اشرف الهداية

আশরাফুল হিদায়া

[বাংলা]

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী

মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস, শেখ জনুরুদ্দীন দারুল কুরআন শামসুল উলূম চৌধুরীপাড়া মাদরাসা, ঢাকা-১২১৯

মাওলানা আব্দুর রায্যাক আল-হুসাইনী

মাওলানা মুহাম্মদ আবূ মূসা

মাওলানা মামূনুর রশীদ

পরিবেশক

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আশরাফুল হিদায়া

প্রকাশক ❖ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা, ৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শব্দবিন্যাস ❖ আল-মাহমূদ কম্পিউটার হোম, ৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া : ৬৫০.০০ [ছয়শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র]

ভূমিকা

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লি 'আলা রাসূলিহিল কারীম।

হাম্‌দ ও সালাতের পর ফিক্‌হ শাস্ত্রে সর্বজনবিধিত, সুবিখ্যাত গ্রন্থ আল্লামা শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন হাসান আলী ইবনে আবূ বকর আল ফারগানানী আলমুরগীনানী (র.) (মৃত: ৫৯৩ হি.) কর্তৃক বিরচিত হিদায়া-এর পরিচয় সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম ও পাঠক সমাজের নিকট নতুন করে তুলে ধরার কোনো অবকাশ রাখে না। এটা স্ব-স্থানে মহা আলোড়ন সৃষ্টিকারী সকল মাযহাবের আলোচনা-পর্যালোচনা, নকলী ও আকলী দলিলের সমন্বয়ে সংকলিত আপন মর্যাদায় উদ্ভাসিত এক অনন্য গ্রন্থ। প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের সকল মাদ্‌রাসায় এটি পাঠ্যসূচির শীর্ষে স্থান করে নিয়েছে। মূলত হিদায়া কিতাবখানাতে ইলমে ফিক্‌হের প্রয়োজনীয় সকল বিধানাবলির বিশদ ব্যাখ্যা সুচারুরূপে প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষার্থীগণ ও পাঠক সমাজের পক্ষে এ সুবিখ্যাত গ্রন্থের সরাসরি অর্থ ও ব্যাখ্যা অনুধাবন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই সহজবোধ্য করার নিমিত্তে এ কিতাবটির বঙ্গানুবাদ ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ জাতীয় কিতাব বাংলাদেশে এটাই প্রথম। ইসলামিয়া কুতুবখানা এ মহাগ্রন্থটির ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ বঙ্গানুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষী ইলম পিপাসু পাঠক মহলের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা বিকাশের গৌরব অর্জন করেছে মাত্র।

পূর্বাপরের সকল প্রশংসাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। কেননা তাঁরই অশেষ কৃপায় আমরা এ মহান উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম হয়েছি। আশা করি এটা আসাতিযায়ে কেরাম ও কোমলমতি তালেবে ইলমদের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ প্রয়াসকে কবুল করুন।

আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এতে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। তবে মৌলিক কোনো ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে এ গ্রন্থটি রচনায় যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন বিশেষ করে চৌধুরীপাড়া মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস ও মুহ্‌তামিম আলহাজ হযরত মাওলানা ইসহাক ফরিদী, মুহাদ্দিস মাওলানা মুফতি আব্দুর রায্‌যাক, মুহাদ্দিস মাওলানা আবূ মূসা ও মাওলানা মামূনুর রশীদ তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। "জাযাহুমুল্লাহু খায়রান ফিদ্‌-দারাইন।" আর আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করছি— তিনি যেন এ গ্রন্থটিকে লেখক, পাঠক ও প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাত ও সাফল্যের মাধ্যম হিসেবে কবুল করে নেন। আমীন!!

বিনীত

প্রকাশক

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ফিক্‌হের সংজ্ঞা ও পরিচিতি

ফিক্‌হ (فِقْهٌ) শব্দটি আরবি। এটি বাবে كَرُمَ ও سَمِعَ হতে ব্যবহৃত হয়। বাবে سَمِعَ থেকে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে– জানা, জ্ঞাত হওয়া বা অবহিত হওয়া ইত্যাদি। যেমন বলা হয়– فَقِهَ فِقْهًا اَىْ عَلِمَ عِلْمًا আর كَرُمَ থেকে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে ফকীহ হওয়া। যেমন বলা হয়– فَقُهَ فَقَاهَةً وَهُوَ فَقِيْهٌ مِنْ قَوْمٍ فُقَهَاءَ

— [লিসানুল আরব-১৩ তম খণ্ড; পৃঃ ৫২২]

প্রখ্যাত অভিধান বিশারদ আল্লামা আবুল ফযল জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুকাররম ইবনে মনযূর (র.) বলেন, اَلْفِقْهُ اَلْعِلْمُ بِالشَّىْءِ وَالْفَهْمُ لَهُ وَغَلَبَ عَلَى عِلْمِ الدِّيْنِ لِسِيَادَتِهٖ وَشَرَفِهٖ وَفَضْلِهٖ عَلَى سَائِرِ اَنْوَاعِ الْعِلْمِ ফিক্‌হ শব্দের (আভিধানিক) অর্থ হলো, কোনো কিছু সম্বন্ধে জানা ও বুঝা। পরে অন্যান্য ইলম তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর শর'ঈ ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব, ফজিলত ও মাহাত্ম্যের কারণে এর ব্যবহার শর'ঈ ইল্‌মের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে হতে থাকে।

—[লিসানুল আরব-প্রাগুক্ত]

শায়খ মুহাম্মদ আলাউদ্দীন হামকাফী (র.) দুররুল মুখতার কিতাবে উল্লেখ করেন যে, فَالْفِقْهُ لُغَةً اَلْعِلْمُ بِالشَّىْءِ ثُمَّ خُصَّ بِعِلْمِ الشَّرِيْعَةِ وَفَقِهَ بِالْكَسْرِ فِقْهًا عَلِمَ وَفَقُهَ بِالضَّمِّ فَقَاهَةً صَارَ فَقِيْهًا ফিক্‌হ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– কোনো কিছু সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া ও জানা। পরে তা শর'ঈ বিষয়াদি জানার সাথে খাস হয়ে যায়। এ শব্দটি بَاب سَمِعَ থেকে ব্যবহৃত হলে এর مَصْدَرْ (ক্রিয়ামূল) فِقْهًا। فَقِهَ অর্থ– সে জেনেছে বা জ্ঞাত হয়েছে। আর بَاب كَرُمَ থেকে ব্যবহৃত হলে এর مَصْدَرْ হবে فَقَاهَةً। فَقُهَ অর্থ–সে ফকীহ হয়েছে।

—[শামী–১ ম খণ্ড; পৃঃ ১১৮]

আল্লামা ইবনে নুজায়ম (র.)ও তৎপ্রণীত আল বাহ্‌রুর রায়িক গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

—[আল্‌ বাহ্‌রুর রায়িক ১ম খণ্ড; পৃঃ ৩]

আল্লামা রশীদ রিযা মিশরী (র.) তৎপ্রণীত তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ শব্দটি কুরআন মাজীদের বিশ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। তন্মধ্যে উনিশ স্থানে এটি গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম ইল্‌মের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিভাষায় ঃ ফিক্‌হ কাকে বলা হয়; এ সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরামের একাধিক অভিমত রয়েছে। উসূলবিদ ওলামায়ে কেরামের মতে, اَلْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ শরিয়তের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে শরিয়তের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিক্‌হ বলা হয়।

এ সংজ্ঞায় বিস্তারিত প্রমাণাদি বলে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস তথা শরিয়তের দলিল চতুষ্টয়কে বুঝানো হয়েছে। — [শামী ১ম খণ্ড; ১১]

ফিক্‌হবিদ (فُقَهَاء) ওলামায়ে কেরামের মতে, حِفْظُ الْفُرُوْعِ অর্থাৎ শরিয়তের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত হুকুম আহকামের সংরক্ষণ করাকে ফিক্‌হ বলা হয়। সূফী সাধকদের মতে,. اَلْجَمْعُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ অর্থাৎ ইলম ও আমলের সমষ্টির নাম ফিক্‌হ। এ কারণেই হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, اَلْفَقِيْهُ الزَّاهِدُ فِى الدُّنْيَا اَلرَّاغِبُ فِى الْاٰخِرَةِ اَلْبَصِيْرُ بِدِيْنِهٖ اَلْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهٖ যে ব্যক্তি পরকালমুখী কিন্তু ইহকাল বিমুখ, কিন্তু দীনের প্রতি বসীরত সম্পন্ন অর্থাৎ সতর্ক দ্রষ্টা বা প্রত্যয়ী এবং স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদতে সদা নিয়োজিত, এ জাতীয় ব্যক্তিকে ফকীহ্ বলা হয়। — [শামী ১ম খণ্ড ; পৃঃ ১২০]

ইমাম শাফি'ঈ (র.) ফিক্হের সংজ্ঞায় বলেন, اَلْفِقْهُ اَلْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ শরিয়তের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে আমলী শরিয়তের বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিক্হ বলা হয়।—[আল্ ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১ম খণ্ড; পৃ ঃ ১৬]

ইমাম আ'যম ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا নফস ও আত্মার জন্য যে সব বিষয় কল্যাণকর এবং যে সব বিষয় কল্যাণকর নয়; তা সহ নফস সম্বন্ধে যথাযথ অবহিত হওয়াকে ফিক্হ বলা হয়। এ সংজ্ঞায় اِعْتِقَادَاتٌ তথা আকীদা-বিশ্বাস وِجْدَانِيَّاتٌ তথা আখলাক ও তাসাউফ এবং عَمَلِيَّاتٌ তথা সালাত, সওম, বেচাকেনা ইত্যাদি সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন জ্ঞানের প্রতিটি শাখা স্বতন্ত্ররূপ পরিগ্রহ করে তখন আকাইদ সম্পর্কিত ইলমের নাম হয় "ইল্মুল কালাম"। আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত ইল্মের নাম হয় "ইলমুত তাসাউফ"এবং আমলী জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধানের নাম হয় "ইল্মুল ফিক্হ"।— [আল্ ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু–১ম খণ্ড; পৃঃ ১৫ –১৬]

ইল্মে ফিক্হের مَوْضُوْع (বিষয়বস্তু) ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য :

ইল্মে ফিক্হের مَوْضُوْع বা আলোচ্য বিষয় হলো فِعْلُ الْمُكَلَّفِ অর্থাৎ মুকাল্লাফ তথা বালিগ ও জ্ঞানবান (عَاقِل) মানুষের কর্ম ও আমল। অর্থাৎ যেহেতু বালেগ, জ্ঞানবান ও মুকাল্লাফ, মানুষের কর্মের স্তর ও ক্ষেত্র নিয়ে এই ইল্মের মধ্যে আলোচনা করা হয় এবং তা ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত; মোস্তাহাব; মুস্তাহ্সান, মুবাহ; জায়েজ, নাজায়েজ, হালাল, হারাম, মাকরূহ তাহরীমী ও মাকরূহ তানযীহী ইত্যাদির থেকে কোনটির অন্তর্ভুক্ত তা নির্দেশ করা হয়; তাই মুকাল্লাফ মানুষের কর্ম এবং আমলই এই ইলমের مَوْضُوْع বা বিষয়বস্তু। আর এই ইল্মের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো, اَلْفَوْزُ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের কামিয়াবী ও সফলতা অর্জন করা।

—[আল ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু – ১ম খণ্ড ; পৃঃ ১৭]

কুরআন-হাদীস এবং ফিকহের পারস্পরিক সম্পর্ক

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, ফিক্হ কুরআন ও হাদীস থেকে ভিন্ন কিছু নয়; বরং কুরআন ও হাদীসের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে উদ্ভাবিত আমলী শরি'য়তের বিধি–বিধানের নামই হচ্ছে ফিক্হ। মাতা-পিতার সাথে সন্তানের যে সম্পর্ক কুরআন হাদীসের সাথেও ফিক্হের সেই একই সম্পর্ক। কুরআন ও হাদীস হলো শরিয়তের اَصْل বা মূল। আর ফিক্হ হলো, এর শাখা-প্রশাখা মাত্র। ইলাহী হিদায়েত ও নববী শরি'য়তের বাস্তবরূপ হলো এই ফিক্হ। ফিক্হ কুরআন ও হাদীসেরই বাস্তব ভিত্তিক ব্যাখ্যা। ফিক্হ ব্যতিরেকে কুরআন ও হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করা এবং তা বাস্তবায়িত করা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। মাসাইলে গায়রে মানসূসা (مَسَائِلِ غَيْرِ مَنْصُوْصَة) তথা যে সব বিষয়ের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কোনো দিক নির্দেশনা নেই সে সব বিষয়ের ক্ষেত্রে ফিক্হের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতিরেকে কোনো গত্যন্তর নেই। এমনকি মাসাইলে মানসূসা (مَسَائِلِ مَنْصُوْصَة)-এর মধ্যেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফিকহের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আলিমগণ ফিক্হের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন তাতেও এ কথার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। তারা বলেছেন, اَلْفِقْهُ اَلْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ শরিয়তের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে আমলী–শরিয়তের বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকেই ফিক্হ বলা হয়। কাজেই ফিক্হকে কুরআন ও হাদীস থেকে ভিন্ন কিছু ভাবার আদৌ কোনো অবকাশ নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, দুধের মধ্যে যেমন মাখন মিশে থাকে; তেমনি কুরআন ও হাদীসের মধ্যে ফিক্হ মিশে ছিল। সুনিপুণ গোয়াল যেমন তার সাধনা ও মেহনতের দ্বারা মাখন ও দুধের অস্তিত্ব সকলকে বুঝিয়ে দেয়; তেমনি ফকীহগণও কুরআন ও হাদীসে যে সব বিধি-বিধান অন্তর্নিহিত ছিল দীর্ঘ-সাধনা ও গবেষণা করে সেগুলোকেই তারা উম্মতের সামনে বিধিবদ্ধ আকারে ফিক্হের নামে পেশ করেছেন। যেমন– অণু-পরমাণুতে এটোমিক শক্তি পূর্ব

হতেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানীরা গবেষণার পর আমাদেরকে এ বিষয়ে অবগত করেছেন যে, এতে এটোমিক শক্তি রয়েছে। অতএব বিজ্ঞানীদের গবেষণা যেমন নুতন কিছুর সৃষ্টি নয়, এমনিভাবে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উদ্ভাবনও কুরআন হাদীসের বিপরীতে আলাদা নুতন কিছুর জন্ম দেওয়া নয়। মূলত কুরআন-হাদীসেরই সহজ রূপায়ন হলো এই ফিক্‌হ। কাজেই দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে, ফিক্‌হের উপর আমল করা প্রকারান্তরে কুরআন ও হাদীসের উপরই আমল করা। এ কারণেই ফিক্‌হ হাসিল করার জন্য কুরআন ও হাদীসে বহু তাকিদ করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে– وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ মু'মিনদের সকলের এক সাথে অভিযানে বের হওয়া সমীচীন নয়। তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি উপদল কেন বের হয় না? যাতে তারা দীন সম্বন্ধে ফিক্‌হ হাসিল করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে; যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়। [৯–১২২]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারক জবান থেকেও ফিক্‌হের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্বন্ধে বহু হাদীস বিবৃত হয়েছে। হযরত মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন; مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল চান তাকে দীনের ফিক্‌হ তথা জ্ঞান দান করেন।

—[মিশকাত; পৃঃ ৩২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন– اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا সোনা-রুপার খনিরাজির ন্যায় মানুষও খনিতুল্য। তাদের মধ্যে জাহেলিয়াতের যুগে যারা শ্রেষ্ঠ ছিল ইসলামি যুগেও তারা শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। যদি তারা ফিক্‌হ তথা দীনের ইল্‌ম হাসিল করে থাকে

—[প্রাগুক্ত]

তিনি আরো ইরশাদ করেন– إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُوْنَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّيْنِ فَإِذَا اَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا (আমার পর) লোকজন তোমাদের অনুসরণকারী হবে। আর দিক-দিগন্ত হতে লোকজন দীনি বিষয়ে ফিক্‌হ হাসিল করার জন্য তোমাদের নিকট আসবে। যখন তারা তোমাদের নিকট আসবে তখন তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দিবে।— [মিশকাত; পৃঃ ৩৪]

আরো ইরশাদ হয়েছে, فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ একজন ফকীহ শয়তানের পক্ষে হাজার আবিদ (ইবাদতকারী) অপেক্ষাও ভয়ংকর।— [প্রাগুক্ত]

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, مَا عَبَدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْءٍ اَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِي الدِّيْنِ وَلَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هٰذَا الدِّيْنِ الْفِقْهُ বান্দা আল্লাহ তা'আলার যত ইবাদত করে তন্মধ্যে ফিক্‌হ ফিদ্দীন তথা দীনি বিষয়ে ফিকহ্ ও ইল্‌ম হাসিল করাই হলো সর্বোত্তম ইবাদত। একজন ফকীহ্ শয়তানের পক্ষে হাজার আবিদের অপেক্ষায়ও ভয়ংকর। আর প্রত্যেক জিনিসেরই একটি স্তম্ভ রয়েছে, দীন ইসলামের স্তম্ভ হলো ফিক্‌হ।—[আওয়ারিফুল মা'আরিফ–১ম খণ্ড; পৃঃ ২২৫]

এক হাদীসে আছে, مَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً ফিকহী মজলিস অর্থাৎ ফিক্‌হ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য কিছু সময় বসা, ষাট বছর নফল ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।

—[আছারুল ফিক্‌হিল ইসলামী–১ম খণ্ড ; পৃঃ ৮৬]

হযরত ওমর (রা.) বলেন, تَفَقَّهُوْا قَبْلَ اَنْ تُسَوَّدُوْا তোমরা নেতৃত্ব লাভের আগেই ফিক্‌হ হাসিল করে নাও।

—[বুখারী শরীফ–১ম খণ্ড ; পৃঃ ১০]

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর জন্য দোয়া করে বলেছেন– اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاوِيْلَ হে আল্লাহ! আপনি তাকে দীনের ফিক্হ দান করুন এবং তাকে কুরআনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ইল্ম দান করুন।— [বুখারী শরীফ –১ম খণ্ড]

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মহান আল্লাহর বাণী كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, كُوْنُوْا حُكَمَاءَ عُلَمَاءَ فُقَهَاءَ অর্থাৎ তোমরা বিজ্ঞ আলিম ও ফকীহ হও।

— [বুখারী শরীফ-১ম খণ্ড; পৃঃ ১৬]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ফিক্হ কুরআন ও হাদীসের বিপরীত কিছু নয়; বরং তা এমন একটি বিষয় যার শিক্ষার প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ ও অনুমোদন রয়েছে। কাজেই ফিক্হ শাস্ত্রকে কুরআন ও হাদীস থেকে ভিন্নতর কিছু বলে আখ্যায়িত করা চরম মূর্খতা এবং অর্বাচীনতারই শামিল।

ফিক্হের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামে ফিক্হের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কুরআন ও সুন্নাহর পরই ফিক্হের স্থান। শামী গ্রন্থের ভূমিকা অংশে উল্লেখ রয়েছে যে, إِنَّ الْاُمَّةَ الْاِسْلَامِيَّةَ لَاحَيَاةَ لَهَا بِدُوْنِ الْفِقْهِ إِذْ هُوَ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ফিক্হ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর জীবন। ফিক্হ ব্যতীত এ উম্মতের জীবন বেঁচে থাকতে পারে না। কেননা হালাল হারাম বর্ণনার কেন্দ্র ভূমিই হচ্ছে এই ফিক্হ।— [শামী–১ম খণ্ড ; পৃঃ ২২

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) বলেছেন, কুরআন বুঝা হাদীস বুঝার ওপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে হাদীস বুঝাও ফিক্হ বুঝার ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে ওহি নাজিলের কালেই কুরআন মাজীদে ফিক্হ হাসিলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। এমনিভাবে হাদীসের মধ্যেও এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবৃত হয়েছে। দরসগাহে নববী থেকে তা'লীম প্রাপ্ত হয়ে সাহাবায়ে কেরামও ফিক্হ চর্চা এবং ইজতিহাদ করেছেন। হাদীসের কিতাবে এর বহু নজীর বিদ্যমান রয়েছে। বুখারী শরীফের এক হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আহযাব (খন্দকের) যুদ্ধের দিন (যুদ্ধ সমাপ্তির পর কতিপয় সাহাবীকে লক্ষ্য করে) নবী কারীম ﷺ বলেছেন, বনী কুরায়যার মহল্লায় না পৌঁছে তোমাদের কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে। (لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ)। পথিমধ্যে আসরের সালাতের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে পৌঁছার পূর্বে সালাত আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা এখানেই সালাত আদায় করব। কেননা নবী কারীম ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই নয় যে, রাস্তায় সালাতের সময় হয়ে গেলেও তা আদায় করা যাবে না। বিষয়টি নবী কারীম ﷺ-এর নিকট উত্থাপিত হলে তিনি তাদের কোনো দলেরই তিরস্কার করেননি।— [বুখারী শরীফ ২য় খণ্ড; পৃঃ ৫৯১] এ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, একদল সাহাবী لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ হাদীসের শব্দের ওপর আমল করেছেন। আর অপর একদল সাহাবী উক্ত হুকুম থেকে এর ইল্লাত (عِلَّتْ) বের করে এ কথা বলেছেন যে, হুযূর ﷺ-এর উক্ত নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য হলো, দ্রুত বনী কুরায়যায় পৌঁছে যাওয়া যাতে সেখানে গিয়ে আসরের সালাত আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য আদৌ এটা নয় যে, রাস্তায় আসরের সালাতের সময় হলেও এখানে সালাত আদায় করা যাবে না। তাই তারা রাস্তায়ই সালাত আদায় করে নিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের দ্বিধা বিভক্তি এবং তাদের দুইভাবে আমল করার সংবাদ নবী কারীম ﷺ-কে জানানো হলে তিনি যাহিরী হাদীসের ওপর আমলকারীদেরকেও কিছু বলেননি এবং হুকুমের ইল্লাত (عِلَّتْ) বের করে যারা রাস্তায় আসরের সালাত আদায় করেছেন তাদেরকেও কিছু বলেননি। এমনিভাবে হাদীসের কিতাবে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়ামনের গভর্নর করে সেখানে পাঠাচ্ছিলেন তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, بِمَا تَقْضِىْ يَا مُعَاذُ হে মু'আয! তুমি কিসের ভিত্তিতে বিচার বিসম্বাদের ফয়সালা করবে? জবাবে

তিনি বলেছেন, بِكِتَابِ اللهِ কুরআন মাজীদের দ্বারা। অতঃপর নবী কারীম ﷺ বললেন, فَإِنْ لَمْ تَجِدْ যদি সে ফয়সালাটি কুরআন মাজীদে না পাও তাহলে? জবাবে তিনি বললেন, بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর আলোকে ফয়সালা করব। নবী কারীম ﷺ পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, فَإِنْ لَمْ تَجِدْ যদি তাতেও তা না পাও তাহলে? জবাবে তিনি বললেন, أَجْتَهِدُ بِرَائِي তখন আমি আমার রায় এবং ফিক্‌হের দ্বারা ইজতিহাদ করব। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কোনোরূপ তিরস্কার না করে বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِهِ بِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُوْلَهُ সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি তার রাসূলের রাসূল তথা প্রতিনিধিকে এমন পন্থা অবলম্বনের তৌফিক দান করেছেন যে ব্যাপারে রাসূল সন্তুষ্ট আছেন।—[মুসনাদে আহমদ]

অপর এক হাদীসে আছে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, একবার দু'জন সাহাবী সফরে বের হলেন। পথিমধ্যে সালাতের সময় হলো। তখন তাঁদের নিকট কোনো পানিই ছিল না। তাই তাঁরা পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর নামাজের সময় বাকি থাকতেই তারা পানিও পেয়ে গেলেন। তখন তাদের একজনে অজু করে সালাত দোহরিয়ে নিলেন; কিন্তু অপরজন অজু করলেন না এবং সালাতও দোহরালেন না। অতঃপর সফর শেষে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং ঘটনা সবিস্তারে তাঁকে জানালেন। সব কথা শুনে তিনি "যে ব্যক্তি অজু ও সালাত দোহরায়নি" তাকে বললেন, أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلٰوتُكَ তুমি সুন্নত মুতাবিক কাজ করেছ এবং তোমার আদায়কৃত নামাজই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি অজু করে তার সালাত দোহরিয়ে নিয়েছিলেন তাকে বললেন, لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ ছওয়াব।—[সুনানে আবূ দাউদ; ১ম খণ্ড]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যে সব সাহাবী ফিক্‌হের ব্যাপারে বিশেষ খ্যাতি ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, হযরত ওমর, হযরত আয়িশা, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত, হযরত আবূ মূসা আশ'আরী, হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায় ফিক্‌হ ছিল, ফিক্‌হের চর্চা ছিল কিন্তু ফিক্‌হ শাস্ত্রের বর্তমান রূপ ছিল না। তা ছাড়া ইসলামি আহকামের প্রকারভেদ তথা ফরজ, ওয়াজিব এবং সুন্নত ও মোস্তাহাব ইত্যাদি বিষয়ের কোনো বিতর্কও তখন হতো না; বরং তখন সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুসরণ করেই চলতেন। কোনো বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে নবী কারীম ﷺ তা সমাধান করে দিতেন বা কুরআন নাজিলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তা নিরসন করে দিতেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের জীবনে সুসংহত অবয়বে স্বতন্ত্রভাবে কোনো ফিকহ শাস্ত্র প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয়নি এবং প্রণীতও হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের পর ইসলাম যখন দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে তখন বিভিন্ন তাহযীব ও তামাদ্দুনের মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে। ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বহু নিত্য-নুতন সমস্যা দেখা দেয়। এ সব সমস্যার সমাধান কল্পে কুরআন ও হাদীসের উপর নতুন আঙ্গিকে গবেষণা করার তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়। সে প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে কুরআন ও হাদীস মন্থন করে আমলী শরিয়তের যে সব বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয় তাই হচ্ছে ফিক্‌হ। এ ছাড়াও আরো এমন কিছু সমস্যা রয়েছে যা ফিক্‌হ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাকে তীব্রতর করে তুলেছে।

১. কুরআন ও হাদীসে মূলনীতি বিবৃত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিধি-বিধান এতে নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কুরআন ও হাদীসে নামাজের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যদি কারো নামাজে ভুল হয় অথবা কোনো আমল ছুটে যায় তাহলে এ কথা বলার কোনো উপায় নেই যে, তার উক্ত আমলের পর্যায়টি কী? এবং কিভাবে এর প্রতিকার করতে হবে। এ জাতীয় বিষয়ের স্পষ্ট সমাধান কুরআন ও হাদীসের কোথাও নেই। অথচ এ ধরনের সমস্যার সমাধানও আবশ্যক।

২. কুরআন মাজীদের কোনো কোনো স্থানে বাহ্যত বিপরীতমুখী দুই রকমের আয়াত রয়েছে। যেমন সূরা বাকারায় উল্লেখ রয়েছে, وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাদের স্ত্রীগণ চারমাস দশদিন প্রতীক্ষায় (ইদ্দতে) থাকবে। [২:২৩৪]। আবার সূরা তালাকের এক আয়াতে উল্লেখ আছে, وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। [৬৫–৪]

উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রথমোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যে মহিলার স্বামী মারা যাবে তার ইদ্দতকাল হবে চারমাস দশদিন। চাই সে গর্ভবতী হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, গর্ভবতী মহিলার ইদ্দতকাল হলো, সন্তান প্রসব হওয়ার সময় পর্যন্ত। ফলে উপরোক্ত আয়াত দু'টো থেকে কোনো স্পষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছে না অথচ এতদুভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা একান্ত জরুরি। কেননা আল্লাহর কালামে বৈপরীত্য থাকতে পারে না।

৩. অনুরূপভাবে এক আয়াতে রয়েছে, فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ কুরআনের যতটুকু পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু পাঠ করবে। [৭৩–২০] আর অপর আয়াতে রয়েছে وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে। যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয় । [৭–২০৪] এই দুই আয়াতের মধ্যেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রথম আয়াত থেকে বুঝা যায়, নামাজে ইমাম ও মুক্তাদী সকলকেই কিরাআত পড়তে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইমামের তিলাওয়াত কালে মুক্তাদী চুপ করে শুনবে, নিজে কুরআন তিলাওয়াত করবে না। এই দুই আয়াতের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান করা অপরিহার্য।

৪. কখনো কখনো কুরআন এবং হাদীসের হুকুমের মধ্যেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন কুরআন মাজীদে রয়েছে, فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ কুরআনের যতটুকু পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ হয় পাঠ করবে। [৭৩–২০] অথচ হাদীস শরীফে রয়েছে, لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ সালাতে যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার সালাত হয় না।— [মিশকাত; পৃঃ ৭৮] আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, সালাতে ফাতিহা পড়া জরুরি নয়। কুরআন মাজীদের যে কোনো স্থান থেকে তিলাওয়াত করলেই নামাজ হয়ে যাবে। অথচ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ফাতিহা পাঠ করতেই হবে। সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে সালাতই হবে না। এই দুই নসের মধ্যেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসঙ্গতি দেখা যায়। এতদুভয় নসের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান করা আবশ্যক।

৫. এমনিভাবে দুই হাদীসের মধ্যেও বাহ্যত অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন এক হাদীসে আছে; لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ সালাতে যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার সালাত হয়নি।— [মিশকাত; পৃঃ ৭৮]
অপর এক হাদীসে আছে, مَنْ كَانَ لَهٗ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ لَهٗ قِرَاءَةٌ সালাতে যার ইমাম রয়েছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি জামাতের সাথে সালাত আদায় করছে, ইমামের কিরাআতই তার জন্য কিরাআত অর্থাৎ তাকে আর ভিন্নভাবে কিরাআত পড়তে হবে না।— [সুনানে ইব্‌নে মাজাহ; পৃঃ ৬১] এ দুই হাদীসের মধ্যেও বাহ্যত বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতদুভয়ের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান করা আবশ্যক।

৬. কুরআন মাজীদ এবং হাদীস শরীফে একাধিক অর্থবোধক শব্দও বহু ব্যবহৃত হয়েছে যা সামঞ্জস্য বিধানের দাবি রাখে। অন্যথায় আয়াত এবং হাদীসের উপর আমল করাই দুষ্কর হয়ে পড়বে। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী তিন কুরূ (قُرُوْء) পর্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকবে। [২:২২৮] আভিধানিক অর্থে কুরূ (قُرُوْء) শব্দটি ঋতু (حَيْض) এবং পবিত্রতা (طُهْر) উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এ কারণে এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এ শব্দটি এখানে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রশ্নের সমাধান অবশ্যই অপরিহার্য।

অনুরূপভাবে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ যে ব্যক্তি জমি বর্গা দেওয়া থেকে বিরত থাকে না সে যেন আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত থাকে।— [সুনানে আবূ দাউদ; পৃঃ ৪৮৩]

مُخَابَرَةٌ অর্থ জমি বর্গা দেওয়া। জমি বর্গা দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কোন পদ্ধতি নিষিদ্ধ এখানে এর স্পষ্ট কোনো বর্ণনা নেই। অথচ হাদীসের উপর আমল করতে হলে এর স্পষ্ট বর্ণনা আবশ্যক।

৭. স্থান-কাল ও অবস্থার পরিবর্তনের ফলে নুতন সমস্যার উদ্ভব হওয়া। ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তাই এ জাতীয় উদ্ভূত সমস্যার সমাধানও অত্যাবশ্যক।

৮. আরবি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কিত সমুদয় জ্ঞান প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান না থাকা। কেননা কুরআন সুন্নাহ হতে সরাসরি মাসআলা বের করে তদনুসারে আমল করতে হলে আরবি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি কুরআন মাজীদের শানে নুযূল এবং হাদীসের শানে উরূদ জানতে হবে। জানতে হবে কোনটি খাস, কোনটি আম, কোনটি মুজমাল, কোনটি মুফাস্‌সাল, কোনটি মুহকাম, কোনটি মুতাশাবিহ কোনটি নাসিখ এবং কোনটি মানসূখ ইত্যাকার বিষয়াদি। অন্যথায় নুসূস থেকে মাসআলা উদ্ভাবন ও اِسْتِنْبَاطٌ করা সম্ভব হবে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুই আয়াত, দুই হাদীস কিংবা এক আয়াত ও এক হাদীসের মধ্যে পরিলক্ষিত বাহ্যিক অসঙ্গতি নিরসন করা এবং সৃষ্ট ও উদ্ভূত সমস্যার সমাধান অত্যাবশ্যক হয়ে দেখা দিলে ফকীহগণ ইসলামি আইন শাস্ত্রকে সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে কুরআন ও হাদীস মন্থন করে প্রণয়ন করেন ইসলামি আইন শাস্ত্রের এক মহামূল্যবান ভাণ্ডার যা আজ ইল্‌মে ফিক্‌হ নামে পরিচিত।

উল্লেখ্য যে, ইসলামি শরিয়তে ফিকহ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা যেমন অনস্বীকার্য তেমনিভাবে ইসলামি জীবন যাপনের জন্য ফিক্‌হ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহর ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দৈনন্দিন জীবনে আমলের জন্য " প্রয়োজনীয় ফিকহ্" শিক্ষা করা ফরজে আইন এবং ইলমে ফিক্‌হে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা ফরজে কিফায়া।— [আসারুত তাশরী]

ফিকহের সূচনা ও ক্রমবিকাশ

ইসলামি ফিক্‌হের মূল উৎস হলো পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস। এই দু' উৎস মূলের ভিত্তিতে কাল পরিক্রমায় উদ্ভাবিত সমস্যাবলির যে সমাধান ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে করা হয়েছে তাও ইসলামি আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে স্বীকৃত। প্রণিধানযোগ্য যে, ইসলামে ফিক্‌হের সূচনা এবং ফিক্‌হের চর্চা ওহি নাজিলের সময়কাল থেকেই শুরু হয়েছে। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে এসে তা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। পরবর্তীকালেও এর ক্রমবিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে। যুগজামানার ভিত্তিতে ফিক্‌হের এ ক্রমবিকাশের ধারাকে আমরা ছয়টি যুগে ভাগ করতে পারি।

১. প্রথম যুগ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারক যুগ যা তাঁর নবুয়ত প্রাপ্তি থেকে দশম হিজরি সন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

২. দ্বিতীয় যুগ : কেবারে (كِبَار) সাহাবায়ে কেরামের যুগ। এই যুগ খুলাফায়ে রাশিদীনের সমাপ্তিলগ্নে এসে শেষ হয়েছে।

৩. তৃতীয় যুগ : সেগারে (صِغَار) সাহাবা ও তাবিঈনে কেরামের যুগ। এ যুগ খোলাফায়ে রাশিদীনের সমাপ্তি কালের পর থেকে শুরু হয়ে হিজরি প্রথম শতকের শেষ সময় পর্যন্ত অথবা হিজরি দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

৪. চতুর্থ যুগ : ফিক্‌হ সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদের যুগ এবং ইল্‌মে ফিক্‌হ এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করার যুগ। এ যুগেই ঐ সমস্ত মহান ফুকায়ে কেরাম এ ধরা পৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়েছেন যাদের অবিস্মরণীয় ও অনবদ্য কীর্তি যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে আসছে ও থাকবে। এ যুগে তাদের সনামধন্য শিষ্যবৃন্দও এ পৃথিবীতে এসে ফিক্‌হ জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। এ যুগ হিজরি তৃতীয় শতকের শেষ লগ্ন পর্যন্ত অথবা চতুর্থ শতাব্দীর অর্ধকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

৫. পঞ্চম যুগ : ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতার ও তাকলীদের যুগ এবং ইলমে ফিক্‌হ মুনাযারার বিষয়ে

পরিণত হওয়ার যুগ। আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন কুরআন ও হাদীস মন্থন করে যে সব মাসআলা মাসাইলের উদ্ভাবন করেছিলেন এ যুগে এসে সে সব মাসাইলের তাহকীক (تَحْقِيْق) ও তাফতীশ (تَفْتِيْش) -এর ব্যাপারে মুনাযারা এবং বাহাস বিতর্কের সূচনা হয়েছিল; সর্বোপরি এ যুগেই সংকলিত হয়েছিল ফিক্হ শাস্ত্রের উপর আলোড়ন সৃষ্টিকারী বহু গ্রন্থরাজি। আব্বাসী খিলাফতের যবনিকাপাত হওয়া এবং বাগদাদে তাতারিদের লোমহর্ষক আক্রমণ সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এ যুগের বিস্তৃতি। অবশ্য এ সময়ের পরও মিসরে এ যুগের কিছুটা বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হয়।

৬. **৬ষ্ঠ যুগ :** খালিস তাকলীদের যুগ। সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে এ যুগের সূচনা হয়। মূলত এ যুগে ইজতিহাদ করার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া থেমে যায়। ফলে সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট লোক সকলেরই ইমামগণের তাকলীদ করতে হয়। এ অবস্থা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

—[তারীখু তাশরী'ইল ইসলামী ঃ শায়খ মুহাম্মদ খিযরী বেগ; তারীখে ফিকহে ইসলামী; ভূমিকা অংশ; পৃঃ ১৬–১৭]

প্রথম যুগ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারক যুগ :

এ যুগের সূচনা হয় মহানবী ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকে; আর শেষ হয় দশম হিজরি সনে গিয়ে তাঁর ইনতিকালের মধ্য দিয়ে। এ সময়ের যাবতীয় বিষয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যাতে পাকের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আইন-প্রণয়ন উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ফতোয়া, ফারাইয, দীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি সব ওহির মাধ্যমে তিনি নিজেই সম্পাদন করতেন। সে সময় স্বতন্ত্র ফিক্হ শাস্ত্র প্রণয়নের কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। এ সময় ইসলামি ফিক্হের উৎস ছিল মাত্র দু'টি–(১) কুরআন মাজীদ, (২) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অর্থাৎ তাঁর হাদীস। উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন সহজ ও সরলভাবে বর্ণনা করতেন যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কুরআনিক বিধান এবং রাসূলে পাকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে কোনো দ্বিমতের অবতারণা হতো না। এমনিভাবে এ নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো প্রকার ভুল বুঝাবুঝি এবং বিরোধের সামান্যতম সম্ভাবনাও দেখা দিত না। কুরআন মাজীদে ফিক্হের যে সমাধান পেশ করা হয়েছে, এর কতেকগুলো তো এমন যা সমাজে অনুপ্রবিষ্ট ফাসিদ আমল এবং বাতিল চিন্তা-ভাবনার মূলোৎপাটনের নিমিত্তে নাজিল করা হয়েছে, আবার কতেক আয়াত এমন যা কারো প্রশ্নের জবাব হিসেবে নাজিল করা হয়েছে। আবার কতেক আয়াত এমনও আছে যা কারো প্রশ্নের জবাবে নয়; বরং এমনিই নাজিল করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ সবের কিছু উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. হজ এবং ওমরার সময় সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ নিয়মে দৌড়ানো (সা'ঈ) ওয়াজিব। এভাবে দৌড়ানোর নিয়ম হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সময় হতে চলে আসছে। মুশরিক লোকেরা হজ ও ওমরার অনুষ্ঠানাদিতে শিরক ও বিদ'আতের প্রবর্তন করেছিল। তারা এ পাহাড়দ্বয়ে দেব মূর্তি স্থাপন করে সা'ঈর সময়ে এগুলো প্রদক্ষিণ করতো। এ কারণে কোনো কোনো সাহাবী বিশেষত আনসারদের অনেকে সেখানে সা'ঈ করাকে গুনাহের কাজ বলে মনে করতেন। এ ভুল আকীদার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাজিল করলেন, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ কা'বা গৃহের হজ কিংবা ওমরা সম্পন্ন করে এই দু'টির মধ্যে সা'ঈ করবে তার কোনো পাপ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ তো পুরস্কারদাতা সর্বজ্ঞ। [২:১৫৮]

২ হজের সময় আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ফরজ। তা সত্ত্বেও কুরাইশগণ আভিজাত্যের অন্ধ অহমিকায় মক্কার সীমার বাইরে অবস্থিত আরাফাতের ময়দানের পরিবর্তে মুযদালিফা উপত্যকায় ৯ম তারিখের উকূফ (অবস্থান) আদায় করতো। নিম্নোক্ত আয়াতে এরূপ অহমিকা পরিহার করে সকলের সাথে আরাফায় অবস্থান করে তথা থেকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ প্রদান করা হয়। ইরশাদ হয়েছে– ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ। অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে; আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। [২:১৯৯]

৩. ইহুদিদের মধ্য হতে যারা ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন তাদের কেউ কেউ ইহুদি ধর্মের কোনো কোনো কাজ

পূর্ববৎ করতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি নাজিল করলেন– يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ * হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। [২ঃ ২০৮]

উপরোক্ত আয়াত তিনটিতে সমাজে অনুপ্রবিষ্ট ফাসিদ আমল এবং বাতিল আকীদার মূলোৎপাটন করে সহীহ আকীদা এবং বিশুদ্ধ আমলের তা'লীম প্রদান করা হয়েছে। এভাবে বহু আয়াতে শরিয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবেও আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন বিধি- বিধান সম্বলিত আয়াত নাজিল করেছেন।

৪. যেমন ইরশাদ হয়েছে–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ - فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ
وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ ــــ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও, কিন্তু তাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে; কী তা'রা ব্যয় করবে? বল, যা উদ্বৃত্ত, এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করো দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে। লোকে তোমাকে এতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। বস্তুত! আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। [২ঃ২১৯-২২০]

৫. অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا
تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

লোকে তোমাকে রক্তস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল; এটা অরুচি। সুতরাং তোমরা রক্তস্রাবকালে স্ত্রী সঙ্গম বর্জন করবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সঙ্গম করবে না। অতঃপর তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন। [২:২২২]

৬. আরো ইরশাদ হয়েছে–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ -

পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বল, এ মাসে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা।আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং এর বাসিন্দাকে তা থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়। [২:২১৭]

৭. আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ

يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ـ

লোকে তোমার নিকট ফতোয়া অর্থাৎ ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন যে, কোনো পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভগ্নি থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে, আর দুই ভগ্নি থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ; আর যদি ভাই বোন উভয়ে থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এ আশঙ্কায় আল্লাহ তোমাদের পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বাধিক অবহিত। [৪ঃ১৭৬]

৮. অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ

লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের; সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো; যদি তোমরা মু'মিন হও। [৮ঃ১]

যেমনিভাবে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে অথবা বিশেষ কোনো ব্যক্তির জিজ্ঞাসাবাদের প্রেক্ষিতে কুরআন মাজীদের আয়াত নাজিল হয়েছে। এমনিভাবে কোনো প্রেক্ষিত বা জিজ্ঞাসা ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াত নাজিল করেছেন। পূর্বেও এ কথা বলা হয়েছে যে, কুরআন মাজীদের সর্বমোট পাঁচশত আয়াত দ্বারা আহকাম সাব্যস্ত হয়েছে। (নূরুল আনওয়ার ; পৃঃ ৫) যেমন– নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত; মু'আমালা-মু'আশারা, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, দাওয়াত, জিহাদ, বিবাহ-শাদী, পারিবারিক জীবন; সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, আন্তর্জাতিক জীবন, বিচার ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি বিষয়ের এক একটির সম্পর্কে কুরআন মাজীদে একাধিক আয়াতও নাজিল হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কুরআন মাজীদে যে ফিক্হ বর্ণনা করা হয়েছে এর মধ্যে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

১. عَدَمُ الْحَرَجِ অর্থাৎ সাধ্যাতীত কোনো কাজ মানুষের প্রতি চাপিয়ে না দেওয়া। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا আল্লাহ কারো উপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত। [২:২৮৬]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি। [২২:৭৮]

আরো ইরশাদ হয়েছে, يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না। [২:১৮৫]

২. تَقْلِيْلُ التَّكَالِيْفِ অর্থাৎ তাকলীফ তথা শরিয়তের বাধ্য-বাধকতা হ্রাস করা। এটি মূলত عَدَمُ الْحَرَجِ -এরই ফলাফল। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ হে মু'মিনগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করবে না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে। কুরআন অবতরণকালে তোমরা যদি সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ সে সব ক্ষমা করেছেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল। [৫-১০১]

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্বন্ধে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হজ ফরজ হওয়ার হুকুম হলে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হজ কি প্রতি বছর ফরজ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, আমি যদি হাঁ

বলি তবে তা-ই হবে। যে বিষয়ে তোমাদেরকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না।— [আল কুরআনুল কারীম; টীকা নং ৩৮৫ ই. ফা. বাংলাদেশ]

এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শরিয়তের তাকলীফ তথা বিধি-বিধানকে কমিয়ে রাখা এটাই শরিয়তদাতার উদ্দেশ্য।

৩. تدريج অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে শরিয়তের বিধানে পূর্ণতা দান করা। বহু বিষয়ের ক্ষেত্রে আমরা এ নীতির বাস্তবায়ন দেখতে পাই। মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মদের ব্যাপারে প্রথমে নিম্নের আয়াতটি নাজিল করা হয়। يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, উভয়ের মধ্যেই পাপ রয়েছে। তবে মানুষের জন্য এতে উপকারও আছে। কিন্তু এগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। [২:২১৯]

অতঃপর মানুষের মধ্যে যখন মদের কুফল সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সাধনার সৃষ্টি হলো, তখন আরেকটু অগ্রসর হয়ে নামাজের ওয়াক্তে মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেওয়া হলো, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ * হে মু'মিনগণ! তোমরা মদ্যপানরত অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হবে না যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পারো। [৪ঃ ৪৩]

দ্বিতীয় নির্দেশটি বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হলে আল্লাহ তা'আলা তৃতীয় পর্যায়ে নাজিল করলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মুর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক সর ঘৃণ্যবস্তু। এগুলো শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো, তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে। [৫ ঃ ৯০]

এ আয়াত নাজিলের পর সাহাবায়ে কেরামের অন্তর থেকে মদের আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়। তরবিয়াতের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে কোনো বিধানকে পূর্ণতা দান করার এ নীতিটি এতই ফলপ্রসূ যে, শেষোক্ত আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর সাহাবীগণের মনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হলো। ফলে যারা মদ মুখে নিয়েছিলেন তারা তা ওগলিয়ে সব মুখ থেকে বের করে দেন। যারা মদের গ্লাস হাতে নিয়ে ছিলেন তারা হাত থেকে গ্লাসটি ছুড়ে ফেলে দিলেন। আর যাদের ঘরে মদের মটকা ছিল তারা মটকাগুলো ভেঙ্গে ফেললেন। এতে মদীনার অলিতে গলিতে মদের সয়লাব বইতে লাগল।— [তারীখুত তাশরী'ইল ইসলামী]

এ পর্যায়ে নামাজের বর্তমান পদ্ধতিটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে আমরা যে পদ্ধতিতে সালাত আদায় করছি, ইসলামের প্রাথমিক যুগে সালাতের এ পদ্ধতি ছিল না। প্রাথমিক যুগে সালাম কালাম কথাবার্তা এদিক ওদিক তাকানো চলাফেরা করা ইত্যাদি সব কিছুই নামাজরত অবস্থায় মুসল্লীর জন্য বৈধ ছিল। পরে যখন সাহাবায়ে কেরাম সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন তখন পর্যায়ক্রমে কখনো এদিক ওদিক তাকানো আবার কখনো সালাম কালাম ইত্যাদি একাগ্রতা বিনষ্টকারী কাজগুলোকে হারাম করে দেওয়া হয়। শরিয়তকে এভাবে পর্যায়ক্রমিক ভাবে পেশ করায় এ নীতি খুবই ফলপ্রসূ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বা সুন্নাহ; কুরআন মাজীদের মাধ্যমে যেমনিভাবে শরিয়তের বহু বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে তেমনিভাবে হাদীসের মাধ্যমেও শরিয়তের বহু বিধি-বিধান প্রদান করা হয়েছে। বলা হয় আহকামাতের সাথে সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা তিন হাজার। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

১. প্রত্যেক মুসলমানের ওপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ। এ কথা উল্লেখ পূর্বক রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ (দৈনিক) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ করেছেন।— [নাসাঈ শরীফ; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৮০]

২. তিন সময় নামাজ পড়া নিষেধ। এ সম্পর্কে মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلٰثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ

مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضِيْفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ .

হযরত উক্বা ইবনে আমির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনটি সময় এমন যে সময়ে রাসূল ﷺ আমাদেরকে নামাজ পড়তে এবং মৃত লোকদেরকে কবরস্থ করতে (জানাযার নামাজ আদায় করতে) নিষেধ করেছেন। (১) সূর্যোদয়ের সময় যতক্ষণ না তা উপরের দিকে উঠে আসে। (২) ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় যতক্ষণ না তা হেলে যায়। (৩) ঠিক সূর্যাস্তের সময় যতক্ষণ না তা পূর্ণাঙ্গভাবে আস্তমিত হয়। — [বুলূগুল মারাম ;১ম খণ্ড; পৃঃ ১৩]

৩. জামাতের সাথে নামাজ আদায়কারী মুক্তাদীর জন্য ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْنَ ইমামকে এ জন্যই তো ইমাম নিয়োগ করা হয়েছে যাতে তার ইক্তেদা করা হয়। যখন সে তাকবীর বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন সে কিরাআত পড়বে তখন তোমরা তা চুপ করে শুনবে। এবং যখন সে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে।— [আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ সূত্র মিশকাত; পৃঃ ৮১]

অপর এক হাদীসে আছে– عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (رض) أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِيْ شَيْءٍ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-কে ইমামের সাথে কিরাআত পড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে তিনি বললেন, ইমামের সাথে কোনো অবস্থাতেই কিরাআত পড়া যাবে না।— [মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড; পৃঃ ২১৫]

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের মধ্যে দীনের সামগ্রিক বিষয়ের বিধি-বিধানই বিবৃত হয়েছে। এ সব হাদীসের মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে দীনের তা'লীম দিয়েছেন এবং তৎকালীন সমাজের উদ্ভূত সমস্যার সমাধান পেশ করেছেন। মানুষের জীবনের এমন কোনো বিষয় নেই যার মৌলিক সমাধান কুরআন ও হাদীসে নেই।

দ্বিতীয় যুগ : কিবারে সাহাবায়ে কিরামের যুগ :

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিরোধানের পর একাদশ হিজরি সন থেকে এ যুগের সূচনা হয় এবং শেষ হয় তা চল্লিশ হিজরি সনে গিয়ে। আর এ সময়েই খিলাফতে রাশিদারও পরিসমাপ্তি ঘটে। খুলাফায়ে রাশিদীনের সোনালী যুগে বিভিন্ন দেশ জয় এবং নানা প্রকার সামাজিকতার সংস্পর্শে আসার কারণে মুসলিম সমাজে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে থাকে। এ সব সমস্যার সমাধানের জন্য কুরআন ও হাদীস ছাড়া আরো দু'টি উপায় অবলম্বিত হয়ে থাকে।

১. সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশিদীনের সোনালী যুগে যদি মুসলিম সমাজে কোনো সমস্যা দেখা দিতো তাহলে তার সমাধানের জন্য প্রথমে তারা কুরআন ও হাদীসের সিদ্ধান্ত তালাশ করতেন। যদি উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন ও হাদীসে না পাওয়া যেতো, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শের ভিত্তিতে ঐকমত্য হয়ে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। একেই ইজমায়ে সাহাবা বলা হয়। এটিই হলো ইজমার গ্রহণ যোগ্যতার মূলভিত্তি। এরই ফলশ্রুতিতে পরবর্তী কালে ইজমা ইসলামি আইনের তৃতীয় উৎস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

২. বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ বা ব্যক্তিগত অভিমত। এ যুগে উদ্ভাবিত যে সকল সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদীসে সরাসরি পাওয়া যেতো না এবং যার সমাধানে সাহাবায়ে কেরাম সম্মিলিতভাবেও কোনো সিদ্ধান্ত নেননি, বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম এমন কিছু সমস্যার সমাধানে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত অভিমত পেশ করেছেন। একেই কিয়াসের ভিত্তি বলা হয়। পরবর্তীতে এটাই ইসলামি আইনের চতুর্থ উৎস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।— [তারীখে ফিকহে ইসলামী; পৃ : ১৭৫]

তৃতীয় যুগ : সিগারে সাহাবা ও তাবিঈনে কেরামের যুগ :

এ যুগ খুলাফায়ে রাশিদীনের সমাপ্তিকালের পর হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর শাসনকাল তথা একচল্লিশ হিজরি সন থেকে শুরু হয়ে হিজরি প্রথম শতকের শেষ সময় পর্যন্ত অথবা হিজরি দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে শরিয়তের হুকুম-আহকাম সুবিন্যস্ত করার তথা ফিকহ শাস্ত্র সংকলন করার প্রয়োজনীয়তা চরমভাবে দেখা দেয়। এর কারণ বহুবিদ। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো —

১. এ সময় যে সকল সাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন তাদের অনেকেই ইসলামি খিলাফতের বিশাল সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েন। অপর দিকে এককভাবে কোনো সাহাবীর পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল হাদীস জানা সম্ভব ছিল না। তাই নব উদ্ভূত সমস্যার সমাধান তাঁরা নিজ নিজ রায় মুতাবিক দিতে বাধ্য হলেন। এভাবে সঙ্গত কারণেই বিভিন্ন অঞ্চলে সাহাবায়ে কেরামের রায়ও বিভিন্ন হতে থাকল।

২. রাজনৈতি কারণে এ সময়ে যে সব চরমপন্থী ও বিপথগামী যথা শিয়া, খারেজী ইত্যাদি ফিরকার উদ্ভব ঘটে, তারা নিজ নিজ আকীদা অনুযায়ী সমস্যার সমাধান দিতে থাকার কারণেও মাসআলা মাসাইলের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা দেয়।

৩. অনারব লোকদের বিপুল পরিমাণে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া এবং তাদেরও লেখা-পড়া ফতোয়া ফারায়িযের কাজে অংশ গ্রহণ করা। এ কারণেও ফতোয়ার মধ্যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

৪. এ সময়ে ইসলাম বিদ্বেষী এবং স্বার্থান্বেষী লোকদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে রচিত জাল হাদীসও মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে। এ সব বানোয়াট এবং জাল হাদীসের কারণেও মাসআলা মাসাইলের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। হাদীস বিশারদদের মতে নিম্নোক্ত কারণে জাল হাদীস রচনা করা হয়।— [তারীখে ফিকহে ইসলাম]

(ক) اَلْخِلَافَاتُ السِّيَاسِيَّةُ (রাজনৈতিক মতানৈক্য) অর্থাৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের ভ্রান্ত মতের প্রতিষ্ঠা প্রাধান্য এবং নিজেদের আচরিত মতাদর্শকে সপ্রমাণিত এবং জনগণের নিকট তা গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য জাল হাদীস রচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে রাফিযী সম্প্রদায়ের লোকেরা সবচেয়ে অগ্রগামী। ইমাম মালিক (র.)-কে রাফিযীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এর জবাবে বলেছেন– لَا تُكَلِّمْهُمْ وَلَا تَرْوِ عَنْهُمْ فَاِنَّهُمْ يَكْذِبُوْنَ তোমরা তাদের সাথে কথা বলবে না এবং তাদের লোকে কোনো হাদীসও বর্ণনা করবে না। কেননা ওরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে।

১. উল্লেখ্য যে, শিয়া সম্প্রদায়েরই একটি দলকে রাফিযী বলা হয়। এই দলটি হযরত আলী (রা.)-কে মানে কিন্তু প্রথম তিন খলীফাকে মন্দ বলে; বরং তারা নয়; সাত বা পাঁচজন সাহাবী ছাড়া অন্য সকল সাহাবীকে কাফির মনে করে। তাদের সম্পর্কে আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র.) বলেন,

هٰؤُلَاءِ قَدْ قَصَّرُوا الْاِسْلَامَ عَلٰى تِسْعَةٍ مِنْهُمْ اَوْ سَبْعَةٍ اَوْ خَمْسَةٍ عَلٰى اِخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِى الْعَدَدِ وَكَذَا لَهُمْ فِى التَّنْزِيْلِ الْعَزِيْزِ اَقْوَالٌ قِيْلَ زَادَ فِيْهِ عُثْمَانُ وَكَذَا نَقَصَ عَنْهُ وَقِيْلَ نَقَصَ وَلَمْ يَزِدْ وَقِيْلَ هُوَ مَحْفُوْظٌ عَنْهُمَا وَهٰؤُلَاءِ لَايَعْتَرِفُوْنَ بِصِحَّةِ اَحَادِيْثِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَكُتُبِهِمْ.

অতঃপর আল্লামা কাশ্মীরী (র.) বলেন,

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِىْ تَكْفِيْرِ الرَّافِضَةِ وَلِلْحَنَفِيَّةِ فِيْهِ قَوْلَانِ وَالْاَصَحُّ تَكْفِيْرُهُمْ وَفِىْ اِكْفَارِ الْمُلْحِدِيْنَ وَالْاَكْثَرُ عَلٰى تَكْفِيْرِ مُنْكِرِ خِلَافَةِ الشَّيْخَيْنِ. — [মা'আরিফুস সুনান ১ম খণ্ড; পৃ : ১৮৮]

বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শিয়া, রাফিযী সম্প্রদায়ের লোকেরাই সর্ব প্রথম জাল হাদীস রচনা করে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, রাফিযী সম্প্রদায়ের লোকদের আকীদা এবং দাবি হলো, "নবী কারীম ﷺ বিদায় হজ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় সাহাবায়ে কেরামকে "গাদীরে আম" নামক স্থানে একত্রিত করেন এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তাতে তিনি হযরত আলী (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, هٰذَا وَصِيِّىْ وَاَخِىْ وَالْخَلِيْفَةُ مِنْ بَعْدِىْ فَاسْمَعُوْا لَهٗ وَاَطِيْعُوْهُ এ-ই (আলী) আমার অসী, আমার ভাই এবং আমার পরবর্তী খলীফা, সুতরাং তোমরা সকলে তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। হাদীস নামে প্রচারিত এ বাক্যটি আদৌ হাদীস

নয়; বরং এটি নিছক রাজনীতি ও দলীয় স্বার্থ হাসিলের জন্যই মূলতঃ রচিত। হযরত আলী (রা.)-ই নবী কারীম ﷺ -এর পরবর্তী বৈধ খলীফা, এ কথা প্রমাণ করার জন্য শিয়ারা যে কত শত হাদীস জাল করেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই কিন্তু তাদের রচিত ও প্রচারিত এ সবগুলোই মিথ্যা এবং বানোয়াট।

— [আস্ সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত্ তাশরী'ইল ইসলামী; পৃ : ৮০]

(খ) اَلزَّنَادِقَةُ যিন্দীক লোকেরা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য জাল হাদীস রচনা করে। তারা কখনো শিয়া মতবাদের আবরণে, কখনো সূফী বাদের আবরণে, আবার কখনো দর্শনের আবরণে আত্ম প্রকাশ করেছে। তাদের রচিত হাদীস যে সর্বৈব মিথ্যা এবং বানোয়াট তা তাদের হাদীস নামে প্রচারিত বাক্য থেকেই প্রতীয়মান হয়। যেমন কথিত আছে যে, يَنْزِلُ رَبُّنَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَلٰى جَمَلٍ أَوْرَقَ يُصَافِحُ الرُّكْبَانَ وَيُعَانِقُ الْمُشَاةَ আরাফার দিন বিকালে আমাদের প্রতিপালক আসমান থেকে জমিতে অবতরণ করেন এবং তিনি এখানে এসে সাদা-কালো মিশ্রিত রঙ্গের একটি উটের উপর সওয়ার হয়ে সওয়ারিতে আরোহী হাজীদের সাথে মুসাফাহা করেন এবং মু'আনাকা করেন পদব্রজে চলাচলকারী হাজীদের সাথে।

(গ) দলীয়, গোত্রীয়, বংশীয়, ভাষাগত ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক মানসিকতার ভিত্তিতেও জাল হাদীস রচনা করা হয়। এমনকি মাযহাবের বাড়াবাড়ির কারণেও জাল হাদীস রচনা করা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে এ মর্মে জাল হাদীস রচনা করা হলো, سَيَكُوْنُ رَجُلٌ فِىْ أُمَّتِىْ يُقَالُ لَهُ اَبُوْحَنِيْفَةَ هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِىْ অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে আবূ হানীফা নামে এক ব্যক্তির জন্ম হবে এবং সে হবে আমার উম্মতের মুকুট। এভাবে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মর্যাদা হ্রাস করতে গিয়ে হাদীস জাল করা হয়। যেমন মাউযূআত গ্রন্থে উল্লেখ আছে- سَيَكُوْنُ فِىْ أُمَّتِىْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ هُوَ اَضَرُّ عَلٰى أُمَّتِىْ مِنْ اِبْلِيْسَ অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস নামে এক ব্যক্তির জন্ম হবে; সে আমার উম্মতের জন্য ইবলীসের থেকেও অধিক ক্ষতিকর। এগুলো সবই হচ্ছে মিথ্যা, বানোয়াট ও কল্পিত।

(ঘ) জনগণের মধ্যে ইসলামের প্রচার, ওয়াজ-নসিহত দ্বারা জনগণকে ধর্মপ্রাণ বানানো, ইবাদত বন্দেগীতে অধিকতর উৎসাহী বানানো এবং পরকালের ভয়ে অধিক ভীত করে তোলার জন্যও জাল হাদীস রচনা করা হয়।

(ঙ) ইসলামি দর্শন এবং ফিক্হী মতানৈক্যের কারণেও এক ফিক্হের অনুসারী লোকেরা অন্য ফিক্হের বিপক্ষে হাদীস রচনা করে। যেমন বলা হয়, مَنْ قَالَ الْقُرْاٰنُ مَخْلُوْقٌ فَقَدْ كَفَرَ যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে, কুরআন মাখলূক (সৃষ্ট) তবে সে কুফরি করল।

(চ) টাকা পয়সা উপার্জনের জন্যও কেউ কেউ সুন্দর সুন্দর ঘটনাকে হাদীস বলে চালিয়ে দিতো। যাতে লোকেরা তাদের কথায় মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে হাদিয়া তুহ্ফা প্রদান করে।

(ছ) রাজা-বাদশাহদের নৈকট্য লাভের জন্যও স্বার্থ লোভী লোকেরা মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস রচনা করে।

(জ) প্রসিদ্ধি লাভের জন্যও একদল লোক জাল হাদীস রচনায় আত্ম নিয়োগ করে।

—[আস্ সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা; পৃ : ৭৯ - ৮৮]

৫. আহলুল হাদীস এবং আহ্লুর রায়, এ দু' সম্প্রদায়ের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়া। অর্থাৎ আহ্লুল হাদীস তথা হাদীস বিশারদ আলিমগণ যদি কুরআন ও হাদীসে কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেতেন তখন তারা এ ব্যাপারে কিয়াস ও ইজতিহাদের আলোকে রায় প্রদান করা থেকে বিরত থাকতেন। অপর পক্ষে আহ্লুর রায় তথা ওলামায়ে মুজতাহিদীন যদি কুরআন ও হাদীসে কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেতেন তখন তারা কিয়াস ও ইজতিহাদের আলোকে নিজস্ব রায় অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করতেন। এতে ঐ দু' সম্প্রদায়ের মধ্যে মাসআলা মাসাইলের ক্ষেত্রে মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। উল্লিখিত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে ইসলামের হেফাজতের লক্ষ্যে শরিয়তের হুকুম-আহকামকে সুবিন্যাস্ত করা অর্থাৎ ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ প্রণয়ন ও সংকলন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ তৃতীয় যুগে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন শহরে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে ফতোয়া দানের জন্য কতিপয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত কেন্দ্রসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১) মাদীনা মুনাওয়ারা, (২) মক্কা মুকাররমা, (৩) কূফা

(ইরাক), (৪) বসরা, (৫) শাম (সিরিয়া), (৬) মিসর, (৭) ইয়ামন। এ সব কেন্দ্রসমূহে যে সকল মুফতিয়ানে কেরাম ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন। পর্যায়ক্রমে তাদের আলোচনা তুলে ধরা হলো।

মদীনা শরীফ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ হতে হযরত ওসমান গনী (রা.)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত মদীনা শরীফ ছিল মুসলিম জাহানের ফতোয়া প্রদানের বিশেষ কেন্দ্র। এ সময় খলীফাতুল মুসলিমীন ও আমীরুল মু'মিনীনগণসহ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত আয়েশা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা.), হযরত মু'আয ইব্‌নে জাবাল (রা.), হযরত যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রা.), হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.), হযরত আবুদ্‌দারদা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে 'আব্বাস (রা.), হযরত মু'আবিয়া (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম।

ডক্টর আল্লামা খালিদ মাহমূদ বলেন, কম-বেশি সমস্ত সাহাবীই ফকীহ্ ছিলেন। তবে উচ্চ মানের ফকীহ তাঁদের মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ জনের অধিক ছিল না। হাফিয ইবনে কায়্যিম (র.)-এর মতে ফতোয়া প্রদানকারী সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা একশত ত্রিশ থেকে কিছু বেশি ছিল।— [আসারুল ফিকহিল ইসলামী; ১ম খণ্ড পৃঃ ২০৩-২৪৪]

আল্লামা খিযরী বেগ (র.)-এর মতে তৎকালীন যুগে মদীনা শরীফে যে সব মনীষী ফতোয়া প্রদানের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন—

১. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কন্যা এবং নবী কারীম ﷺ-এর সর্ব কনিষ্ঠা জীবন সঙ্গিনী। হিজরতের দু'বছর পূর্বে নবী কারীম ﷺ-এর সাথে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তখন তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। অপর এক বর্ণনা মতে তখন তিনি সাত বছর বয়সে পদার্পণ করেছিলেন। নয় বছর বয়সে তাঁকে স্বামীর বাড়িতে তুলে দেওয়া হয়। নবী কারীম ﷺ-এর ইনতিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র আঠার বছর । সর্বমোট তিনি নয় বছর নবী কারীম ﷺ-এর মুবারক সুহবতের দ্বারা ধন্য হয়েছিলেন। হযরত 'আতা ইব্‌নে আবূ রাবাহ (র.) বলেন, হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা.) সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের ফকীহ্ ছিলেন এবং তাঁর রায়কে সকলের রায়ের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। হযরত উরওয়া (রা.) বলেন, হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বড় আলিম, ফকীহ এবং কবি হিসেবে আমি আর কাউকে পাইনি। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পারিবারিক জীবনসহ ফিক্‌হের সকল অধ্যায়েই তাঁর থেকে কিছু না কিছু হাদীস অবশ্যই পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম দীনি কোনো বিষয়ে সমস্যায় পড়লে এর সমাধানের লক্ষ্যে তাঁরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর স্মরণাপন্ন হতেন। বহু সাহাবী ও তাবিঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.)-এর ভাগিনা উরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং তাঁর ভাতিজা কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (র.)-ই তাঁর থেকে সব চেয়ে বেশি রিওয়ায়াত করেছেন । হিজরি ৫৭ সনে তিনি এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।— [তারীখে ফিকহে ইসলামী; পৃঃ ২১১]

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ওমর (রা.) : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) স্বীয় পিতা হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কমবয়স্ক হওয়ার কারণে বদর ও ওহুদে শরিক হতে না পারলেও পরবর্তীতে তিনি খন্দক, মূতা, ইয়ারমূক ইত্যাদি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। এমনিভাবে মিসর এবং আফ্রিকা বিজয় অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নতের অনুসরণ করে চলতেন। রাসূল ﷺ যে স্থানে সালাত আদায় করেছেন তিনিও সেখানে সালাত আদায় করেছেন, যেখানে তিনি অবতরণ করেছেন তিনিও সেখানে অবতরণ করেছেন। এমনকি যে স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্‌তিনজা করেছেন প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও সেখানে তিনি কিছুক্ষণ বসে থেকে পরে উঠে চলে এসেছেন। পরে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণের নিমিত্তেই আমি এরূপ করেছি। তিনি একজন উঁচু পর্যায়ের ইমাম এবং মুফতি ছিলেন। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ফতোয়া প্রদান করতেন। কতিপয় সাহাবী তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর তাবিঈদের অনেকেই তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর সাহেবজাদা সালিম এবং আজাদকৃত গোলাম নাফি'ই (র.) তাঁর থেকে অধিক পরিমাণে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি ৭৩ হিজরি

সনে ইনতিকাল করেছেন।

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নাম আব্দুর রহমান এবং তাঁর পিতার নাম ছিল সাখর। তিনি ছিলেন দাওস বংশীয় মানুষ। তিনি খায়বার বিজয়ের পর সপ্তম হিজরি সনে মদীনায় এসে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন থেকে নিয়ে নবী কারীম ﷺ-এর ওফাত পর্যন্ত তিনি ছায়ার মতোই নবী কারীম ﷺ-কে অনুসরণ করে চলেন। এ কারণেই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করার সৌভাগ্য তাঁর অর্জিত হয়। তার থেকে অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর জামাতা হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব এবং তাঁর আজাদকৃত গোলাম হযরত আরাজ (র.)-ই তাঁর থেকে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন উচ্চপর্যায়ের ফকীহ্ ও আবিদ ছিলেন। এমনিভাবে তিনি ছিলেন বিনয়ের এক মূর্ত প্রতীক। তিনি ৫৭ হিজরি সনে এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। উপরোক্ত এ মহান তিন ব্যক্তিত্বই তৎকালীন যুগে মদীনা শরীফে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হাদীস ও ফতোয়া বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন। মদীনাবাসীদের ইল্‌ম তাদের ওপরই নির্ভরশীল ছিল এবং বড় বড় তাবিঈনে কেরাম তাদের থেকে দীনের তা'লীম হাসিল করেছেন।

মদীনা শরীফে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাবেঈগণের মধ্যে যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তাদের অন্যতম হলেন :

৪. হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.) : হযরত ওমর (রা.)-এর দু'বছর পর জন্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি বড় বড় সাহাবী থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী একজন উচ্চমানের ফকীহ্ তাবিঈ ছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বড় বড় মুফতিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত কাতাদা এবং আলী ইবনে মাদীনী (র.) বলেন, তাবিঈগণের মধ্যে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের তুলনায় অধিক বড় আলিম এবং ফকীহ্ আমি আর কাউকে পাইনি। তিনি রাজা-বাদশাহদের দেওয়া হাদিয়া কখনো গ্রহণ করতেন না। দীনি বিষয়ে হযরত হাসান বসরী (র.) কোনো সমস্যায় পড়লে পত্রের মাধ্যমে তিনি হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের নিকট তার সমাধান তলব করতেন। এক বর্ণনা মতে ৯৪ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৫. হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের আসাদী (র.) : উরওয়া ইবনে যুবায়ের (র.) হযরত উসমান গনী (রা.)-এর খিলাফত কালে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি বহু সাহাবী থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং নিজ খালা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে ফিক্‌হের ইলম হাসিল করেছেন। বস্তুত: তিনি হাদীসের হাফিজ হওয়ার পাশাপাশি একজন ঐতিহাসিকও ছিলেন। হিশাম এবং তাঁর অপরাপর সন্তানগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে ইমাম যুহরী এবং আবুয্ যিনাদ (র.) সহ মদীনার অপরাপর আলিমগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, আমি তাঁকে জ্ঞানের এমন সাগর হিসেবে পেয়েছি যার জ্ঞান-পানি কখনো শুকায়নি। তিনিও হিজরি ৯৪ সনে ইনতিকাল করেছেন।

৬. আবূ বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হারিস ইব্‌নে হিশাম মাখযূমী (র.) : হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তাঁর জন্ম। তিনি নিজ পিতা এবং অপরাপর সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ইমাম যুহরী ও সেগারে তাবিঈনের অনেকে। তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, আল্লাহভীরু, দানশীল এবং উচ্চ পর্যায়ের একজন ফকীহ্ ছিলেন। তাঁকে "রাহিবে কুরায়শ" বলা হতো। তিনি ৯৪ হিজরি সনে ইনতিকাল করেছেন।

৭. হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আবী তালিব হাশিমী (র.) : তিনি অধিক ইবাদত গুজার ছিলেন বিধায় তাঁকে যায়নুল আবিদীন (ইবাদতকারীদের শোভা) উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

৮. হযরত উবায়দুল্লাহ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ (র.) : তিনি হযরত আয়েশা, হযরত আবূ হুরায়রা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ। তাদের থেকেই তিনি হাদীস এবং ফিক্‌হ হাসিল করেছেন। তিনি হাদীস ও ফিকহের ইমাম হওয়ার পাশাপাশি একজন কবিও ছিলেন। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, হযরত উবায়দুল্লাহ (র.) ইলমের এক সাগর ছিলেন। তিনি ৯৮ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

৯. হযরত সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (র.) : তিনি নিজ পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এবং সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রা.)-এর শাগরিদ ছিলেন। তাঁদের থেকেই তিনি হাদীসের ইল্‌ম হাসিল করেছেন। ইমাম মালিক (র.) বলেন, দুনিয়া বিমুখতা এবং তাকওয়া ও পরহেযগারীর

ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ে তাঁর সমতুল্য কেউ ছিল না। তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। ১০৬ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন। — [তারীখে ফিকহে ইসলামী; পৃঃ ১১২-১১৪]

১০. হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র.) : তিনি হযরত মায়মূনা, হযরত আয়েশা, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। হাসান ইবনে মুহাম্মদ আল হানাফিয়্যা (র.) বলেন, আমার মতে তিনি সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব (র.) থেকেও অধিক জ্ঞানী ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব (র.)-এর নিকট কেউ ফতোয়া জিজ্ঞাসা করতে আসলে তিনি বলতেন, সুলায়মান ইবনে ইয়াসারের কাছে যাও। তিনি ১০৭ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

১১. হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর (র.) : তিনি স্বীয় ফুফু হযরত আয়েশা, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে ওমর (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। মূলত তাঁর তারবিয়াত করেছেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)। হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবন সাঈদ (র.) বলেন, আমি মদীনার মধ্যে এমন কোনো লোক পাইনি যাকে হযরত কাসিম (র.) -এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া যায়। আবুয্ যিনাদ (র.) বলেন, তৎকালীন জমানায় কাসিম (র.)-এর তুলনায় বড় ফকীহ্ এবং হাদীস বিশারদ আমি আর কাউকে দেখিনি। ইবনে উয়ায়না (র.) বলেন, কাসিম (র.) সে যুগের সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন। ইবনে সাঈদ (র.) বলেন, কাসিম (র.) একজন উঁচু মানের ফকীহ এবং যাহিদ লোক ছিলেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) বলেন, আমার শক্তি থাকলে আমি কাসিম (র.)-কে মুসলিম জাহানের খলীফা নিযুক্ত করতাম। তিনি ১০৬ হিজরি সনে ইনতিকাল করেছেন।

১৩. মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে যুহরী (র.) **:** পঞ্চাশ হিজরি সনে তাঁর জন্ম। তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি খুবই উদার এবং অমায়িক মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্য প্রকাশে অকুতোভয়। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আনাস ইবনে মালিক এবং সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয, ইমাম মালিক, লায়স ইব্‌নে সাআদ এবং হযরত রবীআ (র.) প্রমুখ মনীষী উচ্চ প্রশংসা করেছেন। ১২৪ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

১৫. আবুয যিনাদ আব্দুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান (র.) : তিনি হাসান ইবনে মালিক এবং বহু তাবিঈনে কেরামের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ এবং নেতৃস্থানীয় ফকীহ ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, আমার মতে রবীআ (র.)-এর তুলনায় আবুয যিনাদ (র.) বড় ধরনের ফকীহ্ ছিলেন। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) আবুয্ যিনাদ (র.)-কে আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস বলতেন। ১৪৩ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

১৬. হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবন সাঈদ আনসারী (র.) : তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) সহ বহু তাবিঈনে কেরামের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান (র.) বলেন, আমার মতে তিনি ইমাম যুহরী (র.) থেকেও উত্তম ছিলেন। তিনিও ১৪৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

১৭. হযরত রবী'আ ইবনে আবূ আব্দুর রহমান (র.) : তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) সহ বহু তাবিঈনে কেরাম থেকে হাদীসের ইলম হাসিল করেছেন। তিনি হাফিযুল হাদীস হওয়ার পাশাপাশি ফকীহ এবং মুজতাহিদও ছিলেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ এবং কাযী সিওয়ার ইবনে আব্দুল্লাহ এবং ইবনে সীরীন (র.) তাঁর প্রজ্ঞা, ইলম এবং দানশীলতার প্রশংসা করেছেন। তিনি ১৩৬ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

—[তারীখে ফিকহে ইসলামী; পৃঃ ১১৫-১১৭]

মক্কা মুকাররমা

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু দিনের জন্য হযরত মু'আয (রা.)-কে সেখানকার মু'আল্লিম ও মুফতি নিয়োগ করেছিলেন। এ ছাড়াও মক্কা মুকাররমায় আরো পাঁচ মুফতি ফতোয়া প্রদানের কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের মধ্যে একজন সাহাবী আর বাকি চারজন হচ্ছেন তাবিঈ।

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) : তিনি হিজরতের দু' বছর আগে জন্ম গ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য দু'আ করেছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রঈসুল মুফাস্‌সিরীন বানিয়ে দিয়েছেন। হযরত

'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) একজন শ্রেষ্ঠতম মুফাস্সির ছিলেন। তিনি যদিও আমার মতো বয়সী ছিলেন তবে তাঁর সমতুল্য কেউ ছিল না। মা'মার (র.) বলেন ইবনে আব্বাস, হযরত ওমর, হযরত আলী এবং হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে ইলম হাসিল করেছেন। তাফসীর এবং ফিক্হের ক্ষেত্রে মক্কাবাসী লোকদের ইলমের মাদার হলেন হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.)। তিনি ৬৮ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

২. মুজাহিদ ইবনে জুবায়ের (র.) : হযরত মুজাহিদ (র.) ছিলেন একজন বিখ্যাত তাফসীরবিদ। তিনি হযরত সা'দ, হযরত আয়েশা, হযরত আবূ হুরায়রা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীসের ইল্ম হাসিল করেছেন। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সুহবতে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ছিলেন এবং তাঁর নিকট থেকে কুরআন মাজীদের ইল্ম হাসিল করেছেন। তিনি নিজেই বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট তিনবার কুরআন মাজীদ খতম করেছি। প্রতিটি আয়াতের তিলাওয়াত শেষে আমি তাঁকে এর মর্ম, এর শানে নুযূল এবং এ আয়াতটি কোন বিষয়ে নাজিল হয়েছে তা জিজ্ঞাসা করতাম। হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, তাফসীর বিষয়ে তিনি সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন। মুজাহিদ (র.) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা.) অনেক সময় আমার সওয়ারির রিকাব টেনে ধরে আমাকে তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি ১০৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

—[তারীখে ফিক্হে ইসলামী; পৃঃ ২১৮]

৩. হযরত ইকরামা (র.) : তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আজাদকৃত গোলাম এবং শাগরিদ ছিলেন। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ছাড়া হযরত আয়েশা এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নিকট থেকে ইলম হাসিল করেছেন। বিশেষভাবে তিনি ফিক্হ হাসিল করেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট থেকে। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার থেকেও বড় আলিম হিসেবে আপনি কাউকে জানেন কি ? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ। আমার থেকেও বড় আলিম আছেন এবং তিনি হলেন, হযরত ইকরামা (র.) । তিনি ১০৭ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

৪. হযরত আতা ইবনে আবূ রাবাহ (র.) : হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আয়েশা, হযরত আবূ হুরায়রা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর মাথার চুল ছিল কিছুটা কোঁকড়ানো। তিনি অত্যন্ত বাগ্মী এবং পণ্ডিত লোক ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, আমি আতা (র.) থেকে উত্তম কোনো মানুষ আর দেখিনি। তিনি সাধারণত নীরব থাকতেন। যখন কথা বলতেন তখন মনে হতো যেন তাঁকে গায়বীভাবে আল্লাহর তরফ থেকে সাহায্য করা হচ্ছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, হে মক্কাবাসী লোকেরা! তোমরা আমার কাছে আসছ অথচ তোমাদের মধ্যে আতার মতো ব্যক্তিত্বও বিদ্যমান আছে। তিনি ১১৪ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন ।

৫. আবূয যুবায়ের মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম (র.) : তিনি হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর এবং সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি একজন ধীমান ও বিদগ্ধ আলিম ছিলেন। হযরত আতা (র.) বলেন, আমরা হযরত জাবির (রা.)-এর নিকট যাতায়াত করতাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন। আমরা এ সম্পর্কে মুযাকারা করতাম। হাদীস হিফজ করার ক্ষেত্রে আবূয যুবায়েরই আমাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। ১২৭ হিজরি সনে তিনি এ নশ্বর পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।— [তারীখে ফিকহে ইসলামী]

কূফা (ইরাক)

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশে ইরাক এলাকায় কূফা ও বসরা নামে দু'টি নতুন শহরের গোড়া পত্তন হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরামের এক জামা'আত এই নতুন শহরে বসবাস আরম্ভ করলে খলীফা হযরত ওমর (রা.) ফকীহুল উম্মত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে কূফার মু'আল্লিম, মুফতি এবং প্রশাসক নিয়োগ করেন। সেখানে তাঁর দশ বছর অবস্থানকালে স্থানীয় জ্ঞান পিপাসু সবাই তাঁর সান্নিধ্যে এসে জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের মহাসুযোগ লাভ করেন। চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) -এর শাসন আমলে ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল কূফা।

হযরত আলী (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকে ফকীহ সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এই দুই বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের শিক্ষা ধারার মাধ্যমে এখানে ইলমে দীনের চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ফলে কূফা ইল্‌ম নগরীর রূপ পরিগ্রহ করে। এরই ফলশ্রুতিতে এখানকার বহু মুজতাহিদ এবং তাবিঈনে কেরাম বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী অবদান রেখে খ্যাতির শীর্ষ চূড়ায় অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হোন। নিম্নে তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো :

১. হযরত আলকামা ইবনে কায়স নাখঈ (র.) : তিনি নবী কারীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত ওমর, ওসমান ইবনে মাসউদ ও আলী (রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি ফিক্‌হের ইলম হাসিল করেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট থেকে। আচার আচরণে তিনি তাঁর প্রতিচ্ছবি ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি যা জানি এবং আমি যা পড়ি তা আলকামাও জানে এবং সেও তা পড়ে। ইমাম যুহরী (র.)-এর মতে তিনি একজন উচ্চস্তরের ফকীহ এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি সুমধুর কণ্ঠে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। তিনি পরকালমুখী এবং দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত ছিলেন। তিনি ৬২ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

২. হযরত মাসরূক ইবনে আজদা হামদানী (র.) : তিনি একজন শ্রেষ্ঠ আলিম ও ফকীহ ছিলেন। তিনি ছিলেন আম্‌র ইবনে মা'দীকারাব (র.)-এর ভাতিজা। হযরত ওমর, আলী এবং ইবনে মাসউদ (রা.)-এর থেকে তিনি ইল্‌ম হাসিল করেছেন। প্রখ্যাত বিচারক কাজি শুরায়হ (র.) তাঁর সাথে পরামর্শ করে ফতোয়া দিতেন এবং তিনি তাঁর তুলনায়ও অধিক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ৬৩ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

৩. হযরত উবায়দা ইবনে আমর সালমানী (র.) : তিনি ইয়ামন বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত আলী ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট থেকে তিনি ইল্‌ম হাসিল করেছেন। হযরত শা'বী (র.)-এর মতে বিচার বিষয়ে তিনি কাজি শুরায়হ (র.) -এর সমকক্ষ ছিলেন। ৯২ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৪. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ নাখঈ (র.) : তিনি হযরত আলকামা (র.)-এর ভাতিজা এবং কূফার বিশিষ্ট আলিম ছিলেন। তিনি হযরত মু'আয্ এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। ৯৫ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৫. হযরত শুরায়হ ইবনে হারিস কিনদী (র.) : নবী যুগে তাঁর জন্ম। তিনি হযরত ওমর, আলী এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। দ্বিতীয় খলীফার যুগে তিনি কূফার কাজি পদে নিযুক্ত হোন। অব্যাহতভাবে ষাট বছর পর্যন্ত তিনি কাজির পদে বহাল থেকে এ গুরু দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। ইনতিকালের এক বছর আগে এ পদ থেকে ইস্তিফা দেন। অবশেষে ৭৮ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৬. হযরত ইব্‌রাহীম ইবনে ইয়াযীদ নাখঈ (র.) : তিনি ছিলেন ইরাকের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি আলকামা, মাসরূক, আসওয়াদ (র.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। ফকীহ হাম্মাদ ইবনে আবূ সালামার তিনি উস্তাদ ছিলেন। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) বলতেন, ইব্‌রাহীম নাখঈ (র.) বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তোমরা আমার নিকট ফতোয়ার জন্য আসছ! আমি তো তাকে জিজ্ঞাসা না করে কোনো ইল্‌মী কথাই বলি না। তিনি ৯৫ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

৭. হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) : তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর শাগরেদ ছিলেন। হজের সময় লোকেরা হযরত ইবনে আববাস (রা.)-কে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে কি সাঈদ ইবনে জুবায়ের নেই? তিনি তাঁর সামনে কাউকে অন্যের গিবত করতে দিতেন না। ৯৮ হিজরি সনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তাঁকে শহীদ করে দেয়।

৮. হযরত আম্‌র ইবনে শুরাহ্‌বীল শা'বী (র.) : তাবিঈগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ফকীহ ব্যক্তি ছিলেন। হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফত কালে তাঁর জন্ম। তিনি হযরত আলী, আবূ হুরায়রা, আয়েশা সিদ্দীকা এবং ইবনে

'ওমর (রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সম্মানিত উস্‌তাদ ছিলেন এবং তিনি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত কূফার কাজি (বিচারক) ছিলেন। মাকহুল এবং আবূ হুসায়ন (র.) বলেন, শা'বী (র.)-এর তুলনায় বড় আলিম এবং ফকীহ্ আমি আর কাউকে দেখিনি। ইবনে আবূ লায়লা (র.) বলেন, শা'বী (র.) সর্বদা হাদীসের অনুসরণ করে চলতেন এবং তিনি একজন খোশমিযাজ মানুষ ছিলেন। ১০৪ হিজরি সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

বস্‌রা

বসরায় অবস্থানকারী যে সব সাহাবী ও তাবিঈ ফতোয়ার কাজে বিশেষ অবদান রাখেন তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত মনিষীবৃন্দ হলেন অন্যতম।

১. হযরত আনাস ইবনে মালিক আনসারী (রা.) : হযরত আনাস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদিম ছিলেন। তিনি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুহবতে থেকে তার থেকে বহু হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি হযরত আবূ বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা.)-এর থেকে ইল্‌ম হাসিল করেছেন। তিনি দীর্ঘ হায়াত লাভ করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) আশিটি হাদীস এবং ইমাম মুসলিম সত্তর খানা হাদীস তাঁর সূত্রে নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আর সম্মিলিতভাবে তাঁরা উভয়েই তার থেকে একশত আটাশ খানা হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। ৯৩ হিজরি সনে তিনি এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

২. হযরত আবুল আলিয়া রফী ইবনে মিহ্‌রান (র.) : তিনি ছিলেন হযরত ওমর ইবনে মাসউদ এবং আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -এর বিশিষ্ট শাগরিদ। তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আমাকে উঁচু স্থানে বসাতেন। আর কুরায়শ লোকেরা বসাতেন এর থেকে কিছুটা তুলনামূলক নিচু স্থানে। ৯০ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৩. হযরত হাসান ইবনে আবুল হাসান সায়্যার (র.) : মদীনা শরীফে তিনি লালিত পালিত হয়েছেন। তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান গনী (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি পূর্ণ কুরআন মাজীদ হিফয সমাপ্ত করে নেন। অতঃপর জিহাদ এবং ইলম ও আমলের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি একজন বড় ধরনের মুজাহিদ ছিলেন। বহু সাহাবী থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন। ইবনে সাঈদ (র.) বলেন, তিনি একজন উচ্চস্তরের আবিদ আলিম এবং বাগ্মী ব্যক্তি ছিলেন। বাতিলের বিরুদ্ধে এবং হকের পক্ষে তিনি ছিলেন চির সোচ্চার। তিনি অত্যন্ত সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন। তিনি হক কথা বলতে কারোই তোয়াক্কা করতেন না। ১১০ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৪. হযরত আবুশ শা'সা জাবির ইবনে যায়েদ (র.) : তিনি বসরার বিশিষ্ট ফকীহ এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বিশেষ শাগরিদ ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তোমাদের মাঝে জাবির ইবনে যায়েদ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তোমরা কেন আমার নিকট ফতোয়া জিজ্ঞাসা করো? আম্‌র ইবনে দীনার (র.) বলেন, ফতোয়ার বিষয়ে জাবির ইবনে যায়েদের তুলনায় অধিক জ্ঞানী আমি আর কাউকে দেখিনি। তিনি ৯৩ হিজরি সনে এই নশ্বর পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

৫. মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.) : তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা.)-এর খিলাফত কালের দুই বছর বাকি থাকতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর এবং আনাস (রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি একজন বিজ্ঞ ফকীহ এবং ইমাম ছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন জগদ্বিখ্যাত। পরহেযগারীর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বেনজীর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সমকালীন অনেকেই তাঁর ফিক্‌হ এবং পারহেযগারীর বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হযরত হাসান বসরী (র.)-এর ইন্‌তিকালের একশত দিন পর ১১০ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৬. হযরত কাতাদা ইবনে দা'আমা দূসী (র.) : তিনি হযরত আনাস (রা.) এবং সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। তিনি একজন অন্ধ মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর মেধা ছিল খুবই প্রখর। তাফসীর বিষয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, তাফসীরের ক্ষেত্রে কাতাদার তুলনায় অধিক প্রজ্ঞাবান আমি আর কাউকে পাইনি। ফিক্‌হ ও মেধার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিশেষ খ্যাতির অধিকারী। আরবি ভাষা তত্ত্ব এবং মানুষের বংশধারা সম্পর্কে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ১১৮ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন। —[তারীখে ফিকহে ইসলামী ; পৃঃ ২২০]

শাম (সিরিয়া)

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে হযরত মু'আয, উবাদাহ ইবনে সামিত এবং হযরত আবুদ্ দারদা (রা.)-কে সিরিয়ার মু'আল্লিম ও মুফতি হিসেবে নিয়োগ দান করেছিলেন। পরবর্তীতে যে সকল তাবিঈ এ দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন–

১. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে গানাম আশ'আরী (র.) : তিনি ছিলেন হযরত ওমর এবং হযরত মু'আয (রা.)-এর শাগরিদ। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) তাঁকে সিরিয়া পাঠিয়েছিলেন সেখানকার লোকদেরকে ফিক্‌হের তা'লীম দেওয়ার জন্য। তাঁর থেকে সিরিয়াবাসীর তাবিঈনে কেরাম ফিক্‌হ হাসিল করেছেন। ৭৮ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

২. হযরত আবূ ইদরীস খাওলানী (র.) : তিনি হযরত মু'আয ইবনে জাবাল এবং আরো অনেক সাহাবী থেকে ইল্‌ম হাসিল করেছেন। তিনি একজন সু-বক্তা এবং সিরিয়ার বিচারকও ছিলেন। ৮০ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৩. হযরত কবীসা ইবনে যুওয়াইব (র.) : তিনি হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.) থেকে ইলম হাসিল করেছেন। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, কবীসা (র.) এ উম্মতের উল্লেখযোগ্য আলিমদের অন্যতম ছিলেন। শা'বী (র.) বলেন, কবীসা (র.) যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর বিচার সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত সমূহের সর্বাধিক সংরক্ষক ছিলেন।

৪. হযরত মাকহুল ইবনে আবূ মুসলিম (র.) : মূলত তিনি ছিলেন কাবুলের বাসিন্দা। তিনি সিরিয়ার একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, তিনি এ উম্মতের তিনজন আলিমের অন্যতম ছিলেন। আবূ হাতিম (র.) বলেন, সিরিয়াতে মাকহুলের তুলনায় বড় ফকীহ তৎকালে আর কেউ ছিল না। ১১৩ হিজরি সনে তাঁর ইনতিকাল হয়।

৫. হযরত রাজা ইবনে হায়ওয়া (র.) : তিনি হযরত মু'আবিয়া, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর এবং হযরত জাবির (রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি সিরিয়ার শায়খ এবং হুকূমতের রুকনে আযীম অর্থাৎ অন্যতম স্তম্ভতুল্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হযরত মাতার (র.) বলেন, রাজার তুলনায় বড় ফকীহ সিরিয়াতে আমি আর কাউকে দেখিনি। মাকহুল (র.) বলেন, রাজা সিরিয়াবাসীদের নেতা ছিলেন। তিনি ১১২ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

৬. হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) : তিনি ছিলেন বনী উমায়্যার অষ্টম খলীফা। মদীনা মুনাওওয়ারায় তাঁর জন্ম তবে তিনি মিসরে লালিত পালিত হয়েছেন। আনাস ইবনে মালিক এবং বহু তাবিঈর নিকট থেকে তিনি ইল্‌ম হাসিল করেছেন। তিনি একজন উচ্চমানের ইমাম ও ফকীহ ছিলেন। তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত ইবাদত গুজার, দীনি ব্যাপারে খুবই নির্ভরযোগ্য এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। ন্যায়পরায়ণতায় তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর, তাকওয়া ও পরহেযগারীর ক্ষেত্রে তিনি হাসান বসরীর এবং ইল্‌মর ক্ষেত্রে তিনি ইমাম যুহরী (র.)-এর অনুরূপ ছিলেন। এ কারণেই তাঁকে "ওমরে ছানী" বলা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম হাদীস সংকলনের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১০১ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।—[তারীখে ফিক্‌হ ইসলামী]

মিসর

মিসরে আগত সাহাবীগণের মধ্যে প্রধান ফকীহ ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইব্‌নুল আস (রা.)। আর তাবিঈদের মধ্যে দু' জন সেখানে ফকীহ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো,

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইব্‌নুল আস (রা.) : সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তিনি একজন উচ্চস্তরের আবিদ এবং কুরআন তিলাওয়াতকারী সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং এগুলোর এক এক বিষয়ের ওপর একটি করে তিনি সহীফাও (সংকলন) বের করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি আমার থেকেও হাদীস সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। কারণ তিনি হাদীস

লিখতেন; কিন্তু আমি লিখতাম না। মিসরবাসী লোকেরা তাঁর থেকে বহু ইল্‌ম হাসিল করেছেন। তিনি ৬৫ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

২. হযরত আবুল খায়র মুরশিদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) : তিনি হযরত আবূ আইয়্যুব আনসারী, আবূ বসরা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইব্‌নুল আস (রা.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। তিনি মিসরের খ্যাতিমান মুফতিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ৯০ হিজরি সনে তিনি এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

৩. হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবূ হাবীব (র.) : তিনি মিসরের একজন শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) তাঁকে মিসরের প্রধান মুফতি নিয়োগ করেছিলেন। তিনি একজন ধীমান, সহনশীল তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ফকীহ ছিলেন। হযরত লায়স ইবনে সা'দ (র.) বলেন, ইয়াযীদ আমাদের আলিম এবং আমাদের নেতা ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই মিসরে ইল্‌মের চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনিই সর্বপ্রথম মিসরে হালাল হারাম সম্পর্কিত বিষয়ের চর্চা আরম্ভ করেন। তিনি সত্যকথা বলতে কারো তোয়াক্কা করতেন না। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে মিসরের গভর্নর তাঁকে দেখার জন্য আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, মশার রক্ত লাগা কাপড়ে নামাজ পড়া সম্পর্কে আপনার ফতোয়া কি ? জবাবে তিনি বললেন, প্রত্যহ হাজার মানুষকে খুন করে এখন আমাকে মশার রক্ত সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করছ ? ১২৮ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

ইয়ামান

রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু দিনের জন্য ইয়ামনে হযরত আলী (রা.) কে প্রশাসক হিসেবে পাঠিয়ে ছিলেন। এরপর সেখানে আবূ মূসা আশআরী (রা.) কে আমীর ও মু'আল্লিমরূপে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে তাবিঈগণের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনজন সেখানে ফকীহ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

১. হযরত তাউস ইবনে কায়সান (র.) : তিনি ইয়ামনের বিখ্যাত মুফতি ছিলেন। তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত আয়েশা সিদ্দীকা এবং আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। আমর ইবনে দীনার (র.) বলেন, আমি তাউসের মতো বড় আলিম আর কাউকে দেখিনি। তিনি ইয়ামনবাসীদের শায়খ ও ফকীহ ছিলেন। তিনি বহুবার হজব্রত পালন করেছেন এবং হজের সফরেই ১০৬ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

২. হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) : তিনি ইয়ামানের বিখ্যাত আলিম ও বিচারক ছিলেন। তিনি হযরত ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস এবং জাবির (রা.)-এর শিষ্য ছিলেন। ১১৪ হিজরি সনে তিনি ইহলীলা সাঙ্গ করে পরপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

৩. হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু কাসীর (র.) : তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ কাতাদা (রা.) এবং তাবিঈনে কেরাম থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। শু'বা (র.) বলেন, হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি ইমাম যুহরী (র.) থেকেও অগ্রগামী ছিলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, যদি কোনো হাদীসের ক্ষেত্রে যুহরী (র.)-এর সাথে তাঁর মতবিরোধ হয় তবে ইয়াহ্‌ইয়া (র.)-এর কথাই অধিক গ্রহণযোগ্য হবে। ১২৯ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

উল্লেখ্য যে, উপরে যে সব সাহাবী ও তাবিঈনে কিরামের আলোচনা করা হয়েছে তাঁরা তাদের নিজ নিজ যুগে একদিকে যেমন ফতোয়া প্রদানের কাজ করতেন, অপরদিকে তাঁরা হাদীসও রিওয়ায়াত করতেন। আবার যারা ফতোয়া জিজ্ঞাসা করতেন তারাও কোনো নির্দিষ্ট ফিক্‌হের অনুসরণ করতেন না এবং তখন তাকলীদে সাখ্‌সীর ওপর আমল করার নিয়ম প্রচলিত ছিল না; বরং তৎকালীন যুগে তাকলীদে মুতলাকের ওপর আমল প্রচলিত ছিল।

—[তারীখে ফিকহে ইসলামী; পৃঃ ২২৫-২২৮]

চতুর্থ যুগ : ফিক্‌হ্ সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদের যুগ এবং ইলমে ফিক্‌হ্ এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করার যুগ :

এ যুগেই ঐ সমস্ত মহান ফুকাহায়ে কেরাম এ ধরা পৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়েছেন যাঁদের অবিস্মরণীয় ও অনবদ্য কীর্তি যুগ-যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে আসছে ও থাকবে। এ যুগে তাদের সুনামধন্য শিষ্যবৃন্দও এ পৃথিবীতে এসে ফিক্‌হ জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। এ যুগ হিজরি তৃতীয় শতকের শেষ লগ্ন পর্যন্ত অথবা চতুর্থ শতাব্দীর অর্ধকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

স্মর্তব্য যে, এ যুগেই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) তাঁর সহযোগী-সহকর্মী ও শিষ্য শাগরিদগণের সহায়তায় ফিক্‌হের নিয়মতান্ত্রিক সংকলন শুরু করেন এবং তিনি বেঁচে থাকতেই এর সম্পাদনাও পূর্ণাঙ্গ করেন। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ইমামগণও নিয়মিতভাবে ইলমে ফিক্‌হ গ্রন্থাকারে রচনা ও প্রকাশ করেন এবং মুসলিম উম্মাহ ব্যাপকভাবে তা অনুসরণ করতে থাকে। বিচারক এবং কাজিগণ ঐ ফিক্‌হের অনুসরণে মকাদ্দমার ফয়সালা দিতে থাকেন। মুসলিম জনতা ইমামগণের তাকলীদ করতে থাকেন। আবশ্য ইজতিহাদ প্রক্রিয়াও তখন নিজ গতিতে চলতে থাকে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ ইমামগণের শিষ্যবৃন্দ তাদের নিজ নিজ উস্তাদগণের সম্পাদিত ফিক্‌হের প্রচার প্রসারে ব্রতী হোন। তাঁদের অভিমতের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁদের উদ্ভাবিত মূল নীতির আলোকে নতুন নতুন মাসআলার জবাব দিতে থাকেন। উসূলে ফিক্‌হও এ যুগে বিধিবদ্ধ হতে থাকে।

এ যুগের ফুকাহায়ে কেরাম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো :

○ **ইমাম আবূ হানীফা (র.) :** প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে তিনি ৮০ হিজরি সনে কূফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রখ্যাত ফকীহ হাম্মাদ ইব্‌নে আবূ সুলায়মান (র.)-এর নিকট ফিক্‌হ-এর ইলম হাসিল করেন এবং হাদীসের ইলম হাসিল করেন আতা ইবনে আবূ রাবাহ, নাফী (র.) সহ অসংখ্য তাবিঈনে কেরাম থেকে। বস্তুত তিনি নিজেও তাবিঈনে কেরামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উদ্ভাবনী মনন এবং অসাধারণ আইন-প্রণয়ন প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন ফিক্‌হ শাস্ত্রের সর্বাধিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাঁর পূর্ববর্তী যুগে ফিক্‌হ কোনো স্বতন্ত্র ও বিন্যস্ত শাস্ত্ররূপে ছিল না। মাসআলা বা ধর্ম বিষয়ক প্রশ্নের জবাব দান বা ফতোয়া প্রদানের কোনো সঠিক ও বিধিবদ্ধ নিয়ম তৎকালে ছিল না। সর্বোপরি তৎকালে এমন বহু মাসআলা এবং সমস্যাও দেখা দিল যার স্পষ্ট কোনো সমাধান কুরআন হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণীতে পাওয়া যেতো না। এহেন পরিস্থিতিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইসলামি ফিক্‌হ বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। সেই প্রেক্ষিতে ফিক্‌হ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একদল লোক এ মহতী কাজে ব্রতী হোন। এখান থেকেই শুরু হয় ইসলামি ফিক্‌হ্ সংকলন ও সম্পাদনার প্রক্রিয়া।

ফিক্‌হী মাসআলা সংকলন ও লিপিবদ্ধ করণে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুসৃত নীতি ছিল; তিনি প্রথমেই মাসআলার সমাধান পবিত্র কুরআনে অনুসন্ধান করতেন। কুরআন মাজীদে কোনোভাবেই এর সমাধান না পাওয়া গেলে তিনি হাদীসের মধ্যে এর সমাধান অনুসন্ধান করতেন। হাদীসের মধ্যেও এর সমাধান না পওয়া গেলে আসারে সাহাবা এবং ফতোয়ায়ে সাহাবা অনুসন্ধান করতেন। তাতেও না পাওয়া গেলে অর্থাৎ বিষয়টি ইব্‌রাহীমে নাখঈ, হাসান বসরী, ইব্‌নে সীরীন এবং সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তখন তাদের ন্যায় তিনিও ইজতিহাদ করতেন।

— [তারীখে ফিকহে ইসলামী; পৃঃ ৩০১]

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জমানায় কূফাতে আরো তিনজন বড় বড় ফকীহ ছিলেন। তাদের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. হযরত সুফইয়ান সাওরী (র.) : তিনি ইমামুল মুহাদ্দিসীন ছিলেন। তাঁর দীনদারী, পরহেযগারী এবং যুহদ ও তাকওয়ার উপর সমস্ত মানুষ একমত। তিনি ঐ সমস্ত মুজতাহিদ ইমামগণের একজন যাঁদের ওপর মানুষ তাকলীদ করেছে। সুফইয়ান ইবনে উয়ায়না (র.) বলেন, হালাল হারাম বিষয়ে সুফইয়ান সাওরী (র.) থেকে অধিক জ্ঞানী আমি আর কাউকে দেখিনি। ৯৭ হিজরি সনে তাঁর জন্ম এবং ১৬১ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

২. শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ নাখঈ (র.) : তিনি ৯৫ হিজরি সনে বুখারাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন ধীমান ও প্রাজ্ঞ ফকীহ ছিলেন। খলীফা মাহ্দীর জমানায় তাঁকে কূফার বিচারক নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারক ছিলেন। তিনি সর্বদা সঠিক ফয়সালা দিতেন এবং তিনি ছিলেন প্রত্যুৎ পন্নমতি। ১৭৭ হিজরিতে তিনি কূফায় ইনতিকাল করেন।

৩. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা (র.) : ১৭৪ হিজরি সনে তাঁর জন্ম। তিনি একজন বিদগ্ধ ফকীহ ছিলেন। খিলাফতে বনী উমাইয়ার জমানায় সর্বপ্রথম তাকে বিচারক নিয়োগ করা হয়। এরপর আব্বাসী যুগেও পুনরায় তাকে ফকীহ এবং মুফতি পদে নিয়োগ দান করা হয়। সর্বসাকুল্যে তেত্রিশ বছর পর্যন্ত তিনি বিচারকের দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে এ মহান জিম্মাদারী আদায় করেছেন। সুফইয়ান সাওরী (র.) বলেন, ইবনে আবূ লায়লা এবং শুবরুমা (র.) আমাদের ফকীহ। তিনি ১৪৮ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শিষ্যদের মধ্যে যারা তাঁর নিকট থেকে ফিক্‌হের তা'লীম হাসিল করেছেন এবং ইজতিহাদ ও মাসাইল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যারা বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

১. ইমাম আবূ ইউসুফ ইয়াকূব ইবনে ইব্রাহীম (র.) : ১১৩ হিজরি সনে তাঁর জন্ম। যৌবনে পদার্পণ করার পর তিনি হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনার কাজে পূর্ণাঙ্গভাবে আত্ম নিয়োগ করেন। তিনি হিশাম ইবনে উরওয়া, আবূ ইসহাক এবং অন্যান্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং এতে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.) বলেন, ফকীহগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) সর্বাধিক হাদীস জানতেন এবং তিনি একজন বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতকারীও ছিলেন। হাদীস অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তিনি ইবনে আবূ লায়লা (র.)-এর নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মজলিসে গিয়ে বসেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই গভীর পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা অর্জন করে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমী মদদগার অর্থাৎ শিক্ষা সহকারীরূপে পরিগণিত হন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে কিতাব রচনা করে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতামত সারা বিশ্বে প্রচার করেন। খলীফা মাহদীর খিলাফতকালে তিনি কাজির পদে অধিষ্ঠিত হন এবং খলীফা হারুনুর রশীদের রাজত্বকালে সমগ্র আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের তিনি প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৮৩ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

২. ইমাম যুফার (র.) : ইমাম যুফার ইবনে হুযায়ল কূফী (র.) ১১০ হিজরিতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে হাদীস অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শিক্ষালয়ে ভর্তি হন এবং ফিক্‌হের অনুশীলন করে শেষ পর্যন্ত কিয়াসের ইমাম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি দুনিয়ার ঝামেলা হতে মুক্ত থেকে সারা জীবন শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা দানের কাজে অতিবাহিত করেন। ১৫৮ হিজরিতে তাঁর ইনতিকাল হয়।

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী (র.) : ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে ফরকদ শায়বানী (র.) ১৩২ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য কালেই তিনি লেখা-পড়া আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি হাদীস অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ইমাম আবূ হানীফা (র.) যখন বাগদাদে খলীফা মনসূরের কারাগারে তখন তিনি তাঁর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা শুরু করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ইনতিকালের পর তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট ফিক্‌হের অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। মদীনায় গিয়ে তিনি ইমাম মালিক (র.)-এর মুআত্তা অধ্যয়ন করেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) খুব মেধাবী, প্রতীভাবান এবং বিচক্ষণ ছিলেন। মাসআলার বিশ্লেষণে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সময়েই তিনি এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, মাসআলার ব্যাপারে দলে দলে লোক তাঁর শরণাপন্ন হতো। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের শিক্ষাধারা বেশির ভাগই ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দ্বারা প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খলীফা হারুনুর রশীদের রাজত্বকালে তিনিও কাজির পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ১৮৯ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৪. ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) : ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ লুলুঈ কূফী (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা আরম্ভ করে তা সমাপ্ত করেন সাহেবাইনের নিকটে। তিনি ফিক্‌হে হানাফীর ওপর বহু কিতাব লিখেছেন। কিয়াসে তিনি খুব দক্ষ ছিলেন। তিনি কিছুকাল কাজির পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ২০৪ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

ফিক্‌হে হানাফী ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতি সম্পর্কিত হলেও বাস্তবে তা তাঁর মাধ্যমে এবং তাঁর এই চার শাগরিদের মাধ্যমেই দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করেছে। কাজেই ইমাম আবূ হানীফা এবং এই চার ইমামের রায়ের সমষ্টির নামই হলো ফিকহে হানাফী।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শিষ্যদের ঐ সমস্ত শাগরিদবৃন্দ যারা স্বীয় উস্তাদগণের নীতি ও নির্দেশনা মুতাবিক কিতাব প্রণয়ন করেছেন এবং ফিকহে হানাফীর প্রচার ও প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

১. ইব্‌রাহীম ইবনে রুস্তম মিরওয়াযী (র.) : তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট থেকে ফিক্‌হের ইল্‌ম হাসিল করেছেন এবং হাদীস শ্রবণ করেছেন ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট থেকে। তিনিই নাওয়াদিরে ইমাম মুহাম্মদ অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বিরল বর্ণনাসমূহ সংকলন করেছেন। তিনি ২১১ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

২. আহ্‌মদ ইবনে হাফ্‌স (র.) : তিনি আবূ হাফস কবীর বুখারী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট ফিক্‌হ হাসিল করেছেন এবং তাঁর কিতাব সমূহের তিনিই রাবী ছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) কর্তৃক প্রণীত মাবসূত গ্রন্থটি তাঁরই হাতে লিখিত।

৩. বশীর ইবনে গিয়াস মুরীসী (র.) : তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট থেকে ফিক্‌হের ইল্‌ম হাসিল করেছেন। তিনি বহু কিতাব প্রণয়ন করেন এবং ২২৮ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

৪. বিশ্‌র ইবনে ওয়ালীদ কিন্দী (র.) : তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর ছাত্র এবং তাঁর কিতাবসমূহের রাবী ছিলেন। খলীফা মুতাসিম বিল্লাহর জমানায় তিনি বাগদাদের কাজি ছিলেন এবং ২৩৮ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

৫. ঈসা ইবনে আবান (র.) ঃ তিনি ইমাম মুহাম্মদ এবং হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর শিষ্য ছিলেন। তিনি বিখ্যাত ফকীহ এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। ২২১ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

৬. মুহাম্মদ ইবনে সিমাআ তামীমী (র.) : তিনি লায়স ইবনে সা'দ, ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট থেকে হাদীসের ইলম হাসিল করেছেন এবং ফিক্‌হ হাসিল করেছেন ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) থেকে। খলীফা মামূনুর রশীদের যুগে তিনি বাগদাদের কাজি ছিলেন। তিনি নাওয়াদিরে ইমাম আবূ ইউসুফ এবং নাওয়াদিরে ইমাম মুহাম্মদের সংকলক ছিলেন। তিনি ২৩৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

৭. মুহাম্মদ ইবনে শুজা' সালজী (র.) : তিনি হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর শিষ্য এবং বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি একজন পরহেযগার আবিদ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাস্‌হীহুল আসার, কিতাবুন নাওয়াদির, কিতাবুল মুযারাবা ইত্যাদি গ্রন্থাবলি রচনা করেছেন। ২৬৭ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৮. আবূ সুলায়মান মূসা ইবনে সুলায়মান জুযজানী (র.) : তিনি ফিক্‌হ হাসিল করেছেন ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট থেকে এবং তিনি ছিলেন মাসাইলে উসূল এবং "আমালী" (أَمَالِيْ) প্রণেতা। ২০০ হিজরির পরে তিনি ইনতিকাল করেন।

৯. হিলাল ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে মুসলিম বসরী (র.) : তিনি ইমাম যুফার এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর শাগরিদ এবং অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ফকীহ ছিলেন। তিনি "ওয়াক্‌ফের বিধান ও শর্ত" শিরোনামে একটি কিতাব প্রণয়ন করেছেন। ২৪৫ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

১০. আবূ জা'ফর আহমদ ইবনে ইমরান (র.) ঃ তিনি ইবনে সিমাআ (র.)-এর শিষ্য এবং ইমাম আবূ জা'ফর তাহাভী (র.)-এর উস্তাদ ছিলেন। ২৮০ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

১১. আহমদ ইবনে ওমর আল খাসসাফ (র.) ঃ তিনি নিজ পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করেছেন এবং তার পিতা হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর শাগরিদ ছিলেন। তিনি কিতাবুল খারাজ, কিতাবুল হিয়াল, কিতাবুল ওয়াসায়া, কিতাবুশ শরূত, কিতাবুল ওয়াক্‌ফ গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি অংক শাস্ত্র ও ফারাইযের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি ২৬১ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

১২. বাক্‌কার ইবনে কুতায়বা ইবনে আসাদ (র.) ঃ তিনি মিসরের কাজি এবং হিলালুর রায়-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি একজন উচ্চ স্তরের ফকীহ ছিলেন। তিনি বহু কিতাবের প্রণেতা। ২৯০ হিজরি সনে তাঁর ইনতিকাল হয়।

১৩. ইমাম আবূ হাযিম আব্দুল হামীদ ইবনে আব্দুল আযীয (র.) ঃ তিনি ঈসা ও শায়খ হিলালের ছাত্র এবং কূফার কাজি ছিলেন। তিনি কিতাবুল মুহাযির, কিতাবু আদাবিল কাযী এবং কিতাবুল ফারাইয প্রণয়ন করেন এবং ২৯২ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

১৪. আবূ সাঈদ আহমদ ইবনে হুসায়ন বারদাঈ (র.) ঃ তিনি ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবূ হানীফা (র.) এবং আবূ আলী দাক্‌কাক (র.) -এর ছাত্র ছিলেন। তিনি ৩১৭ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

১৫. শায়খ আবূ আলী দাক্কাক (র.) ঃ তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর ছাত্র মূসা ইবনে নসর (র.)-এর ছাত্র ছিলেন। ৩১৭ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

১৬. ইমাম আবূ জা'ফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা আযদী তাহাভী (র.) ঃ তিনি ২৩০ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ছাত্র ইমাম মুযানী (র.) তাঁর মামা ছিলেন। প্রথমে তিনি মামার নিকট ফিকহে শাফি'ঈ শিক্ষা করেন; অতঃপর হানাফী মত গ্রহণ করেন এবং আবূ জা'ফর আহমদ ইবনে আবূ ইমরান ও আবূ হাযিম (র.)-এর নিকট ফিক্‌হ অধ্যয়ন করেন। তিনি হানাফী মাযহাবের একজন উচ্চস্তরের ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হাদীস ও ফিক্‌হের ওপর বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যা হানাফী মাযহাবের প্রসারে বেশ সহায়ক হিসেবে কাজ করে। তিনি ৩২১ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। — [তারীখে ফিকহে ইসলামী; পৃঃ ২৯৯]

উপরে যে সব ইমাম ও মুজতাহিদীনে কেরামের কথা বলা হয়েছে তাদের ছাড়াও এ যুগে আরো বহু ফকীহ্ এবং মুজতাহিদীনে কেরাম এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ ইমাম শাফি'ঈ ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ এবং ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল ও তাঁর শিষ্যবৃন্দের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

✵ ইমাম মালিক (র.) ঃ তিনি ৯৩ হিজরি সনে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মদীনাতেই তিনি বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। তিনি আব্দুর রহমান ইবনে হুরমুয (র.)-এর নিকট থেকে প্রথমে হাদীসের ইলম হাসিল করেন। অতঃপর ইমাম যুহরী, নাফি' ইবনে যাকওয়ান এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র.)-এর নিকট থেকেও তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। হিজাযের ফকীহ রবী'আতুর রায় (র.)-এর নিকট থেকে তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর হাদীস ও ফিক্‌হের ক্ষেত্রে যারা তার শায়েখ ছিলেন তাদের নির্দেশ ও অনুমতিতে তিনি হাদীস রিওয়ায়াত এবং ফতোয়া প্রদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বলেন, সত্তরজন উসতাদ আমার যোগ্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত আমি ফতোয়া প্রদানের এই আসনে উপবিষ্ট হইনি।

ইমাম মালিক (র.) হাদীসেরও সর্বস্বীকৃত ইমাম ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ এবং আরোও অনেকে ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.)ও ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেছেন। ইমাম মালিক (র.)-এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের সংকলনের নাম হলো اَلْمُوَطَّأ (আল মুআত্তা)। বহু মুজতাহিদ, ফকীহ্, মুহাদ্দিস, আমীর এবং সূফী এর থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং হচ্ছেন।

ফিক্‌হ সংকলন এবং ফতোয়া দানের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক (র.)-এর মূলনীতি ছিল, প্রথমে তিনি কুরআন মাজীদের ওপর অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমস্ত হাদীস যেগুলোকে তিনি বিশুদ্ধ মনে করতেন, সেগুলোর ওপর নির্ভর করতেন। তাঁর মতে হিজাযের প্রবীণতম ও শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিসগণই ছিলেন শুদ্ধাশুদ্ধির মাপকাঠি। মদীনাবাসীদের আমল এবং তাদের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক প্রথাকেও তিনি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন।

মদীনাবাসীগণ আমল করেননি বলে তিনি অনেক বিশুদ্ধ হাদীসও গ্রহণ করেননি। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে تَعَامُلُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ অর্থাৎ মদীনাবাসীদের আমলও ফিক্‌হ শাস্ত্রের অন্যতম উৎস। মদীনাবাসীদের আমল এবং ইজমার পরই কিয়াসের স্থান। কিন্তু হানাফী মাযহাবের মতো তাঁর মাযহাবে কিয়াসের ততো আধিক্য নেই। অবশ্য হানাফী মাযহাবের ইস্‌তিহ্‌সানের (اِسْتِحْسَان) মতো মালিকী মাযহাবেও مَصَالِحِ مُرْسَلَة তথা ইসতিস্‌লাহ (اِسْتِصْلَاح) -এর ওপর আমল করা হয়। اِسْتِصْلَاح-এর মর্ম হলো এমন মুসলাহাত (কল্যাণ) যা দ্বারা শরিয়ত সম্মত এমন উদ্দেশ্যের হিফাজত করা হয় যার শরিয়ত সম্মত হওয়া কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার সমষ্টিগত হুকুম দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। তবে এ ব্যাপারে সরাসরি শরিয়তে কোনো প্রমাণ নেই, যেমন এর বাতুলতার ব্যাপারেও কোনো প্রমাণ নেই। বরং কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার সমষ্টিগত হুকুমের দ্বারা এর শরিয়ত সম্মত হওয়ার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে এই اِسْتِصْلَاح-এর ওপর আমল করা জায়েজ। অবশ্য যদি কোনো জায়গায় এর বিপক্ষে শরিয়তের কোনো নস (কুরআন বা হাদীস) যা কিয়াস আছে বলে প্রমাণিত হয় তবেই এর ওপর আমল করার বিষয়টি বিতর্কিত হয়ে যাবে। ইমাম গাযালী (র.) তাঁর মুস্‌তাস্‌ফা (مُسْتَصْفٰى) নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মোদ্দাকথা হলো ইমাম মালিক (র.)-এর মতে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎস হলো, কুরআন হাদীস, মদীনাবাসীদের আমল, কিয়াস এবং ইসতিসলাহ। — [তারীখে ফিকহে ইসলামী; পৃঃ ৩১০ -৩১১]

ইমাম মালিক (র.)-এর শিক্ষা মজলিস ছিল খুব শান-শওকতের। তিনি খুব সুন্দর পরিপাটি পোশাক পরিধান করে; আতর সুরমা লাগিয়ে খুব জাকজমকপূর্ণ আসনে বসে শিক্ষা দান করতেন। হাদীসে নববী ও কুরআন মাজীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মানসেই তিনি এরূপ করতেন। তিনি আজীবনই মদীনায় ছিলেন, অন্য কোনো শহরে যাননি। মসজিদে নববীতে বসেই তিনি শিক্ষা দান করতেন। বহু দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে তাঁর নিকট থেকে হাদীস ও ফিক্‌হ শিক্ষা করতেন। বিশেষভাবে মিসর ও আফ্রিকাবাসীগণ তাঁর নিকট থেকে ফিক্‌হ শিক্ষা করার জন্য আসতেন এবং শিক্ষা সমাপনান্তে নিজ নিজ দেশে গিয়ে তা প্রচার করতেন।

মদীনায় ইমাম মালিক (র.)-এর বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন আবূ মারওয়ান আব্দুল মালিক ইবনে আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ সালামা আল মাজিশুন (র.)। তিনি কুরায়শ বংশের বনী তায়ম গোত্রের আজাদকৃত দাস ছিলেন। অনেকেই তার নিকট থেকে ফিকহে মালিকী শিক্ষা করেছেন। ২১২ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

উল্লেখ্য যে, মিসরবাসী ছাত্র এবং ছাত্রের ছাত্র দ্বারাই মূলত মালিকী মাযহাবের অধিক প্রসার লাভ ঘটেছে। বরং মিসরীয় ছাত্র-শিষ্যদের মাধ্যমেই মালিকী মাযহাব দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নে ইমাম মালিক (র.)-এর মিসরীয় ছাত্র এবং ছাত্রের ছাত্রগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো ঃ

১. আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব ইবনে মুসলিম কুরাশী (র.) ঃ তিনি লায়স ইবনে সা'দ, সুফইয়ান ইবনে উয়ায়না, সুফইয়ান সাওরী (র.) ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি ১৪৮ হিজরিতে ইমাম মালিক (র.)-এর শিক্ষালয়ে যোগদান করেন এবং সুদীর্ঘ ৩১ বছর পর্যন্ত তাঁর সুহবতে থাকেন। অর্থাৎ ইমাম মালিক (র.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথেই থাকেন। ইমাম মালিক (র.) তাকে "ফকীহে মিসর" উপাধি দিয়ে ছিলেন। হাদীস ও মালিকী মাযহাবের জ্ঞানে তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৭ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

২. আবূ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবনে কাসিম আতাকী (র.) ঃ তিনি ইমাম মালিক; লায়স ইবনে সা'দ; ইবনে মাজিশুন এবং মুসলিম ইবনে খালিদ প্রমুখ মনীষীবৃন্দের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন। ১৫৮ হিজরিতে মদীনায় এসে তিনি ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। অতঃপর মিসরে ফিরে গিয়ে সেখানে মালিকী মাযহাব প্রচার করেন। ১৯১ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৩. মাশহাব ইবনে আব্দুল আযীয আল কায়সী আল আমেরী আল জা'দী (র.) ঃ তিনি ইমাম লায়স ইবনে সা'দ এবং ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট হাদীস শাস্ত্রের শিক্ষা হাসিল করেন। আর ফিক্‌হ হাসিল করেন তিনি ইমাম মালিক (র.) ও মাদানী, মিসরী মাশায়িখে কেরামের নিকট থেকে। ইবনুল কাসিম (র.)-এর পর তিনি মিসরের ফকীহগণের নেতৃত্ব প্রাপ্ত হন। ২০৪ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৪. আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে হাকাম ইবনে আ'য়ান (র.) ঃ তিনি ইমাম মালিক (র.)-এর মাযহাবের মুহাক্কিক ফকীহ ছিলেন। আশহাব (র.)-এর পর তিনিই মিসরে মালিকী মাযহাবের ইমাম নিয়োজিত হন। তিনি ইমাম মালিক; লায়স ইবনে সা'দ, ইবনে উয়ায়না এবং ইবনে লাহী'আ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.) মিসরে আসলে তাঁর নিকটই আবস্থান করতেন। ২২৪ হিজরিতে তিনি মিসরেই ইনতিকাল করেন।

৫. আসবাগ ইবনে ফারাজ উমুভী (র.) ঃ তিনি ইমাম মালিক (র.)-এর ইনতিকালের দিন মদীনায় এসে পৌছেন এবং ইমাম মালিক (র.)-এর ছাত্র ইবনে কাসিম, ইবনে ওয়াহাব এবং আশহাব (র.) প্রমুখের নিকট ফিকহ হাসিল করেন। তাকে ইবনে ওয়াহাব (র.)-এর বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাঁর উস্তাদ আশহাব (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি আপনার পরবর্তী জানেশীন হিসেবে কাকে রেখে যাচ্ছেন ? জবাবে তিনি বলেছেন, আসবাগ ইবনে ফারাজকে রেখে যাচ্ছি। ইবনে মাঈন (র.) বলেন, তৎকালীন যুগে ইমাম মালিক (র.)-এর রায় এবং মতামত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন আসবাগ ইবনে ফারাজ। তিনি ইমাম মালিক (র.) -এর এক একটি মাসআলা তন্য তন্য করে জানতেন।

৬. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল হাকাম (র.) ঃ তিনি স্বীয় পিতার নিকট থেকে ইলম হাসিল করেন। তারপর তিনি ইবনে ওয়াহাব, আশহাব, ইবনে কাসিম (র.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ইমাম শাফিঈ (র.)-এর সুহবতেও দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করেন। তিনি মিসরের সর্বজন স্বীকৃত ফকীহ ছিলেন। ২৬৮ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৭. মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে যিয়াদ ইসকান্দারী (র.) ঃ তিনি ইবনে মাজিশুন ও ইবনে আব্দুল হাকাম (র.) থেকে ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি মিসরের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন। ১৮০ হিজরিতে তাঁর জন্ম এবং ২৬৯ হিজরিতে তিনি দামেশকে ইনতিকাল করেন।

স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় ইমাম মালিক (র.)-এর নিম্নোল্লিখিত ছাত্রগণ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন ঃ

১. আবূ আব্দুল্লাহ যিয়াদ ইবনে আব্দুর রহমান কুরতুবী (র.) ঃ শাবতুন তাঁর উপাধি ছিল। তিনি ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট মুআত্তা কিতাবটি সরাসরি অধ্যয়ন করেছেন। এ ছাড়াও লায়স ইবনে সাদ এবং ইবনে উয়ায়না (র.)-এর নিকট থেকেও তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন। মালিকী মাযহাবের উপর তিনিই সর্বপ্রথম কিতাব রচনা করেছেন। ২১৩ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

২. ঈসা ইবনে দীনার উন্দোলূসী (র.) ঃ তিনি স্পেন হতে মদীনায় এসে ইমাম মালিক এবং ইবনে কাসিম (র.)-এর নিকট ফিক্হ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কর্ডোভার সবচেয়ে বড় মুফতি ছিলেন। প্রাচ্য অঞ্চলের সমস্ত ফতোয়ার জবাব তিনিই দিতেন। ২১২ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।

৩. ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর লায়সী (র.) ঃ তিনি প্রথমে যিয়াদ ইবনে আব্দুর রহমান (র.)-এর নিকট ইমাম মালিক (র.)-এর মুআত্তা কিতাবটি পাঠ করেন। অতঃপর মদীনায় এসে পুনরায় তিনি এ কিতাবটি সরাসরিভাবে ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট অধ্যয়ন করেন। এ বছরই ইমাম মালিক (র.) ইনতিকাল করেন। ফলে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর আবার সফরে যান এবং ইবনে কাসিম (র.)-এর নিকট ফিক্হ শিক্ষা করেন। موطا مالك কিতাবটি তাঁর রিওয়ায়াতেই বিখ্যাত। সেখানে তিনিই ছিলেন মালিকী মাযহাবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ২৩৪ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৪. আব্দুল মালিক ইবনে হাবীব ইবনে সুলায়মান সুলামী (র.) ঃ তিনি স্পেনেই বিদ্যা শিক্ষা করেন। অতঃপর ২০৮ হিজরিতে আরো ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে সফরে বের হন এবং ইমাম মালিক (র.)-এর ছাত্র ইবনে মাজিশুন, মুতাররিফ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল হাকাম এবং আসাদ ইবনে মূসা (র.) প্রমুখের নিকট হাদীস ও ফিক্হ শিক্ষা করেন। অতঃপর স্পেনে প্রত্যাবর্তন করলে আমীর আব্দুর রহমান ইব্নুল হাকাম তাকে কর্ডোভার মুফতি নিয়োগ করেন। তিনি মালিকী মাযহাবের হাফিজ ছিলেন। كِتَابُ الْوَاضِحَةِ فِى السُّنَنِ وَالْفِقْهِ তাঁর বিখ্যাত সংকলন গ্রন্থ। ২৩৮ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৫. আবুল হাসান আলী ইবনে যিয়াদ তিউনিসী (র.) ঃ তিনি ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট থেকে مؤطا (মুআত্তা) শ্রবণ করেছেন। হাদীস শ্রবণ করেছেন তিনি লায়স ইবনে সা'দ; সুফইয়ান সাওরীসহ আরো কতিপয় ফকীহ ও মুহাদ্দিসের নিকট থেকে। তৎকালীন যুগে আফ্রিকাতে তাঁর সমপর্যায়ের কোনো ফকীহ ছিল না। ১৮৩ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

৬. আসাদ ইবনে ফুরাত (র.) ঃ প্রথমে তিনি তিউনিসে আলী ইবনে যিয়াদের নিকট ফিক্হ শিক্ষা করেন। অতঃপর মদীনায় এসে ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট مؤطا কিতাবটি সরাসরি অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি ইরাক সফর করে ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আসাদ ইবনে ওমর এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অন্যান্য ছাত্রদের নিকট থেকে ফিক্হে হানাফী শিক্ষা করেন। তিনি তিউনিসের একজন কাজিও ছিলেন। ২১৩ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

৭. আব্দুস সালাম ইবনে সাঈদ আত্তান্নুখী (র.) ঃ তাঁর উপাধি ছিল শাহনূন। তিনি প্রথমে মিসর গিয়ে ইমাম মালিক (র.)-এর ছাত্র ইবনে কাসিম, ইবনে ওয়াহাব ও অন্যান্যদের নিকট ফিক্হ শিক্ষা করেন। অতঃপর সেখান থেকে মদীনায় গিয়ে মদীনার আলিমদের নিকট হাদীস ও ফিক্হ অধ্যয়ন করেন। তারপর ১৯১ হিজরিতে আফ্রিকা প্রত্যাবর্তন করেন এবং জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি আফ্রিকার কাজি নিযুক্ত হন। একজন উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ হওয়ার পাশাপাশি তাঁর মধ্যে আরো বহু গুণাবলির সমন্বয় হয়েছিল; যা অন্যান্যদের মাঝে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল। যেমন– তাকওয়া ও পরহেযগারী, অকুতোভয় সত্যভাষী, পানাহারে সরলতা, দানশীলতা ও বদান্যতা এবং রাজা বাদশাহদের পক্ষ থেকে দেওয়া উপঢৌকন কবুল না করা ইত্যাদি। তাঁর উস্তাদ ইবনে কাসিম (র.) বলতেন, আফ্রিকাতে শাহনূনের অনুরূপ আর কেউ নেই। ২৪০ হিজরিতে তার ইনতিকাল হয়। —[তারিখে ফিক্হে ইসলামী; পৃঃ ৩০৮-৩১৮]

পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ ইরাকে ফিকহে মালিকী প্রচার করেন ইমাম মালিক (র.)-এর ছাত্রের ছাত্রগণ। তাদের মধ্যে নিম্নোল্লিখিত দু' জন ফকীহ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।

১. আহমদ ইবনে মাযাল ইবনে গীলান (র.) ঃ তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ, দার্শনিক, তার্কিক ও বাগ্মী আলিম ছিলেন। পাশাপাশি তিনি একজন দীনদার ইবাদত গুজার ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাজিশুন এবং মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার অন্যতম শিষ্য ছিলেন। প্রাচ্য অঞ্চলে তাঁর মাধ্যমেই মালিকী মাযহাবের সম্প্রসারণ হয়ে ছিল।

২. কাজি আবূ ইসহাক (র.) ঃ তিনি ইবনে মাযাল (র.)-এর নিকট থেকে ফিক্হ শাস্ত্র এবং ইবনে মাদীনী (র.)-এর নিকট থেকে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। আবূ বক্র ইবনুল খতীব (র.) বলেন, কাজি আবূ ইসহাক সর্ব বিষয়ে পারদর্শী একজন ফকীহ ছিলেন। তিনিই এতদঞ্চলে মালিকী মাযহাবের ব্যাখ্যাকার ছিলেন। তাদের পক্ষ হয়ে তিনি বহু বাহাছ ও মুনাযারা করেছেন। হাদীস ও ফিক্হের উপর তিনি বেশ কিছু কিতাব রচনা করেছেন। মালিকী মাযহাবের লোকেরা ইরাকে কাজি আবূ ইসহাক (র.)-এর নিকট থেকেই ফিক্হ শিক্ষা করেছেন। ইমাম মালিক (র.)-এর পর কাজি আবূ ইসহাক (র.)-এর অনুরূপ এত বড় আলিম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস আর সৃষ্টি হয়নি। তিনি প্রথমে মাদাইন এবং নাহরাওয়াতের বিচারক হয়েছিলেন। শেষ পর্যায়ে তিনি প্রধান বিচারপতির আসনও অলংকৃত করেন। সর্বমোট তিনি বত্রিশ অথবা পঞ্চাশ বছর এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। ২০০ হিজরিতে তাঁর জন্ম এবং ২৮২ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

◎ ইমাম শাফি'ঈ (র.) ঃ তিনি আসকালান প্রদেশের গাযাহ নামক স্থানে ১৫০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা মারা যান। অতঃপর তাঁর মাতাই তাঁকে লালন পালন করেন। দশ বছর বয়সে তিনি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন। এরপর তিনি মক্কায় পৌছে সেখানকার শায়খ মুসলিম ইবনে খালিদ যানজী (র.)-এর নিকট ফিক্হ শিক্ষা করেন। পনের বছর বয়সে তাঁর উস্তাদ শায়খ যানজী (র.) তাঁকে ফতোয়া দানের অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় উস্তাদের অনুমতিক্রমে তাঁর দেওয়া একখানা পত্র নিয়ে ইমাম মালিক (র.) এবং সেখানকার মাশায়িখে কেরামের উদ্দেশ্যে গমন করেন। মদীনা পৌছে তিনি ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট মুআত্তা মালিক অধ্যয়ন করেন এবং তা মুখস্থ করে তাকে শুনান। এতে ইমাম মালিক (র.) বিস্ময়াভিভূত হন এবং তাঁকে খুব কাছে টেনে নেন। এ ছাড়াও আরো ৮১ জন ফকীহ ও মুহাদ্দিসের নিকট তিনি ফিক্হ ও হাদীস শিক্ষা করেন। খলীফা হারুনুর রশীদের খিলাফতকালে তিনি নাজরান প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। কিন্তু সৈয়দ বংশের অর্থাৎ হযরত আলী

(রা.)-এর বংশের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করে তাঁর বিরুদ্ধে খলীফার নিকট অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। অতঃপর রবী' ইবনে ফযল-এর সুপারিশক্রমে তিনি মুক্তি পেয়ে সপদে পুনঃ বহাল হন। কিন্তু বেশি দিন তাঁর এ চাকরি অব্যাহত থাকেনি। অতঃপর তিনি ইরাক চলে যান। ইরাক গিয়ে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (র.)-এর নিকট ফিকহে হানাফী শিক্ষা করেন। এভাবে তিনি বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় মক্কায় আগত মিসরীয়, স্পেনীয় ও আফ্রিকার আলিমগণের সাথেও তিনি ভাবের আদান প্রদান করে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অতঃপর ১৯৫ হিজরিতে পুনরায় তিনি ইরাক সফর করেন এবং দু' বছর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে জ্ঞান পিপাসু লোকদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করেন। এ সময় তিনি যেসব ফতোয়া প্রদান করেছেন সেগুলোকে তাঁর قَوْلِ قَدِيْم "পুরাতন অভিমত" বলা হয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর ইরাকে অবস্থানকালে তাঁর মাযহাবের বেশ প্রসার লাভ ঘটে। সেখানকার একদল আলিমও তাঁর মাযহাব অবলম্বন করেন। অতঃপর তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৮ হিজরিতে তৃতীয়বার তিনি ইরাক গমন করেন এবং সেখানে কয়েক মাস অবস্থানের পর মিসর চলে যান।

মিসরে মালিকী মাযহাবের অধিক প্রচলন ছিল। ইমাম শাফি'ঈ (র.) মিসরী আলিমদের সামনে তাঁর মাযহাব পেশ করেন। এ সময় তাঁর ইজতিহাদ চিন্তাধারায় কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন তিনি পূর্বের মতামতে কিছুটা পরিবর্তন করে নতুন আঙ্গিকে ফতোয়া প্রদান করেন এবং এ হিসেবে কিছু কিতাবও রচনা করেন। একেই ইমাম শাফিঈ (র.)-এর قَوْلِ جَدِيْد "নুতন অভিমত" বলা হয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.) নিজেই তাঁর মাযহাবের প্রচার কার্য চালিয়ে যান। পরে তাঁর ছাত্র শিষ্যরাও এ প্রচারকার্যে যোগদান করেন। ফলে মিসরে তাঁর মাযহাব খুবই গ্রহণীয় হয়। তিনি ১৯৮ হিজরি হতে মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছয় বছর মিসরেই অবস্থান করেন এবং এখানেই ২০৪ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

ইমাম শাফি'ঈ (র.) তাঁর মাযহাবের বুনিয়াদী উসূল তৎপ্রণীত رِسَالَةُ اُصُوْلِيَّةٌ নামক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেছেন। আর তা হলো, ইমাম শাফিঈ (র.) প্রথমে কুরআন মাজীদের যাহিরী অর্থকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন। কিন্তু যদি কোনো দলিল দ্বারা প্রমাণিত হতো যে, এখানে কুরআনের যাহিরী অর্থ উদ্দেশ্য নয় তাহলে তিনি এটাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন না। অতঃপর তিনি হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করতেন। যে কোনো অঞ্চলের আলিমই এই হাদীস বর্ণনা করুক না কেন তিনি তাতে কোনো বাছ-বিচার করতেন না। শুধু সনদ مُتَّصِل এবং রাবী ثِقَه হওয়ার শর্ত আরোপ করতেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.) ইমাম মালিক (র.)-এর ন্যায় হাদীসের মর্মানুযায়ী কেউ আমল করেছে বলে প্রমাণ থাকার শর্ত এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ন্যায় বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হওয়ার শর্ত আরোপ করেননি। তিনি কুরআন ও হাদীসকে একই নজরে দেখতেন এবং উভয়ের আনুগত্যই সমভাবে ওয়াজিবুল আমল মনে করতেন। হাদীসের পর তিনি ইজমার ওপর আমল করতেন। কুরআন হাদীস ও ইজমার দ্বারা কোনো মাসআলার সমাধান না হলে তিনি তা কিয়াস দ্বারা সমাধান করতেন। তবে কিয়াসের জন্য তিনি এই শর্ত আরোপ করতেন যে, এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো اَصْل বা নীতি থাকতে হবে। তিনি হানাফীদের اِسْتِحْسَانْ এবং মালিকীদের اِسْتِصْلَاحْ-এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তবে তিনি এই গুলোর কাছাকাছি দলিলের ওপর আমল করতেন।

— [তারীখে ফিক্‌হে ইসলামী; পৃঃ ৩২০-৩২৪]

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর প্রথম যুগের ছাত্র এবং ছাত্রের ছাত্র যারা তাঁর ফিক্‌হের প্রচার করেছেন তাদের মধ্যে ইরাকী ও মিসরী কতিপয় ব্যক্তিবর্গ হলেন অন্যতম। তাঁর কয়েকজন বিখ্যাত ইরাকী ছাত্রের পরিচয় ও অবদান নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

১. **আবূ সাওর ইব্‌রাহীম ইবনে খালিদ ইবনে ইয়ামান কালবী আল বাগদাদী (র.) ঃ** প্রথমে হানাফী মাযহাবের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। পরে তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মাযহাব গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজেই একটি স্বতন্ত্র ফিকহ প্রবর্তন করেন। ঐ ফিক্‌হের কিছু অনুসারীও ছিল। কিন্তু পরে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তিনি ২৪০ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

২. ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল (র.) ঃ তিনি প্রথমে শাফি'ঈ ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। পরে নিজেই একটি স্বতন্ত্র ফিক্‌হ প্রবর্তন করেন। তাঁর ঐ মাযহাবের নামই হলো হাম্বলী মাযহাব।

৩. হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ্ আয যাফরানী আল বাগদাদী (র.) ঃ তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মাযহাব কাদীমের (পুরাতন) সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। ২৬০ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৪. আবূ আলী হুসাইন ইবনে আলী আলকারাবীসী (র.) ঃ তিনি প্রথমে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ফিক্‌হে শাফিঈ (র.)-এর অনুসারী হয়ে যান। ২৪৫ হিজরিতে তিনি মারা যান।

৫. আহ্‌মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল আযীয আল বাগদাদী (র.) ঃ তিনি প্রথমে বাগদাদে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মাযহাবে কাদীমের অনুসারী ছিলেন। পরে তিনি যাহিরী মাযহাব গ্রহণ করেন।

৬. আবূ ওসমান ইবনে সাঈদ আনমাতী (র.) ঃ তিনি ইমাম মুযানী, ইমাম রবী' এবং ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর অন্যান্য ছাত্রদের নিকট থেকে ফিক্‌হ শিক্ষা করেছেন। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের উপর বহু কিতাব রচনা করেছেন। ২৮৮ হিজরিতে তাঁর ইনতিকাল হয়।

৭.আবুল আব্বাস আহ্‌মদ ইবনে ওমর ইবনে সুরায়জ (র) ঃ তিনি যাফরানী এবং আনমাতী (র.) প্রমুখ শাফি'ঈ ফকীহগণের ছাত্র ছিলেন। শাফিঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে তিনি উক্ত মাযহাবের পক্ষে বহু মুনাযারা ও বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদির সংখ্যা চারশতের কাছাকাছি। ৩০৬ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৮. আবুল আব্বাস আহ্‌মদ ইবনে আবূ আহমদ তাবারানী (র.) ঃ তিনি ইব্‌নুল কাস উপাধিতে মশহুর ছিলেন। ইবনে সুরায়জ (র.)-এর নিকট তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। তালখীস, মিফতাহ, আদাবুল কাযী এবং উসূলুল ফিকহ ইত্যাদি গ্রন্থাবলি তাঁর রচিত। ৩৩৫ হিজরিতে তাঁর ইনতিকাল হয়।

মিসরে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর নিকট যারা ফিক্‌হ হাসিল করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

১. ইউসুফ ইবনে ইয়াহইয়া মিসরী (র.) ঃ ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মিসরী ছাত্রদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক প্রবীণ এবং ফতোয়া দানের ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর একজন বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন। মৃত্যুকালে ইমাম শাফি'ঈ (র.) তাঁকে স্থলাভিষিক্ত করে যান। তিনিই ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর ফিক্‌হকে দেশের কানায় কানায় ছড়িয়ে দেন। خَلْقِ قُرْاٰن -এর মাসআলায় তাঁকে বন্দী করা হয় এবং ৩৩১ হিজরিতে তাঁর ইনতিকাল হয়।

২. আবূ ইব্‌রাহীম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া মুযানী (র.) ঃ ১৯৯ হিজরিতে ইমাম শাফিঈ (র.) মিসরে আগমন করলে তিনি তাঁর নিকট থেকে ফিক্‌হ শিক্ষায় পূর্ণতা অর্জন করেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.) তাঁকে "হামীয়ে মাযহাব" উপাধি দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির ওপরই শাফি'ঈ মাযহাব নির্ভরশীল। খুরাসান, ইরাক এবং সিরিয়ার আলিমগণ তাঁর থেকেই ফিক্‌হে শাফি'ঈ শিক্ষা লাভ করেছেন। ২৬৪ হিজরিতে তাঁর ইনতিকাল হয়।

৩. রবী' ইবনে সুলায়মান ইবনে আব্দুল জাব্বার মুরাদী (র.) ঃ তিনি ১৭৪ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম মুরাদী ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর খিদমতে দীর্ঘ দিন ছিলেন এবং তার থেকে হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি তাঁর কিতাবের রাবীও ছিলেন। শাফি'ঈ মতাবলম্বীগণ ইমাম রবী' (র.)-এর রিওয়ায়াতকে ইমাম মুযানীর রিওয়ায়েতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তিনি ২৭০ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

৪. হারমালা ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আব্দুল্লাহ আত্ তুজায়বী (র.) ঃ তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ ছিলেন। ইবনে ওয়াহাব (র.)-এর নিকট তিনি হাদীস এবং ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর নিকট তিনি ফিক্‌হ শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের ওপর বহু গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। ২৪৩ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৫. ইউনুস ইবনে আব্দুল আ'লা সাদাফী আল মিসরী (র) ঃ ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মিসরী ছাত্রদের মধ্যে তিনি একজন নেতৃস্থানীয় ফকীহ ছিলেন। ২৬৮ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৬. আবূ বক্‌র মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ওরফে ইব্‌নুল হাদ্দাদ (র.) ঃ ইমাম মুযানী (র.)-এর ইনতিকালের দিন তাঁর জন্ম হয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর ছাত্রদের নিকট তিনি ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। তিনি হাফিযে কুরআন হিসেবে অদ্বিতীয়, ফিক্‌হের ইমাম, আরবি অভিধান শাস্ত্রের সমুদ্র এবং সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিশ্লেষণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। মাসাইল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বেনজীর। ইলমী বিষয়ে তিনি মিসরের অলংকার ছিলেন এবং আইন আদালতের ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ফকীহ ও বিচারক। ৩৪৫ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

◉ **ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল (র.) ঃ** তিনি ১৬৪ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। অতঃপর তাঁর মা তাঁকে লালন পালন করেন। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হুশায়ম এবং সুফইয়ান ইবনে উয়ায়না (র.) প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট থেকে হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইয়ামনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আব্দুর রাযযাক (র.)-এর নিকট থেকেও তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.) ইরাক গেলে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) তাঁর থেকে ফিক্হ শিক্ষা করেন। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বাগদাদের ছাত্রদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়ই তিনি ফিক্হ গবেষণায় নিজস্ব ধারা প্রবর্তন করেন। যদিও ফকীহ অপেক্ষা মুহাদ্দিসগণের মধ্যেই তাকে গণ্য করা হতো বেশি, তথাপিও তিনি নিজস্ব ফিক্হ মুতাবিক ফতোয়া দিতে শুরু করেন। মুসনাদে আহমদ তাঁর অমর কীর্তি যাতে ৪৩ হাজার হাদীস সন্নিবেশিত রয়েছে। ফিক্হ রচনায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ছিলেন অত্যন্ত সহজ ও সরল। কুরআন ও সহীহ সনদের হাদীসের ওপর আমল করাই ছিল তাঁর নীতি। তিনি খবরে ওয়াহিদ-এর উপরও আমল করতেন যদি তা সহীহ সনদে প্রমাণিত হতো। তিনি اَقْوَالِ صَحَابَہ-কে কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার দিতেন। হানাফী ও শাফি'ঈ মতাবলম্বীদের ন্যায় তিনি দিরায়েত, পর্যালোচনা, ভাবার্থ গ্রহণ এবং কিয়াস থেকে বিরত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। মালিকীদের মতো মদীনাবাসীদের আমলকেও তিনি প্রামাণ্য দলিল মনে করতেন না। মারফূ' (مَرْفُوْع) অথবা মাওকূফ (مَوْقُوْف) উভয় অবস্থায়ই সহীহ হাদীসকে তিনি আমলযোগ্য মনে করতেন। এ কারণেই তাঁর মাযহাবে একই মাসআলায় একাধিক হুকুম পাওয়া যায়। একান্ত বাধ্য হলে তিনি কিয়াস দ্বারা মাসআলার সমাধান করতেন। মোদ্দাকথা হচ্ছে, ইমাম চতুষ্টয়ের সকলের নিকটই ইজমা ও কিয়াস শরিয়তের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গণ্য।

ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর ছাত্র যারা তার থেকে ফিক্হে হাম্বলী রিওয়ায়াত করেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন ঃ

১. **আবূ বক্র আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হানী ওরফে আসরম (র.) ঃ** তিনি হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ ছিলেন। তিনি ফিকহে হাম্বলীর উপর কিতাবুস সুনান নামে একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এবং তিনি প্রতিটি মাসআলা হাদীসের দলিল দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ২৭৩ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

২. **ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম ওরফে ইবনে রাহওয়াইহ** (اِبْنِ رَاهَوَيْه) **(র.) ঃ** তিনিও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং তিনিও ফিক্হে হাম্বলীর ওপর কিতাবুস সুনান নামে কিতাব রচনা করেছেন। ২৩৮ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

৩. **আহমদ ইবনে হাজ্জাজ মিরওয়াযী (র.) ঃ** ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন। তিনি একজন উচ্চস্তরের ফকীহ ও বিচক্ষণ আলিম ছিলেন।

৪. **আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ঃ** তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর সুযোগ্য সাহেবজাদা এবং বড় ধরনের একজন ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। ২৯০ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

— [তারীখে ফিকহে ইসলামী; পৃঃ ২২৫-২৩০]

পঞ্চম যুগ ঃ ফিক্হ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতা তাকলীদের যুগ এবং ইলমে ফিক্হ মুনাযারার বিষয়ে পরিণত হওয়ার যুগ ঃ

এ যুগ হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু হয় এবং হিজরি সপ্তম শতাব্দীতে এসে এর সমাপ্তি ঘটে। এ যুগ হচ্ছে ফিক্হ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতার যুগ। তাকলীদের যুগ। সর্বোপরি এ যুগ হচ্ছে ইলমে ফিক্হ মুনাযারার বিষয়ে পরিণত হওয়ার যুগ। এ সময়ে ব্যাপকভাবে ইজতিহাদ করা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ওলামায়ে কেরাম এবং সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সকলেই বিশিষ্ট ইমামগণের তাকলীদ করতে থাকেন এবং তাদের ফিক্হী মতাদর্শের ভিত্তিতে কিতাব লিখতে শুরু করেন। আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন কুরআন ও হাদীস মন্থন করে যে সব মাসআলা মাসাইলের উদ্ভাবন (اِسْتِنْبَاط) করেছিলেন এ সময়ে এসে সে সব মাসাইলের তাহকীক তাফতীশ তথা বিশ্লেষণ পর্যালোচনা ও সমর্থনে পক্ষে বিপক্ষে মুনাযারা এবং বাহাছ বিতর্কের সূচনা হয়। চার ইমাম তথা ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম শাফিঈ (র.), ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর তাকলীদ করার উপর

মুসলিম উম্মাহর ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) বলেন, মাযহাব অবলম্বনের ক্ষেত্রে এ চারটির মধ্যে সীমিত থাকার উপযোগিতা ও বাস্তবতা অনস্বীকার্য। এর ব্যতিক্রম হলে সমূহ বিশৃঙ্খলা ও ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এর কয়েকটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে ইজমায় (ঐকমত্যে) উপনীত হয়েছেন যে, শরিয়তের পরিচিতি লাভের জন্য পূর্বসূরি সালাফে সালিহীনের অনুসরণ করতে হবে। আর প্রতিষ্ঠিত এ চার মাযহাবের মধ্যে যেহেতু পূর্বসূরি আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের গবেষণা লব্ধ ব্যাখ্যা ও অভিমত বিশুদ্ধভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে তাই এর অনুসরণ অপরিহার্য।

২. হাদীস শরীফে আছে, বৃহত্তম মুসলিম জামা'আতের অনুসরণ করবে। যেহেতু পূর্বেকার অন্যান্য মাযহাবের ধারাবাহিকতা বিলুপ্ত হয়ে মাযহাব কেবলমাত্র চারটিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং বিশ্ব মুসলিম এরই অনুসরণ করছে তাই এখন আর এর ব্যতিক্রম করার কোনো অবকাশ নেই।

৩. خَيْرُ الْقُرُوْنِ তথা উত্তম যুগ থেকে যেহেতু সময়ের ব্যবধান দীর্ঘতর হয়েছে। আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার চরম অভাব দেখা দিয়েছে এবং কার মধ্যে ইজতিহাদের শর্তাবলি বিদ্যমান আছে তা যাচাই করে দেখাও অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ এই চার মাযহাবের অনুসরণ করাই অপরিহার্য। —[ইকদুল জীদ]

উল্লেখ্য যে, এই যুগে ইজতিহাদ বা স্বাধীন মত প্রকাশ করা যদিও প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং ওলামায়ে কেরাম ও সাধারণ ব্যক্তিবর্গ সকলেই কোনো না কোনো নির্দিষ্ট ইমামের মুকাল্লিদ হয়ে যায়; তথাপিও এই যুগের ফকীহগণের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা পরবর্তীকালের ওলামায়ে কেরামের মধ্যে বিদ্যমান নেই। যেমন–

১. ফিক্হ সংকলন ও সম্পাদনার যুগে ইমামগণ শরিয়তের এমন অনেক হুকুম-আহকাম ইস্তিম্বাত করেছেন যেগুলোর عِلَّتْ ও مَنَاطْ অর্থাৎ কারণ ও উদ্দেশ্য তাঁরা বর্ণনা করেননি। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে এ যুগে এমন কিছু ফকীহ-এর আবির্ভাব হয় যাঁরা তাঁদের ইমামগণের সেই সমুদয় আহ্কামের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ ধরনের ফুকাহায়ে কেরামকে আসহাবুত তাখরীজ (اَصْحَابُ التَّخْرِيْجِ) বলা হয়। تَخْرِيْجِ مَنَاطْ অর্থ– শর'ঈ হুকুম-আহকামের কারণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা পর্যালোচনা করে তা নির্ণয় করা।

২. মাযহাবের প্রবর্তক ইমাম ও তাদের ছাত্রদের বিভিন্নমুখী রায় সমূহের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়ার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন কিছু আলিমও এ যুগে আবির্ভূত হয়েছেন যাদেরকে আসহাবে তারজীহ (اَصْحَابُ التَّرْجِيْحِ) বলা হয়।

৩. আসহাবে তাখরীজ এবং তারজীহ ফকীহগণ ব্যতীত সে যুগে এমন আলিম এবং ফকীহও বিদ্যমান ছিলেন যাঁরা اِجْمَالاً ও تَفْصِيْلاً অর্থাৎ মোটামুটিভাবে এবং বিস্তারিতভাবে নিজ নিজ মাযহাবের তায়িদ ও সহায়তা করেছেন। اِجْمَالاً সহায়তা করার মানে হচ্ছে তাঁর নিজ মাযহাবের ইমামের উচ্চ শিক্ষা, গভীর জ্ঞান, পরহেযগারী, আল্লাহ ভীরুতা, সত্যবাদীতা, ইজতিহাদের দক্ষতা, মাসআলা ইস্তিম্বাত করার নিপুণতা, কুরআন-সুন্নাহর আনুগত্য ইত্যাদি খুব জোরে শোরে প্রচার করেছেন। আর تَفْصِيْلاً তায়ীদের অর্থ হলো, তাঁরা নিজ ইমামের মাযহাব ও মাসআলার সমর্থনে পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, মুনাযারা ও বিতর্ক করেছেন এবং এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। — [তারীখে ফিকহে ইসলামী; পৃঃ ৪০০]

এ যুগের হানাফী মতাবলম্বী যে সব ফুকাহায়ে কেরাম এ মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঃ

১. ইমাম আবুল হাসান উবায়দুল্লাহ ইবনে হাসান কারখী (র.)। [মৃত্যু-২৪০]
২. আবূ বকর আহ্মদ ইবনে 'আলী আর রাযী আল জাসসাস (র.)। [মৃত্যু-৩৭০]
৩. আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল বলখী ওরফে ছোট আবূ হানীফা। [মৃত্যু-৩৬২]
৪. আবুল লায়স নাস্র ইবনে মুহাম্মদ সমরকন্দী (র.)। [মৃত্যু ৩৭৩]
৫. আবূ আব্দুল্লাহ ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ জুরজানী (র.)। [মৃত্যু-৩৯৮]
৬. আবুল হাসান আহ্মদ ইবনে মুহাম্মদ কুদূরী (র.)। [মৃত্যু-৪২৮]
৭. আবূ যায়েদ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আদ্ দাবূসী সমরকন্দী (র.)। [মৃত্যু-৪৩০]
৮. আবূ আব্দুল্লাহ হুসাঈন ইবনে আলী আয্যমীরী (র.)। [মৃত্যু-৪৩৬]

৯. আবূ বকর খাহারযাদা মুহাম্মদ ইবনে হুসাঈন আল বুখারী (র.)। [মৃত্যু-৪৩২]
১০. শামসুল আয়িম্মা আব্দুল আযীয ইবনে আহ্‌মদ হালওয়ানী আল বুখারী (র.)। [মৃত্যু-৪৪৮]
১১. শামসুল আয়িম্মা মুহাম্মদ ইবনে আহ্‌মদ সারাখ্‌সী (র.)। [মৃত্যু-৫৯০]
১২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ,ইবনে আলী দামগানী (র.)। [মৃত্যু-৪৭৮]
১৩. আলী ইবনে মুহাম্মদ বাযদূবী (র.)। [মৃত্যু-৪৮০]
১৪. শামসুল আয়িম্মা বকর ইবনে মুহাম্মদ যার নাজী (র.)। [মৃত্যু-৫১৩]
১৫. আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইবনে ইসমাঈল সাফ্‌ফার (র.)। [মৃত্যু-৫৭৪]
১৬. তাহির ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুর রশীদ আল বুখারী (র.)। [মৃত্যু-৫৪৩]
১৭. যহীরুদ্দীন আব্দুর রশীদ ইবনে আবূ হানীফা ইবনে আব্দুর রায্‌যাক আল ওয়াল্‌জী (র.)। [মৃত্যু-৫৪০ হি:]
১৮. আবূ বকর ইবনে মাসউদ ইবনে আহমদ কাসানী (র.)। [মৃত্যু-৫৮৭]
১৯. ফখরুদ্দীন হাসান ইবনে মানসূর আল উয্‌জন্দী ওরফে কাযীখান (র.)। [মৃত্যু-৫৯২]
২০. আলী ইবনে আবূ বক্‌র ইবনে 'আব্দুল জলীল ফারগানী আল মুরগিনানী সাহেবে হিদায়া (র.)। [মৃত্যু-৫৯৩]

এ যুগের মালিকী মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম যারা তাদের মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে বিরাট অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঃ

১. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে লুবাবা উন্দোলুসী (র.)। [মৃত্যু-৩৩৬]
২. আবূ বকর ইবনে আলা আল কুশায়রী (র.)। [মৃত্যু- ৩৪৪]
৩. আবূ ইসহাক মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ইবনে শা'বান আল 'আনাসী (র.)। [মৃত্যু-৩৫৫]
৪. মুহাম্মদ ইবনে হারিস ইবনে আসাদ আল খুশানী (র.)। [মৃত্যু-৩৬১]
৫. আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল মু'আয়তী আল উন্দোলুসী (র.)। [মৃত্যু-৩৬৭]
৬. ইউসুফ ইবনে ওমর ইবনে 'আব্দুল বার (র.)। [মৃত্যু-৩৮০]
৭. আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ যায়েদ 'আব্দুর রহমান নাকরী আল কীরওয়ানী (র.)। [মৃত্যু-৩৮৬]
৮. আবূ সাঈদ খালাফ ইবনে আবুল কাসিম আযদী ওরফে বারান্দাঈ (র.)।
৯. আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আবহুরী (র.)। [মৃত্যু-৩৯৫]
১০. আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ওরফে আবূ যিমনীন আলবীরী (র.)। [মৃত্যু-৩৯৯]
১১. আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালাফ আল মুআফিরী ওরফে ইবনে কাবিসী (র.)। [মৃত্যু-৪০৩]
১২. কাযী আব্দুল ওয়াহাব ইবনে নাস্‌র বাগদাদী মালিকী (র.)। [মৃত্যু-৪২২]
১৩. আবুল কাসিম আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ হাযরামী ওরফে লবীদী (র.)। [মৃত্যু-৪৪০]
১৪. আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে 'আব্দুল্লাহ ইবনে ইউনুস সায়কালী (র.)। [মৃত্যু-৪৬১]
১৫. আবুল ওয়ালীদ সুলায়মান ইবনে খালাফ আল বাজী (র.)। [মৃত্যু-৪৯৪]
১৬. আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ রিব'ঈ ওরফে লখমী (র.)। [মৃত্যু-৪৯৮]
১৭. আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে রুশদ কুরতুবী (র.)। [মৃত্যু-৪২০]
১৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে ওমর তামীমী মাযরী সায়কালী (র.)। [মৃত্যু-৫৩৬]
১৯. আবূ বক্‌র মুহাম্মদ ইবনে 'আব্দুল্লাহ ওরফে ইব্‌নুল আরবী আল মু'আফিরী আল্‌ আশবীলী (র.)। [মৃত্যু-৫৪৩]
২০. কাযী আবুল ফযল 'আয়ায ইবনে মূসা ইবনে আয়ায ইয়াহসীবী আস সাবতী (র.)। [মৃত্যু- ৫৪১]
২১. ইসমাঈল ইবনে মক্কী আল 'আওফী (র.)। [মৃত্যু-৫৪১]
২২. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে রুশদ মালিকী (র.)। [মৃত্যু-৫৯৫]
২৩. আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ ইবনে নাজম ইবনে শাস জুযামী আস্‌ সা'দী (র.)। [মৃত্যু-৬১০]

এ যুগের শাফি'ঈ মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম যাঁরা এ মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে বিরাট অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঃ

১. আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইবনে আহমদ মিরওয়াযী (র.)। [মৃত্যু-৩৪০]
২. আবূ আহমদ মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ ইবনে আবুল কাযী খাওয়ারিযমী (র.)। [মৃত্যু-৩৪০]
৩. আবূ বকর আহমদ ইবনে ইসহাক আয যাবঈ নিশাপুরী (র.)। [মৃত্যু-৩৪৩]
৪. আবূ আলী হুসায়ন ইবনে হুসায়ন ওরফে ইবনে আবূ হুরায়রা (র.)। [মৃত্যু-৩৪৫]
৫. আবুস সায়িব উতবা উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা (র.)। [মৃত্যু-৩৫০]
৬. কাযী আবূ হামিদ আহ্‌মদ ইবনে বিশ্‌র মির ওয়াযী (র.)। [মৃত্যু-৩৬২]
৭. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.)। [মৃত্যু-৩৬৫]
৮. আবূ সাহ্‌ল মুহাম্মদ ইবনে সুলায়মান সা'লূকী (র.)। [মৃত্যু-৩৬৯]
৯. আবুল কাসিম 'আব্দুল আযীয ইবনে 'আব্দুল্লাহ দারিকী (র.)। [মৃত্যু-৩৭৫]
১০. আবুল কাসিম আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে হুসায়ন আয যমীরী (র.)। [মৃত্যু-৩৮৬]
১১. আবূ আলী হুসাঈন ইবনে শু'আয়ব সান্‌জী (র.)। [মৃত্যু-৪০৩]
১২. আবূ হামিদ ইবনে মুহাম্মদ ইসফারাঈনী (র.)। [মৃত্যু-৪০৮]
১৩. আবুল হাসান আহমদ ইবনে মুহাম্মদ যাববী ওরফে ইব্‌নুল মুহামিলী (র.)। [মৃত্যু-৪১৫]
১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আহ্‌মদ (র.)। [মৃত্যু-৪১৭]
১৫. আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইসফারাঈনী (র.)। [মৃত্যু-৪১৮]
১৬. আবুত তায়্যিব তাহির ইবনে 'আব্দুল্লাহ তাবারী (র.)। [মৃত্যু-৪৫০]
১৭. আবূ আসিম মুহাম্মদ ইবনে আহ্‌মদ হিরুভী ইবাদী (র.)। [মৃত্যু-৪৫৮]
১৮. আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ মাযরাবী (র.)। [মৃত্যু-৪৫০]
১৯. আবুল কাসিম আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ফাওরানী আল মিরওয়াযী (র.)। [মৃত্যু-৪৬১]
২০. আবূ আব্দুল্লাহ কাযী হুসায়ন মিরওয়াযী (র.)। [মৃত্যু-৪৬২]
২১. আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইবনে আলী ফিরুযাবাদী শীরাযী (র.)। [মৃত্যু-৪৭৬]
২২. আবূ নাস্‌র আব্দুস সায়্যিদ ইবনে মুহাম্মদ ওরফে ইবনে সাব্বাগ (র.)। [মৃত্যু-৪৭৭]
২৩. আবূ সা'দ আব্দুর রহমান ইবনে মামূন মুতাওয়াল্লী (র.)। [মৃত্যু-৪৮৮]
২৪. আবুল মাআলী আব্দুল মালিক ইবনে আব্দুল্লাহ জুওয়ায়নী ওরফে ইমামুল হারামাইন (র.)। [মৃত্যু-৪৭৮]
২৫. আবুল মাহাসিন আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে ইসমাঈল রূয়ানী (র.)। [মৃত্যু-৫০২]
২৬. হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাযালী (র.)। [মৃত্যু-৫০৫]
২৭. আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইবনে মানসূর ইবনে মুসলিম ইরাকী (র.)। [মৃত্যু-৫৯৬]
২৮. আবূ সা'দ 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিবাতুল্লাহ তামীমী, আল মুসিলী (র.)।
২৯. আবুল কাসিম আব্দুল করীম ইবনে মুহাম্মদ কাযবীনী আর্ রাফি'ঈ (র.)। [মৃত্যু-৬২৩]
৩০. মুহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে শরফ ইবনে মিররী আন নববী (র.)। [মৃত্যু-৬৭৬]

এ যুগে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ফুকাহায়ে কেরাম যারা এ মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঃ

১. শায়খুল ইসলাম আবূ ইসমাঈল আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ হিরুবী আল আনসারী (র.)। [মৃত্যু-৪৮১]
২. হাফিয শামসুদ্দীন আবুল ফারাহ আব্দুর রহমান ইবনে আলী আল বাগদাদী (র.)। [মৃত্যু-৫৯৭]

—(তারীখে ফিক্‌হে ইসলামী; পৃঃ ৪০১-৪১৫)

৬ষ্ঠ যুগঃ খালিস তাকলীদের যুগ ঃ সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে এই যুগের সূচনা হয়। মূলত এ যুগে ইজতিহাদ করার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া থেমে যায়। ফলে ওলামায়ে কেরাম এবং সাধারণ মানুষ সকলকেই ইমামগণের তাকলীদ করতে হয়। এমনকি মাসআলার ব্যাখ্যা এবং অনুশীলনেরও এখন খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। কেননা চতুর্থ ও পঞ্চম যুগের ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্হ শাস্ত্র বা ইসলামি আইন শাস্ত্র তৈরি করে গিয়েছেন যাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে। আমাদের চোখে সমস্যা যত নতুন বলেই দৃষ্ট হোক না কেন সমস্ত সমস্যারই সমাধান ফুকাহায়ে কেরামের রচিত কিতাবসমূহে রয়েছে। হয়তো সেই বিশেষ সমস্যার সুনির্দিষ্ট সমাধান রয়েছে অথবা ঐ সমস্যার সমাধানের মূলনীতি সেখানে উল্লেখ রয়েছে। সে যুগের কিতাবসমূহে এমন সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা উদ্ভব হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এখনো তা সংঘটিত হয়নি। সে সব কিতাবে এত খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধানও রয়েছে যা এখনো অলীক এবং কল্পনা বলে মনে হয়। কিন্তু কালের বিবর্তনে হয়তো কোনো সময় সে সব সমস্যারও উদ্ভব হবে, তখন সেগুলোর সমাধান ঐ পুরাতন কিতাব সমূহেই পাওয়া যাবে। নতুন ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে না। বস্তুত এটি হচ্ছে ইসলামের মু'জিযানা শান যা মূলত إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক। (১৫-৯) ঘোষণার-ই বাস্তব প্রতিফলন। অতএব এখন ইজতিহাদ করার অর্থ হলো, জ্ঞাত জিনিসকে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা। হাঁ যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ সে যুগের কিতাবসমূহে নেই এবং সেখানে এর মূলনীতিও উল্লেখ নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দ্বার চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। তবে তা মাযহাব চতুষ্টয়ের নির্ধারিত মূলনীতির ভিত্তিতে করতে হবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই। মোদ্দাকথা হলো, ইসলামে যেমনিভাবে ইজতিহাদের দ্বার অবরুদ্ধ নয় এমনিভাবে বল্গাহীন ইজতিহাদেরও এতে কোনো সুযোগ নেই। এই যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট আলিমই দরজায়ে ইজতিহাদে পৌঁছে ছিলেন। তবে তা ছিল এ যুগের প্রথমার্ধের দিকে। যেমন হানাফী মাযহাবে আল্লামা কামাল ইবনে হুমাম (র.) আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লাঈ (র.) এবং আল্লামা কামাল ইবনে পাশা (র.) প্রমুখ; মালিকী মাযহাবে আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ (র.); শাফিঈ মাযহাবে আল্লামা ইয্যুদ্দীন আব্দুস সালাম (র.), শায়খ তকী উদ্দীন সুবকী (র.), আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.), শায়খ জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) প্রমুখ এবং হাম্বলী মাযহাবে আল্লামা ইবনে তায়মিয়া (র.) ও আল্লামা ইবনে কায়্যিম (র.) প্রমুখ। তারা নিজ নিজ ইমামের মূলনীতি অনুসারে কিতাবাদি রচনা করে ফিক্হের ক্রম বিকাশের এ ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন।

এ যুগে পাক-ভারত উপমহাদেশেও ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রম বিকাশে ফুকাহায়ে কেরাম বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁরা ফিকহের দরস দিয়ে; মাসাইলের মজলিস করে এবং এর উপর কিতাব লিখে যে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন তা থেকে মুসলিম সমাজ চিরকাল উপকৃত হতে থাকবে। নিম্নে তাদের মধ্য থেকে কতিপয় বিশেষ বিশেষ মুফতি এবং ফকীহ-এর পরিচয় তুলে ধরা হলো ঃ

১. শায়খ নিযামুদ্দীন (র.) ঃ তিনি একদিকে সূফীসাধক অপর দিকে ছিলেন বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ। তিনি ৭২৫ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

২. শায়খ ইয়াহ্ইয়া মনীরী (র.) ঃ তিনি একজন বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। তিনি ৭৭২ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

৩. শায়খ ইমামুদ্দীন দেহলবী (র.) ঃ তৎকালীন যুগে এ মহান সাধকও একজন খ্যাতনামা ফকীহ ছিলেন। তিনি ৭৮০ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

৪. শায়খ আলম ইবনে আ'লায়া আন্দরপতি (র.) ঃ আমীর তাতার খানের নির্দেশে এবং তার সহায়তায় তিনি ফাতাওয়ায়ে তাতার খানিয়া গ্রন্থখানি সংকলন করেন। উপমহাদেশে এ কিতাবটিই হলো সর্বপ্রথম রচিত ফিক্হ গ্রন্থ। তিনি ৭৮৬ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

৫. শায়খ আবুল ফাতহ রুক্ন ইবনে হুসসাম নাগারী (র.) ঃ ফাতাওয়ায়ে হাম্মাদিয়া গ্রন্থখানা তাঁর অমর অবদান।

৬. শায়খ ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ মুলতানী (র.) ঃ তিনি একজন খ্যাতনামা বুজুর্গ ফকীহ ছিলেন। ৭৯৫ হিজরি সনে তাঁর ইনতিকাল হয়।

৭. মাওলানা ইফতিখার উদ্দীন গিলানী (র.) ঃ তিনি একজন বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন।

৮. মাওলানা হাদ্দাদ জৌনপুরী (র.) ঃ এ মহান বুজুর্গ উচ্চমানের আরবি ভাষাবিদ ও ফকীহ ছিলেন। তিনি শরহে হিদায়া নামে হিদায়া কিতাবের একখানা ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন। এ ছাড়াও উসূলে বাযদূবীর একখানা শরাহ রচনা করে তিনি অমর অবদান রেখে গেছেন। তিনি ৯২৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

৯. সিরাজ উদ্দীন ওমর ইবনে ইসহাক হিন্দী (র.) ঃ তিনি যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ছিলেন। তিনি اَلتَّوْشِيْحُ নামে হিদায়ার একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তা পুরা করে যেতে পারেননি। তিনি ৭৭৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

১০. বারকলী মুহীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে পীর আলী (র.) ঃ তিনি তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া নামক একখানা অমূল্য গ্রন্থ মুসলিম সমাজকে উপহার দিয়েছেন। ৯৮২ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

১১. মাওলানা হামিদ ইবনে মুহাম্মদ কুনূবী (র.) ঃ তিনি খ্যাতনামা একজন ফকীহ ছিলেন। ফাতাওয়ায়ে হামিদিয়া নামকগ্রন্থ খানি তার অমর অবদান। ৯৮৫ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

১২. কাজি আবুল ফাতাহ বিলগিরামী (র.) ঃ তিনি একজন ফকীহ এবং বিলগিরামের কাজি ছিলেন। ১০০১ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

১৩. হযরত শাহ বাকী বিল্লাহ (র.) ঃ তিনি হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.)-এর পীর ছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস এবং ফকীহও ছিলেন। ১০১২ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

১৪. হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) ঃ এ মহান বুজুর্গ একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এবং ফকীহ ছিলেন। তিনি বহুগ্রন্থাদি রচনা করেছেন। ১০৩৪ হিজরি সনে তাঁর ইনতিকাল হয়।

১৫. মুহাম্মদ সাঈদ ইবনে মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র.) ঃ তিনি একজন মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। হাশিয়ায়ে মিশকাত তাঁর অমর অবদান। ১০৭০ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

১৬. মাওলানা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) ঃ তিনি একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। ১০৫২ বা ১০৫৮ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

১৭. বাদশাহ আলমগীর (র.) ঃ তিনি মোগল সাম্রাজ্যের একজন পরহেযগার দীনদার আলিম বাদশাহ ছিলেন। তিনি সাতশ ফকীহ আলিমের সমন্বয়ে একটি ফতোয়া বোর্ড গঠন করে তাদের মাধ্যমে শরঈ বিধানের একটি সংকলন বের করেন,-যা ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী নামে খ্যাত। তিনি তাঁর শাসন আমলে সমস্ত রাজকীয় কাজে এ গ্রন্থখানিকে অনুসরণ করে চলতেন এবং সর্বক্ষেত্রে এর অনুসরণের নির্দেশ দিতেন। ১১১৮ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

১৮. মোল্লা নিযামুদ্দীন বুরহানপুরী (র.) ঃ বাদশাহ আলমগীর (র.) সাতশ আলিমের সমন্বয়ে যে ফতোয়া বোর্ড গঠন করেছিলেন, এর প্রধান ছিলেন এ মহান ফকীহ। তিনি ১১০৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

১৯. শায়খ মোল্লাজিউন (র.) ঃ তিনি একজন উচ্চ স্তরের হানাফী ফকীহ ছিলেন। তিনি নূরুল আনওয়ার নামে উসূলে ফিক্‌হ বিষয়ের "আল মানার" কিতাটির শরাহ রচনা করেছেন। এ মহান বুজুর্গের আরেকটি অমর কীর্তি হলো তাফসীরুল আহমদিয়া ফী আয়াতিশ্ শরীআ-যা এ দেশে তাফসীরে আহমদী নামে খ্যাত। ১১৩০ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

২০. মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ বিহারী (র.) ঃ তিনি একজন উসূলবিদ ফকীহ আলিম ছিলেন। হানাফী ফিক্‌হের উসূলের উপর প্রণীত مُسَلَّمُ الثُّبُوْتِ কিতাবখানি তাঁর অমর কীর্তি। তিনি ১১১৯ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

২১. মোল্লা ইসামুদ্দীন (র.) ঃ তিনি একজন খ্যাতনামা ফকীহ ছিলেন। শরহে বিকায়ার টীকা (حَوَاشِىْ شَرْحِ وِقَايَه) তাঁর একটি ফিক্‌হী অবদান। তিনি ৯০০ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

২২. মোল্লা নিযামুদ্দীন সিহালবী (র.) ঃ দরসে নিযামিয়ার প্রবর্তক এই ফকীহ مُسَلَّمُ الثُّبُوْتِ-এর একখানা শরাহ্ প্রণয়ন করেছেন। ১১৬১ হিজরি সানে তিনি ইনতিকাল করেন।

২৩. মুহাম্মদ বশীরুদ্দীন ইবনে কারীমুদ্দীন উসমানী কনৌজী (র.) ঃ তিনিও كَشْفُ الْمُبْهَمِ مِمَّا فِى الْمُسَلَّمِ নামে مُسَلَّمُ الثُّبُوْتِ-এর একখানা শরাহ লিখেছেন।

২৪. বাহরুল উলূম মাওলানা আব্দুল আলী ইবনে নিযামুদ্দীন ইবনে কুতুবুদ্দীন (র.) ঃ তিনি مُسَلَّمُ الثُّبُوْتِ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় فَوَاتِحُ الرَّحَمُوْتِ شَرْحُ مُسَلَّمِ الثُّبُوْتِ নামে একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করে উম্মতকে উপহার দিয়েছেন।

২৫. ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) ঃ এ মহান বুজুর্গ একজন দার্শনিক ফকীহ, মুফতি ও মুহাদ্দিস ছিলেন। ইজতিহাদের ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি হানাফী ফিক্হের অনুসারী ছিলেন। তাঁর প্রণীত আল মুসাওওয়া শরহে মুআত্তা (আরবি), আল মুসাফ্ফা (ফারসি), ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ, আল ইন্সাফ ফী বয়ানে আস্বাবিল ইখতিলাফ এবং আল হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়। তিনি ১১৭৬ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

২৬. শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) ঃ তিনি একজন সেরা মুফতি ছিলেন। ফতোয়ায়ে আযীযিয়্যা তাঁর অমর অবদান। ১২৩৯ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

২৭. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথি (র.) ঃ এ মহান বুজুর্গ একজন মুফাস্সির, ফকীহ ও সূফী সাধক ছিলেন। তিনি ফিক্হ শাস্ত্রের ওপর মাবসূত এবং মালাবুদ্দা মিনহু নামে দু' খানা মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন। ১২২৫ হিজরি সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

২৮. মাওলানা আবদুল হাই লাখনৌভী (র.) ঃ তিনি এ উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত মুফতি ও ফকীহ ছিলেন। তাঁর প্রণীত উমদাতুর রি'আয়া আলা শরহিল বিকায়া তাঁর ফকীহ হওয়ার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। এ ছাড়াও তিনি মুজমুআয়ে ফতোয়া ও ফাওয়ায়িদে বাহিয়্যা গ্রন্থদ্বয় সহ আরো বহু কিতাব রচনা করেছেন। তিনি ১৩০৪ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

১৯. মাওলানা ওয়াহীদুয্ যামান ইবনে মসীহুয্ যামান লাখনৌভী ফারুকী (র.) ঃ তিনি একজন ফকীহ আলিম ছিলেন। তিনি নূরুল হিদায়া আলা শরহিল্ বিকায়া গ্রন্থটি রচনা করেছেন। ১৩০৭ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৩০. আবূ মুহাম্মদ আবদুল হক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খাজা শামসুদ্দীন দেহলভী (র.) ঃ আননামী শরহে হুসসামী নামক গ্রন্থখানি তাঁর অমর অবদান।

৩১. শাহ আহলুল্লাহ দেহলভী (র) ঃ তিনি একজন বিখ্যাত ফকীহ ছিলেন। তিনি বিশ্ব বিখ্যাত ফিক্হের কিতাব কান্যুদ্.দাকায়িক-এর ফারসি ভাষায় অনুবাদ করে অমর অবদান রেখে গেছেন।

৩২. মাওলানা মুহাম্মদ আহসান ইবনে লুতফে আলী (র.) ঃ তিনি একজন খ্যাতনামা ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি কানযুদ্ দাকায়িক, ইকদুল জীদ এবং আল ইনসাফ ফী সাবাবিল ইখতিলাফ ইত্যাদি গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ করেছেন। ১৩১২ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৩৩. মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) ঃ তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ এবং তাসাওউফ শাস্ত্রে পূর্ণ কামালাত ও বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। "মিফতাহুল জান্নাত" সহ তিনি বহু কিতাব রচনা করেছেন। ১২৯০ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৩৪. মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) ঃ হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ ও তাসাওউফ শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া তাঁর অমর অবদান। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইনতিকাল করেন।

৩৫. মুফতি আবদুল্লাহ টুন্কী বিহারী (র.) ঃ তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার সদরুল মুদাররিসীন ছিলেন। ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। ফকীহ পদটি তাঁর কর্মময় জীবনের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

৩৬. মুফতি আযীযুর রহমান (র.) ঃ তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতি ও ফকীহ ছিলেন। তিনি আজীবন ফতোয়া প্রদানের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ তাঁর অমর অবদান।

৩৭. শায়খুল হিন্দু মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র.) ঃ তিনি একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস, মুফতি ও ফকীহ ছিলেন। ফিক্হ শাস্ত্রে ঈযাহুল আদিল্লা তাঁর অমর অবদান।

৩৮. মাওলানা ই'যায আলী (র.) ঃ তিনি একজন খ্যাতনামা আদীব ও মুফতি ছিলেন। হাশিয়ায়ে নূরুল ঈযাহ আরবি, হাশিয়ায়ে নূরুল ঈযাহ ফারসি, হাশিয়ায়ে নিকায়া এবং হাশিয়ায়ে কান্‌যুদ দাকায়িক ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অমর অবদান। তিনি হিজরি ১৩৭৪ সনে ইনতিকাল করেন।

৩৯. মুফতি কিফায়েত উল্লাহ (র.) ঃ তিনি দিল্লীর মুফতীয়ে আ'যম হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর ফতোয়া ইরান, আফগান, তুরস্ক, মিসর, আরব ও আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ওলামায়ে কেরামের সমর্থন লাভ করেছে। তাঁর রচিত তা'লীমুল ইসলাম এবং কিফায়াতুল মুফতী কিতাবসমূহ উপমহাদেশে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। এ মহান বুজুর্গ ১৯৫২ইং সনে ইনতিকাল করেন।

৪০. হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) ঃ বেহেশ্‌তী জেওর এবং ইমদাদুল ফাতাওয়া ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অমর অবদান। ১৩৬২ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৪১. মুফতি নিযামুদ্দীন (র.) ঃ তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতি ছিলেন। তাঁর রচিত ফতোয়ায়ে নিযামিয়া আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার সমাধানে এক অমূল্য গ্রন্থ।

৪২. মুফতি মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী (র.) ঃ তাঁর রচিত ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ফিক্হ শাস্ত্রে এক অমূল্য অবদান। তিনি ১৯৯৫ ইং সনে ইনতিকাল করেন।

৪৩. মুফতি আবদুশ্ শাকূর লাখনৌভী (র.) ঃ তিনি ইলমুল ফিক্হ নামে গ্রন্থ একখানা রচনা করে ফিক্হ শাস্ত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

৪৪. মুফ্তি মুহাম্মদ শফী (র.) ঃ এ মহান ব্যক্তিত্ব একজন খ্যাতনামা ফকীহ এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। জাওয়াহিরুল ফিক্হ, মাসাইলে আহলে হাদীস এবং ইসলাম কা নিযামে আরযী ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অমর অবদান।

৪৫. মাওলানা ইউসুফ বিনৌরী (র.) ঃ তিনি হলেন সর্বজন পরিচিত একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ও ফকীহ। মা'আরিফুস সুনান গ্রন্থখানা তাঁর অমর অবদান।

৪৬. মাওলানা শাববীর আহমদ ওসমানী (র.) ঃ তিনি একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। ফতহুল মুলহিম গ্রন্থখানি তাঁর অমর কীর্তি।

৪৭. মাওলানা জা'ফর আহমদ ওসমানী (র.) ঃ তিনি একজন ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ধীমান গবেষক আলিম ছিলেন। ই'লাউস সুনান গ্রন্থখানি তাঁর অমর অবদান। —(তারীখে ইলমে ফিকহ্; পৃঃ ১২০-১২৪)

এ ছাড়াও আরো বহু মনীষী এই উপমহাদেশে ফিক্হ ও ফতোয়ার ময়দানে বিরাট অবদান রেখেছেন।

অনুরূপভাবে ভারত উপমহাদেশের বাইরেও এই তাকলীদের যুগে বহুজন বহুভাবে ইলমে ফিক্হের ক্রম বিকাশের ময়দানে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। এ পর্যায়ে আরব, মিসর, ইরাক ইত্যাদি মুসলিম দেশসমূহের ওলামায়ে কেরামের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে দরস দানের মাধ্যমে এবং কিতাব রচনা করে এ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। এমনিভাবে বোর্ড গঠন করেও ওলামায়ে কেরাম এ গুরু দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। এ ক্ষেত্রে "আন্তর্জাতিক ফিক্হ একাডেমীর" ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয়। তাঁরা আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন

ফিক্হী বিষয়ে সেমিনার সেম্পুজিয়াম করে ফিক্হের ক্রম বিকাশের ধারাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলছেন। বিশেষ করে আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার আলোকে যে সব সমস্যা নতুন করে উদ্ভাবিত হচ্ছে তাঁরা এর সমাধানে সদা সচেষ্ট। গোটা মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানী, গুণী ও ইসলামি চিন্তাবিদদের সমন্বয়ে এ একাডেমী গঠিত। এর মূল কেন্দ্র হচ্ছে সউদী আরবে।

তাকলীদের এই যুগে ফিকহের ক্রম বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখার বিষয়ে বাংলাদেশী মুফতি ও ফুকাহায়ে কেরামের অবদানকেও খাটো করে দেখা যায় না। নিম্নে বাংলাদেশের বিখ্যাত কতিপয় মুফতি এবং ফকীহ-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো ঃ

১. শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.) ঃ সমকালীন যুগে হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ কোনো আলিম ছিল না। তিনি বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সোনারগাও পরগণায় একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করে-সেখান থেকে হাদীস ও ফিক্হ্ শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ধারা চালু করেন। ৭০০ হিজরি সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন এবং সোনার গাওয়েই তাঁকে দাফন করা হয়।

২. মাওলানা হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র.) ঃ তিনি হাদীস, তাফসীর এবং ফিক্হ্ শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। মানুষের প্রতি আল্লাহ যে সব হুকুম-আহকাম তথা ফারাইয নির্ধারণ করে দিয়েছেন; মানুষ যেন তা যথাযথভাবে পালন করে সে লক্ষ্যে ফারাইযী আন্দোলন নামে একটি সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর এ আন্দোলনের ধারাটি ফিক্হ্ শাস্ত্রের ভিত্তিতেই প্রবাহমান ছিল, যা এর নামকরণ দ্বারাই প্রতীয়মান হয়। এ মহান বুজুর্গ ১২৫৬ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

৩. মাওলানা হাফিয আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (র.) ঃ তিনি একজন উচ্চস্তরের মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। তিনি আল ফতোয়াল ইয়ামানিয়্যা ফিল আহকামিস্ সামানিয়্যা, মুফীদুল মুফতি এবং আন্ নাওয়াদিরুল মুনীফা ফী মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফা ইত্যাদি গ্রন্থাদি রচনা করে অমর অবদান রেখে গেছেন। তিনি ১৯৩৯ ইং সালে ইনতিকাল করেন।

৪. মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ (র.) ঃ তিনি একজন বিখ্যাত মুফতি ছিলেন। তিনি মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসার প্রধান মুফতি ছিলেন। আমৃত্যু তিনি ফতোয়া প্রদানের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। اَلْفَيْصَلَةُ الْجَلِيَّةُ فِيْ حُكْمِ سَجْدَةِ التَّحِيَّةِ সহ ফিক্হ্ শাস্ত্রের ওপর তিনি বহু গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেছেন। ১১৭০/৭২ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৫. মুফতি দীন মুহাম্মদ খান (র.) ঃ তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ মুফতি ছিলেন। ফতোয়া ফারাইয প্রদানের কাজে তিনি ছিলেন সুবিজ্ঞ। তিনি এ কাজেই আজীবন ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯৭৪ ইং তিনি ইনতিকাল করেন।

৬. মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.) ঃ তিনি হাদীস, তাফসীর ও ফিক্হ শাস্ত্রে একজন ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন আলিম ছিলেন। তিনি বেহেশতী জেওর সহ বহু ফিক্হী কিতাবের বঙ্গানুবাদ করেছেন। এসব তাঁর অমর কীর্তি। এ মহান বুজুর্গ ১৯৬৮ ইং সালে ইনতিকাল করেন।

৭. মুফতি আমীমুল ইহ্সান মুজাদ্দিদী বরকতী (র.) ঃ তিনি একজন বিখ্যাত মুফতি ও ফকীহ ছিলেন। কাওয়ায়িদুল ফিক্হ, আদাবুল মুফ্তী, হাদিয়্যাতুল মুসাল্লীন, তারীখে ইলমে ফিক্হ, ফিক্হুস সুনান ওয়াল আসার, লুববু উসূলিল ফিক্হ, আততাম্বীহ লিল্ ফিক্হ, মালাবুদ্দা লিল্ ফিক্হ্, তরীকায়ে হজ্জ গ্রন্থাদি তাঁর অমর অবদান। এ মহান বুজুর্গ বিশ হাজার ফতোয়ার একটি সংকলনও রেখে গেছেন, যার নাম হচ্ছে "ফতোয়ায়ে বরকতিয়্যা"। তবে এখনো তা প্রকাশিত হয়নি। ১৩৯৪ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৮. মুফতি আবদুল মুঈয (র.) ঃ তিনি লালবাগ জামিয়ার প্রধান মুফতি ছিলেন। আজীবন তিনি ফতোয়া প্রদানের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি ইংরেজি ১৯৮৪ সনে ইনতিকাল করেন।

৯. মাওলানা আবদুর রহমান (র.) ঃ তিনি একজন মুফতি ও ফকীহ ছিলেন। ফতোয়া ফারাইয প্রদান করা তাঁর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ঈমান শিক্ষা ও তালাকের মাসাইল নামে দু' খানা কিতাব লিখে তিনি ফিক্‌ শাস্ত্রে অমর অবদান রেখে যান। ইংরেজি ১৯৬৮ সানে তিনি ইনতিকাল করেন।

১০. মুফতি আবদুল ওয়াহিদ (র) ঃ তিনি বালিয়া আশরাফুল উলূম মাদরাসার প্রধান মুফতি ছিলেন। আজীব তিনি ফতোয়া ফারাইযের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। ১৪০১ বাংলা সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

১১. মুফতি মুহাম্মদ আলী (র.) ঃ তিনি বাংলাদেশের একজন প্রসিদ্ধ মুফতি ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি বিভি মাদরাসায় প্রধান মুফতির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

১২. মুফতী মুহাম্মদ ইবরাহীম (র.) ঃ তিনি একজন মুহাদ্দিস ও মুফতি ছিলেন। বিভিন্ন মাদরাসায় তিনি প্রধ মুফতির দায়িত্ব পালন করেন। ৩৭০০ ফতোয়ার এক বিরাট পাণ্ডুলিপি ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অমর কীর্তি।

১৩. মুফতি বিলায়েত হুসাইন (র.) ঃ তিনি একজন প্রসিদ্ধ মুফতি ছিলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুহাদ্দিস ও মুফ পদে নিয়োজিত থেকে হাদীস ও ফিক্‌হ চর্চায় ময়দানে অমর অবদান রেখে গেছেন।

১৪. মুফতি নূরুল হক (র.) ঃ তিনি জিরী মাদ্‌রাসার প্রধান মুফতি ছিলেন। ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর দে জোড়া খ্যাতি ছিল। তিনি ইংরেজি ১৯৮৭ সালে ইনতিকাল করেন।

ফিক্‌হের ক্রম বিকাশ এবং ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর অবদানও অনস্বীকার্য। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দীনি বিষয়ে হাজারো মৌলিক এবং অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এসব পুস্তকাদি পাঠ ক অসংখ্য পথহারা মানুষ পথের সন্ধান পাচ্ছে। এ পর্যায়ে ফিক্‌হ চর্চা এবং ফিক্‌হের ক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে পৃথি বিখ্যাত ফতোয়া গ্রন্থ ফতোয়ায়ে আলমগীরী এবং হিদায়া অনুবাদের বিষয়টি অবিস্মরণীয়। বিশেষভাবে ছয় খ প্রকাশিত ফতোয়া ও মাসাইল এবং একখণ্ডে প্রকাশিত দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম গ্রন্থ দু'টো সারা দেশে বিপুল সা জাগাতে সক্ষম হয়েছে। গ্রন্থ দু'টো দেশের বাইরেও দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ সব ফতোয়া গ্রন্থ থে বাংলা ভাষাভাষী লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাদের জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় মাসআলা মাসাইল সম্পর্কে অবগত হওয়া সুযোগ পেয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ফিক্‌হ গ্রন্থের উপর কিতাব সংকলন ও অনুবাদ করে এ ধারা এগিয়ে নিয়ে চলছেন। তাদের অবদানকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। এমনিভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়েও এ দেশে ওলামায়ে কেরাম ফিক্‌হের বিভিন্ন কিতাব অনুবাদ করছেন এবং বিষয় ভিত্তিকভাবে কিছু কিছু গ্রন্থ রচনাও করছে এগুলো তাদের অমরকীর্তি। এতেও ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রম বিকাশের ধারা এগিয়ে চলছে। ভবিষ্যতে আরো বহু ধরনে অবদান এ দেশের ওলামায়ে কেরাম রাখতে সক্ষম হবেন বলে আমরা আশা রাখি।

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ـ

যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।–(৬, ৫ সূরা তালাক)

ফিক্হ চতুষ্টয়ের সূচনা ও বিকাশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায়ই ফিক্হের সূচনা হয় যা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। তবে ফিক্হ প্রণয়ন ও সংকলনের কাজ হিজরি প্রথম শতকে শুরু হলেও তা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতকে এসে এক স্বয়ং সম্পূর্ণ শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে এবং পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। যে সব মুজতাহিদীনে কেরামের অক্লান্ত পরিশ্রমে ফিক্হ এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ লাভ করে এবং যারা জীবন ব্যাপী সাধনা করে মুসলিম জীবনের সকল দিকের জন্য ইসলামি শরিয়তের সুবিন্যাস্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান পেশ করেন, তাদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফি'ঈ (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অবদান অনবদ্য ও অবিস্মরণীয়। মূলতঃ দীনের হিফাজতের লক্ষ্যেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ জাতীয় অবিস্মরণীয় খিদমত আঞ্জাম দানের তৌওফিক ও যোগ্যতা দান করেছেন। ফিক্হ রচনা, এর প্রচারণা এবং বিকাশে তাদের যে ইখলাস, লিল্লাহিয়্যাত ও ঐকান্তিকতা ছিল, এর কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চির অমর করে রাখার নিমিত্তে তাদের ফিক্হ তথা মাযহাবকে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য কবুল করে নিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই ইমাম চতুষ্টয়ের তাকলীদ করার ওপর। অবশ্য মাযহাব চতুষ্টয় ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করার পূর্বে কিছু কাল পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ফকীহগণের মাযহাবও প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। যেমন ইমাম সুফয়ান সাওরী (র.), ইমাম হাসান বসরী (র.) ও ইমাম আওযা'ঈ (র.)-এর মাযহাব। তৎকালীন যুগে মুসলিম জনগণ তাদেরও অনুসরণ করতেন। এ তিনটি মাযহাব হিজরি তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল। এরপর তাদের মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে যায়। তা ছাড়া ইমাম আবূ সাওর (র.)-এর মাযহাবও হিজরি তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত চালু থেকে পরে বন্ধ হয়ে যায়। তবে ইমাম দাউদ যাহিরী (র.)-এর মাযহাব প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদূন (র.)-এর মতে হিজরি ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল বলে জানা যায়। এতদ্ভিন্ন ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ (র.), সুফয়ান ইবনে উয়ায়না (র.) এবং লায়স ইবনে সা'দ (র.)-এর মাযহাবও কিছু কাল পর্যন্ত চালু ছিল। পরবর্তীতে এগুলোর চর্চা এবং অনুসরণও বন্ধ হয়ে যায়। শুধু হানাফী, মালিকী, শাফি'ঈ এবং হাম্বলী এই চার মাযহাবই অবশিষ্ট থেকে যায় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা বাকি থাকবে ইনশাআল্লাহ। আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিমগণ উপরোক্ত মাযহাব চতুষ্টয়ের যে কোনো একটির অনুসরণ বা তাকলীদ করাকে অপরিহার্য বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন। (আয়িম্মায়ে আরবা'আ; ১৯,২০) ফিকহে হানাফীর উৎপত্তি ও বিকাশের ওপর যেহেতু স্বতন্ত্র শিরোনামে আলোচনা হবে তাই এখানে শুধুমাত্র ফিক্হত্রয় সম্পর্কেই আলোচনা পেশ করা হলো।

ফিক্হে মালিকী ঃ ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র.) এ ফিক্হের প্রবর্তক। মদীনা শরীফ থেকেই এ ফিক্হের সূচনা হয়। তারপর হিজাযের বিভিন্ন এলাকায় তা প্রসার লাভ করে। এরপর বস্‌রা, মিসর, আফ্রিকা, স্পেন ও সুদানে, তারপর খুরাসান, কাযবীন, আযহার, ইয়ামন, নীসাপূর, পারস্য, রোম ও সিরিয়ার শহরসমূহে এর ব্যাপক বিস্তৃতি হয়। ফকীহ্ আব্দুর রহীম ইবনে মালিক (র.) মিসরে সর্বপ্রথম ফিক্হে মালিকীর প্রচলন করেন। তারপর 'আব্দুর রহমান ইবনে কাসিম (র.)-এর ব্যাপক প্রচার করেন। সে সময় ইমাম মালিক (র.)-এর বহু শাগরিদ মিসরে বিদ্যমান থাকায় সেখানে মালিকী ফিক্হ যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে। মালিকী ফিক্হের অনুসারী আমীর এবং কাজিদের মাধ্যমেও পশ্চিম আফ্রিকায় এ মাযহাবের বিশেষ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইমাম তকী উদ্দীন সুব্কী (র.) 'আল ইকদুস্ সামীন' নামক কিতাবে লিখেন; নবম শতাব্দীতে পশ্চিমা দেশসমূহের অধিকাংশ মুসলমান ফিক্হে মালিকীর অনুসারী ছিল। স্পেনে প্রথমে ইমাম আওযা'ঈ (র.)-এর মাযহাব প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর সেখানে ফিক্হে মালিকীর প্রসার ঘটে। ইমাম মালিক (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ যিয়াদ ইবনে আবদুর রহমান, গাযী ইবনে কায়স, ইয়াহইয়া ইবনে কায়স, ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া প্রমুখ ফকীহবৃন্দ মদীনা থেকে স্পেনে এসে এখানে মালিকী মাযহাবের প্রচার ও প্রসার করেন। স্পেনের বিশিষ্ট খলীফা হিশাম ইবনে আবদুর রহমান ফিক্হে মালিকী অনুসরণ করার জন্য দেশময় নির্দেশ জারি করেন। খলীফা

হিশাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়াকে অত্যধিক ভালবাসতেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি কাজি নিয়োগ করতেন। এ ছাড়া অন্যান্য সরকারি পদে লোক নিয়োগের ব্যাপারেও তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এসব কারণে স্পেনে ফিক্হে মালিকীর সম্প্রসার ঘটে খুব বেশি। — (ফাতোয়া ও মাসাইল; পৃঃ ৮৫-৮৬)

ফিকহে শাফি'ঈ ঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস শাফি'ঈ (র.) হলেন এ ফিক্হের প্রবর্তক। মিসরে এ ফিকহের সূচনা হয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর অধিকাংশ ছাত্রই ছিলেন মিসরীয়। এরপর ইরাকেও এর বিকাশ ঘটে। হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে হিজায, বাগদাদ, খুরাসান, সিরিয়া, ইয়ামন, মাওয়ারাউন নাহার, পারস্য, ভারত, আফ্রিকা এবং স্পেন পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়ে এসব জায়গার কোথাও কোথাও ফিক্হে শাফি'ঈর ব্যাপক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে গমন করেন এবং সেখানে ফিক্হের দরস প্রদান করেন। তিনি যখন যেখানে গমন করেছেন তখন থেকে সেখানে শাফি'ঈ মাযহাবের বিস্তৃতি ঘটেছে। সিরিয়ায় প্রথমে ইমাম আওযা'ঈ (র.)-এর মাযহাব চালু ছিল। কিন্তু ইমাম আবূ যুর'আ মুহাম্মদ ইবনে ওসমান দামেশ্কী (র.) যখন দামেশ্কের কাজি হন তখন তিনি সেখানে ফিকহে শাফি'ঈ চালু করেন। তারপর অন্যান্য কাজিগণও এ ফিক্হ গ্রহণ করেন। আবূ যুর'আ দামেশ্কীর কৌশল ছিল, কোনো আলিম শাফি'ঈ মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল মুখ্তাসার লিল মুযানী মুখস্থ করলে তাকে এক দীনার পুরস্কার দিতেন। আল্লামা মাকদেসী (র.) লিখেন, হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে সিরিয়ায় শাফি'ঈ মাযহাব ব্যতীত কোনো মাযহাবেরই প্রচলন ছিল না। ইমাম সুবকী (র.) "তাবাকাতুশ্ শাফিইয়্যা" নামক গ্রন্থে লিখেন; মাওয়ারাউন্ নাহার এলাকায় মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) শেখ সা'দী (র.)-এর সহযোগিতায় ফিক্হে শাফি'ঈর প্রচার করেন। আল্লামা মাকদেসী (র.) বলেন, প্রাচ্যের দেশ তথা কাওর, শাশ, আবলাক, তুস ও ফাসা ইত্যাদি স্থানে শাফি'ঈ মাযহাবের প্রাধান্য ছিল। সারাখস, নীসাপুর ও মারু এলাকায়ও শাফি'ঈ মাযহাবের প্রচলন ছিল। ইসফারাইন এলাকায় আবূ বারযা ইয়াকূব ইবনে ইসহাক নীশাপুরী (র.) শাফি'ঈ মাযহাব এবং এ মাযহাবের কিতাবাদী প্রচলন করেন। বাগদাদে হানাফী মাযহাবের প্রচলন ছিল, ইমাম শাফি'ঈ (র.) সেখানে গিয়ে স্বীয় মাযহাবের প্রচার করেন। ইমাম সুবকী (র.) বর্ণনা করেন, আরবের তিহামা অঞ্চলে শাফি'ঈ মাযহাব প্রচলিত ছিল। আল্লামা ইবনে আসীর (র) বলেন, আফ্রিকায় ইয়াকূব ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুল মু'মিন তাঁর শাসন আমলের শেষভাগে শাফিঈ মাযহাবের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী লোকদেকে কাজি পদে নিয়োগ দান করেন। — (আইম্মায়ে আরবা'আ ;পৃঃ ২৭)

ফিক্হে হাম্বলী ঃ এ ফিক্হের প্রবর্তক হলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)। বাগদাদ ছিল এ ফিক্হের কেন্দ্র। এই ফিক্হের প্রচার উপরোক্ত ফিক্হ দু'টির তুলনায় কিছুটা কম ছিল। আল্লামা ইবনে খালদুন (র.)-এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, ফিকহে হাম্বলীতে ইজতিহাদের ব্যবহার ছিল খুব কম। এ মাযহাবের মাসআলা মাসাইল নিরূপণে ম'শিরী হাদীস এবং নুসূসের ওপরই অধিকতর নির্ভর করা হতো। হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী যে সকল ফকীহ ইরাক ও সিরিয়ায় অবস্থান করতেন তারা সকলেই হাদীস বর্ণনায় ছিলেন অগ্রগামী। হাম্বলী মাযহাব বাগদাদ অতিক্রম করে সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকায়ও তা সম্প্রসারিত হয়েছিল। এমনকি সপ্তম শতাব্দীর পর সিরিয়ায় হাম্বলী মাযহাবেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাম সুয়ূতী (র.)-এর বর্ণনা অনুসারে বুঝা যায় যে, চতুর্থ শতাব্দীতে বাগদাদ এবং ইরাকের সীমা অতিক্রম করে অন্যান্য দেশেও হাম্বলী মাযহাব প্রসার লাভ করে। শায়খ আবদুল গনী মাকদেসী (র.) মিসরে সর্বপ্রথম এ মাযহাব প্রচলন করেন। তিনি বলেন, চতুর্থ শতাব্দীতে বসরা, দায়লাম, বিহার, খুজিস্তান ইত্যাদি এলাকায়ও হাম্বলী মাযহাব বিদ্যমান ছিল। আল্লামা ইবনে আসীর (র.) ৩২৩ হিজরির এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করেন যে, সে সময় বাগদাদে হাম্বলী মাযহাবের এত অধিক প্রভাব ছিল যে, এ মাযহাবের অনুসারী ফকীহ্ ওলামায়ে কেরাম যদি আমীর ওমারাদের বাড়িতে নবীয শরাব ইত্যাদি পেতেন তাহলে তারা তা ফেলে দিতেন, নর্তকী ও গায়িকাদের প্রহার করতেন, বাদ্যযন্ত্র পেলে তা ভেঙ্গে চুরমার করে দিতেন। শরিয়ত বিরোধী কাজের ব্যাপারে তাঁদের এ কঠোর নীতির ফলে রাজা-বাদশাহ এবং সাধারণ জনগণও তাঁদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে ক্ষেপে যায়। এতে ফিক্হে হাম্বলী প্রচারে ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিরাট বাধার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। আল্লামা ইবনে তায়মিয়া ও ইবনে কায়্যিম (র.) এ মাযহাবের বিরাট স্তম্ভ। তাঁদের মাধ্যমেই এ ফিক্হের প্রসার ঘটেছে খুব বেশি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ঃ জীবন ও সাধনা

হানাফী, মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলী এই চার মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হলেন মুজতাহিদুকুল শিরোমণি এবং সমস্ত ইমামগণেরও ইমাম। তাঁর নাম নু'মান এবং উপনাম আবূ হানীফা। এই নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সাবিত।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা বিখ্যাত ইলম নগরী কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও প্রসিদ্ধ মতে উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসন আমলে ৮০ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত গবেষক আল্লামা যাহিদ আল কাওসারী (র.) -এর মতে, ৭০ হিজরি সনে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জন্ম এবং বিভিন্ন উদ্ধৃতির দ্বারা তিনি একে প্রাধান্য দিয়েছেন। –(আস্‌সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা; পৃঃ ৪০১)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) অসাধারণ মেধাশক্তি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি ইলমে কালাম শিক্ষা লাভ করেন। তিনি এ বিষয়ে এত গভীর পারদর্শিতা লাভ করেন যে, লোকেরা তাঁর প্রতি ইশারা করে বলতো, তিনি হলেন ইলমে কালামের শ্রেষ্ঠ ইমাম। সে সময়ের যিন্দীক, নাস্তিক ও বাতিল আকীদাপন্থীদের বিরুদ্ধে মুনাযারা করে তিনি অত্যন্ত সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর নিজের বক্তব্য–"শুধুমাত্র মুনাযারা ও বাহাসের উদ্দেশ্যে আমাকে বিশ বার বাসরায় গমন করতে হয়েছে। কোনো কোনো সময় পূর্ণ এক বছর আবার কোনো সময় এক বছরের কম বসরায় অবস্থান করতে হয়েছে। এ সময় ইলমে কালামই ছিল আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। একেই দীন ও শরিয়তের মৌলিক জ্ঞান বলে আমি মনে করতাম। এরপর আমি ভেবে-চিন্তে দেখলাম যে, সাহাবায়ে কেরাম আমাদের তুলনায় দীন ও শরিয়তের ব্যাপারে অধিক ইলম ও অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন। তথাপিও তারা তর্ক-বিতর্ক এবং বাহাস-মুবাহাসায় লিপ্ত হননি, বরং দীনের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ককে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। তারা তো শরিয়তের ফিক্হী মাসআলা-মাসাইল ও আহকামের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। আর এ জন্য তাঁরা ইলমের মজলিস কায়েম করেছিলেন। তখন আমি ইলমে কালাম বাদ দিয়ে ফিক্হ ও হাদীস শিক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করলাম।" এরপর তিনি সে যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ হাম্মাদ (র.)-এর ইলমী হালকায় শারিক হয়ে ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ্ অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। ইমাম হাম্মাদ (র.)-এর দরসের এ মজলিস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.)–এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কেননা হাম্মাদ (র.) ইবরাহীম নাখঈ থেকে, তিনি আলকামা (র.) থেকে, আর আলকামা (র.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিক্হ শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি আঠার বছর পর্যন্ত হযরত হাম্মাদ (র.)-এর নিকট লেখাপড়া করেন। উস্তাদ হাম্মাদের ইনতিকালের পর ছাত্রগণ সর্বসম্মতিক্রমে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং কূফায় অবস্থিত এ মাদ্রাসাটির দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে তিনি ইরাকের শ্রেষ্ঠ ফকীহ হিসেবে সর্বজন কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেন। —(আল সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা; পৃঃ ৪০১)

উল্লেখ্য যে, আবূ হানীফা (র.) জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় শুধুমাত্র ইলমে কালাম শিক্ষায়ই রত ছিলেন-তা নয়; বরং এর সাথে সাথে তিনি ইলমে হাদীসও শিক্ষা করেছেন। তবে ঐ সময় তিনি ইলমে হাদীস শিক্ষার তুলনায় ইলমে কালামকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। অবশ্য ২২ বছর বয়সে পৌঁছার পর তিনি কেবলমাত্র ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিক্হ শিক্ষায় আত্ময়োগ করেন। হাম্মাদ (র.)-এর সাহচর্যে থাকাকালে দরসের অবশিষ্ট সময়ে তিনি বিভিন্ন মুহাদ্দিসের খিদমতে হাজির হয়ে হাদীস শিক্ষা লাভ করতেন। তা ছাড়া সেকালের ইলমী মারকায বসরা, মক্কা মুয়াযযমা ও মদীনা মুনাউওয়ারার শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম ও ইমামগণের সাথেও তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি তাঁদের সাথে বিভিন্ন ইসমী বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেন। এসব আলোচনার মাধ্যমে ইমাম আবূ হানীফা (র.) যেমনিভাবে তাঁদের থেকে ইলমী ফায়িদা হাসিল করেন অনুরূপভাবে তাঁরাও ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে যথেষ্ট উপকৃত হন। এর ফলে গোটা বিশ্বে তাঁর ইলম ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) যেসব আসাতিযায়ে কেরামের নিকট থেকে ইলম হাসিল করেছেন তাদের সংখ্যা চার হাজারের মতো। তাদের মধ্যে হাম্মাদ ইবনে আবূ সুলায়মান, আমির ইবনে শুরাহ্‌বীল, আলকামা ইবনে মারসাদ কূফী, সালামা ইবনে কুহায়ল কূফী, আতা ইবনে আবী রাবাহ মাক্কী, আদী ইবনে সাবিত আনসারী, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী, নাফি ইবনে মাওলা ইবনে ওমর মাদানী, অমর ইবনে দীনার মক্কী, আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয আল আ'রায মাদানী, মুহারিব ইবনে দিছার, মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির, সিমাক ইবনে হারব কূফী, ইয়াযীদ ইবনে সুহায়ব কূফী, আবূ যুবায়র, মুহাম্মদ মুসলিম মাক্কী (র.)। তাঁরা সকলেই যুগের সেরা ফকীহ এবং সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তৎকালীন ইমাম, ফকীহ বেং মুহাদ্দিসগণও এ কথা দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করেছেন। ইমাম বুখারী (র.)-এর বিশেষ উস্তাদ মক্কী ইবনে ইব্‌রাহীম (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্বন্ধে বলেন, كَانَ اَعْلَمَ اَهْلِ زَمَانِهٖ

"তিনি তাঁর যুগের সর্বাধিক বড় আলিম ছিলেন।"—(তাহযীবুত তাহযীব ঃ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী; পৃঃ ২৯০) উল্লেখ্য যে, সেকালে আলিম বলে মুহাদ্দিস এবং ইলম দ্বারা ইলমে হাদীসকেই বুঝানো হতো। এ হিসেবে এ কথার মর্ম এই হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) তৎকালীন যুগের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস ছিলেন।

প্রখ্যাত হাফিজে হাদীস ইয়াযীদ ইবনে হারূন (র.) যাঁর থেকে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মাঈন, আলী ইবনে মাদীনী ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেন–

اَدْرَكْتُ اَلْفَ رَجُلٍ وَكَتَبْتُ عَنْ اَكْثَرِهِمْ مَا رَأَيْتُ فِيْهِمْ اَفْقَهَ وَلَا اَوْرَعَ وَلَا اَعْلَمَ مِنْ خَمْسَةٍ اَوَّلُهُمْ اَبُوْ حَنِيْفَةَ

আমি এক হাজার মাশায়িখে হাদীসকে পেয়েছি এবং তাদের অধিকাংশের থেকেই আমি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। তন্মধ্যে পাঁচজনকে সবচেয়ে বড় ফকীহ, আলিম এবং মুত্তাকী হিসেবে পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে প্রথম ও সেরা ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)। — (তাহযীবুত তাহযীবঃ ইবনে হাজার আসকালানী (র.); ১১ খণ্ড; পৃঃ ৩৬৬-৩৬৯)

শাকীক বলখী (র.) বলেন– كَانَ الْاِمَامُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ مِنْ اَوْرَعِ النَّاسِ وَاَعْلَمِ النَّاسِ وَاَعْبَدِ النَّاسِ

ইমাম আবূ হানীফা (র.) তৎকালীন যুগের মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় পরহেযগার, সবচেয়ে বড় আলিম এবং সর্বাধিক ইবাদত গুজার ব্যক্তি ছিলেন।— (ই'লাউস সুনান; পৃঃ ৩০৯)

সুফয়ান সাওরী (র.)-এর মতে, كَانَ الْاِمَامُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ اَفْقَهَ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ

ইমাম আবূ হানীফা (র.) পৃথিবীবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিক্‌হবিদ ছিলেন।—(প্রাগুক্ত; পৃঃ ৩০৯)

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) -এর মতে, اَفْقَهُ النَّاسِ اَبُوْ حَنِيْفَةَ مَارَأَيْتُ فِى الْفِقْهِ مِثْلَهٗ

ইমাম আবূ হানীফা (র.) সমকালীন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন। ফিক্‌হ -এর মধ্যে তাঁর সমতুল্য আমি কাউকে দেখিনি।—(প্রাগুক্ত; পৃঃ ৫)

ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, اَلنَّاسُ عِيَالٌ فِى الْفِقْهِ عَلٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ

ইলমে ফিক্‌হে দুনিয়ার সমস্ত মানুষই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পরিজনতুল্য।

—(মুকাদ্দিমায়ে ই'লাউস্ সুনান; পৃঃ ৩১৩)

এভাবে বহু ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ইলম, ফিক্‌হ ও পরহেযগারীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

হাফিজ যাহবী, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী, হাফিয ইরাকী, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম তাবারী, আল্লামা সুয়ূতী, খতীবে বাগদাদী, হাফিয ইবনুল জাওযী, আল্লামা নববী, আল্লামা কাসতালানী এবং আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) প্রমুখ ইমামুল হাদীস ওলামা ও মাশায়িখে কেরামের মতে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ছিলেন একজন তাবি'ঈ। তিনি হযরত আনাস (রা.)-কে দেখেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাবয়ীযুস্ সহীফা (تَبْيِيْضُ الصَّحِيْفَةِ) গ্রন্থে দলিলের ভিত্তিতে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা, হযরত আনাস (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা, আবদুল্লাহ ইবনে হারিস, আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স, ওয়াসিলা ইবনে

আসকা, আয়িশা বিন্তে আজরাদ (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে সরাসরি হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাবয়ীযুস সাহীফা গ্রন্থে আবূ মা'শার (র.) থেকে বর্ণিত আছে– أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন, হাদীসটি সহীহ। আবূ নু'আয়ম ইস্পাহানী (র.) (حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ গ্রন্থের লেখক) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা হযরত আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ও আবদুল্লাহ ইবনে আওফা (র.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। (লিসানুল মীযান) ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন (র.) বলেন–

إِنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ صَاحِبُ الرَّأْيِ سَمِعَ عَائِشَةَ بِنْتَ عَجْرَدٍ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَكْثَرُ جُنْدِ اللّٰهِ فِى الْأَرْضِ الْجَرَادُ لَا أَكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ -

আল্লামা আবূ মা'শার আবদুল করীম (র.) বলেন, ইমাম আ'যম (র.) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ এবং হযরত মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকেও হাদীস শ্রবণ করেছেন। কাজেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) একজন তাবি'ঈ এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য।—(দরসে তিরমিযী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৯২-৯৩)

তাকওয়া, পরহেযগারী, ইবাদত-বন্দেগী এবং চারিত্রিক গুণাবলিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। একদা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) খলীফা হারুনুর রশীদের সামনে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) অত্যন্ত পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সর্বদা নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকতেন। তাঁর নিকট কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তা জানা থাকলে তিনি তার উত্তর দিতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ও দয়ালু। জাগতিক শানশওকত ও জাঁকজমক তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না। অন্যের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হতে তিনি সব সময় বিরত থাকতেন। পরোপকার, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, সাধুতা, ধৈর্য, সংযম, মায়ের খিদমত ও উস্তাদের প্রতি ভক্তি ইত্যাদি বহু গুণাবলির তিনি অধিকারী ছিলেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রধানতম উস্তাদ হাম্মাদ ইবনে আবূ সুলায়মান (র.)-এর ইনতিকালের পর ইমাম আ'যম (র.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করার পর প্রথমত তিনি স্বীয় উস্তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে হালকায়ে দরস কায়েম করতে ইতস্তত করছিলেন। পরে তিনি একদা স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর খনন করছেন। এতে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তারপর বসরা গমন করে এক ব্যক্তির মাধ্যমে মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.)-এর নিকট এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, স্বপ্নদ্রষ্টা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস ভাণ্ডার বিকশিত করবেন। এরপর থেকে ইমাম সাহেব প্রসন্ন মনে ফিকহ ও ফতোয়ার দরস দিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর দরস-তাদ্‌রীসের সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে আলিমগণ তাঁর দরসে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। মক্কা, মদীনা, দামেস্ক, বসরা, মুসিল, মিসর, ইয়ামন, বাহরাইন, কূফা, বাগদাদ, জাযীরা এবং রাশিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে হাদীস ও ফিক্‌হ-এর শিক্ষা লাভ করতে আরম্ভ করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বহুসংখ্যক ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং কাজি ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে কাজি আবূ ইউসুফ, ইয়াকূব ইবনে ইব্‌রাহীম, মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী, যাফর ইবনে হুযায়ল আম্বরী, হাসান ইবনে যিয়াদ, হাজাম ইবনে আবদুল্লাহ বলখী, মুগীরা ইবনে মিকসাম, যাকারিয়া ইবনে আবূ যায়দা, মিস'আর ইবনে কুদাম, সুফয়ান সাওরী, মালিক ইবনে মিগওয়াল, ইউনুস ইবনে আবূ ইসহাক, হাসান ইবনে সালিহ, আবূ বকর ইবনে আয়্যাশ, ঈসা ইবনে ইউনুস, আলী ইবনে মুসহির, হাফস ইবনে গিয়াস, আবূ আসিম নাবীল, জারীর ইবনে আবদুল হামীদ, আদুল্লাহ ইবনে মুবারক, ওয়াকী ইবনে জাররাহ, আবূ ইসহাক ফাযারী, ইয়াযীদ ইবনে হারুন, মক্কী ইবনে ইব্‌রাহীম, আবদুর রহমান মুকরী, ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়ামান (র.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইলমে হাদীসেও বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে নির্বাচন করে তিনি কিতাবুল আসার (كِتَابُ الْآثَارِ) ফিকহী তারতীব অনুসারে বিন্যস্ত করেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর মতে এটিই এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কিতাব।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুল আযীয দারাওয়ার্দী (র.) বলেন–

كَانَ مَالِكٌ يَنْظُرُ فِي كُتُبِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَيَنْتَفِعُ بِهَا

ইমাম মালিক (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক প্রণীত কিতাবসমূহ দেখতেন এবং এর দ্বারা তিনি উপকৃত হতেন। এ থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক প্রণীত এ কিতাব মুআত্তা মালিক -এর পূর্বে সংকলিত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জনৈক শিষ্যের মতে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থে সত্তর হাজার হাদীসের সন্ধান পাওয়া যায়। —[দরসে তিরমিযী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৯৮]

ইমাম আ'যম (র.) যদিও ইলমে কালাম, ইলমে হাদীস এবং ইলমে ফিক্‌হ ইত্যাদি সব বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন, তবে তিনি তাঁর জীবনকে ফিক্‌হ-এর খিদমতেই উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এ জন্যই তাকে আহলুর রায় বলা হতো। আহলুর রায় মানে ফিক্‌হ শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তি। ফিক্‌হী ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তার মূলনীতি কি ছিল? এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি ফিকহী বিষয়ে প্রথমত কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন থেকে হুকুম গ্রহণ করি। যদি কিতাবুল্লাহর মধ্যে সে সম্পর্কে হুকুম না পাই তবে সুন্নত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীস থেকে হুকুম গ্রহণ করি। আর যদি কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূলুল্লাহ হতে সে হুকুম না পাই তবে সাহাবীগণের মধ্যে যার কথা গ্রহণযোগ্য মনে করি তার কথা গ্রহণ করি। তাঁদের মতামত বর্তমান থাকতে তা প্রত্যাখ্যান করে অন্য কারো মতামত গ্রহণ করি না। যখন সাহাবীদের কোনো অভিমত না পাওয়া যায় এবং মাসআলার সিদ্ধান্ত ইব্‌রাহীম নাখ'ঈ, শা'বী, ইবনে সীরীন, হাসান, আতা, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (র.) প্রমুখ ফকীহগণের ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল হয়, তখন আমিও ইজতিহাদ করি, যেমন তাঁরা ইজতিহাদ করেন।"

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ইজতিহাদের পদ্ধতি এই ছিল, যে সব বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের কোনো অভিমত পাওয়া যেতো না সে সব বিষয়ে তিনি কিয়াস করতেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলতেন, আমার প্রকাশিত মতের খেলাফ কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে হাদীসকে গ্রহণ করবে এবং জেনে রাখবে যে, এটাই আমার মত। ইমাম আযম (র.) শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে সকল বিষয়ের সমাধান কল্পে প্রখ্যাত চল্লিশ জন ফকীহ -এর সমন্বয়ে ইলমে ফিক্‌হের একটি মজলিস (আল-মাজমাউল ফিক্‌হী) গঠন করেছিলেন। এই মজলিস সর্বসম্মতভাবে যা সিদ্ধান্ত দিতো তা লিপিবদ্ধ করা হতো। কোনো বিষয়ে তাঁদের একজনও যদি ভিন্নমত পোষণ করতেন তবে তিন দিন পর্যন্ত সে বিষয়ের উপর আলোচনা করা হতো। এরপর ঐকমত্যে পৌছতে পারলে তা লিপিবদ্ধ করা হতো। কথিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এসব মজলিস থেকে ৬০ হাজার, কারো মতে ৮৩ হাজার আবার কারো মতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উদ্ভাবিত ও সংকলিত মাসাইলের সংখ্যা পাঁচ লক্ষে গিয়ে পৌছেছে।—(জামিউল মাসাইল; পৃঃ ৩৫) আইন সংক্রান্ত সমস্যার শরয়ী ফয়সালা প্রদান করা হয় এবং এগুলো তাঁর জীবদ্দশায়ই বিভিন্ন শিরোনামে সংগৃহীত হয়েছিল।

ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুসারীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। তিনি তৎকালীন শাসকবর্গ কর্তৃক অমানুষিকভাবে নির্যাতনের শিকার হন। উমাইয়া এবং আব্বাসীয় শাসনামলে দু'বার তাঁকে বিচারকের পদ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এতে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন। ফলে তাঁকে দু'বার জেলখানায় অন্তরীণ জীবনযাপন করতে হয়। তারপরও তিনি ঐ পদ গ্রহণ না করায় কারাগারেই তাঁকে বিষপান করানো হয়। এর ফলে তিনি ১৫০ হিজরি সনে কারাগারেই ইনতিকাল করেন। বাগদাদের খিযরান নামক কবরস্থানের পূর্বপার্শ্বে মসজিদ সংলগ্ন স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

ফিকহে হানাফীর উৎপত্তি ও বিকাশ

ইসলামে যে চারটি মাযহাব প্রচলিত আছে এর মধ্যে হানাফী মাযহাব বা ফিক্‌হে হানাফীই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইমাম আ'যম ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইবনে সাবিত (র.) হলেন এ মাযহাবের প্রবর্তক। তাঁর নামানুসারে এ মাযাহাবের নামকরণ করা হয় হানাফী মাযহাব বা ফিক্‌হে হানাফী করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের নিকট এ মাযহাবই সর্বাধিক সমাদৃত। এ মাযহাব অধিকভাবে প্রসার লাভ করার কারণ হলো, এ মাযহাবের প্রবক্তা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ছিলেন মুজতাহিদ কুল শিরোমনি। সর্বোপরি অনেক মুজতাহিদ নিজে মাযহাব প্রবর্তন না করে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের অনুসরণ করেছেন, এটিও এ মাযহাবের প্রসার ও প্রচারের অন্যতম কারণ।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পূর্ববর্তী যুগে "ফিক্‌হ" কোনো স্বতন্ত্র ও বিন্যস্ত শাস্ত্র হিসাবে ছিল না। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেছেন, اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ فِى الْفِقْهِ সমগ্র মানবজাতি ফিক্‌হে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সন্তান তুল্য। —[আসরুল ফিক্‌হিল ইসলামী; পৃঃ ২২৩]

আল্লামা মুওয়াফ্‌ফিক (مُوَفَّقْ) (র.) বলেন,

وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) اَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ عِلْمَ هٰذِهِ الشَّرِيْعَةِ لَمْ يَسْبِقْهُ اَحَدٌ مِمَّنْ قَبْلَهُ

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ই সর্বপ্রথম এই শরিয়তের ইলম তথা ইলমে ফিক্‌হ সংকলন করেন। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ফকীহদের কেউই তাঁকে পেছনে ফেলতে সক্ষম হয়নি।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন,

اِنَّهُ اَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ عِلْمَ الشَّرِيْعَةِ وَرَتَّبَهَا اَبْوَابًا ثُمَّ تَبِعَهُ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَلَمْ يَسْبِقْ اَبَا حَنِيْفَةَ اَحَدٌ ـ

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ই সর্বপ্রথম এই ইলমে শরিয়ত তথা ইলমে ফিক্‌হ সংকলন এবং তা অধ্যায় হিসাবে বিন্যস্ত করেন। তারপর এ পথে তাঁর অনুসরণ করেন ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র.)। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে কেউ এ বিষয়ে পেছনে ফেলতে পারেনি।

আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী (র.) বলেন,

اِنَّهُ اَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ عِلْمَ الْفِقْهِ وَ رَتَّبَهُ اَبْوَابًا وَكَتَبَ عَلٰى نَحْوِ مَا هُوَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ই সর্বপ্রথম ইলমে ফিক্‌হ সংকলন করেন এবং একে অধ্যায় হিসাবে বিন্যস্ত করেন। আর বর্তমানে ফিক্‌হ যেভাবে আছে তিনিই এভাবে তা লেখার ব্যবস্থা করেন।

[মানাকিবে মুওয়াফ্‌ফিক ২য় খণ্ড; পৃঃ ১৩৬, তাবযীয়ুস সাহীফা; পৃঃ ৩৬, আল খায়রাতুল হিসান; পৃঃ ২৮ আসারুত তাশরী; পৃঃ ২২৪]

ইমাম আবূ হানীফা (র.) মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমূহ সমস্যার সমাধান কল্পে দীর্ঘ বাইশ বছর কাল পর্যন্ত এ ব্যাপারে সাধনা করেন এবং তাঁর সুযোগ্য ও বিশিষ্ট ছাত্রদের নিয়ে চল্লিশ সদস্যের একটি "ফিক্‌হী বোর্ড" গঠন করে কুরআন, হাদীস, ইজমায়ে সাহাবা, ফাতাওয়ায়ে সাহাবা এবং কিয়াসের মাধ্যমে ব্যাপক গবেষণা করে বিষয়ভিত্তিক ভাবে ফিক্‌হের এক বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তোলেন। যা ইলমে ফিক্‌হ নামে পরিচিতি ও সুবিদিত।

ইমাম তাহাভী মিসরী (র.) মুত্তাসিল সনদে আসাদ ইবনে ফুরাত (ইমাম মালিক (র.)-এর ছাত্র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ফিক্‌হী বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল চল্লিশ। শায়খ আবদুল কাদির কুরাশী (র.) তাঁদের নাম اَلْجَوَاهِرُ الْمُضِيْئَةُ গ্রন্থে এ ভাবে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করেছেন—

(১) ইমাম যুফার (র.) (মৃ. ১৫৮ হি.), (২) ইমাম মালিক ইবনে মিগওয়াল (র.) (মৃ. ১৫৯ হি.), (৩) ইমাম মালিক ইবনে নাযীর তা'ঈ (র.) (মৃ. ১৬০ হি.), (৪) ইমাম মিনদাল ইবনে আলী (র.) (মৃ. ১৬৮ হি.), (৫) ইমাম নয়ম ইবনে আবদুল করীম (র.) (মৃ. ১৬৯ হি.), (৬) ইমাম আম্মার ইবনে মায়মূন (র.) (মৃ. ১৭১ হি.), (৭) ইমাম

হিব্বান ইবনে আলী (র.) (মৃ. ১৭২ হি.), (৮) ইমাম আবূ ইসমা (র.) (মৃ. ১৭৩ হি.), (৯) ইমাম যুহায়র ইবনে মু'আবিয়া (র.) (মৃ. ১৭৩ হি.), (১০) ইমাম কাসিম ইবনে মা'আন (র.) (মৃ. ১৭৫ হি.), (১১) ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবূ হানীফা (র.) (মৃ. ১৭৬ হি.), (১২) ইমাম সায়্যাজ ইবনে বিসতাম (র.) (মৃ. ১৭৭ হি.), (১৩) ইমাম শরীক ইবনে আবদুল্লাহ (র.) (মৃ. ১৭৮), (১৪) ইমাম 'আফিয়া ইবনে ইয়াযীদ (র.) (মৃ. ১৮০ হি.), (১৫) ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) (মৃ. ১৮১ হি.), (১৬) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) (মৃত ১৮২), (১৭) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নূহ (র.) (মৃঃ ১৮৩), (১৮) ইমাম হায়সাম ইবনে বশীর (র.) মৃ. ১৮৩ হি.), (১৯) ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়্যা (র.) (মৃ. ১৮৪ হি.) (২০) ইমাম ফুযায়ল ইবনে ইয়ায (র.) (মৃ. ১৮৭ হি.), (২১) ইমাম আসাদ ইবনে ওমর (র.) (মৃ. ১৮৮ হি.), (২২) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (র.) (মৃ. ১৮৯ হি.), (২৩) ইমাম আলী ইবনে মুসহির (র.) (মৃ. ১৮৯ হি.), (২৪) ইমাম ইউসুফ ইবনে খালিদ (র.) (মৃ. ১৮৯ হি.), (২৫) ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস (র.) (মৃ. ১৯২ হি.), (২৬) ইমাম ফযল ইবনে মূসা (র.) (মৃ. ১৯২ হি.), (২৭) ইমাম আলী ইবনে যিবয়ান (র.) (মৃ. ১৯২হি.), (২৮) ইমাম হাফ্‌স ইবনে গিয়াস (রঃ) (মৃ. ১৯৪ হি.), (২৯) ইমাম অকী' ইবনে জাররাহ (র.) (মৃ. ১৯৭ হি.), (৩০) ইমাম হিশাম ইবনে ইউসুফ (র.) (মৃ. ১৯৭ হি.), (৩১) ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান (র.) (মৃ. ১৯৮ হি.), (৩২) ইমাম শুআয়ব ইবনে ইসহাক (র.) (মৃ. ১৯৮ হি.), (৩৩) ইমাম আবূ হাফস ইবনে আবদুর রহমান (র.) (মৃ. ১৯৯ হি.), (৩৪) ইমাম আবূ মূতী বলখী (র.) (মৃ. ১৯৯ হি.), (৩৫) ইমাম খালিদ ইবনে সুলায়মান (র.) (মৃ. ১৯৯ হি.), (৩৬) ইমাম আবদুল হামীদ (র.) (মৃ. ২০৩ হি.), (৩৭) ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) (মৃ. ২০৪ হি.), (৩৮) ইমাম আবূ আসিম নাবীল (র.) (মৃ. ২১২ হি.), (৩৯) ইমাম হাম্মাদ ইবনে দলীল (র.) (মৃ. ২১৫ হি.), (৪০) ইমাম মক্কী ইবনে ইব্‌রাহীম (র.) (মৃ.২১৫ হি.)।

তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম যুফার (র.), ইমাম দাউদ তায়ী (র.), ইমাম আসাদ ইবনে ওমর (র.), ইমাম ইউসুফ ইবনে খালিদ তামীমী (র.) এবং ইমাম ইয়াহ্ইয়া যায়িদা (র.)। লেখার দায়িত্ব ছিল হযরত ইয়াহইয়া (র.)-এর উপর। তিনি দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত এ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। — [আসারুল ফিক্‌হিল ইসলামী; পৃঃ ২০৯-২১০]

এ মজলিসে সর্বসম্মতভাবে যা সিদ্ধান্ত হতো তাই লিপিবদ্ধ করা হতো। তাঁদের মধ্য থেকে একজনও যদি ভিন্ন মত পোষণ করতেন তাহলে তিন দিন পর্যন্ত সে বিষয়ের উপর আলোচনা হতো। এরপর ঐকমত্যে পৌঁছলে তা লিপিবদ্ধ করা হতো। কাজেই বলা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতিষ্ঠিত এ ফিক্‌হী বোর্ডের তত্ত্বাবধানে যে সব ফিক্‌হী মাসাইল লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা কারো ব্যক্তিমত ফিক্‌হ ছিল না; বরং এ ছিল মূলত; এক شُوْرَائِىْ فِقْه (পরামর্শ ভিত্তিক রচিত ও সংকলিত ফিক্‌হ)। যদিও সদরে মজলিস (صَدْرِ مَجْلِسْ) -এর দিকে সম্বোধন করে আমরা এর তাকলীদ করাকেও তাকলীদে শাখসী হিসাবে অভিহিত করে থাকি।—(সীরাতুন নু'মান; পৃঃ ১৬৪) এ সম্পর্কে সদরুল আয়িম্মা আল্লামা মুওয়াফ্‌ফাক (র.) বলেন,

فَوَضَعَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) مَذْهَبَهُ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ لَمْ يَسْتَبِدَّ فِيْهِ بِنَفْسِهِ دُوْنَهُمْ اِجْتِهَادًا مِنْهُ فِى الدِّيْنِ وَمُبَالَغَةً فِى النَّصِيْحَةِ لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَكَانَ يُلْقِىْ مَسْئَلَةً مَسْئَلَةً وَيَسْمَعُ مَاعِنْدَ هُمْ وَ يَقُوْلُ مَا عِنْدَهُ وَيُنَاظِرُهُمْ شَهْرًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ حَتّٰى يَسْتَقِرَّ اَحَدُ الْاَقْوَالِ فِيْهَا ثُمَّ يُثْبِتُهَا اَبُوْ يُوْسُفَ فِى الْاُصُوْلِ حَتّٰى اُثْبِتَ الْاُصُوْلُ كُلُّهَا ـ

অর্থাৎ আবূ হানীফা (র.) তাঁর মাযহাব তথা ফিক্‌হী চিন্তাধারা পরস্পর আলোচনা ও পরামর্শের উপর ভিত্তি করে রচনা করেন। মজলিসে শুরার সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে তিনি নিজের একান্ত মতে কিছুই করেননি। দীনি বিষয়ে ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহ, রাসূল এবং মু'মিনদের কল্যাণ কামনার্থেই তিনি এ নীতি অবলম্বন করেছিলেন। ফিক্‌হী বোর্ডের সামনে তিনি এক একটি মাসআলা করে পেশ করতেন, সদস্যদের মতামত ও প্রমাণাদি

শুনতেন এবং সব শেষে নিজের দলিল এবং যুক্তিসমূহ পেশ করতেন। এ ভাবে এক এক মাসআলার উপর মাসব্যাপী বা এর চেয়েও বেশি সময় পর্যন্ত তিনি বোর্ড সদস্যদের সাথে মুনাযারা বা বাহাছ করতেন। পরিশেষে কোনো একটি অভিমতের উপর বোর্ড সদস্যগণ একমত হলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) তা কপিতে লিপিবদ্ধ করতেন। এভাবে ফিক্‌হে হানাফী লিপিবদ্ধ হয়। — [মানাকিবে মুওয়াফ্‌ফাক; ২য় খণ্ড; পৃঃ ১৩৩]

ফিক্‌হী মাসআলা লিপিবদ্ধকরণে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুসৃত নীতি কি ছিল, এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেন,

إِذَا جَاءَنَا الْحَدِيْثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَأْخُذُ بِهِ وَإِذَا جَاءَنَا مِنَ الصَّحَابَةِ تَخَيَّرْنَا وَإِذَا جَاءَنَا عَنِ التَّابِعِيْنَ زَاحَمْنَاهُمْ.

নবী করীম ﷺ-এর কোনো হাদীস আমাদের নিকট পৌছলে আমরা তা গ্রহণ করে সে মুতাবিক ফয়সালা করি; যদি আমাদের কাছে সাহাবায়ে কেরামের রিওয়ায়তে পৌছে তাঁবে আমরা এ সব বর্ণনাসমূহের মধ্যে কোনো একটি গ্রহণ করে থাকি। আর আমাদের কাছে তাবিঈনে কেরামের বর্ণনা পৌছলে আমরা এর মোকাবেলায় নিজেদের অভিমত পেশ করি অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আমরা ইজতিহাদের পথ অবলম্বন করি। — [আল ইনতিকা; পৃঃ ১৪১]

তিনি আরো বলেন,

آخُذُ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَمَا لَمْ أَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْآثَارِ الصِّحَاحِ عَنْهُ الَّتِيْ فَشَتْ فِيْ أَيْدِي الثِّقَاتِ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فَبِقَوْلِ أَصْحَابِهِ آخُذُ بِقَوْلِ مَنْ شِئْتُ وَأَدَعُ قَوْلَ مَنْ شِئْتُ وَأَمَّا إِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَالْعَطَاءِ فَأَجْتَهِدُ كَمَا اجْتَهَدُوْا.

আমি কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন মাজীদ থেকে দলিল প্রমাণ গ্রহণ করতাম। কুরআন মাজীদে দলিল প্রমাণ না পেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস এবং সহীহ আসার -যা নির্ভরযোগ্য রাবীর সূত্রে মানুষের কাছে পৌছেছে সে মুতাবিক ফয়সালা করতাম। এতেও না পেলে সাহাবীগণের যে কোনো একজনের অভিমত অনুসারে ফয়সালা করতাম। বিষয়টি ইব্‌রাহীমে নাখঈ, শা'বী, হাসান বসরী ও আতা পর্যন্ত গিয়ে পৌছলে তাঁরা যেমন ইজতিহাদ করেছেন তখন আমিও তাঁদের অনুরূপ ইজতিহাদ করি। — [আল মানাকিব আল্লামা যাহবী; পৃঃ ২০]

এতে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর নিজের ও নিজের আসাতিযায়ে কেরামের রায়ের উপর সর্বদাই হাদীস এবং আসারে সাহাবাকে-অগ্রাধিকার দিতেন। হাদীস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় দীনের কোনো বিষয়ে নিজের রায় প্রকাশ করা এবং সে মতে ফতোওয়া দেওয়া তিনি জায়েজ মনে করতেন না।

ইমাম আযম (র.) বলতেন,

لَمْ تَزَلِ النَّاسُ فِيْ صَلَاحٍ مَادَامَ فِيْهِمْ مَنْ يَطْلُبُ الْحَدِيْثَ فَإِذَا طَلَبُوا الْعِلْمَ بِلَاحَدِيْثٍ فَسَدُوْا.

যতদিন পর্যন্ত এ উম্মতের মধ্যে হাদীস অন্বেষণকারী লোক বাকি থাকবে ততদিন পর্যন্ত এ উম্মতের মধ্যে ফালাহ ও কল্যাণ অব্যাহত থাকবে। আর যখন লোকেরা হাদীস বিহীন ইল্‌ম তলবে লিপ্ত হবে তখন এ উম্মত ধ্বংস হয়ে যাবে। — [মীযানুল কুবরা ঃ আল্লামা শা'বানী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৫১]

তিনি আরো বলতেন, وَإِيَّاكُمْ وَالْقَوْلَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ بِالرَّأْيِ وَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ.

দীনি বিষয়ে তোমরা নিজেদের রায় অনুপাতে কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। সর্বদা সুন্নাহ তথা হাদীসকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। যে এর থেকে বাইরে চলে যাবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। — [মীযানুল কুবরা; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৫০]

দুর্বল সনদেও যদি কোনো হাদীস পাওয়া যায় তবে এটিও রায়ের ভিত্তিতে ফয়সালা দেওয়া অপেক্ষা উত্তম। একদা খলীফা আবূ জা'ফর মনসূরের নিকট কোনো এক ব্যক্তি এ মর্মে অভিযোগ করল যে, ইমাম আবূ হানীফা ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে হাদীসের কোনো পরোয়া করেন না। খলীফা এ সম্পর্কে ইমাম আ'যম (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি ভুল শুনেছেন। আমি কখনো এমন করি না। আমি সর্বাগ্রে কুরআনের উপর আমল করি। এরপর হাদীসের উপর আমল করি। এরপর আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা.)-এর ফতোয়ার

উপর, এরপর অপরাপর সাহাবীগণের ফতোয়ার উপর আমল করি। যদি কোনো এক মাসআলার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের একাধিক অভিমত থাকে তবে অনন্যোপায় হয়ে এ ক্ষেত্রে আমি কিয়াস করি এবং তাঁদের কোনো একজনের অভিমতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। —[মীযানুল কুবরা; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৫০]

যে ব্যক্তি বলে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) কিয়াসকে হাদীসের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেন, তাঁর জবাবে আল্লামা শা'রানী (র.) বলেন, এ জাতীয় কথা এমন ব্যক্তিই বলতে পারে যে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন, দীনি ব্যাপারে বে-পরোয়া এবং কথাবার্তায় অসর্তক। প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে অনবহিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ـ নিশ্চয়ই কান, চক্ষু এবং অন্তঃকরণ, এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হবে। (১৭-৩৬) এ জাতীয় সর্তকবাণী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি অন্যায় অভিযোগ করা থেকে বিরত না থাকে তবে আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যে, তাঁর হৃদয় আত্মা অন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া আর কিছু নয়। —(প্রাগুক্ত)

উল্লেখ্য যে, আল্লামা শা'রানী (র.) হানাফী মাযহাবের অনুসারী আলিম নন; বরং তিনি হচ্ছেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী আলিম। তাঁরপরও যা হক এবং সত্য, তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে তাই বলে গেছেন। মীযানুল কুবরা নামক তদীয় গ্রন্থের এক স্থানে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্বন্ধে লিখেন, একদা জনৈক ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর খিদমতে এসে বলেন, আমাকে হাদীস থেকে আলাদা করে দিন। এ কথা শুনে তিনি লোকটিকে খুব শাসালেন এবং বললেন, হাদীস না থাকলে আমাদের কোনো ব্যক্তি কুরআন মাজীদের কিছুই বুঝতে পারত না। অতঃপর ইমাম আ'যম (র.) ঐ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, বানরের গোশ্‌ত সম্পর্কে তোমার কি রায়? এর হালাল হারাম হওয়া সম্পর্কে কুরআন মাজীদে কোনো বিধান আছে কী? লোকটি একেবারে খামোশ হয়ে গেল। পরক্ষণে সে লোকটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যাপারে আপনার রায় কী? জবাবে তিনি বললেন, বানর চতুষ্পদ জন্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়, কাজেই তা হালাল হতে পারে না। —[মীযানুল কুব্‌রা; পৃঃ ১৫৮]

বাইশ বছর পর্যন্ত অক্লান্ত সাধনা ও গবেষণার ফলে এ ফিক্‌হী বোর্ডের তত্ত্বধানে ৮৩ হাজার মাসআলা সংকলিত ও সন্নিবেশিত হয়। এরপরও মাসআলার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। অবশেষে ফিক্‌হে হানাফীতে মাসাইলের সংখ্যা পাঁচ লাখে গিয়ে পৌঁছে। আল্লামা খাওয়ারিযিমী (র.) স্বীয় جَامِعُ الْمَسَائِل গ্রন্থে বলেন–

قَدْ قِيْلَ بَلَغَتْ مَسَائِلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ خَمْسَمِائَةُ أَلْفِ مَسْئَلَةٍ وَكُتُبُهُ وَكُتُبُ أَصْحَابِهِ تَدُلُّ عَلٰى ذَالِكَ ـ

বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর (উদ্ভাবিত ও লিপিবদ্ধকৃত) মাসাইলের সংখ্যা পাঁচ লক্ষে গিয়ে পৌঁছেছে। তাঁর ও তাঁর ছাত্রদের গ্রন্থরাজি এর (বক্তব্যের) প্রমাণ বহন করে। — [জামিউল মাসাইল; পৃঃ ৩৫]

ফিক্‌হে হানাফীর বিকাশ ঃ ফিক্‌হে হানাফীর বিকাশ সম্বন্ধে আলিমগণ বলেন, এ মাযহাবের উসূল ও নীতিমালা অত্যাধিক ব্যাপক। মাসাইলের সংখ্যাও প্রচুর। সব বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাসআলার সমাধান এতে রয়েছে। ফিক্‌হে হানাফীতে এমন সহজভাবে মাসআলা মাসাইল প্রণয়ন করা হয়েছে, যা মানুষের সামর্থ্য ও সাধ্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল, সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা ফিক্‌হে হানাফীকে এমনভাবে কবুল করেছেন যে, একে তিনি গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের নিকট সমাদৃত করে দিয়েছেন। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, وَاَهْلُ الرُّوْمِ وَمَاوَرَاءَ النَّهْرِ وَالْهِنْدِ حَنَفِيُّوْنَ রোম, মা-ওয়ারাউন্ নাহার এবং পাক ভারত ও বাংলাদেশের মুসলমান সকলেই হানাফী।
— [আসারুল ফিক্‌হিল ইসলামী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ২১২]

ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) লিখেন,

درجميع بلدان وجميع اقاليم بادشاہاں حنفی اند وقضاة اكثر ومدرساں واكثر عوام حنفی ـ

দেশ ও রাষ্ট্রের সমস্ত কর্ণধার রাজা বাদশাহগণ ছিলেন হানাফী, কাজি তথা বিচারপতিগণ হানাফী, শিক্ষকবৃন্দ হানাফী এমনকি অধিকাংশ জনসাধারণও ছিল হানাফী। –(کلمات طیبات মাকতূব নং ১১)

১৭০ হিজরি সনে খলীফা হারূনুর রশীদ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-কে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করলে হানাফী ফিক্‌হ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং এতে ফিক্‌হে হানাফীর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। কেননা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর প্রধান বিচারপতি হওয়ার পর আব্বাসী খিলাফতের অধীনে যত বিচারপতি ছিল সকলেই তাঁর নির্দেশ মুতাবিক বিচারকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। এমনিভাবে নতুন বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রেও তাঁর মতামতকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে তিনি ঐ সমস্ত লোকদেরকেই নির্বাচন করেছিলেন যারা ফিক্‌হের ক্ষেত্রে একই ফিক্‌হের অনুসারী ছিলেন। ফলে ফিক্‌হে হানাফী অল্প কিছু দিনের মধ্যে মুসলিম সাম্রাজ্যের গোটা অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লামা ইবনে হযম উন্দুলুসী (র.) বলেন–

مَذْهَبَانِ انْتَشَرَ فِىْ بَدْءِ اَمْرِهِمَا بِالرِّيَاسَةِ الْحَنَفِيِّ بِالْمَشْرِقِ وَالْمَالِكِىْ بِالْاَنْدُلُسْ .

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় রাষ্ট্রীয় সহায়তায় দু'টি মাযহাব গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচ্য অঞ্চলে হানাফী মাযহাব, আর উন্দুলুসে মালিকী মাযহাব। – [وفيات الاعيان ২য় খণ্ড; পৃঃ ২১৬]

ফিক্‌হে হানাফী বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হওয়ার পেছনে একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অপর দিকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাগরিদ ছিল অনেক। তাঁরা বিভিন্ন দেশ তথা ইরাক, বলখ, খুরাসান, সমরকন্দ, বুখারা, রায়, সিরাজ, তুনিস, জানজান, ইসতিরাবাদ, বুস্‌তাম, ফারগানা, খাওয়ারিযিম, ভারত ইত্যাদি স্থানসমূহে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা সর্বত্র ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব প্রচার করেন। নিজেরা এর উপর আমল করেন, লোকদেরকে এর প্রতি দাওয়াত দেন, এর উপর কিতাব রচনা করেন এবং অপরাপর মাযহাবের অনুসারীদের সাথে নিজেদের মাযহাবের যৌক্তিকতা তুলে ধরে মুনাযারা ও মুবাহাসা করেন। এতেই মৌলিকভাবে ফিক্‌হে হানাফী বিশ্বব্যাপী সামগ্রীকতা লাভ করে। — [আসারুল ফিক্‌হিল ইসলামী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ২৩০]

বসরায় ফিক্‌হে হানাফীর প্রচার ঃ বসরায় ওসমান বাত্তী (র.) ছিলেন প্রখ্যাত ফকীহ ও মুফতি। ইমাম যুফার (র.)-এর পূর্বে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ খালিদ সিমতী (র.) শিক্ষা সমাপনের পর বসরায় ফিরে যান। তিনি দরসের মজলিস কায়েম করে সেখানে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব প্রচার করতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর মজলিসে যখন তিনি ওসমান বাত্তীর মতের খিলাফ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত বর্ণনা করতেন তখন ওসমান বাত্তীর শাগরিদরা তাঁকে শুধু গালমন্দই নয় বরং প্রহার করতেও উদ্যত হতো। তাই খালিদ সিমতী (র.) সেখানে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব প্রচার করতে ব্যর্থ হন। এরপর ইমাম যুফার (র.) বসরায় গমন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান, তিনি নিজে মজলিস কায়েম না করে প্রথমে ওসমান বাত্তীর দরসে বসতে আরম্ভ করেন। ওসমান বাত্তী কোনো ব্যাপারে মাসআলা বললে তিনি বলতেন, এ ব্যাপারে আরো একটি সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ অভিমত রয়েছে। ওসমান বাত্তী (র.) তা জানতে চাইলে তিনি তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উসূল ও নীতিমালা অনুসারে বর্ণনা করতেন। শক্তিশালী প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তির কারণে ওসমান বাত্তী (র.) তা মেনে নিতে বাধ্য হতেন। ইমাম যুফার (র.) যখন বুঝতে পারতেন যে, মজলিসের সকল ছাত্র তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে তখন তিনি বলতেন, এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। তা শুনে মজলিসে অংশ গ্রহণকারীরা বলে উঠত, যে-ই বলুক না কেন এটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য অভিমত। এ কৌশল অবলম্বনে ধীরে ধীরে মজলিসের সকল ছাত্র ইমাম যুফার (র.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং বাত্তীর দরস বর্জন করে ইমাম যুফারের দরসে ভিড় জমাতে থাকেন। এভাবে সেখানে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের প্রসার ঘটে।

— [লামহাতুন নযর ফী সীরাতিল ইমাম যুফার]

পশ্চিমাদেশে হানাফী মাযহাবের প্রচার ঃ পশ্চিমা দেশ তথা আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে তারাবলুস, তিউনিস এবং আল জাযাইরে প্রাথমিক পর্যায়ে হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য ছিল না। কিন্তু যখন আসাদ ইবনে ফুরাত সেখানকার বিচারপতি নিযুক্ত হন তখন তিনি হানাফী মাযহাবের প্রচারে ব্রতী হন এবং তাঁর মাধ্যমে আফ্রিকা অঞ্চলে ফিক্‌হে হানাফীর বিপুল প্রসার ঘটে। হিজরি চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত আফ্রিকায় ফিক্‌হে হানাফীর প্রাধান্য অব্যাহত থাকে। এরপর তা ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে। উন্দুলুসেও প্রাচীন কাল থেকেই ফিক্‌হে হানাফীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এটি ইবনে ফারহূনের অভিমত। আল্লামা মাক্‌দিসী (র.)-এর মতে জাযীরা অধিবাসীরা সকলেই হানাফী মাযহাবের অনুসারী

হলেন। আল্লামা মাকদিসী পাশ্চাত্য দেশীয় কোনো এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমাদের দেশে হানাফী মাযহাবের প্রসার ঘটল কিভাবে, তোমরা তো কখনো ইরাক সফরে যাওনি? জবাবে তিনি বললেন, মালিকী মাযহাবের খ্যাত ফকীহ ওয়াহাব ইবনে ওয়াহাব (র.) যখন ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট থেকে ইলম হাসিল করে দেশে ফিরে আসেন তখন আসাদ ইবনে ফুরাত (র.) স্বীয় ব্যক্তিত্বের কারণে তাঁর নিকট থেকে ইলম হাসিল করতে লজ্জাবোধ করেন। তাই তিনি তাঁর নিকট থেকে ইল্‌ম হাসিল না করে সরাসরি ইমাম মালিক (র.)-এর দরবারে চলে যান। তখন ইমাম মালিক (র.) বেশ অসুস্থ ছিলেন। আসাদ ইবনে ফুরাত বেশ কিছু দিন তাঁর দরবারে থাকার পর তিনি তাঁকে বললেন, ওয়াহাব ইবনে ওয়াহাব-এর নিকট আমি আমার ইলম আমানত রেখেছি তুমি তাঁর নিকট চলে যাও, তাহলে তোমাকে সফরের এ কষ্টও সহ্য করার প্রয়োজন হবে না। শায়খের এ কথা মেনে নেওয়া তাঁর জন্য খুবই কঠিন ছিল। তাই তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইমাম মালিক (র.)-এর ন্যায় ইলমের অধিকারী আর কোনো আলিম আছে কী? জবাবে লোকেরা বললেন, হ্যাঁ, কূফাতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একজন নওজোয়ান শাগরিদ আছে। তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান। তিনি একজন উচ্চমানের ফকীহ্। তুমি তাঁর কাছে যেতে পার। অতঃপর আসাদ ইব্‌নে ফুরাত ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দরবারে গেলেন। তিনি তাঁকে খুব যত্নসহকারে ফিক্‌হের তালীম দিলেন। ফিক্‌হের মধ্যে তাঁর যখন বেশ ব্যুৎপত্তি হাসিল হলো তখন ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দেন। দেশে এসে তিনি ফিক্‌হের দরস দিতে আরম্ভ করলে অসংখ্য মানুষ তাঁর থেকে ফিক্‌হ লিখতে শুরু করেন। এভাবেই আফ্রিকায় হানাফী ফিক্‌হের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে।

মিসরে ফিক্‌হে হানাফীর প্রচার : খলীফা মাহদীর জমানায় মিসরে হানাফী ফিক্‌হের সূচনা হয়। যতদিন পর্যন্ত মিসরে আব্বাসী খলীফাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত সেখানে হানাফী ফিক্‌হের প্রাধান্য ছিল। তবে প্রাচ্য অঞ্চলে ফিক্‌হে হানাফীর যতটা প্রচার ছিল মিসরে এর ততটা প্রচার ছিল না এবং এ অঞ্চলে ফিক্‌হে হানাফী ততটা সর্বগ্রাহীতাও লাভ করতে পারেনি। — [اَلرَّحْمَةُ الْغَيْثِيَّةُ بِالتَّرْجَمَةِ اللَّيْثِيَّةِ ২য় খণ্ড; পৃঃ ২৪]

ডঃ আল্লামা খালিদ মাহমূদের মতে সুলতান নূরুদ্দীন (র.) একজন হানাফী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ক্ষমতার মসনদে বসার পর "মানাকিবে ইমাম আবূ হানীফা" -এর উপর কিতাব প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর মাধ্যমে সিরিয়ায় ফিক্‌হে হানাফীর প্রসার ঘটে। অতঃপর তাঁর মাধ্যমে মিসরেও এ মাযহাবের বিস্তৃতি ঘটে। এমনিভাবে এ মাযহাব মিসরীয় লোকদের নিকট সমাদৃত হতে থাকে। সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী (র.)-এর মাধ্যমেও ফিক্‌হে হানাফীর সম্প্রসারণ ঘটে। তিনি কাহেরাতে "মাদ্‌রাসায়ে সিউফিয়্যা" নামে একটি হানাফী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদরাসার মাধ্যমে ফিক্‌হে হানাফী ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে তুরস্কের ওসমানী খলীফাগণ যখন মিসর দখল করে নেন তখন তাঁরা দেশের সমস্ত আদালতে হানাফী ফকীহদের থেকেই কাজি নির্বাচিত ও মনোনীত করেন। এতে ছাত্রদের মধ্যে হানাফী ফিক্‌হ হাসিল করার আগ্রহ চরমভাবে বৃদ্ধি পায়। এ ভাবেও মিসরে ফিক্‌হে হানাফীর সম্প্রসারণ ঘটে। তখন হানাফী ফিক্‌হ অনুসারেই সমস্ত ফতোয়া ও ফয়সালা প্রদান করা হতো। এভাবে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় হানাফী মাযহাব মিসরে একটি জাতীয় মাযহাবের রূপ পরিগ্রহ করে।

— [আসারুল ফিক্‌হিল ইসলামী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ২৩৩]

সিরিয়াতে ফিক্‌হে হানাফীর প্রচার : সিরিয়াতে প্রথম থেকেই হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য ছিল। এখানকার অধিবাসী প্রায় সকলেই এ মাযহাবের অনুসারী ছিল। এখানে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলেও ফিক্‌হে হানাফীর প্রচার ও প্রসারে কোনো রূপ বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি। —(প্রাগুক্ত)

প্রাচ্য দেশে ফিক্‌হে হানাফীর প্রচার : প্রাচ্য দেশ তথা ইরাক, খুরাসান, সীসতান এবং মা-ওয়ারাউন নাহারে ফিক্‌হে হানাফীর প্রাধান্য ছিল। এখানকার কিছু কিছু অধিবাসী শাফি'ঈ মাযহাবেরও অনুসারী ছিল। মসজিদে এবং আমীর উমারাদের দরবারে হানাফী এবং শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারীদের মাঝে কখনো কখনো মুনাযারার মজলিসও সংঘটিত হতো। এ পথ ধরে ফিক্‌হের বিষয়টি দিন দিন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। তবে এর ফলে মাযহাবী تعصب এবং সাম্প্রদায়িকতাও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনি করে মাযহাবী সাম্প্রদায়িকতা মানুষের মধ্যে চরম জমূদ ও স্থবিরতা এনে দেয়। যার ফলে মানুষিক প্রশস্ততা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।

রাশিয়া ও পারস্যে ফিক্‌হে হানাফীর প্রচার ঃ আরমিনিয়া, আজরবায়জান, তিবরীয এবং আহওয়ায অঞ্চলে হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য ছিল। এমনিভাবে পারস্য দেশে প্রথমে ফিক্‌হে হানাফীর প্রাধান্য ছিল। পরে সেখানে শিয়া ইসনা আশারিয়্যা সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শায়খ আবূ যুহরা (র.) বলেন, ইরানে প্রথমে হানাফী ফিক্‌হের প্রাধান্য ছিল। পরে সেখানে ইসনা আশারিয়্যাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারত উপমহাদেশে ফিক্‌হে হানাফীর প্রচার ঃ পাক ভারত, বাংলাদেশের অধিকাংশ অধিবাসী হানাফী। এখানে শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারীও কিছু লোক আছে। তবে তাঁদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

— [আসারুল ফিক্‌হিল ইসলামি; ১ম খণ্ড; পৃঃ ২৩৬-২৩৮]

ফিক্‌হে হানাফীর বৈশিষ্ট্য

ফিক্‌হে হানাফীর বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মধ্য হতে কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ-

১. হানাফী ফিক্‌হে রিওয়ায়েতের সাথে দিরায়াত তথা যুক্তির সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

২. হানাফী ফিক্‌হ অপরাপর ফিক্‌হের তুলনায় সরল এবং সহজে পালনযোগ্য।

৩. হানাফী ফিক্‌হে বাস্তব জীবন ব্যবস্থার অংশ অত্যন্ত ব্যাপক, সুদৃঢ় এবং নিয়মতান্ত্রিক।

৪. তাহযীব, তামাদ্দুন বা কৃষ্টি-কালচারের জন্য যা যা প্রয়োজন তা অন্যান্য ফিক্‌হের তুলনায় এতে অনেক বেশি।

৫. হানাফী ফিক্‌হ অনুযায়ী রাষ্ট্র ও বিচার কার্য পরিচালনা করা অত্যন্ত সহজ। কারণ এতে প্রজা সাধারণ বিশেষত অমুসলিম প্রজাদের দাবি ও চাহিদার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

৬. কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আহরিত মাসআলা মাসাইল হানাফী ফিক্‌হে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও যুক্তিসম্মত।

৭. হানাফী ফিক্‌হে কুরআন ও হাদীস এবং একাধিক হাদীসের ক্ষেত্রে এমনভাবে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে যার ফলে হাদীস এবং কুরআনের কোনো আয়াতই আমলের আওতা বহির্ভূত থাকেনি। (ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রম বিকাশ পৃঃ ৭২)

ফিক্‌হে হানাফীর দলিল

ফিক্‌হে হানাফীর মূল দলিল হচ্ছে সাতটি ঃ (১) কিতাবুল্লাহ (কুরআন মাজীদ), (২) সুন্নাহ (হাদীস), (৩) সাহাবায়ে কেরামের অভিমত, (৪) ইজমা, (৫) কিয়াস, (৬) ইস্‌তিহসান, (৭) উরফ। এ সব দলিলের ভিত্তিতেই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) মাসআলা-মাসাইল ইস্‌তিম্বাত তথা উদ্ভাবন করতেন।

১. কিতাবুল্লাহ ঃ তথা কুরআন মাজীদ। ইসলামি ফিক্‌হের মূল উৎসই হলো, এই কুরআন মাজীদ। কুরআন ইসলামি শরিয়তের প্রদীপ স্তম্ভ, যা কিয়ামত পর্যন্ত দীপ্তিমান থাকবে। এতে শরিয়তের সামগ্রিক বিধান كلى ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। **ইসলামি শরিয়তের অন্য যত উৎস আছে-সবই এর থেকে উদ্‌গত।**

২. সুন্নাহ ঃ তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস। মূলত ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো এই হাদীস। কুরআন যেমনিভাবে শরিয়তের প্রামাণ্য দলিল, হাদীসও ঠিক তেমনিভাবে শরিয়তের প্রামাণ্য দলিল। হাদীস কুরআন মাজীদেরই ব্যাখ্যা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর তেইশ বছরের নবুওয়াতী জিন্দেগিতে কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যায় যে সব কথা বলেছেন এবং যে সব কাজ করেছেন মূলত একেই হাদীস বলা হয়। হাদীস ছাড়া কুরআন বুঝা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। যারা হাদীস মানে না তাঁরা মূলত ইসলামকেই মানে না।

৩. আকওয়ালে সাহাবা ঃ তথা সাহাবায়ে কেরামের অভিমত। ফিক্‌হে হানাফীর তৃতীয় মূল উৎস হলো, সাহাবায়ে কেরামের অভিমত ও তাঁদের ফতোয়া। ইমাম আবূ হানীফা (র.) মাসাইল ইস্তিম্বাত ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যও গ্রহণ করতেন এবং তাঁদের অনুসরণ করা ওয়াজিব মনে করতেন। যখন তিনি কোনো বিষয়ে ইজতিহাদ করতেন এবং সে বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের কোনো বক্তব্য পেতেন, তখন তিনি তাঁদের মধ্য হতে যে কারো বক্তব্য গ্রহণ করতেন। তাঁদের বক্তব্য পাওয়া যাওয়া অবস্থায় অন্য কারো বক্তব্য তিনি গ্রহণ করতেন না। অবশ্য সাহাবায়ে কেরামের মতামত না পাওয়া অবস্থায় তিনি ইজতিহাদ করতেন, তাবিঈগণের তাকলীদ করতেন না।

৪. **ইজমা ঃ** অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদীনে কেরামের শরিয়তের কোনো হুকুমের ব্যাপারে ঐকমত্য য়া। ডঃ আবু যুহরা ইজমার সংজ্ঞায় বলেন,

هُوَ اِتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِيْنَ مِنَ الْاُمَّةِ الْاِسْلَامِيَّةِ فِىْ عَصْرِ الْحُكْمِ فِىْ اَمْرٍ مِنَ الْاُمُوْرِ.

কোনো এককালে উম্মতে ইসলামিয়ার মুজতাহিদগণের মধ্যে কোনো শর'ঈ বিষয়ে ঐকমত্য হওয়ার নাম ইজমা — [শামী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৩৪-৩৫]

মোল্লা জিউন (র.) বলেন,

هُوَ فِى اللُّغَةِ اَلْاِتِّفَاقُ وَ فِى الشَّرِيْعَةِ اِتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِيْنَ صَالِحِيْنَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِىْ عَصْرٍ وَا عَلٰى اَمْرٍ قَوْلِيٍّ اَوْ فِعْلِيٍّ.

ইজমার আভিধানিক অর্থ– একমত হওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় "একই যুগের মধ্যে মুহাম্মদ ﷺ -এর তের নেককার মুজতাহিদগণের "উক্তি বা কর্মজাতীয়" কোনো বিষয়ের উপর ঐকমত্য হওয়াকে ইজমা বলা হয়। — [নূরুল আনওয়ার; পৃঃ ২২৩]

ইজমার উপরোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা বিদ'আতী এবং ভ্রান্ত ফিরকাসমূহের লোকদের ঐকমত্যকে বাদ দেওয়া হয়েছে। না হানাফী ফকীহগণের মতে এ জাতীয় লোকদের ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়। মোটকথা, ইজমা শরিয়তের প্রামাণ্য ল। হানাফী মাযহাবের উসূলে ফিক্‌হ্‌বিদগণ বলেছেন, ইজমা কাতঈ বা অকাট্য দলিল হিসাবে গণ্য। আর কেউ ঃ বলেছেন, ইজমা যন্নী দলিল হিসাবে গণ্য। শায়খ ফখরুল ইসলাম (র.) বলেন,

اَلْاِجْمَاعُ ثَلٰثُ مَرَّاتٍ اَعْلَاهَا اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَجَعَلَهُ كَالْحَدِيْثِ الْمُتَوَاتِرِ وَالْاَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ يُوْ قَطْعًا لِاَنَّهُمْ هُمُ الَّذِيْنَ شَاهَدُوْا وَعَايَنُوْا وَالثَّانِى اِجْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمْ فِىْ فَصْلٍ غَيْرِ مُجْتَهِدٍ فِيْهِ فَيَ كَالْحَدِيْثِ الْمَشْهُوْرِ الْمُسْتَفِيْضِ وَالثَّالِثُ فِىْ فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيْهِ فَاِنَّهُ فِىْ هٰذِهِ الْحَالِ يَكُوْنُ كَخَبَرِ الْا يُعْتَبَرُ ظَنِّيًّا فَقَطْ تَكُوْنُ فِيْهِ شُبْهَةٌ.

ইজমার তিনটি স্তর রয়েছে ঃ

১. **সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইজমা হলো ঃ** সাহাবায়ে কেরামের ইজমা। এটি মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীস এবং ট্য দলিলের ন্যায় গণ্য। এর দ্বারা কাত'ঈ ও অকাট্য ইলম হাসিল হয়। কেননা তাঁরা নবী করীম ﷺ -কে খেছেন এবং তাঁরাই হলেন, শরিয়তের প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

২. **তাবিঈগণের ইজমা ঃ** যা গায়রে ইজতিহাদী বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জাতীয় ইজমা মশহুর হাদীসের ন্যায় গণ্য।

৩. **তৃতীয় পর্যায়ের ইজমা হলো ঃ** যা কোন ইজতিহাদী বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জাতীয় ইজমা খবরে হিদের ন্যায় যন্নী হিসাবে গণ্য। এতে কিছুটা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

(اَلْاِمَامُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ حَيَاتُهُ وَعَصْرُهُ وَ اٰرَاءُهُ وَفِقْهُهُ)

উপরোক্ত শ্রেণী বিন্যাস সে অবস্থাতেই প্রযোজ্য হবে, যদি ইজমা মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়ে আসে। যদি মার বিষয়টি খবরে ওয়াহিদের ন্যায় পৌছে থাকে তবে এর দ্বারা ইয়াকীন তথা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা যায় না। ও তা সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকুক না কেন। কেননা সাহাবায়ে কেরামের ইজমা যদিও ঈ ও অকাট্য দলিল। কিন্তু খবরে ওয়াহিদ পদ্ধতিতে বর্ণিত হওয়ার কারণে তা খবরে ওয়াহিদের ন্যায় যন্নীই হবে। খ্য যে, ইজমা সর্বাবস্থায় কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার পাবে। ফখরুল ইসলাম বাযদূবী (র.) বলেন,

مَنْ اَنْكَرَ الْاِجْمَاعَ فَقَدْ اَبْطَلَ دِيْنَهُ لِاَنَّ مَدَارَ اُصُوْلِ الدِّيْنِ كُلِّهَا وَمَرْجِعَهَا اِلَى اِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ.

যে ব্যক্তি ইজমা অস্বীকার করল সে দীনকে নিঃশেষ করে দিল। কেননা দীনের সকল পর্যায়ের উসূল তথা নীতি মুসলমানদের ইজমার উপরই নির্ভরশীল। (اَلْاِمَامُ اَبُوْحَنِيْفَةَ حَيَاتُهُ وَعَصْرُهُ وَاٰرَاءُهُ وَفِقْهُهُ পৃঃ ২৮১ - ২৮২)

৫. **কিয়াস ঃ** কিয়াস ইসলামি শরিয়তের প্রামাণ্য দলিল। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সকল ইমামই াসকে ইসলামি আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বস্তুত কিয়াস শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো অনুমান করা, ন্বিত করা ইত্যাদি।

শরিয়তের পরিভাষায়- تَقْدِيْرُ الْفَرْعِ بِالْأَصْلِ فِى الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ মূল বিষয়ের সাথে হুকুম ও ইল্লাতের মধ্যে কোনো শাখা বিষয়কে তুলনা করাকে কিয়াস বলা হয়। —[নূরুল আনওয়ারঃ পৃঃ ২২৮]

বস্তুত যে বিষয় সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মধ্যে স্পষ্ট কোনো বিধান নেই সে জাতীয় বিষয়কে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাতে বর্ণিত কোনো বিষয়ের হুকুমের সাথে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে মিলিয়ে বিধান উদ্ভাবন করাকে কিয়াস বলা হয়। ইসলামি আইনের উৎস হিসাবে কিয়াসের মর্যাদা কুরআন, হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মতের পরেই। কেয়াসের এ মর্যাদার কারণ অতি স্পষ্ট। কেননা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমায়ে সাহাবার দ্বারা কিয়াসের হুজ্জিয়্যাত প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নীতি ছিল, তিনি যখন কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়াতে কোনো সমাধান না পেতেন, তখন তিনি ইজতিহাদ করতেন এবং সংঘটিত সমস্যার উপর সামগ্রিকভাবে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম দৃষ্টি রেখে কখনো কিয়াস এবং কখনো ইসতিহ্সানের উপর আমল করতেন। এ কারণে কোনো কোনো আলিম বলেছেন, কিয়াস মূলত নুসূসেরই তাফসীর বা ব্যাখ্যা। কাজেই কিয়াস নুসূস বর্হিভূত বা এর বিপরীত কোনো কিছু এ কথা বলা ঠিক নয়।

৬. ইসতিহ্সান ঃ উসূলে ফিক্হের পরিভাষায় ইস্তিহসান শব্দটি এমন দলিলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় যা কিয়াসে জলী (প্রকাশ্য কিয়াস)-এর মোকাবেলায় আসে। অর্থাৎ কিয়াসে জলীকে ছেড়ে কিয়াসে খফী (অপ্রকাশ্য কিয়াস) অবলম্বন করাকেই ইসতিহসান বলা যায়। কেননা কিয়াসে জলী অনেক সময় এমন একটি বিষয় চায় যা নস, (কুরআন, হাদীস) ইজমা এবং উরফের পরিপন্থী। এমতাবস্থায় উসূল বিদগণের মতে কিয়াসে জলীকে বাদ দেওয়া পছন্দনীয়, তাই একে ইসতিহসান (পছন্দ করা) বলা হয়। উসূলে ফিক্হের পরিভাষায় সাধারণত ইস্তিহ্সান বলতে কিয়াসে খফী, আর কিয়াস বলতে কিয়াসে জলীকেই বুঝানো হয়ে থাকে। মূলত ইস্তিহ্সান কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও উরফ বিরোধী কোনো কিছু নয়; বরং ক্ষেত্র বিশেষ কিয়াসকে পরিহার করে এ সবের উপর আমল করার নামই হলো ইস্তিহ্সান।

৭. উরফ ঃ হানাফী ফিক্হে উরফ শরিয়তের সহকারী উৎস হিসাবে স্বীকৃত। ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা মানুষের সমস্যার সমাধান না করা গেলেই সে অবস্থায় ইস্তিহসান অথবা উরফ দ্বারা মানুষের সমস্যার সমাধান করা হতো। এ বিষেয়ে সাহল ইবনে মুযাহিম (র.) বলেন,

كَلَامُ أَبِىْ حَنِيْفَةَ أَخْذٌ بِالثِّقَةِ وَفِرَارٌ مِنَ الْقُبْحِ وَالنَّظْرُ فِىْ مُعَامَلَاتِ النَّاسِ وَمَا اسْتَقَامُوْا عَلَيْهِ وَصَلُحَتْ عَلَيْهِ أُمُوْرُهُمْ يَمْضِى الْأُمُوْرَ عَلَى الْقِيَاسِ فَإِذَا قَبُحَ الْقِيَاسُ يَمْضِيْهَا عَلَى الْاِسْتِحْسَانِ مَادَامَ يَمْضِىْ لَهُ فَإِذَا لَمْ يَمْضِ لَهُ رَجَعَ إِلٰى مَا يَتَعَامَلُ بِهِ الْمُسْلِمُوْنَ ـ

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্যের মূল কথা হলো, নির্ভরযোগ্য বস্তু গ্রহণ করা, দোষযুক্ত বস্তু থেকে পলায়ন করা এবং মানুষের কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কিয়াসের উপর অবিচল থাকতো এবং তাঁদের মু'আমালা যথাযথভাবে পরিচালিত হতো ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কিয়াসের মাধ্যমেই ফয়সালা করতেন। যখন তিনি কিয়াসের মধ্যে কোনো অসুবিধা লক্ষ্য করতেন তখন মানুষের কার্যাবলিকে ইস্তিহ্সানের আলোকে সমাধান করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে কোনো অসুবিধা না দেখতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা এভাবেই চলতো। আর কোনো অসুবিধা দেখা দিলে মুসলমানদের আচার-আচরণ তথা সামাজিক প্রথার দিকে ফিরে আসতেন। —[শামী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৩৫]

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে দু'টি বিষয় প্রতীয়মান হয়।

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) যখন কোনো বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও ইজমা না পেতেন তখন তিনি মানুষের বিভিন্ন বিষয়কে কিয়াস ও ইসতিহ্সানের আলোকে সমাধান করতেন। আর শেষোক্ত বিষয় দু'টোর মধ্যে যেটি মানুষের জন্য অধিকতর কল্যাণকর বিবেচিত হতো এবং যেটি শরিয়তের উদ্দেশ্যাবলির অধিকতর নিকটবর্তী হতো তিনি সেটিই গ্রহণ করতেন।

২. কোনো বিষয়ে কিয়াস ও ইসতিহ্‌সান দ্বারা মানুষের সমস্যার সমাধান করা না গেলে সে ক্ষেত্রে তিনি মানুষের কার্যাবলির প্রতি নজর করতেন। কার্যাবলি অর্থ সে "উরফ" যা মানুষের মধ্যে ব্যাপক হারে প্রচলিত। তিনি উরফের উপর তখনই আমল করতেন যখন কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের কোনোটিতেই শরঈ দলিল না পেতেন এবং না সে বিষয়ে কিয়াস ও ইসতিহসানের নীতি অবলম্বনের কোনো অবকাশ ছিল। এহেন অবস্থায় কোনোটিতে সমাধান না পেয়েই কেবলমাত্র তিনি 'উরফ' -এর নীতি অবলম্বন করতেন। উল্লেখ্য যে, 'উরফ দু' প্রকার।

১. উরফে সহীহ্, যা "নস"-এর পরিপন্থী নয়।

২. উরফে ফাসিদ, যা 'নস"-এর পরিপন্থী। মোদ্দাকথা হচ্ছে, উরফ শরিয়তের সহকারী উৎস। সমস্যার সমাধানে কোনো দলিল না পাওয়া গেলেই কেবল ইমাম আবূ হানীফা (র.) উরফ-এর নীতি অবলম্বন করতেন।
— [শামী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৩৫-৩৬]

ফিক্‌হে হানাফী ও হাদীস

উপরে যে সব দলিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এগুলোই হলো ফিক্‌হে হানাফীর দলিল। তন্মধ্যে চারটি হলো বুনিয়াদী দলিল, আর বাকি তিনটি হলো সহকারী দলিল বা সহকারী উৎস। এ সবের উপর ভিত্তি করেই ফিক্‌হে হানাফী রচিত ও সম্পাদিত হয়েছে। ফিক্‌হে হানাফীর কোনো কথাই উপরোক্ত দলিলসমূহের বাইরে নয়। বিশেষভাবে কুরআন ও হাদীসের বাইরে নয়। তা সত্ত্বেও কতেক লোক এ কথা প্রমাণ করার অহেতুক চেষ্টা করেছেন যে, মাসাইল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীসের উপর খুব কমই اِعْتِمَادْ (নির্ভর) করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হলো!, তিনি কিয়াসকে হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতেন। তাঁদের এ বক্তব্য যথার্থ কিনা তা জানতে হলে আমাদেরকে যাচাই করে দেখতে হবে যে, আসলেই কি ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীসের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করতেন না কি প্রতিকূল? যদি তিনি কতেক হাদীসের ব্যাপারে প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করে থাকেন তাহলে তা কি কুরআন মাজীদ এবং সুন্নাতে মাশহুরার দলিলের ভিত্তিতে, না কি বিনা দলিলে? এ বিষয়গুলো জানার পরই আমরা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ভূমিকা এবং موقف যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারব। বস্তুত যারা বলেন, "ইমাম আবূ হানীফা (র.) কিয়াসকে হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতেন" তাঁদের এ বক্তব্য একেবারেই অবাস্তব। এ জাতীয় অহেতুক ভিত্তিহীন অভিযোগ খণ্ডন করে স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন–

كَذَبَ وَاللّٰهِ وَافْتَرٰى عَلَيْنَا مَنْ يَّقُوْلُ اِنَّنَا نُقَدِّمُ الْقِيَاسَ عَلَى النَّصِّ وَهَلْ يُحْتَاجُ بَعْدَ النَّصِّ اِلَى الْقِيَاسِ ؟

যে ব্যক্তি বলে, আমরা কিয়াসকে নস (কুরআন-হাদীস)-এর উপর প্রাধান্য দেই, আল্লাহর কসম! সে আমাদের উপর মিথ্যা অভিযোগ এবং মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। (আমরা বলব) নস থাকা অবস্থায়ও কি কিয়াসের প্রয়োজন আছে?
—[আল মীযান ঃ আল্লামা শা'রানী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৫১]

এ বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি কিয়াসকে সে স্থানই দিয়েছেন যা এর প্রাপ্য। তিনি বলেছেন, কিয়াসের প্রয়োজন তো তখন যখন নস পাওয়া যাবে না। যখন নস পাওয়া যাবে তখন কিয়াসের প্রয়োজন নেই। এমনকি তিনি বলেছেন, نَحْنُ لَا نَقِيْسُ اِلَّا عِنْدَ الضَّرُوْرَةِ الشَّدِيْدَةِ আমরা একান্ত প্রয়োজনে নিরুপায় হয়েই কিয়াস করে থাকি। কেননা আমরা বিভিন্ন মাসআলার দলিল কিতাব, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের ফতোয়ায় অনুসন্ধান করি। সেখানে অনুসন্ধানের পরও কোনো দলিল খুঁজে না পেলে তখনই আমরা গায়রে মান্‌সূস (اَلْغَيْرُ الْمَنْصُوْصُ) বা (নির্দেশনাবিহীন) বিষয়কে মানসূস (مَنْصُوْص) বিষয়ের উপর কিয়াস করি।
— [আল মীযান; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৫১]

অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন,

اِنَّا نَاْخُذُ اَوَّلًا بِكِتَابِ اللّٰهِ ثُمَّ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ بِاَقْضِيَةِ الصَّحَابَةِ وَنَعْمَلُ بِمَا يَتَّفِقُوْنَ عَلَيْهِ فَاِنِ اخْتَلَفُوْا قِسْنَا حُكْمًا عَلٰى حُكْمٍ بِجَامِعِ الْعِلَّةِ بَيْنَ الْمَسْئَلَتَيْنِ حَتّٰى يَتَّضِحَ الْمَعْنٰى.

আমরা প্রথমত কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন মাজীদকে দলিল গ্রহণ করি। তাঁরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস। তাঁরপর সাহাবায়ে কেরামের ফয়সালা। সাহাবায়ে কেরাম যে বিষয়ে সর্বসম্মত, আমরা এর উপর আমল করি। যদি তাঁদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হয়ে যায়, তখন আমরা সামগ্রিক ইল্লাতের ভিত্তিতে এক হুকুমকে অন্য হুকমের উপর কিয়াস করি যে যাবৎ না নসের অর্থ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। (প্রাগুক্ত)

তাঁর থেকে আরো উল্লেখ রয়েছে,

إِنَّا نَعْمَلُ أَوَّلًا بِكِتَابِ اللّٰهِ ثُمَّ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ بِأَحَادِيْثِ أَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ.

আমরা প্রথমে কুরআন মাজীদের উপর আমল করি, তাঁরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নতের উপর, এরপর আবূ বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা.)-এর আছার তথা বক্তব্যের উপর।

তিনি আরো বলতেন,

مَا جَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ بِأَبِىْ وَأُمِّىْ وَلَيْسَ لَنَا مُخَالَفَتُهُ. وَمَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِهِ تَخَيَّرْنَا وَمَا جَاءَ عَنْ غَيْرِهِمْ فَهُمْ رِجَالٌ نَحْنُ رِجَالٌ.

যা কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত তা আমার মাথার মুকুট ও চোখের জ্যোতি হিসাবে বিনাবাক্য ব্যয়ে গৃহীত, এতে আমার মতবিরোধের কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহর রাসূলের প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গিত হোক। আর যা কিছু তাঁর সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত, এর থেকে আমরা আমাদের পছন্দমতে যার বক্তব্য ইচ্ছা গ্রহণ করে থাকি। আর যা কিছু তাঁদের ছাড়া অন্য কারো (তাবিঈ) থেকে বর্ণিত, সে ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো, তাঁরাও পুরুষ আমরাও পুরুষ। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আমরা তাঁদের ন্যায় ইজতিহাদ করি। — [প্রাগুক্ত; পৃঃ ৫২]

বর্ণিত আছে যে, একদা খলীফা আবূ জা'ফর মানসূর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে এ মর্মে পত্র দিয়েছিলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি কিয়াসকে হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।" ইমাম আ'যম (র.)-এর জবাবে লিখেছিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সত্যিকার বক্তব্য তা নয়, যা আপনি শুনেছেন। আমি তো প্রথমেই কুরআন মাজীদের উপর আমল করে থাকি। তাঁরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের উপর আমল করি। এরপর আবূ বকর, ওমর, ওসমান এবং আলী (রা.) -এর ফতোওয়ার উপর আমল করি। এরপর অবশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়ার উপর আমল করি। যদি কোনো মাসআলায় সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য হয়ে যায় তখন আমি কিয়াস করি। খালিক ও মাখলূকের মধ্যে আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক নেই। — [আল মীযান; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৫২]

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কিয়াসকে হাদীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া কস্মিন কালেও ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর নীতি হতে পারে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) তো দূরের কথা কোনো ফকীহই এ নীতি অবলম্বন করতে পারেন না। আর এ কারণে তিনি مُتَعَارِضْ (বাহ্যত সংঘর্ষিক), দুই হাদীসের ক্ষেত্রে تَطْبِيْق (সামঞ্জস্য বিধান করা), تَرْجِيْح (অগ্রাধিকার প্রদান), نَسْخ (রহিতকরণ) বা تَسَاقُطْ (বাদ দেওয়া) নীতি অবলম্বন করেছেন। সর্বোপরি বাবের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত হাদীসকে একত্রিত করে এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি মাসআলা তুলে ধরা হলো।

مَسْئَلَةُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ ঃ তাকবীরে তাহরীমার সময় رَفْعِ يَدَيْن করা অর্থাৎ উভয় হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করা সুন্নত। এ বিষয়ে ইমাম চতুষ্টয়ের সকলেই একমত। এ ছাড়া রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করার সময় رَفْع يَدَيْن করা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সুন্নত নয়। এ বিষয়টি একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন–

(١) عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) اَلَا أُصَلِّىْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِىْ أَوَّلِ مَرَّةٍ.

আলকামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে সালাত আদায় করতেন, আমি কি তোমাদেরকে সেভাবে সালাত আদায় করে দেখাব? অতঃপর তিনি সালাত আদায় করলেন। কিন্তু তাকবীরে তাহরীমার সময় ছাড়া আর অন্য কোনো সময় তিনি তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করেননি। — [তিরমিযী শরীফ; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৩৫]

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে হযম যাহিরী (র.) তৎপ্রণীত আল মুহাল্ল্যা (المحلى) গ্রন্থে একে সহীহ্ বলে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা আহ্‌মদ শাকির (র.) শরহে তিরমিযীতে উল্লেখ করেছেন যে,

وَهٰذَا الْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ وَمَاقَالُوْا فِىْ تَعْلِيْلِهِ لَيْسَ بِعِلَّةٍ -

হাদীসটি সহীহ। আল্লামা ইবনে হাযম যাহিরী (র.) এবং অপরাপর হুফ্‌ফাযে হাদীস এটিকে সহীহ বলে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর যারা এই হাদীসের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেছেন, তাঁদের এ আপত্তি মূলত কোনো আপত্তিই নয়। — [শরহে তিরমিযী আহমদ শাকির; ২য় খণ্ড; পৃঃ ৪১]

(٢) عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ اِلٰى قَرِيْبٍ مِنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَايَعُوْدُ .

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত কানের কাছাকাছি পর্যন্ত উঠাতেন। এরপর তিনি আর কখনো হাত উত্তোলন করতেন না। — [আবূ দাউদ শরীফ; ১ম খণ্ড; পৃঃ ১০৯]

আল্লামা মারিদীনী (র.) "আল জাওহারুন নকী" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি হুবহু এই শব্দেই আল কামিল (اَلْكَامِلُ لِابْنِ عَدِىْ) তে উদ্ধৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে এই শব্দেই তা দারাকুতনী এবং মু'জামে তাবারানী (আওসাত) তেও উদ্ধৃত হয়েছে। আল্লামা আন্‌ওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) نَيْلُ الْفَرْقَدَيْنِ গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং উক্ত হাদীসের ব্যাপারে যত ধরনের আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, এক এক করে তিনি এই সব ক'টিরই জবাব দিয়েছেন। — [দরসে তিরমিযী; ২য় খণ্ড; পৃঃ ৩২-৩৩]

(٣) عَنْ عَبَّادِ بْنِ زُبَيْرٍ (رض) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا فِىْ شَيْءٍ حَتّٰى يَفْرُغَ .

'আববাদ ইবনে যুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন, তখন তিনি সালাতের শুরুতে একবার উভয় হাত উত্তোলন করতেন। এরপর সালাত শেষ করা পর্যন্ত তিনি আর কোথাও তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন না। — [বায়হাকী শরীফ সূত্র নসবুর রায়া; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৪০৪]

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) اَلدِّرَايَةُ فِىْ تَخْرِيْجِ اَحَادِيْثِ الْهِدَايَةِ গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, لِيَنْظُرْ فِىْ اِسْنَادِهِ (হাদীসটির সনদ দেখা উচিত)। আল্লামা কাশ্মীরী (র.) বলেন, আমি হাফিয ইবনে হাজার (র.)-এর নির্দেশ পালনার্থে হাদীসটির সনদ তন্ন তন্ন করে যাচাই করে দেখেছি যে, এর প্রত্যেক রাবীই সিকা ও নির্ভরযোগ্য। তবে আব্বাদ ইবনে যুবায়র (র.) হলেন তাবিঈ। এই হিসাবে হাদীসটি মুরসাল হাদীস হিসাবে পরিগণিত হয়। আর মুরসাল হাদীস জমহুর মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে হুজ্জত (দলিল হিসাবে স্বীকৃত)।

(٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَالِىْ اَرَاكُمْ رَافِعِىْ اَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ اُسْكُنُوْا فِى الصَّلٰوةِ .

হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, কি হলো যে, আমি তোমাদেরকে অস্থির ও আস্ফালনকারী উটের ন্যায় উভয় হস্ত উত্তোলনকৃত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। তোমরা সালাতে ধীরস্থির থাকবে। —(সহীহ মুসলিম; ১ম খণ্ড; পৃঃ ১৮১)

হাদীসটি সনদের দিক থেকে সহীহ। কিন্তু হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) তাল্‌খীসুল হাবীর গ্রন্থে এ মর্মে আপত্তি করেছেন যে, مَنِ احْتَجَّ بِحَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَلٰى مَنْعِ الرَّفْعِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ فَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ مِنَ الْعِلْمِ .

অর্থাৎ রুকুতে যাওয়ার সময় رَفْعِ يَدَيْنِ নিষিদ্ধ হওয়ার উপর যারা জাবির ইবনে সামুরা (রা.) -এর এ হাদীসকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করে তাঁদের ইলমের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। বস্তুত ইবনে হাজার (র.) -এর আপত্তির সারমর্ম হচ্ছে, এ হাদীসের সম্পর্ক رَفْعِ يَدَيْنِ عِنْدَ السَّلَامِ-এর সাথে, রুকুর সাথে নয়। এ আপত্তির জবাবে আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লাঈ (র.) নসবুর রায়া (نَصْبُ الرَّايَةِ) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি একাধিক

সূত্রে বর্ণিত আছে। তন্মধ্য হতে উবায়দুল্লাহ ইবনে আল কিব্‌তিয়্যা (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি কেবলমাত্র رَفْع يَدَيْن -এর সাথে সম্পর্কিত। আর বাকিগুলোর মধ্যে যে رَفْع يَدَيْن -এর কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে يَدَيْن عِنْد السَّلَام অর্থাৎ ব্যাপক অর্থবোধক। এর মধ্যে সর্বপ্রকার رَفْع يَدَيْن শামিল। কাজেই আল্লামা ইবনে হাজার (র.)-এর عَامْ আপত্তি যথার্থ নয়। — [দরসে তিরমিযী; ২য় খণ্ড; পৃঃ ৩৬]

এভাবে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে মাথা উত্তোলন কালে رَفْع يَدَيْن করা সুন্নত না হওয়ার ব্যাপারে আরো বহু হাদীস এবং আসারে সাহাবা রয়েছে। সর্বোপরি উপরোক্ত অবস্থাতে رَفْع يَدَيْن না করার বর্ণনা গুলো কুরআন মাজীদের আয়াত وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ (আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে। (২ - ২৩৮) এর দ্বারা সমর্থিত। এমনিভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রিওয়ায়াতে কোনোরূপ اِضْطِرَابْ ও اِخْتِلَافْ নেই এবং এ ব্যাপারে তাঁর থেকে দু'রকমের আমলও বর্ণিত নেই। অর্থাৎ তাঁর থেকে শুধুমাত্র رَفْع يَدَيْن না করাই বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে যারা رَفْع يَدَيْن -এর রিওয়ায়াত করছেন তাঁদের রিওয়ায়াতের মধ্যে اِخْتِلَافْ ও বৈপরীত্য রয়েছে। স্বয়ং 'আবদুল্লাহ' ইবনে ওমর (রা.) থেকে একদিকে رَفْع يَدَيْن -এর রিওয়ায়েত রয়েছে, অপরদিকে তাঁর নিজের আমল এর বিপরীতে রয়েছে। অনুরূপভাবে মদীনা ও কূফাবাসী সমস্ত সাহাবী ও তাবিঈদের আমলও رَفْع يَدَيْن না করার উপর। অধিকন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর সূত্রে যে হাদীসটি বর্ণিত, এর বর্ণনা পরম্পরায় যে রাবীগণ রয়েছেন, তাঁরা সকলেই হলেন ফকীহ। কাজেই এ হাদীসটি ঐ সব বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত যাকে مُسَلْسَلْ بِالْفُقَهَاءِ বলা হয়। অতএব এ হাদীসটি অপরাপর হাদীসের তুলনায় অগ্রগণ্য হবে। রাবীর ফিক্‌হী ব্যুৎপত্তির ভিত্তিতে তাঁর বর্ণিত হাদীস অপরাপার বর্ণনার তুলনায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হয়ে থাকে" এ কথাটি নিম্নোক্ত ঘটনা থেকেও প্রতীয়মান হয়।

সুফয়ান ইবনে উয়ায়না (র.) বলেন, একদা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আওযা'ঈ (র.) মক্কা শরীফের দারুল খায়্যাতীন-এ মিলিত হলেন। এ সময় ইমাম আওযা'ঈ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে মাথা উত্তোলন কালে رَفْع يَدَيْن করেন না? জবাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বললেন, রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে মাথা উত্তোলনকালে উভয় হাত উঠানোর বিষয়টি সহীহ সনদে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়, এ কারণে আমি তা করি না। ইমাম আওযা'ঈ (র.) বললেন, এটি কেমন করে হতে পারে? وَقَدْ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ كَانَ يَرْفَعُ (অথচ আমাকে যুহরী (র.) বলেছেন, তিনি সালিম (র.) থেকে, সালিম (র.) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হাত উঠাতেন।) তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.) বললেন, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لَايَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا عِنْدَ اِفْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَلَا يَعُوْدُ اِلٰى شَيْءٍ مِنْ ذَالِكَ. (আমাকে হাম্মাদ (র.) বর্ণনা করেছেন, তিনি ইব্‌রাহীম (র.) থেকে, ইবরাহীম (র.) আলকামা ও আসওয়াদ (র.) থেকে এবং তাঁরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধুমাত্র নামাজ শুরু করার সময় হাত উঠাতেন। তা ছাড়া নামাজের মাঝখানে আর হাত উঠাতেন না।)। তখন ইমাম আওযা'ঈ (র.) বললেন, اُحَدِّثُكَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ وَتَقُوْلُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ.

(আমি যুহরী (র.)-এর সূত্রে সালিম এবং তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা শুনাচ্ছি, আর আপনি আমাকে হাম্মাদ (র.)-এর সূত্রে ইব্‌রাহীম (র.)-এর বর্ণনা শুনাচ্ছেন?) ইমাম আবূ হানীফা (র.) জবাবে বললেন, হাম্মাদ (র.) যুহরী (র.)-এর তুলনায় বড় ফকীহ ছিলেন। ইব্‌রাহীম (র.) সালিম (র.)-এর তুলনায় বড় ফকীহ ছিলেন। আর আলকামা (র.) ইবনে ওমর (রা.) থেকে কোনো অংশেই কম নন। যদিও ইবনে ওমর (রা.) সাহাবী ছিলেন। আর আসওয়াদ (র.) তো অনেক গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে,

اِبْرَاهِيْمُ اَفْقَهُ مِنْ سَالِمٍ وَلَوْلَا فَضْلُ الصُّحْبَةِ لَقُلْتُ اِنَّ عَلْقَمَةَ اَفْقَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدُ اللّٰهِ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ.

ইব্‌রাহীম (র.) সালিম (র.) -এর তুলনায় বড় ফকীহ ছিলেন, যদি সুহবত তথা সাহচর্যের ফজিলত না থাকতো তবে আমি বলতাম, আলকামা (র.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকেও বড় আলিম এবং ফকীহ ছিলেন। আর আবদুল্লাহ তো হলেন আবদুল্লাহই।

আবদুল্লাহ দ্বারা বুঝানো হয়েছিল আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে। অর্থাৎ উপরোক্ত রাবীগণের মধ্যে কেউই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সমকক্ষ নয়। উপরোক্ত বিতর্ক থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, দু' বর্ণনার মধ্যে বিরোধকালে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) রাবীর ফিক্‌হী জ্ঞানকে গভীরভাবে লক্ষ্য করতেন। অর্থাৎ যে রাবী ফিক্‌হের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ হতেন তাঁকেই প্রাধান্য দিতেন। এর কারণ ছিল, হানাফী ফকীহগণের মতে যিনি ফকীহ, তাঁর বর্ণনার সাথে যিনি ফকীহ নন তাঁর বর্ণনার মোকাবেলা হতে পারে না। কেননা ফকীহ রাবী হিফয ও যবতের দিক থেকে অধিকতর শক্তিমান। সুতরাং ফকীহ রাবীগণের রিওয়ায়াতের অপরাপর রাবীর রিওয়ায়াতের তুলনায় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। — [اَلْاِمَامُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ حَيَاتُهٗ وَعَصْرُهٗ وَاٰرَاءُهٗ وَفِقْهُهٗ পৃঃ ২৪৪-২৪৫]

مَسْئَلَةُ التَّامِيْنِ ঃ নামাজে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করার পর "আমীন" আস্তে বা জোরে বলা উভয়ই জায়েজ। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আমীন আস্তে বলা উত্তম। কেননা হাদীসে আছে,

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهٗ.

আলকামা ইব্‌নে ওয়াইল (র.) তাঁর পিতা ওয়াইল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ তিলাওয়াত করার পর আমীন বললেন এবং তিনি তা আস্তে বললেন। — [সুনানে তিরমিযী-১ম খণ্ড; পৃঃ ৩৪]

তাহাবী শরীফে বর্ণিত আছে,

كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ لَا يَجْهَرُ اِنْ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - وَلَا بِالتَّعَوُّذِ وَلَا بِالتَّامِيْنِ.

হযরত ওমর ও আলী (রা.) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম এবং আমীন (এই তিনটি বিষয়) জোরে বলতেন না; (বরং আস্তে আস্তে বলতেন)।—[শুরহু মা'আনিল আসার-১ম খণ্ড; পৃঃ ৯৯]

এমনভিাবে হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলতেন,

اَرْبَعٌ يُخْفِيْنَ عَنِ الْاِمَامِ اَلتَّعَوُّذُ وَبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاٰمِيْنَ وَاَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

চারটি বিষয় ইমাম থেকে গোপনে পাঠ করা হবে। (১) আউযুবিল্লাহ, (২) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, (৩) আমীন, (৪) আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ। — [কানযুল উম্মাল-৪র্থ খণ্ড; পৃঃ ২৪৯]

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, اِنَّ اَكْثَرَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ كَانُوْا يُخْفُوْنَ بِهَا.

অধিকাংশ সাহাবী ও তাবিঈনে কেরাম আস্তে আমীন বলতেন। — [ই'লাউস সুনান ২য় খণ্ড; পৃঃ ২২৩]

مَسْئَلَةُ الْقِرَأَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ ঃ জামা'আতে ইমামের পেছনে সালাত আদায় করা অবস্থায় মুসল্লীগণ সূরা ফাতিহা এবং কিরাআত পাঠ করবে কিনা? এ সম্বন্ধে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, جَهْرِىْ (যে নামাজে কিরাআত জোরে পড়া হয়) এবং سِرِّىْ (যে নামাজে কিরাআত আস্তে পড়া হয়) উভয় নামাজেই ইমামের পেছনে মুক্তাদীদের কিরাআত পড়া মাকরূহ তাহরীমী। এ সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীসে বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে, তাহলে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে। (৭ - ২০৪)

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الصَّلٰوةِ فَسَمِعَ قِرَأَةَ فَتًى مِنَ الْاَنْصَارِ فَنَزَلَ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا.

রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে কিরাআত পড়তেন, এমতাবস্থায় তিনি এক আনসারী সাহাবীর কিরাআত শুনতে পেলেন, তখনই وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا আয়াত নাজিল হয়। –[দরসে তিরমিযী ২য় খণ্ড; পৃঃ ৮৬]

হযরত আবুল আলিয়া (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে এবং তাঁর বর্ণনাতে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, অতঃপর তাঁরা ইমামের পেছনে কিরাআত পড়া থেকে নিবৃত্ত হয়ে যান। — [প্রাগুক্ত; পৃঃ ৮৬]

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে,

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلٰوتَنَا فَقَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ فَاَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَءَ فَاَنْصِتُوْا وَاِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ .

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। এতে তিনি আমাদেরকে সালাতের তা'লীম দিলেন এবং সুন্নতের বিশদ বিবরণ পেশ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, যখন তোমরা সালাত আদায় করবে তখন প্রথমে (নামাজের) কাতার ঠিক করবে, তারপর তোমাদের একজন ইমামত করবে। যখন সে তাকবীর বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। যখন সে কিরাআত পড়বে তখন তোমরা তা চুপ করে শুনবে। আর সে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ পড়ে শেষ করলে তোমরা আমীন বলবে। — [সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড; পৃঃ ১৭৪]

অপর এক হাদীসে আছে, عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهٗ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ لَهٗ قِرَاءَةٌ .

হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যার ইমাম আছে অর্থাৎ যে জামা'আতের সাথে ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করছে, ইমামের কিরাআতই তাঁর কিরাআত (এর জন্য যথেষ্ট)। —(সুনানে ইবনে মাজাহ; পৃঃ ৬১)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) কুরআন, হাদীস এবং ফতোয়ায়ে সাহাবার আলোকেই মাসাইল বর্ণনা করেছেন। তিনি আদৌ কিয়াসকে নসের উপর প্রাধান্য দেননি। অবশ্য কোনো মাসআলায় নস না পাওয়া যাওয়ার অবস্থায়ই কেবলমাত্র তিনি কিয়াসের নীতি অবলম্বন করেছেন।

اِعْلَامُ الْمُوَقِّعِيْنَ গ্রন্থে হাফিয ইবনে কায়্যিম (র.) লিখেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর শিষ্যগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) য'ঈফ তথা দুর্বল হাদীসকেও কিয়াস এবং ইজতিহাদী রায়ের উপর প্রাধান্য দিতেন এবং এই নীতির উপরই হানাফী মাযহাবের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। যেমন–

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) নামাজে উচ্চৈঃস্বরে হাসার হাদীস দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও একে কিয়াস এবং ইজতিহাদী রায়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

২. সফরে খেজুরের নাবীয দ্বারা অজু জায়েজ হওয়ার হাদীস য'ঈফ হওয়া সত্ত্বেও একে কিয়াস এবং রায়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

৩. দশ দিরহামের কম চুরি করলে চোরের হাত কাটা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত হাদীস দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা মেনে নিয়েছেন।

৪. হায়েযের সর্বোচ্চ মুদ্দত দশ দিন নির্দিষ্টকারী হাদীস দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ করে নিয়েছেন।

৫. জুমার নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) শহর হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। অথচ এ সম্পর্কিত হাদীসটি দুর্বল।

৬. কূয়া পবিত্র করার বিধানে ইমাম আবূ হানীফা "গায়রে মারফূ' আছার" তথা দুর্বল হাদীসের ভিত্তিতে কিয়াসকে বর্জন করেছেন।

আল্লামা ইবনে কায়্যিমের উপরোক্ত বক্তব্য থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কিয়াসকে কখনো হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতেন না; বরং দুর্বল হাদীসকেও তিনি কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন। এমনকি তিনি মুরসাল হাদীসও গ্রহণ করতেন এবং একেও তিনি রায় এবং কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন। অথচ ইমাম শাফি'ঈ (র.)-ও কতেক শর্ত সাপেক্ষে মুরসাল হাদীস গ্রহণ করতেন। আর মুহাদ্দিসগণ তো মুরসাল হাদীসকে গ্রহণই করতেন না। এতদসত্ত্বেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতি দোষারোপ যে, তিনি কিয়াস ও রায়কে হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতেন। এহেন বক্তব্য সত্যিই চরম দুর্ভাগ্যজনক। — (আস সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীইল ইসলামী; পৃঃ ৪১৯)

তাকলীদ : পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস হলো, কুরআন ও হাদীস। পরবর্তীতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সম্পূরক আরো দু'টি উৎস তথা ইজমা ও কিয়াসের সংযোজন ঘটে। এই দলিল চতুষ্টয়ের ভিত্তিতে ইমাম ও মুজতাহিদগণ ইসলামি শরিয়তের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং একে বিন্যস্ত করেছেন। কুরআন হাদীস এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং ইজতিহাদ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের দরুন মুজতাহিদ ইমামগণের সিদ্ধান্তে বিভিন্নতা দেখা দেয়। এর ফলে বহু মাযহাবের উদ্ভব ঘটে। পরবর্তী সময়ে সে সবের মধ্যে চারটির উপরে মুসলিম উম্মাহর ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চারটি মাযহাব হলো– (১) হানাফী, (২) মালিকী, (৩) শাফি'ঈ ও (৪) হাম্বলী।

এই চার মাযহাবের যে কোনো একটির অনুসরণ বা তাকলীদ করলেই কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ হয়ে যাবে।

বস্তুত তাকলীদ (تقليد) শব্দটি আরবি। এর অর্থ– গলায় মালা বা হার পরিয়ে দেওয়া। ফিক্হ শাস্ত্রের নীতিমালা বিশেষত ওলামায়ে কেরামের মতে তাকলীদের সংজ্ঞা হলো,

اَلْعَمَلُ بِقَوْلِ اِمَامٍ مُجْتَهِدٍ مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَةِ دَلِيْلٍ

অর্থাৎ দলিল-প্রমাণ অন্বেষণ ব্যতীত কোনো মুজতাহিদ ইমামের কথা অনুসারে আমল করাকে তাকলীদ বলা হয়
— (কাওয়ায়িদুল ফিক্হ মুফতি আমীমুল ইহসান)

দলিল প্রমাণ অন্বেষণ ব্যতীত' এ কথার মানে হলো, মুকাল্লিদ তার ইমামের প্রতি এরূপ আস্থা পোষণ করবে যে, অনুসরণীয় বিষয়ে আমার ইমামের নিকট প্রমাণ তো অবশ্যই আছে এবং তা সত্যও বটে। কাজেই প্রমাণ পেলে অনুসরণ করব, অন্যথায় করব না, এরূপ দুঃশ্চিন্তার আমি শিকার হবো না। অবশ্য কোনো ইমামের তাকলীদ করার পর প্রমাণ জানতে সচেষ্ট হওয়া তাকলীদের পরিপন্থী কাজ নয়।

উল্লেখ্য যে, কুরআন হাদীসের মর্ম দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

১. যে সব মর্ম অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত, তা উদ্ধারে কোনোরূপ অস্পষ্টতা, সন্দেহ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় না। যেমন– নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি ফরজ হওয়া এবং চুরি, জেনা, মদ্যপান ইত্যাদি হারাম হওয়া। এসবের হুকুম-আহকাম কুরআন-হাদীস হতে সবাই উদ্ধার করতে সক্ষম। কাজেই এই শ্রেণীর আয়াত ও হাদীসের মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে ইজতিহাদও তাকলীদের কোনো প্রয়োজন নেই।

২. এমন সব আয়াত ও হাদীস যার মধ্যে বাহ্যত কোনো না কোনো অস্পষ্টতা ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান রয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ

তালাক প্রাপ্তা নারীগণ তিন কুরূ (قُرُوْءٍ) পর্যন্ত (ইদ্দত পালনের জন্য) অপেক্ষা করবে। (২ ঃ ২২৮)

এ আয়াতে উল্লিখিত কুরূ শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। এর এক অর্থ হায়িয (حَيْض) এবং অন্য অর্থ পবিত্রতা (طُهْر)। এখানে কোন অর্থটি উদ্দেশ্য তাতে দ্বিধা বিদ্যমান। তাই আয়াতের যুক্তিযুক্ত অর্থ নিরূপণে ইজতিহাদ প্রয়োজন, যা সাধারণ মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُوذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

কোনো ব্যক্তি যদি মুখাবারা (বর্গাচাষ) পরিত্যাগ না করে, তবে সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। —(আবূ দাউদ, কিতাবুল বুয়ূ'; পৃঃ ৪৮৩)

এখানে বাহ্যত অস্পষ্টতা এই যে, মুখাবারা (ভূমি চাষ ব্যবস্থা) বহু প্রকারের হতে পারে। যথা– টাকার বিনিময়ে, ফসলের অংশের বিনিময়ে, নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের বিনিময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানের ফসলের বিনিময়ে ইত্যাদি। এ হাদীসে কোন ধরনের মুখাবারা উদ্দেশ্য তা নির্ণয় করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা উক্ত আয়াত ও হাদীসে যে অস্পষ্টতা রয়েছে তা নিরসনে হয়তো প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বিবেক ও বিবেচনা অনুযায়ী আমল করবে অথবা কোনো মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ করবে। আর এ কথা অনস্বীকার্য যে, এরূপ বিষয়ে সাধারণ মানুষ নিজ বিবেক অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে গেলে মারাত্মক ভ্রান্তির আশঙ্কা রয়েছে। তখন যত মানুষ তত মাযহাব সৃষ্টি হবে। ফলে

ইসলামের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হবে। এমনকি ইসলামের অস্তিত্বই আর অক্ষুণ্ন থাকবে না। পক্ষান্তরে কুরআন ও হাদীস বিশেষজ্ঞ মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণে সে আশঙ্কা নেই। এ কারণেই ইমাম চতুষ্টয়ের কোনো একজনের তাকলীদ ও অনুসরণ করাকে সর্বসম্মত রায় অনুসারে অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইমামের অনুসরণ করার মানে কুরআন ও হাদীসকে বাদ দেওয়া নয়; বরং কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করার জন্যই কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যাকার হিসাবে তাদের অনুসরণ করা। কেননা তাদের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করা সম্ভব নয়; বরং সেটা হবে নফস পরস্তী বা আত্মপূজা। পক্ষান্তরে যারা তাকলীদের বিরুদ্ধে প্রলাপোক্তি করে তারাও প্রকৃতপক্ষে কারো না কারো অবশ্যই তাকলীদ করে। যেমন এ হাদীসটি সহীহ বা য'ঈ,ফ দুর্বল বা মুনকার-এ কথা আমরা কিভাবে বলতে পারি? যারা সারা জীবন সাধনা করে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন তাদের অনুসরণ করেই আমরা এ কথা বলি। আমরা বলি এ হাদীসটি বুখারী শরীফে আছে, কাজেই এটি সহীহ। এভাবে বলে আমরা কি মূলত ইমাম বুখারী (র.)-এর অনুসরণ (তাকলীদ) করছি না? এ ক্ষেত্রে যদি তাকলীদ বৈধ হয় তাহলে ফিক্‌হের ক্ষেত্রে তাকলীদ বৈধ হবে না কেন?

বস্তুত তাকলীদ দু'প্রকার ঃ (১) তাকলীদে মুতলাক (২) তাকলীদে শাখ্‌সী। (১) তাকলীদে মুতলাক মানে হলো, নির্দিষ্ট কোনো ইমামের তাকলীদ না করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইমামের মতের অনুসরণ করা। (২) তাকলীদে শাখসী অর্থাৎ শরিয়তের সামগ্রিক বিষয়ে নির্দিষ্ট একজন ইমামের অনুসরণ করা। স্মর্তব্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় তাকলীদের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা তখন সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেই সমাধান পাওয়া যেতো; কিন্তু তাঁর ইনতিকালের পর ওহীর মাধ্যমে নতুন বিষয়ে সমাধান লাভ করার ধারা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ইজতিহাদ ও তাকলীদের সূচনা হয়। তবে সাহাবীগণের মধ্যে তাকলীদে মুতলাকই অধিক প্রচলিত ছিল। এই তাকলীদে মুতলাকের ধারা ক্রমান্বয়ে তাকলীদে শাখসীতে রূপান্তরিত হতে থাকে। অতঃপর হানাফী, মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলী এই চার মাযহাবের কোনো একটির অনুসরণ (তাকলীদে শাখসী) -এর উপর মুসলিম উম্মাহর ইজমা সংঘটিত হয়। বর্তমানে তাকলীদ বলতে তাকলীদে শাখসীকেই বুঝানো হয়ে থাকে। তাকলীদে শাখসীর অপরিহার্যতার উপর কুরআন এবং হাদীসেও বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। অধিকন্তু এই দাবিটি যুক্তিসম্মতও বটে। কেননা কুরআন ও হাদীসের সঠিক মর্ম উদ্ধার করে এর উপর আমল করা সকল মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই শরিয়ত মুতাবিক আমল করার জন্য কোনো না কোনো ইমামের অনুসরণ অবশ্যই অপরিহার্য।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

তোমরা যদি না জান, তবে আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের ইলম (জ্ঞান) যাদের আছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

— (১৬—৪৩)

এ আয়াতে যারা জানে না তাদেরকে আলিমদের নিকট জিজ্ঞাসা করার হুকুম করা হয়েছে। এর দ্বারা তাকলীদের আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়। তাকলীদে শাখসীর অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, اِنِّىْ لَا اَدْرِىْ مَا بَقَائِىْ فِيْكُمْ فَاقْتَدُوْا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِىْ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ (رضـ)

আমি জানি না, কতদিন পর্যন্ত তোমাদের মাঝে আমার অবস্থান থাকবে। সুতরাং তোমরা আমার পরে এই দুই জনের অনুসরণ (তাকলীদ) করবে। অর্থাৎ আবূ বক্‌র ও ওমরের অনুসরণ করবে। — (মিশকাত, তিরমিযী; পৃঃ ৫৬০)

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরবর্তীতে দু'জন খলীফার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং তাদের খিলাফতকালে তাদেরকে অনুসরণ করার নির্দেশও এতে বিদ্যমান রয়েছে। আর এ কথা সকলেরই জানা যে, এক সময় একজনই মাত্র খলীফা হয়ে থাকেন, দু'জন নয়। সুতরাং যিনি যখন খলীফা থাকবেন, তখন শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করতে হবে। বলা বাহুল্য নির্দিষ্ট কোনো একজনের কথা মান্য করাকেই তাকলীদে শাখসী বলা হয়। অতএব তাকলীদে শাখসীর অপরিহার্যতার কথা উক্ত হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তাকলীদে শাখসীর অপরিহার্যতার বিষয়টি যৌক্তিকভাবেও প্রমাণিত। কেননা পূর্ববর্তী মুসলমানদের সময়কাল নবী কারীম ﷺ-এর যুগের কাছাকাছি হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে প্রবৃত্তির অনুসরণ ছিল না বললেই চলে। তাঁরা সুবিধা লাভের নিমিত্তে "তাকলীদে মুতলাক" করতেন না; বরং যখন যে বিষয়ে যে ফয়সালা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতেন, তখন তাঁরা তাঁর ফয়সালাই

গ্রহণ করতেন। পক্ষান্তরে পরবর্তীতে মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং সুবিধা লাভের নিমিত্তে নিজ নিজ চাহিদা মতো বিভিন্ন মুজতাহিদের ফয়সালা গ্রহণের প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে উঠে। এহেন অবস্থায় তাকলীদে মুতলাক অনুযায়ী যে কোনো ইমামের অনুসরণের দ্বারা অবারিত থাকলে শর'ঈ বিধি-বিধান খেল-তামাশায় পরিণত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। যেমন– ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে তাতে অজু ভঙ্গ হয় না, কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে মহিলাদের শরীর স্পর্শ করলে তাতে অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে এতে অজু ভঙ্গ হয় না। এ অবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত মতপার্থক্যের সুযোগ নিয়ে রক্ত প্রবাহিত অবস্থায় ইমাম শাফিঈ (র.) -এর এবং মহিলাদের শরীর স্পর্শ করার অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অনুসরণের দাবি করে তবে তা বৈধ হবে না। কারণ এরূপ করা সুবিধাবাদী মনোভাবের পরিচায়ক। এহেন সুবিধাবাদের দ্বারা শরিয়তের মাসআলা মাসাইল হালকা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ জন্যই মাযহাব চতুষ্টয়ের কোনো এক ইমামের নির্দিষ্টভাবে তাকলীদ করা অপরিহার্য। উল্লিখিত কারণে হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর ওলামায়ে কেরামের যুগে "তাকলীদে মুতলাকের" অনুমতি রহিত হয়ে তাকলীদে শাখসী তথা চার ইমামের মধ্য হতে নির্দিষ্ট কোনো এক ইমামের অনুসরণ (তাকলীদ) ওয়াজিব হওয়ার উপর ইজমা সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য যে, এই চার মাযহাবের অনুসারীগণ সকলেই "আহলে হক" এবং আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত।

ফকীহ্ ও মুজতাহিদগণের শ্রেণীবিন্যাস

আল্লামা শামসুদ্দীন ইব্নে কামাল পাশা (র.) বলেছেন, ফকীহ ও মুজতাহিদগণ সাতশ্রেণীতে বিভক্ত।

১. মুজতাহিদ ফিশ শারয়ি (مُجْتَهِدٌ فِى الشَّرْعِ)।

২. মুজতাহিদ ফিল মাযহাব (مُجْتَهِدٌ فِى الْمَذْهَبِ)।

৩. মুজতাহিদ ফিল মাসাইল (مُجْتَهِدٌ فِى الْمَسَائِلِ)।

৪. আসহাবুত তাখরীজ (اَصْحَابُ التَّخْرِيْجِ)।

৫. আসহাবুত তারজীহ (اَصْحَابُ التَّرْجِيْحِ)।

৬. আসহাবুত তাময়ীয (اَصْحَابُ التَّمْيِيْزِ)।

৭. মুকাল্লিদীনে মাহয (مُقَلِّدِيْنِ مَحْضٍ)।

প্রথম শ্রেণী : মুজতাহিদ ফিশ শারয়ি (مُجْتَهِدٌ فِى الشَّرْعِ)। তাঁরা হলেন, ঐ সমস্ত মহান ফুকাহা ও মুজতাহিদীনে কেরাম যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইজতিহাদের সর্বোচ্চ যোগ্যতা দান করেছেন। তারা স্বাধীনভাবে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস হতে ইজতিহাদ করে মাসাইল বের করতে সক্ষম এবং اُصُوْل ও فُرُوْع -এর ক্ষেত্রে কারো নির্ধারিত নীতিমালার অনুসারী বা মুকাল্লিদ নন; বরং তারা নিজেরাই কুরআন হাদীস থেকে ইজতিহাদের নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। তাদেরকে মুজতাহিদে মুতলাক (مُجْتَهِدْ مُطْلَقْ) এবং মুজতাহিদে মুস্তাকিল (مُجْتَهِدْ مُسْتَقِلْ)-ও বলা হয়। তাঁরা হলেন; চার ইমাম তথা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এবং সে যুগের আরো কতিপয় ইমাম।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ মুজতাহিদ ফিল মাযহাব (مُجْتَهِدْ فِى الْمَذْهَبْ)। তাঁরা ঐ সকল ফিক্হবিদ যারা মুজতাহিদে মুতলাকের কোনো ইমামের নির্ধারিত মূলনীতি অনুসরণ করে সে আলোকে ইজতিহাদ পূর্বক কুরআন ও হাদীস থেকে মাসাইল আহরণ করেন। এই শ্রেণীর মুজতাহিদগণকে মুজতাহিদে মুনতাসাব (مُجْتَهِدْ مُنْتَسِبْ)-ও বলা হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার, ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক প্রমুখ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় শ্রেণী : মুজতাহিদ ফিল মাসাইল (مُجْتَهِدْ فِى الْمَسَائِلْ)। তাঁরা এ সকল ফিক্হবিদ : যারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের ইমামগণের পক্ষ হতে যে সকল বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়নি সে সকল ক্ষেত্রে ইমামের নির্ধারিত

মূলনীতি অনুসরণ করে ফয়সালা দিতে এবং মাসাইল আহরণ করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে ইমামের বর্ণিত সিদ্ধান্ত ও মতামতের বিষয়ে দ্বিমত পোষণের অধিকার এই শ্রেণীর মুজতাহিদগণের নেই। ইমাম তাহাবী, ইমাম কারখী, ইমাম সারাখসী (র.) প্রমুখ এই শ্রেণীর ফকীহগণের অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ শ্রেণী : আসহাবুত তাখরীজ (اَصْحَابُ التَّخْرِيْج) । তাঁরা ঐ সকল ফিক্হবিদ যাদের মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা বিদ্যমান নেই। তবে উসূল ও নীতির উপর পারদর্শিতা থাকার কারণে মাযহাবের ইমামগণ থেকে বর্ণিত কোনো অস্পষ্ট (مُجْمَل) বাক্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং দ্ব্যর্থবোধক (ذُو الْوَجْهَيْن) বাক্যের কোনো একটিকে নির্ধারিত করার তাদের যোগ্যতা রয়েছে। ইমাম আবূ বকর রাযী এবং হিদায়া গ্রন্থকার শায়খ বুরহান উদ্দীন মুরগীনানী (র.) এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম শ্রেণী : আসহাবুত তারজীহ (اَصْحَابُ التَّرْجِيْح)। তাঁরা ঐ সকল ফিক্হবিদ যাদের কাজ হলো ইমামের পক্ষ থেকে কোনো বিষয়ে বর্ণিত একাধিক মতামতের কোনো একটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। অগ্রাধিকার নির্ণয়ের সময় তাঁরা বলেন, هٰذَا اَوْلٰى (এটি উত্তম), هٰذَا اَصَحُّ (এটি বিশুদ্ধতম), هٰذَا اَوْفَقُ بِالْقِيَاسِ (এটি অধিক যুক্তিযুক্ত) ইত্যাদি। ইমাম কুদূরী প্রমুখ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ শ্রেণী ঃ আসহাবুত তাময়ীয (اَصْحَابُ التَّمْيِيْز)। তাঁরা ঐ সকল ফিক্হবিদ যারা ইমামে মাযহাবের মুকাল্লিদ। তাদের কাজ হলো ইমামগণের সিদ্ধান্ত ও মতামত দলিলের ভিত্তিতে কোনটি সবল এবং কোনটি দুর্বল তা নির্ণয় করা। বিকায়া, কানয, মুখতার ইত্যাদি গ্রন্থের গ্রন্থকারগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

সপ্তম শ্রেণী : মুকাল্লিদীনে মহায (مُقَلِّدِيْن مَحْض)। তাঁরা এ সমস্ত ওলামায়ে কেরাম যারা উল্লিখিত যোগ্যতা সমূহের কোনো একটির উপরও ক্ষমতা রাখে না, যারা দুর্বল ও সবলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না এবং যেখানে যে ধরনের মতামত পায় তাই বর্ণনা করে থাকে। এ সকল আলিমকে নিছক মুকাল্লিদ বলা হয়। তাদের নিজস্ব মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। — (শামী; ১ম খণ্ড; পৃ : ৭৭)।

ফিকহে হানাফীর বিভিন্ন পরিভাষা

ইসলামের বিধান মতে মানুষের কাজগুলো দু'ভাগে বিভক্ত ১. মাশরু (مَشْرُوْع) অর্থাৎ শরিয়ত সম্মত ও শরিয়ত অনুমোদিত। ২. গায়রে মাশরু (غَيْرُ الْمَشْرُوْع) অর্থাৎ শরিয়ত পরিপন্থী কাজ। শরিয়ত সম্মত এবং শরিয়ত অনুমোদিত কার্যাবলি আবার সাত প্রকার ১. ফরজ, ২. ওয়াজিব, ৩. সুন্নত, ৪. মোস্তাহাব ৫. হারাম, ৬. মাকরূহ তাহরীমী, ৭. মাকরূহ তানযীহী, ৮. মুবাহ।

১. ফরজ : অর্থ– অবশ্য পালনীয়। আল্লাহ তা'আলার অলঙ্ঘনীয় আদেশ যা দলিলে কাতঈ অর্থাৎ অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। যাতে সন্দেহের কোনোরূপ অবকাশ নেই। যেমন ইসলামের পাঁচ রুক্ন যা কুরআন মাজীদের অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। কেউ যদি এ হুকুমকে অস্বীকার করে তবে কাফির বলে গণ্য হবে। আর তরক করলে ফাসিক বলে গণ্য হবে।

ফরজ দু'প্রকার ঃ ১. ফরজে আইন যা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। ২. ফরজে কিফায়া-যা আদায় করা সকল মুসলমানদের উপর ফরজ নয়; বরং সমাজের কিছু লোক আদায় করলে তা সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। কিন্তু কেউই যদি আদায় না করে তবে সকলেই গুনাহগার হয়ে যাবে। যেমন জানাযার নামাজ, জিহাদ ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, ফরজে কিফায়ার ক্ষেত্রেও আদায়ের আগে সমাজের সকল মুসলমানই এর জন্য مَسْئُوْل (জিম্মাদার)। কিন্তু সমাজের কিছু লোক তা আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকেই তা আদায় হয়ে যায়।

২. ওয়াজিব : ওয়াজিবও ফরজের ন্যায় অবশ্য পালনীয়। তবে আকীদাগত দিক থেকে ওয়াজিব এবং ফরজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা ফরজ প্রমাণিত হয়েছে দলিলে কাত'ঈ তথা অকাট্য দলিল দ্বারা। আর ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে দলিলে যন্নী দ্বারা, যাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যেমন– সাদাকাতুল ফিত্র, বিতরের নামাজ এবং দুই ঈদের নামাজ ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, কেউ যদি ওয়াজিবকে অস্বীকার করে তবে সে কাফির হবে না।

৩. সুন্নত : ফরজ বা ওয়াজিব ব্যতীত দীনের যে সকল কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে করেছেন, করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন বা অনুমোদন করেছেন, শরিয়তের পরিভাষায় একে সুন্নত বলা হয়। এ ছাড়া খোলাফায়ে রাশিদীন যে সকল কাজ প্রবর্তন করেছেন, সেগুলোকেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন– হাদীসে বর্ণিত আছে,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعُضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ .

তোমাদের জন্য অপরিহার্য হলো আমার সুন্নত এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরা। —(মিশকাত; পৃ: ৩০)

সুন্নত দু'প্রকার ঃ ১. সুন্নতে মুআক্কাদা, ২. সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদা।

১. সুন্নতে মুআক্কাদা : যে সব কাজ নবী কারীম ﷺ ইবাদত হিসাবে নিয়মিতভাবে পালন করেছেন। তবে ওজরবশতঃ কখনো ছেড়েও দিয়েছেন। আমলের দিক থেকে সুন্নতে মুআক্কাদা ওয়াজিবের কাছাকাছি; বিনা কারণে তা বর্জন করা বা বর্জনের অভ্যাস করে নেওয়া অনুচিত ও গুনাহের কাজ।

২. সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদা : যে সকল কাজ নবী কারীম ﷺ অভ্যাসগতভাবে নিয়মিত করেছেন এবং বিনা কারণে কখনো তা ছেড়েও দিয়েছেন। এ কাজ যারা করবেন তাঁরা ছওয়াবের অধিকারী হবেন। কিন্তু না করলে কোনো গুনাহ হবে না। — (ফাতওয়া ও মাসাইল; ১ম খণ্ড; পৃ : ৩৩-৩৪)

৪. মোস্তাহাব : যে সব কাজ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো লোকদেরকে উৎসাহিত করেছেন। মোস্তাহাব কাজ আদায় করলে ছওয়াবের অধিকারী হওয়া যাবে; কিন্তু না করলে কোনো গুনাহ হবে না। ফকীহদের পরিভাষায় মোস্তাহাবকে নফল (نَفْل) মানদুব (مَنْدُوْب) এবং তাতাওউ' (تَطَوُّع) ও বলা হয়।

৫. হারাম : যে সব কাজ নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই তাকে হারাম বলা হয়। যেমন কাউকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা, মদ পান করা, চুরি করা ও জেনা করা ইত্যাদি। বিনা ওজরে কেউ হারাম কাজ করলে সে ফাসিক বলে গণ্য হবে এবং কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হবে। আর কেউ যদি তা অস্বীকার করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

৬. মাকরূহ তাহরীমী : যে কাজ নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং দলিলে যন্নী দ্বারা প্রমাণিত। বিনা ওজরে এসব কাজ গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৭. মাকরূহ তানযীহী : যে কাজের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি শরিয়তে দৃঢ়তার সাথে প্রমাণিত নয় এবং যা বর্জন করলে ছওয়াব পাওয়া যায় কিন্তু করলে শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হবে না; বরং অনুচিত কাজ করেছে বলে বিবেচিত হবে।

৮. মুবাহ : যে কাজ করাতে কোনো ছওয়াব নেই এবং না করাতেও কোনো গুনাহ নেই। ইচ্ছা করলে তা করতে পারবে, আবার ইচ্ছা করলে তা নাও করতে পারবে।

— (আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু; ১ম খণ্ড; পৃ : ৫২ - ৫৩)

শর্ত ও রুকন : مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُوْدُ الشَّيْءِ وَكَانَ خَارِجًا عَنْ حَقِيْقَتِهِ

কোনো বস্তুর অস্তিত্ব যার উপর নির্ভরশীল এবং যেটি এ বস্তুর হাকীকত থেকে খারিজ, একে শর্ত বলা হয়। আর যদি সে জিনিসটি ঐ বস্তুর হাকীকতের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে একে রুকন বলা হয়। যেমন অজু নামাজের জন্য শর্ত কিন্তু রুকু সিজদা নামাজের রুকন।

সহীহ, ফাসিদ ও বাতিল : هُوَ مَا اسْتَوْفٰى اَرْكَانَهُ وَ شُرُوْطَهُ الشَّرْعِيَّةَ

যে কাজে শরিয়ত কর্তৃক আরোপিত শর্ত ও শরিয়ত অনুমোদিত রুকনসমূহ সমভিব্যাহারে পাওয়া যায় তাকে সহীহ বলা হয়। আর যার মধ্যে এসব কিছু পাওয়া যাবে না সেটি সহীহ বলে গণ্য হবে না। যদি মূল বিষয় বা "মূল আক্দে" কোনো ত্রুটি থাকে তবে একে বাতিল বলা হয়। আর যদি গুণাগুণ বা وَصْف-এর মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকে তবে একে ফাসিদ বলা হয়। কোনো আমল নির্ধারিত সময়ের ভেতর সম্পাদন করাকে আদা (اداء) বলা হয়, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সম্পাদন করাকে কাযা (قَضَاء) বলা হয়, আর সময়ের ভেতর পুনঃ সম্পাদন করাকে দুহরানো (إِعَادَة) বলা হয়। —(প্রাগুক্ত; পৃ : ৫৫-৫৬)

হিদায়া প্রণেতার জীবনী ও তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী (র.) হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ফকীহ এবং হিদায়া গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর নাম আলী, উপনাম আবুল হাসান, উপাধি বুরহান উদ্দীন, পিতার নাম আবূ বকর। বংশ পরিচয় নিম্নরূপ : আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ বকর ইবনে আবদুল জলীল ইবনে খলীল (র.)। তিনি হযরত আবূ বরক সিদ্দীক (র.)-এর বংশধর। তিনি ফারগানা প্রদেশের মুরগীনান শহরের অধিবাসী ছিলেন বিধায় তাঁকে মুরগীনানী বলা হয়। তিনি ৫১১ হিজরি সনে ৮ই রজব সোমবার বাদ আসর জন্মগ্রহণ করেন। আল্লামা বুরহানউদ্দীন (র.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির। এ ছাড়া ইসলামের বিভিন্ন বিষয়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাকওয়া ও পরহেযগারীর দিক দিয়েও তিনি সে যুগের অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আল্লামা ইব্‌নে কামাল পাশা (র.) তাঁকে তাবাকাতে ফুকাহার আসহাবুত তারজীহ (পঞ্চম শ্রেণী)-এর মধ্যে গণ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে মুজতাহিদ ফিল মাযহাবও বলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি চতুর্থ শ্রেণীর ফকীহ তথা আসহাবুত তাখরীজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শায়খ মুরগীনানী বহু সংখ্যক খ্যাতনামা ফকীহ ও মু াদ্দিসের নিকট থেকে বভিন্ন বিষয়ের ইলম হাসিল করেছেন। তাঁদের মধ্য হতে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. মুফতী উস সাকালায়ন নাজমুদ্দীন আবূ হাফস ওমার নাসাফী (র.) (ইনি আকাইদ বিষয়ক বিশ্ববিখ্যাত নাসাফিয়্যা গ্রন্থের প্রণেতা)। ২. ইমাম সদরুশ শহীদ হুসামুদ্দীন ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (র.), ৩. ইমাম যিয়াউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে হুসায়ন (র.), ৪. ইমাম কিওয়ামুদ্দীন (قِوَامُ الدِّيْنِ) আহমদ ইবনে আবদুর রশীদ আল বুখারী (র.), ৫. আবুল লায়স আহমদ ইবনে ওমর (র.), ৬. আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান (র.), ৭. মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে মাসউদ (র.), ৮. ওসমান ইবনে ইব্‌রাহীম (র.), ৯. শায়খুল ইসলাম বাহাউদ্দীন (র.), ১০. মিনহাজুশ শরীআহ মুহাম্মদ ইবনে হুসায়ন (র.) প্রমুখ।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন (র.)-এর নিকট থেকে যারা ইলম হাসিল করার সুযোগ লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম জালালুদ্দীন (র.), শায়খুল ইসলাম ইমামুদ্দীন (র.), কাযিউল কুযাত মুহাম্মদ ইবনে আলী (র.), শামসুল আইম্মা মুহাম্মদ ইবনে আবদুস সাত্তার কুরদী (র.) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বুরহানুদ্দীন (র.) ৫৯৩ হিজরি সনের জিলহজ মাসের ১০ তারিখে ইনতিকাল করেন। তিনি ইনতিকালের সময় তিন পুত্র রেখে যান। তাঁরা তৎকালীন যুগে খ্যাতনামা আলিম হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।— (আনওয়ারুল বারী; ২য় খণ্ড-পৃ : ১১২) ইনতিকালের পর তাকে সমরকন্দ শহরে দাফন করা হয়। (কাশফুয যুনূন)।

শায়খ বুরহান উদ্দীন (র.) বহু গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদি প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো (১) مَجْمُوعُ النَّوَازِلِ (মাজমূউন নাওয়াযিল), (২) مُنْتَقَى (মুনতাকা), (৩) تَجْنِيْس (তাজনীস), (৪) مَزِيْد (মাযীদ), ৫. مَنَاسِكُ الْحَجِّ (মানাসিকুল হজ), (৬) نَشْرُ الْمَذْهَب (নাশরুল মাযহাব), (৭) كِتَابُ الْفَرَائِضِ (কিতাবুল ফারাইয), (৯) مُخْتَارَاتُ النَّوَازِلِ (মুখতারাতুন নাওয়াযিল), (১০) بِدَايَةُ الْمُبْتَدِىْ (বিদায়াতুল মুবতাদী), (১১) كِفَايَةُ الْمُنْتَهِىْ (কিফায়াতুল মুন্‌তাহী), (১২) هِدَايَةْ (হিদায়া)।

হিদায়া গ্রন্থের গুরুত্ব ও এর মর্যাদা

ফিক্‌হ জগতে, বিশেষত হানাফী ফিক্‌হের পরিমণ্ডলে হিদায়া একটি মৌলিক ও বুনিয়াদী কিতাব। এক কথায় একে ফিকহে হানাফীর বিশ্বকোষ বলা যায়। বস্তুত সুদীর্ঘ আট শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহতভাবে এ গ্রন্থ ফিক্‌হ জগতে হানাফী মাযহাবের প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। এমনকি পাক ভারত উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক শাসন কালেও বিচার বিভাগে হিদায়াকে সিদ্ধান্তমূলক গ্রন্থের মর্যাদা প্রদান করা হয়। পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিদায়া গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয়ে থাকে। এ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিদ্যাঙ্গনে এই কিতাবটি পাঠ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে। এ কিতাবটিকে কেন্দ্র করে যত গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে এবং যত ব্যাখ্যা, ভাষ্য, টীকা ও পর্যালোচনা গ্রন্থ এ পর্যন্ত রচিত হয়েছে তা অন্য কোনো ফিক্‌হ গ্রন্থের ক্ষেত্রে হয়নি।

গবেষক ও সূক্ষ্মদর্শী আলিমগণ হিদায়া কিতাবের এ অসাধারণ জনপ্রিয়তার দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো, কিতাবের নিজস্ব গুণ ও বৈশিষ্ট্য। হিদায়া প্রণেতা শায়খ বুরহানুদ্দীন (র.) নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, "হানাফী ফিকহের মতন (مَتْنٌ) গুলোর মাঝে প্রামাণ্যতা, ব্যাপকতা, সার্বিকতা ও সুসংক্ষিপ্ততার দিক থেকে اَلْجَامِعُ الصَّغِيْرُ এবং مُخْتَصَرُ الْقُدُوْرِيْ ছিল শীর্ষস্থানীয়।" তাই এ দু'টো কিতাবকে সামনে রেখে তিনি بِدَايَةُ الْمُبْتَدِيْ নামে একটি মতন (বা মূলগ্রন্থ) সংকলন করেছেন। ফলে তাতে দু'টি মূল গ্রন্থের যাবতীয় গুণ ও পূর্ণতার সমাবেশ ঘটে। এরপর তিনি প্রায় আশি খণ্ডে উক্ত মূল গ্রন্থটির একটি সুবিশদ ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং এর নামকরণ করেন كِفَايَةُ الْمُنْتَهِيْ করে। كِفَايَةُ الْمُنْتَهِيْ নামক এই সুবিশাল ব্যাখ্যা গ্রন্থে তিনি ইসলামি ফিক্‌হ ভাণ্ডারের যাবতীয় গবেষণালব্ধ ও ইজতিহাদ ভিত্তিক আলোচনার অবতারণা করেন। এই সুবিশাল গ্রন্থ বর্তমানে যদিও نَادِرُ الْوُجُوْدِ (দুষ্প্রাপ্য), তথাপিও মাননীয় লেখকের সম-সাময়িক যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহগণ অতিউচ্ছ্বাসিত ভাষায় এর প্রশংসা করেছেন এবং একে মানব সাধ্যের চূড়ান্ত সাধনা বলে অভিহিত করেছেন। অতঃপর তিনি কিতাবটির এই দীর্ঘ কলেবরের প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং ভাবলেন যে, হয়তো এ কারণে কিতাবটি পরিত্যক্ত হতে পারে। তাই তিনি আশি খণ্ডের এই সুবিশাল গ্রন্থের মহাসমুদ্রের নির্যাস নিয়ে সংক্ষিপ্ত (অথচ পূর্ণাঙ্গ) কলেবরে চার খণ্ডের হিদায়া এ গ্রন্থখানি সংকলন করেন। গ্রন্থকার (র.) ৫৭৩ হিজরি সনের জিলকাদ মাসের বুধবার দিন জোহরের নামাজের পর এ গ্রন্থখানির রচনা কর্মের শুভ সূচনা করেন। কেননা হাদীসে আছে– مَا مِنْ شَيْءٍ بُدِئَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ اِلَّا تَمَّ

যে কোনো জিনিস বুধবার দিন আরম্ভ করা হলে তবে তা পূর্ণতায় পৌছে যায়।

অতঃপর দীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত নিরলস সাধনা ও নিরবচ্ছিন্ন মেহনত করে তিনি এ গ্রন্থ সংকলনের কাজ সুসমাপ্ত করেন। এ গ্রন্থখানি مُخْتَصَرٌ (সংক্ষিপ্ত) হওয়ার পাশাপাশি جَامِعٌ (ব্যাপক) এবং مُحَقَّقٌ (এর প্রতিটি কথা সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত)ও বটে। এ কারণেই এর এত বিপুল জনপ্রিয়তা। সর্বোপরি এটি এমন একটি কিতাব যাতে পক্ষ-বিপক্ষ প্রত্যেক ইমামের প্রতিটি মাসআলার সমর্থনে دَلَائِلُ نَقْلِيَّةٌ অর্থাৎ উৎসভিত্তিক প্রমাণের পাশাপাশি دلائل عَقْلِيَّةٌ অর্থাৎ যুক্তিগত প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এতে এর যাবতীয় সূত্র ও পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক কারণেই কিতাবখানি সকল মহলে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র.)-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, হিদায়া কিতাবের বিশ্ব বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতহুল কাদীরের মতো উঁচুমানের কিতাব রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব কিনা? জবাবে তিনি বললেন, খুবই সম্ভব। অতঃপর পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হিদায়ার মতো কোনো কিতাব লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব কি না? জবাবে তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, আমার পক্ষে এর এক ছত্র লেখাও সম্ভবপর নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি তাঁর কোনো অতিশয়োক্তি ছিল না; বরং এ ছিল তাঁর গ্রন্থটির সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন।

হিদায়া প্রণেতা শায়খ বুরহানুদ্দীন (র.) তনয় শায়খ ইমাদুদ্দীন (র.) হিদায়াগ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,

كِتَابُ الْهِدَايَةِ يَهْدِيْ الْهُدٰى * اِلٰى حَافِظِيْهِ وَيَجْلُو الْعَمٰى
فَلَازِمْهُ وَاحْفَظْهُ يَاذَاالْحِجٰى * فَمَنْ نَالَهٗ نَالَ اَقْصَى الْمُنٰى

হিদায়া কিতাবখানি হিদায়েতের পথ নির্দেশ দান করে। এর সংরক্ষণকারীদের (জাহালতের) অন্ধত্ব দূর করে। সুতরাং হে জ্ঞানবান! তুমি একে আঁকড়ে ধর এবং সংরক্ষণ কর। বস্তুত যে ব্যক্তি হিদায়া প্রদর্শিত হিদায়েত লাভ করল সে চরম লক্ষ্য অর্জনে ধন্য হলো। — (যফরুল মুহাস্‌সিলীন; পৃ : ১৯৭)

হিদায়া গ্রন্থের পাদটীকা লেখক শায়খ হাদ্দাদ (র.) বর্ণনা করেন যে, কোনো এক কবি মনীষী হিদায়াগ্রন্থের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করে বলেছেন,

اِنَّ الْهِدَايَةَ كَالْقُرْاٰنِ قَدْ نَسَخَتْ * مَا صَنَّفُوْا قَبْلَهَا فِي الشَّرْعِ مِنْ كُتُبٍ
فَاحْفَظْ قِرَاءَتَهَا وَالْزَمْ تِلَاوَتَهَا * يَسْلَمْ مَقَالُكَ مِنْ زَيْغٍ وَمِنْ كَذِبٍ

হিদায়া গ্রন্থটি কুরআনের মতোই "ফিক্‌হ বিষয়ে লিখিত পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবকে" রহিত করে দিয়েছে। শরিয়তের বিষয়ে এর আগে এ ধরনের কোনো কিতাব কেউ আর রচনা করতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং তোমরা এর পাঠ সংরক্ষণ করবে এবং নিয়মিতভাবে তা পাঠ করবে। তাহলে তোমার অভিব্যক্তি ও বক্তৃতা মিথ্যার স্পর্শ থেকে নিরাপদ থাকবে।

দ্বিতীয় যে কারণটি আলিম, ফকীহ ও বিদগ্ধ সমাজে বহু শতাব্দী ব্যাপী অনন্য সাধারণ জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা এনে দিয়েছে তা হলো, গ্রন্থকারের ইখলাস লিল্লাহিয়্যাত, তাকওয়া এবং আল্লাহ প্রেমে আত্ম নিবেদন। একটি মাত্র ঘটনা থেকে সাহিবুল হিদায়ার এই অত্যুজ্জ্বল দিক সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। আল্লামা আবদুল হাই লাখনৌবী (র.) বলেন, হিদায়া কিতাবের মকবূলিয়্যাত ও সর্বজন স্বীকৃত হওয়ার গূঢ় রহস্য এই যে, শায়খ বুরহানুদ্দীন (র.) সুদীর্ঘ তের বছর বিরামহীন সিয়াম পালনে রত থেকে এ গ্রন্থ রচনার কাজ সম্পন্ন করেছেন। আর এ সিয়াম পালনের বিষয়টি এমন গোপন রাখার চেষ্টা করেছেন যাতে তার খাদিমও তা জানতে না পারেন। খাদিম যখন খানা নিয়ে আসতো, তখন তিনি বলতেন, রেখে যাও। পরে কোনো তালিবুল ইলম, মুসাফির কিংবা আশে-পাশের কোনো ফকির মিসকিনকে ডেকে সে খাবার দিয়ে দিতেন। খাদিম যথা সময়ে ফিরে এসে খালি বর্তন নিয়ে যেতেন এবং ভাবতেন যে, তিনি খেয়ে নিয়েছেন। এ হলো, সালাফে সালিহীন এবং বর্তমান যুগের লেখক, গবেষক ও পণ্ডিত লোকদের মধ্যে পার্থক্য। আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী (র.) এ গূঢ়-রহস্য এ বলে ব্যক্ত করেছেন যে, "কী যেন একটা তাদের মাঝে ছিল। আর কী যেন একটা আমাদের মাঝে নেই।"

হিদায়া সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত কেউ কেউ এরূপ সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছে যে, এতে সাহিবুল হিদায়া হানাফী মাযহাবের পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ যেসব হাদীস পেশ করেছেন এর অনেক গুলোই য'ঈফ অর্থাৎ দুর্বল। এ অহেতুক অভিযোগের জবাবে হাদীসশাস্ত্রের প্রাজ্ঞ বহু মনীষী হিদায়ার হাদীসসমূহের তাখরীজ বিষয়ক বিভিন্ন মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং মূল সূত্র ও উৎস উল্লেখ করে প্রতিটি হাদীসের প্রামাণিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরেছেন। যেমন–

১. ইমাম মহীউদ্দীন আবদুল কাদীর ইবনে মুহাম্মদ আল কুরাশী (র.) রচিত اَلْعِنَايَةُ بِمَعْرِفَةِ اَحَادِيْثِ الْهِدَايَةِ
২. শায়খ আলাউদ্দীন (র.) রচিত اَلْكِفَايَةُ فِىْ مَعْرِفَةِ اَحَادِيْثِ الْهِدَايَةِ ৩. আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লাঈ (র.) রচিত نَصْبُ الرَّايَةِ لِاَحَادِيْثِ الْهِدَايَةِ ইত্যাদি গ্রন্থাবলী। —(যফরুল মুহাস্‌সিলীন– পৃ: ১৯৪ - ১৯৯)

হিদায়া প্রণেতার অনুসৃত নীতি ও পরিভাষা

সাহিবে হিদায়া এ কিতাব প্রণয়নে কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করেছেন- যা জানা অতীব জরুরি।

১. হিদায়া গ্রন্থে সাহিবে হিদায়া قَالَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ বলে নিজেকেই বুঝিয়েছেন। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) "মাদারিজুন নবুওয়াহ্" নামক গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শায়খ আবুস সউদ (র.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে হিদায়া প্রণেতা قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ عَفَا عَنْهُ বলেই স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে গ্রন্থ প্রণেতার ইনতিকালের পর তার কোনো এক শিষ্য বাক্যটিকে قَالَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ-এর দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। এ ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে নাম পুরুষের সীগার সাথে উল্লেখ করেননি। যাতে আত্মগরিমা বা অহঙ্কার বশত তিনি "নিজস্ব রায় পেশ করেছেন" বলে ধারণা না করা হয়। এটিই শীর্ষস্থানীয় ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনে কেরামের চিরন্তন অভ্যাস।

২. যে মতটি গ্রন্থাকারের নিকট পছন্দনীয় এর দলিল তিনি সর্বশেষে উল্লেখ করেন, যাতে এ দলিল পূর্বোল্লিখিত দললিসমূহের জবাব হয়ে যায়। অবশ্য মতামত উল্লেখ করার ক্ষেত্রে যেটি তুলনামূলক শক্তিশালী সেটিকে তিনি অগ্রে উল্লেখ করেন।

৩. সাহিবে হিদায়া যখন قَالَ مَشَائِخُنَا (আমাদের মাশায়িখে কেরাম বলেছেন) বলেন, তখন তিনি এর দ্বারা مَاوَرَاءُ النَّهْرِ তথা মেসোপটেমিয়ার মধ্য হতে বুখারা ও সমরকন্দের আলিমগণকে বুঝিয়ে থাকেন। اَلْعِنَايَةُ নামক গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। তবে আল্লামা কাসিম (র.) বলেন, مَشَائِخ বলতে সাহিবে হিদায়ার উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত ওলামায়ে কেরাম যারা ইমাম আযম (র.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করতে সক্ষম হননি।

৪. সাহিবে হিদায়া যেখানে فِىْ دِيَارِنَا (আমাদের দেশ) বলেছেন, সেখানে এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো مَاوَرَاءُ النَّهْرِ তথা মেসোপটেমিয়ার শহরসমূহকে বুঝানো। ফতহুল কাদীর গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৫. তিনি পূর্বোল্লেখিত আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য مَا تَلَوْنَا (যা আমরা তিলাওয়াত করেছি); পূর্বোল্লিখিত دَلِيْل عَقْلِىْ (যুক্তি ভিত্তিক প্রমাণ) -এর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য مَاذَكَرْنَا (যা আমরা উল্লেখ করেছি) বা مَا بَيَّنَّا (যা আমরা বর্ণনা করেছি) এবং পূর্বোল্লিখিত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য مَا رَوَيْنَا (যা আমরা রিওয়ায়াত করেছি) শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে কোথাও কোথাও তিনি পূর্বোল্লিখিত আয়াত বা হাদীস বা دَلِيْل عَقْلِىْ ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য مَا بَيَّنَّا শব্দও ব্যবহার করেছেন। اَلْكِفَايَة ও نَتَائِجُ الْاَفْكَارِ فِىْ كَشْفِ الرُّمُوْزِ وَالْاَسْرَارِ গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৬. অনেক সময় তিনি মূল মাসআলার উপর কুরআনের আয়াত দ্বারা اِسْتِدْلَالْ করেন, অতঃপর ঐ নসের عِلَّتْ (কারণ) বর্ণনা করেন। পরিণামে তা মূল মাসআলার উপর একটি স্বতন্ত্র دَلِيْل عَقْلِىْ -এর রূপ পরিগ্রহ করে। نَتَائِج اَفْكَارْ কিতাবে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৭. কখনো তিনি যুক্তিভিত্তিক দলিলকে فِقْه শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেন। যেমন– বলেন, اَلْفِقْهُ فِيْهِ كَذَا মিফ্‌তাহুস্ সাআদা গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৮. অনেক সময় তিনি একটি যুক্তিভিত্তিক দলিলের পর আরেকটি যুক্তিভিত্তিক দলিল উপস্থাপন করেন। এতে তার উদ্দেশ্য থাকে দ্বিতীয় দলিল দ্বারা প্রথম দলিলের لِمِّىْ এবং عِلَّتْ বর্ণনা করা। نَتَائِجُ الْاَفْكَارِ গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত আছে।

৯. مُدَّعِىْ (দাবি) -এর উপর দলিল পেশ করার পর কোথাও তিনি وَهٰذَا لِاَنَّ বলেছেন। এতে তার উদ্দেশ্য হলো, এ কথা ব্যক্ত করা যে, এখান থেকে دَلِيْل اِنِّىْ -এর পর دَلِيْل لِمِّىْ বর্ণনা করা হবে।

১০. اَلْاَصْلُ শব্দ দ্বারা মাবসূত কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করা তাঁর উদ্দেশ্য।

১১. গ্রন্থকার اَلْمُخْتَصَرُ শব্দ দ্বারা মুখ্‌তাসারুল কুদূরী বুঝিয়েছেন এবং اَلْكِتَابُ শব্দ দ্বারা জামে'উসসগীর কে বুঝানোই হলো তাঁর উদ্দেশ্য।

১২. বহু মাসআলার প্রারম্ভে গ্রন্থকার قَالَ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এ মাসআলা কুদূরী বা জামে' সগীর -এর মূল কিতাব থেকে উদ্ধৃত।

১৩. গ্রন্থকার (র.) সাধারণত বাবের শুরুতে কুদূরীর মাসআলা এবং বাবের শেষে জামে' সগীরের মাসআলা উল্লেখ করেছেন।

১৪. কুদূরী এবং জামে' সগীরের عِبَارَتْ -এর মধ্যে পার্থক্য থাকলে সে ক্ষেত্রে وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ বলে জামে' সগীরের বক্তব্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

১৫. যে ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের একাধিক অভিমত রয়েছে সে ক্ষেত্রে গ্রন্থকার (র.) قَالُوْا শব্দ ব্যবহার করেছেন।

১৬. সাহিবে হিদায়া যে ক্ষেত্রে هٰذَا الْحَدِيْثُ مَحْمُوْلٌ عَلٰى كَذَا বলেছেন, সেক্ষেত্রে এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো, এ কথা বর্ণনা করা যে, মুহাদ্দিসীনে কেরাম এই হাদীসকে এই অর্থের উপর প্রয়োগ করেন। আর যেখানে نَحْمِلُهُ বলেছেন সেখানে এর দ্বারা তার নিজেকে বুঝানো হলো উদ্দেশ্য।

১৭. عِنْدَ فُلَانٍ (অমুকের নিকট) -এর দ্বারা গ্রন্থকার (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো; অমুকের মাযহাব বর্ণনা করা। আর عَنْ فُلَانٍ (অমুক থেকে) যেখানে তিনি বলেছেন, এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো এ কথা বর্ণনা করা যে, এটি অমুকের একটি রিওয়ায়াত। কিন্তু এটি তার মাযহাব নয়।

১৮. যে ক্ষেত্রে মুসান্নিফ (র.) মাসআলা বর্ণনা করার পর এর নযীরও উল্লেখ করেছেন, সে ক্ষেত্রে তিনি মাসআলার প্রতি ইশারা করার জন্য اِسْم اِشَارَهْ قَرِيْب এবং নযীরের প্রতি ইশারা করার জন্য اِسْم اِشَارَهْ بَعِيْد ব্যবহার করেছেন।

১৯. তিনি বহু সম্ভাব্য প্রশ্নের سُوَالِ مُقَدَّرْ -এর উত্তর দান করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উত্তরকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ فَاِنْ قِيْلَ (যদি প্রশ্ন করা হয়) قُلْنَا كَذَا (তাহলে জবাবে আমরা বলব) এরূপ বলেননি। কিন্তু তিন স্থানে তিনি এ নীতির বিপরীত করেছেন। অর্থাৎ আদাবুল কাযীর দুই জায়গায় এবং কিতাবুল গসবের এক জায়গায় তিনি স্পষ্টভাবে প্রশ্ন উল্লেখ করে এর জবাব বিশ্লেষণ করেছেন।

২০. ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ শব্দটি গ্রন্থকার (র.) বহু স্থানে ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর রচিত ছ'খানা কিতাব থেকে সংগৃহীত মাসআলা বা মতামতের প্রতি ইঙ্গিত করা। সে ছ'খানা কিতাব হলো, (১) মাবসূত, (২) যিয়াদাত, (৩) জামে' সগীর, (৪) জামে' কবীর, (৫) সিয়ারে সগীর, (৬) সিয়ারে কবীর।

২১. ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত মাসআলাসমূহকে مَسَائِلُ النَّوَادِرِ বলা হয়। এসব মাসআলা ইমাম মুহাম্মদ (র.) কর্তৃক রচিত উল্লিখিত গ্রন্থাবলি ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো হলো,

১. কাইসানিয়্যাত (كَيْسَانِيَّاتٌ) -এ গ্রন্থ ইমাম মুহাম্মদ জনৈক কায়সান নামক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সংকলন করেছেন।

২. জুরজানিয়্যাত (جُرْجَانِيَّاتٌ) -এ গ্রন্থ তিনি জুরজান শহরে অবস্থান কালে সংকলন করেছেন।

৩. হারূনিয়্যাত (هَارُوْنِيَّاتٌ) -এ গ্রন্থ তিনি খলীফা হারূনুর রশীদের উদ্দেশ্যে সংকলন করেছেন।

৪. রাক্কীয়্যাত (رَقِّيَاتٌ) -এ গ্রন্থখানা তিনি রাক্কা শহরে অবস্থানকালে সংকলন করেছেন।

৫. আমালিয়ে মুহাম্মদ (اَمَالِىْ مُحَمَّدٌ) ইত্যাদি।

গ্রন্থকার (র.) এ কিতাবে صَاحِبَيْنِ (সাহেবাইন), شَيْخَيْنِ (শায়খাইন) এবং طَرْفَيْنِ (তরফাইন) শব্দগুলোও ব্যবহার করেছেন। صَاحِبَيْنِ বলে তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-কে, شَيْخَيْنِ বলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-কে এবং طَرْفَيْنِ বলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) কে বুঝিয়েছেন। — (যফরুল মুহাস্সিলীন, ফাতাওয়া মাসাইল; ১ম খণ্ড)

আশরাফুল হিদায়া (আরবি-বাংলা)-এর خُصُوْصِيَّاتٌ বা বৈশিষ্ট্য ঃ

১. প্রতি অধ্যায়ের শুরুতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সারগর্ভ আলোচনা এতে সন্নেবিশিত রয়েছে। এতে আরো রয়েছে উক্ত বিষয়ের গুরুত্ব, ফজিলত ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা ।

২. এতে হিদায়ার মূল ইবারতের সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ রয়েছে।

৩. এতে আরবি জটিল শব্দের প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ (حَلِّ لُغَاتٌ)-ও প্রদত্ত হয়েছে।

৪. প্রাসঙ্গিক আলোচনা শিরোনামের অধীনে এতে সংশ্লিষ্ট মাসআলার উপর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও প্রদত্ত হয়েছে।

৫. কুরআন মাজীদের আয়াতের ক্ষেত্রে সূরা ও আয়াত নম্বর প্রদান করা হয়েছে। (যা হিদায়ার মূল ইবারতে নেই)।

৬. হাদীসের ক্ষেত্রে এর মূল সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. হানাফী মাযহাবের প্রামাণিকতাকে বলিষ্ঠভাবে সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে এতে অতিরিক্ত دَلَائِلٌ (প্রমাণাদি)ও সংযোজন করা হয়েছে। বিশেষভাবে ইখতিলাফী মাসাইলের ক্ষেত্রে এ দিকে আরো লক্ষ্য বেশি রাখা হয়েছে।

৮. ফায়দা শিরোনামে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

৯. এতে হানাফী মাযহাবকে مُحَقَّقًا - مُدَلَّلًا সাব্যস্ত করা হয়েছে।

১০. মুকাদ্দিমাতুল কিতাব শিরোনামের অধীনে ফিক্‌হের পরিচিতি, সংজ্ঞা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ফিক্‌হের উৎপত্তি ও বিকাশ, তাকলীদ ইত্যাদির উপর গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে-যা ছাত্র, শিক্ষক এবং সাধারণ মুসলমান সকলের জন্যই উপকারী ও জরুরি।

(মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরিদী)
মুহ্‌তামিম
শেখ জনুরুদ্দিন দারুল কুরআন শামসুল উলূম
চৌধুরীপাড়া মাদ্‌রাসা, ঢাকা-১২১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَعْلٰى مَعَالِمَ الْعِلْمِ وَاَعْلَامَهُ وَاَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ وَاَحْكَامَهُ وَبَعَثَ رُسُلًا وَاَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ اِلٰى سَبِيْلِ الْحَقِّ هَادِيْنَ وَاَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ اِلٰى سَنَنِ سُنَنِهِمْ دَاعِيْنَ يَسْلُكُوْنَ فِيْمَا لَمْ يُؤْثَرْ عَنْهُمْ مَسْلَكَ الْاِجْتِهَادِ مُسْتَرْشِدِيْنَ مِنْهُ فِىْ ذٰلِكَ هُوَ وَلِيُّ الْاِرْشَادِ وَخَصَّ اَوَائِلَ الْمُسْتَنْبِطِيْنَ بِالتَّوْفِيْقِ حَتّٰى وَضَعُوْا مَسَائِلَ مِنْ كُلِّ جَلِيٍّ وَ دَقِيْقٍ غَيْرَ اَنَّ الْحَوَادِثَ مُتَعَاقِبَةُ الْوُقُوْعِ وَالنَّوَازِلَ يَضِيْقُ عَنْهَا نِطَاقُ الْمَوْضُوْعِ وَاقْتِنَاصُ الشَّوَارِدِ بِالْاِقْتِبَاسِ مِنَ الْمَوَارِدِ وَالْاِعْتِبَارُ بِالْاَمْثَالِ مِنْ صَنْعَةِ الرِّجَالِ وَبِالْوُقُوْفِ عَلَى الْمَاٰخَذِ يَعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ـ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য খাস যিনি ইলমের নিদর্শন ও ঝাণ্ডাসমূহ সমুন্নত করেছেন। যিনি শরিয়তের শি'আর তথা বৈশিষ্ট্যাবলি ও বিধি-বিধানসমূহকে সুপ্রকাশিত করেছেন, যিনি নবী-রাসূল ﷺ সকলকে সত্যের পথ প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছেন, আর যিনি আলিমগণকে তাঁদের স্থলবর্তী করেছেন যাঁরা (লোকদেরকে) তাঁদের সুন্নতের পথের দিকে আহবান করেন (এবং) যে সকল বিষয়ে তাঁদের (নবী-রাসূলগণের) থেকে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি সে সকল ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর থেকে পথ নির্দেশ প্রার্থনা করে ইজতিহাদের নীতি অনুসরণ করেন। আর আল্লাহই সঠিক পথ নির্দেশের অধিকারী।

আর তিনিই (আল্লাহই) প্রথম যুগের মুজতাহিদগণকে বিশেষভাবে তৌফিক দান করেছেন, ফলে তাঁরা স্পষ্ট ও সূক্ষ্ম সকল প্রকার মাসআলা (কিতাবাদিতে) সঙ্কলন করেছেন। কিন্তু উদ্ভূত সমস্যা যেহেতু পর্যায়ক্রমে ঘটমান, তাই নির্দিষ্ট কোনো আলোচ্য বিষয় এসব বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে পরিব্যাপ্ত করে নিতে অক্ষম। সর্বোপরি উৎস মূল থেকে বিচ্ছিন্ন মাসআলাসমূহ আহরণ বা সংগ্রহ করা এবং সদৃশ মাসআলাসমূহের উপর কিয়াস করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা পণ্ডিত লোকদের কীর্তিরূপে স্বীকৃত। আর মাসায়েলের উৎসসমূহ যা দৃঢ়ভাবে ধারণযোগ্য এর উপর অবগতি লাভ করাও বিজ্ঞজনদের কাজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : مُصَنِّفْ (رح) কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করার নিমিত্তে তাঁর এই কিতাবটিকে بِسْمِ اللّٰهِ ও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর দ্বারা শুরু করেছেন। কেননা প্রথম নাজিলকৃত ওহীতে আল্লাহর নামে পড়ার জন্য হুকুম করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (৯৬-সূরা আলাক- ১)। আর কালামে মাজীদের সূচনা করা হয়েছে بِسْمِ اللّٰهِ ও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর দ্বারা। দ্বিতীয়ত হাদীসের মধ্যে আছে, كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ فَهُوَ اَجْزَمُ আল্লাহর প্রশংসার দ্বারা যে কাজের সূচনা হয় না তা বরকতহীন হয়ে থাকে। ইবনে মাজাহ্ শরীফের বর্ণনায় اَجْزَمُ-এর স্থলে اَقْطَعُ শব্দ উদ্ধৃত রয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে এভাবে বর্ণিত আছে যে, كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ তা যদি আল্লাহর নামের সাথে শুরু না করা হয় তবে তা বরকতহীন হয়ে যায়। মূলকথা হচ্ছে, যদি কোনো কাজ আল্লাহর প্রশংসা এবং তার নামে শুরু না

করা হয় তবে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সর্বোপরি আমাদের আসলাফ এবং পূর্বসূরি বুজুর্গদের আমলও এরূপ যে, তাঁরা কিতাব রচনাকালে স্বীয় কিতাবাদিকে আল্লাহর প্রশংসা, হামদ এবং বিসমিল্লাহর মাধ্যমেই শুরু করতেন। কুরআন হাদীস এবং বুজুর্গদের তরীকার অনুসরণ করে مُصَنِّف-ও তাই করেছেন।

قَوْلُهُ اَلْحَمْدُ ঃ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ওলামায়ে কেরামের মতে الحمد শব্দের الف ولام অক্ষরটি جنسى অথবা استغراقى। অর্থাৎ جنس حمد অথবা সকল প্রকার حمد (হামদ) আল্লাহ তা'আলার জন্যই খাস।

لِاَنَّهُ مُسْتَجْمِعٌ لِجَمِيْعِ الصِّفَاتِ الْكَمَالِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَجْمِعٌ لِجَمِيْعِ الصِّفَاتِ الْكَمَالِ فَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِجَمِيْعِ الْحَمْدِ فَاللّٰهُ مُسْتَحِقٌّ لِجَمِيْعِ الْحَمْدِ .

اَلْحَمْدُ هُوَ ঃ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রশংসা করা। আর পরিভাষায় حمد -এর সংজ্ঞা হচ্ছে নিম্নরূপ। حَمْدٌ اَلثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِىْ نِعْمَةً كَانَ اَوْ غَيْرَهَا . ইখতিয়ারী সৌন্দর্যের (خوبى) উপর মৌখিকভাবে আল্লাহর প্রশংসা করা। চাই তা নিয়ামতের মোকাবেলায় হোক বা না হোক। −(শরহে তাহযীব; পৃঃ ২)

قَوْلُهُ لِلّٰهِ ঃ আল্লাহ শব্দটি আরবি, না ইবরানি, না সুরয়ানি এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধতম মতে শব্দটি আরবি। যারা আরবি বলেন তাদের মধ্যে এটি صفت না علم এ বিষয়ে ফের মতভেদ রয়েছে। যারা একে علم বলেন তাদের মধ্যে আবার দুই দল। এক দলের মতে শব্দটি مشتق। আর অপর দলের মতে এটি جامد বরং এটি হচ্ছে علم مرتجل অর্থাৎ এটি এমন একটি শব্দ (নামবাচক বিশেষ্য) যা কোনো কিছু থেকে উদ্ভাবিত হয়নি। এটিই জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত। (আল-কুনূযুল ইযাযিয়্যা; পৃঃ ২৪) আল্লামা তাফতাযানী (র.) আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, اَللّٰهُ عَلَمٌ عَلَى الْاَصَحِّ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ الْمُسْتَجْمِعِ لِجَمِيْعِ الصِّفَاتِ الْكَمَالِ . বিশুদ্ধতম মতানুসারে আল্লাহ শব্দটি ঐ চিরন্তন যাতের সত্তাবাচক নাম, যাঁর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী এবং যিনি সমস্ত প্রশংসনীয় ও উত্তম গুণাবলি দ্বারা মণ্ডিত। (শরহে তাহযীব; পৃঃ ২)

قَوْلُهُ مَعَالِمَ ঃ مَعَالِمُ - مَعْلَمٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ− নির্দশন স্থল। এখানে معالم শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শরিয়তের দলিল চতুষ্টয় তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসকে বুঝানো। এগুলোকে সমুন্নত করার অর্থ হলো, মহান আল্লাহ কর্তৃক আমাদেরকে এ সব বিষয়াদির অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করা। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে−

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاءَ .

তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো এবং তাকে ছাড়া অন্য কোনো অভিভাবকের অনুসরণ করবে না। (৭-সূরা আ'রাফ− ৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে− وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ . وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا .

এবং রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো। (৫৯-সূরা হাশর− ৭)

আরো ইরশাদ হয়েছে−

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ . وَسَاءَتْ مَصِيْرًا .

কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর তা কত মন্দ আবাস! (৪- সূরা নিসা−১১৫)

আরো ইরশাদ হয়েছে− فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ .

অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। (৫৯.- সূরা হাশর− ২)

কোনো কোনো আলিম বলেন, مَعَالِمُ দ্বারা ওলামায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে। আর ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা সমুন্নত করার বিষয়টি সুস্পষ্ট।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে− يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ .

যাদেরকে ইল্ম দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন। (৫৮- সূরা মুজাদালা− ১১)

قَوْلُهٗ وَاَعْلَامَهٗ : اَعْلَامٌ শব্দটি عَلَمٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ– আলামত, পাহাড়, ঝাণ্ডা। শব্দটি আলামত-এর অর্থে ব্যবহৃত হলে এর মর্ম হবে দলিল। পাহাড়ের অর্থে ব্যবহৃত হলে এর মর্ম হবে ওলামায়ে কেরাম। আর ঝাণ্ডা অর্থে ব্যবহৃত হলে এর মর্ম হবে ঝাণ্ডাধারী ব্যক্তি।

ফতহুল কাদীর কিতাবের গ্রন্থকার আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, اعلام দ্বারা মুরাদ হলো اسباب شرعيه অর্থাৎ শরিয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহকামের কারণসমূহ। যেমন– সূর্য হেলে যাওয়া জোহরের নামাজের سبب বা কারণ, নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া জাকাত ওয়াজিব হওয়ার سبب রমজান মাসের আগমন ঘটা রোজা ওয়াজিব হওয়ার سبب এবং শরাফতে মাকান (মক্কা মুকাররমার মর্যাদা) হজ ওয়াজিব হওয়ার سبب। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, علم অর্থ– আলামত। আর اسباب شرعيه ও যেহেতু শরিয়তের বিধি-বিধান ওয়াজিব হওয়ার আলামত তাই اعلام দ্বারা اسباب شرعية-ই উদ্দেশ্য হবে। কোনো কোনো ফকীহ বলেন, اعلام দ্বারা ওলামায়ে কিরামকে বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে اعلا বলে ওলামায়ে কেরামকে বুঝানোই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ وَاَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ : شعائر - شعيرة -এর বহুবচন। যেমন– صَحَائِفُ - صَحِيْفَةٌ-এর বহুবচন شعيرة অর্থ এমন কাজ যা আল্লাহর ইবাদতের উপর আলামত হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। কোনো কোনো আলিম বলেন, شعائر দ্বারা এমন ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যা ইসলামের বিশেষ শি'আর ও বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য। যেমন– আযান, জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ, খুতবা, কুরবানি, আরাফা ও মুযদালিফার ময়দানে হাজীদের সমবেত হওয়া ইত্যাদি। এখানে شرع শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শরিয়ত অনুমোদিত বিষয়াদি। শরিয়ত দাতা (شارع) নয়।

قَوْلُهٗ وَاَحْكَامَهٗ : احكام - حكم-এর বহুবচন। حكم-এর অর্থ হলো اَلْاَثَرُ الْمُرَتَّبُ عَلَى الشَّيْءِ কোনো বস্তুর উপর যে আছর বা প্রভাব প্রতিফলিত হয়, সেটিই ঐ বস্তুর হুকুম। যেমন– হালাল-হারাম, জায়েজ-নাজায়েজ ইত্যাদি। অথবা حُكْمٌ অর্থ– هُوَ خِطَابُ اللّٰهِ تَعَالٰى الْمُتَعَلِّقُ بِاَفْعَالِ الْمُكَلَّفِيْنَ অর্থাৎ হুকুম আল্লাহর ঐ খিতাব বা সম্বোধনকে বলা হয়, যা মুকাল্লাফ বান্দাদের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকে। অথবা, نسبت تامة-এর নাম হলো হুকুম। উল্লেখ্য যে, مصنف (رحـ) খুতবার মধ্যে احكام-এর কথা উল্লেখ করেছেন– صناعت براعت استهلال-এর ভিত্তিতে। অর্থাৎ খুতবায় আহকামের কথা উল্লেখ করে তিনি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এ কিতাবে আহকাম ও মাসাইল সন্নিবেশিত হবে।

قَوْلُهٗ وَبَعَثَ رُسُلًا وَاَنْبِيَاءَ : رُسُلٌ শব্দটি رَسُوْلٌ-এর বহুবচন। অর্থ– প্রেরিত, পয়গাম্বর। পরিভাষায় اِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيْغِ الْاَحْكَامِ আল্লাহর বিধি-বিধান সৃষ্টির নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত ও প্রেরিত ব্যক্তিকে রাসূল (رسول) বলা হয়। আর انبياء শব্দটি نبي-এর বহুবচন। نبي (নবী) বলা হয়– مَنْ اُوْحِيَ اِلَيْهِ وَحْيًا خَاصًّا مِنَ اللّٰهِ بِتَوَسُّطِ الْمَلَكِ اَوْ بِاِلْهَامٍ فِيْ قَلْبِهٖ اَوْ بِالرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ আল্লাহর পক্ষ হতে সত্য স্বপ্ন অথবা ইলহাম অথবা ফেরেশতা প্রেরণের মাধ্যমে যার প্রতি বিশেষ ধরনের ওহী নাজিল করা হয়েছে, এরূপ মনোনীত মহা মানবদেরকে নবী বলা হয়। –(ইসলামী আকীদা; পৃঃ ৮৭-৮৮)

هادين শব্দটি رسلا وانبياء-এর صفت। হিদায়েত (هدايت) দুই প্রকার। (১) هدايت بلا واسطه অর্থাৎ কোনো মাধ্যম ব্যতিরেকে কাউকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেওয়া। এ কাজ আল্লাহর সত্তার সাথে খাস। (২) هدايت بالواسطه অর্থাৎ রাস্তা দেখানো বা পথ প্রদর্শন করা। এটি নবী রাসূলগণের দায়িত্ব।

قَوْلُهٗ وَاَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ : اخلف শব্দটি خلف فلان فلانا বাক্য থেকে গৃহীত হয়েছে। এ শব্দটি باب افعال থেকে متعدى بدو مفعول হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন এখানে হয়েছে। লেখক বলেন, اَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আলিমগণকে নবী-রাসূলদের স্থলবর্তী করেছেন। হাদীসে আছে– اِنَّمَا الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ নিশ্চয়ই ওলামায়ে কেরাম নবীগণের ওয়ারিশ। –(মিশকাত ১ম খণ্ড; পৃঃ ৩৪)

আর ওয়ারিশ স্বীয় مورث-এর খলীফা এবং স্থলবর্তী হয়ে থাকেন। علماء - عالم-এর বহুবচন। যেমন– شعراء - شاعر-এর বহুবচন।

سنن শব্দটি سنة-এর বহুবচন। سنة (সুন্নত) অর্থ- রাস্তা, অভ্যাস। الي سنن سننهم বাক্যে উল্লিখিত প্রথম سنن শব্দের অর্থ হচ্ছে طرق (রাস্তা) আর দ্বিতীয় سنن শব্দের অর্থ হলো- আদত, অভ্যাস। এই হিসাবে الي سنن سننهم داعين অর্থ হবে তারা (আলিমগণ) এমন পথের দিকে দাওয়াত দেন যা (লোকদেরকে) নবী-রাসূলদের অভ্যাস ও আচার-আচরণ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

قَوْلُهُ وَخَصَّ أَوَائِلَ الْمُسْتَنْبِطِينَ ঃ এখানে اوائل المستنبطين (প্রথম যুগের মুজতাহিদগণ) বলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং তাঁর শিষ্যগণকে বুঝানো হয়েছে। কেননা نصوص (কুরআন-হাদীস) থেকে دلائل বা প্রমাণাদি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তারাই হলেন অগ্রগামী এবং মাসাইল রচনার ক্ষেত্রে তারাই ছিলেন সর্বাধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। আর পরবর্তীতে যে সকল ইমাম ফিক্‌হ জগতে অবদান রেখেছেন তাঁরা সকলেই ছিলেন তাদের অনুবর্তী। বস্তুত استنباط অর্থ- ভূমি খুঁড়ে পানি বের করা। এমনিভাবে نصوص থেকে وصف مؤثر বের করাকে استنباط বলা হয়। কেননা মাটি খুঁড়ে পানি বের করা এবং نصوص থেকে وصف مؤثر বের করা উভয়টিই কষ্টসাধ্য কাজ। এ কষ্টসাধ্য কাজ আঞ্জাম দানের কারণেই নবী-রাসূলগণের পরেই ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা। উল্লেখ্য যে, পানি এবং ইলমের মাঝে বিরাট সামঞ্জস্য রয়েছে। কেননা পানি حيات اجسام-এর سبب আর ইলম হচ্ছে حيات ارواح-এর سبب অর্থাৎ যেমনিভাবে পানির দ্বারা মানব জীবন বেঁচে থাকে তেমনিভাবে মানব আত্মা বেঁচে থাকে ইল্‌ম দ্বারা। এদিকে ইঙ্গিত করেই কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- واحيينا به بلدة ميتا বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে। -(৫০-সূরা কাফ-১১)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- اومن كان ميتا فاحييناه . যে ব্যক্তি মৃত ছিল (আধ্যাত্মিকভাবে); পরে আমি তাকে (ইলমে ওহী দ্বারা) জীবিত করেছি। -(৬-সূরা আন'আম-১২২)

قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ جَلِيٍّ وَ دَقِيقٍ ঃ (স্পষ্ট ও সূক্ষ্ম মাসায়িল) বলে এখানে مسائل قياسيه (কিয়াসী মাসায়িল) ও مسائل استحسانية (সূক্ষ্ম কিয়াসী মাসায়িল) উদ্দেশ্য। যেমন কুয়ায় যদি বিষ্ঠা পতিত হয় তবে কিয়াসের দৃষ্টিতে এই পানি নাপাক হয়ে যাবে। কিন্তু কুয়ার পানি ماء قليل (স্বল্প পানি)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর স্বল্প পানিতে নাপাকী পড়তেই তা নাপাক হয়ে যায়। কিন্তু استحسان তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে পানি নাপাক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা মাঠে ময়দানে যে সব কুয়া থাকে তাতে সাধারণত ঢাকনা ইত্যাদি থাকে না। আর গবাদি পশু এর আশে পাশে সচরাচর মল ত্যাগ করে থাকে এবং বাতাস উড়িয়ে নিয়ে এগুলোকে কুয়াতে নিক্ষেপ করে। সুতরাং স্বল্প পরিমাণ মল বা বিষ্ঠা কুয়ায় পতিত হলে তা মাফ বলে গণ্য হবে। আর বেশি পরিমাণ পতিত হলে তা মাফ বলে গণ্য হবে না। غير ان الحوادث বাক্য দ্বারা একটি سوال مقدر-এর জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য। سوال مقدر-এর সারমর্ম হলো, যদি সুস্পষ্ট ও সূক্ষ্ম সব ধরনের মাসাইলই লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে পরবর্তী কালের আলিমগণ কেন دلائل (দলিল) استنباط করা এবং মাসাইল সংকলন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। (অথচ গ্রন্থকারের ভাষ্যমতে এ কাজের তো কোনো প্রয়োজন ছিল না।) সর্বোপরি লেখক নিজেই পরবর্তীতে কেন আল-হিদায়া গ্রন্থ সংকলন করলেন? غير ان الحوادث বাক্যে লেখক এ প্রশ্নেরই জবাব প্রদান করেছেন। জবাবের খুলাসা হচ্ছে, যেহেতু উদ্ভূত সমস্যাবলি প্রায় প্রত্যহই নতুনভাবে সংঘটিত হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট কোনো موضوع (আলোচ্য বিষয়) এ সব বিষয়াষয়কে পরিব্যাপ্ত করে নিতেও অক্ষম, তাই এসব ঘটমান উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সর্ব কালেই মাসাইল সংকলন হতে থাকবে। এটি কোনো قابل اشكال কথা নয়।

قَوْلُهُ وَاقْتِنَاصُ الشَّوَارِدِ بِالْاِقْتِبَاسِ مِنَ الْمَوَارِدِ ঃ اقتناص অর্থ- শিকার করা। شوارد - شاردة-এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে বন্য পশু। اقتباس অর্থ- আহরণ করা, সংগ্রহ করা। موارد - مورد-এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে- ঘাট। এখানে موارد দ্বারা اصول (মূলনীতি) বুঝানো হয়েছে। উক্ত ইবারতে মুশকিল ও জটিল মাসাইল استنباط ও উদ্ভাবন করাকে বন্যপশু শিকার করার সাথে تشبيه দেওয়া হয়েছে বা তুলনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ الْاِعْتِبَارُ بِالْاَمْثَالِ مِنْ صَنْعَةِ الرِّجَالِ ঃ অর্থাৎ সদৃশ বিষয়াদির উপর আহকামকে কিয়াস করা কামিল ও পণ্ডিত মানুষের কাজ সকলের কাজ নয়। কেননা এটি বড় কঠিন কাজ যা সকলের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

قَوْلُهُ يَعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ঃ يعض-এর مصدر হচ্ছে عض। عض অর্থ- দাঁত দ্বারা কাটা। نواجذ - ناجذ-এর বহুবচন। এর অর্থ- চোয়ালের দাঁত।

وَقَدْ جَرٰى عَلَىَّ الْمَوْعِدُ فِىْ مَبْدَأ بِدَايَةِ الْمُبْتَدِى اَنْ اَشْرَحَهَا بِتَوْفِيْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى شَرْحًا اُرَسِّمُهُ بِكِفَايَةِ الْمُنْتَهٰى فَشَرَعْتُ فِيْهِ وَالْوَعْدُ يَسُوْغُ بَعْضَ الْمَسَاغِ وَحِيْنَ اَكَادُ اَتَّكِأُ عَنْهُ اِتِّكَاءَ الْفَرَاغِ تَبَيَّنْتُ فِيْهِ نَبْذًا مِّنَ الْاِطْنَابِ وَخَشِيْتُ اَنْ يُّهْجَرَ لِاَجْلِهِ الْكِتَابَ فَصَرَفْتُ عِنَانَ الْعِنَايَةِ اِلٰى شَرْحٍ اٰخَرَ مَوْسُوْمٍ بِالْهِدَايَةِ اَجْمَعُ فِيْهِ بِتَوْفِيْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى بَيْنَ عُيُوْنِ الرِّوَايَةِ وَمُتُوْنِ الدِّرَايَةِ تَارِكًا لِلزَّوَائِدِ فِىْ كُلِّ بَابٍ مُعْرِضًا عَنْ هٰذَا النَّوْعِ مِنَ الْاِسْهَابِ مَعَ مَا اَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلٰى اُصُوْلٍ يَنْسَحِبُ عَلَيْهَا فُصُوْلٌ وَاَسْاَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْ يُّوَفِّقَنِىْ لِاِتْمَامِهَا وَيَخْتِمَ لِىْ بِالسَّعَادَةِ بَعْدَ اِخْتِتَامِهَا حَتّٰى اَنَّ مَنْ سَمَتْ هِمَّتُهُ اِلٰى مَزِيْدِ الْوُقُوْفِ يَرْغَبُ فِى الْاَطْوَلِ وَالْاَكْبَرِ وَمَنْ اَعْجَلَهُ الْوَقْتُ عَنْهُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْاَصْغَرِ وَالْاَقْصَرِ وَلِلنَّاسِ فِيْمَا يَعْشِقُوْنَ مَذَاهِبُ وَالْفَنُّ خَيْرٌ كُلُّهُ ثُمَّ سَأَلَنِىْ بَعْضُ اِخْوَانِىْ اَنْ اُمْلِىَ عَلَيْهِمُ الْمَجْمُوْعَ الثَّانِىَ فَافْتَتَحْتُهُ مُسْتَعِيْنًا بِاللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ تَحْرِيْرِ مَا اُقَاوِلُهُ مُتَضَرِّعًا اِلَيْهِ فِى التَّيْسِيْرِ لِمَا اُحَاوِلُهُ اِنَّهُ الْمُيَسِّرُ لِكُلِّ عَسِيْرٍ وَهُوَ عَلٰى مَا يَشَاءُ قَدِيْرٌ وَبِالْاِجَابَةِ جَدِيْرٌ وَحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ

অনুবাদ ঃ উল্লেখ্য যে, 'বিদায়াতুল মুবতাদী' নামক কিতাবের ভূমিকায় আমার পক্ষ থেকে এ প্রতিশ্রুতি ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা যদি তৌফিক দান করেন, তবে কিফায়াতুল মুনতাহী নামকরণ পূর্বক আমি এ কিতাবের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করব। অতঃপর আমি শরাহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) লিখতে আরম্ভ করলাম। অবশ্য ওয়াদা পালন করার ব্যাপারে কিছু অবকাশ থাকে। (অর্থাৎ যদিও কৃত প্রতিশ্রুতি পালনে কোনো বাধ্য-বাধকতা ছিল না।) অতঃপর যখন আমি কিফায়াতুল মুনতাহী কিতাব সঙ্কলনের কাজ থেকে ফারেগ (অবসর) হওয়ার কাছাকাছি অবস্থায় উপনীত হলাম তখন এতে কিছু 'বিশদতা বা দীর্ঘসূত্রতা' (اطناب) অনুভব করলাম এবং আশঙ্কা করলাম যে, এ (বিশদতার) কারণে (হয়তো) গ্রন্থখানি পরিত্যক্ত হতে পারে। তাই 'আল হিদায়া' নামকরণ পূর্বক আমি অপর একটি শরাহ তথা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার প্রতি মনোনিবেশ করলাম। আল্লাহ তা'আলা তৌফিক দিলে এর প্রতি অধ্যায়ে অতিরিক্ত বিষয় পরিহার করে আমি পছন্দনীয় বর্ণনা এবং মজবুত যৌক্তিক দলিলসমূহ জমা করব বা সমাবিষ্ট করব। আর এ ক্ষেত্রে আমি অতিবিশদ আলোচনার ধারা উপেক্ষা করে চলব। তবে এতে এমন সব মূলনীতি সন্নিবেশিত থাকবে-যার ওপর ভিত্তি করে বহু আনুষঙ্গিক বিষয় (فروع) উদ্ভাবিত (متفرع) হবে।

আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছি, যেন তিনি আমাকে এ কাজ সম্পন্ন করার তৌফিক দান করেন এবং তা সমাপ্তির পর যেন আমার খাতিমা বিল খায়ের হয় অর্থাৎ এ শুভকাজ সম্পন্ন করার পর যেন সৌভাগ্যের সাথে তিনি আমার জীবনের অবসান ঘটান। আর অধিক জ্ঞান অর্জনের উচ্চস্পৃহা যাদের হবে তারা যেন সুদীর্ঘ ও সুবৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থ (কিফায়াতুল মুনতাহী) টি অধ্যয়ন করার প্রতি মনোনিবেশ করে। আর যাদের সময়ের তাড়াহুড়া থাকবে অর্থাৎ যাদের সময় ও সুযোগ কম হবে তারা (তুলনামূলক) ছোট ও সংক্ষিপ্ত পরিধির ব্যাখ্যাগ্রন্থ (আল হিদায়া) টি অধ্যয়ন করার উপর নির্ভর করবে। আর وَلِلنَّاسِ فِيْمَا يَعْشِقُوْنَ مَذَاهِبُ পছন্দের ক্ষেত্রে মানুষের তো রুচি বৈচিত্র্য রয়েছেই।

উল্লেখ্য যে, এ ফিক্‌হশাস্ত্র (فن) সর্বোতভাবেই সর্বাধিক কল্যাণকর। অতঃপর আমার কতিপয় সুহৃদ ভ্রাতা আমার নিকট এ আবেদন করলেন যে, আমি যেন তাদের জন্য উক্ত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করি। সুতরাং আমি ফিক্‌হী কথা (মাসআলা) লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কামনা করে তা লিখতে শুরু করলাম, তাঁর দরবারে সকাতর প্রার্থনা সহকারে, যেন তিনি আমার প্রয়াস সহজ করে দেন। তিনিই সকল কঠিনকে সহজ করেন। তিনিই যা ইচ্ছা তা করার উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং আবেদন কবুল করার ব্যাপারে তিনিই একমাত্র উপযুক্ত। আর আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اطناب ঐ লম্বা বক্তব্য যা কোনো রহস্য বা نكتة-এর ভিত্তিতে দীর্ঘায়িত হয়। পক্ষান্তরে যদি এর মধ্যে কোনো ফায়দা বা রহস্য না থাকে, এমনিই লম্বা করা হয় তবে এ জাতীয় দীর্ঘ বক্তব্যকে تطويل বলা হয়।

عُيُونِ الرِّوَايَةِ ঃ পছন্দনীয় বর্ণনা। কেননা خِيَارُ الشَّيْءِ-কে عَيْنُ الشَّيْءِ বলা হয়। আর رواية অর্থ– مرويات (বর্ণিত বিষয়)। মূলত عُيُونِ الرِّوَايَةِ শব্দে إِضَافَةُ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ-এর নীতি অবলম্বিত হয়েছে।

قَوْلُهُ لِإِتْمَامِهَا .... بَعْدَ اخْتِتَامِهَا ঃ এখানে উভয় শব্দে مفرد مؤنث-এর ضمير ব্যবহার করা হয়েছে। ضمير এর مرجع হবে আল-হিদায়া। পক্ষান্তরে কোনো نسخة তে تثنية -এর ضمير ব্যবহার করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে -এর مرجع হবে আল-হিদায়া ও কিফায়াতুল মুনতাহী গ্রন্থ দু'টি।

قَوْلُهُ وَلِلنَّاسِ فِيْمَا يَعْشِقُوْنَ مَذَاهِبُ ঃ এখানে مذاهب দ্বারা উদ্দেশ্য হলো طرق مختلفة অর্থাৎ রুচি বৈচিত্র্য বা চরিত্রের বিভিন্নতা। فن দ্বারা মুরাদ হলো, ইলমে ফিক্‌হ এবং المجموع الثاني দ্বারা মুরাদ হলো হিদায়া।

ভূমিকার সার-সংক্ষেপ ঃ গ্রন্থকার (র.) (আল্লাহ তা'আলার) হাম্‌দ (حمد) ও ছানা (ثناء) করার পর বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রথম যুগের মুজতাহিদগণকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন এবং তাদেরকে নবী-রাসূলগণের স্থলবর্তী করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে তারা স্পষ্ট ও সূক্ষ্ম সকল প্রকার মাসায়েল উদ্ভাবন ও সংকলন করতে সক্ষম হয়েছেন। আর উদ্ভূত সমস্যা যেহেতু সর্বদাই ঘটে যাচ্ছে এবং এগুলোকে যেহেতু একই গ্রন্থে পরিব্যাপ্ত করে নেওয়া সম্ভব নয়, তাই মাসায়েল সংকলন ও উদ্ভাবনের কাজ সর্বদাই চলবে। তবে এ মহান কাজ সকলের পক্ষে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব নয়; বরং ইলমে ফিক্‌হের মধ্যে যাদের পাণ্ডিত্য আছে এবং যাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা আছে তারাই কেবল এ কাজ আঞ্জাম দিতে পারবে। উল্লেখ্য যে, বিদায়াতুল মুবতাদী কিতাবের ভূমিকা অংশে যেহেতু কিফায়াতুল মুনতাহী নামক একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি ছিল, তাই ঐ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সে শরাহ লেখার কাজ শুরু করলাম। অতঃপর রচনার কাজ সমাপ্ত করার কাছাকাছি অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর আমি অনুভব করলাম যে, শরাহটি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। এতে আমার আশঙ্কা হলো যে, বিশদতা এবং দীর্ঘ সূত্রতার কারণে গ্রন্থটি হয়তো পরিত্যক্ত হতে পারে। এ আশঙ্কা নিরশনের লক্ষ্যে আমি আলি হিদায়া নামে আরেক শরাহ লেখার কাজ শুরু করলাম, যা প্রথমটির তুলনায় মুখতাসার এবং সংক্ষিপ্ত হবে। এতে থাকবে পছন্দনীয় বর্ণনা এবং মজবুত যৌক্তিক দলিল-প্রমাণসমূহ। আর এতে এমন সব মূলনীতিও সন্নিবেসিত থাকবে যার উপর ভিত্তি করে বহু আনুষঙ্গিক বিষয়াদি উদ্ভাবন করা যাবে। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বলেন, যেন গ্রন্থ রচনার কাজ সম্পন্ন করার পর তিনি তার জীবনের অবসান ঘটান। এরপর তিনি বলেন, যাদের মধ্যে অধিক জ্ঞান আহরণের উচ্চস্পৃহা আছে তারা যেন শরহে আকবর তথা কিফায়াতুল মুনতাহী কিতাবটি মুতালা'আ করে। আর যাদের সময় ও সুযোগ কম তারা যেন শরহে আসগর তথা হিদায়া অধ্যয়নের উপর নির্ভর করে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, তৎপর আমার কতিপয় সুহৃদ ভ্রাতা অনুরোধ করলেন, যেন আমি তাদের জন্য দ্বিতীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করি, তাই আমি আল্লাহর দরবারে সকাতর প্রার্থনা সহকারে তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করে হিদায়া গ্রন্থখানা সংকলন করার কাজ আরম্ভ করলাম। অতঃপর বললেন, তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।

كِتَابُ الطَّهَارَاتِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ الاية فَفَرْضُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْاَعْضَاءِ الثَّلٰثَةِ وَمَسْحُ الرَّأْسِ بِهٰذَا النَّصِّ وَالْغَسْلُ هُوَ الْاِسَالَةُ وَالْمَسْحُ هُوَ الْاِصَابَةُ وَحَدُّ الْوَجْهِ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ اِلٰى اَسْفَلِ الذَّقَنِ وَاِلٰى شَحْمَتَيِ الْاُذُنَيْنِ لِاَنَّ الْمُوَاجَهَةَ تَقَعُ بِهٰذِهِ الْجُمْلَةِ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْهَا .

অধ্যায় ঃ তাহারাত

অনুবাদ ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসাহ করবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে।–(৫-সূরা মায়িদা– ৬) উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অজুতে তিনটি অঙ্গ ধোয়া এবং মাথা মাসাহ করা ফরজ। গোসল (غسل) অর্থ– (পানি) প্রবাহিত করা। আর মাসাহ (مسح) অর্থ– (ভিজা হাত শরীরের অঙ্গের উপর) বুলানো। মুখমণ্ডলের সীমানা হলো, মাথার অগ্রভাগের চুলের গোড়া হতে চিবুকের নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি হতে অপর কানের লতি পর্যন্ত। কেননা وجه শব্দটি مواجهه থেকে উদগত হয়েছে। আর مواجهه (মুখামুখি হওয়া) প্রমাণিত হয় এই পুরা অংশের মাধ্যমে। (সুতরাং মুখমণ্ডল ধোয়ার সময় এই পরিমাণ অঙ্গ ধোয়া অপরিহার্য।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كِتَابُ الطَّهَارَاتِ বাক্যটির মধ্যে তিন ধরনের بحث (আলোচনা) রয়েছে। (১) বাক্যটির تركيب نحوى সম্পর্কিত আলোচনা। (২) كتاب শব্দের বিশ্লেষণ। (৩) طهارات শব্দের বিশ্লেষণ। كِتَابُ الطَّهَارَاتِ বাক্যের মধ্যে تركيب-এর দিক থেকে তিন ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। (১) هٰذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ এ ক্ষেত্রে كِتَابُ الطَّهَارَاتِ বাক্যটি هٰذَا مبتدأ-খبر এর হবে। (২) كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هٰذَا এ ক্ষেত্রে كِتَابُ الطَّهَارَاتِ বাক্যটি مبتدأ এবং এর خبر-এর محذوف। আর তা হচ্ছে هٰذَا (৩) خُذْ বা اِقْرَأْ كِتَابَ الطَّهَارَاتِ এ ক্ষেত্রে كِتَابَ الطَّهَارَاتِ বাক্যটি خُذْ বা اِقْرَأْ-محذوف। فعل محذوف-এর مفعول হবে।

كتاب এবং كتابت শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– লেখা, জমা করা ইত্যাদি। كِتَابٌ শব্দটি مَكْتُوْبٌ (লিখিত) অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন خلق শব্দটি مخلوق-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর পরিভাষায় كتاب বলা হয় মাসাইলের ঐ সমষ্টিকে, যা স্বতন্ত্রভাবে ধর্তব্য (معتبر) ও গৃহীত হয়। চাই এতে مختلف نوع তথা বিভিন্ন ধরনের মাসায়েল থাকুক বা না থাকুক। طهارة শব্দটি বিভিন্নভাবে পঠিত হতে পারে। যেমন– طهارة - طهارة ও طهارة। যদি ط। অক্ষরে পেশ দিয়ে طهارة পড়া হয় তবে এর অর্থ হবে– পবিত্রতা হাসিল করার পানি। যদি ط। অক্ষরে যের দিয়ে طهارة পড়া হয় তবে এর অর্থ হবে– পবিত্রতা অর্জন করার آله বা উপকরণ। আর যদি ط। অক্ষরে যবর দিয়ে طهارة পড়া হয় তবে এটি مصدر হবে। এর

অর্থ হবে– পবিত্রতা অর্জন করা। শরিয়তের পরিভাষায় হদস ও জানাবাত থেকে পবিত্রতা অর্জন করাকে طهارة বলা হয়। কোনো কোনো ফকীহ-এর মতে তিন অঙ্গ ধৌত করা এবং মাথা মাসাহ করার নাম طهارة।

আল্লামা আবদুল হাই লাক্ষনৌবী (র.) আল্লামা হালবী (র.) -এর সূত্রে শরহে বিকায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ সি'আয়া (السعاية) -এর মধ্যে একথা উল্লেখ করেছেন যে, তাহারাতের ক্ষেত্রে দুই ধরনের শর্ত রয়েছে।

(১) شروط وجوب (২) شروط صحت। شروط وجوب অর্থাৎ যে সব শর্ত পাওয়া গেলে তাহারাত ওয়াজিব হয় তা নয়টি। (১) ইসলাম; (২) জ্ঞানবান হওয়া; (৩) বালিগ হওয়া; (৪) হদস হওয়া (চাই হদসে আসগর হোক বা আকবর হোক); (৫) সমস্ত শরীরে পাক পানি বহিয়ে দেওয়া; (৬) হায়েযের অবস্থা না হওয়া; (৭) নিফাস না হওয়া; (৮) পানি বা মাটি ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া; (৯) সময়ের মধ্যে এর সুযোগ এবং অবকাশ থাকা। شروط صحت অর্থাৎ তাহারাত সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত চারটি। (১) সমস্ত শরীরে পানি পৌছানো; (২) হায়েয না হওয়া; (৩) নিফাস না হওয়া; (৪) যে ব্যক্তি মাজুর নয়, এ জাতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহারাত হাসিলের সময় ناقض طهارة (তাহারাত ভঙ্গকারী) কোনো বিষয় সংঘটিত না হওয়া এবং তাহারাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ হদস বা জানাবাত পাওয়া যাওয়া। তাহারাতের হুকুম হলো, যে কাজ তাহারাত ব্যতিরেকে বৈধ হয় না, সে কাজ তাহারাতের মাধ্যমে বৈধ বা মুবাহ হয়ে যাওয়া।

اشكال ঃ এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, হিদায়া গ্রন্থকার طهارات শব্দটিকে جمع-এর صيغة-এর সাথে কেন ব্যবহার করেছেন? অথচ طهارة শব্দটি مصدر। আর مصدر-এর কোনো تثنيه ও جمع আসে না।

জবাব : যদি مصدر-এর শেষে تاء تانيث সংযুক্ত থাকে তবে ঐ مصدر-এর تثنيه ও جمع ব্যবহার করা বৈধ আছে। স্মর্তব্য যে, এখানে (رحـ) مصنف - طهارات শব্দটিকে جمع ব্যবহার করে طهارة-এর বিভিন্ন انواع (প্রকারসমূহ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা رفع نجاست -ও طهارة; এমনিভাবে رفع خبث -ও طهارة। অথচ এ দু'টি দুই مختلف نوع সম্পর্কিত বিষয়।

উল্লেখ্য, এখানে গ্রন্থকার (র.) كِتَابُ الطَّهَارَاتِ তথা তাহারাত অধ্যায়কে অপরাপর অধ্যায়ের উপর مقدم করলেন কেন? এ সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, শরিয়ত স্বীকৃত ও অনুমোদিত (مشروعات) বিষয়সমূহ হচ্ছে চার প্রকার। (১). খালিস হুকূকুল্লাহ (خَالِص حُقُوقُ اللّٰهِ); (২) খালিস হুকূকুল ইবাদ (خَالِص حُقُوقُ الْعِبَادِ); (৩) হুকূকুল্লাহ এবং হুকূকুল ইবাদ মিশ্রিত বিষয়। তবে এতে হক্কুল্লাহ প্রবল; (৪) হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল ইবাদ মিশ্রিত বিষয় তবে এতে হক্কুল আবদ প্রবল। এ সব বিষয়াদির মধ্যে হুকূকুল্লাহ-এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি হওয়ায় গ্রন্থকার (র.) হুকূকুল্লাহ (ইবাদত)-এর বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অতঃপর ইবাদতের মধ্যে নামাজের গুরুত্ব বেশি হওয়ায় প্রথমে নামাজের আলোচনা করেছেন। কেননা ইসলামের মধ্যে ঈমানের পর নামাজের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। কুরআন মাজীদের বহু স্থানে নামাজের প্রতি তাকীদ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ .

তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং জাকাত প্রদান করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। (২-সূরা বাকারা-৪৩)

নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ مَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ .

নামাজ দীনের স্তম্ভ। যে নামাজ কায়েম করল সে দীন কায়েম করল। (হাদীস)

আর তাহারাত নামাজের জন্য পূর্বশর্ত। হাদীসে আছে, مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ (পবিত্রতা নামাজের কুঞ্জি) এবং এ মূলনীতিও সর্বজন স্বীকৃত যে, شَرْطُ الشَّيْءِ مُقَدَّمٌ عَلَى الشَّيْءِ (যে সব বিষয়াদি কোনো কাজের জন্য পূর্বশর্ত, সে সব বিষয়াদি ঐ কাজের অগ্রে পাওয়া যাওয়া অত্যাবশ্যক), এ কারণে (رحـ) مصنف - طهارة-এর আলোচনার দ্বারা তাঁর এই কিতাবটি শুরু করেছেন।

হিদায়া গ্রন্থকার শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন (র.) অজু সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা কিতাবের শুভসূচনা করেছেন। অথচ দুনিয়ার নিয়ম হলো, দাবি আগে এবং দলিল পরে উল্লেখ করা। এতদসত্ত্বেও গ্রন্থকার (র.) এমনটি কর..ন কেন? জবাবে আলিমগণ বলেন যে, গ্রন্থকার (র.) تَبَرُّكًا ও تَيَمُّنًا অর্থাৎ বরকত হাসিলের জন্য এমনটি করেছেন। যদিও এটি প্রচলিত নিয়মের বিপরীত কাজ।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ـ

উপরোক্ত আয়াতে কয়েক ধরনের আলোচনা রয়েছে। (১) এখানে إن শব্দ ব্যবহার না করে إذا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা إذا শব্দটি ইয়াকীনী বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং إن শব্দটি সন্দেহযুক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া মু'মিনের ক্ষেত্রে একটি ইয়াকীনী বিষয়, সন্দেহযুক্ত বিষয় নয়, তাই এখানে إذا ব্যবহার করা হয়েছে। (২) দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে মাদানী। কেননা বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) স্বীয় হার হারানোর ঘটনা বর্ণনার পর বলেছেন–

فَنَزَلَتْ - يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ .... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ

আর এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, হার হারানোর এ ঘটনা হিজরতের কয়েক বছর পর সংঘটিত হয়েছে। কাজেই এই আয়াত মাদানী হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। উল্লেখ্য যে, মক্কা মকাররমায় যখন সালাত ফরজ হয় তখন অজুও ফরজ করা হয়েছিল। এ ব্যাপারেও কারো কোনো দ্বিমত নেই। আল্লামা ইবনে আবদুল বার (র.) বলেন, সমস্ত ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে অবগত আছেন যে, নামাজ ফরজ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো নামাজই অজু ছাড়া আদায় করেননি। এ কথাটি জাহিল, অজ্ঞ এবং ইসলামের দুশমন মানুষ ব্যতীত আর কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এখন এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, অজু করার আমল পূর্ব হতে জারি থাকা অবস্থায় এরূপ দীর্ঘ দিন পর এ আয়াত নাজিল করার মাঝে কি হিকমত? এ সম্বন্ধে আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী (র.) সি'আয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যাতে অজুর হুকুমটি متلو بالقران হয়ে যায় এ হিকমতের پیش نظر চলমান অজুর আমলকে আয়াত নাজিল করে পুনরায় বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। অথবা অজুর বিধান সম্পর্কিত উক্ত আয়াতের ক্ষেত্রে এ কথাও বলা যেতে পারে, আয়াতের প্রথমাংশ যেখানে অজুর কথা বলা হয়েছে তা অজু ফরজ হওয়ার সময় মক্কায়ই নাজিল হয়েছে, আর আয়াতের শেষাংশ যেখানে তায়াম্মুমের কথা বর্ণিত হয়েছে তা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।—(আল-ইত্‌কান)

(৩) তৃতীয় আলোচনা হচ্ছে, যাহিরী আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যে কোনো ব্যক্তিই নামাজ পড়ার ইচ্ছা করবে চাই সে محدث (অজুহীন) হোক বা غير محدث (অজুহীন না) হোক সর্বাবস্থায়ই তাকে অজু করতে হবে। اصحاب ظواهر-এর মাযহাব এটিই। অর্থাৎ অজু থাকলেও অজু করতে হবে এবং না থাকলেও অজু করতে হবে। কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরামের মাযহাব এর থেকে ভিন্নতর। তাঁদের মতে এখানে একটি শর্ত উহ্য আছে। তা হলো, وانتم محدثون। এ হিসাবে আয়াতের মর্ম হবে, অজুহীন অবস্থায় তোমরা নামাজ আদায়ের ইচ্ছা করলে তোমাদের জন্য অপরিহার্য হবে প্রথমে অজু করা। হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত যে, অজু ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো অজুহীন হওয়া। অর্থাৎ অজুহীন হলেই কেবল অজু ওয়াজিব হবে, অন্যথায় নয়। সর্বোপরি অজুহীন ব্যক্তিরই কেবল অজু করা ওয়াজিব, এ কথাটি আলোচ্য আয়াতের دلالة النص থেকেও প্রমাণিত হয়। কেননা, وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا ـ

আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের বিধানকে حدث-এর সাথে সংশ্লিষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, حدث হওয়া তায়াম্মুম ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত। উল্লেখ্য যে, তায়াম্মুম হলো, অজুর খলীফা বা بدل। আর এ قاعده টি সর্বজন স্বীকৃত যে, بدل -এর মধ্যে যে জিনিসটি نص হিসাবে গণ্য হবে اصل-এর মধ্যেও তা نص হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং حدث হওয়া অজু ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হিসাবে গণ্য হবে, যেমন তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

فَفَرْضُ الطَّهَارَةِ الخ : ফরজ (فرض) শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) فرض শব্দের এক অর্থ হচ্ছে قطع অর্থাৎ কর্তন করা। যেমন বলা হয়, فرض الخياط الثوب দর্জি কাপড় কেটেছে। (২) فرض শব্দের এক অর্থ হচ্ছে তাকদীর (تقدير) অর্থাৎ নিরূপণ করা, সাব্যস্ত করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ। এখানে فرضتم-এর অর্থ হচ্ছে قَدَّرْتُمْ। অর্থাৎ তোমরা যা সাব্যস্ত করেছ এর অর্ধেক। (৩) এর এক অর্থ تفضيل অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, سُوْرَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا। এখানে فَرَضْنَاهَا শব্দটি فَضَّلْنَاهَا-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (৪) শব্দটি বয়ান (بيان) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ

تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ । এর অর্থ হলো, بَيَّنَ لَكُمْ كَفَّارَةَ اَيْمَانِكُمْ । (৫) সীমা (حد) নির্ধারণ করা -এর অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا এখানে مَفْرُوْضًا শব্দটি مَحْدُوْدًا (নির্ধারিত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (৬) এটি দান (عطية) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, فَرَضْتُ الرَّجُلَ (আমি এক ব্যক্তিকে কিছু দান করেছি)। (৮) বৃদ্ধ হওয়া। যেমন বলা হয়, فَرَضَتِ الْبَقَرَةُ (গাভীটি বৃদ্ধ হয়েছে)। এই অর্থেই কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে, لَا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ (গরুটি বৃদ্ধও নয় এবং অল্পবয়স্কও নয়)। (৯) আযমতের অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, فُلَانٌ فَارِضٌ (অমুক ব্যক্তি একজন নেতা)। শরিয়তের পরিভাষায় ফরজ এমন হুকুমকে বলা হয় যা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। এর হুকুম হলো, যে ব্যক্তি এর উপর আমল করবে সে ছওয়াবের অধিকারী হবে। আর যে ব্যক্তি তা বর্জন করবে সে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে ওয়াজিব এমন হুকুমকে বলা হয় যা دليل ظنى দ্বারা প্রমাণিত। যে ব্যক্তি এর উপর আমল করবে সেও ছওয়াবের অধিকারী হবে। তবে তার ছওয়াব ফরজের উপর আমলকারীর তুলনায় কিছুটা কম হবে। আর বর্জনকারীর শাস্তিও ফরজ বর্জনকারীর শাস্তির তুলনায় কম হবে।

উল্লেখ্য যে, دلالت চার প্রকার। (১) قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ قَطْعِيُّ الثُّبُوْتِ -যেমন কুরআন মাজীদের আয়াত এবং ঐ সমস্ত মুতাওয়াতির হাদীস যা স্পষ্ট এবং যাতে কোনোরূপ তাবীল (تاويل)-এর অবকাশ নেই। (২) قَطْعِيُّ الثُّبُوْتِ ظَنِّيُّ الدَّلَالَةِ - যেমন কুরআন মাজীদের আয়াত এবং ঐ সমস্ত হাদীস যার মধ্যে তাবীল (تاويل)-এর অবকাশ রয়েছে। (৩) ظَنِّيُّ الثُّبُوْتِ - قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ -যেমন ঐ সমস্ত খবরে ওয়াহিদ (خبر واحد) যা স্পষ্ট ও صريح। (৪) ظَنِّيُّ الثُّبُوْتِ ظَنِّيُّ الدَّلَالَةِ -যেমন– খবরে ওয়াহিদ (خبر واحد) যাতে বিভিন্ন ধরনের অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম প্রকারটি ইয়াকীনের ফায়দা দেয়। দ্বিতীয় প্রকারটি ظن তথা প্রবল ধারণার ফায়দা দেয়। তৃতীয় প্রকার দ্বারা وجوب এবং مكروه تحريمى সাব্যস্ত হয়। আর চতুর্থ প্রকার দ্বারা সুন্নত ও মোস্তাহাব সাব্যস্ত হয়। —(হাশিয়ায়ে শরহে নিকায়া)

এখানে طهارة শব্দটি وضو -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। وضو -এর واو অক্ষরে যদি পেশ হয় তবে এর অর্থ হবে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় অজুর অঙ্গসমূহ ধোয়া ও মাসাহ করা। আর যদি واو অক্ষরে যবর দেওয়া হয় তবে এর অর্থ হবে ঐ পানি যার দ্বারা অজু করা হয়।

এখানে হিদায়া গ্রন্থকার অজুর বিষয়টিকে গোসল ইত্যাদির আগে বর্ণনা করেছেন। এর প্রথম কারণ হলো, গোসলের তুলনায় অজুর বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, অজুর অঙ্গ (محل) সমূহ গোসলের অঙ্গ (محل) সমূহের جزء। আর جز - كل-এর উপর طبعا হয় مقدم। তাই وضعا অজুর আলোচনাকে গোসলের আলোচনার উপর مقدم করা হয়েছে। আর তৃতীয় কারণ হচ্ছে, কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলাও প্রথমে অজুর কথা বর্ণনা করে বলেছেন, فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ এবং পরে গোসলের কথা উল্লেখপূর্বক বলেছেন, وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

غُسْلٌ - غين অক্ষরে যদি পেশসহ পড়া হয় তবে এর অর্থ হবে গোসল করা। যে পানি দ্বারা গোসল করা হয় একেও غسل বলা হয়। যদি غين অক্ষরে যের পড়া হয় (غِسْلٌ) তবে এর অর্থ হবে ঐ সমস্ত জিনিস যার দ্বারা মাথা ধৌত করা হয়, যেমন খিতমী ইত্যাদি। আর غين অক্ষরে যদি যবর হয় (غَسْلٌ) তবে এর অর্থ হবে ধৌত করা।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, অজুর ফরজ চারটি, অর্থাৎ তিন অঙ্গ ধৌত করা এবং মাথা মাসাহ করা। এই চারটি বিষয়ের ফরযিয়ত কুরআন মাজীদের উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, اَلْغَسْلُ অর্থ– اَلْاِسَالَةُ পানি প্রবাহিত করা। এর দ্বারা ইমাম মালিক (র.)-এর রদ করা উদ্দেশ্য। কেননা তাঁর মতে অজুর অঙ্গসমূহের ওপর পানি প্রবাহিত করাই শুধু যথেষ্ট নয়; বরং এর সাথে শরীর মর্দন করাও শর্ত। মাসাহ অর্থ تَقَاطُر (পানি ফোঁটা ফোঁটা পড়া) ব্যতীত ভিজা হাত অঙ্গসমূহের উপর বুলানো।

হিদায়া গ্রন্থকারের মতে طُوْلًا وَعَرْضًا তথা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের দিক থেকে চেহারার সীমানা হলো, মাথার অগ্রভাগের চুলের উৎপত্তিস্থল থেকে চিবুকের নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত চেহারা ধৌত করা ফরজ। কেননা وجه শব্দটি مواجهة (মুখোমুখি হওয়া) থেকে উদ্‌গত হয়েছে। আর مواجهة এই পুরা চেহারার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই এই পূর্ণ চেহারা ধৌত করা ফরজ।

وَالْمِرْفَقَانِ وَالْكَعْبَانِ تَدْخُلَانِ فِى الْغَسْلِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) وَهُوَ يَقُوْلُ إِنَّ الْغَايَةَ لَاتَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَيَّا كَاللَّيْلِ فِى بَابِ الصَّوْمِ وَلَنَا اَنَّ هٰذِهِ الْغَايَةَ لِإِسْقَاطِ مَا وَرَاءَ هَا إِذْ لَوْلَاهَا لَاسْتَوْعَبَتِ الْوَظِيْفَةُ الْكُلَّ وَفِى بَابِ الصَّوْمِ لِمَدِّ الْحُكْمِ إِلَيْهَا إِذِ الْإِسْمُ يُطْلَقُ عَلَى الْإِمْسَاكِ سَاعَةً وَالْكَعْبُ هُوَ الْعَظْمُ النَّاتِىْ هُوَ الصَّحِيْحُ وَمِنْهُ الْكَاعِبُ .

অনুবাদ ঃ আমাদের তিন ইমামের মতে কনুইদ্বয় এবং পায়ের টাখনুদ্বয়ও ধৌত করার বিধানের অন্তর্ভুক্ত। (অতএব হাত-পা ধৌত করার সময় এই স্থানগুলোও ধৌত করতে হবে।) কিন্তু ইমাম যুফার (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, গায়া (غاية) অর্থাৎ الى শব্দের পরবর্তী বিষয়টি মুগায়্যা (مغيا) তথা الى শব্দের পূর্ববর্তী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয় না। যেমন– রোজার ক্ষেত্রে লায়ল (ليل)-রাত্র) রোজা রাখার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের (ইমামগণের) যুক্তি হলো, আলোচ্য আয়াতে এই গায়া (غاية) তৎপরবর্তী অংশকে বাদ দেওয়া (اسقاط)-এর নিমিত্তে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এখানে যদি কনুই এবং টাখনুর কথা উল্লেখ না থাকতো তবে হাত-পা বলতে যা বুঝা যায় এর পুরোটাই এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হতো। পক্ষান্তরে রোজা সম্পর্কিত আয়াতে الى ব্যবহৃত হয়েছে সওম তথা রোজাকে গায়া غاية তথা ليل (রাত্র) পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে। কেননা সামান্য সময়ের জন্য (পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে) বিরত থাকার উপরও صوم শব্দটি ব্যবহৃত হয়। إِلَى اللَّيْلِ (নিশাগম পর্যন্ত) বলার কারণে রাত পর্যন্ত রোজা রাখা প্রতীয়মান হয়েছে। আল-কা'ব (الكعب) অর্থ– ভাসমান বা বেরিয়ে থাকা হাড়। এটিই সহীহ অভিমত। الكاعب শব্দটি এর থেকেই উদগত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مرفق শব্দের ميم অক্ষরে যের এবং فا. অক্ষরে যবর হবে। অবশ্য এর বিপরীতও জায়েজ আছে। অর্থাৎ ميم অক্ষরে যবর এবং فا. অক্ষরে যের। এর অর্থ কনুই। প্রকৃতপক্ষে বাহুর জোড়াকে مرفق বলা হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে পায়ের পাতার উপরিভাগে ভাসমান যে হাড় রয়েছে যেখানে জুতার ফিতা বাঁধা হয় ঐ জোড়াটিকে كعب বলা হয়। মূলত এ কথা সহীহ নয়। সহীহ অভিমত অনুসারে كَعْبٌ অর্থ পায়ের গোড়ালির নিচে ভাসমান হাড়, যাকে টাখনু বলা হয়। كاعب শব্দটি এর থেকেই উদ্‌গত হয়েছে। এর বহুবচন كَوَاعِبُ। كَوَاعِبُ এমন যুবতী মহিলাকে বলা হয় যাদের স্তন উত্থিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হাত ধৌত করার ক্ষেত্রে কনুইদ্বয় এবং পা ধৌত করার ক্ষেত্রে টাখনুদ্বয় হাত এবং পায়ের অন্তর্ভুক্ত কিনা? এ সম্বন্ধে আমাদের ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে হাতের সাথে কনুই ধৌত করা এবং পায়ের সাথে টাখনু ধৌত করা ফরজ। এটি ইমাম শাফি'ঈ এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এরও অভিমত। এটি ইমাম মালিক (র.)-এর একটি রিওয়ায়াতও বটে।

পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে হাত ধোয়ার সময় কনুই ও পা ধোয়ার সময় টাখনু ধৌত করা ফরজ নয়। এটি ইমাম মালিক (র.)-এর একটি রিওয়ায়াতও বটে। ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল হলো, আলোচ্য আয়াতে مَرَافِقُ এবং كَعْبَيْنِ শব্দ দু'টো হচ্ছে غاية। আর غاية - مطلقا - مغيا-এর হুকুমের মধ্যে দাখিল হয় না। কাজেই কনুই হাতের হুকুমের মধ্যে এবং টাখনু পায়ের হুকুমের মধ্যে দাখিল হবে না।

আমাদের ইমামত্রয়ের বক্তব্য হলো, غاية - مغيا-এর মধ্যে مطلقا দাখিল হয় না, ইমাম যুফার (র.)-এর এ কথা আমরা স্বীকার করি না। কেননা غاية দুই প্রকার। (১) غاية হয়তো তৎপূর্ববর্তী শব্দ مغيا-এর جنس থেকে হবে (অথবা হবে না) অর্থাৎ যদি غاية-কে পৃথক করে দেওয়া হয় তাহলে صدر كلام অর্থাৎ غايه - مغيا এবং তৎপরবর্তী বিষয়কে নিজের মধ্যে শামিল করে নেয়। (২) অথবা غاية তৎপূর্ববর্তী শব্দ অর্থাৎ مغيا-এর جنس থেকে হবে না। অর্থাৎ غاية -কে যদি পৃথক করে দেওয়া হয় তবে صدر كلام অর্থাৎ غاية - مغيا এবং তৎপরবর্তী বিষয়কে নিজের মধ্যে শামিল করে নেয় না। غاية-এর প্রথমোক্ত প্রকার مغيا-এর মধ্যে দাখিল হয় না। ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ আয়াতে ليل (রাত) যেহেতু রোজার جنس থেকে নয়, এ জন্য ليل (রাত) রোজার হুকুমের মধ্যে দাখিল নয়। কিন্তু مِرْفَقَيْنِ (কনুইদ্বয়) যেহেতু يَدَيْنِ (হস্তদ্বয়) এবং كَعْبَيْنِ (টাখনুদ্বয়) যেহেতু رِجْلَيْنِ (পদদ্বয়)-এর جنس থেকে তাই এই দুই غاية - مغيا-এর হুকুমের মধ্যে দাখিল হবে। কাজেই হাত ধোয়ার সাথে কনুই এবং পা ধোয়ার সাথে টাখনুও ধৌত করতে হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.)-এর বর্ণিত দলিলের সারমর্ম হচ্ছে غاية দুই প্রকার। (১) غَايَتِ اِثْبَاتْ (২) غَايَتِ اِسْقَاطْ। এ দুই প্রকার غاية-এর মধ্যে مَابِهِ الْاِمْتِيَازُ হচ্ছে, যদি صَدْرِ كَلَامْ অর্থাৎ غاية - مغيا-কে নিজের মধ্যে শামিল রাখে তাহলে এটি غَايَةِ اِسْقَاطْ হবে। আর মغيا যদি غاية-কে নিজের মধ্যে শামিল না রাখে তবে তা غَايَةِ اِثْبَاتْ হবে। غَايَتِ اِثْبَاتْ - مغيا-এর হুকুমের মধ্যে দাখিল হয় না। যেমন– ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ আয়াতে ليل (রাত) রোজার হুকুমের মধ্যে দাখিল নয়। আর غَايَتِ اِسْقَاطْ-এর মধ্যে غاية - ماوراء غاية (গায়া পরবর্তী অংশ)-কে ساقط করা তথা বহির্ভূত করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই غَايَتِ اِسْقَاطْ-এর ক্ষেত্রে غاية - مغيا-এর মধ্যে দাখিল হবে। অতএব وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ-এর মধ্যে مَرَافِقْ (কনুই) اَيْدِيَكُمْ (হাত)-এর মধ্যে দাখিল হবে এবং وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ-এর মধ্যে كَعْبَيْنِ (টাখনু) اَرْجُلَكُمْ (পা)-এর মধ্যে দাখিল হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে اَلْمَرَافِقْ (কনুই)-এর উল্লেখ করা হয়েছে কনুই এর পরবর্তী অংশকে হাতের হুকুম থেকে বহির্ভূত করার জন্য এবং اَلْكَعْبَيْنِ-এর উল্লেখ করা হয়েছে টাখনু পরবর্তী অংশকে পা ধোয়ার হুকুম থেকে বহির্ভূত করার জন্য।

قَالَ : وَالْمَفْرُوضُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ مِقْدَارُ النَّاصِيَةِ وَهُوَ رُبْعُ الرَّأْسِ لِمَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَخُفَّيْهِ وَالْكِتَابُ مُجْمَلٌ فَالْتَحَقَ بَيَانًا بِهِ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) فِي التَّقْدِيرِ بِثَلْثِ شَعَرَاتٍ وَعَلَى مَالِكٍ فِي اشْتِرَاطِ الْاِسْتِيْعَابِ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ قَدَّرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (رحـ) بِثَلْثِ أَصَابِعِ الْيَدِ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي آلَةِ الْمَسْحِ .

অনুবাদ ঃ গ্রন্থকার (র.) বলেন, মাথা মাসাহ করার ক্ষেত্রে মাথার অগ্রভাগ (ناصية) তথা এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ মাসাহ করা ফরজ। কেননা হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, একদা নবী কারীম ﷺ কওমের আবর্জনা ফেলার স্থানে এসে পেশাব করে অজু করলেন। তখন তিনি মাথার সম্মুখ ভাগ (ناصيه) ও মোজার উপর মাসাহ করলেন। যেহেতু আল-কুরআনের বক্তব্য (وَامْسَحُوا بِرُءُوْسِكُمْ) এখানে (পরিমাণের বর্ণনায়) সংক্ষিপ্ত (مجمل) সেহেতু আলোচ্য হাদীসটিকে এর বয়ান বা ব্যাখ্যারূপে যুক্ত করা হয়। এ হাদীসটি (حَدِيْثُ الْمُغِيْرَةِ) ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বক্তব্য "তিন চুল পরিমাণ মাসাহ করা ফরজ"-এর বিপরীতে আমাদের মাযহাবের পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ। এমনিভাবে ইমাম মালিক (র.) -এর অভিমত "পূর্ণ মাথা মাসাহ করা শর্ত"-এর বিপক্ষেও আমাদের দলিল। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, আমাদের ইমামগণের কেউ কেউ ফরজ মাসাহের পরিমাণ হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। কেননা اٰلَةُ الْمَسْحِ (যার দ্বারা মাসাহ করা হয়)-এর মধ্যে যে জিনিসটি (আঙ্গুলসমূহ) আসল আঙ্গুল তিনটি এর اكثر বা তুলনামূলক অধিক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مسح -এর অর্থ হলো, ভিজা হাত বুলানো। চাই তা পাত্রের পানির দ্বারা ভিজানো হোক বা কোনো مغسول অঙ্গকে ধৌত করার পর এ আর্দ্রতা হাতের মধ্যে বাকি থাকুক। মাথা মাসাহ করা সর্বসম্মতিক্রমে ফরজ। কেননা মাথা মাসাহ করার বিষয়টি স্পষ্ট নস তথা কুরআন মাজীদের স্পষ্ট বিধান দ্বারা প্রমাণিত। অবশ্য কি পরিমাণ মাসাহ করতে হবে, এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী ইমামগণের মতে মাথার চার ভাগের একভাগ পরিমাণ মাসাহ করা ফরজ। চাই তা মাথার সম্মুখ ভাগের এক-চতুথাংশ হোক বা পিছনের দিকের এক-চতুর্থাংশ হোক কিংবা ডান বা-বা দিকের এক-চতুর্থাংশ হোক। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে مطلقا মাথা মাসাহ করা ফরজ। সুতরাং কেউ যদি তিন চুল বা ভিন্ন মতে এক চুল পরিমাণ মাসাহ করে তবে ফরজ আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) -এর মতে পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরজ। ইমামগণ সকলেই وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ আয়াত দ্বারা استدلال করেন।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, بِرُءُوسِكُمْ শব্দের باء অক্ষরটি অতিরিক্ত (زائده)। তাই وَامْسَحُوْ بِرُءُوسِكُمْ-এর অর্থ হবে وَامْسَحُوا رُءُوسَكُمْ (তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ করবে)। আর এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, মাথা (رأس) বলতে পূর্ণ মাথাকেই বুঝায়, অংশ বিশেষকে বুঝায় না। কাজেই এতে বুঝা যায় যে, পূর্ণ মাথা মাসাহ করাই ফরজ। শরহে নিকায়ার মুসান্নিফ (مصنف) বলেন, এ মাসআলায় ইমাম মালিক (র.) احتياط-এর উপর আমল করেছেন।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ আয়াতটি মাসাহ-এর পরিমাণ (مِقْدَارِ مَسْحٍ) বর্ণনার ক্ষেত্রে مطلق। আর اَلْمُطْلَقُ يَجْرِيْ عَلٰى إِطْلَاقِهٖ-এর قاعده (নীতি) অনুসারে مطلقا মাথা মাসাহ করা ফরজ। সুতরাং ইমাম

শাফি'ঈ (র.)-এর মতে أَدْنٰى رَأْس অর্থাৎ মাথার ন্যূনতম অংশ মাসাহ করার দ্বারাই মাসাহের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে। আর সেই ন্যূনতম পরিমাণ হচ্ছে এক চুল অথবা হিদায়া গ্রন্থকারের বক্তব্য অনুসারে তিন চুল। সুতরাং এ পরিমাণ মাসাহ করলেই ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

হানাফী ইমামগণের মতে মাসাহ-এর পরিমাণ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি হচ্ছে مجمل (সংক্ষিপ্ত)। مجمل -এর জন্য بَيَانِ إِجْمَالْ হচ্ছে জরুরি। আর হযরত মুগীরা (রা.)-এর হাদীসে সেই اجمال -এরই বয়ান পেশ করা হয়েছে। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.)-এর হাদীসটি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى نَاصِيَتِهِ وَخُفَّيْهِ .

(একদা নবী করীম ﷺ কওমের আবর্জনা ফেলার স্থানে এসে পেশাব করে অজু করলেন এবং মাথার সম্মুখ ভাগের উপর এবং মোজার উপর মাসাহ করলেন।) হিদায়া গ্রন্থকারের পেশকৃত হাদীসটি হযরত মুগীরা ও হযরত হুযায়ফা (রা.) উভয়ের বর্ণনাকৃত হাদীস দ্বারা مركب। হযরত মুগীরা (রা.) -এর হাদীসটি যা ইমাম মুসলিম (র.) উদ্ধৃত করেছেন, এর শব্দাবলি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلٰى خُفَّيْهِ .

(একদা নবী করীম ﷺ অজু করে মাথার সম্মুখ ভাগের উপর মাসাহ করলেন এবং মাসাহ করলেন তিনি পাগড়ি ও মোজার উপর।)

আর হুযায়ফা (রা.)-এর হাদীস, যা বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ .

(একদা নবী করীম ﷺ কওমের আবর্জনা ফেলার স্থানে এসে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। অতঃপর পানি আনার জন্য বললেন আমি পানি নিয়ে আসলাম। এরপর তিনি অজু করলেন।)

উপরোক্ত হাদীস দু'টির সারমর্ম হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পেশাব করার পর অজু করেছেন এবং অজুতে তিনি মাথার সম্মুখ ভাগ পরিমাণ জায়গা মাসাহ করেছেন। সম্মুখ ভাগ হলো মাথার চারভাগের এক ভাগের সমপরিমাণ। এ কারণে হানাফী ইমামগণ এ আয়াত দ্বারা استدلال করে বলেন যে, মাথার চারভাগের একভাগ পরিমাণ মাসাহ করা ফরজ। আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত এক হাদীসেও এ কথার প্রতি সমর্থন রয়েছে।

হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنْ أَنَسٍ رض رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قَطَرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ تَحْتَ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ .

(হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অজু করতে দেখেছি। তখন তাঁর মাথায় কাতারী পাগড়ি ছিল। অতঃপর তিনি তাঁর উভয় হাত ঐ পাগড়ির নিচে ঢুকিয়ে মাথার সম্মুখ ভাগ মাসাহ করেছেন।) এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর মাথার সম্মুখ ভাগের পুরোটাই মাসাহ করেছেন। আর এটিই হচ্ছে মাথার চতুর্থাংশ, একেই পূর্বোল্লিখিত হাদীসে ناصية বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সুতরাং এ হাদীস ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর বিপরীতে আমাদের দলিল। ইমাম মালিক (র.)-এর বিপরীতে এ হাদীস এ জন্য দলিল যে, যদি পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরজ হতো তাহলে শরিয়ত প্রণেতা হযরত মুহাম্মদ ﷺ মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করার উপর اكتفاء করতেন না। এমনিভাবে এ হাদীস ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর বিপরীতে এ হিসাবে দলিল যে, যদি মাথা এক-চতুর্থাংশের কম মাসাহ করা জায়েজ হতো তবে بَيَانِ جَوَازْ -এর জন্য হলেও কমপক্ষে একবার তিনি এর উপর অবশ্যই আমল করতেন। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো হাদীস দ্বারাই মাথার এক-চতুর্থাংশের কম মাসাহ করা প্রমাণিত হয় না।

হানাফী আলিমগণের কেউ কেউ مِقْدَارِ نَاصِيَة তিন আঙ্গুল পরিমাণ বলে নির্ধারণ করেছেন। তাঁদের দলিল হলো, হাত দ্বারাই মাসাহ করা হয়। আর হাতের মধ্যে আঙ্গুল হলো আসল (মূল)। আর এর মধ্যে আঙ্গুল তিনটি হলো اكثر। অর্থাৎ দুইয়ের তুলনায় অধিক। আর قاعده আছে যে, لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ। কাজেই তিন আঙ্গুলকে كل-এর স্থলাভিষিক্ত ধরে এর উপর كل -এর হুকুম দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যদি তিন আঙ্গুল পরিমাণ মাসাহ করা হয় তাহলেই (শরিয়তে) মাসাহ হয়ে যাবে।

قَالَ : وَسُنَنُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ اِدْخَالِهِمَا الْاِنَاءَ اِذَا اسْتَيْقَظَ الْمُتَوَضِّئُ مِنْ نَوْمِهٖ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهٖ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهٗ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلٰثًا فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهٗ وَلِاَنَّ الْيَدَ اٰلَةُ التَّطْهِيْرِ فَتُسَنُّ الْبِدَايَةُ بِتَنْظِيْفِهَا وَهٰذَا الْغَسْلُ اِلَى الرُّسْغِ لِوُقُوْعِ الْكِفَايَةِ بِهٖ فِى التَّنْظِيْفِ قَالَ وَتَسْمِيَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ اِبْتِدَاءِ الْوُضُوْءِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ وَالْمُرَادُ بِهٖ نَفْىُ الْفَضِيْلَةِ وَالْاَصَحُّ اَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ وَاِنْ سَمَّاهَا فِى الْكِتَابِ سُنَّةً وَيُسَمِّىْ قَبْلَ الْاِسْتِنْجَاءِ وَبَعْدَهٗ هُوَ الصَّحِيْحُ ـ

অনুবাদ ঃ গ্রন্থকার (র.) বলেন, অজুর সুন্নত হলো– অজুকারী ব্যক্তির ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর পানির পাত্রে হাত ঢুকানোর পূর্বে উভয় হাত ধৌত করা। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে তখন সে যেন তার হাত তিন বার না ধোয়া পর্যন্ত পাত্রে না ডুবায়। কেননা সে জানে না, নিদ্রিত অবস্থায় তার হাত কোথায় ছিল। (অর্থাৎ কোন অঙ্গ স্পর্শ করেছিল।) অধিকন্তু হাত হচ্ছে পবিত্রতা অর্জনের اله (মাধ্যম)। সুতরাং তা পবিত্রকরণের মাধ্যমে অজু আরম্ভ করা সুন্নত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ ধৌত করার পরিমাণ কব্জি পর্যন্ত। কেননা তাহারাত সম্পাদনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। গ্রন্থকার (র.) বলেন, অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অজুর শুরুতে যে বিসমিল্লাহ বলেনি তার অজু হয়নি। এ হাদীসের মর্ম হলো, (অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ না বললে) অজুর ফজিলত হাসিল হবে না। বিশুদ্ধতম মতানুসারে অজুর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ বলা মোস্তাহাব। যদিও মূল কিতাবে (কুদূরীতে) একে সুন্নত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইস্তিনজার আগে ও পরে বিসমিল্লাহ বলবে। এটিই সঠিক অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

سُنَنٌ - سُنَّةٌ-এর বহুবচন। সুন্নত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– পথ-পন্থা। শরিয়তের পরিভাষায় সুন্নত ঐ আমলকে বলা হয় যা নবী করীম ﷺ নিয়মিতভাবে পালন করেছেন, তবে মাঝে মধ্যে তরকও করেছেন, যাতে তা উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক না হয়ে যায়। সুন্নতের উপর আমলকারী ব্যক্তি ছওয়াবের অধিকারী হবে এবং সুন্নত বর্জনকারী ব্যক্তি ভর্ৎসনা ও শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। স্মতর্ব্য যে, হিদায়া গ্রন্থকার (র.) فرض (ফরজ) শব্দটিকে একবচনের সাথে এবং سنن শব্দটিকে বহুবচনের সাথে কেন উল্লেখ করলেন? এ সম্বন্ধে আলিমগণ বলেন, فرض শব্দটি হচ্ছে مصدر (ক্রিয়ামূল) يُطْلَقُ عَلَى الْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ (কম-বেশি সর্বক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়)। কাজেই একে جمع ও تثنيه ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে সুন্নত (سنت) শব্দটি এমন নয়। এ কারণে একে جمع -এর صيغه-এর সাথে ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অজুর সুন্নতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সুন্নত হলো, অজুকারী ব্যক্তি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখন সে উভয় হাত পানির পাত্রে ঢুকানোর আগে তা ভালভাবে ধোয়ে নেবে। হাত ধোয়ার তরীকা হলো, পানি যদি কোনো ছোট পাত্রে রাখা থাকে তবে বাম হাত দ্বারা পাত্রটি ধরে তা ডান হাতের উপর ঢালবে (এবং তা পরিষ্কার করে ধোবে)। অতঃপর তা ডান হাতে ধরে বাম হাতের উপর পানি ঢালবে এবং হাতটি উত্তমরূপে পরিষ্কার করবে। যদি পানির পাত্রটি এমন বড় হয় যে, এক হাত দ্বারা উঠানো সম্ভব নয় তাহলে একটি ছোট মগ বা এ জাতীয় কিছু দ্বারা পানি উঠিয়ে বাম হাত দ্বারা ডান হাতের উপর পানি ঢালবে। এভাবে ডান হাত ধোয়ার পর ডান হাতে ঐ ছোট পাত্রটি নিয়ে বাম হাতের উপর পানি ঢালবে। এভাবে উভয় হাত পরিষ্কার

করবে। যদি ছোট কোনো পাত্রও সেখানে না থাকে তাহলে হাতের তালু পানিতে না ডুবিয়ে শুধু বাম হাতের আঙ্গুলসমূহ একত্রিত করে তা দ্বারা পানি তুলে সে পানি ডান হাতের উপর ঢালবে। অতঃপর ডান হাত দ্বারা পানি তুলে বা হাতে ঢেলে তা পরিষ্কার করে ধৌত করবে।

উক্ত হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)। বুখারীর বর্ণনায় হাদীসের শব্দমালা নিম্নরূপ ঃ

إِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِّنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لَايَدْرِيْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ .

এ হাদীসে শুধুমাত্র হাত ধৌত করার কথা উল্লেখ আছে; কিন্তু তিনবার ধৌত করার কথা উল্লেখ নেই। পক্ষান্তরে মুসলিম শরীফে তিনবার ধৌত করার কথা উল্লেখ আছে। সেখানে আছে, حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلٰثًا। কোনো কোনো বর্ণনায় فَلَايَغْمِسَنَّ অর্থাৎ نون تاكيد -এর সাথে শব্দটি বর্ণিত রয়েছে। উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের সারমর্ম হলো, যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তখন সে যেন পানির পাত্রে হাত ঢুকানোর পূর্বে তা তিনবার ধৌত করে নেয়। কেননা তার জানা নেই যে, ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত কোথায় ছিল।

মাবসূত গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, অজুর শুরুতে উভয় হাত ধৌত করা مطلقا সুন্নত। চাই সে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর অজু করুক বা ঘুম ছাড়াই অজু করুক। কেননা হাত ধোয়ার علت জাগ্রত ব্যক্তির মধ্যেও পাওয়া যায়। কারণ জাগ্রত অবস্থায়ও কোনো ব্যক্তি হাত দ্বারা নিজের মল দ্বার বা খুজলি-পাঁচড়া স্পর্শ করে থাকতে পারে। মোদ্দাকথা হচ্ছে, অজুর আগে হাত ধোয়ার علت হলো, تَوَهُّمِ نَجَاسَتْ (হাতে নাপাকী লাগার সন্দেহ)। আর এই تَوَهُّمِ نَجَاسَتْ উভয় অবস্থায়ই বিদ্যমান আছে। চাই ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর অজু করুক বা ঘুম ছাড়াই অজু করুক। অজুর শুরুতে উভয় হাত ধৌত করা সুন্নত হওয়ার এ হুকুম ততক্ষণ পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে, যদি হাতে নাপাকী যাহির না হয়। যদি নাপাকী হাতে দৃশ্যমান হয়ে যায় তাহলে ঐ নাপাকী দূর করা ফরজ। গ্রন্থকার (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, হাতই হলো শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পবিত্রকরণের آلہ (মাধ্যম)। কাজেই প্রথমে এটি পাক করা সুন্নত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য যে, উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া সুন্নত। কেননা পবিত্রতা অর্জনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। رسغ শব্দের راء তে পেশ হবে এবং سين সাকিন হবে।

قَالَ وَتَسْمِيَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى الخ : কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, "উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া" এটি অজু শুরু করার পূর্বের কাজ। কিন্তু যখন অজু শুরু করা হবে তখন বিসমিল্লাহ বলে অর্থাৎ আল্লাহর নাম নিয়ে অজু শুরু করবে। আল্লাহর নামে শুরু করার ন্যূনতম পরিমাণ হলো 'বিসমিল্লাহ' বলে অজু শুরু করা। কিন্তু উত্তম হলো— بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পূর্ণ পড়া। ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ দোয়াটি পড়বে। এ দোয়া سَلَفِ صَالِحِيْن থেকে বর্ণিত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এ দোয়াটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে مَرْفُوْع ভাবে বর্ণিত রয়েছে। মোটকথা, আমাদের মতে অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নত। اَصْحَابِ ظَوَاهِر এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা শর্ত (شرط)। অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলা ব্যতিরেকে অজু শুরু করলে অজু হবে না। তাঁদের দলিল হচ্ছে, اَبُوْ دَاوُد এবং مُسْتَدْرَكِ حَاكِم শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَا وُضُوْءَ لَهُ وَلَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অজু করেনি তার নামাজ হয়নি। আর যে ব্যক্তি অজুর শুরুতে আল্লাহর নাম নেয়নি তার অজু হয়নি।

اَصْحَابِ ظَوَاهِر -এর মতে উক্ত হাদীসে উল্লিখিত لا অক্ষরটি نفى جنس -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বিসমিল্লাহ না বললে অজু হবে না। কিন্তু আমাদের এবং অপরাপর ইমামগণের পক্ষ থেকে এর জবাবে বলা হয় যে, এখানে لا অক্ষরটি نفى جنس -এর জন্য নয় বরং نفى فضيلة -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ না বলে অজু শুরু করলে অজু হয়ে যাবে বটে, কিন্তু অজুর ফজিলত হাসিল হবে না। যেমন—

لَاصَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ اِلَّا فِى الْمَسْجِدِ অর্থাৎ মসজিদের প্রতিবেশির জন্য মসজিদ ছাড়া সালাত আদায় হয় না।

হাদীসে لا অক্ষরটি فَضِيْلَةِ صَلٰوة এবং كَمَالِ صَلٰوة (নামাজের ফজিলত)-এর نفى -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। صِحَّتِ صَلٰوة (নামাজ সহীহ হওয়া)-এর نفى -এর জন্য ব্যবহৃত হয়নি। অনুরূপভাবে لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَاعَهْدَ لَهٗ (যে অঙ্গীকার পালন করে না তার ঈমান নেই) হাদীসের মধ্যেও لا অক্ষরটি كَمَالِ اِيْمَانْ -কে- نفى করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, نَفْسِ اِيْمَانْ -এর- نفى -এর জন্য তা ব্যবহৃত হয়নি। মোদ্দাকথা হলো, উপরোক্ত হাদীস দু'টির ন্যায় "হাদীসে তাসমিয়ার" মধ্যেও ঠিক তদ্রূপই হয়েছে। অর্থাৎ এখানে فضيلة ও كَمَالِ وُضُوْء -এর- نفى করা উদ্দেশ্য, صِحَّتِ وُضُوْء ও جواز -এর نفى করা উদ্দেশ্য নয়। আলী ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে খাল্লাদ (র.)-এর হাদীসের মধ্যেও আমাদের এ বক্তব্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْمُسِيْئِ صَلٰوتَهٗ اِذَا قُمْتَ فَتَوَضَّأْ كَمَا اَمَرَكَ اللّٰهُ.

এক ব্যক্তি সহীহভাবে সালাত আদায় করতে পারছিল না , নবী করীম ﷺ তাকে বলেছিলেন, যখন তুমি নামাজ আদায়ের ইচ্ছা করবে তখন ঠিক সেইভাবে অজু করবে যেভাবে অজু করার জন্য আল্লাহ তোমাকে হুকুম করেছেন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা যে অজুর হুকুম করেছেন তাতে বিসমিল্লাহর কথা উল্লেখ নেই। কাজেই অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব হতে পারে না।

দারাকুতনীর এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে,

مَنْ تَوَضَّأَ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّهٗ يُطَهِّرُ جَسَدَهٗ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ لَمْ يُطَهِّرْ اِلَّا مَوْضَعَ الْوُضُوْءِ.

যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলে অজু শুরু করল তার এ অজু তার সমস্ত শরীরকে পাক করে দেবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিয়ে অজু শুরু করল না তার শুধুমাত্র অজুর অঙ্গসমূহ পাক হবে। (পূর্ণ শরীর নয়)। এতেও প্রমাণিত হয় যে, অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা অজু সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত নয়।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, বিশুদ্ধতম মতে অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা মোস্তাহাব। যদিও ইমাম কুদূরী (র.) একে সুন্নত বলে আখ্যা দিয়েছেন। হিদায়া গ্রন্থের ভাষ্যকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) বলেন, বহু হাদীসে অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার কথা উদ্ধৃত হয়েছে। কাজেই মোস্তাহাব হওয়ার কথা যুক্তিযুক্ত নয়।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইস্তিনজার আগে বা পরে উভয় অবস্থাতেই বিসমিল্লাহ পড়া যায় এবং এটিই সহীহ অভিমত। তবে কারো কারো অভিমত হলো, ইস্তিনজার আগে বিসমিল্লাহ পড়বে। আবার কারো অভিমত হলো, ইস্তিনজার পরে বিসমিল্লাহ পড়বে।

যারা বলেন ইস্তিনজার আগে বিস্‌মিল্লাহ পড়বে; তাদের যুক্তি হলো, ইস্তিনজা অজুর সুন্নতসমূহ থেকে একটি সুন্নত। কাজেই ইস্তিনজার আগেই বিসমিল্লাহ পড়তে হবে। যাতে অজুর সমস্ত কর্ম-কাণ্ড, চাই তা ফরজ হোক বা সুন্নত হোক সব কিছুর সূচনাই যেন বিসমিল্লাহর মাধ্যমে হয়ে যায়।

যারা বলেন ইস্তিনজার পর বিসমিল্লাহ বলবে তাদের যুক্তি হলো, ইস্তিনজা পূর্ববর্তী অবস্থা হলো, كَشْفِ عَوْرَتْ (সতর খোলা থাকা)-এর অবস্থা। আর সতর খোলা অবস্থায় আল্লাহর নাম নেওয়া সমীচীন নয়। কাজেই ইস্তিনজার পর বিসমিল্লাহ বলবে। আর قَوْلِ اَصَحّ তথা বিশুদ্ধতম অভিমতটির যুক্তি হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيْهِ بِذِكْرِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ

যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর নামের সাথে শুরু না করা হয় তবে তা বরকতহীন হয়ে যায়। এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অজুর শুরুতেই বিসমিল্লাহ বলা বাঞ্ছনীয়। আর ইস্তিন্‌জাও যেহেতু অজুর সাথেই সংশ্লিষ্ট তাই ইস্তিন্‌জার আগে বিসমিল্লাহ বলাও মোস্তাহাব।

وَالسِّوَاكُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ وَعِنْدَ فَقْدِهِ يُعَالِجُ بِالْإِصْبَعِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ كَذَالِكَ وَالْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَهُمَا عَلَى الْمُوَاظَبَةِ وَكَيْفِيَّتُهُمَا أَنْ يُمَضْمِضَ ثَلٰثًا يَأْخُذُ لِكُلِّ مَرَّةٍ مَاءً جَدِيْدًا ثُمَّ يَسْتَنْشِقَ كَذٰلِكَ هُوَ الْمَحْكِيُّ مِنْ وُضُوْئِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ وَهُوَ سُنَّةٌ بِمَاءِ الرَّأْسِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ وَالْمُرَادُ بَيَانُ الْحُكْمِ دُوْنَ الْخِلْقَةِ .

অনুবাদ ঃ মিসওয়াক করা। কেননা নবী করীম ﷺ সব সময় তা করতেন। মিসওয়াক না থাকলে আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করবে। কেননা নবী করীম ﷺ এরূপও করেছেন। কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়াও সুন্নত। কেননা নবী কারীম ﷺ এ দু'টি কাজ (অজুতে) নিয়মিতভাবে করতেন। এর নিয়ম হলো, তিনবার কুলি করা এবং প্রত্যেকবার নতুন পানি নিয়ে কুলি করা। অতঃপর অনুরূপ নিয়মে তিনবার নাকে পানি দেবে। নবী কারীম ﷺ-এর অজু অনুরূপভাবেই বর্ণিত রয়েছে। উভয় কান মাসাহ করা। মাথা মাসাহের (অবশিষ্ট) পানি দ্বারা তা সম্পাদন করা সুন্নত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। আমাদের দলিল হলো, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কর্ণদ্বয় মাথারই অংশ বিশেষ। এর উদ্দেশ্য হলো, শরিয়তের হুকুম বর্ণনা করা; خلقة সৃষ্টিগত অবস্থা বর্ণনা করা নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, মিসওয়াক করা সুন্নত। এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা মিসওয়াক করার উপর আমল করেছেন। কিন্তু তিনি তা কখনো তরকও করেছেন। অগত্যা যদি কখনো মিসওয়াক না থাকে তবে আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করবে। কেননা এ কাজটিও নবী করীম ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে। مُوَاظَبَتْ مَعَ التَّرْكِ (মাঝে মধ্যে ছেড়ে দিয়ে সর্বদা কোনো আমল করা) সুন্নত হওয়ার দলিল। আর بِلَاتَرْك مُوَاظَبَتْ (মাঝে মধ্যে তরক করা ছাড়া সর্বদা কোনো আমল করা) ওয়াজিব হওয়ার দলিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাঝে মধ্যে যে মিসওয়াক করা তরক করতেন এর দলিল হলো, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন গ্রাম্য সাহাবীকে নামাজের তালিম দিয়েছিলেন। সে তালিমের মধ্যে মিসওয়াকের কথা উল্লেখ নেই। যদি মিসওয়াক করা ওয়াজিব হতো তাহলে তিনি তাঁকে অবশ্যই মিসওয়াকের তালিম দিতেন। —(ইনায়া) যদি কোনো ব্যক্তির কাছে মিসওয়াক না থাকে তবে আঙ্গুল মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিম্নোক্ত বাণী এ ব্যাপারে দলিল। তিনি বলেছেন, يَجْزِيْ مِنَ السِّوَاكِ الْاَصَابِعُ (মিসওয়াক না থাকা অবস্থায়) আঙ্গুল মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে। এ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তাবারানী (র.) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يَذْهَبُ فُوْهُ يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُدْخِلُ اِصْبَعَهُ فِيْ فِيْهِ .

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তির মুখে দাঁত নেই সেও কি মিসওয়াক করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সেও করবে। আমি বললাম কিভাবে করবে? জবাবে তিনি বললেন, মুখের মধ্যে হাতের আঙ্গুল ঢুকিয়ে তা করবে।—(ফতহুল কাদীর শরহে নিকায়া)

উল্লেখ্য যে, মিসওয়াক سُنَّتِ صَلٰوة (সুন্নতে সালাত) না سُنَّتِ وُضُو (সুন্নতে অজু) এ বিষয়ে তিন ধরনের অভিমত রয়েছে। (১) মিসওয়াক سُنَّتِ وُضُو (অজুর সুন্নত)। কেননা নাসাঈ শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ -

যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর না হতো তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেকবার অজু করার সময় মিসওয়াক করার হুকুম করতাম।

এমনিভাবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর সূত্রে আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে,

اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ اِلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ اَنْ يَتَوَضَّاَ -

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে বা দিনে যখনই ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখনই তিনি অজু করার পূর্বে মিসওয়াক করতেন।

(২) ভিন্ন মতে মিসওয়াক করা سُنَّتِ صَلٰوةٍ (নামাজের সুন্নত)। তাদের দলিল হলো, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ اَوْ مَعَ كُلِّ صَلٰوةٍ رواه - (الستة)

যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো তাঁহলে আমি তাদেরকে নামাজের সময় অথবা প্রত্যেক নামাজের সাথে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম। এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবেই উদ্ধৃত হয়েছে।

(৩) তৃতীয় মতে মিসওয়াক করা سُنَّتِ دِيْنٍ (দীনের সুন্নত)। এটিই সর্বাধিক বলিষ্ঠ অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও এ ধরনের মতামত বর্ণিত রয়েছে। এ অভিমতের পক্ষে দলিল হলো, হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা.)-এর হাদীস যা ইমাম তিরমিযী (র.) স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

اَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ اَلْخِتَانُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ -

চারটি কাজ নবী-রাসূলগণের সুন্নত। (১) খতনা করানো; (২) আতর ব্যবহার করা; (৩) মিসওয়াক করা; (৪) বিবাহ করা।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -এর হাদীসে আছে, দশটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। এতে মিসওয়াকের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

হাদীসে মিসওয়াকের বহু ফজিলতের কথা বর্ণিত রয়েছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে,

اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ صَلٰوةٌ بِسِوَاكٍ اَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ صَلٰوةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ -

মিসওয়াক করে এক নামাজ আদায় করা মিসওয়াক ছাড়া সত্তর নামাজ আদায় করা অপেক্ষা উত্তম। অর্থাৎ এতে সত্তরগুণ ছওয়াব বেশি রয়েছে।

গবেষণা ও অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণিত যে, পাঁচ অবস্থায় মিসওয়াক করা মোস্তাহাব। (১) দাঁত লাল হয়ে গেলে; (২) মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলে; (৩) ঘুম থেকে উঠার পর; (৪) নামাজে দাঁড়ানোর পূর্বে; (৫) অজু করার সময়।

ফায়দা ঃ মিসওয়াক নরম হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তা আঙ্গুলের সমপরিমাণ মোটা এবং এক বিঘত পরিমাণ লম্বা হবে। সোজা হওয়া ভাল। এমন ডালের হবে যাতে গিরা কম থাকে। তিক্ত গাছের ডাল হলে ভাল যেমন নীম ইত্যাদি। এতে কফ-কাশি দূরীভূত হবে, বক্ষ পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং হজমও ভাল হবে।

মিসওয়াক করার সুন্নত তরীকা হলো, মিসওয়াক লম্বালম্বি এবং আড়াআড়ি উভয়ভাবে করবে। যদি শুধু একদিকে করতে হয় তাহলে লম্বালম্বিভাবে করবে। কেউ কেউ বলেছেন আড়াআড়ি ভাবে করবে, লম্বা-লম্বিভাবে করবে না। উল্লেখ্য যে, দাঁতের ক্ষেত্রে যা আড়াআড়ি মুখের ক্ষেত্রে তা লম্বালম্বি হিসাবে গণ্য। —(শরহে নিকায়া)

وَالْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ الخ কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া উভয়টিই অজুতে সুন্নত। এ বিষয়ের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদাই অজুতে কুলি করতেন এবং নাকে পানি দিতেন। বাইশ জন সাহাবী থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অজুর কথা বর্ণিত রয়েছে। তাঁদের সকলেই কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। তবে কত বার কুলি করতে হবে এবং কত বার নাকে পানি দিতে হবে, এ বিষয়ে একাধিক ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। কেউ তো এ বিষয়ে একেবারেই নিশ্চুপ। আবার কেউ একবার কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। কেউ তিনবারের কথা বর্ণনা করেছেন। যে বাইশ জন সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অজুর বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন, (১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.); (২) হযরত ওসমান (রা.); (৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.); (৪) হযরত মুগীরা (রা.); (৫) হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব

(রা.); (৬) হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রা.); (৭) হযরত আবূ মালিক আশ'আরী (রা.); (৮) হযরত আবূ বকর (রা.); (৯) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.); (১০) হযরত ওয়াইল ইবনে হুজার (রা.); (১১) হযরত জুবায়র ইবনে নুফায়র (রা.); (১২) হযরত আবূ উমামা (রা.); (১৩) হযরত আনাস (রা.); (১৪) হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা.); (১৫) হযরত কা'ব ইবনে আম্‌র আল-ইয়ামানী (রা.); (১৬) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রা.); (১৭) হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.); (১৮) হযরত আবূ কাহিল কায়স ইবনে আইয (রা.); (১৯) হযরত রুবাইয়ি' বিনতে মুআওয়িয (রা.); (২০) হযরত আয়েশা (রা.); (২১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স (রা.); (২২) হযরত আমর ইবনে শুআইব আন আবীহি আন জাদ্দিহী।

–(ফতহুল কাদীর-হাশিয়ায়ে শরহে নিকায়া)

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) অজুতে কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার বিষয়ে مواظبت ও مداومت (সর্বদা করা)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এ আমল দু'টো নবী কারীম ﷺ নিয়মিতভাবে করতে বলেছেন। তিনি যে, "এ দু'টো কাজ মাঝে মধ্যে তরকও করতেন" তা উল্লেখ করেননি। কেননা হাদীসে উল্লেখ আছে যে, একদা নবী কারীম ﷺ এক গ্রাম্য সাহাবীকে অজুর তালিম দিয়েছেন। কিন্তু এ সময় তিনি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কথা বলেননি। এমনিভাবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অজুর কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেননি। অতএব যেহেতু مواظبت -এর সাথে মাঝে মধ্যে তা তরক করার কথাও হাদীসে প্রমাণিত আছে তাই (অজুতে) কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নত বলেই গণ্য হবে, ওয়াজিব এবং ফরজ হিসাবে গণ্য হবে না। যেভাবে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা مُوَاظَبَتِ نَبِي ﷺ-এর কারণে এ দু'টো আমলকে غُسْلِ جَنَابَتْ এবং وضوء-এর মধ্যে ফরজ হিসাবে সাব্যস্ত করছেন। সর্বোপরি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে موقوفا এবং مرفوعا উভয়ভাবেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, هُمَا سُنَّتَانِ فِى الْوُضُوْءِ وَ وَاجِبَتَانِ فِى الْغُسْلِ কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া অজুতে সুন্নত, কিন্তু গোসলে ওয়াজিব। — (ইনায়া - কিফায়া)

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়ার তরিকা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রথমে তিনবার কুলি করবে এবং প্রত্যেকবার নতুন পানি দ্বারা কুলি করবে। অতঃপর এমনিভাবে তিনবার নাকি পানি দেবে এবং প্রত্যেক বারই নতুন পানি ব্যবহার করবে। কেননা অজুর বিষয়টি নবী করীম ﷺ থেকে এভাবেই বর্ণিত রয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, একবার পানি নিয়ে এ পানি দ্বারাই কুলি করবে এবং নাকে পানি দেবে। কেননা ইমাম আবূ দাউদ (র.) সুনানে আবূ দাউদ গ্রন্থে এ মর্মে এক হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আলী (রা.) আমলীভাবে নবী করীম ﷺ -এর অজুর বর্ণনা দিতে গিয়ে একবার হাতে পানি নিয়ে সে পানি দ্বারাই কুলি করেছেন এবং নাকে পানি দিয়েছেন। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, নাকে পানি দেওয়া এবং কুলি করার জন্য একবার পানি নেওয়াই যথেষ্ট, مَاءِ جَدِيْد -এর কোনো প্রয়োজন নেই। —(শরহে নিকায়া)

আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাবে বলা হয় যে, بَيَانِ جَوَازْ ("এটিও জায়েজ" এ কথা বর্ণনা করা)-এর জন্য নবী করীম ﷺ কখনো এরূপ করেছেন। তবে উত্তম তো তা-ই যা আমরা অবলম্বন করেছি।

ইনায়া প্রণেতা (صاحب عنايه) উক্ত হাদীসের জবাবে বলেছেন, মুখ এবং নাক পৃথক পৃথক দু'টি অঙ্গ, কাজেই এক অঞ্জলি পানি উভয় আমলের ক্ষেত্রে যথেষ্ট না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যেমন অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হয় না, এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হওয়া সমীচীন।

ফাওয়ায়িদ ঃ শরহে নিকায়া প্রণেতা বলেন, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া যেমনিভাবে সুন্নত ঠিক তেমনিভাবে কুলিকে নাকে পানি দেওয়ার উপর مقدم করা (অগ্রাধিকার দেওয়া)-ও অনুরূপ সুন্নত। শরহে নিকায়া গ্রন্থে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, مضمضة (কুলি করা) ও استنشاق (নাকে পানি দেওয়া) উভয়টি ডান হাতে সম্পাদন করবে। কেউ কেউ বলেছেন, استنشاق বাম হাতে করবে। কিন্তু সহীহ মত হলো, নাকে পানি দেবে ডান হাতে, আর নাক পরিষ্কার করবে বাম হাতে।

وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ الخ অজুর সুন্নতসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো, উভয় কান মাসাহ করা। আল্লামা হুলওয়ানী এবং শায়খুল ইসলাম (র.)-এর অভিমত অনুসারে কান মাসাহ করার তরীকা হলো, নিজের শাহাদাত অঙ্গুলি কানের ভেতর ঢুকিয়ে তা মৃদু নাড়া দেবে। তারা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই কান মাসাহ করেছেন। ইবনে মাজাহ শরীফে সহীহ সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে,

إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَسَحَ أُذُنَيْهِ فَادْخَلَهُمَا السَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلٰى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ .

فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا ঃ নবী করীম ﷺ উভয় কান মাসাহ করেছেন এবং (মাসাহের সময়) তিনি তার শাহাদাত আঙ্গুলদ্বয় উভয় কানের ভিতর ঢুকিয়ে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় কানের উপর বুলিয়েছেন। এভাবেই তিনি উভয় কানের উপরি ভাগ এবং ভিতরের অংশ মাসাহ করেছেন। আর এ পদ্ধতিটিই হচ্ছে উত্তম। — (ফাতহুল কাদীর)

আমাদের মাযহাবে মাথা মাসাহের পানি দ্বারাই কান মাসাহ করা সুন্নত। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে নতুন পানি দ্বারা কান মাসাহ করা সুন্নত। তাদের (ইমামত্রয়ের) দলিল হলো ঐ হাদীস যা মুসতাদরাকে হাকিম গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। তা হলো, হিববান ইবনে ওয়াসি (حبان بن واسع) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَاَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِىْ أَخَذَ لِرَأْسِهِ .

তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অজু করতে দেখেছেন এবং অজুতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা মাসাহ করার জন্য যে পানি নিয়েছিলেন কান মাসাহ করার জন্য ঐ পানি ছাড়া তিনি পুনরায় ভিন্ন পানি নিয়েছিলেন।

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নিয়ে কান মাসাহ করা সুন্নত।

আমাদের দলিল হলো, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস যে হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে যে,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ .

"কর্ণদ্বয় মাথারই অংশ বিশেষ।" এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো শরিয়তের হুকুম বর্ণনা করা। অর্থাৎ এ কথা বর্ণনা করা যে, মাথা এবং কান উভয় অঙ্গের অজুর হুকুম একই। এ হাদীসে সৃষ্টিগত অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা শরিয়াতের আহকাম বর্ণনা করার জন্যই নবী করীম ﷺ প্রেরিত হয়েছেন। সৃষ্টির হাকীকত এবং সৃষ্টিগত অবস্থা বর্ণনা করার জন্য তিনি প্রেরিত হননি।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, মাথা এবং কানের হুকুম যেহেতু এক, তাই কান মাসাহ করা মাথা মাসাহের স্থলাভিষিক্ত হওয়া চাই। অথচ বিষয়টি এমন নয়।

এরূপ প্রশ্ন করা হলে এর জবাবে বলা হবে যে, মাথা মাসাহ করা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি دليل قطعى অর্থাৎ অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। আর কান মাসাহ করার বিষয়টি خبر واحد (খবরে ওয়াহিদ) দ্বারা প্রমাণিত। তাই কান মাসাহ করা সুন্নত। আর সুন্নতের দ্বারা কখনো ফরজ আদায় হতে পারে না। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اَلْحَطِيْمُ مِنَ الْبَيْتِ হাতীমে কা'বা কা'বারই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাই বলে কেউ যদি হাতীমের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করে তবে তার নামাজ সহীহ হবে না। কেননা কা'বার দিকে মুখ করে নামাজ পড়া ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। আর হাতীম কা'বার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথাটি خبر واحد দ্বারা প্রমাণিত। উল্লেখ্য যে, خبر واحد -এর উপর আমল তখনই ওয়াজিব হবে যদি এর কারণে دليل قطعى -এর উপর আমল বাতিল হয়ে হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি خبر واحد-এর উপর আমল করার কারণে دليل قطعى -এর উপর আমল বাতিল হয়ে যায় তবে এ অবস্থায় خبر واحد -এর উপর আমল করা যাবে না।

আমাদের দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে ঐ হাদীস যা হাকিম, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তা হলো–

إِنَّهُ قَالَ اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْهِ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ .

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অজু সম্পর্কে সংবাদ দেব? (অতঃপর তিনি অজুর বিবরণ পেশ করলেন) তাতে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, এরপর তিনি এক অঞ্জলি পানি নিয়ে এর দ্বারা মাথা এবং উভয় কান মাসাহ করলেন। এতেও প্রমাণিত হয় যে, কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

قَالَ وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَهُ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذٰلِكَ وَقِيْلَ هُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) جَائِزٌ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) لِاَنَّ السُّنَّةَ اِكْمَالُ الْفَرْضِ فِيْ مَحَلِّهِ وَالدَّاخِلُ لَيْسَ بِمَحَلِّ الْفَرْضِ وَتَخْلِيْلُ الْاَصَابِعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَلِّلُوْا اَصَابِعَكُمْ كَيْ لَاتَتَخَلَّلَهَا نَارُ جَهَنَّمَ وَلِاَنَّهُ اِكْمَالُ الْفَرْضِ فِيْ مَحَلِّهِ .

অনুবাদ ঃ গ্রন্থকার বলেন, দাড়ি খিলাল করা। কেননা হযরত জিব্রাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সুন্নত এবং ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে জায়েজ মাত্র। কেননা সুন্নত হলো এমন কাজ, যা দ্বারা ফরজকে তার স্থানে পূর্ণতা দান করা হয়। অথচ দাড়ির ভিতরের অংশ ফরজের স্থান নয়। আঙ্গুল খিলাল করা। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করো, যাতে জাহান্নামের আগুন তাতে প্রবেশ না করে। আর এর যৌক্তিক কারণ হচ্ছে, এর দ্বারা ফরজকে তার স্থানে পূর্ণতা দান করা হয়। কাজেই আঙ্গুল খিলাল করা সুন্নত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.)-এর মতে দাড়ি খিলাল করাও সুন্নত। দলিল হলো, হযরত জিব্রাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ-কে দাড়ি খিলাল করার হুকুম দিয়েছেন। ইনায়া গ্রন্থকার হাদীসটি নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন।

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ عَلَيَّ جِبْرَئِيْلُ وَاَمَرَنِيْ اَنْ اُخَلِّلَ لِحْيَتِيْ اِذْ تَوَضَّأْتُ .

নবী করীম ﷺ বলেন, একদা হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমার নিকট এসে বললেন, আমি যখন অজু করি তখন যেন আমি দাড়িও খিলাল করি। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনে মাজাহ হযরত ওসমান (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ অজুতে স্বীয় দাড়ি খিলাল করতেন। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে,

اِنَّهُ قَالَ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অজু করতেন, তখন তিনি দাড়ি খিলাল করতেন। হাদীসটি ইমাম বায্যার (র.) বর্ণনা করেছেন।

কোনো কোনো ফকীহ বলেন যে, দাড়ি খিলাল করা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে সুন্নত। কিন্তু طرفين অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সুন্নত নয় বরং জায়েজ। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, সুন্নত এমন কাজকে বলা হয় যা ফরজকে তার স্থানে পূর্ণতা দান করে। আর দাড়ির ভিতরের অংশ ফরজের স্থান নয়, তাই একে বিদ'আতও বলা যাবে না। আর যে কাজ সুন্নত নয় এবং বিদ'আতও নয়, এ কাজকে জায়েজ বলা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই।

وَتَخْلِيْلُ الْاَصَابِعِ الخ অজুর সুন্নতসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো, হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা। হাতের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করার উত্তম তরীকা হলো, এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ভিতর ঢুকিয়ে খিলাল করা। 'শরহে নিকায়া' গ্রন্থে আছে যে, খিলাল করার উত্তম নিয়ম হলো, ডান হাতের হাতুলীর ভিতরের অংশ বাম হাতের হাতুলীর ওপরের অংশের উপর রেখে আঙ্গুল আঙ্গুলের ভেতর ঢুকিয়ে দেবে। এ নিয়মে ডান হাতের আঙ্গুলসমূহও খিলাল করবে। পায়ের

আঙ্গুলসমূহ খিলাল করার তরীকা হলো, বাম হাত ডান পায়ের নিচে রেখে বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলি পায়ের আঙ্গুলসমূহের ভিতরে ঢুকিয়ে পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করবে। উল্লেখ্য যে, ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলি থেকে খিলাল শুরু করে বাম পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত গিয়ে তা শেষ করবে। —(শরহে নিকায়া)

আঙ্গুল খিলাল করা সুন্নত হওয়ার এক দলিল তো হিদায়া প্রণেতা শায়খ বুরহান উদ্দীন (র.) উল্লেখ করেছেন। এ সম্বন্ধে আরো বহু দলিল রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ اَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তুমি অজু করবে তখন তুমি তোমার হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করবে।

তাবারানী গ্রন্থে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ لَمْ يُخَلِّلْ اَصَابِعَهٗ بِالْمَاءِ خَلَّلَهَا اللّٰهُ بِالنَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

যদি কেউ পানি দ্বারা তার আঙ্গুলসমূহ খিলাল না করে তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার আঙ্গুলসমূহের মাঝে জাহান্নামের আগুন ঢুকিয়ে দেবেন।

ফতহুল কাদীর গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, আঙ্গুল খিলাল করা সম্পর্কে যত হাদীস আছে এ সবের মধ্যে হযরত লাকীত ইবনে সাবিরা (রা.)-এর হাদীসটি সর্বাধিক সামঞ্জস্যশীল। হাদীসটি সুনানে আরবা'আতে উদ্ধৃত হয়েছে। সাহাবী বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তুমি অজু করবে তখন পরিপূর্ণভাবে অজু করবে এবং আঙ্গুলসমূহ খিলাল করবে।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, আঙ্গুল খিলাল করা সম্পর্কে যত হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে সব গুলোতেই صيغه امر (আদশসূচক ক্রিয়া) ব্যবহার করা হয়েছে। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, امر - وجوب-এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ হিসাবে তো আঙ্গুল খিলাল করা সুন্নত না হয়ে ওয়াজিব হওয়া চাই। জবাব : যদি আঙ্গুলসমূহের মাঝে পানি না পৌঁছে তবে আঙ্গুল খিলাল করে এর মাঝে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। আর যদি স্বাভাবিক নিয়মে পানি পৌঁছে যায় তাহলে খিলাল করা সুন্নত। আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী (র.) বলেন, আঙ্গুল খিলাল করা সম্পর্কে যেহেতু আদেশসূচক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে, তাই আঙ্গুল খিলাল করা ওয়াজিব হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল; কিন্তু যেহেতু অজুতে ওয়াজিব কোনো আমলই নেই তাই আঙ্গুল খিলাল করা ওয়াজিব নয়। আর অজুতে ওয়াজিব আমল না থাকার কারণ হলো, অজু নামাজের জন্য শর্ত। এই হিসাবে অজু নামাজের تابع বা অধীন। এ অবস্থায় নামাজের ন্যায় অজুতেও যদি ওয়াজিব আমল আছে বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলে اصل ও تابع এক পর্যায়ের হয়ে যাওয়া لازم হয়ে পড়ে। অথচ এটি যুক্তিযুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় একটি যৌক্তিক দলিল হচ্ছে এই যে, হাত এবং পা ধৌত করা ফরজ। আর খিলাল করার দ্বারা ফরজকে তার স্থানে পূর্ণতা দান করা হয়। আর অজুতে যে জিনিসের দ্বারা ফরজকে তার স্থানে পূর্ণতা দান করা হয় তা সুন্নত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ কারণেই আঙ্গুল খিলাল করা সুন্নত।

وَتَكْرَارُ الْغَسْلِ إِلَى الثَّلٰثِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ هٰذَا وُضُوْءٌ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ تَعَالَى الصَّلٰوةَ إِلَّا بِهٖ وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هٰذَا وُضُوْءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللّٰهُ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ وَتَوَضَّأَ ثَلٰثًا ثَلٰثًا وَقَالَ هٰذَا وُضُوْئِيْ وَ وُضُوْءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا وَنَقَصَ فَقَدْ تَعَدّٰى وَظَلَمَ وَالْوَعِيْدُ لِعَدَمِ رُؤْيَتِهٖ سُنَّةً ـ قَالَ وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّيْ أَنْ يَّنْوِيَ الطَّهَارَةَ فَالنِّيَّةُ فِي الْوُضُوْءِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيْ (رحـ) فَرْضٌ لِأَنَّهٗ عِبَادَةٌ فَلَا يَصِحُّ بِدُوْنِ النِّيَّةِ كَالتَّيَمُّمِ وَلَنَا أَنَّهٗ لَا يَقَعُ قُرْبَةً إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَلٰكِنَّهٗ يَقَعُ مِفْتَاحًا لِلصَّلٰوةِ لِوُقُوْعِهٖ طَهَارَةً بِاسْتِعْمَالِ الْمُطَهِّرِ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ لِأَنَّ التُّرَابَ غَيْرُ مُطَهِّرٍ إِلَّا فِيْ حَالِ إِرَادَةِ الصَّلٰوةِ أَوْ هُوَ يُنْبِئُ عَنِ الْقَصْدِ وَيَسْتَوْعِبُ رَأْسَهٗ بِالْمَسْحِ وَهُوَ السُّنَّةُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) اَلسُّنَّةُ هُوَ التَّثْلِيْثُ بِمِيَاهٍ مُخْتَلِفَةٍ ـ

অনুবাদ ঃ তিনবার পর্যন্ত (اَعْضَاءِ مَغْسُوْلَه) পুনঃ ধৌত করা। কেননা নবী করীম ﷺ এক এক অঙ্গ একবার করে ধৌত করেছেন এবং বলেছেন, এটা এমন অজু যা না করলে আল্লাহ তা'আলা নামাজই কবুল করবেন না। আবার দু'বার করে ধৌত করেছেন এবং বলেছেন, এটা ঐ ব্যক্তির অজু যাকে আল্লাহ দ্বিগুণ ছওয়াব দান করবেন। আবার তিনি তিনবার করে ধৌত করেছেন এবং বলেছেন, এটা আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অজু। যে এর বেশি বা কম করল, সে সীমালঙ্ঘন করল এবং অন্যায় করল। এই কঠোর হুশিয়ারী তিনবার করে ধোয়াকে সুন্নত বলে বিশ্বাস না করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, অজুকারীর জন্য মোস্তাহাব হলো, পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা। আমাদের মতে অজুতে নিয়ত করা সুন্নত। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর মতে নিয়ত করা ফরজ। কেননা অজু একটি ইবাদত। সুতরাং তায়াম্মুমের ন্যায় অজুও নিয়ত ছাড়া সহীহ হবে না। আমাদের দলিল হলো, নিয়ত ছাড়া অজু ইবাদতরূপে গণ্য হবে না ঠিক, কিন্তু مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ (সালাতে প্রবেশের মাধ্যম) রূপে অবশ্যই বিবেচিত হবে। কেননা পবিত্রতার উপকরণ (পানি) যেহেতু ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এতে পবিত্রতা হাসিল হয়ে যাবে। কিন্তু তায়াম্মুতের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা নামাজ আদায়ের নিয়ত ছাড়া অন্য অবস্থায় মাটি পবিত্রকারী বস্তুরূপে গণ্য হয় না। অথবা تيمم শব্দটিই ইচ্ছা ও নিয়তের অর্থবহ। (তাই তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়ত করা ফরজ।) সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা। এটি সুন্নত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, সুন্নত হচ্ছে প্রত্যেকবার নতুন পানি নিয়ে তিনবার মাসাহ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَعْضَاءِ مَغْسُوْلَه -কে তিন তিনবার করে ধৌত করাও অজুর সুন্নত। اَعْضَاءِ مَغْسُوْلَه -এর কথা উল্লেখ করে এর দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, تَكْرَارِ مَسْح সুন্নত নয়। কোনো কোনো ফকীহ-এর মতে একবার করে ধোয়া ফরজ। দু'বার করে ধোয়া সুন্নত। আর তিনবার করে ধোয়া হচ্ছে اكمال। অর্থাৎ পূর্ণতা দান করা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, দু'বার এবং

তিনবার করে ধোয়া সুন্নত। আবার কেউ এ কথাও বলেছেন যে, দ্বিতীয়বার ধোয়া সুন্নত এবং তৃতীয়বার ধোয়া নফল। কোনো কোনো ফকীহের মতে দ্বিতীয়বার ধোয়া নফল এবং তৃতীয়বার ধোয়া সুন্নত। আবূ বক্‌র ইসকাফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনবার ধৌত করার সমষ্টির দ্বারাই ফরজ আদায় হয়ে যায়। যেমন কেউ যদি নামাজে কিয়াম বা রুকূ দীর্ঘ করে তবে এই পুরাটাই ফরজ হিসাবে গণ্য হবে।

أَعْضَاءُ مَغْسُوْلَةٌ -কে তিনবার করে ধৌত করা সুন্নত হওয়া সম্পর্কে এক হাদীস তো হিদায়া গ্রন্থকার নিজেই উল্লেখ করেছেন। সে হাদীসে স্পষ্টভাবে এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অজুর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করার পর বলেছেন, এটি এমন অজু যা না হলে নামাজই কবুল হয় না। দু'বার করে ধৌত করে বলেছেন, এটি ঐ ব্যক্তির অজু যার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে। আবার তিনবার করে ধৌত করে বলেছেন, এটি আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অজু। যে এর বেশি বা কম করল সে সীমালঙ্ঘন করল এবং অন্যায় করল। হাদীসে বর্ণিত تَعَدّٰى (সীমালঙ্ঘন করল) শব্দের সম্পর্ক হলো زَادَ (বেশি করল)-এর সাথে এবং ظَلَمَ (অন্যায় করল) শব্দের সম্পর্ক হলো نَقَصَ (কম করল)-এর সাথে। ظَلَم শব্দটি কম করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا এখানে لَمْ تَظْلِم শব্দটি لَمْ تَنْقُصْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এ কঠোর হুঁশিয়ারী তখনই প্রযোজ্য হবে যদি কারো এই বিশ্বাস হয় যে, কামিল সুন্নত তিনবার ধৌত করার দ্বারা আদায় হয় না। অর্থাৎ এই বিশ্বাসের সাথে কেউ যদি কমবেশি করে তবে সে تَعَدّٰى وَظَلَمَ (সীমালঙ্ঘন করল এবং অন্যায়) করল। কিন্তু যদি সন্দেহের অবস্থায় মনের প্রশান্তি হাসিলের জন্য তিনবারের অধিক ধৌত করে অথবা যদি প্রয়োজনের কারণে তিনবারের কম ধৌত করে তাহলে সে ক্ষেত্রে এই কঠোর হুঁশিয়ারী প্রযোজ্য হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং কখনো তিনবার, কখনো দু'বার, আবার কখনো একবার ধৌত করেছেন।

تَكْرَارُ الْغَسْلِ إِلَى الثَّلٰثِ - ঐ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত যা ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الطُّهُوْرُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِيْ اِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلٰثًا فَذَكَرَ صِفَةَ الْوُضُوْءِ ثَلٰثًا ثَلٰثًا اِلَّا الرَّأْسَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا اَوْ نَقَصَ فَقَدْ اَسَاءَ وَظَلَمَ اَوْ ظَلَمَ وَاَسَاءَ .

হযরত আমর ইবনে শুআয়ব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অজু কিভাবে করতে হবে? এ প্রশ্নের পর তিনি একটি পাত্রে করে পানি আনার জন্য বললেন। অতঃপর তিনি তাঁর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। এরপর তিনি أَعْضَاءِ مَغْسُوْلَةٌ তিন তিনবার করে ধৌত করার কথা বর্ণনা করলেন। অবশ্য মাথা মাসাহর বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। সর্বশেষ তিনি বললেন, এ নিয়মেই অজু করতে হবে। কেউ যদি এর থেকে বেশি বা কম করে তবে সে অন্যায় করল এবং জুলুম করল অথবা তিনি বলেছেন, সে জুলুম করল এবং অন্যায় করল। ইবনে মাজাহ শরীফের হাদীসে আছে, فَقَدْ تَعَدّٰى وَظَلَمَ আর নাসাঈ শরীফের হাদীসে আছে, فَقَدْ اَسَاءَ وَتَعَدّٰى وَظَلَمَ অর্থাৎ হাদীসের শেষাংশের বাক্যের মধ্যে শব্দের কিছুটা অগ্র-পশ্চাৎ রয়েছে।

قَالَ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ الخ নিয়ত হলো, মনে মনে অজু করার সংকল্প করা অথবা নাপাকী (حَدَث) দূর করার ইচ্ছা করা কিংবা এমন কোনো ইবাদতের ইরাদা করা যা তাহারাত ব্যতিরেকে সহীহ হয় না। অজুতে নিয়ত করা জরুরি কিনা এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী আলিমগণের মতে অজুতে নিয়ত করা সুন্নত। ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) -এর মতে নিয়ত করা ফরজ। ইমামত্রয়ের দলিল, নবী করীম ﷺ-এর বর্ণনা إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল)। আর অজুও যেহেতু একটি আমল, তাই এটিও নিয়তের উপর নির্ভরশীল হবে। তাদের দ্বিতীয় দলিল হলো, অজু একটি ইবাদত। আর ইবাদত নিয়ত ছাড়া সহীহ হয় না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا أُمِرُوْٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ .

তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে ইখলাসের সাথে তার ইবাদত করতে। (সূরা বায়্যিনাহ্– ৯৮-৫) আর ইখলাস নিয়ত ছাড়া সম্ভব নয়। এ কারণেই (ইমামত্রয়ের) বক্তব্য হলো, কোনো ইবাদতই নিয়ত ব্যতীত সম্ভব নয়। যেমনিভাবে তায়াম্মুমের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে নিয়ত ফরজ।

আমাদের দলিল হলো, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -কে অজু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি তাকে অজুর তা'লীম দিয়েছেন; কিন্তু নিয়তের কথা বলেননি।—(শরহে নিকায়া) এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নিয়ত করা অজুতে ফরজ নয়। যদি ফরজ হতো তাহলে নবী করীম ﷺ অবশ্যই তাকে নিয়তের তা'লীম দিতেন। আমাদের দ্বিতীয় দলিল হলো, নামাজের জন্য অজু হলো শর্ত। নামাজের অন্যান্য শর্তাবলির ক্ষেত্রে নিয়ত জরুরি নয়। কাজেই এ ক্ষেত্রেও নিয়ত জরুরি হবে না।

উল্লেখ্য যে, হিদায়া গ্রন্থকার যে দলিলটি পেশ করেছেন তা মূলত ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিলের জবাব। সে দলিলের সারমর্ম হলো, নিঃসন্দেহে অজু একটি ইবাদত এবং তা নিয়ত ছাড়া সহীহ হতে পারে না। কিন্তু অজু নিয়ত ছাড়া مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ (নামাজ শুরু করার চাবি) হতে পারে। কেননা নামাজের চাবি হলো তাহারাত বা পবিত্রতা। আর এই তাহারাত নিয়ত করা, না করার সাথে সম্পর্কিত নয়। তাই তা (তাহারাত) উভয় অবস্থায়ই مُتَحَقِّقْ হতে পারে। কেননা পানি مُطَهِّرٌ فِيْ نَفْسِهٖ (পবিত্রকারী) বস্তু। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। —(সূরা ফুরকান, ২৫-৪৮)

সুতরাং পাককারী জিনিস অর্থাৎ পানি ব্যবহারের পর পবিত্রতা হাসিল হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। চাই তাহারাতের নিয়ত করুক বা না করুক। بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ (তায়াম্মুমের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম) বলে (رحـ) مصنف ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর কিয়াসের জবাব দিয়েছেন। সে জবাবের সারমর্ম হলো, অজুকে তায়াম্মুমের উপর কিয়াস করা ঠিক নয়; বরং এ কিয়াস হচ্ছে قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ। কেননা অজু করা হয় পানি দ্বারা, আর পানি بِذَاتِهٖ পাক-পবিত্রকারী জিনিস। পক্ষান্তরে তায়াম্মুম করা হয় মাটি দ্বারা। আর মাটি بذاته পাককারী জিনিস নয়; বরং নামাজের ইরাদা করা অবস্থায় তা পাককারী হিসাবে গণ্য হয়। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মাটি পাককারী বস্তু রূপে গণ্য হয় اَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ হিসেবে। আর اُمُوْرٌ تَعَبُّدِيَّه -এর মধ্যে নিয়ত অপরিহার্য। কাজেই তায়াম্মুমের উপর অজুকে কিয়াস করা ঠিক নয়।

(শাফি'ঈ মতাবলম্বী আলিমগণের উদ্দেশ্যে) আমাদের দ্বিতীয় জবাব হলো, তায়াম্মুমের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে قَصْدٌ و اِرَادَةٌ (ইচ্ছা ও সংকল্প) আর اُمُوْرٌ شَرْعِيَّةٌ-এর মধ্যে আভিধানিক অর্থ ধর্তব্য হয়ে থাকে। এ কারণেই তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়তের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ হাদীসের জবাব হলো, হাদীসে বর্ণিত اَعْمَالٌ শব্দ দ্বারা عِبَادَتٌ উদ্দেশ্য। কেননা শরিয়তে যে সব কাজ মুবাহ এর অনেক গুলোই নিয়ত ছাড়া গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। যেমন বিবাহ, তালাক ইত্যাদি। বরং اَعْمَالٌ দ্বারা عِبَادَاتٌ مُسْتَقِلَّةٌ হচ্ছে উদ্দেশ্য। আর অজু عِبَادَاتٌ مُسْتَقِلَّةٌ -এর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটি হচ্ছে নামাজের জন্য وَسِيْلَةٌ মাত্র। কাজেই অজু নিয়তের উপর নির্ভরশীল হবে না।

শরহে নিকায়া গ্রন্থকার বলেন, হাদীসে اَلْاَعْمَالُ শব্দের আগে ثَوَابُ শব্দটি উহ্য আছে। এ হিসাবে হাদীসের মর্ম হচ্ছে আমলের ছওয়াব নিয়তের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু نَفْسِ عَمَلْ নিয়তের উপর নির্ভরশীল নয়।

اِعْتِبَارًا بِالْمَغْسُوْلِ وَلَنَا اَنَّ اَنَسًا (رض) تَوَضَّأَ ثَلٰثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَالَ هٰذَا وَضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ يُرْوٰى مِنَ التَّثْلِيْثِ مَحْمُوْلٌ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَشْرُوْعٌ عَلٰى مَارُوِيَ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَلِاَنَّ الْمَفْرُوْضَ هُوَ الْمَسْحُ وَبِالتَّكْرَارِ يَصِيْرُ غَسْلًا فَلَايَكُوْنُ مَسْنُوْنًا فَصَارَ كَمَسْحِ الْخُفِّ بِخِلَافِ الْغَسْلِ لِاَنَّهُ لَايَضُرُّهُ التَّكْرَارُ.

অনুবাদ ঃ মাসাহকে তিনি ধোয়ার অঙ্গসমূহের (اَعْضَاءُ مَغْسُوْلَة) উপর কিয়াস করেন। আমাদের দলিল এই যে, হযরত আনাস (রা.) (মুখ, হাত, পা) তিনবার করে ধোয়ে অজু করলেন এবং মাথা মাসাহ করলেন একবার। তারপর তিনি বলেছেন, এ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অজু। আর তিনবার মাসাহ করার যে হাদীস আছে, তা মূলত একইবার হাত ভিজিয়ে তিনবার মাসাহ করার ওপর مَحْمُوْلٌ এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত মত অনুযায়ী এ-ও শরিয়ত সম্মত। তা ছাড়া ফরজ হলো মাসাহ করা। অথচ বারংবার মাসাহ করলে তা ধোয়াতেই পরিণত হয়ে যাবে। কাজেই তিনবার মাসাহ করা সুন্নত হতে পারে না। অতএব মাথা মাসাহ করা মূলত মোজার উপর মাসাহ করার সাদৃশ্য। পক্ষান্তরে অঙ্গ ধৌত করার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা تَكْرَارٌ (পুনঃ পুনঃ ধোয়া) غَسْل (ধোয়া)-এর জন্য ক্ষতিকারক নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, পূর্ণ মাথা মাসাহ করাও অজুর সুন্নতসমূহের মধ্যে অন্যতম। পূর্ণ মাথা মাসাহ করার নিয়ম হলো, প্রথমে উভয় হাতের হাতুলী আঙ্গুলসহ ভিজাবে। তারপর শাহাদাত আঙ্গুল ও বৃদ্ধাঙ্গুলিকে আলাদা রেখে উভয় হাতের তিন তিন আঙ্গুল মাথার অগ্রভাগের উপর রাখবে। অতঃপর আঙ্গুলসমূহ টেনে মাথার পেছনের দিকে আনবে। এরপর মাথার প্রান্তি দিয়ে টেনে উভয় হাতের হাতুলী সামনের দিকে আনবে। অতঃপর বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কানের উপরিভাগ এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কানের ভেতরের ভাগ মাসাহ করবে।—(ফতহুল কাদীর) নিহায়া গ্রন্থে অতিরিক্ত এ কথাও বর্ণিত আছে যে, এসব কাজ সম্পন্ন করে উভয় হাতের পৃষ্ঠ দ্বারা গর্দান মাসাহ করবে।

মোদ্দাকথা হলো, আমাদের মাযহাবে পূর্ণ মাথা একবার মাসাহ করা সুন্নত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, তিনবার নতুন পানি নিয়ে তিনবার পূর্ণ মাথা মাসাহ করা সুন্নত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) মাথা মাসাহ করার বিষয়টিকে عَضْو مَغْسُوْل-এর উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ যেমনিভাবে মুখ, হাত ও পা তিনবার ধৌত করা সুন্নত; ঠিক তেমনিভাবে পূর্ণ মাথাও তিনবার মাসাহ করা সুন্নত।

আমাদের দলিল এই যে, হযরত আনাস (রা.) মুখ, হাত ও পা তিনবার করে ধৌত করে অজু করেছেন এবং মাথা মাসাহ করেছেন একবার। অবশেষে তিনি বলেছেন, এটিই হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অজু। উল্লেখ্য যে, হযরত আলী এবং ওসমান (রা.)-ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অজুর বিবরণ পেশ করেছেন। তাদের বর্ণিত হাদীসে اَعْضَاءُ مَغْسُوْلَة তিনবার করে ধৌত করা এবং মাথা তিনবার করে মাসাহ করার কথা বর্ণিত আছে। এর জবাবে اَحْنَافٌ-এর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হাত ভিজিয়ে এর দ্বারাই তিনবার মাথা মাসাহ করেছেন। তিনবার নতুন পানি নিয়ে এর দ্বারা তিনবার মাথা মাসাহ করেননি। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এরূপ করাও শরিয়ত সম্মত। আমাদের দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, ফরজ হলো মাথা মাসাহ করা। আর বারংবার মাসাহ করলে তা ধোয়াতেই পরিণত হয়ে যাবে। আর এটি (غَسْل) কুরআন, হাদীস এবং ইজমার পরিপন্থী কাজ। কাজেই تَكْرَار مَسْح (পুনঃ পুনঃ মাসাহ করা) সুন্নত হতে পারে না। আসলে মূলত মাথা মাসাহ করার বিষয়টি মোজার উপর মাসাহ করার সদৃশ। অর্থাৎ মোজার উপর মাসাহ করার ক্ষেত্রে যে ভাবে تَثْلِيْث (তিনবার ধোয়া) সুন্নত নয়। এমনিভাবে মাথা মাসেহের ক্ষেত্রেও تَثْلِيْث সুন্নত নয়। পক্ষান্তরে ধোয়া (غَسْل)-এর বিষয়টি এর থেকে ভিন্নতর। কেননা তা تَكْرَارٌ-এর কারণে ফাসিদ হয় না। অর্থাৎ تَكْرَارٌ সত্ত্বেও غَسْل ই থাকে। তাই ধোয়ার ক্ষেত্রে তিনবার ধোয়া সুন্নত।

وَيُرَتِّبُ الْوُضُوْءَ فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِذِكْرِهٖ وَبِالْمَيَامِنِ وَالتَّرْتِيْبُ فِى الْوُضُوْءِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِىْ (رحـ) فَرْضٌ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ اَلْاٰيَةُ وَالْفَاءُ لِلتَّعْقِيْبِ وَلَنَا اَنَّ الْمَذْكُوْرَ فِيْهَا حَرْفُ الْوَاوِ وَهِىَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ بِاِجْمَاعِ اَهْلِ اللُّغَةِ فَتَقْتَضِىْ اِعْقَابَ غَسْلِ جُمْلَةِ الْاَعْضَاءِ وَالْبِدَايَةُ بِالْمَيَامِنِ فَضِيْلَةٌ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى التَّنَعُّلِ وَالتَّرَجُّلِ ـ

অনুবাদ ঃ তারতীবের সাথে অজু করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেভাবে বর্ণনা শুরু করেছেন, সে ধারায় শুরু করা। এবং ডান দিক থেকে শুরু করা। আমাদের মাযহাবে অজুতে তারতীব রক্ষা করা সুন্নত। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে ফরজ। কেননা কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ الاية। فَاغْسِلُوْا শব্দে ব্যবহৃত فَاء অব্যয়টি تَعْقِيْب (ক্রমধারা) প্রকাশের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (কাজেই অজুর অঙ্গসমূহ পর্যায়ক্রমে ধোয়া ফরজ।) আমাদের দলিল হলো, আলোচ্য আয়াতে (উল্লিখিত প্রতিটি অঙ্গের পর) وَاوْ অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে। আর অভিধান বিশারদগণ সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, واو অক্ষরটি নিছক جَمْع তথা একত্রিকরণের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং আয়াতের দাবি হলো, নামাজের ইচ্ছা করার পরবর্তী পর্যায়ে সবকটি অঙ্গ ধৌত করার কাজ সম্পন্ন করা। আর ডান দিক থেকে শুরু করা উত্তম। কেননা নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা সমস্ত কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করেন। এমনকি জুতা পরিধান করা এবং চুল আঁচড়ানোর ক্ষেত্রেও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উক্ত عِبَارَتْ তে দু'টি মাসআলা আলোচিত হয়েছে– (১) তারতীবের মাসআলা, (২) ডান দিক থেকে অজু শুরু করা। উল্লেখ্য যে, অজুতে যে সব অঙ্গ ধোয়া ও মাসাহ করা ফরজ, এ সবের মধ্যে তারতীব রক্ষা করার হুকুম কি, এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী ইমামগণের মতে অজুর اَعْضَاءِ مَفْرُوْضَة-এর তরতীব রক্ষা করা সুন্নত। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে তারতীব রক্ষা করা ফরজ। তাঁদের দলিল হচ্ছে– اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ (الاية) আয়াতটি। কেননা আলোচ্য আয়াতে فَاء অব্যয়টি উল্লিখিত হয়েছে–যা تعقيب-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর تَعْقِيْب تَرْتِيْب-এর অর্থ প্রকাশ করে থাকে। কেননা تعقيب-এর মর্ম হলো, فَاء পরবর্তী বিষয়গুলো فَاء পূর্ববর্তী বিষয়ের উপর مرتب হওয়া। এতে قِيَامُ اِلَى الصَّلٰوةِ (নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো) এবং غسل وجه (মুখমণ্ডল ধোয়া)-এর মাঝে তারতীব প্রতীয়মান হয়। যেহেতু قِيَامُ اِلَى الصَّلٰوةِ এবং غسل وجه-এর মাঝে তারতীব জরুরি তাই অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝেও তারতীব জরুরি বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা অবশিষ্ট অঙ্গসমূহ সবগুলোই غسل وجه-এর উপর معطوف আর قاعده আছে যে, مَعْطُوْف عَلَى الْمُرَتَّبْ ও مرتب হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে। তাই অবশিষ্ট অঙ্গ সমূহের মাঝেও তরতীব আবশ্যক বলে সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি অবশিষ্ট অঙ্গসমূহের মাঝে তারতীব আবশ্যক নয় বলা হয় তাহলে اَعْضَاءِ مَفْرُوْضَة-এর মধ্যে পার্থক্য বিধান করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। অথচ কেউই এরূপ পার্থক্য বিধান করার কথা বলে না। অর্থাৎ হয়তো এ কথা বলা হবে যে, অজুর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে তারতীব জরুরি অথবা জরুরি নয়। এ কথা তো কেউ বলে না যে, কিছু অঙ্গের মাঝে তারতীব জরুরি। আর কিছু অঙ্গের মাঝেও তারতীব জরুরি নয়।

আমাদের দলিল হলো, أَعْضَاءِ مَفْرُوْضَه-এর বর্ণনা করতে গিয়ে আলোচ্য আয়াতে واو অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। আর অভিধান বিশারদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, واو অব্যয়টি শুধুমাত্র جمع অর্থাৎ একত্রিকরণের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় আমরা যদি এ কথা মেনেও নেই যে, আলোচ্য আয়াতে فاء অব্যয়টি تعقيب-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, তথাপিও আমরা বলব যে, যেহেতু আয়াতে فاء এবং واو উভয় অক্ষরই বিদ্যমান আছে তাই আয়াতের মর্ম হবে, اعضاء اربعة তথা অঙ্গ চতুষ্টয়ের ধৌত করার বিষয়টি قيام الى -قِيَامَ إِلَى الصَّلٰوةِ-এর পরে সম্পন্ন (مرتب) হবে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, غَسْلِ أَعْضَاءِ أَرْبَعَةَ এবং الصلوة এর মধ্যে তরতীব রক্ষা করা জরুরি; কিন্তু এর দ্বারা অঙ্গ চতুষ্টয়ের মাঝে তারতীব জরুরি এ কথা সাব্যস্ত হয় না। অথচ আমাদের বক্তব্য হলো, অঙ্গ চতুষ্টয়ের তারতীব সম্পর্কে। اعضاء اربعة-এর মাঝে তারতীব সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ হলো, আলোচ্য আয়াতে اعضاء اربعة এর বর্ণনার ক্ষেত্রে واو অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। আর واو তারতীবের ফায়দা দেয় না। এ কারণেই আমরা বলি যে, অজুতে اعضاء مفروضه-এর মাঝে তারতীব জরুরি নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু কুরআন মাজীদে বর্ণিত ধারা অনুসারে অজু সম্পাদন করেছে তাই আমরা বলি যে, অজুতে তরতীব রক্ষা করা সুন্নত ফরজ নয়।

এখানে একটি اشكال (প্রশ্ন) হয় যে, হিদায়া গ্রন্থকার এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, واو অব্যয়টি مطلقا جمع-এর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এ ব্যাপারে তিনি اجماع সংঘটিত হওয়ায় দাবি করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তার এ দাবি ঠিক নয়। কেননা আলিমদের কেউ কেউ বলেছেন যে, واو অক্ষরটি তারতীবের অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উক্ত اشكال-এর জবাবে شارحين كرام বলেন, শায়খ আবূ আলী ফারমি (র.) বলেছেন, ইল্মে নাহ্ বিশেষজ্ঞদের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, واو অক্ষরটি مطلق جمع-এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইমামুন নাহ্ আল্লামা সীবাওয়াহ (র.) স্বীয় কিতাবের সতের জায়গায় এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, واو - مطلق جمع-এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হিদায়া গ্রন্থকার এ সব বক্তব্যের উপর ভিত্তি করেই اجماع-এর দাবি করেছেন। উল্লেখ্য যে, কতিপয় ব্যক্তির মতভেদ اجماع সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে مانع (প্রতিবন্ধক) নয়।

দ্বিতীয় মাসআলা ছিল ابتداء باليمين অর্থাৎ ডান দিক থেকে অজু শুরু করা। স্বর্তব্য যে, হাত পা ধোয়ার ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করা উত্তম বা মোস্তাহাব। শরহে নিকায়া গ্রন্থের مصنف বলেছেন যে, বিশুদ্ধতম মতে ডান দিক থেকে অজু শুরু করা সুন্নত। যেমন তুহফা গ্রন্থে উল্লেখ আছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা ডান দিক থেকে অজু করতেন। সর্বোপরি তিনি বলেছে, إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوْا بِمَيَامِنِكُمْ যখন তোমরা অজু করবে তখন ডান দিক থেকে তা শুরু করবে। হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম ইবনে মাজাহ্, ইমাম ইবনে খুযায়মা এবং ইমাম ইবনে হিব্বান (র.) উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى التَّنَعُّلِ وَالتَّرَجُّلِ রাসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা বা পসন্দ করতেন। এমনকি জুতা পরিধান করা এবং চুল আচড়ানোর ক্ষেত্রেও। অপর এক হাদীসে আছে, حَتّٰى فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। এমনকি অজু করা, জুতা পরিধান করা, চুল আঁচড়ানোর ক্ষেত্রেও অর্থাৎ তার সকল কাজের ক্ষেত্রেই তিনি ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।

فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوْءِ : اَلْمَعَانِي النَّاقِضَةُ لِلْوُضُوْءِ كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ (الاية) وَقِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَا الْحَدَثُ قَالَ مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ وَكَلِمَةُ مَا عَامَّةٌ فَتَتَنَاوَلُ الْمُعْتَادَ وَغَيْرَهُ وَالدَّمُ وَالْقَيْحُ اِذَا خَرَجَا مِنَ الْبَدَنِ فَتَجَاوَزَا اِلٰى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيْرِ وَالْقَيْءُ مِلْءُ الْفَمِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) اَلْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ لَايَنْقُضُ الْوُضُوْءَ لِمَا رُوِيَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاءَ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلِاَنَّ غَسْلَ غَيْرِ مَوْضِعِ الْاِصَابَةِ اَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ فَيُقْتَصَرُ عَلٰى مَوْرِدِ الشَّرْعِ وَهُوَ الْمَخْرَجُ الْمُعْتَادُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْوُضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَاءَ اَوْ رَعُفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلٰى صَلَاتِهِ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ لِاَنَّ خُرُوْجَ النَّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَالِ الطَّهَارَةِ وَهٰذَا الْقَدْرُ فِي الْاَصْلِ مَعْقُوْلٌ وَالْاِقْتِصَارُ عَلَى الْاَعْضَاءِ الْاَرْبَعَةِ غَيْرُ مَعْقُوْلٍ۔ لٰكِنَّهُ يَتَعَدّٰى ضَرُوْرَةَ تَعَدِّي الْاَوَّلِ غَيْرَ اَنَّ الْخُرُوْجَ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالسَّيَلَانِ اِلٰى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيْرِ وَبِمِلْءِ الْفَمِ فِي الْقَيْءِ لِاَنَّ بِزَوَالِ الْقِشْرَةِ تَظْهَرُ النَّجَاسَةُ فِي مَحَلِّهَا فَتَكُوْنُ بَادِيَةً لَاخَارِجَةً۔

অনুচ্ছেদ : অজু ভঙ্গের কারণসমূহ

অনুবাদ ঃ অজু ভঙ্গের কারণগুলো যথাক্রমে ঃ (১) পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "অথবা তোমাদের কেউ যদি শৌচ স্থান থেকে আসে" (৪. মায়িদা. ৪৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল حدث (অজু ভঙ্গের কারণ) কী? তিনি বললেন, পেশাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে যা কিছু বের হয়। আলোচ্য হাদীসের ما (যা- কিছু) শব্দটি ব্যাপকতা জ্ঞাপক। সুতরাং প্রকৃতিগত ও অপ্রকৃতিগতভাবে যা কিছু বের হয় সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।(২) দেহের কোনো অংশ থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে যদি তা পাক করার বিধান প্রযোজ্য হয় এমন স্থান অতিক্রম করে।(৩) মুখ ভর্তি বমি হওয়া। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, পেশাব পায়খানার রাস্তা ছাড়া (দেহের অন্য কোনো স্থান থেকে) কিছু বের হলে অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বমি করে অজু করেননি। তাছাড়া যে স্থানে নাজাসাত স্পর্শ করেনি, তা ধৌত করা যুক্তি-উর্ধ্ব করণীয় (امر تعبدى) বিধান। সুতরাং শরিয়তের নির্দেশিত স্থানে তা সীমিত থাকবে। আর তা হলো প্রকৃতিগত পথ। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সকল প্রবাহিত রক্তের জন্যই অজু আবশ্যক। তিনি আরো বলেছেন, নামাজ অবস্থায় কারো বমি হলে কিংবা নাক থেকে রক্ত ঝরলে সে যেন ফিরে গিয়ে অজু করে এবং পরবর্তী নামাজের ওপর "বেনা" করে যতক্ষণ না কথা বলবে। (আমাদের) আকলী দলিল হলো, নাজাসাত নির্গত হওয়া তাহারাত ও পবিত্রতা ভঙ্গের কারণ, মূল আয়াতের সাথে এতটুকু তো যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য নির্দিষ্ট চার অঙ্গ ধোয়ার নির্দেশ যুক্তির উর্ধ্বে। কিন্তু প্রথম বিষয়টি স্থানান্তরিত হওয়ায় দ্বিতীয় বিষয়টিও স্থানান্তরিত হওয়া অনিবার্য হবে। তবে নির্গত হওয়া তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন তা তাহারাতের হুকুমভুক্ত কোনো অংশে গড়িয়ে পৌছবে। আর বমির ক্ষেত্রে যখন তা মুখ ভরে হবে। কেননা "আবরণত্বক" ওঠে গেলে রক্ত বা পুঁজ স্বস্থানে প্রকাশ পায় মাত্র নির্গত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অজু ভঙ্গের কারণসমূহের একটি হলো, পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া। প্রথম দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী– أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ ـ غائط এমন নিম্নভূমিকে বলা হয় যেখানে মানুষ পেশাব পায়খানা সমাধা করার জন্য যায়। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা বলতেছেন, তোমাদের কেউ যদি কাযায়ে হাজাত সেরে আসে আর পানি না পায় তবে সে যেন তায়াম্মুম করে নেয়। বুঝা গেল خُرُوْجٌ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ -এর কারণে অজু ভেঙ্গে যায়। অজু না ভাঙ্গলে পানি না থাকা অবস্থায় তায়াম্মুমের নির্দেশ দেওয়া হতো না।

দ্বিতীয় দলিল ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে হাদাস (حدث) কী জিনিস? তিনি বলেন مَايَخْرُجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ। পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে যা-কিছু বের হয়। উক্ত হাদীসে ما শব্দটি ব্যাপক যা প্রকৃতিগত شئ معتاد যেমন– পেশাব-পায়খানা এবং অপ্রকৃতিগত غير معتاد যেমন– কাপড়, কঙ্কর, ইস্‌তিহাযার রক্ত ইত্যাদি। এ সব বের হওয়া অজু ভঙ্গের কারণ। ইমাম মালিক (র.) বলেন, অপ্রকৃতিগত বস্তু যেমন– কাপড়, কঙ্কর, ইস্‌তিহাযার রক্ত, পেশাবের ফোঁটা ইত্যাদি বের হলে অজু ভাঙ্গবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা غائط দ্বারা কাযায়ে হাজাতের দিকে كناية করেছেন। আর কাযায়ে হাজাত হলো প্রকৃতিগত তথা– معتاد।

এর জবাবে আমরা বলি রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ মুস্‌তাহাযাহ মহিলা প্রত্যেক নামাজের সময় অজু করবে। আর ইস্‌তিহাযা হলো অপ্রকৃতিগত غير معتاد। বুঝা গেল অপ্রকৃতিগত বস্তু যা পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হয়, তার দ্বারাও অজু ভেঙ্গে যায়।

অজু ভঙ্গের একটি কারণ হলো জীবন্ত মানুষের শরীর থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে এমন স্থান অতিক্রম করা যা অজু বা গোসলের মধ্যে পাক করার নির্দেশ রয়েছে। অর্থাৎ সাবীলাইন ব্যতীত অন্য কোনো স্থান থেকে নাজাসাত বের হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং "সায়লান" তথা গড়িয়ে যাওয়া শর্ত। তাইতো রক্ত যদি ক্ষত স্থান অতিক্রম না করে তবে এর দ্বারা অজু ভঙ্গ হবে না।

অজু ভঙ্গের আরেকটি কারণ হলো, মুখ ভর্তি বমি করা। এর অর্থ হলো এমন বমি যাকে কষ্ট ছাড়া সাধারণভাবে বারণ করা যায় না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, পেশাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়া দেহের অন্য কোনো স্থান থেকে কিছু বের হলে অজু ভঙ্গ হবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে অজু ভেঙ্গে যাবে। এর মধ্যে সায়লান বা গায়রে সায়লান অথবা মুখ ভর্তি বা কম এর কোনো শর্ত নেই; বরং সর্বাবস্থায় অজু ভেঙ্গে যাবে। মোট কথা, ইমামগণের মতামতের সারসংক্ষেপ হলো, ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে خَارِجٌ مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ দ্বারা মুত্‌লাকান অজু ভাঙ্গবে না। ইমাম যুফার (রা.)-এর নিকট মুত্‌লাকান ভেঙ্গে যা ব। আর ওলামায়ে আহনাফের আয়িম্মায়ে ছালাছার (ইমামত্রয়ের) মতে উপরে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর নকলী দলিল ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বমি করেছেন কিন্তু অজু করেননি। বুঝা গেল বমির কারণে অজু ভঙ্গ হয় না।

দ্বিতীয় আকলী দলিল ঃ যে সকল স্থানে নাজাসাত স্পর্শ করেনি সেগুলো ধৌত করা আম্‌রে তা'আববুদী (امر تعبدى) তথা কিয়াস বহির্ভূত করণীয় বিধান। কেননা সাধারণ কিয়াসের দাবি হচ্ছে, নাজাসাত লেগে যাওয়া অঙ্গ ধৌত করা। অথচ অজুর ক্ষেত্রে রয়েছে এর বিপরীত। তবে যেহেতু আমরা আল্লাহ বান্দা, সেহেতু বন্দেগীর সাধারণ দাবি হচ্ছে, যুক্তি ও বুদ্ধিকে প্রাধান্য না দিয়ে আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেওয়া। তবে এ ধরনের হুকুম শরিয়তের প্রত্যক্ষ নির্দেশের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সুতরাং অজুর নির্দেশ সম্বলিত আয়াতে যেহেতু পেশাব-পায়খানার স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে নির্গত নাজাসাতের কথা রয়েছে, তাই এর বাইরে অজু ভঙ্গের বিধানকে প্রয়োগ করা যাবে না। বুঝা গেল خَارِجٌ مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ অজু ভঙ্গ হবে না।

আমাদের প্রথম নকলী দলিল عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوُضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সকল প্রবাহিত রক্তের জন্যই অজু আবশ্যক। (الكامل لابن عدى) উক্ত হাদীস এভাবে আমাদের দলিল যে, এ ধরনের বক্তব্য দ্বারা ওয়াজিব বুঝা যায়। যেমন - রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী فِيْ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ شَاةٌ দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে উটের যাকাতের ফরযিয়াত সাবিত হয়। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী اِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ দ্বারা সকলের মতে গোসলের ওয়াজিব সাবিত হয়। সুতরাং উপরোক্ত হাদীসের অর্থ হবে, تَوَضَّئُوْا مِنْ كُلِّ دَمٍ سَالَ مِنَ الْبَدَنِ অর্থাৎ যত প্রকার রক্তই শরীর থেকে বের হয় -এর কারণে তোমাদেরকে ওজু করতে হবে।

দ্বিতীয় নকলী দলিল ঃ مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ - রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নামাজ অবস্থায় কারো বমি হলে কিংবা নাক থেকে রক্ত ঝরলে সে যেন ফিরে গিয়ে অজু করে এবং পূর্ববর্তী নামাজের উপর বেনা করে যতক্ষণ না কথা বলবে।— (ইবনে মাজাহ) (ابن ماجه) এ হাদীস এভাবে আমাদের দলিল যে, এ হাদীসের মধ্যে অজুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর امر (নির্দেশ) উজুবের জন্য আসে। বুঝা গেল বমি করা বা নাক থেকে রক্ত ঝরার পর অজু করা ওয়াজিব।

আমাদের আকলী দলিল, যা মূলত ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর আকলী দলিলের জবাব; সাবীলাইন থেকে নাজাসাত বের হওয়া পবিত্রতা ভঙ্গের কারণ। এতটুকু পরিমাণ اصل অর্থাৎ مقيس عليه -এর মধ্যে কিয়াস সম্মত। তবে নির্দিষ্ট চার অঙ্গ ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া কিয়াস। সুতরাং خُرُوْجُ النَّجَاسَةِ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ-কে خُرُوْجُ النَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ-এর উপর কিয়াস করা হয়েছে এবং তাহারাত ভঙ্গের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তাহারাত ভঙ্গের জন্য যেহেতু তাহারাত জরুরি তাই خُرُوْجُ النَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ-এর কারণে তাহারাত দূরীভূত হওয়া চার অঙ্গ ধোয়ার হুকুম নিজে নিজেই সাবিত হয়ে গেছে। কেননা প্রথম বিষয়টি স্থানান্তরিত হওয়ায় দ্বিতীয় বিষয়টিও স্থানান্তরিত হওয়া অনিবার্য হয়ে যায়।

এখানে প্রশ্ন হয় যখন غير سبيلين থেকে নাজাসাত বের হওয়া سبيلين থেকে নাজাসাত বের হওয়ার মতোই। এ হিসেবে سبيلين থেকে নাজাসাত বের হলে যেমনিভাবে অজু ভেঙ্গে যায়, এমনিভাবে غير سبيلين থেকে বের হলেও তো অজু ভেঙ্গে যাওয়ার কথা। অথচ আপনারা এখানে বের হওয়ার সাথে সাথে سيلان-এরও শর্ত আরোপ করেছেন?

হিদায়া গ্রন্থকার এর জবাবে বলেন اصل ও فرع উভয় স্থানেই খুরুজ তথা নির্গত হওয়ার বিষয়টিই ধর্তব্য বিষয়। তবে রক্ত ও পুঁজ তখনই নির্গত বলে সাব্যস্ত হবে যখন তা এমন স্থানে গড়িয়ে যায়, যা অজু ও গোসলের মধ্যে ধোয়া আবশ্যক। আর বমির ক্ষেত্রে যখন তা মুখ ভরে হবে। দলিল এই যে, আবরণত্বক উঠে গেলে রক্ত বা পুঁজ স্বস্থানে প্রকাশ পায় মাত্র; বের হয় না।

পক্ষান্তরে পেশাব-পায়খানার পথ দু'টি এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ সেখানে নাজাসাত দেখা গেলেই অজু ভঙ্গ হয়েছে বলে ধরা হবে। কেননা তা নাজাসাতের প্রকৃত স্থান নয়। সুতরাং সেখানে নাজাসাতের প্রকাশ থেকেই তার স্থান অতিক্রম ও নির্গত হওয়া প্রমাণিত হবে। আর বমির ক্ষেত্রে নির্গত হয়েছে তখনই ধরা হবে যখন তা মুখ ভরে হবে। মুখ ভরা বমির অর্থ হলো যা অনায়াসে আটকানো যায় না। কেউ কেউ বলেছেন, মুখ ভরা তখনই হবে যখন কথা বলতে কষ্ট হয়। কেউ কেউ বলেছেন, যখন অর্ধ মুখ থেকে বেশি হয়।—(নিহায়া) দলিল হলো, মুখের ভিতরের দু'টো দিক রয়েছে, এক. যাহির দুই. বাতিন। কেননা মুখ খুললে তা যাহিরের অনুরূপ, আর মুখ বন্ধ করলে তা বাতিন-এর অনুরূপ। আমরা উভয়টির উপর লক্ষ্য রেখে বলেছি যদি মুখ ভরে না হয় তবে বাতিন-এর অনুরূপ ধরে বলা হয়েছে যে, খুরূজ পাওয়া যায়নি, তাই এ সূরতে অজু ভঙ্গ হবে না। আর যদি মুখ ভরে হয় তবে যাহির-এর অনুরূপ ধরে বলা হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে খুরূজ পাওয়া গেছে তাই এ সূরতে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

ইমাম যুফার (র.)-এর মাযহাব উপরে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর মতে خَارِجٌ مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ -এর কারণে মুতলাকান অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। অর্থাৎ অল্প ও বিস্তর বমি সমপর্যায়ের। তাঁর মতে প্রবাহিত হওয়া শর্ত নয়। কেননা তিনি পেশাব পায়খানার স্বাভাবিক নির্গত হওয়া স্থানের উপর কিয়াস করেন। বমি অল্প বিস্তর অজু ভঙ্গের কারণ। দলিল এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, القلس حدث - قلس অর্থ– বমি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ মুতলাকান বমিকে অজু ভঙ্গের কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

خَارِجٌ مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ-এর জন্য প্রবাহিত হওয়া শর্ত। এর স্বপক্ষে আমাদের দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ سَائِلًا প্রবাহিত না হলে এক দু' ফোঁটা রক্ত বের হলে অজু ওয়াজিব নয়।– (দারাকুতনী) বমি কম হলে অজু ভাঙ্গবে না। দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী يُعَادُ الْوُضُوْءُ مِنْ سَبْعٍ مِنْ اقْطَارِ الْبَوْلِ وَالدَّمِ السَّائِلِ وَالْقَيْحِ وَمِنْ دَسْعَةٍ تَمْلَأُ الْفَمَ وَنَوْمِ الْمُضْطَجِعِ وَقَهْقَهَةِ الرَّجُلِ فِي الصَّلٰوةِ وَخُرُوْجِ الدَّمِ -

সাতটি জিনিস দ্বারা অজু দোহ্রান জরুরি। পেশাবের ফোঁটা দ্বারা, প্রবাহিত রক্ত দ্বারা, পুঁজ দ্বারা, ভরা মুখে বমি দ্বারা, চিৎ হয়ে ঘুমানো দ্বারা, পুরুষের (সাবালেগ) নামাজে অট্টহাসি দ্বারা এবং রক্ত বের হওয়া দ্বারা। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, মুখ ভরা বমি অজু ভঙ্গের কারণ। এ কথাগুলো হিদায়া গ্রন্থকার এভাবে বলেছেন; হযরত আলী (রা.) অজু ভঙ্গের সবকটি কারণ গণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, أَوْ دَسْعَةٍ تَمْلَأُ الْفَمَ কিংবা মুখ ভরা বমি। এখানে যখন হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী, তখন সমন্বয়ের জন্য ইমাম শাফি'ঈ (র.) বর্ণিত হাদীসকে অল্প বমির উপর, আর ইমাম যুফার (রা.) বর্ণিত হাদীসকে বেশি বমির উপর ধরা হবে। পক্ষান্তরে পেশাব পায়খানার রাস্তা سبيلين এবং অন্যান্য স্থান থেকে নির্গত হওয়া নাজাসাতের পার্থক্য আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি।

بِخِلَافِ السَّبِيْلَيْنِ لِاَنَّ ذَاكَ الْمَوْضَعُ لَيْسَ بِمَوْضَعِ النَّجَاسَةِ فَيُسْتَدَلُّ بِالظُّهُوْرِ عَلَى الْاِنْتِقَالِ وَالْخُرُوْجِ وَمِلْءُ الْفَمِ اَنْ يَّكُوْنَ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ اِلَّا بِتَكَلُّفٍ لِاَنَّهُ يَخْرُجُ ظَاهِرًا فَاعْتُبِرَ خَارِجًا وَقَالَ زُفَرُ (رح) قَلِيْلُ الْقَيْئِ وَكَثِيْرُهُ سَوَاءٌ وَكَذَا لَايُشْتَرَطُ السَّيْلَانُ اِعْتِبَارًا بِالْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ وَلِاِطْلَاقِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْقَلْسُ حَدَثٌ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ فِى الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوْءٌ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ سَائِلًا وَقَوْلُ عَلِيٍّ (رض) حِيْنَ عَدَّ الْاَحْدَاثَ جُمْلَةً اَوْ دَسْعَةً تَمْلَأُ الْفَمَ وَاِذَا تَعَارَضَتِ الْاَخْبَارُ يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ (رح) عَلَى الْقَلِيْلِ وَمَا رَوَاهُ زُفَرُ (رح) عَلَى الْكَثِيْرِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْلَكَيْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ وَلَوْ قَاءَ مُتَفَرِّقًا بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَ يَمْلَأُ الْفَمَ فَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) يُعْتَبَرُ اِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) يُعْتَبَرُ اِتِّحَادُ السَّبَبِ وَهُوَ الْغِثْيَانُ ثُمَّ مَا لَايَكُوْنُ حَدَثًا لَايَكُوْنُ نَجِسًا يُرْوٰى ذٰلِكَ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ وَهُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ حُكْمًا حَيْثُ لَمْ يَنْتَقِضْ بِهِ الطَّهَارَةُ وَهٰذَا

اِذَا قَاءَ مِرَّةً اَوْ طَعَامًا اَوْ مَاءً فَاِنْ قَاءَ بَلْغَمًا فَغَيْرُ نَاقِضٍ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَمُحَمَّدٍ (رح) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) نَاقِضٌ اِذَا قَاءَ مِلْءَ الْفَمِ وَالْخِلَافُ فِى الْمُرْتَقِىْ مِنَ الْجَوْفِ اَمَّا النَّازِلُ مِنَ الرَّأْسِ فَغَيْرُ نَاقِضٍ بِالْاِتِّفَاقِ لِاَنَّ الرَّأْسَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ النَّجَاسَةِ لِاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) اَنَّهُ نَجِسٌ بِالْمُجَاوَرَةِ وَلَهُمَا اَنَّهُ لَزِجٌ لَا تَتَخَلَّلُهُ النَّجَاسَةُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ قَلِيْلٌ وَالْقَلِيْلُ فِى الْقَيْئِ غَيْرُ نَاقِضٍ ـ

অনুবাদ ঃ পক্ষান্তরে পেশাব-পায়খানার পথ দু'টি ব্যতিক্রম। (অর্থাৎ সেখানে নাজাসাত দেখা গেলে অজু ভঙ্গ হয়েছে বলে ধরা হবে।) কেননা তা নাজাসাতের প্রকৃত স্থান নয়। সুতরাং সেখানে নাজাসাতের প্রকাশ থেকেই তার "স্থানচ্যুতি" ও নির্গত হওয়া প্রমাণিত হবে। মুখ ভরা বমির অর্থ হলো, অনায়াসে যা আটকানো সম্ভব নয়। কেননা দৃশ্যত তা নির্গত হতে বাধ্য। সুতরাং নির্গত হয়েছে বলেই গণ্য হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, অল্প ও বিস্তর বমি সমপর্যায়ের তদ্রূপ, রক্তের ক্ষেত্রেও তিনি প্রবাহিত হওয়ার শর্ত আরোপ করেন না, পেশাব-পায়খানার স্বাভাবিক নির্গত হওয়ার স্থানের উপর কিয়াস করে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বমি অজু ভঙ্গের কারণ বাণী হচ্ছে শর্তমুক্ত। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস প্রবাহিত না হলে এক দু' ফোঁটা রক্ত বের হলে অজু আবশ্যক নয়। (কুতনী) এবং হযরত আলী (রা.) অজু ভঙ্গের সবক'টি কারণ গণনা প্রসঙ্গে বলেছেন কিংবা মুখ ভরা বমি। এখানে যখন হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী তখন সমন্বয়ের জন্য ইমাম শাফি'ঈ (র.) বর্ণিত হাদীসকে অল্প বমির উপর এবং ইমাম যুফার (র.) বর্ণিত হাদীসকে বেশি বমির উপর ধরা হবে। পক্ষান্তরে পেশাব পায়খানার রাস্তা এবং অন্যান্য স্থান থেকে নাজাসাত নির্গত হওয়ার পার্থক্য ইতঃপূর্বে আমরা বলে এসেছি। কেউ যদি বিভিন্ন দফায় এত পরিমাণ বমি করে যে,

একত্র করা হলে তা মুখ ভর্তি পরিমাণ হবে, তখন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে স্থানের অভিন্নতা বিবেচ্য হবে। (অর্থাৎ একই কারণে বা বিভিন্ন কারণে একই মজলিসে যত দফাই বমি হোক সেগুলোর সম্মিলিত পরিমাণ বিবেচনা করা হবে।) আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে বমনোদ্রেককারী হেতু অর্থাৎ উদ্গারের অভিন্নতা বিবেচ্য। (অর্থাৎ একই মজলিসে বা বিভিন্ন মজলিসে একই কারণে যত দফাই বমি হোক সেগুলোর সম্মিলিত পরিমাণ বিবেচনা করা হবে।) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে নির্গত পদার্থ অজু ভঙ্গের কারণ নয়, তা নাপাকও নয় এবং এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। যেহেতু এর দ্বারা তাহারাত ভঙ্গ হয় না, তাই শরিয়তের বিধানে তা নাপাক নয় বলে প্রমাণিত। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যখন পিত্ত বা খাদ্যদ্রব্য বা সাধারণ পানি বমন হয়। আর শ্লেষ্মা বমন হলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা কোনো অবস্থায়ই অজু ভঙ্গকারী নয়। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এটিও মুখ ভর্তি হলে অজু ভঙ্গের কারণ হবে। এ মতপার্থক্য হচ্ছে উদর থেকে উঠে আসা শ্লেষ্মার ব্যাপারে। মাথা থেকে নেমে আসা শ্লেষ্মার ক্ষেত্রে কিন্তু সর্বসম্মত মতেই তা অজু ভঙ্গের কারণ নয়। কেননা মাথা নাজাসাতের স্থান নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর যুক্তি হলো, (উদরস্থ) শ্লেষ্মা নাজাসাতের সাথে স্পর্শ হেতু নাজাসাত রূপে গণ্য। আর অন্য দুই ইমামের যুক্তি হলো, এই শ্লেষ্মা যেহেতু পিচ্ছিল, কাজেই তাতে নাজাসাত প্রবেশ করে না। যা এর সাথে লেগে থাকে তা অতি অল্প। আর বমির ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ অজু ভঙ্গকারী নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَوْ قَاءَ مُتَفَرِّقًا الخ যদি কোনো অজুকারী ব্যক্তি কয়েকবার বমি করে এবং প্রত্যেকবার ভরা মুখ হতে কম বমি করে। এমতাবস্থায় একত্র করার পর যদি মুখ ভর্তি পরিমাণ হয় তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে মজলিস এক হওয়া জরুরি। সুতরাং যদি একই মজলিসে বারবার বমি করে চাই সবব এক হোক বা ভিন্ন হোক। সববগুলো একত্র করা হবে। যদি মুখ ভরা পরিমাণ হয় তবে অজু ভেঙ্গে যাবে। (অন্যথায় অজু ভঙ্গ হবেনা।)

যেমন ঃ একই মজলিসে একটি আয়াতে সিজ্‌দাকে বারবার তিলাওয়াত করলেও একই সিজদা ওয়াজিব হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সবব এক হতে হবে। আর বমির সবব হলো উদ্বেগ। সুতরাং যদি একই কারণে কয়েকবার বমি হয়, চাই আর মজলিস এক হোক বা বিভিন্ন হোক সবগুলো একত্র করা হবে। যদি ভরা মুখ পরিমাণ হয় তবে অজু ভেঙ্গে যাবে। দলিল হলো, হুকুম সবব অনুযায়ী হয়, এজন্য সবব এক হওয়ার কারণে হুকুমও এক হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে একটি কায়দা বর্ণনা করেছেন। কায়দাটি হলো, যে সকল বস্তু নাকিযে অজু নয় সেগুলো নাপাকও নয়। সুতরাং কম বমি আর অ-প্রবাহিত রক্ত নাজিস নয়; তাই অজু ভঙ্গকারীও নয়। এটাই বিশুদ্ধ মত। শরিয়তের দৃষ্টিতে এগুলো নাজিস নয়। কেননা এগুলো দ্বারা অজু ভঙ্গ হয় না।

গ্রন্থকার وهو الاصح বলে ইমাম মুহাম্মদ-এর মত থেকে ইহতিরায করতেছেন। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.) কম বমি ও অ-প্রবাহিত রক্তকে নাজিস বলেন।

وَهٰذَا إِذَا قَاءَ مِرَّةً أَوْ طَعَامًا الخ : গ্রন্থকার উপরোক্ত ইবারতে এ কথা বলতে চান যে, মুখ ভর্তি বমির কারণে অজু তখন ভেঙ্গে যাবে যখন পিত্ত বমি বা খাদ্যদ্রব্য বা সাধারণ পানি বমন হয়। তবে যদি সে খালিস শ্লেষ্মা বমি করে যাতে খাদ্যদ্রব্য জাতীয় বস্তুর কোনো মিশ্রণ আছে তবে এর দু' সূরত রয়েছে। হয়তো শ্লেষ্মা মাথা থেকে নেমে আসবে, না হয় উদর থেকে উঠে আসবে। প্রথম সুরত সর্বসম্মতিক্রমে অজু ভঙ্গকারী নয়। কেননা মাথা নাজাসাতের স্থান নয়। আর দ্বিতীয় সুরত তরফাইনের মতে অজু ভঙ্গকারী নয়। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে অজু ভঙ্গকারী। শর্ত হলো মুখ ভর্তি হওয়া। তাঁর দলিল হচ্ছে, শ্লেষ্মা যদিও সত্তাগতভাবে নাপাক নয় তবে উদরের নাজাসাতের সাথে মিশ্রণের কারণে নাপাক হয়ে গেছে। এবং এমন স্থান পর্যন্ত বেরিয়ে আসছে যা গোসলের মধ্যে পাক করার হুকুম রয়েছে। অর্থাৎ গোসলের মধ্যে কুলি করা ফরজ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে خروج نجاست পাওয়া গেছে তাই অজু ভেঙ্গে যাবে। যেমন খাদ্যদ্রব্য বা পিত্ত বমি হলে অজু ভেঙ্গে যায়। তরফাইনের (র.) দলিল হলো, শ্লেষ্মা যেহেতু পিচ্ছিল কাজেই তাতে নাজাসাত প্রবেশ করতে পারে না। আর যে নাজাসাত তার সাথে মিশ্রিত হয় তা-ও একেবারেই কম। আর বমির ক্ষেত্রে স্বল্প পরিমাণ দ্বারা অজু ভঙ্গ হয় না। তাই বমিও অজু ভঙ্গকারী নয়।

وَلَوْ قَاءَ دَمًا وَهُوَ عَلَقٌ يُعْتَبَرُ فِيْهِ مِلْءُ الْفَمِ لِاَنَّهُ سَوْدَاءُ مُحْتَرِقَةٌ وَاِنْ كَانَ مَائِعًا فَكَذٰلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) اِعْتِبَارًا بِسَائِرِ اَنْوَاعِهٖ وَعِنْدَهُمَا اِنْ سَالَ بِقُوَّةِ نَفْسِهٖ يَنْقُضُ الْوُضُوْءُ وَاِنْ كَانَ قَلِيْلًا لِاَنَّ الْمِعْدَةَ لَيْسَتْ بِمَحَلِّ الدَّمِ فَيَكُوْنُ مِنْ قُرْحَةٍ فِى الْجَوْفِ وَلَوْنَزَلَ مِنَ الرَّأْسِ اِلٰى مَالَانَ مِنَ الْاَنْفِ نَقَضَ الْوُضُوْءُ بِالْاِتِّفَاقِ لِوُصُوْلِهٖ اِلٰى مَوْضَعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيْرِ فَيَتَحَقَّقُ الْخُرُوْجُ ـ

অনুবাদ ঃ আর যদি কেউ রক্ত বমি করে এবং তা জমাট হয়, তবে এতে মুখভর্তি হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। কেননা মূলত তা পিত্ত নিঃসৃত গাঢ় কাল পদার্থ। আর যদি তরল হয় তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, অন্যান্য প্রকার বমির মতো এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ মুখ ভর্তি হওয়া বিবেচ্য। অন্য দুই ইমামের মতে যদি স্বতঃস্ফূর্ত বেগে প্রবাহিত হয় তাহলে অল্প হলেও অজু ভেঙ্গে যাবে। কেননা পাকস্থলী রক্তের স্থান নয়। সুতরাং তা উদরস্থ কোনো ক্ষত থেকে নির্গত হয়েছে বলে গণ্য হবে। (আর রক্ত) মাথার ভিতর থেকে গড়িয়ে নাকের নরম অংশ পর্যন্ত উপনীত হলে সর্বসম্মত মতে অজু ভেঙ্গে যাবে। কেননা তা তাহারাতের হুকুম ভুক্ত অংশে চলে এসেছে। সুতরাং নির্গত হওয়া متحقق হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কেউ রক্ত বমি করে, তবে ঐ রক্ত দু'ধরনের হতে পারে। হয়তো জমাট হবে, না হয় প্রবাহিত হবে। কেননা তা মূলত পিত্ত নিঃসৃত গাঢ় কাল পদার্থ যা পাকস্থলী থেকে বের হয়। আর যে জিনিস পাকস্থলী থেকে বের হয় তা অজু ভঙ্গকারী হয়ে থাকে। তবে শর্ত হলো মুখ ভর্তি হওয়া। আর যদি প্রবাহিত হয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এখানেও মুখ ভর্তি পরিমাণ রক্ত হলে অজু ভঙ্গকারী হবে নতুবা নয়। দলিল হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.) রক্তের বমিকে অন্যান্য বমির উপর কিয়াস করেন। অন্যান্য বমি পাঁচ প্রকার– এক. খাদ্যদ্রব্যের বমি, দুই. পানি বমি, তিন. পিত্ত বমি, চার. তিক্ত বমি, পাঁচ. কাল গাঢ় বমি। যেমনিভাবে এগুলোর মধ্যে মুখ ভর্তি পরিমাণ হওয়া শর্ত এমনিভাবে রক্ত বমির মধ্যেও মুখ ভর্তি পরিমাণ হওয়া শর্ত।

শায়খাইন (র.) বলেন, যদি রক্ত স্বতঃস্ফূর্ত বেগে প্রবাহিত হয় তবে অল্প হলেও অজু ভেঙ্গে যাবে। কেননা পাকস্থলী রক্তের স্থান নয় সুতরাং তা উদরের কোনো ক্ষতস্থান থেকে বের হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর যে রক্ত ক্ষতস্থান থেকে বের হয় তা অজু ভঙ্গের কারণ হওয়ার জন্য প্রবাহিত হওয়া শর্ত। এমনিভাবে এখানেও প্রবাহিত হওয়া শর্ত যদিও তা মুখ ভরে না হয়। যদি রক্ত মাথা থেকে বের হয় আর প্রবাহিত হয়ে নাকের নরম অংশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে অজু ভেঙ্গে যাবে। দলিল হলো, এ রক্ত এমন স্থান পর্যন্ত পৌঁছেছে যাকে পাক করার বিধান রয়েছে। সুতরাং তা প্রবাহিত হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

وَالنَّوْمُ مُضْطَجِعًا اَوْمُتَّكِئًا اَوْمُسْتَنِدًا اِلٰى شَئٍ لَوْ اُزِيلَ لَسَقَطَ لِاَنَّ الْاِضْطِجَاعَ سَبَبٌ لِاِسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ فَلَا يَعْرٰى عَنْ خُرُوْجِ شَئٍ عَادَةً وَالثَّابِتُ عَادَةً كَالْمُتَيَقَّنِ بِهٖ وَالْاِتِّكَاءُ يُزِيْلُ مُسْكَةَ الْيَقْظَةِ لِزَوَالِ الْمَقْعَدِ عَنِ الْاَرْضِ وَ يَبْلُغُ الْاِسْتِرْخَاءُ فِى النَّوْمِ غَايَتَهٗ بِهٰذَا النَّوْعِ مِنَ الْاِسْتِنَادِ غَيْرَ اَنَّ السَّنَدَ يَمْنَعُهٗ مِنَ السُّقُوْطِ بِخِلَافِ حَالَةِ الْقِيَامِ وَالْقُعُوْدِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فِى الصَّلٰوةِ وَغَيْرِهَا هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّ بَعْضَ الْاِسْتِمْسَاكِ بَاقٍ اِذْ لَوْ زَالَ لَسَقَطَ فَلَمْ يَتِمَّ الْاِسْتِرْخَاءُ وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا وُضُوْءَ عَلٰى مَنْ نَامَ قَائِمًا اَوْ قَاعِدًا اَوْ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا اِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَاِنَّهٗ اِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهٗ ـ وَالْغَلَبَةُ عَلَى الْعَقْلِ بِالْاِغْمَاءِ وَالْجُنُوْنِ لِاَنَّهٗ فَوْقَ النَّوْمِ مُضْطَجِعًا فِى الْاِسْتِرْخَاءِ وَ الْاِغْمَاءُ حَدَثٌ فِى الْاَحْوَالِ كُلِّهَا وَهُوَ الْقِيَاسُ فِى النَّوْمِ اِلَّا اَنَّا عَرَفْنَاهُ بِالْاَثَرِ وَالْاِغْمَاءُ فَوْقَهٗ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ ঃ (৪) ঘুমানো– কাত হয়ে কিংবা হেলান দিয়ে কিংবা এমন কিছুতে ঠেস দিয়ে যে, তা সরিয়ে দিলে সে পড়ে যাবে। কেননা পার্শ্ব শয়ন শরীরের গ্রন্থিগুলোর শিথিলতার কারণ। ফলে এ অবস্থা স্বভাবতই কিছু (বায়ু) বের হওয়া থেকে মুক্ত নয়। আর স্বভাবত যা বিদ্যমান তা ইয়াকিনী বিষয় বলে গণ্য। আর হেলান অবস্থায় ঘুম আসলে ভূমির সাথে নিতম্বের সংলগ্নতা না থাকার কারণে জাগ্রতাবস্থার নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। আর কিছুতে উক্ত প্রকার ঠেস দিয়ে ঘুমালে অঙ্গ শৈথিল্য চরমে পৌছে যায়। তবে ঠেকনাটি তাকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখে। পক্ষান্তরে (নামাজে বা নামাজের বাইরে) দাঁড়ানো, বসা, রুকু ও সিজদা অবস্থার ঘুম তেমন নয়। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা আংশিক নিয়ন্ত্রণ তখনো বহাল থাকে, তা না হলে সে তো পড়েই যেতো। সুতরাং এ অবস্থায় পুরোপুরি অঙ্গ শিথিল হয় না। এ বিষয়ে মূল ভিত্তি হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী ঃ দাঁড়িয়ে, বসে, রুকুতে বা সিজদায় যে ঘুমায়, তার উপর অজু জরুরি নয়। অজু জরুরি হলো তার উপর যে, পার্শ্বে ভর দিয়ে ঘুমায়, কেননা পার্শ্বের উপর ভর দিয়ে ঘুমালে তার গ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়ে। (৫) এমন সংজ্ঞাহীনতা, যাতে বোধ শক্তি লোপ পায়। (৬) এবং জুনূনী (অপ্রকৃতিস্থতা) কেননা, এগুলো অঙ্গ শৈথিল্যের ক্ষেত্রে পার্শ্ব শয়নের চেয়েও বেশি ক্রিয়াশীল। সংজ্ঞাহীনতা সর্বাবস্থায় অজু ভঙ্গের কারণ। ঘুমের ক্ষেত্রেও কিয়াসের দাবি এটাই। কিন্তু ঘুমের ক্ষেত্রে উক্ত পার্থক্য আমরা হাদীস থেকে পেয়েছি। সংজ্ঞাহীনতাকে আবার নিদ্রার উপর কিয়াস করার সুযোগ নেই। কেননা তা নিদ্রার চেয়ে বেশি প্রবল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অজু ভঙ্গের এটাও কারণ যে, অজুকারী ব্যক্তি কাত হয়ে কিংবা হেলান দিয়ে কিংবা এমন কিছুতে ঠেস দিয়ে ঘুমানো যে, তা সরিয়ে নিলে সে পড়ে যায়। শরহে নিকায়ার গ্রন্থকার লিখেন, যদি কাত হয়ে কিংবা এক নিতম্বের উপর ঠেস দিয়ে ঘুমায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি এমন কিছুতে হেলান দিয়ে ঘুমায় যে, তা সরিয়ে নিলে সে পড়ে যায় তবে এর দু'টো সুরত রয়েছে। যদি নিতম্ব ভূমি হতে আলাদা হয়ে যায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে অজু ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ভূমি হতে আলাদা না হয় তবে ইমাম তাহাবী ও ইমাম কুদূরী (র.) লিখেছেন যে, অজু ভেঙ্গে যাবে। কেননা এতে তার গ্রন্থিগুলো শিথিল হয়ে পড়ে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা ভূমির উপর নিতম্ব লেগে থাকা বায়ু নির্গত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

কাত হয়ে ঘুমানোর দ্বারা অজু ভেঙ্গে যাওয়ার দলিল হলো, কাত হয়ে শোয়া গ্রন্থি ঢিলা হওয়ার কারণ। সুতরাং কাত হয়ে শোয়ার দ্বারা সাধারণত কোনো না কোনো জিনিস বের হয়েই থাকে। আর কায়দা আছে যে, যে জিনিস স্বভাবতঃ সাবিত তা ইয়াকীন ইয়াকীনী বিষয় বলে গণ্য হয়ে থাকে। বুঝা গেল কাত হয়ে শোয়ার দ্বারা বায়ু ইত্যাদি বের হয়েছে। আর বায়ু বের হওয়ার দ্বারা নিশ্চিতভাবে অজু ভেঙ্গে যায়। এজন্য এর দ্বারাও অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। উক্ত দলিল দ্বারা বুঝা গেল শুধুমাত্র ঘুম হাদাস নয়। কারো কারো মতে ঘুমও হাদাস। আর হেলান দিয়ে ঘুমানো এমন যা জাগ্রত অবস্থার নিয়ন্ত্রণকে দূরীভূত করে দেয়। কেননা এ অবস্থায় নিতম্ব ভূমি থেকে আলাদা হয়ে যায়। সুতরাং শোয়া অবস্থায় অঙ্গের নিয়ন্ত্রণ তো অবশ্যই দূর হয়ে যাবে।

কোনো কিছুতে ঠেস দিয়ে ঘুমালে অঙ্গের শৈথিল্য চরমে পৌঁছে যায়। শুধু এতটুকু যে, ঠেকনাটি তাকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখে। সুতরাং অজু ভঙ্গের ভিত্তি হলো অঙ্গ শৈথিল্য হওয়া যা এখানে বিদ্যমান। তাই এ সুরতেও অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ নামাজে বা নামাজের বাইরে দাঁড়ানো, বসা, রুকু ও সিজদা অবস্থায় ঘুমায় তবে অজু ভঙ্গ হবে না। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। দলিল এই যে, এ সকল অবস্থায় কিছু না কিছু নিয়ন্ত্রণ বহাল থাকে। তা-না হলে তো লোকটি পড়েই যেতো। সুতরাং পুরোপরি অঙ্গ শিথিল না হওয়ায় তার অজু ভঙ্গ হবে না। এ বিষয়ে মূল ভিত্তি হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণি– তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে, বসে, রুকুতে বা সিজদা অবস্থায় ঘুমায় তার উপর অজু ওয়াজিব নয়। অজু ওয়াজিব হলো ঐ ব্যক্তির উপর, যে পার্শ্বে ভর দিয়ে ঘুমায়। কেননা পার্শ্বের উপর ভর দিয়ে ঘুমালে তাঁর গ্রন্থিগুলো শিথিল হয়ে যায়। আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এভাবে বর্ণিত আছে যে,

إِنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ نِمْتَ فَقَالَ إِنَّ الْوُضُوْءَ لَايَجِبُ إِلَّا عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ إِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ ـ

তিনি [হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)] রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সিজদা অবস্থায় ঘুমাতে দেখলেন। এমনকি তাঁর নাকের শব্দ আসতে লাগল। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, অজু ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব যে কাত হয়ে ঘুমায়। কেননা কোনো ব্যক্তি যখন কাত হয়ে ঘুমায় তখন তার গ্রন্থিগুলো শিথিল হয়ে যায়।

وَالْغَلَبَةُ عَلَى الْعَقْلِ الخ ঃ সংজ্ঞাহীনতা এক ধরনের রোগ বিশেষ, যা বোধ শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। এর দ্বারা মুরাদ হলো জ্ঞান লোপ পাওয়া, সবব যাই হোকনা কেন। আর জুনূন এমন ব্যাধি যা আকল বুদ্ধিকে নিস্তেজ ও নিঃশেষ করে দেয়। আম্বিয়ায়ে কেরামের ক্ষেত্রে اغماء-এর ব্যবহার জায়েজ; কিন্তু جنون-এর ব্যবহার জায়েজ নয়। মোটকথা, اغماء ও جنون অজু ভঙ্গকারী। দলিল হলো, এ গুলোর দ্বারা অঙ্গ শৈথিল্য হওয়া পার্শ্ব শয়নের চেয়েও বেশি ক্রিয়াশীল। اغماء সর্বাবস্থায় অজু ভঙ্গকারী। ঘুমের ক্ষেত্রেও কিয়াসের দাবি এটাই ছিল। তবে ঘুমের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হওয়া পার্থক্য আমরা হাদীস থেকে পেয়েছি, তাই কিয়াসকে বর্জন করেছি। সংজ্ঞাহীনতাকে (اغماء) আবার ঘুমের উপর কিয়াসও করা যাবে না, কেননা তা ঘুমের চেয়ে বেশি প্রবল। তাই এগুলো দ্বারা অবশ্যই অজু ভেঙ্গে যাবে।

وَالْقَهْقَهَةُ فِىْ صَلٰوةٍ ذَاتِ رُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ وَالْقِيَاسُ اَنَّهَا لَا تَنْقُضُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىْ (رحـ) لِاَنَّهٗ لَيْسَ بِخَارِجٍ نَجِسٍ وَلِهٰذَا لَمْ يَكُنْ حَدَثًا فِىْ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَخَارِجِ الصَّلٰوةِ وَلَنَا قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلَا مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ قَهْقَهَةً فَلْيُعِدِ الْوُضُوْءَ وَالصَّلٰوةَ جَمِيْعًا وَبِمِثْلِهٖ يُتْرَكُ الْقِيَاسُ وَالْاَثَرُ وَرَدَ فِىْ صَلٰوةٍ مُطْلَقَةٍ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهَا وَالْقَهْقَهَةُ مَا يَكُوْنُ مَسْمُوْعًا لَهٗ وَلِجِيْرَانِهٖ وَالضِّحْكُ مَا يَكُوْنُ مَسْمُوْعًا لَهٗ دُوْنَ جِيْرَانِهٖ وَهُوَ عَلٰى مَا قِيْلَ يُفْسِدُ الصَّلٰوةَ دُوْنَ الْوُضُوْءِ ـ

অনুবাদ : (৭) রুকু সিজদা বিশিষ্ট নামাজে অট্টহাসি। অবশ্য কিয়াস ও যুক্তির দাবি হলো অজু ভঙ্গ না হওয়া। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতও তাই। কেননা এটি নাজাসাত নির্গত কারী কোনো বিষয় নয়। এ কারণে সালাতুল জানাযায়, তিলাওয়াতে সিজদায় এবং নামাজের বাইরে তা অজু ভঙ্গের কারণ নয়। আমাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– শুনো, তোমাদের কেউ অট্টহাসি হাসলে অজু ও নামাজ উভয়ই পুনরায় আদায় করবে। –(দারু কুতনী) বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের (মাশহুর হাদীস) দ্বারা কিয়াস পরিহার করা হয়ে থাকে। তবে হাদীসটি যেহেতু صلوة مطلقة সম্পর্কিত, সেহেতু এর হুকুম তাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। قهقهة বা অট্টহাসি হলো যা নিজে এবং পার্শ্ববর্তী লোক শুনতে পায়। আর ضحك হলো ঐ হাসি হলো যা নিজে শুনতে পায়, কিন্তু অন্যরা তা শুনতে পায় না। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, ضحك দ্বারা অজু নষ্ট হয় না, কিন্তু নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قهقهة হলো এমন হাসি যা নিজে এবং পার্শ্ববর্তী মানুষ উভয়ে শুনতে পায়। দাঁত বের হোক বা না হোক। ضحك হলো যা নিজে শুনে তবে অন্যরা শুনতে পায় না। تبسم হলো এমন হাসি যা কেউ শুনতে পায় না। تبسم দ্বারা নামাজ অজু কিছুই বাতিল হয় না। ضحك দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায় তবে অজু ভাঙ্গে না। আর আকিল বালিগের অট্টহাসির (قهقهة) হুকুম হলো, যদি তা রুকু ও সিজদা বিশিষ্ট নামাজে হয় অথবা রুকু বা সিজদা বিশিষ্ট নামাজ যা ইশারা করে আদায় করছে তাতে পাওয়া যায় তবে এর দ্বারা নামাজ অজু উভয়টিই বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে কাহ্কাহা অজু ভঙ্গকারী নয়। কিয়াসের চাহিদাও তাই। তাঁদের দলিল এই যে, কাহ্কাহা দ্বারা নাজাসাত নির্গত হয় না। অথচ নাজাসাত নির্গত হওয়াই অজু ভঙ্গকারী। তাই তো কাহ্কাহা নামাজে জানাযায়, সিজদায়ে তিলাওয়াত এবং নামাজের বাইরে অজু ভঙ্গকারী নয়।

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার নামাজ পড়াচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় এক বেদুঈন সাহাবী যার দৃষ্টিশক্তি কম ছিল এসে হঠাৎ করে পড়ে যান। সাহাবায়ে কেরাম নামাজে থাকা অবস্থায় হাসতে লাগলেন। নামাজান্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, শুনো তোমাদের মধ্যে যারা নামাজে অট্টহাসি দিয়েছ, তারা নামাজ ও অজু উভয়টি দোহ্রাবে। এটা হাদীসে মাশহুর। আর হাদীসে মাশহুর দ্বারা কিয়াস পরিহার করা হয়ে থাকে। তবে যেহেতু হাদীসটি সালাতে কামিলা তথা রকু সিজদা বিশিষ্ট নামাজ সম্পর্কিত, তাই তার হুকুম এতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এর থেকে অতিক্রম করে নামাজে জানাযা, সিজদায়ে তিলাওয়াত এবং নামাজের বাইরে অজু ভঙ্গকারী হবে না। কেননা খেলাফে কিয়াস হুকুম তার মাওরাদ থেকে অতিক্রম করে না।

وَالدَّابَّةُ تَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ نَاقِضَةٌ فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ أَوْ سَقَطَ اللَّحْمُ مِنْهُ لَا يَنْقُضُ وَالْمُرَادُ بِالدَّابَّةِ الدُّوْدَةُ وَهٰذَا لِأَنَّ النَّجَسَ مَا عَلَيْهَا وَ ذٰلِكَ قَلِيْلٌ وَهُوَ حَدَثٌ فِي السَّبِيْلَيْنِ دُوْنَ غَيْرِهِمَا فَأَشْبَهَ الْجُشَاءَ وَالْفُسَاءَ بِخِلَافِ الرِّيْحِ الْخَارِجَةِ مِنَ الْقُبُلِ وَالذَّكَرِ لِأَنَّهَا لَاتَنْبَعِثُ عَنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ حَتّٰى لَوْكَانَتِ الْمَرْأَةُ مُفْضَاةً يُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوْءُ لِاِحْتِمَالِ خُرُوْجِهَا مِنَ الدُّبُرِ ـ

অনুবাদ ঃ (৮) পিছনের রাস্তা দিয়ে কোনো কীট বের হলে তা অজু ভঙ্গকারী হবে। তবে ক্ষতস্থান থেকে কীট বের হলে বা গোশত খণ্ড খসে পড়লে অজু ভঙ্গ হবে না। মূল পাঠে "দাব্বা" দ্বারা উদ্দেশ্য "কীট"। কেননা (মূলত কীট নাজাসাত নয় বরং) তার দেহে লেগে থাকা পদার্থ হলো নাজিস বা নাপাক এবং তা অতি অল্প। আর অল্প নাজাসাত পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত হওয়া অজু ভঙ্গের কারণ। কিন্তু অন্য স্থান থেকে অল্প বের হওয়া অজু ভঙ্গের কারণ নয়। তাই (অন্যস্থান থেকে অল্প বের হওয়া) ঢেকুরের সঙ্গে তুলনীয় এবং (পেশাব পায়খানার রাস্তা থেকে অল্প বের হওয়া) নিঃশব্দ বাতকর্মের সাথে তুলনীয়। (অর্থাৎ মৃদু বাত কর্মে নির্গত নাজাসাত অতি অল্প হলেও পায়খানার রাস্তায় বলে তা অজু ভঙ্গকারী হয়। সুতরাং পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত কীটও অজু ভঙ্গকারী হবে। পক্ষান্তরে ঢেকুরের সাথে নির্গত অতি অল্প নাজাসাত অজু ভঙ্গকারী নয়। সুতরাং পায়খানার রাস্তা ছাড়া অন্য কোনো স্থান থেকে নির্গত কীট অজু ভঙ্গকারী হবে না।) পক্ষান্তরে নারী অথবা পুরুষের পেশাবের রাস্তা দিয়ে নির্গত বায়ু অজু ভঙ্গকারী নয়। কেননা তা নাজাসাতের স্থান থেকে সৃষ্ট নয়। তবে উভয় পথ সংযুক্ত এমন কোনো নারীর বায়ু নির্গত হলে তার জন্য অজু করে নেওয়া মোস্তাহাব। কেননা সেটা পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে কীট পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হয় এর দ্বারা অজু ভেঙ্গে যায়। যেমন বাতকর্ম এবং কংকর বের হওয়ার দ্বারা অজু ভেঙ্গে যায়। যদি কীট পিছনের রাস্তা ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষত স্থান থেকে বের হয় অথবা ক্ষতের থেকে গোশত খণ্ড খসে পড়ে তবে তা অজু ভঙ্গকারী নয়।

মূল মতনে "দাব্বা" দ্বারা কীট উদ্দেশ্য। উপরোক্ত দু' সুরতের মধ্যে পার্থক্য হলো, মূলত কীট নাজাসাত নয়; বরং তার দেহে লেগে থাকা পদার্থ হলো নাপাক। আর তা অতি অল্প, অল্প নাজাসাত পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হলে অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু অন্য স্থান থেকে বের হলে অজু ভঙ্গকারী নয়। তাই আমরা বলেছি ,কীট পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হলে অজু ভঙ্গকারী আর অন্য কোনো স্থান বা ক্ষত থেকে বের হলে অজু ভঙ্গকারী নয়। সুতরাং ঢেকুরের অনুরূপ। আর পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে অল্প বের হওয়া নিঃশব্দ বাত কর্মের অনুরূপ। অর্থাৎ ঢেকুর অন্য রাস্তা দিয়ে হওয়ায় অজু ভঙ্গকারী নয়। আর নিঃশব্দ বাতকর্ম পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হওয়ায় অজু ভঙ্গকারী। পক্ষান্তরে নারী বা পুরুষের পেশাবের রাস্তা দিয়ে যে বায়ু বের হয় তা অজু ভঙ্গকারী নয়। কেননা তা নাজাসাতের স্থান থেকে সৃষ্ট নয়। তবে এখানে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ কে অজু ভঙ্গকারী বলেছেন। এ হিসাবে তো বাতকর্ম, বা বাতকর্ম নয়। এ জাতীয় কোনো কিছু পুরুষ বা মহিলার লজ্জাস্থান দিয়ে বের হলে অজু ভঙ্গকারী হবে না কেন? এর জবাব হচ্ছে, সকল মুজ্তাহিদ একমত যে, উপরোক্ত হাদীসের মধ্যে كُلُّ مَايَخْرُجُ দ্বারা كُلُّ نَجِسٍ يَخْرُجُ উদ্দেশ্য। সুতরাং পুরুষ বা মহিলার লজ্জাস্থান দিয়ে বের হওয়া বায়ু যেহেতু নাজিস নয় তাই তা অজু ভঙ্গকারীও নয়।

যদি কোনো মহিলার উভয়পথ সংযুক্ত হয় এবং তার সামনের রাস্তা দিয়ে বায়ু বের হয় তবে অজু করে নেওয়া মোস্তাহাব। কেননা তা পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তার অজু করা ওয়াজিব নয়। কেননা সম্ভাবনাময় বিধানের দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না।

فَإِنْ قُشِرَتْ نَفْطَةٌ فَسَالَ مِنْهَا مَاءٌ أَوْ صَدِيدٌ أَوْ غَيْرُهُ إِنْ سَالَ عَنْ رَأْسِ الْجُرْحِ نَقَضَ وَإِنْ لَمْ يَسِلْ لَا يَنْقُضُ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) يَنْقُضُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَا يَنْقُضُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ وَهٰذِهِ الْجُمْلَةُ نَجِسَةٌ لِأَنَّ الدَّمَ يَنْضَجُ فَيَصِيْرُ قَيْحًا ثُمَّ يَزْدَادُ نَضْجًا فَيَصِيْرُ صَدِيْدًا ثُمَّ يَصِيْرُ مَاءً هٰذَا إِذَا قَشَرَهَا فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ وَأَمَّا إِذَا عَصَرَهَا فَخَرَجَ بِعَصْرِهِ فَلَا يَنْقُضُ لِأَنَّهُ مُخْرَجٌ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ـ

অনুবাদ ঃ কোনো ফোঁড়া-ফোস্কার চামড়া তুলে ফেলার কারণে তা থেকে পানি পুঁজ ইত্যাদি গড়িয়ে যদি ক্ষতস্থানের মুখ অতিক্রম করে তাহলে অজু ভঙ্গ হবে। আর যদি অতিক্রম না করে তবে অজু ভঙ্গ হবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে উভয় অবস্থায় অজু ভঙ্গ হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে উভয় অবস্থাতেই অজু ভঙ্গ হবে না। মূলত এটা পেশাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়া ভিন্ন পথে নাজাসাত নির্গত হওয়ার মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত। এই সমস্ত পানি-পুঁজ ইত্যাদি অবশ্যই নাজিস। কেননা এ গুলো মূলত রক্ত যা পর্যায়ক্রমে পক্ক হয়ে নির্গত ক্লেদ এবং আরো বেশি পক্ক হওয়ার পর পুঁজ এবং এরপর তরল হয়ে পানি হয়ে যায়। আর এই পার্থক্য তখনই হবে যখন আবরণ ত্বক সরিয়ে ফেলার কারণে তা আপনা-আপনি বের হয়। পক্ষান্তরে চিপ দেওয়ার কারণে বের হলে অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা (হাদীসে الخارج বা নির্গত শব্দ রয়েছে, অথচ) এটা خارج বা নির্গত নয়, বরং مخرج বা নিঃসারিত হয়েছে। (বিশুদ্ধ মত হলো, নিঃসারিত হলেও তা অজু ভঙ্গের কারণ হবে। কেননা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস এই দলিল চতুষ্টয় প্রমাণ করে যে, নির্গত পদার্থের নাপাকিত্বই হলো অজু ভঙ্গের কারণ, আর এই নাপাকিত্বের গুণ নিঃসারিত পদার্থেও বিদ্যমান।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি ফোঁড়ার চামড়া তুলে ফেলা হয় তারপর পানি পুঁজ বা অন্য কোনো কিছু বের হয়। এর দু'টো সুরত রয়েছে। এক, ক্ষতস্থান হতে গড়িয়ে পড়েছে অথবা পড়েনি। যদি বের হওয়ার সাথে সাথে গড়িয়েও পড়ে তবে অজু ভঙ্গকারী। আর গড়িয়ে না পড়লে অজু ভঙ্গকারী নয়। এই মাযহাব ইমাম যুফার (র.) ব্যতীত ফুকাহায়ে আহনাফ সকলের। ইমাম যুফার (র.) বলেন, উভয় অবস্থায় অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে, তা গড়িয়ে পড়ুক বা না পড়ুক। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, উভয় অবস্থায় অজু ভঙ্গ হবে না। মূলত এই মাসআলা خَارِجٌ مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ-এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ ইমাম যুফার (র.)-এর মতে خَارِجٌ مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ মুত্লাকান অজু ভঙ্গকারী। প্রবাহিত হোক বা না হোক। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে অজু ভঙ্গকারী নয়। আমাদের মতে প্রবাহিত হলে অজু ভঙ্গকারী আর না হলে অজু ভঙ্গকারী নয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ সমস্ত ক্ষতের পানি, পুঁজ ইত্যাদি নাজিস। কেননা রক্ত পক্ক হয়ে ক্লেদ হয়ে যায়। অতঃপর আরো পক্ক হয়ে পুঁজ হয়ে যায়। এরপর তরল হয়ে পানি হয়ে যায়। আর এ সব হলো নাপাক। নাপাক তখনই অজুভঙ্গকারী হবে যখন প্রবাহমান হয়। এজন্য উপরোক্ত সব সুরতও অজু ভঙ্গকারী হবে। উল্লেখ্য যে, অজু ভঙ্গের হুকুম তখন দেওয়া হবে যখন আবরণ ত্বক সরিয়ে ফেলা হয় আর তা আপনা আপনি বের হয়। পক্ষান্তরে চিপ দেওয়ার কারণে বের হলে অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা এটা خارج নয় বরং مخرج যা নিঃসারিত করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

فَصْلٌ فِى الْغُسْلِ : وَفَرْضُ الْغُسْلِ الْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَغَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ وَعِنْدَ الشَّافِعِىْ (رحـ) هُمَا سُنَّتَانِ فِيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ اَىْ مِنَ السُّنَّةِ وَ ذَكَرَ مِنْهَا الْمَضْمَضَةَ وَالْاِسْتِنْشَاقَ وَلِهٰذَا كَانَ سُنَّتَيْنِ فِى الْوُضُوْءِ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا اَمَرَ بِالْاِطِّهَارِ وَهُوَ تَطْهِيْرُ جَمِيْعِ الْبَدَنِ اِلَّا اَنَّ مَا تَعَذَّرَ اِيْصَالُ الْمَاءِ اِلَيْهِ خَارِجٌ بِخِلَافِ الْوُضُوْءِ لِاَنَّ الْوَاجِبَ فِيْهِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَالْمُوَاجَهَةُ فِيْهِمَا مُنْعَدِمَةٌ وَالْمُرَادُ بِمَا رُوِىَ حَالَةُ الْحَدَثِ بِدَلِيْلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّهُمَا فَرْضَانِ فِى الْجَنَابَةِ سُنَّتَانِ فِى الْوُضُوْءِ ـ

অনুবাদ ঃ অনুচ্ছেদ ; গোসল ঃ গোসলের ফরজ হলো কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া এবং সমস্ত শরীর ধোয়া। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে গোসলের মধ্যে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দশটি বিষয় ফিত্‌রাত অর্থাৎ সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে তিনি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই অজুতে এ দু'টিকে সুন্নত বলে গণ্য করা হয়। আমাদের দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী যদি তোমরা জুনুবী হও তাহলে পূর্ণরূপে তাহারাত হাসিল কর। এখানে পূর্ণরূপে তাহারাত হাসিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার মর্ম হলো সমস্ত শরীর পবিত্র করা। তবে যেখানে পানি পৌঁছানো দুষ্কর, সেগুলো (ধোয়ার আওতা থেকে) বহির্ভূত। আর অজুর অবস্থা ভিন্ন। কেননা অজুর মধ্যে (وجه) চেহারা ধোয়া ওয়াজিব। আর আভিধানিক অর্থে وجه দ্বারা এতটুকু অংশ বুঝায় যা মুখোমুখিতে প্রকাশ পায়। আর মুখ ও নাকের অভ্যন্তরের মধ্যে মুখোমুখির অবস্থা অনুপস্থিত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির উদ্দেশ্য হচ্ছে অজু ভঙ্গের অবস্থা। এর দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী–কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া উভয়টি জানাবাতের গোসলে ফরজ এবং অজুতে সুন্নত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার অজুর আহকাম বর্ণনার পর গোসলের আহকাম বর্ণনা শুরু করেছেন। কারণ, এক. গোসলের তুলনায় অজুর আহকাম বেশি। দুই. অজুর মহল হলো جزء بدن আর গোসলের মহল হলো كل البدن কায়দা আছে جزء - كل -এর পূর্বে আসে। তিন. এর দ্বারা আল্লাহর কালামের অনুসরণ উদ্দেশ্য। কেননা সেখানেও আগে অজুর আহকাম পরে গোসলের আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। উপরোক্ত কারণগুলোকে সামনে রেখে অজুর আহকাম গোসলের আহাকামের পূর্বে আলোচিত হয়েছে। غسل - غين -এর উপর পেশ, অর্থ اغتسال অর্থাৎ সমস্ত শরীর ধোয়া। ফুকাহায়ে আহনাফের মতে গোসলের তিনটি ফরজ– কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া এবং সমস্ত শরীর ধোয়া। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া অজুর ন্যায় গোসলের মধ্যেও সুন্নত। তাঁদের প্রথম নকলী দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ দশটি বিষয়কে সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। এর মধ্যে পাঁচটির সম্পর্ক মাথার সাথে যেমন– সিথি কাটা, মিসওয়াক করা, কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া, গোঁফ কাটা। আর পাঁচটির সম্পর্ক শরীরের সাথে যেমন ঃ খত্‌না করা, নাভীর নিচের পশম কাটা, বগলের নিচের চুল উঠানো, নখ কাটা এবং পানি দ্বারা ইস্‌তিনজা করা। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নত।

দ্বিতীয় আকলী দলিল ঃ তারা গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়াকে অজুতে কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ এগুলো অজুর ন্যায় গোসলেও সুন্নত।

আমাদের দলিল ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী– "তোমরা যদি জুনুবী হও তবে পূর্ণরূপে তাহারাত হাসিল কর। এখানে পূর্ণরূপে তাহারাত হাসিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার অর্থ হলো সমস্ত শরীর পবিত্র করা। তবে যেখানে পানি পৌঁছানো অসম্ভব যেমন চোখের ভিতরের অংশে, তা ধোয়ার আওতার বহির্ভূত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে অজুর হুকুম ভিন্ন। কেননা অজুর মধ্যে চেহারা ধোয়া ওয়াজিব। যেমন আল্লাহর বাণী– فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ তোমরা চেহারা ধোও। আর আভিধানিক অর্থেও চেহারা দ্বারা এতটুকু অংশ বুঝায় যা মুখোমুখিতে প্রকাশ পায়। আর মুখ ও নাকের আভ্যন্তরীণ অংশে মুখোমুখির অবস্থা অনুপস্থিত। তাই গোসলকে অজুর উপর কিয়াস করা ঠিক হবে না। এতে তাদের আকলী দলিলের জবাব হয়ে গেল। আর তাদের বর্ণিত হাদীসের জবাব হলো, উক্ত হাদীসটি অজুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া জানাবাতের গোসলে ফরজ আর অজুতে সুন্নত।

وَسُنَّتُهُ أَنْ يَبْدَأَ الْمُغْتَسِلُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ وَفَرْجَهُ وَيُزِيلُ النَّجَاسَةَ إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ إِلاَّ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ ثَلٰثًا ثُمَّ يَتَنَحّٰى عَنْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ هٰكَذَا حَكَتْ مَيْمُوْنَةُ (رض) اِغْتِسَالَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّمَا يُؤَخِّرُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ لِاَنَّهُمَا فِيْ مُسْتَنْقَعِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فَلَايُفِيْدُ الْغَسْلُ حَتّٰى لَوْ كَانَ عَلٰى لَوْحٍ لَايُؤَخِّرُ وَاِنَّمَا يَبْدَأُ بِاِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيْقَةِ كَيْلَا تَزْدَادَ بِاِصَابَةِ الْمَاءِ ـ

অনুবাদ ঃ গোসলের সুন্নত ঃ গোসলকারী প্রথমে দু' হাত এবং লজ্জাস্থান ধুইবে। আর শরীরে নাজাসাত লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করবে, অতঃপর নামাজের অনুরূপ অজু করবে, তবে পদদ্বয় ধুইবে না। এরপর মাথায় ও সারা শরীরে তিন বার পানি প্রবাহিত করবে। এরপর গোসলের স্থান থেকে সরে গিয়ে দু'পা ধুয়ে নেবে। হযরত মায়মূনা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোসলের অনুরূপ বিবরণই দিয়েছেন। পা ধোয়া সর্বশেষে করার কারণ এই যে, পা দু'টো ব্যবহৃত পানি জমা থাকার জায়গায় থাকে। তাই আগে ধোয়াতে কোনো লাভ নেই। এমনকি তক্তার উপরে (বা উঁচুস্থানে) দাঁড়িয়ে গোসল করলে তখন পা ধোয়া বিলম্বিত করবে না। প্রথমে হাকীকী নাজাসাত (নাপাক পদার্থ) দূর করে নেওয়ার কারণ হলো, পানি লেগে তা যেন আরো ছড়িয়ে না পড়ে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গোসলের সুন্নত তরীকা হলো, প্রথমে উভয় হাত কব্জিসহ ধুইবে। কেননা এগুলো হলো পাক করার মাধ্যম। স্বীয় লজ্জাস্থান ধুইবে। কেননা এটি নাজাসাতের স্থান, তারপর তাই এর মধ্যে নাজাসাত লেগে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। শরীরে নাজাসাতে হাকীকী লেগে থাকলে ধুইবে। যাতে তার উপর পানি ঢেলে দিলে অন্যত্র নাজাসাত ছড়িয়ে না পড়ে। অতঃপর নামাজের অজুর ন্যায় অজু করবে। তবে পা ধুইবে না। তারপর তিনবার মাথায় পানি ঢালবে এবং তিনবার সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিবে। শামসুল আয়িম্মা হুলওয়ানী (র.) বলেন, প্রথমে ডান কাঁধের উপর পানি ঢেলে দিবে। তারপর বাম কাঁধের উপর তিনবার তারপর সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢেলে দিবে। কেউ কেউ বলেন, ডান কাঁধ থেকে আরম্ভ করে তারপর মাথার উপর তারপর বাম কাঁধের উপর পানি ঢালবে। আবার কেউ কেউ বলেন, মাথা থেকে আরম্ভ করবে। কুদূরীর ইবারত দ্বারা এটাই বুঝা যায়। অতঃপর ঐ স্থান হতে সরে গিয়ে উভয় পা ধুইবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, হযরত মায়মূনা (রা.) রাসূলুল্লাহর ﷺ গোসলের এরূপ বর্ণনাই দিয়েছেন।

ফাতহুল কাদীরের গ্রন্থকার শায়খ ইবনুল হুমাম (র.) পূর্ণ হাদীস নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন–

رَوَى الْجَمَاعَةُ عَنْهَا قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا ثُمَّ اَفْرَغَ بِيَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيْرَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلٰثًا ثُمَّ اَفْرَغَ عَلٰى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحّٰى عَنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ـ

এক দল লোক হযরত মায়মূনা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মায়মূনা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি পানি উভয় হাতের উপর ঢেলে দু'বার বা তিনবার হাতগুলো ধুইলেন অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢাললেন এবং নিজের লজ্জাস্থান ধুইলেন। তারপর মাটিতে হাত ঘসলেন। তারপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, চেহারা ধুইলেন, উভয় হাত ধুইলেন। তারপর তিনবার মাথা ধুইলেন। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢাললেন, তারপর ঐ স্থান থেকে সরে গিয়ে উভয় পা ধুইলেন।

হিদায়া গ্রন্থাকার বলেন, সবশেষে পা ধোয়ার কারণ হলো, পা দু'টো যেহেতু ব্যবহৃত পানি জমা থাকার জায়গায় থাকে তাই আগে ধোয়াতে কোনো লাভ নেই। তবে কেউ যদি কোনো উঁচু জায়গায় যেমন তক্তা বা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে গোসল করে তবে বিলম্বে পা ধোয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ اَنْ تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا فِى الْغُسْلِ اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ اُصُوْلَ الشَّعْرِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا يَكْفِيْكِ اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ اُصُوْلَ شَعْرِكِ وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَلُّ ذَوَائِبِهَا هُوَ الصَّحِيْحُ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْحَرَجِ بِخِلَافِ اللِّحْيَةِ لِاَنَّهٗ لَا حَرَجَ فِىْ اِيْصَالِ الْمَاءِ اِلٰى اَثْنَائِهَا ـ قَالَ وَالْمَعَانِى الْمُوْجِبَةُ لِلْغُسْلِ اِنْزَالُ الْمَنِىِّ عَلٰى وَجْهِ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ حَالَةَ النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رح) خُرُوْجُ الْمَنِىِّ كَيْفَ مَاكَانَ يُوْجِبُ الْغُسْلَ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ اَىِ الْغُسْلُ مِنَ الْمَنِىِّ وَلَنَا اَنَّ الْاَمْرَ بِالتَّطْهِيْرِ يَتَنَاوَلُ الْجُنُبَ وَ الْجَنَابَةُ فِى اللُّغَةِ خُرُوْجُ الْمَنِىِّ عَلٰى وَجْهِ الشَّهْوَةِ يُقَالُ اَجْنَبَ الرَّجُلُ اِذَا قَضٰى شَهْوَتَهٗ مِنَ الْمَرْاَةِ وَالْحَدِيْثُ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْخُرُوْجِ عَنْ شَهْوَةٍ ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَ مُحَمَّدٍ اِنْفِصَالُهٗ عَنْ مَكَانِهٖ عَلٰى وَجْهِ الشَّهْوَةِ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) ظُهُوْرُهٗ اَيْضًا اِعْتِبَارًا لِلْخُرُوْجِ بِالْمُزَايَلَةِ اِذَا الْغُسْلُ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا وَلَهُمَا اَنَّهٗ مَتٰى وَجَبَ مِنْ وَجْهٍ فَالْاِحْتِيَاطُ فِى الْاِيْجَابِ ـــ

অনুবাদ ঃ স্ত্রী লোকের জন্য গোসলের সময় বেণী খুলে নেওয়া জরুরি নয়, যদি চুলের গোড়ায় পানি পৌছে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে সালামা (রা.)-কে বলেছেন, চুলের গোড়ায় পানি পৌছলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। বেণি বাঁধা চুল ভিজানো ও স্ত্রী লোকের জন্য জরুরি নয়, এটি-ই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা তা কষ্টসাধ্য কাজ। দাড়ির ব্যাপারটি অবশ্য ভিন্ন। কেননা দাড়ির ভিতরে পানি পৌছানো কষ্টদায়াক নয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ হলো ঃ (১) জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় নারী বা পুরুষের সবেগে ও কামোদ্দীপনার সাথে বীর্যস্খলন। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে, বীর্যস্খলন যেভাবেই হোক তাতে গোসল ওয়াজিব হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পানির কারণে পানি আবশ্যক, অর্থাৎ বীর্যস্খলনের কারণে গোসল আবশ্যক। আমাদের দলিল হলো, পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ জুনুবীর সাথে সম্পর্কিত। جنابة শব্দের আভিধানিক অর্থ কমোদ্দীপনার সাথে বীর্যস্খলন। (উদাহরণত) লোকটি জুনুবী হয়েছে তখনই বলা হয়, যখন লোকটি স্ত্রীর সাথে কাম ইচ্ছা চরিতার্থ করে। উক্ত হাদীস সকাম বীর্যস্খলনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মূল স্থান থেকে বীর্যের স্খলনকালে কামোত্তেজনা থাকাই যথেষ্ট।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বীর্যের প্রকাশ বা নির্গমন কামোত্তেজনাসহ হওয়া শর্ত। তিনি নির্গমন অবস্থাকে মূল স্থান থেকে স্খলন অবস্থার উপর কিয়াস করেন। কেননা গোসলের সম্পর্ক উভয়ের সাথে। উক্ত দুই ইমামের যুক্তি হলো, যখন গোসল ওয়াজিব হওয়ার এক কারণ বিদ্যমান তখন সর্তকতার চাহিদা হলো গোসল ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা, যদি গোসলের সময় স্ত্রী লোকের চুলের গোড়ায় পানি পৌছে যায় তবে তার বেণি খোলা ওয়াজিব নয়। দলিল হলো হযরত উম্মে সালামা (রা.) এর হাদীস– قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ امْرَأَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِىْ اَفَاَنْقُضُهٗ فِىْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِىَ عَلٰى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ — (فَتْحُ الْقَدِيْرِ)

উম্মে সালামা (রা.) বলেন ঃ আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আমার মাথার চুলগুলো খুব শক্ত করে বেঁধে রাখি। জানাবাতের গোসলের সময় আমার কি তা খুলতে হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, না তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি মাথার উপর তিনকোষ পানি ঢেলে দিবে। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিবে। এতেই তুমি পাক হয়ে যাবে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, চুল ভিজানো জরুরি নয়, যদি গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, বেণি বাঁধা চুল ভিজানোও মহিলার জন্য জরুরি নয়, এটাই হলো বিশুদ্ধ মত। কেননা বেণি ভিজানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পক্ষান্তরে দাড়ির ব্যাপারটি এর থেকে ভিন্ন। কেননা দাড়ির ভিতরে পানি পৌঁছানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। তাই দাড়ির ভিতর পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। এমনিভাবে মহিলাদের চুল খোলা থাকলেও তার মধ্যে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। কেননা এতে কষ্টের কোনো কিছু নেই।

قَالَ وَالْمَعَانِيْ الخ ঃ গ্রন্থকার উপরোক্ত ইবারতে মধ্যে গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ বর্ণনা করা শুরু করেছেন। প্রথম কারণ হলো, সবেগ ও সকামে বীর্যস্খলিত হওয়া। বীর্যস্খলন পুরুষের হোক বা মহিলার হোক। ঘুমে হোক বা জাগ্রত অবস্থায় হোক, সর্বাবস্থায়ই গোসল ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মালিক (র.) বলেন, বীর্যস্খলিত হলে গোসল ওয়াজিব হবে। চাই বীর্য সবেগে বা নিঃবেগে বের হোক। সুতরাং যদি কোনো ভারী জিনিস উঠানোর দ্বারা বীর্য বের হয়ে যায় বা উপর থেকে নিচে অবতরণের সময় বীর্য বের হয়ে যায় তবে এ অবস্থায় আমাদের মতে গোসল ওয়াজিব হবে না। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে গোসল ওয়াজিব হবে। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ অর্থাৎ বীর্য দ্বারা গোসল ওয়াজিব। উক্ত হাদীস শাহ্ওয়াত (সবেগ)-এর কয়েদ থেকে مطلق সুতরাং اَلْمُطْلَقُ يَجْرِيْ عَلٰى اِطْلَاقِهٖ-এর কানুন অনুযায়ী হাদীসটি مطلق-ই থাকবে। আমাদের দলিল ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا যদি তোমরা জুনুবী হও তবে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে। উক্ত আয়াতে পবিত্রতা অর্জনের হুকুমের সাথে জুনুবীও শামিল। جَنَابَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ সকাম অবস্থায় বীর্য বের হওয়া। সুতরাং কোনো ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে কাম-ইচ্ছা পূর্ণ করলে আরবীগণ বলেন اَجْنَبَ الرَّجُلُ। বুঝা গেল যে, সবেগে ও সকর্মে বীর্য বের হলে গোসল ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পেশ করা হাদীসের জবাব হলো, উক্ত হাদীস সকাম বীর্যস্খলনের অর্থেই ব্যবহৃত হবে। কেননা হাদীসটি তার শব্দের দিক থেকে ব্যাপক। তাইতো এই হাদীসে পেশাব, মযী, ওদী, সকাম ও বে-কাম বীর্যস্খলন সবগুলো শামিল। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, এ হাদীস দ্বারা সবগুলো মুরাদ নয়। সুতরাং যেহেতু সকাম বীর্য বের হলে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়, তাই এ হাদীসকে সকাম বীর্য বের হওয়ার অর্থেই গণ্য করতে হবে। আমাদের মাযহাবের সমর্থনে হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত বীর্যের ব্যাখ্যা সম্বলিত বক্তব্যও রয়েছে।

তিনি বলেন– اَلْمَنِيُّ بِاَنَّهٗ اَبْيَضُ ثَخِيْنٌ يَنْكَسِرُ مِنْهُ الذَّكَرُ বীর্য হলো সাদা গাঢ় পদার্থ বিশেষ, যার দ্বারা পুরুষাঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যায়। আর একথা সর্বাবিধিত যে, পুরুষাঙ্গ তখনই নিস্তেজ হয়ে পড়ে যখন সবেগে বীর্য বের হয়ে আসে। বুঝা গেল যে, সবেগ ছাড়া যা বের হয় তা বীর্য নয়। এর দ্বারা গোসল ওয়াজিব হবে না। হানাফী আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো বীর্য যখন তার স্থান থেকে পৃথক হয় তখন কামোত্তেজনার সাথে বের হওয়া। তবে লজ্জাস্থান থেকে বের হওয়ার সময় কামোত্তেজনা থাকা শর্ত কি-না এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মূল স্থান থেকে বের হওয়ার সময় কামোত্তেজনা থাকাই যথেষ্ট। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বীর্য প্রকাশের সময় কামোত্তেজনাসহ বের হওয়া শর্ত। তাঁর দলিল হলো, কিয়াস। অর্থাৎ তিনি বের হওয়ার অবস্থাকে মূল স্থান থেকে পৃথক হওয়ার অবস্থার উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ যেমনিভাবে মূল স্থান থেকে বীর্য পৃথক হওয়ার সময় কামোত্তেজনা জরুরি এমনিভাবে বীর্য বের হওয়ার সময়ও কামোত্তেজনা জরুরি। কেননা উভয়ের সাথেই গোসলের সম্পর্ক রয়েছে।

তরফাইনের দলিল হলো, বীর্য পৃথক হওয়ার সময় যেহেতু কামোত্তেজনা পাওয়া গেছে সেহেতু তার দাবি হলো গোসল ওয়াজিব হওয়া। আর বের হওয়ার সময় যেহেতু কামোত্তেজনা ছিল না তাই এর দাবি হলো গোসল ওয়াজিব না হওয়া। এখন এ সুরতে যেহেতু গোসল ওয়াজিব হওয়া না হওয়ার উভয়টিরই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাই আমরা সর্তকতাকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছি গোসল ওয়াজিব হবে।

উল্লেখ্য যে, উভয় মাযহাবের ফল হলো, কেউ যদি স্খলিত বীর্য কোনো উপায়ে রোধ করে রাখে এবং উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পর তা বেরিয়ে আসে তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না। আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে গোসল ওয়াজিব হবে।

وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ اِنْزَالٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَغَابَتِ الْحَشْفَةُ وَجَبَ الْغُسْلُ اَنْزَلَ اَوْ لَمْ يُنْزِلْ وَلِاَنَّهُ سَبَبٌ لِلْاِنْزَالِ وَ نَفْسُهُ يَتَغَيَّبُ عَنْ بَصَرِهِ وَقَدْ يَخْفٰى عَلَيْهِ لِقِلَّتِهِ فَيُقَامُ مَقَامَهُ وَكَذَا الْاِيْلَاجُ فِى الدُّبُرِ لِكَمَالِ السَّبَبِيَّةِ يَجِبُ عَلَى الْمَفْعُوْلِ بِهِ اِحْتِيَاطًا بِخِلَافِ الْبَهِيْمَةِ وَمَا دُوْنَ الْفَرْجِ لِاَنَّ السَّبَبِيَّةَ نَاقِصَةٌ وَالْحَيْضُ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ بِالتَّشْدِيْدِ وَكَذَا النِّفَاسُ بِالْاِجْمَاعِ وَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَعَرَفَةَ وَالْاِحْرَامِ صَاحِبُ الْكِتَابِ نَصَّ عَلَى السُّنِّيَّةِ وَقِيْلَ هٰذِهِ الْاَرْبَعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ وَسَمّٰى مُحَمَّدٌ (رح) اَلْغُسْلَ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ حَسَنًا فِى الْاَصْلِ وَقَالَ مَالِكٌ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ اَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ اَفْضَلُ وَبِهٰذَا يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ عَلَى النَّسْخِ ثُمَّ هٰذَا الْغُسْلُ لِلصَّلٰوةِ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) وَهُوَ الصَّحِيْحُ لِزِيَادَةِ فَضِيْلَتِهَا عَلَى الْوَقْتِ وَاخْتِصَاصِ الطَّهَارَةِ بِهَا وَ فِيْهِ خِلَافُ الْحَسَنِ وَالْعِيْدَانِ بِمَنْزِلَةِ الْجُمُعَةِ لِاَنَّ فِيْهِمَا الْاِجْتِمَاعُ فَيُسْتَحَبُّ الْاِغْتِسَالُ دَفْعًا لِلتَّأَذِّىْ بِالرَّائِحَةِ وَاَمَّا فِىْ عَرَفَةَ وَالْاِحْرَامِ فَسَنُبَيِّنُهُ فِى الْمَنَاسِكِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

অনুবাদ ঃ (২) বীর্যস্খলন ব্যতিরেকে দুই যৌনাঙ্গের মিলন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উভয় খতনা স্থান যখন মিলিত হয় এবং পুরুষাঙ্গের মাথা অদৃশ্য হয়ে যায় তখন গোসল ওয়াজিব হয়। বীর্য বের হোক বা না হোক। আর এজন্য যে, দুই অঙ্গের মিলন হলো বীর্য বের হওয়ার কারণ। আর পুরুষাঙ্গ রয়েছে তার দৃষ্টির আগোচরে। পরিমাণ অল্প হলে স্খলন তার অজ্ঞাতও থাকতে পারে। কাজেই কারণকে স্খলনের স্থলবর্তী ধরে নেওয়া হয়েছে। গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করানোর এই একই হুকুম। কেননা স্খলনের কারণ এখানেও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। আর যার সাথে এ কাজ করা হয়, সতর্কতা স্বরূপ তার উপরও গোসল ওয়াজিব। পশু সংগম ও যৌনাঙ্গ ছাড়া মৈথুন এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে স্খলনের কারণ দুর্বল। (৩) ঋতুস্রাব (এর সমাপ্তি)। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন حتى يطهرن (ط-এর উপর تشديد-এর কিরাআত অনুযায়ী) যতক্ষণ না তারা উত্তমরূপ পবিত্রতা অর্জন করবে। (৪) অদ্রূপ সর্বসম্মত মতে নিফাসও। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসল সুন্নত করেছেন, জুমা, দু' ঈদ, আরাফায় অবস্থান ও ইহরামের জন্য। মূল গ্রন্থকার ইমাম কুদূরী (র.) স্পষ্ট সুন্নত বলেছেন। কারো কারো মতে এই চার সময়ের গোসল মোস্তাহাব। মূল (মাবসূত) গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) জুমার গোসলকে উত্তম বলেছেন। আর ইমাম মালিক (র.) বলেছেন, ওয়াজিব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমায় যে শরিক হয়, সে যেন গোসল করে নেয়।-(ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমার দিন যে অজু করে, তা তার জন্য যথেষ্ট ও ভাল। আর যে গোসল করে তা উত্তম।– (আবূ দাউদ, তিরমিযী) (সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে) ইমাম মালিক (র.) বর্ণিত হাদীসের নির্দেশকে মুস্তাহাব অর্থে ধরে নেওয়া হবে। কিংবা রহিত বলে গণ্য করা হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এই গোসল হলো সালাতুল জুমার জন্য এবং এটিই বিশুদ্ধ মত। কেননা সময়ের তুলনায় তার ফজিলত অধিক। তাছাড়া নামাজের সাথেই তাহারাতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এ বিষয়ে ইমাম হাসান (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। দু' ঈদও জুমু'আর মতোই। কেননা উভয় ঈদেই বড় সমাবেশ হয়। সুতরাং দুর্গন্ধজনিত কষ্ট দূর করার জন্য তাতে গোসল মোস্তাহাব। আরাফা ও ইহরামের গোসল সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ হজের বিষয় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ختان মহিলা-পুরষের খত্না করার স্থান। সে কালের আরবদের অভ্যাস ছিল পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরকেও খত্না করানো হতো। ইবনুল হুমাম (র.) লিখেন পুরুষের খত্না করা সুন্নত, আর মহিলাদের জন্য ভালো। কেননা খত্নাকৃত মহিলার সাথে সহবাসে অধিক তৃপ্তি পাওয়া যায়। পুরুষ খত্না না করলে তাকে জোর করা হবে। তবে খাত্না দ্বারা মরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে জোর জবরদস্তি করা হবে না। মহিলা খত্না না করলে তাকে জোর করা হবে না।

মাসআলা ঃ যদি উভয় খত্না স্থান মিলে যায় আর পুরুষাঙ্গ মহিলার গুপ্তাংশে অদৃশ্য হয়ে যায় তবে উভয়ের উপর গোসল করা ওয়াজিব, বীর্য বের হোক বা না হোক। দলিল হলো– রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَغَابَتِ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ। অর্থাৎ উভয় খতনার স্থান যখন মিলিত হয় এবং পুরুষাঙ্গের মাথা মহিলার যৌনাঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন গোসল ওয়াজিব হয়, বীর্যস্খলন ঘটুক বা না ঘটুক।

দ্বিতীয় দলিল হলো, যে জিনিসের উপর হুকুম দেওয়া হয় তা যদি خفى হয় আর তার কোনো سبب জাহির হয়, তখন এই امر خفى ঐ سبب ظاهر -এর স্থলাভিষিক্ত হয়।

আর হুকুম ঐ سبب-এর উপর জারি হয়। সুতরাং اِلْتِقَاءُ خَتَانَيْنِ বীর্য বের হওয়ার سبب। আর বীর্য যার দ্বারা গোসলের হুকুম দেওয়া হবে তা হলো অদৃশ্য। আবার কখনো বীর্যস্খলন কম হওয়ার কারণে অজ্ঞাতও থেকে যায় যে বীর্য স্খলন হলো কি হলো না। এ জন্য التقاء-কে انزال। তথা বীর্য স্খলনের এর স্থলে ধরা হয়েছে। আর গোসলের হুকুম التقاء -এর উপর দেওয়া হয়েছে। বীর্যস্খলনের উপর নয়।

যদি পুরুষাঙ্গ গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করানো হয় তারও একই হুকুম হবে। অর্থাৎ গোসল ওয়াজিব হবে। কেননা বীর্য বের হওয়ার কারণ এখানেও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এমনকি কোনো কোনো ফাসিক লোক গুহ্যদ্বারে কামভাবে চরিতার্থ করাকে প্রাধান্য দেয় সামনের রাস্তার তুলনায়। তাই তো কোনো কোনো ফকীহ বলেন, দাড়িহীন বালকের محاذات দ্বারা এমনিভাবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যায় যেমনিভাবে মহিলাদের محاذات দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যার সাথে এ কাজ করা হয়, সতর্কতা স্বরূপ তার উপরও গোসল ওয়াজিব। কেননা হতে পারে সেও তৃপ্তি অনুভব করেছে। আর বীর্যও বের হয়েছে অথবা সে তৃপ্তি অনুভব করেনি এবং তার বীর্যও বের হয়নি কিন্তু পবিত্রতায় যেহেতু সতর্কতা অবলম্বন করা হয় তাই তার উপরও গোসল ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে পশুসঙ্গম ও যৌনাঙ্গ ছাড়া হস্তমৈথুন একটি ভিন্ন বিষয়। তাই এখানে বীর্যস্খলন ব্যতীত গোসল ওয়াজিব হবে না। কেননা এখানে বীর্যস্খলনের কারণ একেবারেই দুর্বল। কেননা কোনো ভাল প্রকৃতির লোক এ ধরনের কাজ সমর্থন করতে পারে না।

গোসল ওয়াজিব হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া। দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী– حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ অর্থাৎ ঋতুবতীর নিকট যেয়ো না যতক্ষণ না তারা উত্তমরূপে পাক হয়। আর এ উত্তমরূপে পাক তখনই হবে যখন ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গোসল করে নেয়। তবে এখানে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, يطهرن-এর তাশদীদ ছাড়াও কিরাআতে

মুতাওয়াতিরাহ রয়েছে। তখনতো আয়াতটি উপরোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হবে না। এর জবাব হলো, দু' কিরাআত দু' আয়াতের স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে বলে গণ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) উভয় কিরাআতের উপর আমল করেন। আর তা এভাবে যে, দশদিন পূর্ণ হবার পর যদি ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় তবে স্বামীর জন্য তার গোসল ছাড়াই সহবাস করা জায়েজ। এ সুরতে তাশ্দীদ বিহীন আয়াতটি দলিল হবে। কেননা মহিলাটি রক্ত বন্ধ হওয়ার পরই পাক হয়ে গিয়েছে। আর যদি দশদিনের কমে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে সহবাস করার জন্য তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে। এ সুরতে তাশ্দীদযুক্ত আয়াতটি দলিল হবে। একই হুকুম নিফাসের ক্ষেত্রেও অর্থাৎ সর্বসম্মত মতে নিফাসও গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ।

وَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : উপরোক্ত ইবারতে সুন্নত গোসলের আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) চার অবস্থায় গোসল মাসনূন হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এক. জুমা, দুই. দু' ঈদ, তিন. আবাফা এবং চার. ইহ্রামের জন্য। কেউ কেউ বলেছেন, এই সময়ের গোসল মোস্তাহাব। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত নামক গ্রন্থে জুমার গোসলকে উত্তম বলেছেন। ইমাম মালিক (র.) ওয়াজিব বলেছেন ইমাম মালিক (র.)-এর প্রথম দলিল– مَنْ اَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

দ্বিতীয় দলিল : আবূ সাঈদ খুদরী (র.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ জুমার দিন প্রত্যেক বালিগ-এর উপর গোসল করা ওয়াজিব। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন অজু করে তা তার জন্য যথেষ্ট ও ভাল। আর যে ব্যক্তি গোসল করে তা তাব জন্য উত্তম। এ হাদীস দ্বারা সুন্নত তো সাবিত হয় না; বরং মোস্তাহাব সাবিত হয়। হাদীসে অজু এবং এ হাদীস বিরোধ হয়ে যাওয়ায় উভয় হাদীসের সমাধান দিতে হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মালিক (র.) কর্তৃক বর্ণিত

প্রথম হাদীস : مَنْ اَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ-কে মোস্তাহাব অর্থে ধরে নেওয়া হবে। যাতে উভয় হাদীসের সমাধান হয়ে যায়। বিরোধ না থাকে। ইমাম মালিক (র.)-এর বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীস : যা আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ এখানে واجب অর্থ متاكدلازم দ্বারা জুমার দিন গোসল করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা বুঝা যায়, ওয়াজিব নয়।

দ্বিতীয় জবাব : হাদীসে উজুবকে রহিত বলে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক যুগে জুমু'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব ছিল। পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে যায়। নসখ হওয়ার দলিল হযরত ইক্রিমা (রা.)-এর হাদীস যা ইমাম আবূ দাউদ (র.) তাঁর কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন।

হাদীসটি হলো এই যে–

اِنَّ اُنَاسًا مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوْا فَقَالُوْا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا؟ فَقَالَ لَا وَلٰكِنَّهُ طُهُوْرٌ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَاُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ الْغُسْلُ كَانَ النَّاسُ مَجْهُوْدِيْنَ يَلْبَسُوْنَ الصُّوْفَ وَيَعْمَلُوْنَ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ اِنَّمَا هُوَ عَرِيْشٌ . فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ وَعَرِقَ النَّاسُ فِىْ ذٰلِكَ الصُّوْفِ حَتّٰى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ حَتّٰى اٰذٰى بَعْضُهُمْ بَعْضًا . فَلَمَّا وَجَدَ ﷺ تِلْكَ الرِّيَاحَ . قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِذَا كَانَ هٰذَا الْيَوْمَ فَاغْتَسِلُوْا وَيَمَسُّ اَحَدُكُمْ مِثْلَ مَا يَجِدُهُ مِنْ دُهْنِهِ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللّٰهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوْا غَيْرَ الصُّوْفِ وَكُفُوْا الْعَمَلَ وَ وُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ وَ ذَهَبَ بَعْضُ الَّذِىْ كَانَ يُؤْذِىْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ .

হযরত ইক্রিমা (রা.) বলেন, ইরাকের কিছু লোক বলল, হে ইবনে আব্বাস! আপনি কি জুমার দিন গোসলকে ওয়াজিব মনে করেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, না, তবে যে ব্যক্তি গোসল করবে তা তার জন্য উত্তম। আর কেউ যদি গোসল না করে, তবে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব নয়। গোসলের সূচনা কিভাবে হলো তা আমি আপনাদেরকে সবিস্তার বলছি। ঘটনা ছিল হলো, (তৎকালীন যুগের) লোকেরা খুব মেহনত করতো, পশমি কাপড় পরিধান করতো, তাদের মসজিদের

ছাদ ঝুপড়ির মতো একেবারেই নিচু ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন গরমের দিনে তাশরীফ আনলেন। লোকেরা পশমি কাপড় পরিহিত থাকায় ঘর্মাক্ত ছিল। এমনকি তাদের থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। যা অপরজনকে কষ্ট দিতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অবস্থা দেখে ঘোষণা দিলেন হে লোক সকল! এ (জুমার) দিন আসবে, তখন তোমরা গোসল করে এবং তৈল ও খুশবু ব্যবহার করবে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা মানুষের অবস্থা ভালো করে দিলেন, লোকেরা পশমি কাপড় ব্যতীত অন্যান্য কাপড় ব্যবহার করতে লাগল এবং কাম কাজ বন্ধ করে দিল। মসজিদগুলোও প্রশস্ত হয়ে গেল। এবং ঘামের কারণে তারা যে একে অপরকে কষ্ট দিত তাও দূর হয়ে গেল। (তখন গোসলের উজূবের হুকুম মানসূখ হয়ে যায়।) পুরো হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, ইসলামের প্রথম যুগে জুমার দিনের গোসল ওয়াজিব ছিল পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জুমার দিনের গোসল, জুমার দিনের কারণে সুন্নত নাকি জুমার নামাজের কারণে সুন্নত। এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) বলেন, জুমার দিনের গোসলের ফজিলত "দিন" অর্থাৎ জুমার দিনের কারণে, কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, سَيِّدُ الْاَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ জুমার দিন সকল দিনের সরদার। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, গোসলের ফজিলত জুমার নামাজের কারণে; মোল্লা আলী কারী (র.)-এর মতে এ মতই বিশুদ্ধ। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ –(বুখারী ও মুসলিম) তোমাদের মধ্যে যে জুমা পাবে সে যেন জুমার নামাজের জন্য গোসল করে। এমনিভাবে জুমার দিনের জুমার নামাজের ফজিলত রয়েছে। জুমার দিনের সরদারী জুমার নামাজের কারণেই। এছাড়া তাহারাতের সম্পর্ক নামাজের সাথে দিনের সাথে বা সময়ের সাথে নয়। এ কারণেও গোসলের ফজিলত নামাজের জন্য হওয়া চাই, জুমার দিনের জন্য নয়। হাসান ইবনে যিয়াদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মধ্যকার ইখতিলাফের ফল এভাবে প্রকাশ পাবে যে, এক ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করেছে। পরে তার অজু চলে গেছে। সে অজু করে জুমার নামাজ আদায় করেছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তার সুন্নত গোসল আদায় হয়নি। হাসান ইবনে যিয়াদের মতে আদায় হয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, দু' ঈদও জুমার মতোই। কেননা উভয় ঈদেই অনেক লোক সমাগম হয়। সুতরাং দুর্গন্ধজনিত কষ্ট দূর করার জন্য তাতেও গোসল মোস্তাহাব। দু' ঈদের নামাজের জন্য গোসল করা হাদীস দ্বারা সাবিত।

ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত যে, اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' ঈদের দিনে গোসল করতেন। আরাফা ও ইহরামের গোসল সম্পর্কে হজের অধ্যায়ে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

মোদ্দা কথা, এগার ধরনের গোসল রয়েছে, তন্মধ্যে পাঁচটি হলো ফরজ। এক. বীর্যস্খলনের কারণে, **দুই.** দুই খত্না স্থান একত্রিত হওয়ার কারণে, তিন. স্বপ্নদোষের কারণে, চার. ঋতুস্রাবের কারণে, পাঁচ. নিফাসের কারণে।

চারটি হলো সুন্নত। **এক.** জুমার দিনের গোসল, **দুই.** আরাফার দিনের গোসল, তিন. দুই ঈদের গোসল, চার. ইহ্রামের জন্য গোসল।

একটি হলো ওয়াজিব; যেমন– মাওয়্যেতকে গোসল দেওয়া। একটি হলো মোস্তাহাব; যেমন– কোনো কাফির যখন মুসলমান হয়, আর জুনুবী না হয়। তখন তার গোসল করা মোস্তাহাব।

قَالَ وَلَيْسَ فِى الْمَذِىِّ وَالْوَدِىِّ غُسْلٌ وَفِيْهِمَا الْوُضُوْءُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ فَحْلٍ يُمْذِىْ وَفِيْهِ الْوُضُوْءُ وَالْوَدِىُّ الْغَلِيْظُ مِنَ الْبَوْلِ يَتَعَقَّبُ الرَّقِيْقَ مِنْهُ خُرُوْجًا فَيَكُوْنُ مُعْتَبَرًا بِهِ وَالْمَنِىُّ خَاثِرٌ اَبْيَضُ يَنْكَسِرُ مِنْهُ الذَّكَرُ وَالْمَذِىُّ رَقِيْقٌ يَضْرِبُ اِلَى الْبَيَاضِ يَخْرُجُ عِنْدَ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ اَهْلَهُ وَالتَّفْسِيْرُ مَاثُوْرٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا .

অনুবাদ ঃ ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মযী ও ওদী বের হলে তাতে গোসল ওয়াজিব নয়, তবে অজু ওয়াজিব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সকল মানুষেরই মযী নির্গত হয়। আর তাতে অজু আবশ্যক। (আবূ দাউদ, মুসনাদে আহমদ) ودى হলো পেশাবের পর নির্গত অপেক্ষাকৃত গাঢ় তরল পদার্থ। তাই তা পেশাবের হুকুমের মধ্যেই গণ্য হবে। منى হচ্ছে, সাদা আঠাল পদার্থ, যার স্খলন পুরুষাঙ্গকে নিস্তেজ করে দেয়। مذى হলো সাদাটে তরল পদার্থ যা স্ত্রীকে আদর আহ্লাদ করার সময় নির্গত হয়। এ ব্যাখ্যা হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার বলেন, মযী, ও ওদী বের হলে গোসল ওয়াজিব হবে না, তবে অজু ওয়াজিব হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন كُلُّ فَحْلٍ يُمْذِىْ وَفِيْهِ الْوُضُوْءُ প্রত্যেক পুরুষেরই মযী বের হয় এবং তাতে অজু করা জরুরি।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, যখন মযী ও ওদী দ্বারা অজু ওয়াজিব হয়, কিন্তু গোসল ওয়াজিব হয় না তবে তো এ দু'টোকে فَصْلٌ فِى الْوُضُوْءِ -এর মধ্যে উল্লেখ করা দরকার ছিল, فَصْلٌ فِى الْغُسْلِ -এর মধ্যে নয়?

এর জবাব হচ্ছে, এ দু'টি যেহেতু منى -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তাই এগুলোকে فَصْلٌ فِى الْغُسْلِ -এর মধ্যে উল্লেখ্য করা হয়েছে। তবে উত্তম জবাব হলো এই যে, এগুলোকে এখানে উল্লেখ করার কারণ হলো ইমাম আহমদ (র.)-এর বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করা। কেননা ইমাম আহমদ (র.) এগুলের কারণে গোসলকে ওয়াজিব বলেন।

আরেকটি প্রশ্ন হলো, পূর্বে বর্ণিত হয়েছে كُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ অজু ভঙ্গকারী ودى ও مذى তো সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তবে ভিন্নভাবে এগুলোকে কেন বয়ান করা হলো? জাবাব হচ্ছে, এগুলোর ভিন্নভাবে আলোচনা করা হয়েছে ইমাম মালিক (র.) এর বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য। কেননা ইমাম মালিক (রা.) এগুলোর বের হওয়া কারণে অজু আবশ্যক বলেন না।

আরেকটি প্রশ্ন, ودى বের হওয়া দ্বারা অজু করা কিভাবে বুঝে আসবে? কেননা ودى তো পেশাবের পর বের হয়। সুতরাং অজু তো ওদীর পূর্বেই পেশাবের কারণে ওয়াজিব হয়ে গেছে, এ ক্ষেত্রে ওদীর কোনো দখল নেই? জবাব হলো, উপরোক্ত অবস্থার সুরত হচ্ছে হলো, এক ব্যক্তি পেশাব করেছে তারপর অজু করেছে; তারপর তার ওদী বের হলো। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির ওপর অজু করা ওয়াজিব হবে।

بَابُ الْمَاءِ الَّذِيْ يَجُوْزُ بِهِ الْوُضُوْءُ وَمَالَا يَجُوْزُ بِهِ

اَلطَّهَارَةُ مِنَ الْاَحْدَاثِ جَائِزَةٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْاَوْدِيَةِ وَالْعُيُوْنِ وَالْاٰبَارِ وَالْبِحَارِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا وَقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ لَايُنَجِّسُهُ شَيْئٌ اِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ اَوْطَعْمَهُ اَوْ رِيْحَهُ وَقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ وَمُطْلَقُ الْاِسْمِ يُطْلَقُ عَلٰى هٰذِهِ الْمِيَاهِ ـ

পরিচ্ছেদ ঃ যে পানি দ্বারা অজু জায়েজ এবং যে পানি দ্বারা অজু জায়েজ নয়

অনুবাদ ঃ আসমানের (বৃষ্টির) পানি, উপত্যকায় জমা পানি, ঝরনার পানি, কূপের পানি এবং সমুদ্রের পানি দ্বারা অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা জায়েজ। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমি আসমান থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করেছি। (২৫ ফুরকান – ৪৮) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পানি পবিত্র, কোনো কিছু তাকে নাপাক করতে পারে না, কিন্তু যে অপবিত্র বস্তু পানির বর্ণ, স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তন করে দেয় তা নাপাক। (ইবনে মাজাহ) অন্য হাদীসে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মরা হালাল (ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মাজাহ, দারু কুতনী ও হাকিম) আর সাধারণভাবে বিশেষণ ছাড়া পানি শব্দটি এ সকল পানির উপর প্রযোজ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে মুসান্নিফ (র.) অজু ও গোসলের আলোচনা করেছেন। বক্ষমান পরিচ্ছেদে যার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায় তার আলোচনা শুরু করছেন, অর্থাৎ ماء مطلق-এর আলোচনা। আর ماء مطلق দ্বারা মুরাদ হলো, বৃষ্টির পানি, উপত্যকার পানি, ঝরনার পানি, কূপের পানি এবং সমুদ্রের পানি। কেননা ইরশাদ হয়েছে, আমি আসমান থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করেছি।— (২৫, ফুরকান, ৪৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পানি পবিত্র, কোনো কিছু তাকে নাপাক করে না, কিন্তু যে অপবিত্র বস্তু পানির বর্ণ, স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তন করে দেয় (তা নাপাক বলে গণ্য হবে।) —(ইবনে মাজাহ)

اَحْدَاثٌ - حَدَثٌ-এর বহুবচন, অর্থ– অপবিত্রতা ও নাপাকী। حدث দু' প্রকার (১) حدث اصغر (২) حدث اكبر অথবা এভাবেও বলা যায় حدث দু' প্রকার (১) حدث غليظ গাঢ় নাপাকী, (২) حدث خفيف হালকা নাপাকী। উভয় ধরনের নাপাকী থেকে আসমানের পানি ইত্যাদি দ্বারা পাক হওয়া জায়েজ। কেননা আল্লাহর বাণী, وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ لَايُنَجِّسُهُ شَيْئٌ اِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ اَوْ طَعْمَهُ اَوْ رِيْحَهُ অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّاْنَا بِهٖ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّاُ مِنَ الْبَحْرِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ ـ (ابن ماجة)

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, সমুদ্রের পানি পাক। ঝরনা, কূপ এবং উপত্যকার পানি মূলত আসমানেরই পানি। ইরশাদ হয়েছে, اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন অতঃপর তা ভূমিতে নির্ঝর রূপে প্রবাহিত করেন।—(৩৯ যুমার- ২১)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا তিনি আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ তাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয়।— (১৩, রাদ, ১৭)

বস্তুত হেদায়া প্রণেতার উপস্থাপিত সবগুলো نص-এর মধ্যে طهور শব্দটি রয়েছে। যার দ্বারা পানি সত্তাগতভাবে পাক বুঝা যায়, কিন্তু অপর বস্তুকেও পাক করে তা বুঝা যায় না। এ জন্য উত্তম হলো, আল্লাহর বাণী وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ দ্বারা দলিল দেওয়া, যার দ্বারা পানি مطهر হওয়া বুঝে আসে। তবে ফাতহুল কাদীর -এর লেখক বলেছেন শরিয়তের পরিভাষায় طهور বলা হয় যা অন্যকে পাক করে। সুতরাং এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী হেদায়া প্রণেতার উপরোক্ত طهور-এর আয়াত ও হাদীস দ্বারা দলিল দেওয়া সহীহ আছে।

وَلَا يَجُوزُ بِمَا اعْتُصِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ وَالْحُكْمُ عِنْدَ فَقْدِهٖ مَنْقُولٌ اِلَى التَّيَمُّمِ وَالْوَظِيفَةُ فِىْ هٰذِهِ الْاَعْضَاءِ تَعَبُّدِيَّةٌ فَلَا تَتَعَدّٰى اِلٰى غَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ اَمَّا الْمَاءُ الَّذِيْ يَقْطُرُ مِنَ الْكَرْمِ فَيَجُوزُ التَّوَضِّىْ بِهٖ لِاَنَّهُ مَاءٌ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ ذَكَرَهُ فِىْ جَوَامِعِ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) وَفِى الْكِتَابِ اِشَارَةٌ اِلَيْهِ حَيْثُ شَرَطَ الْاِعْتِصَارَ ـ

অনুবাদ ঃ বৃক্ষ কিংবা ফল থেকে নিংড়ানো পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েজ নয়। কেননা তা সাধারণ পানি নয়, আর সাধারণ পানি না পাওয়া গেলে (পবিত্রতা অর্জনের) হুকুম তায়াম্মুমে দিকে হয়ে যায়। আর এ সকল অঙ্গ ধৌত করার হুকুম কিয়াস বহির্ভূত। সুতরাং তা نص বা শরিয়তের বাণীতে উল্লিখিত বস্তুকে অতিক্রম করবে না। তবে আঙ্গুর বৃক্ষ থেকে ফোঁটা ফোঁটা যে পানি পড়ে, তা দ্বারা অজু জায়েজ হবে। কেননা তা হস্তক্ষেপ ছাড়া নির্গত হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) جوامع গ্রন্থে এ মাসআলা উল্লেখ করেছেন। মূল কুদূরী কিতাবেও এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা তাতে নিঃসারণের শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যে পানি বৃক্ষ কিংবা ফল থেকে নিংড়ানো হয় তার দ্বারা অজু জায়েজ নয়। কেননা এ পানি ماء مطلق নয়। দলিল হলো— যদি কারো নিকট কূপ বা সমুদ্রের পানি অথবা বৃক্ষ ও ফলের নিংড়ানো পানি থাকে, অতঃপর কাউকে বলা হয় পানি নিয়ে এসো, তখন তার যেহেন ও মন প্রথম প্রকারের পানির দিকে ধাবিত হবে। বুঝা গেল নিংড়ানো পানি ماء مطلق নয়। তাই পানি না থাকা অবস্থায় অজুর হুকুম তায়াম্মুম-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا এবং তোমরা যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে।— (৪ নিসা - ৪৩)

এতে প্রতীয়মান হলো যে, বৃক্ষ বা ফলের নিংড়ানো পানি অজুর যোগ্য নয়।

وَالْوَظِيْفَةُ فِىْ هٰذِهِ الْاَعْضَاءِ বাক্যটি দ্বারা একটি প্রশ্নের সমাধান দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, নিংড়ানো পানি যদিও ماء مطلق নয়, তবে ماء مطلق -এর حكم -এর মধ্যে রয়েছে। কেননা শায়খাইন (র.) -এর মতে নিংড়ানো পানি দ্বারা نَجَاسَتِ حَقِيْقِيَّه দূর করা জায়েজ। তাই نَجَاسَتِ حُكْمِيَّه -ও দূর করা জায়েজ হওয়া চাই। অথচ আপনারা না জায়েজ বলেন? এ প্রশ্নের জবাবের পূর্বে এ কথা বুঝতে হবে যে, কিয়াস সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো اصل তথা مقيس عليه -এর হুকুম কিয়াস বহির্ভূত না হওয়া।

জবাবের সার নির্যাস হলো— অঙ্গ চতুষ্টয় পাক করার ক্ষেত্রে ماء مطلق -এর ব্যবহার কিয়াস বহির্ভূত। কেননা মুহ্দিস -এর অঙ্গ حقيقة ও حكما সর্বাবস্থায় পাক। حقيقة পাক এভাবে যে, কোনো نَجَاسَتِ حَقِيْقِيَّه তার অঙ্গে লাগেনি, حكما পাক এভাবে যে, কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কোনো محدث বা جنبى -কে কাঁধে নিয়ে নামাজ আদায় করে তবে তার নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। অথচ এরা যদি নাপাক হতো তাহলে তার নামাজ সহীহ হতো না। এতে বুঝা গেল মুহ্দিস-এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাক, আর পাককে পুনরায় পাক করা অসম্ভব বিষয়। যার দ্বারা تَحْصِيْلِ حَاصِلْ লাযিম আসে। তা ছাড়া ماء مطلق পরিপূর্ণভাবে ماء مطلق -এর অর্থেও ব্যবহৃত হয় না। কেননা ماء مطلق-কে বাধা দেওয়া যায় না, অনায়াসে নাগালে আনা যায়। আর ماء مقيد-কে বাধা দেওয়া যায়, যা খুব কমই পাওয়া যায়। মোদ্দাকথা, যখন সকল অঙ্গ ধোয়ায় ماء مطلق-এর ব্যাবহার কিয়াস বর্হিভূত, আর ماء مقيد-ও পরিপূর্ণভাবে ماء مطلق -এর অর্থে আসে না, তাই ماء مقيد-কে ماء مطلق -এর ওপর কিয়াস করা যায় না, তাই আমরা বলি ماء مطلق -এর হুকুম ماء مقيد -এর দিকে متعدى হয় না।

পক্ষান্তরে ماء مطلق দ্বারা نَجَاسَتِ حَقِيْقِيَّه দূর করা কিয়াস সম্মত। তাই ماء مقيد -কেও তার উপর কিয়াস করা সহীহ, তার দ্বারাও نَجَاسَتِ حَقِيْقِيَّه দূর করা জায়েজ।

আঙ্গুরের কাঁদি থেকে যে পানি নিজে নিজে বের হয় তার দ্বারা অজু জায়েজ। এ মাসআলাটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর جوامع গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কুদূরীতেও এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।—(ফাত্হুল কাদীর)

وَلَا يَجُوْزُ بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَأَخْرَجَهُ عَنْ طَبْعِ الْمَاءِ كَالْأَشْرِبَةِ وَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَمَاءِ الْبَاقِلِّي وَالْمَرَقِ وَمَاءِ الزَّرْدَجِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمّٰى مَاءً مُطْلَقًا وَالْمُرَادُ بِمَاءِ الْبَاقِلِّي مَا تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ فَإِنْ تَغَيَّرَ بِدُوْنِ الطَّبْخِ يَجُوْزُ التَّوَضِّيْ بِهِ ـ

অনুবাদ ঃ এমন পানি দ্বারা (পবিত্রতা অর্জন) জায়েজ নয়, যাতে অন্য কোনো বস্তু প্রভাব বিস্তার করে পানির প্রকৃত গুণ দূরীভূত করে দিয়েছে। যেমন– শরবত, সিরকা, গোলাব জল, সবজির পানি, শুরুয়ার পানি, লোধ্র (গাজর) ভিজিয়ে রাখা পানি। কেননা এগুলোকে সাধারণ পানি ماء مطلق বলা হয় না। সবজির পানির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা জ্বাল দেওয়ার দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আর যদি বিনা জ্বালে তাতে পরিবর্তন আসে তাহলে তা দ্বারা অজু জায়েজ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি পানির সাথে অন্য কোনো বস্তু প্রভাব বিস্তার করে পানির প্রকৃত গুণ দূরীভূত করে দেয় (আর পানির প্রকৃত গুণ হলো বর্ণ, স্বাদ এবং গন্ধ) তবে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের পানি দ্বারা অজু জায়েজ নয়। যেমন– সিরকা, গোলাবজল, সবজির পানি, শুরুয়ার পানি, লোধ্র ভিজিয়ে রাখা পানি ইত্যাদি।

ইবনুল হুমাম (র.) লিখেছেন যে, যদি اشربه দ্বারা বৃক্ষের নির্গত পানি, যেমন– আঙ্গুরের শরবত, আনারসের শরবত, আর সিরকা দ্বারা খালিস সিরকা মুরাদ হয় তবে এই উভয় প্রকারের পানি বৃক্ষ ও ফলের নিংড়ানো পানির ন্যায় হবে। সবজির পানি, শুরুয়ার পানি ঐ পানির ন্যায় হবে, যার উপর অন্য কোনো বস্তু প্রভাব বিস্তার করেছে। বস্তুত মুসান্নিফ (র.) -এর বর্ণিত ইবারতে لف نشر مرتب হবে। অর্থাৎ بِمَا اعْتُصِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ-এর উদাহরণ আগে হবে আর بِمَا غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ এর উদাহরণ পরে হবে। যেমন কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ তিনি তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য করেছেন রজনী ও দিবস যেন উহাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পারো এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো।— (২৮ - কাসাস - ৭৩)

উপরোক্ত আয়াতে কারীমায়ও لف نشر مرتب হয়েছে। আর যদি اشربه দ্বারা মিষ্টান্ন মিলানো পানি যেমন– শীরা বা মধু মিলানো পানি, আর সিরকা দ্বারা পানি মিশ্রিত সিরকা মুরাদ হয়, এমতাবস্থায় এ সকল পানি, অন্য বস্তুর প্রভাব বিস্তার ওয়ালা পানির ন্যায় হবে।

উপরোক্ত পানি দ্বারা অজু জায়েজ না হওয়ার দলিল হলো— এ সকল পানিকে সাধারণ পানি বলা হয় না। অর্থাৎ 'পানি' শব্দ দ্বারা ঐ সকল পানির দিকে মন ধাবিত হয় না। যেমন– কোনো ব্যক্তি বলল, আমি পানি পান করিনি অথচ সে সবজির পানি বা শুরুয়া পান করেছিল এতে তাকে মিথ্যাবাদী বলা যাবে না। হেদায়া প্রণেতা বলেন, সবজির পানি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা মরিচ ইত্যাদি দ্বারা জ্বাল দেওয়া হয় আর তাতে পানি পরিবর্তন হয়ে যায়। তবে এগুলো দ্বারা অজু জায়েজ নয়। আর যদি বিনা জ্বালে পরিবর্তন হয়, তবে অজু জায়েজ।

وَيَجُوْزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ اَحَدَ اَوْصَافِهِ كَمَاءِ الْمَدِّ وَالْمَاءِ الَّذِىْ اِخْتَلَطَ بِهِ الزَّعْفَرَانُ اَوِ الصَّابُوْنُ اَوِ الْاُشْنَانُ قَالَ اُجْرِىَ فِى الْمُخْتَصَرِ مَاءُ الزَّرْدَجِ مَجْرَى الْمَرَقِ وَالْمَرْوِىُّ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ هُوَ الصَّحِيْحُ كَذَا اخْتَارَهُ النَّاطِفِىْ وَالْاِمَامُ السَّرْخَسِىْ وَقَالَ الشَّافِعِىْ (رحـ) لَا يَجُوْزُ التَّوَضِّىْ بِمَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَاَشْبَاهِهِ مِمَّا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْاَرْضِ لِاَنَّهُ مَاءٌ مُقَيَّدٌ اَلَا يَرٰى اَنَّهُ يُقَالُ مَاءُ الزَّعْفَرَانِ بِخِلَافِ اَجْزَاءِ الْاَرْضِ لِاَنَّ الْمَاءَ لَايَخْلُوْ عَنْهَا عَادَةً وَلَنَا اِسْمُ الْمَاءِ بَاقٍ عَلَى الْاِطْلَاقِ اَلَايَرٰى اَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ اِسْمٌ عَلٰى حِدَةٍ وَاِضَافَتُهُ اِلَى الزَّعْفَرَانِ كَاِضَافَتِهِ اِلَى الْبِئْرِ وَالْعَيْنِ وَلِاَنَّ الْخَلْطَ الْقَلِيْلَ لَايُعْتَبَرُ بِهِ لِعَدَمِ اِمْكَانِ الْاِحْتِرَازِ عَنْهُ كَمَا فِىْ اَجْزَاءِ الْاَرْضِ فَيُعْتَبَرُ الْغَالِبُ وَالْغَلَبَةُ بِالْاَجْزَاءِ لَابِتَغَيُّرِ اللَّوْنِ هُوَ الصَّحِيْحُ ـ

অনুবাদ ঃ যে পানির সাথে কোনো পাক জিনিস মিশ্রিত হয় আর তা পানির (তিনটি গুণের) কোনো একটিকে পরিবর্তন করে দেয়, সে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েজ। যেমন– বন্যার ঘোলা পানি এবং জাফরান, সাবান ও উশনান মিশ্রত পানি।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, কুদূরীতে লোধ্র ভিজিয়ে রাখা পানিকে ঝোলের পর্যায়ের ধরা হয়েছে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বর্ণনা মতে তা জাফরান মিশ্রিত পানির সমপর্যায়ের, এ মতটিই বিশুদ্ধ। নাতিফী ও ইমাম সারখসী (র.) এ মতই গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, জাফরান এবং এর অনুরূপ এমন পদার্থ মিশ্রিত পানি যা মাটি জাতীয় নয়, তা দ্বারা অজু জায়েজ নয়। কেননা এটা সাধারণ পানি নয়। তুমি লক্ষ্য করছ না যে, তাকে (শুধু পানি না বলে) জাফরানের পানি বলা হয়। মাটি জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত পানি এর ব্যতিক্রম। কেননা পানি সাধারণত তা থেকে মুক্ত হয় না। আমাদের যুক্তি হলো, এ ক্ষেত্রে পানি নামটি এখনও সাধারণভাবেই অক্ষুণ্ন আছে। এর জন্য তার ক্ষেত্রে আলাদা নতুন কোনো নাম যুক্ত হয়নি। জাফরানের দিকে সম্বোধন করে (জাফরানের পানি বলা) মূলত কুয়া ও ঝরনার দিকে সম্বোধন করার মতো। তা ছাড়া সামান্য মিশ্রণ পরিহার করা সম্ভব নয় বিধায় ধর্তব্যও নয়, যেমন মাটি পদার্থের ক্ষেত্রে। সুতরাং প্রবলতাই বিবেচ্য বিষয় হবে। আর প্রবলতা সাব্যস্ত হবে অংশগত اجزاء পরিমাণ দ্বারা, রং এর পরিবর্তন দ্বারা নয়। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি পানির সাথে কোনো পাক জিনিস মিশ্রিত হয় এবং তা পানির তিনটি গুণের (বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ) কোনো একটিকে পরিবর্তন করে দেয়, তবে সে পানি দ্বারা অজু করা জায়েজ, যেমন– বন্যার ঘোলা পানি, জাফরান সাবান বা উশনান মিশ্রিত পানি, উশনান এক ধরনের লবণাক্ত ঘাস যা সাবানের ন্যায় কাপড়ের ময়লা দূর করে।

কুদূরী কিতাবে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি পানির দুই বা তিনটি গুণে পরিবর্তন এসে যায় তবে সে পানি দ্বারা অজু জায়েজ নয়। নিহায়া কিতাবে বর্ণিত আছে যে, অজু জায়েজ। এমনকি হেমন্ত কালে যখন কূপের মধ্যে বৃক্ষের পাতা পড়ে পানির সব গুণ পরিবর্তন করে দেয় তখনও মাশায়িখগণ উক্ত পানি দ্বারা অজু জায়েজ বলেন। বুঝা গেল সব গুণ পরিবর্তন হয়ে গেলেও অজু জায়েজ। শরহে তাহাবীতেও এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। তবে শর্ত হলো পানির তরলতা অবশিষ্ট থাকতে হবে। যদি কোনো জিনিস মিশ্রিত হওয়ার দ্বারা পানি গাঢ় হয়ে যায় তবে তাদের নিকটও অজু জায়েজ হবে না।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে লিখেছেন, ফকীহ আহমদ ইবনে ইবরাহীম মায়দানী (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, অধিক পাতা পড়ার কারণে যদি পানির বর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়, এবং হাতে পানি উঠালে পাতার বর্ণ দেখা যায়, তবে এর কী হুকুম? উত্তরে তিনি বলেন, এ ধরনের পানি দ্বারা অজু জায়েজ নয়। তবে এ পানি পান করা বা অন্য কোনো জিনিস ধোয়া জায়েজ। কেননা এ পানি পাক। অজু না জায়েজ হওয়ার কারণ হলো— পানিতে পাতার বর্ণ প্রবল হওয়ায় এ পানি مَاء مقيد যেমন সবজির পানি-এর ন্যায় হয়ে গেছে। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এ ধরনের পানি দ্বারা অজু জায়েজ নয়।

এ স্থানে মুসান্নিফ (র.)-এর ইবারতের উপর একটি প্রশ্ন হয়, পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيْحَهُ দ্বারা বুঝা যায় পানির একটি গুণ পরিবর্তন হলেও তার দ্বারা অজু জায়েজ নয়। অথচ কুদূরী গ্রন্থকার জায়েজ বলেছেন? উত্তর হলো, হাদীসে বর্ণিত شيء দ্বারা شيء نجس উদ্দেশ্য অর্থাৎ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ نَجَسٌ। আর এই হাদীস ماء جاري-এর ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। এখন হাদীসের মূল অর্থ হবে জারি পানি পাক, কোনো নাপাক জিনিস তাকে নাপাক করতে পারবে না। তবে যদি তার বর্ণ, স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যায়, তখন তা ব্যবহার করা জায়েজ নেই। কারণ উপরোক্ত গুণ গুলো নাপাকীরই ইঙ্গিত বহন করে।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম কুদূরী তাঁর মুখতাসারুল কুদূরীতে গাজরের পানিকে ঝোলের পর্যায়ের ধরেছেন অর্থাৎ উভয়টি দ্বারা অজু নাজায়েজ। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) গাজরের পানিকে জাফরান মিশ্রিত পানির ন্যায় বলেছেন অর্থাৎ পানির একটি গুণ চলে গেলেও উভয়টি দ্বারা অজু জায়েজ। ইমাম নাতিফী ও ইমাম সারখসী (র.) এ মতই গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, জাফরান এবং এর অনুরূপ এমন পদার্থ মিশ্রিত পানি যা মাটি জাতীয় নয় তা দ্বারা অজু জায়েজ নয়। কেননা এটা ماء مقيد তাই তো এই পানিকে জাফরানের পানি বলা হয়। ইযাফত যেহেতু تقيد -কে চায়, তাই বৃক্ষের পানি, ফলের রস এবং গোলাব জলের ন্যায় জাফরানের পানিও ماء مقيد হবে, ماء مطلق নয়। আর ماء مطلق না থাকলে তায়াম্মুমের বিধান রয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا অর্থাৎ ماء مطلق না পেলে তায়াম্মুম করো। বুঝা গেল জাফরানের পানি ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম জায়েজ। মাটি জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত পানি এর ব্যতিক্রম। কেননা পানি সাধারণত তা থেকে মুক্ত হয় না। তাই মাটি জাতীয় পদার্থের মিশ্রণ দ্বারা ماء مطلق -এর কোনো অসুবিধা হয় না। মোদ্দাকথা, পানি মাটি জাতীয় পদার্থের মিশ্রণ দ্বারা ماء مطلق হিসাবেই থাকে, তা দ্বারা অজু জায়েজ, আর মাটি জাতীয় নয় এমন পদার্থের মিশ্রণ দ্বারা পানি ماء مقيد হয়ে যায় তাই এর দ্বারা অজু জায়েজ নয়। আমাদের (হানাফীদের) ১ম যুক্তি হলো— পানি নামটি এখনও সাধারণভাবেই অক্ষুণ্ন আছে, তার ক্ষেত্রে আলাদা নতুন কোনো নাম যুক্ত হয়নি। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে যেমন জাফরানের পানি এখানে তো নতুন নাম যুক্ত হয়েছে? তবে তার জবাব এই যে, জাফরানের পানি বলা এমন যেমন বলা হয় কূপের পানি, ঝরনার পানি, অথচ এগুলো ماء مطلق , তদ্রূপ জাফরানের পানিও ماء مطلق। পুনরায় প্রশ্ন হয় যে, এমন তো সবজি বা ঝোলের পানিও। তবে তো এগুলো দ্বারা কি অজু জায়েজ? আপনারা তো নাজায়েজ বলেন? জবাব হলো— নিশ্চয় সবজির দ্বারা নতুন নাম আসেনি তবে সবজি মিশ্রিত হওয়ার কারণে পানির প্রকৃত গুণ দূরীভূত হয়ে গেছে, তাই এই পানি দ্বারা অজু জায়েজ নয়। সুতরাং জাফরানও যদি পানিতে এ পরিমাণ মিশ্রিত হয় যার দ্বারা পানির প্রকৃত গুণ দূরীভূত হয়ে যায় তবে তা দ্বারাও অজু নাজায়েজ হবে।

আমাদের দ্বিতীয় যুক্তি হলো— সামান্য জিনিসের মিশ্রণ পরিহার করা অসম্ভব, তাই তা ধর্তব্যও নয়। যেমন– মাটি জাতীয় পদার্থের ক্ষেত্রে। তাই প্রবলতাই বিবেচ্য বিষয় হবে। প্রণিধান যোগ্য যে, প্রবলতা সাব্যস্ত হবে অংশগত পরিমাণ দ্বারা, রংয়ের পরিবর্তন দ্বারা নয়। আর এটাই হলো বিশুদ্ধতম অভিমত।

وَاِنْ تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ بَعْدَمَا خُلِطَ بِهٖ غَيْرُهٗ لَايَجُوْزُ التَّوَضِّىْ بِهٖ لِاَنَّهٗ لَمْ يَبْقَ فِىْ مَعْنَى الْمُنَزَّلِ مِنَ السَّمَاءِ اِلَّا اِذَا طُبِخَ فِيْهِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمُبَالَغَةُ فِى النَّظَافَةِ كَالْاُشْنَانِ وَنَحْوِهٖ لِاَنَّ الْمَيِّتَ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ الَّذِىْ اُغْلِىَ بِالسِّدْرِ بِذٰلِكَ وَ رَدَتِ السُّنَّةُ اِلَّا اَنْ يَّغْلِبَ ذٰلِكَ عَلَى الْمَاءِ فَيَصِيْرُ كَالسَّوِيْقِ الْمَخْلُوْطِ لِزَوَالِ اِسْمِ الْمَاءِ عَنْهُ ـ

অনুবাদ ঃ মিশ্রণের পর যদি জ্বাল দেওয়ার দ্বারা পানি পরিবর্তিত হয় তবে সে পানি দ্বারা অজু জায়েজ নয়। কেননা তা আসমান থেকে বর্ষিত পানির স্বভাবে নেই। অবশ্য যদি পানিতে এমন কিছু জ্বাল দেওয়া হয় যা দ্বারা অধিক পরিষ্করণ উদ্দেশ্য হয় যেমন উশনান বা এই জাতীয় কিছু তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা মাইয়েতকে বরই পাতার জ্বাল দেওয়া পানি দ্বারা গোসল দেওয়া হয়। হাদীসেও তা বর্ণিত আছে। তবে যদি তা পানির উপর প্রবল হয়ে ছাতু (মিশ্রিত পানির) মতো হয়ে যায়। (তাহলে জায়েজ হবে না) কেননা তখন পানি নামটি তা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা ঃ যদি পানিতে কোনো জিনিস মিশ্রিত করে জ্বাল দেওয়া হয় তা দ্বারা অজু জায়েজ নয়। তবে যদি নিরেট পানি জ্বাল দেওয়া হয় আর এর দ্বারা পানি পরিবর্তন হয়ে যায় তবে তা দ্বারা অজু জায়েজ। কেননা জ্বাল দেওয়া মিশ্রিত পানি আসমান থেকে বর্ষিত পানির মতো নয়। তাই তা দ্বারা অজু জায়েজ নয়। অবশ্য যদি পানিতে এমন কিছু জ্বাল দেওয়া হয় যা দ্বারা অধিক পরিষ্করণ উদ্দেশ্য হয় যেমন উশনান ইত্যাদি, তবে তা দ্বারা অজু জায়েজ। কেননা মাইয়েতকে বরই পাতা দ্বারা জোশ দেওয়া পানি দ্বারা গোসল দেওয়া হয়, আর হাদীসেও তা বর্ণিত আছে।

শরহে নেকায়ার গ্রন্থকার বলেন, বুখারী ও মুসলিমে শুধু আছে اِغْسِلُوْا بِمَاءِ السِّدْرِ বরই পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দাও, কিন্তু তা দ্বারা জ্বাল দেওয়ার কথা বুঝায় না, যেমনটি হেদায়া গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই উত্তম জানেন। (ফাতহুল কাদীর) এর জবাবে বলা হয়, বরই পাতার পানি দ্বারা গোসল দেওয়া তখনই সম্ভব যখন পানি ও পাতা পরস্পর মিশ্রিত হয়ে যায়, আর এই মিশ্রণ জ্বাল দেওয়া ব্যতীত সম্ভব নয় এ জন্য হেদায়া গ্রন্থকার اُغْلِىَ بِالسِّدْرِ বলেছেন। আর হাদীসের উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন। তবে হ্যাঁ অধিক পরিষ্করণের জন্য যে জিনিস পানিতে জ্বাল দেওয়া হয় তা পানির উপর প্রবল না হওয়া চাই। যদি প্রবল হয়ে যায় তবে অজু জায়েজ হবে না। যেমন– পানিতে ছাতু মিলিয়ে জ্বাল দেওয়া হলে তা দ্বারা অজু জায়েজ নয়। কেননা তখন পানি নামটি তা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

وَكُلُّ مَاءٍ وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِيْهِ لَمْ يَجُزِ الْوُضُوْءُ بِهِ قَلِيْلًا كَانَتِ النَّجَاسَةُ أَوْ كَثِيْرًا وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) يَجُوزُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ اَحَدُ اَوْصَافِهِ لِمَا رَوَيْنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يَجُوْزُ إِنْ كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَايَحْمِلُ خَبَثًا وَلَنَا حَدِيْثُ الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ مَنَامِهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَايَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلَنَّ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَالَّذِىْ رَوَاهُ مَالِكٌ وَرَدَ فِىْ بِيْرِ بُضَاعَةَ وَمَاؤُهُ كَانَ جَارِيًا فِى الْبَسَاتِيْنِ وَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِىْ (رحـ) ضَعَّفَهُ اَبُوْدَاوُدَ اَوْ هُوَ يَضْعُفُ عَنْ اِحْتِمَالِ النَّجَاسَةِ ـ

অনুবাদ ঃ যে কোনো (স্থির ও অল্প) পানিতে নাপাকি পড়লে তা দ্বারা অজু জায়েজ নয়। নাপাকি অল্প হোক বা বেশি হোক। ইমাম মালিক (র.) বলেন, যতক্ষণ পানির তিনটি গুণের কোনো একটির পরিবর্তন না হয় ততক্ষণ অজু জায়েজ উপরে আমাদের বর্ণিত হাদীস দ্বারা তিনি দলিল গ্রহণ করেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, পানি দুই মটকা পরিমাণ হলে অজু জায়েজ হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, পানি যদি দুই মটকা পরিমাণ হয়, তবে তা নাপাক হয় না। আমাদের দলিল হলো, ঘুম থেকে জেগে উঠা ব্যক্তি সম্পর্কিত হাদীস এবং নিম্নোক্ত হাদীস তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে পেশাব না করে এবং তাতে জানাবাতের গোসল না করে। এখানে (মটকা পরিমাণের) পার্থক্য করা হয়নি।

ইমাম মালিক (র.) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা 'বুযা'আ নামক কূপ সম্পর্কিত। তার পানি ছিল প্রবাহিত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফি'ঈ (র.) বর্ণিত হাদীসকে ইমাম আবূ দাউদ (র.) দুর্বল বলেছেন, অথবা -এর অর্থ নাপাকি বহন করার ব্যপারে দুর্বল। (অর্থাৎ নাপাক হয়ে যাবে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইবারতে 'পানি' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্থির পানি এবং ঐ পানি যা প্রবাহিত নয় এবং প্রবাহিত পানির হুকুমেও নয়। হেদায়ার কোনো কোনো ছাপায় قَلِيْلًا كَانَ اَوْ كَثِيْرًا আবার কোনো কোনো ছাপায় قَلِيْلًا كَانَتِ النَّجَاسَةُ اَوْكَثِيْرًا বর্ণিত হয়েছে। প্রথম ছাপার ভিত্তিতে ইবারতের ব্যাখ্যা হলো, قليل ও كثير শব্দ দু'টো فعيل-এর ওযনে فاعل -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে تشبيه- فَعِيْلٌ بِمَعْنٰى مَفْعُوْلٍ -এর সাথে فَعِيْلٌ بِمَعْنٰى فَاعِلٍ-কে علامت تانيث উহ্য থাকার ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ -এর মধ্যে قريب থেকে علامت تانيث-কে হযফ করা হয়েছে। এখন صور مسئله হবে প্রত্যেক নাপাকি মিশ্রিত পানি দ্বারা অজু জায়েজ নেই, নাপাকি কম বা বেশি হোক। قليل -এর قيد দ্বারা ইমাম মালিক (র.) বক্তব্য থেকে احتراز করা হয়েছে। কেননা তাঁর মতে অল্প নাপাকি পানিকে, নাপাক করে না যতক্ষণ পানির তিন গুণের কোনো একটি পরিবর্তন না হয়।

দ্বিতীয় ছাপা অনুযায়ী صورت مسئله হবে, স্থির পানি কম হোক বা বেশি হোক যদি তাতে নাপাকি পড়ে তবে তা দ্বারা অজু জায়েজ নয়। قليل পানি দ্বারা উদ্দেশ্য এ পরিমাণ পানি যা কেবল অজু গোসলের জন্য যথেষ্ট।

ইবারতে قليلا -এর قيد দ্বারা ইমাম মালিক (র.) আর كثيرا -এর قيد দ্বারা ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর قول থেকে احتراز করা হয়েছে। কেননা ইমাম মালিক (র.) ماء قليل দ্বারা অজু জায়েজ বলেন, যদিও পানির মধ্যে নাপাকি পড়ার দ্বারা তার তিন গুণের কোনো একটি গুণে পরিবর্তন না আসে। তিনি উপরে বর্ণিত হাদীস কে (الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ) দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, দুই মটকা পরিমাণ পানিতে নাপাকী পড়লে অজু জায়েজ হবে। দলিল হলো, কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَا يَحْمِلُ خَبَثًا পানি যদি দুই মটকা পরিমাণ হয়, তাহলে তা নাপাক হয় না। (سنن اربعه)

হানাফীদের ১ম দলিল ঃ ঘুম থেকে জেগে ওঠা ব্যক্তি সম্পর্কিত হাদীস إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلٰثًا তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠলে সে যেন পাত্রে হাত না ঢুকায় তিনবার ধৌত করা ব্যতীত। (سنن اربعه) وجه استدلال এভাবে যে, যখন সম্ভাবনাময় নাপাকীর কারণে পানিতে হাত ঢুকানো নিষেধ, তখন একথা সহজেই অনুমেয় যে, প্রকৃত নাপাকি দ্বারা পানি অবশ্যই নাপাক হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় দলিল ঃ রাসূলুল্লাহর ﷺ -এর হাদীস لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلَنَّ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে পেশাব না করে এবং তাতে জানাবাতের গোসল না করে। (বুখারী ও মুসলিম) এ হাদীস ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (র.) উভয়ের বিপক্ষে দলিল হতে পারে। ইমাম মালিক (র.)-এর বিপক্ষে এভাবে দলিল যে, হাদীসের মধ্যে স্থির পানি দ্বারা জানাবাতের গোসল করতে বারণ করা হয়েছে, অথচ জানাবাতের গোসল দ্বারা পানির কোনো গুণে পরিবর্তন আসে না। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর বিপক্ষে এভাবে যে, হাদীসটি مطلق এখানে قلتين বা غير قلتين -এর কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মালিক (র.) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা 'বুযা'আ' নামক কূপ সম্পর্কিত হাদীস, যার পানি বিভিন্ন বাগানে প্রবাহিত ছিল অর্থাৎ এ কূয়ার পানি দ্বারা সর্বদা বাগানে পানি সিঞ্চন করা হতো। এখানে কোনো পানি জমে থাকতে পারতনা। ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, বুযা'আ কূপ দ্বারা পাঁচটি বাগানে পানি দেওয়া হতো। বুঝা গেল বুযা'আ কূপের পানি প্রবাহিত পানির (ماء جارى) মতো। আর ماء جارى দ্বারা আমাদের মতেও অজু জায়েজ। যদিও তার মধ্যে নাপাকি পড়ে। পূর্ণ হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ تُلْقٰى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتَنُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ – (ابو داود ، الترمذى و النسائى)

সাহাবী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি বুযা'আর পানি দিয়ে অজু করব? অথচ তাতে হায়েযের কাপড়, কুকুরের গোশ্ত এবং দুর্গন্ধ যুক্ত জাতীয় জিনিস নিক্ষেপ করা হয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পানি পবিত্র, কোনো কিছু তাকে নাপাক করতে পারে না। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী) সুতরাং بِئْرِ بُضَاعَة-এর হাদীসে এর পানি ماء جارى -এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তার দ্বারা অল্পপানি নাপাক না হওয়ার উপর দলিল দেওয়া জায়েজ হবে না। এ পর্যায়ে গ্রন্থকারের উপর প্রশ্ন জাগে যে, অধ্যায়ের শুরুতে উক্ত হাদীস দ্বারা সাধারণ পানি পাক হওয়ার উপর দলিল দিয়েছেন। আর এ স্থানে উক্ত হাদীসকে بِئْرِ بُضَاعَة সম্পর্কিত বলেছেন, এখন اَلْمَاءُ طَهُورٌ -এর لام যদি جنس -এর জন্য হয় তখন উক্ত হাদীস দ্বারা সাধারণ পানি পাক হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল দেওয়া যায়, তবে بِئْرِ بُضَاعَة -এর সাথে সম্পর্কিত বলা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি لام-عهد خارجى -এর জন্য হয় তবে بِئْرِ بُضَاعَة সম্পর্কিত বলা সহীহ হবে; কিন্তু সাধারণ পানি পাক হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল দেওয়া সহীহ হবে না। ইনায়া গ্রন্থকার আল্লামা আলাউদ্দীন আব্দুল আযীয (র.)-এর বরাত দিয়ে এর জবাবে বলেন, اَلْمَاءُ طَهُورٌ -এর لام - جنس -এর জন্য। কাজেই হাদীস দ্বারা সাধারণ পানি পাক হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল দেওয়া সহীহ। আর بِئْرِ بُضَاعَة সম্পর্কিত বলাও বাতিল

নয়। কেননা উক্ত হাদীসের দু'টো দিক রয়েছে– (ক) اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ (খ) لَايُنَجِّسُهُ شَيْئٌ। প্রথমটি দ্বারা সাধারণ পানি পাক হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল দেওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি দ্বারা বীরে বুযা'আ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হয় لاينجسه -এর ضمير টা الماء -এর দিকে ফিরেছে আর الماء -এর لام টি جنس -এর জন্য। এ ক্ষেত্রে এককভাবে বীরে বুযা'আকে খাস করা কিভাবে সহীহ হবে? এর জবাব হলো, উক্ত হাদীস শরীফে صنعت استخدام -এর নীতি অনুসৃত হয়েছে। صنعت استخدام হলো এমন একটি যার দু'টো অর্থ রয়েছে, শব্দ দ্বারা একটি অর্থ মুরাদ নেওয়া আর তার ضمير ফিরিয়ে আরেকটি অর্থ মুরাদ নেওয়া। যেমন– اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ -এর মধ্যে الماء দ্বারা جنس ماء মুরাদ নিয়ে পানি পাক হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল দেওয়া হয়েছে আর لَايُنَجِّسُهُ -এর ضمير ফিরিয়ে বীরে বুযা'আর পানি মুরাদ নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, بضاعة বুযা'আ ضمه এর সাথে এবং বিযা'আ كسره -এর সাথে উভয়ভাবেই এর ব্যবহার রয়েছে। (সিহাহ) مغرب -এর মধ্যে শুধু ضمه -এর সাথে আনা হয়েছে। বীরে বুযা'আ মদীনা শরীফের বহু পুরাতন একটি কূপ তার মধ্যে অনেক পানি ছিল। কেউ কেউ বলেন, ঐ কূপটি আটগজ লম্বা এবং আটগজ চওড়া ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত ঐ কূপ থেকে পাঁচ অথবা সাতটি বাগানে পানি দেওয়া হতো। .

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পেশকৃত হাদীসে قلتين-এর জবাব হচ্ছে— সনদের দিক থেকে হাদীসটি ضعيف ইমাম আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনে আশয়'আস আস্‌সাজিস্‌তানী (র.) হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী (র.)-এর উস্তাদ আল্লামা আলী ইবনে মাদীনী (র.) বলেছেন, لَمْ يَثْبُتْ حَدِيْثُ الْقُلَّتَيْنِ। এমনিভাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত ইবনে যুবায়ের (রা.) যমযম কূপে এক হাবশী পড়ে মরে যাওয়ায় যমযমের পানি বের করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি حديث قلتين সহীহ হতো তবে অন্যান্য সাহাবী এবং তাবিয়ীগণ তাদের উভয়ের বিরুদ্ধে হাদীসে قلتين দ্বারা দলিল দিতেন। তাই حَدِيْثُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ -এর মতো حديث قلتين ও দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

তা ছাড়া হাদীসের মূল متن -এও اضطراب রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ اَوْثَلَاثًا কোনো বর্ণনায় اَرْبَعِيْنَ قُلَّةً কোনো বর্ণনায় اَرْبَعِيْنَ غَرْبًا আবার কোনো বর্ণনায় اَرْبَعِيْنَ دَلْوًا রয়েছে। এমনিভাবে দ্বিতীয় অংশ কোনো বর্ণনায় لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْئٌ কোনো বর্ণনায় لم ينجس কোনো বর্ণনায় لَايَحْمِلِ الْخَبَثَ আবার কোনো বর্ণনায় يَحْمِلْ خَبَثًا রয়েছে। উল্লেখ্য যে, متن -এর মধ্যে اضطراب হওয়া ضعيف হওয়ার কারণ, رجال যতই মজবুত হোক না কেন, সর্বোপরি উপরোক্ত হাদীসের সনদেও اضطراب বিদ্যমান। قلة-এর অর্থেও অস্পষ্টতা রয়েছে। কেননা قلة শব্দটি কখনো قامت رجل মানুষের দেহের গঠন কখনো رأس جبل পাহাড়ের চূড়া, কখনো লোটা, আবার কখনো মটকার অর্থে ব্যবহার হয়। যেমনিভাবে لَايَحْمِلُ خَبَثًا -এর অর্থ ইমাম শাফি'ঈ (র.) করেছেন যে, দুই মটকা পরিমাণ পানি হলে পানি নাপাক হয় না। এমনিভাবে এ অর্থও মুরাদ নেওয়া যেতে পারে যে, নাপাকি বরদাশ্‌ত করার ব্যাপারে দুর্বল অর্থাৎ নাপাক হয়ে যায়। মোদ্দাকথা, উক্ত হাদীসে যেহেতু বহু اضطراب এবং বহু احتمال বিদ্যমান কাজেই এ হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না।

وَالْمَاءُ الْجَارِى إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ جَازَ الْوُضُوءُ بِهِ إِذَا لَمْ يُرَ لَهَا أَثَرٌ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ مَعَ جَرَيَانِ الْمَاءِ وَالْأَثَرُ هُوَ الطَّعْمُ أَوِ الرَّائِحَةُ أَوِ اللَّوْنُ وَالْجَارِى مَا لَا يَتَكَرَّرُ اسْتِعْمَالُهُ وَقِيلَ مَا يَذْهَبُ بِتِبْنَةٍ وَالْغَدِيرُ الْعَظِيمُ الَّذِى لَا يَتَحَرَّكُ أَحَدُ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِيكِ الطَّرَفِ الْآخَرِ إِذَا وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ فِى أَحَدِ جَانِبَيْهِ جَازَ الْوُضُوءُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ النَّجَاسَةَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ إِذْ أَثَرُ التَّحْرِيكِ فِى السِّرَايَةِ فَوْقَ أَثَرِ النَّجَاسَةِ ثُمَّ عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ (رحـ) أَنَّهُ يَعْتَبِرُ التَّحْرِيكَ بِالْإِغْتِسَالِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِى يُوسُفَ (رحـ) وَعَنْهُ بِالتَّحْرِيكِ بِالْيَدِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) بِالتَّوَضِّى وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ فِى الْحِيَاضِ أَشَدُّ مِنْهَا إِلَى التَّوَضِّى وَبَعْضُهُمْ قَدَّرُوا بِالْمَسَاحَةِ عَشْرًا فِى عَشْرٍ بِذِرَاعِ الْكِرْبَاسِ تَوْسِعَةً لِلْأَمْرِ عَلَى النَّاسِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَالْمُعْتَبَرُ فِى الْعُمْقِ أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يَنْحَسِرُ بِالْإِغْتِرَافِ هُوَ الصَّحِيحُ وَقَوْلُهُ فِى الْكِتَابِ جَازَ الْوُضُوءُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَنْجُسُ مَوْضِعُ الْوُقُوعِ وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ (رحـ) أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ إِلَّا بِظُهُورِ النَّجَاسَةِ فِيهِ كَالْمَاءِ الْجَارِى ـ

অনুবাদ ঃ প্রবহমান পানিতে নাজাসাত পড়লে সে পানি দ্বারা অজু জায়েজ। যদি তাতে নাজাসাতের কোনো আলামত দেখা না যায়। কেননা পানির প্রবাহের কারণে তা স্থির থাকে না। আর আলামত হলো স্বাদ গন্ধ বা বর্ণ। প্রবহমান ঐ পানিকে বলা হয় যা পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে আসে না। কেউ কেউ বলেন, যা খড়কুটা ভাসিয়ে নেয়। এক পার্শ্ব নাড়া দিলে অপর পার্শ্বের পানি তরঙ্গায়িত হয় না এমন বড় পুকুরের এক পার্শ্বে নাজাসাত পড়লে অপর পার্শ্বে অজু করা জায়েজ। কেননা এটাই স্বাভাবিক যে, এতে অপর পার্শ্বে নাজাসাত পৌঁছবে না। কারণ ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে তরঙ্গের প্রভাব নাজাসাতের প্রভাবের চেয়ে বেশি। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি গোসলের দ্বারা সৃষ্ট তরঙ্গ গ্রহণ করেন। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এরও অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে অন্য এক বর্ণনায় আছে হাত দিয়ে নাড়ার তরঙ্গ গ্রহণ করেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তিনি অজু দ্বারা সৃষ্ট তরঙ্গ গ্রহণ করেন।

প্রথম মতের যুক্তি হলো — হাউজ ও পুকুরে অজুর তুলনায় গোসলের প্রয়োজনই বেশি। কোনো কোনো ফকীহ বিষয়টিকে সাধারণ মানুষের জন্য সহজ করার উদ্দেশ্যে মাপের দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ কাপড় মাপার হাতে দশ দশ হাত (চতুর্দিকে) হতে হবে। এর উপরই ফতোয়া। গভীরতার ক্ষেত্রে বিবেচ্য এই যে, তা এমন পরিমাণ হবে যে, অঞ্জলি ভরে পানি তোলার সময় তলা জেগে উঠবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত। মূল কিতাবের এ কথা, অন্য পার্শ্বে অজু জায়েজ হবে, ইঙ্গিত করে যে, নাজাসাত পড়ার স্থান নাপাক হয়ে যাবে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, উক্ত স্থানও নাপাক হবে না। যতক্ষণ না নাজাসাত প্রকাশ পায়, যেমন প্রবহমান পানির হুকুম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি প্রবহমান পানিতে নাজাসাত পড়ে তবে তা দ্বারা অজু জায়েজ। কিন্তু শর্ত হলো তাতে নাজাসাতের কোনো আলামত না থাকা চাই। নাজাসাত দৃশ্যমান হোক বা অদৃশ্যমান হোক। দলিল হলো, পানির প্রবাহের কারণে নাজাসাত স্থির থাকতে পারে না। তাই নাজাসাত পড়ার পরও প্রবহমান পানি পাক থাকে। নাজাসাতের আলামত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার স্বাদ, গন্ধ বা বর্ণ।

উল্লেখ্য যে, প্রবহমান পানির সংজ্ঞায় ফুকাহাগণের ইখতিলাফ রয়েছে। কোনো কোনো ফকীহ বলেন, প্রবহমান পানি হলো যা পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে আসে না। যেমন কেউ নালা থেকে পানি নিয়ে হাত ধৌত করল, ধৌত করা পানি নালায় পড়ল, দ্বিতীয় বার অতঃপর নালা থেকে পানি নেওয়া হলো তখন প্রথম পানি থেকে নেওয়া হলো না। কেননা প্রথম পানি প্রবাহিত হয়ে চলে গেছে। কেউ বলেন, প্রবহমান পানি হলো যা শুষ্ক খড়কুটা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কেউ কেউ বলেন, কোনো ব্যক্তি প্রস্থের দিক থেকে পানিতে হাত দিলে পানির প্রবাহ বন্ধ হয় না সেটি হলো প্রবহমান পানি। কেউ কেউ বলেন, মানুষ যাকে ماء جاري বলে সেটিই প্রবহমান পানি।

وَالْغَدِيْرُ الْعَظِيْمُ الخ : হানাফী আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি পানির এক অংশ অপর অংশের সাথে মিলে যায় তবে তা অল্প পানি, আর যদি না মিলে তাহলে অধিক পানি। তবে কমবেশি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ইখতিলাফ রয়েছে। متقدمين حنفية বলেন, এক পার্শ্ব নাড়া দিলে অপর পার্শ্বের পানি তরঙ্গায়িত না হলে বড় পুকুর বা বেশি পানি; আর তঙ্গায়িত হলে কম পানি। নাড়া দেওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পানি উপর নিচ হওয়া। কেননা পানি বেশি হলে উঁচু হয়ে নড়ে। বুদ্বুদের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কেননা অল্প পানি নাড়া দিলেও বুদ্বুদ পয়দা হয়ে যায়। অতঃপর তাদের মাঝে নাড়ার কারণ নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, গোসলের দ্বারা সৃষ্ট তরঙ্গ ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ কেউ যদি পুকুরের এক পার্শ্ব দিয়ে মাঝারি ধরনের গোসল করে আর এর দ্বারা দ্বিতীয় পার্শ্ব না নড়ে তবে এটা বড় পুকুর বলে বিবেচিত হবে। আর যদি অন্য পার্শ্ব নড়ে তবে এটা বড় পুকুর বলে গণ্য হবে না। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এরও অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে অন্য একটি বর্ণনায় বলেন, তিনি হাত দিয়ে নাড়া দেওয়ার বিষয়টি اعتبار করেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে অজু দ্বারা সৃষ্ট তরঙ্গ ধর্তব্য হবে। প্রথম মতের যুক্তি হলো— হাউজ এবং পুকুরে অজুর তুলনায় গোসলের প্রয়োজনই বেশি পরিলক্ষিত হয়। কেননা অজু সাধারণত ঘরেই করা হয় আর গোসল হাউজে করা হয়। এ জন্য গোসল দ্বারা সৃষ্ট তরঙ্গ মুরাদ নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় মতের যুক্তি হলো– হাত নাড়ার তরঙ্গ অজু দ্বারাও হয় আবার হাত ধোয়ার দ্বারাও হয়, তবে হাত ধোয়ার দ্বারা যে তরঙ্গ হয় তা অন্যান্য নাড়ার তুলনায় হালকা। তাই জন সাধারণের জন্য সহজ করার উদ্দেশ্যেই উক্ত মত গ্রহণ করা হয়েছে। তৃতীয় মতের যুক্তি হলো, মাঝারি ধরনের নাড়াকে গ্রহণ করা হবে। আর মাঝারি ধরনের নাড়া হলো যা অজু দ্বারা সৃষ্টি হয়। তাই এই মতকে গ্রহণ করা হয়েছে। متاخرين حنفيه বলেন, এক পার্শ্বের পানি অন্য পার্শ্বে পৌঁছা নাড়া ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে জানতে হবে। তাই কোনো কোনো মুতায়াখ্খিরীনে হানাফিয়া বলেন, মাটির বর্ণের হিসাব হবে অর্থাৎ পুকুরের এক পার্শ্বে গোসল করায় পানিতে মাটির বর্ণ এসে গেছে আর এ বর্ণ যদি অন্য পার্শ্বে পৌঁছে যায় তাহলে ماء قليل বিবেচিত হবে। আর যদি না পৌঁছে তবে ماء كثير হবে।

আবূ হাফ্স কাবীর (র.) থেকে বর্ণিত যে, এ ক্ষেত্রে রং এর বিষয়টি ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ যদি পুকুরের এক পার্শ্বে জাফরান ঢেলে দেওয়া হয়, আর অন্য পার্শ্বে তার রং পৌঁছে যায় তবে ماء قليل নতুবা ماء كثير বলে গণ্য হবে। আবূ সুলাইমান জুয্জানী (র.) পরিমাপের দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ কাপড় মাপার হাতে চতুর্দিকে দশ দশ হাত হলে ماء كثير কম হলে ماء قليل হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যদি পানির হাউজ আমার এই মসজিদের সমপরিমাণ হয় তবে ماء كثير হবে আর যদি কম হয় তাহলে ماء قليل হবে। হাউজ মাপার পর কোনো কোনো বর্ণনায় চতুর্দিকে আট আট হাত অন্য বর্ণনায় চতুর্দিকে দশ দশ হাত ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, হাউজের ভিতরে আট আট হাত করে আর বাহিরে দশ দশ হাত ছিল। মোটকথা, মাশায়েখগণ আবূ সুলাইমান জুয্জানী (র.)-এর মতকে গ্রহণ করেছেন। হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, মানুষের জন্য সহজ করার উদ্দেশ্যে মাপের দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণকে গ্রহণ করা হয়েছে।

গভীরতার ক্ষেত্রে বিবেচ্য হলো এই যে, পানি এমন পরিমাণ হতে হবে যাতে অঞ্জলি ভরে পানি তোলার সময় পানির তলা জেগে না উঠে। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কেউ কেউ বলেছেন সর্বনিম্ন এক হাত হওয়া জরুরি। কেউ কেউ দুই হাত হওয়াকে গ্রহণ করেছেন। আবার কোনো কোনো ফকীহ্ এক বিঘত হওয়াকে ধরে নিয়েছেন। হিদায় গ্রন্থকার বলেন, কুদূরী কিতাবের এ কথা বড় পুকুরের অন্য পার্শ্বে অজু জায়েজ হবে ইংগিত করে যে, যে স্থানে নাজাসাত পড়ে তা নাপাক হয়ে যাবে। নাজাসাত দৃশ্যমান হোক বা অদৃশ্যমান হোক। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাজাসাত পড়ার স্থানও নাপাক হবে না, যতক্ষণ না নাজাসাত প্রকাশ পায়। যেমন প্রবহমান পানির হুকুম।

قَالَ وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَايُنَجِّسُهُ كَالْبَقِّ وَالذُّبَابِ وَالزَّنَابِيْرِ وَالْعَقْرَبِ وَنَحْوِهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يُفْسِدُهُ لِأَنَّ التَّحْرِيْمَ لَا بِطَرِيْقِ الْكَرَامَةِ اٰيَةٌ لِلنَّجَاسَةِ بِخِلَافِ دُوْدِ النَّحْلِ وَسُوْسِ الثِّمَارِ لِأَنَّ فِيْهِ ضَرُوْرَةً وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْهِ هٰذَا هُوَ الْحَلَالُ اَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَالْوُضُوْءُ مِنْهُ وَلِأَنَّ الْمُنَجِّسَ اِخْتِلَاطُ الدَّمِ الْمَسْفُوْحِ بِاَجْزَائِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ حَتّٰى حَلَّ الْمُذَكّٰى لِانْعِدَامِ الدَّمِ فِيْهِ وَلَادَمَ فِيْهَا وَالْحُرْمَةُ لَيْسَتْ مِنْ ضَرُوْرَتِهَا النَّجَاسَةُ كَالطِّيْنِ ـ

অনুবাদ ঃ মশা, মাছি, ভিমরুল, বিচ্ছু ইত্যাদি যে সকল প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত নেই সেগুলোর মৃত্যুর দ্বারা পানি নাপাক হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, (এগুলোর মৃত্যু) পানিকে নষ্ট করে দেবে। কেননা সম্মানার্থে না হয়ে অন্য কারণে যা হারাম এ হুরমত নাজাসাতের আলামত। তবে মৌমাছি ও ফলের পোকার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা এগুলোর প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের দলিল হলো, এ ধরনের পানি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এটা খাওয়া ও পান করা এবং তা দ্বারা অজু করা জায়েজ। অথবা এ জন্যে যে, পশু মরার সময় তার প্রবাহিত নাপাক রক্ত পশুর শরীরের اجزاء -এর সাথে মিশে যায়; এটিই মূলত منجس এ কারণেই জবাইকৃত পশু হালাল। কেননা তার থেকে রক্ত দূরীভূত হয়ে গেছে। আর এ সকল পশুর মধ্যে রক্তই নেই। (ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর জবাব হলো— হারাম হওয়ার জন্য নাজাসাত জরুরি নয়। যেমন মাটি হারাম অথচ তা নাজিস নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা ঃ যে সকল প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত নেই সেগুলোর মৃত্যুর দ্বারা পানি নাপাক হবে না। যেমন— মশা, মাছি, ভিমরুল এবং বিচ্ছু ইত্যাদি। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, এ সকল প্রাণীর মৃত্যুর দ্বারাও পানি নাপাক হয়ে যাবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো— এ সকল প্রাণী হারাম, কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

তোমাদের উপর মৃত্যুপ্রাণী হারাম করা হয়েছে। আর হারাম করা যদি সম্মানার্থে না হয় তবে এটি নাজাসাতের আলামত। لَابِطَرِيْقِ الْكَرَامَةِ দ্বারা মানুষকে নাজাসাতের হুকুম থেকে খারিজ করা হয়েছে। কেননা মানুষ যদি জুনুবী না হয়ে পানিতে মারা যায় তবে এর দ্বারা পানি নাপাক হবে না। কেননা মানুষকে হারাম করা হয়েছে তার সম্মানের জন্য, নাজাসাতের জন্যে নয়। যদি মৌমাছির বাচ্চা মধুতে মারা যায় অথবা ফলের পোকা ফলের মধ্যে মারা যায় এতে মধু ও ফল নাপাক হবে না। দলিল হলো, কিয়াস অনুযায়ী এ সকল জিনিসও নাপাক হয়ে যাওয়ার কথা তবে এগুলোতে মানবীয় চাহিদা বিদ্যমান থাকায় পাক বলা হয়েছে।

আমাদের প্রথম দলিল—

عَنْ سَلْمَانَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ اِنَاءٍ فِيْهِ طَعَامٌ اَوْ شَرَابٌ يَمُوْتُ فِيْهِ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ فَقَالَ هٰذَا هُوَ الْحَلَالُ اَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَالْوُضُوْءُ مِنْهُ (الكفايه)

দারা কুতনী গ্রন্থে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত আছে,

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَا سَلْمَانُ كُلُّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فِيهِ فَهُوَ حَلَالٌ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَ وُضُوئُهُ -(الدار قطني)

সনদ বিশ্লেষণ : جوهرنقى-এর গ্রন্থকার বলেন দারু কুতনী উপরোক্ত হাদীসের রাবী بقيه بن الوليد -কে ضعيف বলেছেন। আর অন্য একজন রাবী سعيد بن ابى سعيد زبيدى-কে علامه ابن عدى، مجهول বলেছেন। এর জবাবে আল্লামা আইনী ও আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, এই بقيه بن الوليد থেকে حمادبن اسحاق، راهويه ، اوزاعى ، ابن المبارك ، ابن عيينه ، يزيد بن هارون ، وكيع এবং شعبه প্রমুখের মতো মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসে নকল করেছেন। يحيى بن معين বলেন, بقيه بن الوليد যখন বাগদাদ এসেছিল তখন شعبه তার অনেক তাজিম করেছেন। ইমাম বুখারী ব্যতীত صحاح سته-এর সকল মুহাদ্দিসীনে কেরাম তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস তাদের কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন। سعيد بن ابى سعيد সম্পর্কে আল্লামা خطيب بغدادى (رحـ) বলেন, তার পিতার নাম عبد الجبار তিনি শায়খ এবং ثقه রাবী, অহেতুকভাবে তাকে مجهول الحال বলা হয়।

আমাদের দ্বিতীয় দলিল—

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِى شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِى إِحْدٰى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِى الْأُخْرٰى شِفَاءً . (بخارى)

উপরোক্ত হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওয়ার পাত্রে মাছি ডুবিয়ে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন, অনেক সময় খানা গরম থাকে আর তাতে মাছি অবশ্যই মারা যায়। এখন পানিতে মাছি মারা গেলে যদি পানি নাপাক হয়ে যেতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের নির্দেশ দিতেন না। মাছির ন্যায় অন্যান্য প্রাণীর হুকুমও এক পর্যায়ের হবে, যা دلالة النص বা اجماع দ্বারা প্রমাণিত। —(বাহ্রুর রায়েক)

আমাদের আকলী দলিল, পানি নাপাক করে এমন প্রাণীর মৃত্যুর সময় প্রবাহিত রক্ত পানির সাথে মিশে যায়। এ কারণেই তো জবাইকৃত পশু হালাল এবং পাক। কেননা তার থেকে প্রবাহিত রক্ত বিদূরিত হয়ে যায়। উপরে যে সকল প্রাণীর আলোচনা হয়েছে সে গুলোর মধ্যে তো প্রবাহিত রক্ত-ই নেই। তাই এগুলোর মৃত্যুর দ্বারা পানি নাপাক হবে না।

وَالْحُرْمَةُ لَيْسَتْ দ্বারা ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর জবাব দেওয়া হয়েছে। হারাম হওয়ার জন্য নাজিস হওয়া জরুরি নয় অর্থাৎ যে জিনিস হারাম হবে তা নাজিসও হবে এমনটি অনিবার্য নয়। যেমন— মাটি, কয়লা ইত্যাদি সবগুলো হারাম কিন্তু নাজিস নয়।

وَمَوْتُ مَا يَعِيْشُ فِي الْمَاءِ فِيْهِ لَا يُفْسِدُهُ كَالسَّمَكِ وَالضِّفْدَعِ وَالسَّرْطَانِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يُفْسِدُهُ إِلَّا السَّمَكَ لِمَا مَرَّ وَلَنَا أَنَّهُ مَاتَ فِي مَعْدِنِهِ فَلَا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ كَبَيْضَةٍ حَالَ مُخُّهَا دَمًا وَلِأَنَّهُ لَادَمَ فِيْهَا إِذِ الدَّمَوِيُّ لَا يَسْكُنُ فِي الْمَاءِ وَالدَّمُ هُوَ النَّجَسُ وَفِي غَيْرِ الْمَاءِ قِيْلَ غَيْرُ السَّمَكِ يُفْسِدُهُ لِانْعِدَامِ الْمَعْدِنِ وَقِيْلَ لَا يُفْسِدُهُ لِعَدَمِ الدَّمِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَالضِّفْدَعُ الْبَحْرِيُّ وَالْبَرِّيُّ سَوَاءٌ وَقِيْلَ الْبَرِّيُّ يُفْسِدُ لِوُجُوْدِ الدَّمِ وَعَدَمِ الْمَعْدِنِ وَمَا يَعِيْشُ فِي الْمَاءِ مَا يَكُوْنُ تَوَالُدُهُ وَمَثْوَاهُ فِي الْمَاءِ وَمَائِيُّ الْمَعَاشِ دُوْنَ مَائِيِّ الْمَوْلِدِ مُفْسِدٌ ـ

অনুবাদ ঃ মাছ, ব্যাঙ, কাকড়া ইত্যাদি যা পানিতে থাকে, পানিতে এগুলোর মৃত্যু, পানি নষ্ট (নাপাক) করবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, পূর্বোল্লিখিত যুক্তির আলোকে মাছ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর মৃত্যু পানি নষ্ট করে দেবে। তার দালিল ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের দলিল এই যে, এগুলো নিজ উৎপত্তিস্থলে মারা গেছে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে নাজাসাতের হুকুম প্রয়োগ করা হবে না। যেমন– ডিমের কুসুম রক্তে পরিবর্তিত হলেও (তা নাপাক হয় না)। তা ছাড়া এগুলোর কোনো রক্ত নেই, কেননা রক্তবাহী প্রাণী পানিতে বাস করে না। আর রক্তই হলো নাজিস। পানি ছাড়া অন্য কিছুতে এগুলো মারা গেলে, কেউ বলেছেন মাছ ব্যতীত অন্যান্য জন্তু এ বস্তুকে নাপাক করে দেবে, সে সব গুলোর উৎপাত্তিস্থল না হওয়ার কারণে। আবার কেউ বলেছেন তা নষ্ট করবে না রক্ত না থাকার কারণে। এ মতই বিশুদ্ধ। জলজ ব্যাঙ এবং স্থল ব্যাঙ দু'টির হুকুম সমান। আর কেউ কেউ বলেছেন, স্থল ব্যাঙ পানি নষ্ট করে দেবে, কেননা এতে রক্ত বিদ্যমান এবং যেহেতু তা উৎপত্তিস্থলে মারা যায়নি। জলজ প্রাণী দ্বারা সে সকল প্রাণীকে বুঝায়, যার জন্ম ও বাস পানিতে। যে প্রাণী পানিতে অবস্থান করে কিন্তু জন্ম পানিতে নয় তা পানিকে নষ্ট করে দিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পানিতে থাকে এমন প্রাণী পানিতে মারা গেলে এতে পানি নাপাক হবে না। পানি কম বা বেশি হোক। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, মাছ ব্যতীত অন্যান্য জন্তু মারা গেলে তাতে পানি নাপাক হয়ে যাবে। তার দলিল উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, তাহ্‌রীম যদি সম্মানার্থে না হয় তবে তা নাজিস হওয়ার আলামত। আর যেহেতু এ সকল জন্তু হারাম তাই পানিতে মারা গেলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। এ স্থানে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর উপর প্রশ্ন হলো— كتاب الذبائح-এ বর্ণিত আছে যে, ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে ব্যাঙ ও কাকড়া খাওয়া হালাল, সুতরাং উপরোক্ত দলিল যথার্থ নয়? এর জবাবে বলা হয়েছে যে, كتاب الذبائح-তে বর্ণিত মতটি আসহাবে শাফি'ঈদের মত নয়। তারা উক্ত মতটি মানেন না। তাতো ইমাম নববী (র.) কর্তৃক ইমাম শাফি'ঈ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে সকল জন্তু পানিতে বাস করে আর সেগুলো যদি খাওয়া যায় তবে সেগুলোর মৃত্যু দ্বারা পানি নাপাক হবে না। আর যদি খাওয়া না যায় যেমন— ব্যাঙ ইত্যাদি; এগুলো কম পানি অথবা কোনো প্রবাহিত জিনিসের মধ্যে মারা গেলে এতে সে পানি বা ঐ জিনিসটি নাপাক হয়ে যাবে। একই ব্যাখ্যা কাকড়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে ব্যাঙ, কাকড়া ইত্যাদি হারাম হওয়া প্রবল।

আমাদের প্রথম দলিল ঃ জলজ প্রাণী যদি পানিতে মারা যায়, তবে তো সেগুলো নিজ উৎপত্তি স্থলেই মারা গেছে। এতে ঐ প্রাণী নিজ উৎপত্তিস্থলে থাকা অবস্থাই নাপাক হয়ে যাওয়া চাই। তবে এর উপর এ অবস্থায় নাপাক হওয়ার হুকুম দেওয়া যাবে না। কেননা উৎপত্তিস্থলেই যদি একে নাপাক হওয়ার হুকুম দেওয়া হয় তবে কোনো মানুষই আর পাক হতে পারবে না। কেননা মানুষের শিরায় নাপাক রক্ত রয়েছে। তাই নাপাকী যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপত্তিস্থলে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত একে নাপাক বলা যাবে না। যেমন ডিমের কুসুম রক্তে পরিবর্তিত হলেও উৎপত্তিস্থলে থাকা অবস্থায় একে নাপাক বলা যাবে না। এমনকি এ ধরনের ডিম পকেটে নিয়ে নামাজ পড়লেও নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে নাপাক যদি তার উৎপত্তিস্থলে না থাকে বরং বের হয়ে যায় তখন তাকে নাপাকের হুকুম দেওয়া যাবে। সুতরাং শিশি ভরা রক্ত পকেটে নিয়ে যদি নামাজ পড়া হয় তবে নামাজ জায়েজ হবে না। কেননা শিশি নাপাকের উৎপত্তিস্থল নয়। মোদ্দাকথা, জলজ প্রাণী পানিতে মারা গেলে পানি নাপাক হবে না। কারণ এটা তার উৎপত্তিস্থল।

আমাদের দ্বিতীয় দলিল ঃ মূলত প্রবাহিত রক্ত হলো নাপাক, আর রক্তের প্রকৃতি হলো গরম, পানির প্রকৃতি হলো ঠাণ্ডা, উভয়ের মাঝে পার্থক্য বিরাজমান। তাই রক্তবাহী প্রাণী পানিতে বাস করতে পারে না। আর যেগুলো পানিতে বাস করে সে গুলোতে রক্ত নেই। তা ছাড়া রক্তের বর্ণ রোদ্রে কালো হয়ে যায়। আর জলজ প্রাণী থেকে যে জিনিস বের হয় তা রোদ্রে সাদা বর্ণ ধারণ করে। বুঝা গেল জলজ প্রাণীতে রক্ত নেই। তাই রক্ত না থাকায় এগুলো পানিতে মারা গেলে পানি নাপাক হবে না। পানি বেশি হোক বা কম হোক।

জলজ প্রাণী পানি ছাড়া অন্য কিছুতে মারা গেলে যেমন সিরকা, দুধ ইত্যাদি, এতে ইখতিলাফ রয়েছে। কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, মাছ ব্যতীত অন্য প্রাণী একে নাপাক করে দেবে। কেননা এগুলো উৎপত্তিস্থলে মরেনি। আবার কেউ কেউ বলেছেন নাপাক করবে না। কেননা এগুলোতে রক্ত নেই; অথচ রক্তই হলো নাজিস। হিদায়া গ্রন্থকার দ্বিতীয় মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আর বলেছেন, জলজ ব্যাঙ বা স্থল ব্যাঙ উভয়টির হুকুম সমান। উভয়টি মরার দ্বারা পানি নাপাক হবে না। জলজ ব্যাঙ ও স্থল ব্যাঙ এর মধ্যে পার্থক্য হলো জলজ ব্যাঙের আঙ্গুলের মাঝখানে হাসের ন্যায় পাতলা চামড়া থাকে। স্থল ব্যাঙের মধ্যে এমনটি থাকে না। কোনো কোনো ফকীহ্ বলেন, স্থল ব্যাঙের পানিতে মারা যাওয়ার দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যাবে। কেননা এগুলোতে রক্ত বিদ্যমান আছে।

জলজ প্রণীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যে প্রাণীর জন্ম ও বাস পানিতে তা জলজ প্রাণী, আর যে প্রাণী পানিতে অবস্থান করে কিন্তু জন্ম পানিতে নয় সেগুলোর মৃত্যু দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যাবে।

قَالَ : اَلْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لَا يُطَهِّرُ الْاَحْدَاثَ خِلَافًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ (رحـ) هُمَا يَقُوْلَانِ اِنَّ الطَّهُوْرَ مَا يُطَهِّرُ غَيْرَهُ مَرَّةً بَعْدَ اُخْرٰى كَالْقَطُوْعِ وَقَالَ زُفَرُ وَهُوَ اَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) اِنْ كَانَ الْمُسْتَعْمِلُ مُتَوَضِّيًا فَهُوَ طَهُوْرٌ وَاِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَهُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُوْرٍ لِاَنَّ الْعُضْوَ طَاهِرٌ حَقِيْقَةً وَبِاِعْتِبَارِهٖ يَكُوْنُ الْمَاءُ طَاهِرًا لٰكِنَّهٗ نَجِسٌ حُكْمًا وَبِاِعْتِبَارِهٖ يَكُوْنُ الْمَاءُ نَجِسًا فَقُلْنَا بِاِنْتِفَاءِ الطَّهُوْرِيَّةِ وَبَقَاءِ الطَّهَارَةِ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ هُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُوْرٍ لِاَنَّ مُلَاقَاةَ الطَّاهِرِ الطَّاهِرَ لَاتُوْجِبُ التَّنَجُّسَ اِلَّا اَنَّهٗ اُقِيْمَتْ بِهٖ قُرْبَةٌ فَتَغَيَّرَتْ بِهٖ صِفَتُهٗ كَمَالِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَاَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) هُوَ نَجِسٌ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَايَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَايَغْتَسِلَنَّ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لِاَنَّهٗ مَاءٌ اُزِيْلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ فَيُعْتَبَرُ بِمَاءٍ اُزِيْلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ الْحَقِيْقِيَّةُ ثُمَّ فِىْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) نَجَاسَةٌ غَلِيْظَةٌ اِعْتِبَارًا بِالْمُسْتَعْمَلِ فِى الْحَقِيْقِيَّةِ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُهٗ نَجَاسَةٌ خَفِيْفَةٌ لِمَكَانِ الْاِخْتِلَافِ ـ

অনুবাদ ঃ ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ব্যবহৃত পানি হাদাস থেকে পবিত্রতা দান করে না। ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফি'ঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, (কুরআনে বর্ণিত) طهور বলা হয় এমন জিনিসকে যা অন্যকে বারবার পাক করতে পারে, যেমন قطوع বলা হয় এমন জিনিসকে যা বারবার কর্তন করতে সক্ষম। ইমাম যুফার (র.) বলেন, এবং এটা ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এরও দ্বিতীয় অভিমত। পানি ব্যবহারকারী ব্যক্তি যদি অজু অবস্থায় থেকে থাকে তাহলে তার ব্যবহারকৃত পানি দ্বারা আবার তাহারাত হাসিল করা যাবে। আর যদি পানি ব্যবহারকারী ব্যক্তি অপবিত্র থেকে থাকে তাহলে তার ব্যবহারকৃত পানি পবিত্র থাকবে, কিন্তু পবিত্রকারী থাকবে না। কেননা অঙ্গ মূলত পবিত্র। সে হিসাবে পানি পবিত্র থাকা চাই। কিন্তু বিধান অনুযায়ী সে অঙ্গ নাপাক। সে হিসাবে পানি নাপাক হয়ে যাওয়া চাই। তাই উভয় অবস্থা বিবেচনা করে আমরা পানির পবিত্রকরণ গুণের বিলুপ্তি এবং পবিত্র থাকার পক্ষে মত পোষণ করেছি। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও বর্ণিত যে, ব্যবহৃত পানি পবিত্র কিন্তু পবিত্রকারী নয়। কেননা দুই পবিত্র বস্তুর সংস্পর্শ অপবিত্র হওয়ার কারণ হতে পারে না। তবে যেহেতু তা দ্বারা একটি ইবাদত আদায় করা হয়েছে সেহেতু তার গুণ পারিবর্তিত হয়ে গেছে। যেমন সাদাকার মাল।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এ পানি নাপাক। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে পেশাব না করে এবং তাতে জানাবাতের গোসল না করে। তাছাড়া এ পানি দ্বারা হুকমী নাজাসাত দূর করা হয়েছে। সুতরাং তা ঐ পানির সমতুল্য হবে, যা দ্বারা হাকীকী নাজাসাত দূর করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে ইমাম হাসান (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত মতে হাকীকী নাজাসাত দূর করার জন্য ব্যবহৃত পানির সমতুল্য গণ্য করে এ পানিও নাজাসাতে গলীযা (গুরু নাপাক) হিসেবে পরিগণিত হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত মতে এ পানি নাজাসাতে খাফীফা (লঘু নাপাক) হিসেবে পরিগণিত হবে। কেননা এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হিদায়া গ্রন্থকার ব্যবহৃত পানি সম্পর্কে তিনটি আলোচনা করেছেন, (এক) ব্যবহৃত পানির হুকুম। (দুই) ব্যবহৃত পানির হাকীকত বা সবব; (তিন) ব্যবহৃত পানির সময়। গ্রন্থকার এ স্থানে ব্যবহৃত পানির হুকুম সম্পর্কে সর্বাগ্রে আলোচনা করেছেন। মূলত এ আলোচনাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই সর্বাগ্রে এর আলোচনাটা এনেছেন। এই আলোচনার সারাংশ হলো এই যে, ব্যবহৃত পানি তিন প্রকার। যথা– (ক) এমন পানি যা পাক জিনিস ধোয়ার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন– শস্যাদি, শাক-সবজি, পাক কাপড় ইত্যাদি। এই পানি সর্বসম্মতিক্রমে পাক। (খ) এমন পানি যা নাজাসাতে হাকীকী দূর করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন– পেশাব পায়খানায় ব্যবহৃত পানি, নাপাক কাপড় ধোয়া পানি, এই পানি সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক। (গ) এমন পানি যা নাজাসাতে হুকমী দূর করণার্থে ব্যবহৃত হয়েছে; অথবা নৈকট্য অর্জন বা ছওয়াব লাভের আসায় ব্যবহৃত হয়েছে। এতে ওলামাদের ইখ্‌তিলাফ রয়েছে। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, ঐ পানি পাবিত্র এবং পবিত্রকারীও বটে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, পানি ব্যবহারকারী ব্যক্তি যদি অজু অবস্থায় থাকে এবং পুনরায় সে আবার অজু করে তবে তার ব্যবহৃত পানি নিজেও পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্রকারীও বটে। এটা ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এরও দ্বিতীয় মত।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এরও একটি মত, ব্যবহৃত পানি পবিত্র কিন্তু পবিত্রকারী নয়। শায়খাইন তথা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন, ব্যবহৃত পানি নাপাক। অতঃপর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) কর্তৃক বর্ণিত যে, ব্যবহৃত পানি নাজাসাতে গলীযা তথা গুরু নাপাক। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করে বলেন, ব্যবহৃত পানি নাজাসাতে খফীফা তথা লঘু নাপাক। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো— আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ماء مطلق -কে طهور বলেছেন, যেমন ইরশাদ হয়েছে وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا। এটা طهور-এর ওযনে- فَعُولٌ -এর মবালগা صيغه -এর صيغه। যার অর্থ বারবার পাক করা যেমন– قطوع -এর অর্থ বারবার কর্তন করা। সুতরাং বুঝা গেল যে, পানি দ্বারা একবার পবিত্রতা অর্জন করার পর তা দ্বারা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারও পবিত্রতা অর্জন করা যাবে। তাই বলা হয়েছে ماء مستعمل নিজেও পবিত্র এবং অন্যকেও পবিত্রকারী। মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (র.) উপরোক্ত দলিলের কয়েকটি জবাব প্রদান করেছেন—

(ক) طهور - فعول -এর ওযনে مبالغه -এর صيغة হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তা আমরা মানি না বরং - فعول - طهور -এর ওযনে مصدر যা طهارة -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে لَا صَلٰوةَ إِلَّا بِطَهُوْرٍ يَعْنِي بِطَهَارَةٍ. অন্য হাদীস مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ اَيِ الطَّهَارَةُ কুরআনুল কারীমের আয়াত سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا . اَيْ شَرَابًا طَاهِرًا। তা ছাড়া ইলমে নাহুর ইমামগণ যেমন সীবওয়াই, খলীল, মুবাররাদ, আসমা'য়ী এবং ইবনুস্ সাকীত (র.)-ও طهور -কে مصدر বলে অবিহিত করেছেন যেহেতু طهور -এর অর্থ পুনঃপুন পাক করা নয় তাই ব্যবহৃত পানিও مطهر হতে পারবে না।

(খ) দ্বিতীয় জবাব হলো— طهور ঐ জিনিসের নাম যার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয়। যেমন– سحور ঐ খানাকে বলা হয় যা সকাল বেলার কিছু পূর্বে খাওয়া হয়। সুতরাং এ হিসাবেও পানি বারবার পবিত্রকারী সাব্যস্ত হয় না।

(গ) তৃতীয় জবাব হলো— আমরা মেনে নিলাম যে, فعول -এর وزن - مبالغه -এর صيغة হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু طهور - لازم طهر لفظا থেকে مشتق হয়েছে, متعدى طهر থেকে নয়। এ হিসাবে طهور-এর অর্থ হবে খুব ভালভাবে পাক করা বারবার পাক নয়। মোট কথা مبالغه -এর صيغة যদি فعل لازم থেকে مشتق হয় তখন مبالغه فى الفاعل-এর জন্যে আসে, তার সাথে مفعول -এর কোনো সম্পর্ক থাকে না। আর যদি فعل متعدى থেকে مشتق হয় যেমন قطوع তখন مفعول -এর সাথেও সম্পর্ক থাকে। সুতরাং উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী পানি ভালভাবে পাক প্রতীয়মান আসে কিন্তু বারবার পাক করা প্রতীয়মান হয় না।—(সেকায়া)

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল, মুহ্দিস ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাহ্যত যদিও পাক কেননা বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনো নাজাসাত নেই কিন্তু শরিয়তের বিধান অনুযায়ী নাজিস। কেননা ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী মুহ্দিস ব্যক্তির অজু করা ফরজ। তাই ব্যবহৃত পানি প্রথমটির হিসেবে পাক আর দ্বিতীয়টির হিসেবে নাপাক। প্রকৃতপক্ষে একটিকে ছেড়ে অপরটির উপর আমল করার তুলনায় উভয়টির উপরই আমল করাই উত্তম। তাই আমরা উভয় অবস্থা বিবেচনা করে ব্যবহৃত পানিকে طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ তথা নিজে পবিত্র তবে অন্যকে পবিত্রকারী নয় বলেছি। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল, অজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পাক, পানিও পাক, আর পাক জিনিস পাক জিনিস-এর সাথে মিলিত হওয়া নাপাক হওয়ার কারণ নয়। তবে যদি পানি নৈকট্য অর্জন বা ইবাদত আদায়ের জন্য ব্যবহার করা হয় তাতে পানির গুণ পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন সাদাকা ও যাকাতের মাল। কেননা মাল মূলগতভাবে পাক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا তাদের সম্পদ হতে সদকা গ্রহণ করবে। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পাক করবেন এবং পরিশোধিত করবেন।— (৯. তাওবা - ১০৩)

যাকাত আদায়কৃত মালকে শরিয়ত ময়লা-আবর্জনা বলে আখ্যা দিয়েছে। তাই তো যাকাতের মাল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পরিবারবর্গকে দেওয়া জায়েজ নেই। এমনিভাবে পানি যখন নৈকট্য অর্জন বা নাপাকী দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন নাজাসাতে হুকমিয়ার কারণে পানি ময়লা হয়ে যায় এবং তার মূলরূপে অবশিষ্ট থাকে না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবহৃত পানি নিজে পবিত্র তবে অন্যের পবিত্রকারী নয়, তা ছাড়া এ কথাটিও স্বতঃসিদ্ধ যে সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যবহৃত পানির জন্য সর্বদা উদ্গ্রীব থাকতেন। নিজেদের শরীরে, মুখে মাখতেন। এখন পানি যদি নিজে নাপাক হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনটি করতে অবশ্যই বারণ করতেন, যেমন হযরত আবূ তায়্যিবা (রা.) (শিঙ্গা পাচারকারী)-কে তার শরীরের রক্ত পান করতে নিষেধ করেছেন। — (ইনায়া)

ব্যবহৃত পানি অন্যকে পবিত্র না করার এটাও দলিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম অনেক সময় সফর করেছেন। সফরে তাদের পানির প্রয়োজন হয়েছে তা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করার জন্য ব্যবহৃত পানি জমা করে রাখার আদেশ দেননি। বুঝা গেল যে, ব্যবহৃত পানি দ্বিতীয়বার পবিত্রকারী নয়। ব্যবহৃত পানি নাপাক হওয়ার উপর শায়খাইন (র.)-এর প্রথম দলিল হলো— রাসূলুল্লাহ ﷺ স্থির পানিতে যেমনিভাবে নাজাসাতে হাকীকিয়া তথা পেশাব করতে নিষেধ করেছেন এমনিভাবে নাজাসাতে হুকমিয়া তথা গোসল করা থেকেও নিষেধ করেছেন। বুঝা গেল পেশাব যেমনিভাবে স্থির পানিকে নাপাক করে দেয় এমনিভাবে গোসলও নাপাক করে দেয়।

দ্বিতীয় দলিল হলো— ব্যবহৃত পানি ঐ পানি যার দ্বারা নাজাসাতে হুকমিয়া দূর করা হয়েছে। সুতরাং এ পানিকে ঐ পানির সাথে কিয়াস করা হয়েছে যার দ্বারা নাজাসাতে হাকীকী দূর করা হয়েছে। আর যে পানি দ্বারা নাজাসাতে হাকীকী দূর করা হয় তা নাপাক সুতরাং ব্যবহৃত পানিও নাপাক। মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (র.) বলেন, কোনো মুসাফির যদি চরম পিপাসার্ত হয় এবং তার কাছে পানিও থাকে তবে তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েজ। যদি অজুতে ব্যবহৃত পানি পাক হতো মুসাফিরের জন্য এ বিধান থাকতো যে, পানি দ্বারা অজু করবে আর ব্যবহৃত পানি পান করার জন্য জমা করবে। বুঝা গেল যে, এ পানি নাপাক। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ব্যবহৃত পানি নাজাসাতে গলীযা হওয়ার উপর কিয়াস দ্বারা দলিল পেশ করেন। তিনি বলেন, যে পানি নাজাসাতে হাকীকিয়া দূরীকরণে ব্যবহৃত হয়েছে যেমনিভাবে এ পানি নাজাসাতে গলীযার হুকুমে এমনিভাবে যে পানি নাজাসাতে হুকমিয়া দূরীকরণে ব্যবহৃত হয়েছে তাও নাজাসাতে গলীযার হুকুমে হবে। ব্যবহৃত পানি নাজাসাতে খাফীফা হওয়ার উপর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) দলিল পেশ করেন যে, ব্যবহৃত পানি পাক-নাপাক হওয়ার ক্ষেত্রে ওলামাদের মতবিরোধ রয়েছে। আর ওলামাদের মতবিরোধ দ্বারা সহজ জিনিস বেরিয়ে আসে। তাই ব্যবহৃত পানি নাজাসাতে খফীফা-এর হুকুমে হবে, নাজাসাতে গলীযার হুকুমে হবে না।

وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ هُوَ مَاءٌ اُزِيْلَ بِهٖ حَدَثٌ اَوِ اسْتُعْمِلَ فِى الْبَدَنِ عَلٰى وَجْهِ الْقُرْبَةِ قَالَ هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَقِيْلَ هُوَ قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَيْضًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) لَايَصِيْرُ مُسْتَعْمَلًا اِلَّا بِاِقَامَةِ الْقُرْبَةِ لِاَنَّ الْاِسْتِعْمَالَ بِانْتِقَالِ نَجَاسَةِ الْاٰثَامِ اِلَيْهِ وَاِنَّهَا تُزَالُ بِالْقُرْبَةِ وَاَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) يَقُوْلُ اِسْقَاطُ الْفَرْضِ مُؤَثِّرٌ اَيْضًا فَيَثْبُتُ الْفَسَادُ بِالْاَمْرَيْنِ -

অনুবাদ ঃ ব্যবহৃত পানি অর্থ, যে পানি দ্বারা হাদাস দূর করা হয়েছে বা ছওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে শরীরে ব্যবহার করা হয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এরও মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, শুধু ছওয়াব হাসিলের নিয়তে পানি ব্যবহার করলেই সেই পানি ব্যবহৃত গণ্য হবে। কেননা গুনাহের নাজাসাত স্থানান্তরিত হওয়ার কারণেই পানি ব্যবহৃত সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর গুনাহ দূর হয় ছওয়াবের নিয়ত দ্বারা। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, (পানির মধ্যে) ফরজ সাকিত করারও প্রভাব রয়েছে। সুতরাং উভয় কারণেই (পানির) নষ্ট হওয়া সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে দ্বিতীয় বাহাছ তথা ব্যবহৃত পানির হাকীকত এবং সবব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শায়খাইন (র.)-এর মতে পানি ব্যবহৃত হওয়ার দু'টো সবব রয়েছে। (১) হাদাস দূর করার নিয়তে ব্যবহার করা, (২) নৈকট্য বা ছওয়াবের নিয়তে তা ব্যবহার করা। উভয়টি বা উভয়ের যে কোনো একটি পাওয়া গেলেই পানি ব্যবহৃত বলে পরিগণিত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পানি ব্যবহৃত হওয়ার মাত্র একটি সবব তথা নৈকট্য হাসিলের নিয়তে তা ব্যবহার করা। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে সবব একটি তথা হাদাস দূর করার নিয়তে তা ব্যবহার করা। সুতরাং কোনো অজুহীন ব্যক্তি যদি নৈকট্যতা বা ছওয়াব -এর ইরাদায় অজু করে তবে সর্বসম্মতিক্রমে পানি ব্যবহৃত বলে গণ্য হবে। আর যদি অজু ওয়ালা কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র ঠাণ্ডা হাসিলের জন্য অজু করে তবে সর্বসম্মতিক্রমে পানি ব্যবহৃত বলে গণ্য হবে না, যদি অজুহীন ব্যক্তি ঠাণ্ডা হাসিলের জন্য অজু করে তবে শায়খাইন ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে পানি ব্যবহৃত হয়ে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে পানি ব্যবহৃত হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে এ কারণে যে, উপরোক্ত অবস্থায় নৈকট্য ও ছওয়াবের নিয়ত ছিল না। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে এর কারণ হলো যে, নিয়ত ব্যতীত নাপাক দূর হয় না।

যদি কোনো বা-অজু ব্যক্তি নৈকট্য ও ছওয়াবের নিয়তে একবার অজু করার পর পুনরায় অজু করে তবে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পানি ব্যবহৃত হয়ে যাবে। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে ব্যবহৃত হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো— গুনাহের নাজাসাত স্থনান্তরিত হওয়ার কারণে পানি ব্যবহৃত হয়। আর এ নাজাসাত শুধু নৈকট্য ও ছওয়াবের নিয়ত দ্বারাই দূর করা যায়। বুঝা গেল যে, পানি কুরবত-এর নিয়ত ব্যতীত ব্যবহৃত হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, পানির মধ্যে ফরজ সাকিত করারও প্রভাব রয়েছে। মোটকথা শায়খাইন (র.)-এর মতে পানির গুণাগুণ তখনই পরিবর্তিত বলে গণ্য হবে যখন নাজাসাতে হুকমিয়া স্থান থেকে পৃথক হয়ে পানির দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। আর নাজাসাতে হুকমিয়া উপরোক্ত উভয় অবস্থায়-ই পানির দিকে স্থানান্তরিত হয়। তাই উভয় অবস্থায়ই পানি ব্যবহৃত বলে সাব্যস্ত হবে।

وَمَتٰى يَصِيْرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلاً اَلصَّحِيْحُ اَنَّهٗ كَمَا زَالَ عَنِ الْعُضْوِ صَارَ مُسْتَعْمَلاً لِاَنَّ سُقُوْطَ حُكْمِ الْاِسْتِعْمَالِ قَبْلَ الْاِنْفِصَالِ لِلضَّرُوْرَةِ وَلَا ضَرُوْرَةَ بَعْدَهٗ ـ وَالْجُنُبُ اِذَا انْغَمَسَ فِى الْبِئْرِ لِطَلَبِ الدَّلْوِ فَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَلرَّجُلُ بِحَالِهٖ لِعَدَمِ الصَّبِّ وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَهٗ لِاِسْقَاطِ الْفَرْضِ وَالْمَاءُ بِحَالِهٖ لِعَدَمِ الْاَمْرَيْنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) كِلَاهُمَا طَاهِرَانِ اَلرَّجُلُ لِعَدَمِ اِشْتِرَاطِ الصَّبِّ وَالْمَاءُ لِعَدَمِ نِيَّةِ الْقُرْبَةِ وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) كِلَاهُمَا نَجَسَانِ اَلْمَاءُ لِاِسْقَاطِ الْفَرْضِ عَنِ الْبَعْضِ بِاَوَّلِ الْمُلَاقَاةِ وَالرَّجُلُ لِبَقَاءِ الْحَدَثِ فِىْ بَقِيَّةِ الْاَعْضَاءِ وَقِيْلَ عِنْدَهٗ نَجَاسَةُ الرَّجُلِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَعَنْهُ اَنَّ الرَّجُلَ طَاهِرٌ لِاَنَّ الْمَاءَ لَا يُعْطٰى لَهٗ حُكْمُ الْاِسْتِعْمَالِ قَبْلَ الْاِنْفِصَالِ وَهُوَ اَوْفَقُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ ـ

অনুবাদ ঃ কখন পানি ব্যবহৃত রূপে গণ্য হবে? বিশুদ্ধমত হলো— (ধৌত) অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র তা ব্যবহৃত বলে গণ্য হবে। কেননা (পানি শরীর থেকে) বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে প্রয়োজনের তাগিদে পানির উপর "ব্যবহৃত" হওয়ার হুকুম দেওয়া হয় না। আর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর সে প্রয়োজন আর বাকি নেই। জুনুবী ব্যক্তি যদি বালতি তালাশ করার জন্য কূপের মধ্যে ডুব দেয় তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সে জুনুবী-ই থেকে যাবে। কেননা সে তার গায়ে পানি ঢালেনি। অথচ এটি তাঁর মতে ফরজ গোসল আদায় হওয়ার জন্য শর্ত। আর পানিও পূর্ব অবস্থায় পাক থাকবে। কেননা উভয় কারণই এখানে অনুপস্থিত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে (পানি ও মানুষ) উভয়ই পাক। লোকটি পবিত্র হয়ে গেল পানি ঢালার শর্ত না হওয়ার কারণে, আর পানি পবিত্র থাকল ছওয়াবের নিয়ত না থাকার কারণে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উভয়ই অপবিত্র। পানি এ কারণে অপবিত্র যে, (পানির সাথে) প্রথম সংস্পর্শের সাথে সাথেই শরীরের অংশ বিশেষ থেকে জানাবাত দূরীভূত করা হয়েছে। আর লোকটি অপবিত্র এজন্য যে, অবশিষ্ট অঙ্গে হাদাস বিদ্যমান রয়ে গেছে। আর কেউ কেউ বলেন, তাঁর মতে লোক অপবিত্র থাকার কারণ হলো "ব্যবহৃত" পানি অপবিত্র হওয়া। তাঁর থেকে বর্ণিত আরেকটি মত হলো– লোকটি পবিত্র হয়ে যাবে। কেননা (শরীর থেকে) বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে পানির উপর "ব্যবহৃত" হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয় না। তাঁর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বর্ণনা গুলোর মাঝে এটিই অধিক যুক্তিযুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে তৃতীয় বাহাছ তথা ব্যবহৃত পানির সময় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

হানাফী আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, পানি যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরের উপর বিরাজমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পানি ব্যবহৃত এর হুকুম দেওয়া হয় না। তবে তা যখন শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এখনো শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

কোনো স্থান বা পাত্রে অবস্থান না করার পূর্ব মুহূর্ত এর হুকুম কি হবে সম্পর্কে ওলামাগণের মতবিরোধ রয়েছে। সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখ্'ঈ এবং কোনো কোনো মাশায়েখে বলখ -এর মতে পানি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো স্থানে গিয়ে স্থির না হওয়া পর্যন্ত তা ব্যবহৃত বলে সাব্যস্ত হবে না। ইমাম তাহাবী (র.)-ও উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

হানাফীগণের মাযহাব হলো— পানি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথেই তা ব্যবহৃত বলে সাব্যস্ত হবে। কোনো স্থানে গিয়ে স্থির হওয়া ব্যবহৃত হওয়ার জন্য শর্ত নয়। এমনকি পানি শরীর থেকে পৃথক হয়ে যদি কোনো কাপড়ে লেগে যায় তবে শায়খাইনের মতে কাপড় নাপাক হয়ে যাবে। ফুকাহায়ে আহনাফ বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি মাথা মাসাহ করতে ভুলে যায়। অতঃপর সে দাড়ির আর্দ্রতা দিয়ে মাথা মাসাহ করে এতে মাসাহ জায়েজ হবে না। দলিল হলো— শরীর থেকে পৃথক হওয়ার আগে পানিকে ব্যবহৃত হওয়ার হুকুম জরুরতের কারণে দেওয়া হয়নি কিন্তু পৃথক হওয়ার পর কোনো জরুরত অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণে শরীর থেকে পৃথক হওয়ার সাথে সাথেই এর উপর ব্যবহৃত হওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

وَالْجُنُبُ إِذَا انْغَمَسَ الخ উপরোক্ত ইবারতে জুনুবী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন ব্যক্তি যার শরীরে নাজাসাতে হাকীকী নেই। আর কূপ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দশ বর্গগজ হাউজ থেকে কম হওয়া। এখন সুরতে মাসআলা হলো— কোন জুনুবী ব্যক্তি যদি বালতি তালাশ করার জন্য অথবা শরীরকে ঠাণ্ডা করার জন্য কূপে ডুব দেয়। কিন্তু তার শরীরে পানি (ভালভাবে) না লাগে, এতে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে লোকটি জুনুবী থেকে যাবে। আর পানি পূর্বের অবস্থায় পাক থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ব্যক্তি ও পানি উভয়ই পাক। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ব্যক্তি ও পানি উভয়ই নাপাক। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো— ফরজ আদায়ের জন্য শরীরের উপর পানি ঢেলে দেওয়া পূর্ব শর্ত; আর তা এখানে পাওয়া যায়নি। এ জন্য জুনুবী ব্যক্তির ফরজ আদায় হয়নি, তাই ব্যক্তিটি জুনুবী-ই থেকে যাবে। আর পানি পাক থাকার কারণ হলো— ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে পানি ব্যবহৃত বলে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য দু'টি কারণ রয়েছে। (১) হাদাস দূর বা (২) নৈকট্য বা ছওয়াব লাভের আশায় পানি ব্যবহার করা। উপরোক্ত সুরতে উভয় কারণ না পাওয়া যাওয়ায় পানি ব্যবহৃত বলে গণ্য হবে না, তাই পানি পূর্বের ন্যায় পাক থাকবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হচ্ছে— ফরজ আদায়ের জন্য শরীরে পানি ঢেলে দেওয়া শর্ত নয়। তাই শুধু ডুব দ্বারাই তার ফরজে জানাবাত সাকিত হয়ে যাবে বিধায় লোকটি পাক। আর পানি পাক হওয়ার কারণ হলো, লোকটি নৈকট বা ছওয়াব অর্জনের নিয়ত করেনি যা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পানি ব্যবহৃত বলে গণ্য হওয়ার জন্য শর্ত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো— পানি নাপাক এ কারণে যে, জুনুবী ব্যক্তির কিছু অঙ্গ পানিতে মিলায় ঐ অঙ্গের ফরজ আদায় হয়ে গেছে, তার দরুন পানিও ব্যবহৃত হয়ে গেছে। যদিও সে নিয়ত করেনি। কেননা জানাবাতের ফরজ সাকিত হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত নয়। আর ব্যক্তি এ কারণে নাপাক যে, তার কিছু কিছু অঙ্গে হাদাছ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। আর এই অবশিষ্ট অঙ্গগুলো নাপাক পানি দ্বারা পাক হবে না। কেউ কেউ বলেন, ব্যক্তি নাপাক থাকার কারণ হলো— ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ফরজ আদায়ের জন্য নিয়ত শর্ত নয়। তাই নিয়ত ছাড়াই তার ফরজ গোসল আদায় হয়ে গেছে। কিন্তু পানি ব্যবহৃত হয়ে যাওয়ার কারণে তার শরীর নাপাক হয়ে গেছে। এ মত অনুযায়ী জুনুবী ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে; তবে নামাজ আদায় করতে পারবে না। ইমাম আবূ হানীফার (র.) একটি বর্ণনা হলো— ব্যক্তি পাক হয়ে গেছে। কেননা পানি শরীর থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে ব্যবহৃত বলে গণ্য হয় না। সুতরাং যখন ঐ ব্যক্তি পানি থেকে পৃথক হলো তখন পানি ব্যবহৃত বলে সাব্যস্ত হলো। এরপর তো সে পানিতে আর ডুব দেয়নি। তাই সে পাকই থেকে গেল। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ বর্ণনা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উসূলের সাথে অধিক সম্পর্ক রাখে, তাই এ বর্ণনা প্রাধান্য পাবে।

قَالَ وَكُلُّ اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ جَازَتِ الصَّلٰوةُ فِيْهِ وَالْوُضُوْءُ مِنْهُ اِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيْرِ وَالْاٰدَمِيِّ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ وَهُوَ بِعُمُوْمِهٖ حُجَّةٌ عَلٰى مَالِكٍ (رح) فِيْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَلَا يُعَارَضُ بِالنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنِ الْاِنْتِفَاعِ مِنَ الْمَيْتَةِ وَهُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاتَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاِهَابٍ لِاَنَّهُ اِسْمٌ لِغَيْرِ الْمَدْبُوْغِ وَحُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) فِيْ جِلْدِ الْكَلْبِ وَلَيْسَ الْكَلْبُ نَجِسَ الْعَيْنِ اَلَا تَرٰى اَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهٖ حِرَاسَةً وَاصْطِيَادًا بِخِلَافِ الْخِنْزِيْرِ لِاَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ اِذِ الْهَاءُ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاِنَّهُ رِجْسٌ مُنْصَرِفٌ اِلَيْهِ لِقُرْبِهٖ وَحُرْمَةُ الْاِنْتِفَاعِ بِاَجْزَاءِ الْاٰدَمِيِّ لِكَرَامَتِهٖ فَخَرَجَا عَمَّا رَوَيْنَاهُ ثُمَّ مَايَمْنَعُ النَّتَنَ وَالْفَسَادَ فَهُوَ دَبَاغٌ وَاِنْ كَانَ تَشْمِيْسًا اَوْتَتْرِيْبًا لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ يَحْصُلُ بِهٖ فَلَا مَعْنٰى لِاشْتِرَاطِ غَيْرِهٖ ثُمَّ مَا يَطْهُرُ جِلْدُهٗ بِالدِّبَاغِ يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ لِاَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الدِّبَاغِ فِيْ اِزَالَةِ الرُّطُوْبَاتِ النَّجِسَةِ وَكَذٰلِكَ يَطْهُرُ لَحْمُهٗ وَهُوَ الصَّحِيْحُ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ مَاكُوْلًا ـــ

অনুবাদ ঃ শূকর ও মানুষের চামড়া ব্যতীত যে কোনো চামড়া দাবাগাত তথা পরিশোধন করা হলে তা পাক হয়ে যায়। তাতে সালাত আদায় করা এবং তা থেকে (তৈরি পাত্রের পানি দিয়ে) অজু করা জায়েজ। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে কোনো চামড়া পরিশোধন করা হলে, তা পাক হয়ে যায়।

এ হাদীসটি তার অর্থ– ব্যাপকতার ভিত্তিতে মৃত পশুর চামড়ার ব্যাপারে ইমাম মালিক (র.)-এর বিপক্ষে দলিল। আর মৃত পশুর চামড়া কাজে লাগানোর ব্যাপারে বর্ণিত নিষেধ বাণী, তোমরা দাবাগাত করে মৃত পশুর চামড়া দ্বারা উপকৃত হবে না। কে উপরোল্লিখিত হাদীসের বিপরীতে পেশ করা যাবে না। কেননা যে চামড়া দাবাগাত করা হয়নি, তাকেই اهاب বলা হয়।

অদ্রূপ আলোচ্য হাদীস কুকুরের চামড়ার ব্যাপারে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলিল। কেননা কুকুর (শূকরের মতো) সত্তাগতভাবে নাপাক নয়। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, পাহারা দেওয়া ও শিকার করার ক্ষেত্রে তার থেকে উপকার গ্রহণ করা হয়? আর শূকর হলো সত্তাগতভাবেই নাপাক। কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী فَاِنَّهُ رِجْسٌ (নিঃসন্দেহে তা নাজাসাত)-এর ها সর্বনামটি خنزير-এর দিকে راجع হয়েছে। কেননা এ সর্বনামের নিকটবর্তী শব্দ এটিই। মানব দেহের কোনো অংশ দ্বারা উপকার লাভ করা হারাম হওয়ার কারণ (নাপাকি নয় বরং) তার মর্যাদা ও কারামত। সুতরাং এ দু'টি আমাদের বর্ণিত হাদীসের আওতার বাইরে। যে প্রক্রিয়া দুর্গন্ধ ও পচন রোধ করে, তাকেই দাবাগত বা পরিশোধন করা বলে। চাই তা রোদে শুকিয়ে হোক বা মাটি মেখে হোক। কেননা মূল উদ্দেশ্য এতটুকুর দ্বারা অর্জিত হয়ে যায়। সুতরাং অন্য শর্ত আরোপ করার কোনো যুক্তি নেই। যে চামড়া দাবাগাত করলে পাক হয়, তা জবাই করার মাধ্যমেও পাক হয়। কেননা জবাই দ্বারা আর্দ্রতা দূর করার ক্ষেত্রে দাবাগত করার ক্রিয়া পাওয়া যায়। এরূপ জবাই দ্বারা গোশ্‌তও পাক হয়ে যায়। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। যদিও তা খাওয়া হালাল না হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِهَابٌ-এর হামযা যের-এর সাথে গঠিত হবে। বহুবচন أُهُبٌ ও آهِبَةٌ বিনায়া গ্রন্থকার লিখেছেন, দাবাগতের পর চামড়াটিকে اديم আর দাবাগাতের পূর্বে اهاب বলা হয়। جلد শব্দটি উভয়টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইনায়া গ্রন্থকার লিখেছেন, চামড়ার দাবাগাত-এর সাথে তিনটি মাসআলার সম্পর্ক রয়েছে। এক, চামড়াটি পাক হওয়া, দুই চামড়া দ্বারা পোশাক বা জায়নামাজ বানানো, তিন, চামড়া দিয়ে মশক বানিয়ে তা দ্বারা অজু করা। প্রথম মাস্‌আলাটির সম্পর্ক كِتَابُ الصَّيْدِ -এর সাথে, দ্বিতীয় মাসআলাটির সম্পর্ক كِتَابُ الصَّلٰوةِ-এর সাথে (যা সে, দুই অধ্যায়ে আলোচিত হবে) আর তৃতীয় মাসয়ালাটির সম্পর্ক উপরোক্ত অধ্যায়ের সাথে যা এখানে আলোচিত হয়েছে।

কুদূরী গ্রন্থকার وَالصَّلٰوةُ فِيْهِ বলেছেন, কিন্তু وَالصَّلٰوةُ عَلَيْهِ বলেননি? যদিও উভয়টির হুকুম একই। কারণ হলো— পোশাক-এর পবিত্রতা منصوص عليه তথা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত যেমন আল্লাহর বাণী وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ আর স্থান-এর পবিত্রতা এমনটি নয় বরং دلا لة النص দ্বারা সাবিত। এ জন্য কুদূরী গ্রন্থকার وَالصَّلٰوةُ فِيْهِ বলেছেন।

ইবারতের মধ্যে শূকর-এর আলোচনা মানুষের পূর্বে করা হয়েছে। কারণ হলো, এখানে নাজাসাত-এর আলোচনা হয়েছে যা অপমান জনক আলোচনা। আর অপমান জাতীয় আলোচনার স্থানে বিলম্বে বা পরে আলোচনা করার মধ্যে তা'যীম নিহিত থাকে। যেমন : আল্লাহর বাণী– لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ এর মধ্যে مساجد-এর আলোচনা পরে করা হয়েছে তাযীমের উদ্দেশ্যে।

উপরে বর্ণিত ইবারতের সুরতে মাসআলা হলো— আমাদের (হানাফীগণের) মতে শূকর আর মানুষের চামড়া ব্যতীত সকল চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পাক হয়ে যায়। যে ধরনের জিনিস দ্বারাই দাবাগাত করা হোক না কেন। তাতে সালাত আদায় করা বা তার মশকে পানি নিয়ে তা দ্বারা অজু করা জায়েজ। ইমাম মালিক (র.) বলেন, মৃতের চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পাক হয় না।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে কুকুরের চামড়াও দাবাগ্যাত দ্বারা পাক হয় না। مبسوط নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে غَيْرُ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ -এর চামড়া দাবাগ্যাত করার দ্বারা পাক হয় না।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল কিয়াস দ্বারা। অর্থাৎ যেমনিভাবে শূকরের চামড়া দাবাগ্যাত করার দ্বারা পাক হয় না এমনিভাবে কুকুরের চামড়াও পাক হবে না। অথবা مبسوط-এর বর্ণনা অনুযায়ী غَيْرُ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ-এর চামড়াও দাবাগাত করার দ্বারা পাক হবে না।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল নিম্নোক্ত হাদীস–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَتَبَ إِلٰى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ . (ابوداود . نسائى . ابن ماجه . ترمذى)

আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইম (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকালের একমাস পূর্বে জুহাইনা গোত্রের নিকট তিনি লিখলেন যে, তোমরা দাবাগতের পর মৃত পশুর চামড়া দ্বারা এবং তার রগ দ্বারা উপকার গ্রহণ করবে না।

উপরোক্ত হাদীস (أَنْ لَاتَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ) দ্বারা বুঝা গেল মৃতের চামড়া নাপাক।

আমাদের দলিল (১) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ (الترمذى . الموطأ لامام مالك . صحيح ابن حبان . مسند احمد)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে কোনো চামড়া দাবাগাত করা হলে তা পাক হয়ে যায়।

(২) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّتَوَضَّأَ مِنْ سِقَاءٍ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُ مَيْتَةٌ فَقَالَ دِبَاغُهُ يُزِيْلُ خَبَثَهُ اَوْ نَجَسَهُ اَوْ رِجْسَهُ .(ابن خزيمة "بيهقى" حاكم)

হযরত ইবনে আব্বাস (র.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি মশকের পানি দিয়ে অজু করতে চাইলেন, তখন তাকে বলা হলো, এটি মৃত জানোয়ারের চামড়া দ্বারা তৈরি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দাবাগাত কারার দ্বারা তার খুবুস (নাপাকি) তার নাজাসাত তার দুর্গন্ধ চলে গেছে। এ হাদীস দ্বারাও বুঝা গেল যে, মৃতের চামড়া দাবাগাত দ্বারা পাক হয়ে যায়।

(৩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ تُصُدِّقَ عَلٰى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُوْنَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلَّا اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ اِنَّمَا حَرُمَ اَكْلُهَا . (بخارى "مسلم" دار قطنى)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.)-এর আজাদকৃত দাসীকে একবার একটি বকরি সদকা দেওয়া হয়েছিল, কিছুদিন পর বকরিটি মারা যায়। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ সে দিক দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, মৃত বকরিটি দেখে তখন তিনি বললেন, এর চামড়াটি তোমরা কেন দাবাগাত (পাকা) করলে না? তাহলে তো তা তোমাদের কোনো উপকারে আসতো? লোকেরা বললেন, এটাতো মৃত। রাসূলুলুল্লাহ ﷺ বলেন, হারাম তো এর গোশত খাওয়া। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, اِنَّمَا حَرُمَ لَحْمُهَا وَ رُخِّصَ لَكُمْ فِىْ مَسْكِهَا তোমাদের উপর তো শুধু এর গোশত হারাম করা হয়েছে। তোমাদের জন্য তার চামড়া ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, اِنَّ دِبَاغَهُ طُهُوْرٌ তার দাবাগাত তাকে পাক করে দেয়।

(৪) عَنْ سَوْدَةَ (رضـ) قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَازِلْنَا نَنْبِذُ فِيْهِ حَتّٰى صَارَ شَنًّا ـ (بخارى)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা.) বলেন, আমাদের একটি বকরি মারা গিয়েছিল। আমরা এর চামড়া দাবাগাত করে নেই। তারপর আমরা তাতে নাবীযে তামার (খেজুর ভিজানো পানি) বানাতে থাকি এমনকি এক পর্যায়ে তা একেবারে পুরাতন হয়ে যায়।— (বুখারী) উপরোক্ত দলিল ছাড়াও হানাফীগণের আরো অনেক দলিল রয়েছে।

<u>ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর কিয়াস-এর জবাব :</u> কুকুরের চামড়াকে শূকরের চামড়ার উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী কুকুরের চামড়া نجس العين (মূলগত নাপাক) নয়। তার দলিল হলো, পাহারা বা শিকার করার জন্য কুকুর নিজের নিকট রাখা জায়েজ। কুকুর نجس العين হলে তার দ্বারা কোনোভাবেই উপকৃত হওয়া জায়েজ হতো না। তবে এ পর্যায়ে প্রশ্ন হয় যে, نجس العين দ্বারাও তো উপকৃত হওয়া যায়। যেমন গোবর نجس العين হওয়া সত্ত্বেও তার দ্বারা আগুন জ্বালানো বা জমিনের শক্তি যোগানোর কাজে ব্যবহার করা হয়; সুতরাং কুকুর দ্বারা উপকৃত হওয়া نجس العين না হওয়ার উপর দলিল কিভাবে হয়? এর জবাব হচ্ছে— গোবর দ্বারা অবশ্যই উপকৃত হওয়া যায়, তবে শর্ত হলো গোবরকে পরিপূর্ণ ভাবে হালাক করে দিতে হবে। আর نجس العين-কে পূর্ণভাবে হালাক করে তার দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েজ। মোদ্দাকথা, কুকুর نجس العين নয়। আর শূকর نجس العين হওয়ার দলিল হলো আল্লাহর বাণী–

قُلْ لَّا اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهُ رِجْسٌ ـ

বলো, তোমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না, মরা, প্রবহমান রক্ত ও শূকরের গোশত ব্যতীত। কেননা এটা অবশ্যই নাপাক। (৬. আন'আম. ১৪৫) উক্ত আয়াতের মধ্যে فانه -এর ضميره -এর مرجع দু'টি হতে পারে (ক) لحم (খ) خنزير। তবে নিকটবর্তী হওয়ার কারণে خنزير-এর দিকে ফিরানোই উত্তম। তখন فانه رجس -এর অর্থ হবে, শূকর নাজাস এবং নাপাক। এখানে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আয়াতের মধ্যে خنزير শব্দটি مضاف اليه আর مضاف দ্বারা غير مقصود হয়ে থাকে। সুতরাং ضمير-এর مرجع . خنزير হতে পারে না? এর জবাব হচ্ছে এই যে, ضمير-এর مرجع مضاف اليه হতে পারে, এতে কোনো বাঁধা নেই।

যেমন আল্লাহর বাণী- وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ -এর মধ্যে- اياه এর- ضمير এর-مرجع . الله যা এখানে مضاف اليه হয়েছে। আল্লাহর বাণী- يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ -এর মধ্যে ميثاقه এর ضمير এর- مرجع কখনো (الله) مضاف اليه ও হতে পারে। আবার (عهد) -مضاف ও হতে পারে। কখনো مرجع -এর- ضمير -এর مفعول কখনো শুধু مضاف-ও হতে পারে। যেমন- কেউ বলল رأيت ابن زيد فكلمته এ উদাহরণের মধ্যে ضمير -এর مرجع (ابن) مضاف সুতরাং বুঝা গেল فانه رجس -এর মধ্যে- ضمير -এর- مرجع (خنزير) مضاف اليه হতে পারবে। মোটকথা, আয়াত দ্বারা خنزير . نجس العين হওয়া সাবিত হলো। আর কুকুর হলো غير نجس العين তাই কুকুরের চামড়াকে শূকরের চামড়ার উপর কিয়াস করা ঠিক হবে না।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিলের জবাব হলো— হাদীস لَا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ আর অপর হাদীস أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ-এর মধ্যে কোনো تعارض নেই। কেননা اهاب দাবাগাতের পূর্বের চামড়াকে বলা হয়, আর لَا تَنْتَفِعُوْا দ্বারা দাবাগাতের পূর্বে চামড়া দ্বারা উপকৃত হতে বারণ করা হয়েছে। কেননা তা এখনো পর্যন্ত নাপাক। أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ-এর মধ্যে বলা হয়েছে যে, দাবাগাতের পর চাড়া পাক হয়ে যায়। সুতরাং উভয় হাদীসে কোনো تعارض থাকল না। তবে এখানে প্রশ্ন জাগে যে, হাদীস أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ -এর عموم দ্বারা বুঝা যায় যে, সব ধরনের চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পাক হয়ে যায়। শূকর বা মানুষের চামড়াই হোক না কেন? এর জবাব হলো— ঐ হাদীস থেকে শূকর ও মানুষের চামড়াকে খাস করা হয়েছে। কেননা কুরআনের বাণী- أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهٗ رِجْسٌ দ্বারা শূকরের نجس العين হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। আর মানুষের চামড়া মর্যাদাবান হওয়া কুরআনের বাণী وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং দাবাগাত করা সত্ত্বেও শূকরের চামড়া نجس العين হওয়ায় ব্যবহার যোগ্য নয়। আর মানুষের চামড়া তার মর্যাদার কারণে ব্যবহার যোগ্য নয়।

ثُمَّ مَا يَمْنَعُ النَّتْنَ وَالْفَسَادَ বাক্যটি দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার দাবাগাতের সংজ্ঞা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, যা দুর্গন্ধ ও পচন রোধ করে তাকে দাবাগাত বা পরিশোধন করা বলা হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) كتاب الاثار এ লিখেছে, যে জিনিস চামড়ার পচন রোধ করে সেটাই পরিশোধনকারী তা রোদে শুকিয়ে করা হোক বা মাটি মেখে করা হোক। কারণ এগুলো দ্বারা নাজাসাতের আর্দ্রতা দূর হওয়ার কারণে মূল উদ্দেশ্য অর্জন হয়ে যায়। তাই অন্য কোনো শর্ত আরোপ করার কোনো যুক্তি নেই। যেমন ইমাম শাফি'ঈ (র.) সলম বৃক্ষের পাতা (এক ধরনের কাটাদার বৃক্ষ যার পাতা দ্বারা দাবাগাত করা হয়), শাছ বৃক্ষের পাতা (এক ধরনের কাটাহীন বৃক্ষ যার পাতা দ্বারা দাবাগাত করা হয়) এবং "মাযূ" নামক বৃক্ষের শর্ত আরোপ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যে চামড়া দাবাগাত দ্বারা পাক হয়ে যায় তা জবাই করার দ্বারাও পাক হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো জবাইকারী ব্যক্তি জবাই এর আহাল বা যোগ্য হতে হবে। সুতরাং মুজূসী ব্যক্তির জবাই দ্বারা পশু পাক হবে না। দলিল হলো— জবাই দ্বারা নাপাক আর্দ্রতা দূর করার ক্ষেত্রে দাবাগাত করার ক্রিয়া পাওয়া যায়। তাই এরূপ জবাই দ্বারা গোশ্তও পাক হয়ে যায়। এমনকি রক্ত ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গও পাক হয়ে যায়। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। যদিও তা এমন পশু হয় যার গোশত খাওয়া হালাল নয়।

وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) نَجِسٌ لِاَنَّهُ مِنْ اَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ وَلَنَا اَنَّهُ لَاحَيٰوةَ فِيهِمَا وَلِهٰذَا لَايَتَالَّمُ بِقَطْعِهِمَا فَلَا يَحُلُّهُمَا الْمَوْتُ اِذِ الْمَوْتُ زَوَالُ الْحَيٰوةِ وَشَعْرُ الْاِنْسَانِ وَعَظْمُهُ طَاهِرٌ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) نَجِسٌ لِاَنَّهُ لَايُنْتَفَعُ بِهِ وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُهُ وَلَنَا اَنَّ عَدَمَ الْاِنْتِفَاعِ وَالْبَيْعِ لِكَرَامَتِهِ فَلَايَدُلُّ عَلٰى نَجَاسَتِهٖ ـ

অনুবাদ ঃ মৃত পশুর পশম ও হাড় পাক। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন নাপাক, কেননা এগুলো মৃত পশুরই অংশ। আমাদের দলিল হলো— তাতে প্রাণ নেই, এ জন্য এগুলো কাটলে ব্যথা অনুভূত হয় না। সুতরাং এ দু'টোতে মৃত্যু প্রবেশ করে না। কেননা মৃত্যু অর্থ প্রাণের বিলোপ। মানুষের চুল ও হাড় পাক। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন নাপাক, কেননা এর দ্বারা উপকার লাভ করা বৈধ নয় এবং তা বিক্রি করাও জায়েজ নয়। আমাদের দলিল হলো — তার ব্যবহার ও বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা। সুতরাং তা নাজাসাতের পরিচায়ক নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মৃত পশুর পশম ও হাড় পাক, অর্থাৎ যদি এগুলো পানিতে পড়ে তবে ঐ পানি দ্বারা অজু জায়েজ। এমনিভাবে মৃত পশুর পাছা, খুর, শিং, পর, নখ, ঠোঁট প্রভৃতির হুকুম এই একই। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, এসব নাপাক। তার দলিল হলো, এগুলো মৃত পশুরই অংশ। আর মৃত পশুর সবকিছু নাপাক। আমাদের দলিল হলো— মৃত পশুর সমস্ত অঙ্গ নাপাক নয়। বরং শুধু ঐ সমস্ত অঙ্গ নাপাক যেগুলোর মধ্যে প্রাণ আছে। আর তা মউতের দ্বারা দূর হয়ে যায়। উপরোক্ত বস্তুগুলোর মধ্যে প্রাণ নেই। কেননা এগুলোর কোনোটাকে যদি কাটা হয় তখন পশুর কোনো কষ্ট অনুভূত হয় না। তাই প্রাণ না থাকায় এগুলোতে মৃত্যু প্রবেশ করতে পারে না। অথচ মৃত্যু হলো প্রাণ বিলোপ করার নাম।

কুদূরী গ্রন্থকার দ্বিতীয় মাসআলা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, মানুষের চুল ও হাড় পাক। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, নাপাক। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো— মানুষের চুল ও হাড় উপকার লাভের যোগ্য নয় এবং এগুলো বিক্রি করাও জায়েজ নয়। বুঝা গেল যে, উভয়টি নাপাক। আমাদের দলিল হলো— এগুলোর ব্যবহার বা বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা, যা সেগুলোর নাজাসাতের পরিচায়ক নয়। তাছাড়া এ কথা সতঃসিদ্ধ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের মাথার চুল হলক করে সাহাবায়ে কেরামগণের মাঝে বন্টন করেছেন। এগুলোও তো চুল পাক হওয়ার পরিচয় বহন করে।

فَصْلٌ : فِي الْبِئْرِ وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ نُزِحَتْ وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ وَمَسَائِلُ الْبِئْرِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اِتِّبَاعِ الْآثَارِ دُوْنَ الْقِيَاسِ فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهَا بَعْرَةٌ أَوْ بَعْرَتَانِ مِنْ بَعْرِ الْإِبِلِ أَوِ الْغَنَمِ لَمْ تُفْسِدِ الْمَاءَ اِسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ تُفْسِدَهُ لِوُقُوْعِ النَّجَاسَةِ فِي الْمَاءِ الْقَلِيْلِ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنَّ آبَارَ الْفَلَوَاتِ لَيْسَتْ لَهَا رُؤُسٌ حَاجِزَةٌ وَالْمَوَاشِي تَبْعَرُ حَوْلَهَا فَتُلْقِيهَا الرِّيحُ فِيهَا فَجُعِلَ الْقَلِيْلُ عَفْوًا لِلضَّرُوْرَةِ وَلَاضَرُوْرَةَ فِي الْكَثِيْرِ وَهُوَ مَا يَسْتَكْثِرُهُ النَّاظِرُ إِلَيْهِ فِي الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ (رحـ) وَعَلَيْهِ الْاِعْتِمَادُ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ কুয়ার বর্ণনা

অনুবাদ ঃ কূপে কোনো নাজাসাত পড়লে (যদি তা ১০ × ১০ হাতের কম হয়) তার পানি বের করে নিতে হবে। আর তাতে বিদ্যমান পানি নিষ্কাশনই তার জন্য তাহারাত বলে গণ্য। এর দলিল হলো সালাফে সালিহীনের ইজমা। আর কূপ সংক্রান্ত মাসআলার ভিত্তি হচ্ছে সালাফে সলিহীনের ফাতাওয়া, কিয়াস নয়। কুয়ায় উট বা বকরির দু'একটি লাদি পড়লে তাতে পানি নষ্ট হবে না। এ হুকুম সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। আর সাধারণ কিয়াসের চাহিদা হলো পানি নষ্ট হয়ে যাওয়া। কেননা নাজাসাত পড়েছে অল্প পানিতে। ইযতিহ্সান বা সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হচ্ছে— খোলা মাঠের কুয়ার উপরে বাধাদানকারী কোনো কিছু থাকে না, আর গবাদি পশু তার আশে পাশে মল ত্যাগ করে থাকে, এবং বাতাস এসে এগুলোকে কুয়ার ভিতর এনে ফেলে। তাই প্রয়োজনের তাকীদে অল্প পরিমাণ ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত। আর অধিক পরিমাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাকিদ নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দর্শক যা অধিক মনে করে, তা-ই অধিক। এ মতটিই নির্ভরযোগ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি অল্প পানিতে নাজাসাত পড়ে তবে পানি নাপাক হয়ে যায়। পুরো পানি বের করে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, কূপে নাজাসাত পড়লে সমস্ত পানি বের করা সম্ভব হয় না। এতে বুঝা যায় যে, কূপের কিছু আহকাম পূর্ব বর্ণিত মাসআলা হতে ভিন্ন। তাই গ্রন্থকার কুয়ার মাসআলা ভিন্নভাবে আলোকপাত করেছেন।

গ্রন্থকার বলেন, যদি কূপে পশু ব্যতীত অন্য কোনো নাজাসাত পড়ে যেমন, পেশাব, মদ, রক্ত বা শূকর চাই নাজাসাত কম হোক বা বেশি হোক, কূপের সমস্ত পানি বের করা জরুরি। সমস্ত পানি বের করাটা কূপের জন্য তাহারাত বলে বিবেচিত। অর্থাৎ কূপের দেয়াল ধোয়া জরুরি নয় শুধু পানি বের করে ফেললেই কূপ পাক হয়ে যাবে। দলিল হলো, সাহাবী (রা.) ও তাবিয়ীগণের ইজমা।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কূপ সংক্রান্ত মাসআলার ভিত্তি হচ্ছে সালাফে সালিহীনের ফাতাওয়া। এখানে কিয়াসের কোনো দখল নেই। সুতরাং কিয়াস দ্বারা পানির নির্ধারিত কোনো পরিমাণ বের করা যাবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে দু'টো বিপরীতমুখী কিয়াস রয়েছে। প্রথম কিয়াস হলো, পানি একেবারেই নাপাক না হওয়া। কেননা কূপের নিম্নদেশ হতে পানি অনবরত বের হচ্ছেই। তাই কূপের পানি ماء جاری-এর অনুরূপ হবে। আর ماء جاری নাজাসাত পড়ার দ্বারা নাপাক হয় না। দ্বিতীয় কিয়াস হলো, পানি পাক-ই না হওয়া। কেননা কূপে নাজাসাত পড়ায় পানি নাপাক হয়ে গেছে, কুয়ার দেয়াল নাপাক হয়ে গেছে, তার মাটি নাপাক হয়ে গেছে, এমনকি যতটুকু পানি বের করা হবে ঐ পরিমাণ পানি কূপের নিচ হতে বের হবে যা নাপাক, মাটি নাপাক, আবার নাপাক পানি নাপাক দেয়ালের সাথে মিলে নিজেও নাপাক হয়ে যাবে। আর এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে কিয়ামত অবধি কূপ পাক হবে না। মোদ্দাকথা, কুয়া সংক্রান্ত সকল মাসআলার ভিত্তি হবে সাহাবী ও তাবিয়ীদের ফতোয়া, কিয়াস নয়।

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ وَالصَّحِيْحِ وَالْمُنْكَسِرِ وَالرَّوْثِ وَالْخِثْىِ وَالْبَعْرِ لِاَنَّ الضَّرُوْرَةَ تَشْتَمِلُ الْكُلَّ وَفِىْ شَاةٍ تَبْعَرُ فِى الْمِحْلَبِ بَعْرَةً اَوْ بَعْرَتَيْنِ قَالُوْا يُرْمَى الْبَعْرَةُ وَيُشْرَبُ اللَّبَنُ لِمَكَانِ الضَّرُوْرَةِ وَلَايُعْفَى الْقَلِيْلُ فِى الْاِنَاءِ عَلٰى مَا قِيْلَ لِعَدَمِ الضَّرُوْرَةِ وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّهُ كَالْبِئْرِ فِىْ حَقِّ الْبَعْرَةِ وَالْبَعْرَتَيْنِ ـ

অনুবাদ ঃ শুষ্ক ও তাজা বিষ্ঠা এবং গোটা ও টুকরা বিষ্ঠা আর উটের লাদা ও ঘোড়া বা গরুর গোবরের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা প্রয়োজন সবগুলোতেই বিদ্যমান। দোহন পাত্রে বকরি দু'এক গোটা বিষ্ঠা ত্যাগ করলে সে সম্পর্কে ফকীহ্গণ বলেছেন, বিষ্ঠা ফেলে দিয়ে দুধ পান করা যাবে। কেননা এখানে প্রয়োজন রয়েছে। কারো কারো মতে সাধারণ পাত্রে অল্পও মাফযোগ্য নয়। কেননা এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দু'একটি বিষ্ঠার ক্ষেত্রে পাত্রও কুয়ার অনুরূপ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কুয়ায় উট বা বকরির দু' একটি লাদি পড়ে তবে ইসতিহ্সানের চাহিদা হলো পানি নাপাক হবে না, আর কিয়াসের চাহিদা হলো নাপাক হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, দু'একটি লাদি দ্বারা স্বল্প পরিমাণ উদ্দেশ্য।

কিয়াসের দলিল হলো, নাজাসাত অল্প পানিতে পড়েছে। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, অল্প পানিতে নাজাসাত পড়লে পানি নাপাক হয়ে যায়। নাজাসাত কম হোক বা বেশি হোক। এখানে কুয়া দ্বারা এমন কুয়া উদ্দেশ্য যা ১০০ বর্গহাতের থেকে কম। ইস্তিহ্সানের কারণ হলো দু'টি–

এক. বন জঙ্গলের কুয়ার উপর বাধাদানকারী কোনো কিছু থাকে না আর গবাদি পশু তার আশে পাশে মল ত্যাগ করে ফলে বাতাস তা কুয়ায় ফেলে। তাই প্রয়োজনের তাকিদে অল্প পরিমাণকে মাফ করা হয়েছে। আর অধিক পরিমাণের মধ্যে যেহেতু প্রয়োজনের তাকিদ নেই তাই তাকে ক্ষমা করা হয়নি।

এখন অল্প বেশির পরিমাণ নিয়ে ওলামাদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কারো কারো মতে অধিক হলো, এ পরিমাণ লাদি পড়া যা পানির এক চুতুর্থাংশ বা এক তৃতীয়াংশ বা অধিক পানিও ছেয়ে ছড়িয়ে যায়। কেউ কেউ বলেন, লাদি পুরো পানিতে ছড়িয়ে গেলে তা অধিক বলে গণ্য হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, কোনো বালতি লাদি বিনে তোলা যায় না। কারো কারো মতে যদি তিনটি লাদি পড়ে তবে তা অধিক বলে বিবেচিত হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দর্শক যা অধিক মনে করে তা-ই অধিক; নতুবা কম। আর এ মতই নির্ভরযোগ্য। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ ধরনের মাসায়িলের ক্ষেত্রে তৎবিষয়ের বিশেষজ্ঞের উপর সোপর্দ করে থাকেন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, উক্ত ইস্তিহ্সানের ভিত্তিতে তাজা ও শুষ্ক বিষ্ঠা, গোটা ও টুকরা বিষ্ঠা, উটের লাদা, গরু বা ঘোড়ার গোবর প্রভৃতির হুকুম একই সমান। কেননা প্রয়োজন সবগুলোতেই পরিব্যাপ্ত। এ হিসাবে বন-জঙ্গল এবং শহরের কুয়ার মাঝে পার্থক্য হয়ে যাবে। কেননা বন-জঙ্গলের কুয়ার উপর যদিও বাধাদানকারী কোনো কিছু না থাকে কিন্তু শহুরে কুয়ার উপর ঢাকনা থাকে যা খরকুটা পড়া থেকে বাধা দেয়। এ জন্য বন-জঙ্গলের কুয়ায় অল্প পরিমাণ নাজাসাত ক্ষমার যোগ্য; তবে শহরে কুয়ায় ক্ষমার প্রয়োজন নেই।

দুই. ইস্তিহ্সানের দ্বিতীয় কারণ হলো— ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, লাদি শক্ত জাতীয় জিনিস, তার সাথে অন্ত্রের আর্দ্রতা লেগেই থাকে। এজন্য লাদির ভিতর পানি প্রবেশ করতে পারে না। তাই নাজাসাতের প্রভাবও পানিতে পড়ে না। এ কারণে অল্প পরিমাণ ক্ষমার যোগ্য। ইস্তিহ্সানের উক্ত কারণের ভিত্তিতে মাঠের ও শহুরে কুয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

হিদায়া গ্রন্থকার অন্য একটি মাসআলা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, দুধ দোহনের সময় যদি বকরি দোহন পাত্রে দু'একটি বিষ্ঠা ত্যাগ করে তবে বিষ্ঠা ফেলে দিয়ে দুধ পান করা যাবে। কেননা এখানে প্রয়োজন রয়েছে। বকরির আদত হলো দুধ দোহনের সময় বিষ্ঠা ত্যাগ করা। আর যদি দুধ রাখা পাত্রে বিষ্ঠা ত্যাগ করে তবে অল্প পরিমাণও ক্ষমার যোগ্য হবে না। কেননা এখানে কোনো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া পাত্র ঢেকে রাখা সম্ভব। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দু'এক গোটা বিষ্ঠার ক্ষেত্রে পাত্রের হুকুমও কুয়ার অনুরূপ। অর্থাৎ দু'এক গোটা দ্বারা যেমনিভাবে কুয়া নাপাক হয় না এমনিভাবে পাত্রও নাপাক হবে না।

فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا خُرْءُ الْحَمَامِ أَوِ الْعُصْفُورِ لَا يُفْسِدُهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) لَهُ أَنَّهُ إِسْتَحَالَ إِلَى نَتْنٍ وَفَسَادٍ فَأَشْبَهَ خُرْءَ الدَّجَاجَةِ وَلَنَا إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى اِقْتِنَاءِ الْحَمَامَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ مَعَ وُرُوْدِ الْأَمْرِ بِتَطْهِيْرِهَا وَاسْتِحَالَتُهُ لَا إِلَى نَتْنٍ رَائِحَةٍ فَأَشْبَهَ الْحَمْأَةَ ـ

অনুবাদ ঃ যদি কুয়ায় কবুতর বা চড়ুই পাখির বিষ্ঠা পড়ে তাহলে পানি নষ্ট হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর দলিল হলো— (বিষ্ঠা) পচা ও দূষিত পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং তা মুরগির বিষ্ঠার অনুরূপ। আমাদের দলিল হলো— মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত থাকা সত্ত্বেও মসজিদে কবুতরের অবাধ বিচরণের অনুকূলে মুসলমানদের সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে। আর তার রূপান্তর দুর্গন্ধযুক্ত পচা পদার্থের দিকে নয়। সুতরাং তা কালো কাদা সদৃশ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কবুতর আর চড়ুই পাখির বিষ্ঠা নিয়ে ওলামাদের ইখ্‌তিলাফ রয়েছে। আমাদের মতে পাক। সুতরাং যদি তাহা কুয়ায় পড়ে তবে কুয়া নাপাক হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে নাপাক। কুয়ায় পড়লে কুয়া নাপাক হয়ে যাবে। কিয়াসের চাহিদাও তাই। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো— খাদ্য এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় রূপান্তরিত হয় দু'ভাবে।

এক. দুর্গন্ধ ও পচা পদার্থে রূপান্তরিত হয়। যেমন– পেশাব, পায়খানা। এগুলো সর্ব সম্মতিক্রমে নাপাক।

দুই. ভালো ও উত্তম পদার্থের দিকে রূপান্তরিত হয়। যেমন– ডিম, দুধ, মধু প্রভৃতি। এগুলো সর্বসম্মতিক্রমে পাক। এখানে কবুতর ও চড়ুই পাখির বিষ্ঠা প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তাই এগুলো মুরগির বিষ্ঠার অনুরূপ। আর মুরগির বিষ্ঠা সকলের মতে নাপাক, এ জন্য কবুতর ইত্যাদির বিষ্ঠাও নাপাক হবে।

আমাদের দলিল হচ্ছে— সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীনগণ মসজিদে কবুতরের অবাধ বিচরণের অনুকূলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অথচ মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার নির্দেশ রয়েছে। যেমন– আল্লাহর বাণী أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ (আমার ঘর তথা মসজিদ পবিত্র রাখো)। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ (শিশুদেরকে মসজিদ থেকে দূরে রাখবে) কেননা শিশুদের দ্বারা মসজিদ ময়লাযুক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ সম্ভাবনাময় দরজাও বন্ধ করে দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস আছে قَالَتْ عَائِشَةُ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ। (হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘর সমূহে মসজিদ বানানো আর সেগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।)— (সহীহ ইবনে হিব্বান) আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে– عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى بَنِيْهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصْنَعَ الْمَسَاجِدَ فِيْ دُوْرِنَا وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا ـ (হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি তাঁর ছেলেদেরকে লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিজেদের ঘরসমূহে মসজিদ নির্মাণ করতে আর মসজিদগুলোকে পরিষ্কার রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।) উপরোক্ত দুই হাদীস (আয়েশা ও সামুরা (রা.)-এর) দ্বারা বুঝা যায় যে, মসজিদগুলো পবিত্র রাখা জরুরি। মোদ্দাকথা, সাহাবায়ে কেরাম অবাধে মসজিদে কবুতর বিচরণ করতে দিতেন। এমনকি মসজিদে হারামে কবুতরের মেলা জমে যেতো। কবুতরের বিষ্ঠা সম্পর্কেও সাহাবায়ে কেরাম অবগত ছিলেন। সুতরাং মসজিদে কবুতর অবাধে বিচরণ করার ইজাযত এ কথার দলিল যে, কবুতরের বিষ্ঠা পাক।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিলের জবাব হলো— নাপাক হওয়ার দু'টো কারণ রয়েছে। এক. দুর্গন্ধ. দুই. পচে যাওয়া. কুবুতর ইত্যাদির বিষ্ঠার মধ্যে দুর্গন্ধ নেই। আর কায়দা আছে যে, انتفاء جزء - انتفاء كل -কে লাযিম করে। অর্থাৎ নাজাসাতের দু'টো কারণের একটি না হওয়ার কারণে উভয় কারণেরই নফী হয়ে গেছে। তাই কবুতরের বিষ্ঠা নাপাক হবে না। এখন যদি ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয় যে, শুধু পচে যাওয়াও নাপাক হওয়ার কারণ হতে পারে? এর জবাবে আমরা বলব বীর্য খাদ্যকে নষ্ট করে দেয় অথচ ইমাম শাফি'ঈ (র.) বীর্যকে পাক বলেন। অপরদিকে খাদ্য জাতীয় বস্তু গুলো দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে পচে যায় কিন্তু নাপাক হয় না। বুঝা গেল, শুধু 'পচে যাওয়া নাপাক হওয়ার কারণ হতে পারে না। মোটকথা, কবুতর ইত্যাদির বিষ্ঠা কালো মাটির অনুরূপ। আর কালো মাটি সর্ব সম্মতিক্রমে নাপাক নয়। তাই কবুতর ইত্যাদির বিষ্ঠাও নাপাক হবে না।

فَإِنْ بَالَتْ فِيهَا شَاةٌ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) لَا يُنْزَحُ إِلَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ فَيَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ طَهُورًا وَأَصْلُهُ أَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ نَجِسٌ عِنْدَهُمَا لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ الْعُرَنِيِّينَ بِشُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِسْتَنْزِهُوا عَنِ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ إِلَى نَتْنٍ وَفَسَادٍ نَصَارَ كَبَوْلِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَتَاوِيلُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَرَفَ شِفَاؤُهُمْ وَحْيًا ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ لِلتَّدَاوِيْ لِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ بِالشِّفَاءِ فِيهِ فَلَا يُعْرَضُ عَنِ الْحُرْمَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رحـ) يَحِلُّ لِلتَّدَاوِيْ لِلْقِصَّةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) يَحِلُّ لِلتَّدَاوِيْ وَغَيْرِهِ لِطَهَارَتِهِ عِنْدَهُ ـ

অনুবাদ ঃ যদি কূপে বকরি পেশাব করে দেয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে [স]বটুকু পানি ফেলে দিতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যতক্ষণ না পানির উপর এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে [এ]বং পানির পবিত্র করার গুণ নষ্ট না করে ততক্ষণ পানি ফেলতে হবে না। আলোচ্য মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো— [হা]লাল পশুর পেশাব ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পাক। আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর [ম]তে নাপাক। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হচ্ছে— রাসূলুল্লাহ ﷺ উরায়নাবাসী একদল লোককে উটের দুধ ও [পে]শাব পানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো— হালাল পশু ও [হা]রাম পশুর মাঝে কোনো পার্থক্যের নির্দেশ না করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা পেশাব থেকে বেঁচে থাকো। [কে]ননা অধিকাংশ কবরের আজাব এ কারণেই হয়ে থাকে। তাছাড়া উক্ত পেশাব পচন ও দুর্গন্ধে পরিবর্তিত হয়েছে। [সু]তরাং তা এমন পশুর পেশাবের মতো গণ্য হবে, যার গোশ্ত খাওয়া নিষেধ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বর্ণিত হাদীসের [ব্য]াখ্যা হচ্ছে— রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে (উটের পেশাবে) তাদের রোগ আরোগ্য জানতে পেরেছিলেন। উল্লেখ্য [ই]মাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে চিকিৎসা হিসাবেও তা পান করা হালাল নয়। কেননা তাতে আরোগ্য লাভ নিশ্চিত [ন]য়। সুতরাং হারাম হওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করা যাবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে (উরায়না গোত্রের) [ঘ]টনার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তা পান করা হালাল। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উক্ত পেশাব পাক হওয়ার [কা]রণে চিকিৎসা হিসাবে এবং সাধারণভাবে তা পান করা হালাল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

[মা]সুরতে মাসআলা হলো— যদি কূপে বকরি পেশাব করে দেয়, তবে শায়খাইনের মতে সবটুকু পানি বের করতে হবে। [আ]র ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, পানি বের করা জরুরি নয়। তবে যদি পেশাব পানির উপর গালিব হয়ে যায় তাহলে পানি [মু]তাহহির (অন্যকে পবিত্রকারী) থাকবে না, শুধু নিজে পাক থাকবে। উপরোক্ত ইখ্তিলাফের ভিত্তি হচ্ছে— যে পশুর গোশত [খা]ওয়া হালাল, তার পেশাব ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পাক। যদি অল্প পানিতে পড়ে তবে তা পানি নাপাক করবে না; বরং [এ]র দ্বারা অজু করা জায়েজ। হ্যাঁ, যদি পেশাব পানির উপর প্রবল হয়ে যায় তাহলে পানি طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ হয়ে যাবে। অর্থাৎ [নি]জে পাক থাকবে কিন্তু অন্যকে পাক করবে না। শায়খাইনের (র.) মতে হালাল পশুর পেশাব নাপাক। যদি এক ফোঁটা [পে]শাব পানিতে পড়ে তবে পানি নাপাক হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল : হাদীসে উরায়না ঃ

إِنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتَاقُوا النَّعَـ

فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ خَبَرُهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيْئَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسُمِرَ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوْا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَلَا يُسْقَوْنَ ـ (ابو داود)

উকল বা উরায়নার কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট মদীনায় আসে। (এবং মুসলমান হয়ে যায়) কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনোপযোগী হয়। (যার কারণে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে কিছু দুধেল উটনী দিলেন। আর সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করার নির্দেশ দিলেন। (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হতে তারা তথায়) চলে গেল। কিছুদিন পর তারা পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। (পরে তারা মুরতাদ হয়ে যায়, যার দরুন) তারা উটের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ দিনের প্রথম দিকে উক্ত খবর সম্পর্কে অবহিত হন। পরে তিনি সাহাবায়ে কেরামের একটি দল তাদের খোঁজে প্রেরণ করেন। দ্বি-প্রহরের সময় তারা তাদেরকে নিয়ে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশে তাদের হাত পা কেটে দেওয়া হলো, চক্ষুগুলো গরম শলাকা দিয়ে ফুঁড়ে দেওয়া হলো এবং তাদেরকে গরম পাথরের উপর নিক্ষেপ করা হলো তারা পানি চাইলে তাদেরকে পানি দেওয়া হয়নি।—(আবূ দাউদ)

উপরোক্ত হাদীস এভাবে দলিল হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে উটের পেশাব পান করতে বলেছেন। হালাল পশুর পেশাব যদি নাপাক হতো তাহলে তিনি এ ধরনের নির্দেশ দিতেন না। কেননা পেশাব নাপাক হলে তা হারাম হয়ে যেতো, আর হারামের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَائَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (আল্লাহ তা'আলা হারাম বস্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য শেফা রাখেননি।)

শায়খাইন (র.)-এর নকলী দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ ـ (হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা পেশাব থেকে বেঁচে থাকো। কেননা অধিকাংশ কবরের আজাব এ কারণেই হয়ে থাকে।)— (সুনানে কুতনী, মুসতাদ্‌রাকে হাকিম) উক্ত হাদীসের মধ্যে ব্যাপকভাবে পেশাব থেকে পরহেয করার কথা বলা হয়েছে। পেশাব হালাল পশুর হোক বা হারাম পশুর হোক। হাদীসের শব্দ استنزهوا শব্দটি صيغه امر যা উজূবের জন্য আসে। বুঝা গেল পেশাব নাপাক। না হয় তার থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হতো না। এর সমর্থন অন্য হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। যেমন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَيَّعَ جَنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَكَانَ يَمْشِيْ عَلٰى رُؤُوْسِ أَصَابِعِهِ مِنْ زِحَامِ الْمَلَائِكَةِ الَّتِيْ حَضَرَتِ الصَّلٰوةَ عَلَيْهِ فَلَمَّا وُضِعَ فِي الْقَبْرِ ضَغَطَتْهُ الْأَرْضُ ضَغْطَةً كَادَتْ تَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ سَبَبِهِ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ ـ

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'আদ ইবনে মু'আয (রা.)-এর জানাযায় শরিক হয়েছিলেন। তিনি নামাজে জানাজায় শরিক হয়ে ফেরেশ্‌তাগণের ভিড়ের দরুন পায়ের আঙ্গুলের মাথার উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। পরে যখন সা'আদকে কবরস্থ করা হলো তখন জমিন এমন জোরে তাকে চাপ দিল যে, তার পাজরের হাড় এপাশ ও পাশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সা'আদ পেশাব থেকে পরহেয করতো না।) উক্ত হাদীস নকল করার পর ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, হাদীসে বর্ণিত পেশাব দ্বারা নিজের পেশাব উদ্দেশ্য নয়। কেননা যে ব্যক্তি নিজের পেশাব থেকে পরহেয করে না তার নামাজ-ই জায়েজ হয় না; বরং এখানে উটের পেশাব উদ্দেশ্য। সা'আদ (রা.) উটের পালের সাথে থাকতেন, পেশাব থেকে সতর্ক থাকতেন না, যার দরুন তার কবরে সাজা হচ্ছে। উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, হালাল পশুর পেশাবও নাপাক।

শায়খাইন (র.)-এর আকলী দলিল হলো— হালাল পশুর পেশাবও পচে যায় ও দুর্গন্ধে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং এ গুলোর পেশাবও এমন পশুর পেশাবের ন্যায় গণ্য হবে যেগুলোর গোশ্‌ত খাওয়া নিষেধ। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিলের জবাব হচ্ছে— রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, উটের পেশাবে তাদের আরোগ্য রয়েছে। তাই তাদেরকে পেশাব পান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এখন যেহেতু তা জানা যায় না তাই ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা জায়েজ হবে না।

দ্বিতীয় জবাব হলো— কোনো কোনো হাদীসে ابوال-এর শব্দটি আসেনি বরং البان শব্দটি এসেছে। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে উটের দুধ পান করতে বলেছেন, পেশাব পান করতে বলেননি।

তৃতীয় জবাব হলো— উক্ত হাদীস منسوخ হয়ে গেছে। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে পেশাব ঔষধ হিসাবেও পান করা জায়েজ নেই। কেননা তাতে আরোগ্য লাভ করা নিশ্চিত নয়। তাই হারাম হওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করা যাবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে উরায়না গোত্রের ঘটনার প্রেক্ষিতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে পেশাব পান করা জায়েজ। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উক্ত পেশাব পাক হওয়ার কারণে চিকিৎসা হিসাবে এবং সাধারণভাবে পান করা জায়েজ।

وَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ عُصْفُورَةٌ أَوْ سُودَانِيَّةٌ أَوْصَعْوَةٌ أَوْسَامٌّ أَبْرَصَ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا إِلَى ثَلْثِيْنَ بِحَسْبِ كِبَرِ الدَّلْوِ وَصِغَرِهَا يَعْنِي بَعْدَ إِخْرَاجِ الْفَارَةِ لِحَدِيْثِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَارَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي الْبِئْرِ وَأُخْرِجَتْ مِنْ سَاعَتِهِ يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا وَالْعُصْفُورَةُ وَنَحْوُهَا تُعَادِلُ الْفَارَةَ فِي الْجُثَّةِ فَاَخَذَتْ حُكْمَهَا وَالْعِشْرُوْنَ بِطَرِيْقِ الْإِيْجَابِ وَالثَّلْثُوْنَ بِطَرِيْقِ الْإِسْتِحْبَابِ ـ

অনুবাদ ঃ যদি কূপে ইঁদুর, চড়ুই, কোয়েল, দোয়েল, টিকটিকি ইত্যাদি মারা যায় (বাইরে মরে কূপে পড়লেও একই হুকুম) তবে যদি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে তাহলে রক্তের কারণে সব পানি নাপাক হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, সীমিত পানি উত্তোলন তখনই হবে, যখন মৃত প্রাণী ফেঁটে গলে না গিয়ে থাকে) তাহলে বালতির বড়ত্ব ও ছোটত্ব হিসাবে বিশ থেকে ত্রিশ বালতি পর্যন্ত পানি তুলে ফেলতে হবে। অর্থাৎ ইঁদুরটি বের করে নেওয়ার পর। এর প্রমাণ হলো, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস ইঁদুর সম্পর্কে, তিনি বলেছেন যে, তা কুয়াতে পড়ে মারা গেলে এবং তৎক্ষণাৎ তা বের করে নিলে কুয়া থেকে বিশ বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলতে হবে। চড়ুই ও অনুরূপ পশু যেহেতু দৈহিক পরিমাণে ইঁদুরের সমান তাই এসবের ব্যাপারে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। বিশ বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলা ওয়াজিব। আর ত্রিশ বালতি পরিমাণ তুলে ফেলা মোস্তাহাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত মাসআলাগুলোর হাসিল হলো— যে সকল পশু কুয়ায় পড়ে তার সাতটি সুরত হতে পারে। কেননা ঐ পশু হয়তো ইদুর বা তার অনুরূপ হবে অথবা মুরগি বা তার অনুরূপ হবে, অথবা বকরি বা তার অনুরূপ হবে। অতঃপর প্রত্যেকটি জীবিত বা মৃত অবস্থায় বের করা হবে। যদি মৃত অবস্থায় বের হয় তবে তার দুই সুরত রয়েছে। ফুলে ফেটে গেছে অথবা যায়নি। যদি ঐ পশু জীবিত বের হয় তবে কূপ নাপাক হবে না। তবে শূকর نَجَسُ الْعَيْنِ হওয়ায় জীবিত বের হলেও কূপ নাপাক হয়ে যাবে। আর যাদের মতে কুকুর نَجَسُ الْعَيْنِ তাদের মতে কুকুর জীবিত বের হলেও কূপ নাপাক হয়ে যাবে। আর যদি পশুটি মৃত অবস্থায় বের হয় তবে প্রথম সুরত অর্থাৎ ইঁদুর বা তার ন্যায় পশু হলে হুকুম হলো— ঐ মৃত পশুটি বের করার পর বিশ বালতি পানি ফেলে দেওয়া ওয়াজিব; আর ত্রিশ বালতি মোস্তাহাব। উপরোক্ত হুকুমটি একটি ইদূর থেকে চারটি ইঁদুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে পাঁচটি থেকে নয়টি পর্যন্ত চল্লিশ বালতি ফেলে দেওয়া ওয়াজিব। আর দশটি হলে পুরো পানি ফেলে দেওয়া ওয়াজিব। দলিল হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইঁদুর কুয়ায় পড়ে মারা গেলে এবং তৎক্ষণাৎ তা বের করে নিলে কুয়া থেকে বিশ বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলে দিতে হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ ত্রিশ বালতি পানি ফেলে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। মুহাদ্দিসীনে কেরাম উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য বলেছেন, আনাস (রা.)-এর হাদীস উজূবের উপর আর ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস মোস্তাহাব-এর উপর মাহমূল। এখানে বালতি দ্বারা মাঝারি ধরনের বালতি উদ্দেশ্য যা শহরে সাধারণভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। অথবা ঐ কূপে সাধারণভাবে ব্যবহৃত করা হয়। সুতরাং যদি বড় বালতি দ্বারা পানি বের করা হয় তাহলে সে হিসাবে বিশ বালতির কম পানি ফেলে দিতে হবে। আর যদি ছোট বালতি দ্বারা পানি বের করা হয় তাহলে সে হিসাবে বিশ বালতির বেশি পানি বের করতে হবে।

فَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ نَحْوُهَا كَالدَّجَاجَةِ وَالسِّنَّوْرِ نُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ دَلْوًا إِلَى سِتِّينَ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّجَاجَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي الْبِئْرِ يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا هٰذَا لِبَيَانِ الْإِيجَابِ وَالْخَمْسُونَ بِطَرِيقِ الْإِسْتِحْبَابِ ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِي كُلِّ بِئْرٍ دَلْوُهَا الَّذِي يُسْتَقَى بِهِ مِنْهَا وَقِيلَ دَلْوٌ يَسَعُ فِيهِ صَاعٌ وَلَوْ نُزِحَ مِنْهَا بِدَلْوٍ عَظِيمٍ مَرَّةً مِقْدَارَ عِشْرِينَ دَلْوًا جَازَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ـ

অনুবাদ ঃ যদি কবুতর কিংবা তার মতো প্রাণী যেমন– মুরগি, বিড়াল ইত্যাদি কুয়ায় পড়ে মারা যায়, তাহলে চল্লিশ থেকে ষাট বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলতে হবে। জামে সগীর গ্রন্থে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এর কথা আছে। আর তাই অধিক নির্ভরযোগ্য। কেননা আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে তিনি মুরগি সম্পর্কে বলেছেন, তা কুয়ায় পড়ে মারা গেলে সেখান থেকে চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে। এ পরিমাণ হলো ওয়াজিবের বিবরণ। আর পঞ্চাশ হলো মোস্তাহাব। প্রত্যেক কুয়ার ক্ষেত্রে সে বালতিই বিবেচ্য হবে যা তা থেকে পানি তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়। কারো কারো মতে এমন আকারের বালতি হতে হবে, যাতে এক সা' পরিমাণ পানি ধরে। আর যদি এমন বড় বালতি দ্বারা পানি তুলে ফেলা হয়– যাতে একেবারেই বিশ বালতি পরিমাণ পানি ধরে– তাহলে মূল উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার কারণে তা জায়েজ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কুয়ায় কবুতর বা তার মতো কোনো প্রাণী পড়ে মারা যায় যেমন– মুরগি, বিড়াল ইত্যাদি তবে তার হুকুম হলো : চল্লিশ থেকে ষাট বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলতে হবে। অর্থাৎ চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলা ওয়াজিব, আর ষাট বালতি মোস্তাহাব। ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামে' সগীরে গ্রন্থে লিখেছেন, চল্লিশ বালতি ওয়াজিব আর পঞ্চাশ বালতি মোস্তাহাব। হিদায়া গ্রন্থকার এ মতটিকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। কেননা জামে' সগীর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সর্বশেষ কিতাব। তাই এর মধ্যে যা বর্ণিত হয়েছে তা ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর (قَوْلٌ مَرْجُوْعٌ إِلَيْهِ) সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য অভিমত। দলিল হলো— হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি মুরগি সম্পর্কে বলেছেন, যদি তা কুয়ায় পড়ে মারা যায় তবে সেখান থেকে চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক কুয়ার ক্ষেত্রে সে বালতিই বিবেচ্য হবে যা তা থেকে পানি তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি দুর্বল মত পাওয়া যায় যে, বালতি এমন হতে হবে যাতে এক সা' পরিমাণ পানি ধরে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কুয়া পাক করার ক্ষেত্রে বালতির সংখ্যার কোনো গ্রহণ যোগ্যতা নেই। তবে এত এত পরিমাণ পানি বের করার গ্রহণযোগ্যতা আছে। যেমন কেউ যদি বড় বালতি দ্বারা একবারেই বিশ বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলে দেয় তবে মূল উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবার কারণে তা যথেষ্ট এবং জায়েজ বলে বিবেচিত হবে।

وَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا شَاةٌ أَوْ آدَمِيٌّ أَوْكَلْبٌ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ أَفْتَيَا بِنَزْحِ الْمَاءِ كُلِّهِ حِينَ مَاتَ زَنْجِيٌّ فِي بِئْرِ زَمْزَمَ فَإِنِ انْتَفَخَ الْحَيَوَانُ فِيهَا أَوْ تَفَسَّخَ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا صَغُرَ الْحَيَوَانُ أَوْ كَبُرَ لِانْتِشَارِ الْبِلَّةِ فِي أَجْزَاءِ الْمَاءِ . وَإِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ مَعِيْنَةً بِحَيْثُ لَايُمْكِنُ نَزْحُهَا أَخْرَجُوا مِقْدَارَ مَا كَانَ فِيهَا مِنَ الْمَاءِ وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ أَنْ تُحْفَرَ حَفْرٌ مِثْلَ مَوْضَعِ الْمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ يُصَبُّ فِيهَا مَا يُنْزَحُ مِنْهَا إِلَى أَنْ تَمْتَلِيَ أَوْ تُرْسَلُ فِيهَا قَصَبَةٌ وَتُجْعَلُ لِمَبْلَغِ الْمَاءِ عَلَامَةٌ ثُمَّ يُنْزَحُ مِنْهُ مَثَلًا عَشْرُ دِلَاءٍ ثُمَّ تُعَادُ الْقَصَبَةُ فَتَنْظُرُكَمْ اِنْتَقَصَ فَيُنْزَحُ لِكُلِّ قَدْرٍ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ وَهٰذَانِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ (رحـ) وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) نُزِحَ مِائَتَا دَلْوٍ إِلَى ثَلٰثِ مِائَةٍ فَكَأَنَّهُ بَنٰى قَوْلَهُ عَلٰى مَا شَاهَدَ فِي بَلَدِهِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ فِي مِثْلِهِ يُنْزَحُ حَتّٰى يَغْلِبَهُمُ الْمَاءُ وَلَمْ يُقَدِّرِ الْغَلَبَةَ بِشَيْءٍ كَمَا هُوَ دَأْبُهُ وَقِيلَ يُؤْخَذُ بِقَوْلِ رَجُلَيْنِ لَهُمَا بَصَارَةٌ فِي أَمْرِ الْمَاءِ وَهٰذَا أَشْبَهُ بِالْفِقْهِ ـ

অনুবাদ ঃ যদি কুয়ায় বকরি, মানুষ বা কুকুর (কুকুরের ক্ষেত্রে মৃত্যু শর্ত নয়। জীবিত অবস্থায় বের হয়ে আসলেও একই হুকুম হবে, যদি মুখ ভিজে গিয়ে থাকে। কেননা কুকুরের লালা নাপাক) পড়ে মারা যায়, তাহলে তাতে বিদ্যমান সবটুকু পানি তুলে ফেলতে হবে। কেননা ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়ের (রা.) যমযম্ কূপে জনৈক নিগ্রোর মৃত্যুর কারণে সবটু কু পানি তুলে ফেলার ফতোয়া দিয়ে ছিলেন। যদি মৃত প্রাণী কুয়ার মধ্যে ফুলে বা পচে গলে যায়, তাহলে প্রাণী বড় বা ছোট হোক, কুয়ার সবটুকু পানি তুলে ফেলতে হবে। কেননা পানির সর্বাংশে মৃত দেহের নিঃসৃত রস ছড়িয়ে পড়েছে। কূপ যদি এমন প্রস্রবণ প্রকৃতির হয় যে, তার সবটুকু পানি তুলে ফেলা অসম্ভব তাহলে তাতে বিদ্যমান পানির সমপরিমাণ তুলে ফেলতে হবে। এর পরিমাণ জানার উপায় হলো— কূপের পানির সমতল পরিমাণ অনুরূপ একটি গর্ত খনন করা হবে এবং পানি তুলে তা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাতে ফেলতে হবে। কিংবা একটি বাঁশ নামিয়ে পানির উচ্চতা পরিমাণ স্থানে তাতে দাগ কাটা হবে। তারপর ধরুন, দশ বালতি তুলে আবার বাঁশ নামিয়ে দেখা হবে, কি পমিরাণ পানি হ্রাস পেল। এরপর প্রত্যেক এই পরিমাণের জন্য দশ বালতি করে পানি উত্তোলন করা হবে। এ দু'টি উপায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দু'শ থেকে তিন'শ বালতি তুলে ফেললেই হবে। সম্ভবত তিনি নিজ শহরের (বাগদাদে দেখা কুয়াগুলোর) উপরই তার সিদ্ধান্তের ভিত্তি করেছেন। জামে' সগীর গ্রন্থে এ ধরনের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পানি অনবরত তুলতেই থাকবে, যতক্ষণ না পানি তাদেরকে পরাভূত তথা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত করে দেয়। তবে পরাভূত করার নির্দিষ্ট সীমা তিনি নির্ধারণ করেননি। (এ ধরনের ক্ষেত্রে) এটাই তাঁর অনুসৃত নীতি। কারো কারো মতে পানির (গভীরতা) সম্পর্কে অভিজ্ঞ দু'জন লোকের মতামত গ্রহণ করা হবে। এ মত ফিক্হী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কুয়ায় বকরি, মানুষ অথবা কুকুর পড়ে মারা যায় তবে কুয়ায় বিদ্যমান সবটুকু পানি ফেলে দেওয়া ওয়াজিব। দলিল হলো— একবার এক নিগ্রো ব্যক্তি কুয়ায় পড়ে মারা যায়। তখন হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়ের (রা.) কুয়ার সবটুকু পানি তুলে ফেলে দেওয়ার ফতোয়া দিয়েছিলেন।

মাসআলা : যদি কুয়ায় কোনো প্রাণী পড়ে মরে যায় এবং ফুলে বা পচে গলে টুকরা টুকরা হয়ে যায়, তাহলে সম্ভব হলে কুয়ার সবটুকু পানি তুলে ফেলে দিতে হবে। প্রাণী ছোট বা বড় হোক। দলিল হলো প্রাণীটি ফুলে পচে গলে যাওয়ার কারণে তার নাপাক অংশের আর্দ্রতা পানিতে ছড়িয়ে পড়েছে এ জন্য পুরো পানি নাপাক হয়ে গেছে। যেমন, কুয়ায় রক্ত বা শরাবের এক ফোঁটা পড়লে পুরো পানিতে ছড়িয়ে সবটুকু পানি নাপাক করে দেয়।

وَإِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ الخ : যদি কুয়া এমন প্রস্রবণ জাতীয় হয় যে, যার সমস্ত পানি তোলা অসম্ভব। এমতাবস্থায় হুকুম হলো, নাজাসাত পড়ার প্রাক্কালে যে পরিমাণ পানি বিদ্যমান ছিল তার সমপরিমাণ পানি তুলে ফেলতে হবে। পানির পরিমাণ জানার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে দু'টি উপায় বর্ণিত রয়েছে (১) কুয়ার পানির সমতল পরিমাণ অনুরূপ একটি গর্ত খোঁড়া হবে এবং কুয়া থেকে পানি বের করে ঐ গর্তে রাখা হবে যদি গর্ত ভরে যায় তবে বুঝতে হবে যে, কুয়ার সবটুকু পানি বেরিয়ে গেছে এবং কুয়া পাক হয়ে গেছে। (২) কুয়ার ভিতর একটি বাঁশ নামিয়ে পানির উচ্চতা পরিমাণ স্থানে দাগ কাটা হবে। অতঃপর ধরুন, দশ বালতি পানি তুলে আবার বাঁশ নামিয়ে দেখতে হবে কি পরিমাণ পানি কমেছে। তারপর প্রত্যেক এ পরিমাণের জন্য দশ বালতি করে পানি বের করতে হবে। যেমন– কুয়ায় দশ ফুট পানি আছে। এখন একবারে দশ বালতি পানি বের করার দ্বারা এক ফুট পানি কমে গেছে। এতে বুঝা গেল যে, পুরো কুয়ায় একশ বালতি আছে। সুতরাং আরো নব্বই বালতি পানি বের করলে কুয়ার সব পানি বেরিয়ে যাবে। বুঝা গেল যে, নাজাসাত পড়ার সময় যে পরিমাণ পানি ছিল তা বেরিয়ে গেছে এবং কুয়া পাক হয়ে গেছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, দু'শ থেকে তিনশ বালতি পানি বের করতে হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের ভিত্তি তার নিজ শহরের (বাগদাদের) দেখা কুয়া গুলোর উপর। কেননা বাগদাদের কুয়াগুলোতে সাধারণত দু'শ থেকে তিনশ বালতি পরিমাণ পানি হতো। তবে উপরোক্ত আন্দাজ সব জায়গার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়। কেননা যে সকল জায়গায় পানি বেশি পরিমাণ থাকে সেখানে সে পরিমাণ পানি বের করতে হবে।

জামে' সগীর গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে প্রস্রবণ জাতীয় কুয়ার ক্ষেত্রে বর্ণিত আছে যে, নাপাক কুয়াকে পাক করার জন্য এ পরিমাণ পানি বের করতে হবে যে, পানি তাদেরকে পরাভূত করে ফেলে। তবে ইমাম সাহেব (র.) স্বীয় নীতি অনুযায়ী পরাভূত করার নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করেননি। কোনো কোনো ফকীহ এর মতে পানির গভীরতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ দু'জন ন্যায়পরায়ণ এবং বিশ্বস্ত লোকের মতামতের উপর আমল করা হবে। যদি তারা আন্দাজ করে দু'শ বালতির কথা বলে তবে কুয়া পাক করার জন্য দু'শ বালতি পানি বের করা ওয়াজিব। আর যদি তারা এর চেয়ে কম ফেলতে বলে তবে সে পরিমাণ পানি বের করা ওয়াজিব হবে। বিজ্ঞ গ্রন্থকার বলেন, উক্ত মতটি ফিক্‌হী দৃষ্টি ভঙ্গির সাথে অধিক সামঞ্জস্য পূর্ণ। ফিক্‌হ দ্বারা মুরাদ হলো যা কুরআন ও হাদীস থেকে উদ্ভাবিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা শিকারি পশুর মূল্য নির্ধারণের জন্য দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোকের শর্ত আরোপ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ - (তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহ পালিত পশু যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক।—[৫. মায়িদা – ৯৫]) সাক্ষীর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ এবং তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে। (৬৫ তালাক, ২) পানির ক্ষেত্রে এ জন্য বিজ্ঞতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, নীতিমালা জ্ঞানবান লোকদের থেকেই জানা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানবান লোকদের জিজ্ঞাসা করো।) — (১৬ নাহ্‌ল, ৪৩)

وَاِنْ وَجَدُوْا فِي الْبِئْرِ فَارَةً اَوْ غَيْرَهَا وَلَايَدْرِىْ مَتٰى وَقَعَتْ وَلَمْ يَنْتَفِخْ اَعَادُوْا صَلٰوةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اِذَا كَانُوْا تَوَضَّؤُوْا مِنْهَا وَغَسَلُوْا كُلَّ شَيْئٍ اَصَابَهٗ مَاؤُهَا وَاِنْ كَانَتْ قَدْ اِنْتَفَخَتْ اَوْ تَفَسَّخَتْ اَعَادُوْا صَلٰوةَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَيْسَ عَلَيْهِمْ اِعَادَةُ شَيْئٍ حَتّٰى يَتَحَقَّقُوْا اَنَّهَا مَتٰى وَقَعَتْ لِاَنَّ الْيَقِيْنَ لَايَزُوْلُ بِالشَّكِّ وَصَارَ كَمَنْ رَأٰى فِىْ ثَوْبِهِ النَّجَاسَةَ وَلَايَدْرِىْ مَتٰى اَصَابَتْهُ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ لِلْمَوْتِ سَبَبًا ظَاهِرًا وَهُوَ الْوُقُوْعُ فِى الْمَاءِ فَيُحَالُ بِهٖ عَلَيْهِ اِلَّا اَنَّ الْاِنْتِفَاخَ دَلِيْلُ التَّقَادُمِ فَيُقَدَّرُ بِالثَّلٰثِ وَعَدَمُ الْاِنْتِفَاخِ وَالتَّفَسُّخِ دَلِيْلُ قُرْبِ الْعَهْدِ فَقَدَّرْنَاهُ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِاَنَّ مَا دُوْنَ ذَالِكَ سَاعَاتٌ يُمْكِنُ ضَبْطُهَا وَاَمَّا مَسْأَلَةُ النَّجَاسَةِ فَقَدْ قَالَ الْمُعَلّٰى هِىَ عَلَى الْخِلَافِ فَيُقَدَّرُ بِالثَّلٰثِ فِى الْبَالِىْ وَبِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِى الطَّرِىِّ وَلَوْ سُلِّمَ فَالثَّوْبُ بِمَرْأٰى عَيْنِهٖ وَالْبِئْرُ غَائِبَةٌ عَنْ بَصَرِهٖ فَيَفْتَرِقَانِ ـــ

অনুবাদ ঃ যদি লোকেরা ইঁদুর বা এ ধরনের অন্য কোনো প্রাণী কুয়াতে দেখতে পায় এবং কখন পড়েছে তা জানা না যায় আর তা ফুলে গিয়ে না থাকে তাহলে যদি তারা সে কুয়ার পানি দ্বারা অজু করে থাকে, তাহলে একদিন এক রাতের নামাজ দোহরাবে এবং ঐ কুয়ার পানি লেগেছে এমন প্রতিটি জিনিস ধুয়ে ফেলতে হবে। আর যদি (প্রাণী) ফুলে বা পচে গলে গিয়ে থাকে তাহলে তিন দিন তিন রাতের নামাজ দোহ্‌রাবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, পতিত হওয়ার সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া তাদের উপর কিছুই দোহ্‌রান জরুরি নয়। কেননা নিশ্চিত অবস্থা সন্দেহ দ্বারা দূরীভূত হয় না। এটা হলো ঐ ব্যক্তির অবস্থার মতো যে তার কাপড়ে নাজাসাত দেখতে পেল, কিন্তু কখন লেগেছে তা সে জানে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো— এখানে মৃত্যুর একটি প্রকাশ্য سبب বা কারণ রয়েছে। তা হলো পানিতে পতিত হওয়া। সুতরাং এর সাথে মৃত্যুকে সম্পৃক্ত করা হবে। তবে যেহেতু ফুলে উঠা সময়ের দীর্ঘতার প্রমাণ, সেহেতু সময়সীমা তিন দিন নির্ধারণ করা হবে। আর ফুলে ফেটে না যাওয়া যেহেতু সময়ের নৈকট্যের প্রমাণ, সেহেতু তার সময়সীমা আমরা একদিন একরাত্র নির্ধারণ করেছি। কেননা এর নিচে হচ্ছে মুহূর্তসমূহ, যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য (কাপড়ে) নাজাসাত (লেগে থাকার) বিষয়টি সম্পর্কে মু'আল্লার বক্তব্য হলো, এর মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। অর্থাৎ পুরাতন লাগা নাজাসাতের জন্য তিন দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে। আর তাজা নাজাসাতের বেলায় একদিন এক রাতের। আর যদি মতভেদ না থাকার দাবি স্বীকার করেও নেওয়া হয়, তাহলে যেহেতু কাপড় তার দৃষ্টির সম্মুখে থাকে আর কুয়া থাকে দৃষ্টির আড়ালে, সুতরাং দু'টোর মাসআলা আলাদা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি লোকেরা কুয়ায় মৃত প্রাণী দেখে আর না জানে যে তা কখন পড়েছে এবং প্রাণীটি এখনো ফুলেনি এবং ফাটেনি। এ অবস্থায় হুকুম হলো, যদি ঐ কুয়ার পানি দ্বারা অজু করে নামাজ পড়ে থাকে তবে এক দিন এক রাতের নামাজ দোহ্রাবে এবং কুয়ার পানি লেগেছে এমন প্রতিটি জিনিস ধুয়ে ফেলবে। আর যদি প্রাণী ফুলে পচে টুকরা টুকরা হয়ে গিয়ে থাকে তবে তিন দিন তিন রাতের নামাজ দোহরাবে। এ হুকুম ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে প্রাণী পতিত হওয়ার সময়ের ব্যাপারে নিশ্চিত্ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কিছুই দোহ্রাতে হবে না।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো— নিশ্চিতভাবে কুয়ার পানি পাক ছিল। তবে তার মধ্যে মৃত প্রাণী পাওয়া যাওয়ায় বিগত দিনের পানি নাপাক হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ এসে গেছে। কেননা সম্ভাবনা রয়েছে যে প্রাণীটি কুয়ায় এখনি পড়েছে আর এখনো তার পানি ব্যবহার হয়নি। আবার এও সম্ভাবনা রয়েছে যে, প্রাণীটি অনেক পূর্বেই পড়েছে আর তার পানি দ্বারা অজু করে নামাজ পড়া হয়েছে। মোদ্দাকথা, বিগত দিনে পানি নাপাক হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আর কায়দা আছে যে, নিশ্চিত অবস্থা সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত জানা না যাবে যে, প্রাণীটি কখন পড়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিগত দিনে কুয়া নাপাক ছিল তার হুকুম দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, যদি তার পড়ার সময় জানা যায় তবে পড়ার সময় থেকে নাপাক হয়েছে বলে গণ্য হবে। কেননা এক নিশ্চিত অবস্থা অন্য নিশ্চিত অবস্থা দ্বারা দূরীভূত হয়ে যায়। আর এ হুকুমটি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে, তার কাপড়ে নাজাসাত দেখতে পেলো তবে কখন লেগেছে তা সে জানে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো— প্রাণীটি পানিতে পড়া তার মৃত্যুর প্রকাশ্য কারণ। কায়দা আছে যে, মুসাব্বাব যদি পুশিদা হয় তবে তার জাহেরী সববের উপর হুকুম দেওয়া ওয়াজিব হয়ে পড়ে। সুতরাং ঐ প্রাণীটির মৃত্যুকে পানিতে পড়ার দিকে নিসবত করা হবে। অর্থাৎ এ কথা বলা হবে যে, প্রাণীটি পানিতে পড়েই মারা গেছে। যদিও এ ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, প্রাণীটি অন্য কোনো কারণে মরে তারপর পানিতে পড়েছে। তবে এ সম্ভাবনাটি অস্পষ্ট। আর অস্পষ্ট জিনিস স্পষ্ট জিনিসের মোকাবেলায় গ্রহণযোগ্য হয় না। এ কারণে উক্ত সম্ভাবনাটিও অগ্রহণযোগ্য হবে। এ ব্যাপারটি এমন– যেমন কোনো ব্যক্তি কাউকে ক্ষত করেছে, যার দরুন সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে এক পর্যায়ে লোকটি মারা গেছে। এখন বলা হবে লোকটি ঐ ক্ষতের কারণেই মারা গেছে। যদিও এখানে অন্য কোনো কারণ থাকারও সম্ভাবনা রয়েছে। তবে প্রাণীটি ফুলে ফেটে যাওয়া এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, প্রাণীটি অনেক পূর্বেই মারা গেছে। আর বিলম্বের সর্বনিম্ন সময় হলো তিন দিন। তাই সময় সীমা তিন দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন– যদি কোনো ব্যক্তিকে জানাযা ছাড়া দাফন করা হয় তবে তার কবরের উপর তিন দিন পর্যন্ত জানাযার নামাজ পড়া জায়েজ। তিন দিনের পর জায়েজ নেই। কেননা তিন দিনের পর লাশ ফুলে পচে গলে যায়। আর ফুলে ফেটে না যাওয়া এ কথার প্রমাণ যে, প্রাণীটি নিকটবর্তী সময়ে পড়ে মরেছে। তাই তার সময়সীমা এক দিন এক রাত। কেননা এর নিচে হচ্ছে মুহূর্তসমূহ যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

وَأَمَّا مَسْئَلَةُ النَّجَاسَةِ দ্বারা সাহেবাইনের কিয়াসের জবাব দেওয়া হয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার এর দু'টো জবাব দিয়েছেন। (এক) কাপড়ে নাজাসাত লাগার মাসআলাটির মধ্যেও ইখ্তিলাফ রয়েছে। বিজ্ঞ ফকীহ মু'আল্লা ইবনে মানসূর বলেন, এ মাসআলার মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে পুরাতন লাগা নাজাসাতের জন্য তিন দিন, তিন রাত, আর তাজা নাজাসাতের ব্যাপারে এক দিন এক রাতের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এমনকি ঐ নাপাক কাপড় নিয়ে যদি নামাজ আদায় করা হয় তবে পরে দোহ্রানো ওয়াজিব।

দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে— যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, উপরোক্ত মাসআলায় কোনো মতভেদ নেই তবুও নাজাসাত লাগা কাপড়ের উপর কিয়াস করা জায়েজ হবে না। কেননা কাপড় শরীরে থাকার কারণে সর্বদা দৃষ্টির সম্মুখে থাকে। তাই নাজাসাত লাগার সাথে সাথেই দেখা যায় যে, এ মুহূর্তে নাজাসাত লেগেছে। কিন্তু কুয়া থাকে দৃষ্টির আড়ালে। তাই জানোয়ার কখন পড়ে মরেছে তা জানা যায় না। সুতরাং দু'টো মাসআলা আলাদা। তাই একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা ঠিক হবে না।

فَصْلٌ فِى الْاَسَارِ وَ غَيْرِهَا : وَعِرْقُ كُلِّ شَيْءٍ مُعْتَبَرٌ بِسُؤْرِهِ لِاَنَّهُمَا يَتَوَلَّدَانِ مِنْ لَحْمِهِ فَاَخَذَ اَحَدُهُمَا حُكْمَ صَاحِبِهِ وَسُؤْرُ الْاٰدَمِىِّ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ لِاَنَّ الْمُخْتَلِطَ بِهِ اللُّعَابُ وَقَدْ تَوَلَّدَ مِنْ لَحْمٍ طَاهِرٍ وَيَدْخُلُ فِى هٰذَا الْجَوَابِ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ وَالْكَافِرُ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ উচ্ছিষ্ট ইত্যাদির বিবরণ

অনুবাদ ঃ প্রত্যেক প্রাণীর ঘাম তার উচ্ছিষ্টের হিসেবে বিবেচ্য হয়ে থাকে। কেননা (লালা ও ঘাম) দু'টোরই জন্ম তার গোশ্ত থেকে। সুতরাং একটিতে অপরটির বিধান প্রযোজ্য হবে। মানুষের উচ্ছিষ্ট এবং যে প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া যায়, তার উচ্ছিষ্ট পাক। কেননা তার সাথে লালা মিশ্রিত হয়েছে। আর তা সৃষ্ট হয়েছে পাক গোশ্ত থেকে। জুনুবী, ঋতুবতী এবং কাফিরও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হিদায়া গ্রন্থকার পানির মধ্যে জানোয়ার পড়ার দরুন তা পাক-নাপাক হওয়ার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করার পর এ অধ্যায়ে লালা ও ঘাম পানিতে মিলে যাওয়ার দরুন পানি পাক-নাপাক হওয়ার হুকুমের বর্ণনা শুরু করেছেন। سؤر - اسار -এর বহুবচন। এর অর্থ অবশিষ্ট খানা, অবশিষ্ট পানি। পরিভাষায় তাকে উচ্ছিষ্ট বলা হয়। আমাদের মতে سؤر চার প্রকার– (১) পাক, যেমন– মানুষ ও হালাল প্রাণীর উচ্ছিষ্ট, (২) মাকরূহ, যেমন– বিড়ালের উচ্ছিষ্ট, (৩) নাপাক, যেমন– শূকর এবং হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্ট, (৪) মাশকূক, যেমন– গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট।

শায়খ ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, গ্রন্থকারের (র.) উচিত ছিল, এভাবে বলা وَسُؤْرُ كُلِّ شَيْءٍ مُعْتَبَرٌ بِعِرْقِهِ কেননা অধ্যায় হলো سؤر -এর عرق -এর নয়? এর জবাবে ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত অভিযোগ ঠিক নয়। কেননা হিদায়া গ্রন্থকার اسار -এর অধীনে عرق-এর আলোচনাও করতে চান। যদি গ্রন্থকার وَسُؤْرُ كُلِّ شَيْءٍ مُعْتَبَرٌ بِعِرْقِهِ বলতেন, তবে তারপর একথা বলাও জরুরি হয়ে যেতো عِرْقُ الْاٰدَمِىِّ كَذَا وَعِرْقُ الْكَلْبِ كَذَا ইত্যাদি। এ অবস্থায় এ অনুচ্ছে عرق তথা ঘাম-এর হয়ে যেতো سؤر তথা উচ্ছিষ্টের অনুচ্ছেদ হতো না। অথচ এ অনুচ্ছেদ سؤر বয়ান করার জন্য عرق বয়ান করার জন্য নয়। মোটকথা মাসআলা হলো— প্রত্যেক প্রাণীর ঘামকে তার উচ্ছিষ্টের উপর কিয়াস করা হবে। অর্থাৎ উচ্ছিষ্টের যে হুকুম, ঘামেরও একই হুকুম হবে। দলিল হচ্ছে— লালা ও ঘাম উভয়টির জন্ম তার গোশ্ত থেকে। তাই উভয়টির একই হুকুম হবে। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, গাধার উচ্ছিষ্ট মাশ্কূক, অথচ তার ঘাম পাক। কিয়াস কিভাবে সহীহ হলো? এর জবাব হলো, গাধার উচ্ছিষ্ট পাক হওয়ার ক্ষেত্রে কারো কোনো সন্দেহ নেই। তবে সন্দেহ হচ্ছে পাককারী হিসাবে অর্থাৎ এর মধ্যে সন্দেহ যে, গাধার উচ্ছিষ্ট পানির দ্বারা তাহারাত হাসিল করা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, সত্তাগতভাবে তা পাক। সুতরাং তার ঘামও পাক হবে।

وَسُؤْرُ الْاٰدَمِىِّ وَمَا يُؤْكَلُ الخ ঃ উক্ত ইবারতে سؤر-এর চার প্রকারের প্রথম প্রকারের আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের উচ্ছিষ্ট পাক, সে মুসলমান, কাফির, জুনুবী, হায়িযা যা-ই হোক না কেন। এমনিভাবে হালাল প্রাণীর উচ্ছিষ্টও পাক, যেমন– গরু, বকরি, উট ইত্যাদি। দলিল হলো— পানি মুখের লালার সাথে মিশ্রিত হয়ে উচ্ছিষ্ট হয়, আর লালা সৃষ্টি হয় গোশ্ত থেকে। আর এ সকল প্রাণীর গোশ্ত পাক, তাই লালাও পাক হবে, যেহেতু লালা পাক সেহেতু লালার সাথে মিশ্রিত জিনিসও

পাক হবে। মানুষের উচ্ছিষ্ট পাক হওয়ার উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস দলিল إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ وَنَاوَلَ الْبَاقِيَ أَعْرَابِيًّا كَانَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَ أَبَابَكْرٍ فَشَرِبَهُ - (একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ দুধের পেয়ালা হাতে নিয়েছেন নিজে দুধ পান করেছেন। অবশিষ্টগুলো ডান দিকের আরাবীকে দিয়েছেন। সে পান করে আবূ বকর (র.)-কে দিয়েছে। তিনিও পান করেছেন। (উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষের উচ্ছিষ্ট পাক। তা ছাড়া যুক্তি হলো মানুষের (সত্তা) যেহেতু পাক, তাই তার উচ্ছিষ্টও পাক হবে। প্রশ্ন হয় যে, তবে মানুষের গোশ্‌ত খাওয়া যায় না কেন? এর জবাব হলো, মানুষের গোশ্‌ত খাওয়া যায় না তার সম্মানের কারণে, নাজাসাতের কারণে নয়।

জুনুবী মানুষের উচ্ছিষ্টও পাক। এর দলিল হলো إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ حُذَيْفَةَ فَمَدَّ يَدَهُ لِيُصَافِحَهُ فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ إِنِّيْ جُنُبٌ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ - (বর্ণিত আছে যে, হযরত হুযায়ফার (রা.) সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ সাক্ষাৎ হয় তিনি তার সাথে মুসাফাহার জন্য হাত বাড়ালেন। হযরত হুযায়ফা (র.) নিজ হাত সংকুচিত করলেন আর বললেন (হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমি জুনুবী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মু'মিন নাপাক হয় না।) উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, জুনুবী ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট পাক।

হায়েযা মহিলার উচ্ছিষ্ট পাক হওয়ার উপর দলিল হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস। إِنَّ عَائِشَةَ (رضـ) شَرِبَتْ مِنْ إِنَاءٍ فِيْ حَالِ حَيْضِهَا فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِيْهَا وَشَرِبَ - (হযরত আয়েশা (রা.) হায়েয অবস্থায় এক পাত্র থেকে পানি পান করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও সে জায়গায় মুখ দিয়ে পানি পান করলেন।) বুঝা গেল যে, হায়েযা মহিলার উচ্ছিষ্টও পাক। তা না হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশার (রা.)-এর উচ্ছিষ্ট পানি পান করতেন না। অথচ হযরত আয়েশা (রা.) হায়েযা ছিলেন।

কাফিরের উচ্ছিষ্ট পাক। তা-ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। رُوِيَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْزَلَ وَفْدَ ثَقِيْفٍ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانُوْا مُشْرِكِيْنَ - (সকীফ গোত্রের এক জামাআত মুশরিক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে অবস্থান করার অনুমতি প্রদান করছেন।) যদি মুশরিকরা নাপাক হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে মসজিদে আসতে ইজাযত দিতেন না। আল্লাহর বাণী إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ (মুশরিকরা নাপাক) দ্বারা ই'তিকাদী নাজাসাত মুরাদ, বাহ্যিক নাজাসাত মুরাদ নয়।

وَسُؤْرُ الْكَلْبِ نَجِسٌ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوْغِهِ ثَلٰثًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوْغِ الْكَلْبِ ثَلٰثًا وَلِسَانُهُ يُلَاقِى الْمَاءَ دُوْنَ الْإِنَاءِ فَلَمَّا تَنَجَّسَ الْإِنَاءُ فَالْمَاءُ أَوْلٰى وَهٰذَا يُفِيْدُ النَّجَاسَةَ وَالْعَدَدُ فِى الْغَسْلِ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِىِّ (رحـ) فِىْ إِشْتِرَاطِ السَّبْعِ وَلِأَنَّ مَا يُصِيْبُهُ بَوْلُهُ يَطْهُرُ بِالثَّلٰثِ فَمَا يُصِيْبُهُ سُؤْرُهُ وَهُوَ دُوْنَهُ أَوْلٰى وَ الْأَمْرُ الْوَارِدُ بِالسَّبْعِ مَحْمُوْلٌ عَلٰى اِبْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ وَسُؤْرُ الْخِنْزِيْرِ نَجِسٌ لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ عَلٰى مَامَرَّ وَسُؤْرُ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ نَجِسٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ (رحـ) فِيْمَا سِوَى الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ لِأَنَّ لَحْمَهَا نَجِسٌ وَمِنْهُ يَتَوَلَّدُ اللُّعَابُ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فِى الْبَابِ ـ

অনুবাদ ঃ কুকুরের উচ্ছিষ্ট নাপাক। সে যে কোনো পাত্রে মুখ দিলে তা ধৌত করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুকুরের মুখ দেওয়ার কারণে পাত্র তিনবার ধৌত করতে হবে। (দারু কুতনী) সাধারণত কুকুরের জিহ্বা পানি স্পর্শ করে, পাত্র নয়। সুতরাং পাত্র যখন নাপাক হয়ে যায়, তখন পানি নাপাক হওয়া অনিবার্য। এ হাদীসে নাপাক হওয়া এবং ধোয়ার সংখ্যা প্রমাণিত হয়। সুতরাং এ হাদীস ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর সাতবার ধোয়ার শর্ত আরোপের বিপক্ষে দলিল। তা ছাড়া যে বস্তুতে কুকুরের পেশাব লাগে, তা তিনবার ধুইলে পাক হয়ে যায়। কাজেই যে বস্তুতে তার উচ্ছিষ্ট লাগে যা পেশাবের চেয়ে সাধারণ, তা পাক হওয়া তো আরো স্বাভাবিক। আর সাতবার ধোয়া সম্পর্কে বর্ণিত নির্দেশ ইসলামের প্রথম যুগের অবস্থায় প্রযোজ্য। শূকরের উচ্ছিষ্ট নাপাক। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শূকর সত্তাগতভাবেই নাপাক। হিংস্র পশুর উচ্ছিষ্ট নাপাক। শূকর ও কুকুর ছাড়া অন্যান্য হিংস্র পশুর উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বিপরীত মত রয়েছে। আমাদের দলিল হলো, হিংস্র পশুর গোশ্ত নাপাক এবং তা থেকেই লালা সৃষ্ট। আর লালার হুকুম গোশতের উপরই নির্ভরশীল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ওপরে বর্ণিত ইবারতে কুকুরের উচ্ছিষ্ট পানির হুকুম বয়ান করা হয়েছে। ইমাম মালিক (র.) ব্যতীত সকল ইমামের মতে কুকুরের উচ্ছিষ্ট নাপাক। যদি কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দেয়, তা তিনবার ধোয়া ওয়াজিব। তবে ইমাম মালিক (র.)-এর মতে কুকুরের উচ্ছিষ্ট পাক। মোদ্দাকথা, এখানে দু'টো জিনিস লক্ষণীয়। এক. কুকুরের উচ্ছিষ্ট নাজাসাত হওয়া। দুই. কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্র তিনবার ধোয়া। এর উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস দ্বারা দলিল দেওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দেয় তা তিনবার ধৌত করতে হবে। (দারু কুত্নী) উক্ত হাদীস এভাবে দলিল হয় যে, কুকুরের জিহবা সাধারণত পানি স্পর্শ করে, পাত্র নয়। সুতরাং পাত্র যখন নাপাক হয়ে যায় তখন পানি তো অবশ্যই নাপাক হয়ে যাবে। এ স্থানে কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন যে, হতে পারে হাদীসের মধ্যে ولوغ দ্বারা লেহন মুরাদ। এ হিসাবে তো জিহ্বা পাত্রের সাথে মিলে যায়, পানির সাথে নয়। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা কিভাবে দলিল দেওয়া যাবে?

জবাব হলো, ولوغ-এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, কুকুরের জিহ্বার প্রান্ত দ্বারা পানি ইত্যাদি পান করা। আর কায়দা আছে যতক্ষণ পর্যন্ত (معنى حقيقى) প্রকৃত অর্থের খিলাফ কোনো করীনা না পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত অর্থই মুরাদ হবে। মোটকথা, হাদীস দ্বারা দু'টো জিনিস সাবিত হয়েছে। এক. কুকুরের লালা নাপাক। দুই. ধোয়ার সংখ্যা তিনবার। এ হিসাবে এ

হাদীস ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলিল হয়, কেননা তাঁর মতে সাতবার ধোয়া আবশ্যক। তাঁর দলিল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (র.)-এর বর্ণিত হাদীস–

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَائِكُمْ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعًا وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ -

(রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি কুকুর তোমাদের কোনো পাত্রে মুখ দেয় তবে তা সাতবার ধৌত করবে এবং অষ্টম বার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করবে।) আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হয় ইসলামের প্রথম যুগে কুকুরের মুখ দেওয়ার কারণে সাতবার ধোয়ার বিধান ছিল পরবর্তীতে তা মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়। আসল কথা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের প্রথম যুগে কুকুরের ব্যাপারে লোকদের উপর খুব কঠোরতা প্রদর্শন করতেন যাতে কুকুর থেকে পূর্ণভাবে পরহেয করে। পরবর্তীতে মানুষের আদতে পরিবর্তন আসায় পূর্বের বিধান রহিত হয়ে যায়। হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বিপক্ষে ইল্যামী দলিল পেশ করেন যে, যে বস্তুতে কুকুরের পেশাব লাগে তা তিনবার ধৌত করলে পাক হয়ে যায়। তাহলে যে বস্তুতে তার উচ্ছিষ্ট লাগে যা পেশাবের চেয়ে সাধারণ তা পাক হওয়া তো আরো স্বাভাবিক। উল্লেখ্য যে, কুকুরের উচ্ছিষ্টকে তার পেশাবের চেয়ে সাধারণ বলা হয়েছে এ জন্যে যে, কুকুরের পেশাবকে কেউ পাক বলেনি আর তার উচ্ছিষ্টকে ইমাম মালিক (র.) পাক বলেছেন।

سِوَى الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ الخ : আমাদের মতে হিংস্র পশু, যেমন— সিংহ, বাঘ, হাতি ইত্যাদির উচ্ছিষ্ট নাপাক। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে কুকুর ও শূকর ব্যতীত সকল হিংস্র পশুর উচ্ছিষ্ট নাপাক। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল নিম্নরূপ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মক্কা ও মদীনার মাঝখানে অবস্থিত হাউজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং এ-ও বলা হয়েছিল যে, ঐ হাউজ গুলোতে কুকুর ও হিংস্র পশু পানি পান করার জন্য আসে। জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, لَهَا مَا أَخَذَتْ فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُوْرٌ (সেগুলোর পেটে যা গেছে তা তাদের জন্য। আর অবশিষ্ট যা রয়েছে তা আমাদের পান করার জন্য এবং সেগুলো পাক।) অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ فَقَالَ نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا -

(গাধার অবশিষ্ট পানি দ্বারা আমরা অজু করতে পারি কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, হ্যাঁ এবং হিংস্র পশুর অবশিষ্ট পানি দ্বারাও অজু করা জায়েজ।) উপরোক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, হিংস্র পশুর উচ্ছিষ্ট পাক। আমাদের দলিল হলো—

إِنَّ عُمَرَ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَرَدَا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ أَتَرِدُ السِّبَاعُ مَاءَكَ هٰذَا فَقَالَ عُمَرُ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَلَوْلَا أَنَّهُ إِذَا أَخْبَرَ بِوُرُوْدِ السِّبَاعِ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِمَا اِسْتِعْمَالُهُ لَمَّا نَهَاهُ عَنْ ذَالِكَ -

(হযরত ওমর ও হযরত আম্‌রুব্‌নুল আস (রা.) একবার এক হাউজের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমর ইব্‌নুল আস (রা.) বললেন, হে হাউজের মালিক! তোমার এই পানির নিকট হিংস্র পশু আসে কী? (তার জবাবের পূর্বে) হযরত ওমর (রা.) বললেন, ওহে হাউজের মালিক। এ সম্পর্কে তুমি আমাদেরকে অবহিত করো না। কেননা যদি আমাদেরকে হিংস্র পশুর খবর দেওয়া হয় তবে তা ব্যবহার করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তা থেকে নিষেধ করেছেন।) উপরোক্ত ঘটনার দ্বারা বুঝা গেল যে, হিংস্র পশুর উচ্ছিষ্ট নাপাক। আমাদের আকলী দলিল ঃ হিংস্র পশুর গোশ্‌ত নাপাক। আর তার লালা তা থেকেই সৃষ্টি হয়। লালা পাক-নাপাক হওয়া গোশ্‌ত দ্বারা বিবেচিত। অর্থাৎ গোশ্‌ত যদি নাপাক হয় তবে লালাও নাপাক হবে। আর গোশ্‌ত পাক হলে লালাও পাক হবে। সুতরাং বুঝা গেল, হিংস্র পশুর উচ্ছিষ্ট নাপাক।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিলের জবাব : হিংস্র প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম হওয়ার হুকুম দেওয়ার আগে এর উচ্ছিষ্ট পাক ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত হুকুম রহিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় জবাব হলো, প্রশ্ন ছিল বড় হাউজের ক্ষেত্রে। আর বড় হাউজের ক্ষেত্রে আমরাও বলি যে, বড় হাউজ হিংস্র পশুর উচ্ছিষ্ট দ্বারা নাপাক হয় না।

وَسُؤْرُ الْهِرَّةِ طَاهِرٌ مَكْرُوْهٌ وَعَنْ أَبِى يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوْهٍ لِاَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصْغِىْ لَهَا الْاِنَاءَ فَتَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْهِرَّةُ سَبُعٌ وَالْمُرَادُ بَيَانُ الْحُكْمِ اِلَّا اَنَّهُ سَقَطَتِ النَّجَاسَةُ لِعِلَّةِ الطَّوَافِ فَبَقِيَتِ الْكَرَاهَةُ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلٰى مَا قَبْلَ التَّحْرِيْمِ ثُمَّ قِيْلَ كَرَاهَتُهُ لِحُرْمَةِ اللَّحْمِ وَقِيْلَ لِعَدَمِ تَحَامِيْهَا النَّجَاسَةَ وَهٰذَا يُشِيْرُ اِلَى التَّنَزُّهِ وَالْاَوَّلُ اِلَى الْقُرْبِ مِنَ التَّحْرِيْمِ ـ

অনুবাদ ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পাক (কিন্তু তা ব্যবহার করা) মাকরূহ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তা মাকরূহও নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বিড়ালের জন্য পাত্র কাত করে ধরতেন। বিড়াল তা থেকে পানি পান করতো, পরে তা দ্বারা তিনি অজু করতেন। (দারু কুত্নী) ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছে, الهرة سبع বিড়াল হিংস্র পশু। এ হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিধান বর্ণনা করা। তবে নাজাসাত হওয়ার হুকুম রহিত করা হয়েছে (গৃহের অভ্যন্তরে) সর্বদা ঘুরাফেরা করার কারণে। সুতরাং মাকরূহ হওয়ার হুকুম বাকি থেকে যায়। আর পাত্র কাত করে ধরার বর্ণনা হারাম হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ের সাথে সম্পর্কিত। উল্লেখ্য যে, কারো মতে তার উচ্ছিষ্ট মাকরূহ হওয়ার কারণ তার গোশ্ত নাপাক হওয়া। আবার কারো মতে নাজাসাত পরিহার না করার কারণে। শেষোক্ত মতে মাকরূহ তান্যীহের প্রতি এবং প্রথম মতে হারামের কাছাকাছি হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিড়ালের উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে ফুকাহায়ে আহনাফের ইখতিলাফ রয়েছে। তরফাইনের মতে পাক তবে মাকরূহ। ইমাম তাহাবী (র.)-এর মতে মাকরূহে তাহ্রীমী আর ইমাম কারখী (র.)-এর মতে মাক্রূহে তানযীহী। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে মাকরূহও নয়। এটা ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এরও অভিমত বটে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো: রাসূলুল্লাহ ﷺ বিড়ালের জন্য পাত্র কাত করে ধরতেন। বিড়াল তা থেকে পানি পান করতো। পরে তা দ্বারা তিনি অজু করতেন। এ হাদীস নকল করার পর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, كَيْفَ اَكْرَهُ مَعَ هٰذَا الْحَدِيْثِ এ হাদীস থাকা সত্ত্বেও আমি কিভাবে বিড়ালের উচ্ছিষ্টকে মাকরূহ বলব? অন্য এক হাদীসে রয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كُنْتُ اَتَوَضَّأُ اَنَا وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْ اَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَالِكَ

(আয়েশা (রা.) বলেন, আমি আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক পাত্রে অজু করতাম। অথচ পূর্বে উক্ত পাত্রে বিড়াল মুখ দিয়েছিল) এ হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট মাকরূহ নয় বরং পাক।

তরফাইনের দলিল ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, الهرة سبع বিড়াল হিংস্র প্রাণী। এ হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিধান বর্ণনা করা। নিছক বিড়ালের আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং বিড়ালের উচ্ছিষ্টের হুকুম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সৃষ্টিগত প্রকৃতি বর্ণনা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, বরং শরয়ী হুকুম বর্ণনা করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং যখন বিড়াল হিংস্র প্রাণীর অনুরূপ। তাই হিংস্র প্রাণীর ন্যায় তার উচ্ছিষ্টও নাপাক হওয়া উচিত। অথচ নাপাক বলা হয় না? এর জবাবে হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কিয়াসের চাহিদা তো এটাই ছিল। তবে ঘরের অভ্যন্তরে সর্বদা ঘুরাফিরা করার কারণে তার নাজাসাতের বিধান রহিত হয়ে যায়, আর মাকরূহ হওয়ার হুকুম বাকি থেকে যায়। علت طواف (ঘুরাফেরার

কারণ) দ্বারা হয়তো জরুরত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ জরুরতের কারণে নাজাসাত রহিত হয়ে গেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর ইজাযত চাওয়াকে ওয়াজিব করেছেন, যে কারো ঘরে প্রবেশ করতে চায়। তবে জরুরতের কারণে দাসদাসী, নাবালিগ শিশুর জন্য তিন সময় ব্যতীত (অর্থাৎ ফজরের নামাজের পূর্বে, দ্বি-প্রহরে কায়লুলার সময় এবং রাতে ইশার নামাজের পর) অন্য সময়ের জন্য উক্ত হুকুমকে রহিত করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ثَلٰثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ـ

(হে মু'মিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের নামাজের পূর্বে, দ্বি-প্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখো তখন এবং ইশার নামাজের পর।) এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এই তিন সময় ব্যতীত অন্য সময় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোনো দোষ নেই।—(২৪; নূর - ৫৮)

অথবা علت طواف দ্বারা হযরত আয়েশার হাদীসের দিকে ইশারা করা হয়েছে। হাদীসটি এই–

عَنْ عَائِشَةَ (رض الله) اَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّىْ وَفِىْ بَيْتِهَا قَصْعَةٌ مِنْ هَرِيْسَةٍ فَجَاءَتْ هِرَّةٌ وَاَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَتْ مِنْ صَلٰوتِهَا دَعَتْ جَارَاتٍ لَهَا فَكُنَّ يَتَحَامَيْنَ مِنْ مَوْضِعِ فَمِهَا فَمَدَّتْ يَدَهَا وَاَخَذَتْ مَوْضَعَ فَمِهَا وَاَكَلَتْ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْهِرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ اِنَّمَا هِىَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ اَوِ الطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ فَمَا لَكُنَّ لَاتَاْكُلْنَ ـ

(হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি নামাজ রত ছিলেন। তার ঘরে হারীসা (গোশ্ত ও গম মিশ্রিত খাদ্য বিশেষ) এর একটি পেয়ালায় রাখা ছিল। বিড়াল এসে তা থেকে খেতে লাগল। তিনি নামাজ থেকে ফারেগ হলেন, আশে-পাশের মহিলাদেরকে ডাকলেন। তারা বিড়ালের মুখ দেওয়া স্থান থেকে পরহেয করতে ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) হাত বাড়িয়ে সেখান থেকে খাওয়া আরম্ভ করলেন। আর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি বিড়াল নাপাক নয়। সে তো তোমাদের আশে-পাশে ঘুরাফেরা করে। তোমাদের কি হলো তোমরা খাচ্ছ না?) মোদ্দাকথা, কিয়াসের চাহিদাও এই যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক হওয়া উচিত। তবে উপরোক্ত হাদীসের কারণে তার নাজাসাতের হুকুম রহিত হয়ে যায়। আর কারাহাতের হুকুম বাকি থেকে যায়।

ইমাম আবূ ইউসুফ কর্তৃক উপস্থাপিত হাদীসের জবাব হলো, ঐ হুকুম হারাম হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ের উপর محمول।

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট মাকরূহে তাহ্রীমী হওয়ার উপর ইমাম তাহাবী (র.)-এর দলিল হলো, পানির মধ্যে যেহেতু বিড়ালের গোশ্ত হারাম, তাই এর উচ্ছিষ্ট মাকরূহ হবে। আর হারামের কারণে যে কারাহাত হয় তা কারাহাতে তাহ্রীমীই হয় কারাহাতে তানযীহী নয়। অতএব বিড়ালের উচ্ছিষ্ট মাকরূহ তাহরীমা হবে।

ইমাম কারখী (র.)-এর দলিল (কারাহাতে তানযীহী হওয়ার উপর) বিড়ালের উচ্ছিষ্ট মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো, সে নাজাসাত পরিহার করে না। সতর্কতা অবলম্বন করে না। আর অসতর্কতার কারণে যে কারাহাত আসে তা কারাহাতে তানযীহী-ই হয়, কারাহাতে তাহ্রীমী নয়।

وَلَوْ اَكَلَتِ الْفَارَةَ ثُمَّ شَرِبَتْ عَلٰى فَوْرِهِ الْمَاءَ يَتَنَجَّسُ اِلَّا اِذَا مَكَثَتْ سَاعَةً لِغَسْلِهَا فَمَهَا بِلُعَابِهَا وَالْاِسْتِثْنَاءُ عَلٰى مَذْهَبِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) وَيَسْقُطُ اِعْتِبَارُ الصَّبِّ لِلضَّرُوْرَةِ - وَسُؤْرُ الدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّاةِ مَكْرُوْهٌ لِاَنَّهَا تُخَالِطُ النَّجَاسَةَ وَلَوْ كَانَتْ مَحْبُوْسَةً بِحَيْثُ لَا يَصِلُ مِنْقَارُهَا اِلٰى مَا تَحْتَ قَدَمَيْهَا لَا يُكْرَهُ لِوُقُوْعِ الْاَمْنِ عَنِ الْمُخَالَطَةِ وَكَذَا سُؤْرُ سِبَاعِ الطَّيْرِ لِاَنَّهَا تَاْكُلُ الْمَيْتَاتِ فَاَشْبَهَ الدَّجَاجَةَ الْمُخَلَّاةَ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) اَنَّهَا اِذَا كَانَتْ مَحْبُوْسَةً يَعْلَمُ صَاحِبُهَا اَنَّهُ لَاقَذَرَ عَلٰى مِنْقَارِهَا لَا يُكْرَهُ لِوُقُوْعِ الْاَمْنِ عَنِ الْمُخَالَطَةِ وَاسْتَحْسَنَ الْمَشَائِخُ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ -

অনুবাদ ঃ বিড়াল যদি ইঁদুর খেয়ে সাথে সাথে পানি পান করে, তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। তবে কিছু সময় বিলম্ব করার পর হলে নাপাক হবে না। কেননা সে লালা দ্বারা মুখ পরিষ্কার করে ফেলে। এ ব্যতিক্রম শুধু ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মুতানুযায়ী। আর অনিবার্য প্রয়োজন বশতঃ পাক হওয়ার জন্য পানি ঢালার শর্তটি রহিত হয়ে যাবে। ছেড়ে দেওয়া মুরগির উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। কেননা ছাড়া মুরগি নাজাসাত ঘাটে। তবে যদি এমনভাবে বাঁধা থাকে যে, তার পায়ের নিচ পর্যন্ত তার ঠোঁট পৌঁছে না, তাহলে নাজাসাতের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত থাকার কারণে মাকরূহ হবে না। হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্টও তদ্রূপ নাপাক। কেননা এরা মরা খায়, সুতরাং ছাড়া মুরগির মতোই হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, হিংস্র পাখি যদি আবদ্ধ থাকে এবং মালিক জানে যে, পাখির ঠোঁটে ময়লা নেই, তাহলে (নাজাসাতের) সংস্পর্শ থেকে সংরক্ষিত থাকার কারণে (তার উচ্ছিষ্ট) মাকরূহ হবে না। মাশায়িখগণ এবর্ণনাকে উত্তম বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : বিড়াল যদি ইঁদুর খেয়ে সাথে সাথে পাত্রে মুখ দিয়ে পানি পান করা আরম্ভ করে তবে এই পানি নাপাক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি কিছু সময় বিলম্ব করার পর পানি পান করে তবে শায়খাইনের মতে পানি নাপাক হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এ সুরতেও পানি নাপাক হয়ে যাবে।

শায়খাইনের দলিল হলো— তাঁদের মতে প্রবহমান পবিত্র জিনিস থেকে নাজাসাত দূর করা জায়েজ আছে। সুতরাং বিড়াল যখন ইঁদুর খেয়ে অল্পক্ষণ বিলম্ব করেছে। বুঝতে হবে সে তার জিহ্বা দ্বারা মুখকে সাফ করে নিয়েছে এবং নাজাসাত গিলে ফেলেছে। তারপর পাত্রে মুখ দিয়ে পানি পান করেছে। বেশির থেকে বেশি এ কথা বলা যাবে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে অঙ্গ পাক করার জন্য পানি বহিয়ে দেওয়া শর্ত, যা এখানে পাওয়া যায়নি? এর জবাব হলো, জরুরতের কারণে পানি বহিয়ে দেওয়ার শর্ত সাকিত হয়ে গেছে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যেহেতু পানি ব্যতীত নাজাসাত দূরীভূত হয় না, তাই এ ধরনের বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সর্বদা নাপাক থাকবে। সে লালা দ্বারা তার মুখ পরিষ্কার করুক বা না করুক।

وَسُؤْرُ الدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّاةِ ঃ নাজাসাত, পায়খানা ইত্যাদিতে ঘুরে এমন মুরগির উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। কেননা এ মুরগি নাজাসাত ঘাটে। তাই তার উচ্ছিষ্ট কারাহাত থেকে খালি হবে না। তবে যদি মুরগি বাঁধা থাকে এবং তার ঠোঁট তার পায়ের নিচ পর্যন্ত না পৌঁছে তবে তার উচ্ছিষ্ট মাকরূহ হবে না। দলিল হলো— কারাহাত নাজাসাতের সাথে সংমিশ্রণের কারণে আসে, আর বাঁধা থাকার কারণে নাপাক থেকে নিরাপদ থাকে তাই তার উচ্ছিষ্ট মাকরূহ হবে না। শিকারি প্রাণীরও একই হুকুম। কারণ এগুলো মুরদার খায় তাই এগুলোও ছাড়া মুরগির অনুরূপ।

ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, হিংস্র প্রাণীর উপর কিয়াসের চাহিদাতো ছিল এই যে, শিকারি প্রাণীর উচ্ছিষ্টও নাপাক হওয়া। তবে ইস্তিহ্সানান তাকে নাপাক বলা হয়নি। ইস্তিহ্সানের কারণ হলো— প্রাণী তার ঠোঁট দ্বারা পানি পান করে। আর ঠোঁটটি হলো শুষ্ক হাড় বিশেষ। পক্ষান্তরে হিংস্র প্রাণী তার মুখ দ্বারা পান করে, যা তার লালার কারণে সিক্ত থাকে। তাই হিংস্র প্রাণী তার মুখে পানি নেওয়ার সাথে সাথেই তার লালার সাথে তা মিশ্রিত হয়ে যায়। এ কারণে পানি নাপাক হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হিংস্র প্রাণী যদি আবদ্ধ থাকে আর তার মালিকের বিশ্বাস যে, তার ঠোঁটে ময়লা নেই তবে এ অবস্থায় তার উচ্ছিষ্ট মাকরূহ হবে না। কেননা এ সুরতে নাজাসাত থেকে নিরাপদ থাকা যায়। মাশায়িখগণ এ মত-ই উত্তম বলেছেন এবং এর উপরই ফাত্ওয়া দিয়েছেন। ফকীহ আবুল্ লাইস (র.) বলেন, হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পাখি যদি মুরদার না খায়, তবে তার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অজু করা মাকরূহ নয়।

وَسُؤْرُ مَا يَسْكُنُ الْبُيُوتَ كَالْحَيَّةِ وَالْفَارَةِ مَكْرُوْهٌ لِاَنَّ حُرْمَةَ اللَّحْمِ اَوْجَبَتْ نَجَاسَةَ السُّؤْرِ اِلَّا اَنَّهُ سَقَطَتِ النَّجَاسَةُ لِعِلَّةِ الطَّوَافِ فَبَقِيَتِ الْكَرَاهَةُ وَالتَّنْبِيْهُ عَلَى الْعِلَّةِ فِى الْهِرَّةِ ـ وَسُؤْرُ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ مَشْكُوْكٌ فِيْهِ قِيْلَ اَلشَّكُّ فِى الطَّهَارَةِ لِاَنَّهُ لَوْ كَانَ طَاهِرًا لَكَانَ طَهُوْرًا مَالَمْ يَغْلِبِ اللُّعَابُ عَلَى الْمَاءِ وَقِيْلَ اَلشَّكُّ فِىْ طَهُوْرِيَّتِهِ لِاَنَّهُ لَوْ وَجَدَ الْمَاءَ لَايَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ رَأْسِهِ وَكَذَا لَبَنُهُ طَاهِرٌ وَعِرَقُهُ لَايَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلٰوةِ وَاِنْ فَحُشَ فَكَذَا سُؤْرُهُ وَهُوَ الْاَصَحُّ وَيُرْوٰى نَصُّ مُحَمَّدٍ (رحـ) عَلٰى طَهَارَتِهِ وَسَبَبُ الشَّكِّ تَعَارُضُ الْاَدِلَّةِ فِىْ اِبَاحَتِهِ وَحُرْمَتِهِ اَوْ اِخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ (رضـ) عَنْهُمْ فِىْ نَجَاسَتِهِ وَطَهَارَتِهِ وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ نَجِسٌ تَرْجِيْحًا لِلْحُرْمَةِ وَالنَّجَاسَةِ وَالْبَغْلُ مِنْ نَسْلِ الْحِمَارِ فَيَكُوْنُ بِمَنْزِلَتِهِ ـ

অনুবাদ ঃ সাপ, ইঁদুর ইত্যাদি গৃহে অবস্থানকারী প্রাণীর উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। কেননা (এগুলোর) গোশ্‌ত হারাম হওয়ার অবশ্যম্ভাবী চাহিদা হলো উচ্ছিষ্ট নাপাক হওয়া। তবে সর্বদা গৃহে বিচরণের কারণে নাজাসাতের হুকুম রহিত হয়ে যায়, মাকরূহ হওয়ার হুকুম অবশিষ্ট থাকে। আর বিচরণের কারণটি বিড়ালের (ব্যাপারে) উল্লেখ করা হয়েছে। গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট সন্দেহযুক্ত। কারো মতে সন্দেহটি পবিত্রতা সম্পর্কে। কেননা উচ্ছিষ্ট পানি পবিত্র হলে অবশ্যই পাবিত্রকারীও হবে যতক্ষণ না লালা পানির চেয়ে অধিক হয়। অন্যমতে সন্দেহটি পানির পবিত্রকরণ গুণ সম্পর্কে। কেননা সে যদি পানি পায়, তবে তার মাথা ধোয়া তার জন্য ওয়াজিব নয়। তদ্রূপ তার দুধ পাক। তার ঘাম নামাজের বৈধতাকে বাধাগ্রস্ত করে না, যদিও পরিমাণে তা বেশি হয়। সুতরাং তার উচ্ছিষ্টও অনুরূপ হবে। এ মতই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। গাধার উচ্ছিষ্ট পাক হওয়া সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর স্পষ্ট মত বর্ণিত রয়েছে। সন্দেহের কারণ হচ্ছে গাধার গোশ্‌ত হালাল বা হারাম হওয়া দলিলগুলো পরস্পর বিরোধী। কিংবা তার উচ্ছিষ্ট পাক বা নাপাক হওয়া সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হারাম ও নাপাক হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে গাধার উচ্ছিষ্টকে নাজিস বলেছেন। খচ্চর যেহেতু গাধার প্রজননভুক্ত। সুতরাং সেও গাধার পর্যায়ে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ঘরে অবস্থানকারী প্রাণী যেমন সাপ, ইঁদুর ইত্যাদির উচ্ছিষ্ট পানিও মাকরূহ। দলিল হলো এগুলোর গোশ্‌ত হারাম হওয়া এ কথার প্রমাণ বহণ করে যে, তার উচ্ছিষ্ট নাপাক হোক। তবে এগুলোর গৃহে ঘুরাফিরার কারণে নাজাসাতের হুকুম রহিত হয়ে গেছে আর কারাহাত বাকি রয়ে গেছে।

وَالتَّنْبِيْهُ عَلَى الْعِلَّةِ, দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হলো, ঘরে অবস্থানকারী প্রাণীর উচ্ছিষ্ট থেকে নাজাসাত রহিত হওয়ার ইল্লত طواف (ঘুরাফেরা) তা কিভাবে বুঝা যায়? জবাব হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট থেকে নাজাসাত রহিত হওয়ার ইল্লত طواف বয়ান করেছেন। যেমন– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ। আর এ ইল্লত ঘরে অবস্থানকারী প্রাণীর মধ্যে পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। কেননা ঘরের বাতি বা অন্যান্য ফাঁক বন্ধ করে দিলে বিড়াল আসতে পারে না। সাপ, ইঁদুর ইত্যাদির ঘুরার পথ বন্ধ করা যায় না তারা যে কোনো ভাবেই এসে যায়। সুতরাং ইল্লতে তাওয়াফ দ্বারা যখন বিড়ালের উচ্ছিষ্ট থেকে নাজাসাত সাকিত হয়ে গেছে। তাহলে তো ঘরে অবস্থানকারী প্রাণী থেকে অবশ্যই নাজাসাত সাকিত হয়ে যাবে।

وَسُؤْرُ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ الخ ঃ উক্ত ইবারতের মধ্যে গাধা দ্বারা গৃহ পালিত গাধা আর খচ্চর দ্বারা যার মা গাধী তা মুরাদ। সুতরাং যদি তার মা ঘুড়ি বা গরু হয় তবে তার উচ্ছিষ্ট পাক।— (শরহে নিকায়া)

এখন মূল মাসআলা হলো— গৃহ পালিত গাধা আর ঐ খচ্চর যা গাধীর পেট থেকে বেরিয়ে এসেছে উভয়ের উচ্ছিষ্ট সন্দেহযুক্ত। অধিকাংশ মাশায়েখের মতে এটাই হুকুম। শায়খ আবূ তাহির দাব্বাস (র.) বলেছেন, এগুলোর উচ্ছিষ্ট সন্দেহযুক্ত নয়। কেননা আহ্কামে খোদাওন্দীর কোনো হুকুমই সন্দেহযুক্ত নয়; বরং তার মতে গাধার উচ্ছিষ্ট পাক। যদি সে পানিতে কাপড় ডুবে যায় তবে ঐ কাপড় দ্বারা নামাজ জায়েজ। তবে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তাই এ পানি ছাড়া যদি অন্য কোনো পানি না পাওয়া যায় তবে অজু এবং তায়াম্মুম উভয়টি করা উচিত।

ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, এগুলোর উচ্ছিষ্ট তাহির ও মুতাহ্হির উভয়টি। তার মতে যে প্রাণীর চামড়া উপকার যোগ্য তার উচ্ছিষ্ট পাক।

সন্দেহটি পানির তাহারাতের মধ্যে নাকি পবিত্রকারী হওয়ার মধ্যে এ ব্যাপারে ইখ্তিলাফ রয়েছে। কোনো কোনো মাশায়েখ বলেন, গাধার লালার তাহারাতের মধ্যে সন্দেহ রয়েছে অর্থাৎ তার লালা পাক না-কি নাপাক?

দলিল হলো— যদি গাধার লালা পাক হতো তবে তো যে পানিতে এ লালা মিশ্রিত হতো সে পানির পবিত্রতা বাকি থাকতো। যতক্ষণ না লালা পানির উপর গালিব হতো। যেমনটি পানিতে পাক জিনিস মিশ্রিত হওয়ার দ্বারা হয়ে থাকে। অথচ লালার প্রাধান্য ছাড়াও তার দ্বারা তাহারাত হাসিল করা যথেষ্ট নয়। বুঝা গেল যে, সন্দেহটি তার পাক হওয়ার মধ্যে।

কোনো কোনো মাশায়েখের অভিমত হলো— গাধার লালার তাহুর ও মুতাহ্হির উভয়টির মাঝে সন্দেহ রয়েছে। অর্থাৎ গাধার লালা সত্তাগতভাবে পাক তবে সন্দেহ হলো তা পবিত্রকারী কি-না! দলিল হচ্ছে— যদি কোনো ব্যক্তি প্রথমে গাধার উচ্ছিষ্ট দ্বারা মাথা মাসাহ করে, পরে যদি সাধারণ পানি পাওয়া যায় তবে তার মাথা ধোয়া ওয়াজিব নয়। যদি গাধার উচ্ছিষ্টের তাহারাতের মাঝে সন্দেহ হতো তবে পুনরায় ঐ ব্যক্তির মাথা ধোয়া ওয়াজিব হতো। বুঝা গেল যে, গাধার উচ্ছিষ্ট তো সত্তাগতভাবে পাক। তবে অন্যকে পাক করবে কি-না এতে সন্দেহ। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, গাধীর দুধও পাক। এ হুকুম ظاهر الرواية অনুযায়ী নয়; বরং ইমাম (র.) থেকে বর্ণিত একটি রিওয়ায়াত। ظاهر الرواية হলো গাধীর দুধ নাপাক।

গাধার ঘাম-এর ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে তিনটি রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। এক. গাধার ঘাম পাক। নামাজ জায়েজ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। দুই. নাজাসাতে খফীফা। তিন. নাজাসাতে গলীযা। তবে মাশহুর রিওয়ায়াত অনুযায়ী পাক। সুতরাং ঘামের ন্যায় তার উচ্ছিষ্টও পাক হবে। কেননা ঘাম ও লালা গোশ্ত থেকেই সৃষ্টি হয়। তাই উভয়টির হুকুম একই হুকুম হবে। হিদায়া প্রণেতা বলেন, এটাই বিশুদ্ধ মত যে, সন্দেহটি পবিত্রতা সম্পর্কে নয়; বরং পবিত্রকরণ গুণ সম্পর্কে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)ও গাধার উচ্ছিষ্ট পাক হওয়ার ব্যাপারে মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন চারটি জিনিসের মধ্যে কাপড় ডুবে গেলে কাপড় নাপাক হবে না। ঐ চারটি জিনিস হলো– গাধার উচ্ছিষ্ট, ব্যবহৃত পানি, গাধীর দুধ এবং হালাল প্রাণীর পেশাব।

গ্রন্থকার আরো বলেন, গাধার উচ্ছিষ্ট সন্দেহযুক্ত হওয়ার দু'টো কারণ ঃ এক. তার হালাল ও হারাম হওয়ার দলিলের বিভিন্নতা, যেমন বর্ণিত আছে– إِنَّ غَالِبَ ابْنَ اَبْجَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ لَمْ يَبْقَ لِيْ مَالٌ اِلَّا حُمَيْرَاتٌ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلْ مِنْ سَمِيْنِ مَالِكَ - (গালিব ইবনে আবজুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, (হে আল্লাহর রাসূল!) আমার নিকট গাধা ব্যতীত আর কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যা মোটাতাজা তা খেয়ে নাও।) এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল গাধার গোশ্ত হালাল। অন্যত্র বর্ণিত রয়েছে– إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّمَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ (রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের দিন পালিত গাধার গোশ্তকে হারাম করেছেন।) এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝে যায় যে, গাধার গোশ্ত হারাম। দ্বিতীয় কারণ এই যে, গাধার উচ্ছিষ্ট পাক-নাপাক হওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইখ্তিলাফ। যেমন– আব্দুল্লাহ ইব্নে উমর (রা.) থেকে নাপাক আর ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে পাক হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। শায়খুল ইসলাম (র.) বলেন, গাধার গোশ্ত কোনো ধরনের সন্দেহ ব্যতীত হারাম এবং তার উচ্ছিষ্ট নাপাক। কেননা এখানে মুহাররিম ও মুবীহ একত্রিত হয়েছে এ অবস্থায় মুহাররিমটা মুবীহ এর উপর প্রাধান্য পায়, যেমন একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বলল এই গোশ্ত মাজূসীর যবীহা। আর অপর জন বলল, মুসলমানের যবীহা। এ অবস্থায় মুহাররিম প্রাধান্য পাবে, তাই এই গোশ্ত হারাম হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও একটি বর্ণনা রয়েছে যে, গাধার উচ্ছিষ্ট নাপাক। কেননা হুরমত ও নাজাসাত প্রবল। তা ছাড়া খচ্চর যেহেতু গাধার প্রজননভুক্ত সেহেতু খচ্চরের হুকুমও গাধার অনুরূপ হবে।

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا يَتَوَضَّأُ بِهِمَا وَيَتَيَمَّمُ وَيَجُوْزُ اَيُّهُمَا قَدَّمَ وَقَالَ زُفَرُ (رح) لَايَجُوْزُ اِلَّا اَنْ يُقَدِّمَ الْوُضُوْءَ لِاَنَّهُ مَاءٌ وَاجِبُ الْاِسْتِعْمَالِ فَاَشْبَهَ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ وَلَنَا اَنَّ الْمُطَهِّرَ اَحَدُهُمَا فَيُفِيْدُ الْجَمْعَ دُوْنَ التَّرْتِيْبِ وَسُؤْرُ الْفَرَسِ طَاهِرٌ عِنْدَهُمَا لِاَنَّ لَحْمَهُ مَاكُوْلٌ وَكَذَا عِنْدَهُ فِى الصَّحِيْحِ لِاَنَّ الْكَرَاهَةَ لِاِظْهَارِ شَرَفِهِ ـ

অনুবাদ ঃ যদি গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট পানি ছাড়া অন্য পানি না পাওয়া যায়, তাহলে তা দ্বারা অজু করবে এবং তায়াম্মুম ও করবে এবং যে কোনোটা আগে করা জায়েজ। ইমাম যুফার (র.) বলেন, অজুকে অগ্রবর্তী না করলে জায়েজ হবে না। কেননা তা এমন পানি (শরিয়তের হুকুম মতে) যা ব্যবহার করা ওয়াজিব। সুতরাং তা সাধারণ পানি সদৃশ। আমাদের দলিল হলো— যেহেতু পবিত্রকারী হলো দু'টির যে কোনো একটি, ফলে উভয়ের একত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এর চাহিদা ক্রমবিন্যাস (ترتيب) নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ঘোড়ার উচ্ছিষ্ট পাক। কেননা তার গোশ্‌ত হালাল। বিশুদ্ধ বর্ণনায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতও অনুরূপ। কেননা গোশ্‌ত মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো তার মর্যাদা প্রকাশ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : অজুকারী ব্যক্তির নিকট যদি সন্দেহযুক্ত পানি ব্যতীত কোনো পানি না থাকে তবে হুকুম হলো, ঐ পানি দ্বারা অজু করবে এবং পরে তায়াম্মুমও করবে। উভয়টির যে কোনোটি আগে-পরে করা যায়, তবে ইমাম যুফার (র.) বলেন, শুধু অজু অগ্রে করা জায়েজ। তাঁর দলিল হলো— সন্দেহযুক্ত পানি এমন পানি শরিয়তের হুকুম মতে যা ব্যবহার করা ওয়াজিব তাই তা সাধারণ পানির সদৃশ।

আমাদের দলিল হলো— সন্দেহযুক্ত পানি দ্বারা অজু ও তায়াম্মুমের মধ্য থেকে যে কোনো একটি পবিত্রকারী। অর্থাৎ দু'টোর যে কোনো একটি দ্বারা তাহারাত অর্জন হয়ে যাবে। এখন যদি সন্দেহযুক্ত পানি দ্বারা তাহারাত হাসিল হয়েই যায়, তবে মাটি ব্যবহারে কোনো ফায়দা নেই, আগে করুক বা পরে করুক। আর যদি পবিত্রকারী শুধু মাটি হয় তবে আগ-পিছ দ্বারা কোনো ক্ষতি নেই। মোদ্দাকথা, পবিত্রকারী যেহেতু দু'টির যে কোনো একটি, তাই উভয়ের একত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়, ক্রমবিন্যাস দ্বারা কোনো ফায়দা নেই।

ঘোড়া নর বা মাদী হোক সাহেবাইনের মতে তার উচ্ছিষ্ট পাক। কেননা এর গোশ্‌ত হালাল। আর যার গোশ্‌ত হালাল তার উচ্ছিষ্ট পাক হয়। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে চারটি বর্ণনা রয়েছে। এক. তা ব্যতীত অন্য পানি দ্বারা অজু করা ভালো। দুই. তার গোশ্‌তের ন্যায় তার উচ্ছিষ্টও মাকরূহ। তিন. গাধার উচ্ছিষ্টের ন্যায় মাশকূক। চার. পাক, আর এটাই হলো বিশুদ্ধ মত। প্রশ্ন হলো ইমাম সাহেবের নিকট ঘোড়ার গোশ্‌ত মাকরূহ, তাহলে তার উচ্ছিষ্ট কিভাবে পাক হবে? জবাব হলো, গোশ্‌ত মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো তার মর্যাদা প্রচার করা। কেননা ঘোড়া জিহাদের অস্ত্র। নাজাসাতের কারণে নয়। তাই তার গোশতের কারাহাত দ্বারা তার উচ্ছিষ্টে কোনো প্রভাব পড়বে না।

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ نَبِيْذَ التَّمْرِ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلاَ يَتَيَمَّمُ لِحَدِيْثِ لَيْلَةِ الْجِنِّ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَضَّأَ بِهِ حِيْنَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) يَتَيَمَّمُ وَلاَ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) عَمَلاً بِآيَةِ التَّيَمُّمِ لِاَنَّهَا اَقْوٰى اَوْ هُوَ مَنْسُوْخٌ بِهَا لِاَنَّهَا مَدَنِيَّةٌ وَلَيْلَةُ الْجِنِّ كَانَتْ مَكِّيَّةً وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ لِاَنَّ فِى الْحَدِيْثِ اِضْطِرَابًا وَفِى التَّارِيْخِ جَهَالَةٌ فَوَجَبَ الْجَمْعُ اِحْتِيَاطًا قُلْنَا لَيْلَةُ الْجِنِّ كَانَتْ غَيْرَ وَاحِدَةٍ فَلاَ يَصِحُّ دَعْوَى النَّسْخِ وَالْحَدِيْثُ مَشْهُوْرٌ عَمِلَتْ بِهِ الصَّحَابَةُ وَبِمِثْلِهِ يُزَادُ عَلَى الْكِتَابِ وَاَمَّا الْاِغْتِسَالُ بِهِ فَقَدْ قِيْلَ يَجُوْزُ عِنْدَهُ اِعْتِبَارًا بِالْوُضُوْءِ وَقِيْلَ لاَيَجُوْزُ لِاَنَّهُ فَوْقَهُ ـ

অনুবাদ ঃ যদি খুরমা ভিজানো পানি ছাড়া কোনো পানি পাওয়া না যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, তা দ্বারা অজু করবে, তায়াম্মুম করবে না। কেননা জিন সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাতের রাত্রি সম্পর্কীয় হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি না পেয়ে খুরমা ভিজানো পানি দ্বারা অজু করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তায়াম্মুম করবে, অজু করবে না। আবূ হানীফা (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-ও এ মত পোষণ করেন, তায়াম্মুমের আয়াতের উপর আমল করার পরিপ্রেক্ষিতে। কেননা আয়াত অধিক শক্তিশালী। অথবা হাদীস আয়াতের দ্বারা রহিত। কেননা তায়াম্মুমের আয়াত মাদানী আর জিনের রাত্রির ঘটনা হলো মাক্কী। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, অজু ও তায়াম্মুম দু'টোই করবে। কেননা হাদীসের বর্ণনায় স্ববিরোধিতা রয়েছে। আর (ঘটনাটির) তারিখ (সঠিক) জানা নেই। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বনে উভয়টির উপর আমল করা ওয়াজিব। আমাদের পক্ষ থেকে জবাব এই যে, লাইলাতুল জিনের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছিল। সুতরাং রহিত হওয়ার দাবি সঠিক নয়। আর হাদীসটি মশহুর পর্যায়ের, যার উপর সাহাবায়ে কেরাম আমল করেছেন। এ ধরনের মশহুর হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাহ (এর হুকুমে) বাড়ানো যায়। আর তা দ্বারা গোসল করার ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা জায়েজ আছে, অজুর উপর কিয়াস করে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, গোসল জায়েজ নয়। কেননা গোসল অজুর চেয়ে উপরের স্তরের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা ঃ যদি খেজুর ভিজানো পানি ছাড়া অন্য কোনো পানি পাওয়া না যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে তিন ধরনের রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। এক. জামে সগীর ও যিয়াদাত-এ বর্ণিত আছে যে, তা দ্বারা অজু করবে, তায়াম্মুম করবে না। দুই. ইমাম সাহেব বলেছেন, আমার নিকট তা দ্বারা অজু করা এবং পরে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা অধিক পছন্দনীয়। শায়খুল ইসলাম (র.) বলেন, ইমাম সাহেবের উপরোক্ত অভিমতে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদি শুধু নাবীযে তামার দ্বারা অজু করে আর তায়াম্মুম না করে তবে তা জায়েজ। আর যদি তার উল্টো করে তাহলে জায়েজ নেই। তবে অজু ও তায়াম্মুম উভয়টি করা মোস্তাহাব। তিন. নূহ ইবনে আবী মারইয়াম ও হাসান ইবনে যিয়াদ (ইমাম সাহেব থেকে) বর্ণনা করে বলেন, প্রথমে তায়াম্মুম করবে তবে পরে নাবীযে তামার দ্বারা অজু করবে না। এ মতটিই ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম শাফি'ঈ (র.) গ্রহণ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, নাবীযে তামার দ্বারা অজু ও তায়াম্মুম উভয়টি করবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রথম রিওয়ায়াতের কারণ হলো হাদীসে লাইলাতুল জিন। হাদীসটি এই–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ قَالَ لِيَقُمْ مَعِيْ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَامَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَحَمَلَهُ اَىْ اَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ نَفْسِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ وَخَطَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَوْلِيْ خَطًّا وَقَالَ لاَ تَخْرُجْ عَنْ هٰذَا الْخَطِّ فَاِنَّكَ اِنْ خَرَجْتَ عَنْهُ لَمْ تَلْقَنِيْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ ذَهَبَ يَدْعُو الْجِنَّ اِلَى الْاِيْمَانِ وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنَ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ رَجَعَ

بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ وَقَالَ لِيْ هَلْ بَقِيَ مَعَكَ مَاءٌ اَتَوَضَّأُ بِهِ فَقُلْتُ لَا إِلَّا نَبِيْذَ التَّمْرِ فِيْ إِدَاوَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ وَاَخَذَهُ وَتَوَضَّأَ بِهِ وَصَلَّى الْفَجْرَ ـ (عنايه)

(হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কতৃক বর্ণিত আছে, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন, আর বলছিলেন, এমন এক ব্যক্তি আমার সাথে চলার জন্য দাঁড়িয়ে যাও যার অন্তরে যাররা পরিমাণ অহঙ্কার নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) দাঁড়ালেন। তিনি তাকে সাথে নিলেন। আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসউদ (রা.) বলেন, আমরা মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চতুষ্পার্শ্বে একটি দাগ কাটলেন, আর বললেন, এ দাগের বাহিরে যাবে না। কেননা তুমি যদি এর বাহিরে চলে যাও তবে কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে খুঁজে পাবে না। অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) জিনদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিতে লাগলেন। তাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করলেন, এমনকি ফজরের সময় হয়ে গেল। ফজরের পর তিনি তাশরীফ আনলেন আর আমাকে বললেন, তোমার নিকট অবশিষ্ট পানি আছে কী? আমি তা দ্বারা অজু করব। আমি বললাম, না; তবে পাত্রে নাবীযে তামার আছে। তিনি বললেন, খেজুর পবিত্র এবং পানি ও পবিত্র। অতঃপর তা দ্বারা তিনি অজু করলেন।— (ইনায়া)

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, যদি নাবীযে তামার ছাড়া অন্য কোনো পানি না থাকে তবে তা দ্বারা অজু করবে পরে তায়াম্মুমের কোনো প্রয়োজন নেই। যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম শাফে'ঈ (র.)-এর মতামতের কারণ হলো, তায়াম্মুমের আয়াত فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا-এর মধ্যে সাধারণ পানি না থাকা অবস্থায় تطهير-এর নিসবত মাটির দিকে করা হয়েছে আর নাবীযে তামার সাধারণ পানি নয়। সুতরাং উপরোক্ত হাদীস তায়াম্মুমের আয়াত দ্বারা রদ হয়ে যায়। কেননা আয়াতটি হাদীসের মোকাবেলায় অধিক শক্তিশালী। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, লাইলাতুল জিনের হাদীসটি তায়াম্মুমের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কেননা তায়াম্মুমের আয়াতটি হিজরতের পর মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর লাইলাতুল জিনের ঘটনাটি মক্কায় অবস্থানকালে ঘটেছে। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, পরের হুকুমটি পূর্বের হুকুমের জন্য নাসিখ হয়ে থাকে। তাই নাবীযে তামার দ্বারা অজু করার হুকুম তায়াম্মুমের আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো— লাইলাতুল জিনের হাদীসের মধ্যে اضطراب (স্ববিরোধিতা) রয়েছে। কেননা কোনো কোনো হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ইবনে মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে লাইলাতুল জিনে ছিলেন। অন্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবনে মাসউদ (রা.) সাথে ছিলেন না। তা ছাড়া সঠিকভাবে জানা যায় না যে, লাইলাতুল জিন কখন সংঘটিত হয়েছে? সুতরাং সতর্কতার চাহিদা হলো উভয়টির উপর আমল করা অর্থাৎ নাবীযে তামার দ্বারা অজুও করবে পরে তায়াম্মুমও করবে।

আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হচ্ছে— (যা মূলত সকলের দলিলের জবাব) লাইলাতুল জিনের ঘটনা শুধু একবার ঘটেনি; বরং কয়েকবার ঘটেছে। ইনায়া প্রণেতা তাইসীর-এর হাওয়ালায় লিখেছেন যে, জিন সম্প্রদায় দু'বার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে এসেছিল। সম্ভবত দ্বিতীয়বার মদীনায় আয়াতে তায়াম্মুম অবতীর্ণ হওয়ার পর এসেছিল। এমনিভাবে ফাতহুল কাদীরের গ্রন্থকার লিখেছেন। যাহিরে হাদীসের মধ্যে লাইলাতুল জিনের কথা ছয় বার এসেছে। একবার বাকীয়ে গারকাদে এ ঘটনা ঘটেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ইবনে মাসউদ (রা.) ছিলেন। দু'বার মক্কায় ঘটেছে। চতুর্থবার মদীনার বাহিরে ঘটেছে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.) ছিলেন। সুতরাং লাইলাতুল জিনের ঘটনা যখন বারবার ঘটেছে, তখন হতে পারে, যে ঘটনায় নাবীযে তামার দ্বারা অজুর কথা রয়েছে, তা মদীনায় আয়াতে তায়াম্মুম নাজিল হওয়ার পর ঘটেছে। তাই এ সুরতে আয়াতে তায়াম্মুম দ্বারা ঐ হাদীস রহিত হওয়ার দাবি কিভাবে সহীহ হবে। হিদায়া গ্রন্থকারের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় জবাব হলো, এ হাদীসটি মাশহুর পর্যায়ের, যার উপর সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাআত আমল করেছেন। যেমন হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে اَلْوُضُوْءُ بِنَبِيْذِ التَّمْرِ وُضُوْءُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ (নাবীযে তামার দ্বারা ঐ ব্যক্তি অজু করবে যে ব্যক্তি সাধারণ পানি না পায়।) আরো অন্যান্যভাবেও হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, اَنَّهُ كَانَ لَا يَرٰى بَأْسًا بِالْوُضُوْءِ بِنَبِيْذِ التَّمْرِ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ (হযরত আলী (রা.) পানি না থাকা অবস্থায় নাবীযে তামার দ্বারা অজু করাকে কিছু মনে করতেন না।)

ইকরিমা হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন– اِنَّهُ قَالَ تَوَضَّؤُوْا بِنَبِيْذِ التَّمْرِ وَلَا تَتَوَضَّؤُوْا بِاللَّبَنِ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নাবীযে তামার দ্বারা অজু করো দুধ দ্বারা করো না। মোদ্দাকথা, হাদীসে লাইলাতুল জিন হাদীসে মাশহুর এবং বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের মামূল বিহাও। আর এ ধরনের হাদীসে মাশহুর দ্বারা কিতাবুল্লাহ-এর হুকুমে বাড়ানো যায়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট নাবীযে তামার দ্বারা গোসল করা জায়েজ কি না এ পর্যায়ে ওলামায়ে আহনাফের মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, অজুর উপর কিয়াস করে ইমাম সাহেবের নিকট গোসল করাও জায়েজ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নাবীযে তামার দ্বারা গোসল করা জায়েজ নয়। কেননা জানাবাতের হাদাস অজুর হাদাসের চেয়ে উপরের স্তরের এ জন্য অজুর উপর গোসলের কিয়াস করা ঠিক হবে না।

وَالنَّبِيْذُ الْمُخْتَلَفُ فِيْهِ اَنْ يَكُوْنَ حُلْوًا رَقِيْقًا يَسِيْلُ عَلَى الْاَعْضَاءِ كَالْمَاءِ وَمَا اشْتَدَّ مِنْهَا صَارَ حَرَامًا لَا يَجُوْزُ التَّوَضِّىْ بِهِ وَاِنْ غَيَّرَتْهُ النَّارُ فَمَادَامَ حُلْوًا عَلَى الْخِلَافِ وَاِنِ اشْتَدَّ فَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يَجُوْزُ التَّوَضِّىْ بِهِ لِاَنَّهُ يَحِلُّ شُرْبُهُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) لَايَتَوَضَّأُ بِهِ لِحُرْمَةِ شُرْبِهِ عِنْدَهُ وَلَايَجُوْزُ التَّوَضِّىْ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْاَنْبِذَةِ جَرْيًا عَلَى قَضِيَّةِ الْقِيَاسِ ـ

অনুবাদ ঃ যে নাবীয সম্পর্কে বিরোধ রয়েছে, তা হচ্ছে ঐ নাবীয যা মিষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে এমন তরল যে, সাধারণ পানির মতো তা শরীরে প্রবাহিত হয়। আর যা গাঢ় হয়ে গেছে তা হারাম হবে, তা দ্বারা অজু জায়েজ হবে না। আর যদি আগুনে জ্বাল দেওয়ার কারণে তাতে পরিবর্তন আসে তাহলে মিষ্ট থাকা পর্যন্ত অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। আর যদি গাঢ় হয়ে যায় তাহলেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা দ্বারা অজু জায়েজ। কেননা তাঁর মতে তা পান করা হালাল। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা পান করা হারাম বিধায় তা দ্বারা অজু করা যাবে না। নাবীযুত্ তামার ছাড়া অন্য সকল নাবীয দ্বারা কিয়াসের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অজু জায়েজ হবে না। (অর্থাৎ কিয়াসের দাবি হিসাবে কোনো নাবীয দ্বারাই অজু জায়েজ হবে না। কিন্তু নাবীযুত্ তামার সম্পর্কে হাদীস বিদ্যমান থাকায় কিয়াসের বিপরীতে বৈধতার হুকুম দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে কিশমিশ, গম ইত্যাদি দ্বারা তৈরি নাবীযের ক্ষেত্রে কিয়াস অনুযায়ী অবৈধতার হুকুম দেওয়া হয়েছে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে যে নাবীযে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইনের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে তার হাকীকত বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) নাওয়াদির-এ উল্লেখ করেছেন যে, যে নাবীয দ্বারা অজু জায়েজ না জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে আইম্মায়ে ছালাছার মতবিরোধ রয়েছে, তা হলো, যে, পানিতে খেজুর ঢালা হয়েছে। এমনকি পানি মিষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তা এমন তরল যা সাধারণ পানির মতো অঙ্গে প্রবাহিত হয়। গাঢ় হয়নি এবং তাতে নেশাও আসেনি। যদি গাঢ় হয়ে যায় তবে তা দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে অজু জায়েজ নেই। কেননা তা নেশা করে এবং হারাম। আর যদি তাকে আগুনে পাকানো হয় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তা মিষ্ট এবং তরল থাকবে। অঙ্গের উপর সাধারণ পানির ন্যায় প্রবাহিত হয়। তাতেও ইমাম সাহেব এবং সাহেবাইনের মাঝে মতভেদ রয়েছে। আর যদি পাকানো দ্বারা গাঢ় হয়ে যায় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা দ্বারা অজু জায়েজ। কেননা তাঁর মতে তা পান করা হালাল। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যেহেতু তা পান করা হারাম সেহেতু তার দ্বারা অজুও জায়েজ নেই। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, নাবীযে তামার ছাড়া অন্যান্য নাবীয দ্বারা অজু করা জায়েজ নেই। যেমন– কিশমিশ, গম ইত্যাদি দ্বারা তৈরি নাবীয। দলিল হচ্ছে— নাবীযে তামার দ্বারা অজু করা কিয়াসের বিপরীত হাদীস দ্বারা সাবিত। তাই অন্যান্য নাবীয কিয়াসের চাহিদা অনুযায়ী বাকি থাকবে। অর্থাৎ সেগুলো দ্বারা অজু করা জায়েজ হবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইমাম কুদূরী (র.) শরহে কুদূরীতে ওলামায়ে আহনাফ থেকে নকল করেছেন যে, তায়াম্মুমের মতো নাবীযে তামার দ্বারা অজু করার জন্যও নিয়ত শর্ত। দলিল হলো, নাবীযে তামার হলো পানির বদল। এ কারণেই তো সাধারণ পানি থাকা অবস্থায় নাবীযে তামার দ্বারা অজু করা জায়েজ নেই। যদি তা দ্বারা অজু করা হয় এবং পরে সাধারণ পানি পাওয়া যায় তবে পূর্বের অজু বাতিল হয়ে যাবে। যেমন পানি পাওয়া যাওয়ার সুরতে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যায়।

بَابُ التَّيَمُّمِ

وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ مِيلٌ أَوْ أَكْثَرَ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيْدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلتُّرَابُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ اِلَى عَشْرِ حِجَجٍ مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَالْمِيْلُ هُوَ الْمُخْتَارُ فِى الْمِقْدَارِ لِاَنَّهُ يَلْحَقُهُ الْحَرَجُ بِدُخُوْلِ الْمِصْرِ وَالْمَاءُ مَعْدُوْمٌ حَقِيْقَةً وَالْمُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ دُوْنَ خَوْفِ الْفَوْتِ لِاَنَّ التَّفْرِيْطَ يَأْتِى مِنْ قِبَلِهِ ـ

পরিচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমের বিবরণ

অনুবাদ ঃ মুসাফির কিংবা শহরের বাইরে থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি পানি না পায় আর তার ও শহরের মাঝে এক মাইল বা ততোধিক দূরত্ব হয়, তাহলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন – আর যদি তোমরা পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। (৪ মায়িদা– ৬) তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–মাটি হলো মুসলমানের জন্য পবিত্রকারী, যতক্ষণ পানি না পাওয়া যায়, এমনকি যদি দশ বছরও হয়। দূরত্বের পরিমাণের ক্ষেত্রে 'মাইল'-ই হলো গ্রহণযোগ্য। কেননা (এতটুকু দূরত্ব থেকে) শহরে প্রবেশ করতে তার কষ্ট হবে। আর প্রকৃতপক্ষে পানিতো অনুপস্থিত। দূরত্বই হলো বিবেচ্য বিষয়; নামাজ ফউত হওয়ার আশঙ্কা বিবেচ্য নয়। কেননা ক্রটি এর পক্ষ থেকেই এসে থাকে।

প্রাসাঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : পানি দ্বারা তাহারাত হাসিল করা হলো আসল (اصل) আর মাটি দ্বারা তাহারাত হাসিল করা হলো তার খলীফা। কায়দা হলো, খলীফা আসল (اصل)-এর পরে আসে। তাই হিদায়া গ্রন্থকার অজুর আলোচনার পর তায়াম্মুমের আলোচনা শুরু করেছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ এই ধরনের তারতীবে মূলত কুরআনুল কারীমের অনুসরণ করা হয়েছে। কেননা কুরআনের আয়াত إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ الخ-এর মধ্যে প্রথমে অজু তারপর গোসল এবং তারপর তায়াম্মুমের আলোচনা করা হয়েছে।

তায়াম্মুম-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ঃ তায়াম্মুম -এর আভিধানিক অর্থ হলো– ইচ্ছা করা। শরিয়তের পরিভাষায় তায়াম্মুম বলা হয়, তাহারাত লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র মাটির ইচ্ছা করা, (ব্যবহার করা)। শায়খুল আদব (র.) শরহে নিকায়া-এর টীকায় আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.)-এর বরাত দিয়ে লিখেন যে, শরিয়তের পরিভাষায় তায়াম্মুম বলা হয় পবিত্র মাটি দ্বারা চেহারা ও উভয় হাত মাসাহ্ করা।

তায়াম্মুম-এর সুবুত ঃ কুরআন ও হাদীস দ্বারা তায়াম্মুম-এর সুবূত বা প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ– فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا (যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।) (৪ মায়িদা-৬) রাসূলুল্লাহর ﷺ বাণী– إِنَّهُ قَالَ جُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا اَيْنَمَا اَدْرَكَتْنِى الصَّلٰوةُ تَيَمَّمْتُ وَصَلَّيْتُ (জমিনকে আমার জন্য মসজিদ ও তুহুর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানেই নামাজের সময় হয় তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ে নেই।)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে– اَلتُّرَابُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ اِلَى عَشْرِ حِجَجٍ مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ মাটি মুসলমানকে পবিত্রকারী বস্তু যদিও দশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় আর পানি না পাওয়া যায়।—(আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

হযরত আয়েশা (রা.)-এর যে ঘটনায় তায়াম্মুমের আলোচনা রয়েছে তার স্থান ও সময়ের ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। সময়ের ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়। **এক.** এ ঘটনা ঘটেছে চতুর্থ হিজরি সনে, **দুই.** পঞ্চম হিজরি সনে, **তিন.** ষষ্ঠ হিজরি সনে। স্থানের ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়, **এক.** গাযওয়ায়ে মুরায়সি যাকে গায্ওয়ায়ে বনী মুস্তালিকও বলা হয়। **দুই.** গায্ওয়ায়ে যাতুররিকা।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর হার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন আলফায দ্বারা বর্ণিত হয়েছে এখানে একটি হাদীস অর্থসহ নিবদ্ধ করা হলো।

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ اِنْقَطَعَ عِقْدٌ لِيْ فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَاَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَاَتَى النَّاسُ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَقَالُوْا اَلَا تَرٰى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ اَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَاْسَهٗ عَلٰى فَخِذِيْ قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعَنُنِيْ بِيَدِهٖ فِيْ خَاصِرَتِيْ وَلَايَمْنَعُنِيْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلَّا مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى فَخِذِيْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَصْبَحَ عَلٰى مَاءٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مَاهِيَ بِاَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا اٰلَ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِيْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَاِذَا الْعِقْدُ تَحْتَهٗ ـ
(بخاری ج۲)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে সফরে ছিলাম যখন আমরা বায়দা বা যাতুল জায়শ নামক স্থানে পৌছলাম, তখন আমার হার হারিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ স্থানেই থেমে গেলেন এবং হার তালাশ করতে লাগলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে থেমে গেলো। সে স্থানে পানি ছিল না এবং কারো নিকটও পানি ছিল না। কিছু লোক হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট অভিযোগ করল যে, কি কাজ করল আয়েশা! তার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং লোকেরা (এমন স্থানে) অবস্থান করল যেখানে কোনো পানি নেই এবং তাদের কারো কাছেও কোনো পানি নেই।

আবূ বকর (রা.) আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার রানের উপর মাথা দিয়ে শায়িত ছিলেন। আর বললেন, (হে আয়েশা!) তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ আর লোকদেরকে এমন স্থানে আটকে রেখেছ যেখানে না আছে কোনো পানি আর না আছে তাদের কাছে কোনো পানি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আবূ বকর (রা.) আমাকে খুব ডাটলেন, আর আল্লাহ যা চাইলেন তা বললেন। তাঁর হাত দ্বারা আমার কোমরে বারবার আঘাত করতে লাগলেন, আমি নড়াচড়া না করে চুপ থাকলাম এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহর ﷺ মাথা আমার রানের উপর ছিল। সর্বশেষ রাসূলুল্লাহ ﷺ সকাল বেলায় ঘুম থেকে জাগলেন, তখনও পানি ছিল না। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন

হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা.) বললেন, হে আলে আবূ বকর! এটি আপনাদের প্রথম বরকতের বিষয় নয় বরং এর আগেও আপনাদের মাধ্যমে আমরা বরকত প্রাপ্ত হয়েছি।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, অতঃপর যখন আমরা আমাদের উটটিকে দাড় করালাম তখন তার তলদেশে হারটি পাওয়া গেল।—(বুখারী ২য়)

মাসআলা : যে ব্যক্তির নিকট এতটুকুন পানি নেই যার দ্বারা নাপাকী দূর করা যায় অথচ সে ব্যক্তি মুসাফির। অথবা যে মুসাফির নয় তবে শহরের বাইরে অবস্থানরত এবং তার আর শহরের মাঝে এক মাইল বা ততোধিক দূরত্ব। এ ধরনের

ব্যক্তির জন্য মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ। এর সপক্ষে দু'টো দলিল রয়েছে। এক. আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا দুই. রাসূলুল্লাহর বাণী اَلتُّرَابُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ اِلَى عَشْرِ حِجَجٍ مَالَمْ يَجِدِ الْمَاءَ হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, যখন সফর থেকে বাড়ি ফিরতেন, পরিবারের সাথে মিলিত হয়ে জুনুবী হয়ে যেতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জানালে তিনি বলেন— اَلصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ اِلَى عَشْرِ سِنِيْنَ مَالَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَسَّهُ بَشَرَهُ (পবিত্র মাটি মুসলমানের অজু। যদিও দশ বছর পর্যন্ত পান না পাওয়া যায়। পরে যখন পানি পাওয়া যাবে। তখন শরীরের উপর পানি প্রবাহিত করে দেবে।)—(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, দূরত্বের পরিমাণের ক্ষেত্রে 'মাইল'-ই হলো গ্রহণযোগ্য। কেননা এতটুকু দূরত্ব থেকে শহরে প্রবেশ করতে তার কষ্ট হবে। অথচ তায়াম্মুমের প্রবর্তন হলো কষ্ট, দূর করার জন্য। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি।—(২২ : হাজ -৭৮)

وَالْمَاءُ مَعْدُوْمٌ حَقِيْقَةً দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য। প্রশ্নটি হলো, আয়াতটি হলো মুত্লাক তাতে নির্ধারিত কোনো দূরত্বের উল্লেখ নেই। অথচ গ্রন্থকার 'এক মাইল'-এর قيد লাগিয়েছেন, যা দ্বারা কিতাবুল্লাহকে "রায়" দ্বারা মুকায়্যাদ করা লাযিম আসে। অথচ তা জায়েজ নেই? জবাব হলো, প্রকৃতপক্ষে আয়াতের মধ্যে এ কথা নিহিত আছে যে, মূলত পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম জায়েজ। কিন্তু আমাদের ইয়াকীনের সাথে এ কথা জানা আছে যে, সর্বসম্মত মাযহাব হলো, দরজার সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় যদি কেউ তায়াম্মুম করে আর বাড়ির ভিতরে পানি থাকে তাহলে তায়াম্মুম হবে না। কেননা সে সহজেই পানি লাভ করতে পারতো। সুতরাং বুঝা গেল যে, কষ্ট হওয়া না হওয়াই হলো মূলত-এর মাপকাঠি। আর এক মাইলের দূরত্ব হলে সাধারণত কষ্ট হয়ে থাকে। তাই এক মাইল দূরত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তায়াম্মুম তখন জায়েজ হবে, যখন পানি দুই মাইল দূরত্বে থাকে। ফকীহ্ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ফযল উক্ত মতকেই গ্রহণ করেছেন।

ইমাম কারখী (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি এমন স্থানে অবস্থান করে যে পানি ধারণকারীদের আওয়াজ শুনতে পায়, তাহলে মনে করতে হবে যে, পানি নিকটে। তাই তার জন্য তায়াম্মুম জায়েজ হবে না। আর যদি পানি ধারণকারীদের আওয়াজ শুনতে না পায় তাহলে মনে করতে হবে যে, পানি দূরে তাহলে তায়াম্মুম জায়েজ হবে। অধিকাংশ মাশায়িখ এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) বলেন, যদি পানি সফরের দিকে অর্থাৎ সামনের দিকে থাকে তবে দু'মাইল ধর্তব্য হবে। আর যদি ডানে বায়ে বা পিছনের দিকে হয় তবে এক মাইল ধর্তব্য হবে। এ অবস্থায় আশা যাওয়ায় দুই মাইল হয়ে যাবে।—(কিফায়া) ইমাম যুফার (র.) বলেন, যদি নামাজ ফউত হওয়ার আশঙ্কা হয় তবে তায়াম্মুম জায়েজ, যদিও পানি এক মাইল থেকে কম দূরত্বে থাকে। হিদায়া গ্রন্থকার উক্ত মতকে গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন, দূরত্বই হলো বিবেচ্য থাকে, নামাজ ফউত হওয়ার আশঙ্কা বিবেচ্য নয়। কেননা ত্রুটি এর পক্ষ থেকেই এসে থাকে। সুতরাং পানি নিকটে থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম করার ক্ষেত্রে মাজুর মনে করা হবে না।

ফায়েদা ঃ ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, এক মাইল হলো তিন ফরসাখ। আর এক ফারসাখ হলো বারো হাজার কদম। ইবনে শুজা (র.) বলেন, এক মাইল হলো, সাড়ে তিন হাজার গজ থেকে চার হাজার গজ পর্যন্ত।

وَلَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ اِلَّا اَنَّهُ مَرِيْضٌ فَخَافَ اِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ اِشْتَدَّ مَرَضُهُ يَتَيَمَّمُ لِمَا تَلَوْنَا وَلِاَنَّ الضَّرَرَ فِيْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ فَوْقَ الضَّرَرِ فِيْ زِيَادَةِ ثَمَنِ الْمَاءِ وَ ذٰلِكَ يُبِيْحُ التَّيَمُّمَ فَهٰذَا اَوْلٰى وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اَنْ يَّشْتَدَّ مَرَضُهُ بِالتَّحَرُّكِ اَوْ بِالْاِسْتِعْمَالِ وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ (رح) خَوْفَ التَّلَفِ وَهُوَ مَرْدُوْدٌ بِظَاهِرِ النَّصِّ ـ

অনুবাদ ঃ যদি পানি পেয়ে যায় কিন্তু সে অসুস্থ থাকে এবং আশঙ্কা হয় যে. পানি ব্যবহার করলে অসুস্থতা বেড়ে যাবে, তবে তায়াম্মুম করবে ঐ আয়াতের ভিত্তিতে যা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, তা ছাড়া অসুস্থতা বৃদ্ধি জনিত ক্ষতি পানির মূল্য বৃদ্ধিজনিত ক্ষতির চেয়ে বেশি, অথচ এতে তায়াম্মুমের অনুমতি রয়েছে। সুতরাং তাতে অনুমতি হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। আর রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা নড়াচড়ার কারণে হোক কিংবা পানি ব্যবহারের কারণে হোক এতে কোনো পার্থক্য নেই। ইমাম শাফি'ঈ (র.) তায়াম্মুম জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে অঙ্গহানী বা প্রাণহানীর আশঙ্কার উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা তা অগ্রাহ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তির নিকট পানি থাকে, অথচ সে অসুস্থ, পানি ব্যবহার দ্বারা তার রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। অথবা আরোগ্য লাভ করতে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই অবস্থায় তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েজ হবে। নকলী দলিল হলো, আল্লাহর বাণী– وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ الخ আকলী দলিল, যদি কোনো ব্যক্তি অসুস্থ তো নয় তবে পানি মূল্যের বিনিময়ে পায়। এখন পানি বিক্রেতা যদি পানির মূল্য সমমান মূল্যের অধিক মূল্য চায়, তাহলে এ সুরতে অধিক মূল্যের ক্ষতিকে দূর করার মানসে তার জন্য তায়াম্মুমকে জায়েজ করা হয়েছে। আর অসুস্থতা বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি পানির মূল্য বৃদ্ধিজনিত ক্ষতির চেয়ে অধিক। অথচ এতে তায়াম্মুমের ইজাযত রয়েছে। সুতরাং যেহেতু আদনা ক্ষতিকে দূর করার জন্য তায়াম্মুমের ইজাযত আছে তাই বৃহৎ ক্ষতিকে দূর করার জন্য তায়াম্মুমের ইজাযত হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা শরীরের নড়াচড়ার কারণে হোক কিংবা পানির ব্যবহারের কারণে হোক উভয়টি বরাবর অর্থাৎ উভয় অবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েজ।

ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, তায়াম্মুম তখন জায়েজ হবে, যখন পানির ব্যবহার দ্বারা অঙ্গহানী বা প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে। কিন্তু ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মাযহাব আয়াতের (وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى) প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা অগ্রাহ্য হয়ে যায়। কেননা আয়াত মুত্লাক হওয়ার কারণে প্রত্যেক অসুস্থ ব্যক্তির জন্যে তায়াম্মুম জায়েজ হওয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অঙ্গহানী বা প্রাণহানীর আশঙ্কার قيد লাগানোর দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর বৃদ্ধি করা লাযেম আসে, যা জায়েজ নেই। তবে যদি এ কথা বলা হয় যে. হানাফীগণও অসুস্থতা বৃদ্ধির কথা বলেছেন অথচ আয়াতে তো এই قيد-এর কথা উল্লেখ নেই? তখন এর জবাব হচ্ছে– আয়াতের পূর্বাপর দ্বারা এ কথা বুঝা যায় যে, এখানে রোগ বৃদ্ধির বিষয়টিও বিবেচ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কষ্টে নিপাতিত করতে চান না। (৪ মায়িদা– ৬) এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, কষ্ট তখনই হবে যখন রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা হয়।

وَلَوْخَافَ الْجُنُبُ اِنِ اغْتَسَلَ اَنْ يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ اَوْ يُمْرِضَهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيْدِ وَهٰذَا اِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ لِمَا بَيَّنَّا وَلَوْ كَانَ فِى الْمِصْرِ فَكَذٰلِكَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) خِلَافًا لَهُمَا هُمَا يَقُوْلَانِ اِنَّ تَحَقُّقَ هٰذِهِ الْحَالَةِ نَادِرٌ فِى الْمِصْرِ فَلَا يُعْتَبَرُ وَلَهُ اَنَّ الْعِجْزَ ثَابِتٌ حَقِيْقَةً فَلَابُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِهِ ـ

অনুবাদ ঃ জুনুবী ব্যক্তি যদি আশঙ্কা করে যে, সে গোসল করলে ঠাণ্ডায় মারা যাবে কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়বে, তাহলে সে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতে পারবে। এ হুকুম ঐ অবস্থায় যখন সে শহরের বাইরে থাকবে। এর কারণ (ইতঃপূর্বে) আমরা বর্ণনা করেছি। আর যদি শহরেই থাকে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে একই হুকুম। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর থেকে ভিন্নমত রয়েছে। তারা বলেন, শহরে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়া বিরল। সুতরাং তা বিবেচ্য নয়। ইমাম সাহেবের যুক্তি হলো— অক্ষমতা বাস্তবে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তা বিবেচনা করা জরুরি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : জুনুবী ব্যক্তির যদি এ আশঙ্কা হয় যে, গোসল করার দ্বারা সে মারা যাবে অথবা রোগ বৃদ্ধি পাবে, তবে তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েজ। হিদায়া প্রণেতা বলেন, এ ধরনের ঘটনা শহরের বাইরে হলে সর্বসম্মতি ক্রমে তায়াম্মুমের অনুমতি রয়েছে। দলিল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, এতে শহরে ফিরে আসা কষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি শহরের বাইরে থাকা অবস্থায় জুনুবী ব্যক্তির উক্ত আশঙ্কা হয় তখনও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে একই হুকুম। অর্থাৎ তার জন্যও তায়াম্মুম জায়েজ। সাহেবাইন (র.) বলেন, শহরে এ ধরনের আশঙ্কা হলে তায়াম্মুম জায়েজ হবে না। সাহেবাইনের দলিল হলো— শহরে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়া বিরল। সুতরাং তা বিবেচ্য নয়। অর্থাৎ শহরে গরম পানি দ্বারা ঠাণ্ডা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। তাই ধ্বংস হওয়া বা রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। তাই যদি শহরে তায়াম্মুমের অনুমতি দেওয়া হয় তবে সাধারণ লোকেরা সামান্য ঠাণ্ডাতেই (হীন) পথ খোঁজার চেষ্টা করবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো— এ ধরনের ভীতু জুনুবীর ক্ষেত্রে গোসল করা থেকে অপরাগতা বাস্তবে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তা বিবেচনা করা জরুরি।

وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ يَمْسَحُ بِاَحَدِهِمَا وَجْهَهُ وَبِالْاُخْرٰى يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ وَيَنْفُضُ يَدَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَتَنَاثَرُ التُّرَابُ كَيْلَا يَصِيْرَ مُثْلَةً ـ وَلَابُدَّ مِنَ الْاِسْتِيْعَابِ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِقِيَامِهٖ مَقَامَ الْوُضُوْءِ وَلِهٰذَا قَالُوْا يُخَلِّلُ الْاَصَابِعَ وَيَنْزِعُ الْخَاتَمَ لِيَتِمَّ الْمَسْحُ ـ

অনুবাদ ঃ তায়াম্মুম হলো (মাটিতে) উভয় হাত দুইবার। একবারের দ্বারা মুখ মাসাহ করবে এবং দ্বিতীয় বারের দ্বারা কনুই পর্যন্ত উভয় হাত মাসাহ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তায়াম্মুম হলো (মাটিতে) দু'বার হাত মারা একবারের দ্বারা মুখমণ্ডল মাসহ করবে এবং দ্বিতীয়বারের দ্বারা উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ করবে। (দারু কুতনী) আর উভয় হাত এমনভাবে ঝাড়া দেবে, যেন মাটি সরে যায়। যাতে তার আকৃতি বিকৃত না হয়ে যায়। যাহিরী রিওয়ায়ত মতে মাসাহ পূর্ণাঙ্গ হওয়া জরুরি। কেননা তায়াম্মুম অজুর স্থলবর্তী। এ জন্যই ফকীহ্গণ বলেছেন যে, আঙ্গুলগুলো খিলাল করবে এবং আংটি হলে তা খুলে নেবে। যাতে মাসাহ পূর্ণাঙ্গ হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে তায়াম্মুম-এর পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, তায়াম্মুম হলো মাটিতে দু'বার হাত মারা, একবার মুখ মাসাহের জন্য, আরেকবার উভয়হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহের জন্য। ইমাম যুহ্রী (র.) বলেন, বগল পর্যন্ত মাসাহ করবে। ইমাম মালিকের (র.) একটি বর্ণনাও অনুরূপ। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, উভয় হাত কজা পর্যন্ত মাসাহ করবে। ইবনে সীরীন (র.)-এর মতে মাটিতে তিনবার হাত মারবে। এক বার শুধু চেহারার জন্য, দ্বিতীয় বার হাতের কব্জির পর্যন্তের জন্য। আরেকবার উভয় (ذراعين) বাহুর পর্যন্তের জন্য। কেউ কেউ বলেছেন, একবার চেহারার জন্য। আরেকবার বাহুর জন্য। আরেকবার উভয়টির জন্য। মায্হাবে মুখতারের দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ ـ তায়াম্মুম হলো দু'বার হাত মাটিতে মারা। একবার হাত মারা হলো মুখমণ্ডলের জন্য, আরেকবার হাত মারা হলো উভয় হাতের জন্য।

গ্রন্থকার বলেন, জমিনের উপর উভয় হাত মেরে এমনভাবে ঝাড়া দেবে, যেন মাটি ঝরে যায় তবে তার আকৃতি বিকৃত না হয়ে যায়। অর্থাৎ যেমনিভাবে مُثْلَةٌ দ্বারা অঙ্গ বিকৃত হয়ে যায় এমনিভাবে মাটি দ্বারাও যাতে চেহারা বিকৃত না হয়ে যায়। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় হাত জমিনে মেরেছেন, পরে ফুঁক দিয়েছেন, তারপর তা দ্বারা নিজের চেহারা ও উভয় হাত মাসাহ করেছেন।

ইবনে ওমর ও জাবির (রা.) রাসূলুল্লাহর ﷺ -এর তায়াম্মুমের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, উভয় হাত জমিনের উপর মারবে এবং এ পরিমাণ ঝাড়া দেবে যাতে মাটি ঝরে যায়। তারপর তা দ্বারা চেহারা মাসাহ করবে। তারপর পুনরায় জমিনে হাত মারবে, এবং ভালোভাবে ঝেড়ে নেবে। তারপর বাম হাতের চার আঙ্গুলের পেট দ্বারা ডান হাতের বাহিরের অংশ এমনভাবে মাসাহ করবে এবং আঙ্গুলের মাথা থেকে আরম্ভ করে কুনুই পর্যন্ত পূর্ণ করবে। পরে বাম হাতের পেট দ্বারা ডান হাতের ভিতরের অংশ কজা পর্যন্ত মাসাহ করবে এবং বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পেটকে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির বাইরে ফিরাবে। বাম হাত অনুরূপ ভাবে মাসাহ করবে।

وَلَابُدَّ مِنَ الْاِسْتِيْعَابِ الخ ঃ তায়াম্মুমের মধ্যে استيعاب (পূরা অঙ্গ মাসাহ করা)। সুতরাং মাসাহ ব্যতীত যদি কিছু অংশও অবশিষ্ট থেকে যায় তবে তায়াম্মুম হবে না। যেমনটি অজুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ হুকুমটি হলো যাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, অধিকাংশ (اكثر) পূর্ণাঙ্গের (كل)-এর স্থলাভিষিক্ত হবে। দলিল হলো মামসূহাতের (মাসাহ করার অঙ্গসমূহ) মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হওয়া শর্ত নয়। যেমন মোজা ও মাথা মাসাহের মধ্যে পূর্ণ অঙ্গ মাসাহ করা শর্ত নয়। যাহিরী রিওয়ায়েতের কারণ হলো— তায়াম্মুম হলো অজুর স্থলাভিষিক্ত। এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, আঙ্গুলগুলো খিলাল করবে এবং যদি আংটি থাকে খুলে নেবে যাতে মাসাহ পূর্ণাঙ্গ হয়।

অজুর মধ্যে استيعاب (পূর্ণ অঙ্গ ধৌত করা) শর্ত। সুতরাং যা তার স্থলাভিষিক্ত (যেমন তায়াম্মুম) হবে তার মধ্যেও استيعاب শর্ত হবে। তায়াম্মুম যদি অজুর খলীফা না হতো তবে হাত কাঁধ পর্যন্ত মাসাহ করা ওয়াজিব হতো। কেননা আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ-কে সীমা ব্যতীত উল্লেখ করেছেন।

وَالْحَدَثُ وَالْجَنَابَةُ فِيْهِ سَوَاءٌ وَكَذَا الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ لِمَا رُوِىَ اَنَّ قَوْمًا جَاءُوْا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالُوْا اِنَّا قَوْمٌ نَسْكُنُ هٰذِهِ الرِّمَالَ وَلَانَجِدُ الْمَاءَ شَهْرًا اَوْ شَهْرَيْنِ وَفِيْنَا الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاَرْضِكُمْ ـ

অনুবাদ ঃ তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে হাদাস ও জানাবাত দু'টোই সমান। তদ্রূপ হায়েয ও নিফাসের তায়াম্মুমও। কেননা বর্ণিত আছে যে, এক সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে এসে আরজ করল, আমরা মরুভূমিতে বাস করি, ফলে এক দু'মাস আমরা পানি পাই না। অথচ আমাদের মাঝে জুনুবী এবং হায়েয নিফাসগ্রস্তও থাকে। তিনি ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের মাটির সাহায্য নেবে। অর্থাৎ তায়াম্মুম করবে। (মুস্‌নাদে আহমদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, جواز تيمم - كيفيت تيمم এবং ال تيمم-এর মধ্যে হাদাস ও জানাবাত দু'টোই সমান। অর্থাৎ যেমনিভাবে হাদাসে আসগরের মধ্যে তায়াম্মুম শরিয়ত সমর্থিত, এমনিভাবে হাদাসে আকবরের মধ্যেও তায়াম্মুম শরিয়ত সমর্থিত। হাদাসে আসগরের তায়াম্মুমের যে পদ্ধতি, হাদাসে আকবরের তায়াম্মুমও তথৈবচ। একই হুকুম হায়েয ও নিফাসওয়ালীর তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেউ কেউ বলেন, তায়াম্মুম শুধু হাদাসে আসগরের শরিয়ত সমর্থিত। জুনুবী, হায়েযা এবং নিফাসওয়ালী মাহিলার জন্য তায়াম্মুম مشروع নয়। এ মতটি হযরত ওমর, ইবনে মাসউদ এবং ইবনে ওমর (রা.) থেকেও বর্ণিত। উভয় মতের মূল হলো তায়াম্মুমের আয়াত– وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا ـ উক্ত আয়াতে ملامسة نساء (মহিলাদের স্পর্শ) দ্বারা কী মুরাদ? প্রথম মতের প্রবক্তাদের মতে এর দ্বারা সহবাস (جماع) মুরাদ। দ্বিতীয় মতের প্রবক্তাদের মতে এর দ্বারা স্পর্শ (مس باليد) মুরাদ। দ্বিতীয় মতের প্রবক্তাদের দলিল হলো— আল্লাহ তা'আলা অজুহীন ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম প্রবর্তন করেছেন, তাই জুনুবীর জন্য তা মুবাহ হবে না। তা ছাড়া জুনুবীকে অজুহীন ব্যক্তির উপর কিয়াস করাও ঠিক হবে না। কেননা অজুহীন ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুমের হুকুম হলো কিয়াস বহির্ভূত। এমনিতাবে জুনুবীকে অজুহীন ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করাও যাবে না। কেননা জুনুবীর হাদাস অজুহীন ব্যক্তির হাদাস থেকে বড়। অথচ সম্পৃক্ত করার জন্য সমান হওয়া শর্ত।

প্রথম মতের প্রবক্তাদের দলিল হলো— আয়াতের মধ্যে ملامست (স্পর্শ) দ্বারা রূপক অর্থে সহবাস (جماع) মুরাদ নেওয়া হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপরও তাই। ব্যাখ্যা হলো— অজুর আয়াতে হাদাস ও জানাবাত উভয়টির হুকুম বয়ান করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ এ পর্যন্ত হাদাসে আসগরের হুকুম বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا এখানে জানাবাত তথা হাদাসে আকবরের হুকুম বর্ণিত হয়েছে। তারপর পানি না থাকা অবস্থায় হুকুমকে মাটির দিকে ফিরানো হয়েছে। এবং اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ-এর মধ্যে হাদাসে আসগরের আলোচনা রয়েছে। সুতরাং মুনাসিব হলো لامستم-কে হাদাসে আকবর তথা জানাবাতের উপর প্রযোজ্য বলা। তাহলে অজুর আয়াতের ন্যায় তায়াম্মুমের আয়াতেও দুই তাহারাত এবং দুই হাদাসের সন্নিবেশিত হয়ে যাবে এবং এতে তাকরারও লাযিম আসবে না। কেননা আল্লাহর বাণী– اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ-এর মধ্যে তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে হাদাসে আসগর বর্ণিত হয়েছে। এখন যদি لامستم-কেও উক্ত অর্থের জন্য বলা হয়, তখন খামাখা আয়াতের মধ্যে তাকরার লাযিম আসবে। আর যদি এ কথা মেনেও নেওয়া হয় যে, আল্লাহ তা'আলা শুধু নাপাক ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুমকে বৈধ করেছেন, তখন আমরা বলব যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ জুনুবীর জন্যও তায়াম্মুমকে প্রবর্তন করেছেন। বর্ণিত আছে যে, কিছু লোক রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর খিদমতে এসে আরজ করল আমরা মরুভূমিতে বাস করি, ফলে একমাস দু'মাস আমরা পানি পাই না। অথচ আমাদের মাঝে জুনুবী এবং হায়েয নিফাসগ্রস্ত থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের জমিনের সাহায্য নেবে। অর্থাৎ মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, হাদাসে আকবরের জন্যও তায়াম্মুম مشروع আছে।

ইমরান ইবনে হুসাইন কর্তৃক বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِى الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ فِى الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَابَتْنِىْ جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ فَقَالَ ﷺ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهُ يَكْفِيْكَ ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে পৃথকভাবে লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নামাজ আদায় করছে। এ দেখে তিনি বললেন, ওহে ব্যক্তি! তোমাকে সবার সাথে নামাজ পড়তে কে নিষেধ করেছে? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জানাবাত হয়েছিল, পানি ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার জন্য মাটি জরুরি। কেননা এটিই তোমার জন্য যথেষ্ট। এ হাদীস দ্বারাও পরিষ্কারভাবে বুঝে আসে যে, জুনুবী ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম জায়েজ।

وَيَجُوْزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْاَرْضِ كَالتُّرَابِ وَالرَّمَلِ وَالْحَجَرِ وَالْجَصِّ وَالنُّوْرَةِ وَالْكُحْلِ وَالزَّرْنِيْخِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) لَايَجُوْزُ اِلَّا بِالتُّرَابِ وَالرَّمَلِ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ لَايَجُوْزُ اِلَّا بِالتُّرَابِ الْمُنْبِتِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا اَىْ تُرَابًا مُنْبِتًا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ غَيْرَ اَنَّ اَبَايُوْسُفَ زَادَ عَلَيْهِ الرَّمَلَ بِالْحَدِيْثِ الَّذِىْ رَوَيْنَاهُ وَلَهُمَا اَنَّ الصَّعِيْدَ اِسْمٌ لِوَجْهِ الْاَرْضِ سُمِّىَ بِهِ لِصُعُوْدِهِ وَالطَّيِّبُ يَحْتَمِلُ الطَّاهِرَ فَحُمِلَ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ اَلْيَقُ بِمَوْضِعِ الطَّهَارَةِ اَوْ هُوَ مُرَادٌ بِالْاِجْمَاعِ ـ

অনুবাদ ঃ ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মৃত্তিকা জাতীয় যে কোনো বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ। যেমন– মাটি, বালু, পাথর, সুরকি, চুনা, সুরমা ও হরিতাল। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, মাটি ও বালু ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, উৎপাদনকারী মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– তোমরা পবিত্র (অর্থাৎ উৎপাদনকারী) মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। এ কথা ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) আমাদের বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীসের কারণে মাটির সাথে বালু বর্ধিত করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো— صعيدا ভূ-পৃষ্ঠের নাম। ভূ-পৃষ্ঠের উঁচুত্বের কারণেই তার এ নামকরণ করা হয়েছে। আর طيب শব্দটি পবিত্র অর্থও বহন করে। সুতরাং সে অর্থেই তাকে প্রয়োগ করা হবে। কেননা তাহারাতের ক্ষেত্রে এ অর্থই অধিক উপযোগী, অথবা ইজমার দ্বারা এ অর্থ গৃহীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে কোন কোন বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ, তার আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, প্রত্যেক ঐ বস্তু যা মাটি জাতীয় তার দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ। মাটি জাতীয় বস্তু চিনার উপায় হলো, যে সকল বস্তু আগুনে জ্বলে ছাই হয়ে যায়, যেমন বৃক্ষ, আর যে সকল বস্তু গলে নরম হয়ে যায়, যেমন লোহা এ সকল বস্তু মাটি জাতীয় নয়। এগুলো ছাড়া অন্যান্য বস্তু মাটি জাতীয় যেমন– মাটি, বালু, পাথর, সুরকি চুনা, সাধারণ চুনা, সুরমা, হরিতাল, পাহাড়ী লবণ, ইয়াকূত, যামরাদ, যাবারজাদ ইত্যাদি। উপরোক্ত মত হলো তরফাইন (র.)-এর। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, শুধু মাটি আর বালু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, শুধু উৎপাদনকারী মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا দলিল এভাবে যে, صعيد অর্থ– মাটি, আর طيب অর্থ– উৎপাদনকারী, এই তাফসীরটি ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। সুতরাং এ তাফসীর দ্বারা বুঝা যায় যে, তায়াম্মুম শুধু মাটি দ্বারা জায়েজ। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) আমাদের বর্ণিত পূর্বোল্লেখিত হাদীসের কারণে (عَلَيْكُمْ بِالْاَرْضِ) মাটির সাথে বালুও বর্ধিত করেছেন। তরফাইনের দলিল হলো— صعيدا ভূ-পৃষ্ঠের নাম অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের উঁচু অংশ, ভূ-পৃষ্ঠের উচুত্বের কারণেই তার এ নামকরণ করা হয়েছে। মোদ্দাকথা, প্রত্যেক ঐ বস্তু যা صعيد হবে তথা মাটি জাতীয় হবে তার দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ হবে। صعيد-এর উক্ত অর্থ খলীল নাহ্‌বিদ থেকে বর্ণিত। আল্লামা যমখশরী (র.) যুজুজ (র.) থেকে বর্ণনা করে তাফসীরে কাশ্‌শাফে লিখেন যে, صعيد ভূ-পৃষ্ঠের নাম। যুজুজ (র.) মাআনিল কুরআনে লিখেন যে, আমার জানা মতে এ অর্থের ব্যাপারে কারো কোনো মতবিরোধ নেই। সিহাহ গ্রন্থগুলোতেও এ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। বাকি থাকল طيب-এর অর্থ যা ইমাম শাফি'ঈ (র.) উৎপাদনকারী বলেছেন। আমরা বলি طيب দ্বারা তাহির অর্থও হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার বাণী حلالا طيبا-এর মধ্যে طيب অর্থ তাহির তথা পাক। সুতরাং এখানেও طيب দ্বারা পাকই মুরাদ হবে। কেননা এ স্থানটি হলো তাহারাতের স্থান। আর উপরোক্ত অর্থটিই মাকামে তাহারাতের অধিক সমীচীন। দ্বিতীয় দলিল طيب শব্দটি তাহির ও মুম্বিত তথা পাক ও উৎপাদনকারী উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর সর্বসম্মতিক্রমে এর দ্বারা তাহির মুরাদ। এ হিসাবে উৎপাদনকারী অর্থ হবে না। কেননা আমাদের নিকট عموم مشترك জায়েজ নেই।

ثُمَّ لَا يُشْتَرَطُ اَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ غُبَارٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِاِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا وَكَذَا يَجُوْزُ بِالْغُبَارِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّعِيْدِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) لِاَنَّهُ تُرَابٌ رَقِيْقٌ -

অনুবাদ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মাটির উপর ধুলা থাকা শর্ত নয়। কেননা আমাদের উল্লিখিত আয়াতটি নিঃশর্ত। অদ্রূপ ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মাটি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ধুলা দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ। কেননা তা মিহি মাটি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মাটির উপর ধুলা থাকা শর্ত নয়। কেননা কুরআনুল কারীমে صَعِيْدًا طَيِّبًا শব্দটি হচ্ছে مطلق। বালু হওয়া না হওয়ার কোনো তাফসীল এখানে নেই। সুতরাং সাধারণ মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ। তার উপর বালু হোক বা না হোক। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বালু থাকা শর্ত। এ মতটি ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এরও। এবং ইমাম আহমদ (র.) ও এ কথা বলেন। এ সকল ফকীহগণের দলিল হলো আল্লাহর বাণী– فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ اَىْ مِنَ التُّرَابِ (নিজেদের চেহারা ও হাত মাসাহে করো কিছু মাটি দ্বারা।) মোট কথা, منه -এর من টি من تبعيضية আর এর উপর আমল তখনই সম্ভব হবে যখন এর উপর বালু থাকবে। তবে এই দলিলের জবাব হলো— হতে পারে منه -এর ضمير . حدث-এর দিকে হবে تراب এর দিকে হয়। এখন আয়াতের অর্থ হবে, তোমাদের চেহারা এবং হাত মাসাহ করো হাদাস থেকে অর্থাৎ হাদাসের কারণে। তা ছাড়া এখানে من টি ابتدائيه ও হতে পারে। অর্থাৎ তায়াম্মুমের শুরু মাটি দ্বারা হবে। এ হুকুম তরফাইনের মতে তখন হবে যখন মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বালু দ্বারা তায়াম্মুম করে। এর সুরত হবে এমন যে, এক ব্যক্তি তার বালুযুক্ত কাপড় ঝাড়ল আর বালু গিয়ে তার হাতে ও চেহারায় লেগে গেল। পরে তায়াম্মুমের নিয়তে সে চেহারায় ও হাতে হাত বুলাল, এতে তার তায়াম্মুম হয়ে গেল। কেননা বালুও মিহি মাটি। সুতরাং যেমনিভাবে মোটা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ এমনিভাবে মিহি মাটি দ্বারাও তায়াম্মুম জায়েজ।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার সুযোগ থাকা অবস্থায় বালু দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ নয়। দলিল হলো বালু খালিস মাটি নয়; বরং আংশিক মাটি। আর কুরআনে তায়াম্মুমের আদেশ মাটিসহ এসেছে। তাই মাটি থাকা অবস্থায় অন্য বস্তুর দিকে ফিরা (عدول) জায়েজ হবে না। তবে মাটি না থাকা অবস্থায় তা দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ হবে। যেমন রুকু ও সিজদায় অপারগ হলে ইশারা করে নামাজ পড়া জায়েজ।

وَالنِّيَّةُ فَرْضٌ فِى التَّيَمُّمِ وَقَالَ زُفَرُ (رح) لَيْسَ بِفَرْضٍ لِاَنَّهُ خَلَفٌ عَنِ الْوُضُوْءِ فَلَا يُخَالِفُهُ فِيْ وَصْفِهِ وَلَنَا اَنَّهُ يُنْبِئُ عَنِ الْقَصْدِ فَلَايَتَحَقَّقُ دُوْنَهُ اَوْ جُعِلَ طَهُوْرًا فِى حَالَةٍ مَخْصُوْصَةٍ وَالْمَاءُ طَهُوْرٌ بِنَفْسِهِ عَلٰى مَامَرَّ ثُمَّ اِذَا نَوَى الطَّهَارَةَ اَوْ اِسْتِبَاحَةَ الصَّلٰوةِ اَجْزَاهُ وَلَايُشْتَرَطُ نِيَّةُ التَّيَمُّمِ لِلْحَدَثِ اَوْلِلْجَنَابَةِ هُوَ الصَّحِيْحُ مِنَ الْمَذْهَبِ .

অনুবাদ ঃ তায়াম্মুমে নিয়ত করা ফরজ। ইমাম যুফার (র.) বলেন, ফরজ নয়। কেননা তায়াম্মুম অজুর স্থলবর্তী। সুতরাং গুণের দিক থেকে তার বিপরীত হতে পারে না। আমাদের দলিল হলো— (অভিধানিকভাবে) তায়াম্মুম শব্দ দ্বারা ইচ্ছা বুঝায়। সুতরাং ইচ্ছা (নিয়ত) করা ছাড়া তা সঠিক হবে না।

কিংবা মাটিকে বিশেষ অবস্থায় পবিত্রকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পানি স্বকীয়ভাবেই পবিত্রকারী। তবে যদি তাহারাতের কিংবা নামাজের বৈধ হওয়ার নিয়ত করে তাহলে তাই যথেষ্ট। হাদাসের বা জানাবাতের তায়াম্মুমের (আলাদা) নিয়ত করা শর্ত নয়। এটিই বিশুদ্ধ মাযহাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের মতে তায়াম্মুমের জন্য নিয়ত করা ফরজ। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে ফরজ নয়। দলিল হলো— তায়াম্মুম হলো অজুর খলীফা। আর খলীফা গুণের দিক থেকে আসলের খেলাফ হতে পারে না। তাই যেমনিভাবে অজু নিয়ত ব্যতীত সহীহ, এমনিভাবে তায়াম্মুমও নিয়ত ব্যতীত সহীহ হবে। কেননা তায়াম্মুম যদি নিয়ত ব্যতিত সহীহ না হয় তবে তো খলীফার আসলের খেলাফ হওয়া লাযিম আসে, যা জায়েজ নেই। আমাদের দলিল হলো— তায়াম্মুমের অভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। আর ইচ্ছা নাম হলো নিয়তের। আর নিয়ত ছাড়া ইচ্ছা সঠিক হয় না। কায়দা আছে আসমায়ে শরইয়্যাহ-এর মধ্যে আভিধানিক অর্থের ইতিবার করা হয়। এ জন্য আমরা বলেছি তায়াম্মুমের জন্য নিয়ত জরুরি। তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়ত মানে তাহারাতের (নিয়ত করবে) অথবা হাদাস দূর করার বা জানাবাত দূর করার অথবা নামাজ জায়েজ হওয়ার নিয়ত করবে। দ্বিতীয় দলিল হলো— মাটি দুই শর্তের সাথে পবিত্রকারী। এক. পানি না থাকার শর্তে, দুই. তায়াম্মুম নামাজের জন্য হওয়ার শর্তে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, تيمموا এ বাণীটির ভিত্তি হলো আল্লাহর বাণী اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ-এর উপর। এর দ্বারা মুরাদ হলো فَاغْسِلُوْا لِلصَّلٰوةِ সুতরাং সেখানেও فَتَيَمَّمُوْا لِلصَّلٰوةِ মুরাদ হবে। তাই বুঝা গেল যেমনিভাবে পানি থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম দ্বারা তাহারাত অর্জন হয় না এমনিভাবে নিয়ত না থাকলেও তাহারাত অর্জন হবে না। وَالْمَاءُ طَهُوْرٌ দ্বারা প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, আয়াতের মধ্যে পানিকেও বিশেষ অবস্থায় পবিত্রকারী বলা হয়ছে তাই অজুর মধ্যেও নিয়ত শর্ত হওয়া চাই? জবাব হলো, পানি স্বকীয়ভাবে পবিত্রকারী, এ জন্য নিয়তের দরকার নেই। যেমন শরীরী নাজাসাত দূর কারার জন্য নিয়তের প্রয়োজন হয় না।

ثُمَّ اِذَا نَوَى الطَّهَارَةَ الخ উক্ত ইবারতের মধ্যে একটি মাসআলা বয়ান করা হয়েছে। মাসআলাটি হলো এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি তাহারাত হাসিল করার নিয়ত কিংবা নামাজ বৈধ হওয়ার নিয়ত করে তাহলে (এই নিয়ত) তা যথেষ্ট হবে। হাদাস বা জানাবাত দূর করার জন্য আলাদ আলাদা নিয়ত করা শর্ত নয়। এটাই সহীহ মাযহাব। ইমাম আবূ বকর রাযী (র.) বলেন, হাদাস বা জানাবাত দূর করার জন্য নিয়ত করা তায়াম্মুমের জন্য শর্ত। কেননা উভয়টির জন্য একইভাবে তায়াম্মুম করা হয়। তাই উভয়টির মধ্য হতে একটিকে নিয়ত ব্যতীত পার্থক্য করা যাবে না। যেমন ফরজ নামাজ থেকে নফল নামাজকে পার্থক্য করার জন্য নিয়ত শর্ত নয়।

সহীহ মাযহাবের দলিল এই যে, তায়াম্মুমই হলো একটি তাহারাত। তাই তার আসবারের নিয়ত করা জরুরী নয় যেমন অজুর মধ্যে। অর্থাৎ অজু একটি তাহারাত, তাই তার আসবাবের নিয়ত করা জরুরি নয় বিধায় অজুর মধ্যে নিয়ত শর্ত নয়।

فَإِنْ تَيَمَّمَ نَصْرَانِيٌّ يُرِيْدُ بِهِ الْإِسْلَامَ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَكُنْ مُتَيَمِّمًا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رح) هُوَ مُتَيَمِّمٌ لِأَنَّهُ نَوٰى قُرْبَةً مَقْصُوْدَةً بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ لِدُخُوْلِ الْمَسْجِدِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ مَقْصُوْدَةٍ وَلَهُمَا أَنَّ التُّرَابَ مَا جُعِلَ طَهُوْرًا إِلَّا فِيْ حَالِ إِرَادَةِ قُرْبَةٍ مَقْصُوْدَةٍ لَاتَصِحُّ بِدُوْنِ الطَّهَارَةِ وَالْإِسْلَامُ قُرْبَةٌ مَقْصُوْدَةٌ يَصِحُّ بِدُوْنِهَا بِخِلَافِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ مَقْصُوْدَةٌ لَاتَصِحُّ بِدُوْنِ الطَّهَارَةِ وَإِنْ تَوَضَّأَ لَايُرِيْدُ بِهِ الْإِسْلَامَ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ مُتَوَضِّئٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) بِنَاءً عَلٰى اِشْتِرَاطِ النِّيَّةِ ـ

অনুবাদ ঃ কোনো খ্রিস্টান (বিধর্মী) যদি ইসলাম গ্রহণের নিয়তে তায়াম্মুম করে, তারপর ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে তায়াম্মুমকারী বলে গণ্য হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, সে তায়াম্মুমকারী বলে গণ্য হবে। কেননা সে একটি মূখ্য ইবাদতের নিয়ত করেছে। পক্ষান্তরে মসজিদে প্রবেশের এবং কুরআন শরীফ স্পর্শ করার জন্য তায়াম্মুম করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা এটা মূখ্য ইবাদত নয়। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো— তাহারাত ছাড়া বিশুদ্ধ হয়না এমন মূখ্য ইবাদতের নিয়ত করার অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে মাটিকে পবিত্রকারী সাব্যস্ত করা হয়নি। আর ইসলাম হলো এমন মুখ্য ইবাদত যা তাহারাত ছাড়া বিশুদ্ধ হয়। তিলাওয়াতে সিজদার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা এমন মূখ্য ইবাদত যা তাহারাত ছাড়া বিশুদ্ধ হয় না। আর যদি সে ইসলাম গ্রহণের নিয়ত না করেই অজু করে তারপর ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সে অজুকারী বলে গণ্য হবে। নিয়ত শর্ত হওয়ার ভিত্তিতে ইমাম শাফি'ঈ (র.) এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : এক খ্রিস্টান ইসলাম গ্রহণের নিয়তে তায়াম্মুম করেছে। তারপর মুসলমান হয়ে গেছে। তরফাইনের (র.) মতে তার এ তায়াম্মুম গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তার তায়াম্মুম গ্রহণযোগ্য হবে। তাঁর দলিল হলো— সে একটি উদ্দিষ্ট ইবাদতের নিয়ত করেছে। কেননা ইসলাম হলো সবচেয়ে বড় উদ্দিষ্ট ইবাদত। আর উদ্দিষ্ট ইবাদতের নিয়তে যে তায়াম্মুম করা হয় তা শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। সুতরাং ইসলাম গ্রহণের নিয়তে যে তায়াম্মুম করা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য হবে। ইসলাম গ্রহণের পর যদি সে (এ তায়াম্মুম দ্বারা) নামাজ পড়তে চায় তবে পড়তে পারবে। পক্ষান্তরে যদি কোনো মুসলমান মসজিদে প্রবেশের অথবা কুরআন স্পর্শ করার জন্য তায়াম্মুম করে তবে তা শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং যদি উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ পড়তে চায় তবে নামাজ পড়তে পারবে না। কেননা মসজিদে প্রবেশ করা, কুরআন স্পর্শ করা উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়।

তরফাইনের দলিল হলো— মাটি তখন পবিত্রকারী বলে বিবেচিত হবে যখন এমন উদ্দিষ্ট ইবাদতের নিয়ত করা হবে যা তাহারাত ব্যতীত সহীহ হয় না। আর ইসলাম এমনটি নয়। কেননা ইসলাম তাহারাত ছাড়াও সহীহ হয়ে যায়। এর বিপরীত হলো সিজদায়ে তিলাওয়াত। কেননা সিজদায়ে তিলাওয়াত এমন উদ্দিষ্ট ইবাদত যা তাহারাত ব্যতীত সহীহ হয় না। সুতরাং যদি সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়তে তায়াম্মুম করা হয় তবে তা দ্বারা নামাজ আদায় করা সহীহ হবে।

নিহায়া গ্রন্থকার হিদায়া প্রণেতার উত্থাপিত তরফাইনের দলিলের উপর এ মর্মে সন্দেহ করেছেন যে, যদি কোনো কাফির নামাজ আদায়ের নিয়তে তায়াম্মুম করে এবং পরে মুসলমান হয়, তখন এ তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ জায়েজ হওয়া উচিত। কেননা নামাজ এমন উদ্দিষ্ট ইবাদত যা তাহারাত ব্যতীত সহীহ হয় না, অথচ কাফিরের উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ জায়েজ নয়, তাই তরফাইনের এ কথা বলা যে, মাটিকে ঐ সময় পবিত্রকারী ধরা হবে যখন তা দ্বারা এমন উদ্দিষ্ট ইবাদতের নিয়ত করা হবে যা তাহারাত ব্যতীত সহীহ হয় না, ভুল; তবে উত্তম দলিল এভাবে হতে পারে যে, কাফির ব্যক্তি নিয়তের আহাল নয়। কেননা নিয়ত হলো ইবাদত, আর তায়াম্মুম নিয়ত ব্যতীত সহীহ হয় না। এ জন্য কাফিরের তায়াম্মুম সহীহ নয়।

(وإن توضأ) যদি খ্রিস্টান ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের নিয়ত না করেই অজু করে তারপর মুসলমান হয়ে যায়, তবে আমাদের মতে এ ব্যক্তি অজুকারী বলে গণ্য হবে। এর দ্বারা যদি নামাজ পড়তে চায় তবে পড়তে পারবে। কেননা আমাদের মতে অজুর মধ্যে নিয়ত শর্ত নয়। সুতরাং তার আহাল না হলে কোনো ক্ষতি নেই। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে তার অজু গ্রহণ যোগ্য নয়। কেননা তার মতে অজুর মধ্যেও নিয়ত শর্ত। আর খ্রিস্টান ব্যক্তি নিয়তের আহাল নয়। بناء শব্দ দ্বারা ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল বর্ণনা করা হয়েছে যদিও এর দ্বারা আমাদের দলিলও বুঝে আসে।

فَإِنْ تَيَمَّمَ مُسْلِمٌ ثُمَّ ارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ عَلٰى تَيَمُّمِهِ وَقَالَ زُفَرُ (رح) يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ لِأَنَّ الْكُفْرَ يُنَافِيْهِ فَيَسْتَوِيْ فِيْهِ الْاِبْتِدَاءُ وَالْاِنْتِهَاءُ كَالْمُحَرَّمِيَّةِ فِى النِّكَاحِ وَلَنَا أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ صِفَةُ كَوْنِهٖ طَاهِرًا فَاعْتِرَاضُ الْكُفْرِ عَلَيْهِ لَا يُنَافِيْهِ كَمَا لَوِ اعْتَرَضَ عَلَى الْوُضُوْءِ وَاِنَّمَا لَا يَصِحُّ مِنَ الْكَافِرِ اِبْتِدَاءً لِعَدَمِ النِّيَّةِ مِنْهُ -

অনুবাদ ঃ কোনো মুসলমান যদি তায়াম্মুম করে তারপর আল্লাহ না করুন মুরতাদ হয়ে যায় তারপর পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার পূর্ব তায়াম্মুম অক্ষুণ্ন থাকবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। কেননা কুফর তায়াম্মুমের বিপরীত ধর্মী বিষয়। সুতরাং এতে প্রথম অবস্থা ও শেষ অবস্থা উভয়ই সমান হবে। যেমন– বিবাহের ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার ব্যাপার। আমাদের দলিল এই যে, (তায়াম্মুম তো আর স্ব-সত্তায় বিদ্যমান থাকে না যাকে কুফর এসে দূর করে দেবে, বরং) তায়াম্মুমের পর ব্যক্তির মাঝে পবিত্র হওয়ার গুণই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং তার উপর কুফর আরোপিত হলে তা পবিত্রতার বিপরীত ধর্মী নয়। যেমন– অজুর উপর যদি কুফর আরোপিত হয়, উল্লেখ্য যে, কাফিরের নিয়ত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণে প্রাথমিক অবস্থায় তার তায়াম্মুম দুরস্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : এক ব্যক্তি মুসলমান অবস্থায় তায়াম্মুম করেছে তারপর আল্লাহ না করুন সে মুরতাদ হয়ে গেছে; তারপর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেছে, এতে তার পূর্বের তায়াম্মুম অক্ষুণ্ন থাকবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। তাঁর দলিল হলো– কুফর তায়াম্মুমের বিপরীত ধর্মী বিষয়। সুতরাং এতে প্রথম ও শেষ অবস্থা উভয়ই সমান হবে। অর্থাৎ যেমনিভাবে প্রথম অবস্থায় কুফর তায়াম্মুমের বিপরীত এমনিভাবে শেষ অবস্থায়ও বিপরীত। সুতরাং প্রথম অবস্থায় যখন কাফিরের তায়াম্মুম গ্রহণযোগ্য নয় এমনিভাবে শেষ অবস্থায়ও তার তায়াম্মুম গ্রহণযোগ্য হবে না। এ মাসআলাটি এমন– যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার ব্যাপারে। অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় বিবাহের পূর্বে হারাম হওয়ার কারণ সংঘটিত হলে বিবাহ বৈধ হয় না। তেমনি পরবর্তী অবস্থায় বিবাহের পর হারামের কারণ সংঘটিত হলেও বিবাহ বাতিল হয়ে যায়।

ইমাম যুফার (র.)-এর মাযহাবের উপর একটি প্রশ্ন হয়। প্রশ্নটি হলো, কুফর তায়াম্মুমের বিপরীত তখন হবে– যখন তা ইবাদত হবে। আর ইবাদত নিয়ত ছাড়া কবুল হয় না। অথচ ইমাম যুফার (র.)-এর মতে তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়ত শর্ত নয়। সুতরাং কুফর তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে এমন– যেমন কুফর অজুর ক্ষেত্রে। তাই যেমনিভাবে কুফরির কারণে অজু বাতিল হয় না এমনিভাবে তায়াম্মুমও বাতিল না হওয়া উচিত? জবাব হলো মুখতার মাযহাব অনুযায়ী ইমাম যুফার (র.)-এর মতেও তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়ত শর্ত। দ্বিতীয় জবাব হলো, কুফর তায়াম্মুমের বিপরীতধর্মী এ কারণে যে, কাফির-এর মধ্যে আহ্‌লিয়াত নেই। কেননা তায়াম্মুমের প্রবর্তন হয়েছে নামাজের জন্য। আর কাফির নামাজের আহাল নয়। তাই কাফিরের তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে, নিয়ত করুক বা না করুক এবং তাতে প্রথম ও শেষ অবস্থা সমান। আমাদের দলিল হলো— তায়াম্মুম করার পর সত্তাগতভাবে তা আর বিদ্যমান থাকে না বরং ঐ তাহারাত-ই বাকি থাকে যা তায়াম্মুম দ্বারা হাসিল হয়েছে। সুতরাং তাহারাতের উপর কুফর আরোপিত হলে তা তার বিপরীতধর্মী হয় না। যেমন– অজু করার পর যদি কোনো ব্যক্তি কাফির হয়ে যায় তবে তার অজু বহাল থাকে। প্রশ্ন হলো, কাফিরের তায়াম্মুম প্রথম অবস্থায় গ্রহণযোগ্য হয় না কেন? এর জবাব হলো— যেহেতু কাফির নিয়তের আহাল নয় আর তায়াম্মুমের জন্য নিয়ত শর্ত এ জন্য প্রথম অবস্থায় কাফিরের তায়াম্মুম গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মুরতাদ হওয়ার দ্বারা আমল বাতিল হয়ে যায়। যেমন– আল্লাহর বাণী– وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ অথবা لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ। আর অজু এবং তায়াম্মুমও আ'মালের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মুরতাদ হওয়ার দ্বারাও তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত? এর জবাব হলো, মুরতাদ হওয়ার দ্বারা আ'মালের ছওয়াব বাতিল হয়ে যায়, আ'মাল বাতিল হয় না। তাই তায়াম্মুম বাতিল হবে না। যেমন– এক ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে অজু করল এতে তার হাদাস দূর হয়ে যাবে কিন্তু এ অজু দ্বারা সে ছওয়াব পাবে না।

وَيَنْقُضُ التَّيَمُّمَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ لِأَنَّهُ خَلَفٌ عَنْهُ فَأَخَذَ حُكْمَهُ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا رُؤْيَةُ الْمَاءِ إِذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ هِيَ الْمُرَادُ بِالْوُجُوْدِ الَّذِيْ هُوَ غَايَةٌ لِطَهُوْرِيَّةِ التُّرَابِ وَخَائِفُ السَّبُعِ وَالْعَدُوِّ وَالْعَطْشِ عَاجِزٌ حُكْمًا وَالنَّائِمُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) قَادِرٌ تَقْدِيْرًا حَتّٰى لَوْ مَرَّ النَّائِمُ الْمُتَيَمِّمُ عَلَى الْمَاءِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ عِنْدَهُ وَالْمُرَادُ مَا يَكْفِيْ لِلْوُضُوْءِ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِمَا دُوْنَهُ اِبْتِدَاءً فَكَذَا اِنْتِهَاءً ـ وَلَا يَتَيَمَّمُ إِلَّا بِصَعِيْدٍ طَاهِرٍ لِأَنَّ الطَّيِّبَ أُرِيْدَ بِهِ الطَّاهِرُ وَلِأَنَّهُ اٰلَةُ التَّطْهِيْرِ فَلَابُدَّ مِنْ طَهَارَتِهِ فِيْ نَفْسِهِ كَالْمَاءِ ـ

অনুবাদ ঃ অজু ভঙ্গকারী সকল বিষয় তায়াম্মুমকেও ভঙ্গ করে দেয়। কেননা তায়াম্মুম অজুর স্থলবর্তী। সুতরাং তা অজুর হুকুম গ্রহণ করবে। আর পানির দেখা পাওয়াও তায়াম্মুম ভঙ্গ করে দেয়, যদি পানি ব্যবহার করতে সে সক্ষম হয়। কেননা পানি পাওয়া দ্বারা ব্যবহার সক্ষমতাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। যা মাটির পবিত্রকরণের غاية সাব্যস্ত হয়েছে। হিংস্র প্রাণী, শত্রু বা পিপাসার আশঙ্কায় শঙ্কিত ব্যক্তি কার্যত অক্ষম। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ঘুমন্ত ব্যক্তি বস্তুত সক্ষম। তাঁর মতে তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় পানির নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। (পানি দেখতে পাওয়ার) অর্থ হলো— ঐ পরিমাণ (পানি) যা অজুর জন্য যথেষ্ট হয়। (আর গোসলের ক্ষেত্রে গোসলের জন্য যথেষ্ট হয়) কেননা প্রথম অবস্থায় এর চেয়ে কম পরিমাণ ধর্তব্য নয়। সুতরাং শেষ অবস্থায়ও তা ধর্তব্য হবে না। পবিত্র মাটি ছাড়া তায়াম্মুম করবে না। কেননা আয়াতের মধ্যে طيب শব্দ দ্বারা পবিত্র মাটিতে বুঝানো হয়েছে। তা ছাড়া মাটি হলো পবিত্রকরণের উপাদান। সুতরাং পানির মতো তার পবিত্র হওয়াও জরুরি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শায়খ কুদূরী (র.) বলেন, যে সকল বস্তু অজু ভঙ্গকারী সেগুলো তায়াম্মুমও ভঙ্গকারী। দলিল হচ্ছে— তায়াম্মুম হলো অজুর খলীফা। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আসল খলীফা থেকে শক্তিশালী হয়। সুতরাং যে সকল বস্তু শক্তিশালীর জন্য ভঙ্গকারী সেগুলো তায়াম্মুম ভঙ্গকারীও বটে।

قَوْلُهُ وَ يَنْقُضُهُ أَيْضًا ঃ কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, কিছু বস্তু এমনও রয়েছে যেগুলো দ্বারা অজু ভাঙ্গে না তবে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়। যেমন : তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি যদি পানি দেখে, আর পানি ব্যবহারে সে সক্ষমও বটে, তবে এ পানি তার তায়াম্মুম ভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে। পানি ব্যবহারে সক্ষম হওয়ার শর্ত আরোপ করার কারণ হলো, আল্লাহর বাণী– لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً আর হাদীসে রাসূল اَلتُّرَابُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلٰى عَشْرِ حِجَجٍ مَالَمْ يَجِدِ الْمَاءَ -এর মধ্যে وجود ماء দ্বারা পানি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া উদ্দেশ্য।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যদি পানি বিদ্যমান থাকে; কিন্তু পানি ব্যবহারে হিংস্র প্রাণীর আশঙ্কা হয়, কিংবা শত্রুর আশঙ্কা হয় কিংবা মাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, কিংবা পানি এত স্বল্প পরিমাণ যে, ব্যবহার করলে তাকে পিপাসার্ত থাকতে হবে। এ সকল সুরতে তাকে পানি ব্যবহারে অক্ষম ধরা হবে। তাই তার জন্য তায়াম্মুম জায়েজ হবে।

হিদায়া প্রণেতা বলেন, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে পানি ব্যবহারে সক্ষম ধরা হবে। সুতরাং যদি তায়াম্মুমকারী ঘুমন্ত ব্যক্তি পানির নিকট দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এ ব্যক্তি পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমন ওজরের সম্মুখীন হয়েছে যা তার পক্ষ থেকে এসেছে, এ জন্য তাকে মাজুর ভাবা হবে না। গ্রন্থকার আরো বলেন, যে পানি দেখার দ্বারা তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যায় তা দ্বারা এতটুকুন পানি উদ্দেশ্য যা অজুর জন্য যথেষ্ট হয়। কেননা যখন প্রথম অবস্থায় স্বল্প পানির ই'তিবার করা হয়নি তখন শেষ অবস্থায়ও ই'তিবার করা হবে না।

وَلَا يَتَيَمَّمُ إِلَّا بِصَعِيْدٍ الخ মাসআলা ঃ তায়াম্মুম শুধু পাক মাটি দ্বারা জায়েজ। কেননা কুরআনের বাণী– فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا -এর মধ্যে طيب দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে তাহারাত উদ্দেশ্য। এ জন্য যার দ্বারা তায়াম্মুম করা হবে তারও পাক হওয়া জরুরি। দ্বিতীয় দলিল হলো, মাটি পাক করার মাধ্যম, তাই তার নিজেরও পাক হওয়া জরুরি। যেমন পানির নিজেরও পাক হওয়া জরুরি।

وَيُسْتَحَبُّ لِعَادِمِ الْمَاءِ وَهُوَ يَرْجُوْهُ اَنْ يُّؤَخِّرَ الصَّلٰوةَ اِلٰى اٰخِرِ الْوَقْتِ فَاِنْ وَجَدَ الْمَاءَ يَتَوَضَّأُ وَاِلَّا تَيَمَّمَ وَصَلّٰى لِيَقَعَ الْاَدَاءُ بِاَكْمَلِ الطَّهَارَتَيْنِ فَصَارَ كَالطَّامِعِ فِى الْجَمَاعَةِ وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) فِىْ غَيْرِ رِوَايَةِ الْاُصُوْلِ اَنَّ التَّاخِيْرَ حَتْمٌ لِاَنَّ غَالِبَ الرَّاْىِ كَالْمُتَحَقِّقِ وَجْهُ الظَّاهِرِ اَنَّ الْعِجْزَ ثَابِتٌ حَقِيْقَةً فَلَايَزُوْلُ حُكْمُهُ اِلَّا بِيَقِيْنٍ مِثْلِهِ وَيُصَلِّىْ بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِىْ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرْضٍ لِاَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُوْرِيَّةٌ وَلَنَا اَنَّهُ طَهُوْرٌ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ فَيَعْمَلُ عَمَلَهُ مَا بَقِىَ شَرْطُهُ ـ

অনুবাদ ঃ পানি যে পাচ্ছে না, অথচ পাওয়ার আশা করছে, তার জন্য আখেরী ওয়াক্ত পর্যন্ত সালাত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। তারপর পানি পেয়ে গেলে অজু করবে, অন্যথায় তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করে নিবে। যাতে দু'টি পবিত্রতার পূর্ণতমটি দ্বারা নামাজ সম্পাদন হয়। সুতরাং বিষয়টি জামাআত পাওয়ার আশায় অপেক্ষমান ব্যক্তির মতো হলো। মূল ছয় গ্রন্থের বহির্ভূত বর্ণনা মতে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বিলম্ব করা ওয়াজিব। কেননা প্রবল ধারণা বাস্তবতুল্য। যাহিরুর রিওয়ায়াতের দলিল হলো — অপারগতা প্রকৃতই বর্তমান। সুতরাং অনুরূপ নিশ্চয়তা ছাড়া অপারগতার বিধান রহিত হয় না। তায়াম্মুমকারী তার তায়াম্মুম দ্বারা যত ইচ্ছা ফরজ, নফল নামাজ আদায় করতে পারবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে প্রতিটি ফরজ নামাজের জন্য আলাদা তায়াম্মুম করতে হবে। কেননা তা জরুরি অবস্থার তাহারাত। আমাদের দলিল হলো — পানির অনুপস্থিতিতে মাটি পবিত্রকারী। সুতরাং যতক্ষণ তার শর্ত বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ তা কার্যকর থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি পানি বিদ্যমান না থাকে; কিন্তু আশা আছে যে, নামাজের আখেরী ওয়াক্তে পানি পাওয়া যাবে। এ সুরতে নামাজকে আখেরী ওয়াক্তে মোস্তাহাব পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। আর যদি পানি পাওয়ার আশা না থাকে তবে অহেতুক নামাজ বিলম্ব করা দরকার নেই। তারপর যখন পানি পাওয়া যাবে অজু করবে, অন্যথায় তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করে নিবে। পানি পাওয়ার আশায় নামাজকে বিলম্ব করা মোস্তাহাব, যাতে দু'টি পবিত্রতার পূর্ণতমটি দ্বারা নামাজ সম্পাদন হয়। সুতরাং বিষয়টি জামাআত পাওয়ার আশায় অপেক্ষমান ব্যক্তির মতো হলো। অর্থাৎ বিলম্বে নামাজ আদায় করলে জামাআতের সাথে পড়া যাবে। এরূপ আশাবাদী ব্যক্তির পক্ষে নামাজ শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব।

রিওয়ায়াতে উসূল বহির্ভূত বর্ণনামতে শায়খাইন (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পানি পাওয়ার আশায় নামাজকে বিলম্ব করা ওয়াজিব। কেননা প্রবল ধারণা বাস্তবতুল্য। সুতরাং পানি বিদ্যমান অবস্থায় যেমনিভাবে তায়াম্মুম জায়েজ নেই এমনিভাবে পানি পাওয়ার প্রবল ধারণা হলেও তায়াম্মুম করা যাবে না; বরং নামাজকে আখেরী ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করবে। যদি ওয়াক্তের ভিতরে পানি পাওয়া যায় তবে তো ভালো, অন্যথায় তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ে নেবে।

যাহিরুর রিওয়ায়াতের দলিল হলো— যেহেতু পানি বিদ্যমান নেই তাই বাস্তবেই অপারগতা বিদ্যামান। আর অপারগতার হুকুম হলো তায়াম্মুম জায়েজ হওয়া। সুতরাং অনুরূপ নিশ্চয়তা ছাড়া অপারগতার বিধান রহিত হবে না। এ জন্য নামাজকে বিলম্ব করা মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

وَيُصَلِّىْ بِتَيَمُّمِهِ الخ : আমাদের মতে এক তায়াম্মুম দ্বারা অনেক নামাজ আদায় করা যায়। নামাজগুলো ফরজ হোক বা নফল হোক। এক ওয়াক্তে আদায় করা হোক বা বিভিন্ন ওয়াক্তে আদায় করা হোক। যতক্ষণ পর্যন্ত তায়াম্মুম ভঙ্গকারী কোনো কিছু না পাওয়া যায় এ হুকম প্রযোজ্য হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে এক তায়াম্মুম দ্বারা এক ফরজ নামাজ আদায় করা যায়, দ্বিতীয় ফরজ আদায় করার জন্য দ্বিতীয়বার তায়াম্মুম করা জরুরি। তবে এক তায়াম্মুম দ্বারা অনেক নফল নামাজ আদায় করা যায়। তার দলিল হলো— তায়াম্মুম হলো জরুরি অবস্থার তাহারাত। সুতরাং জরুরি অবস্থা (অর্থাৎ ফরজ নামাজের প্রয়োজন) অন্তর্হিত হলে ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে তার কার্যকারিতা রহিত হয়ে যাবে। আমাদের দলিল হলো— পানির অনুপস্থিতে মাটি পবিত্রকারী যা হাদীস দ্বারা সাবিত। যেমন— রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী اَلتُّرَابُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ অথবা جُعِلَتْ الْاَرْضُ لَنَا مَسْجِدًا وَّطَهُوْرًا সুতরাং যতক্ষণ তার শর্ত বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ তা কার্যকর থাকবে।

وَيَتَيَمَّمُ الصَّحِيحُ فِى الْمِصْرِ اِذَا حَضَرَتْ جَنَازَةٌ وَالْوَلِىُّ غَيْرُهُ فَخَافَ اِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ اَنْ تَفُوتَهُ الصَّلٰوةُ لِاَنَّهَا لَاتُقْضٰى فَيَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ وَكَذَا مَنْ حَضَرَ الْعِيْدَ فَخَافَ اِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ اَنْ يَّفُوتَهُ الْعِيْدُ يَتَيَمَّمُ لِاَنَّهَا لَاتُعَادُ وَقَوْلُهُ الْوَلِىُّ غَيْرُهُ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّهُ لَايَجُوْزُ لِلْوَلِىِّ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّ لِلْوَلِىِّ حَقَّ الْاِعَادَةِ فَلَا فَوَاتَ فِىْ حَقِّهِ ـ

অনুবাদ ঃ শহর এলাকায় যদি জানাযা উপস্থিত হয় এবং (জানাযার) ওয়ালী সে ছাড়া অন্য কেউ হয়, আর অজু করতে গেলে জানাযা ফউত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে সুস্থ ব্যক্তি তায়াম্মুম করতে পারবে। কেননা জানাযার কাজা নেই। সুতরাং অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি যদি ঈদের জামাআতে হাজির হয় এবং অজু করতে গেলে, ঈদের নামাজ ফউত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে, তবে তায়াম্মুম করতে পারে। কেননা ঈদের জামাআত দোহরানো হয় না। ইমাম কুদূরী (র.)-এর বক্তব্য اَلْوَلِىُّ غَيْرُهُ "ওয়ালী সে ছাড়া অন্য কেউ" কথাটির উদ্দেশ্য হলো, ওয়ালীর জন্য তায়াম্মুম করা জায়েজ নয়। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনা এবং এটাই বিশুদ্ধ। কেননা ওয়ালীর অধিকার আছে নামাজ দোহরানোর। সুতরাং তার পক্ষে ফউত হওয়া প্রযোজ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : এক সুস্থ ব্যক্তি শহরে তায়াম্মুম করতে পারে, যদি জানাযা উপস্থিত হয়, আর ওয়ালী সে ব্যতীত অন্য কেউ হয় এবং তার এ আশঙ্কা হয় যে, যদি সে অজু করা আরম্ভ করে তবে জানাযা ফউত হয়ে যাবে। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি ঈদের নামাজ পড়তে হাজির হলো এবং তার এ আশঙ্কা হয় যে, অজু করতে গেলে তার ঈদের নামাজ ফউত হয়ে যাবে, তখন এ ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামাজে শরিক হয়ে যাবে। ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, কায়েদা আছে যে, প্রত্যেক ঐ নামাজ যা لا الى بدل (যার বদলা নেই) ফউত হয়ে যায়, সে নামাজ পানি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম দ্বারা আদায় করা জায়েজ। আমাদের মতে জানাযার নামাজও এ পর্যায়ের। কেননা তার কাজা নেই। এমনিভাবে ঈদের নামাজেরও কাজা নেই।

গ্রন্থকার صحيح-এর قيد বৃদ্ধি করে مريض থেকে احتراز করেছেন। কেননা অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম জায়েজ। চাই সে শহরে হোক বা বাইরে হোক, ওয়ালী হোক বা না হোক, নামাজ ফউতের ভয় থাকুক বা না থাকুক। আর مصر-এর قيد দ্বারা মাঠ থেকে احتراز করেছেন। কেননা মাঠে তায়াম্মুম জায়েজ। ওয়ালী হোক বা না হোক। কেননা সাধারণত মাঠে পানি পাওয়া যায় না।

কুদূরী (র.) যে বলেছেন, 'ওয়ালী সে ছাড়া অন্য কেউ' এর দ্বারা এ দিকে ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, ওয়ালীর উপর জানাযার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েজ নেই। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) বর্ণনা করেছেন এবং এটাই বিশুদ্ধ। কেননা ওয়ালীর জানাযার নামাজ দোহরানোর অধিকার আছে। তাই তার ক্ষেত্রে ফউত হওয়ার আশঙ্কা নেই। যাহিরুর রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, ওয়ালীর জন্যও তায়াম্মুম করা জায়েজ। কেননা জানাযার মধ্যে অপেক্ষা করা মাকরূহ। ইবনে আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اِذَا فَجَاءَتْكَ جَنَازَةٌ وَاَنْتَ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ عَلَيْهَا ـ

যদি হঠাৎ জানাযা হাজির হয় আর তুমি অজুহীন হও, তবে তায়াম্মুম করে জানাযার নামাজ আদায় কর। ইবনে আব্বাস (রা.) ওয়ালী গায়রে ওয়ালীর কোনো তাফসীর করেননি। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, এ অবস্থায়ও মুতলাকান তায়াম্মুম করা জায়েজ। ওয়ালী সে হোক বা অন্য কেউ ওয়ালী হোক।

وَاِنْ اَحْدَثَ الْاِمَامُ اَوِ الْمُقْتَدِيْ فِيْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ تَيَمَّمَ وَبَنٰى عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَايَتَيَمَّمُ لِاَنَّ اللَّاحِقَ يُصَلِّيْ بَعْدَ فَرَاغِ الْاِمَامِ فَلَا يَخَافُ الْفَوْتَ وَلَهٗ اَنَّ الْخَوْفَ بَاقٍ لِاَنَّهٗ يَوْمُ زَحْمَةٍ فَيَعْتَرِيْهِ عَارِضٌ يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهٗ وَالْخِلَافُ فِيْمَا اِذَا شَرَعَ بِالْوُضُوْءِ وَلَوْ شَرَعَ بِالتَّيَمُّمِ تَيَمَّمَ وَبَنٰى بِالْاِتِّفَاقِ لِاَنَّا لَوْ اَوْجَبْنَا الْوُضُوْءَ يَكُوْنُ وَاجِدًا لِلْمَاءِ فِيْ صَلَاتِهٖ فَيَفْسُدُ ـ

অনুবাদ ঃ ইমাম কিংবা মুকতাদী যদি ঈদের নামাজের (মধ্যে) হাদাসগ্রস্ত হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সে তায়াম্মুম করবে এবং বিনা করবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, সে তায়াম্মুম করতে পারবে না। কেননা لاحق ব্যক্তি ইমামের ফারেগ হওয়ার পর অবশিষ্ট নামাজ আদায় করতে পারে। সুতরাং তার ফউত হওয়ার আশঙ্কা নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আশঙ্কা বিদ্যমান আছে। কেননা সেদিন হলো ভিড়ের দিন। ফলে এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভূত হতে পারে, যা তার নামাজ ফাসিদ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ মতপার্থক্য ঐ ক্ষেত্রে, যখন অজু দ্বারা নামাজ শুরু করে থাকে। আর তায়াম্মুম দ্বারা শুরু করে থাকলে সকলের মতেই তায়াম্মুম করে বিনা করবে। কেননা যদি আমরা তার উপর অজু ওয়াজিব করি, তাহলে নামাজের মধ্যে সে পানি পেয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তো নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ঈদের নামাজের মধ্যে যদি ইমাম অথবা মুক্তাদী হাদাসগ্রস্ত হয় এবং সে অজু করে নামাজ শুরু করেছিল। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সে তায়াম্মুম করে বিনা করবে। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, সে তায়াম্মুম করবে না; বরং অজু করে নামাজ পুরা করবে। তাঁদের দলিল হলো— এ ব্যক্তি লাহিক। আর লাহিক ব্যক্তি ইমামের ফারেগ হওয়ার পর অবশিষ্ট নামাজ আদায় করতে পারে। তাই তার নামাজ ফউত হওয়ার আশঙ্কা নেই। আর যার নামাজ ফউত হওয়ার আশংকা নেই তার পানি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম করার ইজাযত নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো— নামাজ ফউত হওয়ার আশঙ্কা এখনো বিদ্যমান আছে। কেননা ঈদের দিন ভিড়ের দিন, ফলে এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে, যা তার নামাজ নষ্ট করার কারণ হয়ে দাড়াবে। যেমন কোনো ব্যক্তি তাকে সালাম দিল এবং সে তার জবাব দিল। কিংবা কেউ তাকে মুবারকবাদ দিল আর সে তা কবুল করল। এতে তার নামাজ ফউত হয়ে যাবে। আর ঈদের নামাজের কাজাও নেই। কেননা ঈদের নামাজ জামাআতের সাথে مشروع হয়েছে। সুতরাং এ অবস্থায়ও নামাজ ফউত হওয়ার আশঙ্কা বাকি আছে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম সাহেব ও সাহেবাইনের এ মতপার্থক্য তখন প্রযোজ্য হবে, যখন অজু দ্বারা নামাজ শুরু করা হয়। আর যদি তায়াম্মুম করে শুরু করা হয়, তবে সকলের মতেই তায়াম্মুম করে বিনা করবে। কেননা যদি আমরা তার উপর অজু ওয়াজিব করি, তাহলে নামাজের মধ্যে সে পানি পেয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তো তার নামাজই ফাসিদই হয়ে যাবে।

وَلَا يَتَيَمَّمُ لِلْجُمُعَةِ وَاِنْ خَافَ الْفَوْتَ لَوْتَوَضَّأَ فَاِنْ اَدْرَكَ الْجُمُعَةَ صَلَّاهَا وَاِلَّا صَلَّى الظُّهْرَ اَرْبَعًا لِاَنَّهَا تَفُوْتُ اِلٰى خَلَفٍ وَهُوَ الظُّهْرُ بِخِلَافِ الْعِيْدِ وَكَذَا اِذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ لَوْ تَوَضَّأَ لَمْ يَتَيَمَّمْ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْضِىْ مَا فَاتَهُ لِاَنَّ الْفَوَاتَ اِلٰى خَلَفٍ وَهُوَ الْقَضَاءُ وَالْمُسَافِرُ اِذَا نَسِىَ الْمَاءَ فِىْ رَحْلِهِ فَتَيَمَّمَ وَصَلّٰى ثُمَّ ذَكَرَ الْمَاءَ لَمْ يُعِدْهَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ (رح) يُعِيْدُهَا وَالْخِلَافُ فِيْمَا اِذَا وَضَعَهُ بِنَفْسِهِ اَوْ وَضَعَهُ غَيْرُهُ بِاَمْرِهِ وَ ذَكَرَهُ فِى الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ لَهُ اَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ فَصَارَ كَمَا اِذَا كَانَ فِىْ رَحْلِهِ ثَوْبٌ فَنَسِيَهُ وَلِاَنَّ رَحْلَ الْمُسَافِرِ مَعْدِنٌ لِلْمَاءِ عَادَةً فَيُفْتَرَضُ الطَّلَبُ وَلَهُمَا اَنَّهُ لَاقُدْرَةَ بِدُوْنِ الْعِلْمِ وَهِىَ الْمُرَادُ بِالْوُجُوْدِ وَمَاءُ الرَّحْلِ مَعْدِنٌ لِلشُّرْبِ لَا لِلْاِسْتِعْمَالِ وَمَسْاَلَةُ الثَّوْبِ عَلَى الْاِخْتِلَافِ وَلَوْكَانَ عَلَى الْاِتِّفَاقِ فَفَرْضُ السَّتْرِ يَفُوْتُ لَا اِلٰى خَلَفٍ وَالطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ تَفُوْتُ اِلٰى خَلَفٍ وَهُوَ التَّيَمُّمُ ـ

অনুবাদ ঃ জুমুআর নামাজের ব্যাপারে যদি আশঙ্কা করে যে, অজু করলে তা ফউত হয়ে যাবে, তাহলে তায়াম্মুম করবে না; বরং (অজু করার পর) যদি জুমুআর নামাজ পায় তাহলে জুমুআ আদায় করবে। অন্যথায় চার রাকাআত জোহর আদায় করবে। কেননা তা স্থলবর্তী রেখে ফউত হয়। আর তা হলো জোহরের নামাজ। আর ঈদের নামাজ এর বিপরীত। তদ্রূপ যদি অজু করার ব্যাপারে নামাজের সময় ফউত হওয়ার আশঙ্কা করে তাহলে তায়াম্মুম করতে পারবে না; বরং অজু করবে এবং যে নামাজ ফউত হয়েছে তা কাজা করবে। কেননা এ নামাজ স্থলবর্তী রেখে ফউত হচ্ছে। আর তা হলো কাজা। মুসাফির যদি তার বাহনে রক্ষিত পানির কথা ভুলে যায় এবং তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করে নেয়, এরপর পানির কথা স্মরণ হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উক্ত নামাজ দোহ্‌রাবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, উক্ত নামাজ দোহ্‌রাবে। এ মতপার্থক্য হলো ঐ অবস্থায়, যখন পানি সে নিজে কিংবা তার নির্দেশে অন্য কেউ রেখে থাকে। ওয়াক্তের ভিতরে এবং ওয়াক্তের পরে স্মরণ হওয়ার একই হুকুম। ইমাম আবূ ইউসুফের (র.) দলিল হলো— সে পানি প্রাপ্ত ব্যক্তি। সুতরাং সে হলো ঐ ব্যক্তির মতো যে তার বাহনে রাখা কাপড়ের কথা ভুলে যায়। তা ছাড়া মুসাফিরের বাহনে সাধারণত পানি মওজুদ রাখা হয়। সুতরাং পানির খোঁজ করা তার উপর ফরজ। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো— জানা না থাকলে সক্ষমতা বুঝা যায় না, আর পানির প্রাপ্তির দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। আর বাহনে (সাধারণত) খাওয়ার পানি রাখা হয়, ব্যবহারের জন্য নয়। আর বস্ত্রের মাসআলায়ও অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে। আর যদি এ মাসআলায় ঐকমত্যও থাকে, তাহলে উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সতরের ফরজ ফউত হচ্ছে— স্থলবর্তীহীনভাবে। আর পানি দ্বারা তাহারাত হাসিল করার বিষয়টি ফউত হচ্ছে একটি স্থলবর্তী রেখে, তা হলো তায়াম্মুম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি অজু করতে গেলে জুমুআর নামাজ ফউত হওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলেও জুমুআর জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি নেই; বরং তার জন্য অজু করা জরুরি। অতঃপর যদি সে জুমুআর নামাজ পায় তবে আলহামদুলিল্লাহ জুমুআর নামাজ আদায় করবে। অন্যথা জোহরের নামাজ আদায় করবে। দলিল হলো— যদি জুমুআর নামাজ ফউত হয়ে যায় তবে তার খলীফা

জোহর বিদ্যমান আছে। এ জন্য পানি থাকা অবস্থায় শুধু নামাজ ফউত হওয়ার আশঙ্কায় তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না। তবে ঈদের নামাজ এর বিপরীত। যদি ঈদের নামাজ ফউত হওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করবে। কেননা ঈদের নামাজের কাজা নেই।

ফায়িদা ঃ হিদায়া গ্রন্থকার জোহরকে জুমার খলীফা বলেছেন। অথচ শায়খাইন (র.)-এর মতে জুমা হলো জোহরের খলীফা। এর জবাব হচ্ছে— হিদায়া গ্রন্থকার এ দিকে ইশারা করেছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব হলো মুখতার মাযহাব। কেননা তাঁর মতে জুমুআর দিন জুমা হলো আসল, আর জোহর হলো তার খলীফা। দ্বিতীয় জবাব হলো— জুমুআর দিনে যুহরের নামাজ صورة খলীফা। এ কারণে জুমার নামাজ ফউত হয়ে গেলে জোহরের নামাজ পড়া হয়। তার উল্টো নয়। (অর্থাৎ জোহর ফউত হয়ে গেলে জুমুআ পড়া হয় না) এ জন্য হিদায়া গ্রন্থকার জোহরকে জুমুআর খলীফা বলেছেন।

وَكَذَا إِذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ الخ মাসআলা হলো, যদি অজু করার কারণে নামাজের ওয়াক্ত ফউত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে তায়াম্মুম করতে পারবে না; বরং অজু করতে হবে এবং যে নামাজ ফউত হয়ে গেছে তার কাজা করবে। কেননা এ নামাজ তার খলীফা রেখে ফউত হচ্ছে। আর তা হলো কাজা। তাই তায়াম্মুম করে তা আদায় করা জায়েজ হবে না। কেউ কেউ উক্ত ইবারতে তাকরার হওয়ার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এ ধরনের হুকুম পূবেও বর্ণিত হয়েছে? এর জবাব হচ্ছে, পূর্বের অধ্যায়ে হিদায়া প্রণেতার বক্তব্য ছিল আর এ অধ্যায়ে ইমাম কুদূরীর বক্তব্য। সুতরাং তাকরার হলো না।

وَالْمُسَافِرُ إِذَا نَسِيَ الْمَاءَ الخ যদি মুসাফির তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ে অথচ তার বাহনে পানি রক্ষিত ছিল। এর দু'টো সুরত হতে পারে, হয়তো তার পানির কথা জানা ছিল এবং ঐ পানি হয়তো সে নিজ হাতে রাখছে অথবা তার নির্দেশে অন্য কেউ রাখছে। কিংবা তার পানির কথা জানাই ছিল না। আর এ সূরত এভাবে যে, অন্য কেউ তার নির্দেশ ছাড়া পানি রাখছে। যদি দ্বিতীয় সুরত হয় (তার নির্দেশ ছাড়া পানি রাখা হয়) তবে ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে তার নামাজ দোহ্‌রানো ওয়াজিব নয়। কেননা মানুষ অন্যের কাজের দ্বারা কোনো হুকুমের মুখাতাব হয় না। আর যদি প্রথম সুরত হয় (অর্থাৎ সে বা তার নির্দেশে পানি রাখা হয়) এ অবস্থায় বাহনে পানি ছিল না ধারণা করে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ে, অথচ তার বাহনে পানি ছিল তাহলে কোনো ইমামের মতেই তার তায়াম্মুম জায়েজ হয়নি। তার অজু করে নামাজ দোহ্‌রানো ওয়াজিব। কেননা এ সুরতে অলসতা তাঁর নিজের পক্ষ থেকেই হয়েছে। আর যদি এ ব্যক্তি বাহনে পানি রেখে ভুলে যায় এবং তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ে, তারপর তার পানির কথা স্মরণ হয় তাহলে তরফাইনের মতে তার নামাজ দোহ্‌রানো ওয়াজিব নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তার নামাজ দোহ্‌রানো ওয়াজিব। ওয়াক্তের ভিতরে পানির কথা স্মরণ হোক বা ওয়াক্তের বাইরে হোক। ইমাম শাফি'ই (র.)-এরও একই মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো— এই মুসাফির ব্যক্তি পানি প্রাপ্ত ব্যক্তি। আর তায়াম্মুম এর প্রবর্তন হয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যে পানি না পায়। সুতরাং তার তায়াম্মুম জায়েজ হবে না। আর এ হলো ঐ ব্যক্তির মতো যে নিজের কাপড়ের কথা ভুলে যায়, আর উলঙ্গ হয়ে বা নাপাক কাপড় নিয়ে নামাজ আদায় করে। সুতরাং পাক কাপড়ের কথা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই তার উপর নামাজ দোহ্‌রানো ওয়াজিব। দ্বিতীয় দলিল হলো— সাধারণত মুসাফিরের বাহনে পানি মওজুদ রাখা হয়। তাই বাহনে পানির খোঁজ নেওয়া ওয়াজিব ছিল। অথচ সে তালাশ করেনি। তাই তাকে মাজুর ধরা হবে না বিধায় তার নামাজ দোহ্‌রানো ওয়াজিব হবে।

তারফাইনের দলিল হলো— জানা ছাড়া পানির উপর সক্ষমতা বুঝা যায় না। আর পানি প্রাপ্তির দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, পানির উপর সক্ষমতা লাভ করা। সুতরাং যখন তার পানির কথা জানাই নাই, তাই তার পানির উপর কুদরত হাসিল হলো না। এ অবস্থায় তার জন্য তায়াম্মুম জায়েজ এবং নামাজও সহীহ্। সুতরাং তা আর দোহ্‌রানোর প্রয়োজন নেই। আর এ কথা বলা যে, মুসাফিরের বাহনে পানি রাখা হয়? তার জবাব হচ্ছে— বাহনে সাধারণত খাওয়ার পানি রাখা হয়, অজু ও গোসলে ব্যবহারের পানি রাখা হয় না।

وَمَسْئَلَةُ الثَّوْبِ -এর দ্বারা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর কিয়াসের জবাব দেওয়া হচ্ছে। জবাবের সার-সংক্ষেপ হলো— কাপড়ের মাসআলাটিও অনুরূপ মুখ্‌তালাফফীহি অর্থাৎ তারফাইনের মতে যখন পাক কাপড়ের কথা ভুলে গেছে তখন নামাজ উলঙ্গ বা নাপাক কাপড় দ্বারা আদায় হয়ে যাবে। পাক কাপড়ের কথা স্মরণ হলে নামাজ দোহ্‌রানো ওয়াজিব হবে না। আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, কাপড়ের মাসআলায় ঐকমত্য রয়েছে, তারপরও পানির মাসআলাকে কাপড়ের মাসআলার উপর কিয়াস করা সহীহ হবে না। কেননা উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য হলো— সতর ঢাকা ফরজ। সুতরাং যদি সতরের ফরজ ফউত হয়ে যায়, তবে তার কোনো স্থলবর্তী নেই। আর যদি পানির সাথে তাহারাত হাসিল করার বিষয়টি ফউত হয়ে যায় তবে তা স্থলবর্তী রেখে ফউত হয়। আর তা হচ্ছে তায়াম্মুম।

وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ طَلَبُ الْمَاءِ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بِقُرْبِهِ مَاءً لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ الْمَاءِ فِي الْفَلَوَاتِ وَلَادَلِيْلَ عَلَى الْوُجُوْدِ فَلَمْ يَكُنْ وَاجِدًا وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءً لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَّتَيَمَّمَ حَتَّى يَطْلُبَهُ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ نَظَرًا إِلَى الدَّلِيْلِ ثُمَّ يَطْلُبُ مِقْدَارَ الْغَلْوَةِ وَلَايَبْلُغُ مِيْلًا كَيْلَا يَنْقَطِعَ عَنْ رُفْقَتِهِ ـ

অনুবাদ ঃ তায়াম্মুমকারীর অন্তরে যদি প্রবল ধারণা না হয় যে, কাছেই পানি আছে তবে তার জন্য পানির খোঁজ নেওয়া জরুরি নয়। কেননা বিশাল প্রান্তরে পানি না থাকারই সম্ভাবনা বেশি। আর পানির পাওয়ায় কোনো প্রমাণ ও বিদ্যমান নেই। সুতরাং সে ব্যক্তি পানি প্রাপ্ত নয়। আর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, সেখানে পানি আছে, তাহলে খোঁজ না নিয়ে তায়াম্মুম করা তার জন্য জায়েজ হবে না। কেননা (প্রবল ধারণা জনিত) প্রমাণের প্রেক্ষিতে সে পানি প্রাপ্ত বলে সাব্যস্ত হবে। তবে পানির অনুসন্ধানের ব্যাপার এক তীরের দূরত্ব পর্যন্ত (কেউ কেউ বলেন, অর্থাৎ তিনশ গজ) খোঁজ করবে অর্থাৎ নিক্ষেপের পর তা যতটুকুন পর্যন্ত যায়। এক মাইল দূরত্ব পর্যন্ত যেতে হবে না, যাতে সে তার কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের মতে তায়াম্মুমকারী ব্যক্তির জন্য পানির অনুসন্ধান করা ওয়াজিব নয়, শর্ত হলো যদি পানি কাছে হওয়ার প্রবল ধারণা না হয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, ডানে বায়ে পানি অনুসন্ধান করা শর্ত। কেননা فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا -এর মধ্যে তায়াম্মুমের হুকুম হলো পানি না পাওয়ার সময়। আর পানি না পাওয়া তখনই বুঝে আসবে যখন অনুসন্ধান করা হবে। তাই তায়াম্মুম করার পূর্বে অনুসন্ধান করা জরুরি।

আমাদের দলিল হলো— আয়াতের মধ্যে না পাওয়া যাওয়া শব্দটি مطلق। এখানে তলব ও গায়রে তলব-এর কোনো قيد নেই। এ কারণে اَلْمُطْلَقُ يَجْرِيْ عَلٰى إِطْلَاقِهٖ -এর উপর ভিত্তি করে আয়াতটিকে তলব ও গায়রে তলব-এর قيد থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। তা ছাড়া সাধারণত বিশাল প্রান্তরে পানি না থাকারই সম্ভাবনা বেশি। আর পানির অস্তিত্বের উপর কোনো প্রমাণও বিদ্যমান নেই। সুতরাং সে ব্যক্তি পানি প্রাপ্ত নয়। এ অবস্থায় তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েজ। তাই অনুসন্ধান ছাড়াও তায়াম্মুম করাকে জায়েজ বলা হয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর এ কথা বলা যে, তলব ব্যতীত অস্তিত্ব পাওয়া যায় না (عدم وجدان) কথাটি সহীহ নয়। অর্থাৎ وجود -এর জন্য طلب জরুরি এ কথাটি ঠিক নয়; বরং তলব ছাড়াও وجود হতে পারে। যেমন– রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيُعَرِّفْهَا (যে ব্যক্তি লুকাতা পাবে সে তার ঘোষণা করবে।) উক্ত হাদীসে ঐ ব্যক্তিকে واجد, বলা হয়েছে যদিও তার পক্ষ থেকে তলব পাওয়া যায়নি। আর যদি "প্রবল ধারণা" হয় যে, এখানে পানি বিদ্যমান তাহলে তার তায়াম্মুম করা জায়েজ হবে না, যতক্ষণ না সে পানি অনুসন্ধান করবে। কেননা প্রবল ধারণা জনিত প্রমাণের প্রেক্ষিতে সে পানি প্রাপ্ত বলে সাব্যস্ত হবে।

গ্রন্থকারের ইবারতে প্রবল ধারণা শব্দটি ইলম তথা জ্ঞানের স্থলবর্তী। সুতরাং যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, পানি নিকটে, তাহলে তায়াম্মুম জায়েজ হতো না। এমনিভাবে যদি প্রবল ধারণা হয় তাহলেও তায়াম্মুম জায়েজ হবে না। কতটুকুন দূরত্ব পর্যন্ত পানি অনুসন্ধান করবে? এ ব্যাপারে হিদায়া গ্রন্থকারের তাহ্কীক হলো, এক তীরের দূরত্ব পর্যন্ত পানি তালাশ করবে, এক মাইল দূরত্ব পর্যন্ত যেতে হবে না। অন্যথা সে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

<u>ফায়িদা</u> ঃ غلوة লাম-এর যবরের সাথে পঠিত, তীরন্দাজ ব্যক্তি তার কামান থেকে তীর নিক্ষেপ করার পর তীর চালানোর স্থান এবং তার হবে। পতিত হওয়ার স্থানের মাঝের ব্যবধানকেই গাল্‌ওয়াহ্ বলে। কেউ কেউ বলেন, তিনশ গজ থেকে চারশ গজের ব্যবধানকে গালাওয়াহ্ বলা হয়।

وَاِنْ كَانَ مَعَ رَفِيْقِهٖ مَاءٌ طَلَبَ مِنْهُ قَبْلَ اَنْ يَّتَيَمَّمَ لِعَدَمِ الْمَنْعِ غَالِبًا فَاِنْ مَنَعَهٗ مِنْهُ يَتَيَمَّمُ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ وَلَوْ تَيَمَّمَ قَبْلَ الطَّلَبِ اَجْزَاهُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) لِاَنَّهٗ لَايَلْزَمُ الطَّلَبُ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ وَقَالَا لَايُجْزِيْهِ لِاَنَّ الْمَاءَ مَبْذُوْلٌ عَادَةً وَلَوْ اَبٰى اَنْ يُّعْطِيَهٗ اِلَّا بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَعِنْدَهٗ ثَمَنُهٗ لَايُجْزِيْهِ التَّيَمُّمُ لِتَحَقُّقِ الْقُدْرَةِ وَلَايَلْزَمُهٗ تَحَمُّلُ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ لِاَنَّ الضَّرَرَ مُسْقِطٌ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ ঃ যদি তার সফর সঙ্গীর কাছে পানি থাকে, তাহলে তায়াম্মুমের আগে তার কাছে থেকে পানি চেয়ে নিবে। কেননা সাধারণত পানি দিতে অসম্মতি থাকে না। যদি সে তাকে পানি না দেয় তাহলে অপারগতা সাব্যস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে তায়াম্মুম করে নেবে। যদি চাওয়ার আগেই তায়াম্মুম করে নেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তায়াম্মুম তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা অন্যের মালিকানা থেকে চাওয়া জরুরি নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, তায়াম্মুম তার জন্য যথেষ্ট হবে না, কেননা পানি সাধারণত এমনিই দেওয়া হয়ে থাকে। যদি ন্যায্য মূল্য ছাড়া পানি দিতে অস্বীকার করে আর তার কাছে পানির মূল্য থাকে তাহলে তার জন্য তায়াম্মুম যথেষ্ট হবে না। সক্ষমতা সাব্যস্ত হওয়ার কারণে। তবে অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্য বহন করা তার জন্য জরুরি নয়। কেননা ক্ষতিগ্রস্ততা হুকুমকে রহিত করে দেয়। আল্লাহই অধিক জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি সফর সঙ্গীর কাছে পানি থাকে, তাহলে হুকুম হলো, তায়াম্মুম করার পূর্বে তার কাছে পানি চাইবে। যদি সে পানি দিয়ে দেয় তবে অজু করে নামাজ পড়ে নেবে। আর যদি না দেয় তবে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়বে। দলিল হলো— সাধারণত কেউ পানি দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে না; বরং চাওয়া মাত্রই দিয়ে দেয়। এ জন্য তায়াম্মুম করার আগে চাওয়া জরুরি। আর অস্বীকারের সুরতে যেহেতু মূলত অপারগতা পাওয়া গেছে তাই তখন তায়াম্মুম করা জায়েজ হবে।

কারো কারো মাযহাব হলো যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, চাইলে পানি দেবে তাহলে সঙ্গীর নিকট পানি চাওয়াও ওয়াজিব, অন্যথায় নয়।—(কিফায়া)

আর যদি সঙ্গীর নিকট পানি চাওয়ার আগেই তায়াম্মুম করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত তায়াম্মুম যথেষ্ট হবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে যথেষ্ট হবে না। তাঁদের দলিল হলো— পানি এমন বস্তু যা দিতে সাধারণত অস্বীকার করা হয় না। তাই সঙ্গীর নিকট হওয়া মানে তার নিকটে থাকা এবং সে পানি ব্যবহারে সামর্থ্যবান হওয়া। আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো— অন্যের মালিকানা থেকে কোনো কিছু চাওয়া তার জন্য জরুরি নয়। তা ছাড়া চাওয়াও তো এক ধরনের হেয়তা। এ কারণেও তার উপর সঙ্গীর কাছে পানি চাওয়া জরুরি নয়।

আর যদি তার সঙ্গী মূল্যের বিনিময়ে পানি দিতে চায়, এ ব্যক্তিও মূল্য দিয়ে পানি নিতে চায় তবে এর তিনটি অবস্থা হতে পারে।

এক. সে ন্যায্য মূল্যের বিনিময়ে পানি বিক্রয় করতে চায়।

দুই. একেবারে কম মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করতে চায়।

তিন. অধিক মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করতে চায়। প্রথমও দ্বিতীয় সুরতে তায়াম্মুম জায়েজ নয়। কেননা এই দুই সুরতে পানি ব্যবহারের সামর্থ্য পাওয়া গেছে। কেননা মূল্য দিতে সক্ষম হওয়া মানে পানির উপর সক্ষম হওয়া। তাই এই দুই অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েজ নেই। আর তৃতীয় সুরতে তায়াম্মুম জায়েজ। কেননা অস্বাভাবিক অধিক মূল্য বহন করা তার জন্য ক্ষতিকারক। অথচ ক্ষতিগ্রস্ততা হুকুমকে রহিত করে দেয়। কেননা মুসলমানের মাল তার নিকট এমন মর্যাদাপূর্ণ যেমন তার জান মর্যাদাপূর্ণ। আর জানের ক্ষেত্রে যেহেতু ক্ষতিগ্রস্থতাকে রহিত করা হয়েছে সেহেতু মালের ক্ষতিগ্রস্ততাও রহিত হয়ে যাবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ وَالْاَخْبَارُ فِيْهِ مُسْتَفِيْضَةٌ حَتّٰى قِيْلَ اِنَّ مَنْ لَمْ يَرَهُ كَانَ مُبْتَدِعًا لٰكِنَّ مَنْ رَاٰهُ ثُمَّ لَمْ يَمْسَحْ اَخْذًا بِالْعَزِيْمَةِ كَانَ مَاْجُوْرًا ـ

পরিচ্ছেদ ঃ মোজার ওপর মাস্‌হ করার বিবরণ

অনুবাদ ঃ উভয় মোজার ওপর মাস্‌হ করার বৈধতা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আর এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিমাণ মশহুর হাদীস বর্ণিত আছে। এমনকি বলা হয় যে ব্যক্তি মোজার ওপর মাস্‌হ করাকে জায়েজ মনে করে না, সে বিদআত পন্থী। তবে যে ব্যক্তি জায়েজ মনে করার পরও আযীমতের ওপর আমলের উদ্দেশ্যে মোজার ওপর মাস্‌হ করে না, সে ছওয়াব পাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসান্নিফ (র.) তায়াম্মুমের আলোচনা শেষ করার সাথে সাথে মোজার ওপর মাস্‌হ করার احكام উল্লেখ করেছেন কয়েকটি কারণে। যথা—

(১) এতদ উভয়ের প্রত্যেকটিই মাস্‌হ মূলক পবিত্রতা।

(২) এতদ উভয়ের প্রত্যেকটিই বদল। তায়াম্মুম হচ্ছে 'অজু'-এর বদল, আর মোজার ওপর মাস্‌হ করা হচ্ছে পা ধোয়ার বদল।

(৩) তায়াম্মুম এবং মাস্‌হ উভয়টিই رخصت موقته অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পানি ব্যবহারের পরিবর্তে বিকল্প অবলম্বনের অবকাশ।

(৪) এতদ উভয়ের প্রত্যেকটিই عارض (অর্থাৎ তাহারাত হাসিলের সাময়িক ব্যবস্থা)। কারণ স্থায়ী ব্যবস্থা বা আসল হচ্ছে ধৌত করা।

(৫) তায়াম্মুম এবং মোজার ওপর মাস্‌হ উভয়ের মাঝেই অজুর অঙ্গ সমূহের সবগুলো ব্যবহার করার পরিবর্তে শুধুমাত্র কয়েকটি অঙ্গকে ব্যবহার করা যথেষ্ট।

"مَسْحٌ عَلَى الْخُفَّيْنِ"-এর বৈধতা হাদীসে মাশহুর দ্বারা প্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে حديث قولى এবং حديث فعلى উভয় প্রক.রের হাদীস বর্ণিত আছে।

حديث فعلى ঃ হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমূখ বড় বড় সাহাবীগণের এক বিরাট জামাআত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উভয় মোজার ওপর মাস্‌হ করেছেন।

حديث قولى ঃ হযরত ওমর, এবং হযরত আলী (রা.)সহ সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট জামাআত বর্ণনা করেছেন যে, اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন মুকীম ব্যক্তি একদিন একরাত্র (মোজার ওপর) মাস্‌হ করবে, আর মুসাফির ব্যক্তি করবে তিন দিন তিনরাত্র। - (মুসলিম শরীফ)

وَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ تَوَضَّاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ وَكُنْتُ اَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَاَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ ذَيْلِهِ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ اَنَسِيْتَ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ بِهٰذَا اَمَرَنِيْ رَبِّيْ ـ

"হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ অজু করছিলেন আর আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম। ঐ সময় তিনি একটি শাম দেশীয় জুব্বা পরিহিত অবস্থায় ছিলেন, যার আস্তিন (জামা বা কোট ইত্যাদির হাতা) ছিল খুবই সংকীর্ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় হাত মোবারক জুব্বার নিচের দিক দিয়ে বের করে তাঁর মোজার ওপর মাস্হ করলেন। আমি বললাম, আপনি কি পা ধৌত করতে ভুলে গেছেন? তিনি বললেন– আমার প্রতিপালক আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন"

হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা.) বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا اَىْ مُسَافِرِيْنَ اَنْ لَّانَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ اِلَّاعَنْ جَنَابَةٍ وَلٰكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ـ

"যখন আমরা মুসাফির থাকতাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তিন দিন তিন রাত্র মোজা না খোলার কথা বলতেন। কিন্তু জানাবাতের অবস্থা এর থেকে ব্যতিক্রম অর্থাৎ এ অবস্থায় আমরা মোজা খুলে নিতাম; তবে পেশাব পায়খানা এবং নিদ্রার কারণে মাত্র মোজা খুলতাম না।"

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, আমি এমন সত্তরজন সাহাবীকে পেয়েছি, যাদের প্রত্যেকেই مَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ-এর পক্ষে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রা.) বলেন, দিবালোকের মতো পরিষ্কার হওয়ার পরই আমি মোজার ওপর মাস্হ করার কথা বলেছি। যে ব্যক্তি এর বৈধতায় বিশ্বাসী নয়, সে বিদ'আতী।

ইমাম কারখী (র.) বলেন এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আমার কুফরির আশঙ্কা হয়, কারণ মোজার ওপর মাসহ সংক্রান্ত হাদীস সমূহ "তাওয়াতুর" এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

আরো বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) কে আহলুস্ সুন্নাতে ওয়াল জামাআতের মাযহাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন– هُوَ اَنْ يُفَضِّلَ الشَّيْخَيْنِ وَاَنْ يُّحِبَّ الْخَتَنَيْنِ وَاَنْ يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ـ

অর্থাৎ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় হচ্ছে– শায়খাইন তথা হযরত আবূ বকর এবং হযরত ওমর (রা.)-কে সমস্ত সাহাবীগণের তুলনায় আফযল মনে করা, খাতানাইন তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দু' জামাতা হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রা.)-কে ভাল বাসা আর মোজার ওপর মাস্হকে জায়েজ মনে করা।

কিফায়া নামক কিতাবের লিখক উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এই উক্তিটি হযরত আনাস (রা.)-এর একটি বক্তব্য থেকে গৃহীত। হযরত আনাছ (রা.) বলেছিলেন–

اِنَّ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ تُفَضِّلَ الشَّيْخَيْنِ وَتُحِبَّ الْخَتَنَيْنِ وَتَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ـ

অর্থাৎ সুন্নাত হচ্ছে– শায়খাইনকে মর্যাদা দেওয়া, দু' জামাতাকে মুহাব্বত করা এবং মোজার ওপর মাস্হ করাকে জায়েজ মনে করা।

কেউ কেউ বলেছেন, মোজার ওপর মাস্হ করা আল্লাহর কুরআন দ্বারাও প্রমাণিত। আর তা এ ভাবে যে, সূরা মাঈদা এর যে আয়াতে (৬নং আয়াত) অজু-এর হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে ارجلكم কথাটি رءوسكم কথার ওপর عطف হওয়ার কারণে مجرور অর্থাৎ لام এর নিচে كسرة দিয়ে পাঠ করার উপযুক্ত। আর معطوف এবং معطوف عليه-এর হুকুম যেহেতু একই, তাই অজুর ক্ষেত্রে পা-এর বিধানও সেটাই থাকবে, যে বিধান রয়েছে মাথার। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অজুতে মাথা মাসহ করা ফরজ। সুতরাং পা মাস্হ করাও ফরজ হওয়া উচিৎ। তবে كسرة-এর কিরাআতটি যেহেতু نصب যুক্ত কিরাতের বিপরীত, সেহেতু উভয় কিরাআতের ওপর আমল বজায় রাখার নিমিত্তে এইভাবে সাযুজ্য বিধান করা হয়েছে যে, দু' কিরাআত দুই অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে ধরা হবে। অর্থাৎ যখন পায়ে মোজা থাকবে না; তখন نصب যুক্ত কিরাআত (ارجلكم)-এর ভিত্তিতে অযুর সময় পা ধৌত করা ফরয বলে গণ্য হবে। আর যখন পায়ে মোজা থাকবে, তখন جر যুক্ত কিরাআত (وارجلكم) এর ভিত্তিতে পা মাস্হ করার বৈধতা প্রমাণিত হবে।

অবশ্য কিফায়া-এর গ্রন্থকার উপরোক্ত استدلال টিকে নাকচ করে দিয়েছেন।

اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ الخ ঃ উপরোক্ত ইবারতে শায়খ কুদূরী (র.) একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মোজার ওপর মাস্হ করা জায়েজ হলেও তার ওপর আমল করা বাধ্যতা মূলক নয়। বরং তা না করে পা ধৌত করা হচ্ছে আযীমত। এর জন্য আল্লাহর কাছে অধিক ছওয়াব পাওয়া যাবে। তবে আইনুল হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি মাস্হ না করার দরুন খারেজী বা রাফেজী সম্প্রদায়ভুক্ত বলে সন্দেহ হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে মাস্হ করাটাই উত্তম।

وَيَجُوزُ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مُوجِبٍ لِلْوُضُوءِ إِذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ خَصَّهُ بِحَدَثٍ مُوجِبٍ لِلْوُضُوءِ لِأَنَّهُ لَا مَسْحَ مِنَ الْجَنَابَةِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَبِحَدَثٍ مُتَأَخِّرٍ لِأَنَّ الْخُفَّ عُهِدَ مَانِعًا وَلَوْ جَوَّزْنَاهُ بِحَدَثٍ سَابِقٍ كَالْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا لَبِسَتْ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ وَالْمُتَيَمِّمُ إِذَا لَبِسَ ثُمَّ رَأَى الْمَاءَ كَانَ رَافِعًا وَقَوْلُهُ إِذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ لَا يُفِيدُ اِشْتِرَاطَ الْكَمَالِ وَقْتَ اللُّبْسِ بَلْ وَقْتَ الْحَدَثِ وَهٰذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا حَتّٰى لَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَكْمَلَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ أَحْدَثَ يُجْزِئُهُ الْمَسْحُ وَهٰذَا لِأَنَّ الْخُفَّ مَانِعٌ حُلُولَ الْحَدَثِ بِالْقَدَمِ فَيُرَاعٰى كَمَالُ الطَّهَارَةِ وَقْتَ الْمَنْعِ حَتّٰى لَوْ كَانَتْ نَاقِصَةً عِنْدَ ذٰلِكَ كَانَ الْخُفُّ رَافِعًا وَيَجُوزُ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا . قَالَ وَابْتِدَاؤُهَا عَقِيبَ الْحَدَثِ لِأَنَّ الْخُفَّ مَانِعٌ سِرَايَةَ الْحَدَثِ فَتُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْمَنْعِ .

অনুবাদ ঃ প্রত্যেক এমন হদছের জন্য মোজার ওপর মাস্‌হ করা জায়েজ, যার কারণে অজু করা ওয়াজিব। যদি উভয় মোজা পূর্ণ তাহারাতের অবস্থায় পরিধান করে থাকে এবং এরপর হদছ গ্রস্ত হয়। ইমাম কুদূরী (র.) মোজার ওপর মাস্‌হ করাকে অজু ওয়াজিব কারী হদছের সাথে খাছ করেছেন। কারণ জানাবাতের ক্ষেত্রে মাস্‌হ করা জায়েজ নেই। ইনশাআল্লাহ এ প্রসেঙ্গে সামনে আলোচনা করব (এর ভিত্তিতেই এ কথা বলা হয়েছে)। তিনি মোজার ওপর মাস্‌হকে আরও খাছ করেছেন এমন হদছের সাথে যা (পূর্ণ তাহারাত অবস্থায় মোজা পরিধানের) পরবর্তীতে হয়েছে। কেননা শরিয়তের দৃষ্টিতে মোজা হদছ রোধকারী। যদি আমরা পূর্ববর্তী হাদছের দরুন মাসহ করা বৈধ বলি; যেমন মুস্তাহাযা নারি মোজা পরল, তারপর নামাজের সময় চলে গেল। অনুরূপভাবে তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি মোজা পরল, তারপর পানি দেখতে পেল, তাহলে মোজা হদছ দূরকারী হবে। ইমাম কুদূরীর বক্তব্য إِذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ থেকে মোজা পরিধান করার সময় পূর্ণ তাহারাত থাকা শর্ত হওয়ার কথাটি প্রতীয়মান হয় না; বরং হাদাছের সময়। এটাই আমাদের মাযহাব। এমনকি যদি কেউ প্রথমে উভয় পা ধৌত করে এবং মোজা পরিধান করে, অতঃপর তাহারাত পূর্ণ করে এবং এরপর তার হদছ হয়, তাহলে তার জন্য মোজার ওপর মাস্‌হ করা জায়েজ আছে। আর এটা এ কারণে যে, মোজা পায়ের ভিতরে হদছ প্রবেশের জন্য প্রতিরোধক। সুতরাং প্রতিরোধ করার সময় থেকেই তাহারাতের পূর্ণাঙ্গতা লক্ষণীয় হবে। যদি সে সময় তাহারাত অসম্পূর্ণ থাকে, তাহলে মোজা হদছ দূরকারী হবে। মুকীমের জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত (মোজার ওপর) মাস্‌হ করা জায়েজ আছে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– "মুকীম একদিন একরাত এবং মুসাফির তিনদিন তিন রাত মাস্‌হ করবে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মাস্‌হ-এর সময়সীমা শুরু হবে হদছ-এর পর থেকে। কারণ মোজা হচ্ছে হদছ-এর অনুপ্রবেশ রোধকারী। সুতরাং রোধ করার সময় থেকে তা ধর্তব্য হবে।

প্রাসাঙ্গিক আলোচনা

মাস্আলা : হদছ গ্রস্ত ব্যক্তি পুরুষ হোক বা মহিলা হোক যদি সে পূর্ণাঙ্গ তাহারাত অবস্থায় উভয় পায়ে মোজা পরিধান করে থাকে, তাহলে তার জন্য মোজার ওপর মাস্হ করা জায়েজ আছে। আর যে ব্যক্তির ওপর গোসল করা ওয়াজিব, তার জন্য মোজার ওপর মাস্হ করা জায়েজ নেই।

ইমাম কুদূরী (র.) মোজার ওপর মাস্হ বৈধ হওয়ার বিষয়টিকে দু'টো জিনিসের সাথে খাছ করেছেন। (১) হদছটা এমন হতে হবে যার দ্বারা শুধু অজু ওয়াজিব হয়। কেননা যদি পূর্ণাঙ্গ তাহারাত লাভের পর মোজা পরিধান করে এবং এরপর ঐ ব্যক্তি এমন হদছের সম্মুখীন হয়, যার দরুন গোসল করা ওয়াজিব-সে ক্ষেত্রে মোজার ওপর মাস্হ করা জায়েজ নেই।

(২) অজু করার পরে হদছ হতে হবে। কারণ মোজা পা পর্যন্ত হদছ প্রবাহিত হওয়াকে রোধ করে, হদছকে দূর করে না। যদি পূর্ববর্তী হদছের জন্য মোজার ওপর মাস্হ করাকে বৈধ করা হয়, যেমন মুস্তাহাযা মহিলা মোজা পরিধান করেছে, এরপর নামাজের সময় চলে গেছে। কিংবা তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি যখন মোজা পরিধান করার পর পানি পায়, মোজা হদছ দূরকারী হয়ে যাবে। অথচ মোজা হদছ দূরকারী নয়, বরং রোধকারী।

ইমাম কুদূরীর বক্তব্য إِذَا لَبِسَهُمَا -এর দ্বারা এটা বুঝায় না যে, মোজা পরিধান করার সময় তাহারাতের পূর্ণাঙ্গতা শর্ত। বরং এর দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়েছে, যখন হাদাছ হয় তখন পূর্ণ তাহারাত থাকা জরুরি। এটাই আমাদের মাযহাব। অতএব, কেউ যদি প্রথমে উভয় পা ধৌত করে মোজা পরিধান করে, অতঃপর অজু পূর্ণ করে আর এরপর তার হদছ হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে তার জন্য মোজার ওপর মাস্হ করা জায়েজ আছে। কেননা যদিও মোজা পরিধানের সময় পূর্ণাঙ্গ তাহারাত পাওয়া যায়নি, কিন্তু তাহারাতের সময় তা পূর্ণাঙ্গভাবে পাওয়া গেছে। এর দলিল হলো— মোজা পায়ের মধ্যে অপবিত্রতার প্রবেশকে রোধ করে। এ জন্য রোধ করার সময় পূর্ণ তাহারাতের বিষয়টি লক্ষণীয় হবে। এমনকি এই সময় যদি তাহারাত অসম্পূর্ণ থাকে, তাহলে মোজা হদছ দূরকারী হয়ে যাবে।

وَيَجُوْزُ لِلْمُقِيْمِ يَوْمًا الخ ঃ এ ইবারতে মোজার ওপর মাস্হ করার সময় সীমা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মুকীম অবস্থায় থাকে সে একদিন একরাত মোজার ওপর মাস্হ করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে পারবে তিন দিন তিনরাত পর্যন্ত। ইমাম মালিক (র.) থেকে এ ব্যাপারে দু'টি বক্তব্য বর্ণিত আছে।

১। মুকীম ব্যক্তি মোজার ওপর মোটেও মাস্হ করবে না। আর মুসাফির ব্যক্তি অনির্দিষ্ট সময় ব্যাপী মাস্হ করতে পারবে। অর্থাৎ মুসাফির ব্যক্তির জন্য মাস্হ করার কোনো ধরা বাধা সময় সীমা নেই। সে যতদিন ইচ্ছা মাস্হ করতে পারে। ইমাম সারাখ্সী (র.) বলেন– এটাই হাসান বসরী (র.)-এর বক্তব্য।

২। ইমাম মালিক (র.)-এর দ্বিতীয় মতটি হলো মুকীমের হুকুম মুসাফিরের হুকুম-এর মতো।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল ঃ ইমাম মালিক (র.)-এর প্রথম রেওয়ায়াতের দলিল হলো মোজার ওপর মাস্হকে শরিয়ত বৈধ করেছে জরুরতের কারণে। অথচ মুকীমের বেলায় এর কোনো জরুরত নেই, তাই মুকীমের জন্য মোজার ওপর মাস্হ করা জায়েজ নেই।

মুসাফিরের ব্যাপারে ইমাম মালিক (র.) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (র.)-এর একটি হাদীস দ্বারা দলিল দিয়েছেন। তা হলো–

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَوْمًا قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ يَوْمَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ حَتّٰى انْتَهَيْتُ اِلٰى سَبْعَةِ اَيَّامٍ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اِذَا كُنْتَ فِىْ سَفَرٍ فَامْسَحْ مَا بَدَا لَكَ ـ

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি একদিন মোজার ওপর মাস্হ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি আবার বললাম দু'দিন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! এভাবে আমি (বলতে বলতে) সাতদিন পর্যন্ত পৌঁছলাম। তিনি বললেন, তুমি যখন সফর অবস্থায় থাকবে তখন যতদিন ইচ্ছা, ততদিন মোজার ওপর মাস্হ করতে পার। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসাফির ব্যক্তির জন্য মোজার ওপর মাসহ করার ব্যাপারে কোনো সময়সীমা নির্ধারিত নেই।

আমাদের (আহনাফের) প্রথম দলিল হলো, নিম্মোক্ত حديث مشهور রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন– يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا ـ মুকীম ব্যক্তি মোজার ওপর মাস্হ করবে একদিন একরাত। আর মুসাফির ব্যক্তি করবে তিনদিন তিন রাত।

অধিকাংশ হানাফী ওলামায়ে কেরাম হযরত সফওয়ান ইবনে আসসাল (রা.) বর্ণিত এই হাদীসটি দ্বারা দলিল দিয়েছেন,

قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِيْ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ طَلَبُ الْعِلْمِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ فَاِذَا جِئْتَ فَسَلْهُ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ لِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا ـ (كِفَايَة)

তিনি বলেন, একদা "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে হাজির হলাম। তিনি আমাকে বললেন, কি জিনিসে তোমাকে নিয়ে এসেছে। আমি বললাম ইল্‌ম-এর তলব। তিনি বললেন, তালিবে ইলমের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরিশতাগণ তালিবে ইল্‌মদের জন্য নিজেদের পর বিছিয়ে দেন। যাহোক যে উদ্দেশ্যে এসেছ, সে সম্পর্কে প্রশ্ন কর। হযরত সফওয়ান (রা.) বলেন, আমি তাঁকে (সা.) মোজার ওপর মাস্‌হ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, মুকীমদের জন্য একদিন একরাত। আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিনরাত।

ইমাম মালিক (র.)-এর পক্ষ থেকে পেশকৃত হাদীসের জবাব ঃ ইমাম মালিক (র.)-এর মতের পক্ষে দলিল হিসাবে পেশকৃত হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রকম আপত্তি উত্থাপন করেছেন। যেমন– ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে এই হাদীসটি "মাজহুল"।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে এর সকল رِجَالْ ই غَيْرُ مَعْرُوْفٌ ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন, এর সনদের ব্যাপারে اِخْتِلَافٌ আছে এবং সনদ ততটা মজবুত নয়। ইমাম দারে কুতনী (রা.) বলেন, উপরোক্ত হাদীসের সনদটি সুপ্রমানিত নয়। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.) বলেন, এই হাদীসের সনদের মধ্যে اِضْطِرَابٌ রয়েছে। সুতরাং এই অপ্রসিদ্ধ (شَاذْ) হাদীসটি দ্বারা মাশহুর হাদীসকে বর্জন করা যাবে না। তাছাড়া অত্র হাদীসটি দ্বারা হুযূর ﷺ যা বুঝাতে চেয়েছেন, তাহলো— মোজার ওপর মাস্‌হ করার ব্যাপারটি রহিত হয়ে যায়নি, বরং এটি একটি স্থায়ী বিধান। এর অর্থ এই নয় যে, এই সময়ের মাঝে আর মোজা খুলবে না।

ইমাম মালিক (র.) "মুকীমের জন্য মোজার ওপর মাস্‌হ করার কোন জরুরত নেই বলে যে উক্তি করেছেন এ বক্তব্যের সাথে আমরা একমত নই। কারণ তারও এর জরুরত আছে। মুকীম ব্যক্তি যখন নিজ কর্ম ও প্রয়োজন পুরা করার উদ্দেশ্যে সকালে মোজা পরিহিত অবস্থায় বাড়ি থেকে বের হয়, তখন সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরে আসার পূর্বে মোজা খোলা তার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাড়ায় বৈকি? সুতরাং এই প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই মুকীমের জন্য মোজার ওপর মাস্‌হ করাকে বৈধ করা হয়েছে।

قَالَ وَابْتِدَاؤُهَا الخ ঃ মোজার ওপর মাস্‌হ-এর সময়সীমা কখন থেকে শুরু হবে বা কখন থেকে ধরা হবে তা নিয়ে ওলামাদের মাঝে মতবিরোধ আছে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে মাস্‌হ-এর সময়সীমা শুরু হবে হদছ -এর সময় থেকে। তবে হযরত হাসান বসরী (র.)-এর মতে মাস্‌হ-এর সময়সীমা শুরু হবে মোজা পরিধানের সময় থেকে। আর ইমাম আওযাঈ, আবূ ছাওর এবং আহ্‌মদ (রা.) বলেন, যখন মাস্‌হ করা শুরু হয় তখন থেকেই এর সময়সীমা ধর্তব্য হবে।

উক্ত তিন ধরনের মতামতের ফলাফল প্রকাশ পাবে এই উাদাহরণটিতে যেমন– এক ব্যক্তি ফজরের সময় অজু করে মোজা পরিধান করেছে। এরপর সূর্যোদয়ের পরে তার হদছ হয়েছে এবং সূর্য হেলার পরে সে অজু করে মোজার ওপর মাসহ করেছে। এ অবস্থায় অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মাযহাব অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি মুকীম হলে পরদিন সূর্যোদয়ের পর পর্যন্ত মাসহ করবে। আর হাসান বসরী (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী পর দিন সুবহে সাদিক পর্যন্ত মাস্‌হ করবে এবং ইমাম আওযাঈ-এর মাযহাব অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি পরদিন সূর্য হেলার পর পর্যন্ত মাস্‌হ করবে।

হাসান বসরী (র.)-এর দলিল হচ্ছে, মাস্‌হ করার বৈধতা যেহেতু মোজা পরিধানের জন্যই, সেহেতু মাস্‌হ-এর সময়সীমাও মোজা পরিধানের সময় থেকেই ধরা হবে। ইমাম আওযাঈ (র.)-এর দলিল হলো–, মাস্‌হ-এর সময় সীমার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় মাস্‌হ-এর জন্য। তাই এর শুরু ও ধরা হবে মাস্‌হ শুরু করার সময় থেকেই আর অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের দলিল হলো— মোজা হচ্ছে পা পর্যন্ত হদছ পৌছার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক, অতএব সময়সীমা তখন থেকেই ধরা উচিত, যখন থেকে মোজার প্রতিবন্ধকতার কাজ শুরু হয়েছে। আর এ কাজ শুরু হয় হদছ হওয়ার পর থেকে। কারণ

وَالْمَسْحُ عَلٰى ظَاهِرِهِمَا خُطُوْطًا بِالْاَصَابِعِ يُبْدَأُ مِنْ قِبَلِ الْاَصَابِعِ اِلَى السَّاقِ لِحَدِيْثِ مُغِيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى خُفَّيْهِ وَمَدَّهُمَا مِنَ الْاَصَابِعِ اِلٰى اَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً وَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى اَثَرِ الْمَسْحِ عَلٰى خُفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُطُوْطًا بِالْاَصَابِعِ ثُمَّ الْمَسْحُ عَلَى الظَّاهِرِ حَتْمٌ حَتّٰى لَايَجُوْزَ عَلٰى بَاطِنِ الْخُفِّ وَعَقِبِهٖ وَسَاقِهٖ لِاَنَّهٗ مَعْدُوْلٌ بِهٖ عَنِ الْقِيَاسِ فَيُرَاعٰى جَمِيْعُ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ وَالْبِدَايَةُ مِنَ الْاَصَابِعِ اِسْتِحْبَابٌ اِعْتِبَارًا بِالْاَصْلِ وَهُوَ الْغَسْلُ وَفَرْضُ ذٰلِكَ مِقْدَارُ ثَلٰثِ اَصَابِعَ مِنْ اَصَابِعِ الْيَدِ وَقَالَ الْكَرْخِىْ (رحـ) مِنْ اَصَابِعِ الرِّجْلِ وَالْاَوَّلُ اَصَحُّ اِعْتِبَارًا لِاٰلَةِ الْمَسْحِ ـ

অনুবাদ ঃ মাস্‌হ করা হবে উভয় পায়ের ওপরাংশে। (মাস্‌হ করা হবে) আঙ্গুল দ্বারা রেখা টানা অবস্থায়। পায়ের আঙ্গুলের দিক থেকে শুরু করে সাক -এর দিকে নিয়ে যাবে। কেননা হযরত মুগীরা (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে আছে মহানবী ﷺ তাঁর উভয় মোজার ওপর নিজের দু' হাত রেখে পায়ের আঙ্গুল থেকে ওপরের দিকে একবার মাস্‌হ করেছেন। (বর্ণনাকারী বলেন) যেন এখনও আমি রাসূল ﷺ-এর মোজার ওপরে আঙ্গুলের রেখা রূপে মাস্‌হ-এর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। মোজার ওপরি অংশে মাস্‌হ করা ওয়াজিব। অতএব, মোজার তলায়, গোড়ালিতে বা নলাতে মাস্‌হ করা জায়েজ হবে না। কেননা এটা (মোজার ওপর মাস্‌হ করা) কিয়াস বহির্ভূত। সুতরাং এ বিষয়ে শরিয়ত নির্দেশিত যাবতীয় বিষয়ের অনুসরণ করতে হবে।

আঙ্গুল থেকে মাস্‌হ শুরু করা মোস্তাহাব। আস্‌ল তথা ধৌত করার অনুসরণে। মাস্‌হ-এর ফরজ হলো হাতের আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ। ইমাম কারখী (র.) বলেন, পায়ের আঙ্গুলের পরিমাণ। তবে মাস্‌হ-এর উপকরণের বিবেচনায় প্রথম মতটি অধিক শুদ্ধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন, আমাদের মতে মোজার ওপরের অংশে মাস্‌হ করা জরুরি। এর চিত্রটা এমন–ডান হাতের আঙ্গুলগুলো ডান পায়ের মোজার সামনের দিকের অংশে রাখবে এবং বাম হাতের আঙ্গুল গুলোও বাম পায়ের মোজার সামনের দিকের অংশে রাখবে। এরপর উভয় হাতকে টেনে গোড়ালির দিকে এনে নলীর দিকে নিয়ে যেতে থাকবে। এ সময় হাতের আঙ্গুল গুলোকে খোলা এবং প্রশস্ত অবস্থায় রাখবে। এটাই হচ্ছে মোজার ওপর মাস্‌হ করার সুন্নত তরীকা।

যদি কেউ এক আঙ্গুল দিয়ে তিনবার মাস্‌হ করে এবং প্রতিবার নতুনভাবে পানি নিয়ে নতুন নতুন জায়গা মাস্‌হ করে, তাহলে মাস্‌হ বৈধ হবে অন্যথায় নয়।

ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, মোজার ওপর এবং নীচ উভয় অংশে মাস্‌হ করা সুন্নত। তাঁদের দলিল হলো এই হাদীস اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَسَحَ اَعْلَى الْخُفِّ وَاَسْفَلِهٖ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ মোজার ওপর ও নীচ উভয় অংশে মাস্‌হ করেছেন।

আমাদের দলিল হযরত মুগীরাহ (রা.) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উভয় হাত নিজের উভয় পায়ের মোজার ওপর রেখে এগুলোকে ওপরের দিকে টেনে নিয়েছেন। বর্ণনাকারী হযরত মুগীরাহ (রা.) বলেন, যেন আমি এখনও হুযূর ﷺ-এর মোজার ওপর তাঁর হাতের টানা সেই রেখা দেখতে পাচ্ছি। এই হাদীসে একথাও উল্লেখ আছে যে, তিনি একবার মাস্‌হ করেছেন। এ কারণেই আলিমগণ বলেন, মোজার ওপর বারবার মাস্‌হ করা শরিয়ত বিধিত নয়। তিরমিযী শরীফে উক্ত হাদীসটি এভাবে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا

অর্থাৎ মুগীরাহ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উভয় মোজার ওপরাংশে মাস্‌হ করতে দেখেছি।

হিদায়ার মুসান্নিফ বলেন, মাস্‌হ-এর স্থান হচ্ছে মোজার ওপরাংশ। নিচের অংশ নয়। তাই মোজার ওপরাংশে মাস্‌হ করা ওয়াজিব। কেউ যদি মোজার ওপর ছাড়া অন্য কোনো অংশে মাস্‌হ করে তাহলে তা বৈধ হবে না। হযরত আলী (রা.)-এর একটি মন্তব্য থেকেও এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِ وَلٰكِنْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلٰى ظَاهِرِ الْخُفَّيْنِ دُوْنَ بَاطِنِهِمَا ـ

অর্থাৎ দ্বীন যদি যুক্তি বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল হতো, তাহলে মোজার ভিতরের অংশে মাস্‌হ করাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত হতো; কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মোজার ওপরাংশে মাস্‌হ করতে দেখেছি, ভিতরের অংশে নয়।

পায়ের আঙ্গুলী থেকে মাস্‌হ শুরু করা মোস্তাহাব। তবে কেউ যদি পায়ের গোড়ালির দিক থেকেও মাস্‌হ শুরু করে তবুও জায়েজ হবে।

হিদায়া প্রণেতা বলেন, তিন আঙ্গুল পরিমাণ মাস্‌হ করা ফরজ। তবে আঙ্গুল বলতে পায়ের আঙ্গুল ধর্তব্য হবে নাকি হাতের আঙ্গুল? এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মাযহাব হলো হাতের আঙ্গুল ধর্তব্য হবে। অপরদিকে ইমাম কারখী (র.)-এর মতে পায়ের আঙ্গুল ধর্তব্য হবে। তাঁর দলিল হলো মাস্‌হ সংগঠিত হয় পায়ের ওপর। সুতরাং মাস্‌হ করার পরিমাণের মাপ কাঠি পায়ের আঙ্গুলই হওয়া উচিৎ। হিদায়ার লিখক বলেন, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতটিই অধিক শুদ্ধ। তাঁরা মাস্‌হ-এর آلة তথা হাতের দিকটি বিবেচনা করেন। উল্লেখ্য যে, মোজা পরিধান কারীর জন্য উভয় মোজারই তিন আঙ্গুল পরিমাণ মাস্‌হ করা ফরজ। অতএব, কেউ যদি এক মোজায় দুই আঙ্গুল এবং অপর মোজায় পাঁচ আঙ্গুল পরিমাণ মাস্‌হ করে। তাহলে তার মাস্‌হ শুদ্ধ হবে না।

وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ فِيهِ خَرْقٌ كَثِيرٌ يَتَبَيَّنُ مِنْهُ قَدْرُ ثَلْثِ اَصَابِعَ مِنْ اَصَابِعِ الرِّجْلِ وَاِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ جَازَ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ (رحـ) لَايَجُوْزُ وَاِنْ قَلَّ لِاَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ غَسْلُ الْبَادِيْ يَجِبُ غَسْلُ الْبَاقِيْ وَلَنَا اَنَّ الْخِفَافَ لَاتَخْلُوْ عَنْ قَلِيْلِ خَرْقٍ عَادَةً فَيَلْحَقُهُمُ الْحَرَجُ فِى النَّزْعِ وَتَخْلُوْ عَنِ الْكَثِيْرِ فَلَاحَرَجَ وَالْكَثِيْرُ اَنْ يَنْكَشِفَ قَدْرُ ثَلْثِ اَصَابِعِ الرِّجْلِ اَصْغَرِهَا هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّ الْاَصْلَ فِى الْقَدَمِ هُوَالْاَصَابِعُ وَالثَّلْثُ اَكْثَرُهَا فَتُقَامُ مَقَامَ الْكُلِّ وَاعْتِبَارُ الْاَصْغَرِ لِلْاِحْتِيَاطِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِدُخُوْلِ الْاَنَامِلِ اِذَا كَانَ لَايَنْفَرِجُ عِنْدَ الْمَشْيِ وَيُعْتَبَرُ هٰذَا الْمِقْدَارُ فِىْ كُلِّ خُفٍّ عَلٰى حِدَةٍ فَيُجْمَعُ الْخَرْقُ فِىْ خُفٍّ وَاحِدٍ وَلَا يُجْمَعُ فِىْ خُفَّيْنِ لِاَنَّ الْخَرْقَ فِىْ اَحَدِهِمَا لَايَمْنَعُ قَطْعَ السَّفَرِ بِالْاٰخَرِ بِخِلَافِ النَّجَاسَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ لِاَنَّهُ حَامِلٌ لِلْكُلِّ وَانْكِشَافُ الْعَوْرَةِ نَظِيْرُ النَّجَاسَةِ ـ

অনুবাদ ঃ এমন মোজায় মাস্হ করা জায়েজ হবে না যা এতো বেশি পরিমাণ ছেঁড়া যে, এর মধ্য দিয়ে পায়ের আঙ্গুল সমূহের তিন আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা দেখা যায়। যদি তার চেয়ে কম হয়, তাহলে জায়েজ হবে। ইমাম যুফার এবং শাফি'ঈ (র.) বলেন, সামান্য ছেঁড়া হলেও মাস্হ জায়েজ হবে না। কেননা প্রকাশ পাওয়া অংশটি ধোয়া যখন ওয়াজিব হয়ে গেছে, তখন অবশিষ্ট অংশও ধোয়া ওয়াজিব হবে। আমাদের দলিল হচ্ছে— মোজা সাধারণত সামান্য ছেড়া থেকে মুক্ত থাকে না। তাই (এ অবস্থায়) মোজা খোলাটা লোকদের জন্য কষ্ট কর। অবশ্য বেশি পরিমাণ ছেঁড়া থেকে সাধারণতঃ মুক্ত থাকে। তাই (এমন মোজা খোলার হুকুম) কষ্টকর হবে না। আর বেশি-এর পরিমাণ হলো পায়ের ছোট তিন আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা খোলে যাওয়া। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। কারণ (قدم) পায়ের মধ্যে আঙ্গুলই হলো আসল। আর তিন হলো অধিকাংশ। তাই তিনকেই সমগ্রের স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা হবে। আর ছোট তিন আঙ্গুলকে বিবেচনা করা হয়েছে اِحْتِيَاطًا বা শতর্কতামূলক ভাবে। যদি হাঁটার সময় ছেঁড়াটা ফাঁক না হয় তাহলে শুধু মাত্র পায়ের আঙ্গুল ঢুকে যাওয়াটা ধর্তব্য হবে না। প্রতিটি মোজার আলাদা ভাবে এ ধরনের পরিমাণ হিসাব করা হবে। সুতরাং এক মোজার সব ক'টি ফুটো একত্রিত করা হবে। কিন্তু উভয় মোজার গুলো একত্রিত (করে হিসাব) করা হবে না। কারণ এক মোজার ফুটো অন্য মোজার দ্বারা সফর করাকে বাধা দেয়না। তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে লেগে থাকা নাজাসাতের ব্যাপারটি এ বিষয়ের বিপরীত। কারণ সে তো পুরোটা বহনকারী। আর সতর খুলে যাওয়ার ব্যাপারটি (বিক্ষিপ্তভাবে লেগে থাকা) নাজাসাতের নযীর হিসাবে গণ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মোজা যদি ছিড়ে বা ফেঁটে গিয়ে থাকে, তাহলে এর ওপর মাস্হ করা বৈধ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে চারটি মাযহাব আছে।

১। আমাদের মতে ছেঁড়া কম-বেশি হওয়ার দরুন হুকুম-এর মাঝেও ব্যবধান হবে। অর্থাৎ যদি ছেঁড়া কম হয়, তাহলে তার ওপর মাস্হ করা বৈধ। আর যদি ছেড়া বেশি হয়, তাহলে তার ওপর মাস্হ করা বৈধ নয়।

২। ইমাম শাফি'ঈ এবং যুফার (র.)-এর মতে ছেঁড়া কম হউক বেশি হউক, সর্বাবস্থায়ই মাস্হ বৈধ হবে না।

৩। সুফয়ান সাওরী (র.)-এর মতে উভয় অবস্থায় মাস্হ বৈধ।

৪। ইমাম আওযা'ঈ (র.) বলেন, মোজার ফুটো দিয়ে পায়ের যে অংশ প্রকাশ পেয়েছে তা ধৌত করবে, আর বাকি অংশে মাস্‌হ করবে। তার দৃষ্টিতে যেহেতু ধোয়া এবং মাস্‌হ করা উভয়টা একই অঙ্গে একত্রিত করা যায়, সেহেতু তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন।

সুফইয়ান সাওরী (র.)-এর দলিল হলো— মোজা পায়ের পাতা পর্যন্ত হদছ পৌঁছার জন্য প্রতিবন্ধক। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত মোজা পরিধান করেছে বলা যাবে ততক্ষণ এর ওপর মাস্‌হ করাও বৈধ হবে। তাতে ফাঁটা কম হোক বা বেশি হোক। ইমাম যুফার এবং ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দলিল হলো— মোজা ছেঁড়া হওয়ার কারণে পায়ের যে অংশ বের হয়ে গেছে, তা ধোয়া ওয়াজিব। আর ধোয়া এবং মাস্‌হ করা উভয়টা যেহেতু একই অঙ্গে একত্রিত করা জায়েজ নেই, সেহেতু মোজা খুলে পায়ের বাকি অংশ ধোয়াও ওয়াজিব। ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, তাদের দলিল হলো, কিয়াসী দলিল অর্থাৎ তারা বলতে চান যে, যেহেতু অধিক ফাটা থাকা মাসাহ-এর জন্য প্রতিবন্ধক তাই স্বল্প পরিমাণও এর জন্য প্রতিবন্ধক বলে গণ্য হবে। যেমন حَدَثٍ مُطْلَقٌ - نَاقِضِ مَسْحٍ (মাসাহ ভঙ্গকারী) চাই কম হোক বা বেশি হোক। আমাদের দলিল হলো– সাধারণত অল্প স্বল্প ছেঁড়া-ফাটা থেকে মোজা মুক্ত থাকে না। তাই এই হালকা কারণে যদি মোজা খুলে পা ধোয়ার হুকুম দেওয়া হয়, তাহলে এটি মানুষের জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে। এজন্য মামুলী ছেঁড়া-ফাটার বিষয়টি ক্ষমা করে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে বেশি পরিমাণ ফাঁটা থেকে মোজা যেহেতু সাধারণতঃ মুক্ত থাকে, সেজন্য এ ক্ষেত্রে মোজা খুলে পা ধৌত করার হুকুম দেওয়াতে ব্যাপক হারে মানুষ কষ্টে পতিত হবে না। এজন্যই বেশি পরিমাণ ফাঁটা হলে তা মাফ করা হবে না।

বেশি ও কম ফাটার মাপকাঠি কি? কতটুকু ছেঁড়া হলে বেশি, এবং কতটুকু ছেঁড়া হলে কম ছেঁড়া বলে গণ্য হবে? এ ব্যাপারে হিদায়ার লিখক বলেছেন, যদি পায়ের ছোট তিন আঙ্গুল পরিমাণ পা মোজার ছোঁড়া অংশ দিয়ে প্রকাশ হয়ে যায়, তাহলেই একে বেশি পরিমাণ ফাঁটা বলে গণ্য করা হবে। আর যদি তার চেয়ে কম পরিমাণ প্রকাশ পায়, তাহলে তা কম ছেঁড়া বলে গণ্য হবে। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ ক্ষেত্রে হাতের আঙ্গুল ধর্তব্য হবে। শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী (র.) বলেন, ফাটা যদি পায়ের বড় আঙ্গুলসমূহের উপর থাকে তাহলে বড় তিন আঙ্গুল ধর্তব্য হবে। আর যদি ছোট আঙ্গুলের উপর থাকে তবে ছোট তিন আঙ্গুল ধর্তব্য হবে। বিশুদ্ধতম অভিমতটির দলিল হলো— পায়ের মধ্যে আঙ্গুলই আসল। তাই দিয়তের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেউ যদি অন্য কারো পায়ের আঙ্গুলগুলো কেটে দেয়, তাহলে তার ওপর পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হয়। এতেই বুঝা যায় যে পায়ের মাঝে আঙ্গুলই আসল। এর তিন আঙ্গুল যেহেতু পাঁচ আঙ্গুলের মাঝে পরিমাণে অধিক, তাই لِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ এই মূল নীতির আলোকে তিনকে সমগ্র পায়ের স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা হয়েছে। এ জন্যই তিন আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা খুলে যাওয়াকে পুরা পা খুলে যাওয়ার অবস্থায় ধরা হবে এবং মোজা খুলে পা ধৌত করা ওয়াজিব হবে।

যদি মোজা এমনভাবে ফেঁটে যায় যে, তার মধ্যে তিন আঙ্গুল ঢুকে যায় ঠিক, কিন্তু চলার সময় পা বের হয়ে যায় না, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। অর্থাৎ এমন মোজার ওপর মাস্‌হ করা যাবে। হিদায়ার লিখক বলেন, ছেঁড়ার পরিমাণ প্রত্যেক মোজায় পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচনা করা হবে। অতএব, যদি এক মোজায় পৃথক পৃথক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কয়েকটি ফুটো থাকে, তাহলে সবগুলোকে এমন ভাবে পরিমাণ করা হবে যে, যদি সবগুলো ফুটোকে একত্রিত করা হতো, তাহলে এর পরিমাণ কেমন হতো। যদি দেখা যায় পূর্ব বর্ণিত মাপ মতে সর্বসাকুল্যে অধিক পরিমাণ ফাটা তাহলে এর ওপর মাস্‌হ করা বৈধ হবে না। আর যদি এর বিপরীত তথা সব মিলিয়ে কম ফাঁটা বলে বিবেচিত হয়, তাহলে মাস্‌হ করা বৈধ হবে। তবে এ ক্ষেত্রে দুই মোজার ফাঁটাকে একসাথে করে পরিমাপ করা হবে না। কারণ উভয়টা মিলে অধিক পরিমাণ ফাটা হলেও মাস্‌হ জায়েজ হবে। কেননা এক মোজা ফাটা হওয়ার দরুন অপর মোজা দিয়ে পথ চলতে কোনো বাধা নেই। অবশ্য মোজার মাঝে নাজাসাত লাগার ব্যাপারটি ভিন্ন। অর্থাৎ উভয় মোজায় যদি অল্প অল্প করে বিক্ষিপ্তভাবে নাপাকি লেগে থাকে, আর অবস্থা এমন হয় যে, এক মোজার বিক্ষিপ্ত নাপাকি গুলো একত্রিত করলে পরিমাণে এক দেরহামের চেয়ে কম হলেও উভয় মোজার গুলো একত্রিত করলে এক দেরহামের বেশি হবে। এ অবস্থায় এসব মোজা পরিধান করে নামাজ পড়লে নামাজ হবে না। কারণ এই ব্যক্তিই এ সব নাপাকী বহনকারী। আর বিধান হলো এক দেরহামের অধিক নাপাকী বহন কারী ব্যক্তির জন্য তাহারাত (পবিত্রতা অর্জন করা) ওয়াজিব। পবিত্রতা অর্জন ব্যতিরেকে উক্ত ব্যক্তির নামাজ জায়েজ হবে না। এসব নাপাকি একত্রে থাকুক বা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকুক। অনুরূপভাবে সতর ঢাকার বিষয়টিও নাপাকী বহনের মতো। অর্থাৎ নামাজের সময় শরীরের যে সব অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরজ, যদি কারো সেসব অঙ্গের কিছু কিছু করে খুলে যায় যেমন মহিলাদের চুলের কিছু অংশ, পেটের কিছু অংশ, লজ্জাস্থানের কিছু অংশ সব মিলিয়ে যদি এমন পরিমাণ অঙ্গ খোলা থাকে যা এক অঙ্গের এক চতুর্থাংশ হয়ে যাবে, তাহলে এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির নামাজ জায়েজ হবে না।

وَلَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ لِحَدِيْثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ اَنَّهُ قَالَ كَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا اِذَا كُنَّا سَفَرًا اَنْ لَانَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا اِلَّا عَ
جَنَابَةٍ وَلٰكِنْ مِنْ بَوْلٍ اَوْ غَائِطٍ اَوْنَوْمٍ وَلِاَنَّ الْجَنَابَةَ لَاتَتَكَرَّرُ عَادَةً فَلَا حَرَجَ فِى النَّـ
بِخِلَافِ الْحَدَثِ لِاَنَّهُ يَتَكَرَّرُ وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ لِاَنَّهُ بَعْـ
الْوُضُوْءِ وَيَنْقُضُهُ اَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ لِسِرَايَةِ الْحَدَثِ اِلَى الْقَدَمِ حَيْثُ زَالَ الْمَانِعُ وَكَ
نَزْعُ اَحَدِهِمَا لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالْمَسْحِ فِىْ وَظِيْفَةٍ وَاحِدَةٍ ـ

অনুবাদ ঃ যার ওপর গোসল ওয়াজিব, তার জন্য মাস্হ করা জায়েজ নয়। কারণ হযরত সাফওয়ান ইবনে ...সাল (রা.) এক হাদীসে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) সফরের সময় আমাদের নির্দেশ দিতেন যাতে আমরা ...নাবাত ছাড়া পেশাব, পায়খানা ও ঘুম ইত্যাদি হদছের ক্ষেত্রে তিন দিন তিন রাত আমাদের মোজা না খুলি। এর ...স্হ জায়েজ না হওয়ার) আরেকটি কারণ হলো– জানাবাত সাধারণত বার বার ঘটে না। তাই মোজা খোলায় ...মন অসুবিধা নেই। অপর দিকে হদছের বিষয়টি এর বিপরীত। কারণ তা বার বার ঘটে। প্রত্যেক ঐ জিনিস ...হকে ভঙ্গ করবে, যা ভঙ্গ করে অজুকে। কারণ মাস্হতো অজুরই অংশ বিশেষ। তাছাড়া মোজা খুলে ফেলার ...ও মাস্হ ভেঙ্গে যায়। কারণ প্রতিরোধ কারী (মোজা)-কে সরিয়ে ফেলার ফলে পায়ের পাতায় তখন হদছ প্রবেশ করে। অনুরূপভাবে উভয় মোজার কোনো একটি খোলার দ্বারাও (মাস্হ ভেঙ্গে যায়)। কেননা একই ...র্দশনায় মাস্হ এবং ধোয়ার হুকুম উভয়টিকে একত্রিত করা অসম্ভব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত মাস্আলাটির বিবরণ হলো— যার ওপর গোসল ওয়াজিব তার জন্য মাস্হ করা জায়েজ নেই। যেমন কোনো ...ক্ত অজু করে মোজা পরিধান করল। এরপর সে জুনুবী হয়ে গেল। তারপর সে এতটুকু পানি সংগ্রহ করতে পারল যা দিয়ে অজু করা সম্ভব হবে গোসল নয়। এমতাবস্থায় এ ব্যক্তি জানাবাতের জন্য তায়াম্মুম করবে। আর উক্ত পানি দিয়ে অজু ...বে এবং পা ধৌত করবে। তার জন্য মোজার ওপরে মাস্হ করা জায়েজ নেই। এর দলিল হলো— হযরত সাফওয়ান ইবনে ...সাল (রা.) এর একটি হাদীস। যাতে উল্লেখ রয়েছে জানাবাতের অবস্থায় উভয় পায়ের মোজা খুলে পা ধৌত করতে হবে। ...য় দলিল হলো— জানাবাত সাধারণতঃ বারবার হয় না। অথচ হদছে আসগর বারবার হয়। তাই জানাবাত অবস্থায় মোজা ... পা ধোয়াটা মানুষের জন্য অসুবিধা জনক হবে না। পক্ষান্তরে হদছের ক্ষেত্রে সেটা হবে। আর এটা সর্ব স্বীকৃত কথা যে, ...জার ওপর মাস্হকে বৈধই করা হয়েছে অসুবিধা দূর করার জন্য। সুতরাং যে ক্ষেত্রে মোজা খোলাটা মানুষের জন্য অসুবিধা ...ক সে ক্ষেত্রেই কেবল মাস্হ জায়েজ হবে। আর যে ক্ষেত্রে অসুবিধা জনক নয় সে ক্ষেত্রে মোজা খোলা ফরজ। মাস্হ করা ...য়েজ নেই।

وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ الخ ইমাম কুদূরী (রা.) বলেন, যে সব জিনিস نَوَاقِضِ وُضُوْء (অজু ভঙ্গ কারী) সে সব জিনিস ...জার মাসহ ভঙ্গকারীও বটে। কারণ মোজার ওপর মাস্হ করাটা অজুরই অংশ বিশেষ। তাই كل (সমগ্র)-এর ভঙ্গ কারী যা, আরো উত্তমভাবে جزء (অংশ) এরও ভঙ্গকারী হবে। আর মোজা খুলে ফেলাটাও মাস্হ ভঙ্গের একটি কারণ। কেননা ...জা ছিল পায়ের পাতা পর্যন্ত হদছ পৌঁছার পথে প্রতিরোধক। এখন মোজা খোলার মাধ্যমে যখন সেই প্রতিরোধক দূর হয়ে ...ছে, তখন হদছও অনুপ্রবেশ করেছে। ফলে মাস্হও ভেঙ্গে গেছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– তিনি এক জিহাদের সফরে থাকা অবস্থায় মোজা খুলে উভয় পা ...ত করেছেন। তবে অজুর অবশিষ্ট অঙ্গগুলো ধৌত করেন নি। এমনিভাবে অপরাপর সাহাবাগণ থেকেও এমন বিষয়ের ...রণ বর্ণিত আছে।

যদি এক পায়ের মোজা খুলে যায় তবুও মাস্হ ভেঙ্গে যাবে। তখন পায়ের মোজা খুলে উভয় পা ধৌত করা ফরজ। ...রণ একই আমলে ধোয়া ও মাস্হ উভয়টা একত্রিত করা শরঈ' ভাবে অসম্ভব।

وَكَذَا مَضَى الْمُدَّةِ لِمَارَوَيْنَا وَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّةُ نَزَعَ خُفَّيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَصَلَّى وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوْءِ وَكَذَا إِذَا نَزَعَ قَبْلَ الْمُدَّةِ لِاَنَّ عِنْدَ النَّزْعِ يَسْرِى الْحَدَثُ السَّابِقُ إِلَى الْقَدَمَيْنِ كَأَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُمَا وَحُكْمُ النَّزْعِ يَثْبُتُ بِخُرُوْجِ الْقَدَمِ إِلَى السَّاقِ لِاَنَّهُ لَامُعْتَبَرَ بِهِ فِى حَقِّ الْمَسْحِ وَكَذَا بِاَكْثَرِ الْقَدَمِ هُوَ الصَّحِيْحُ ـ

অনুবাদ ঃ অনুরূপভাবে সময় উত্তীর্ণ হওয়াও (মোজার মাসাহ ভঙ্গকারী) ঐ হাদীসের কারণে, যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। সময়সীমা যখন পূর্ণ হবে, তখন উভয় মোজা খুলে ফেলবে এবং উভয় পা ধুয়ে নামাজ আদায় করবে। অবশ্য অজুর অবশিষ্ট কাজ দোহরানো জরুরি নয়। সময় শেষ হওয়ার আগে মোজা খুলে ফেলারও একই হুকুম। কেননা মোজা খোলার সময় পূর্ববর্তী হদছ উভয় পায়ের পাতায় অনুপ্রবেশ করে। যেন সে এগুলো ধৌতই করেনি। মোজা খুলে যাওয়ার হুকুম সাব্যস্ত হবে পায়ের পাতা মোজার সাক (খাড়া অংশ) পর্যন্ত এসে গেলে। কারণ মাস্‌হ-এর ব্যাপারে এ অংশটা ধর্তব্য নয়। পায়ের পাতার অধিকাংশ বের হয়ে গেলেও এই একই হুকুম। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাস্‌আলা : মাস্‌হ-এর নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও মাস্‌হ ভেঙ্গে যায়। এর দলিল হলো ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীস শরীফ। অর্থাৎ হুযূর ﷺ-এর বাণী ـ يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا আবার কেউ কেউ বলেছেন لِمَا رَوَيْنَا বলে লিখক হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্‌সালের এই হাদীসটিকে বুঝিয়েছেন اَنْ لَانَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ـ অর্থাৎ আমরা যেন তিন দিন আমাদের মোজা না খুলি। আর যখন মাস্‌হ-এর সময় সীমা পূর্ণ হয়ে যাবে তখন উভয় পায়ের মোজা খুলে শুধু মাত্র পা দু'টি ধুয়ে নিলেই যথেষ্ট হবে। পূর্ণ অজু করতে হবে না। তবে এর জন্য শর্ত হলো অজু ভাঙ্গার অন্য কোনো কারণ না পাওয়া যেতে হবে। যদি মোজা খোলা ছাড়াও এমন কোনো কারণ বিদ্ধমান থাকে যার দরুন স্বাভাবিক ভাবেই অজু ভেঙ্গে যায়, সে ক্ষেত্রে পূর্ণ অজু করতে হবে। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, ওপরে বর্ণিত অবস্থায় পূর্ণ অজু করা ওয়াজিব। তাঁর যুক্তি হলো মাস্‌হ-এর সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে পায়ের ত্বহারাত ভেঙ্গে গেছে। আর তাহারাত ভেঙ্গে যাওয়াটা تجزى (অংশে অংশে বিভক্ত হওয়া) হয়না। যেমন হদছের কারণে অজু ভাঙ্গাটা تجزى হয় না। সুতরাং পায়ের তাহারাত ভেঙ্গে যাওয়া মানেই হলো পূরো তহারাত ভেঙ্গে যাওয়া। আর যেহেতু পুরা তাহারাত ভেঙ্গে গেছে সেহেতু স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, পুনরায় অজু করা ওয়াজিব।

আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব দেওয়া হয় এভাবে যে, হদছ আর মাস্‌হ-এর সময়সীমা অতিক্রম হওয়া উভয়টা এক জিনিস নয়, তাই একটাকে অপরটার ওপর কিয়াস করাও যথার্থ হবে না। কারণ হদস বলা হয় নাজাসাত বের হওয়াকে অথচ মাস্‌হ-এর সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার অর্থ এটা নয়। অতএব, উক্ত কিয়াসটি قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ হয়েছে।

আমাদের দলিল ঃ এ প্রসঙ্গে হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে হযরত ইব্‌নে ওমর (রা.)-এর ঐ কাজ দ্বারাও দলিল পেশ করা হয়, যা তিনি কোনো এক জিহাদের সফরে করেছিলেন। তিনি মোজা খুলে শুধু উভয় পা ধুয়েছেন। পূর্ণ অজু করেননি।

এই হুকুম ঐ ব্যক্তির বেলায়ও প্রজোয্য যে সময় সীমা পূর্ণ হওয়ার আগে নিজেই নিজের মোজা খুলে ফেলেছে। এর দলিল হলো— মোজা খোলার সময় উভয় পায়ের পাতায় পূর্ববর্তী নাজাসাত পৌছে গেছে। ফলে উভয় পায়ের অবস্থা এমন হয়ে গেছে যেন, এগুলোকে ধৌতই করা হয়নি।

হিদায়ার লিখক বলেন, মোজা খোলার বিষয়টি তখন সাব্যস্ত হবে, যখন পায়ের পাতা মোজার নালা পর্যন্ত আসবে। কারণ মাস্‌হ-এর ক্ষেত্রে মোজার নালা ধর্তব্য নয়। এমনকি কেউ যদি নালা বিহীন মোজা পরিধান করে এবং মাস্‌হ করে, তবুও তা জায়েজ হবে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো পায়ের টাখনু ঢাকা যেতে হবে। তদ্রূপ যদি পায়ের পাতার অধিকাংশ মোজার নালীর ভিতর ঢুকে যায়, তাহলে বিশুদ্ধ মতানুসারে মোজা খুলে যাওয়ার হুকুম সাব্যস্ত হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একটি বর্ণনা মতে পায়ের গোড়ালির অধিকাংশ আপন স্থান থেকে সরে মোজার নালীর ভিতর ঢুকে গেলেও মাস্‌হ বাতিল হয়ে যাবে। কারণ ধোয়ার স্থান যতক্ষণ পর্যন্ত মোজার ভিতর বিদ্যমান থাকবে, কেবল মাত্র ততক্ষণই মাস্‌হ বাকি থাকবে। সুতরাং যখন পুরা গোড়ালী কিংবা তার অধিকাংশ মোজার খাড়া অংশের ভিতরে ঢুকে গেছে, তখন ধোয়ার স্থান মোজার ভিতর বিদ্যমান থাকেনি। তাই মাস্‌হ ও থাকবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পায়ের যে পরিমাণ অংশে মাস্‌হ করা জায়েজ (তিন আঙ্গুল পরিমাণ) সে পরিমাণ অংশ মোজার ভিতর থাকলেই মাস্‌হ করা শুদ্ধ হবে। কারণ যে পরিমাণের ওপর মাস্‌হ করা জায়েজ, তা বের না হওয়া পর্যন্ত ধরতে হবে যে পা বেরই হয়নি।

وَمَنْ اِبْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيْمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَسَحَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا عَمَلاً بِاِطْلَاقِ الْحَدِيْثِ وَلِاَنَّهُ حُكْمٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَقْتِ فَيُعْتَبَرُ فِيْهِ اٰخِرُهُ بِخِلَافِ مَا اِذَا اسْتَكْمَلَ الْمُدَّةَ لِلْاِقَامَةِ ثُمَّ سَافَرَ لِاَنَّ الْحَدَثَ قَدْ سَرٰى اِلَى الْقَدَمِ وَالْخُفُّ لَيْسَ بِرَافِعٍ وَلَوْ اَقَامَ وَهُوَ مُسَافِرٌ اِنِ اسْتَكْمَلَ مُدَّةَ الْاِقَامَةِ نَزَعَ لِاَنَّ رُخْصَةَ السَّفَرِ لَاتَبْقٰى بِدُوْنِهِ وَاِنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْ اَتَمَّهَا لِاَنَّ هٰذِهِ مُدَّةُ الْاِقَامَةِ وَهُوَ مُقِيْمٌ ـ

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি মুকীম অবস্থায় মাস্‌হ শুরু করে একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার আগেই সফরে বের হয়ে গেছে, সে তিন দিন তিন রাত্র মোজার ওপর মাস্‌হ করবে। নিঃশর্ততার (اِطْلَاقُ الْحَدِيْثِ-এর) ওপর আমল করার নিমিত্তে। তাছাড়া মাস্‌হ-এর হুকুম সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এ বিষয়ে শেষ সময় বিবেচ্য হবে। তবে মুকীম অবস্থায় (মাস্‌হ-এর) সময়সীমা পূর্ণ করার পর সফর শুরু করার বিষয়টি এর বিপরীত। কারণ (এ সময়সীমা শেষ হওয়ার সাথে) হদছ পায়ের পাতা পর্যন্ত পৌছে গেছে। আর মাস্‌হ হদছ দূর কারী নয়। মুসাফির ব্যক্তি যদি মুকীম হয়, আর ইতিমধ্যে সে মুকীম হওয়ার সময় সীমা (অর্থাৎ মোজাা পরিধানের পর একরাত এক দিন) পূর্ণ করে ফেলে, তাহলে মোজা খুলে ফেলবে। কারণ সফরের রুখসত সফর শেষ হওয়ার পর অব্যাহত থাকে না। আর যদি সময় সীমা শেষ না করে থাকে, তাহলে তা শেষ করবে। কারণ এ হচ্ছে মুকীমের সময়সীমা। আর সে ব্যক্তিও মুকীম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এই মাস্‌আলায় মোট তিনটি সূরত আছে। যথা–১। যে তাহারাতের ওপর মোজা পরিধান করেছে, তা ভাঙ্গার আগেই সফর শুরু করেছে এবং সফর অবস্থায় থাকা কালে কোনো কারণে ত্বাহারাত ভেঙ্গে গেছে। এই সূরতে সর্ব সম্মত রায় হলো উক্ত ব্যক্তি মাস্‌হ-এর সময়সীমা তিনদিন তিনরাত্র পূর্ণ করবে।

২। হদছের পর এবং ইকামতের সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পর যদি সফর শুরু করে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে ইকামতের সময়সীমা সফরের সময়সীমায় রূপান্তরিত হবে না, অর্থাৎ এই সূরতে একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার পর মোজা খুলবে।

৩। সফর শুরু করেছে ইকামতের সময় সীমা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এবং হদছের পরে। এই সূরতে আমাদের মতে ইকামতের সময়সীমা সফরের সময় সীমায় রূপান্তরিত হবে। অর্থাৎ তিন দিন তিন রাত মাস্‌হ করবে। তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ (র.) বিপরীত মত পোষণ করেন। তার মতে এক দিন একরাত্র মাস্‌হ করে মোজা খুলে ফেলা জরুরি। তাঁর দলিল এই যে, মাস্‌হ একটি ইবাদত। আর প্রত্যেক এমন ইবাদত যা মুকীম অবস্থায় শুরু করা হয়েছে তা সফরের কারণে পরিবর্তিত হয় না। যেমন কেউ যদি মুকীম অবস্থায় রোজা রাখে এবং এ অবস্থায় মুসাফির হয়ে যায়, তাহলে এই সফরের কারণে তার আজকের শুরু করা রোজা ভাঙ্গা জায়েজ হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি শহরে অবস্থান রত জাহাজে নামাজ শুরু করে এবং সে নামাজে থাকা অবস্থায় জাহাজ চলতে আরম্ভ করে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি নামাজে থাকা অবস্থায় মুসাফির হবে না। বরং তার চার রাক্'আত বিশিষ্ট নামাজ চার রাকা'আতই পূর্ণ করবে। কারণ ইকামতের অবস্থা হচ্ছে আযীমতের অবস্থা। আর সফরের অবস্থা হচ্ছে রুখসতের অবস্থা। অতএব, ইবাদতের মাঝে যখন উভয় অবস্থা একত্রিত হয়, তখন আযীমতকে রুখসতের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হবে।

হানাফী মাযহাবের দলিল ঃ এ প্রসঙ্গে আমাদের দলিল হলো রাসূল ﷺ-এর হাদীস يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ (মুসাফির তিন দিন তিনরাত মাস্‌হ করবে)-এর اطلاق। তথা শর্তহীনতা। এই اطلاق-এর কারণে হাদীসের অর্থে ব্যাপকতা এসেছে। অর্থাৎ যে কোনো মুসাফির তিনদিন তিনরাত মাস্‌হ করবে। উক্ত ব্যক্তিও যেহেতু মুসাফির সেহেতু সেও তিন দিন তিন রাত মাসহ করবে। আমাদের আরেকটি দলিল হলো মাস্‌হ-এর হুকুমটা সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর যে জিনিসের হুকুম সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তাতে শেষ সময়ের ভিত্তিতে হুকুম লাগানো হয়। যেমন কোনো হায়েযা মহিলা যদি কোনো নামাজের শেষ ওয়াক্তে পবিত্র হয়, তাহলে ঐ নামাজ তার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়, এমনিভাবে কোনো মহিলা যদি নামাজের শেষ সময়ে হায়েযা হয়, তাহলে ঐ ওয়াক্তের নামাজ উক্ত মহিলার যিম্মাদারী থেকে বাদ হয়ে যাবে। তদ্রূপ মুসাফির যদি শেষ ওয়াক্তে মুকীম হয়, তাহলে সে পূর্ণ চার রাকআত পড়বে। এমনিভাবে মুকীম যদি শেষ ওয়াক্তে মুসাফির হয়, তাহলে সে কসর করবে। মোটকথা যেহেতু শেষ ওয়াক্তই ধর্তব্য, সেহেতু মুকীম ব্যক্তির ইকামতের সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি সফর শুরু করে, তাহলে সে মাসহ-এর ঐ সময়সীমা পূর্ণ করবে যা মুসাফির অবস্থায় করা হয় (তিন দিন তিন রাত)। পক্ষান্তরে যদি ইকামতের সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পর উক্ত ব্যক্তি সফরের সূচনা করে, তাহলে সে আর এখন তিন দিন তিন রাতের সময়সীমা পূর্ণ করতে পারবে না। কারণ মুকীম অবস্থায় মাস্‌হ-এর যে সময়সীমা ছিল তা উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই পায়ের পাতায় হদছ পৌছে গেছে। আর মোজাও হদছ অপসারণকারী নয়। ফলে হদছ দূর করার জন্য উভয় পা ধোয়া আবশ্যকীয় হয়ে গেছে।

وَمَنْ لَبِسَ الْجُرمُوقَ فَوقَ الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) فَإِنَّهُ يَقُولُ الْبَدَلُ لَايَكُونُ لَهُ بَدَلٌ وَلَنَا اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَسَحَ عَلَى الْجُرمُوقَيْنِ وَلِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْخُفِّ اِسْتِعْمَالًا وَغَرْضًا فَصَارَ كَخُفٍّ ذِي طَاقَيْنِ وَهُوَ بَدَلٌ عَنِ الرِّجْلِ لَاعَنِ الْخُفِّ بِخِلَافِ مَا اِذَا لَبِسَ الْجُرمُوقَ بَعْدَ مَا اَحْدَثَ لِاَنَّ الْحَدَثَ حَلَّ بِالْخُفِّ فَلَايَتَحَوَّلُ اِلَى غَيْرِهِ وَلَوْكَانَ الْجُرمُوقُ مِنْ كِرْبَاسٍ لَايَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ لَايَصْلُحُ بَدَلًا عَنِ الرِّجْلِ اِلَّااَنْ تَنْفُذَ الْبِلَّةُ اِلَى الْخُفِّ ـ

অনুবাদ ঃ আর যে ব্যক্তি মোজার উপর "জারমূক" (আবরনী মোজা) পরেছে সে জারমূকের ওপর মাসহ করবে। ইমাম শাফিঈ (রা.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, বদলের বদল হয়না। আমাদের দলিল হলো– নবী করীম ﷺ উভয় জারমূকের উপর মাসহ করেছেন। তাছাড়া ব্যবহার ও উদ্দেশ্যগত দিক থেকে জারমূক মোজার তাবে। তাই এটা দুই পর্বত (ভাজ) মোজার মতোই হয়ে গেছে। আর জারমুক হচ্ছে পায়ের বদল। মোজার নয়। অবশ্য হাদাছগ্রস্থ হওয়ার পর জারমুক পরার ব্যাপারটি এর বিপরীত, কেননা হাদাছ মোজায় পৌছে গেছে। সুতরাং অন্যকোনো কিছুর দিকে তা স্থানান্তরিত হবে না। আর জারমুক যদি সুতী কাপড়ের হয়, তাহলে তার উপর মাসহ জায়েজ হবে না। কারণ তা পায়ের বদল হওয়ার উপযুক্ত নয়। তবে যদি আর্দ্রতা মোজা পর্যন্ত পৌছে যায়, তাহলে জায়েজ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জারমুক বলা হয় এমন মোজাকে যা চামড়ার মোজার ওপর আবরনী হিসাবে পরিধান করা হয় যেন এর কারণে চামড়ার মোজাকে ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত রাখা যায়। আর জারমুকের সাক (খাড়া অংশ) মোজার সাকের তুলনায় ছোট হয়ে থাকে। হানাফী মাযহাব মতে জারমুকের উপর মাসহ করা জায়েজ আছে। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে জায়েজ নেই।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দলিল হলো– মোজা হচ্ছে– পায়ের বদল। আর বদলের বদল হয় না। কারণ মোজার উপর মাসহ করাকে শরীআত বৈধতাই দিয়েছে পায়ের বদল হিসাব। অতএব, এখন যদি জারমুকের উপর মাসহা জায়েজ করা হয়, তাহলে তা হবে মোজার বদল হয়ে। অথচ, তা জায়েজ নেই। তাই জারমুকের উপর মাসহ করাকেও না জায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আমাদের দলিল হচ্ছে হযরত ওমর (রা.)-এর এই হাদীসটি– قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْجُرمُوقَيْنِ অর্থ– হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জারমুকের ওপর মাসহ করতে দেখেছি। মুসনাদে ইমাম আহমাদ এ হযরত বিলাল (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْمُوقَيْنِ অর্থাৎ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মূক-এর উপর মাসহ করতে দেখেছি। মূক জারমূকেরই একটি নাম। আমাদের আকলী (যুক্তিনির্ভর) দলিল হলো– জারমুক ব্যাবহার এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে মোজার তাবে (تابع) হয়ে থাকে ব্যাবহারের দিক থেকে তো এ কারণে যে জারমূক সর্বদা মোজার সাথে সাথে থাকে। আর উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে জারমূক মোজার তাবে এ কারণে যে, একে মোজার হিফাজতের জন্যই ব্যবহার করা হয়। যেমন মোজা ব্যবহার করা হয় পায়ের হেফাজতের জন্য। অতএব, জারমূকগণ একটি দু' পাঠ বিশিষ্ঠ মোজা। দু'পাঠ বিশিষ্ট মোজার ওপরের পাঠে মাসহ করা যেমন সর্ব সম্মত ভাবে জায়েজ তেমনি জারমূকের ওপর মাসহ করাও জায়েজ হবে।

আর জারমূক বদলের বদল এই উক্তিটি সঠিক নয়। কারণ জারমূক বদল বটে, তবে মোজার নয় বরং তা পায়ের বদল। এর বিপরীত অবস্থা হল যদি জারমূক হাদাছের পর পরিধান করে, তাহলে তার ওপর মাসহ করা জায়েজ হবে না। কারণ এতে হদছ মোজার ভিতরে প্রবিষ্ঠ হয়ে গেছে। এখন তা স্থানান্তরিত হয়ে জারমূকের ওপর আসবেনা। যদি জারমূক সূতী কাপরের হয় তখনও তার ওপর মাসহ করা জায়েজ হবে না। কারণ সূতী কাপরের জারমূক পায়ের বদল হতে সক্ষম নয়, কারণ সূতী কাপড়েরর জারমূক পরিধান করে ক্রমাগত চলাচল করা সম্ভব নয়। তবে জারমূক যদি এমন পাতলা কাপড় দ্বারা তৈরি হয়, যার ওপর পানি লাগলে এর আর্দ্রতা জারমূক ভেদ করে মোজা পর্যন্ত পৌছতে পারে এ ধরনের জারমূকের ওপর মাসহ করা জায়েজ আছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, জারমূকের ওপর মাসহ করা হয়েছে; বরং এ মাসহ মোজার ওপরই করা হয়েছে। কারণ জারমূক অতি পাতলা হওয়ার কারণে মোজা পর্যন্ত পানি পৌছার জন্য তা বাধা দায়ক নয়।

وَلَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَا مُجَلَّدَيْنِ اَوْمُنَعَّلَيْنِ وَقَالَا يَجُوْزُ اِذَا كَانَا ثَخِيْنَيْنِ لَايَشِفَّانِ لِمَارُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَلِاَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْمَشْىُ فِيْهِ اِذَا كَانَ ثَخِيْنًا وَهُوَ اَنْ يَّتَمَسَّكَ عَلَى السَّاقِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّرْبَطَ بِشَيْءٍ فَاَشْبَهَ الْخُفَّ وَلَهُ اَنَّهُ لَيْسَ فِىْ مَعْنَى الْخُفِّ لِاَنَّهُ لَايُمْكِنُ مُوَاظَبَةُ الْمَشْىِ فِيْهِ اِلَّا اِذَاكَانَ مُنَعَّلًا وَهُوَ مَحْمَلُ الْحَدِيْثِ وَعَنْهُ اَنَّهُ رَجَعَ اِلٰى قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى وَلَايَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْبُرْقُعِ وَالْقُفَّازَيْنِ لِاَنَّهُ لَاحَرَجَ فِىْ نَزْعِ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ وَالرُّخْصَةُ لِدَفْعِ الْحَرَجِ وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَاِنْ شَدَّهَا عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ ذٰلِكَ وَاَمَرَ عَلِيًّا بِهٖ وَلِاَنَّ الْحَرَجَ فِيْهِ فَوْقَ الْحَرَجِ فِىْ نَزْعِ الْخُفِّ فَكَانَ اَوْلٰى بِشَرْعِ الْمَسْحِ وَيَكْتَفِىْ بِالْمَسْحِ عَلٰى اَكْثَرِهَا ذَكَرَهُ الْحَسَنُ وَ لَايَتَوَقَّتُ لِعَدَمِ التَّوْقِيْفِ بِالتَّوْقِيْتِ وَاِنْ سَقَطَتِ الْجَبِيْرَةُ عَنْ غَيْرِ بُرْءٍ لَايَبْطُلُ الْمَسْحُ لِاَنَّ الْعُذْرَ قَائِمٌ وَالْمَسْحُ عَلَيْهَا كَالْغَسْلِ لِمَا تَحْتَهَا مَادَامَ الْعُذْرُ بَاقِيًا وَاِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ بَطَلَ لِزَوَالِ الْعُذْرِ وَاِنْ كَانَ فِى الصَّلٰوةِ اِسْتَقْبَلَ لِاَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْاَصْلِ قَبْلَ حُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ بِالْبَدَلِ ـ

অনুবাদ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট জাওরাব (চামড়া ছাড়া অন্য কিছুর তৈরি মোজা) এর ওপর মাসহ করা জায়েজ নেই। তবে জাওরাবের ওপরে নীচে কিংবা শুধু নীচে যদি চামড়া যুক্ত থাকে, তাহলে এর ওপর মাসহ করা জায়েজ আছে। ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ বলেন জাওরাব যদি এমন পুরো কাপড়েরর তৈরি হয় যে, এর অপর দিক প্রকাশ হয় না। তাহলে জাওরাবের ওপর মাসহ করা জায়েজ আছে। কেননা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জাওরাবের ওপর মাসহ করেছেন। তাছাড়া জাওরাব মোটা হলে তা পরিধান করে হাটা সম্ভব। পুরো হওয়ার পরিমাণ হচ্ছে– কোনো কিছু দ্বারা না আটকানো অবস্থায়ও পায়ের গোছার (ساق) সাথে আটকে থাকা। এমন জাওরাব মোজার সদৃশ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো– এটি (জাওরাব) মোজার সম-মানের নয়। কারণ তা পরিধান করে অব্যাহতভাবে চলাচল করা সম্ভব নয় অবশ্য যদি তা যুক্ত হয়। আর এটাই হচ্ছে হাদীসের প্রয়োগ ক্ষেত্র। তাঁর থেকে এমন এক বর্ণনাও আছে যে, তিনি ইমাম আবূ ইউসূফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর এর ওপরই ফাতওয়া। পাগড়ী, টুপি, বোরকা এবং হাত মোজার ওপর মাসহ করা জায়েজ নয়। কারণ এগুলো খুলে (ধৌত করার মাঝে) বর্ণিত কোনো অসুবিধা হয় না। অবশ্য رخصة তথা সাময়িক অবকাশ দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র অসুবিধা দূর করার জন্যই। জখমের পট্টির উপর মাসেহ করা জায়েজ। যদিও তা অজু ছাড়া অবস্থায় বাঁধা হয়ে থাকে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছেন এবং হযরত আলী (রা.)-কেও

তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া এ ক্ষেত্রের অসুবিধা মোজা খোলার অসুবিধার চেয়ে বেশি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মাসহ-এর বৈধতা অধিক যুক্তিযুক্ত। আর পট্টির অধিকাংশ স্থান মাসেহ করাই যথেষ্ট। ইমাম হাসান (ইবনে যিয়াদ) তা উল্লেখ করেছেন। এটা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কেননা এর নির্দিষ্ট সময় শরিয়তের মাধ্যমে অবহিত করা হয়নি। যদি জখমের পট্টি নিরাময় ছাড়াই খুলে পড়ে যায়, তাহলে মাসেহ বাতিল হবে না। কেননা, ওজর অব্যাহত আছে, আর যতক্ষণ ওজর অব্যাহত আছে, ততক্ষণ তার উপর মাসেহ করা তার নীচের অংশ ধোয়ারই সমতুল্য। আর যদি নিরাময় হওয়ার পর পট্টি পড়ে যায়, তাহলে মাসেহ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ওজর দূর হয়ে গেছে। আর যদি তখন সে নামাজরত থাকে, তাহলে সে নামাজ নতুনভাবে আদায় করবে। কেননা বিকল্প দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জনের পূর্বেই সে আসল কর্মের ক্ষমতা লাভ করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুজাল্লাদ (مجلد) বলা হয় এমন জাওরাব তথা চামড়া ব্যাতীত অন্য কোনো কিছুর তৈরি মোজাকে যার ওপর এবং নিচে চামড়া যুক্ত করা হয়েছে।

মুনা'আল (منعل) বলা হয় ঐ জাওরাবকে যার নিচে চামড়া যুক্ত করা হয়েছে।

জাওরাব -এর ওপর মাসহ করার ৩টি সূরত হতে পারে (১) জাওরাব পুরো মোটা কাপড় দ্বারা তৈরি। এবং মুনা'আল (منعل) কিংবা মুজাল্লাদ (مجلد) হবে। এমতাবস্থায় সর্বসম্মত রায় হলো এ ধরনের মোজার ওপর মাসহ করা জায়েজ আছে। (২) জাওরাব না মোটা কাপড়েরর তৈরি না منعل এ ধরনের মোজার ব্যাপারে সর্বম্মত রায় হলো, এর ওপর মাসহ করা জায়েজ নেই। (৩) জাওরাব তো মোটা কাপড়ের তৈরি, তবে তা منعل নয়। এ ধরনের মোজার ওপর মাসহ করা জায়েজ হওয়া না হওয়ার বিষয়ে ইমামগণের মতবিরোধ আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ওপরোল্লিখিত জাওরাবের ওপর মাসহ করা জায়েজ নেই। তবে ইমাম মুহাম্মদ এবং আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা জায়েজ আছে।

ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর দলিল হলো– আবূ মূসা আশ'আরী (র.) থেকে বর্ণিত এই হাদীসটি– إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ অর্থাৎ মহানবী ﷺ দু' জাওরাবের ওপর মাসহ করেছেন।

হাদীসটি যেহেতু মুতলাক, তাই মুতলাক জাওরাবের ওপরই মাসহ করা জায়েজ। তা মুনা'আল হোক অথবা না হোক।

আকলী (عقلى) দলিল ঃ জাওরাব যদি এতটা মোটা এবং মজবুত হয় যে কোনো প্রকার বাঁধন ব্যতীত তা পায়ের নালার সাথে স্থিরভাবে মিশে থাকে, তাহলে এটা পরিধান করে ক্রমগত চলাচল করা সম্ভব। এমতাবস্থায় তা মোজার সদৃশ বলে গণ্য হবে। সুতরাং মোজার ওপর মাসহ করা যেমনিভাবে জায়েজ, তেমনি জাওরাবের ওপর মাসহ করাও জায়েজ হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো– জাওরাবকে তখনই মোজার সদৃশ বলে গণ্য করা হবে, যখন সর্ব দিক থেকে জাওরাব মোজার অর্থ বহন করবে। অথচ বাস্তবে জাওরাব মোজার অর্থে নয়। কারণ মোজা পরিধান করে ক্রমাগত চলাচল করা যায়, কিন্তু غير منعل (নিচে চামড়া যুক্ত এমন জাওরাব) জাওরাব পরিধান করে তা করা যায় না। অবশ্য منعل জাওরাব দ্বারা যেহেতু এটা করা সম্ভব সেহেতু এর ওপর মাসহ করা জায়েজ হবে। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বর্ণিত হাদীসটির محمل (প্রয়োগক্ষেত্র) ও এই منعل জাওরাবই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে (কারো মতে ৩দিন পূর্বে, কারো মতে ৭ দিন পূর্বে) অসুস্থ অবস্থায় غير منعل জাওরাবের ওপর মাসহ করেছেন, যারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন فَعَلْتُ مَا كُنْتُ أَمْنَعُ النَّاسَ عَنْهُ আমি এখন তাই করলাম এতোদিন মানুষকে যা করতে নিষেধ করেছি। এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) তার মত পরিবর্তন করে সাহেবাইনের মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন। হেদায়া প্রণেতা বলেন প্রত্যাবর্তিত মতের ওপরই হানাফী মাযহাবের ফতওয়া।

وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ الخ : হানাফী মাযহাবের আলেমগণের মতে পাগড়ী, টুপি, বোরকা এবং হাত মোজার ওপর মাসহ করা জায়েজ নেই। তবে ইমাম আওযাঈ এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে পাগড়ীর ওপর মাসহ করা জায়েজ আছে। তাঁদের দলিল হলো– রাসূলুল্লাহ ﷺ মোজা এবং পাগড়ীর ওপর মাসহ করেছেন বলে সাব্যস্ত আছে।

হানাফী ওলামাগণের দলিল হলো– মোজার ওপর মাসহ করার অবকাশ দেওয়াই হয়েছে অসুবিধা দূর করার জন্য কিন্তু উপরোক্ত জিনিসগুলো খোলা যেহেতু অসুবিধা জনক নয়, সেহেতু এগুলোর ওপর মাসহ করাও বৈধ নয়।

وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ الخ : جبائر শব্দটি جبيرة-এর বহুবচন। আর জবীরা ঐ কাষ্ঠখণ্ডকে বলা হয় যা ভাঙ্গা হাড়ের উপর বাধা হয়। কাযীখান বলেছেন, জবীরার উপর মাসেহ করার অনুমতি তখন দেওয়া হবে যখন যখমের উপর মাসেহ করা কষ্টসাধ্য হয়। আর যদি যখমের উপর মাসেহ করতে কোনো কষ্ট না হয় তবে জবীরার (পট্টি) উপর মাসেহ করবে না। মুদ্দাকথা হলো, পট্টির উপর মাসেহ করাটা শরিয়ত সম্মত। যদিও তা অজু ছাড়া অবস্থায় বাঁধা হয়। দলিল হলো, সাধারণ পট্টি বাঁধা হয় জরুরতের সময়। আর ঐ অবস্থায় তাহারাত এর শর্ত লাগানো দ্বারা কষ্টের দিকে ধাবিত করা হয়। তাই তাহারাতের শর্তারোপ করা হয়নি। এ ব্যাপারে আসল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও পট্টির উপর মাসেহ করেছেন। উহুদের দিনে যখন হযরত আলী (রা.) -এর হাতের গিট্টু ভেঙ্গে গিয়েছিল। তখন তিনি হযরত আলী (রা.)-কে পট্টির উপর মাসেহ করার নর্দেশ দিয়েছিলেন। ইনায়া গ্রন্থকার পূর্ণ ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রা.) রাসূলুল্লাহর ﷺ কেতন উঁচু করে রাখছিলেন। যখন হযরত আলীর (রা.) হাত ভেঙ্গে গেল এবং হাত থেকে কেতন পড়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন। পতাকা বাম হাতে ধারণ কর। কেননা হযরত আলী (রা.) ইহকালে পরকালে আমার পতাকার মালিক হবে। হযরত আলী (রা.) বললেন। مَا أَصْنَعُ بِالْجَبَائِرِ পট্টি দ্বারা আমি কি করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, اِمْسَحْ عَلَيْهَا পট্টির উপর মাসেহ কর। উক্ত হাদীসের মধ্যে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই যে, পট্টি তাহারাতে উপর বাধা হয়েছিল না তাহরাত ছাড়া বাধা হয়েছিল। সুতরাং বুঝা গেল। মতলাকান পট্টির উপর মাসেহ করার বিধান রয়েছে তা তাহারাতের উপর বাঁধা হোক বা তাহারাত ছাড়া বাধা হোক।

আকলী দলিল হলো, মোজা খোলার মধ্যে যতটুকু অসুবিধা রয়েছে। পট্টি খোলা আর বাধার মধ্যে এর চেয়ে আরো অধিক অসুবিধা হয়। সুতরাং যখন অসুবিধা দূর করার জন্য মোজার উপর মাসেহ করার বিধান দেওয়া হয়েছে। তবে তো পট্টির উপর মাসেহ করার বৈধতা আরো অধিক যুক্তিযুক্ত। তবে যদি কিছু পট্টির উপর মাসেহ করা হয় আর কিছুর উপর না করা হয় তবে এর বিধানের ব্যাপারে যাহিরে রিওয়ায়াতে কোনো বর্ণনা নেই, তবে হাসান ইবনে যিয়াদের 'আমালীতে" রয়েছে যে, যদি অধিকাংশ পট্টির উপর মাসেহ করা হয় তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি অর্ধেক বা এরচেয়ে কম মাসেহ করা হয় তবে তা যথেষ্ট হবে না। গ্রন্থকার (র.) বলেন, পট্টির উপর মাসেহ করার জন্য কোনো সময় নির্ধারিত নেই। বরং ভালো হওয়া পর্যন্ত তার উপর মাসেহ করা জায়েজ। কেননা পট্টির উপর মাসেহের ওয়াক্ত সংক্রান্ত কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। উল্লেখ্য যে, উক্ত ইবারত দ্বারা পট্টির উপর মাসেহ আর মোজার উপর মাসেহ এর মধ্যকার পার্থক্যের দিকেও ইশারা হয়ে গেল। কেননা (১) মোজার উপর মাসেহ করার ক্ষেত্রে সময় নির্ধারিত নেই। দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, পট্টির উপর মাসেহ ফরজ তাহারাত ছাড়াও জায়েজ। কিন্তু মোজার উপর মাসেহ করা তাহারাত ছাড়া জায়েজ নেই। তৃতীয় পার্থক্য এই যে, পট্টি যদি নিরাময় ছাড়াই খুলে পড়ে যায় তবে মাসেহ বাতিল হবে না। পক্ষান্তরে মোজা যদি খুলে পা বের হয়ে যায় তবে মাসেহ বাতিল হয়ে যাবে। দলিল হলো, ওজর অব্যহত আছে, আর যতক্ষণ পর্যন্ত ওজর থাকবে ততক্ষণ পট্টির উপর মাসেহ করা এমন– যেমন তার নিচের অংশ ধোয়া। এমনকি যদি এক পায়ে পট্টি থাকে এবং তার উপর মাসেহ করা হয় তখন দ্বিতীয় পায়ে মোজা পরে তার উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই। যাতে হুকুমের দিক থেকে ধোয়া আর মাসেহ এর মাঝে একত্রিত না করতে হয়। আর যদি পট্টি যখন নিরাময়ের পর খুলে পাড়ে যায় তখন পট্টির উপর মাসেহ করা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা যে ওজরের কারণে পট্টির উপর মাসেহ করার বিধান দেওয়া হয়েছিল। সে ওজর এখন আর নেই; বরং দূরীভূত হয়ে গেছে। আর যদি পট্টি নামাজের মধ্যে খুলে পড়ে যায়, এমতাবস্থায় সে যখমও ভালো হয়ে গিয়েছে তবে নামাজ শুরু থেকে পুনরায় পড়ে নিবে। কেননা এই ব্যক্তি বিকল্প দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিলের পূর্বেই আসলের উপর ক্ষমতা লাভ করেছে। যেমন তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি যদি নামাজের মধ্যে পানির উপর ক্ষমতা লাভ করে তবে অজু করে পুনরায় শুরু থেকে নামাজ আদায় করবে।

بَابُ الْحَيْضِ وَالْاِسْتِحَاضَةِ

اَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَمَا نَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُوَ اِسْتِحَاضَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَاَكْثَرُهُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيْ (رح) فِي التَّقْدِيْرِ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رح) اَنَّهُ يَوْمَانِ وَالْاَكْثَرُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ اِقَامَةً لِلْاَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِّ قُلْنَا هٰذَا نَقْصٌ عَنْ تَقْدِيْرِ الشَّرْعِ وَاَكْثَرُهُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ وَالزَّائِدُ اِسْتِحَاضَةٌ لِمَا رَوَيْنَا وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيْ فِي التَّقْدِيْرِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ الزَّائِدُ وَالنَّاقِصُ اِسْتِحَاضَةٌ لِاَنَّ تَقْدِيْرَ الشَّرْعِ يَمْنَعُ اِلْحَاقَ غَيْرِهِ بِهِ ـ

পরিচ্ছেদ ঃ হায়েয ও ইস্‌তিহাযা

অনুবাদ ঃ হায়েযের সর্বনিম্ন সময় তিনদিন তিন রাত্র। এর চেয়ে কম যেটা সেটা হচ্ছে ইস্তেহাযা। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন বাকেরাও ছাইয়েবা নারীর হায়েযের সর্ব নিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিন দিন তিন রাত্র, তার সর্বোচ্চ মেয়াদ হচ্ছে দশদিন। এ হাদীসটি ইমাম শাফিঈ (র.) কর্তৃক হায়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ একদিন একরাত্র নির্ধারণের বিপক্ষে দলিল। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এর মেয়াদ দু'দিন এবং তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সময়। এটা অধিকাংশকে সমগ্রের স্থলবর্তী করার ভিত্তি অনুযায়ী। আমরা বলি এটা শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদকে হ্রাস করার শামিল। حيض -এর সর্বোচ্চ সময় দশ দিন। তার চেয়ে অধিক দিন পরিমাণ (স্রাব) হচ্ছে استحاضة -এর দলিল ঐ হাদীস যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। আর এ হাদীসটি পনের দিন মেয়াদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষে একটি দলিল। এই মেয়াদের অতিরিক্ত বা এর চেয়ে কম রক্ত স্রাব হচ্ছে ইসতিহাযা। কারণ শরিয়তের নির্ধারিত মেয়াদ অন্যকিছুকে এর সাথে যুক্ত করতে বাধা দেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হায়েয এবং নিফাস হাদাসের অন্তর্ভুক্ত নাকি (نجس) নাপাকির অন্তর্ভুক্ত? এ ব্যাপারে ফকীহগণের মাঝে اختلاف আছে। কারো কারো মত হলো উভয়টি نجس -এর অন্তর্ভুক্ত। আবার কারো মত হলো উভয়টি হাদাসের অন্তর্ভুক্ত। তবে শেষোক্ত মতটি যথোপোযুক্ত। কারণ এ আলোচনার পরেই লিখক بَابُ الْاَنْجَاسِ উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝা যায় হায়েয এবং নিফাস انجاس -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি ধরে নেওয়া হয় এ দু'টি انجاس-এর অন্তর্ভুক্ত। তাহলে পরবর্তীতে আবার بَابُ الْاَنْجَاسِ শিরোনামে অধ্যায় স্থাপন করাটা শুধুমাত্র تكرار বলেই গণ্য হবে।

এখানে প্রণিধানযুগ্য যে, আলোচ্য অধ্যায় (بَابُ الْحَيْضِ وَالْاِسْتِحَاضَةِ) نفاس -এর حكم সংক্রান্ত বিবরণ থাকা সত্ত্বেও মূল শিরোনামে نفاس কথাটিকে উল্লেখ করা হয়নি এ কারণে যে, حيض ও نفاس -এর অর্থ বহনকারী। সুতরাং حيض -এর আলোচনা মূলত نفاس -এরই আলোচনা। তবে উভয়টি একই অর্থ বহনকারী হওয়া সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে نفاس থেকে حيض-এর ব্যাপারটি যেহেতু অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়, তাই শুধু حيض (শিরোনাম)-এর কথাটিই উল্লেখ করা হয়েছে।

"حيض" শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– বহির্গমনকারী রক্ত। ফুকাহাদের পরিভাষায় حيض বলা হয় রোগ মুক্ত প্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রী লোকের رحم (বাচ্চাদানী) থেকে নির্গত রক্তকে। এর সূচনা হয়েছিল আদিমাতা বিবি হাওয়া (আ.)-এর মাধ্যমে তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এই অবস্থায় পতিত করেন। সেই থেকে নিয়ে তার সন্তানদের মাঝে এ অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আমাদের মতে হায়যের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিন দিন তিন রাত, আর যে রক্ত এর চেয়ে কম সময়ে স্রাব হয় তা হায়েয নয় বরং তা হচ্ছে استحاضة (ইস্তেহাযা)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, হায়যের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে পূর্ণ দু' দিন এবং তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সময়। ইমাম মালিক (র.) বলেন, শুধু রক্তই হায়েয, চাই তার প্রবাহ এক ঘন্টাই হোক না কেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, حيض -এর সর্ব নিম্ন মেয়াদ হচ্ছে একদিন এক রাত্র।

আমাদের দলিল ঃ এ বিষয়ে আমাদের দলিল হচ্ছে ঐ হাদীসটি যা হযরত আবূ উমামাহ বাহেলী, আয়শা, ওয়াইলা, আনাস ইবনে ওমর প্রমূখ সাহাবা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসখানা হচ্ছে–

إِنَّهُ ﷺ قَالَ اَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَاَكْثَرُهُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বাকেরা ও সাইয়্যেবা নারীর হায়যের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিনদিন তিনরাত্র; আর এর সর্বোচ্চ মেয়াদ হচ্ছে দশদিন।

এই মেয়াদের কথাই বর্ণিত আছে হযরত ওমর, আলী, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, উসমান, ইবনে আবিল আস এবং আনস ইবনে মালিক (রা.) প্রমূখ সাহাবাগণের পক্ষ থেকেও। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের শব্দ গুলো এরূপ– لَاحَيْضَ دُوْنَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ وَلَاحَيْضَ فَوْقَ عَشَرَةِ اَيَّامٍ ـ অর্থাৎ তিন দিনের নিচেও কোনো حيض নেই এবং দশদিনের উপরেও কোনো حيض নেই। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) لِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ এই মূলনীতির ভিত্তিতে দলিল দিয়েছেন। ইমাম মালিক (র.) বলেন, হায়েয হচ্ছে একটি হাদাছ। সুতরাং অন্যান্য হাদাছের ন্যায় এই حيض নামক হাদাছটিও কোনো কিছুর সাথে নির্ধারিত থাকবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, রক্তের প্রবাহ যখন পূর্ণ একদিন একরাত্র ব্যাপী চলতে থাকে, তখন জানা হয়ে যাবে যে এ রক্ত বাচ্চাদানী থেকে নির্গত। সুতরাং حيض -এর রক্ত সনাক্ত করার জন্য এর চেয়ে বেশি সময়ের প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জবাব ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে উপরোল্লিখিত ইমামগণের পেশ করা দলিলসমূহের জওয়াব দেওয়া হয় এই বলে যে, حيض -এর সর্বনিম্ন মেয়াদ শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে তিন দিন। এখন যদি কেউ তার চেয়ে কম মেয়াদকে হায়যের জন্য যথেষ্ট মনে করেন, তাহলে তা শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের চেয়ে কম হয়ে যাবে। অথচ, শরিয়ত নির্ধারিত সময়সীমা হ্রাস, করা জায়েজ নেই।

وَاَكْثَرُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ وَالزَّائِدُ الخ : আমাদের মতে حيض -এর সর্বোচ্চ মেয়াদ দশ দিন। আর ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে এই মেয়াদ পনের দিন। ইমাম শাফিঈ (র.) তাঁর মতের পক্ষে দলিল হিসাবে ঐ হাদীসটি পেশ করেছেন, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রী লোকদের দ্বীনি ত্রুটির ব্যাপারে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন تَقْعُدُ اِحْدٰهُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تَصُوْمُ وَلَا تُصَلِّيْ অর্থাৎ স্ত্রী লোকেরা তাদের জীবনের অর্ধেক সময় বসে থাকে, নামাজ ও পড়ে না রোজা ও রাখে না। এই হাদীসে شطر শব্দের অর্থ হচ্ছে অর্ধেক। আর এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে হায়যের সময়কে।

وجه استدلال এই হাদীসটি দ্বারা দলিল দেওয়া হয় এ ভাবে যে, মানুষের জীবন ও বয়স নির্ধারণ করা হয় বৎসর গণনার মাধ্যমে। আর বৎসর নির্ধারণ করা হয় মাস গণনার মাধ্যমে। আর এক মাসের অর্ধেক হচ্ছে পনের দিন। সুতরাং এ থেকে প্রমাণ হলো যে, স্ত্রী লোকরা হায়যের কারণে পনের দিন নামাজ ও পড়েনা এবং রোজাও রাখে না।

আমাদের দলিল ঃ এ বিষয়ে আমাদের দলিল হচ্ছে ঐ হাদীসটি যা পূর্ববর্তী মাসআলার দলিল হিসাবে পেশ করা হয়েছিল (اَكْثَرُهُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ) প্রকাশ থাকে যে, পূর্ব বর্ণিত মেয়াদের কম বা বেশি যদি রক্ত স্রাব হয় তাহলে এটাকে حيض বলা হবে না। বরং বলা হবে استحاضة কারণ শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো কিছু নির্ধারণ করে দেওয়া এই কথার প্রমাণ যে এই নির্ধারণ করাটাই এর সাথে অন্য কোনো কিছুকে যুক্ত করতে বাধা দেয়। সুতরাং যে রক্ত এই নির্ধারিত মেয়াদের কম বা বেশি হবে, তা হায়েয হবে না; বরং এটাকে বলা হবে استحاضة।

وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ حَيْضٌ حَتّٰى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) لَاتَكُوْنُ الْكُدْرَةُ مِنَ الْحَيْضِ اِلَّا بَعْدَ الدَّمِ لِاَنَّهُ لَوْكَانَ مِنَ الرَّحِمِ لَتَاَخَّرَ خُرُوْجُ الْكَدْرِ عَنِ الصَّافِىْ وَلَهُمَا مَا رُوِىَ اَنَّ عَائِشَةَ جَعَلَتْ مَاسِوَى الْبَيَاضِ الْخَالِصِ حَيْضًا وَهٰذَا لَايُعْرَفُ اِلَّا سِمَاعًا وَفَمُ الرَّحِمِ مَنْكُوْسٌ فَيَخْرُجُ الْكَدْرُ اَوَّلًا كَالْجَرَّةِ اِذَا ثُقِبَ اَسْفَلُهَا وَاَمَّا الْخُضْرَةُ فَالصَّحِيْحُ اَنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْاَقْرَاءِ تَكُوْنُ حَيْضًا وَيُحْمَلُ عَلٰى فَسَادِ الْغِذَاءِ وَاِنْ كَانَتْ كَبِيْرَةً لَاتَرٰى غَيْرَ الْخُضْرَةِ تُحْمَلُ عَلٰى فَسَادِ الْمَنْبَتِ فَلَاتَكُوْنُ حَيْضًا ـ

অনুবাদ : স্বচ্ছ শুভ্রতা দেখার পূর্ব পর্যন্ত ঋতু গ্রস্থনারী (حائضہ) লাল, হলদেরবা ঘোলা রঙ্গের যে কোনো স্রাব দেখতে পাবে, তা হায়েয। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, শুধু মাত্র রক্তের পরেই ঘোলা বর্ণের স্রাবকে হায়েয বলে গণ্য করা হবে। অন্যথায় নয়। কারণ উক্ত রক্ত যদি জরায়ু থেকে নির্গত হতো তাহলে ঘোলা স্রাব অবশ্যই স্বচ্ছ রক্তের পরে বের হতো। ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত এই হাদীস যে, তিনি স্বচ্ছ শুভ্রতা ছাড়া সব কিছুকে হায়েয হিসাবে গণ্য করতেন। আর এ সব বিষয়ে একমাত্র শুনেই জানা যায়। জরায়ুর মুখ যেহেতু নিম্নমুখী সেহেতু খোলা রক্তটাই আগে বের হবে। কলসের নীচ দিক দিয়ে ফুটো করলে যেমন হয় (অর্থাৎ নিচের গাদ আগে বের হয়)। সবুজ রঙের স্রাব সম্পর্কে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে– স্ত্রী লোকটি ঋতুবতী হলে, তা হায়েয বলে গণ্য হবে। আর রঙের ব্যাপারটি খাদ্যের দোষের কারণে হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। আর যদি ঐ মহিলা অধিক বয়স্কা হয়, যে সবুজ রং ছাড়া আর কিছু দেখেনা, তাহলে তা উৎস (জরায়ু)-এর দোষ বলে ধরা হবে এবং এটা হায়েয বলে গণ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হায়েযের রঙ ঃ ফুকাহা গণের মতে হায়েযের রঙ ছয় প্রকার– (১) কালো (২) লাল (৩) হলুদ (৪) গাদলা (৫) সবুজ এবং (৬) মেটে।

হিদায়া প্রণেতা তার কিতাবে কালো রঙ্গের উল্লেখ করেননি এ কারণে যে, এটি হায়েয হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো প্রশ্ন নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– دَمُ الْحَيْضِ اَسْوَدُ عَبِيْطٌ مُحْتَدِمٌ অর্থাৎ হায়েযের রক্ত কালো তাজা গাড় লাল হয়ে থাকে। এই হাদীসে বর্ণিত عَبِيْطٌ শব্দটির অর্থ তাজা আর مُحْتَدِمٌ শব্দের অর্থ গাড় লাল। লাল রঙ যখন খুব বেশি গাড় হয়ে যায়, তখন কিছুটা কালো রঙ ধারণ করে, আর লিখক এ কারণে মেটো রঙেরও উল্লেখ করেন নি যে, গাদলা তথা ঘোলা রঙটা মেটো রঙ্গের অতি নিকবর্তী রঙ। তাই ঘোলা রঙ্গের উল্লেখ থাকাতে মেটো রঙ্গের উল্লেখ করার তেমন প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকেনি। মোটকথা কালো এবং লাল রঙ্গের রক্ত হায়েয হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি নেই। আর গাড় হলুদ বিশুদ্ধ মতানুযায়ী হায়েয। বাকি আছে ঘোলা রঙ্গের রক্ত। সুতরাং এ বিষয়ে طرفين-এর মত হলো এ রংও হায়েয বলে গণ্য। চাই তা হায়েযের প্রাথমিক দিন গুলোতে দেখা যাক অথবা শেষের দিকের দিনগুলোতে। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে ঘোলা

রঙ্গের রক্ত কেবল মাত্র তখনই হায়যের রক্ত বলে গণ্য হবে যদি তা স্বচ্ছ লাল রক্তের পরে দেখা দেয়। যদি প্রথমেই ঘোলা রং দেখা দেয়, তাহলে তাঁর মতে বুঝে নিতে হবে যে, এটা জরায়ু থেকে নির্গত হয়নি। বরং তা নির্গত হয়েছে অন্যকোনো রগ ইত্যাদি থেকে। আর যে রক্ত জরায়ু ছাড়া অন্য কোনো স্থান থেকে নির্গত হয়, তা হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হয়না। এ কারণেই ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) ঘোলা রংকে ততক্ষণ পর্যন্ত হায়েয বলেন না যতক্ষণ না তার পূর্বে লাল রক্ত দেখা দেয়।

صاحب عنايه ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর দলিল এভাবে বিবৃত করেছেন যে, প্রত্যেক বস্তুর ঘোলা অবস্থাটা তার স্বচ্ছ অবস্থার অনুগামী হয়ে থাকে। সুতরাং এখন যদি ঘোলা রঙ্গের স্বচ্ছ রঙ্গের প্রকাশ না ঘটা সত্ত্বেও ঘোলা রংকে হায়েয বলা হয়, তাহলে ঘোলা রংটাই মূল উদ্দেশ্যে পরিণত হবে। অনুগামী নয়। অথচ প্রত্যেক বস্তুর ঘোলা অবস্থাটা তার স্বচ্ছতার অনুগামী হয়ে থাকে।

ইমাম আবূ হানীফা এবং মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল–

طرفين এর দলিল হচ্ছে হলো– হযরত আয়শা (রা.) স্বচ্ছ শুভ্রতা ছাড়া সবকিছুকে হায়েয হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। ইমাম মালিক (র.) তাঁর মু'আত্তা নামক হাদীস গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে–

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ اَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ اُمِّهٖ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ اِلٰى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ فِيْهَا الْكُرْسُفُ فِيْهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ لِيَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلٰوةِ فَتَقُوْلُ لَهُنَّ لَا تَعْجَلْنَ حَتّٰى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ ـ

হযরত আবূ আলকামার সন্তান আলকামা তাঁর মা যিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর আজাদ করা বান্দি ছিলেন তাঁর থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন মহিলাগণ হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট (হায়েযোত্তর) তাদের নামাজ সংক্রান্ত বিষয়ে জানার জন্য এমন কাপড়েরর পোটলা পাঠাতেন যার মাঝে হায়েযের হলুদ রঙের রক্ত মাখা কুরছুপ (এক প্রকার কাপড়েরর টুকরা যা স্ত্রীগণ হায়েযের সময় পরিধান করে থাকে। যার বিকল্প হচ্ছে আধুনিক যুগের নেপকিন) থাকতো। হযরত আয়েশা (রা.) তাঁদেরকে বলতেন তোমরা সাদা কিচ্ছা অর্থাৎ স্বচ্ছ শুভ্রস্রাব দেখা পর্যন্ত তাড়াহুড়া করো না।

এই হাদীসটি থেকে ও প্রমাণ হয় যে, সাদা রং ছাড়া হায়েয চলাকালের সব রঙের রক্তই হায়েযের রক্ত। আর এ কথা স্পষ্ট যে হযরত আয়েশা (রা.) এ বিষয়ে যা কিছু বলেছেন সব হুজুর ﷺ থেকে শুনেই বলেছেন।

وَفَمُ الرَّحْمِ مَنْكُوسٌ এই কথাটি বলে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর পেশ কৃত দলিলের জবাব দিয়েছেন। যার বিবরণ হচ্ছে হলো– "ঘোলা রং স্বচ্ছ রঙের পরে আসে" এই নীতি আমরা মানিনা। তবে এটা ঐ সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে যে ক্ষেত্রে পাত্রের নিচে ছিদ্র না থাকে। অবশ্য যদি পাত্রের নিচ দিক দিয়ে ছিদ্র থাকে, তাহলে প্রথমে গাদ বা ঘোলা রঙের বস্তুই বের হয়ে আসবে তার পরে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বস্তু প্রকাশ পাবে। এখানের চিত্রটাও ঠিক তাই। কারণ জরায়ুর অবস্থান হচ্ছে নিম্নমুখী। তার মুখ হচ্ছে নিচ দিক দিয়ে। হায়েযের দিন গুলো ছাড়া অন্য সময়ে জরায়ুতে মুখ বন্ধ থাকে। সুতরাং হায়েয শুরু হওয়ার প্রক্কালে যখন জরায়ু মুখ খোলে, তখন সর্বাগ্রের তলানী তথা ঘোলা রংয়ের রক্তই বের হবে। সুতরাং এই রংঙ্গের রক্তকে জরায়ু থেকে নির্গত হয় না বলাটা সঠিক নয়।

وَالْحَيْضُ يُسْقِطُ عَنِ الْحَائِضِ الصَّلٰوةَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمَ وَتَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَوَاتِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ (رضـ) كَانَتْ إِحْدَانَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَوَاتِ وَلِأَنَّ فِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ حَرَجًا لِتَضَاعُفِهَا وَلَا حَرَجَ فِي قَضَاءِ الصَّوْمِ ـ

অনুবাদ ঃ হায়েয হায়েযগ্রস্থের জিম্মা থেকে নামাজকে রহিত করে দেয় এবং রোজা রাখাকে তার ওপর হারাম করে দেয়। তবে হায়েযা মহিলাকে রোজার কাযা করতে হবে। নামাজের কাজা করতে হবে না। কারণ হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায় আমাদের কেউ যখন হায়েজ থেকে পবিত্র হতো তখন সে রোজার কাজা করতো কিন্তু নামাজের কাযা করাটা মহিলাদের জন্য অসুবিধা জনক। কেননা তা দ্বিগুণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে রোজার কাজা করার ব্যাপারে এই অসুবিধাটা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এখান থেকে হায়েযের বিধানাবলির বিবরণ শুরু হয়েছে। নিহায়া নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হায়েযের মোট কয়টা বিধান আছে। এর মধ্যে আটটি বিধান এমন যার মাঝে حيض নিফাস উভয়টা শামিল। আর বাকি চারটা এমন যা শুধু হায়েযের সাথে নির্দিষ্ট।

প্রথম আটটির একটি হচ্ছে নামাজ রহিত হওয়া, তবে কাযা করতে হবে না, আর রোজা হারাম হওয়া তবে কাযা করতে হবে। দলিল হচ্ছে হলো– হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন—

كَانَتْ إِحْدَانَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَوَاتِ ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় আমাদের কেউ যখন হায়েয থেকে পবিত্র হতো তখন সে রোজার কাযা করতো কিন্তু নামাজের কাযা করতো না।

হায়েয অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামাজ গুলোর কাজা ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে عقلى দলিল ঃ

নামাজ এমন আমল যা দায়েমী এবং বছরের প্রতিদিনই তা প্রত্যহ পাঁচবার করে ফরজ হয়, কোনো দিন তার ব্যত্যয় ঘটে না। এমতাবস্থায় হায়েজগ্রস্থ মহিলা যদি তার হায়েযের দিন গুলোর নামাজ কাজা করতে হয়, তাহলে প্রত্যেক দিন নির্ধারিত নামাজ ছাড়াও অতিরিক্ত দ্বিগুণ নামাজ আদায় করতে হবে। যা তার পক্ষে অসুবিধা জনক এবং কষ্ট সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাড়াবে। পক্ষান্তরে রোজার ব্যাপারটি তার থেকে ভিন্ন। কারণ রোজা ফরজ হয় সারা বৎসরে মাত্র একমাস। এই এক মাসের মধ্যে যে স্ত্রীলোকের যত দিন ঋতুস্রাব চলতে থাকবে, ততদিন সে রোজা রাখবেনা ঠিক, কিন্তু এ মাস চলে যাওয়ার পর বাকি এগার মাসের যে কোনো সময় সে তার রোজাগুলোর কাজা করতে গেলে তাকে ডবল রোজা রাখার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছেনা। এ কারণেই হায়েযা স্ত্রীগণের জন্য নামাজের কাজা ওয়াজিব না করে রোজার কাজা ওয়াজিব করা হয়েছে। কারণ মহান দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা বান্দীদেরকে অসুবিধায় পতিত করেন না। ইরশাদ হয়েছে— وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো অসুবিধা বা কাঠোরতা আরোপ করেননি।

—(সূরা হাজ্জ, আয়াত ৭৮)

অবশ্য যদিও কাযাকারী রোজার কাজাও ওয়াজিব হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শরিয়ত তা خلاف قياس রোজার কাজা ওয়াজিব করা হয়েছে।

وَلَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَكَذَا الْجُنُبُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) فِي إِبَاحَةِ الدُّخُولِ عَلَى وَجْهِ الْعُبُورِ وَالْمُرُورِ وَلَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ لِأَنَّ الطَّوَافَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ـ

অনুবাদ : হায়েযগ্রস্থ স্ত্রীলোক মসজিদে প্রবেশ করবে না। এমনিভাবে জুনুবী ব্যক্তিও। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমি কোনো হায়েযগ্রস্থ স্ত্রীলোক এবং জুনুবী ব্যক্তির জন্য মসজিদে প্রবেশ করাকে হালাল রাখিনা। এই হাদীসটির ব্যাপক ভাষ্য (اطلاق) ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বক্তব্যের বিরুদ্ধে দলিল যে, তিনি বলেন শুধু মাত্র পার হওয়া এবং অতিক্রম করার জন্য (উক্ত ব্যক্তিদের) মসজিদে প্রবেশ করা বৈধ এবং সে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করবে না। কারণ তওয়াফ মসজিদের অভ্যন্তরে হয়ে থাকে। আর তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "আর তারা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত তোমরা স্ত্রী সঙ্গম করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এইটি হায়েয সংক্রান্ত তৃতীয় حكم বিধানটি হচ্ছে হায়েযগ্রস্থ স্ত্রীলোকের জন্য মসজিদে প্রবেশ জায়েজ নেই। এমনিভাবে জুনুবী ব্যক্তির জন্যও মসজিদ প্রবেশ করা জায়েজ নেই। অবশ্য ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে حائضه এবং جنبى ব্যক্তি মসজিদের ওপর দিয়ে পার হয়ে যাওয়া বা পথ অতিক্রম করতে পারবে। কিন্তু তারা মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থান করতে পারবে না। তিনি দলিল দিয়েছেন পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি দ্বারা–

وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ـ

তোমরা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাজের কাছেও যেয়োনা যতক্ষণ পর্যন্ত না বুঝতে পারবে, তোমরা কি বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও গোসল করা ব্যাতীত। অবশ্য দলিল প্রদানের প্রক্রিয়াটি (وجه استدلال) হলো আয়াতে صلوة বলে مكان صلوة তথা মসজিদ বুঝানো হয়েছে। আর عابرى سبيل -এর অর্থ হলো পথ অতিক্রমকারী। এতে আয়াতের সারমর্ম এই দাড়ায় যে, জুনুবী ব্যক্তির জন্য মসজিদের নিকটে যাওয়া জায়েজ নেই কিন্তু যদি মসজিদ অতিক্রম করে সেখানে অবস্থান না করে। তাহলে তা জায়েজ আছে।

আমাদের দলিল : আমাদের দলিল হলো হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত এই হাদীসটি–

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَجِّهُوا هٰذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন এই গৃহগুলোর প্রবেশদার মসজিদের দিক থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দাও, কারণ আমি হায়েয গ্রস্থ রমণী এবং জুনুবী ব্যক্তির জন্য হালাল রাখি না।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পেশকৃত দলিলের জবাব :

আমাদের পক্ষ থেকে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পেশকরা দলিলের প্রথম জবাব হচ্ছে– মুফাসিসগণ বলেছেন উক্ত আয়াতের لا। শব্দটি لا, -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এর দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, জুনুবী ব্যক্তি মসজিদের নিকট যাবে না এবং সে পথ অতিক্রম করার জন্যও মসজিদে প্রবেশ করবে না। দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে– আয়াতে صلوة শব্দটি হাকীকতানই صلوة -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর عابرى سبيل দ্বারা মুসাফিরকে বুঝানো হচ্ছে। ফলে আয়াতের মর্ম হচ্ছে নামাজ না নেশাগ্রস্থ অবস্থায় পড়বে না জুনুবী অবস্থায় পড়বে। তবে কেউ যদি মুসাফির অবস্থায় জুনুবী হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি গোসল করার আগে তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ আদায় করতে পারবে।

وَلَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ الخ এ হচ্ছে ৪র্থ হুকুম (حكم) এতে বলা হয়েছে যে, হায়েযগ্রস্থ মহিলা বায়তুল্লাহ-এর তওয়াফ করবে না। এর দলিল হলো– তওয়াফ নামক ইবাদতটি মসজিদের অভ্যন্তরেই ঘটে থাকে। অথচ حائضه দের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ। এজন্য তওয়াফ করাও নিষেধ।

মাওলানা নাজমুদ্দীন যাহেদী (র.) বলেন, উপরোক্ত দলিলটি দুর্বল। কারণ এ দলিলের দাবি হলো হায়েজগ্রস্থ মহিলাদের জন্য তওয়াফ করা নিষেধ এই জন্য যে, তওয়াফ করতে হলে মসজিদের প্রবেশ করতে হয়। আর মসজিদে প্রবেশ করা তাদের জন্য নিষেধ। তাই এই অবস্থায় তাদের জন্য তওয়াফ করাও নিষেধ। উপরোক্ত দলিলটি থেকে আরো যা বুঝা যায়, তা হচ্ছে– হায়েযগ্রস্থ মহিলারা যদি মসজিদের বাইরে থেকে তাওয়াফ করে তা হলে জায়েজ হওয়া উচিৎ। অথচ প্রকৃত মাসআলা হলো হায়েযগ্রস্থদের জন্য তওয়াফ করাই জায়েজ নেই, চাই তা মসজিদের ভিতরে গিয়ে হোক অথবা বাইরে থেকে হোক। যদিও পবিত্র মহিলাদের জন্য মসজিদের বাইর থেকে তওয়াফ করা জায়েজ। এসব কারণে সবচেয়ে উপযুক্ত হতো যদি দলিলটি এভাবে দেওয়া হতো যে, হায়েযগ্রস্থদের জন্য তওয়াফ জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো তওয়াফ নামাজের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুজুর ﷺ বলেছেন– اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ অর্থাৎ বাইতুল্লাহর তওয়াফ করা ও সালাতের মধ্যে শামিল। তাই হায়েযসমূহের জন্য নামাজ পড়া যেহেতু নিষেধ। সেহেতু তওয়াফ করাও নিষেধ।

وَلَا يَأْتِيهَا الخ : হায়েযগ্রস্থদের পঞ্চম হুকুম হলো তাদের সাথে স্ত্রী সঙ্গম করা হারাম। দলিল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ তোমরা তাদের সাথে স্ত্রী সঙ্গম করোনা তারা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত।
—(সূরা বাকারা, আয়াত– ২২২)

যদি কোনো স্বামী হলাল মনে করে তার হায়েযগ্রস্থ স্ত্রীর সাথে রতীমিলনে লিপ্ত হয় তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। অবশ্য যদি কেউ এ অবস্থায় সঙ্গম করাকে হারাম মনে করেই তা করে, তাহলে সে কাফির হবে না ঠিক, কিন্তু ফাসিক হয়ে যাবে এবং কবীরা গুনাহ করেছে বলে বিবেচিত হবে। তার জন্য তওবা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এক বা আধা দিনার সদকা করে দিবে।

হায়েযগ্রস্থ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম না করে মিশা-মিশির মাধ্যমে মজা লাভ করা জায়েজে আছে কিনা? এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, শাফিঈ, মালিক (র.) প্রমূখ আইম্মাগণের মত হলো হাটু থেকে উপরের দিকে নাভী পর্যন্ত শরীরের এ অংশ থেকে মজা লাভা করা হারাম। আর ইমাম মুহাম্মদ এবং আহমদ (র.) বলেন, শুধুমাত্র যোনিদার বা লজ্জাস্থান ছাড়া শরীরের অন্য কোনো অংশ থেকে মজা লাভ করা হারাম নয়।

ইমাম মুহাম্মদ ও আহমদ (র.)-এর দলিল ঃ ইহুদিদের অভ্যাস ছিল যে কোনো স্ত্রীলোক যখন হায়েযগ্রস্থ হতো তখন তারা ঐ স্ত্রীদের থেকে এতটা বিচ্ছিন্ন হতো যে, এদের সাথে পানাহার পর্যন্ত করতোনা। সাহাবাগণ হুজুর ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করেন– يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى الخ লোকে আপনাকে ঋতুঃস্রাব সম্পর্ক জিজ্ঞাসা করে; বলুন তা অরুচি।–(সূরা বাক্বারা, আয়াত– ২২২)

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا النِّكَاحَ অন্য বর্ণনায় আছে اِلَّا الْجِمَاعَ অর্থাৎ শুধুমাত্র সঙ্গম ছাড়া সবই করতে পারো।

শায়খায়নের দলিল ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَمَّا يَحِلُّ لِيْ مِنِ امْرَأَتِيْ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لَكَ مَا فَوْقَ الْاِزَارِ ـ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাআদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, প্রসঙ্গ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার স্ত্রী হায়েযগ্রস্থ অবস্থায় থাকা কালে তার সাথে আমার কি কি করা হালাল এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এর উত্তরে তিনি বলেছেন مَافَوْقَ الْاِزَارِ অর্থাৎ চাদরের ওপর যা আছে।

وَلَيْسَ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَالنُّفَسَاءِ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ لِقَوْلِهِ ﷺ لَاتَقْرَأُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَهُوَحُجَّةٌ عَلٰى مَالِكٍ فِى الْحَائِضِ وَهُوَ بِاِطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ مَادُوْنَ الْاٰيَةِ فَيَكُوْنُ حُجَّةً عَلَى الطَّحَاوِىْ فِىْ اِبَاحَتِهٖ وَلَيْسَ لَهُمْ مَسُّ الْمُصْحَفِ اِلَّا بِغِلَافِهٖ وَلَا اَخْذُ دِرْهَمٍ فِيْهِ سُوْرَةٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا بِصُرَّتِهٖ وَكَذَا الْمُحْدِثُ لَايَمَسُّ الْمُصْحَفَ اِلَّابِغِلَافِهٖ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَايَمَسُّ الْقُرْاٰنَ اِلَّاطَاهِرٌ ثُمَّ الْحَدَثُ وَالْجَنَابَةُ حَلَّا الْيَدَ فَيَسْتَوِيَانِ فِىْ حُكْمِ الْمَسِّ وَالْجَنَابَةُ حَلَّتِ الْفَمَ دُوْنَ الْحَدَثِ فَيَفْتَرِقَانِ فِىْ حُكْمِ الْقِرَاءَةِ وَغِلَافُهٗ مَايَكُوْنُ مُتَجَافِيًا عَنْهُ دُوْنَ مَاهُوَ مُتَّصِلٌ بِهٖ كَالْجِلْدِ الْمُشَرَّزِ هُوَ الصَّحِيْحُ وَيُكْرَهُ مَسُّهٗ بِالْكُمِّ هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّهٗ تَابِعٌ لَهٗ بِخِلَافِ كُتُبِ الشَّرِيْعَةِ لِاَهْلِهَا حَيْثُ يُرَخَّصُ فِىْ مَسِّهَا بِالْكُمِّ لِاَنَّ فِيْهِ ضَرُوْرَةً وَلَابَأْسَ بِدَفْعِ الْمُصْحَفِ اِلَى الصِّبْيَانِ لِاَنَّ فِى الْمَنْعِ تَضْيِيْعُ حِفْظِ الْقُرْاٰنِ وَفِى الْاَمْرِ بِالتَّطْهِيْرِ حَرَجًا بِهِمْ وَهٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ ـ

অনুবাদ ঃ হায়েজ, জানাবাত এবং নিফাসগ্রস্তদের জন্য কুরআন পাঠ বৈধ নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন হায়েযগ্রস্ত ও জুনুবী ব্যক্তি কুরআনের কোনো অংশ পাঠ করবে না। এই হাদীসটি হায়েযার ব্যাপারে ইমাম মালিক (র.)-এর বিপক্ষে দলিল। আর এর ব্যাপক ভাষ্য (اطلاق) এক আয়াতের কম পরিমাণকেও শামিল করে। তাই এই পরিমাণ যে বৈধ বলে ইমাম ত্বহাবী (র.) যে মত পোষণ করেন এ হাদীসটি তার বিপক্ষেও দলিল। তাদের জন্য গিলাফ ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করা বৈধ নয় এবং যে মুদ্রায় কুরআনের কোনো সূরা লিখিত আছে তাও খুতি ছাড়া স্পর্শ করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির অজু নেই সেও গিলাফ ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না। যেহেতু হাদাছ এবং জানাবাত উভয়টা হাতে অনুপ্রবেশ করে থাকে, সেহেতু স্পর্শ করার বিধানে উভয়টাই সমান। আর জানাবাত যেহেতু মুখে অনুপ্রবেশ করে থাকে এবং হাদাছ মুখে অনুপ্রবেশ করে না সেহেতু পাঠের বিধানে দু'টোর মধ্যে পার্থক্য আছে। আর গিলাফ হচ্ছে যা কুরআন থেকে আলাদা থাকে। তা নয় যা কুরআনের সাথে জড়িত থাকে। যেমন বাঁধাই কৃত চামড়া এটাই বিশুদ্ধ মত। আস্তিন দ্বারা কুরআন শরীফ স্পর্শ করা মাকরূহ। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কারণ অস্তিন ব্যক্তির তাবে শরিয়ত সম্পর্কিত কিতাবাদির বিধান এর বিপরীত। তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য আস্তিন দ্বারা স্পর্শ করা জায়েজ আছে। কারণ তাতে প্রয়োজন আছে। অবশ্য বাচ্চাদের হাতে কুরআন তুলে দেওয়াতে কোনো দোষ নেই। কারণ যদি তাদের এ থেকে বারণ করা হয়, তাহলে কুরআন সংরক্ষণের বিষয়টি বিনষ্ট হবে। আর পবিত্রতার নির্দেশ তাদের জন্য কষ্ট কর। এটাই সহীহ অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হায়েযগ্রস্থের ষষ্ঠ হুকুম হলো তারা কুরআন শরীফ পাঠ করতে পারবে না। এমনিভাবে জুনুবী ব্যক্তিরাও। জুনুবী ব্যক্তি পুরুষ হউক বা মহিলা কারো জন্যই কুরআন শরীফ পাঠ করা জায়েজ নেই। এক আয়াত কিংবা এক আয়াতের চেয়ে কম পড়াও জায়েজ নেই। ইমাম মালিক (রা.) বলেন, হায়েযগ্রস্থ মহিলার জন্য কুরআন শরীক পাঠ করা জায়েজ আছে। ইমাম ত্বহাবী (র.) হায়েযগ্রস্থ মহিলার জন্য কুরআন শরীফের এক আয়াতের চেয়ে কম পাঠ করাকে মুবাহ বলেছেন।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল ঃ হায়েজ মহিলা মাযূর। আবার কুরআন পাঠের প্রতিও মুহ্তাজ। অথচ পবিত্রতা অর্জন অক্ষম এসব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই হায়েযা স্ত্রীগণের জন্য কুরআন পাঠ করাকে জায়েজ করা হয়েছে। অবশ্য জুনুবী ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত। কারণ যে গোসল অথবা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। তবে নিফাস যেহেতু জীবনের খুব কম সময়ে সংঘটিত হয়, তাই এক্ষেত্রে এটাকে ওজর হিসাব ধরা হয়নি এবং নিফাসগ্রস্থের জন্য কুরআন শরীফ পাঠ করাকে বৈধ করা হয়নি।

আমাদের দলিল ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ হায়েযগ্রস্থ ও জুনুবী কুরআনের কোনো অংশ পাঠ করবে না। এ হাদীসটি ইমাম মালিক (র.) এর বিপক্ষে দলিল। কারণ এটি সরাসরি হায়েয গ্রস্থের জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা না জায়েজ হওয়া অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং ইমাম মালিক (র.)-এর عقلى دليل হাদিসের বিপক্ষে দলিল হতে পারে না। অপরদিকে এ হাদীসটি যেহেতু مطلق (ব্যাপক), সেহেতু এ হাদীস কুরআনের এক আয়াত এবং তার চেয়ে কম অংশেকেও শামিল করে নেয়। ফলে ইমাম ত্বহাবী (র.)-এর উক্তিটিও এর দ্বারা নাকচ হয়ে যায়।

وَلَيْسَ لَهُمْ مَسُّ الخ : সপ্তম নম্বর বিধান হলো জুনুবী এবং নিফাস গ্রস্থের জন্য গিলাফ ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করা নাজায়েজ। আর যে মুদ্রার গায়ে কুরআনের আয়াত লিখিত আছে, তা স্পর্শ করাও নাজায়েজ যে থলের মাঝে এ ধরনের মুদ্রা আছে তা স্পর্শ করা জায়েজ আছে। এ হুকুম অজু বিহীন ব্যক্তির জন্যও। দলিল হচ্ছে হুজুর ﷺ -এর বাণী– لَا يَمَسُّ الْقُرْاٰنَ اِلَّا طَاهِرٌ অর্থাৎ শুধুমাত্র পবিত্র ব্যক্তিই কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে পারে।

হাকীম ইবনে হিযাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাকে ইয়ামান প্রেরণ করেন, তখন বলেছিলেন, তুমি শুধুমাত্র পবিত্র অবস্থা ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করবে না।

কেউ কেউ এই প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন। অপবিত্র অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করা হারাম হওয়ার বিষয়টি সরাসরি কুরআনের আয়াত لَا يَمَسُّهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ দ্বারা ও প্রমাণিত হয় তা সত্বেও গ্রন্থকার এর দ্বারা দলিল না দিয়ে হাদীস দ্বারা দলিল দিলেন কেন?

এর জবাবে বলা হয়েছে যে, কারো কারো মতে এ আয়াতে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে। এজন্য তিনি মানুষের বিধান বর্ণনার ব্যাপারে এ আয়াত দ্বারা দলিল দেননি।

হিদায়া লিখক বলেন, কুরআন শরীফ স্পর্শ করার ব্যাপারে জানাবাত এবং হাদাছ উভয়ের বিধান এক। অর্থাৎ হাদাছের কারণে যেমন কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে পারবে না, তেমনি জানাবাতের কারণেও পারে না। কিন্তু কুরআন শরীফ পাঠ করার ক্ষেত্রে এ দু'য়ের হুকুম ভিন্ন। তাই মুহদাছ হাদাছগ্রস্থের জন্য কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা জায়েজ হলেও জুনুবী ব্যক্তির জন্য তা জায়েজ নেই। এর কারণ হলো হাদাছ এবং জানাবাত উভয়ের নাপাকী ব্যক্তির হাত পর্যন্ত অনুপ্রবেশ (سرايت) করে, তাই উভয় অবস্থায় হাত দ্বারা কুরআন শরীফ স্পর্শ করা নাজায়েজ। পক্ষান্তরে হাদাছ মুখ পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করে না। এ কারণেই হাদাছগ্রস্থের জন্য কুলি করাও ওয়াজিব নয় এবং কুরআন পাঠ করাও নিষিদ্ধ নয়। হিদায়া গ্রন্থকার আরো বলেন, যে গিলাফ দ্বারা বা যে গিলাফের উপর দিয়ে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েজ আছে। তা হচ্ছে এমন গিলাফ বা অন্য কিছু যা কুরআন শরীফের সাথে স্থায়ীভাবে জড়িত হয়ে থাকে না। অর্থাৎ যা স্পর্শকারী ও কুরআন শরীফের মাঝে একটি ব্যবধানকারী হিসাবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে অনেক রকম মতামত থাকলেও বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে যে, গিলাফ বলা হয় এমন থলেকে যার মাঝে কুরআন শরীফ রাখা হয়। যাকে উর্দুতে জুযদানও (جزدان) বলে।

অজু বিহীন বাচ্চাদের হাতে কুরআন শরীফ দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ যদি এই হুকুম না দেওয়া হয়, তাহলে হয়তো তাদেরকে কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে দেওয়া হবে না, নয়তো তাদের ত্বহারাত লাভ করতে বলা হবে। প্রথম প্রস্তাবে হিফযে কুরআন বিনষ্ট হবে আর দ্বিতীয় প্রস্তাবে তাদের জন্য অসুবিধা হবে।

وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَمْ تَحِلَّ وَطْيُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ لِأَنَّ الدَّمَ يَدُرُّ تَارَةً وَيَنْقَطِعُ أُخْرَى فَلَابُدَّ مِنَ الْاِغْتِسَالِ لِيَتَرَجَّحَ جَانِبُ الْاِنْقِطَاعِ وَلَوْ لَمْ تَغْتَسِلْ وَمَضَى عَلَيْهَا أَدْنَى وَقْتِ الصَّلٰوةِ بِقَدْرِ أَنْ تَقْدِرَ عَلَى الْاِغْتِسَالِ وَالتَّحْرِيْمَةِ حَلَّ وَطْيُهَا لِأَنَّ الصَّلٰوةَ دَيْنٌ فِيْ ذِمَّتِهَا فَطَهُرَتْ حُكْمًا وَلَوْ كَانَ اِنْقَطَعَ الدَّمُ دُوْنَ عَادَتِهَا فَوْقَ الثَّلٰثِ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتّٰى تَمْضِىَ عَادَتُهَا وَاِنِ اغْتَسَلَتْ لِأَنَّ الْعَوْدَ فِى الْعَادَةِ غَالِبٌ فَكَانَ الْاِحْتِيَاطُ فِى الْاِجْتِنَابِ وَاِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ حَلَّ وَطْيُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَامَزِيْدَ لَهُ عَلَى الْعَشَرَةِ اِلَّا أَنَّهُ لَايُسْتَحَبُّ قَبْلَ الْاِغْتِسَالِ لِلنَّهْيِ فِى الْقِرَاءَةِ بِالتَّشْدِيْدِ ـ

অনুবাদ ঃ হায়েজের রক্তস্রাব যদি দশদিনের কম সময়ের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে গোসল করা পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা জায়েজ নেই। কারণ রক্ত কখনো চলতে থাকে আবার কখনো থেমে থাকে। সুতরাং থামার দিক টিকে প্রাধন্য দেওয়ার জন্য গোসল করা জরুরি। যদি সে গোসল না করে আর তার ওপর দিয়ে নামাজের এই পরিমাণ আদনা সময় অতিবাহিত হয়ে যায় যে, সে এসময়ে গোসল করে তাহরীমা বাঁধতে সক্ষম হতো তাহলে তার সাথে সহবাস করা বৈধ। আর উক্ত নামাজ তার ওপর ঋণ হিসাবে আরোপিত হয়ে গেছে। সুতরাং বিধান মোতাবেক (حكما) সে পবিত্র বলে সাব্যস্ত। যদি তিন দিনের ওপরে কিন্তু পূর্ব অভ্যাসের চেয়ে কম সময়ের মধ্যে রক্তস্রাব বন্ধ হয়, তাহলে অভ্যস্ত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বামী তার সাথে সঙ্গম করবেনা। যদিও সে গোসল করে থাকে। কারণ অভ্যস্ত সময়ে পুনরায় স্রাব শুরু হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল; সুতরাং পরিহার করার মাঝেই সতর্কতা। আর যদি দশদিন পূর্ণ হয়ে রক্ত বন্ধ হয়, গোসলের পূর্বেই তার সাথে সহবাস করা জায়েজ। কারণ হায়েজ দশদিনের অতিরিক্ত হতে পারে না। অবশ্য গোসলের পূর্বে সহবাস করাটা পছন্দনীয় নয়। তাশদীদ যুক্ত কিরাআতের পরিপ্রেক্ষিতে এ বস্তুটি নিষেজ্ঞার মাঝে শামিল হওয়ার দরুন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অষ্টম হুকুমের বিবরণ হচ্ছে যে, যদি অভ্যাস মোতাবেক কোনো মহিলার হায়েযের রক্ত দশদিনের আগে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সে গোসল করা ব্যতীত তার সাথে সহবাস করা বৈধ নয়। দলিল হলো রক্ত কখনো প্রবাহিত হয় আবার কখনো থেমে থাকে। তাই থেমে থাকা বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার দিক টিকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য গোসল করা জরুরি। যদি ঐ মহিলা রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার গোসল না করে আর এ অবস্থায় এই পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়ে যায় যে ঐ সময়ে সে গোসল করে তাহরীমা বাধতে সক্ষম হতো, তাহলে তার সাথে সহবাস করা জায়েজ। কারণ এই নামাজ তার ওপর ঋণ স্বরূপ আরোপিত হয়েছে। তাই তাকে বিধি মোতাবেক (حكما) পবিত্র সাব্যস্ত করা হবে। কেননা শরিয়ত যখন তার ওপর নামাজ ফরজ করেছে, তখন তাকে (حكما) পবিত্রও সাব্যস্ত করেছে। কারণ হায়েজগ্রস্থের জন্য নামাজ পড়া জায়েজ নয়।

وَلَوْ كَانَ اِنْقَطَعَ الدَّمُ الخ : উদাহরণত কোনো মহিলার হায়েজের অভ্যাস হচ্ছে সাত দিন কিন্তু পাঁচদিনের মাথায় এসে যদি তার রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এ অবস্থায় উক্ত মহিলা গোসল করা সত্ত্বেও ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা জায়েজ হলো, ততক্ষণ পর্যন্ত না সে তার পূর্ব অভ্যাসের সময় অতিক্রম করে। কারণ অভ্যাসের সময় থাকতে থাকতে অধিকাংশ সময়ে পুনরায় রক্তস্রাব শুরু হয়ে যায়। সুতরাং তার সহবাস না করাটাই নিরাপদ এবং সতর্কতা। আর যদি দশদিন পূর্ণ হওয়ার মাথায় রক্ত বন্ধ হয়, তাহলে গোসল করার আগেই ঐ মহিলার সাথে সহবাস করা জায়েজ আছে। কারণ হায়েজ দশদিনের চেয়ে বেশি হতে পারে না। অতএব, দশদিনের পরে আর হায়েজ থাকে না। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও গোসলের আগে সহবাস করা পছন্দনীয় নয়। তাশদীদ যুক্ত কেরাআতের নিষেধাজ্ঞার করানো। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বাণী فَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ (ط এবং ه -এর ওপর তাশদীদ যুক্ত অবস্থায়) এ কিরাআত অনুযায়ী পবিত্রতার ক্ষেত্রে প্রাবল্য অর্জনের বিষয়টি এখানে মুখ্য ও মতলুব। আর পবিত্রতার ক্ষেত্রে প্রাবল্য (مبالغه) হচ্ছে রক্ত বন্ধ হওয়ার পরও গোসল করা। এই কিরাআতটি যদিও দশদিন এবং দশদিনের কম সময়ে রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়া উভয় অবস্থায়কেই শামিল করে, কিন্তু এতটুকু ফরখ আছে যে, দশ দিনের কম সময়ে রক্ত বন্ধ হওয়া অবস্থায় স্রাব শেষে গোসল ছাড়া সহবাস করা জায়েজ নয়। আর দশদিনের মাথায় বন্ধ হওয়ার সূরতে গোসল ছাড়া সহবাস করা জায়েজ তবে গোসল করা মোস্তাহাব।

وَالطُّهْرُ إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي مُدَّةِ الْحَيْضِ فَهُوَ كَالدَّمِ الْمُتَوَالِي قَالَ (ض) هٰذِهِ إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ (رح) وَوَجْهُهُ أَنَّ إِسْتِيْعَابَ الدَّمِ مُدَّةَ الْحَيْضِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بِالْإِجْمَاعِ فَيُعْتَبَرُ أَوَّلُهُ وَاٰخِرُهُ كَالنِّصَابِ فِي بَابِ الزَّكٰوةِ وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ (رح) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَقِيْلَ هُوَ اٰخِرُ أَقْوَالِهِ أَنَّ الطُّهْرَ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَايَفْصِلُ وَهُوَ كُلُّهُ كَالدَّمِ الْمُتَوَالِيْ لِأَنَّهُ طُهْرٌ فَاسِدٌ فَيَكُوْنُ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ وَالْأَخْذُ بِهٰذَا الْقَوْلِ أَيْسَرُ وَتَمَامُهُ يُعْرَفُ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ وَأَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا هٰكَذَا نُقِلَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ وَإِنَّهُ لَايُعْرَفُ إِلَّا تَوْقِيْفًا وَلَاغَايَةَ لِأَكْثَرِهِ لِأَنَّهُ يَمْتَدُّ إِلَى سَنَةٍ وَسَنَتَيْنِ فَلَا يَتَقَدَّرُ بِتَقْدِيْرٍ إِلَّا إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ يُعْرَفُ ذٰلِكَ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ ـ

অনুবাদ ঃ হায়েজের মেয়াদ চলা কালে যদি দুই রক্তের মাঝখানে পবিত্রতা দেখা দেয়, তাহলে তা অব্যাহত রক্তস্রাব বলে গণ্য হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন (এ বিষয়ে) এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়ত সমূহের মধ্যে অন্যতম। এর কারণ হচ্ছে– সর্ব সম্মত মত অনুযায়ী হায়েযের পূর্ণ মেয়াদব্যাপী রক্তস্রাব অব্যাহত থাকা শর্ত নয়। সুতরাং মেয়াদের শুরু আর শেষটাই বিবেচ্যঃ যেমন– যাকাতের বিষয়ে নিসাবের হুকুম। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর একটি মত আছে যা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ও এক মত এবং বলা হয় এটা আবূ হানীফা (র.) এর (এ বিষয়ে) সর্বশেষ মত আর তা হচ্ছে যে, যদি পবিত্রতা পনের দিনের কম হয়, তাহলে তা ফাসিল বা ব্যাবধানকারী হবে না; বরং পূর্ণ মেয়াদ অব্যাহত স্রাব বলে গণ্য হবে। কারণ এটি হচ্ছে তুহুরে ফাসিদ। সুতরাং এটি রক্তের স্থলবর্তী হবে। এ মতটি গ্রহণ করা অধিকতর সহজ। এর পূর্ণ বিবরণ (ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কিতাবুল হায়েজ এ জানা যাবে। তুহুর এর সর্বনিম্ন মেয়াদ পনের দিন। ইব্রাহীম নখঈ থেকে এরূপই বর্ণিত আছে। আর এ বিষয়ে তাওকীফ তথা অবহিত করণ ব্যতীত জানা সম্ভব নয়। তার সর্বোচ্চ মেয়াদের সীমানা নেই। কারণ তা এক বছর দুই বছর পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। অতএব, তা কোনো মেয়াদ দ্বারা নির্ণয় কর। অবশ্য রক্তস্রাব যদি অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, (তাহলে এমন মহিলার বিষয়ে মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়।) এ বিষয়ের বিধি-বিধান কিতাবুল হায়েযে জানা যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

طُهْر (طا. কে পেশ দিয়ে) বলা হয়, দুই হায়েজের মধ্যবর্তী ব্যবধান কারী সময়কালকে। طُهْر দুই প্রকার। (১) طُهْرِ فَاسِدْ (তুহুরে ফাসিদ) (২) طُهْرِ كَامِلْ (তুহুরে কামিল)। শেষোক্ত প্রকারটি সর্বসম্মতিক্রমে ফাসিল বা ব্যাবধান কারী। তবে প্রথমোক্ত প্রকারটি (طُهْر فَاصِلْ) ফাসিল কিনা এ বিষয় খোদ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে ছয়টি মত বর্ণিত আছে। এর মধ্য থেকে হিদায়া গ্রন্থকার শুধুমাত্র দু'টি মত উল্লেখ করেছেন। প্রথমে এই দু'টি মতই উল্লেখ করা হলো।

১। طُهر نَاقِص অর্থাৎ দুই হায়েজের মধ্যবর্তী পবিত্রতা যদি পনের দিনের চেয়ে কম হয়, তাহলে তা طهر فاصل বা দুই হায়েজের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টিকারী তুহুর বলে বিবেচিত হবে না। বরং আদ্যোপান্ত পুরা সময়টিকে হায়েজ বলে গণ্য করা হবে। যেমন প্রথমবার হায়েজ শুরু হয়েছে (مبتداة) এমন কোনো মেয়ে যদি একদিন রক্ত দেখার পর মাঝখানে আটদিন পরে পুনরায় একদিন রক্ত দেখে, তাহলে এই পূর্ণ দশদিনই হায়েজ। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বর্ণনা। দলিল হচ্ছে– হায়েজের সময় অব্যাহতভাবে রক্তস্রাব চলতে হবে কারো দৃষ্টিতেই এমন কোনো শর্ত নেই। সুতরাং প্রথম (হায়েজের মেয়াদের) এবং শেষে রক্তস্রাব পাওয়া গেলেই যথেষ্ট। যেমন জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য পূর্ণ বৎসর অব্যাহতভাবে নেসাবের মালিক থাকা শর্ত নয়, বরং বৎসরের শুরু এবং শেষে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক থাকাই যথেষ্ট।

(২) সাধারণত তুহুরে নাকিস ব্যাবধানকারী (فاصل) নয়, চাই তা দশদিন থেকেও বেশি হউক না কেন। এ মতটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর । আর এটিই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সর্ব শেষ মত। এই মাতানুযায়ী হায়েজের শুরু আর শেষ উভয়টা তুহুর দ্বারা সাব্যস্ত করা সম্ভব। যেমন এক মহিলার সাধারণ অভ্যাস হলো প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত রক্তস্রাব হয়। কিন্তু কোনো একবার সে যদি অভ্যাসের আগের দিন রক্ত দেখল, এর পর দিন থেকে আবার পবিত্র থাকল, এভাবে চলতে চলতে তার অভ্যাসের দশদিন পার হয়ে এগারতম দিনে আবার রক্ত দেখল, তাহলে, তার অভ্যাস মোতাবেক দশদিনকে হায়েজ বলে গণ্য করা হবে। আর এই রক্তবিহীন দশদিনের আগেও পরের রক্ত ইস্তিহাযা (استحاضة) বলে সাব্যস্ত হবে। মুফতী এবং মুস্তাফতী অর্থাৎ ফতোয়া দাতা এবং ফতোয়া জিজ্ঞাসাকারী উভয়ের জন্য সহজার্থে এই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে।

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র.) ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, যদি রক্তস্রাব মুদ্দতে হায়েজ বা ঋতুস্রাবের নির্ধারিত আদতকালের উভয় প্রান্তকে পরিবেষ্টন করে নেয় এবং উভয় রক্ত মিলে আকাল্লে হায়েয (হায়েজের সর্ব নিম্ন সময় সীমা) পরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে এই ধরনের তুহুরও ফাসিল (فاصل) হবে না। উদাহরণত কোনো এক স্ত্রীলোক দুই দিন রক্ত দেখার পর তা বন্ধ হয়ে একটানা সাতদিন আর রক্ত দেখেনি, এর পর পুনরায় একদিন রক্ত দেখল, তাহলে উক্ত দশ দিন পুরোটাই হায়েজ বলে গণ্য হবে।

(৪) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব হলো উপরোক্ত মতামতের মধ্যে যে সমস্ত শর্ত ছিল। তার পাশাপাশি এটাই জরুরি যে, এই তুহুর উভয় পার্শ্বের রক্তের সমান হবে বা তার চেয়ে কম হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নীতিতে হুকমী (دم حكمى ও প্রকৃত রক্ত বলে গণ্য। যেমন এক মহিলা প্রথমে দু'দিন রক্ত দেখল, এরপর তিন দিন পবিত্র থাকল, পুনরায় একদিন রক্ত দেখার পর আবার তিন দিন পবিত্র থেকে শেষে আরো একদিন রক্ত দেখল। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এই দশদিনে দু'টি তুহুর সংঘটিত হয়েছে। তবে প্রথম তুহুরটি তার উভয় প্রান্তের রক্তের সমপরিমাণ হওয়ায় حكما (বিধিগতভাবে) রক্ত হয়ে গেছে। আর এখন হাকীকি এবং হুকমী উভয় রক্ত মিলে সাতদিন হয়ে গেছে। যা দ্বিতীয় তুহুরের চেয়েও বেশি। সুতরাং দ্বিতীয় তুহুরও রক্ত বলে গণ্য হবে। এভাবে এই দশদিন পুরোটাই ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুযায়ী হায়েজ বলে বিবেচিত হবে।

(৫) আবূ সুহাইল (র.)-এর মতও এটাই। তবে তার মতে دم حكمى -এর কোনো ধর্তব্য নেই। তাই তিনি বলেন, তুহুরটি দুই হাকীকি রক্তের সমান বা কম হতে হবে। সুতরাং উল্লেখিত উদাহরণের মাঝে প্রথম ছয়দিন হায়েজ বলে গণ্য হবে। বাকি চারদিন হবে না।

(৬) হাসান ইবনে যিয়াদ বলেন, তুহুর যদি তিন দিন অথবা ততোধিক হয়, তাহলেই তা ফাসিল (فاصل) হবে অন্যথায় নয়।

وَأَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ الخ : তাবিঈ হযরত ইবরাহীম নখঈ (র.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, তুহুর এর সর্ব নিম্ন মেয়াদ পনের দিন। এতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এ কথা সাহাবীর নিকট শুনে থাকবেন আর সাহাবী শুনে থাকবেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে। কারণ এটা হচ্ছে পরিমাণ গত ব্যাপার। আর শরঈ ক্ষেত্রে পরিমাণ গত ব্যাপার শুনে শুনেই জানা যায়। এখানে কিয়াসের কোনোই দখল নেই।

শায়খ আবূ মানসূর মাতুরিদী (র.) طهر -এর সর্বনিম্ন মেয়াদ পনের দিন হওয়ার ওপর দলিল দিয়েছেন এই ভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা নাবালিগা এবং বৃদ্ধাদের জন্য একমাস সময়কে তুহুর এবং হায়েজ উভয়ের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। আর মূলনীতি হলো কোনো জিনিসকে যখন দু'টি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তখন তাকে উভয়ের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে বিভক্ত করে দেওয়া হয়, এই মূলনীতি অনুযায়ী মাসের অর্ধেক সময় তুহুর আর অর্ধেক সময় হায়েজ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হায়েজ অর্ধেক মাসের চেয়ে কম হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু দলিল বিদ্যমান আছে, সেহেতু হায়েজের সর্বোচ্চ মেয়াদ অর্ধেক মাসের চেয়ে কম হলেও তুহুর এর সর্বনিম্ন মেয়াদ নীতি মোতাবেক অর্ধেক মাসই রয়ে গেছে। মাবসূত নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, তুহুর হচ্ছে ইকামতের অনুরূপ। সুতরাং ইকামতের সর্বনিম্ন মেয়াদ যেমন পনের দিন, তেমনি তুহুর-এর সর্বনিম্ন মেয়াদও পনের দিন। অনুরূপভাবে সফরের সর্বনিম্ন মেয়াদের ওপর কেয়াস করে হায়েজের সর্বনিম্ন মেয়াদও তিনদিন নিরূপণ করা হয়েছে।

طهر -এর সর্বোচ্চ মেয়াদের কোনো নির্ধারিত সীমা নেই। অতএব, যতদিন যাবৎ তুহুর দেখবে ততদিন নামাজ-রোজা চালিয়ে যেতে থাকবে। এমনি যদি এমন মহিলার সারা জীবন শুধু তুহুরই চলতে থাকে, তবু সে নামাজ রোজা চালিয়ে যাবে। কারণ কখনও কখনও তুহুরের মেয়াদ এক বৎসর দুই বৎসরও দীর্ঘ হয়ে যায়। বরং তার চেয়েও অধিক হয়ে থাকে। এজন্য طهر -এর কোনো নির্ধারিত সময় ধার্য করা যায়নি। হ্যাঁ! যদি কোনো স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় ওলামাগণের মতে তার জন্য কোনো না কোনো মেয়াদ নির্ধারণ করা হবে। যদি মহিলার রক্ত স্রাবের সূচনাই হয় অব্যাহত ভাবে। অর্থাৎ জীবনের প্রথম রক্ত শুরু হওয়ার পর আর বন্ধ না হয়, তাহলে সে বালিগাই হয়েছে ইস্তিহাজার সাথে। এ ধরনের স্ত্রীলোকের জন্য প্রত্যেক মাসের দশদিনকে হায়েজ বলে নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে তুহুর।

আর যদি প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার তিন দিন রক্ত আসার পর বন্ধ হয়ে একাধারে এক বৎসর দুই বৎসর যাবৎ আর রক্ত না আসে এবং এরপর আবার রক্ত শুরু হয়ে তা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, তাহলে প্রথম তিন দিনকে হায়েজ বলা হবে, আর রক্তবিহীন এক বৎসর বা দুই বৎসরকে বলা হবে তুহুর। সুতরাং এমন মহিলাকে যদি তার স্বামী তালাক দিয়ে দেয়। তাহলে তার ইদ্দত হবে তিন বা ছয় বৎসর এবং নয় দিন।

মুহাম্মদ ইবনে শুজা বলেন, উক্ত মহিলার তুহুর হবে উনিশদিন। কারণ প্রত্যেক মাসে হায়েজের সর্বোচ্চ মেয়াদ দশদিন, আর বাকিটা হয় তুহুর। যদি মাসের দিনকে হায়েজের জন্য ধরা হয়, তাহলে তুহুরের জন্য সন্দেহাতীতভাবে উনিশ নির্দিষ্ট থাকাটাই যুক্তিযুক্ত। আর মুহাম্মদ ইবনে সালামা বলেন, এই মহিলার তুহুর সাতাশদিন। কারণ হায়েজের সর্বানিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিন দিন। অতএব, অবশিষ্ট সাতাশ দিন তুহুরের জন্যই অবধারিত থাকবে।

মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আল মাদানী বলেন, এমন মহিলার তুহুর হবে এক ঘন্টা কম ছয় মাস। কারণ হায়েজ না আসার সর্ব নিম্ন মেয়াদ হচ্ছে ছয় মাস। অর্থাৎ হামল বা গর্ভধারণের সর্ব নিম্ন মেয়াদ হচ্ছে ছয় মাস। আর মূলনীতি হচ্ছে তুহুরের মেয়াদ হামলের মেয়াদের চেয়ে কম হয়ে থাকে। এ কারণে আমরা এক ঘন্টা কম ধরেছি। এই মতনুযায়ী উক্ত মহিলার ইদ্দত তিন ঘন্টা কম উনিশমাস হবে। এর রূপ হবে এই যে, এমন মহিলাকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া হয়েছে। তাই তার ইদ্দত হবে তিন তুহুর এবং তিন হায়েজ। আর তার এক তুহুর হচ্ছে এক ঘন্টা কম ছয় মাস এবং এক হায়েজ হচ্ছে দশদিন। সুতরাং সব মিলিয়ে তিন ঘন্টা কম উনিশ মাস হবে।

হাকিম শহীদ বলেছেন, এই মহিলার তুহুর দুইমাস। ইনায়া, কিফায়া এবং ফাতহুল কাদীর প্রভৃতি কিতাবের লিখকগণ উল্লেখ করেছেন যে, হাকীমের মতের উপরই ফতোয়া।

وَدَمُ الْاِسْتِحَاضَةِ كَالرُّعَافِ لَا يَمْنَعُ الصَّوْمَ وَلَا الصَّلٰوةَ وَلَا الْوَطْيَ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَضَّأِىْ وَصَلِّىْ وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ وَلَمَّا عُرِفَ حُكْمُ الصَّلٰوةِ ثَبَتَ حُكْمُ الصَّوْمِ وَالْوَطْيِ بِنَتِيْجَةِ الْاِجْمَاعِ وَلَوْزَادَ الدَّمُ عَلٰى عَشَرَةِ اَيَّامٍ وَلَهَا عَادَةٌ مَعْرُوْفَةٌ دُوْنَهَا رُدَّتْ اِلٰى اَيَّامِ عَادَتِهَا وَالَّذِىْ زَادَ اِسْتِحَاضَةٌ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا وَلِاَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْعَادَةِ يُجَانِسُ مَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ فَيَلْحَقُ بِهٖ وَاِنِ ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوْغِ مُسْتَحَاضَةً فَحَيْضُهَا عَشَرَةُ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْبَاقِىْ اِسْتِحَاضَةٌ لِاَنَّا عَرَفْنَاهُ حَيْضًا فَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ بِالشَّكِّ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ ঃ ইস্তিহাজার রক্তস্রাব নাক থেকে ক্ষরণ হওয়া রক্তের মতো। যা রোজা, নামাজ এবং সহবাস কোনো টাকেই বাধা দেয়না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি অজু কর এবং নামাজ আদায় কর যদিও রক্তের ফোঁটা চাটাইয়ে পড়তে থাকে। আর নামাজের বিধান যখন জানা হলো তখন ইজমাই ফয়সালার ফল শ্রুতিতে রোজা ও সহবাসের বিধানও সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর যদি রক্তস্রাব দশদিনের বেশি হয় এমন অবস্থায় যে, মহিলার জানা অভ্যাস হচ্ছে দশদিনের চেয়ে কম, তাহলে তার হায়েজকে অভ্যস্ত দিনগুলোর দিকেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর অভ্যাসের অতিরিক্তটা হবে ইস্তিহাযা। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুস্তাহাযা নারী তার হায়েজের নির্দিষ্ট দিন গুলোতে নামাজ বর্জন করবে। তাছাড়া অভ্যাসের অতিরিক্ত দিনগুলো দশের অতিরিক্ত দিনগুলোর সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ সুতরাং এগুলোর সাথেই তা যুক্ত হবে। যদি কোনো মেয়ে মুস্তাহাজা হওয়ার মধ্য দিয়েই বালেগা হয়, (বালেগা হওয়ার আলামত হিসাবে যে, রক্ত স্রাব শুরু হয়েছে, তা আর বন্ধ হয়নি) তাহলে প্রতি মাসের দশদিন তার হায়জের মধ্যে গণ্য হবে। আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে ইস্তিহাজা। কারণ তার প্রারম্ভিক রক্তস্রাবকে আমরা হায়েজ হিসাবে জেনেছি। সুতরাং সন্দেহের কারণে তা হায়েজ থেকে বহির্ভূত হবে না। আল্লাহই উত্তম জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নাকসীর তথা নাক থেকে ক্ষরণ হওয়া রক্ত যেমন রগ থেকে আসে, তেমনি ইস্তিহাজার রক্তও রগ থেকে আসে। তাই নাক্সীর-এর মতো استحاضة -এর রক্ত ও নামাজ রোজা এবং সহবাসের জন্য বাধাদায়ক নয়। এর দলিল হচ্ছে ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত এই হাদীসটি

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّىْ امْرَاَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلَا اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا اِجْتَنِبِىْ الصَّلَاةَ اَيَّامَ مَحِيْضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ وَتَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ ثُمَّ صَلِّىْ وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ ـ

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন একদা ফাতিমা বিনতে আবি হুবায়শ (নাম্নী এক মহিলা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এমন মুস্তাহাজা মহিলা যে কখনও পবিত্র হইনা, অতএব, আমি কি নামাজ বর্জন করব? (এ কথা শুনে) হুজুর ﷺ বললেন, না, বরং তুমি হায়েজের দিনগুলোতে নামাজ বর্জন কর, অতঃপর গোসল করে প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু কর এমন নামাজ পড়তে থাক, যদি রক্তের ফোঁটা চাটাইয়েও পড়তে থাকে।

হিদায়া প্রণেতা বলেন, উপরোক্ত হাদীসটি দ্বারা যখন নামাজে হুকুম প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন ইজমাঈ ফয়সালার ফলশ্রুতিতে রোজা আর সহবাসের হুকুমও প্রমাণিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ এমনিতেই রক্তস্রাব নামাজের জন্য বাধা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইস্তিহাজার রক্ত যখন নামাজের জন্য বাধা নয়, তখন রোজা আর সহবাস যেগুলোর জন্য রক্ত কোনো বাধা নয়. সে গুলোর জন্য ইস্তিহাজা অবশ্যই বাধা হবে না।

আলোচ্য মাসআলায় হানাফী ওলামাগণের সর্বসম্মত মতভিত্তিক হুকুমটিই হিদায়া কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে মুখতালাফ ফীহি বা মতবিরোধপূর্ণ হুকুমটি হিদায়া গ্রন্থকার তার কিতাবে উল্লেখ করেন নি। এখানে সর্বাগ্রে এই মুখতালাফ ফীহি হুকুমটিই আলোচনা করা হলো−

মাসআলা : রক্তস্রাব যদি পূর্ব অভ্যাসের নির্দিষ্ট দিনের চেয়ে বেশি অথচ দশ দিনের কম হয় যেমন অভ্যাস হলো পাঁচ দিন রক্ত দেখা যাওয়া, কিন্তু কোনো একবার আট দিন রক্তস্রাব অব্যাহত ছিল। এ বিষয়ে ওলামাদের মতবিরোধ রয়েছে যে, পূর্ব অভ্যাস মতো পাঁচদিনকেই হায়েজ ধরা হবে? নাকি অতিরিক্ত তিনদিনসহ আট দিন কে?

বলখী মাশাইখগণ এ মত পোষণ করেন যে, উক্ত মহিলা পূর্ব অভ্যাসের দিন অর্থাৎ পাঁচদিন অতিবাহিত করার পর তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে যেন সে গোসল করে নামাজ পড়া শুরু করে। কারণ পাঁচের অতিরিক্ত দিন গুলো হায়েজ হওয়া এবং ইস্তিহাজা হওয়ার ব্যাপারে সংশয়ের অবস্থানে রয়েছে। সুতরাং সংশয়ের দরুন নামাজ বর্জন করা বৈধ হবে না। বুখারা বাসী ওলামাগণের মতে অভ্যাসের অতিরিক্ত রক্তস্রাবের দিনগুলো যদি দশদিনের কম হয়, তাহলে অভ্যাসের দিন অতিবাহিত হওয়ার পর উক্ত মহিলাকে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হবে না। কারণ এ মহিলা হায়েজগ্রস্থ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত। আর অভ্যাসের অতিরিক্ত সময় তখনই ইস্তেহাজার অন্তর্ভুক্ত হবে, যখন তা দশদিন অতিক্রম করবে। সুতরাং যেহেতু দশদিনের পূর্বে তা ইস্তিহাজা হওয়ার কোনো দলিল নেই, তাই তাকে গোসল করে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হবে না। তবে তাদের মতে এই রক্ত যদি দশদিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে অভ্যাসের অতিরিক্ত দিনগুলোর নামাজ ও কাজা করার নির্দেশ দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় যে মাসআলাটি সর্ব সম্মত এবং যা হিদায়া কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে হলো− যদি কোনো মহিলার পূর্ব অভ্যাস থাকে দশদিনের চেয়ে কম রক্তস্রাবের, কিন্তু একবার তা বেড়ে গিয়ে দশদিন অতিক্রম করেছে। এমতাবস্থায় হুকুম হলো− পূর্ব অভ্যাসের পরিমাণ দিনে যে রক্ত এসেছে, তাকে হায়েজ ধরা হবে; আর অতিরিক্ত দিন গুলোকে বলা হবে ইস্তিহাজা। দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী− اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا অর্থাৎ মুস্তাহাযা মহিলা তার হায়েজের নিদিষ্ট দিনগুলোতে (অভ্যাস অনুযায়ী) নামাজ বর্জন করবে। অত্র হাদীসে اَيَّامَ اَقْرَائِهَا দ্বারা হায়েজের অভ্যাসগত নির্দিষ্ট দিনকে বুঝানো হয়েছে। এর দাবি হচ্ছে অভ্যস্তদিন গুলো ছাড়া অতিরিক্ত দিনে নামাজ বর্জন করবে না।

এ ব্যাপারে আকলী দলিল বা যুক্তি হলো− অভ্যাসের দিনগুলোর চেয়ে বেশি যে রক্তটা দেখা গেছে, এটা দশদিনের পরে আসা রক্তের মতোই। হানাফীগণের সর্বসম্মতিক্রমে একথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, দশদিনের অতিরিক্ত রক্তস্রাবকে ইস্তিহাজা বলেই গণ্য করা হবে।

যদি মেয়ের বালেগা হওয়ার সূচনাই হয় ইস্তিহাজার মাধ্যমে অর্থাৎ জীবনের প্রথম রক্তস্রাবই দশদিনের মধ্যে বন্ধ না হয়ে অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, তাহলে তার জন্য প্রত্যেক মাসের দশদিন হায়েজ বলে গণ্য হবে। আর অবশিষ্টগুলো হবে ইস্তিহাজা। কারণ একাধার দশদিন পর্যন্ত রক্ত এসে যদি তা বন্ধ হয়ে যেত, তাহলে পুরোটাই নিশ্চিতভাবে হায়েজই হতো। কিন্তু যখন তা দশদিনের মধ্যে না থেমে আরো অতিরিক্ত হয়ে গেছে, তখনই এই সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে, তিন দিনের চেয়ে বেশি দিনের রক্তটা হায়েজ নাকি ইস্তিহাজা? অতএব, ইয়াকীনি বা নিশ্চিত বিষয় এ ধরনের সন্দেহের কারণে দূর হয়ে যায় না। আল্লাহ উত্তম জানেন।

فَصْلٌ : وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ وَالْجُرْحُ الَّذِى لَا يَرْقَأُ يَتَوَضَّؤُونَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ فَيُصَلُّوْنَ بِذٰلِكَ فِى الْوَقْتِ مَا شَاءُوْا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) تَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ لِكُلِّ مَكْتُوْبَةٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَلِاَنَّ اِعْتِبَارَ طَهَارَتِهَا ضَرُوْرَةُ اَدَاءِ الْمَكْتُوْبَةِ فَلَا تَبْقٰى بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْاَوَّلِ لِاَنَّ اللَّامَ تُسْتَعَارُ لِلْوَقْتِ يُقَالُ اٰتِيْكَ لِصَلٰوةِ الظُّهْرِ اَىْ وَقْتَهَا وَلِاَنَّ الْوَقْتَ اُقِيْمَ مَقَامَ الْاَدَاءِ تَيْسِيْرًا فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ মুস্তাহাযা

অনুবাদ.: মুস্তাহাযা নারী, অব্যাহত মূত্রক্ষরণ ও সার্বক্ষণিক নাক থেকে রক্তক্ষরণের রোগী এবং এমন ক্ষতগ্রস্থ ব্যক্তি, যার ক্ষতস্থান থেকে নিঃসরণ থামে না, এরা সকলে প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য আলাদা অজু করবে। তারপর সে ওয়াক্তের ভিতরে ঐ অজু দ্বারা যত ইচ্ছা ফরজ ও নফল পড়বে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, মুস্তাহাযা নারী প্রত্যেক ফরজ নামাজের জন্য অজু করবে। কেনলা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ (মুস্তাহাযা মহিলা প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করবে)। তাছাড়া তার তাহারাতের গ্রহণযোগ্যতা হচ্ছে ফরজ আদায়ের প্রয়োজনে। সুতরাং ফরজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর তা বহাল থাকবে না। আমাদের দলিল হলো- নবী করীম ﷺ বলেছেন, اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ (মুস্তাহাযা নারী প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য অজু করবে)। ইমাম শাফি'ঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত প্রথম হাদীসের উদ্দেশ্যও এটাই। কেননা لام (লাম) অব্যয়কে ওয়াক্তের অর্থেও ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা হয় اٰتِيْكَ لِصَلٰوةِ الظُّهْرِ (আমি জোহরের নামাজের সময় তোমার কাছে আসব)। তা ছাড়া সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে ওয়াক্তকে আদায়ের স্থলবর্তী করা হয়েছে। সুতরাং তার উপরই বিধান আবর্তিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হায়েয যেহেতু ইস্তিহাযা ও নিফাসের তুলনায় كَثِيْرُ الْوُقُوْعِ (অধিক পাওয়া যায়) তাই হায়েযের আলোচনা সর্বাগ্রে করা হয়েছে। হায়েযের আহকামের পর ইস্তিহাযার হুকুম বয়ান করা হয়েছে। কেননা স্ত্রীলোক কখনো এ কারণে মুস্তাহাযা হয়ে যায় যে, সে হামল অবস্থায় রক্ত দেখেছে আবার কখনো এ কারণে যে রক্তক্ষরণ দশ দিনের অধিক হয়েছে বা নির্ধারিত আদতের চেয়ে অধিক দিন এসেছে। আবার কখনো এ কারণে ও মহিলা মুস্তাযা হয়ে যায় যে, তুহরের মুদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই রক্ত এসে গেছে। কিংবা নয় বছর বয়সের পূর্বেই রক্ত এসে গেছে তখন এটাও মুস্তাহাযার অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে নিফাসের মাত্র একটি সবব অর্থাৎ সন্তান প্রসব করা।

মাসআলা : মুস্তাহাযা নারী, অব্যাহত মূত্রক্ষরণ ব্যক্তি, অব্যাহত নাক থেকে সার্বক্ষণিক রক্তক্ষরণের রোগী এবং এমন ক্ষতগ্রস্ত ব্যক্তি যার ক্ষতস্থান থেকে নিঃসরণ থামে না, এ সকল মাজুরের ব্যাপারে আমাদের মাযহাব অনুসারে হুকুম এই যে, প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য আলাদা অজু করবে। তারপর সে অজু দ্বারা যত ইচ্ছা নামাজ পড়বে, সে নামাজ ফরজ, নফল, ওয়াজিব বা মানত যে নামাজই হোক না কেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর মতে প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করবে অর্থাৎ মাজুর ব্যক্তি এক অজু দ্বারা এক নামাজ আদায় করবে। একাধিক নামাজ আদায় করতে পারবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর দলিল, اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ (মুস্তাহাযা মহিলা প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করবে)। ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর উপর প্রশ্ন হয় যে, হাদীসের মধ্যে صلاة শব্দটি عام, فرض বা غير فرض -এর কোনো قيد নেই। সুতরাং শুধু فرض -এর সাথে مقيد করা কিভাবে দুরস্ত হবে? জবাব হচ্ছে হলো– لكل صلاة -এর মধ্যে صلاة শব্দটি مطلق আর কায়দা আছে اَلْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ اِلَى الْفَرْدِ الْكَامِلِ আর নামাজের فرد كامل হলো فرض নামাজ غير فرض নয়। এ জন্য صلاة দ্বারা فرض নামাজ মুরাদ নেওয়া হয়েছে, مطلق নামাজ মুরাদ নেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয় দলিল হলো– মাজুরের তাহারাতের গ্রহণযোগ্যতা হলো ফরজ আদায়ের কারণে। এ জন্য ফরজ থেকে ফারাগাতের পর তাহারাত বাকি থাকবে না।

<u>আমাদের দলিল</u> ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ (মুস্তাহাযা নারী প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য অজু করবে)। অন্য হাদীস, যা হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ وَتَوَضَّئِىْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশকে বলেছেন, প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য অজু করতে বলেছেন। উক্ত দুই হাদীসের মতলব হলো হলো– মুস্তাহাযা নারী প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য অজু করবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের জবাব এই যে, لكل صلاة -এর মধ্যে لام অব্যয়কে ওয়াক্তের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী– اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ -এর মধ্যে لام ওয়াক্তের জন্যে এসেছে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী اِنَّ لِلصَّلَاةِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا -এর মধ্যে لام ওয়াক্তের জন্যে এসেছে। অর্থাৎ নামাজের ওয়াক্তের শুরুও আছে শেষও আছে। যেমন বলা হয়, اٰتِيْكَ لِصَلٰوةِ الظُّهْرِ আমি তোমার কাছে জোহরের নামাজের সময় আসব। জবাবের হাসিল এই যে, ইমাম শাফি'ঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস مِنْ قَبِيْلَةِ النَّصِّ। আর আমাদের বর্ণিত হাদীস مِنْ قَبِيْلَةِ الْمُفَسَّرِ আর কায়দা আছে যে, نص আর مفسر -এর মধ্যে تعارض হলে مفسر প্রাধান্য পায়।

আমাদের পক্ষ থেকে আকলী দলিল হলো– সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে ওয়াক্তকে আদায়-এর স্থলবর্তী করা হয়েছে। সুতরাং ওয়াক্তের উপরই বিধান আবর্তিত হবে, আদায়ের উপর নয়। কেননা যখন একটি জিনিস অপর জিনিসের স্থলবর্তী হয়ে যায়, তখন তার দ্বারা তাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

وَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وُضُوْءُهُمْ وَاسْتَأْنَفُوا الْوُضُوْءَ لِصَلٰوةٍ أُخْرٰى وَهٰذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلٰثَةِ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) وَاسْتَأْنَفُوْا إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ فَإِنْ تَوَضَّؤُوْا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ أَجْزَأَهُمْ حَتّٰى يَذْهَبَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَزُفَرُ (رحـ) أَجْزَأَهُمْ حَتّٰى يَدْخُلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ طَهَارَةَ الْمَعْذُوْرِ تَنْتَقِضُ بِخُرُوْجِ الْوَقْتِ بِالْحَدَثِ السَّابِقِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَبِدُخُوْلِ الْوَقْتِ عِنْدَ زُفَرَ (رحـ) وَبِأَيِّهِمَا كَانَ عِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) وَفَائِدَةُ الْإِخْتِلَافِ لَاتَظْهَرُ إِلَّا فِيْمَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الزَّوَالِ كَمَا ذَكَرْنَا أَوْ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ لِزُفَرَ (رحـ) أَنَّ إِعْتِبَارَ الطَّهَارَةِ مَعَ الْمُنَافِيْ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْأَدَاءِ وَلَاحَاجَةَ قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَا تُعْتَبَرُ وَلِأَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّ الْحَاجَةَ مَقْصُوْرَةٌ عَلَى الْوَقْتِ فَلَا يُعْتَبَرُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ تَقْدِيْمِ الطَّهَارَةِ عَلَى الْوَقْتِ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الْأَدَاءِ كَمَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَخُرُوْجُ الْوَقْتِ دَلِيْلُ زَوَالِ الْحَاجَةِ فَظَهَرَ إِعْتِبَارُ الْحَدَثِ عِنْدَهُ وَالْمُرَادُ بِالْوَقْتِ وَقْتُ الْمَفْرُوْضَةِ حَتّٰى لَوْ تَوَضَّأَ الْمَعْذُوْرُ لِصَلٰوةِ الْعِيْدِ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِهٖ عِنْدَهُمَا وَهُوَ الصَّحِيْحُ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ صَلٰوةِ الضُّحٰى وَلَوْ تَوَضَّأَ مَرَّةً لِلظُّهْرِ فِيْ وَقْتِهٖ وَأُخْرٰى فِيْهِ لِلْعَصْرِ فَعِنْدَهُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ بِهٖ لِانْتِقَاضِهٖ بِخُرُوْجِ وَقْتِ الْمَفْرُوْضَةِ وَالْمُسْتَحَاضَةُ هِيَ الَّتِيْ لَايَمْضِيْ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلٰوةٍ إِلَّا وَالْحَدَثُ الَّذِيْ أُبْتُلِيَتْ بِهٖ يُوْجَدُ فِيْهِ وَكَذَا كُلُّ مَنْ هُوَ فِيْ مَعْنَاهَا وَهُوَ مَنْ ذَكَرْنَاهُ وَمَنْ بِهٖ اِسْتِطْلَاقُ بَطْنٍ وَانْفِلَاتُ رِيْحٍ لِأَنَّ الضَّرُوْرَةَ بِهٰذَا يَتَحَقَّقُ وَهِيَ تَعُمُّ الْكُلَّ.

অনুবাদ ঃ যখন ওয়াক্ত শেষ হবে, তখন তাদের অজু বাতিল হয়ে যাবে এবং অন্য নামাজের জন্য নতুন অজু করবে। এ হলো আমাদের তিন ইমামের মাযহাব। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, সময় প্রবেশ করার পর নতুন অজু করবে। সুতরাং সূর্যোদয়ের সময় যদি তারা অজু করে তাহলে জোহরের সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত এ অজু তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম যুফার (র.) বলেন, জোহরের সময় প্রবেশ করা পর্যন্ত তাদের জন্য অজু কার্যকর হবে। আলোচ্য মাসআলার সারমর্ম এই যে, ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পূর্ববর্তী হাদাস দ্বারা মাজুরের তাহারাত ভেঙ্গে যায় ওয়াক্ত শেষ হওয়ার কারণে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে দু'টোর যে কোনো একটির কারণে। উপরোক্ত ইখ্‌তিলাফের ফাঁয়দা যাহির হবে এমন মাজুরের ক্ষেত্রে যে, সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে অজু করল, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। অথবা (এমন মাজুরের ক্ষেত্রে যে,) সূর্যোদয়ের পূর্বে (অজু করেছে।) ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল এই

যে, যে জিনিস তাহারাতের বিপরীত এর সাথে তাহারাতের ই'তিবার করা হয় ফরজ আদায়ের প্রয়োজনের নিমিত্তে। আর ওয়াক্তের পূর্বে কোনো حاجت বা প্রয়োজন নেই। (এ জন্য ওয়াক্তের পূর্বে) তাহারাত গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দলিল হলো– তাহারাতের প্রয়োজন ওয়াক্তের সাথে সীমাবদ্ধ। সুতরাং ওয়াক্তের পূর্বাপর তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তরফাইন (র.)-এর দলিল হলো– তাহারাতকে ওয়াক্তের পূর্বে মুকাদ্দাম করা উচিত যাতে ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে সালাত আদায় করা সম্ভব হয়। আর ওয়াক্ত চলে যাওয়া প্রয়োজন (حاجت) মিটে যাওয়ার দলিল বহন করে। তাই ঐ সময় হাদাস معتبر হওয়া জাহির হলো। ওয়াক্ত দ্বারা وَقْتُ الْمَفْرُوْضَةِ মুরাদ। এমনকি যদি মাজুর ব্যক্তি ঈদের নামাজের জন্য অজু করে, তবে তরফাইন (র.) -এর মতে তার ঐ অজু দ্বারা জোহর পড়ার ইখতিয়ার রয়েছে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা ঈদের নামাজ চাশ্তের নামাজের সাদৃশ্য। আর যদি মাজুর ব্যক্তি জোহরের ওয়াক্তে একবার জোহরের জন্য অজু করে, দ্বিতীয় বার জোহরের ওয়াক্তে আসরের জন্য অজু করে, তবে তরফাইন (র.)-এর মতে তার এ অজু দ্বারা আসরের নামাজ পড়ার ইখতিয়ার নেই। কেননা مفروضه জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার দ্বারা অজু ভেঙ্গে গেছে। মুস্তাহাযা নারী ঐ মহিলা যার উপর ফরজ নামাজের এমন কোনো সময় অতিক্রান্ত হয় না যে, সময়ে তার মধ্যে ঐ রোগ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সর্বদা তার মধ্যে হাদাছ বিদ্যমান থাকে। একই হুকুম ঐ মাজুরের ক্ষেত্রেও যা মুস্তাহাযার সমার্থক। আর তা হলো যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি এবং সেও এর অন্তর্ভুক্ত পেটের পীড়ার কারণে যে কলেরায় আক্রান্ত এবং যার বে-ইখতিয়ারে বায়ু নিঃসরণ হয়। কেননা জরুরত এর মধ্যেও বিদ্যমান। আর উক্ত জরুরত এগুলোতেও পরিব্যাপ্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ফরজ নামাজের ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে মাজুরদের অজু বাতিল হয়ে যাবে। এখন যদি দ্বিতীয় কোনো ফরজ আদায় করতে চায় তখন তার জন্য নতুনভাবে অজু করা জরুরি। এটি আমাদের তিন ইমামের মতে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, যখন অন্য নামাজের ওয়াক্ত হবে তখন নতুনভাবে অজু করবে। যেন ইমাম যুফার (র.)-এর মতে অন্য ওয়াক্ত প্রবেশ করা অজু ভঙ্গকারী বলে গণ্য। প্রথম ওয়াক্ত চলে যাওয়া (অজু ভঙ্গকারী) নয়। সুতরাং যদি কোনো মাজুর ব্যক্তি সূর্যোদয়ের সময় অজু করে তবে তরফাইন (র.) -এর মতে তার এ অজু যথেষ্ট হবে। এমনকি জোহরের সময় চলে যাওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ এ অজু দ্বারা জোহরের ফরজ নামাজ পড়তে পারবে। কেননা এ সুরতে জোহরের ওয়াক্তের প্রবেশ তো পাওয়া গেছে কিন্তু কোনো ওয়াক্ত চলে চাওয়া পাওয়া যায়নি। অথচ তরফাইন (র.) -এর মতে ওয়াক্ত চলে যাওয়া অজু ভঙ্গকারী, ওয়াক্ত প্রবেশ করা (অজু ভঙ্গকারী) নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম যুফার (র.) বলেন, এই অজু জোহরের ওয়াক্ত প্রবেশ করা পর্যন্ত যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ জোহরের ওয়াক্ত আসার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এ অজু বাকি থাকবে। জোহরের ওয়াক্ত আসার পর যদি নামাজ পড়তে চায় তখন নতুনভাবে অজু করতে হবে।

উক্ত মাসআলার সারমর্ম এই যে, তরফাইন (র.)-এর মতে মাজুর ব্যক্তির অজু ভঙ্গকারী হলো ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া, ওয়াক্ত প্রবেশ করা নয়। ইমাম যুফার (র.) -এর মতে ওয়াক্ত প্রবেশ করা অজু ভঙ্গকারী, ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া নয়। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে ওয়াক্ত প্রবেশ করা অজু ভঙ্গকারী, ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া নয়। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে উভয়টি অজু ভঙ্গকারী, ওয়াক্ত প্রবেশ হোক বা ওয়াক্ত শেষ হোক। উভয় সুরতে মাজুরের তাহারাত চলে যাবে। উল্লেখ্য যে, প্রকৃতপক্ষে دخول وقت বা خروج وقت কোনোটিই অজু ভঙ্গকারী নয়; বরং হাদাছ হলো প্রকৃত অজু ভঙ্গকারী। কিন্তু যেহেতু ওয়াক্ত বাধাদানকারী ছিল, এ জন্য যখন ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেল তখন হাদাছের আসর যাহির হয়ে পড়ল এ জন্য রূপক অর্থে অজু ভঙ্গকে دخول وقت এবং خروج وقت -এর দিকে নিসবত করা হয়েছে। হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত মতবিরোধের ফলাফল দুই সুরতে বুঝা যাবে।

এক. কোনো মাজুর ব্যক্তি সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে অজু করল, অতঃপর জোহরের ওয়াক্ত প্রবেশ করল, অন্য কোনো ফরজ নামাজের ওয়াক্ত অতিক্রান্ত হল না। এহেন অবস্থায় ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম যুফার (র.) -এর মতে জোহরের ওয়াক্ত প্রবেশ করার দ্বারা অজু ভেঙ্গে যাবে। আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে যেহেতু কোনো ফরজ ওয়াক্তের বের হওয়া পাওয়া যায়নি, তাই অজু ভঙ্গ হবে না।

দুই. কোনো মাজুর ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে অজু করল। সুতরাং সূর্যোদয়ের পর যেহেতু خروج وقت পাওয়া গেছে তাই তরফাইন (র.) -এর মতে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতেও অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর ইমাম যুফার (র.) -এর মতানুযায়ী যেহেতু কোনো ফরজ নামাজের ওয়াক্ত প্রবেশ করেনি তাই অজু ভঙ্গ হবে না।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো– তাহারাতের বিপরীত জিনিসের সাথে তাহারাত গ্রহণযোগ্য হওয়া শুধু ফরজ আদায়ের প্রয়োজনে হয়ে থাকে। আর ওয়াক্তের পূর্বে আদায়ে ফরজ আদায়ের যেহেতু কোনো জরুরত নেই এ জন্য ওয়াক্তের পূর্বে তাহারাত গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং যখন ফরজ নামাজের ওয়াক্ত প্রবেশ করবে তখন তাহারাতের জরুরত দেখা দিবে। বুঝা গেল ওয়াক্ত প্রবেশের পূর্বে তাহারাত ভঙ্গ হয়ে যায়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো– তাহারাতের প্রয়োজন ওয়াক্তের সাথে সীমাবদ্ধ। কেননা ফরজ নামাজের ওয়াক্ত আদায়ের স্থলবর্তী। এ জন্য ওয়াক্তের পূর্বাপর তাহারাত গ্রহণযোগ্য হবে না। বুঝা গেল মাজুরের তাহারাতের জন্য دخول وقت ও خروج وقت উভয়টি অজু ভঙ্গকারী। তরফাইন (র.) -এর দলিল এই যে, তাহারাতকে ওয়াক্তের পূর্বে মুকাদ্দাম করা জরুরি, যাতে ওয়াক্ত প্রবেশ হওয়ার সাথে সাথেই নামাজ আদায় করা সম্ভব হয়। মোদ্দাকথা, ওয়াক্ত হলো আদায় (ادا،) স্থলবর্তী এবং তাহারাতকে নামাজ আদায়ের পূর্বে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। সুতরাং কিয়াসের চাহিদা তো এই ছিল আদায় -এর খলীফা অর্থাৎ ওয়াক্তের উপরও তাহারাতকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হওয়া। কিন্তু খলীফার মর্তবা আসলের মর্তবার চেয়ে কম করার জন্য খলীফার উপর তাহারাতকে মুকাদ্দাম করাকে জায়েজ করা হয়েছে। সুতরাং যখন ওয়াক্তের উপর তাহারাতকে মুকাদ্দাম করা জায়েজ হলো তখন دخول وقت অজু ভঙ্গকারী হবে না। এ জন্য যে, যদি دخول وقت -কে ভঙ্গকারী মেনে নেওয়া হয় তখন তাহারাতকে ওয়াক্ত -এর পূর্বে মুকাদ্দাম করা সম্ভব হয় না। আর خروج وقت যেহেতু প্রয়োজন মিটে যাওয়ার দলিল, তাই ঐ সময়ের মধ্যে পূর্বের হাদাসের গ্রহণযোগ্য হওয়া বুঝা গেল। সুতরাং خروج وقت -এর সাথে সাথেই অজু ভেঙ্গে যাবে।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, যে ওয়াক্তের প্রবেশ এবং শেষ হওয়ার ই'তিবার করা হয়, সে ওয়াক্ত দ্বারা ফরজ নামাজের ওয়াক্ত মুরাদ, নাওয়াফিল বা ওয়াজিবাতের ওয়াক্ত মুরাদ নয়। এমনকি যদি মাজুর ব্যক্তি ঈদের নামাজের জন্য অজু করে তবে তরফাইন (র.) -এর মতে তার এ অজু দ্বারা জোহর নামাজ পড়ার অনুমতি রয়েছে। আর এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা ঈদের নামাজ-চাশ্তের নামাজ সাদৃশ্য। অর্থাৎ ফরজ না হওয়ার দিক থেকে ঈদ ও চাশ্তের নামাজ একই পর্যায়ের; যদিও ঈদের নামাজ ওয়াজিব। সুতরাং مفروضه ওয়াক্ত শেষ না হওয়ার কারণে তার অজু ভঙ্গ হবে না। এজন্য তাকে এ অজু দ্বারা জোহরের নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কোনো কোনো ফকীহ্র মতে এ অজু দ্বারা তার জোহরের নামাজ পড়ার অনুমতি নেই। কেননা صلاة واجبه -এর ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেছে। কেননা ঈদের নামাজ ওয়াজিব। আর ওয়াজিব হলো ফরজের পর্যায়ের। যদি মাজুর ব্যক্তি একবার জোহরের সময় জোহরের জন্য অজু করে অতঃপর দ্বিতীয়বার জোহরের সময় আসরের নামাজের জন্য অজু করে, তবে তরফাইন (র.) -এর মতে তার এ ইখ্তিয়ার নেই যে, উক্ত অজু দ্বারা আসরের নামাজ আদায় করা। কেননা ফরজ নামাজ অর্থাৎ জোহরের সময় শেষ হয়ে যাবার কারণে অজু ভঙ্গ হয়ে গেছে। এ হুকুম সকল ইমামের মতে। কেননা এ সুরতে خروج وقت -এর সাথে دخول وقت عصر ও পাওয়া গেছে। এর কারণ হলো– জোহর ও আসরের ওয়াক্তের মাঝখানে কোনো وقت مهمل নেই বরং জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে আসরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়ে যায়।

اَلْمُسْتَحَاضَةُ هِيَ الَّتِيْ الخ দ্বারা মুস্তাহাযা নারীর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেন, মুস্তাহাযা নারী ঐ মহিলা যার উপর ফরজ নামাজের এমন কোনো সময় অতিক্রান্ত হয় না, যে সময়ে তার মধ্যে ঐ রোগ পাওয়া যায় না। একই হুকুম ঐ সকল মাজুরের ক্ষেত্রেও যা মুস্তাহাযার অনুরূপ যেমন এমন ব্যক্তি যার অব্যাহত গতিতে পেশাব নিঃসরিত হয় এবং যার নাকের রক্ত এবং যার ক্ষত স্থান থেকে নিঃসরণ থামে না এবং সেও মাজুর যার পেটের অসুখ এবং বে-ইখতিয়ার বায়ু নির্গত হওয়ার রোগ আছে। কেননা এ সকল ওজরেও জরুরত বিদ্যমান এবং জরুরত এ সব অবস্থার সবগুলোতে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং তারা সকলেই মাজুরের অন্তর্ভুক্ত।

فَصْلٌ فِي النِّفَاسِ : وَالنِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِيْبَ الْوِلَادَةِ لِأَنَّهُ مَاخُوْذٌ مِنْ تَنَفُّسِ الرَّحْمِ بِالدَّمِ اَوْ مِنْ خُرُوْجِ النَّفْسِ بِمَعْنَى الْوَلَدِ اَوْ بِمَعْنَى الدَّمِ وَالدَّمُ الَّذِيْ تَرَاهُ الْحَامِلُ اِبْتِدَاءً اَوْ حَالَ وِلَادَتِهَا قَبْلَ خُرُوْجِ الْوَلَدِ اِسْتِحَاضَةٌ وَاِنْ كَانَ مُمْتَدًّا وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) حَيْضٌ اِعْتِبَارًا بِالنِّفَاسِ اِذْ هُمَا جَمِيْعًا مِنَ الرَّحْمِ وَلَنَا اَنَّ بِالْحَبْلِ يَنْسَدُّ فَمُ الرَّحْمِ كَذَا الْعَادَةُ وَالنِّفَاسُ بَعْدَ اِنْفِتَاحِهِ بِخُرُوْجِ الْوَلَدِ وَلِهٰذَا كَانَ نِفَاسًا بَعْدَ خُرُوْجِ بَعْضِ الْوَلَدِ فِيْمَا يُرْوٰى عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) لِاَنَّهُ يَنْفَتِحُ فَيَتَنَفَّسُ بِهِ وَالسِّقْطُ الَّذِيْ اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ وَلَدٌ حَتّٰى تَصِيْرَ بِهِ نُفَسَاءَ وَتَصِيْرُ الْاَمَةُ اُمَّ وَلَدٍ بِهِ وَكَذَا الْعِدَّةُ تَنْقَضِيْ بِهِ وَاَقَلُّ النِّفَاسِ لَا حَدَّ لَهُ لِاَنَّ تَقَدُّمَ الْوَلَدِ عَلَمُ الْخُرُوْجِ مِنَ الرَّحْمِ فَاَغْنٰى عَنْ اِمْتِدَادٍ جُعِلَ عَلَمًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْحَيْضِ وَاَكْثَرُهُ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ اِسْتِحَاضَةٌ لِحَدِيْثِ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) فِيْ اِعْتِبَارِ السِّتِّيْنَ وَلَوْ جَاوَزَ الدَّمُ الْاَرْبَعِيْنَ وَكَانَتْ وَلَدَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ وَلَهَا عَادَةٌ فِي النِّفَاسِ رُدَّتْ اِلٰى اَيَّامِ عَادَتِهَا لِمَا بَيَّنَّا فِي الْحَيْضِ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ عَادَةٌ فَابْتِدَاءُ نِفَاسِهَا اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا لِاَنَّهُ اَمْكَنَ جَعْلُهُ نِفَاسًا ـ

অনুচ্ছেদ ঃ নিফাস

অনুবাদ ঃ নিফাস ঐ রক্তকে বলা হয় যা বাচ্চা প্রসবের পর বের হয়। কেননা نفاس শব্দটি تَنَفُّسُ الرَّحْمِ بِالدَّمِ (লজ্জাস্থান রক্ত বের করেছে) থেকে নির্গত। অথবা نفاس শব্দটি خروج النفس - بسكون الفاء থেকে নির্গত। نفس সন্তানের অর্থে হোক বা রক্তের অর্থের হোক। আর যে রক্ত হামেলা স্ত্রীলোক দেখে তা শুরুতে হোক বা প্রসব অবস্থায় বাচ্চা বের হওয়ার পূর্বে হোক, তা ইস্তিহাযা। যদিও এ রক্ত হায়েযের মুদ্দতে পৌঁছে যায়। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তা হায়েয, নিফাসের উপর কিয়াস করে। কেননা উভয়টি রেহেম থেকে বের হয়েছে। আমাদের দলিল এই যে, হামলের কারণে রেহেমের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। আর এটাই স্বাভাবিক। বাচ্চা বের হওয়ার সাথে রেহেমের মুখ খোলার পর (যে) রক্ত (আসে) তা হলো নিফাস। এ কারণে বাচ্চা অংশ বিশেষ বের হওয়ার পর (যে) রক্ত (আসে) তা নিফাস। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর রিওয়ায়াত (যা তাঁদের থেকে বর্ণিত)। কেননা রেহেমের মুখ খুলে যায় এজন্যই তা নিফাস হবে। অসম্পূর্ণ বাচ্চা যার কিয়দংশ বের হয় তাও সন্তান এমনকি তার কারণে স্ত্রীলোক نفساء হয়ে যাবে এবং দাসী তার কারণে উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। এমনিভাবে তার

কারণেই হামেলা স্ত্রীলোকের ইদ্দত সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। নিফাসের সর্বনিম্ন মুদ্দতের কোনো সীমা নেই। কেননা বাচ্চা বের হওয়া– আলামত হলো (রক্ত) রেহেম থেকে বের হওয়ার। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এমন দীর্ঘ কোনো সময়ের প্রয়োজন নেই, যাকে এ বিষয়ের উপর আলামত সাব্যস্ত করা হবে। পক্ষান্তরে হায়েযের বিষয়টি এর থেকে ভিন্নতর নিফাসের সর্বোচ্চ মুদ্দত চল্লিশ দিন। এর চেয়ে যা বেশি হয় তা ইস্তিহাযা। কেননা উম্মে সালামা বর্ণিত হাদীস: রাসূলুল্লাহ ﷺ নিফাসওয়ালী নারীর জন্য চল্লিশ দিন সময় নির্ধারণ করেছেন। আর এ হাদীস ইমাম শাফিঈ (র.) -এর বিপরীত দলিল, ষাট দিনকে গ্রহণ করার ব্যাপারে। যদি রক্ত চল্লিশ অতিক্রম করে, অথচ এ মহিলা পূর্বেও বাচ্চা প্রসব করেছে এবং নিফাসের ক্ষেত্রে তার আদতও রয়েছে, তখন সে তার আদতের দিনগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, ঐ দলিলের ভিত্তিতে যা আমরা হায়েযের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। আর যদি ঐ মহিলার নির্দিষ্ট কোনো আদত না থাকে তবে তার নিফাসের শুরু চল্লিশ দিন হবে। কেননা চল্লিশ পর্যন্ত নিফাসের মুদ্দত নির্ধারণ করা সম্ভব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

نفاس শব্দের نون কে فتحة অথবা كسرة -এর সাথে জায়েজ যায়। স্ত্রীলোকদের সাথে সম্পর্কিত রক্ত তিন ধরনের– (১) হায়েয (২) ইস্তিহাযা (৩) নিফাস। গ্রন্থকার হায়েয ও নিফাসের আলোচনা থেকে ফারিগ হওয়ার পর এ পরিচ্ছেদে তৃতীয় প্রকারের রক্ত তথা নিফাসের আলোচনা করছেন। نفاس শব্দটি نفست المرأة -এর مصدر আবার نفاس কখনো نفساء শব্দের বহুবচনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ফকীহদের পরিভাষায় নিফাস ঐ রক্তকে বলা হয় যা প্রসবের পর বের হয়। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) লিখেছেন, কুদূরীর ইবারত দ্বারা বুঝা যায় স্ত্রীলোকের যদি বাচ্চা প্রসবের পর রক্ত না দেখে তবে তা নিফাস হবে না এবং তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না। এটাই সাহেবাইন থেকে বর্ণিত। তবে ইমাম আযম (র.) বলেন, তার উপর সতর্কতা বশতঃ গোসল ওয়াজিব হবে। কেননা হতে পারে অল্প রক্ত বের হয়েছে কিন্তু তার দৃষ্টিতে পড়েনি। উল্লেখ্য যে, গোসল ওয়াজিব হওয়ার সম্পর্ক রক্ত বের হওয়ার সাথে, রক্ত দেখার সাথে নয়। আল্লামা আইনী লিখেছেন, এটাই ইমাম মালেক ও ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে বিশুদ্ধ।

وَالدَّمُ الَّذِيْ تَرَاهُ الْحَامِلُ الخ : হামেলা স্ত্রী লোক যদি হামল অবস্থায় বা বাচ্চা প্রসবের পূর্বে রক্ত দেখে, তবে এ রক্ত আমাদের মতে ইস্তিহাযা হিসাবে পরিগণিত হবে। যদিও এ রক্ত হায়েযের মুদ্দত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, এ রক্ত হায়েয হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো– কিয়াস ভিত্তিক। অর্থাৎ কোনো স্ত্রীলোক যদি এক উদরে দুই বাচ্চা বহন করে অতঃপর সে দ্বিতীয় বাচ্চা প্রসবের পূর্বে রক্ত দেখে তবে এ স্ত্রীলোক দ্বিতীয় বাচ্চার ক্ষেত্রে হামেলা হিসাবে গণ্য হবে। শায়খাইন (র.)-এর মতে এ রক্ত ইস্তিহাযা। সুতরাং যেমনিভাবে এ রক্ত হামল অবস্থায় ইস্তিহাযা ছিল এমনিভাবে এখানে হামল অবস্থায় যে রক্ত বের হয়েছে তাও ইস্তিহাযা হবে। তাঁদের দলিল এই যে, হায়েয হলো রেহেমের রক্ত। আর রেহেমের রক্ত হামেলা স্ত্রীলোক থেকে সম্ভব নয়। কেননা عادت الله হলো হামলের কারণে রেহেমের মুখ বন্ধ হয়ে যায় যাতে রেহেমের কোনো জিনিস বাইরে বের না হয়। সুতরাং যখন হামেলা অবস্থায় রেহেমের মুখ বন্ধ থাকে তখন হামল অবস্থায় যে রক্ত বের হবে তা রেহেম ব্যতীত অন্য কোনো স্থান থেকে হবে। আর রেহেম ব্যতীত অন্য কোনো স্থান থেকে যে রক্ত বের হয় তা হলো ইস্তিহাযার রক্ত। এ জন্য এ রক্ত ইস্তিহাযার রক্ত হবে। এ রক্তকে নিফাসের উপর কিয়াস করা ঠিক হবে না। কেননা বাচ্চা প্রসব হওয়ার কারণে রেহেমের মুখ খুলে গেছে। আর রেহেমের মুখ খোলার পর যে রক্ত বের হয় তা অবশ্যই নিফাস হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং প্রথম বাচ্চা প্রসবের পর এবং দ্বিতীয় বাচ্চা প্রসবের পূর্বে যে রক্ত দেখা যায় তা নিফাসের রক্ত হবে। এ কারণে যদি বাচ্চার অধিকাংশ বের হওয়ার কারণে রক্ত বের হয় তবে তরফাইন (র.) -এর বর্ণনা মতে এটা নিফাসের রক্ত হবে। কেননা বাচ্চা অধিকাংশ বের হওয়ার কারণে রেহেমের মুখ খুলে নিফাসের রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে।.

وَالسِّقْطُ الَّذِيْ اسْتَبَانَ بَعْضُ الخ : যদি অসম্পূর্ণ বাচ্চার কিছু অংশ বের হয়ে যায়, যেমন– আঙ্গুল, নখ, কিংবা চুল ইত্যাদি, তবে এ বাচ্চা পূর্ণ বাচ্চার হুকুমে হবে। অর্থাৎ স্ত্রীলোক তার কারণে নিফাস ওয়ালী বালেগ গণ্য হবে। যদি কোনো দাসীর এমনটি হয় তবে সে উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। আর যদি তালাকপ্রাপ্ত নারী হয় তবে এর কারণে তার ইদ্দত সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা হামেলা স্ত্রীলোকের ইদ্দত হলো وضع حمل তথা বাচ্চা প্রসব করা। আর যদি শুধু গোশ্তের খণ্ড বিশেষ হয়

এবং তার কোনো আকৃতি যা বাহির না হয় তবে এ স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে নিফাসের হুকুম দেওয়া হবে না। অতঃপর সে যদি রক্ত দেখে এবং এ রক্তকে হায়েয বলাও সম্ভব অর্থাৎ তার মুদ্দত হায়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ পর্যন্ত পৌঁছে তবে তাকে হায়েয হিসাবে ধরা হবে। আর যদি হায়েয বলা সম্ভব না হয় তবে ইস্‌তিহাযা হবে।

وَاَقَلُّ النِّفَاسِ لَاحَدَّ لَهُ الخ আমাদের আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নিফাসের সর্বনিম্ন মুদ্দতের কোনো সীমা নেই। সুতরাং যদি কোনো স্ত্রীলোক বাচ্চা প্রসব করে অতঃপর অল্পক্ষণ রক্ত এসে বন্ধ হয়ে যায়, তবে এ স্ত্রীলোক পাক হয়ে যাবে। সুতরাং এখন নামাজও পড়তে পারবে এবং রোজাও রাখতে পারবে। তবে আমাদের ওলামাদের মাঝে এ সুরতে মতবিরোধ রয়েছে যে, যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে اِذَا وَلَدْتِ فَاَنْتِ طَالِقٌ (তুমি বাচ্চা প্রসব করলে তালাক)। অতঃপর স্ত্রী বলল, আমার ইদ্দত সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর তিন হায়েযের সাথে নিফাসের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করার ব্যাপারে ইখ্‌তিলাফ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে নিফাসের সর্বনিম্ন মুদ্দত পচিশ দিন ধর্তব্য হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে এগার দিন ধর্তব্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে এক ঘণ্টা ধর্তব্য হবে। মোদ্দাকথা এই যে, নামাজ ও রোজার ক্ষেত্রে নিফাসের সর্বনিম্ন কোনো পরিমাণ নেই। তবে ইদ্দত সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে নিফাসের সর্বনিম্ন পরিমাণের ই'তিবার করা হবে, যার বর্ণনা পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

নিফাসের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারিত না থাকার উপর দলিল এই যে, বাচ্চা প্রসব করা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, এ রক্ত রেহেম থেকে এসেছে। আর বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর যে রক্ত রেহেম থেকে আসে তাকে নিফাস বলা হয়। সুতরাং এখন আর কোনো প্রলম্ব আলামতের প্রয়োজন নেই। এর বিপরীত হলো হায়েয। তার মধ্যে একেবারে কম সময় তিন দিন হওয়া শর্ত। যাতে এ রক্ত রেহেম থেকে বের হওয়াটা বুঝে আসে। কেননা এর হায়েয হওয়ার উপর এছাড়া আর কোনো আলামত নেই।

নিফাসের সর্বোচ্চ মুদ্দতের ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। আমাদের মতে চল্লিশ দিন, ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে ষাট দিন, ইমাম শাফি'ঈ (র.) ইমাম আওযায়ী (র.)-এর বক্তব্য দ্বারা দলিল পেশ করেন। [ইমাম আওযা'ঈ (র.)] বলেন, আমাদের জমানায় মহিলারা দু'মাস নিফাসের রক্ত দেখতো। রবী'আতুর রায় থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি লোকদেরকে একথা বলতে শুনেছি যে, মহিলাদের বেশির চেয়ে বেশি ষাট দিন নিফাসের রক্ত আসতো। আমাদের দলিল উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর হাদীস– اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে উক্ত হাদীস এভাবে বর্ণিত আছে যে, قَالَتْ كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا উম্মে সালামা (রা.) বলেন, নিফাসওয়ালী মহিলারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত বসে থাকতো। আমাদের মাযহাবের সমর্থন উম্মে সালামা ব্যতীত ইবনে ওমর, আয়েশা, উম্মে হাবীবা এবং আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস দ্বারাও পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, সাহাবায়ে কেরাম এ সকল রিওয়ায়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেই করেছেন। সুতরাং উক্ত হাদীস ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বিপরীত দলিল হবে। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মাযহাব না হাদীস দ্বারা সাবিত না সাহাবীর কাউল দ্বারা সাবিত বরং কতিপয় তাবিঈনে কিরামের কাউল দ্বারা সাবিত।

যুক্তির কথা হলো এই যে, এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, নিফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা হায়েযের সর্বোচ্চ সময় সীমার চারগুণ বেশি হয়। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আমাদের মতে হায়েযের অধিক মুদ্দত দশ দিন তাঁর নিফাসের অধিক মুদ্দত তাঁর গুণ অর্থাৎ চল্লিশ দিন হবে। আর যেহেতু ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে হায়েযের অধিক মুদ্দত পনের দিন তাই নিফাসের অধিক সময় তার চার গুণ তথা ষাট দিন হবে।

وَلَوْ جَاوَزَ الدَّمُ الْاَرْبَعِيْنَ : যদি কোনো মহিলার প্রসবের পর চল্লিশ দিনের চেয়ে অধিক রক্ত আসে, তাহলে দেখতে হবে এ মহিলার নিফাসের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট আদত রয়েছে কিনা? যদি নির্দিষ্ট আদত থাকে তবে আদত অনুযায়ী নিফাসের মুদ্দত নির্ধারিত হবে, বাকি ইস্‌তিহাযা হবে। আর যদি তার কোনো নির্ধারিত আদত না থাকে তবে এ সুরতে চল্লিশ দিন নিফাসের মুদ্দত হবে, বাকি দিনগুলো ইস্‌তিহাযা হবে। কেননা চল্লিশ দিন পর্যন্ত নিফাসের মুদ্দত নির্ধারিত করা সম্ভবও বটে। এর চেয়ে কম সন্দেহযুক্ত। এ জন্য নিফাসের মুদ্দত চল্লিশ দিন হবে।

فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِيْ بَطْنٍ وَاحِدٍ فَنِفَاسُهَا مِنَ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَأَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) مِنَ الْوَلَدِ الْأَخِيْرِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ (رحـ) لِأَنَّهَا حَامِلٌ بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ فَلَا تَصِيْرُ نُفَسَاءَ كَمَا أَنَّهَا لَاتَحِيْضُ وَلِهٰذَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالْأَخِيْرِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَهُمَا أَنَّ الْحَامِلَ إِنَّمَا لَاتَحِيْضُ لِانْسِدَادِ فَمِ الرَّحِمِ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا وَقَدْ اِنْفَتَحَ بِخُرُوْجِ الْأَوَّلِ وَتَنَفَّسَ بِالدَّمِ فَكَانَ نِفَاسًا وَالْعِدَّةُ تَعَلَّقَتْ بِوَضْعِ حَمْلٍ مُضَافٍ إِلَيْهَا فَيَتَنَاوَلُ الْجَمِيْعَ ـ

অনুবাদ : যদি মহিলার এক পেট থেকে দু-বাচ্চা প্রসব হয়, তবে তার নিফাস শায়খাইন (র.) -এর মতে প্রথম বাচ্চা থেকে শুরু হবে, যদিও উভয় বাচ্চার মাঝে চল্লিশ দিনের ব্যবধান হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দ্বিতীয় বাচ্চা থেকে নিফাসের শুরু হবে। আর এটাই ইমাম যুফার (র.)-এর মত। কেননা প্রথম বাচ্চা প্রসবের পর সে হামেলা। এ জন্য নিফাসওয়ালী হবে না, যেমন হায়েযা নয়। এ কারণেই মহিলার ইদ্দত সর্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় বাচ্চা প্রসবের পর পূর্ণ হবে। শায়খাইন (র.) -এর দলিল এই যে, হামেলা মহিলার রেহেমের মুখ বন্ধ হয়ে যাবার কারণে হায়েয আসে না, যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। আর এখানে প্রথম বাচ্চা প্রসব হওয়ার কারণে রেহেমের মুখ খুলে গেছে এবং তা রক্ত বের করে দিয়েছে। এ জন্য তা অবশ্যই নিফাস হবে। আর ইদ্দতের সম্পর্ক এমন বাচ্চা প্রসবের সাথে যা মহিলার দিকে مضاف হয়। সুতরাং তা সবকে শামিল করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো মহিলা এক পেট থেকে দু'বাচ্চা প্রসব করে তবে শায়খাইন (র.)-এর মতে নিফাসের শুরু প্রথম বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর থেকে হবে, যদিও উভয় বাচ্চার মাঝখানে চল্লিশ দিনের ব্যবধান হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দ্বিতীয় বাচ্চা থেকে নিফাসের শুরু হবে। এটাই ইমাম যুফার (র.) -এর অভিমত। "এক পেট থেকে"-এর দ্বারা মুরাদ হলো উভয় বাচ্চার প্রসবের মাঝখানে ছয় মাসের কম ব্যবধান হওয়া। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো– প্রথম বাচ্চা প্রসবের পরও এ মহিলা হামেলা থাকে। আর হামেলা মহিলার যেমনিভাবে হায়েয আসে না এমনিভাবে দু' নিফাসও হয় না। এ কারণেই মহিলা যদি তালাকপ্রাপ্ত হয় তবে তার ইদ্দত সর্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় বাচ্চার প্রসব দ্বারা সম্পূর্ণ হবে। সুতরাং এটা থেকেই নিফাসও শুরু হবে। শায়খাইন (র.) -এর দলিল হলো– হামেলা মহিলার এ কারণে রক্ত আসে না যে তার রেহেমের মুখ বন্ধ থাকে। কিন্তু যখন বাচ্চার প্রসব দ্বারা রেহেমের মুখ খুলে যায় এবং সে খুন টপকাতে থাকে তবে তো অবশ্যই এটা নিফাসের রক্ত হবে। কেননা প্রসবের পর রেহেমের থেকে বের হওয়া রক্তকেই নিফাস বলা হয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কিয়াসের জবাব এই যে, ইদ্দত সম্পূর্ণ হওয়া এমন হামলের وضع -এর সাথে যুক্ত যার সম্পর্ক হলো মহিলার সাথে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ আর হামল বলা হয় كل ما في البطن -কে, অর্থাৎ যাই পেটে থাকে একেই হামল বলা হয়। সুতরাং প্রথম বাচ্চার প্রসব দ্বারা পুরা হামল وضع হয় না; বরং কিছু হামল وضع হয়। আর হামেলার ইদ্দত সম্পূর্ণ হয় পূর্ণ وضع حمل দ্বারা। এ জন্য ইদ্দত পূর্ণ হবে দ্বিতীয় বাচ্চা প্রসব দ্বারা, প্রথম বাচ্চা দ্বারা নয়।

بَابُ الْاَنْجَاسِ وَتَطْهِيْرِهَا

تَطْهِيْرُ النَّجَاسَةِ وَاجِبٌ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّىْ وَثَوْبِهٖ وَالْمَكَانِ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْهِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُتِّيْهِ ثُمَّ اقْرُصِيْهِ ثُمَّ اغْسِلِيْهِ بِالْمَاءِ وَلَايَضُرُّكِ اَثَرُهٗ وَاِذَا وَجَبَ التَّطْهِيْرُ فِى الثَّوْبِ وَجَبَ فِى الْبَدَنِ وَالْمَكَانِ لِاَنَّ الْاِسْتِعْمَالَ فِىْ حَالَةِ الصَّلٰوةِ يَشْمَلُ الْكُلَّ وَيَجُوْزُ تَطْهِيْرُهَا بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ اِزَالَتُهَا بِهٖ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ مِمَّا اِذَا عُصِرَ اِنْعَصَرَ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَالشَّافِعِىُّ (رحـ) لَايَجُوْزُ اِلَّا بِالْمَاءِ لِاَنَّهٗ يَتَنَجَّسُ بِاَوَّلِ الْمُلَاقَاتِ وَالنَّجَسُ لَايُفِيْدُ الطَّهَارَةَ اِلَّا اَنَّ هٰذَا الْقِيَاسَ تُرِكَ فِى الْمَاءِ لِلضَّرُوْرَةِ وَلَهُمَا اَنَّ الْمَائِعَ قَالِعٌ وَالطَّهُوْرِيَّةُ بِعِلَّةِ الْقَلْعِ وَالْاِزَالَةِ وَالنَّجَاسَةُ لِلْمُجَاوَرَةِ فَاِذَا انْتَهَتْ اَجْزَاءُ النَّجَسِ يَبْقٰى طَاهِرًا وَجَوَابُ الْكِتَابِ لَايُفَرِّقُ بَيْنَ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَهٰذَا قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَعَنْهُ اَنَّهٗ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يَجُوْزْ فِى الْبَدَنِ بِغَيْرِ الْمَاءِ ـ

বিভিন্ন নাজাসাত ও তা থেকে পবিত্রতা অর্জন

অনুবাদ : মুসল্লির শরীর, তার কাপড় এবং নামাজ আদায়ের স্থান নাজাসাত থেকে পবিত্র করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– তোমার বস্ত্রাদি পবিত্র করো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– প্রথমে তা চেছে নাও। তারপর রগড়িয়ে নাও, তারপর পানি দ্বারা তা ধুয়ে নাও তার দাগ থেকে গেলে তোমার ক্ষতি হবে না। কাপড়ের ক্ষেত্রে যখন পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব, তখন শরীর ও স্থানের ক্ষেত্রেও তা ওয়াজিব হবে। কেননা নামাজের অবস্থায় সবগুলো ব্যবহারে আসছে। নাজাসাত থেকে পবিত্রতা অর্জন জায়েজ হবে পানি দ্বারা এবং এমন সকল তরল পদার্থ দ্বারা, যার মাধ্যমে নাজাসাত দূর করা সম্ভব। যেমন– সিরকা, গোলাপ জল ইত্যাদি এবং যা নিংড়ালে নিংড়ে পড়ে। (তা দ্বারা) এটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ, যুফার ও শাফিঈ (র.) বলেন, পানি ছাড়া জায়েজ হবে না। কেননা প্রথম স্পর্শেই তা নাপাক হয়ে যায়। আর নাপাক জিনিসে পবিত্রতা অর্জন হলো না। তবে পানির ক্ষেত্রে প্রয়োজনবশত এই কিয়াস পরিহার করা হয়েছে। শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো– তরল পদার্থ (নাজাসাত) বিদূরণকারী। আর বিদূরণ ও পরিস্কারণের কারণেই তাহারাত অর্জিত হয়। আর মিশ্রিত হওয়ার কারণে নাপাকীর হুকুম আসে। সুতরাং নাজাসাতের হুকুমগুলো যখন খতম হয়ে যাবে তখন তা পবিত্র থেকে যাবে। কুদূরীর বক্তব্যে কাপড় ও শরীরের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। আর তা ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর অভিমত এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত দু'টি রিওয়ায়াতের একটি। আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর রিওয়ায়াত মতে উভয়ের মাঝে তিনি পার্থক্য করেছেন। অর্থাৎ শরীরের ক্ষেত্রে পানি ছাড়া জায়েজ বলেননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : أَنْجَاسٌ শব্দটি বহুবচন, তার একবচন হলো نَجَسٌ بِفَتْحِ الْجِيْمِ হুবহু নাজাসাতকে (عين نجاست) বলা হয়। আর যদি نجس . (بكسر الجيم) হয় তবে অর্থ হবে ঐ জন্তু যা পাক হয় না। গ্রন্থকার পূর্বে নাজাসাতে হুকমী এবং তা থেকে পবিত্রতা অর্জনের বিধান বর্ণনা করেছেন। উক্ত অধ্যায়ে নাজাসাতে হাকীকী এবং তা থেকে পবিত্রতা অর্জনের বিধিমালা বর্ণনা করতেছেন। যেহেতু নাজাসাতে হুকমী নাজাসাতে হাকীকীর তুলনায় শক্তিশালী। তাই গ্রন্থকার নাজাসাতে হুকমীর আলোচনা অগ্রে বর্ণনা করেছেন। আর নাজাসাতে হুকমী শক্তিশালী হওয়ার কারণ হলো, নাজাসাতে হুকমী যদি কমও হয়। তাও নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক হয়। পক্ষান্তরে নাজাসাতে হাকীকী কম হলে নামাজ জায়েজ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয় এতে প্রতীয়মান হলো যে, নাজাসাতে হুকমী নাজাসাতে হাকীকীর চেয়ে শক্তিশালী।

ইবারতের মধ্যে واجب শব্দটি فرض-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। تطهير শব্দটির দু'টো অর্থ রয়েছে। এক. তাহারাত সাবিত দ্বারা দুই. নাজাসাত দূর করা। প্রথম সুরতে অর্থ হবে নাজাসাতের স্থানকে পাক করা তার মধ্যে তাহারাত সাবিত করে। আর দ্বিতীয় সুরতে অর্থ হবে নাজাসাতকে দূর করা ফরজ। মোটকথা, মাসআলা হলো, মুসল্লির শরীর, তার কাপড় এবং নামাজ আদায়ের স্থান পাক করা ফরজ।

কাপড় পাক করার উপর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ তোমার বস্ত্রাদি পবিত্র করো। طهر শব্দটি امر -এর صيغه আর امر وجوب -এর জন্য আসে। তাই কাপড় পাক হওয়ার উজূব عبارة النص দ্বারা সাবিত হবে। কাপড় পাক হওয়া এ জন্য জরুরি যে, নামাজ হলো স্বীয় প্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার মাধ্যম তাই মুসল্লির করণীয় হলো ভালো ও সুন্দর অবস্থার উপর থাকা। আর ভালো ও সুন্দর অবস্থা তখনই সাবিত হবে যখন মুসল্লি নিজে পাক হবে এবং যা তার সাথে সম্পর্কীত তাও পাক হবে। সুতরাং যখন কাপড় পাকরাখা ফরজ অথচ এ কাপড় মুসল্লীর শরীরের সাথে পূর্ণভাবে সম্পর্কিত নয় তখন শরীর ও স্থান যা মুসল্লীর সাথে পূর্ণভাব সম্পর্কিত তা পাক রাখা অবশ্যই ফরজ হবে।

দ্বিতীয় দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস। তিনি বলেন, প্রথমে তা চেছে নাও, তারপর রগড়িয়ে নাও, তারপর পানি দ্বারা তা ধুয়ে নাও। আল্লামা ইব্নুল হুমাম (র.) উক্ত হাদীস এ ভাবে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ (رض) قَالَتْ جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيْبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّيْ فِيْهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

আসমা বিনতে আবী বকর (রা.) বলেন, একদা এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমাদের মধ্যে কোনো মহিলার হায়েযের রক্ত তার কাপড়ে লেগে যায় এ অবস্থায় আমরা কি করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রথমে তা খড়ি ইত্যাদি দ্বারা চেছে নাও, তারপর পানি দ্বারা রগড়িয়ে নাও, তারপর পানি দ্বারা ধৌত করে নাও, তারপর তাতে নামাজ পড়ো। (বুখারী ও মুসলিম) হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ধোয়ার পর যদি কাপড়ে নাজাসাতের দাগ থেকে যায় তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। অর্থাৎ এই দাগ নামাজের প্রতিবন্ধক নয়।

উল্লেখ্য যে, স্থানের পবিত্রতা দ্বারা পায়ের স্থান মুরাদ। অর্থাৎ দাড়াবার স্থান পাক হওয়া জরুরি। সুতরাং যদি দাঁড়ানোর জায়গায় এক দিরহামের চেয়ে বেশি স্থান নাপাক হয়, তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। সিজদার স্থান পাক থাকা জরুরি কিনা এ ব্যাপারে ওলামাদের ইখ্তিলাফ রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, সিজদার স্থানও পাক হওয়া জরুরি। কেননা সিজদাও কিয়াম-এর ন্যায় একটি রুকন। সুতরাং যেমনিভাবে কিয়াম -এর জায়গা পাক হওয়া শর্ত। এমনিভাবে সিজদার স্থানও পাক হওয়া শর্ত। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করে বলেন, সিজদার জায়গা পাক হওয়া জরুরি নয়। কেননা সিজদা শুধু নাক দ্বারা আদায় হয়ে যায়। আর নাক যেভাবে রাখা হয় তা তো এক দিরহামের চেয়ে কম স্থানে রাখা হয় আর এক দিরহামের কম নাজাসাত নামাজ জায়েজ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। এজন্য সিজদার স্থানের তাহারাত শর্ত নয়। তরফাইন-এর মতে স্থান পাক হওয়া শর্ত। কেননা সিজদা কপাল দ্বারা আদায় করা ফরজ। আর সাধারণত কপালের জায়গা এক দিরহাম থেকে বেশি স্থান জুড়ে হয়। তাই তার পাক থাকা জরুরি।

ويجوز تطهيرها بالماء . الخ : কোন কোন জিনিস দ্বারা নাজাসাত দূর করা জায়েজ বা না জায়েজ এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, পানি এবং প্রত্যেক ঐ সকল জিনিস দ্বারা নাজাসাত দূর করা জায়েজ যা প্রবাহিত হয়, পাক এবং তার মাধ্যমে নাজাসাত দূর করা সম্ভবও বটে। যেমন সিরকা, গোলাবজল ইত্যাদি এবং এমন জিনিস যা নিংড়ানো দ্বারা নিংড়ে পড়ে, সুতরাং খাওয়া জায়েজ এমন জানোয়ারের পেশাব এবং তৈল ও ঘি ইত্যাদি দ্বারা তাহারাত হাসিল করা জায়েজ নয়। কেননা পেশাব নাপাক। আর তেল ইত্যাদি যদিও পাক কিন্তু নিংড়ানো দ্বারা নিংড়ে না; বরং কাপড়ের সাথে লেগেই থাকে। ইমাম মুহাম্মদ, যুফার, শাফি'ঈ এবং ইমাম মালিক (র.) ও আম ফুকাহাদের মাযহাব হলো, পানি ছাড়া অন্যান্য প্রবাহিত জিনিস দ্বারাও তাহারাত হাসিল করা জায়েজ নয়। তাঁদের দলিল হলো– পবিত্রকারী জিনিস নাজাসাতের সাথে মিলে প্রথম স্পর্শেই নাপাক হয়ে যায়। অর্থাৎ পানি বা পবিত্রকারী জিনিস যখন নাজাসাতের উপর পরে এবং নাজাসাতের কিছু অংশ তার সাথে মিশ্রিত হয় তখন এটা নিজেই নাপাক হয়ে যায়। আর যে জিনিস নিজে, নাপাক তা অন্যকে পাক করতে পারে। এ জন্য কিয়াসের চাহিদা তো এটাই ছিল যে, পানি বা অন্য কোনো প্রবাহিত বস্তুও মুফীদে তাহারাত না হওয়া। কিন্তু জরুরতের ভিত্তিতে পানির ক্ষেত্রে এ কিয়াসকে তরক করা হয়েছে। এ জন্য শুধু পানিকে তাহারাতের জন্য মুফীদ ধরা হয়েছে। পানি ছাড়া অন্য কোনো জিনিসকে ধরা হয়নি।

দ্বিতীয় দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা উদ্দেশ্য।

তৃতীয় দলিল হলো কিয়াস দ্বারা। অর্থাৎ যেমনিভাবে নাজাসাতে হুকমী পানি ছাড়া দূর হয় না এমনিভাবে নাজাসাতে হাকীকীও পানি ছাড়া দূর হবে না।

শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো, প্রবাহিত জিনিস বিদূরণকারী অর্থাৎ নাজাসাতকে সমূলে দূর করে দেয়। আর পানির মধ্যে পবিত্রকারী গুণ এ কারণেই যে, সে নাজাসাতকে দূর করে দেয়। এ অর্থ যেহেতু অন্যান্য প্রবাহিত বস্তুর মধ্যেও বিদ্যমান, তাই পানির ন্যায় এগুলোও পবিত্রকারী এবং নাজাসাত বিদূরণকারী হবে। বরং পানিতো কখনো রঙ্গীন নাজাসাতের রং কে দূর করতে পারে না; কিন্তু সিরকা তার রং কেও দূর করে দেয়। তবে প্রথম মিশ্রণেই যে নাপাক হয়ে যায়? তার জবাব হলো, পানি নাপাক হয় নাজাসাতের অংশের সাথে মিশ্রিত হওয়ার কারণে। আর নাজাসাতের অংশগুলো যখন প্রবাহিত হয়ে খতম হয়ে যাবে, তখন মহল তথা কাপড়ও পাক হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর প্রথম দলিলের জবাব হলো– যে জরুরতের কারণে পানির ক্ষেত্রে কিয়াসকে তরক করা হয়েছে সে জরুরতের কারণে অন্যান্য প্রবাহিত এবং পবিত্রকারী জিনিসের মধ্যেও কিয়াসকে তরক করা উচিত।

দ্বিতীয় দিলের জবাব হলো– কোনো জিনিসের আলোচনা (ذكر) দ্বারা তার তাখ্সীস বুঝায় না অর্থাৎ আয়াতে কারীমায় পানির (مطهر) পবিত্রকারী হওয়ার আলোচনা দ্বারা অন্যান্য জিনিসের غير مطهر হওয়া বুঝায় না। তৃতীয় দলিলের জবাব হলো– নাজাসাতে হাকীকীকে নাজাসাতে হুকমীর উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা হাদাস (حدث) একটি শরয়ী (مانع) প্রতিবন্ধক। সুতরাং ঐ ভাবেই দূর হবে যে, ভাবে শরিয়ত বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে নাজাসাতে হাকীকিয়া একটি মাহসূস জিনিস। তাই তাকে হাদাসের ওপর কিয়াস করা ঠিক হবে না। হিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, কুদূরীর বক্তব্যে অর্থাৎ يَجُوزُ تَطْهِيْرُهَا بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ -এর মধ্যে কাপড় ও শরীরের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। অর্থাৎ যেমনিভাবে পানি বা অন্যান্য প্রবাহিত পাক জিনিস দ্বারা কাপড় পাক হয়ে যায় এমনিভাবে এগুলো দ্বারা শরীরও পাক হয়ে যায়। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত দু'টি রিওয়ায়াতের একটি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দ্বিতীয় রিওয়ায়াত হলো– তিনি কাপড় ও শরীরের মাঝে পার্থক্য করেন। তিনি বলেন, শরীরকে শুধু পানি দ্বারা পাক করা জায়েজ। আর কাপড়কে পানি এবং অন্যান্য প্রবাহিত পাক জিনিস দ্বারাও পাক করা জায়েজ।

وَإِذَا أَصَابَ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ لَهَا جِرْمٌ كَالرَّوْثِ وَالْعَذِرَةِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ فَجَفَّتْ فَدَلَكَهُ بِالْأَرْضِ جَازَ وَهٰذَا إِسْتِحْسَانٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) لَايَجُوزُ وَهُوَ الْقِيَاسُ إِلَّا فِي الْمَنِيِّ خَاصَّةً لِأَنَّ الْمُتَدَاخِلَ فِي الْخُفِّ لَايُزِيلُهُ الْجَفَافُ وَالدَّلْكُ بِخِلَافِ الْمَنِيِّ عَلٰى مَا نَذْكُرُهُ وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنْ كَانَ بِهِمَا أَذًى فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهُمَا طَهُورٌ وَلِأَنَّ الْجِلْدَ لِصَلَابَتِهِ لَايَتَدَاخَلُهُ أَجْزَاءُ النَّجَاسَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ثُمَّ يَجْتَذِبُهُ الْجِرْمُ إِذَا جَفَّ فَإِذَا زَالَ زَالَ مَاقَامَ بِهِ ـ

অনুবাদ : যদি মুজাতে স্থূল শরীর বিশিষ্ট কোনো নাজাসাত লাগে, যেমন– গোবর, পায়খানা, রক্ত ও বীর্য আর তা শুকিয়ে যায়, এরপর তা মাটি দ্বারা ঘষে নেয়, তাহলে জায়েজ হবে। এটা ইসতিহ্সান তথা সূক্ষ্ম কিয়াস। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জায়েজ হবে না। এ-ই হলো সাধারণ কিয়াসের চাহিদা। তবে বিশেষভাবে মনী তথা শুক্র-এর ব্যতিক্রম। কেননা মুজাতে যা প্রবেশ করে, তাকে তো শুষ্কতা ও ঘসা দ্বারা দূর করতে পারে না। শুক্র তথা বনী এর ব্যতিক্রম। এ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। শায়খাইনের (র.) দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি মুজাদ্বয়ে কোনো নাপাকি থাকে, তাহলে উভয় দিকে মাটি দ্বারা মুছে ফেলবে। কেননা মাটি মুজাদ্বয়ের জন্য পবিত্রকারী। তাছাড়া মাটি শক্ত হওয়ার দরুন তাতে নাজাসাতের খুব সামান্য অংশই ঢুকতে পারে। পরে স্থূল নাজাসাত যখন শুকিয়ে যায়, তখন সেই আর্দ্রতাও শুষে নেয়। সুতরাং যখন স্থূল নাজাসাত দূর হবে, তখন তার সাথে যুক্ত সে আর্দ্রতাও দূর হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি মুজায় এমন নাপাক লাগে যার জিসিম বা শরীর আছে যেমন– গোবর, পায়খানা, প্রবাহিত রক্ত ও বীর্য। অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। এরপর তাকে মাটিতে ঘসা হয় অথবা খড়ি ইত্যাদি দ্বারা খুচিয়ে পরিষ্কার করা হয়, তাহলে মুজা পাক হয়ে যাবে। এ ধরনের মুজা পরিধান করে নামাজ পড়া জায়েজ। এটা ইস্তিহ্সানের হুকুম, য্যা কিয়াসে জলীর মোকাবেলায় আসে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এটা জায়েজ নয়। অর্থাৎ এমনটি করার দ্বারা মুজা পাক হবে না; বরং ধোয়া জরুরি। বীর্যের হুকুম এর বিপরীত যা সামনে আলোচনা করা হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতটি হলো সাধারণ কিয়াস মুতাবিক। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, মুজার ভিতর যা প্রবেশ করে তা শুষ্ক ও ঘসা দ্বারা দূর হয় না। এমনকি শুষ্ক হওয়ার পরও নাজাসাত বাকি থাকে। তবে বীর্যের হুকুম এর ব্যতিক্রম যা আমরা পরে আলোচনা করব। فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ.

শায়খাইন (র.)-এর দলিল হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (র.)-এর হাদীস– إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ بَعْدَ الصَّلٰوةِ مَالَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ فَقَالُوا رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ فَخَلَعْنَا فَقَالَ أَخْبَرَنِي جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا إِذَا أَتٰى أَحَدُكُمْ بَابَ الْمَسْجِدِ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأٰى فِيهِمَا قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ ـ রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পরা ছিলেন। তিনি তার জুতাগুলো খুলে ফেললেন। সাহাবায়ে কেরামও তাদের জুতা খুলে ফেলল। নামাজ আদায়ের পড় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হলো? যে তোমরা জুতা খুলে ফেললে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা আপনাকে জুতা খুলতে দেখে আমরাও খুলে ফেললাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, আমাকে জিবরাঈল (আ.) বলেছেন যে, তাতে নাপাক রয়েছে সুতরাং তোমরা যখন মসজিদের দরজায় আসবে তখন জুতাগুলো উলট-পালট করে দেখবে। যদি নাপাক দেখা যায় তবে জমিনে ঘসে নিবে।

অন্য রিওয়ায়েতের মধ্যে فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهُمَا طَهُورٌ শব্দও এসেছে। অর্থাৎ তিনি বলেছেন, জমিন তাদের জন্য পবিত্রকারী। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মুজায় যদি নাজাসাত লাগে তবে জমিনে ঘসা দ্বারা পাক হয়ে যায়, ধোয়া জরুরি নয়।

দ্বিতীয় আকলী দলিল হলো, মুজা চামড়ার হওয়ায় শক্ত হয় তাতে নাজাসাতের খুব সামান্য অংশই ঢুকতে পারে, পরে তা যখন শুষ্ক হয়ে যায় তখন তার স্থূল নাজাসাত তা শুষে নেয়। সুতরাং যখন স্থূল নাজাসাত দূর হবে তখন তার সাথে যুক্ত আর্দ্রতাও দূর হয়ে যাবে।

وَفِي الرَّطْبِ لَايَجُوْزُ حَتّٰى يَغْسِلَهٗ لِاَنَّ الْمَسْحَ بِالْاَرْضِ يُكَثِّرُهٗ وَلَا يُطَهِّرُهٗ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهٗ اِذَا مَسَحَ بِالْاَرْضِ حَتّٰى لَمْ يَبْقَ اَثَرُ النَّجَاسَةِ يَطْهُرُ لِعُمُوْمِ الْبَلْوٰى وَاِطْلَاقِ مَا يُرْوٰى وَعَلَيْهِ مَشَائِخُنَا فَاِنْ اَصَابَهٗ بَوْلٌ فَيَبِسَ لَمْ يَجُزْ حَتّٰى يَغْسِلَهٗ وَكَذَا كُلُّ مَا لَاجِرْمَ لَهٗ كَالْخَمْرِ لِاَنَّ الْاَجْزَاءَ تَتَشَرَّبُ فِيْهِ وَلَاجَاذِبَ يَجْذِبُهَا وَقِيْلَ مَا يَتَّصِلُ بِهٖ مِنَ الرَّمْلِ جِرْمٌ لَهٗ وَالثَّوْبُ لَايُجْزِىْ فِيْهِ اِلَّا الْغَسْلُ وَاِنْ يَبِسَ لِاَنَّ الثَّوْبَ لِتَخَلْخُلِهٖ يَتَدَاخَلُهٗ كَثِيْرٌ مِنْ اَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ فَلَايُخْرِجُهَا اِلَّا الْغَسْلُ ـ

অনুবাদ : ভিজা নাজাসাতের ক্ষেত্রে ধোয়া ছাড়া জায়েজ হবে না। কেননা ভিজা নাজাসাতকে মাটি দ্বারা মুছলে নাজাসাতকে (আরো) প্রসারিত করবে পাক করবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি তা মাটি দিয়ে এমনভাবে মুছে যে, নাজাসাতের চিহ্নই অবশিষ্ট না থাকে তাহলে তা মাফ হয়ে যাবে। عموم بلوى এবং হাদীস মুতলাক হওয়ার কারণে। অর্থাৎ এ ধরনের ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটে থাকে। আর হাদীসটিও মুতলাক, তাতে কোনো ধরনের শর্ত আরোপ করা হয়নি। আর এ মতের উপর আমাদের ফকীহগণের ফতোয়া রয়েছে। আর যদি মুজায় পেশাব লাগে এবং শুকিয়ে যায় তাহলে তা ধোয়া ছাড়া জায়েজ হবে না। তদ্রূপ এ সমস্ত নাজাসাত, যার স্থূলতা নেই যেমন– মদ, কেননা নাজাসাতের অংশ মুজাতে শোষিত হয়ে যায়। আর তা চুষে তুলে আনার মতো কোনো চোষণকারীও নেই। কারো কারো মতে তার সাথে লেগে থাকা ধুলাও তার স্থূলতা হিসাবে গণ্য হবে। কাপড় শুকিয়ে গেলেও ধোয়া ছাড়া যথেষ্ট হবে না। কেননা কাপড় ফাক ফাক হওয়ার কারণে তাতে নাজাসাতের অংশ অধিক পরিমাণে প্রবেশ করে। সুতরাং ধোয়া ছাড়া তা বের হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি মুজায় ভিজা নাজাসাত লাগে যেমন– গোবর, পায়খানা, রক্ত ইত্যাদি। আর তা এখনো শুকায়নি। তবে মাটিতে ঘসা দ্বারা মুজা পাক হবে না; বরং ধোয়া জরুরি। কেননা ভিজা নাজাসাত মাটিতে ঘসা দিলে আরো প্রসারিত হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, এতে মুজা আরো নাপাক হয়ে যায়, পাক হয় না। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ভিজা নাজাসাতের সুরতের যদি মুজা এমনভাবে মাটিতে ঘসা হয় যে, নাজাসাতের চিহ্নও বাকি না থাকে তাহলে মুজা পাক হয়ে যাবে। তার পুনরায় ধোয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা এর মধ্যে উমূমে বালওয়া রয়েছে। অর্থাৎ এ ধরনের ঘটনা সাধারণত ব্যাপকভাবে ঘটে থাকে। এখন যদি ধোয়ার হুকুম দেওয়া হয় তাতে অনেক কষ্ট পোহাতে হবে। দ্বিতীয়ত এ হাদীসটি فَلْيَمْسَحْهَا بِالْاَرْضِ মুত্‌লাক। ভিজা বা শুষ্ক এর কোনো ব্যবধান দেখানো হয়নি। তাই মাটিতে ঘসা দ্বারা মুজা পাক হয়ে যাবে। তার উপর ভিজা নাজাসাত লাগুক বা শুষ্ক নাজাসাত লাগুক আমাদের মাশায়িখের এটাই অভিমত। আর এর উপর ফাতোয়াও রয়েছে।

فَاِنْ اَصَابَهٗ بَوْلٌ যদি মুজায় এমন নাজাসাত লাগে যে, যার স্থূলতা নেই। যেমন– পেশাব, মদ ইত্যাদি, এ অবস্থায় মুজা শুধু ধোয়ার দ্বারাই পাক হয়ে যাবে। শুকিয়ে যাওয়ার পর যদি মাটিতে ঘসা হয় তবে পাক হবে না। কেননা নাজাসাতের অংশ মুজাতে শুষে গেছে। আর এখানে এমন কোনো চোষণকারীও নেই যা তা চুষে আনবে। এজন্য চুষিত অংশগুলো বের করে আনার জন্য পানি দ্বারা ধোয়া অত্যাবশ্যক। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি কোনো মুজায় পেশাব লেগে যায়। অতঃপর এর উপর কোনো মাটি বা বালু লেগে যায় এবং শুকিয়ে যায়, তারপর মাটিতে ঘসা হয়। এতে মুজা পাক হয়ে যাবে। পানি দ্বারা ধোয়ার কোনো প্রয়োজন হবে না। শামসুল আইম্মা সরখসী (র.) বলেন, এ মতই বিশুদ্ধ।–(ইনায়া)

وَالثَّوْبُ لَايُجْزِىْ নাজাসাত যদি কাপড়ে লেগে যায় তবে ধোয়া ছাড়া পাক হবে না, যদিও নাজাসাত শুকিয়ে যায়। দলিল হলো, কাপড় সাধারণত পূর্ণ হয় না; বরং ফাঁক ফাঁক হয়ে থাকে যার দরুন নাজাসাতের অধিক অংশ তার মধ্যে লেগে যায় তাই সমূহ নাজাসাতের অংশকে বের করার জন্য ধোয়া জরুরি। শুধু মাটির ওপর ঘসা মাঝা যথেষ্ট হবে না।

وَالْمَنِيُّ نَجِسٌ يَجِبُ غَسْلُهُ رَطْبًا فَإِذَا جَفَّ عَلَى الثَّوْبِ أَجْزَأَ فِيهِ الْفَرْكُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَائِشَةَ (رض) فَاغْسِلِيهِ إِنْ كَانَ رَطْبًا وَافْرُكِيهِ إِنْ كَانَ يَابِسًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) اَلْمَنِيُّ طَاهِرٌ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ وَ ذَكَرَ مِنْهَا الْمَنِيَّ وَلَوْ أَصَابَ الْبَدَنَ قَالَ مَشَائِخُنَا (رح) يَطْهُرُ بِالْفَرْكِ لِأَنَّ الْبَلْوَى فِيهِ أَشَدُّ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) أَنَّهُ لَايَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ لِأَنَّ حَرَارَةَ الْبَدَنِ جَاذِبَةٌ فَلَايَعُودُ إِلَى الْجِرْمِ وَالْبَدَنُ لَايُمْكِنُ فَرْكُهُ ـ

অনুবাদ : শুক্র নাপাক। আর্দ্র অবস্থায় তা ধোয়া ওয়াজিব। যদি কাপড়ে শুকিয়ে যায় তাহলে রগড়িয়ে ফেললেও যথেষ্ট হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছেন– আর্দ্র হলে তা ধুয়ে ফেলো আর শুষ্ক হলে তা রগড়িয়ে ফেলো। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, শুক্র পাক। আমাদের বর্ণিত হাদীস তাঁর বিপক্ষে দলিল। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, পাঁচটি জিনিস থেকে কাপড় ধুয়ে নিতে হয়। তার মধ্যে তিনি শুক্রও উল্লেখ করেছেন। শুক্র যদি শরীরে লাগে তাহলে আমাদের মাশায়িখগণ বলেছেন, রগড়ালে তা পাক হয়ে যাবে। কেননা এ ধরনের ঘটনা আরো অধিক ব্যাপক। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ধোয়া ছাড়া তা পাক হবে না। কেননা শরীরের তাপ তা শোষণ করে নেয়। সুতরাং শোষিত অংশ শুষ্ক স্থলে ফিরে আসবে না। আর শরীরকে তো রগড়ানো সম্ভব নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শুক্র পাক নাপাক হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ওলামায়ে আহনাফ বলেন, মানুষের শুক্র নাপাক। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, মানুষের শুক্র পাক। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর মধ্য থেকে কুকুর ও শূকরের শুক্র সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক। এ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর শুক্রের ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। এক. সব প্রাণীর শুক্রপাক ماكول اللحم হোক বা غير ما كول اللحم হোক। দুই. সব প্রাণীর শুক্র নাপাক। তিন. ماكول اللحم -এর শুক্র পাক আর غير ما كول اللحم -এর শুক্র নাপাক।

[টীকা : মাওলানা আব্দুল হাই (র.) ইমাম শাফি'ঈ (র.)] শুক্র পাক হওয়ার ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন। হাদীসটি হলো,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ أَوِ الْبُزَاقِ وَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ إِذْخِرَةٍ ـ

ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাপড়ে লেগে থাকা শুক্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বলেন, সেটাতো শ্লেষ্মা ও থুথু -এর মতো। তিনি আরো বলেন, তাকে কোনো কাপড় খণ্ড বা ইয্খার ঘাস দ্বারা মুছে ফেললে যথেষ্ট হয়ে যাবে। উক্ত হাদীসে শুক্রকে শ্লেষ্মার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর শ্লেষ্মা হলো পাক। সুতরাং শুক্রও পাক। এমনিভাবে হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে শুক্রকে খোঁচাতাম, অথচ তখন তিনি নামাজে রত থাকতেন। উক্ত হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় শুক্র পাক। নতুবা শুক্র লাগা কাপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ আদায় করতেন না।

আকলী দলিল হলো– শুক্র মানব সৃষ্টির সূচনা। তাই তা মাটির অনুরূপ। কেননা আম্বিয়ায়ে কেরামের সৃষ্টি নাপাক বস্তু দ্বারা হওয়া অসম্ভব। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ওলামায়ে আহনাফের অভিমত হলো শুক্র নাপাক। ইমাম মালিক (র.)-এরও একই অভিমত। তবে ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে যে কাপড়ে শুক্র লেগে যায় তা পানি দ্বারা ধোয়া জরুরি। পানি ব্যতীত কাপড় পাক হবে না। আর আমাদের আইম্মায়ে ছালাছার মতে শুক্র যদি আর্দ্র হয় তবে তা ধোয়া ওয়াজিব। আর যদি শুষ্ক হয় তবে ঘষা দ্বারাও পাক হয়ে যাবে। আমাদের দলিল হলো– রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছেন فَاغْسِلِيْهِ اِنْ كَانَ رَطْبًا وَافْرُكِيْهِ اِنْ كَانَ يَابِسًا আর্দ্র হলে তা ধুয়ে ফেলো আর শুষ্ক হলে তা রগড়িয়ে ফেলো। দ্বারে কুতনী ও বায্যার উক্ত হাদীস এ ভাবে নকল করেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَابِسًا وَاَغْسِلُهٗ اِذَا كَانَ رَطْبًا ـ

আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কাপড়ের শুক্র শুষ্ক হলে খোচিয়ে উঠাতাম আর আর্দ্র হলে তা ধুয়ে ফেলতাম।

আমাদের মাযহাবের সমর্থন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-এর হাদীস দ্বারাও হয়। হাদীসটি হলো নিম্নরূপ–

اِنَّهٗ ﷺ مَرَّ بِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَهُوَ يَغْسِلُ ثَوْبَهٗ مِنَ النُّخَامَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا نُخَامَتُكَ وَ دُمُوْعُ عَيْنَيْكَ وَالْمَاءُ الَّذِىْ فِىْ رَكْوَتِكَ اِلَّا سَوَاءٌ وَاِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ وَالْقَيْئِ ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-এর পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আম্মার নিজের কাপড় থেকে নাকের শ্লেষ্মা পরিষ্কার করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নাকের শ্লেষ্মা, চোখের পানি এবং চামড়ার পাত্রের পানি সবই সমান। অর্থাৎ সব পাক। তবে পাচটি জিনিসের কারণে কাপড় ধুইতে হয়। পেশাব, পায়খানা, রক্ত, শুক্র এবং বমি। অন্য এক বর্ণনায় বমির স্থলে শরাবের কথা এসেছে। মুদ্দাকথা, এ সকল হাদীস দ্বারা বুঝা যায় শুক্র নাপাক।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস যা ইমাম শাফি'ঈ (র.) দলিল হিসাবে পেশ করেছেন, তার জবাব হলো এই– এ হাদীসটি مرفوع নয়; বরং ইবনে আব্বাসের উপর موقوف আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, حديث مرفوع ـ حديث موقوف (তথা হাদীসে আয়েশা ও হাদীসে আম্মার ইবনে ইয়াসির)-এর মোকাবেলায় দলিল হতে পারে না।

তা ছাড়া ইনায়া গ্রন্থকার লিখেছেন যে, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসের মধ্যে শুক্রকে শ্লেষ্মা ও থুথুর সাথে তাশ্‌বীহ দেওয়া হয়নি; বরং তৈলাক্ততা ও কম প্রবেশ -এর মধ্যে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেমনিভাবে নাকের শ্লেষ্মার মধ্যে তৈলাক্ততা রয়েছে এমনিভাবে শুক্রের মধ্যেও তৈলাক্ততা রয়েছে। যেমনিভাবে শ্লেষ্মা কাপড়ের মধ্যে খুব কমই প্রবেশ করে এমনিভাবে শুক্রও কাপড়ের মধ্যে খুব কম প্রবেশ করে। এ সম্ভাবনাময় সুরত দ্বারা শুক্রের পাক হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল তথা হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো– উক্ত হাদীসে وَهُوَ يُصَلِّىْ -এর স্থলে فيصلى এসেছে। এখন হাদীসের মতলব এই দাঁড়ায় যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাপড় থেকে শুক্র খোঁচিয়ে পাক করতাম তারপর তিনি নামাজ আদায় করতেন, এ সুরতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শুক্রওয়ালা কাপড় পরিধান করে নামাজ আদায় করা লাজিম আসে না। তাঁদের আকলী দলিলের জবাব হলো– আমরা এ কথা তাসলীম করি না যে, মানব সৃষ্টির সূচনা সরাসরি শুক্র দ্বারা হয়েছে; বরং বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধনের পর মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন– শুক্র রক্তে পরিবর্তন হলো, তারপর জমাট রক্ত হলো, তারপর মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত হলো। এ সকল অবস্থা অতিক্রম করে মানুষ সম্মানিত হলো এবং পরিপূর্ণ মানবরূপে সৃজিত হলো। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, শুক্র যদি শরীরের লাগে এবং শুকিয়ে যায়; তবে মাওরাউননাহারের মাশায়িখগণের অভিমত হলো, এ সুরতেও যদি শরীর থেকে শুক্রকে খোঁচিয়ে উঠানো হয়, তাহলে শরীর পাক হয়ে যাবে। এ সুরতে কষ্ট বেশি। কেননা কাপড়কে তো শুক্র থেকে পৃথক করা সম্ভব কিন্তু শরীরকে তো পৃথক করা যাবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, শুধুমাত্র ধোয়া দ্বারা পাক হতে পারে, রগড়ালে পাক হবে না। কেননা শরীরের তাপ শুক্রকে শোষণ করে নেয়, তাই শোষিত অংশ শুষ্ক স্থলে ফিরে আসবে না। আর শরীরকে তো রগড়ানো সম্ভব নয়, তাই তার ধোয়া জরুরি।

وَالنَّجَاسَةُ إِذَا أَصَابَتِ الْمِرْآةَ أَوِ السَّيْفَ إِكْتَفَى بِمَسْحِهِمَا لِأَنَّهُ لَاتَتَدَاخَلُهُمَا النَّجَاسَةُ وَمَا عَلَى ظَاهِرِهِ يَزُولُ بِالْمَسْحِ وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضَ نَجَاسَةٌ فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ وَ ذَهَبَ أَثَرُهَا جَازَتِ الصَّلٰوةُ عَلَى مَكَانِهَا وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ (رحـ) لَاتَجُوزُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْمُزِيلُ وَلِهٰذَا لَايَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهَا وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا وَإِنَّمَا لَايَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِأَنَّ طَهَارَةَ الصَّعِيدِ ثَبَتَ شَرْطًا بِنَصِّ الْكِتَابِ فَلَاتَتَأَدّٰى بِمَاثَبَتَ بِالْحَدِيثِ ـ

অনুবাদ : আয়না, তলোয়ার ইত্যাদিতে যদি নাজাসাত লেগে থাকে, তাহলে তা মুছে ফেলাই যথেষ্ট। কেননা নাজাসাত তাতে প্রবিষ্ট হয় না। আর তার উপরাংশে যা আছে তা মোছার মাধ্যমেই বিদূরিত হয়ে যায়। মাটিতে নাজাসাত লাগার পর যদি সে মাটি রোদের তাপে শুকিয়ে যায় এবং তার চিহ্ন চলে যায়, তাহলে উক্ত স্থানে নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে। ইমাম যুফার ও শাফি'ঈ (র.) বলেন জায়েজ হবে না। কেননা নাজাসাত দূরকারী কিছু পাওয়া যায়নি। এ জন্যই তো ঐ মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ নয়। আমাদের দলিল হলো– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শুষ্কতাই হলো ভূমির পবিত্রতা। তবে তায়াম্মুম জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, কিতাবুল্লাহর বাণী দ্বারা মাটির পবিত্রতার শর্ত সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং হাদীস দ্বারা যে মাটির পবিত্রতা প্রমাণিত হয়েছে, তা দ্বারা সে পবিত্রতা আদায় হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : নাজাসাত যদি আয়না, ঝুলানো তলোয়ার এবং ছুরি ইত্যাদিতে লেগে থাকে তবে এগুলো মাটিতে মোছার দ্দ্বারাই পাক হয়ে যাবে। পানি ইত্যাদি দ্বারা ধোয়া শর্ত নয়। ইমাম মালিক (র.) ও এ অভিমত ব্যক্ত করেন। দলিল হলো–, এ সকল জিনিসের মধ্যে নাজাসাত প্রবিষ্ট হতে পারে না। তাই এগুলোকে ভিতর থেকে বের করারও কোনো প্রয়োজন নেই। তবে এগুলোর উপরাংশে যা লেগে থাকে তা মোছার মাধ্যমেই দূর হয়ে যায়। এজন্য পানি দ্বারা ধোয়ার কোনো দরকার নেই। তবে যদি তলোয়ার ইত্যাদি খোদাই করা হয়, যাতে ময়লা ইত্যাদি লাগা আছে এবং পরে নাজাসাত লেগে যায়, তবে তো ধোয়া ব্যতীত পাক হবে না।

وان اصابت الارض الخ : যদি মাটিতে নাজাসাত লাগে। তারপর সূর্যের তাপ বা রোদ বা বাতাস বা অন্য কোনো জিনিস দ্বারা শুকিয়ে যায় এবং নাজাসাতের রং, স্বাদ, ঘ্রাণ ইত্যাদিও চলে যায় তবে ঐ স্থানে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা জায়েজ। তবে ঐ স্থান দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ হবে না। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে ঐ স্থানে নামাজ পড়াও জায়েজ হবে না। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো– ঐ স্থানে নাজাসাত লেগে থাকা অবশ্যম্ভাবী এবং নাজাসাত দূরকারী কোনো জিনিসও পাওয়া যায়নি এ জন্য ঐ স্থান নাপাকই থাকবে তার উপর নামাজ পড়া জায়েজ হবে না। এ কারণেই তো তা দ্বারা তায়াম্মুম করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েজ। আমাদের দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী ذَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا অর্থাৎ শুষ্কতাই হলো ভূমির পবিত্রতা। একই অর্থের আরেকটি হাদীস হলো أَيُّمَا أَرْضٍ جَفَّتْ فَقَدْ ذَكَتْ যে ভূমি শুকিয়ে যায় তা পাক হয়ে যায়।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিলের জবাব হলো, আপনাদের নাজাসাত দূরকারী কোনো কিছু পাওয়া যায়নি কথাটি ভুল। কেননা নাজাসাত দূরকারী জিনিস বিদ্যমান ছিল। আর তা হলো, হারারাত তথা তাপ অর্থাৎ যেমনিভাবে আগুন দ্বারা পাক করা যায় এমনিভাবে হারারাত দ্বারা পাক করা যায়। হারারাত কম বা বেশি হোক।

وَإِنَّمَا لَايَجُوزُ التَّيَمُّمُ বাক্যটি দ্বারা ইমাম যুফার ও শাফি'ঈ (র.)-এর কিয়াসের জবাব দেওয়া হচ্ছে। জবাবের সার-নির্যাস হলো– তায়াম্মুমের জন্য মাটি পাক হওয়ার শর্ত কিতাবুল্লাহ তথা فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا দ্বারা সাব্যস্ত। আর যে হুকুম কিতাবুল্লাহ দ্বারা সাব্যস্ত হয় তা অকাট্য হয়ে থাকে এ কারণে তায়াম্মুমের জন্যও যে মাটি পবিত্র হওয়া শর্ত তা অকাট্য হতে হবে। আর এ স্থানে মাটির তাহারাত সাব্যস্ত হয়েছে খবরে ওয়াহেদ তথা ذَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا দ্বারা। আর যে হুকুম খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সাব্যস্ত হয় তা قطعى হয় না বরং ظنى হয়। সুতরাং তায়াম্মুম যার জন্য মাটির তাহারাত قطعى الثبوت তা ঐ মাটি দ্বারা আদায় হবে না যার তাহারাত ظنى الثبوت (তথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়)।

وَقَدْرُ الدِّرْهَمِ وَمَا دُوْنَهُ مِنَ النَّجَسِ الْمُغَلَّظِ كَالدَّمِ وَالْبَوْلِ وَالْخَمْرِ وَخُرْءِ الدَّجَاجِ وَبَوْلِ الْحِمَارِ جَازَتِ الصَّلٰوةُ مَعَهُ وَاِنْ زَادَ لَمْ تَجُزْ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ (رح) قَلِيْلُ النَّجَاسَةِ وَكَثِيْرُهَا سَوَاءٌ لِاَنَّ النَّصَّ الْمُوْجِبَ لِلتَّطْهِيْرِ لَمْ يَفْصِلْ وَلَنَا اَنَّ الْقَلِيْلَ لَايُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَيُجْعَلُ عَفْوًا وَقَدَّرْنَاهُ بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ اَخْذًا عَنْ مَوْضِعِ الْاِسْتِنْجَاءِ ثُمَّ يُرْوٰى اِعْتِبَارُ الدِّرْهَمِ مِنْ حَيْثُ الْمَسَاحَةِ وَهُوَ قَدْرُ عَرْضِ الْكَفِّ فِي الصَّحِيْحِ وَيُرْوٰى مِنْ حَيْثُ الْوَزْنِ وَهُوَ الدِّرْهَمُ الْكَبِيْرُ الْمِثْقَالُ وَهُوَ مَا يَبْلُغُ وَزْنُهُ مِثْقَالًا وَقِيْلَ فِي التَّوْفِيْقِ بَيْنَهُمَا اِنَّ الْاُوْلٰى فِي الرَّقِيْقِ وَالثَّانِيَةَ فِي الْكَثِيْفِ وَاِنَّمَا كَانَتْ نَجَاسَةُ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ مُغَلَّظَةً لِاَنَّهَا ثَبَتَتْ بِدَلِيْلٍ مَقْطُوْعٍ بِهٖ ـ

অনুবাদ : রক্ত, পেশাব, মদ, মুরগির পায়খানা, গাধার পেশাব ইত্যাদি গলীয নাজাসাত পরিমাণে এক দিরহাম বা তার কম হলে তা সহ নামাজ জায়েজ হবে। কিন্তু এর বেশি হলে জায়েজ হবে না। ইমাম যুফার ও শাফি'ঈ (র.) বলেন, অল্প নাজাসাতও অধিক নাজাসাত সমান। কেননা পবিত্রতা ও ওয়াজিবকারী শরিয়তের বাণী কোনো পার্থক্য করেনি। আমাদের দলিল হলো– অল্প পরিমাণ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং তা ক্ষমার যোগ্য। (কেননা ইবনে ওমর (রা.) এ রকম ফাতোয়া দিয়েছেন। নিহায়া) আর নাজাসাত (মল) নির্গমন স্থলের উপর ভিত্তি করে দিরহামের পরিমাণ দ্বারা আমরা স্বল্পতার পরিমাণ নির্ধারণ করেছি। (অর্থাৎ এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, পাথর দ্বারা ইসতিনজা করা যথেষ্ট, অথচ তাতে নাজাসাত সমূলে বিদূরিত হয় না। এ জন্য অল্প পানিতে বসলে পানি নাপাক হয়ে যায়। সুতরাং বুঝা গেল যে, এতটুকু পরিমাণ মাফ ধরা হয়েছে।) বিশুদ্ধ মতে দিরহামের হিসাব ধরা হয়েছে আয়তনের দিক থেকে। অর্থাৎ হাতের তালুর মধ্যভাগ পরিমাণ। তবে ওজনের দিক থেকে বিবেচনা করার কথাও বর্ণিত আছে। অর্থাৎ বড় দিরহাম, যার ওজন এক মিছকাল (প্রায় পঁচাশি গ্রাম)। উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, প্রথমটি হলো তরল নাজাসাতের ক্ষেত্রে, আর দ্বিতীয়টি হলো গাঢ় নাজাসাতের ক্ষেত্রে। এ জিনিসগুলোর গলীয নাজাসাত হওয়া কারণ হচ্ছে– তা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নাজাসাত দু' প্রকার–গলীজা, খফীফা। উভয়টির সংজ্ঞার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নাজাসাতে গলীজা (গাঢ় নাপাক) এমন নাজাসাতকে বলা হয় যার সূরত তথা প্রমাণ এমন নস দ্বারা যার মোকাবেলায় অন্য কোনো নস তাহারাত সাব্যস্তকারী না থাকে। আর যদি দু'টি নস পারস্পরিক বিপরীতমুখী হয় তথা এক নস নাজাসাতকে সাবিত করে পক্ষান্তরে অন্য নস্ তাহারাতকে সাবিত করে, তবে এটাকে নাজাসাতে খফীফা বলা হবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে গলীযা ঐ নাজাসাতকে বলা হয় যার নাপাক হওয়ার উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে। আর খফীফা ঐ নাজাসাতকে বলা হয় যার পাক-নাপাক হওয়ার ক্ষেত্রে ওলামাদের ইখ্তিলাফ রয়েছে :

উপরোক্ত মতবিরোধের ফলাফল গোবরের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গোবর নাজাসাতে গলীযা। কেননা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, لَيْلَةُ الْجِنِّ-এ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইস্তিনজার জন্য দু' টুকরা পাথর ও এক টুকরা গোবর আনা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্থলাভিষিক্ত গোবরটিকে নিক্ষেপ করে ফেলে দিলেন, আর বললেন এটা নাপাক। এখানে লক্ষণীয় যে, অন্য কোনো নাম উপরোক্তি হাদীসের معارض নেই যা গোবরের তাহারাতকে বুঝায়। অপর দিকে সাহেবাইন (র.)-এর মতে গোবর নাজাসাতে খফীফা। কেননা ইমাম মালিক (রা.) গোবর পাক হওয়ার প্রবক্তা।

উপরোক্ত ভূমিকার পর লক্ষণীয় বিষয় হলো, হিদায়া গ্রন্থকারের মাকসাদ হলো এ কথা বয়ান করা যে, নাজাসাত কতটুকু পরিমাণ মাফ বা কতটুকু পরিমাণ মাফ নয়। তাই গ্রন্থকার বলেন, নাজাসাতে গলীযা যেমন– রক্ত, পেশাব, মদ, মুরগির পায়খানা, গাধার পেশাব ইত্যাদি এক দিরহাম বা তার কম পরিমাণ হলে মাফ তথা ক্ষমার যোগ্য। যদি এ পরিমাণ নাজাসাত নিয়ে নামাজ পড়া হয় তবে নামাজ জায়েজ হয়ে যাবে। এ পরিমাণ নাজাসাত কাপড়ে লাগুক বা শরীরে লাগুক, একই হুকুম। আর যদি এক দিরহামের অধিক পরিমাণ নাজাসাত হয় তবে ক্ষমার অযোগ্য। এমনকি তা দ্বারা নামাজ পড়লে নামাজ আদায় হবে না।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, অল্প ও অধিক নাজাসাত সমান। অর্থাৎ মুতলাকান নাজাসাত নিয়ে নামাজ জায়েজ হবে না। চাই নাজাসাত কম বা বেশি হোক। তাঁদের দলিল হলো– আল্লাহর বাণী– وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, যিনি নাজাসাত থেকে পাক করাকে ওয়াজিব করেছেন তিনি কমবেশির কোনো পার্থক্য করেননি; বরং মুতলাকান নাজাসাত থেকে পাক করার হুকুম দিয়েছেন। সুতরাং কমবেশি সবগুলোর পাক করা ওয়াজিব। আমাদের দলিল হলো– অল্প পরিমাণ নাজাসাত এমন যার থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। যেমন– মাছি নাজাসাতের উপর বসে তারপর এসে মানুষের শরীরে বসে। এমনিভাবে মশার রক্ত চুষা থেকে বেচে থাকাও সম্ভব নয়। সুতরাং অল্প পরিমাণ নাজাসাত থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব হওয়ায় তাকে ক্ষমারযোগ্য ধরা হয়েছে। কেননা অল্প পরিমাণের প্রয়োজন রয়েছে। তা ছাড়া শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকেও "প্রয়োজনকে" মুসতাছনা রাখা হয়েছে। এখন কথা হলো কম ও বেশি পরিমাণের ভিত্তি কি? এ ব্যাপারে আমাদের ওলামাগণ বলেন, এক দিরহাম পরিমাণ হলো কম, আর এক দিরহামের চেয়ে বেশি হলে বেশি। এখানে নাজাসাত নির্গমন স্থলের উপর কিয়াস করা হয়েছে। অর্থাৎ নাজাসাত নির্গমণের স্থলে সর্বসম্মত মতে মাফ। তাই আমরা ঐ পরিমাণ অনুমান করে এক দিরহাম পরিমাণকে ক্ষমার যোগ্য বলেছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দিরহামের হিসাবের ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। **এক.** দিরহামের হিসাব আয়তনের দিক থেকে অর্থাৎ হাতের তালুর মধ্যভাগ পরিমাণ। **দুই.** দিরহামের হিসাব ওজনের দিক থেকে অর্থাৎ এমন বড় দিরহাম যার পরিমাণ এক মিছকাল (প্রায় আশি গ্রাম)।

ফকীহ আবূ জা'ফর (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উভয় বর্ণনার সামাঞ্জস্য হচ্ছে– প্রথমটি হলো তরল নাজাসাতের ক্ষেত্রে আর দ্বিতীয়টি হলো গাঢ় নাজাসাতের ক্ষেত্রে। সুতরাং যদি মানুষের পেশাব হয় তবে আয়তনের হিসাবে এক দিরহাম পরিমাণ হলে মাফ। এর চেয়ে বেশি হলে মাফ নয়। আর যদি মানুষের পায়খানা হয় তবে তখন হিসাবে এক দিরহাম পরিমাণ মাফ, এর চেয়ে বেশি হলে মাফ হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মতনে উল্লিখিত জিনিসগুলো নাজাসাতে গলীযা। কেননা এগুলো নাজিস হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। তার মোকাবেলায় অন্য কোনো দলিল নেই।

وَإِنْ كَانَتْ مُخَفَّفَةً كَبَوْلِ مَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ جَازَتِ الصَّلٰوةُ مَعَهُ حَتّٰى يَبْلُغَ رُبْعَ الثَّوْبِ يُرْوٰى ذٰلِكَ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِاَنَّ التَّقْدِيْرَ فِيْهِ بِالْكَثِيْرِ الْفَاحِشِ وَالرُّبْعُ مُلْحَقٌ بِالْكُلِّ فِيْ بَعْضِ الْاَحْكَامِ وَعَنْهُ رُبْعُ اَدْنٰى ثَوْبٍ تَجُوْزُ فِيْهِ الصَّلٰوةُ كَالْمِيْزَرِ وَقِيْلَ رُبْعُ الْمَوْضِعِ الَّذِيْ اَصَابَهُ كَالذَّيْلِ وَالدِّخْرِيْصِ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) شِبْرٌ فِيْ شِبْرٍ وَاِنَّمَا كَانَ مُخَفَّفًا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) لِمَكَانِ الْاِخْتِلَافِ فِيْ نَجَاسَةٍ اَوْ لِتَعَارُضِ النَّصَّيْنِ عَلٰى اِخْتِلَافِ الْاَصْلَيْنِ وَاِذَا اَصَابَ الثَّوْبَ مِنَ الرَّوْثِ اَوْ مِنْ اَخْثَاءِ الْبَقَرِ اَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَمْ تَجُزِ الصَّلٰوةُ فِيْهِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِاَنَّ النَّصَّ الْوَارِدَ فِيْ نَجَاسَةٍ وَهُوَ مَا رُوِيَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَمٰى بِالرَّوْثَةِ وَقَالَ هٰذَا رِجْسٌ اَوْ رِكْسٌ لَمْ يُعَارِضْهُ غَيْرُهُ وَبِهٰذَا يَثْبُتُ التَّغْلِيْظُ عِنْدَهُ وَالتَّخْفِيْفُ بِالتَّعَارُضِ وَقَالَا يُجْزِيْهِ حَتّٰى يَفْحُشَ لِاَنَّ الْاِجْتِهَادَ فِيْهِ مَسَاغًا وَبِهٰذَا يَثْبُتُ التَّخْفِيْفُ عِنْدَهُمَا وَلِاَنَّ فِيْهِ ضَرُوْرَةً لِاِمْتِلَاءِ الطُّرُقِ بِهَا وَهِيَ مُؤَثِّرَةٌ فِي التَّخْفِيْفِ بِخِلَافِ بَوْلِ الْحِمَارِ لِاَنَّ الْاَرْضَ تَنْشِفُهُ قُلْنَا الضَّرُوْرَةُ فِي النِّعَالِ وَقَدْ اَثَّرَتْ فِي التَّخْفِيْفِ مَرَّةً حَتّٰى تَطْهُرَ بِالْمَسْحِ فَتَكْفِيْ مُؤْنَتُهَا وَلَافَرْقَ بَيْنَ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ وَغَيْرِ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ وَ زُفَرُ (رحـ) فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَوَافَقَ اَبَاحَنِيْفَةَ فِيْ غَيْرِ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ وَ وَافَقَهُمَا فِي الْمَاكُوْلِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الرَّيَّ وَ رَاَى الْبَلْوٰى اَفْتٰى اَنَّ الْكَثِيْرَ الْفَاحِشَ لَايَمْنَعُ اَيْضًا وَقَاسُوْا عَلَيْهَا طِيْنَ بُخَارَا وَعِنْدَ ذٰلِكَ رُجُوْعُهُ فِي الْخُفِّ يُرْوٰى ـ

অনুবাদ : আর নাজাসাত যদি লঘু হয়, যেমন হালাল পশুর পেশাব, তাহলে কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ হওয়া পর্যন্ত তা নিয়ে নামাজ জায়েজ হবে। এ মতটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত। কেননা এ ক্ষেত্রে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় অনেক বেশি দ্বারা। আর কতিপয় বিধানের ক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশকে সমগ্রের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, নামাজ জায়েজ হওয়ার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো কাপড়ের যে অংশে নাজাসাত লেগেছে তার এক-চতুর্থাংশ। যেমন– আঁচল, কলি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এক বর্গ বিঘত পরিমাণ হলে নামাজ জায়েজ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে (হালাল পশুর পেশাব) লঘু নাপাক হওয়ার কারণ হলো– এক. এর নাপাকি হওয়া সম্পর্কে মতভেদ থাকা, দুই. কিংবা দুই হাদীসের বিপরীতমুখী হওয়া। দুই নীতির ভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে। (অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মূলনীতি হলো.

শরিয়তের দু'টি বাণীর মাঝে বিরোধ দেখা দিলে বিধানটি লঘু হয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মূলনীতি হলো মুজতাহিদগণের পরস্পর মতভেদ।) লেদা বা গরুর গোবর যদি এক দিরহামের বেশি কাপড়ে লেগে যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ঐ কাপড়ে নামাজ জায়েজ হবে না। কেননা গোবরের নাপাকী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের সাথে অন্য কোনো হাদীসের বিরোধ নেই। হাদীসটি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক খণ্ড গোবর ছুড়ে ফেলে বলেছিলেন (بخاری) هٰذَا رِجْسٌ اَوْ رِكْسٌ (এটা নাপাকী)। আর ইমাম সাহেবের মতে এতেই গলীয নাজাসাত প্রমাণিত হয়। আর বাণী বিরোধ দ্বারা লঘুত্ব প্রমাণিত হয়। সাহেবাইন (র.) বলেন, অনেক বেশি পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত জায়েজ হবে। কেননা এ বিষয়ে ইজতিহাদের অবকাশ আছে। আর তাদের মতে এতেই লঘুত্ব প্রমাণিত হয়। তা ছাড়া রাস্তা-ঘাট গোবর ভরা থাকার কারণে তাতে (সম্পৃক্ত হওয়া) প্রয়োজন রয়েছে। আর লঘুত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োজনের প্রভাব স্বীকৃত। গাধার পেশাবের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা ভূমি তা শুষে নেয়। (সুতরাং তাতে প্রয়োজন নেই) আমরা বলি প্রয়োজন (মূলত) জুতার মধ্যে। আর হুকুম লঘু হওয়ার ব্যাপারে একবার তা ভূমিকা রেখেছে। সুতরাং জুতা মুছে নিলেই পাক হয়ে যায়। এতেই প্রয়োজনের দাবি পূর্ণ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে হালাল পশু ও হারাম পশুর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু ইমাম যুফার (র.) উভয়ের মাঝে পার্থক্য করেছেন, অর্থাৎ হারাম পশুর ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে এবং হালাল পশুর ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন রায় শহরে প্রবেশ করলেন এবং ব্যাপকভাবে তাতে লিপ্ততা দেখতে পেলেন, তখন তিনি অনেক বেশি পরিমাণও নামাজ আদায়ে বাধা হবে না বলে ফতোয়া দিয়েছেন। মাশায়িখগণ এর উপর বুখারার (গোবর মিশ্রিত) কাদা মাটিকে কিয়াস করেছেন। (অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উপরোক্ত ফতোয়ার ভিত্তিতে তারা বলেছেন, বুখারার কাদা মাটি প্রচুর পরিমাণে লাগলেও নামাজে অসুবিধা হবে না। যদিও তা গোবর মিশ্রিত, কেননা এটা এমন ব্যাপক সমস্যা যা থেকে বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই) এখন থেকে মোজার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.) পূর্ব শর্ত প্রত্যাহার করেছেন বলে বর্ণনা করা হয়। (অর্থাৎ মোজা সম্পর্কে তাঁর প্রসিদ্ধ অভিমত ছিল এই যে, তা মাটিতে ঘষে নিলে পাক হবে না। তাতে প্রমাণিত হয় যে, গোবর তার দৃষ্টিতে নাপাক, কিন্তু রায় শহরের ফাতোয়া থেকে মনে হয় তিনি তাঁর অভিমত পরিবর্তন করে এটাকে পাক সাব্যস্ত করেছেন।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে নাজাসাতে খফীফার (লঘু নাপাকি) "ক্ষমার যোগ্য পরিমাণ"-এর আলোচনা করা হয়েছে। তাই গ্রন্থকার বলেন, নাজাসাতে খফীফা যেমন— হালাল পশুর পেশাব কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ থেকে কম হলে মাফ। চতুর্থাংশ পরিমাণ হলে মাফ হবে না। অর্থাৎ যদি কাপড়ের এক-চতুর্থাংশের কমে নাজাসাতে খফীফা লাগে তা নিয়ে নামাজ পড়া জায়েজ। আর যদি কাপড়ের চতুর্থাংশ বা এর চেয়ে বেশি অংশে লাগে, তবে তা নিয়ে নামাজ পড়া জায়েজ হবে না। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত। দলিল হলো, নাজাসাতে খফীফার ক্ষেত্রে "অনেক বেশি" দ্বারা আন্দাজ করা হয়। অর্থাৎ নাজাসাতে খফীফা যদি অনেক লেগে যায় তবে তা দ্বারা নামাজ জায়েজ নেই। আর কতিপয় বিধানের ক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশকে সমগ্রের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। যেমন— মাথার এক-চতুর্থাংশের মাসাহকে পুরো মাসাহ-এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। এক-চতুর্থাংশ সতর খোলা পুরো সতর খোলার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। ইহ্রাম অবস্থায় মাথার এক-চতুর্থাংশের হলক করাকে পুরো মাথা হলক করার স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়। মুদ্দাকথা, এক-চতুর্থাংশ كل তথা সমগ্রের স্থলাভিষিক্ত। আর كل দ্বারা নাজাসাতে খফীফা অনেক বেশি হাসিল হয়ে যায়। সুতরাং যা তার স্থলাভিষিক্ত তথা এক-চতুর্থাংশ তার দ্বারাও অনেক বেশি হাসিল হয়ে যায়। আর যেহেতু নাজাসাতে খফীফার অনেক বেশি মাফ নয় তাই আমরা বলেছি যদি কাপড়ের এক চতুর্থাংশে নাজাসাত লেগে যায় তবে তা দ্বারা নামাজ জায়েজ হবে না। এখন এক-চতুর্থাংশ দ্বারা কি মুরাদ? এ

ব্যাপারে ফুকাহাগণের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একটি বর্ণনা হলো পুরো কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ যদিও কাপড় বড় হয়। আল্লামা ইব্‌নুল হুমাম (র.) এ মতটি পছন্দ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর আরেকটি বর্ণনা হলো مَا يَجُوزُ بِهِ الصَّلٰوةُ -এর এক-চতুর্থাংশ। অর্থাৎ এ পরিমাণ কাপড় যার দ্বারা নামাজ হয়ে যায় তার এক-চতুর্থাংশ। যেমন- লুঙ্গি। কেউ কেউ বলেছেন, কাপড়ের যে অংশে নাজাসাত লেগেছে তার এক-চতুর্থাংশ। যেমন- আঁচল, কলি। সুতরাং যদি আঁচলের এক-চতুর্থাংশে নাজাসাতে খফীফা লেগে যায় তবে তা দ্বারা নামাজ জায়েজ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাজাসাতে খফীফা যদি একবর্গ বিঘত হয়, তা অনেক বেশি তা দ্বারা নামাজ জায়েজ হবে না। যদি তার থেকে কম হয় তবে ক্ষমারযোগ্য তা দ্বারা নামাজ জায়েজ হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, হালাল পশুর পেশাব ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) উভয়ের মতে নাজাসাতে খফীফা। ইমাম সাহেবের মতে এর কারণ হলো, হালাল পশুর পেশাবের ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের নস রয়েছে যেমন- উরায়নার হাদীস দ্বারা পেশাবের তাহারাত বুঝা যায়, আর إِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ দ্বারা মুত্‌লাকান পেশাব নাপাক বুঝা যায়। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এর কারণ হলো হালাল পশুর পেশাব পাক নাপাক হওয়ার ব্যাপারে মুজতাহিদীনের ইখ্‌তিলাফ রয়েছে, যেমন- ইমাম মুহাম্মদ (র.) পাক বলেন আর অন্যান্য ইমামগণ নাপাক বলেন। এ জন্য এগুলোর পেশাব নাজাসাতে খফীফা হবে।

وَإِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنَ الرَّوْثِ الخ : যদি কোনো কাপড়ে লেদা বা গরুর গোবর এক দিরহামের অধিক লেগে যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ঐ কাপড়ে নামাজ জায়েজ হবে না। আর সাহেবাঈনের মতে জায়েজ হবে। ইমাম সাহেব (র.) দলিল হলো- লেদা ও গোবর নাজাসাতে গলীযা। কেননা তার নাপাক হওয়ার ওপর নস বিদ্যমান। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কাযায়ে হাজাতের জন্য তাশরীফ নিয়েছিলেন। আমাকে বললেন, তিনটি পাথর নিয়ে আসো। কিন্তু পাথর পাওয়া গেল দু'টি, তৃতীয়টি পাওয়া যায়নি। তাই আমি একখণ্ড গোবর নিয়ে আসলাম। তিনি দু'টো পাথর তো নিলেন কিন্তু গোবরকে এ বলে নিক্ষেপ করে দিলে هٰذَا رِجْسٌ এটি নাপাকী। সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা লেদা যে নাপাক তা বুঝা গেল। আর যেহেতু অন্য কোনো হাদীস এর বিরোধ নেই যা লেদার তাহারাতকে বুঝায়, তাই প্রতীয়মান হলো যে, লেদা ও গোবর নাজাসাতে গলীযা। কেননা ইমাম সাহেবের মতে দু'টো নস-এর মাঝে বিরোধ না থাকলে নাজাসাতে গালীযা প্রামাণিত হয়ে যায়। আর বিরোধ দ্বারা নাজাসাতে খফীফা সাব্যস্ত হয়। মোটকথা, লেদা ও গোবর নাজাসাতে গলীযা। আর নাজাসাতে গলীযা এক দিরহামের অধিক মাফ নয়; তাই এ পরিমাণ লেদা-গোবর দ্বারা নামাজ জায়েজ হবে না। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো- লেদা, গোবর ইত্যাদি নাজাসাতে খফীফা। কেননা এগুলোর পাক-নাপাক হওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালিক (র.) এগুলোকে পাক বলেন। পক্ষান্তরে অন্যান্যরা নাপাক বলেন। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহেবাইনের মতে কোনো জিনিসের পাক-নাপাক হওয়ার ব্যাপারে মুজতাহিদীনের মতানৈক্য দ্বারা তার নাজাসাতে খফীফা হওয়াকে সাব্যস্ত করে। আর নাজাসাতে খফীফা নামাজের জন্য তখন অন্তরায় হবে যখন তা কাপড়েরর এক-চতুর্থাংশে লেগে যায়। সুতরাং এ নাজাসাত যদি এক দিরহামের চেয়ে অধিক হয় কিন্তু কাপড়ের এক-চতুর্থাংশের কম হয়, তাহলে তা সহ নামাজ জায়েজ হবে।

সাহেবাইনের দ্বিতীয় দলিল হলো- লেদা ইত্যাদির মধ্যে জরুরতও রয়েছে আবার উমূমে বালওয়াও বিদ্যমান। কেননা সাধারণত রাস্তা-ঘাট গোবর ভরা থাকে। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, জরুরত ও উমূমে বালওয়ার সময় সহজতর পন্থা অবলম্বন করা হয়। সুতরাং লেদা, গোবর ইত্যাদির মাঝেও উমূমে বাল্‌ওয়ার কারণে তাখফীফ এসে গেছে। সহজ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

بِخِلَافِ بَوْلِ الْحِمَارِ দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো- যেমনিভাবে লেদা ইত্যাদির মধ্যে জরুরত রয়েছে এমনিভাবে গাধার পেশাবেও জরুরত এবং عموم بلوى সুতরাং যেমনিভাবে লেদা ইত্যাদিকে নাজাসাতে খাফীফা বলা হয় এমনিভাবে গাধার পেশাবকেও নাজাসাতে খফীফা বলা উচিত, অথচ আপনারা গাধার পেশাবকে নাজাসাতে গলীযা বলেন? জবাব হলো- পেশাবের মধ্যে عموم بلوى নেই। কেননা পেশাব এমন জিনিস যাকে ভূমি চুষে নিয়ে যায়। এখন ভূমিতে এমন আর কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই যার দ্বারা পথচারীদের কষ্ট হয়। কিন্তু লেদা, গোবর এর বিপরীত। কেননা ভূমি এগুলো চুষে নিতে পারে না।

সাহেবাইনের উপরোক্ত দলিলের উপর প্রশ্ন জাগে যে, عموم بلوى আর জরুরতের কারণে তো নাজাসাত দূর হয়ে যায়। যেমন– বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক নয় অথচ নাপাক হওয়া উচিত। কেননা বিড়ালের গোশ্‌ত হারাম এবং নাপাক। কিন্তু জরুরত এবং عموم بلوى-এর কারণে নাজাসাত দূর হয়ে গেছে। এর জবাব হচ্ছে– বিড়ালের উচ্ছিষ্টের তুলনায় লেদা ও গোবর ইত্যাদির মধ্যে জরুরত ও عموم بلوى কম। কেননা বিড়ালের উচ্ছিষ্টের মধ্য থেকে নাজাসাত দূর হয়ে গেছে। আর লেদা ও গোবরের নাজাসাতের মধ্যে তাখফীফ হয়েছে সুতরাং উভয়টির পার্থক্য প্রকাশ্য।

হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে সাহেবাইনের দলিলের জবাব এভাবে দিয়েছেন যে, লেদা ও গোবরের মধ্যে জরুরত রয়েছে তা আমরাও জানি, তবে এ জরুরত শুধু জুতার মধ্যে প্রযোজ্য– অন্য কিছুর মধ্যে নয়।

সুতরাং যা জুতার মধ্যে প্রযোজ্য তা আর অন্য কোনো দিকে ধাবিত হবে না। আর জুতার মধ্যে জরুরত একবার ভূমিকা রেখেছে। জুতা ভূমিতে ঘসা দ্বারা পাক হয়ে যায়। এতেই জরুরতের দাবি পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই দ্বিতীয়বার তার নাজাসাতের মধ্যে তাখফীক করা যাবে না। কারণ এক জরুরত দ্বারা একবারই তাখফীফ করা হয় বারবার তাযফীক করা যায় না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আমাদের ওলামায়ে কেরামের মতে হালাল পশু ও হারাম পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ যেমনিভাবে হারাম পশুর লেদা, গোবর ইত্যাদি হারাম এমনিভাবে হালাল পশুর লেদা, গোবর ইত্যাদিও নাপাক। তবে এগুলোর গলীযা ও খফীফা হওয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে যা উপরে আলোচিত হয়েছে। তবে ইমাম যুফার (র.) উভয়ের মাঝে পার্থক্য করেছেন, অর্থাৎ হারাম পশুর ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং বলেছেন, এগুলো নাজাসাতে গলীযা। আর হালাল পশুর ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং বলেছেন এগুলো নাজাসাতে খফীফা।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন রায় শহরে প্রবেশ করলেন, তখন লোকদেরকে ব্যাপকভাবে এর মধ্যে লিপ্ততা দেখতে পেলেন। কেননা সেখানের রাস্তাঘাট সবকিছু গোবরে ভরা ছিল। তখন ইমাম মুহাম্মদ (র.) ফতোয়া দিয়ে দিলেন যে, অধিক বেশি পরিমাণ নাপাকীও যদি কাপড় অথবা শরীরে লাগে তা নামাজ আদায়ে বাধা হবে না। উক্ত মাসআলার উপর মাশায়িখগণ বুখারার গোবর মিশ্রিত কাদামাটিকে কিয়াস করেছেন। তারা বলেছেন এগুলোও যে পরিমাণ লাগবে তা নামাজ আদায়ে বাধা সৃষ্টি করবে না।

উক্ত ঘটনার প্রাক্কালে মোজার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.) পূর্বশর্ত প্রত্যাহার করেছেন বলে বর্ণনা করা হয়। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রথমে বলেছিলেন যে, মোজা ভূমিতে ঘসা দ্বারা পাক হবে না, কিন্তু উক্ত ঘটনার পর তিনি তাঁর পূর্ব মতামত প্রত্যাহার করেছেন এবং শায়খাইনের মতামত অনুযায়ী মতামত পেশ করেছেন।

وَاِنْ اَصَابَهُ بَوْلُ الْفَرَسِ لَمْ يُفْسِدْهُ حَتّٰى يَفْحُشَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) لَاتَمْنَعُ وَاِنْ فَحُشَ لِاَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ مُخَفَّفُ نَجَاسَةٍ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَلَحْمُهُ مَاكُوْلٌ عِنْدَهُمَا وَاَمَّا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ فَالتَّخْفِيْفُ لِتَعَارُضِ الْاٰثَارِ وَاِنْ اَصَابَهُ خُرْءُ مَا لَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُوْرِ اَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ اَجْزَأَتِ الصَّلٰوةُ فِيْهِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) لَايَجُوْزُ فَقَدْ قِيْلَ اِنَّ الْاِخْتِلَافَ فِى النَّجَاسَةِ وَقَدْ قِيْلَ فِى الْمِقْدَارِ وَهُوَ الْاَصَحُّ هُوَ يَقُوْلُ اِنَّ التَّخْفِيْفَ لِلضَّرُوْرَةِ وَلَاضَرُوْرَةَ لِعَدَمِ الْمُخَالَطَةِ فَلَا يُخَفَّفُ وَلَهُمَا اَنَّهَا تَذْرِقُ مِنَ الْهَوَاءِ وَالتَّحَامِىْ عَنْهُ مُتَعَذِّرٌ فَتَحَقَّقَتِ الضَّرُوْرَةُ وَلَوْ وَقَعَ فِى الْاِنَاءِ قِيْلَ يُفْسِدُهُ وَقِيْلَ لَايُفْسِدُهُ لِتَعَذُّرِ صَوْنِ الْاَوَانِىْ عَنْهُ ـ

অনুবাদ : যদি কাপড়ে ঘোড়ার পেশাব লেগে যায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বেশি পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত তা কাপড় নষ্ট করবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বেশি পরিমাণ হলেও তা (নামাজ আদায়ে) বাধা সৃষ্টি করবে না। কেননা তাঁর মতে, হালাল পশুর পেশাব পাক। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা নাজাসাতে খফীফা (লঘু নাপাক) আর উভয়ের মতে তার গোশ্ত হালাল। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দৃষ্টিতে তাতে লঘুত্ব এসেছে হাদীসের পরস্পর বিরোধের কারণে। হারাম পাখির পায়খানা যদি কাপড়ে এক দিরহাম পরিমাণের বেশি লেগে যায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তাতে নামাজ জায়েজ হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না। কারো কারো মতে এ মতপার্থক্য হলো নাজাসাতের ব্যাপারে। (অর্থাৎ শায়খাইনের মতে উক্ত পাখির পায়খানা পাক। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নাপাক) আর কারো কারো মতে পরিমাণের ব্যাপারে (অর্থাৎ সকলের মতেই নাপাক, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা নাজাসাতে খফীফা, পক্ষান্তরে অন্য দুই ইমামের মতে নাজাসাতে গলীযা) এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) যুক্তি দিয়ে বলেন, লঘুত্ব আরোপ করা হয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে। কিন্তু সাধারণত এদের সাথে মেলামেশা না থাকার কারণে এখানে প্রয়োজন নেই। সুতরাং লঘুত্ব আরোপিত হবে না। শায়খাইনের যুক্তি হলো– পাখিরা শূন্য থেকে বিষ্টা ত্যাগ করে। আর তা থেকে বেঁচে থাকা দুষ্কর। সুতরাং এ প্রেক্ষিতে প্রয়োজন সাব্যস্ত হয়েছে। যদি তা (হারাম পাখির পায়খানার) পাত্রে পড়ে, তাহলে কোনো কোনো মতে তা পাত্রকে নষ্ট করে দিবে, আর কোনো কোনো মতে নষ্ট করবে না। কেননা পাত্রটি তা থেকে রক্ষা করা দুষ্কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঘোড়া ও হালাল পশুর পেশাবের ব্যাপারে ওলামায়ে আহ্নাফের মতানৈক্য রয়েছে। শায়খাইনের মতে ঘোড়া ও হালাল পশুর পেশাব নাপাক, তবে নাজাসাতে খফীফা। যদি কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ লেগে যায় তবে কাপড় নাপাক এবং নামাজে বাধাদানকারী হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ঘোড়া ও হালাল পশুর পেশাব নামাজের বাধাদানকারী নয়। তা অনেক বেশি হোক বা কম হোক। তার দলিল হলো– হালাল পশুর পেশাব পাক। পাক জিনিস যত পরিমাণই লাগুক না কেন

নামাজে বাধাদানকারী নয়। এ জন্য হালাল পশুর পেশাব নামাজে বাধাদানকারী নয়। যদিও অধিক পরিমাণই হোকনা কেন। শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো, হালাল পশুর পেশাব নাপাক তবে লঘু নাপাক। উপরে বর্ণিত হয়েছে নাজাসাতে খফীফা যদি কাপড়ের এক-চতুর্থাংশের কম পরিমাণ হয় তবে পাক, নামাজে বাধাদানকারী নয়। আর যদি অধিক পরিমাণ হয়, তাহলে নামাজে বাধাদানকারী কিন্তু তাখফীফ-এর কারণ ভিন্ন ভিন্ন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে হালাল পশুর পেশাব এ জন্য নাজাসাতে খফীফা যে এর নাজাসাত এ তাহারাতের ব্যাপারে মুজ্‌তাহিদীনে উম্মতের ইখ্‌তিলাফ রয়েছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে পরস্পর বিরোধী নস হওয়া নাজাসাতে খফীফার কারণ। কেননা উরায়নার হাদীস পেশাবের পবিত্রতা আর اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ الخ পেশাবের নাজাসাতের উপর দালালাত করে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সাহেবাইনের মতে ঘোড়ার গোশত হালাল। আর ইমাম আবূ হানীফার (র.)-এর মতে হারাম। তবে হুরমতটি সর্বদা এবং জেহাদের বাহন হওয়ার কারণে নাজাসাতের কারণে নয়।

وَاِنْ اَصَابَهُ خُرْءُ الخ : হারাম পাখির পায়খানা যদি এক দিরহাম বা তার অধিক পরিমাণ কাপড় বা শরীরে লেগে যায় তবে শায়খাইনের মতে তাতে নামাজ জায়েজ হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জায়েজ হবে না। শায়খাইন ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উপরোক্ত মতভেদ তার তাহারাত ও নাজাসাত -এর ব্যাপারে নাকি তার পরিমাণের ব্যাপারে? এ ব্যাপারে ইমাম কারখী (র.) বলেন, তাঁদের মতভেদ তাহারাত ও নাজাসাতের ব্যাপারে অর্থাৎ হারাম পাখির পায়খানা শায়খাইনের মতে পাক। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নাপাক। ফকীহ আবূ জা'ফর (র.) বলেন, এ মতপার্থক্য তার পরিমাণের ব্যাপারে। অর্থাৎ সকলের মতেই তা নাপাক। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নাজাসাতে খফীফা। আর সাহেবাইনের মতে নাজাসাতে গলীযা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হিদায়ার ইবারত দ্বারা বুঝা যায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) উপরোক্ত বর্ণনা গুলোতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে আছেন। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়; বরং ইমাম কারখীর বর্ণনা মতে ইমাম আবূ হানীফার সাথে আর ফকীহ আবূ জা'ফরের বর্ণনা মতে ইমাম মুহাম্মদের সাথে আছেন। (যার বর্ণনা অধম উপরে করেছি।) হিদায়া গ্রন্থকার বলেন এ মতটি বিশুদ্ধতম। অর্থাৎ তাদের মতবিরোধ পরিমাণের ব্যাপারে।– (ইনায়া)

হিদায়া প্রণেতার বর্ণনা মতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো– নাজাসাতের ব্যাপারে লঘুত্ব প্রয়োজনের ভিত্তিতে আরোপ করা হয়। কিন্তু এখানে পাখির সাথে মানুষের মেলামেশা না থাকার কারণে কোনো প্রয়োজন নেই। তাই লঘুত্ব আরোপ করা হয়নি। শায়খাইনের দলিল হলো, পাখিরা শূন্য থেকে বিষ্টা ত্যাগ করে, আর তা থেকে বেঁচে থাকা দুষ্কর। এ কারণে এখানে প্রয়োজন সাব্যস্ত হয়েছে।

মাওলানা আব্দুল হাই (র.) লিখেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে লঘুত্বের ভিত্তি হলো দুই নস-এর বিরোধের উপর যা এখনো প্রকাশ পায়নি। তাহলে প্রয়োজনের ভিত্তিতে লঘুত্বের ওয়াজূদ-এর উপর কিভাবে দলিল হবে?

এর জবাব হলো, এই ওয়াজূদ লঘুত্বের দলিল নয় বরং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিলের জবাব। আর যদি হারাম পাখির পায়খানা পাত্রে পড়ে, তবে এ সম্পর্কে দু'টো মতামত রয়েছে। এক. ঐ পায়খানা পাত্রকে নাপাক করে দিবে। এ মতটি আবূ বকর আ'মাশ (র.) গ্রহণ করেছেন। দুই. পাত্রকে নাপাক করবে না। এ মতটি ইমাম কারখী (র.) গ্রহণ করেছেন। আবূ বকর আ'মাশ বলেন, পাত্রগুলোকে এর থেকে রক্ষা করা জরুরত সাব্যস্ত সম্ভব। তাই পাত্রের ক্ষেত্রে কোনো জরুরত সাব্যস্ত নেই। ইমাম কারখী (র.) বলেন, পাত্রাদি এর থেকে রক্ষা করা দুষ্কর। তাই পাত্রের ক্ষেত্রেও জরুরত সাব্যস্ত হবে।

وَاِنْ اَصَابَهُ مِنْ دَمِ السَّمَكِ اَوْ مِنْ لُعَابِ الْبَغْلِ اَوِ الْحِمَارِ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ اَجْزَاتِ الصَّلٰوةُ فِيْهِ اَمَّا دَمُ السَّمَكِ فَلِاَنَّهٗ لَيْسَ بِدَمٍ عَلَى التَّحْقِيْقِ فَلَايَكُوْنُ نَجِسًا وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رـ) اَنَّهٗ اِعْتَبَرَ فِيْهِ الْكَثِيْرَ الْفَاحِشَ فَاعْتَبَرَهٗ نَجِسًا وَاَمَّا لُعَابُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ فَلِاَنَّهٗ مَشْكُوْكٌ فِيْهِ فَلَايَتَنَجَّسُ بِهِ الطَّاهِرُ فَاِنِ انْتَضَحَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ مِثْلَ رُؤُوْسِ الْاِبَرِ فَذٰلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِاَنَّهٗ لَايُسْتَطَاعُ الْاِمْتِنَاعُ عَنْهُ .

অনুবাদ : যদি কাপড়ে মাছের রক্ত বা গাধা ও খচ্চরের লালা দিরহামের বেশি পরিমাণও লেগে যায়, তাহলে তাতে নামাজ দুরস্ত হবে। মাছের রক্তের ক্ষেত্রে কারণ হলো, প্রকৃতপক্ষে তা রক্তই নয়। সুতরাং তা নাপাক হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ ক্ষেত্রে তিনি অত্যধিক পরিমাণের উপর নির্ভর করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এটাকে তিনি নাজাসাত গণ্য করেছেন। গাধা ও খচ্চরের লালা সম্পর্কে কেননা, তা নাপাক হওয়ার ব্যাপারেই সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং কোনো পাক বস্তু তা দ্বারা নাপাক হতে পারে না। যদি কাপড়ে সূচের মাথার মতো পেশাবের ছিটা এসে পড়ে তাহলে তা ধর্তব্য নয়। কেননা তা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কাপড়ে মাছের রক্ত বা গাধা ও খচ্চরের লালা এক দিরহামের বেশি পরিমাণ লেগে যায়, তাহলে ঐ কাপড়ে নামাজ জায়েজ আছে। মাছের রক্তের ক্ষেত্রে কারণ হলো, মাছের রক্ত প্রকৃত পক্ষে কোনো রক্তই নয়। কেননা মাছের রক্ত রোদের তাপে সাদা হয়ে যায় অথচ অন্যান্য রক্ত রোদের তাপে কালো হয়ে যায়। এ কারণেই জবাই ছাড়াও মাছ খাওয়া জায়েজ। মোট কথা যখন মাছের রক্ত কোনো রক্তই নয় তখন তা নাপাকও হবে না। আর যখন নাপাক নয় তখন নামাজ জায়েজ হওয়াতেও কোনো বাধাদানকারী নয়। ইমাম আবূ ইউসুফের একটি বর্ণনা রয়েছে যে, মাছের রক্ত নাজাসাতে খফীফা। সুতরাং কোনো কাপড়ে যদি অধিক পরিমাণ লেগে যায় তবে তাতে নামাজ জায়েজ হবে না। গাধা ও খচ্চরের লালা সম্পর্কে কেননা এগুলোর লালার সন্দেহ রয়েছে। তাই পাক কোনো বস্তু তা দ্বারা নাপাক হবে না।

فَاِنِ انْتَضَحَ الخ : উক্ত মাসআলার সূরতে মাসআলার দলিল প্রকাশ্য। তাই তা আর পুনরায় বয়ানের কোনো দরকার নেই।

وَالنَّجَاسَةُ ضَرْبَانِ مَرْئِيَّةٌ وَغَيْرُ مَرْئِيَّةٍ فَمَا كَانَ مِنْهَا مَرْئِيًّا فَطَهَارَتُهَا بِزَوَالِ عَيْنِهَا لِأَنَّ النَّجَاسَةَ حَلَّتِ الْمَحَلَّ بِاعْتِبَارِ الْعَيْنِ فَتَزُولُ بِزَوَالِهِ إِلَّا أَنْ يَبْقَى مِنْ أَثَرِهَا مَا يَشُقُّ إِزَالَتُهُ لِأَنَّ الْحَرَجَ مَدْفُوعٌ وَهٰذَا يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْغَسْلُ بَعْدَ زَوَالِ الْعَيْنِ وَإِنْ زَالَ بِالْغَسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَفِيهِ كَلَامٌ ـ

অনুবাদ : নাজাসাত দু' প্রকার দৃশ্য ও অদৃশ্য। (অর্থাৎ শুকিয়ে যাবার পর যে নাজাসাতের পদার্থ দেখা যায়, তা দৃশ্য নাজাসাত, যেমন– পায়খানা। আর যা দেখা যায় না, তা অদৃশ্য নাজাসাত, যেমন– পেশাব।) সুতরাং যে নাজাসাত দৃশ্য হয়, তা থেকে পবিত্রতা অর্জিত হবে নাজাসাতের মূল পদার্থ দূর হওয়া দ্বারা। কেননা নাজাসাত সত্তাগতভাবে স্থানটিতে প্রবেশ করেছে। সুতরাং তার সত্তা দূর হলে নাজাসাত বিদূরিত হবে, তবে দূর করা কষ্টকর এমন দাগ লেগে গেলে দোষ নেই। কেননা (শরিয়তে) কষ্ট থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। এ হুকুম ইঙ্গিত করে যে, একবার ধোয়ার দ্বারাও যদি নাপাক পদার্থ দূর হয়ে যায় তাহলে পুনরায় ধোয়ার (তিনবার ধোয়ার) শর্ত নেই। অবশ্য এ সম্পর্কে (মাশায়িখদের) মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শায়খ কুদূরী (র.) বলেন, নাজাসাত দু' প্রকার। দৃশ্য ও অদৃশ্য। কেননা শুকিয়ে যাবার পর যে নাজাসাতের পদার্থ দেখাও যায় তা হলো দৃশ্য নাজাসাত। আর যার পদার্থ দেখা যায় না তা অদৃশ্য নাজাসাত। দৃশ্য নাপাক থেকে তাহারাত হাসিল করার তরীকা হলো, তার মূল সত্ত দূর করে দিতে হবে যদিও তার কোনো রং ঘ্রাণ ইত্যাদি থেকে যায়। দলিল হলো– নাজাসাত সত্তাগতভাবে স্থানটিতে প্রবেশ করেছে। তাই তার সত্তা দূর হলে নাজাসাত দূর হয়ে যাবে। তবে এ ধরনের দূর করা খুবই কষ্টকর। তাই কোনো দাগ ইত্যাদি লেগে থাকলে কোনো দোষ নেই। কেননা শরিয়তে কষ্ট থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। এর সমর্থন খাওলা বিনতে ইয়াসার-এর হাদীস দ্বারাও পাওয়া যায়। হাদীসটি হলো নিম্নরূপ–

أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ ثَوْبًا وَاحِدًا وَإِنِّيْ أَحِيضُ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ رُشِّيهِ وَاقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ يَبْقَى لَهُ أَثَرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَكْفِيكِ الْمَاءُ فَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ ـ

খাওলা বিনতে ইয়াসার (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট মাত্র একটি কাপড় আছে। এতেই আমি মাসিক এর কাজ সমাধা করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এর উপর পানির ছিটা দাও তারপর মলো তারপর তা পানি দ্বারা ধৌত করো। খাওলা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তারপরও তো তার দাগ অবশিষ্ট থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার জন্য পানিই যথেষ্ট। অর্থাৎ পানি দ্বারা ধোয়া। এরপরও কোনো দাগ ইত্যাদি অবশিষ্ট থাকলে কোনো অসুবিধা নেই।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কুদূরীর কথা এ দিকে ইঙ্গিত করে যে, মূল নাজাসাত চলে যাবার পর পুনরায় ধোয়া শর্ত নয়। যদিও মূল নাজাসাত একবার ধৌত করলেই চলে যায়। অর্থাৎ দৃশ্য নাজাসাত একবার ধোয়ার দ্বারা দূর হয়ে গেলে এটাই যথেষ্ট। আর যদি তিনবার ধুলেও দূর না হয় তাহলে মূল নাজাসাত না যাওয়া পর্যন্ত ধুইতেই থাকবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যদি দৃশ্য নাজাসাত একবার ধৌত করলেই দূর হয়ে যায় তবে এতে মাশায়িখগণের মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে মূল নাজাসাত দূর হয়ে যাবার পর পুনরায় তিনবার ধুইবে। কেননা মূল নাজাসাত দূর হয়ে যাবার পর তা অদৃশ্য নাজাসাতের ন্যায় হয়ে গেছে। আর অদৃশ্য নাজাসাতকে তিনবার ধোয়া শর্ত।

ফকীহ আবূ জা'ফর (র.) বলেন, একবার ধোয়ার পর পুনরায় দু'বার ধুইবে। তাহলে তিনের সংখ্যা পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত হলো যা বিজ্ঞ গ্রন্থকার দিয়েছেন। (একবার ধোয়ার দ্বারা নাজাসাত দূর হলে পুনরায় তিনবার ধোয়ার শর্ত নেই)

وَمَا لَيْسَ بِمَرْئِيٍّ فَطَهَارَتُهُ أَنْ يَغْسِلَ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ الْغَاسِلِ أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ لِأَنَّ التَّكْرَارَ لَابُدَّ مِنْهُ لِلْاِسْتِخْرَاجِ وَلَا يُقْطَعُ بِزَوَالِهِ فَاعْتُبِرَ غَالِبُ الظَّنِّ كَمَا فِي أَمْرِ الْقِبْلَةِ وَإِنَّمَا قَدَّرُوْا بِالثَّلْثِ لِأَنَّ غَالِبَ الظَّنِّ يَحْصُلُ عِنْدَهُ فَأُقِيْمَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ مَقَامَهُ تَيْسِيْرًا وَيَتَأَيَّدُ ذٰلِكَ بِحَدِيْثِ الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ مَنَامِهِ ثُمَّ لَابُدَّ مِنَ الْعَصْرِ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَخْرِجُ ـ

অনুবাদ : আর যে নাজাসাত দৃশ্য নয় (যেমন– পেশাব ও মদ) তা থেকে তাহারাত হাসিলের উপায় হলো ধোয়া, যাতে ধৌতকারীর প্রবল ধারণা হয় যে, তা পাক হয়ে গেছে। কেননা নাপাকির নিষ্কাশনের জন্য (ধোয়ার ক্ষেত্রে) বারংবারতা অপরিহার্য। আর নাজাসাত দূরীভূত হওয়ার নিশ্চয়তা লাভ সম্ভব নয়। সুতরাং ধারণাই বিবেচ্য হবে। যেমন কিবলার মাসআলা রয়েছে। (অর্থাৎ যদি কিবলা জানা না থাকে এবং জিজ্ঞাসা করার মতো উপযুক্ত লোকও না থাকে, তাহলে নিজস্ব প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে কিবলা নির্ধারণ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।) ফকীহগণ তিনবারের সীমা নির্ধারণ করেছেন এ কারণে যে, তাতে (নিষ্কাশনের) প্রবল ধারণা লাভ হয়ে থাকে। সুতরাং সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রকাশ্য কারণকে প্রবল ধারণার স্থলবর্তী করা হয়েছে। নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া সংক্রান্ত হাদীস দ্বারা এ মতামতের সমর্থন পাওয়া যায়। (কেননা তাতে তিনবার ধোয়ার কথা রয়েছে) যাহিরী বর্ণনা মতে প্রতিবার ধোয়ার পর নিংড়ানো জরুরি। কেননা নিংড়ানোই (নাসাজাত) নিষ্কাশনকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে নাজাসাতের দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ অদৃশ্য নাজাসাতের বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– পেশাব মদ ইত্যাদি তার হুকুম হলো– কাপড় এ পরিমাণ ধুইতে হবে যে, ধৌতকারী ব্যক্তির প্রবল ধারণা হয়ে যায় পাক হয়ে গেছে। দলিল হলো– নাজাসাত বের করার জন্য বারবার ধোয়া জরুরি। আর যেহেতু ঐ নাজাসাত দূরীভূত হওয়ার নিশ্চয়তা লাভ সম্ভব নয় তাই প্রবল ধারণাই বিবেচিত হবে। যেমন কিবলার দিক নির্ধারণ করার মাসআলায় রয়েছে। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তির কিবলা কোন দিকে তা জানা না থাকে এবং জিজ্ঞাসা করার মতো উপযুক্ত কোনো লোকও না থাকে তবে এ অবস্থায় সে তাহাররী করবে। যেদিকে তার প্রবল ধারণা হয় তা-ই গ্রহণ যোগ্য হবে। এমনকি তাহাররী করে নামাজ আদায়ের পর যদি কিবলা অন্য দিকেও সাব্যস্ত হয় তবে নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ফকীহগণ প্রবল ধারণার ক্ষেত্রে তিনবারের সীমা নির্ধারণ করেছেন। কেননা এর দ্বারা প্রবল ধারণা লাভ হয়ে যায়। সুতরাং সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রকাশ্য কারণ তথা তিনের সংখ্যাকে প্রবল ধারণার স্থলবর্তী করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনবার ধুলেই পাক হয়ে যাবার হুকুম দেওয়া হবে। এ মতামতের সমর্থন হাদীস দ্বারাও পাওয়া যায়। হাদীসটি হলো–

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

উক্ত হাদীসে অস্পষ্ট নাজাসাতের কারণে তিনবার ধোয়ার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর যাহিরী বর্ণনা মতে কাপড় প্রতিবার নিংড়ানো জরুরি। কেননা নিংড়ানোই অদৃশ্য নাজাসাত নিষ্কাশনকারী। গায়রে যাহিরী বর্ণনায় ইমাম মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তৃতীয়বার নিংড়ানোই যথেষ্ট, প্রত্যেকবার নিংড়ানো জরুরি নয়।

فَصْلٌ فِى الْاِسْتِنْجَاءِ : اَلْاِسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ لِاَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهِ وَيَجُوْزُ فِيْهِ الْحَجَرُ وَمَا قَامَ مَقَامَهُ يَمْسَحُهُ حَتّٰى يُنَقِّيَهُ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ هُوَ الْاِنْقَاءُ فَيُعْتَبَرُ مَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ وَلَيْسَ فِيْهِ عَدَدٌ مَسْنُوْنٌ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) لَابُدَّ مِنَ الثَّلٰثِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلْيَسْتَنْجِ مِنْكُمْ بِثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ وَلَنَا قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ فَمَنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ وَمَنْ لَا فَلَاحَرَجَ وَمَا رَوَاهُ مَتْرُوْكُ الظَّاهِرِ فَاِنَّهٗ لَوِ اسْتَنْجٰى بِحَجَرٍ لَهٗ ثَلٰثَةُ اَحْرُفٍ جَازَ بِالْاِجْمَاعِ وَغَسْلُهٗ بِالْمَاءِ اَفْضَلُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَتَطَهَّرُوْا نَزَلَتْ فِىْ اَقْوَامٍ كَانُوْا يَتْبَعُوْنَ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ ثُمَّ هُوَ اَدَبٌ وَقِيْلَ سُنَّةٌ فِىْ زَمَانِنَا وَيَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ اِلٰى اَنْ يَقَعَ فِىْ غَالِبِ ظَنِّهٖ اَنَّهٗ قَدْ طَهُرَ وَلَا يُقَدَّرُ بِالْمَرَّاتِ اِلَّا اِذَا كَانَ مُوَسْوِسًا فَيُقَدَّرُ بِالثَّلٰثِ فِىْ حَقِّهٖ وَقِيْلَ بِالسَّبْعِ ـ

পরিচ্ছেদ : ইস্তিনজা

অনুবাদ : ইস্তিনজা হলো সুন্নত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তা সর্বদা করেছেন। তার তাতে পাথর এবং পাথরের ন্যায় জিনিস ব্যবহার করা জায়েজ আছে। এর দ্বারা (এ পরিমাণ) মুছে ফেলবে যাতে নাজাসাতের স্থানটি পরিষ্কার হয়ে যায়। কেননা পরিষ্কার হওয়াই হলো মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং যা মূল উদ্দেশ্য, সেটাই বিবেচ্য হবে। এতে কোনো (নির্দিষ্ট) সংখ্যা মাসনূন নয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, তিন সংখ্যা হওয়া জরুরি। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের প্রত্যেকে যেন তিনটি পাথর দ্বারা ইস্তিনজা করে। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি ইস্তিনজায় পাথর ব্যবহার করবে, সে যেন বেজোড় (অর্থাৎ তিন) সংখ্যা ব্যবহার করে। যে তা করল, সে ভালো করল আর যে করল না, তার কোনো ক্ষতি নেই।–(আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ) শাফি'ঈগণ যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার বাহ্যিক অর্থ বর্জন করা হয়েছে। কেননা কেউ তিন কোণ বিশিষ্ট একটি পাথর ব্যবহার করলে সর্বসম্মতিক্রমেই তা যথেষ্ট হবে। (সুতরাং বুঝা গেল তিন সংখ্যা আসলে উদ্দেশ্য নয়।) (পাথর বা ঢিলা ব্যবহার করার পর) পানি ব্যবহার করা উত্তম। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–সেখানে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা উত্তমভাবে তাহারাত লাভ করা পছন্দ করে। আলোচ্য আয়াত ঐ সকল লোকদের শানে নাজিল হয়েছিল যারা পাথর ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করতে। মোটকথা পানি ব্যবহার করা ইস্তিনজার আদব। কারো কারো মতে আমাদের যুগে এটা সুন্নত। আর পানি ততক্ষণ ব্যবহার করবে, যতক্ষণ তার প্রবল ধারণা হয় যে, তা পাক হয়ে গেছে। কতবার হবে তা নির্ধারণ করা হয়নি। তবে কেউ খুঁত খুঁতে স্বভাবের হলে তার ক্ষেত্রে তিনবার এবং মতান্তরে সাতবার নির্ধারণ করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) উক্ত পরিচ্ছেদে ইস্তিনজার আহকাম আলোচনা করেছেন। কোনো কোনো ওলামার মত হলো, ইস্তিনজা অজুর সুন্নত; তাই এর আলোচনা ওজুর সুনানের সাথে হওয়ার প্রয়োজন ছিল? জবাব হলো, পায়খানা-পেশাবের রাস্তা থেকে নাজাসাতে হাকীকিয়াকে দূর করার নাম হলো ইস্তিনজা তাই তাকে باب الانجاس وتطهيرها অধীনে আনা হয়েছে।

استنجاء ، استطابة ، استجمار একই অর্থের বিভিন্ন শব্দ। তবে استنجاء ও استطابة হলো ব্যাপক যা পানি বা অন্য কোনো জিনিস দ্বারাও হতে পারে। তবে استجمار শব্দটি ঢিলা ও পাথরের সাথে খাস। استنقاء -এর অর্থও পাথর ইত্যাদি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা। استبراء জমিনের উপর পা মারা استنزاء পেশাব থেকে পবিত্রতা চাওয়া।

استنجاء শব্দটি نجو থেকে নির্গত হয়েছে। نجو এমন জিনিসকে বলা হয় যা পেট থেকে নির্গত হয়। উঁচুস্থানকেও نجو বলা হয়। আমাদের মতে ইস্তিন্‌জা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ইমাম মালিক ও ইমাম মুযানীও এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে ফরজ।

ইস্তিন্‌জা সুন্নত হওয়ার উপর দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সবসময়ের আমল। যেমন– বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে,

عَنْ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَاَحْمِلُ اَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِيْ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةٍ فَيَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পায়খানার তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন আমি এবং আমার মতো এক ছেলে পানির পাত্র ও লাঠি বহন করলাম। অতঃপর তিনি পানি দ্বারা ইস্‌তিন্‌জা করলেন।

ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, قَالَتْ مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ إِلَّا مَسَّ مَاءً উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পায়খানা থেকে পানি ব্যবহার না করে বের হতে দেখিনি উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা (পানি দ্বারা) ইস্তিনজা করতেন।

ইস্তিন্‌জার মধ্যে পানি ও পানির গুণের অনুরূপ বস্তু ব্যবহার করা জায়েজ। এর কাইফিয়ত হলো, এর দ্বারা ইস্তিনজার স্থান এ পরিমাণ মুছে ফেলবে যাতে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। কেননা পরিষ্কার করাই হলো মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং যা মূল উদ্দেশ্য সেটাই বিবেচ্য হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, পাথরের মধ্যে কোনো সংখ্যা মাসনূন নয়; বরং যে পরিমাণ দ্বারা তাহারাত হাসিল হবে সে পরিমাণ ব্যবহার করবে। আর সে পরিমাণ তিন হোক বা তিন থেকে বেশি বা কম হোক। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, তিন সংখ্যা হওয়া জরুরি। দলিল হলো– হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ إِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلَايَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَايَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلَابَوْلٍ وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ .(بخاری)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের নিকট পিতৃতুল্য। যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ পায়খানায় যাবে, তখন পায়খানা পেশাবের সময় কিবলামুখী ও কিবলার দিকে পিঠ করে বসবে না। তিনটি পাথর দ্বারা ইস্তিন্‌জা করবে।–(বুখারী) উক্ত হাদীসে امر -এর صيغه এসেছে, যা وجوب -কে চায়। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা ইস্তিনজার ওয়াজিব হওয়ার এবং পাথরের মধ্যে তিনটি হওয়া সাব্যস্ত হলো। আমাদের দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَاحَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَافَلَا حَرَجَ وَمَنْ اَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهٖ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَاحَرَجَ وَمَنْ اَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا اَنْ يَجْمَعَ كَثِيْبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِيْ اٰدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَاحَرَجَ ـ (ابو داود)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সুরমা ব্যবহার করবে সে যেন বেজোড় (তিন) ব্যবহার করে। যে তা করল সে ভালো করল। আর যে করল না তার কোনো গুনাহ নেই। আর যে ব্যক্তি পাথর ইত্যাদি দ্বারা ইস্তিন্‌জা করবে সে যেন বেজোড় ব্যবহার করে। যে তা করল সে ভালো করল। আর যে করল না তার কোনো ক্ষতি নেই। যে ব্যক্তি খানা খায় (দাঁত লাগা) যা সে খেলাল দ্বারা বের করে তা নিক্ষেপ করে ফেলে দিবে। আর যা জিহবা দ্বারা বের করে তা খেয়ে ফেলবে। যে তা করল, সে ভালো করল, আর যে করল না তার কোনো গুনাহ নেই। যে ব্যক্তি পায়খানায় যায় সে যেন পর্দা করে, যদি পর্দা না পায় তবে বালুর স্তূপ বানাবে। তারপর বালুর দিকে পিঠ করে বসবে। কেননা শয়তান আদম সন্তানের লজ্জাস্থান দ্বারা খেল-তামাশা করে। তা করলে সে ভালো করল, আর যে তা করবে না তার কোনো ক্ষতি নেই।- (আবূ দাউদ)

আল্লামা ইব্‌নুল হুমাম (র.) বলেন, বেজোড় তো একও হয়। হাদীসের মধ্যে বলা হয়েছে বেজোড় তরক করলে কোনো ক্ষতি নেই। বুঝা গেল ইস্তিন্‌জা তরক করলেও কোনো ক্ষতি নেই। আর যে জিনিস তরক করল কোনো গুনাহ বা ক্ষতি নেই। তা ফরজ বা ওয়াজিব হতে পারে না। এতে প্রতীয়মান হলো ইস্তিন্‌জা ফরজ নয় বরং সুন্নত। আর বেজোড় যেমনিভাবে তিন সংখ্যা পাওয়া যায় এমনিভাবে তা এক, পাঁচ, সাত সংখ্যাতেও বিদ্যমান। এজন্য তিন সংখ্যা হওয়া জরুরি নয়।

ইমাম শাফি'ঈ (র.) বর্ণিত হাদীসের জবাব হলো, এ হাদীস متروك الظاهر তথা তার বাহ্যিক অর্থ বর্জন করা হয়েছে। কেননা কেউ যদি তিন কোণ বিশিষ্ট একটি পাথর ব্যবহার করে তবে সর্বসম্মতিক্রমে তা যথেষ্ট হবে। বুঝা গেল তিন সংখ্যা আসলে শর্ত নয়। দ্বিতীয় জবাব হলো, হাদীসে বর্ণিত امر-এর صيغه টি استحباب-এর জন্য প্রযোজ্য। তৃতীয় জবাব হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে ইস্তিন্‌জার জন্য পাথর চেয়েছিলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা.) দু'টি পাথর এনেছিলেন। তৃতীয় পাথর না পাওয়ায় এক খণ্ড গোবর এনছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পাথর দু'টো গ্রহণ করেছিলেন। আর গোবর খণ্ডটি নিক্ষেপ করে ফেলে দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন, এটা নাপাক। এখন তিনটি পাথর যদি ওয়াজিব হতো তবে তো রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয় আরেকটি পাথর অবশ্যই তলব করতেন। অথচ তিনি তৃতীয় আরেকটি পাথর তলব করেননি। যেমন- বুখারীতে এসেছে। এ ঘটনা দ্বারাও বুঝা গেল তিনের সংখ্যা শর্ত নয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ঢিলা বা পাথর ব্যবহার করার পর পানি দ্বারা ধোয়া উত্তম। কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী- فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا কুবাবাসীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছিল। আর কুবাবাসীদের আদত ছিল যে, তারা ঢিলা ব্যবহার করার পর পানি ব্যবহার করতো। মোটকথা ঢিলা ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করা মোস্তাহাব বা আদব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো পানি ব্যবহার করতেন আবার মাঝে মাঝে ছেড়েও দিতেন। এতো মোস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের যুগে পানি দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা সুন্নত। এটা হাসান বসরী থেকে বর্ণিত। দলিল হলো হযরত আলী (র.)-এর হাদীস-

قَالَ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَبْعَرُونَ بَعْرًا وَأَنْتُمْ تَثْلِطُونَ ثَلْطًا فَأَتْبِعُوا الْحِجَارَةَ الْمَاءَ . (البيهقى)

হযরত আলী (রা.) বলেন, তোমাদের পূর্বের লোকেরা বিষ্ঠা ত্যাগ করতো। আর তোমরা পায়খানা করো তাই তোমরা পাথরের পর পানি ব্যবহার করো।- (বায়হাকী)

গ্রন্থকার বলেন, পানি ততক্ষণ ব্যবহার করবে যতক্ষণ তার প্রবল ধরণা হয় যে, তা পাক হয়ে গেছে। তিন বা পাঁচবারের কোনো বাধ্যবাদকতা নেই। তবে কোনো ব্যক্তি যদি খুঁত খুঁতে স্বাভাবের হয় তার ক্ষেত্রে তিনবার নির্ধারণ করা হবে। যেমনটি ছিল অদৃশ্য নাজাসাতের ক্ষেত্রে। পায়খানা যদিও দৃশ্য নাজাসাত; কিন্তু ইস্‌তিন্‌জাকারী যেহেতু তা দেখতে পায় না, তাই সেও এ ব্যাপারে পেশাব তথা অদৃশ্য নাজাসাত অনুরূপ হবে। কেউ কেউ সাতবারকে নির্ধারণ করেছেন। এদের দলিল হলো, পাত্রে কুকুরের মুখ লাগলে সাতবার ধোয়ার হাদীস।

وَلَوْ جَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا لَمْ يَجُزْ إِلَّا الْمَاءُ وَفِيْ بَعْضِ النُّسَخِ إِلَّا الْمَائِعُ وَهٰذَا يُحَقِّقُ إِخْتِلَافَ الرِّوَايَتَيْنِ فِيْ تَطْهِيْرِ الْعُضْوِ بِغَيْرِ الْمَاءِ عَلٰى مَا بَيَّنَّا وَهٰذَا لِاَنَّ الْمَسْحَ غَيْرُ مُزِيْلٍ إِلَّا اَنَّهُ إِكْتَفٰى بِهٖ فِيْ مَوْضِعِ الْاِسْتِنْجَاءِ فَلَا يَتَعَدَّاهُ ثُمَّ يُعْتَبَرُ بِالْمِقْدَارِ لِلْمَانِعِ وَرَاءَ مَوْضِعِ الْاِسْتِنْجَاءِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَاَبِيْ يُوْسُفَ (رح) لِسُقُوْطِ اِعْتِبَارِ ذٰلِكَ الْمَوْضِعِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) مَعَ مَوْضِعِ الْاِسْتِنْجَاءِ اِعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْمَوَاضِعِ ـ

অনুবাদ : নাজাসাত যদি নির্গমন স্থান থেকে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে পানি ছাড়া যথেষ্ট হবে না। কুদূরীর কোনো কোনো সংস্করণে الا الماء -এর পরিবর্তে الا المائع রয়েছে। অর্থাৎ তরল পদার্থ ছাড়া যথেষ্ট হবে না। উভয় নুস্খার এ পার্থক্য পানি ছাড়া (অন্য তরল পদার্থ দ্বারা) অঙ্গ পাক করার ক্ষেত্রে ভিন্ন দু'টি মত থাকা প্রমাণ করে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। পানি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এ জন্য যে, শুধু মোছা (নাজাসাত) দূরীভূত করে না। তবুও নাজাসাতের নির্গমন স্থানের ক্ষেত্রে (প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে) সেটাকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত হুকুমকে অন্যত্র প্রলম্বিত করা যাবে না। ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে নাজাসাতের মূল স্থান বাদ দিয়ে নামাজে বাধাদানকারী পরিমাণ বিবেচনা করা হবে। (অর্থাৎ এক দিরহামের পরিমাণ হলে তা নামাজের জন্য বাধাদানকারী হয়। তবে তাদের মতে নাজাসাতের মূল স্থানকে হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হবে।) কেননা (শরিয়তের বিধান মতেই) উক্ত স্থান ধর্তব্য হওয়া রহিত হয়ে গেছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অন্য সকল স্থানের উপর কিয়াস করে এখানেও নাজাসাতের স্থানসহ হিসাব করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি নাজাসাত নির্গমন স্থান থেকে দিকবিদিক ছড়িয়ে পড়ে তা শুধু পানি দ্বারা দূরীভূত করা যাবে। পাথর ইত্যাদির দ্বারা মোছার কোনো প্রয়োজন নেই। কুদূরীর কোনো কোনো নুসখায় الا الماء -এর পরিবর্তে الا المائع রয়েছে। অর্থাৎ সে নাজাসাত নির্গমন স্থান থেকে ছড়িয়ে পড়ে তা শুধু প্রবাহমান বস্তু দ্বারা দূরীভূত করা যায়। প্রবাহিত জিনিস তা পানি বা পানি ছাড়া অন্য কোনো জিনিসও হতে পারে। যেমন– সিরকা ইত্যাদি। উভয় নুস্খার এ পার্থক্য পানি ছাড়া অন্য কোনো তরল পদার্থ দ্বারা অঙ্গ পাক করার ক্ষেত্রে ভিন্ন দু'টি মত থাকা প্রমাণ করে। যেমন– আমরা باب الانجاس -এর শুরুতে বয়ান করে এসেছি। অর্থাৎ الا الماء নুস্খা দ্বারা বুঝা যায় শরীর থেকে নাজাসাতে হাকীকিয়াকে একমাত্র পানি দ্বারা দূর করা জায়েজ। আর الا المائع নুস্খা দ্বারা বুঝা যায় যত জিনিস দ্বারা নাজাসাতে হাকীকিয়াকে দূর করা সম্ভব তত জিনিস দ্বারা দূর করা। আর তা পানি দ্বারা হোক বা অন্য কোনো জিনিস দ্বারা হোক। নাজাসাত নির্গমন স্থান অতিক্রম করলে তা ধোয়া ফরজ। এর দলিল হলো– পাথর ইত্যাদি দিয়ে মোছা দ্বারা নাজাসাত দূর হয় না; বরং ছড়িয়ে পড়ে। তবুও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নাজাসাতের নির্গমন স্থানের ক্ষেত্রে সেটাকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত হুকুমকে অন্যত্র প্রলম্বিত করা যাবে না। বুঝা গেল পানি ব্যতীত অন্য কোনো জিনিস দ্বারা পাক করলে তা জায়েজ হবে না। প্রকাশ থাকে যে, যতটুকু নাজসাত নামাজকে বাধাদানকারী, এ সম্পর্কে শায়খাইনের মতে নাজাসাতের মূল স্থান ব্যতীত এক দিরহামের অধিক। কেননা নাজাসাতের স্থানতো পরিহারযোগ্য তাই তা ব্যতীত এক দিরহাম থেকে বেশি হলে তা ধোয়া ফরজ। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নামাজের স্থানসহ যদি এক দিরহামের অধিক হয়, তাহলে নামাজকে বাধাদানকারী বলে বিবেচিত হবে। অন্য সকল স্থানের ওপর কিয়াস করে তিনি উপরোক্ত মতামত দিয়েছেন। অর্থাৎ অন্যান্য স্থানে যেমনিভাবে এক দিরহাম পরিমাণ নাজাসাত মাফ এক দিরহামের অধিক মাফ নয় এমনিভাবে নাজাসাতের স্থানের ক্ষেত্রেও যদি এক দিরহাম হয় তাহলে মাফ হবে, আর যদি বেশি হয় তাহলে মাফ হবে না।

وَلَا يَسْتَنْجِىْ بِعَظْمٍ وَلَابِرَوْثٍ لِاَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ وَلَوْ فَعَلَ يُجْزِيْهِ لِحُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ وَمَعْنَى النَّهْيِ فِى الرَّوْثِ النَّجَاسَةُ وَفِى الْعَظْمِ كَوْنُهٗ زَادَ الْجِنِّ وَلَا بِطَعَامٍ لِاَنَّهٗ اِضَاعَةٌ وَاِسْرَافٌ وَلَا بِيَمِيْنِهٖ لِاَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ ـ

অনুবাদ : হাড় ও শুকনো গোবর দ্বারা ইস্তিনজা করবে না, কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করতে নিষেধ করেছেন। আর যদি কেউ তা করে, তাহলে মূল উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার কারণে জায়েজ হয়ে যাবে। গোবরের ক্ষেত্রে নিষেধের কারণ তা নাপাক হওয়া। আর হাড়ের ক্ষেত্রে কারণ হলো, তা জিন জাতির খাদ্য হওয়া। খাদ্যদ্রব্য দ্বারাও ইস্তিন্‌জা করবে না। কেননা এটা খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করা এবং অপচয়ের শামিল। ডান হাতেও ইস্তিন্‌জা করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ডান হাতে ইস্তিন্‌জা করতে নিষেধ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : হাড় ও গোবর দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে নিষেধ। কেননা বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস, قَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اِبْغِنِىْ اَحْجَارًا اَسْتَنْفِضُ مِنْهَا وَلَا تَأْتِنِىْ بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ قُلْتُ مَابَالُ الْعِظَامِ وَالرَّوْثَةِ قَالَ هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ * রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে বললেন, আমার জন্য পাথর তালাশ করো তা দ্বারা আমি তাহারাত হাসিল করব; তবে হাড় ও গোবর আনবে না। আমি বললাম, হাড় ও গোবরের কি অবস্থা (কেন আনব না)? তিনি বললেন, এগুলো জিন জাতির খাদ্য।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, لَاتَسْتَنْجُوْا بِالرَّوْثِ وَلَابِالْعِظَامِ فَاِنَّهٗ زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ তোমরা গোবর ও হাড় দ্বারা ইস্তিনজা করো না। কেননা এগুলো তোমাদের ভাই জিন্নাতের খাদ্য। নিষেধ হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ এগুলো দ্বারা ইস্তিন্‌জা করে তবে মূল উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাওয়ার কারণে জায়েজ হয়ে যাবে। তবে এর দ্বারা সুন্নত আদায় হবে না। গোবরের ক্ষেত্রে নিষেধের করণ হলো যে তা নাপাক। হাড়ের ক্ষেত্রে নিষেধের কারণ হলো যে তা জিন্নাতের খাদ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উপরের বর্ণিত হাদীস দ্বারা গোবর পাক হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল দেওয়া যায়। যেমন– ইমাম মালিক (র.) গোবরকে পাক বলেন, কেননা গোবর যদি নাপাক হতো তাহলে তা জিন্নাতের খাদ্য হিসেবে হালাল হতো না। কেননা শরিয়ত দুই জাতির জন্য দুই হুকুম দেয় না। তবে হ্যাঁ, যদি কোনো সুস্পষ্ট দলিল পাওয়া যায়। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, গোবর নাপাক হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল বিদ্যমান। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ গোবরের ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.)-কে বলেছিলেন, هٰذَا رِكْسٌ অর্থাৎ এটা দুর্গন্ধ, এটা নাপাকি।

খাদ্যদ্রব্য দ্বারাও ইসতিনজা করবে না। কেননা এটা খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করা ও অপচয়ের শামিল। আর এ দু'টোই হারাম। স্বীয় ডান হাত দ্বারাও ইস্তিন্‌জা করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ডান হাত দ্বারা ইস্তিন্‌জা করতে নিষেধ করেছেন। যেমন হযরত আবূ কাতাদাহ থেকে বর্ণিত হাদীস, قَالَ اِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهٗ بِيَمِيْنِهٖ وَلَا يَسْتَنْجِىْ بِيَمِيْنِهٖ وَلَايَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ (بخارى ومسلم) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ পেশাব করে তবে সে যেন ডান হাত দ্বারা স্বীয় লজ্জাস্থান স্পর্শ না করে, ডান হাত দ্বারা ইস্তিন্‌জা না করে এবং পাত্রে শ্বাস নিক্ষেপ না করে। উক্ত হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, ডান হাত দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা নিষেধ।

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

নামাজ অধ্যায়

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নামাজ সকল প্রকার ইবাদতের উৎস এবং সমূহ নেক আমলের ভিত্তি। এ জন্য একে সমস্ত বিধানের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্রতা নামাজের পূর্ব শর্ত। বস্তুত কোনো বস্তুর শর্ত ঐ বস্তুর পূর্বে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ জন্য পবিত্রতার অধ্যায়কে নামাজের অধ্যায়-এর পূর্বে উল্লেখ করেছে।

অভিধানে সালাতের অর্থ– 'দোয়া, যেমন– ইরশাদ হয়েছে وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ অর্থ– আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন, আপনার দোয়া তাদের জন্য অবশ্যই প্রশান্তি স্বরূপ।—[৯ তাওবা; ১০৩] অনুরূপভাবে রাসূল ﷺ বলেছেন– وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ অর্থ– ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য দোয়া করেন। রাসূল ﷺ আরো বলেছেন- إِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَاكُلْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ অর্থ– যদি তোমাদের কাউকে খাবারের দাওয়াত প্রদান করা হয় তাহলে সে যেন তা গ্রহণ করে, এমতাবস্থায় যদি সে রোজা না রাখে তাহলে খাবার খেয়ে নেবে এবং যদি সে রোজাদার হয় তাহলে বরকতের দোয়া করবে।

শরিয়তের পরিভাষায় সালাত বলা হয় সু-নির্দিষ্ট কর্ম এবং রোকনের সমষ্টিকে। নির্দিষ্ট কর্ম এবং নির্দিষ্ট রোকনকে এ জন্য সালাত বলে যে, এতেও দোয়া বিদ্যমান রয়েছে।

সালাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ ঃ সালাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ ওয়াক্ত। আর সালাত আদায় আবশ্যক হওয়ার কারণ আল্লাহর নির্দেশ। সালাতের শর্ত পবিত্রতা, সতর ঢাকা, কেবলামুখী হওয়া, ওয়াক্ত হওয়া, তাকবীরে তাহরীমা। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ওয়াক্ত সালাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ, অতএব তা সালাতের শর্ত কিভাবে হয়? উত্তর ওয়াক্ত সালাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ এবং সালাত আদায় করা আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে ওয়াক্ত শর্ত বিধায় আর কোনো আপত্তি বিদ্যমান থাকবে না।

সালাতের রোকন ঃ দাঁড়ানো, কিরাত পড়া, রুকু করা, সেজদা করা, আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সমপরিমাণ সময় শেষ বৈঠক করা।

সালাতের হুকুম ঃ দুনিয়াতে দায়িত্বমুক্ত হওয়া, আখেরাতে প্রতিশ্রুত ছওয়াব হাসিল হওয়া। কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মতের দ্বারা সালাতের ফরযিয়্যাত প্রমাণিত। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ তোমরা নামাজ কায়েম রাখবে।— (বনী ইসরাঈল; ৭৮) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا অর্থ– নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করা মু'মিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। —(নিসা; ১০৩)

হাদীসে প্রিয় রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَرَضَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ - অর্থ– মহান আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর রাত্র-দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। এ মর্মে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সালাত আদায় করা ফরজ, এটাতে কারো দ্বিমত নেই। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। ইরশাদ হয়েছে– حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى অর্থ-তোমরা সমস্ত নামাজ এবং মধ্যবর্তী নামাজের পাবন্দি করবে।—(২–বাকারা-২৩৮) এ আয়াত দ্বারা নামাজের ফরযিয়্যাত এবং (নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত হওয়া প্রমাণিত হয়। কেননা মহান আল্লাহ সমস্ত নামাজের পাবন্দি করার হুকুম দিয়েছেন এবং তার উপর মধ্যবর্তী নামাজকে আতফ (عطف) করেছেন, এখানে সালাওয়াত (صلوات) শব্দ বহুবচন হিসাবে

এনেছে। তার মধ্যবর্তী হওয়ার জন্য ন্যূনতম চার ওয়াক্ত নামাজ হওয়া আবশ্যক। অতএব আস্‌সালাওয়াত (الصلوات) -এর মধ্য চার ওয়াক্ত নামাজ এবং সালাতে ওস্‌তা বা মধ্যবর্তী নামাজ দ্বারা এক নামাজ, মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ প্রমাণিত হয়। সূরা ত্ব-হাতে আরো অধিক স্পষ্টভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ উল্লেখ হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ اٰنَآءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ - তাফসীরে জালালাইন -এর সংকলক উল্লেখ করেছেন যে, سبح শব্দ দ্বারা صل বা নামাজ পড়, বুঝানো হয়েছে। উক্ত আয়াতে قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ (সূর্যোদয়ের পূর্বে) দ্বারা ফজরের নামাজ, قَبْلَ غُرُوْبِهَا (সূর্যাস্তের পূর্বে) দ্বারা আসরের নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। اٰنَآءِ اللَّيْلِ (রাত্রের মধ্যখান) দ্বারা মাগরিব এবং ইশার নামাজকে বুঝানো হয়েছে এবং اَطْرَافَ النَّهَارِ (দিনের প্রান্তসমূহ) দ্বারা জোহরের নামাজকে বুঝানো হয়েছে। উহা এভাবে যে, জোহরের নামাজের সময় আরম্ভ হয় দিনের প্রথম অর্ধেকের শেষ প্রান্তে এবং দিনের দ্বিতীয় অর্ধেকের প্রথম প্রান্তে সূর্য হেলে গেলে দিনের প্রথম অর্ধেকের সমাপ্তি হয় উহাই মূলত জোহরের নামাজের সময়ের সূচনা। সূর্য ঢলে যাওয়ার সাথে সাথে দিনের দ্বিতীয় অর্ধেকের সূচনা হয়, পরিণামে জোহরের সময়ে দিনের দু' প্রান্ত একত্রিত হয়। অতএব আয়াতের মর্ম দাঁড়াবে যে, দিনের দু' প্রান্ত একত্রিত হওয়ার সময়ও (জোহরের) নামাজ পড়ো।

নামাজ কখন ফরজ (فرض) হয়েছে এবং নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বে রাসূলে ﷺ-এর ইবাদত করার পদ্ধতি কি ছিল? সীরাত এবং হাদীস বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মিরাজের রাতে ফরজ হয়েছে তবে হাঁ; শবে মিরাজের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মতানৈক্য রয়েছে যে, তা কোন বছরে সংঘটিত হয়েছে নববী পঞ্চম বছর হতে দশম বর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন মতামত আছে। অধিকাংশ আলেমদের মতে নবুয়তের পঞ্চম সনে নামাজ ফরজ হয়েছে। শবে মিরাজের পূর্বে কোনো নামাজ ফরজ ছিল কিনা? অধিকাংশ আলিমদের মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে কোনো নামাজ ফরজ ছিল না। তবে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ ছিল। এর দলিল সূরা মুয্‌যাম্মিলের প্রথম দিকের আয়াতসমূহ; ইরশাদ হয়েছে قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا অর্থ– রাত্রে জাগরণ করে ইবাদত করো, কিছু সময় ব্যতীত।—[৭-মুয্‌যাম্মিল; ৭৩] এ সূরাটি পবিত্র মাক্কায় প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ এর উত্তর দিয়েছেন যে, সূরা মুয্‌যাম্মিলে নামাজের হুকুমটি মাদানী। উহার দলিল এই যে, এ সূরার শেষের দিকে ইরশাদ হয়েছে وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থ– এবং অপর দল আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। প্রকাশ থাকে যে, যুদ্ধের বিধান পবিত্র মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত জবাব সঠিক নয়, কারণ হচ্ছে– এখানে যুদ্ধের কথা ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে– عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ [মুয্‌যাম্মিল; ২০] আয়াতের মধ্যে ইসতেকবাল (ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহৃত) সীগাহ বিদ্যমান আছে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এ হুকুম পূর্বে দেওয়া হয়েছে এবং এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় যুদ্ধ ছিল না।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বে সাধারণ মুসলমানরা কোনো নামাজ পড়ত কিনা? এক জামাত আলিমদের মতে ফজর এবং ইশার নামাজ মিরাজের পূর্বে ফরজ হয়েছিল। এর দলিল হচ্ছে وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ অর্থ– তুমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো রজনী ও প্রভাতে।—[৩-আল ইমরান; ৪১] এ আয়াতটি মিরাজের ঘটনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে উক্ত দু'নামাজ (ফজর ও ইশা)-এর উল্লেখ আছে তবে এ ব্যাপারে সঠিক কথা হলো যে, বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ এবং সাহাবীগণ মিরাজের পূর্বে ফজর এবং ইশার নামাজ পড়তেন, যেমন সূরা জিনে পবিত্র কুরআন শ্রবণ করার ঘটনা ফজরের নামাজের মধ্যে ঘটেছিল এবং উহা মিরাজের

ঘটনার পূর্বেকার ঘটনা ছিল, তবে ঐ দু'নামাজ মহানবী ﷺ-এর উপর ফরজ ছিল, না কি তিনি তা নফল হিসাবে পড়তেন? এর কোনো দলিল হাদীসের মধ্যে বিদ্যমান নেই।

নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত কেন ফরজ করা হলো, উহার থেকে কমবেশি হলো না কেন? উত্তর এর কয়েকটি হিক্‌মত (উপকার) নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

(১) মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক জিনিস জানার জন্য মানুষের মাঝে পাঁচটি শক্তি সৃষ্টি করেছেন। ১. দৃষ্টি শক্তি, ২. শ্রবণ শক্তি, ৩. ঘ্রাণ নেওয়ার শক্তি, ৪. স্বাদ গ্রহণের শক্তি, ৫. স্পর্শ করার শক্তি। উক্ত পাঁচ শক্তির মোকাবেলায় মহান আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হুকুম দিয়েছেন।

(২) জগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহ পৃথিবীতে যখন মানুষকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন, তখন সর্বপ্রথম মানুষকে প্রাণ দান করেছেন, অতপর মানুষের প্রয়োজনীয় পাঁচটি বড় নিয়ামত দান করেছেন।

১. খাবার এবং পানীয় বস্তু ; ২. গরম এবং শীতের পোশাক ; ৩. বসবাসের জন্য গৃহ; ৪. সেবার জন্য স্ত্রী ও সেবক ইত্যাদি; ৫. ভ্রমণের জন্য আরোহী। জীবনের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ-কলেমায়ে তায়্যেবা, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ-এর স্বীকৃতি দেওয়া। উক্ত পাঁচটি নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে, যাতে একেক নামাজের দ্বারা একটি বড় নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা যায়।

(৩) মানুষের পূর্ণ জীবন পাঁচ অবস্থায় অতিবাহিত হয়-১. শায়িত অবস্থায়, ২. বসা অবস্থায়, ৩. দাড়ান অবস্থায়, ৪. নিদ্রা অবস্থায়, ৫. জাগ্রত অবস্থায়। উক্ত পাঁচ অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার ওপর অগণিত রহমত এবং নিয়ামত বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হয়ে থাকে যা গণনা করা অসম্ভব, মহান আল্লাহ উক্ত পাঁচ অবস্থার সমূহ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ল সে উক্ত সময়ে আল্লাহর প্রত্যেক নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

(৪) পার্থিব জীবন শেষ হওয়ার পরে মানুষের ওপর পাঁচটি বিপদ আসে, ১. মৃত্যু, ২. কবর, ৩. পুলসিরাত, ৪. আমলনামা বাম হাতে পাওয়া, ৫. জান্নাতের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া। মহান দয়ালু আল্লাহ ঐ পাঁচটি বিপদ দূর করার নিমিত্তে এ পাঁচ নামাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লামা ইব্‌নে হাজর মক্কী (র.) বলেছেন,

مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلٰوةِ اَكْرَمَهُ اللّٰهُ بِخَمْسِ خِصَالٍ يَرْفَعُ عَنْهُ ضَيْقَ الْمَوْتِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ وَيُعْطِيْهِ اللّٰهُ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

অর্থ– যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাযথভাবে আদায় করবে, মহান আল্লাহ তাকে পাঁচটি পুরস্কার দিবেন– ১. তাকে মৃত্যুর কষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, ২. কবরের সংকীর্ণতা এবং শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন, ৩. আমলনামা তার ডান হাতে প্রদান করবেন, ৪. বিজলির ন্যায় পুলসিরাত পার হয়ে যাবে, ৫. বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

بَابُ الْمَوَاقِيْتِ

اَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِىْ وَهُوَ الْمُعْتَرِضُ فِى الْاُفُقِ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ لِحَدِيْثِ اِمَامَةِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهُ اَمَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْهَا فِى الْيَوْمِ الْاَوَّلِ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَفِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ حِيْنَ اَسْفَرَ جِدًّا وَكَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ ثُمَّ قَالَ فِىْ اٰخِرِ الْحَدِيْثِ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ لَّكَ وَلِاُمَّتِكَ وَلَامُعْتَبَرَ بِالْفَجْرِ الْكَاذِبِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الَّذِىْ يَبْدُوْ طُوْلًا ثُمَّ يَعْقُبُه الظَّلَامُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَايَغُرَّنَّكُمْ اَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْلُ وَاِنَّمَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْرُ فِى الْاُفُقِ اَىْ اَلْمُنْتَشِرُ فِيْهَا .

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ নামাজের সময়সমূহ

অনুবাদ ঃ ফজরের নামাজের ওয়াক্তের সূচনা হয়, যখন ভোরের দ্বিতীয় আলো উদিত হয়, দ্বিতীয় আলো বলতে ঐ আলো যা দিগন্তে বিস্তৃত হয় এবং এর শেষ ওয়াক্ত হলো, সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। কেননা হযরত জিব্‌রীল (আ.)-এর ইমামতি সম্পর্কীত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রথম দিন ফজরের নামাজে রাসূল ﷺ -এর ইমাম হয়ে নামাজ আদায় করেন, যখন আলো উদিত হয়, এবং দ্বিতীয় দিন (নামাজ আদায় করেন) যখন খুব ফরসা হয়ে গেল, এমনকি সূর্য উদয় হওয়ার উপক্রম হলো। হাদীসের শেষে রয়েছে, হযরত জিব্‌রীল (আ.) বলেন, "এ দু'সময়ের মধ্যবর্তী সময়টি হলো আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য সময়"। ফজরে কাযিব (فجر كاذب) ধর্তব্য নয়, ফজরুল কাযিব হচ্ছে লম্বা-লম্বিতে উদ্ভাসিত আলো, এর পর অন্ধকার থেকে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বিলালের আযান যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে, তদ্রূপ লম্বালম্বি আলো (যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে)। দিগন্তে উদ্ভাসিত বিস্তৃত আলোই হলো ফজরের সময়।"

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামাজের ওয়াক্ত নামাজ ওয়াজিব হওয়ার সবব (سبب) বা কারণ। আর সবব মুসাব্‌ব্যব (مسبب) -এর ওপর مقدم হয়। এ কারণে নামাজের ওয়াক্তের বর্ণনা পূর্বে আনা হয়েছে। মাওয়াকীত (مواقيت) শব্দটি মীকাত (ميقات)-এর বহুবচন। মীকাত ঐ সময় বা স্থানকে বলে যার দ্বারা কোনো জিনিসের সীমানা নির্ধারণ করা হয় যেমন মাওয়াকীতে সালাত (مواقيت صلوة) এবং মাওয়াকীতে ইহরাম (مواقيت احرام) ।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীস শরীফে যদিও জোহরের নামাজের সময় আগে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন কারণে এখানে ফজরের নামাজের সময় আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>প্রথম কারণ :</u> ফজরের প্রথম এবং শেষ ওয়াক্তের ক্ষেত্রে সকল ইমাম একমত বিধায় একে প্রথমে আনা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য নামাজের ওয়াক্তের ব্যাপারে মতানৈক্য আছে।

<u>দ্বিতীয় কারণ :</u> সর্ব প্রথম ফজরের নামাজ দুনিয়ার প্রথম মানুষ-হযরত আদম (আ.) পড়েছেন। যেহেতু ফজরের নামাজ, প্রথম নামাজ এ জন্য আলোচনার মধ্যে তাকে প্রথমে উল্লেখ করেছেন।

<u>তৃতীয় কারণ :</u> ফজরের নামাজ দিনের প্রথম নামাজ, এ জন্য তাকে আলোচনার মধ্যে আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>চতুর্থ কারণ :</u> ঘুমন্ত ব্যক্তি যে মৃত্যুব্যক্তির সাদৃশ্য তার ওপর প্রথম যে আমল ওয়াজিব, তাও হচ্ছে ফজরের নামাজ। এ কারণেই ফজরের নামাজের ওয়াক্ত প্রথমে উল্লেখ করেছেন (টীকা মোল্লা আবদুল গফুর-ইনায়া)

মোট কথা ফজরের নামাজের সময় সুবহে সাদিক থেকে আরম্ভ হয়ে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। সুবহে সাদিক ঐ আলো যা দিগন্তে বিস্তৃত হয়, ফজরে কাযিব (فَجْرٌ كَاذِبٌ) ঐ আলো যা লম্বা-লম্বি ভাবে উদ্ভাসিত হয় এবং উহার পর অন্ধকার থেকে যায়।

আরবগণ ফজরে কাযিবকে যানবুস্ সারহান (ذَنْبُ السِّرْحَانِ) (বাঘের রক্ত) বলে। ফজরের প্রথম সময় এবং শেষ সময় এর দলিল হচ্ছে– হযরত জিব্রাঈলের ইমামতি সম্পর্কিত হাদীসটি। ইনায়াগ্রন্থের লেখক পূর্ণ হাদীস নিম্নোক্ত ভাবে বর্ণনা করেছেন–

جَبْرَئِيْلُ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَمَّنِيْ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ وَصَلّٰى بِيَ الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الْاَوَّلِ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَصَارَ الْفَيْئُ مِثْلَ الشِّرَاكِ وَصَلّٰى بِيَ الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْئٍ مِثْلَهٗ وَصَلّٰى بِيَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَصَلّٰى بِيَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّفَقُ وَصَلّٰى بِيَ الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلّٰى بِيَ الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِيْ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَصَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْئٍ مِثْلَهٗ وَصَلّٰى بِيَ الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْئٍ مِثْلَيْهِ وَصَلّٰى بِيَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ لِوَقْتِهٖ بِالْاَمْسِ وَصَلّٰى بِيَ الْعِشَاءَ حِيْنَ مَضٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ قَالَ نِصْفُ اللَّيْلِ وَصَلّٰى بِيَ الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَاَسْفَرَ وَكَادَتِ الشَّمْسُ اَنْ تَطْلُعَ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هٰذَا وَقْتُكَ وَوَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ .

অর্থ- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন-জিব্রাঈল (আ.) কা'বা গৃহের নিকট দু'বার আমার ইমামতি করেছেন, প্রথম দিন আমাকে নিয়ে জোহরের নামাজ আদায় করেছেন যখন সূর্য হেলে যায় এবং বস্তুর ছায়া জুতার ফিতার সমপরিমাণ হয় এবং আমাকে নিয়ে আসরের নামাজ পড়েছেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ ছিল এবং আমাকে নিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়েছেন যখন সূর্য ডুবে গিয়েছিল এবং আমাকে নিয়ে ইশার নামাজ পড়েছেন যখন শফক বা দিগন্তের লালিমা ডুবে গিয়েছিল এবং ফজর পড়েছেন যখন সুবহে সাদিক উদিত হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় দিন জোহর আদায় করেছেন যখন সূর্য ঢলে গিয়েছিল এবং প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়েছিল এবং আসর পড়েছেন, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হয়েছিল এবং মাগরিব পড়েছেন যখন সূর্য অস্ত গিয়েছিল অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন মাগরিব ঐ সময় পড়েছেন যে সময় প্রথম দিন পড়েছিলেন এবং ইশা পড়েছেন যখন রাত্রের তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেকাংশ অতিবাহিত হয়েছে এবং ফজর পড়েছেন যখন ভোরের আলো এত বেশি ফর্সা হয়েছে যে, সূর্য উদয় হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল। অতঃপর জিব্রাঈল (আ.) বললেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! ইহা তোমার ওয়াক্ত এবং তোমার পূর্বের নবীগণের ওয়াক্ত।

হিদায়া গ্রন্থের প্রণেতা বলেছেন, ফজরের নামাজে সুব্হি সাদিক ধর্তব্য, সুবহি কাযিব ধর্তব্য নয়, উহার দলিল-সহীহ মুসলিম এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদীসটি যার বিবরণ নিম্নরূপ– হযরত বিলাল (রা.) সুবহি সাদিক উদয় হওয়ার পূর্বে তাহাজ্জুদ অথবা সাহরী খাবার জন্য আযান দিতেন এবং ইবনে আবদুল্লাহ ইব্নে উম্মে মাকতূম (রা.) সুবহি সাদিক হবার পর ফজরের নামাজের আযান দিতেন। এ প্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, لَا يَغُرَّنَّكُمْ اَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْلُ অর্থ– বিলালের আযান যেন তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে অর্থাৎ হযরত বিলাল (রা.)-এর আযানের দ্বারা এ ধারণা করো না যে, ফজরের নামাজের সময় কেননা তার আযান ফজরের নামাজের জন্য নয়; বরং তাহাজ্জুদ অথবা সাহরী খাবার জন্য এবং লম্বালম্বি আলো (فَجْرٌ مُسْتَطِيْلٌ) যেন তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে অর্থাৎ ঐ আলো যা লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত হয়।

اَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لِاِمَامَةِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى الْيَوْمِ الْاَوَّلِ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَيْهِ سِوٰى فَىْءِ الزَّوَالِ وَقَالَا اِذَا صَارَ الظِّلُّ مِثْلَهٗ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَفَىْءُ الزَّوَالِ هُوَ الْفَىْءُ الَّذِىْ يَكُوْنُ لِلْاَشْيَاءِ وَقْتَ الزَّوَالِ لَهُمَا اِمَامَةُ جِبْرِيْلَ فِى الْيَوْمِ الْاَوَّلِ لِلْعَصْرِ فِىْ هٰذَا الْوَقْتِ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاَشَدُّ الْحَرِّ فِىْ دِيَارِهِمْ فِىْ هٰذَا الْوَقْتِ وَاِذَا تَعَارَضَتِ الْاٰثَارُ لَايَنْقَضِى الْوَقْتُ بِالشَّكِّ ـ

অনুবাদ ঃ জোহরের নামাজের প্রথম সময় হলো যখন সূর্য হেলে পড়ে। কেননা হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) প্রথম দিন সূর্য হেলে পড়ার পর ইমামতি করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জোহরের শেষ সময় হলো যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া মধ্যাহ্ন ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মতে যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়। ইহাও ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত একটি মত। فَىْءُ الزَّوَالِ (মধ্যাহ্ন ছায়া) হলো ঠিক মধ্যাহ্ন কালে কোনো বস্তুর যে ছায়া হয় তাই। সাহেবাইনের দলিল হলো, হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) প্রথম দিন এ সময় আসরের ইমামতি করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো রাসূল ﷺ বলেছেন— জোহরকে তোমরা শীতল করে পড়ো। কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের তীব্রতা থেকে আসে। আর আরব দেশে (প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়ার) এ সময়টাতেই গরম তীব্রতম হয়। সুতরাং হাদীস যখন পরস্পর বিরোধপূর্ণ হলো, তাই সন্দেহ বশতঃ সময় শেষ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইনায়া প্রণেতা মুহাম্মদ ইবনে শুজা (র.)-এর বরাতে فى زوال বা মধ্যাহ্ন ছায়া অবগত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন-প্রথমে জমিনকে এমন সমতল করতে হবে, যেন একচুল পরিমাণও উঁচু নিচু না থাকে। অতঃপর সেখানে একটি লাকড়ী স্থাপন করে যে পর্যন্ত এর ছায়া পৌঁছে সেখানে একটি চিহ্ন দিতে হবে, যেখান থেকে ছায়া কমবে একে زوال -এর পূর্বের সময় জ্ঞান করতে হবে, যখন এ লাকড়ীর ছায়া স্থির হবে অর্থাৎ কমবেও না বাড়বেও না তখন ঐ সময়কে استوا (বরাবর) এবং نِصْفُ النَّهَارِ (দিনের মধ্য ভাগ) ধরা হবে। মোট কথা ঐ সময় যে ছায়া হয় উহাকে فى زوال (মধ্যাহ্ন ছায়া) বা মূল ছায়া বলা হয় এবং যখন ছায়া বড় হতে থাকবে, তখন মনে করতে হবে যে, সূর্য হেলে গিয়েছে এবং জোহরের নামাজের সময় আরম্ভ হয়েছে।

মোটকথা জোহরের প্রথম সময় সূর্য হেলে যাবার পর থেকে আরম্ভ হয়, এর দলিল হলো– হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রথম দিন জোহরের নামাজ ঐ সময়ই (পূর্বোক্ত সময়েই) পড়িয়েছেন। জোহরের শেষ সময়ে হানাফী আলিমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে এ ব্যাপারে তিনটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, প্রথম রেওয়ায়েত ইমাম মুহাম্মদ (র.) আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন, মূল ছায়া বা মধ্যাহ্নকালের ছায়া ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া যখন দ্বিগুণ হয়, তখন জোহরের নামাজের সময় শেষ হয়ে আসরের নামাজের সময় আরম্ভ হবে। এটিই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত, হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন মূল ছায়া ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ তখন জোহরের নামাজের সময় শেষ হয়ে যায় এবং আসরের নামাজের সময় আরম্ভ হয়। সাহেবাইন, ইমাম শাফেঈ (র.) এবং ইমাম যুফার (র.)-এর মাযহাব এরূপই।

তৃতীয় রেওয়ায়েত আসাদ ইবনে ওমর এবং আলী ইবনে জা'দ ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয় মূল ছায়া ব্যতীত। তখন জোহরের নামাজের সময় শেষ হয়ে যায়। তবে আসরের নামাজের সময় আরম্ভ হয় না; বরং আসরের নামাজের সময় ঐ সময় আরম্ভ হবে যখন মূল ছায়া ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হবে। এই রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে জোহর এবং আসরের মধ্যখানে বেকার সময় (وَقْتٌ مُهْمَلٌ) বিদ্যমান থাকছে। যেমন ফজর এবং জোহরের মধ্যখানে বেকার সময় আছে।— (ইনায়া)

এখানে ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারতে সামান্য ত্রুটি আছে। তা হচ্ছে নিম্নরূপ– ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট জোহরের শেষ সময় হচ্ছে ঐ সময় যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হয় এবং সাহেবাইনের মতে প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হয়। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সময়ে জোহরের সময় শেষই হয়ে যায়। অতএব তাকে আখিরী ওয়াক্ত বা শেষ সময় বলার কোনো মর্ম হতে পারে না।

উত্তর ঃ আখির (শেষ) সময় দ্বারা মুরাদ ঐ সময় যখন জোহরের সময় শেষ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

সাহেবাইনের দলিল হচ্ছে– জিব্‌রাঈল প্রথম দিন আসরের নামাজ এ সময় পড়িয়েছেন যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ঐ সময় আসরের নামাজের সময় আরম্ভ হয় এবং জোহরের নামাজের সময় শেষ হয়ে যায়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) -এর হাদীস أَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ। অর্থ– জোহরের নামাজ শীতল করে পড়ো কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের তীব্রতা থেকেই আসে। এ হাদীস দ্বারা দলিল এ ভাবে হবে যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ জোহরের নামাজ শীতল সময়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আরব দেশের শহরগুলোতে সূর্যের ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়ার সময় প্রচণ্ডগরম বিদ্যমান থাকে। এর দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, রাসূল ﷺ সূর্যের ছায়া এক মিছিল (পরিমাণ) হওয়ার পর জোহরের নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব যখন এক মিছিলের পর জোহরের সময় বিদ্যমান থাকে তাহলে এক মিছিলের পর আসরের সময় কিভাবে আরম্ভ হবে। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) জিব্‌রাঈল কর্তৃক ইমামত সম্পর্কিত হাদীসের জবাব এভাবে দিয়েছেন, নামাজের সময়ের ক্ষেত্রে উক্ত হাদীসটি প্রথম দিকের, আর উক্ত হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ সব হাদীস পরের দিকের। প্রকাশ থাকে যে, পরের হাদীস আগের হাদীসের জন্য নাসিখ বা রহিতকারী হিসাবে গণ্য হয়। অতএব বুঝ গেল যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক বর্ণিত ইমামত সম্পর্কিত হাদীসটি মনসূখ বা রহিত। অতএব ঐ হাদীসের দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে না।

'হিদায়া প্রণেতা এভাবে এর জবাব দিয়েছেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ইমামত সংক্রান্ত হাদীস এবং জোহরের নামাজ শীতল করে পড়, উক্ত হাদীসদ্বয়ের মাঝে বিরোধ। কেননা জিবরাঈল (আ.)-এর ইমামত সংক্রান্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, এক মিছিলের সময় জোহরের সময় শেষ হয়ে যায় আর "জোহরের নামাজ শীতল করে পড়" এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে এক মিছিলের সময় জোহরের নামাজের সময় শেষ হয়ে যায় না; বরং সময় বিদ্যমান থাকে। মোট কথা এক মিছিলের সময় জোহরের নামাজের সময় শেষ হওয়ার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত। অথচ ছায়া এক মিছিল হওয়ার পূর্বে জোহরের সময় বিদ্যমান থাকা প্রমাণিত। সর্বজনমান্য মূলনীতি হলো, যে জিনিস প্রত্যয়ের সাথে সুপ্রমাণিত তা সন্দেহের দ্বারা বিলীন হয়ে যাবে না। যেহেতু প্রত্যেক জিনিসের ছায়া এক মিছিল হওয়ার সময় জোহরের নামাজের সময় শেষ হওয়াটা সন্দেহযুক্ত অতএব জোহরের সময় শেষ হবে না।

ফায়দা ঃ আসরের নামাজ সর্ব প্রথম হযরত ইউনুস (আ.) পড়েছেন, যখন আল্লাহ তাঁকে চারটি অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়েছেন, ১. ভুলচুকের অন্ধকার, ২. রাতের অন্ধকার, ৩. পানির অন্ধকার, ৪. মাছের পেটের অন্ধকার। হযরত ইউনুস (আ.) চার রাকআত নামাজ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নফল হিসাবে আদায় করেছেন। কিন্তু মহান আল্লাহ উক্ত চার রাকআত নামাজ এ উম্মতের ওপর ফরজ করে দিয়েছেন।

وَاَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ اِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَهَا ـ

অনুবাদ : আসরের প্রথম ওয়াক্ত যখন উভয় মতানুযায়ী যুহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। আর আসরের শেষ ওয়াক্ত যতক্ষণ না সূর্য অস্ত যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আসরের এক রাকআত পায় সে তা (আসর) পেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আসরের প্রথম ওয়াক্ত জুহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকে আরম্ভ হয়। চাই জুহরের ওয়াক্ত দুই مثل (দ্বিগুণ) -এর উপর শেষ হয়। যা ইমাম সাহেবের মাযহাব। কিংবা এক مثل (একগুণ) এর উপর শেষ হয়। যা সাহেবাইন (র.)-এর মাযহাব। আর আসরের শেষ ওয়াক্ত সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত থাকে।

দলিল হল, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস–

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে সকালের এক রাকআত পেল, সে তা পেল। আর যে ব্যক্তি সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আসরের এক রাকআত পেল, সে তা পেল। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, আসরের সময় সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) বলেন যে, আসরের সময় সূর্য হলদে বর্ণ হওয়া পর্যন্ত বাকি থাকে। এরপর আর থাকে না। তার দলিল হল আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ـ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। আসরের ওয়াক্ত ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ না সূর্য হলদে বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে উক্ত হাদীসের জওয়াব হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে মধ্যে মোস্তাহাব ওয়াক্তের কথা বর্ণিত হয়েছে। জায়েজ ওয়াক্তের কথা বর্ণনা করা হয়নি। তাই এই হাদীসের সাথে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সংঘাত হবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আসরের এক রাকআত পেল অতঃপর সালাম ফিরাবার পূর্বে ওয়াক্ত চলে গেল তবে তার নামাজ বাতিল হবে না। এর উপর সকলে একমত। আর যদি সকালের নামাজে এক রাকআতের পর সূর্য বেরিয়ে আসে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়ার পর কাযা আদায় করবে। ইমাম মালিক (র.) ইমাম শাফি'ঈ (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে নামাজ বাতিল হবে না। বরং ঐ নামাজ-ই পূর্ণ করবে। তাদের দলিল উপরে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস। আমাদের পক্ষ থেকে উক্ত হাদীসের জওয়াব শায়খুল আদব (র.) এভাবে দিয়েছেন যে, فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ -এর অর্থ হল فَقَدْ اَدْرَكَ وَقْتَ الصُّبْحِ অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নামাজের আহাল ছিল না। পরে এমন সময় নামাজের আহাল হল যে, যখন মাত্র এক রাকআতের ওয়াক্ত অবশিষ্ট ছিল। তবে তার উপর নামাজ ওয়াজিব হয়ে গেছে। যেমন– কাফির মুসলমান হল, শিশু বালিগ হল, হায়িযা স্ত্রীলোক পাক হল, উল্লেখ্য যে, এক রাকআতের বর্ণনা শুধু বুঝার জন্য। না হয় চাই এক রাকআতের ওয়াক্ত পায় কিংবা এর চেয়ে কম ওয়াক্ত পায় উভয় অবস্থায় তার উপর উক্ত নামাজ অবধারিত হয়ে যাবে।

<u>ফায়িদা :</u> আসরের নামাজ সর্ব প্রথম হযরত ইউনুস (আ.) পড়েছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা তাকে আসরের সময় চারটি অন্ধকার থেকে নাজাত দিয়েছিলেন। (১) অপরাধের অন্ধকার (২) রাতের অন্ধকার (৩) পানির অন্ধকার (৪) মাছের পেটের অন্ধকার। হযরত ইউনুস (আ.) চার রাকআত নফল নামাজ শুকরিয়া হিসাবে আদায় করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তা উম্মতের উপর ফরজ করে দিয়েছেন।

وَاَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَقَالَ الشَّافِعِى (رحـ) مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي فِيْهِ ثَلٰثُ رَكَعَاتٍ لِاَنَّ جِبْرِئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَّ فِىْ يَوْمَيْنِ فِىْ وَقْتٍ وَاحِدٍ وَلَنَا قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ وَمَارَوَاهُ كَانَ لِلتَّحَرُّزِ عَنِ الْكَرَاهَةِ ثُمَّ الشَّفَقُ هُوَ الْبَيَاضُ الَّذِىْ فِى الْاُفُقِ بَعْدَ الْحُمْرَةِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَعِنْدَهُمَا هُوَ الْحُمْرَةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِى (رحـ) لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاٰخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ اِذَا اسْوَدَّ الْاُفُقُ وَمَا رَوَاهُ مَوْقُوْفٌ عَلٰى اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) ذَكَرَهٗ مَالِكٌ فِى الْمُوَطَّا وَفِيْهِ اِخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ ـ

অনুবাদ ঃ মাগরিবের প্রথম সময় হলো, যখন সূর্য ডুবে যায় এবং তার শেষ সময় হলো যতক্ষণ পর্যন্ত শাফাক (شفق) অদৃশ্য না হয়। ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন, তিন রাকআত নামাজ পড়ার পরিমাণ সময় হলো মাগরিবের সময়। কেননা জিব্রাঈল (আ.) দু'দিন এই একই সময়ে মাগ্রিবের ইমামতি করেছেন। আমাদের দলিল হলো-রাসূল ﷺ বলেছেন, মাগরিবের প্রথম সময় হলো যখন সূর্য ডুবে যায় এবং তার শেষ সময় হলো, যখন শাফাক (شفق) অদৃশ্য হয়। ইমাম শাফেঈ (র.) যে হাদীস পেশ করেছেন, তাতে বিলম্ব না করার কারণ হলো মাকরূহ থেকে বেঁচে থাকা। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে শাফাক (شفق) -এর অর্থ দিগন্তের ফরসা আলো, যা লালিমার পরে দেখা যায়। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে লালিমাটিই হলো শাফাক (شفق)। এরই অনুরূপ একটি বর্ণনা ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে পাওয়া যায়। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর (পূর্ববর্তী) অভিমতও এই। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, اَلشَّفَقُ الْحُمْرَةُ শাফাক হলো দিগন্ত লালিমা। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, وَاٰخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ اِذَا اسْوَدَّ الْاُفُقُ অর্থ– মাগরিবের শেষ সময় হলো, যখন দিগন্ত কালো হয়ে যায়। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর বর্ণিত হাদীসটি ইবনে ওমর (রা.)-এর ওপর মওকুফ। ইমাম মালিক মুয়াত্তা গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন এবং এ সম্পর্কে (শাফাক এর অর্থ সম্পর্কে) সাহাবীদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাগরিবের সময় সূর্য ডুবার পর থেকে আরম্ভ হয় এবং শাফাক (شفق) ডুবে যাওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ইমাম শাফেঈ (র.) -এর মতে মাগরিবের সময় শুধু এতটুকু, যার মধ্যে তিন রাকআত নামাজ পড়া যায়। এটা ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দু'টি মতের একটি। ইমাম গাযালী (র.) বলেছেন, মাগরিবের সময়ের ব্যাপারে ইমাম শাফেঈ (র.) হতে দু'টি অভিমত বর্ণিত আছে– ১. মাগরিবের সময় শাফাক অস্ত যাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। এটা ইমাম আহ্মদ (র.)-এর মতও। ২. সূর্য ডুবে যাওয়ার পর অজু, আযান, একামতের পর পাঁচ রাকআত নামাজ পড়ার সময় অতিবাহিত হলে মাগরিবের সময় শেষ হবে।

অর্থাৎ মাগরিবের নামাজের সময় শুধু এতটুকু যার মধ্যে অজু, আযান, একামতের পর পাঁচ রাকআত নামাজ আদায় করতে পারে। হিল্‌য়া (حلبه) নামক গ্রন্থে রয়েছে, মাগরিবের সময় শুধু এতটুকু যাতে তিন রাকআত নামাজ পড়তে পারে। হিদায়া গ্রন্থ প্রণেতা এটিই উল্লেখ করেছেন।

ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল হলো حَدِيْثُ إِمَامَةِ جِبْرَئِيْلَ অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) মাগরিবের নামাজ দু'দিন একই সময়ে পড়িয়েছেন। অতএব যদি মাগরিবের নামাজের সময় লম্বা হত, যার শুরু এবং শেষ থাকত, তাহলে জিবরাইল দু' দিন একই সময়ে নামাজ পড়াতেন না। আমাদের দলিল হচ্ছে– হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর হাদীস اَوَّلُ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَاٰخِرُهُ حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ অর্থ– মাগরিবের প্রথম সময় হচ্ছে যখন সূর্য ডুবে যায় এবং শেষ সময় হচ্ছে যখন শাফাক (شفق) ডুবে যায়। হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) উভয় দিন একই সময় নামাজ পড়িয়েছেন, মাকরূহ থেকে বাঁচার জন্য, কেননা মাগরিবকে শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরূহ।

প্রকাশ থাকে যে, শাফাক এর সীমা নিয়ে আলিমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে শাফাক ঐ আলোকে বলে যা লালিমার পরে দিগন্তে বিস্তৃত হয়। এরূপ মত আবূ বকর সিদ্দীক (র.), মুয়ায (রা.), আনাস (রা.), ইবনুয্‌ যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। সাহেবাইনের মতে শাফাক লালিমাকে বলে, এরূপ একটি বর্ণনা ইমাম আবূ হানীফা (রা.) থেকে নকল করা হয়েছে। এটাই ইমাম শাফেঈ (র.) -এর অভিমত।

সাহেবাইনের দলিল- রাসূল ﷺ-এর বাণী শাফাক (شفق) লালিমাকে বলে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস-

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اٰخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ اِذَا اسْوَدَّ الْاُفُقُ ـ

অর্থ ঃ রাসূল ﷺ বলেছেন, মাগরিবের শেষ সময় যখন দিগন্ত কালো হয়। প্রকাশ থাকে যে, দিগন্তে আলোর পরই অন্ধকার আসে, অতএব প্রমাণ হলো যে দিগন্তে আলো বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত মাগরিবের নামাজের সময় থাকবে। হাদীসে শাফাক দ্বারা আলোই উদ্দেশ্য حَدِيْثُ اَلشَّفَقُ اَلْحُمْرَةُ অর্থ– শাফাক হচ্ছে লালিমা। ইহা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর ওপর মওকূফ (موقوف), এ কথা ইমাম মালিক (র.) মুয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মওকুফ হাদীস প্রমাণ্য দলিল নয় বিধায় উক্ত হাদীসটি দলিল হওয়ার যোগ্য হবে না। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, উক্ত হাদীসটি মারফূ' (مرفوع) তাহলে আমরা জবাব দেব যে, ঐ হাদীসের মর্মের ক্ষেত্রে সাহাবীদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কোনো কোনো সাহাবীদের মতে শাফাক-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আলো। পক্ষান্তরে অন্যান্য সাহাবীদের মতে শাফাক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লালিমা। যদি মারফূ' হাদীসের মধ্যে সাহাবীদের মতানৈক্য থাকে তাহলে তা দলিল হওয়ার যোগ্য থাকে না।

ফায়দা ঃ হযরত ঈসা (আ.) সর্ব প্রথম মাগরিবের নামাজ পড়েছেন-মহান আল্লাহ যখন তাঁকে সম্বোধন করে বললেন— اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ অর্থ– তুমি কি লোকদেরকে বলেছ যে, তোমরা আমাকে এবং আমার মাকে মাবূদ হিসাবে গ্রহণ করো আল্লাহ ব্যতীত।— (৫-মায়িদা-১২৬) তিনি এ নামাজ সূর্য অস্ত যাবার পর পড়েছিলেন, প্রথম রাকআত নিজের অস্তিত্ব থেকে উলূহিয়্যাত (الوهيت-মাবুদ হওয়া) কে নিষেধ করার জন্য ছিল। দ্বিতীয় রাকআত নিজের মাতা থেকে উলূহিয়্যাত (الوهيت মাবুদ হওয়া) নিষেধ করার জন্য ছিল। তৃতীয় রাকআত আল্লাহর জন্য উলূহিয়্যাত (الوهيت) সাবিত করার জন্য ছিল।

وَاَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَآءِ اِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَالَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاٰخِرُ وَقْتِ الْعِشَآءِ حِيْنَ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي (رحـ) فِىْ تَقْدِيْرِهِ بِذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ . وَاَوَّلُ وَقْتِ الْوِتْرِ بَعْدَ الْعِشَآءِ وَاٰخِرُهُ مَالَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى الْوِتْرِ فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ الْعِشَآءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ قَالَ (رضـ) هٰذَا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقْتُهُ وَقْتُ الْعِشَآءِ اِلَّا اَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّذْكِيْرِ لِلتَّرْتِيْبِ .

অনুবাদ ঃ ইশার প্রথম সময় হলো যখন শাফাক (شفق) অদৃশ্য হয় এবং এর শেষ সময় হলো যতক্ষণ পর্যন্ত ফজর বা সুব্‌হি সাদিক উদয় না হয়। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন– ইশার শেষ সময় হলো যতক্ষণ ফজর উদয় না হয়। রাতের তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার দ্বারা ইশার সময় নির্ধারণের ব্যাপারে এ হাদীস ইমাম শাফেঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলিল। বিতরের প্রথম সময় হলো ইশার পরে এবং তার শেষ সময় হলো যতক্ষণ পর্যন্ত সুব্‌হি সাদিক উদয় না হয়। কেননা রাসূল ﷺ বিত্‌র সম্পর্কে বলেছেন, "ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে তোমরা তা (বিতর) আদায় করো"। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, এটা সাহেবাইনের মত। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইশার সময়ই হচ্ছে বিতরের সময়। তবে তারতীব ওয়াজিব হওয়ার কারণে স্মরণ থাকা অবস্থায় বিত্‌রকে ইশার আগে আদায় করা যাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইশার প্রথম সময় শাফাক অস্ত যাওয়ার পর হতে আরম্ভ হয় এবং এর শেষ সময় হলো, যতক্ষণ না সুব্‌হি সাদিক উদিত হয়। কেননা রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– ইশার শেষ সময় যতক্ষণ পর্যন্ত সুবহি সাদিক না হয়। ইমাম শাফেঈ (র.) বলেছেন– রাতের তৃতীয়াংশ অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত ইশার সময় বিদ্যমান থাকে।

আমাদের দলিল হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস,

اِنَّهُ ﷺ قَالَ وَاٰخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرَ .

অর্থ– রাসূল ﷺ বলেছেন– ইশার শেষ সময় যতক্ষণ পর্যন্ত সুব্‌হি সাদিক উদয় না হয়।

এ হাদীস ইশার সময় সুব্‌হি সাদিক পর্যন্ত বিদ্যমান থাকার প্রমাণ বহন করে। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল হচ্ছে– জিব্‌রাঈলের ইমামত সম্পর্কিত হাদীস, এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইশার শেষ সময় রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। আমাদের পক্ষ হতে তার জবাব জোহরের সময়ের বিবরণে প্রদান করা হয়েছে। সেখানে দেখুন।

ফায়দা ঃ ইশার নামাজ সর্ব প্রথম হযরত মূসা (আ.) পড়েছেন। — (ইনায়া)

وَاَوَّلُ وَقْتُ الْوِتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الخ ঃ বিতরের প্রথম সময় নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। সাহেবাইনের মতে ইশার নামাজের পর থেকে বিতরের সময় আরম্ভ হয় এবং সুব্‌হি সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে ইশার নামাজের সময়ই বিতরের সময়।

সাহেবাইনের দলিল হচ্ছে– খারিজা ইবন হুযাফা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস,

قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَضَافَ بِصَلٰوةٍ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ .

অর্থ ঃ হযরত খারিজা ইবনে হুযাফা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য একটি নামাজ বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা তোমাদের জন্য লাল উষ্ট্রী হতে উত্তম। আর তা হচ্ছে বিতরের নামাজ, অতঃপর তিনি একে 'ইশা এবং সুবৃহি সাদিক এর মাঝে রাখেন।— (ফত্‌হুল কাদির)

হিদায়া গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন–

فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ .

অর্থ ঃ ইশা এবং সুবৃহি সাদিক-এর মধ্যবর্তী সময়ে তা আদায় করবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো বিত্‌র আমলের দিক থেকে ফরজ। যদি সময় দু'ওয়াজিব নামাজকে একত্রিত করতে পারে তাহলে দু' নামাজের জন্য একই সময় হবে যেমন কাজা নামাজ এবং ওয়াক্তিয়া নামাজ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কথার উপর প্রশ্ন হবে যে, যদি দু' নামাজের একই সময় হয় তাহলে বিতরের নামাজ 'ইশার আগে পড়া জায়েজ হওয়া চাই। অথচ তা জায়েজ নেই।

উত্তর ঃ স্মরণ থাকা অবস্থায় বিত্‌র 'ইশার আগে পড়া এ জন্য জায়েজ নেই যে, 'ইশা এবং বিত্‌রের নামাজের মধ্যে তরতীব ওয়াজিব। অতএব যদি কেউ 'ইশার নামাজের পূর্বে বিতরের নামাজ ইচ্ছকৃতভাবে পড়ে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে বিতরের নামাজ পুনরায় পড়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে যদি ইশার নামাজ ভুলে যায় এবং বিতরের নামাজ পড়ে অতঃপর ইশার নামাজ স্মরণ হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিত্‌রের নামাজ পুনরায় পড়বে না। ভুলে যাওয়ার কারণে তারতীব রহিত হয়ে যায়।

তবে সাহেবাইনের মতে বিতরের নামাজ পুনরায় পড়তে হবে। কেননা সাহেবাইনের মতে বিতরের নামাজ 'ইশার নামাজের সুন্নত। যেমন-'ইশার পরে অন্য দু'রাকআত সুন্নত আছে। যদি ঐ দু'রাকআত সুন্নত 'ইশার নামাজের পূর্বে পড়ে তাহলে তা জায়েজ নেই। চাই তা ইচ্ছাকৃতভাবে পড়ুক বা ভুলে পড়ুক অনুরূপ ভাবে তিতরের নামাজকে 'ইশার পূর্বে পড়া জায়েজ নেই; চাই ইচ্ছাকৃতভাবে পড়ুক বা ভুলক্রমে পড়ুক।

فَصْلٌ : وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ وَقَالَ الشَّافِعِي (رح) يُسْتَحَبُّ التَّعْجِيْلُ فِيْ كُلِّ صَلٰوةٍ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ وَمَا نَرْوِيْهِ وَالْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ وَتَقْدِيْمُهُ فِي الشِّتَاءِ لِمَا رَوَيْنَا وَلِرِوَايَةِ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ بَكَّرَ بِالظُّهْرِ وَإِذَا كَانَ فِي الصَّيْفِ أَبْرَدَ بِهَا وَتَاخِيْرُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ فِي الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَكْثِيْرِ النَّوَافِلِ لِكَرَاهَتِهَا بَعْدَهُ وَالْمُعْتَبَرُ تَغَيُّرُ الْقُرْصِ وَهُوَ أَنْ يَّصِيْرَ بِحَالٍ لَاتَحَارُ فِيْهِ الْأَعْيُنُ هُوَ الصَّحِيْحُ وَالتَّاخِيْرُ إِلَيْهِ مَكْرُوْهٌ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ নামাজের মোস্তাহাব সময়

অনুবাদ ঃ ফজরের নামাজ ফরসা হওয়ার পরে আদায় করা মোস্তাহাব। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা ফজরের নামাজ ফরসা হয়ে যাওয়ার পর আদায় করবে। কেননা, এতেই রয়েছে অধিক ছওয়াব। ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন, প্রত্যেক নামাজ অবিলম্বে আদায় করা মোস্তাহাব। আমাদের বর্ণিত এ হাদীস ইমাম শাফেঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলিল, এবং পরবর্তী আসন্ন হাদীসটিও তার বিপক্ষে দলিল। গ্রীষ্ম কালে জোহরের সালাত সূর্যের তাপ কমে আসলে এবং শীতকালে প্রথম সময়ে আদায় মোস্তাহাব। প্রমাণ ইতঃপূর্বে যে হাদীস আমরা বর্ণনা করেছি এবং হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যে, রাসূল ﷺ শীতকালে জোহর অবিলম্বে আদায় করতেন এবং গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপ কমে আসলে আদায় করতেন। শীত গ্রীষ্ম উভয় মৌসুমে সূর্য বিবর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আসরের নামাজ বিলম্ব করা মোস্তাহাব। যেহেতু আসরের পরে নফল নামাজ মাকরূহ। সুতরাং আসর বিলম্বে পড়লে অধিক নফল আদায়ের অবকাশ পাওয়া যায়। আর ধর্তব্য হলো সূর্যের গোলক বিবর্ণ হওয়া। অর্থাৎ এমন অবস্থা হওয়া যাতে চোখ না ধাঁধায়। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। এ (বিবরণ) পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরূহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিগত পৃষ্ঠাগুলোতে নামাজের মতলক বা সাধারণ সময়ের বিবরণ ছিল, এখন নামাজের উত্তম সময় এবং ক্রটিযুক্ত সময়ের আলোচনা হবে। উভয়টির জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে নামাজের উত্তম সময় বা মোস্তাতাহাব সময়ের বর্ণনা করেছেন এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নামাজের ক্রটিযুক্ত (مكروه) সময়ের বর্ণনা করেছেন।

আহনাফ (র.)-এর মতে ফজরের নামাজ ফরসা করে পড়া মোস্তাহাব। ফরসা হওয়ার সীমা হলো যে, সকালের আলো (ফরসা) বিস্তৃত হবার পর সুন্নত তরীকায় কিরাত আরম্ভ করবে অতঃপর যদি কারো কোনো কারণ বশত আবার অজু করার প্রয়োজন হয় তাহলে পুনঃ অজু করে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে নামাজ সুন্নত কেরাতের মাধ্যমে পড়া সম্ভব হয়। সারকথা হলো ফরসার মধ্যে নামাজ আরম্ভ করা হবে এবং ফরসার মধ্যেই নামাজ শেষ করা হবে। তাহলে মোস্তাহাবের ওপর আমল হবে। পক্ষান্তরে ইমাম তাহাবী (র.) -এর মতে মোস্তাহাব হলো যে, নামাজ অন্ধকারে আরম্ভ করবে এবং ফরসার মধ্যে শেষ করবে, মোটকথা দীর্ঘ কেরাত দ্বারা অন্ধকার এবং ফরসাকে সমন্বয় করবে। ইমাম শাফেঈ (র.) এবং ইমাম মালিক (র.)-এর মতে ফজর অবিলম্বে পড়া মোস্তাহাব-অবিলম্বের সীমা হলো যে, ফজরের সময়ের প্রথমার্ধে নামাজ আদায় করবে। ইমাম শাফেঈ হযরত আয়েশা (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ প্রদান করেন,

قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ (بُخَارِىْ وَمُسْلِمْ)

অর্থ ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ফজরের নামাজ পড়ে ফারিগ হতেন। তখন মহিলাগণ স্বীয় উরনীতে পেঁচানো অবস্থায় (নিজ গৃহে) প্রত্যাবর্তন করতেন, অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চিনা যেতো না। এ হাদীসের দ্বারা এ কথা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ অন্ধকারে নামাজ পড়ে ফারিগ হতেন। দ্বিতীয় দলিল রাসূল ﷺ-এর বাণী اَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَاٰخِرُهٗ عَفْوُ اللّٰهِ অর্থ– প্রথম সময়টি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং শেষ সময়টি তাঁর মার্জনার সময়। عفو বা মার্জনার দ্বারা বুঝা যায় যে, শেষ সময়ে নামাজ পড়া ত্রুটি ও অবহেলা। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, নামাজ অবিলম্বে পড়া মোস্তাহাব। রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল-اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ অর্থ– কোন আমল আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়। রাসূল ﷺ উত্তর দিয়েছেন, اَلصَّلٰوةُ لِاَوَّلِ وَقْتِهَا অর্থ-প্রথম সময়ে নামাজ আদায় করা।

হানাফী ফকীহ্‌দের দলিল-হযরত রাফি ইবনে খাদীজ (রা.) -এর হাদীস اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهٗ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ অর্থ– ফজর ফরসা করে পড়ো। কেননা তাতে অধিক ছওয়াব রয়েছে। এ হাদীস থেকে এভাবে দলিল গ্রহণ করা হয়েছে যে, এখানে اِسْفَارْ বা ফরসা করে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমর (امر)-এর ন্যূনতম স্তর হলো মোস্তাহাব। এ জন্য বলা হয়েছে যে, ফজরের নামাজ ইসফারে (اسفار) পড়া মোস্তাহাব। ইমাম শাফেঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.) -এর হাদীসের জবাব হলো, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটি فعلى। পক্ষান্তরে اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ হাদীসটি قولى যখন قول ও فعل-এর মধ্যে বৈপরীত্ব সৃষ্টি হয় তখন قولى হাদীস প্রাধান্য পায়, فعلى হাদীস প্রাধান্য পায় না।

গ্রীষ্মকালে জোহরের নামাজ শীতল করে পড়া এবং শীতকালে অবিলম্বে পড়া মোস্তাহাব। তাঁর দলিল পূর্বোক্ত হাদীসটি অর্থাৎ اَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিও দলিল, বুখারী শরীফে পূর্ণ হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত খালিদ ইবনে দীনার বলেন, আমাদের আমীর আমাদের জুমার নামাজ পড়িয়েছেন অতঃপর হযরত আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন–

كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلٰوةِ وَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ ـ

অর্থ ঃ রাসূল ﷺ কিভাবে জোহরের নামাজ পড়তেন, তিনি [আনাস (রা.)] বললেন, যখন প্রচণ্ড শীত হয় তখন জোহরের নামাজ অবিলম্বে পড়েন। আর যখন প্রচণ্ড গরম পড়ে তখন (জোহরের নামাজ) শীতল করে পড়েন।

আসরের নামাজ প্রত্যেক মৌসুমে বিলম্ব করে পড়া মোস্তাহাব। তবে শর্ত হলো, সূর্য যেন বিবর্ণ না হয়। এটার দলিল এই যে, আসর বিলম্ব করার দ্বারা অধিক নফল পড়ার অবকাশ থাকে। কেননা আসরের পরে নফল পড়া মাকরূহ। অতএব আসরের নামাজ বিলম্ব করে পড়া হবে। যাতে আসরের পূর্বে বেশি করে নফল পড়ার অবকাশ থাকে। ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম শাফেঈ (র.) -এর মতে আসর অবিলম্বে পড়া উত্তম, দলিল হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস,

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِىْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ـ

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রাসূল ﷺ আসরের নামাজ পড়তেন এবং পথিক মদীনার আওয়ালী (عوالى) -এর দিকে চলে যেতেন এবং ঐ সময় সূর্য উঁচুতে থাকতো। ইহা ঐ সময়ই সম্ভব যখন আসর অবিলম্বে আদায় করা হয়।

উপরোক্ত হাদীসের জবাবে আহনাফের পক্ষ থেকে বলা হয়,

আওয়ালী (عوالى) মদীনা থেকে দু' তিন মাইল পরিমাণ দূরে অবস্থিত। মাইল দ্বারা ঐ মাইলকে বুঝানো হয়েছে যা তায়াম্মুম (تيمم)-এর অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তা তেমন বেশি দূর নয়। এবং আসরের নামাজ বিলম্ব করে পড়ার পরও ঐ পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব। অতএব এ হাদীসটি আমাদের বিপক্ষে দলিল হবে না।

হিদায়া প্রণেতা বলেছেন, সূর্য বিবর্ণ হওয়ার দ্বারা সূর্যের গোলক বিবর্ণ হওয়া ধর্তব্য। তা হচ্ছে– সূর্য এমন অবস্থায় পৌঁছা যে, এর প্রতি যদি কেউ নজর করে তবে এতে তার চোখে ধাঁধাবেনা; বরং তার উপর দৃষ্টি স্থির থাকবে এবং এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।

ইব্রাহীম নাখঈ (র.) বলেন যে, সূর্য বিবর্ণ হওয়া দ্বারা তার আলো বিবর্ণ হওয়া, যা প্রাচীরের উপর পড়ে। এ মতটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা সূর্যের আলো সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে বিবর্ণ হওয়া আরম্ভ করে। ইনায়া গ্রন্থের প্রণেতা লিখেছেন যে, সূর্যের গোলক বিবর্ণ হওয়া এই যে, সূর্য এক বর্শা পরিমাণ থেকে কম হবে। পক্ষান্তরে যদি এক বর্শা পরিমাণ হয়, তাহলে গোলাকৃতি বিবর্ণটি হয়নি বলে মনে করতে হবে। হিদায়া প্রণেতার মতে সূর্যের আলো বিবর্ণ হওয়া পর্যন্ত নামাজ বিলম্ব করা মাকরূহ, এর পূর্বে আদায় করা মোস্তাহাব।

وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيْلُ الْمَغْرِبِ لِاَنَّ تَاخِيْرَهَا مَكْرُوْهٌ لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالْيَهُوْدِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَايَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْمَغْرِبَ وَاَخَّرُوا الْعِشَاءَ وَتَاخِيْرُ الْعِشَاءِ اِلٰى مَا قَبْلَ ثُلُثِ اللَّيْلِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَخَّرْتُ الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلِاَنَّ فِيْهِ قَطْعَ السَّمَرِ الْمَنْهِىْ عَنْهُ بَعْدَهُ وَقِيْلَ فِى الصَّيْفِ تُعَجَّلُ كَيْلَا تَتَقَلَّلَ الْجَمَاعَةُ وَالتَّاخِيْرُ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ مُبَاحٌ لِاَنَّ دَلِيْلَ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ تَقْلِيْلُ الْجَمَاعَةِ عَارَضَهُ دَلِيْلُ النُّدْبِ وَهُوَ قَطْعُ السَّمَرِ بِوَاحِدٍ فَيَثْبُتُ الْاِبَاحَةُ اِلَى النِّصْفِ وَاِلَى النِّصْفِ الْاَخِيْرِ مَكْرُوْهٌ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَقْلِيْلِ الْجَمَاعَةِ وَقَدِ انْقَطَعَ السَّمَرُ قَبْلَهُ وَيُسْتَحَبُّ فِى الْوِتْرِ لِمَنْ يَّاْلَفُ صَلٰوةَ اللَّيْلِ اٰخِرَ اللَّيْلِ فَاِنْ لَّمْ يَثِقْ بِالْاِنْتِبَاهِ اَوْتَرَ قَبْلَ النَّوْمِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ خَافَ اَنْ لَّا يَقُوْمَ اٰخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ اَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ اَنْ يَّقُوْمَ اٰخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ اٰخِرَ اللَّيْلِ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ فَالْمُسْتَحَبُّ فِى الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ تَاخِيْرُهَا وَفِى الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ تَعْجِيْلُهَا لِاَنَّ فِىْ تَاخِيْرِ الْعِشَاءِ تَقْلِيْلُ الْجَمَاعَةِ عَلٰى اِعْتِبَارِ الْمَطَرِ وَفِىْ تَاخِيْرِ الْعَصْرِ تَوَهُّمُ الْوُقُوْعِ فِى الْوَقْتِ الْمَكْرُوْهِ وَلَا تَوَهُّمَ فِى الْفَجْرِ لِاَنَّ تِلْكَ الْمُدَّةَ مَدِيْدَةٌ وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَلتَّاخِيْرُ فِى الْكُلِّ لِلْاِحْتِيَاطِ اَلَا تَرٰى اَنَّهُ يَجُوْزُ الْاَدَاءُ بَعْدَ الْوَقْتِ لَا قَبْلَهُ ـ

অনুবাদ : মাগরিবের নামাজ প্রথম সময়ে আদায় করা মোস্তাহাব। কেননা বিলম্বে পড়লে ইহুদিদের সাথে সাদৃশ্য হয় বিধায় উহা মাকরূহ। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– আমার উম্মত যতদিন মাগরিব্ অবিলম্বে এবং ইশা বিলম্বে আদায় করবে, ততদিন তারা কল্যাণের পথে থাকবে। ইশাকে রাত্রের তৃতীয়াংশের পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি আমার উম্মতের কষ্ট হবে মনে না করতাম তাহলে অবশ্যই আমি ইশার নামাজ রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম। তা ছাড়া তা ইশার পরে হাদীসে নিষিদ্ধ আলাপ করা থেকে বিরত থাকার উপায়। কারো কারো মতে গ্রীষ্মকালে তাড়াতাড়ি করতে হবে, যাতে জামাতে মুসল্লির সংখ্যা কমে না যায়। মধ্যরাত পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ। কেননা মাকরূহ হওয়ার দলিল হলো জামাত ছোট হওয়া এবং মোস্তাহাব হওয়ার দলিল

হলো-আলাপচারিতা থেকে বিরত থাকা পরস্পর বিরোধী। সুতরাং মধ্যরাত পর্যন্ত মাকরূহ হওয়া প্রমাণিত হবে। কেননা তাতে জামাত ছোট হয়। পক্ষান্তরে আলাপচারিতা এর আগেই বন্ধ হয়ে যায়। তাহাজ্জুদের নামাজ আদায়ে অভ্যস্ত ব্যক্তির জন্য বিতরের ক্ষেত্রে রাতের শেষ ভাগ পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। আর যে ব্যক্তি জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চিত, সে ঘুমের আগেই বিতর আদায় করবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আশঙ্কা করে যে, শেষ রাতে জাগ্রত হতে পারবে না সে যেন রাতের প্রথম দিকে বিতর আদায় করে। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার আশা করে সে যেন শেষ রাতেই বিতর আদায় করে। মেঘলা দিন হলে ফজর জোহর এবং মাগরিব বিলম্বে আদায় করা এবং আসর ও ইশা অবিলম্বে আদায় করা মোস্তাহাব। কেননা মেঘ-বৃষ্টির কারণে ইশা বিলম্ব করায় জামাত ছোট হবে। আর আসর বিলম্ব করলে মাকরূহ ওয়াক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে ফজরে সে সম্ভাবনা নেই। কেননা ফজরের সময় দীর্ঘ। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে সতর্কতার জন্য সকল নামাজে বিলম্বের নির্দেশ বর্ণিত আছে। কেননা সময় অতিক্রম হওয়ার পরে (কাজা হলেও) নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে। পক্ষান্তরে সময়ের আগে নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيْلُ الْمَغْرِبِ الخ ঃ মাগরিবের নামাজ অবিলম্বে আদায় করা মোস্তাহাব অর্থাৎ আযান এবং ইকামতের মাঝে কোনো ব্যবধান করবে না, শুধু হালকা বৈঠক বা সামন্য বিরত থাকা ব্যতীত। কেননা ইহুদিরা মাগরিবের নামাজ বিলম্ব করে পড়ে। দ্বিতীয় দলিল রাসূল ﷺ-এর হাদীস- لَا يَزَالُ أُمَّتِىْ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْمَغْرِبَ وَاَخَّرُوا الْعِشَاءَ ـ

অর্থ ঃ আমার উম্মত যতদিন মাগরিব অবিলম্বে এবং ইশা বিলম্বে পড়বে ততদিন তারা কল্যাণের পথে থাকবে।

ব্যাখ্যা ঃ ইশার নামাজ রাত্রের তৃতীয়াংশের পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। শরহে নিকায়া (شرح نقايه)-এর মধ্যে আছে যে, তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। দলিল রাসূল ﷺ-এর হাদীস لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَخَّرْتُ الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ অর্থ- যদি আমার উম্মতের কষ্ট হবে মনে না করতাম, তাহলে অবশ্যই আমি ইশার সালাত রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম। দ্বিতীয় দলিল হলো যে, ইশার নামাজের পর শরিয়তের দৃষ্টিতে আলাপচারিতা নিষিদ্ধ। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, لَا سَمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ অর্থ- ইশার পর আলাপচারিতা নেই।

তৃতীয় দলিল, اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا অর্থ- রাসূল ﷺ ইশার পূর্বে ঘুমানো এবং ইশার পরে আলাপচারিতাকে অপসন্দ করতেন। মোট কথা ইশার পর আলাপচারিতা, গল্প করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। ইশার নামাজ তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করার দ্বারা আলাপচারিতার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। কেননা যখন বিলম্বে নামাজ পড়বে তখন ইশার পর পরই ঘুমানোর চিন্তা করবে, গল্পগুজবে নয়। এ জন্য রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোনো কোনো ফকীহ-এর মতে গ্রীষ্মকালে ইশার নামাজ অবিলম্বে পড়া মোস্তাহাব। কেননা গ্রীষ্মকালে ইশার নামাজ বিলম্ব করলে জামাতে লোক কম হবে। এর কারণ হচ্ছে যে, গ্রীষ্মকালে রাত ছোট হয় এবং মানুষ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে।

হিদায়া প্রণেতা বলেছেন, ইশার নামাজ অর্ধেক রাত পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ আছে। দলিল এই যে, বিলম্বের কারণে জামাতে লোক কম হলে মাকরূহ হবে। অন্য দিকে বিলম্বের কারণে গল্পগুজব বন্ধ হওয়ার কারণে মোস্তাহাব হবে। এখানে মুস্তাহাব এর দলিল এবং মাকরূহের দলিলের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার কারণে উভয়টি রহিত হয়ে বৈধতা সাবেত হবে। শেষার্ধেক পর্যন্ত ইশার নামাজ বিলম্ব করা মাকরূহ। কেননা মাকরূহ-এর দলিল এবং জামাতে লোক কম হওয়া বিদ্যমান। মোস্তাহাবের দলিল এর জন্য মুআরিয (معارض) বা বিপরীত বিষয় নয়। কেননা গল্পগুজব পূর্বেই খতম হয়ে গিয়েছে। বিধায় এখানে মোস্তাহাবের দলিল পাওয়া যাচ্ছে না।

وَيُسْتَحَبُّ فِى الْوِتْرِ الخ ব্যাখ্যা ঃ মাসআলা যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ-এর নামাজে অভ্যস্ত এবং শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার বিশ্বাস আছে, তার ক্ষেত্রে মোস্তাহাব হলো বিতরের নামাজ শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পরে পড়া। পক্ষান্তরে যদি শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার বিশ্বাস না থাকে অথবা তাহাজ্জুদ-এর নামাজ পড়ার অভ্যস্ত না হয়, তা হলে সে ব্যক্তি ঘুমের পূর্বেই বিতর পরে নেবে। হিদায়া প্রণেতা রাসূল ﷺ-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। হাদীসটি নিম্নোরূপ– পূর্বে মোস্তাহাব সময়ের বর্ণনা ছিল, যখন সূর্য উদয়ের স্থান পরিষ্কার থাকে। পক্ষান্তরে যদি উদয়ের স্থান পরিষ্কার না থাকে বরং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এমতাবস্থায় ইনায়া প্রণেতা মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, اَلْعَيْنُ مَعَ الْعَيْنِ অর্থাৎ যে নামাজের প্রথম অক্ষরে আইন (عين) আছে যেমন– আসর (عصر) এবং ইশা (عشاء) তাহলে উক্ত নামাজদ্বয়ে নামাজ উজলত (عجلت) বা জলদী পড়তে হবে অর্থাৎ তড়িৎভাবে পড়তে হবে। ঐ দুই নামাজ ব্যতীত অবশিষ্ট নামাজ বিলম্বে আদায় করা মোস্তাহাব। মেঘের দিনে ইশার নামাজ অবিলম্বে পড়ার কারণ হচ্ছে যে, এমতাবস্থায় যদি ইশার নামাজ বিলম্ব করা হয় তাহলে জামাতে লোক কম হবে। বৃষ্টির কারণে লোকেরা অলসতা করবে এবং রোখ্‌সতের (رخصت)-এর উপর আমল করবে। কেননা রাসূল ﷺ বৃষ্টির দিনে আযানের পর ঘোষণা করাতেন اَلَا صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ অর্থ– সাবধান নিজ নিজ বাসস্থানে নামাজ পড়ো। আসরের নামাজ তাড়াতাড়ি পড়ার কারণ হচ্ছে যে, আসর বিলম্ব করে পড়লে নামাজ মাকরূহ সময়ে আদায় করার সন্দেহ বিদ্যমান থাকে। কেননা আসরের শেষ সময় মাকরূহ। এ জন্য আসরের নামাজ অবিলম্বে আদায় করা মোস্তাহাব। পক্ষান্তরে ফজরের নামাজে এ সন্দেহ বিদ্যমান নেই। কেননা ফজরের নামাজের সময় সুবহি সাদিক থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। অতএব ফজরের নামাজ বিলম্ব করা সত্ত্বেও সূর্য উদয় হওয়ার সময় নামাজ আদায় কারার সন্দেহ হবে না। এ কারণে মেঘের দিনে ফজরের নামাজ বিলম্বে আদায় করা মোস্তাহাব। জোহর এবং মাগরিব এ জন্য বিলম্ব করা মোস্তাহাব। পক্ষান্তরে যদি মেঘের দিনে উক্ত নামাজদ্বয় আগেভাগে পড়ে, তাহলে সময়ের পূর্বে নামাজ আদায় করার সম্ভাবনা থাকে। আর সময়ের পূর্বে নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। এ কারণে ঐ নামাজদ্বয় বিলম্ব করে পড়া মোস্তাহাব।

হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন, মেঘের দিনে সকল নামাজ বিলম্ব করে পড়ার মাঝেই সাবধানতা। কেননা আগেভাগে পড়ার মাঝে সময়ের পূর্বে নামাজ আদায় হওয়ার আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে নামাজ বিলম্ব করে পড়লে সময়ের পরে নামাজ আদায় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রকাশ থাকে যে, সময়ের পরে নামাজ পড়া জায়েজ আছে, যদিও তা কাজা হয়। পক্ষান্তরে সময়ের পূর্বে নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। আদা বা ওয়াক্তিয়া হিসাবে জায়েজ নেই এবং কাজা হিসাবেও জায়েজ নেই।

فَصْلٌ : فِى ٱلْاَوْقَاتِ الَّتِى تُكْرَهُ فِيْهَا الصَّلٰوةُ لَا تَجُوْزُ الصَّلٰوةُ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ قِيَامِهَا فِى الظَّهِيْرَةِ وَلَاعِنْدَ غُرُوْبِهَا لِحَدِيْثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ ثَلٰثَةُ اَوْقَاتٍ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُصَلِّىَ وَاَنْ نَقْبُرَ فِيْهَا مَوْتَانَا عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتّٰى تَزُوْلَ وَحِيْنَ تَضِيْفُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَاَنْ نَقْبُرَ صَلٰوةُ الْجَنَازَةِ لِاَنَّ الدَّفْنَ غَيْرُ مَكْرُوْهٍ وَالْحَدِيْثُ بِاِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِى (رحـ) فِىْ تَخْصِيْصِ الْفَرَائِضِ بِمَكَّةَ وَحُجَّةٌ عَلٰى اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) فِىْ اِبَاحَةِ النَّفْلِ يَوْمَ اْلجُمُعَةِ وَقْتَ الزَّوَالِ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ নামাজের মাকরূহ সময়

অনুবাদ ঃ সূর্যদোয়ের সময়, মধ্যাহ্নে সূর্য মধ্যকাশে অবস্থানের সময় এবং সূর্যাস্তের সময় নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। দলিল উকবা ইবনে আমির (রা.) বলেছেন, রাসূল ﷺ তিনটি সময়ে আমাদেরকে নামাজ পড়তে এবং মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন, সূর্যোদয়কালে সূর্য উপরে উঠে যাওয়া পর্যন্ত, মধ্যাহ্ন কালে সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত, আর যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। লেখকের বক্তব্য وان نقبر -এর দ্বারা উদ্দেশ্য জানাযার নামাজ। কেননা (ইজমা দ্বারা প্রমাণ যে, উক্ত সময়ে) দাফন করা মাকরূহ নয়। আলোচ্য হাদীসটির অর্থ ব্যাপক হওয়ার কারণে ইমাম শাফেঈ (র.) -এর বিপক্ষে দলিল, ফরজসমূহ মক্কাতে খাস বা নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বিপক্ষেও দলিল, জুমার দিন মধ্যাহ্নকালে নফল জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে নামাজের সময়ের দুই প্রকারের মধ্য হতে মোস্তাহাব সময়ের বর্ণনা ছিল। এ পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ মাকরূহ সময়ের বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। এখানে كراهت বা মাকরূহ হওয়া ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। মাকরূহ এর সাথে জায়েজ এবং সম্পূর্ণ নাজায়েজ উভয়কে বুঝায়। মোটকথা হচ্ছে আমাদের নিকটে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন কালও সূর্যাস্ত কালে ফরজ পড়াও জায়েজ নেই নফল পড়াও জায়েজ নেই। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.) বলেছেন যে, উক্ত সময়গুলোতে সকল শহর এবং সকল স্থানে ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ আছে এবং পবিত্র মাক্কায় উক্ত সময়গুলোতে নফল নামাজ পড়া জায়েজ আছে।— (ইনায়া)।

ফতহুল কাদীর প্রণেতা লিখেছেন যে, উক্ত সময়গুলোতে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে পবিত্র মক্কায় যে কোনো নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে। ফরজ হোক বা নফল হোক। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন, জুমার দিনে মধ্যাহ্ন কালে নফল নামাজ পড়া জায়েজ আছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এবং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ اِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

অর্থ– রাসূল ﷺ মধ্যাহ্ন কালে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য হেলে না পড়ে। তবে হাঁ জুমার দিন এর ব্যতিক্রম। ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল–

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ وَقْتُهَا .

অর্থ– যে ব্যক্তি নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা নামাজ পড়তে ভুলে যায়, তাহলে ঐ নামাজ পড়ে নেবে যখন তা স্মরণ হয়। কেননা উহাই তার সময়। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ সময়গুলোতেও ফরজ পড়া জায়েজ আছে। উক্ত সময়ে পবিত্র মক্কায় নফল নামাজ বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে হযরত আবূ যর (রা.) -এর নিম্নোক্ত হাদীসটি দলিল। হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, উক্ত সময়ে পবিত্র মক্কা ব্যতীত নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। অন্যত্র রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوْا اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلّٰى فِىْ اَيَّةِ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ .

অর্থ : হে বনি আবদে মানাফ! তোমরা কোনো ব্যক্তিকে এ গৃহে তওয়াফ করতে এবং নামাজ পড়তে বাধা দিও না রাত্র দিনে যখনই নামাজ পড়তে চায়। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, পবিত্র মাক্কায় সর্বদা নামাজ পড়া জায়েজ আছে। আমাদের দলিল ওক্‌বা ইব্‌নে আমির (রা.)-এর হাদীস -

قَالَ ثَلٰثَةُ اَوْقَاتٍ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُصَلِّىَ وَاَنْ نَقْبُرَ فِيْهَا مَوْتَانَا عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتّٰى تَزُوْلَ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ .

হযরত ওকবা ইবনে আমির (রা.) -এর হাদীসে নামাজের দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যাপক, ফরজ হোক বা নফল হোক এবং وان نقبر দ্বারা জানাযার নামাজ উদ্দেশ্য। কেননা ঐ সময়ে মৃত্যু ব্যক্তিকে দাফন করা মাকরূহ নয়। এখন মর্ম এই দাঁড়াল যে, রাসূল ﷺ ঐ সময় সাধারণ নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন; চাই ফরজ হোক বা নফল হোক এবং জানাযার নামাজ পড়তেও নিষেধ করেছেন। অতএব এ হাদীস ইমাম শাফেঈ (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বিপক্ষে (আমাদের) দলিল। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের জবাব اِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ এটা استثناء منقطع (অসম গোত্রীয় ব্যত্যয়)। দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে اِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ-এর অর্থ হবে لَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ সুতরাং হাদীসের মর্ম হবে রাসূল ﷺ মধ্যাহ্নকালে নামাজ আদায় করতে নিষেধ করছে এবং জুমার দিনেরও নামাজ পড়বে না। ইমাম শাফেঈ (র.) -এর বর্ণিত হাদীস مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ الخ -এর জবাব-এ হাদীস দ্বারাই ঐ তিন সময়ে নামাজ আদায়ের বৈধতা সাবেত হয় এবং ওক্‌বা ইবনে আমির (রা.)-এর হাদীস দ্বারা নামাজ পড়া হারাম সাবিত হয়। উসূলে ফিকহের গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, বৈধ এবং অবৈধ (হারাম) একত্রিত হলে অবৈধ প্রাধান্য পায়। এ কারণে এখানে ওক্‌বা ইবনে আমির (রা.)-এর হাদীসের প্রাধান্য হবে। হযরত আবূ যর (রা.)-এর হাদীসের উত্তর হলো الا بمكة -এর অর্থ হবে ولا بمكة যেমন আল্লাহর বাণী الا خطاء -এর অর্থ ولا خطاء, অতএব এ হাদীস ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল হবে না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

قَالَ وَلَا صَلٰوةُ جَنَازَةٍ لِمَا رَوَيْنَا وَلَاسَجْدَةُ تِلَاوَةٍ لِاَنَّهَا فِىْ مَعْنَى الصَّلٰوةِ اِلَّا عَصْرَ يَوْمِهٖ عِنْدَ الْغُرُوْبِ لِاَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْجُزْءُ الْقَائِمُ مِنَ الْوَقْتِ لِاَنَّهٗ لَوْتَعَلَّقَ بِالْكُلِّ اَوْجَبَ الْاَدَاءَ بَعْدَهٗ وَلَوْ تَعَلَّقَ بِالْجُزْءِ الْمَاضِىْ فَالْمُؤَدِّىْ فِىْ اٰخِرِ الْوَقْتِ قَاضٍ وَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ فَقَدْ اَدَّاهَا كَمَا وَجَبَتْ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ لِاَنَّهَا وَجَبَتْ كَامِلَةً فَلَاتَتَادّٰى بِالنَّاقِصِ قَالَ (رضـ) وَالْمُرَادُ بِالنَّفْىِ الْمَذْكُوْرِ فِىْ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ الْكَرَاهَةُ حَتّٰى لَوْصَلَّاهَا فِيْهِ اَوْ تَلَا سَجْدَةً فِيْهِ وَسَجَدَهَا جَازَ لِاَنَّهَا اُدِّيَتْ نَاقِصَةً كَمَا وَجَبَتْ اِذِالْوُجُوْبُ بِحُضُوْرِ الْجَنَازَةِ وَالتِّلَاوَةِ ـ

অনুবাদ ঃ ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে জানাযার নামাজ জায়েজ হবে না, আমাদের বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে এবং সাজদায়ে তেলাওয়াতও জায়েজ হবে না। কেননা তা নামাজের অংশ বিশেষ। তবে সূর্যাস্তের সময় ঐ দিনের আসর আদায় করা যাবে। নামজ ওয়াজিব হওয়ার سبب বা হেতু হচ্ছে সময়ের সেই অংশ যা বিদ্যমান আছে অর্থাৎ নামাজ আরম্ভের পূর্ব মুহূর্ত। কেননা سبب বা হেতুর সম্পর্ক যদি পূর্ণ সময়ের সাথে হয়, তাহলে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব হয়। আর সময়ের বিগত অংশের সাথে যদি সম্পর্কিত হয়, তাহলে শেষ সময়ে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি নামাজ কাজাকারী হিসাবে গণ্য হয়। বিষয়টি যখন এমনই হলো, তবে তো তার ওপর যেমন ওয়াজিব হয়েছে, সে তেমনই আদায় করেছে। আর অন্যান্য নামাজ-এর ব্যতিক্রম। কেননা সেগুলো পূর্ণাঙ্গ সময়ে ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং অপূর্ণাঙ্গ সময়ে তা আদায় করতে পারে না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, জানাযার নামাজ এবং তেলাওয়াতে সিজদা সম্পর্কে উল্লিখিত নাজায়েজের অর্থ হলো মাকরূহ হওয়া। সুতরাং যদি কেউ ঐ সময়ে জানাযার নামাজ আদায় করে কিংবা সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করতঃ উক্ত তেলাওয়াতের সাজদা আদায় করে, তাহলে জায়েজ হবে। কেননা যেমন নাকিস (ناقص) সময়ে তা ওয়াজিব হয়েছে তেমনি নাকিস সময়ে তা আদায় করা হয়েছে। কেননা জানাযা উপস্থিত হওয়া এবং তেলাওয়াত করার মাধ্যমে তা ওয়াজিব হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার বলেছেন, উক্ত তিন সময়ে জানাযার নামাজ এবং সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করবে না। দলিল পূর্বোক্ত হাদীস অর্থাৎ اَنْ نَقْبُرَ مَوْتَانَا এবং সিজদায়ে তেলাওয়াত নাজায়েজ হওয়ার দলিল হলো যে, সিজদায়ে তেলাওয়াত নামাজের অংশ বিশেষ, তা এ ভাবে যে, নামাজের মধ্যে যেমন পবিত্রতা, সতর ঢাকা, কেবলামুখী হওয়া ইত্যাদি শর্ত অনুরূপভাবে ঐগুলো সিজদায়ে তেলাওয়াতের মধ্যেও শর্ত।

সিজদায়ে তেলাওয়াত নামাজের অংশ বিশেষ বিধায় তা উক্ত তিন সময়ে নামাজের ন্যায় নিষিদ্ধ হবে। এ মর্মে নবী করীম ﷺ বলেছেন, - ثَلَاثَةُ اَوْقَاتٍ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُصَلِّىَ فِيْهَا এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে-সিজদায়ে তেলাওয়াত নামাজের অংশ বিশেষ। তবে অট্ট হাসির দ্বারা যেমন অজু এবং নামাজ বাতিল হয় অনুরূপভাবে অট্টহাসি দ্বারা সিজদায়ে তেলাওয়াতও বাতিল হওয়া চাই। অথচ সিজদায়ে তেলাওয়াত অট্টহাসি দ্বারা বাতিল হয় না। উত্তর- যে নামাজে অট্ট হাসিকে অজু ভঙ্গের কারণ ধরা হয়েছে, তার দ্বারা তাহরীমা, রুকু এবং সিজদা বিশিষ্ট নামাজকে বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে

সিজদায়ে তেলাওয়াত এমন নয়, বিধায় অট্টহাসি দ্বারা তা ভাঙ্গে না। উক্ত তিন সময়ে নামাজ পড়তে এ জন্য নিষেধ করা হয়েছে যেন সূর্য উপাসনাকারীদের সঙ্গে সাদৃশ্য না হয়ে যায়।

শাইখ আবুল হাসান কদূরী (র.) বলেছেন, তিন সময়ে সবধরনের নামাজ পড়া নিষেধ। তবে ঐ দিনের আসরের নামাজ উক্ত হুকুম থেকে ব্যতিক্রম, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি আসরের নামাজ পড়েনি। সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় ঐ দিনের আসরের নামাজ পড়ে নেবে। তবে অন্য কোনো নামাজ বা অন্য দিনের আসরের নামাজ ঐ সময় পড়া জায়েজ নেই। দলিলের পূর্বে কতিপয় জিনিস আত্মস্থ করতে হবে।

(১) সময় নামাজ ওয়াজিব হওয়ার কারণ। (২) সবব (سبب) বা কারণ মুসাব্বাব (مسبب) হতে পূর্বে হয়। (৩) সবব যেমন হবে মুসাব্বাবও তেমন হবে। অর্থাৎ সবব যদি কামিল (كامل) হয়, তাহলে মুসাব্বাবও কামিল ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে সবব যদি নাকিস (ناقص) বা অসম্পূর্ণ হয় তাহলে মুসাব্বাবও নাকিস ওয়াজিব হবে। (৪) নামাজ যদি কামিলভাবে ওয়াজিব হয়, তাহলেতো কামিলভাবে আদায় করা জরুরি। পক্ষান্তরে যদি নামাজ নাকিসভাবে ওয়াজিব হয় তাহলে নাকিসভাবে আদায় করার দ্বারা তা আদায় হয়ে যাবে। দলিলের সারকথা হলো যে, যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের সময় আসরের নামাজ আদায় করে তার সবব (سبب) -এর মধ্যে তিনটি সম্ভাবনা আছে-এক পূর্ণ সময়কে সবব (سبب) ধরা হবে। দুই ওয়াক্তের অতিবাহিত অংশ সবব। তিন-নামাজ আদায় করার অংশটি সবব (سبب) হবে। প্রথম সম্ভাবনা দু'টি বাতিল, কেননা যদি পূর্ণ সময়কে সবব (سبب) ধরা হয় তাহলে সময় শেষ হওয়ার পর নামাজ আদায় করা ওয়াজিব হওয়া চাই। কেননা মুসাব্বাব (مسبب) টি সবব (سبب)-এর পরে হয়। অথচ নামাজ সময়ের মধ্যে ওয়াজিব হয়। সময়ের পরে হয় না। অতএব বুঝা গেল যে, পূর্ণ সময় নামাজ ওয়াজিবের সবব (سبب) নয়। দ্বিতীয় সম্ভাবনা এ জন্য বাতিল যে, যদি ওয়াক্তের অতিবাহিত অংশকে সবব ধরা হয়, তাহলে যে ব্যক্তি ওয়াক্তের শেষ মুহূর্তে নামাজ পড়বে সে ব্যক্তিকে কাজা নামাজ আদায়কারী হিসাবে জ্ঞান করা উচিত। অথচ তাকে কাজা নামাজ আদায়কারী হিসাবে জ্ঞান করা হয় না। অতএব বুঝা গেল যে, ওয়াক্তের যে অংশে নামাজ আদায় করেছে তাই নামাজ ওয়াজিব হওয়ার সবব। উক্ত মাসআলায় যে অংশে নামাজ আদায় করেছে তা নাকিস সময়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সময় যদি নাকিস হয় তাহলে নামাজ নাকিস হিসাবে ওয়াজিব হবে, যেমন ওয়াজিব হয়েছে এমনই আদায় করেছে। এ ভিত্তিতে আমরা বলেছি যে, ঐ দিনের আসরের নামাজ সূর্যাস্তের সময় পড়া জায়েজ আছে। পক্ষান্তরে ঐ দিনের আসর ব্যতীত অন্যান্য নামাজ সূর্যাস্তের সময় আদায় করার দ্বারা আদায় হবে না। কেননা ঐ নামাজগুলো পূর্ণভাবে ওয়াজিব হয়েছে, বিধায় নাকিস সময়ে আদায় হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, জানাযার নামাজ এবং সিজদায়ে তেলাওয়াত যে নিষেধ করা হয়েছে, তার দ্বারা মকরূহ হওয়া বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ এ দু'টি আমল উক্ত সময়ে মাকরূহ (مكروه)। এমনকি যদি মাকরূহ সময়ে জানাযা আসে এবং মাকরূহ সময়ে জানাযার নামাজ আদায় করে অথবা মাকরূহ সময়ে সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে এবং মাকরূহ সময়ে তা আদায় করে, তাহলে জায়েজ হবে। তার দলিল হলো– জানাযার নামাজ ওয়াজিব হওয়ার সবব (سبب) হলো জানাযার উপস্থিতি এবং সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার সবব (سبب) হলো সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করা। যেহেতু এ দু'টি সবব (سبب) নাকিস সময় অর্থাৎ মাকরূহ সময়ে পাওয়া গিয়েছে, এ কারণে জানাযার নামাজ এবং সিজদায়ে তেলাওয়াত নাকিসভাবে ওয়াজিব হয়েছে, অতএব এ দু'টি সেভাবে ওয়াজিব হয়েছে ঐ ভাবে আদায় হয়েছে, বিধায় দু'টির আদায় জায়েজ হয়েছে, পক্ষান্তরে ফরজসমূহ উক্ত তিন সময়ে জায়েজ হবে না।

وَيُكْرَهُ اَنْ يَّتَنَفَّلَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ لِمَا رُوِىَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ وَلَابَأْسَ بِاَنْ يُّصَلِّىَ فِىْ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ الْفَوَائِتَ وَيَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ وَيُصَلِّىَ عَلَى الْجَنَازَةِ لِاَنَّ الْكَرَاهَةَ كَانَتْ لِحَقِّ الْفَرْضِ لِيَصِيْرَ الْوَقْتُ كَالْمَشْغُوْلِ بِهٖ لَالِمَعْنًى فِى الْوَقْتِ فَلَمْ تَظْهَرْ فِىْ حَقِّ الْفَرَائِضِ وَفِيْمَا وَجَبَ لِعَيْنِهٖ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَظَهَرَ فِىْ حَقِّ الْمَنْذُوْرِ لِاَنَّهٗ تَعَلَّقَ وُجُوْبُهٗ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهٖ وَ فِىْ حَقِّ رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ وَفِى الَّذِىْ شَرَعَ فِيْهِ ثُمَّ اَفْسَدَهٗ لِاَنَّ الْوُجُوْبَ لِغَيْرِهٖ وَهُوَ خَتْمُ الطَّوَافِ وَصِيَانَةُ الْمُؤَدّٰى عَنِ الْبُطْلَانِ وَيُكْرَهُ اَنْ يَّتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ بِاَكْثَرِ مِنْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا مَعَ حِرْصِهٖ عَلَى الصَّلٰوةِ وَلَا يَتَنَفَّلُ بَعْدَ الْغُرُوْبِ قَبْلَ الْفَرْضِ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَاخِيْرِ الْمَغْرِبِ وَلَا اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلٰى اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهٖ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْاِشْتِغَالِ عَنْ اِسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ .

অনুবাদ ঃ ফজরের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত নফল পড়া এবং আসরের পরে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত নফল পড়া মাকরূহ। কেননা বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ তা নিষেধ করেছেন। তবে এ দু সময়ে কাজা নামাজ এবং তেলাওয়াতে সিজদা আদায় করতে পারে এবং জানাযার নামাজ আদায় করতে পারে। কেননা এ মাকরূহ হওয়াটা ছিল ফরজের মর্যাদার ভিত্তিতে। যেন সম্পূর্ণ সময়টা সালাতে মাশগুল তুল্য হয়ে যায়। এ (মাকরূহ হওয়াটা) সময়ের নিজস্ব কোনো প্রকৃতির কারণে নয়। সুতরাং ফরজসমূহের ক্ষেত্রে এবং যে সব ইবাদত স্বকীয়ভাবে ওয়াজিব হয়, যেমন তেলাওয়াতের সিজদা, সেগুলোর ক্ষেত্রে সময়ের মাকরূহ হওয়ার হুকুম প্রকাশ পাবে না। সিজদায়ে তেলাওয়াতে ওয়াজিব হওয়াটা বান্দার কর্মের উপর নির্ভরশীল নয়। নামাজ (মানতকৃত নামাজ)-এর ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পাবে। কেননা উক্ত ইবাদতে আবশ্যকতা তার নিজের পক্ষ থেকে সৃষ্ট কারণের সাথে সম্পৃক্ত এবং তওয়াফের রাকআতদ্বয়ের ক্ষেত্রেও মাকরূহ হওয়া প্রকাশ পাবে এবং ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও মাকরূহ হওয়া প্রকাশ পাবে যে নফল নামাজ আরম্ভ করে ভেঙ্গে দেয়। কেননা উক্ত নামাজ ওয়াজিব হওয়া তার নিজস্ব কারণে নয়, অন্য কারণে। আর তাহলো তওয়াফ খতম করা এবং শুরু করা নামাজকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা। ফজর উদয়ের পর ফজরের দু রাকআতের অধিক, নফল আদায় করা মাকরূহ। কেননা নামাজের প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও উক্ত দু রাকআতের অতিরিক্ত নামাজ নবী করীম ﷺ আদায় করেন নি। সূর্যাস্তের পর, ফরজের পূর্বে কোনো নফল আদায় করবে না। কেননা তাতে মাগ্‌রিবকে বিলম্ব করা হয়। তদ্রূপ জুমার দিন ইমাম যখন খুৎবার জন্য (হুজরা থেকে) বের হবেন তখন থেকে খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নফল আদায় করবে না। কেননা তাতে খুৎবা শ্রবণ করা থেকে অন্য-মনস্ক হওয়া লাযিম আসে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, ফজরের পর থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নফল নামাজ আদায় করা মাকরূহ। দলিল হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস—

شَهِدَ عِنْدِيْ رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ وَاَرْضَاهُمْ عِنْدِيْ عُمَرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تُشْرِقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমার সন্তোষভাজন হক প্রসঙ্গ ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন, তন্মধ্যে হযরত ওমর সর্বাধিক সন্তোষভাজন ব্যক্তি। (তিনি বলেন, আমাকে) রাসূল ﷺ ফজরের পরে সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত নামাজ পড়তে এবং আসরের পর সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন।— (বুখারী ও মুসলিম শরীফ) হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি উক্ত হাদীসের বিপরীত,

رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

অর্থ ঃ দু' রাকআত নামাজ রাসূল ﷺ গোপন ও প্রকাশ্য কোনো অবস্থায়ই ছাড়েননি। ফজরের নামাজের পূর্বে দু' রাকআত এবং আসরের নামাজের পরে দু' রাকআত। অন্য একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِيْنِيْ فِيْ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلَّا صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ রাসূল ﷺ আমার নিকট আসরের পর আসলেই দু' রাকআত নামাজ পড়তেন। উক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূল ﷺ আসরের পর দু রাকআত নামাজ প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পড়েছেন। তার জবাব হলো, আসরের পর দু রাকআত নামাজ পড়া রাসূল ﷺ-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। অতএব উহা রাসূল ﷺ-এর উম্মতের জন্য জায়েজ হবে না। তার দলিল হলো যে, একদা জোহরের পর আবদুল কায়সের কতিপয় লোক রাসূল ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলেন, রাসূল ﷺ তাঁদের সঙ্গে দীনি আলাপ আলোচনায় মগ্ন হয়ে যাওয়ায় জোহরের পরের দু' রাকাআত সুন্নত পড়তে পারেননি, বিধায় উক্ত ক্ষতিপূরণ করার নিমিত্তে আসরের পর দু' রাকআত নামাজ পড়লেন। রাসূল ﷺ-এর অভ্যাস ছিল যে, যখন কোনো আমল আরম্ভ করতেন, তা সর্বদা আমল করে যেতেন। এ জন্য রাসূল ﷺ আসরের পরে সর্বদা দু' রাকআত নামাজ পড়তেন এবং অন্যদেরকে তা পড়তে নিষেধ করতেন। আল্লামা ইবনে হুমাম বুখারী এবং মুসলিম শরীফের বরাত দিয়ে পূর্ণ ঘটনা এভাবে লেখেছেন—

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَزْهَرَ وَمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَرْسَلُوْهُ اِلٰى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا اِقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ بَلَغَنَا اَنَّكِ تُصَلِّيْهِمَا وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُمَا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا فَاَخْبَرْتُهَا فَقَالَتْ سَلْ اُمَّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا فَرَجَعْتُ اِلَيْهِمْ فَاَخْبَرْتُهُمْ فَرَدُّوْنِيْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُمَا ثُمَّ رَاَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا فَقِيْلَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّهُ اَتَانِيْ نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالرُّسُلِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُوْنِيْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَهُمَا هَاتَانِ .

অর্থ– কুরাইব (রা.) (ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আজাদকৃত গোলাম)-এর সূত্রে বার্ণিত রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আবদুর রহমান ইবনে আযহার এবং মিস্ওয়ার ইবনে মাখরামা (র.) আমাকে (কুরাইব (রা.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) -এর খেদমতে পাঠালেন এবং বললেন আমাদের সকলের পক্ষ থেকে হযরত আয়েশা (রা.)-এর খেদমতে সালাম পেশ করো এবং আসরের পরে দু' রাকআত নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো। আমাদের নিকট সংবাদ আসছে যে, আপনি ঐ দু রাকআত নামাজ পড়েন, অথচ রাসূল ﷺ উহা হতে নিষেধ করেছেন। হযরত কুরাইব (রা.) বলেন, -এর

পর আমি হযরত আয়েশা (রা.)-এর খেদমতে গিয়ে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন যে, হযরত উম্মে সালমা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করো। তাকে বলবে তখন আমি তাঁদের নিকট গিয়ে সংবাদ দিলাম। অতঃপর তারা আমাকে উম্মে সালমা (রা.)-এর নিকটে পাঠালেন। উম্মে সালমা (রা.) বললেন, আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি যে, তিনি আসরের পর নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন, অতঃপর আমি দেখেছি যে, তিনি ঐ দু রাকআত নামাজ পড়েছেন। তখন এতদ্ সম্পর্কে তাকে (রাসূলকে) জিজ্ঞাসা করা হলো। রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন যে, আমার নিকট আবদুল কায়েসের কতিপয় লোক স্বীয় গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে আসলেন। জোহরের পর দু রাকআত সুন্নত নামাজ ব্যস্ততার কারণে পড়া সম্ভব হয়নি। এটা সেই দু' রাকআত নামাজ।— (বুখারী শারীফ; মাগাযী অধ্যায়)

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, ঐ দু সময়ে অর্থাৎ ফজরের পরে এবং আসরের পরে কাজা নামাজ, সিজদায়ে তেলাওয়াত এবং জানাযার নামাজ পড়তে কোনো অসুবিধা নেই, দলিল হলো যে, ফজর এবং আসরের পর নামাজ মাকরূহ হওয়াটা ফজর এবং আসরের নামাজের কারণে ছিল। যাতে ব্যক্তি পূর্ণ ওয়াক্ত ঐ ওয়াক্তের ফরজের মধ্যে রত থাকে।

মাকরূহ হওয়াটা ফরজের মর্যাদার ভিত্তিতে ছিল, বিধায় প্রকৃত ফরজের ক্ষেত্রে মাকরূহ হবে না। কেননা প্রকৃত ফরজ নামাজের মধ্যে সময়কে মাশগুল রাখা উত্তম ফরজের মর্যাদার সাথে মাশগুল রাখার তুলনায়। অতএব ফরজ এবং এর সম পর্যায়ের জিনিসের ক্ষেত্রে মাকরূহ হওয়াটা প্রকাশ পাবে না, যেমন সিজদায়ে তেলাওয়াত। কেননা তা প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি ওয়াজিব। কেননা সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হওয়াটা বান্দার কর্মের ওপর নির্ভরশীল নয়। তার দলিল হচ্ছে– সিজদায়ে তেলাওয়াত যেভাবে সিজদার আয়াত পাঠ করার দ্বারা ওয়াজিব হয়, অনুরূপভাবে সিজদার আয়াত শ্রবণ করার দ্বারাও ওয়াজিব হয়। যদিও শ্রবণের ইচ্ছা না করে। অতএব সিজদায়ে তিলাওয়াত সরাসরি ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ফরজের সমতুল্য হলো।

এরূপ অবস্থা জানাযার নামাজেরও। কেননা জানাযার নামাজের ওয়াজিব হওয়াটা বান্দার কর্মের ওপর নির্ভরশীল নয়। অবশ্য ফজর এবং আসরের পর মানতের নামাজ মাকরূহ হবে। কেননা মানতের নামাজ সরাসরি (প্রত্যক্ষ) ভাবে ওয়াজিব হয় না; বরং মানতকারী ব্যক্তির মানত করার কারণে ওয়াজিব হয়। অনুরূপভাবে তওয়াফের দু' রাকআতের মধ্যেও কারাহাত (كراهت) আসবে। যেমন ফজর এবং আসরের পরে এর নিয়ত করাও মাকরূহ। কেননা ঐ দু রাকআত নামাজ তওয়াফের কারণে ওয়াজিব হয়। তওয়াফ করা তার নিজস্ব কর্ম। অতএব তওয়াফের দু রাকআত নামাজ প্রত্যক্ষভাবে ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে ঐ নামাজের ক্ষেত্রেও মাকরূহ হবে, যা শুরু করার পর ফাসিদ (فاسد) বা নষ্ট করে দেয় যেমন নফল নামাজ আরম্ভ করার পর নষ্ট করে দিল, অতঃপর যদি ফজর এবং আসরের পর তা কাযা করতে চায় তাহলে মাকরূহ হবে। কেননা ইহা সরাসরি ওয়াজিব নয়। বরং শুরু করে নষ্ট করা নামাজকে রক্ষা করার জন্য ওয়াজিব হয়েছে।

وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ الخ : দ্বিতীয় মাসআলা হচ্ছে যে, সূর্যাস্তের পর ফরজ আদায় করার পূর্বে নফল পড়া মাকরূহ। কেননা এর দ্বারা মাগরিব বিলম্ব হয়। অথচ মাগরিবের নামাজ তাড়া তাড়ি পড়া মোস্তাহাব। ইমাম খুৎবার জন্য যখন বের হন তখন থেকে নিয়ে খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নফল পড়া মাকরূহ। দলিল হচ্ছে– এর দ্বারা খুৎবা শ্রবণের থেকে বিমুখ থাকা লাযিম আসে। অথচ খুৎবা শ্রবণ করা ওয়াজিব।

بَابُ الْاَذَانِ

اَلْاَذَانُ سُنَّةٌ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ الْجُمْعَةِ لَا سِوَاهَا لِلنَّفْلِ الْمُتَوَاتِرِ وَصِفَةُ الْاَذَانِ مَعْرُوْفَةٌ وَهُوَ كَمَا اَذَّنَ الْمَلَكُ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ ـ

পরিচ্ছেদ ঃ আযানের বর্ণনা

অনুবাদ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জুমার জন্য আযান দেওয়া সুন্নত; অন্যকোনো সালাতের জন্য নয়। এ বিধান মুতাওয়াতির (অর্থাৎ প্রচুর সংখ্যক ধারাবাহিক ও নিশ্চিত সূত্রে প্রাপ্ত) হাদীসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আযানের বিবরণ সুপরিচিত। (আর তা হলো, আসমান থেকে অবতরণকারী ফেরেশতার দেওয়া আযান।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আযান যেহেতু নামাজের সময় হওয়ার ঘোষণা, এ জন্য প্রথমে নামাজের সময়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর আযানের আলোচনা করা হয়েছে। আযানের আভিধানিক অর্থ– জানানো এবং ঘোষণা দেওয়া। অতঃপর উহাকে নামাজের ঘোষণার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যখনই আযানের শব্দ শুনা যায়, তখন এর দ্বারা নামাজের ঘোষণাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে আযান শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ ـ (سورة الحج ٢٧)

(তওবা; ৩) وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا আয়াতদ্বয়ে اذان এবং اذن শব্দদ্বয় ঘোষণার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শরিয়তের পরিভাষায় আযান বলা হয়, নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নামাজের সময় দাখিল হওয়ার সংবাদ দেওয়া। আযান শব্দের সুবূত (ثبوت) আয়াত এবং হাদীসে বিদ্যমান। তবে আযানের পূর্ণ শব্দ হাদীসে বিদ্যমান আছে। আয়াত যেমন– وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ

অর্থ ঃ যখন তোমরা নামাজের জন্য ঘোষণা করো তখন তারা একে ঠাট্টা এবং ক্রিড়া কৌতুকের বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে এটা এ কারণে যে, তারা বুঝে না। এ আয়াতে নামাজের দিকে ডাকা এর দ্বারা আযানই উদ্দেশ্য। কেননা এর শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) লিখেছেন যে, মদীনায় এক খ্রিস্টান ছিল, যখন আযানের মধ্যে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ [আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল] উচ্চারণ করা হতো তখন সে বলত قَدْ حَرَقَ الْكَاذِبُ (মিথ্যুক জ্বলে যাক)। এক রাত্রে এ রকম ঘটনা ঘটে গেছে যে, সে এবং তার পরিবারের সব লোক ঘুমিয়ে ছিল জনৈক খাদেম আগুন নিয়ে আসল, একটি স্ফুলিঙ্গ পড়ে গেল, তখন সে, তার ঘর এবং ঘরের সব মানুষ পুড়ে গেল।

আয়াতের শানে নুযূলের আরো একটি কাহিনী আছে-যখন আযান হতো তখন মুসলমান নামাজ আরম্ভ করে দিতো, তখন ইহুদিরা বলতো قَامُوْا لَاقَامُوْا وَصَلُّوْا لَاصَلُّوْا অর্থ– মুসলমানগণ (নামাজে) দাঁড়ালে, আল্লাহ যেন তাদেরকে দাঁড়ানোর তৌফিক না দেন এবং তারা নামাজ শুরু করলে, আল্লাহ যেন তাদের নামাজ পড়ার তৌফিক না দেন। উক্ত ঘটনাদ্বয় দ্বারা বুঝা গেল যে, নামাজের দিকে আহবান করার দ্বারা আযানকে বুঝানো হয়েছে।

অন্য আয়াত, وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

আল্লামা বগবী (র.) বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, এ আয়াত মুয়াজ্জিনদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, হযরত ইকরিমা (রা.) বলেছেন, مَنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ -এর দ্বারা মুয়াজ্জিন উদ্দেশ্য। আবূ উমামা বাহেলী (র.) বলেছেন, এ আয়াত-এর

মধ্যে আমলে সালেহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– আযান এবং ইকামতের মধ্যে দুরাক'আত নামাজ পড়া। মোট কথা উক্ত মতামতগুলো দ্বারা এ কথা সাবিত হয় যে, আয়াতের মধ্যে دَعَا إِلَى اللّٰهِ দ্বারা আযান উদ্দেশ্য। অতএব এ আয়াতের দ্বারা আযান সাবিত হবে।

তৃতীয় আয়াত– يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! যখন জুমার দিন নামাজের জন্য আহবান করা হয়, তখন আল্লাহর স্মরণের (নামাজে জুমা ও খুতবা) প্রতি দ্রুত ধাবিত হও এবং বেচাকেনা (এবং যা চলার পথে প্রতিবন্ধক হয়) ছেড়ে দাও। যেসব হাদীস দ্বারা আযান সাবিত হয় এবং আযানের শব্দ নির্দিষ্ট হয়, তা বিভিন্ন সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে। যার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো।

আযানের হুকুম কখন এসেছে? মোল্লা আলী কারী (র.) এ সম্পর্কে শরহে নিকায়া গ্রন্থে দু'টি মত উল্লেখ করেছেন। প্রথম মত হলো যে, প্রথম হিজরিতে আযানের হুকুম এসেছে। দ্বিতীয় মত হলো যে, আযানের বিধান দ্বিতীয় হিজরিতে এসেছে। দ্বিতীয় মতের দলিল হলো, ইবনে সা'দ (র.), নাফি' ইবনে জুবাইর, ওরওয়া ইবনে যুবাইর এবং সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

إِنَّهُمْ قَالُوْا كَانَ النَّاسُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ اَنْ يُؤْمَرُوْا بِالْاَذَانِ يُنَادِيْ مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةً فَتَجْتَمِعُ النَّاسُ فَلَمَّا صُرِفَتِ الْقِبْلَةُ اُمِرَ بِالْاَذَانِ ـ

উক্ত তিন সাহাবী (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ -এর যুগে আযানের বিধান আসার পূর্বে এরূপ নিয়ম ছিল যে, রাসূল ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةً বলে ঘোষণা দিতেন, ফলে এ আহবান শ্রবণ করে লোকেরা একত্রিত হতো। কিন্তু যখন কেবলা পরিবর্তন হলো তখন আযান দেওয়ার বিধান আসল। এ কথায় সকলে একমত যে, আযানের বিধান দ্বিতীয় হিজরিতে দেওয়া হয়েছে। অতএব বুঝা গেল যে, আযানের বিধান দ্বিতীয় হিজরিতে দেওয়া হয়েছে। প্রখ্যাত ফকীহ মাওলানা আবদুল হাই (র.) আস্সিআয়াহ (السعاية) নামক গ্রন্থে ইবনে হাজার আসকালী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, কোনো কোনো হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, আযানের বিধান পবিত্র মাক্কায় হিজরতের পূর্বে দেওয়া হয়েছে। যেমন "তবরানী" নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, إِنَّهُ لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ اَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ الْاَذَانَ فَنَزَلَ بِهِ فَعَلَّمَهُ بِلَالًا ـ অর্থ ঃ মিরাজের রাত্রে মাহান আল্লাহ রাসূল ﷺ -এর প্রতি আযান সম্পর্কে ওহী নাজিল করেছেন, অতঃপর রাসূল ﷺ আযানের শব্দসমূহ হযরত বিলাল (রা.)-কে শিক্ষা দেন। "দারা কুত্‌নী' নামক গ্রন্থে হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, اِنَّ جِبْرِيْلَ اَمَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِالْاَذَانِ حِيْنَ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ ـ অর্থ– যখন নামাজ ফরজ হলো, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল ﷺ -কে আযানের হুকুম দিলেন। উক্ত রেওয়ায়েতদ্বয় দ্বারা বুঝা গেল যে, হিজরতের পূর্বে পবিত্র মক্কায় আযানের বিধান দেওয়া হয়েছে। তবে ইবনে হাজার আসকালানী (র.) উক্ত হাদীসগুলো সহীহ না হওয়ার দাবি করেছেন। মাওলানা আবদুশ শাকূর লক্ষ্মৌবী (র.) "ইলমুল ফিকহ" নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, এর পূর্বে নামাজ আযানবিহীন পড়া হতো, ঐ সময় পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না। এ জন্য ঘোষণা ছাড়াই জামাতের জন্য সমবেত হওয়াটা তেমন কঠিন ছিল না। যখন মুসলমানদের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি হতে লাগল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোক দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগল, তখন প্রয়োজন দেখা দিল যে, নামাজের সময় এবং জামাত কায়েম করার ব্যাপারে অবগতি প্রদান করা। যাতে তারা নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী বাড়ি হতে জামাতের জন্য মসজিদে একত্রি হতে পারে। আযানের এই নিয়ম ঐ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আযান এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য, পূর্বের উম্মতের মধ্যে এর বিধান ছিল না।

আযানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ যখন সাহাবীদের নামাজ এবং জামাতের সময় জানানোর প্রয়োজন হলো, তখন তারা পরস্পর পরামর্শ করলেন। কেউ কেউ প্রস্তাব দিলেন যে, ইহুদিদের ন্যায় ঘণ্টা বাজানো হক। কেউ কেউ প্রস্তাব দিলেন যে, আগুন জ্বালানো হোক। কিন্তু রাসূল ﷺ তা পছন্দ করলেন না। হযরত ওমর (রা.) প্রস্তাব দিলেন যে, নামাজের সময়ে اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةً বলা হোক। এরপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) স্বপ্নে দেখলেন যে, এক ফেরেশতা আযানের নিয়ম তাঁদেরকে শিক্ষা দিলেন। ঐ নিয়মে নামাজের সময় এবং জামাতের অবগতি প্রদান করা হবে।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) বলতেন যদি আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করার আশংকা না হতো তাহলে আমি বলতাম যে, স্বপ্ন দেখার সময় আমি সম্পূর্ণ ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম না। এ কারণে কোনো আলিম এ ঘটনাকে হাল এবং কাশফের অবস্থা হিসাবে জ্ঞান করেছেন– যা বাতেন পন্থী বুজুর্গ লোকদের জাগ্রত অবস্থায় হয়ে থাকে। মোটকথা সকালে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) এ ঘটনা রাসূল ﷺ-এর খেদমতে পেশ করলেন, তখন রাসূল ﷺ বললেন যে, এ ঘটনা সত্য হযরত বিলাল (রা.)-কে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, এ ভাবে আযান প্রদান করো। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) এসে স্বীয় স্বপ্ন বর্ণনা করলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, এ ঘটনার পূর্বে আযান সম্পর্কে রাসূল (স.)-এর নিকট ওহী এসেছে। আবদুর রায্যাক (র.) মুসান্নাফে এবং আবূ দাউদ (র.) মারাসীলে এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মিরাজের রাতে রাসূল ﷺ-কে জিব্রাঈল (আ.) আযান শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এ হাদীস সহীহ নয়। যদি সহীহ ধরে নেওয়া হয়, তাহলে মক্কায় জাগ্রতাবস্থায় সংঘটিত মিরাজের রাত্র উদ্দেশ্য নয়। কেননা আধ্যাত্মিকভাবে রাসূলের কয়েকবার মিরাজ হয়েছে। এ জন্য এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ রাত্র, যে রাত্রে রাসূল ﷺ-কে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে।

আযানের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব ঃ আযান আল্লাহর জিকিরের মধ্য হতে সর্বাধিক বড় জিকির, এতে তাওহীদ রিসালাতের সাক্ষ্যের সুস্পষ্ট ঘোষণা আছে। এর দ্বারা ইসলামের প্রভাব এবং শক্তি প্রকাশ পায়। অনেক হাদীসে আযানের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।

১. আযানের ধ্বনি যে পর্যন্ত পৌঁছে এবং যারা তা শ্রবণ করে জিন হোক বা মানুষ হোক, তারা কিয়ামতের দিন আযান প্রদান কারীর ঈমানের সাক্ষ্য দেবে। —(বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

২. রাসূল ﷺ বলেছেন, নবী এবং শহীদগণের পর আযানদাতা জান্নাতে দাখিল হবে। কোনো কোনো হাদীসে আছে যে, মুয়াজ্জিনের মর্যাদা শহীদের সমান হবে।

৩. আবদুল্লাহ (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সাত বছর ধারাবাহিকভাবে আযান দেবে এবং তার উদ্দেশ্য হবে ছওয়াব অর্জনের, তাহলে তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ লিখে দেওয়া হবে।—(আবূ দাউদ, তিরমিযী)

৪. রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি লোকেরা জানতো যে, আযানে কত বেশি পুণ্য। তাহলে লটারী দিয়ে হলেও তারা আযান দেওয়ার এ সুযোগ লাভ করার চেষ্টা করত।—(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।)

সাহাবীদের যুগে এ রকম হয়েছে যে, আযানের সুযোগ গ্রহণের নিমিত্তে মানুষের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির কাম্য ছিল যে, এ বরকতময় পদ যেন আমি পাই। এমনকি এর জন্য লটারী দেওয়া হয়েছে।—(তারীখে বুখারী)

৫. রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক মিশকের টিলার ওপর থাকবে, তাঁদের হিসাব দিতে হবে না এবং তাঁরা অস্থিরও হবে না। **এক.** যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন পড়েছে। **দ্বিতীয়.** যে ব্যক্তি কৃতদাস থাকা সত্ত্বেও পরকাল থেকে গাফেল হয়নি। **তৃতীয়** মুয়াজ্জিন।—(আল মুরশিদুল আমীন)

৬. কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনদেরকে সুপারিশ করার অধিকার দেওয়া হবে। সে স্বীয় আত্মীয়, বন্ধু এবং তার মনোনীত ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করতে পারবে।

৭. আযান দেওয়ার সময় শয়তানের উপর ভয়ভীতি সঞ্চারিত হয়। সে বেদিশা হয়ে পালাতে থাকে এবং যে পর্যন্ত আযানের ধ্বনি পৌঁছে সে পর্যন্ত সে স্থির থাকতে পারে না।—(বুখারী ও মুসলিম)

৮. কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনের ঘাড় উঁচু হবে অর্থাৎ তারা সম্মানিত এবং মানুষের মধ্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবেন, কিয়ামতের ভয় এবং বিপদ থেকে সংরক্ষিত থাকবেন।

৯. যে স্থানে আযান দেওয়া হয় সেখানে আল্লাহর রহমত নাজিল হয়। আজাব-গজব হতে সে স্থান সংরক্ষিত থাকে।

১০. রাসূল ﷺ মুয়াজ্জিনদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছেন।

اَلْأَذَانُ سُنَّةٌ لِلصَّلَوَاتِ الخ ঃ আযান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জুমার নামাজের জন্য সুন্নতে মুয়াক্কাদা। কোনো কোনো শায়খের মতে ওয়াজিব। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে, যদি শহরবাসী সকলে আযান বর্জন করার ওপর ঐকমত্য হয়, তাহলে তাদের সাথে জিহাদ করা হবে। প্রকাশ থাকে যে, জিহাদ ওয়াজিব বর্জনের কারণে হয়; সুন্নত বর্জনের

কারণে নয়। অতএব বুঝা গেল যে, আযান ওয়াজিব। এর জবাবঃ আযান মূলত সুন্নতই। তবে আযান বর্জনের ওপর ঐকমত্যের কারণে দীনের অবমাননা হয়। আর দীন অবমাননার অবস্থায় জিহাদ ওয়াজিব হয়। এ জন্য ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাদের সাথে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন। আযান সুন্নত এর পক্ষে নকলে মুতাওয়াতির (متواتر) দলিল। রাসূল ﷺ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জুমার জন্য আযান দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তবে বিতর, দুই ঈদ, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, ইস্তেস্কা, জানাযা, সুন্নত এবং নফল নামাজের জন্য আযান দেওয়ার ব্যবস্থা করেননি।

জাবির ইবনে সামুরা (রা.) সূত্রে মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে –

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعِيْدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلاَاِقَامَةٍ ـ

অর্থাৎ আমি রাসূল ﷺ-এর পিছনে একাধিকবার ঈদের নামাজ আযান এবং ইকামত ছাড়াই পড়েছি।

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত

خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِيْ بِالصَّلَاةُ جَامِعَةً ـ

অর্থ ঃ রাসূল ﷺ -এর যুগে সূর্য গ্রহণ লাগত, তখন রাসূল ﷺ একজন ঘোষণাকারীকে পাঠাতেন, তিনি اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةً বলে ঘোষণা দিতেন। উক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, দুই ঈদ, সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণের নামাজের জন্য আযানের বিধান নেই।

বিত্‌র যদিও ওয়াজিব; কিন্তু ইশার নামাজের আযানই তার জন্য যথেষ্ট। কেননা ইশার ওয়াক্তেই বিতরের ওয়াক্ত। আর ইশার সুন্নত ও নফল, ইশার ফরজের তাবে (تابع)। অতএব ওগুলোর জন্য স্বতন্ত্র আযানের প্রয়োজন নেই। জুমার আযান সুন্নতের পক্ষে বুখারী ও মুসলিম শরীফে সায়িব ইবনে ইয়াযীদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস দলিল।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, আযান দেওয়ার বিবরণ সু-পরিচিত। তা এভাবে যে আকাশ থেকে আগত ফেরেশ্‌তা আযান দিয়েছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ (রা.) -এর হাদীসে গিয়েছে। ঐ হাদীসের শব্দসমূহ নিম্নরূপ–

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ (يَعْنِىْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ) اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ رَاَيْتُ فِى النَّوْمِ كَاَنَّ رَجُلًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ عَلَيْهِ بُرْدَانِ اَخْضَرَانِ اَنْزَلَ عَلٰى جِزْمِ حَائِطٍ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَاَذَّنَ مَثْنٰى مَثْنٰى ثُمَّ جَلَسَ ـ قَالَ اَبُوْبَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَلٰى نَحْوِ مِنْ اَذَانِنَا الْيَوْمَ قَالَ عَلِّمْهَا بِلَالًا فَقَالَ عُمَرُ وَ رَاَيْتُ مِثْلَ الَّذِىْ رَاٰى وَلٰكِنَّهُ سَبَقَنِىْ ـ

বদর উদ্দীন আইনী (র.)-এর মতে উক্ত ফেরেশতা হলেন হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) তবে অন্যান্যদের মতে অন্য কোনো ফেরেশ্‌তা।

وَلَا تَرْجِيْعَ فِيْهِ وَهُوَ اَنْ يُّرَجِّعَ فَيَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَمَا خَفَضَ بِهِمَا وَقَالَ الشَّافِعِى (رحـ) فِيْهِ ذٰلِكَ لِحَدِيْثِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَهُ بِالتَّرْجِيْعِ وَلَنَا اَنَّهُ لَا تَرْجِيْعَ فِى الْمَشَاهِيْرِ وَكَانَ مَارَوَاهُ تَعْلِيْمًا فَظَنَّهُ تَرْجِيْعًا وَيَزِيْدُ فِىْ اَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ لِاَنَّ بِلَالًا (رضـ) قَالَ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ حِيْنَ وَجَدَ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَاقِدًا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا اَحْسَنَ هٰذَا يَا بِلَالُ اِجْعَلْهُ فِىْ اَذَانِكَ وَخُصَّ الْفَجْرَ بِهِ لِاَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ وَالْاِقَامَةُ مِثْلُ الْاَذَانِ اِلَّا اَنَّهُ يَزِيْدُ فِيْهَا بَعْدَ اَلْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ مَرَّتَيْنِ هٰكَذَا فَعَلَ الْمَلَكُ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ ثُمَّ هُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِى (رحـ) فِىْ قَوْلِهِ اِنَّهَا فُرَادٰى فُرَادٰى اِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ـ

অনুবাদ ঃ আযানের মধ্যে তারজী (تَرْجِيْع বা কলেমায়ে শাহাদাতের পুনঃ উচ্চারণ) নেই। তারজী (تَرْجِيْع) অর্থ উভয় কলেমায়ে শাহাদতকে (প্রথমে দু'বার করে) অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে উচ্চারণ করার পর পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে (দু'বার করে) উচ্চারণ করা। ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন, আযানে তারজী (تَرْجِيْع) আছে। আবূ মাহ্যূরা (রা.) -এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের কারণে যে, রাসূল ﷺ তাঁকে তারজী (تَرْجِيْع) -এর নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের দলিল হলো, প্রসিদ্ধ হাদীসগুলোতে তারজী (تَرْجِيْع) নেই। ইমাম শাফে'ঈ (র.) যে হাদীস (দলিল স্বরূপ) বর্ণনা করেছেন, তা ছিল (কলেমায়ে শাহাদত) শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে, সেটাকে তিনি তারজী (ترجيع) ধারণা করেছেন। ফজরের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -এর পরে দু' বার اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বৃদ্ধি করবে। কেননা একবার যখন হযরত বিলাল (রা.) রাসূল ﷺ -কে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েছিলেন, তখন اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বলেছিলেন। তখন রাসূল ﷺ বলে ছিলেন, হে বিলাল! কতনা সুন্দর কথা এটা। একে তোমার আযানের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। এর সাথে ফজরের আযানকে খাস করার কারণ হলো– এটা ঘুম এবং অলসতার সময়। ইকামত আযানের মতো। তবে তাতে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -এর পর দু'বার قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ যোগ করবে। আসমান থেকে অবতীর্ণ ফেরেশতা এমনই করেছিলেন এবং এটাই প্রসিদ্ধ বর্ণনা। এ হাদীস ইমাম শাফেঈ (র.) -এর বিপক্ষে দলিল। কেননা তিনি বলেন যে, ইকামত হচ্ছে-এক এক শব্দ বিশিষ্ট, قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ব্যতীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আযানে তারজীর রূপ এভাবে اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এবং اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ চার বার উচ্চারণ করবে। প্রথম দুবার মৃদুস্বরে অতঃপর দুবার উচ্চৈঃস্বরে। আমাদের মতে আযানে তারজী নেই। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে তারজী (تَرْجِيْع) আছে।

ইমাম শাফেঈ (র.) আবূ মাহযূরা (রা.) -এর হাদীস দ্বারা দলিল প্রদান করেন—

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ. ثُمَّ يَعُوْدُ فَيَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ الْحَدِيْثُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

উক্ত হাদীসে শাহাদাতাইন (شهادتين) চার বার বলা সাবিত আছে। সেই সাথে শুরুতে الله اكبر দু'বার বলাও সাবিত আছে। ইমাম মালিক (র.) শুরুতে আল্লাহু আকবার দু'বার বলার পক্ষে উক্ত হাদীস দ্বারা দলিল দিয়েছেন। তবে ইমাম আবূ দাউদ (র.) এবং ইমাম নাসাঈ (র.) আল্লাহু আকবার চার বার বলার পক্ষে রেওয়ায়েত এনেছেন। ঐগুলো আমাদের দলিল। মুসলিম শরীফে বর্ণিত রেওয়ায়েতের জবাব ঃ আল্লাহু আকবার দু'বার এক শ্বাসে পড়া এক শব্দের ন্যায়। অতএব মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতের মর্ম দাঁড়াবে যে, রাসূল ﷺ আবূ মাহযূরা (রা.)-কে আযান শিক্ষা দিয়েছেন এবং দু' বার আল্লাহু আকবার বলেছেন, অর্থাৎ দু'শ্বাসে চার বার আল্লাহু আক্বার বলেছেন। এ ব্যাখ্যার পর উভয় রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না। আমাদের দলিল হলো যে, আযানের বিবরণে যেসব্ হাদীস প্রসিদ্ধ, সেগুলোতে তারজী (ترجيع) নেই। তন্মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আব্দি রব্বিহি (রা.) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসদ্বয়, যাতে তারজী (ترجيع) নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসের শব্দ নিম্নরূপ–

قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً.

দলিলে আকলী বা যুক্তিভিত্তিক দলিল হলো, আযানের মূল উদ্দেশ্য হলো حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ আর এ দু'কালেমার মধ্যে যেহেতু তারজী (ترجيع) নেই। অতএব এই দু' কলেমা ব্যতীত অন্য কলেমায় অবশ্যই তারজী হবে না। হযরত আবূ মাহ্যূরা (রা.) -এর হাদীসের জবাব হলো, হযরত আবূ মাহ্যূরা (রা.)-কে ঐ কলেমাগুলো বারবার বলানো তালীম বা শিক্ষা দানের জন্য ছিল। কিন্তু আবূ মাহযূরা (রা.) সেটাকে তারজী ধারণা করেছেন। অর্থাৎ আবূ মাহযূরা (রা.) প্রথমে শাহাদাতাইনের (شهادتين) -এর ধ্বনি এ পরিমাণ উচ্চৈঃস্বরে পড়েননি, যে পরিমাণ রাসূল ﷺ -এর কাম্য ছিল, এ জন্য উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ উচ্চারণ করিয়েছেন। কিন্তু হযরত আবূ মাহযূরা (রা.) ধারণা করেছেন যে, সর্বদা আমাকে মৃদুস্বরে বলার পর উচ্চৈঃস্বরে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম তাহাবী (র.) এ ব্যাখ্যা করেছেন। ইনায়া গ্রন্থকার লেখেছেন যে, রাসূল ﷺ আবূ মাহযূরা (রা.)-কে বিশেষ হিকমতের প্রেক্ষিতে তারজির নির্দেশ দিয়েছেন। তা হলো যে, আবূ মাহযূরা (রা.) প্রথমে রাসূল ﷺ-এর প্রতি কঠোর বিদ্বেষ পোষণ করতেন। অতঃপর যখন আবূ মাহযূরা (রা.) মুসলমান হলেন, তখন আল্লাহর নবী ﷺ তাঁকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, আবূ মাহযূরা (রা.) যখন শাহাদাতাইনে পৌছলেন তখন স্বীয় জাতির প্রতি লজ্জা-শরমের কারণে আযানের ধ্বনিকে মৃদু বা নিচু করলেন, তখন রাসূল ﷺ হযরত আবু মাহ্যূরা (রা.)-কে ডাকলেন এবং তার কান মর্দন করলেন এবং বললেন যে, এ কালিমাগুলো পুনঃ উচ্চারণ করো এবং উচ্চ ধ্বনিতে পড়ো। এখন এই পুনঃ উচ্চারণের উদ্দেশ্য হয়তো এ কথা শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য যে, সত্য কথা বলতে কোনো লজ্জা নেই। অথবা এ উদ্দেশ্য যে কলেমায়ে শাহাদত বারবার পড়ার দ্বারা রাসূলের প্রতি হযরত আবূ মাহযূরা (রা.)-এর ভাল বাসা সৃষ্টি হয়ে যাবে। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেছেন যে, তব্রানী শরীফে হযরত আবূ মাহযূরা (রা.) সূত্রে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে-যার মধ্যে তারজী (ترجيع) নেই। অতএব হযরত আবূ মাহযূরা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত দু' রেওয়ায়েতের মধ্যে বিরোধ। বিধায় বিরোধের কারণে উভয় রেওয়ায়েত রহিত বা অগ্রাহ্য হবে।

ইবনে ওমর (রা.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর হাদীস বিরোধ থেকে মুক্ত, বিধায় তা গ্রহণযোগ্য হবে। তারজী না হওয়াটা এ জন্য প্রাধান্য পাবে যে, আযানের অধ্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদি রব্বিহি (রা.) -এর হাদীস মূল এবং তার মধ্যে তারজী নেই।

وَيَزِيْدُ فِيْ أَذَانِ الْفَجْرِ الخ : ফজরের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ-এর পর দু'বার اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বলা মোস্তাহাব। দলিল এই যে, একদা হযরত বিলাল (রা.) ফজরের আযান দিলেন, অতঃপর তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরার দরজায় গিয়ে বললেন, اَلصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ নামাজ হে রাসূল ﷺ। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, اَلرَّسُوْلُ نَائِمٌ রাসূল ঘুমিয়ে আছেন। তখন হযরত বিলাল (রা.) বললেন, اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ অতঃপর রাসূল ﷺ ঘুম থেকে জাগলেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল ﷺ-কে ঐ সম্পর্কে অবগত করালেন। তিনি ঐ শব্দ পছন্দ করলেন এবং বললেন, বিলাল (রা.) এ শব্দ আযানের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। এ শব্দ শুধু ফজরের আযানে কেন বৃদ্ধি হবে? জবাব হলো, এ সময়টা হলো ঘুম ও অলসতার সময়, এ জন্য এ শব্দ শুধু ফজরের আযানে বৃদ্ধি করা হবে।

وَالْإِقَامَةُ الخ ঃ কুদূরী প্রণেতা বলেছেন যে, ইকামত আযানের মতো। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ-এর পর قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ দু'বার বৃদ্ধি করতে হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন যে, قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ব্যতীত অন্যান্য শব্দ এক এক বার বলবে এবং قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ দু'বার পড়বে। ইমাম শফিঈ (র.)-এর দলিল হলো যে, হযরত আনাস (রা.) -এর হাদীস- হুযুর ﷺ হযরত বিলালকে নির্দেশ দিলেন আযানে জোড়া জোড়া বলবে এবং ইকামত বেজোর বলবে, قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ব্যতীত। আমাদের দলিল হলো, যে ফেরেশতা আসমান থেকে এসেছিলেন, তিনি আযানের মতো ইকামত ও দু' দু' বার বলেছেন। যেমন ইবনে আবী শায়বা (র.) ওসমান ইবনে আবী লায়লা (র.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। আমার (ওসমান) নিকট রাসূল ﷺ-এর সাহাবীরা বর্ণনা করেছেন যে, ওসমান ইবনে যায়েদ আনসারী (রা.) এসে রাসূল ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করেছেন মনে হয় যেন দু'টি সবুজ চাদর পরিহিত এক ব্যক্তি প্রচীরের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আযান দু' দু' বার এবং ইকামত দু' দু' বার বলেছেন। হযরত আনাস (রা.) -এর জবাব হলো যে, আযানে দু'টি শব্দ দু'ধ্বনিতে বলেছেন এবং ইকামতে দুটি শব্দ একই ধ্বনিতে বলেছেন।

وَيَتَرَسَّلُ فِى الْاَذَانِ وَيَحْدُرُ فِى الْاِقَامَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا اَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَاِذَا اَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَهٰذَا بَيَانُ الْاِسْتِحْبَابِ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ لِاَنَّ النَّازِلَ مِنَ السَّمَاءِ اَذَّنَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلَوْتَرَكَ الْاِسْتِقْبَالَ جَازَ لِحُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ وَيُكْرَهُ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ وَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ لِلصَّلٰوةِ وَالْفَلَاحِ يُمْنَةً وَيُسْرَةً لِاَنَّهُ خِطَابٌ لِلْقَوْمِ فَيُوَاجِهُهُمْ وَاِنِ اسْتَدَارَ فِىْ صَوْمِعَتِهِ فَحَسَنٌ وَمُرَادُهُ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ تَحَوُّلَ الْوَجْهِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا مَعَ ثُبَاتِ قَدَمَيْهِ مَكَانَهَا كَمَا هُوَ السُّنَّةُ بِاَنْ كَانَتِ الصَّوْمِعَةُ مُتَّسِعَةً فَاَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَا وَالْاَفْضَلُ لِلْمُؤَذِّنِ اَنْ يَّجْعَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ بِذٰلِكَ اَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِلَالًا (رض) وَلِاَنَّهُ اَبْلَغُ فِى الْاِعْلَامِ وَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَحَسَنٌ لِاَنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ اَصْلِيَّةٍ۔

অনুবাদ ঃ আযান ধীরলয়ে থেমে থেমে উচ্চারণ করবে, আর ইকামত না থেমে দ্রুতলয়ে উচ্চারণ করবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন আযান দেবে, তখন ধীরলয়ে দেবে। আর যখন ইকামত দেবে, তখন দ্রুতলয়ে বলবে। এ হলো মোস্তাহাবের বর্ণনা। কেবলামুখী হয়ে আযান ও ইকামত উভয় দিবে। কেননা আসমান থেকে অবতীর্ণ ফেরেশতা কেব্‌লামুখী হয়ে আযান দিয়েছেন। তবে কেবলামুখী না হয়ে আযান দিলেও মূল উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার কারণে তা জায়েজ হবে। তবে সুন্নতের খেলাফ হওয়ার কারণে তা মাকরূহ্ হবে এবং বলার সময় মুখমণ্ডল যথাক্রমে ডানে-বামে ফিরাবে। কেননা তা লোকদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন। সুতরাং তাদের দিকে মুখ করেই সম্বোধন করবে। আর যদি আযান খানায় প্রদক্ষিণ করে তাহলে, তবে তা উত্তম হবে। এ কথার উদ্দেশ্য হলো যে, মিনারা প্রশস্ত হওয়ার কারণে যদি সুন্নত মুতাবিক পদদ্বয় স্বস্থানে রেখে মুখমণ্ডল ডানে ও বামে ফিরাতে না পারে, তবে বিনা প্রয়োজনে পদদ্বয় স্বস্থান হতে সরানো ভাল নয়। মুয়াজ্জিনের জন্য উত্তম হলো তার উভয় কানে দু' আঙ্গুল স্থাপন করা। রাসূল ﷺ হযরত বিলাল (রা.)-কে এমনই নির্দেশ দিয়েছেন। তা ছাড়া এটা প্রচারের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর। আর যদি তা না করে তাহলেও ভাল। কেননা এটা মূলত সুন্নত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তারাস্‌সুল (ترسل) -এর অর্থ দু' শব্দের মাঝখানে পৃথক করে থেমে থেমে উচ্চারণ করা। হদর (حدر) বলা হয়, দু' শব্দ মিলিয়ে উচ্চারণ করা। আযানের মধ্যে তারাস্‌সুল (ترسل) উত্তম এবং ইকামতের মধ্যে হদর (حدر) উত্তম। দলিল, রাসূল ﷺ হযরত বিলাল (রা.)-কে ঐ ভাবে হুকুম করেছেন। যদি ইকামতের মধ্যে তারাস্‌সুল (ترسل) করে তাহলে কারো কারো মতে সুন্নতের খেলাফ হওয়ার কারণে মাকরূহ হবে। তবে হিদায়া গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী মাকরূহ না হওয়া সাবিত হয়। তিনি বলেছেন هٰذَا بَيَانُ الْاِسْتِحْبَابِ আর استحباب বর্জন করলে মাকরূহ হয় না। ইবনে হুমাম বলেছেন যে, প্রথম মতই হক অর্থাৎ আযানে তারাস্‌সুল, ইকামতে হদর করা সুন্নত।

ইনায়া গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন যে, আযান এবং ইকামতে কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে, তবে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ব্যতীত। দলিল ঃ যে ফেরেশতা আসমান থেকে এসেছিলেন, তিনি কেবলার দিকে মুখ করে আযান দিয়েছেন। কেউ যদি কেবলামুখী না হয়ে আযান দেয় তাহলে জায়েজ আছে, তবে সুন্নতের খেলাফ হওয়ার কারণে মাকরূহে তানযীহী হবে। حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় মুখ যথাক্রমে ডানে এবং বামে ফিরাবে। কেননা এ দু' শব্দ দ্বারা মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়। সুতরাং এ সম্বোধন তাঁদের দিকে ফিরে করতে হবে। যার মর্ম হলো তোমরা নামাজ এবং উভয় জগতের কল্যাণের দিকে এসো। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, মুসলমান যেরূপ ডানে এবং বামে আছে অনুরূপভাবে পিছনের দিকেও আছে? অতএব ডানে এবং বামে যেমন মুখ ফিরানোর হুকুম আছে, অনুরূপ পিছনের দিকেও মুখ ফিরানোর হুকুম হওয়া চাই। জবাব হচ্ছে যে, ঐ সুরতে কিবলার দিকে পিঠ হবে। অথচ মুয়াজ্জিন লোকদেরকে কেবলার দিকে মুখ করার আহবান করছে। এ জন্য ডানে এবং বামের দিকে মুখ ফিরানোই যথেষ্ট। কেননা তার দ্বারা আহবানের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

সাওমাআহ (صومعه) "বাহরুর রাইক" নামক গ্রন্থে আছে যে, সওমা মিনারাকে বলে। আল্লামা বদর উদ্দীন আইনী হিদায়ার ভাষ্যে লিখেছেন যে, সওমাআহ ঐ উঁচু স্থানকে বলে, যেখানে মুয়াজ্জিন দাঁড়িয়ে আযান দেয়। মোট কথা হলো, মুয়াজ্জিন যদি মিনারায় ঘুরে যায় তাহলে উত্তম, শর্ত হলো মিনারা প্রশস্ত হতে হবে। ডানে মাথা ঘুরিয়ে দু'বার حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলবে এবং বামে মাথা ঘুরিয়ে দু'বার حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলবে। হিদায়া প্রণেতা বলেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর যে বক্তব্য মতনে উল্লেখ আছে তার উদ্দেশ্য হলো মিনারায় ফিরা। তা ঐ সুরতে যখন মিনারা প্রশস্ত হওয়ার কারণে সুন্নত মুতাবিক পদদ্বয় স্বস্থানে রেখে মুখমণ্ডল ডানে ও বামে ফিরাতে না পারে। মোট কথা হলো যে, যদি পদদ্বয় স্বস্থানে রেখে আযানের পূর্ণ ঘোষণা না দিতে পারে (যা আযানের উদ্দেশ্য) তাহলে মুখ ফিরানোর প্রয়োজন হলে কোনো অসুবিধা নেই। প্রয়োজন ছাড়া স্বস্থান হতে পদদ্বয় সরানো ভাল নয়।

وَالْاَفْضَلُ لِلْمُؤَذِّنِ اَنْ يَّجْعَلَ الخ : আযান দেওয়ার সময় মুয়াজ্জিনের জন্য উত্তম হলো যে, দু' কানে স্বীয় দু' আঙ্গুল দাখিল করা। দলিল রাসূল ﷺ হযরত বিলাল (রা.)-কে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন হাকেম (র.) মুসতাদরাক নামক গ্রন্থে সাদ আল-কুরয (কুবার মুয়াজ্জিন) (র.)-এর সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন,

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِلَالًا (رض) اَنْ يَّجْعَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ وَقَالَ اِنَّهٗ اَرْفَعُ لِصَوْتِكَ .

রাসূল ﷺ হযরত বিলাল (রা.)-কে হুকুম দিয়েছেন যে, তিনি যেন স্বীয় দু'কানে নিজের দু'আঙ্গুল দাখেল করেন এবং বললেন যে, এটা তোমার ধ্বনিকে উঁচু করবে। আল্লামা তবরানী (র.) উক্ত হাদীসকে এ শব্দে বর্ণনা করেছেন—

اِذَا اَذَّنْتَ فَاجْعَلْ اِصْبَعَيْكَ فِىْ اُذُنَيْكَ فَاِنَّهٗ اَرْفَعُ لِصَوْتِكَ .

অর্থ ঃ যখন তুমি আযান দেবে তখন স্বীয় দু' আঙ্গুল নিজ দু' কানে দাখিল করবে। কেননা এটা তোমার ধ্বনি উঁচু করবে।

যুক্তি ভিত্তিক দলিল, জানানো এবং ঘোষণা যা আযানের মূলত উদ্দেশ্য, তা এর দ্বারা পূর্ণ হয়, যদি মুয়াজ্জিন এরূপ না করে তাহলেও আযান সহীহ হবে। কেননা এটা সুন্নতে মুয়াক্কাদার (سنن الهدى) অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং সুন্নতে যায়িদার অন্তর্ভুক্ত। "ইনায়ার" গ্রন্থকার লেখেছেন যে, ঐ অবস্থায় আযান দেওয়া ভালো। তা বর্জন করা উত্তম নয়। আযানের সময় মুয়াজ্জিনের কানে আঙ্গুল দাখিল করা যদিও মূলত সুন্নত নয়। কেননা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-কে স্বপ্নে যে আযান দেখানো হয়েছে, তাতে কানে আঙ্গুল দাখিল করার কথা উল্লেখ নেই। অথচ আযানের অধ্যায়ে তাকে মূল ধরা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও যেহেতু রাসূল ﷺ এটা করতে বিলাল (রা.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন তাই এটা বর্জন করাকে ভাল (حسن) বলা সমীচীন নয়।

মোট কথা আযানে কানে আঙ্গুল দাখিল করা আহ্‌সান (احسن) বা সর্বোত্তম, আর তা না করা হাসান (حسن) বা ভাল।

ফায়দা ঃ সাদ আল-কুরয (রা.) ব্যতীত রাসূল ﷺ-এর আরো তিন জন মুয়াজ্জিন ছিলেন। (১) বিলাল (রা.); (২) আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.); (৩) আবূ মাহযূরা (রা.)। কুরয (قرظ) বলা হয়, বরই পাতা যার দ্বারা চামড়া দাবাগাত করা হয়। সা'দ (রা.) যেহেতু তিনি ঐ তেজারত করতেন এ জন্য তাঁকে সা'দ আল্-কুরয বলা হতো। আইনুল হিদায়া গ্রন্থে লেখেছে মুয়াজ্জিনের জন্য নিম্নোক্ত গুণগুলো থাকা বাঞ্ছনীয়। পুরুষ, বুদ্ধিমান, বয়ঃপ্রাপ্ত, সুস্থ, পরহেজগার সুন্নত সম্পর্কে অবগত, নামাজের সময় সম্পর্কে অবগত, সর্বদা পাঁচ ওয়াক্তের আযান প্রদানকারী হওয়া এবং আযানের বিনিময়ে কিছু না নেওয়া।

وَالتَّثْوِيْبُ فِي الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ حَسَنٌ لِاَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ وَكُرِهَ فِيْ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَمَعْنَاهُ الْعَوْدُ اِلَى الْاِعْلَامِ وَهُوَ عَلٰى حَسْبِ مَا تَعَارَفُوْهُ وَهٰذَا تَثْوِيْبٌ اَحْدَثَهُ عُلَمَاءُ الْكُوْفَةِ بَعْدَ عَهْدِ الصَّحَابَةِ (رضـ) لِتَغَيُّرِ اَحْوَالِ النَّاسِ وَخَصُّوا الْفَجْرَ بِهِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَالْمُتَاَخِّرُوْنَ اِسْتَحْسَنُوْهُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِظُهُوْرِ التَّوَانِيْ فِي الْاُمُوْرِ الدِّيْنِيَّةِ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ (رحـ) لَااَرٰى بَاْسًا اَنْ يَّقُوْلَ الْمُؤَذِّنُ لِلْاَمِيْرِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَلصَّلٰوةُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَاسْتَبْعَدَهُ مُحَمَّدٌ (رحـ) لِاَنَّ النَّاسَ سَوَاسِيَةٌ فِيْ اَمْرِ الْجَمَاعَةِ وَاَبُوْيُوْسُفَ (رحـ) خَصَّهُمْ بِذٰلِكَ لِزِيَادَةِ اشْتِغَالِهِمْ بِاُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ كَيْلَا تَفُوْتَهُمُ الْجَمَاعَةُ وَعَلٰى هٰذَا الْقَاضِيْ وَالْمُفْتِيْ ـ

অনুবাদ ঃ ফজরের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'বার حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলে তাসবীব (বা পুনঃ ঘোষণা দান) করা উত্তম। কেননা এটা ঘুম ও গাফলতের সময়। অন্যান্য সালাতে তা মাকরূহ। তাসবীব অর্থ পুনঃ ঘোষণা দান এবং তা লোকদের মধ্যে প্রচলিত পন্থায় করতে হবে। এই তাসবীব প্রথমবারের মতো কূফার আলিমগণ সাহাবীদের যুগের পরে মানুষের অবস্থার পরিবর্তনের কারণে উদ্ভাবন করেছেন এবং তারা এটাকে ফজরের সাথেই খাস করেছেন। তবে পরবর্তী আলিমগণ দীনের সকল বিষয়ে শৈথিল্য দেখা দেওয়ায় সকল সালাতেই তাসবীব উত্তম মনে করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, মুয়াজ্জিন প্রত্যেক নামাজের সময়ে আমীর ও শাসককে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলায় কোনো দোষ নেই। হে আমীর আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, নামাজে আসুন, কল্যাণের দিকে আসুন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ মতকে দুর্বোধ্য মনে করেছেন। কেননা জামাআতের ব্যাপারে সকল মানুষ সমান। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) মুসলমানদের বিষয়াদিতে অধিক ব্যস্ততার কারণে এ ব্যাপারে তাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন। যেন তাঁদের জামাআত ছুটে না যায়। এ ব্যাপারে কাজি ও মুফতিদের জন্য একই হুকুম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তাসবীবের আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন ও ফিরে আসা, এর থেকে ছওয়াব (ثواب) শব্দটি নির্গত হয়েছে। কেননা মানুষের আমলের ফায়দা তার দিকে ফিরে আসে এবং -এর থেকে মাসাবা (مثابة) যার অর্থ আস্তানা শব্দটি উৎকলিত। কেননা লোকেরা বারবার স্বীয় আস্তানায় ফিরে আসে। শরিয়তের পরিভাষায় তাসবীব বলা হয় اَلْاِعْلَامُ بَعْدَ الْاِعْلَامِ বা ঘোষণার পর ঘোষণা দেওয়া। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেছেন যে, আযান ও ইকামতের মাঝখানে নামাজের ঘোষণাকে তাসবীব বলে।

তাসবীব- দু' প্রকার এক পুরাতন তাস্‌বীব, তা হচ্ছে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বলা। ফখরুল ইসলামের মতে ছহীহ হলো যে, এটা আযানের পরে ছিল। কিতাবুল আসারে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতের দ্বারাও এটিই বুঝা যায়। কিন্তু লোকেরা এই তাস্‌বীবকে আযানের মধ্যে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ-এর পরে দাখিল করে দিয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হলো যে, উহা حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ-এর পরেই আযানে দাখিল ছিল, যা মতনে (متن) উল্লেখ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী আমল চলে আসছে। হযরত বিলাল (রা.) -এর হাদীস يَا بِلَالُ اِجْعَلْهُ فِيْ اَذَانِكَ হে বিলাল, উহাকে তোমার আযানের অন্তর্ভুক্ত করো। এ কথা উক্ত দাবির উপর সুস্পষ্ট দলিল।

দুই. তাস্‌বীবে মুহ্‌দাস (محدث) বা সৃষ্ট তাসবীব। তা হচ্ছে যে আযান ও ইকামতের মধ্যে দু'বার حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ অথবা তার সমার্থবোধক সমাজে প্রচলিত কোনো শব্দ বলা। তাস্‌বীবের জন্য শব্দ নির্দিষ্ট নেই এবং আরবি ভাষায় হওয়াও শর্ত নয়। যেমন কেউ اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ বলল অথবা قَامَتْ قَامَتْ বলল। তাহলে এটা দ্বারাও তাসবীব হবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে নামাজ তৈরি, নামাজ হচ্ছে অথবা অন্য কোনো শব্দ বলল, তাহলেও দুরুস্ত হবে। যদি কাশি দেওয়ার দ্বারা লোকেরা বুঝে তাহলে তাসবীব হবে। মোট কথা হলো যে, যেখানে যে নিয়ম আছে, ঐ মুতাবিক সেখানে তাসবীব করা হবে। এটাকে তাস্‌বীবে মুহ্‌দাস (تثويب محدث) এ জন্য বলে যে, এটা না রাসূল ﷺ -এর যুগে ছিল; না সাহাবীদের যুগে ছিল; বরং তাবেঈনদের যুগে যখন মানুষের অবস্থা পরিবর্তন হলো এবং লোকেরা দীনি কাজে অলসতা করতে লাগল তখন কুফার আলিমগণ উহা আবিষ্কার করেছেন। ধরা যায় যে এটা বিদ্‌আতে হাসানা (بدعت حسنة)। হাসানা (حسنه) এ জন্য যে, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ফকীহগণ উহাকে ভাল মনে করেছেন। আর মুসলমানরা যেটাকে ভাল মনে করে সেটা আল্লাহর নিকটও ভাল। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

مَارَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ وَمَارَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ قَبِيْحًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ قَبِيْحٌ ـ

অর্থাৎ মুসলমান যেটাকে ভাল মনে করবে, সেটা আল্লাহর নিকটও ভাল। পক্ষান্তরে মুসলমানরা যেটাকে খারাপ মনে করে সেটা আল্লাহর নিকটও খারাপ।

তাসবীবে মুহ্‌দাস শুধু ফজরে জায়েজ না সব নামাজে জায়েজ? এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী আলিমদের মত হলো যে, তাসবীব শুধু ফজরের নামাজে জায়েজ অন্য নামাজে জায়েজ নয়। কেননা এ সময় ঘুম ও অলসতার সময়। এর সমর্থন তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ-এর হাদীস দ্বারা পাওয়া যায়।

عَنْ بِلَالٍ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لَّا اُثَوِّبَ فِىْ شَيْءٍ مِنَ الصَّلٰوةِ اِلَّا فِى الْفَجْرِ ـ

অর্থাৎ হযরত বিলাল (রা.) বলেন যে, রাসূল ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছে, ফজর ছাড়া অন্য কোনো নামাজে যেন তাসবীব না করি। এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত আলী (রা.) এক মুয়াজ্জিনকে ইশার নামাজে তাস্‌বীব করতে দেখেছেন, তখন বলেছেন, اَخْرِجُوْا هٰذَا الْمُبْتَدِعَ مِنَ الْمَسْجِدِ এ বিদ্‌আতীকে মসজিদ হতে বের করে দাও।

পরবর্তী আলিমদের মতে সকল নামাজে তাসবীব জায়েজ। আইনুল হিদায়া নামক গ্রন্থে শরহে নিকায়ার বরাত দিয়ে লেখেছেন যে, পরবর্তী আলিমদের মতে মাগরিব ব্যতীত সকল নামাজে তাস্‌বীব উত্তম। দলিল মানুষেরা দীনি কাজে অলসতা করে। যেহেতু ফজরে ঘুমের আলস্যের কারণে তাসবীব জায়েজ। অতএব অলসতা এবং কাজের গাফ্‌লতের কারণেও অনায়াসে তাস্‌বীব জায়েজ হবে। তবে পরবর্তী আলিমদের এ মত সঠিক নয়, কেননা ঘুমের কারণে যে গাফ্‌লত আসে তা ইখতিয়ারী (اختيارى) বা ইচ্ছাকৃত নয় এবং উহাতে মানুষের কোনো অবহেলা ও অবাধ্যতা নেই। যেমন লায়লাতুত্ তারীসের (ليلة التعريس) -এর হাদীসে আছে যে, যখন সকলে ফজরের নামাজে ঘুমিয়ে ছিলেন। তখন সাহাবীদের অস্থিরতা সৃষ্টি হলো যে, আমরা বড় অবহেলা করেছি, তখন রাসূল ﷺ বললেন, لَاتَفْرِيْطَ فِى النَّوْمِ ঘুমের অবস্থায় অবহেলা ধর্তব্য নয় বরং মার্জনীয়। কেননা আত্মাসমূহ আল্লাহর কব্‌জায়, আল্লাহ যখন চাহেন, তখন রুহকে ছেড়ে দেন। অবহেলা যা জাগ্রত অবস্থায় হয়, তা আপত্তিকর। অতএব ফজরের মধ্যে তাসবীব অবহেলা ব্যতীত গায়রে ইখতিয়ারী বা অনিচ্ছার অবস্থায় ছিল। সুতরাং তাকে অন্যান্য নামাজের ওপর (যাতে অবহেলা ইচ্ছাকৃত) তুলনা করা ঠিক হবে না। কেননা উভয় নামাজের গাফ্‌লত এক ধরনের নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন যে, আমার মতে বিচারক এবং শাসকদের জন্য ফজর ব্যতীত অন্যান্য নামাজেও তাসবীব জায়েজ। অতএব মুয়াজ্জিন শাসকদেরকে এই শব্দ দ্বারা তাসবীব করবে,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَلصَّلٰوةُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ـ

ইমাম মুহাম্মদ (র.) উহাকে দুর্বোধ্য মনে করেছেন। দুর্বোধ্যের কারণ হচ্ছে-শরিয়তের দৃষ্টিতে সকল মুসল্লি সমপর্যায়ের। রাজা হোক প্রজা হোক অতএব বাদশার কোনো অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য থাকবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বাদশা এবং শাসকদেরকে তাস্‌বীবের সাথে খাস করেছেন। এর কারণ হচ্ছে যে, তাঁরা জনসাধারণের কাজে ব্যস্ত থাকে। এ জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে পুনঃ ঘোষণা দেবে। যাতে তাঁদের জামাআত ছুটে না যায়। এরূপ হুকুম ঐ সব লোকদের জন্যও প্রযোজ্য হবে যাঁরা জনগণের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে যেমন মুফতি, বিচারক ইত্যাদি।

ফায়দা ঃ আযানের পর চল্লিশ আয়াত পড়ার সমপরিমাণ সময় বিরত থাকবে। অতঃপর তাসবীব করবে।

وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا يَجْلِسُ فِي الْمَغْرِبِ أَيْضًا جَلْسَةً خَفِيْفَةً لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنَ الْفَصْلِ إِذِ الْوَصْلُ مَكْرُوْهٌ وَلَا يَقَعُ الْفَصْلُ بِالسَّكْتَةِ لِوُجُوْدِهَا بَيْنَ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ فَيُفْصَلُ بِالْجَلْسَةِ كَمَا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّ التَّأْخِيْرَ مَكْرُوْهٌ فَيَكْتَفِيْ بِأَدْنَى الْفَصْلِ اِحْتِرَازًا عَنْهُ وَالْمَكَانُ فِيْ مَسْأَلَتِنَا مُخْتَلِفٌ وَكَذَا النَّغْمَةُ فَيَقَعُ الْفَصْلُ بِالسَّكْتَةِ وَلَا كَذَالِكَ الْخُطْبَةُ وَقَالَ الشَّافِعِيْ (رح) يُفْصَلُ بِرَكْعَتَيْنِ اِعْتِبَارًا بِسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَالْفَرْقُ قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَالَ يَعْقُوْبُ رَأَيْتُ أَبَا حَنِيْفَةَ (رح) يُؤَذِّنُ فِي الْمَغْرِبِ وَيُقِيْمُ وَلَا يَجْلِسُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَهٰذَا يُفِيْدُ مَا قُلْنَاهُ وَأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ ـ

অনুবাদ : মাগরিব ছাড়া অন্য সময় আযান ও ইকামতের মাঝে কিছু সময় অপেক্ষা করবে। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। সাহেবাইন বলেন যে, মাগরিবের সময় ও স্বল্পক্ষণ অপেক্ষা করবে। কেননা আযান ও ইকামতে ব্যবধান করা আবশ্যক। আর উভয়কে মিলিয়ে দেওয়া মাকরূহ। আর স্বর-বিরতি বা নীরবতা ব্যবধান বলে গণ্য হবে না। কেননা তা তো আযানের কলেমাগুলোর মধ্যেও বিদ্যমান। সুতরাং স্বল্পক্ষণ বসা দ্বারা ব্যবধান করতে হবে। যেমন দুই খুতবার মাঝখানে হয়ে থাকে। ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর দলিল হলো যে, মাগ্‌রিবে বিলম্ব করা মাকরূহ। সুতরাং তা পরিহার করার জন্য ন্যূনতম ব্যবধানেই যথেষ্ট হবে। আর আমাদের আলোচ্য মাসআলাতে স্থানও ভিন্ন এবং স্বরও ভিন্ন। সুতরাং স্বল্প বিরতি দ্বারাই ব্যবধানগণ্য হবে। পক্ষান্তরে খুতবা সেরূপ নয়। ইমাম শাফেঈ (রা.) অন্যান্য নামাজের ওপর কিয়াস করে বলেন যে, দুই রাক'আত নফলের মাধ্যমে ব্যবধান করবে (অন্য নামাজ থেকে মাগরিবের পার্থক্য আমরা পূর্বে উল্লেখ করছি) ইমাম ইয়াকূব (আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে আযান ও ইকামত দিতে দেখেছি। তিনি আযান ও ইকামতের মাঝে বসতেন না। আমরা যা বলেছি, এটি তার সমর্থন করে। আর এতে এটাও প্রমাণিত হয় যে, মুয়াজ্জিনের শরিয়ত সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, وَيُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাদের জন্য আযান দেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ ব্যাপারে আলিমগণ সকলেই একমত যে, আযান ও ইকামতকে একত্রে মিলানো মাকরূহ। রাসূল ﷺ হযরত বিলাল (রা.)-কে হুকুম দিয়েছেন - اِجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ অর্থাৎ হে বিলাল! তুমি আযান ও ইকামতের মধ্যে এই পরিমাণ বিরতি দাও, যাতে একজন খাবাররত ব্যক্তি খাবার খেয়ে অবসর হতে পারে। দ্বিতীয় দলিল—আযানের উদ্দেশ্য মানুষকে সময় দাখেল হওয়ার সংবাদ দেওয়া। যাতে সে নামাজের প্রস্তুতি নিয়ে নামাজের জন্য মসজিদে যেতে পারে। আযান ও ইকামত মিলানোর দ্বারা এ উদ্দেশ্য ফউত হয়ে যায়। এ জন্য আযান এবং ইকামত মিলানো মাকরূহ তাই ব্যবধান করা উচিত। যদি নামাজ এমন হয়, যার পূর্বে সুন্নত বা মোস্তাহাব নামাজ আছে, তাহলে আযান এবং ইকামতের মধ্যে (ঐ) নামাজের দ্বারা ব্যবধান করবে। যেমন ফজরের পূর্বে দু' রাক'আত সুন্নত এবং জোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নত মসনুন। আসরের পূর্বে চার রাক'আত এবং ইশার পূর্বে চার রাক'আত মোস্তাহাব। দলিলঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ

করেছেন, بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ প্রত্যেক আযান এবং ইকামতের মাঝে নামাজ রয়েছে। রাসূল ﷺ এ কথা তিন বার বলেছেন। তৃতীয় বার বলেছেন لِمَنْ شَاءَ، فَاِنْ لَمْ يُصَلِّ يَفْصِلُ بِجَلْسَةٍ خَفِيْفَةٍ. যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, যদি নামাজ না পড়ে তাহলে হালকা বৈঠকের মাধ্যমে ব্যবধান করবে। মোট কথা ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মাগরিব ব্যতীত সকল নামাজে আযান ও ইকামতের মধ্যে কিছু সময় অপেক্ষা করবে। মুয়াজ্জিনের জন্য ঐ সময়ে সুন্নত বা নফল পড়া উত্তম। মাগরিবের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা থেকে দু'টি রেওয়ায়েত আছে।

এক. মাগরিবের আযান ও ইকামতের মাঝখানে নীরবভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ পরিমাণ ব্যবধান করা মোস্তাহাব, যে সময়ের মধ্যে তিনটি ছোট আয়াত বা বড় একটি আয়াত পড়া যায়।

দুই. এ পরিমাণ ব্যবধান করবে যাতে তিন কদম চলতে পারে। সাহেবাইনের মতে মাগরিবের মধ্যে অপেক্ষা করবে। তবে অতি অল্প সময় অপেক্ষা করবে। যেমন দু' খুতবার মধ্যে ব্যবধান হয়। সাহেবাইনের দলিল এটা সর্ব সম্মত কথা যে, আযান ও ইকামতের মধ্যে মিলানো মাকরূহ এবং ব্যবধান করা জরুরি। যা ভূমিকায় গিয়েছে। এ কথা প্রায় সর্বসম্মত যে, শুধু নীরব থাকার দ্বারা ব্যবধান সংঘটিত হয় না। কেননা নীরবতা তো আযানের শব্দের মাঝখানেও পাওয়া যায়। এ জন্য বৈঠকের মাধ্যমে ব্যবধান করবে, যদিও তা সংক্ষিপ্ত হয়। যেমন— জুমার দিনের দু' খুতবার মাঝে বসে ব্যবধান করা হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল মাগরিবের নামাজে বিলম্ব করা মাকরূহ। আমরা পূর্বে এর কারণ বর্ণনা করেছিলাম যে, সূর্যাস্তের পর ফরজের পূর্বে কোনো নফল পড়বে না স্বল্প বিরতি দেবে যাতে অধিক বিলম্ব করা হতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং আযান ও ইকামতের মধ্যেও বিরতি হয়ে যায়। সাহেবাইনের কিয়াসের জবাব হলো– আযান ও ইকামতের মাঝখানের বিরতিকে দু'খুতবার মাঝখানের বিরতির উপর কিয়াস করা জায়েজ নেই; কেননা উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল সম পার্থক্য। আযান ও ইকামতের স্থান বিভিন্ন হয় এবং উভয়ের ধ্বনি বিভিন্ন হয়। যেমন– আযান তারাসসুল করা হয় বা ধীরলয়ে থেমে থেমে তা দেওয়া হয়, পক্ষান্তরে ইকামত হদর বা দ্রুতলয়ে উচ্চারণ করা হয়। উভয়ের মধ্যে মুয়াজ্জিনের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়। কেননা আযানের সময় স্বীয় আঙ্গুলদ্বয় দু'কানে দাখেল করে। পক্ষান্তরে ইকামতে হাত ছেড়ে দেয়। এর বিপরীত হলো খুতবা। কেননা উভয় খুতবার স্থান এক, উভয় খুতবার ধ্বনি ও স্বর এক, উভয় খুতবায় খতীবের অবস্থা এক। অতএব এতবড় পার্থক্য বিদ্যমান থাকতে একটিকে অপরটির ওপর কিয়াস করা কিভাবে জায়েজ হবে? ইমাম শাফেঈ (র.) বলেছেন যে, মাগরিবের আযান ও ইকামতের মাঝে দু'রাকআতের দ্বারা ব্যবধান করবে। দলিল হলো– মাগরিবকে অন্যান্য নামাজের উপর কিয়াস করা হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মাগরিব এবং অন্যান্য নামাজের পার্থক্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মাগরিবকে অন্যান্য নামাজের উপর কিয়াস করা কিয়াস মাআল ফারিক (قياس مع الفارق) বা অসম বস্তুর উপর কিয়াস করার ন্যায় বলেছেন। কেননা মাগরিবের নামাজে বিলম্ব করা মাকরূহ। পক্ষান্তরে অন্যান্য নামাজে বিলম্ব করা মাকরূহ নয়। অতএব মাগরিবের নামাজকে অন্যান্য নামাজের উপর কিয়াস করা কিভাবে সহীহ হবে?

হিদায়া গ্রন্থকারের উপর বিস্ময় যে, সময়ের অধ্যায়ে মাগরিবের সময় সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মত উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাগরিবের সময় এতটুকু, যার মধ্যে অজু, আযান এবং ইকামতের পর তিন রাকআত আদায় করা যায়। আর এখানে লেখেছেন যে, আযান ও ইকামতের মধ্যে দু'রাকআতের দ্বারা ব্যবধান করবে। এ দু'মত কিভাবে একত্রিত হতে পারে?। জবাবঃ ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মাগরিবের সময়ের ব্যাপারে দু'টি মত, খাদিম (র.) ইমাম গাযালী (র.)-এর বরাত দিয়ে সময়ের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। হিদায়া গ্রন্থকার সময়ের অধ্যায়ে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর একটি মত উল্লেখ করেছেন এবং এখানে (আযান অধ্যায়ে) দ্বিতীয় মত উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় মত হচ্ছে যে, মাগরিবের সময় এতটুকু যার মধ্যে অজু, আযান এবং ইকামতের পর পাঁচ রাকআত নামাজ পড়তে পারা যায় অর্থাৎ তিন রাকআত ফরজ এর এবং দু'রাকআত– যার দ্বারা আযান ও ইকামতের মধ্যে ব্যবধান হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন যে, আমি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে দেখিছি যে, তিনি আযান এবং ইকামত দিয়েছেন এবং আযান ও ইকামতের মাঝে বসেননি।

আবূ ইউসুফ (র.)-এর উক্তি দ্বারা দু'টি বস্তু বুঝা গেল, এক. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আযান ও ইকামতের মধ্যে অপেক্ষা করবে না। **দুই.** আযান প্রদানকারীকে আহকামে শরিয়ত সম্পর্কে অবগত হতে হবে। দলিল রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন وَيُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَقْرَأُكُمْ অর্থ-তোমাদের জন্য তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আযান দেবে এবং তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে অধিক জান্তা ব্যক্তি ইমামতি করবে।

وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيْمُ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَضَى الْفَجْرَ غَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيْسِ بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي (رحـ) فِىْ اِكْتِفَائِهِ بِالْاِقَامَةِ فَاِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ اَذَّنَ لِلْاُوْلَى وَاَقَامَ لِمَارَوَيْنَا وَكَانَ مُخَيَّرًا فِى الْبَاقِىْ اِنْ شَاءَ اَذَّنَ وَاَقَامَ لِيَكُوْنَ الْقَضَاءُ عَلَى حَسْبِ الْاَدَاءِ وَاِنْ شَاءَ اِقْتَصَرَ عَلَى الْاِقَامَةِ لِاَنَّ الْاَذَانَ لِلْاِسْتِحْضَارِ وَهُمْ حُضُوْرٌ قَالَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَنَّهُ يُقَامُ لِمَا بَعْدَهَا قَالُوْا يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ هٰذَا قَوْلُهُمْ جَمِيْعًا ـ

অনুবাদ ঃ কাজা নামাজের জন্যও আযান এবং ইকামত দেবে। কেননা রাসূল ﷺ সফর থেকে ফিরার পথে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার কারণে পরবর্তী সকালে আযান ও ইকামত দিয়ে ফজরের নামাজ কাজা করেছেন। শুধু ইকামতকে যথেষ্ট মনে করার ব্যাপারে এ হাদীস ইমাম শাফে'ঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলিল। যদি কারো কয়েক ওয়াক্ত নামাজ ছুটে যায় বা কাজা হয়, তাহলে প্রথম নামাজের জন্য আযান দেবে ও ইকামত বলবে। দলিল, আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীসটির কারণে। অবশিষ্টগুলোর ক্ষেত্রে এখতিয়ার রয়েছে। ইচ্ছা করলে আযান ও ইকামত দেবে, যাতে কাজা নামাজ আদা নামাজের মতো হয়। আর ইচ্ছা করলে শুধু ইকামতের উপর নির্ভর করতে পারবে। কেননা আযান দেওয়া হয় মুসল্লিদের উপস্থিত করার জন্য। আর এখানে তারা উপস্থিত (আগে থেকেই) আছে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পরবর্তী নামাজসমূহের জন্য ইকামতই দেওয়া হবে। মাশায়েখ কিয়াসও বলেন যে এটা তাঁদের (আবূ হানীফা (র.) আবূ ইউসুফ (র.) এবং মুহাম্মদ (র) সর্বসম্মত মত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাজা নামাজের জন্যে আযান দেবে এবং ইকামত দিবে, চাই নামাজ একাকি পড়ুক বা জামাত বদ্ধী হয়ে পড়ুক। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে ইকামতই যথেষ্ট, আযানের প্রয়োজন নেই। আমাদের দলিল, রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার ঘটনা, একে লায়লাতুত্ তা'রীসের ঘটনা বলে। তারীস (تعريس) বলা হয় শেষ রাত্রে ঘুমানো। এ ঘটনা হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) ইমাম আবূ দাউদ (র.)-এর বরাত দিয়ে এ শব্দে নকল করেছেন।

اِنَّهُ ﷺ اَمَرَ بِلَالًا بِالْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ حِيْنَ نَامُوْا عَنِ الصُّبْحِ وَصَلُّوْهَا بَعْدَ اِرْتِفَاعِ الشَّمْسِ ـ

অর্থ-রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বিলাল (রা.)-কে আযান ও ইকামতের নির্দেশ দিয়েছেন। যখন সাহাবারা সকালের নামাজের সময়ে ঘুমিয়ে ছিলেন এবং সূর্য উদয় হবার পর তা কাজা করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম এ ঘটনা এভাবে নকল করেছেন।

عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَخَافُ اَنْ تَنَامُوْا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ اَنَا اُوْقِظُكُمْ فَاضْطَجَعُوْا وَاَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ اِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ اَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا اُلْقِيَتْ عَلَىَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَبَضَ اَرْوَاحَكُمْ حِيْنَ شَاءَ يَا بِلَالُ قُمْ فَاَذِّنْ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا اَرْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ قَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً ـ

উভয় রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ লাইলাতুত্ তারীসের সকালের নামাজ বেলা উদয় হবার পর আযান ও ইকামতের সাথে কাজা করেছেন। ইমাম শাফেঈ (র.) মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল দিয়েছেন। তা হচ্ছে أَمَرَ بِلَالًا فَاَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلّٰى بِهِمْ অর্থ– রাসূল ﷺ বিলাল (রা.)-কে ইকামত দিতে হুকুম দিলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ তাদের (সাহাবীদের)-কে নিয়ে নামাজ পড়লেন। এ হাদীসে আযানের কথার উল্লেখ নেই। অতএব বুঝা গেল যে, কাজা নামাজের জন্য ইকামতই যথেষ্ট। জবাব হলো, অন্যান্য সহীহ রেওয়ায়েতে আযানের কথার উল্লেখ আছে। অতএব যে রেওয়ায়েতে উভয়ের উল্লেখ আছে তার ওপর আমল করাই উত্তম। আমাদের মতের সমর্থন এ রেওয়ায়েত দ্বারাও হয় যে, খন্দকের যুদ্ধে যখন রাসূল ﷺ-এর নামাজ কাজা হলো, তখন রাসূল তা আযান ও ইকামতসহ আদায় করেছিলেন। অতএব এতগুলো হাদীস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতনৈক করা সমীচীন মনে হচ্ছে না।

فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ الخ : যদি কোনো ব্যক্তির কয়েক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়, তাহলে প্রথম নামাজের জন্য আযান দিবে এবং ইকামত বলবে। দলিল লায়লাতুত্ তারীসের হাদীস। অবশিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে তাকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, ইচ্ছা করলে আযান দেবে এবং এ ইকামতও বলবে, যাতে কাজাটা আদায় বা ওয়াক্তিয়ার মতো হয়ে যায়। ইবনে হুমাম (র.) কর্তৃক আবূ ইউসুফ (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়েত দ্বারা উহার সমর্থন হয়

اَنَّهٗ ﷺ حِيْنَ شَغَلَهُمُ الْكُفَّارُ يَوْمَ الْاَحْزَابِ عَنْ اَرْبَعِ صَلَوَاتٍ عَنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَضَاهُنَّ عَلَى الْوَلَاءِ وَاَمَرَ بِلَالًا اَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيْمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ـ

অর্থ– আহ্যাবের যুদ্ধের সময় কাফিররা রাসূল ﷺ -কে চার ওয়াক্ত নামাজ (জোহর, আসর, মাগরিব এবং ইশা) হতে বিরত রেখেছে। রাসূল ﷺ সেগুলো ক্রমান্বয়ে আদায় করেছেন। বিলাল (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, প্রত্যেক নামাজের জন্য আযান এবং ইকামত বলো। আর ইচ্ছা করলে শুধু ইকামতের ওপর যথেষ্ট করতে পারো। দলিল হলো যে, আযান দেওয়া হয় মানুষকে একত্রিত করার জন্য। এখানে সকলে উপস্থিত আছে বিধায় আযানের প্রয়োজন নেই। যাহিরুর রেওয়ায়েতের (ظاهر الرواية) বাহিরে ইমাম মুহাম্মদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যদি কতিপয় নামাজ কাজা হয় তাহলে প্রথম নামাজটি আযান এবং ইকামতের সথে আদায় করবে। অবশিষ্ট নামাজগুলো শুধু ইকামতের সাথে আদায় করবে। মাশাইখগণ বলেছেন, হতে পারে এটা ইমাম মুহাম্মদ (রা.) ইমাম আবূ ইউসুফ (রা.) এবং আবূ হানীফা (রা.) সকলের মত।

وَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلَى طُهْرٍ فَإِنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَازَ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ وَلَيْسَ بِصَلٰوةٍ فَكَانَ الْوُضُوءُ فِيهِ اِسْتِحْبَابًا كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ ـ وَيُكْرَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ وَيُرْوٰى أَنَّهُ لَاتُكْرَهُ الْإِقَامَةُ أَيْضًا لِأَنَّهُ اَحَدُ الْاَذَانَيْنِ وَيُرْوٰى أَنَّهُ يُكْرَهُ الْاَذَانُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَصِيرُ دَاعِيًا اِلَى مَا لَايُجِيبُ بِنَفْسِهٖ وَيُكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُبٌ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَ وَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ هُوَ أَنَّ لِلْاَذَانِ شِبْهًا بِالصَّلٰوةِ فَيُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ عَنْ اَغْلَظِ الْحَدَثَيْنِ دُوْنَ اَخَفِّهِمَا عَمَلًا بِالشِّبْهَيْنِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إِذَا أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَأَقَامَ لَايُعِيدُ وَالْجُنُبُ اَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ يُعِيدَ وَاِنْ لَّمْ يُعِدْ اَجْزَاهُ اَمَّا الْاَوَّلُ فَلِخِفَّةِ الْحَدَثِ وَاَمَّا الثَّانِي فَفِي الْاِعَادَةِ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ رِوَايَتَانِ وَالْاَشْبَهُ اَنْ يُّعَادَ الْاَذَانُ دُوْنَ الْاِقَامَةِ لِاَنَّ تَكْرَارَ الْاَذَانِ مَشْرُوْعٌ دُوْنَ الْاِقَامَةِ وَقَوْلُهُ اِنْ لَّمْ يُعِدْ اَجْزَاهُ يَعْنِي الصَّلٰوةَ لِاَنَّهَا جَائِزَةٌ بِدُوْنِ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ ـ

অনুবাদ ঃ পবিত্র অবস্থায় আযান ও ইকামত দেওয়া উচিত। তবে অজু ছাড়া আযান দিলে জায়েজ হবে। কেননা এটা (আল্লাহর) জিকির, নামাজ নয়। সুতরাং তাতে অজু মোস্তাহাব মাত্র। যেমন কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে। অজু ছাড়া ইকামত বলা মাকরূহ হবে। কেননা তাতে ইকামত ও নামাজের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি হয়।. অবশ্য বর্ণিত আছে যে, ইকামত মাকরূহ হবে না। কেননা এটাতো দু' আযানের মধ্য হতে একটি। অন্য এক রেওয়ায়েত মুতাবিক আযানও (অজু ছাড়া) মাকরূহ হবে। কেননা সেতো এমন বিষয়ের প্রতি আহবান জানাচ্ছে, যার প্রতি সে নিজেও সাড়া দেয়নি। জুনুবী অবস্থায় আযান দেওয়া মাকরূহ। এ সম্পর্কে মাত্র একটি বর্ণনা আছে। মুহ্‌দিছের আযান সম্পর্কীয় দু'টি রেওয়ায়েতের মধ্যে থেকে মাকরূহ না হওয়ার রেওয়ায়েতটির সাথে পার্থক্য হলো, নামাজের সাথে আযানের সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং উভয় সাদৃশ্যের উপর আমল হিসাবে দুই হদসের যেটি সবচেয়ে কাঠোর, তা থেকে পবিত্রতা অর্জনের শর্ত আরোপ করা হবে, যেটি হালকা তা থেকে পবিত্রতার শর্ত আরোপ করা হবে না। আল্‌ জামেউস সগীর নামক গ্রন্থে আছে অজু ছাড়া আযান ও ইকামত দিলে তা দোহরাতে হবে না আর জানাবাতের বেলায় দোহরানোই আমার নিকট অধিক প্রিয়। তবে না দোহরালেও চলে। প্রথমটির কারণ হাদাসের লঘুতা। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ জানাবাতের কারণে দোহরানের ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। তবে অধিতর যুক্তিপূর্ণ এটি যে, আযান দোহরানো উচিত। কিন্তু ইকামত দোহ্‌রাতে হবে না। কেননা পুনঃ আযান শরিয়ত অনুমোদিত। পুনঃ ইকামত অনুমদিত নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্যের অর্থ হলো নামাজ আদায় হয়ে যাবে। কেননা নামাজ তো আযান ও ইকামত ছাড়াও জায়েজ হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মোস্তাহাব হলো আযান ও ইকামত অজুর সাথে দেওয়া। কিন্তু যদি অজু ছাড়া আযান দেয় তাহলে যাহিরুর রেওয়ায়েত (ظاهر الروايت) অনুযায়ী আযান জায়েজ হবে। মাক্রূহ হবে না। দলিল, আযান আল্লাহর জিকির, নামাজ নয়। আল্লাহর জিকিরের জন্য অজু মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। অতএব আযানের জন্য অজু মোস্তাহাব হবে, যেমন- কুরআন তেলাওয়াতর জন্য অজু মোস্তাহাব। ইমাম গাযালী (র.)-এর মতে আযানের জন্য অজু শর্ত। ইমাম তিরমিযী (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ অজু ছাড়া আযান দেবে না। আমরা জবাব দেব যে, এখানে আমর (امر) টি ইসতেহবাব (استحباب)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَيُكْرَهُ أَنْ يُقِيْمَ الخ ঃ অজু ছাড়া ইকামত বলা মাকরূহ। কেননা এতে মুয়াজ্জিনের ইকামত ও নামাজের মধ্য ব্যবধান হয়ে যায়। অথচ ইকামত নামাজের সাথে আরম্ভ করা হয়েছে। ইমাম কারখী (র.)-এর বর্ণনা মুতাবিক তা মাকরূহ নয়। কেননা ইকামত দু' আযানের মধ্য হতে একটি। আযান অজু ছাড়া মাকরূহ নয়। অতএব ইকামতও মাকরূহ হবে না। কারখী (র.)-এর থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, আযান অজু ছাড়া মাকরূহ হবে। কেননা সে আযানের মাধ্যমে লোকদেরকে নামাজের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আহবান করছে। অথচ সে নিজে এর জন্য প্রস্তুতি নেয়নি। বিধায় তা এ আয়াতের আওতায় পড়বে أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ - এ জন্য বলা হয়েছে যে, অজু ছাড়া আযান মাকরূহ হবে।

وَيُكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الخ : জানাবাতের অবস্থায় আযান দেওয়া মাকরূহ। এ সম্পর্কে মাত্র একটি রেওয়ায়েত আছে। মাকরূহ না হওয়ার কোনো রেওয়ায়েত নেই। তবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অজু ছাড়া আযান দিলে, দুটি রিওয়ায়েত আছে, একটি মাক্রূহ হওয়ার, অপরটি মাকরূহ না হওয়ার। জুনুবীর আযান মাকরূহ হওয়ার রেওয়ায়েত এবং মুহদিছ ব্যক্তির আযান মাকরূহ না হওয়ার রিওয়ায়েতের মধ্যে পার্থক্যের কারণ হলো যে, আযান নামাজের সাদৃশ্য এদিক থেকে যে, উভয়টি তাক্বীরের মাধ্যমে আরম্ভ করা হয়। উভয়টি কেব্‌লার দিকে মুখ করে আদায় করা হয়। আযানের শব্দ নির্দিষ্ট যেমন নামাজের আরকান নির্দিষ্ট। উভয়টি সময়ের সাথে নির্দিষ্ট এবং উভয়টির মাঝে কথা বলা নিষেধ। উক্ত দিক থেকে আযান নামাজের মতো, তবে আযান প্রকৃতপক্ষে নামাজ নয়। মোটকথা আযান একদিক থেকে নামাজের সাদৃশ্য, অন্য দিক থেকে সাদৃশ্য নয়। যদি সাদৃশ্যতার দিক লক্ষ্য করা হয় তা হলে অজু ছাড়া আযান না জায়েজ হওয়া চাই। অনুরূপভাবে জানাবাতের অবস্থায়ও আযান না জায়েজ হওয়া চাই। পক্ষান্তরে যদি অসাদৃশ্যতার দিক লক্ষ্য করা হয় তাহলে উভয় (অজু ছাড়া এবং জানাবাত) অবস্থায় আযান কারাহাত (كراهت) ছাড়াই জায়েজ হওয়া চাই। আমরা উভয় সাদৃশ্যতার উপর আমল করেছি। জানাবাতের অবস্থায় নামাজের সাদৃশ্যতার ইতিবার (اعتبار) করে বলেছি যে, আযানের জন্য পবিত্রতা শর্ত। অতএব জানাবাতের অবস্থায় আযান দেওয়া মাকরূহ। এবং হদস (حدث) বা অজুবিহীন অবস্থায় নামাজের সাথে অসাদৃশ্যতার ইতিবার (اعتبار) করে আমরা বলেছি যে, আযানের জন্য তাহারাত (طهارت) শর্ত নয়। অতএব হদস বা অজু ছাড়া অবস্থায় আযান দেওয়া জায়েজ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) 'জামিউস্ সগীর' নামক গ্রন্থে বলেছেন, যদি অজু ছাড়া আযান ও ইকামত বলে, তাহলে আযান ও ইকামত দোহ্‌রাতে হবে না। তবে যদি জুনুবী ব্যক্তি আযান ও ইকামত বলে তাহলে আমার মতে উহা দোহ্‌রানো মোস্তাহাব। তাহাবী শরীফের ভাষ্যে উল্লেখ আছে যে, চার শ্রেণীর মানুষের আযান দোহ্‌রানো মোস্তাহাব, ১. জুনুবী ব্যক্তি, ২. মহিলা, ৩. (নিশা করে) মাতাল ৪. এবং ব্যক্তি পাগল। কিন্তু যদি জুনুবীর আযান ও ইকামত না দোহরায় তবুও যথেষ্ট হবে। সর্বাবস্থায় মুহ্‌দিস (محدث)-এর আযান ও ইকামত দোহরাবে না। কেননা হদস (حدث) হালকা নাপাক। তবে জুনুবীর আযান ও ইকামতের ক্ষেত্রে দু'টি রেওয়ায়েত আছে। ১. দোহরাবে ২. দোহরাবেনা। অধিক যুক্তি সঙ্গত হলো যে জুনুবীর আযান দোহ্‌রাবে, তবে ইকামত দোহরাবে না) কেননা পুনঃ আযান শরিয়ত অনুমোদিত, যেমন জুমার নামাজে দু'বার আযান দেওয়া হয়। কিন্তু পুনঃ ইকামত শরিয়তে অনুমোদিত নয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর বক্তব্য إِنْ لَمْ يُعِدْ أَجْزَأَهُ-এর উদ্দেশ্য হলো নামাজ জায়েজ হবে, কেননা আযান ইকামত ছাড়াও নামাজ জায়েজ হয়। অতএব দোহ্‌রানো ছাড়াই অনায়াসে জায়েজ হবে।

قَالَ وَكَذٰلِكَ الْمَرْأَةُ تُؤَذِّنُ مَعْنَاهُ يُسْتَحَبُّ اَنْ يُّعَادَ لِيَقَعَ عَلٰى وَجْهِ السُّنَّةِ وَلَا يُؤَذِّنُ لِصَلٰوةٍ قَبْلَ دُخُوْلِ وَقْتِهَا وَيُعَادُ فِى الْوَقْتِ لِاَنَّ الْاَذَانَ لِلْاِعْلَامِ وَقَبْلَ الْوَقْتِ تَجْهِيْلٌ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَجُوْزُ لِلْفَجْرِ فِى النِّصْفِ الْاَخِيْرِ مِنَ اللَّيْلِ لِتَوَارُثِ اَهْلِ الْحَرَمَيْنِ وَالْحُجَّةُ عَلَى الْكُلِّ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِبِلَالٍ (رضـ) لَا تُؤَذِّنْ حَتّٰى يَسْتَبِيْنَ لَكَ الْفَجْرُ هٰكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا وَالْمُسَافِرُ يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِاِبْنَىْ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اِذَا سَافَرْتُمَا فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا فَاِنْ تَرَكَهُمَا جَمِيْعًا يُكْرَهُ وَلَوِ اكْتَفٰى بِالْاِقَامَةِ جَازَ لِاَنَّ الْاَذَانَ لِاسْتِحْضَارِ الْغَائِبِيْنَ وَالرُّفْقَةُ حَاضِرُوْنَ وَالْاِقَامَةُ لِاِعْلَامِ الْاِفْتِتَاحِ وَهُمْ اِلَيْهِ مُحْتَاجُوْنَ فَاِنْ صَلّٰى فِىْ بَيْتِهٖ فِى الْمِصْرِ يُصَلِّىْ بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ لِيَكُوْنَ الْاَدَاءُ عَلٰى هَيْأَةِ الْجَمَاعَةِ وَاِنْ تَرَكَهُمَا جَازَ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَذَانُ الْحَىِّ يَكْفِيْنَا ـ

অনুবাদ ঃ গ্রন্থকার বলেন, স্ত্রীলোক যদি আযান দিয়ে থাকে তাহলেও এরূপ হুকুম হবে। অর্থাৎ তাহলে আযান দোহ্‌রানো মোস্তাহাব। যাতে আযান সুন্নত মুতাবিক হয়ে যায়। সময় হওয়ার পূর্বে কোনো নামাজের আযান দেওয়া বৈধ নয়, এরূপ করলে সময় হওয়ার পর পুনঃ আযান দিতে হবে। কেননা আযান দেওয়া হয় মানুষের অবগতির জন্য। অথচ পূর্বে হলে সেটা হবে মানুষকে অজ্ঞতায় ফেলার শামিল। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন এবং এটি ইমাম শাফেঈ (র.)-এর অভিমতও বটে যে, ফজরের ক্ষেত্রে রাত্রের শেষার্ধে আযান দেওয়া বৈধ। কেননা হারামাইন শরীফের অধিবাসীদের যুগ পরম্পরায় তা চলে আসছে। এ সকলের বিপক্ষে দলিল হলো হযরত বিলাল (রা.)-এর উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ-এর এ নির্দেশ, অর্থ-ফজর এরূপ ফরসা হওয়ার পূর্বে আযান দিবে না। একথা বলে তিনি উভয় হাত আড়াআড়িভাবে প্রসারিত করলেন। মুসাফির আযান ও ইকামত দেবে। কেননা রাসূল ﷺ আবূ মুলাইকার দুই পুত্রকে বলেছিলেন, اِذَا سَافَرْتُمَا فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا যখন তোমরা সফর করবে, তখন তোমাদের একজন আযান দেবে এবং ইকামত বলবে। যদি আযান ও ইকামত দু'টোই তরক করে, তাহলে তা মাকরূহ হবে। আর যদি শুধু ইকামত বলে, তাহলে তা জায়েজ হবে। কেননা (মূলত) আযান অনুপস্থিতদের উপস্থিত করার জন্য। অথচ সফরসঙ্গীরা তো উপস্থিতই আছে। পক্ষান্তরে ইকামত হলো নামাজ আরম্ভের ঘোষণার জন্য। আর উপস্থিতদের জন্য এর প্রয়োজন আছে। যদি নগরীতে স্বীয় গৃহে নামাজ আদায় করে, তাহলে আযান-ইকামত দিয়েই নামাজ আদায় করবে, যাতে জামাআতের নিয়ম অনুসারে নামাজ আদায় হয়। আর যদি তরক করে, তাহলেও তা জায়েজ আছে। কেননা ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, মহল্লার আযান আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জুনুবী ব্যক্তির আযান যেরূপ দোহ্‌রাতে হয় অনুরূপভাবে মহিলারা আযান দিলে তাও দোহ্‌রাতে হবে। কেননা আযান সুন্নত তরীকায় দেওয়া চাই, আর সুন্নত তরীকা হলো মুয়াজ্জিন পুরুষ হওয়া, মহিলার আযান দেওয়া সুন্নত নয় বরং বিদ্‌আত। কেননা যদি মহিলা উচ্চৈঃস্বরে আযান দেয় তাহলে সে হারাম কাজ করল। কেননা মহিলার ধ্বনিও সতরের অন্তর্ভুক্ত। মহিলাদের সতর

ঢাকার ন্যায় আওয়াজকে গায়রে মাহরামের নিকট প্রকাশ না করা ওয়াজিব। কেননা সে আযানের ধ্বনি বুলন্দ করলে আযানের উদ্দেশ্য ফউত হয়ে যাবে। এজন্য মহিলার আযান দোহরানো মোস্তাহাব। দ্বিতীয় কথা হলো, মহিলাদের জন্য আযান ও ইকামত নেই। কেননা এ দু'টি জামাআতের নামাজের জন্য সুন্নত। আর মহিলাদের জন্য জামাআতে যাওয়ার হুকুম মনসূখ (منسوخ) বা রহিত হয়ে গেছে। তবে যদি তারা জামাআতের সাথে নামাজ পড়তে চায় তাহলে আযান ও ইকামত ছাড়াই নামাজ পড়বে।

দলিল রায়েতা (رائطة)-এর হাদীস قَالَتْ كُنَّا جَمَاعَةً مِنَ النِّسَاءِ، أَمَّتْنَا عَائِشَةُ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ.
রায়েতা (রা.) বলেন, আমরা মহিলাদের জামাআত করেছি, হযরত আয়শা (রা.) আযান ও ইকামত ব্যতীত ইমামতি করেছেন।

নামাজের সময় দাখিল হওয়ার পূর্বে আযান দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন কেউ সময়ের পূর্বে আযান দিল তাহলে সময় আসলে পুনঃ আযান দিতে হবে। কেননা আযানের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে নামাজের সময় দাখিল হওয়ার সংবাদ দেওয়া। আর সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া মানুষকে অজ্ঞতার মধ্যে ফেলে দেওয়ার শামিল। তাই সময়ের পূর্বে আযান দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন, যা ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতও বটে যে, ফজরের ক্ষেত্রে রাতের শেষার্ধে আযান দেওয়া বৈধ। তাঁদের থেকে অন্য একটি রেওয়ায়ত আছে পূর্ণ রাত ফজরের আযানের সময়। তাঁদের দলিল হলো মক্কাবাসী ও মদীনাবাসীদের নিকট ইহা যুগ পরম্পরায় চলে আসছে, যে তাঁরা ফজরের জন্য রাতের শেষার্ধে আযান দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন

إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى تَسْمَعُوْا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ.

অর্থ– রাতে বিলাল (রা.) আযান দেন, তোমরা খাবার খাও এবং পান করো, ইব্‌নে উম্মে মাকতূমের আযান শ্রবণ করা পর্যন্ত। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, হযরত বিলাল (রা.) ফজরের পূর্বে রাতে আযান দিতেন। চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায়, এ হাদীস আমাদের দলিল। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল নয়। কেননা হযরত বিলাল (রা.)-এর আযান তাহাজ্জুদের নামাজ এবং সাহরী খাওয়ার জন্য ছিল, ফজরের নামাজের জন্য ছিল না। ফজরের নামাজের জন্য ছিল ইব্‌নে উম্মে মাকতূমের আযান। তিনি ফজরের নামাজের সময় দাখেল হওয়ার পর আযান দিতেন।

অন্যথা حَتّٰى تَسْمَعُوْا أَذَانَ ابْنِ مَكْتُوْمٍ ইব্‌নে উম্মে মাক্‌তূম (রা.)-এর আযান শ্রবণ করা পর্যন্ত-এর কোনো অর্থ হয় না। তাঁদের বিপক্ষে এ হাদীস আমাদের দলিল। রাসূল ﷺ হযরত বিলাল (রা.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন, আযান দিবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত সুব্‌হি সাদিক না হয়। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল ﷺ স্বীয় হস্তদ্বয় চওড়াভাবে প্রসারিত করে ইঙ্গিত করলেন, এ দ্বারা সুবহি সাদিক এর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। ইবনে আব্‌দিল বার ইব্রাহীম (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

قَالَ كَانُوْا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ قَالُوْا لَهُ اِتَّقِ اللّٰهَ وَ أَعِدْ أَذَانَكَ –

অর্থ-ইবরাহীম (র.) বলেন যে, সাহাবীদের এই রীতি ছিল যে, যখন মুয়াজ্জিন রাত্রে (সুবহি সাদিকের পূর্বে) আযান দিতেন, তখন সাহাবীরা তাকে বলতেন যে, আযানের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো এবং আযান দোহরিয়ে দাও।

প্রশ্ন ঃ হাদীসে আসছে لاَ يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ অর্থ– বিলালের আযান তোমাদেরকে যেন ধোঁকায় না ফেলে এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত বিলাল (রা.) সময়ের পূর্বে রাত্রে আযান দিতেন।

জবাব ঃ এ হাদীস আমাদের দলিল, কেননা রাসূল ﷺ বিলাল (রা.)-এর আযান গ্রহণযোগ্য মনে করেননি; বরং লোকদের ধোঁকা না খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং তা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

وَأَقِيْمَا فَإِنْ تَرَكَهُمَا الخ : মুসাফিরের জন্য আযান ও ইকামত বলা উচিত। দলিল রাসূল ﷺ আবূ মুলাইকার দুই পুত্রকে নির্দেশ দিয়েছে إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيْمَا অর্থ– যখন তোমরা সফর করবে তখন তোমাদের একজন আযান দেবে এবং ইকামত বলবে। নিহায়া গ্রন্থকার লিখেছেন যে, মব্‌সূত নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, রাসূল ﷺ এ হাদীসে আবূ মুলাইকার দু'পুত্র ব্যতীত অন্যকে সম্বোধন করে বলেছেন।

رُوِى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لِمَالِكِ ابْنِ الْحُوَيْرِثِ وَابْنِ عَمٍّ لَهُ إِذَا سَافَرْتُمَا فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْثَرُ كُمَا قُرْاٰنًا وَرَوٰى فَخْرُ الْاِسْلَامِ وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا سِنًّا

রাসূল ﷺ, মালিক ইবনে হুয়াইরিস এবং তার চাচাতো ভাইকে বললেন, যখন তোমরা সফর করবে তখন আযান দেবে এবং ইকামত দেবে। আর তোমাদের দু'জনের মধ্য হতে যে অধিক কুরআন পড়েছে সে ইমামতি করবে। ফখরুল ইসলাম (র.) বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে ইমামতি করবে। আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে আছে

يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِىْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّىْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ـ

অর্থ– তোমার প্রতিপালকের নিকট বকরির ঐ সব রাখালগণ প্রিয়। যারা পাহাড়ের চূড়ায় আযান দেয় এবং নামাজ আদায় করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার প্রতি নজর কর যে, সে আযান দেয় এবং নামাজের জন্য ইকামত দেয়, আমাকে ভয় করে আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করবো। হযরত সালমান ফার্সী (রা.) -এর সূত্রে বর্ণিত আছে,

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِاَرْضٍ فَلَاةٍ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ فَاِنْ اَقَامَ صَلّٰى مَعَهُ مَلَكَانِ وَاِنْ اَذَّنَ وَاَقَامَ صَلّٰى خَلْفَهُ مِنْ جُنُوْدِ اللّٰهِ مَالَايُرٰى طَرْفَاهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ) ـ

অর্থ-সালমান ফার্সী (র.)-এর সূত্রে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত আছে। যখন কোনো মানুষ ময়দানে একাকীভাবে থাকে অতঃপর যখন নামাজের সময় আসে, তখন সে যেন অজু করে। যদি পানি না পায়, তাহলে যেন তায়াম্মুম (تيمم) করে। অতঃপর সে যদি সে ইকামত বলে তাহলে দু' ফেরেশতা তার সাথে নামাজ পড়ে। আর যদি সে আযান দেয় এবং ইকামত বলে তাহলে তার পিছনে আল্লাহর সৈনিকদের বড় দল নামাজ পড়ে যার প্রান্তের দূরুত্বকে সে দেখতে সক্ষম হয় না। উক্ত হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা গেল যে, আযানের উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু নয় যে, মুয়াজ্জিন লোকদের উপস্থিত হওয়ার ঘোষণা দেবে; বরং এটাও উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর নাম এবং আল্লাহর দ্বীন জমিনে বুলন্দ হওয়া। তার পিছনে এবং ময়দানে জিন এবং ইনসানকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া– যাদেরকে মুয়াজ্জিন দেখতে সক্ষম হয় না।– (ফত্‌হুল কাদির) গ্রন্থকার বলেন যে, মুসাফির যদি আযান ও ইকামত উভয় ছেড়ে দেয়, তাহলে মাকরূহ হবে। কেননা এটা মালিক ইবনে হুয়াইরিস (রা.)-এর হাদীসের বিপরীত। আর যদি ইকামত বলে এবং আযান ছেড়ে দেয় তাহলে জায়েজ হবে। দলিল, আযানের উদ্দেশ্য হলো অনুপস্থিত লোকদেরকে নামাজের সময় উপস্থিত হওয়ার সংবাদ দেওয়া, যাতে তারা নামাজের তৈরি নিয়ে নামাজের জন্য আসতে পারে। যেহেতু সফরে সফরসঙ্গীরা সর্বদা উপস্থিত থাকে তাই এখানে আযানের বেশি প্রয়োজন নেই। ইকামত বলা হয় নামাজ আরম্ভের ঘোষণা দেওয়ার জন্য। আর উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্যও এর প্রয়োজন আছে। যদি নগরীতে স্বীয় গৃহে নামাজ পড়তে চায় তাহলেও আযান ও ইকামতের সাথে নামাজ পড়বে। চাই নামাজ একাকি পড়ুক বা জামাতের সাথে পড়ুক। যাতে নামাজ জামাআত অনুযায়ী আদায় হয়। পক্ষান্তরে যদি উভয়টা তরক করে তাহলেও জায়েজ আছে। দলিল, একদা আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ (রা.) আলকামা (রা.) এবং আস্‌ওয়াদ (রা.)-কে নিয়ে আযান এবং ইকামত ছাড়াই নামাজ পড়িয়েছেন। জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে প্রশ্ন করল যে, আপনি আযান ও ইকামতের মধ্য হতে কোনোটাই দিলেন না ব্যাপার কী? তখন তিনি বললেন, اَذَانُ الْحَيِّ يَكْفِيْنَا মহল্লার আযান আমাদের জন্য যথেষ্ট। এর কারণ হচ্ছে যে, মুয়াজ্জিন আযান ও ইকামতে মহল্লাবাসীর প্রতিনিধি হয়। কেননা মহল্লাবাসীরা তাঁকে এ কাজের জন্য নির্ধারণ করেছে। অতএব যে ব্যক্তি মহল্লার মধ্যে আযান এবং ইকামত ছাড়া নামাজ আদায় করবে, ধরে নেওয়া হবে যে, সে আযান ও ইকামতের সাথে নামাজ আদায় করেছে। তাই তার নামাজ মাকরূহ হবে না। পক্ষান্তরে যদি মুসাফির আযান ও ইকামত ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে আযান এবং ইকামত তরককারী হিসাবে জ্ঞান করা হয়। সে প্রকৃতপক্ষে জামাআত তরককারী এবং জামাআত তরককারীদের সাদৃশ্য পূর্ণ হলো। আর জামাআতের নামাজ তরক করা মাকরূহ। অনুরূপভাবে জামাআতের সাদৃশ্যতা বর্জন করাও মাকরূহ।

بَابُ شُرُوطِ الصَّلٰوةِ الَّتِىْ تَتَقَدَّمُهَا

يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّىْ اَنْ يُّقَدِّمَ الطَّهَارَةَ مِنَ الْاَحْدَاثِ وَالْاَنْجَاسِ عَلٰى مَاقَدَّمْنَاهُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ اَىْ مَايُوَارِىْ عَوْرَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاصَلٰوةَ لِحَائِضٍ اِلَّا بِخِمَارٍ اَىْ لِبَالِغَةٍ - وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَاتَحْتَ السُّرَّةِ اِلَى الرُّكْبَةِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَابَيْنَ سُرَّتِهٖ اِلٰى رُكْبَتِهٖ وَيُرْوٰى مَادُوْنَ سُرَّتِهٖ حَتّٰى تَجَاوَزَ رُكْبَتَهُ وَبِهٰذَا يَتَبَيَّنُ اَنَّ السُّرَّةَ لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ خِلَافًا لِمَا يَقُوْلُهُ الشَّافِعِىْ (رحـ) وَالرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ خِلَافًا لَهُ اَيْضًا وَكَلِمَةُ اِلٰى نَحْمِلُهَا عَلٰى كَلِمَةِ مَعَ عَمَلًا بِكَلِمَةِ حَتّٰى وَعَمَلًا بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ -

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নামাজের পূর্ববর্তী শর্তসমূহ

অনুবাদ ঃ মুসল্লির জন্য যাবতীয় হাদাস ও নাজাসাত বা নাপাকি থেকে পাক-পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব। সে পদ্ধতিতে, যা পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। মহান আল্লাহ বলেন, তুমি তোমার কাপড় পূর্ণ পাক রাখবে।—(সূরা মুদদাসসির ৪ আয়াত)। মহান আল্লাহ আরো বলেন, যদি তোমরা জুনুবী হও, তাহলে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। এবং সতর ঢাকবে। কেননা মাহান আল্লাহ বলেছেন, অর্থ– তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় এমন পোশাক পরিধান করবে যাতে তোমাদের সতর ঢাকে। রাসূল ﷺ বলেছেন, যার ঋতু হয়েছে এমন (বালেগা) নারীর নামাজ ওড়না ছাড়া সহীহ হবে না। পুরুষের সতর হলো নাভির নীচে থেকে হাঁটু পর্যন্ত। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, পুরুষের সতর হলো নাভির থেকে হাঁটু পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় আছে, তার নাভির নিচ থেকে তার হাঁটু অতিক্রম করে যাওয়া পর্যন্ত। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমাম শাফেঈ (র.) এ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন যে, হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে ও ইমাম শাফেঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। হাদীসের الى -কে আমরা مع (সহ)-এর অর্থে গ্রহণ করেছি। দ্বিতীয় হাদীসের حتى শব্দের উপর আমল করার এবং রাসূল ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীসের উপর আমল করার উদ্দেশ্যে, اَلرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : এখানে شروط (শরুতুন) শব্দটির আরো দু'টি বহুবচন ব্যবহার হয়, একটি شرائط (শরাইত) অপরটি اشراط (আশরাতুন)। সাধারণ গ্রন্থসমূহে شروط (শরূতুন) ব্যবহার হয়েছে। شروط শব্দটি শারতুন (شرط) -এর বহুবচন। শরতুনের রা (ر) সাকিন হবে। এর আভিধানিক অর্থ-আলামত বা চিহ্ন। পরিভাষায় ঐ বস্তু যার উপর অন্য জিনিসের অস্তিত্ব

নির্ভর করে। তবে তা অন্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। নামাজের শর্ত তিন প্রকারঃ এক. شرط انعقاد বা সংঘটিত হওয়ার শর্ত যেমন নিয়ত, তাহরীমা, সময়, জুমার খুতবা। দুই. شرط دوام বা সর্বাক্ষণিক শর্ত। যেমন- পবিত্রতা, সতর ঢাকা, কেবলামুখী হওয়া। তিন. شرط بقاء বা (নামাজ) বিদ্যমান থাকার শর্ত। যেমন- কিরাআত (কিফায়া)। পূর্বে নামাজের সবব (سبب) অর্থাৎ সময়ের আলোচনা হয়েছে। অতঃপর সময়ের আলামত অর্থাৎ আযানের আলোচনা হয়েছে। এখানে নামাজের পূর্ববর্তী শর্ত সম্পর্কে আলোচনা হবে।

এখানে ওয়াজিব শব্দটি ফরজের অর্থে ধর্তব্য হবে। নামাজি ব্যক্তির জন্য নামাজের পূর্বে যাবতীয় নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করা ফরজ। দলিল وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ দ্বিতীয় শর্ত হলো সতর ঢাকা। অর্থাৎ এ পরিমাণ শরীর ঢাকা শর্ত যা খুলে রাখা নিন্দনীয় বা দূষণীয় এবং লজ্জাহীনতার মধ্যে গণ্য। এটা আমাদের এবং ইমাম শাফেঈ (র.) ইমাম আহমদ (র.) এবং অধিকাংশ ফকীহগণের মতে শর্ত। দলিল خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ এ আয়াতে زينت (যীনাতুন) দ্বারা সতর ঢাকা বুঝানো হয়েছে এবং মসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য নামাজ। অতএব আয়াতের মর্ম দাঁড়াবে যে, নামাজের মধ্যে সতর ঢাকা ফরজ। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফকারীদের সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। নামাজ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়নি। অতএব এ আয়াত দ্বারা সতর ঢাকার ফরজ কিভাবে সাবিত হবে?

জবাব ঃ শব্দের ব্যাপকতা ধরা হবে, আয়াতকে শানে নুযূলের সঙ্গে নাম করা যাবে না। عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ-এর মর্ম ব্যাপক ধরা হবে। এ হুকুম মসজিদে হারামের সঙ্গে নির্দিষ্ট থাকবে না। দ্বিতীয় দলিল রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ বয়ঃপ্রাপ্তা মহিলার নামাজ ওড়না ছাড়া আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না।

প্রশ্ন ঃ হিদায়ার গ্রন্থকার সতর ফরজ হওয়ার পক্ষে যে আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করেছেন তা দ্বারা ফরজ সাবিত হয় না। কেননা خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ আয়াতটি দ্বারা তাওয়াফের ক্ষেত্রে সতর ঢাকা ওয়াজিব সাবিত করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে যে, উলঙ্গ তওয়াফ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও সে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে যদি তা নামাজের ক্ষেত্রে ফরজ হওয়া বুঝায় তাহলে خذوا শব্দটি ওয়াজিব ও ফরজ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হবে। এটা জায়েজ নেই। কেননা তা দ্বারা হাকীকত (حقيقت) এবং মাজায (مجاز) একত্রিত হওয়া লাযিম আসতেছে যা জায়েজ নেই। সর্বোপরি উক্ত হাদীস হচ্ছে খবরে ওয়াহিদ (خبر واحد)। আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ফরজ সাবিত হয় না। সুতরাং তা দ্বারা ফরজ সাবিত হবে না।

জবাব ঃ আয়াতটি যদিও قطعى الدلالة নয়; কিন্তু قطعى الثبوت অবশ্যই। আর হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ হওয়ার কারণে যদিও ظنى الثبوت তবে اداة حصر-এর কারণে قطعى الثبوت তা হয়ে গেছে। অতএব উভয়ের সমন্বয়ে ফরজ সাবিত হবে।

وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا تَحْتَ الخ **ঃ** এ ইবারতে পুরুষের সতরের সীমা বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের তিন ইমামের নিকট পুরুষের সতর নাভির নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত। নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মত এর বিপরীত অর্থাৎ নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত তবে হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের দলিল রাসূল ﷺ -এর বাণী عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلٰى رُكْبَتِهِ অন্য বর্ণনায় আছে مَادُوْنَ سُرَّتِهِ حَتّٰى تَجَاوَزَ رُكْبَتَهُ সতর তার নাভির নিচ থেকে তার হাঁটু অতিক্রম করে যাওয়া পর্যন্ত। উক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, প্রথম বর্ণনায় الى শব্দটি غايت-এর জন্য এবং مُغَيًّا টি غايت-এর মধ্যে দাখিল হয়না। অতএব হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত হবে না। **জবাব ঃ** আমরা الى শব্দটিকে مع (সহ)-এর অর্থে গ্রহণ করব। এর দলিল হলো وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَهُمْ إِلٰى أَمْوَالِكُمْ শব্দটি مع-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার আলামত হলো এ হাদীস حَتّٰى تَجَاوَزَ رُكْبَتَهُ তার হাঁটু অতিক্রম করে যাওয়া পর্যন্ত। রাসূল ﷺ অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, اَلرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। মোট কথা উক্ত তিনটি রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় হতে পারে যদি الى শব্দকে مع-এর অর্থে ধরা হয়।

وَبَدَنُ الْحُرَّةِ كُلُّهَا عَوْرَةٌ اِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُوْرَةٌ وَاِسْتِثْنَاءُ الْعُضْوَيْنِ لِلْاِبْتِلَاءِ بِاِبْدَائِهِمَا قَالَ وَهٰذَا تَنْصِيْصٌ عَلٰى اَنَّ الْقَدَمَ عَوْرَةٌ وَيُرْوٰى اَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَهُوَ الْاَصَحُّ فَاِنْ صَلَّتْ وَرُبُعُ سَاقِهَا مَكْشُوْفٌ اَوْثُلُثُهَا تُعِيْدُ الصَّلٰوةَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) وَاِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ لَاتُعِيْدُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) لَاتُعِيْدُ اِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ لِاَنَّ الشَّيْئَ اِنَّمَا يُوْصَفُ بِالْكَثْرَةِ اِذَا كَانَ مَايُقَابِلُهُ اَقَلَّ مِنْهُ اِذْ هُمَا اَسْمَاءُ الْمُقَابَلَةِ وَفِى النِّصْفِ عَنْهُ رِوَايَتَانِ فَاعْتَبَرَ الْخُرُوْجَ عَنْ حَدِّ الْقِلَّةِ اَوْعَدَمِ الدُّخُوْلِ فِىْ ضِدِّهِ وَلَهُمَا اَنَّ الرُّبُعَ يَحْكِىْ حِكَايَةَ الْكَمَالِ كَمَا فِىْ مَسْحِ الرَّأْسِ وَالْحَلْقِ فِى الْاِحْرَامِ وَمَنْ رَأٰى وَجْهَ غَيْرِهٖ يُخْبِرُ عَنْ رُؤْيَتِهٖ وَاِنْ لَمْ يَرَ اِلَّا اَحَدَ جَوَانِبِهِ الْاَرْبَعَةِ ـ

অনুবাদ ঃ স্বাধীন নারীর মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের কব্জি ছাড়া সমস্ত শরীর সতর। কেনননা রাসূল ﷺ বলেছেন, স্ত্রীলোক আওরত, যা ঢেকে রাখা কর্তব্য। দু'টি অঙ্গকে ব্যতিক্রম করার কারণ হলো তা প্রকাশ করা অনিবার্য। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ ব্যতিক্রম স্পষ্ট নির্দেশ করে যে, পায়ের পাতা সতর। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তা সতর নয়। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। যদি কোনো মহিলা পায়ের গোছার এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ খোলা অবস্থায় নামাজ আদায় করে তাহলে সে তার নামাজ দোহরাবে। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। আর যদি তা এক-চতুর্থাংশের কম হয়, তাহলে নামাজ দোহরাবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, যে অর্ধেকের কম হলে দোহরাবে না। যেহেতু কোনো কিছুকে তখনই অধিক বলে আখ্যায়িত করা হয়, যখন তার বিপরীত বস্তুটি পরিমাণে তার চেয়ে কম হয়। কেননা কমবেশি শব্দ দু'টি তুলনামূলক। অর্ধেক সম্পর্কে তাঁর (আবূ ইউসুফ (র.) থেকে দু'টি বর্ণনা আছে এক বর্ণনায় কম এর গণ্ডি বহির্ভূত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। অপর বর্ণনায় বেশি এর গণ্ডিভুক্ত না হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর যুক্তি হলো- চতুর্থাংশ সম্পূর্ণের স্থলবর্তী হয়ে থাকে যেমন মাথা মাসাহের ক্ষেত্রে এবং ইহরাম অবস্থায় মাথা মুড়ানোর ক্ষেত্রে এবং যে ব্যক্তি কারো কারো চেহারা দেখেছে সেই ব্যক্তিকে দেখেছে বলে খবর দেয়। যদিও সে উক্ত ব্যক্তির চার পাশের এক পাশ মাত্র দেখেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

স্বাধীন মহিলার পূর্ণ শরীর সতর। তবে মুখমণ্ডল এবং হাতের কবজি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। দলিল, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে اِنَّهُ ﷺ قَالَ اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ মহিলা আওরত, তা ঢেকে রাখা কর্তব্য। যখন সে ঘর থেকে বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে দেখে। হিদায়ার গ্রন্থকার এ হাদীসকে এ শব্দে বর্ণনা করেছেন যে, اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُوْرَةٌ। মাওলানা আব্দুল হাই (র.) বলেন যে, مستورة শব্দ আমি কোনো রিওয়ায়েতে পাইনি। কেউ কেউ উক্ত রেওয়ায়েতের মর্ম বর্ণনা করেছেন যে, মহিলার দায়িত্ব হলো নিজেকে ঢেকে রাখা। মুখমণ্ডল এবং হাতের কবজি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এ দুটি অঙ্গ সাধারণভাবে বিভিন্ন কাজের জন্য বের করার প্রয়োজন। ঐ দু'টি অঙ্গ ছাড়া কাজকাম লেনদেন করা সম্ভব নয়। তার সমর্থন আবূ দাউদে বর্ণিত মুরসাল হাদীসে পাওয়া যায়। اِنَّ الْجَارِيَةَ

إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا وَجْهُهَا وَيَدَاهَا إِلَى الْمَفْصَلِ কোনো মেয়ে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন তাকে দেখা জায়েজ নেই। কিন্তু মুখমণ্ডল এবং হাত কবজি পর্যন্ত দেখা জায়েজ। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মতনের দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, মহিলার পাও সতরের অন্তর্ভুক্ত। কেননা পূর্ণ শরীরের মধ্য হতে শুধু মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জিকে ইসতেস্না (استثناء) করেছে। ইমাম হাসান (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, দু'পাও সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটিই বিশুদ্ধ মত, ইমাম কারখী উহার প্রবক্তা। বিশুদ্ধ মতটির দলিল, মহিলার পা দেখে তেমন খাহেশ সৃষ্টি হয় না যেমনটা তার চেহারা দেখে সৃষ্টি হয়। চেহারার প্রতি অধিক খাহেশ থাকা সত্ত্বেও যেহেতু তা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব পাও সতরের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ফায়েদা ঃ মুখমণ্ডল সতর হওয়া এবং ইহা দেখা বৈধতা হওয়ার মাঝে কোনো বৈপরীত্ব নেই। কেননা দৃষ্টি করার বৈধতা খাহিশের আশঙ্কা না থাকার সাথে সম্পর্কিত। এ কারণে মহিলার চেহারা এবং নাবালিগ ছেলের চেহারা দেখা হারাম। অথচ তা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তাতে খাহিশের সম্ভাবনা অধিক শক্তিশালী।

فَإِنْ صَلَّتْ وَرُبُعُ سَاقِهَا الخ : ইবারাতে ربع বা চতুর্থাংশের উল্লেখ করার পর ثلث বা তৃতীয়াংশের উল্লেখ অনর্থক। **জবাব ঃ** ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কিতাবে লিপিকারের ভুলের কারণে ثلث শব্দটি উল্লেখ হয়েছে। এ কারণে আল্লামা ফখরুল ইসলাম (র.) এবং অধিকাংশ মাশাইখে কিয়াস (ثلث) উল্লেখ করেননি। দ্বিতীয় জবাব হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর শিষ্যদের মধ্য হতে কোনো বর্ণনাকারীর সন্দেহ হয়েছে যে, তিনি ربع বলেছেন অথবা ثلث বলেছেন, তাই এভাবে বিষয়টিকে উল্লেখ করা হয়েছে। সারকথা হলো যে, যদি স্বাধীন মহিলা পায়ের গোছার এক-চতুর্থাংশ খোলা অবস্থায় নামাজ পড়ে তাহলে তার নামাজ পুনঃ পড়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যদি এক-চতুর্থাংশের থেকে কম খোলে যায় তাহলে নামাজ পুনঃ আদায় করা ওয়াজিব নয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ-এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত হলো যে, যদি অর্ধেকের কম খুলে যায় তাহলে নামাজ পুনঃ আদায় করা ওয়াজিব নয়। যদি পায়ের পাতা অর্ধেক খোলে যায় তাহলে তার থেকে দু'টি মত রয়েছে। প্রথম মতানুসারে এমতাবস্থায় নামাজ দোহরানো ওয়াজিব নয়, আর দ্বিতীয় মত হলো নামাজ পুনঃ আদায় করা ওয়াজিব। সারকথা হলো আমাদের আলিমগণ এ কথায় একমত যে, কোনো অঙ্গের কম অংশ খুললে তা মাফ। পক্ষান্তরে কোনো অঙ্গের অধিকাংশ খুলে গেলে তা মাফ নয়। তবে কম ও বেশির সীমানা বা পরিমাণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে কোনো অঙ্গের এক-চতুর্থাংশ বেশি। আর তা থেকে কম হলে, তা কালীল (قليل) বা কম গণ্য হবে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে অর্ধেকের কম হলে কালীল (قليل) বা কম ধরা হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো– কোনো বস্তুকে তখনই অধিক বলে আখ্যায়িত করা হয় যখন তার বিপরীত বস্তুটি পরিমাণে তার চেয়ে কম হয়। কেননা কমও বেশির মধ্যে تقابل تضايف-এর সম্পর্ক বা কম ও বেশি শব্দ দু'টি তুলনামূলক শব্দ। অতএব অর্ধেকের কম হলে তাকে কালীল বা কম ধরা হবে। কাজেই কোনো অঙ্গের অর্ধেকের কম খুলে গেলে, নামাজ দোহ্রানো ওয়াজিব হবে না। যদি পায়ের গোছার অর্ধেকের কম খুলে যায় তাহলে নামাজ দোহরানো ওয়াজিব নয়। অর্ধেক খুলে যাওয়ার অবস্থায় উভয় মতের দলিল হলো–অর্ধেক কমের গণ্ডি বহির্ভূত এবং এর বিপরীতের অংশ উহার থেকে অধিক নয় বিধায় তা বেশির গণ্ডিভুক্ত হবে। যেহেতু বেশির ভাগ অংশ খুলে গেলে নামাজ দোহরানো ওয়াজিব হয় তাই এমতাবস্থায় (অর্ধেক খোলে গেলে) নামাজ দোহরানো ওয়াজিব হবে।

প্রশ্ন ঃ অর্ধেক কমের বিপরীত বটে, কিন্তু বেশির গণ্ডিভুক্ত নয়। কেননা তার মোকাবেলায় অন্য অর্ধেক (نصف اخر) বিদ্যমান যা এর থেকে কম নয়। অতএব অর্ধেক বেশির গণ্ডিভুক্ত হবে না। বিধায় তা কমের গণ্ডিভুক্ত হবে। আর অর্ধেকের কম খুলে গেলে নামাজ দোহ্রানো ওয়াজিব হয় না। অতএব এমতাবস্থায় (অর্ধেক খুলে গেলে) নামাজ দোহরানো ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল বিভিন্ন আহকাম এবং বাক্যের ব্যবহারে এক চতুর্থাংশকে পূর্ণাংশের স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়, যেমন মাথা মাসাহ করার ক্ষেত্রে এক চতুর্থাংশকে পূর্ণ মাথার হুকুমে ধরা হয়। অনুরূপভাবে যদি ইহ্রাম অবস্থায় মাথা নেড়ে করে তাহলে কুরবানি ওয়াজিব হবে। আর যদি মাথার এক চুতর্থাংশ নেড়ে করে তা হলেও কুরবানী ওয়াজিব হয়। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মাথার এক-চতুর্থাংশ পূর্ণ মাথার স্থলাভিষিক্ত। পরিভাষারও একই অবস্থা যেমন কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ব্যক্তির চার দিক হতে শুধু এক দিক দেখে বলে যে আমি তাকে দেখেছি তখন এ কথাকে সহীহ্ মনে করা হয়। অতএব যখন এক-চতুর্থাংশকে পূর্ণ অঙ্গের হুকুমে ধরা হয়, তাহলে পায়ের গোছার এক-চতুর্থাংশ খুলে গেলে মনে করা হবে যে পায়ের পূর্ণ গোছা খুলে গেছে। আর পায়ের পূর্ণ গোছা খুলে গেলে নামাজ দোহরানো ওয়াজিব হয়। বিধায় এক চতুর্থাংশ খুলে গেলেও নামাজ দোহ্রানো ওয়াজিব হবে।

وَالشَّعْرُ وَالْبَطْنُ وَالْفَخِذُ كَذٰلِكَ يَعْنِىْ عَلٰى هٰذَا الْاِخْتِلَافِ لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ عُضْوٌ عَلٰى حِدَةٍ وَالْمُرَادُ بِهِ النَّازِلُ مِنَ الرَّأْسِ هُوَ الصَّحِيْحُ وَاِنَّمَا وُضِعَ غَسْلُهُ فِى الْجَنَابَةِ لِمَكَانِ الْحَرَجِ وَالْعَوْرَةُ الْغَلِيْظَةُ عَلٰى هٰذَا الْاِخْتِلَافِ وَالذَّكَرُ يُعْتَبَرُ بِانْفِرَادِهٖ وَكَذَا الْاُنْثَيَانِ وَهٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ دُوْنَ الضَّمِّ ـ

অনুবাদ ঃ চুল, পেট ও উরুও অনুরূপ অর্থাৎ এতেও উক্ত মতভেদ রয়েছে। কেননা প্রতিটি আলাদা অঙ্গ। চুল দ্বারা এখানে মাথা থেকে ঝুলে থাকা অংশ উদ্দেশ্য। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। তবে জানাবাতের গোসলে এটা ধোয়া মাফ। মাফ হওয়ার কারণ হলো কষ্ট হওয়া। লজ্জাস্থান দু'টিতেও অনুরূপ বিরোধ রয়েছে অবশ্য পুরুষ লিঙ্গকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়। তদ্রূপ অণ্ডকোষ দু'টিও আলাদা ভাবে বিবেচ্য হবে। উভয়টিকে এক গণ্য করা হবে না। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

চুল, পেট এবং উরুর হুকুমও অনুরূপই। অর্থাৎ, এখানেও পূর্বের ন্যায় মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যদি এক-চতুর্থাংশ খুলে যায় তাহলে নামাজ জায়েজ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বর্ণনা মুতাবিক অর্ধেক খুলে গেলে নামাজ জায়েজ হবে না। আর অর্ধেকের বেশি খুলে গেলে সর্বসম্মতিক্রমে নামাজ জায়েজ হবে না। দলিল, ওগুলোর প্রত্যেকটি আলাদা অঙ্গ। অতএব পায়ের গোছার ন্যায় প্রত্যেকটির মধ্যে মতানৈক্য হবে। চুল দ্বারা এখানে মাথা থেকে ঝুলে থাকা অংশ উদ্দেশ্য। এটিই বিশুদ্ধ মত। যে চুল মাথার সঙ্গে মিলিত তা উদ্দেশ্য নয় বরং তা সতরের অন্তর্ভুক্ত।

اِنَّمَا وُضِعَ غَسْلُهُ الخ দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। যদি মাথা থেকে ঝুলে থাকা চুল সতর হয় তাহলে তা তার শরীর হওয়ার কারণে সতর হবে। অথচ বিষয়টি এমন নয়। কেননা জানাবাতের গোসলে তা ধৌত করা জরুরি নয়। অথচ জানাবাতের গোসলে শরীরের প্রত্যেকটি অংশ ধৌত করা আবশ্যক। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মাথা থেকে ঝুলে থাকা চুল সতরের অঙ্গ নয়। অর্থাৎ চুল যেহেতু শরীর নয় তাই তা সতরও নয়।

জবাব ঃ জানাবাতের গোসলে মাথা থেকে ঝুলে থাকা চুল ধৌত করা জরুরি নয়। তা এ কারণে নয় যে, সেটা তার শরীরের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তা তার শরীরের অংশ সৃষ্টিগতভাবে। কেননা তা তার শরীরের সাথেই সংযুক্ত। তবে জানাবাতের গোসলে কষ্টের কারণে তা ধোয়া মাফ।

খাছ সতর যেমন পুরুষাঙ্গ, মহিলার লজ্জাস্থান এবং পুরুষ ও মহিলার নিতম্বের ক্ষেত্রেও অনুরূপ মতানৈক্য বিদ্যমান আছে অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এক-চতুর্থাংশ খোলে গেলে নামাজ দোহ্রানো ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে নামাজ দোহ্রানো ওয়াজিব নয়। হিদায়ার গ্রন্থকার বলেন যে, (ذكر) বা পুরুষাঙ্গ একটি স্বতন্ত্র অঙ্গ এবং তদ্রূপ দু'টি অণ্ডকোষ ও দু'টি আলাদা অঙ্গ। এগুলোর মধ্য হতে কোনো একটির এক-চতুর্থাংশ খোলে গেলে নামাজ দোহ্রানো ওয়াজিব হবে। দু'টি মিলে একটি অঙ্গ নয়, এটিই বিশুদ্ধ মত। কারো কারো মতে দু'অণ্ডকোষ এবং পুরুষাঙ্গ মিলে একটি অঙ্গ। কেননা অণ্ডকোষ দু'টি পুরুষঙ্গের তাবে, বিধায় এসবগুলোর সমষ্টির এক-চতুর্থাংশ খোলে গেলে নামাজ দোহরাতে হবে। ফায়দা এই ব্যাখ্যা আমাদের মতে। শাফেঈ (র.)-এর মতে নয়।

وَمَا كَانَ عَوْرَةً مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ عَوْرَةٌ مِنَ الْاَمَةِ وَبَطْنُهَا وَظَهْرُهَا عَوْرَةٌ وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنْ بَدَنِهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ لِقَوْلِ عُمَرَ (رض) اَلْقِ عَنْكِ الْخِمَارَ يَا دِفَارُ اَتَتَشَبَّهِيْنَ بِالْحَرَائِرِ وَلِاَنَّهَا تَخْرُجُ لِحَاجَةِ مَوْلَاهَا فِىْ ثِيَابِ مِهْنَتِهَا عَادَةً فَاعْتُبِرَ حَالُهَا بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فِىْ حَقِّ جَمِيْعِ الرِّجَالِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ ـ قَالَ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يُزِيْلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلّٰى مَعَهَا وَلَمْ يُعِدْ وَهٰذَا عَلٰى وَجْهَيْنِ اِنْ كَانَ رُبْعُ الثَّوْبِ اَوْ اَكْثَرُ مِنْهُ طَاهِرًا يُصَلِّىْ فِيْهِ وَلَوْ صَلّٰى عُرْيَانًا لَا يُجْزِئُهُ لِاَنَّ رُبْعَ الشَّئِ يَقُوْمُ مَقَامَ كُلِّهِ وَاِنْ كَانَ الطَّاهِرُ اَقَلَّ مِنَ الرُّبْعِ فَكَذٰلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَهُوَ اَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِىْ (رحـ) لِاَنَّ فِى الصَّلٰوةِ فِيْهِ تَرْكُ فَرْضٍ وَاحِدٍ وَفِى الصَّلٰوةِ عُرْيَانًا تَرْكُ الْفُرُوْضِ وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) يَتَخَيَّرُ بَيْنَ اَنْ يُصَلِّىَ عُرْيَانًا وَبَيْنَ اَنْ يُصَلِّىَ فِيْهِ وَهُوَ الْاَفْضَلُ لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَانِعٌ جَوَازَ الصَّلٰوةِ حَالَةَ الْاِخْتِيَارِ وَيَسْتَوِيَانِ فِىْ حَقِّ الْمِقْدَارِ فَيَسْتَوِيَانِ فِىْ حُكْمِ الصَّلٰوةِ وَتَرْكُ الشَّئِ اِلٰى خَلَفٍ لَا يَكُوْنُ تَرْكًا وَالْاَفْضَلِيَّةُ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ السَّتْرِ بِالصَّلٰوةِ وَاخْتِصَاصُ الطَّهَارَةِ بِهَا ـ

অনুবাদ ঃ পুরুষের যতটুকু অংশ সতর, দাসীরও তাই সতর। তার পেট এবং পিঠও সতর। এ ছাড়া তাঁর শরীরের অন্যান্য অঙ্গ সতর নয়। কেননা হযরত ওমর (রা.) জনৈকা দাসীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, এই মেয়ে? মাথা থেকে ওড়না সরিয়ে নে। স্বাধীন মহিলার মতো হতে চাস বুঝি। তাছাড়া তাকে তার মনিবের প্রয়োজনে কাজের পোশাকে বাহিরে বের হতে হয়। সুতরাং অসুবিধা লাঘবের উদ্দেশ্যে সকল পুরুষের ক্ষেত্রে তাকে মাহরামের ন্যায় গণ্য করা হবে। যদি নাজাসাত দূর করার মতো কিছু না পায়, তাহলে তা সহই নামাজ আদায় করবে। এবং নামাজ দোহ্রাতে হবে না। এর দুই সূরত– যদি কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ বা তার চাইতে বেশি অংশ পাক হয়, তাহলে ঐ কাপড় পড়েই নামাজ আদায় করবে। যদি বিবস্ত্র হয়ে নামাজ আদায় করে তাহলে জায়েজ হবে না। কেননা এক-চতুর্থাংশ পূর্ণ বস্তুর স্থলবর্তী হয়। যদি এক-চতুর্থাংশের কম পাক হয় তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একই হুকুম (তা সহই নামাজ পড়বে)। আর এটা ইমাম শাফেঈ (র.)-এরও দু'টি মতের একটি। কেননা ঐ কাপড়ে নামাজ আদায়ে একটি ফরজ তরক হয়, আর উলঙ্গ হয়ে নামাজ পড়লে একাধিক ফরজ তরক হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তার ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে উলঙ্গ অবস্থায় নামাজ আদায় করতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে নাপাক কাপড় পরেও নামাজ আদায় করতে পারবে। তবে দ্বিতীয়টাই উত্তম। কেননা সক্ষম অবস্থায় উভয়টি নামাজের প্রতিবন্ধক। এবং মা'ফ হওয়ার পরিমাণের ক্ষেত্রে দু'টোই সমান। সুতরাং সালাতের হুকুমেও দু'টোই সমান। তা ছাড়া কোনো কিছু কে স্থলবর্তী রেখে তরক করলে তাকে তরক হিসাবে গণ্য করা হয় না। (কাপড় পরে নামাজ আদায় করা) উত্তম হওয়ার কারণ হলো, সতর নামাজের সাথে নির্দিষ্ট নয়। পক্ষান্তরে তাহারাত নামাজের সাথে নির্দিষ্ট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এই ইবারতে দাসীর সতর বর্ণনা করা হয়েছে। পুরুষের যেরূপ নাভির নিচ হতে হাঁটু পর্যন্ত সতর অনুরূপ দাসীরও। তা ছাড়া দাসীর পেট এবং পিঠও সতর। কেননা এ দু'টি খাহিশ সৃষ্টিকারী স্থান বিধায় এগুলো ঢেকে রাখা ফরজ। অবশ্য এ দু'টি অংশ ছাড়া তার শরীর সতর নয়। দলিল, হযরত ওমর (রা.) ওড়না পরিহিতা এক দাসীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে মেয়ে! মাথা থেকে ওড়না সরিয়ে নাও। তুমি কি স্বাধীন মহিলাদের মতো হতে চাও। অন্য একটি রেওয়ায়েতের শব্দ এই اِكْشِفِيْ رَأْسَكِ وَلَا تَتَشَبَّهِيْ بِالْحَرَائِرِ অর্থ- তোমার মাথা খোলে দাও, স্বাধীন মহিলার মতো হয়ো না। দ্বিতীয় দলিল, সাধারণ রীতি-নীতি হলো যে দাসীকে স্বীয় মনিবের প্রয়োজনে কাজের পোশাকে বের হতে হয়। সুতরাং অসুবিধা লাঘবের উদ্দেশ্যে অন্যান্য পুরুষের ক্ষেত্রে তাকে মাহরামের ন্যায় গণ্য করা হবে। অর্থাৎ দাসী পর্দার ব্যাপারে পুরুষদের ক্ষেত্রে মাহরামের ন্যায় হবে। মায়ের নিজ ছেলের সাথে যে পরিমাণ পর্দা করা ওয়াজিব এবং বোনের নিজ ভায়ের সাথে যে পরিমাণ পর্দা করা ওয়াজিব ঐ পরিমাণ পর্দা প্রত্যেক পুরুষের জন্য দাসীর সাথে করা ওয়াজিব।

قَالَ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ الخ ঃ যদি কোনো ব্যক্তির নিকট নাপাক কাপড় ব্যতীত অন্য কাপড় না থাকে এবং এমন কোনো বস্তুও নেই যার দ্বারা নাপাকী দূর করা যায়, তাহলে ঐ নাপাক কাপড় পড়ে নামাজ পড়বে। ঐ নামাজকে আর দোহরাতে হবে না। এ মাস্‌আলাটির দু'টো সূরত- এক. যদি এক চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশি অংশ পাক হয়, তাহলে ঐ কাপড় পরে নামাজ পড়বে। উলঙ্গ হয়ে নামাজ পড়লে, জায়েজ হবে না। কেননা এক-চতুর্থাংশ পূর্ণ বস্তুর স্থলবর্তী হয়। অতএব এক-চতুর্থাংশ পাক হলে সম্পূর্ণ পাক হওয়া ধরা হবে। আর পাক কাপড় রেখে উলঙ্গ নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। এ জন্য ঐ কাপড় পরে নামাজ পড়বে। দুই. যদি কাপড় এক-চতুর্থাংশের কম পাক হয়, তাহলে এতে মতানৈক্য আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ঐ কাপড় পরে নামাজ পড়া ওয়াজিব, উলঙ্গ হয়ে নামাজ পড়া জায়েজ নেই। এটি ইমাম মালিক (র.)-এরও অভিমত এবং ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দু'টি মতের একটি। তার দ্বিতীয় মত হলো, উলঙ্গ হয়ে নামাজ পড়বে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের যুক্তি হলো যে, নাপাক কাপড় পরে নামাজ পড়লে একটি ফরজ তরক হয় (কাপড় পবিত্র হওয়া)। পক্ষান্তরে উলঙ্গ হয়ে নামাজ পড়লে একাধিক ফরজ তরক হয়। যেমন সতর ঢাকা, কিয়াম করা, রুকু করা, সিজদা করা। কেননা উলঙ্গ ব্যক্তি ইঙ্গিতে নামাজ আদায় করে। ফলে সতর ঢাকা ছাড়াও কিয়াম, রুকূ এবং সিজদা তরক হয়ে যায়। এটাই যুক্তি সঙ্গত যে, একটি ফরজ তরক করা উত্তম, একাধিক ফরজ তরক করার তুলনায়। এই জন্য ঐ নাপাক কাপড় পরে নামাজ পড়া ওয়াজিব। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তার ইখ্‌তিয়ার, ইচ্ছা করলে উলঙ্গ হয়ে নামাজ পড়তে পারবে, আর ইচ্ছা করলে ঐ নাপাক কাপড় পরেও নামাজ পড়তে থাকবে। তবে ঐ নাপাক কাপড় পরে নামাজ আদায় করাই উত্তম। দলিল, সতর খোলা এবং নাপাকী উভয়টিই সক্ষম অবস্থায় নামাজের প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ যদি সতর ঢাকা এবং নাপাক কাপড় ধোয়া সম্ভব হয়, তাহলে সতর খোলে এবং নাপাক কাপড় পরে নামাজ পড়া জায়েজ নেই। পরিমাণের ক্ষেত্রে উভয়টির মধ্যে কম মা'ফ, বেশি মা'ফ নয়। যখন পরিমাণের ক্ষেত্রে উভয়টি সমান হলো, তাহলে নামাজের ক্ষেত্রেও উভয়টি সমান হবে। অর্থাৎ যেমন ঐ নাপাক কাপড় পরে নামাজ পড়া জায়েজ আছে তেমন উলঙ্গ হয়ে নামাজ আদায় কারাও জায়েজ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর যুক্তির জবাব, কোনো কিছুকে তার স্থলবর্তী রেখে তরক করলে তা তরক হিসাবে গণ্য হয় না। কেননা উলঙ্গ অবস্থায় নামাজ আদায় করলে যদিও কিয়াম, রুকু এবং সিজদা তরক হয়ে যায়, কিন্তু এর স্থলবর্তী ইশা'রা বিদ্যমান আছে।

প্রশ্ন ঃ উলঙ্গ অবস্থায় নামাজ পড়ার তুলনায় ঐ নাপাক কাপড় পরে নামাজ পড়া উত্তম কেন ?

জবাব ঃ সতর বা শরীর ঢাকা নামাজের সাথে খাস নয়; বরং সতর ঢাকা নামাজের ভেতরে ও বাইরে উভয় অবস্থায় ওয়াজিব, তবে পবিত্রতা নামাজের সাথে খাছ। মোটকথা সতরের ফরজ পবিত্রতার ফরজের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় উলঙ্গ হয়ে নামাজ আদায় করার তুলনায় ঐ কাপড়ে নামাজ পড়া উত্তম।

وَمَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا صَلَّى عُرْيَانًا قَاعِدًا يُوْمِئُ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ هٰكَذَا فَعَلَهُ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاِنْ صَلَّى قَائِمًا اَجْزَاهُ لِاَنَّ فِى الْقُعُوْدِ سَتْرَ الْعَوْرَةِ الْغَلِيْظَةِ وَفِى الْقِيَامِ اَدَاءُ هٰذِهِ الْاَرْكَانِ فَيَمِيْلُ اِلٰى اَيِّهِمَا شَاءَ اِلَّا اَنَّ الْاَوَّلَ اَفْضَلُ لِاَنَّ السَّتْرَ وَجَبَ لِحَقِّ الصَّلٰوةِ وَحَقِّ النَّاسِ وَلِاَنَّهُ لَاخَلَفَ لَهُ وَالْاِيْمَاءُ خَلَفٌ عَنِ الْاَرْكَانِ ـ

অনুবাদ ঃ যদি কেউ সতর ঢাকার কাপড় না পায় তাহলে উলঙ্গ অবস্থায় বসে ইশারায় রুকূ সিজদা করে নামাজ পড়বে। কেননা রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ এরূপ করেছেন। যদি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে তবে তাও জায়েজ হবে। কেননা বসার মধ্যে লজ্জা স্থানের সতর হয়, আর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে উল্লিখিত রুকনগুলো আদায় হয়। সুতরাং দু'টোর যে কোনো একটি সে গ্রহণ করতে পারে। তবে প্রথমটিই উত্তম। কেননা সতর ঢাকা ফরজ হয়েছে নামাজের হক হিসেবে এবং মানুষের হক হিসেবে। তা ছাড়া এর কোনো স্থলবর্তী নেই। আর ইশারা হয়েছে রোকনের স্থলবর্তী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো ব্যক্তির নিকট পাক বা নাপাক কোনো ধরনের কাপড় না থাকে তাহলে সে উলঙ্গ অবস্থায় বসে ইশারায় রুকূ সিজদা করে নামাজ আদায় করবে। দলিল, রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ (রা.) এরূপ আমল করেছেন। হযরত আনাস ইব্‌নে মালিক (রা.) সূত্রে বর্ণিত রাসূল ﷺ-এর সাহাবীরা কোনো এক কশ্‌তীতে আরোহণ করেছিলেন অতঃপর কিশ্‌তী ডুবে গেল। তারা সমুদ্র হতে উলঙ্গ অবস্থায় বের হলেন এবং বসে নামাজ পড়লেন, যেমন তিনি বলেছেন, اِنَّهُ قَالَ اِنَّ اَصْحٰبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَسلم رَكِبُوْا فِىْ سَفِيْنَةٍ فَانْكَسَرَتْ بِهِمُ السَّفِيْنَةُ فَخَرَجُوْا مِنَ الْبَحْرِ عُرَاةً فَصَلُّوْا قُعُوْدًا হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) এবং ইব্‌নে ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে, اِنَّهُمَا قَالَا الْعَارِىْ يُصَلِّىْ قَاعِدًا بِالْاِيْمَاءِ অর্থ– তাঁরা দু'জন বলেছেন, যে উলঙ্গ ব্যক্তি বসে ইশারার নামাজ আদায় করবে। **প্রশ্ন ঃ** রাসূল ﷺ ইমরান ইব্‌নে হুসাইন (রা.) কে বলেছেন, صَلِّ قَائِمًا فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا (উলঙ্গ অবস্থায়) দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় কর যে, যদি সম্ভব না হয় তাহলে বসে আদায় করবে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, উলঙ্গ অবস্থায় বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। জবাব, উলঙ্গ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে যে, সে দাড়িয়ে নামাজ পড়তে সক্ষম নয়। কেননা ঐ অবস্থায় রুকূ, সিজদা এবং কিয়াম তরক করা ছাড়া তার জন্য খাছ সতর ঢাকা সম্ভব নয়, বিধায় ধরা হবে যে, সে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে সক্ষম নয়, কাজেই তার জন্য বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে। যদি উলঙ্গ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে তাহলেও নামাজ জায়েজ হবে। কেননা বসে নামাজ আদায় করলে খাছ সতর ঢাকা সম্ভব হয়, অন্য দিকে দাড়িয়ে নামাজ আদায় করলে নামাজের আরকান যেমন রুকূ, সিজদা, এবং কিয়াম আদায় করা যায়। অতএব দু'সুরতের মধ্যে যেটি পছন্দ হয় সেটি গ্রহণ করবে। তবে প্রথম সুরত অর্থাৎ বসে নামাজ আদায় করাই উত্তম। কেননা সতর ঢাকা ফরজ নামাজের হক হিসাবে এবং মানুষের হক হিসাবে ওয়াজিব। পক্ষান্তরে পবিত্রতা শুধু নামাজের হক হিসাবে ফরজ হয়েছে। এ ছাড়া সতর ঢাকার ফরজটি অধিক গুরুত্ব পূর্ণ হুকুম রুকূ এবং সিজদার ফরজের তুলনায়। দলিল হলো যে, নফল নামাজ সওয়ারীর উপর আরোহণ করা অবস্থায় বসে ইশারায় আদায় করা জায়েজ আছে। তবে কাপড় থাকা অবস্থায় সতর না ঢেকে নামাজ পড়া কোনো ক্রমেই জায়েজ নেই। যেহেতু উলঙ্গ ব্যক্তির জন্য বসে নামাজ পড়া সতরের জন্য ভাল দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার তুলনায়। তাই আমরা বলেছি যে, উলঙ্গ ব্যক্তির জন্য বসে নামাজ পড়া উত্তম। দ্বিতীয় দলিল হলো, সতরের কোনো স্থলবর্তী নেই। পক্ষান্তরে ইশারা হচ্ছে রোকন বা রুকূ এবং সিজাদার স্থলবর্তী। মূলনীতি হলো, যে জিনিসের স্থলবর্তী আছে তা তরক করা উত্তম এমন জিনিস তরক করার তুলনায় যার স্থলবর্তী নেই। অতএব উলঙ্গ ব্যক্তি বসে নামাজ আদায় করার কারণে যদি রুকূ, সিজদা তরক হয় কিন্তু এর স্থলবর্তী (ইশারা) আছে। পক্ষান্তরে যদি দাড়িয়ে নামাজ পড়ে তাহলে সতর তরক হচ্ছে যার কোনো স্থলবর্তী নেই। অতএব উলঙ্গ ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার তুলনায় বসে নামাজ পড়াই উত্তম।

وَقَالَ وَيَنْوِى الصَّلٰوةَ الَّتِىْ يَدْخُلُ فِيْهَا بِنِيَّةٍ لَايَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيْمَةِ بِعَمَلٍ وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِاَنَّ اِبْتِدَاءَ الصَّلٰوةِ بِالْقِيَامِ وَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وَلَايَقَعُ التَّمِيْزُ اِلَّا بِالنِّيَّةِ وَالْمُتَقَدِّمُ عَلَى التَّكْبِيْرِ كَالْقَائِمِ عِنْدَهٗ اِذَا لَمْ يُوْجَدْ مَا يَقْطَعُهٗ وَهُوَ عَمَلٌ لَايَلِيْقُ بِالصَّلٰوةِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمُتَاَخِّرَةِ مِنْهَا عَنْهُ لِاَنَّ مَا مَضٰى لَايَقَعُ عِبَادَةً لِعَدَمِ النِّيَّةِ وَفِى الصَّوْمِ جُوِّزَتْ لِضَرُوْرَةٍ وَالنِّيَّةُ هِىَ الْاِرَادَةُ وَالشَّرْطُ اَنْ يَعْلَمَ بِقَلْبِهٖ اَىَّ صَلٰوةٍ يُصَلِّىْ اَمَّا الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ فَلَا مُعْتَبَرَ بِهٖ وَيَحْسُنُ ذٰلِكَ لِاِجْتِمَاعِ عَزِيْمَتِهٖ ثُمَّ اِنْ كَانَتِ الصَّلٰوةُ نَفْلًا يَكْفِيْهِ مُطْلَقُ النِّيَّةِ وَكَذَا اِذَا كَانَتْ سُنَّةً فِى الصَّحِيْحِ وَاِنْ كَانَتْ فَرْضًا فَلَابُدَّ مِنْ تَعَيُّنِ فَرْضٍ كَالظُّهْرِ مَثَلًا لِاِخْتِلَافِ الْفُرُوْضِ ـ

অনুবাদ ঃ ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুসল্লী যে নামাজ শুরু করতে যাচ্ছে এর এমনভাবে নিয়ত করবে যে নিয়ত এবং তাহরীমার মাঝে কোনো ব্যবধান সৃষ্টি করবে না। দলিল, যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। তা ছাড়া নামাজের শুরু হয় কিয়াম বা দাঁড়ানো অবস্থা দ্বারা। আর তা অভ্যাস এবং ইবাদত উভয়ের মাঝে দোদুল্যমান। সুতরাং নিয়ত ছাড়া এতে পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। আর যে নিয়ত তাক্‌বীরের পূর্বে করা হয়, তা তাকবীরের সময়ও বিদ্যমান আছে বলে গণ্য। যদি তাকে বিচ্ছিন্নকারী কোনো কিছু না পাওয়া যায়। অর্থাৎ এমন কোনো কাজ যা নামাজের উপযোগী নয়। আর তাক্‌বীরের পরবর্তী নিয়ত গ্রহণ যোগ্য নয়। কেননা নিয়তের পূর্বে যা বিগত হয়েছে, তা নিয়তহীনতার কারণে ইবাদত হবে না। অবশ্য রোজার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের কারণে তা জায়েজ রাখা হয়েছে। নিয়ত অর্থ ইচ্ছা, তবে শর্ত হলো, নিজ অন্তরে জ্ঞাত হতে হবে যে, কোন নামাজ আদায় করছে। মুখে উচ্চারণ করা ধর্তব্য নয়। তবে উচ্চারণ করা উত্তম, কেননা তা ইচ্ছাকে সংহত করে। উল্লেখ্য যে, সে যদি নামাজ নফল হয় তাহলে সাধারণ নিয়তই যথেষ্ট। বিশুদ্ধমতে সুন্নত নামাজেরও এ হুকুম। আর যদি নামাজ ফরজ হয় তাহলে ফরজ নামাজ নির্ধারিত হওয়া জরুরি। উদাহরণ স্বরূপ যেমন জোহর। কেননা ফরজ বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসল্লী যে নামাজ পড়তে চায় ঐ নামাজের নিয়ত করবে। শর্ত হলো নিয়ত এবং তাহ্‌রীমার মাঝে কোনো ব্যবধান সৃষ্টি করবে না, এমন জিনিসের দ্বারা যা নামাজের প্রতিবন্ধক। যেমন নিয়তের পর খাওয়া, পানকরা অথবা কথা বলার মধ্যে রত হয়ে অতঃপর তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলে নামাজ আরম্ভ করা, তাহলে এ নিয়ত ধর্তব্য হবে না। হিদায়ার গ্রন্থকার এখানে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন, ১. নিয়ত, ২. যে দলিলের দ্বারা নিয়ত ওয়াজিব হয়, ৩. নিয়তের সময়, ৪. নিয়তের অবস্থা বা নিয়ম। বিজ্ঞ গ্রন্থকার প্রথমে নিয়ত শর্ত হওয়ার দলিল বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ বলেছেন اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এর ব্যাখ্যা হলো যে, নামাজ একটি আমল যা নিয়তের সাথে সম্পর্কীত। অতএব যে নামাজ নিয়ত ছাড়া হবে, তা মূলত নামাজ হিসাবেই গণ্য হবে না। প্রশ্ন, উক্ত হাদীসে আমাল (اعمال)-এর পূর্বে হুকুম (حكم) শব্দটি মুকাদ্দর (مقدر) মানা হবে, এবং হুকুমের দ্বারা পারলৌকিক হুকুম (حكم اخروى) অর্থাৎ ছওয়াব উদ্দেশ্য হবে। অতএব হাদীসের মর্ম দাড়াবে, আমালের পারলৌকিক হুকুম অর্থাৎ ছওয়াব নিয়তের উপর নির্ভরশীল, মূল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল নয়। কারো কারো মতে আমালের পূর্বে ছাওয়াব (ثواب) মুকাদ্দার মানা হবে, অর্থাৎ ثَوَابُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ অর্থ যাবতীয় আমালের ছওয়াব নিয়তের উপর নির্ভরশীল। মোটকথা নিয়ত ছাড়া মূল নামাজ জায়েজ হবে কিন্তু ছওয়াব হাসিল হবে না। জবাব, হুকুম (حكم) দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যাপক তা ইহলৌকিক হোক বা পারলৌকিক হোক। হুকুমকে পারলৌকিক বিষয়ের

প্র : প্র : বেফাক (১৪২৫) – ২০০৫ ই

সাথে বিশিষ্ট করার কোনো যুক্তি নেই। যদি মেনে নেওয়া হয় যে পারলৌকিক হুকুম উদ্দেশ্য অর্থাৎ ছওয়াব তাহলে হয়ত ছওয়াব (ثواب) শব্দ মুকাদ্দার মানা হলেও নিয়ত ছাড়া ইবাদত সহীহ না হওয়া সাবিত হয়। কেননা মুখ্য ইবাদতে (عبادت محضه) ছওয়াবই উদ্দেশ্য। মূলনীতি (قاعده) আছে যে, উদ্দেশ্য ফউত হয়ে গেলে মূল জিনিস ফউত হয়ে গেছে বলে গণ্য হয়ে থাকে। অতএব নিয়ত না করার কারণে ছওয়াব হাসিল হয়নি, তাই ধরা হবে যে, নামাজই হয়নি। এজন্য নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য নিয়তকে শর্ত আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় দলিল, নামাজ আরম্ভ হয় কিয়াম বা দাঁড়ানোর অবস্থা দ্বারা। আর তা অভ্যাস ও ইবাদত উভয়ের মধ্যে দোদুল্যমান, অর্থাৎ মানুষ কখনো অভ্যাস হিসাবে দাঁড়ায় এবং কখনো আল্লাহর দরবারে ইবাদতের জন্য দাঁড়ায়। উভয় দাঁড়ানো বাহ্যিকভাবে একই ধরনের। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিয়তের দ্বারা হবে বিধায় নামাজের জন্য নিয়তকে শর্ত আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

اَلْمُتَقَدِّمُ عَلَى التَّكْبِيْرِ এখানে নিয়তের সময় সম্পর্কে আলোচনা। যে নিয়ত তাকবীরের পূর্বে করা হয়, তা তাকবীরের সময়ও বিদ্যমান আছে বলে গণ্য। সারকথা হলো নিয়তের সঙ্গে সঙ্গে তাকবীর বলার নিয়ম। তবে যদি তা তাকবীরে তাহ্‌রীমার পূর্বে করে এবং নিয়ত ও তাহ্‌রীমার মাঝে নামাজ বিচ্ছিন্নকারী, বা নামাজের প্রতিবন্ধক কোনো কর্ম না পাওয়া যায়, তাহলে ঐ নিয়ত জায়েজ হবে। যেমন ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে কোনো ব্যক্তি অজু করার সময় নিয়ত করল যে, আমি জোহরের নামাজ ইমামের সাথে পড়ব। অজুর পর নামাজের প্রতিবন্ধক কোনো কাজে লিপ্ত হয়নি। সে মসজিদে গেল এবং নামাজ আরম্ভ করল। অতঃপর নামাজ আরম্ভ করার সময় তার অন্তরে নিয়ত বিদ্যমান ছিল না, তাহলে ঐ (অজুর) নিয়তের দ্বারা তার নামাজ জায়েজ হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে যদি নিয়ত এবং তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার মাঝে নামাজের প্রতিবন্ধক কোনো কর্ম পাওয়া যায়, তাহলে ঐ নিয়ত যথেষ্ট হবে না। যেমন অজুর সময় ইমামের সাথে জোহরের নামাজ পড়ার নিয়ত করল অতঃপর খাবার এবং পান করার কাজে লেগে গেল, তাহলে তার জন্য নতুন নিয়ত করা জরুরি, প্রথম নিয়ত যথেষ্ট নয়। যদি নিয়ত তকবীরের পরে করে তাহলে তা শরিয়তের দৃষ্টিতে ধর্তব্য হবে না। কেননা যে অংশ তাক্‌বীরের পর এবং নিয়তের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে, তা নিয়ত না থাকার কারণে ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে না। যেহেতু নামাজের পরবর্তী অংশগুলো পূর্বের অংশের ওপর নির্ভরশীল, এজন্য পরবর্তী অংশগুলোও ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে না। এ জন্য আমরা বলেছি যে, তাহ্‌রীমার পর নিয়ত করলে, নামাজ জায়েজ হবে না। তবে ইমাম কারখী (র.) বলেছেন যে, তাহ্‌রীমার পর নিয়ত করলেও তা ধর্তব্য হবে। তাহরীমার পর কতক্ষণ পর্যন্ত নিয়ত ধর্তব্য হবে ? কারো কারো মতে ছানা (ثنا) শেষ হওয়া পর্যন্ত নিয়ত করতে পারবে। কারো কারো মতে তায়াওবুয (تعوذ) শেষ হওয়ার পর্যন্ত নিয়ত করতে পারবে। কারো কারো মতে রুকূ হতে মাথা উঠানো পর্যন্ত নিয়ত করতে পারবে। রোজা এর থেকে ব্যতিক্রম। এর প্রথম অংশে নিয়ত পাওয়া শর্ত নয়। অতএব যদি কেউ সুব্‌হে সাদেকের পরে নিয়ত করে তাহলে রোজা জায়েজ হবে। কেননা সুব্‌হে সাদেকের সময় নিদ্রা এবং অলসতার সময়। অতএব যদি প্রথম সময়ে নিয়ত করার শর্ত আরোপ করা হয় তাহলে তা মানুষের জন্য জটিল ও কঠিন হবে। শরিয়তে জটিলতা ও কঠোরতা দূরীভূত করা হয়েছে। এ জন্য রোজার জন্য প্রথম অংশে নিয়তকে শর্ত হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে নামাজ জাগ্রত অবস্থায় আরম্ভ হয় এ জন্য তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার সময় নিয়তকে শর্ত হিসাবে আখ্যা দিতে কোনো জটিলতা বা সংকীর্ণতা নেই।

اَلنِّيَّةُ هِيَ الْاِرَادَةُ এখানে নিয়তের বিবরণ পেশ করা হয়েছে। নিয়তের অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো কিছুর ইচ্ছা করা। এখানে আল্লাহর জন্য নামাজের ইচ্ছা করাকে বুঝানো হয়েছে। নিয়তের জন্য শর্ত হলো অন্তরে এ উপলব্ধি থাকতে হবে যে, সে কোনো এক নামাজ পড়তেছে। এর চিহ্ন হলো, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তখন সে নির্দ্বিধায় বলতে সক্ষম হবে যে আমি অমুক নামাজ পড়তেছি পক্ষান্তরে যদি জবাব দিতে দেরী করে তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে, সে জানে না, কোন নামাজ পড়ছে। নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য মুখে উচ্চারণ করা শর্ত নয় তবে উহা ভাল। কেননা এটি হৃদয়ের ইচ্ছাকে সংহত করে।

ثُمَّ اِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ نَفْلًا উক্ত ইবারতের দ্বারা নিয়তের নিয়ম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। মোটকথা হলো মুসল্লী যে নামাজ শুরু করতে চায়, তা ফরজ হবে বা ফরজ হবে না। যদি ফরজ না হয় চাই নফল হোক বা সুন্নত হোক তাহলে সাধারণ নিয়তই যথেষ্ট হবে। এটি বিশুদ্ধ মত। কেননা নিয়ত অভ্যাস এবং ইবাদতের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করার জন্য আসে। আর এ উদ্দেশ্য সাধারণ নিয়তের দ্বারাই হাসিল হয় বিধায় এক্ষেত্রে সাধারণ নিয়তই যথেষ্ট। কারো কারো মতে যদি সুন্নত পড়তে চায় তাহলে রাসূল ﷺ-এর সুন্নতের নিয়ত করা জরুরি। কেননা সুন্নতের মধ্যে সাধারণ নফলের তুলনায় একটি অতিরিক্ত গুণ বিদ্যমান আছে। অতএব ঐ অতিরিক্ত গুণটির নিয়ত করা জরুরি, সাধারণ নিয়ত যথেষ্ট নয়। আর যদি ঐ নামাজ ফরজ হয় তাহলে এর দু'সুরত। এক. একা আদায় করবে, দুই. ইমামের অনুসরণে আদায় করবে। যদি একা আদায় করে তাহলে যে নামাজ পড়বে সেটির নির্দিষ্টভাবে নিয়ত করতে হবে। যেমন জোহর পড়তে চাইলে জোহরকে নির্দষ্ট করা জরুরি। শুধু এতটুকু বলা যথেষ্ট নয় যে, আমি ফরজের নিয়ত করলাম। কেননা ফরজ বিভিন্ন প্রকারের আছে। এই জন্য এগুলোর মাঝে ব্যবধান করা জরুরি।

وَاِنْ كَانَ مُقْتَدِيًا بِغَيْرِهِ يَنْوِى الصَّلٰوةَ وَمُتَابَعَتَهُ لِاَنَّهُ يَلْزَمُهُ فَسَادُ الصَّلٰوةِ مِنْ جِهَتِهِ فَلَابُدَّ مِنْ اِلْتِزَامِهِ قَالَ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ ثُمَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَفَرْضُهُ اِصَابَةُ عَيْنِهَا وَمَنْ كَانَ غَائِبًا فَفَرْضُهُ اِصَابَةُ جِهَتِهَا هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّ التَّكْلِيْفَ بِحَسْبِ الْوُسْعِ وَمَنْ كَانَ خَائِفًا يُصَلِّيْ اِلٰى اَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ لِتَحَقُّقِ الْعُذْرِ فَاَشْبَهَ حَالَةَ الْاِشْتِبَاهِ ـ

অনুবাদ ঃ আর যদি অন্য কারো মুক্তাদী হয় তাহলে নামাজের এবং ইমামের অনুসরণের নিয়ত করবে। কেননা ইমামের দিক থেকেও মুক্তাদীর নামাজে ফসাদ সৃষ্টি হয়। সুতরাং তার পক্ষ থেকে এই বাধ্য-বাধকতা গ্রহণ করা অবশ্যক। গ্রন্থকার বলেন যে, সে কেবলামুখী হবে, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল মসজিদুল হারাম অভিমুখী কর।—(বাকারা: আয়াত নং ১৪৪) তবে যে ব্যক্তি মক্কায় অবস্থান করছে, তার জন্য স্বয়ং কা'বামুখী হওয়া ফরজ। আর মক্কায় অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য ফরজ হলো কা'বার দিকের প্রতি মুখ করা। এটিই বিশুদ্ধমত। কেননা দায়িত্ব অর্পিত হয় সাধ্য অনুযায়ী। যে ব্যক্তি ভীতিগ্রস্ত হয়, সে যেদিকেই সক্ষম হয় সে দিকেই মুখ করে নামাজ আদায় করবে, ওজর বিদ্যমান থাকার কারণে। সুতরাং কেবলা অজ্ঞাত হওয়ার অনুরূপ হুকুম হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِنْ كَانَ مُقْتَدِيًا الخ এখানে দ্বিতীয় সুরতের বিবরণ অর্থাৎ যদি ফরজ নামাজ ইমামের পিছনে পড়ে তাহলে উক্ত নিয়তের সাথে ইক্তেদা বা অনুসরণেরও নিয়ত করবে। কেননা ইমামের নামাজ ফাসেদ হওয়ার কারণে মুক্তাদীর নামাজও ফাসেদ হয়। বিধায় অনুসরণের নিয়ত করা জরুরি। তাহলে ইমামের নামাজের ফাসাদের ক্ষতি মুক্তাদীর উপর আসবে অনুসরণের কারণে।

কিবলামুখী হওয়া নামাজের শর্তের মধ্য হতে একটি দলিল ঃ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ দলিল এভাবে গ্রহণ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ বলেছেন, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا আমি আপনাকে আপনার মনোনীত কিবলার প্রতি ফিরিয়ে দিব।—(বাকারা আয়াত–১৪৪) এখানে মসজিদুল হারামের প্রতি মুখ ফিরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নামাজ ব্যক্তির দু' সুরত। এক. মক্কা মুকাররামায় নামাজ আদায় করবে অথবা মক্কা মুকাররমা থেকে অনুপস্থিত হয়ে অন্য স্থানে নামাজ আদায় করবে। প্রথম সুরতে স্বয়ং কা'বার প্রতি মুখ করা আবশ্যক। কেননা রাসূল ﷺ যখন মসজিদুল হারামে নামাজী পড়তেন তখন স্বয়ং কা'বার দিকে মুখ করতেন, সাহাবা তাবেঈদের আমলও অনুরূপ ছিল। এর ওপর ইজমা (اجماع) সংগঠিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় সুরতে কাবার দিকের প্রতি মুখ করা ফরজ। দলিল, রাসূল ﷺ এবং সাহাবাগণ পবিত্র মদীনায় ছিলেন, মহান আল্লাহ তাঁদেরকে মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করার হুকুম দিয়েছেন, কাবার দিকে নয়। এর দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হলো যে, যে ব্যক্তি পবিত্র মক্কা হতে অনুপস্থিত তার জন্য স্বয়ং কা'বার দিকে মুখ করা জরুরি নয়। কেননা মহান আল্লাহ বান্দাকে সাধ্য অনুযায়ী বিধান দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থ-আল্লাহ কোনো মানুষের প্রতি সাধ্যাতীত কোনো কাজের দায়িত্ব আরোপ করেন না। —(বাকারা; আয়াত নং ২৮৬)

وَمَنْ كَانَ خَائِفًا الخ যদি কোনো ব্যক্তি ভয়ের কারণে কেব্লার দিকে মুখ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে যেদিকে সক্ষম সেদিকে মুখ করবে। জানের ভয় থাক বা মালের ভয় থাক, শত্রু হিংস্র প্রাণী হোক বা ডাকাত হোক। যেমন কোনো ব্যক্তির এই অশঙ্কা হয় যে, নড়াচড়া করলে এবং কেব্লার দিকে মুখ করলে শত্রু অবগত হবে, তাহলে সে বসে বা শুয়ে যেভাবে সম্ভব হয় ইশারায় নামাজ আদায় করবে। এ হুকুম ঐ অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যে কেব্লার দিকে ঘুরতে সক্ষম নয় এবং তাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো কোনো ব্যক্তিও সেখানে উপস্থিত নেই। অনুরূপভাবে যদি কিশতী ডুবে যায় এবং এক ব্যক্তি কিশতীর তখ্তায় উপবিষ্ট থাকে আর সে অশংকা বোধ করে যে, সে যদি কেব্লার দিকে মুখ করে তাহলে পানিতে ডুবে যাবে, তাহলে তার জন্য জায়েজ হবে যেদিকে সক্ষম সেদিকে মুখ করে নামাজ আদায় করা। দলিল: কিব্লা অজ্ঞাত বা সংশয় যুক্ত হয়ে যাওয়া ব্যক্তির ন্যায় তার ওজরকেও গ্রহণ করা হবে। তার জন্য প্রকৃত কিব্লার দিকে মুখ করা জরুরি নয়।

فَإِنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا اجْتَهَدَ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ تَحَرَّوْا وَصَلُّوْا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِأَنَّ الْعَمَلَ بِالدَّلِيْلِ الظَّاهِرِ وَاجِبٌ عِنْدَ انْعِدَامِ دَلِيْلٍ فَوْقَهُ وَالْاِسْتِخْبَارُ فَوْقَ التَّحَرِّيْ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ بَعْدَمَا صَلّٰى لَا يُعِيْدُهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُعِيْدُهَا إِذَا اسْتَدْبَرَ لِتَيَقُّنِهِ بِالْخَطَإِ وَنَحْنُ نَقُوْلُ لَيْسَ فِيْ وُسْعِهِ إِلَّا التَّوَجُّهُ إِلٰى جِهَةِ التَّحَرِّيْ وَالتَّكْلِيْفُ مُقَيَّدٌ بِالْوُسْعِ .

অনুবাদ ঃ যদি কারো জন্য কেব্‌লা অজ্ঞাত বা সন্দেহ পূর্ণ হয়ে পড়ে এবং তার কাছে এমন কেউ না থাকে, যাকে কিব্‌লা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারে। তাহলে সে সাধ্য অনুযায়ী تَحَرِّيْ বা চিন্তা-ভাবনা করে কিবলা স্থির করবে। কেননা সাহাবীগণ চিন্তা করে (কিবলা নির্ধারণ করে) নামাজ আদায় করেছেন। আর রাসূল ﷺ তাঁদের কাজ প্রত্যাখ্যান করেননি। তা ছাড়া অধিকতর শক্তিশালী দলিলের অবর্তমানে প্রকাশ্য দলিলের ওপর আমল করাই ওয়াজিব। আর সংবাদ জিজ্ঞাসা চিন্তা-ভাবনার চেয়ে অগ্রাধিকার রাখে। নামাজ আদায় করার পর সে জানতে পারল যে, সে ভুল করেছে তাহলে নামাজ দোহ্‌রাতে হবে না। আর ইমাম শাফেঈ (র.) বল্যেছেন, যদি কিব্‌লার দিকে পিঠ দিয়ে থাকে, তাহলে ভুল নিশ্চিত হওয়ার কারণে নামাজ দোহ্‌রাতে হবে। আমাদের দলিল হলো, চিন্তা-ভাবনা দ্বারা নির্ধারিত দিকের অভিমুখী হওয়া ছাড়া অন্য কিছু তার সাধ্যে ছিল না। আর হুকুম অর্পণ সাধ্যের ওপরই নির্ভরশীল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا ইবারত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যদি সেখানে কেব্‌লার দিক সম্পর্কে অবগত কোনো লোক উপস্থিত থাকে তাহলে সে তাকে জিজ্ঞাসা করবে। তাকে জিজ্ঞাসা না করে চিন্তা-ভাবনা করে কেবলা স্থির করলে জায়েজ হবে না।

অনুরূপভাবে সন্দেহপূর্ণ অবস্থায় যদি চিন্তাভাবনা ছাড়া নামাজ আদায় করে, তাহলেও নামাজ জায়েজ হবে না। দলিল: একদা সাহাবাদের কিবলার দিক সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হলো, তখন সাহাবাগণ চিন্তা ভাবনা করে নামাজ আদায় করলেন, এবং এ কাহিনী রাসূলের সামনে আলোচনা করলেন। তখন রাসূল ﷺ-এর কোনো প্রতিবাদ করেননি। পক্ষান্তরে যদি কিব্‌লার দিক সম্পর্কে অবগত কোনো লোক সেখানে উপস্থিত থাকে তাহলে চিন্তা-ভাবনা করে নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। দলিল; অধিকতর শক্তিশালী দলিলের অবর্তমানে প্রকাশ্য প্রমাণের ওপর আমল করাই ওয়াজিব। আর জিজ্ঞাসাবাদ করা চিন্তা-ভাবনার চেয়ে অগ্রাধিকার রাখে তাই যতক্ষণ পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই।

فَإِنْ عَلِمَ الخ কিব্‌লার দিক সন্দেহপূর্ণ হওয়ার কারণে চিন্তা-ভাবনা করে নামাজ আদায় করার পর জানতে পারল যে, সে কিবলা ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করে নামাজ পড়েছে, তাহলে এমতাবস্থায় তার নামাজ দোহ্‌রানো ওয়াজিব নয়। দলিল, কেননা তার জন্য চিন্তা-ভাবনা দ্বারা নির্ধারিত দিকই কেবলা। আর সে চিন্তা-ভাবনা করেই নামাজ আদায় করেছে। ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন, যদি কেব্‌লার দিকে পিঠ করে, তাহলে ভুল নিশ্চিত হওয়ার কারণে নামাজ দোহ্‌রাতে হবে।

وَاِنْ عَلِمَ ذٰلِكَ فِى الصَّلٰوةِ اِسْتَدَارَ اِلَى الْقِبْلَةِ لِاَنَّ اَهْلَ قُبَاءٍ لَمَّا سَمِعُوا بِتَحَوُّلِ الْقِبْلَةِ اِسْتَدَارُوْا كَهَيْاٰتِهِمْ فِى الصَّلٰوةِ وَاسْتَحْسَنَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَذَا اِذَا تَحَوَّلَ رَأْيُهُ اِلٰى جِهَةٍ اُخْرٰى تَوَجَّهَ اِلَيْهَا لِوُجُوْبِ الْعَمَلِ بِالْاِجْتِهَادِ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ غَيْرِ نَقْضِ الْمُؤَدّٰى قَبْلَهُ وَمَنْ اَمَّ قَوْمًا فِىْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَتَحَرَّى الْقِبْلَةَ وَصَلّٰى اِلَى الْمَشْرِقِ وَتَحَرّٰى مَنْ خَلْفَهُ فَصَلّٰى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اِلٰى جِهَةٍ وَكُلُّهُمْ خَلْفَهُ وَلَا يَعْلَمُوْنَ مَاصَنَعَ الْاِمَامُ اَجْزَاهُمْ لِوُجُوْدِ التَّوَجُّهِ اِلٰى جِهَةِ التَّحَرِّىْ وَهٰذِهِ الْمُخَالَفَةُ غَيْرُ مَانِعَةٍ كَمَا فِىْ جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَمَنْ عَلِمَ مِنْهُمْ بِحَالِ اِمَامِهٖ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لِاَنَّهُ اِعْتَقَدَ اِمَامَهُ عَلَى الْخَطَاءِ وَكَذَا لَوْكَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْاِمَامِ لِتَرْكِهٖ فَرْضَ الْمَقَامِ ـ

অনুবাদ ঃ আর যদি সে নামাজের মধ্যে তা জানতে পারে, তাহলে কেবলার দিকে ঘুরে যাবে। কেননা কুবাবাসীরা যখন কেবলা পরিবর্তনের খবর পেলেন তখন তাঁরা নামাজের অবস্থায় ঘুরে গেলেন এবং মহানবী ﷺ তা পছন্দ করেছেন। অদ্রূপ যদি তার সিদ্ধান্ত অন্য দিকে পরিবর্তিত হয়ে যায় তাহলে সে সেদিকে অভিমুখী হবে। কেননা পরবর্তী ক্ষেত্রে নতুন ইজ্‌তেহাদের ওপর আমল করা আশ্যক। তবে তাতে ইতঃপূর্বে আদায় কৃত অংশ ভংগ হবে না। যে ব্যক্তি অন্ধকার রাত্রে কোনো জামাআতের ইমামতি করল এবং চিন্তা-ভাবনা করে কেবলা নির্ধারণ করল এবং পূর্বের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করল। আর তার পিছনে যারা আছে তারাও চিন্তা-ভাবনা করে নামাজ আরম্ভ করেছে এবং প্রত্যেকে একেক দিকে নামাজ আদায় করল। এমতাবস্থায় তারা প্রত্যেকেই ইমামের পশ্চাতে আছে এবং ইমাম কী করছেন, তা তাদের জানা নেই, তাহলে সকলের নামাজ জায়েজ হবে। কেননা চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে নির্ধারিত দিকের অভিমুখী হওয়া তো পাওয়া গেছে। আর ইমামের সাথে এই বিরোধ নামাজ জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবে না। যেমন কা'বা শরীফের অভ্যন্তরের মাস্‌আলা। কিন্তু তাদের মধ্যে যে ইমামের বিপরীত অবস্থা জানতে পারে, তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা আপন ইমাম ভুলের ওপর আছে বলে সে বিশ্বাস করে। এই হুকুম যদি সে ইমামের সম্মুখে হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে উক্ত হুকুম হবে। কেননা সে তার স্থান গত ফরজ তরক করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করে নামাজ শুরু করেছে অতঃপর নামাজের মধ্যে অবগত হলো যে, সে কিবলার দিকের ক্ষেত্রে ভুল করেছে, তাহলে সে নামাজের মধ্যেই কিবলার দিকে ঘুরে যাবে। দলিল, কুবাবাসীরা যখন নামাজের মধ্যে জানতে পারল যে, কেবলা পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে পবিত্র কা'বার দিকে মুখ করার নির্দেশ এসেছে, তখন নামাজের মধ্যে রুকূ অবস্থায় পবিত্র কা'বার দিকে ঘুরে গিয়েছেন। যখন রাসূল ﷺ এ ঘটনা জানতে পারলেন তখন তা পছন্দ করলেন, কোনো প্রতিবাদ করেননি। এ-ই হুকুম ঐ সময়ও যখন নামাজের মধ্যে তার মত পরিবর্তন হয়ে অন্য দিকে স্থির হয়, যে দিকে মত স্থির হয়, সেদিকে ফিরেই নামাজ আদায় করবে। যদি ঘুরতে ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করে, তাহলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা নামাজের পরবর্তী অংশে নতুন ইজতেহাদের ওপর আমল করা ওয়াজিব। পূর্বে আদায়কৃত অংশ নতুন করে পড়তে হবে না।

وَمَنْ اَمَّ قَوْمًا فِىْ لَيْلَةٍ الخ : যে ব্যক্তি অন্ধকার রাত্রে কোনো এক দল লোকের ইমামতি করেছে চাই কোনো গৃহে হোক বা ময়দানে হোক অথবা কিবলা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তির উপস্থিত বিহীন হোক চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে কিবলা নির্ধারণ করে পূর্বমূখী হয়ে নামাজ আদায় করেছে। আর তার পিছনে যারা রয়েছে তারাও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে কিবলা নির্ধারণ করে প্রত্যেকে একেক দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করেছে এমন অবস্থায় যে, তারা প্রত্যেকে ইমামের পশ্চাতে আছে, কেউ ইমামের সম্মুখে নেই এবং ইমাম কি করছেন তাও তাদের জানা নেই। এমন অবস্থায় সকলের নামাজ জায়েজ হবে। কেননা চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে নির্ধারিত দিকে অভিমুখী হওয়াতো পাওয়া গিয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এ নামাজ তো রাতের নামাজ। রাতের নামাজে তো কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পড়া হয়, এর মাধ্যমে তো জানা যেতে পারে যে, ইমাম কোন্ দিকে মুখ করে আছেন; কাজেই এখানে ইমামের অবস্থা অজ্ঞাত থাকবে কেন? জবাব, হতে পারে কাজা নামাজ অথবা আওয়াজের সহিত কিরা'আত পড়তে ভুলে গিয়েছে অথবা আওয়াজের দ্বারা জানা গেছে যে ইমাম সম্মূখে আছে কিন্তু এটা জানতে পারেনি যে, কোন দিকে আছে অথবা শত্রু বা ডাকাতের ভয় ইমাম আওয়াজের সাথে কিরাআত পড়েনি এবং সকলে কিরাআত আওয়াজবিহীন ভাবে পড়ার চেষ্টা করেছে বিধায় সকলের নামাজ জায়েজ হবে। কেননা চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে নির্ধারিত দিকে অভিমুখী হওয়া তো পাওয়া গেছে। আর ইমামের সাথে এই বিরোধ নামাজ জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে না। যেমন কা'বার অভ্যন্তরের মাসআলা। কেননা আমাদের মতে কা'বার অভ্যন্তরে ফরজ ও নফল নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে।

যদি লোকেরা কা'বার অভ্যন্তরে জামাআতের সাথে নামাজ পড়ে এবং ইমামের ইকতেদা করে এহেন অবস্থায় যে ব্যক্তির পিঠ ইমামের পিঠের দিকে করবে অথবা নিজের মুখমণ্ডল ইমামের পিঠের দিকে করবে, তার নামাজ জায়েজ হবে। তবে যে ব্যক্তি স্বীয় মুখ ইমামের মুখের দিকে করবে তার নামাজ মাকরূহের সাথে আদায় হবে। শর্ত হলো তার এবং ইমামের মাঝে কোনো সুতরা না থাকতে হবে, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বীয় পিঠ ইমামের মুখের দিকে করবে, তাঁর নামাজ জায়েজ হবে না। যে ব্যক্তি ইমামের ডানে এবং বামে থাকবে তার নামাজ জায়েজ হবে, তবে শর্ত হলো, যে প্রাচীরের দিকে ইমাম মুখ করেছে সে দিকের কাতারের কোনো মুসল্লী ইমামের তুলনায় প্রাচীরের অধিক নিকটবর্তী না হতে হবে এবং তাদের মধ্যে যে ইমামের বিপরীত অবস্থা জানবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা সে যেদিকের চিন্তা-ভাবনা করছে সেটিকেই সহীহ মনে করেছে এবং অন্য দিককে ভুল মনে করেছে, বিধায় ইমামের পিছনে ইক্তেদা সহীহ হবে না। কেননা সে আপন ইমাম ভুলের ওপর আছে বলে বিশ্বাস করে। অনুরূপভাবে যদি মুক্তাদী ইমামের সম্মুখে যায় তাহলেও নামাজ ফাসিদ হবে। কেননা সে তার স্থান গত ফরজ তরক করেছে।

بَابُ صِفَةِ الصَّلٰوةِ

فَرَائِضُ الصَّلٰوةِ سِتَّةٌ اَلتَّحْرِيْمَةُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَالْمُرَادُ بِهٖ تَكْبِيْرَةُ الْاِفْتِتَاحِ اَلْقِيَامُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ وَالْقِرَاءَةُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَالْقَعْدَةُ فِىْ اٰخِرِ الصَّلٰوةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ حِيْنَ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ اِذَا قُلْتَ هٰذَا اَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ عَلَّقَ التَّمَامَ بِالْفِعْلِ قَرَأَ اَوْ لَمْ يَقْرَأْ ـ

নামাজের ধারাবাহিক বিবরণ

অনুবাদ : নামাজের ফরজ ছয়টি- (প্রথমত) তাহ্রীমা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ (তুমি তোমার প্রতিপালকের নামে তাকবীর বলো ....) আর (মুফাস্সিরগণের সর্বসম্মতিক্রমে) আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকবীরে তাহ্রীমা। (দ্বিতীয়ত) কিয়াম, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ (তোমরা একাগ্রচিত্তে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হও)। (তৃতীয়ত) কেরাত, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ (কুরআনের যে অংশ সহজে সম্ভব হয় তোমরা পড়ো)। রুকু ও সিজদা করা, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا তোমরা রুকু করো এবং সিজদা করো। নামাজের পর তাশাহ্হুদ পরিমাণ বৈঠক। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে তাশাহ্হুদ শিক্ষাদান কালে বলেছেন- اِذَا قُلْتَ هٰذَا اَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ (তুমি যখন এ বললে বা এ করলে তখন তোমার নামাজ সমাপ্ত হলো) এখানে নামাজের সম্পূর্ণতাকে তিনি বসার কাজের সাথে যুক্ত করেছেন (তাশাহুদ) পাঠ করুক বা না করুক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : এ পর্যন্ত নামাজের ভূমিকার আলোচনা ছিল। এখন থেকে মূল উদ্দেশ্য তথা নামাজের আলোচনা করা হবে। اهل اللغة গণের মতে وصف এবং صفت উভয়টি مترادف এবং উভয়টি مصدر , যেমন- وعد এবং اعدة মুতাকাল্লিমীনগণের মধ্য থেকে আমাদের ওলামাদের মতে وصف হলো واصف -এর কালাম। আর صفت হলো যা মাওসূফ এর সাথে সম্পৃক্ত থাকে। যেমন- زيد عالم - زيد এর وصف তার صفت নয়। আর তার ইল্ম যা তার সাথে সম্পৃক্ত صفت , তার وصف নয়। তবে এখানে صفت দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, صفت দ্বারা মুরাদ হলো নামাজের ঐ অবস্থা যা তার আরকান ও আওয়ারিয দ্বারা অর্জন হয়। কারো কারো মতে صفت দ্বারা মুরাদ হলো নামাজের ওয়াজিবাত, ফারায়িয, সুনান এবং মুস্তাহাবসমূহ। এ সুরতে صفت -এর اضافت - صلوة -এর দিকে হবে। এবং اِضَافَتُ الْجُزْءِ اِلَى الْكُلِّ -এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা উপরোক্ত সিফাত এর মধ্য থেকে প্রত্যেকটি সিফত নামাজের জুয তথা অংশ বিশেষ। কেউ কেউ বলেন, এখানে مضاف উহ্য আছে। মূলত ইবারত হবে এভাবে بَابُ صِفَةِ اَجْزَاءِ الصَّلٰوةِ এ সুরতে সিফত দ্বারা কাইফিয়ত মুরাদ হবে। অর্থাৎ উক্ত অধ্যায় নামাজের আজ্যার কাইফিয়ত তথা উযূব, ফরযিয়ত ইত্যাদি সম্পর্কে।

এখানে কিয়াসের তাকাযা হলো ইমাম কুদূরী (র.)-এর فَرَائِضُ الصَّلٰوةِ سِتٌّ বলা কিন্তু তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা ব্যবহারের নিয়ম হলো যদি معدود টা مذكر হয় তাহলে عدد টা مؤنث হবে, আর معدود টা مؤنث হলে عدد টা مذكر হবে। এখানে فرائض . معدود যা فريضة-এর বহুবচন। আর فريضة হলো مؤنث তাই عدد -কে مذكر নেওয়া প্রয়োজন ছিল? এর জবাব হলো এখানে فرائض -কে فروض -এর ব্যাখ্যা নেওয়া হয়েছে। فروض হলো فرض -এর বহুবচন। আর مذكر . فرائض তাই سنة -কে مؤنث লওয়ায় ফায়দা অনুসারে হয়েছে। এ দিকে ইনায়া গ্রন্থকার লিখেন কোনো কোনো নুসখায় فرض الصلوة ست রয়েছে। এ হিসাবে তো শুরু থেকেই কোনো প্রশ্নের অবকাশ থাকে না।

প্রশ্ন : গ্রন্থকার فرائض الصلوة বলেছেন, اركان الصلوة কেন বলেননি? فرائض শব্দটি عام যা اركان ও غير اركان সব কিছুকে শামিল করে। যেমন– এখানে যে تحريمه -এর কথা বলা হয়েছে তা নামাজের ركن নয়; বরং নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত। আর قعده اخيره যদিও ফরজ তবে ركن اصلى নয়। আর ركن اصلى না হওয়ার দলিল হলো, قعده اخيره প্রথম রাকআতে প্রবর্তিত নয়। মুদ্দাকথা, গ্রন্থকার যদি فرائض -এর স্থলে اركان বলতেন, তাহলে تحريمه ইত্যাদি তাতে শামিল হতো না। তাই এমন শব্দ উল্লেখ করেছেন যা সব কিছুকে শামিল করে।

ফরজ ও রুকন-এর সংজ্ঞা : ফরজ : যা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং যা করা অবধারিত, তা ركن হোক বা শর্ত হোক। আর ركن বলা হয়, যা নামাজের ভিতরের অংশ বিশেষ হয়। (বাহ্রুররায়িক) আবার কখনো ফরজ ঐ বিষয়কেও বলা হয় যা রুকনও নয় আবার শর্তও নয়।

নামাজের ফরজসমূহের প্রথমটি হলো– তাহ্রীমা। আভিধানিক অর্থে তাহ্রীমা বলা হয় جَعْلُ الشَّيْءِ مُحَرَّمًا কোনো কিছুকে হারাম করা। এখানে তাহরীমা দ্বারা تكبير اولى মুরাদ। কেননা তাকবীরে উলা দ্বারা ঐ সমস্ত জিনিসকে হারাম করা হয় যা ইতঃপূর্বে হালাল ছিল। পক্ষান্তরে অন্যান্য তাকবীরের উক্ত শান নেই।

আল্লামা ইব্নুল হুমাম (র.) বলেন, তাকবীরকে রূপক অর্থে তাহ্রীমা বলা হয়। কেননা তাহ্রীমা সত্তাগতভাবে তাহ্রীম নয়; বরং তার দ্বারা তাহ্রীম সাবিত হয়। এদিকেই ইশারা করা হয়েছে হাদীস শরীফে

مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ .

নামাজের চাবি হলো তহুর, আর তাহ্রীম হলো তার তাকবীর এবং তার তাহলীল হলো তাসলীম। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

তাকবীরে তাহরীমা ফরজ হওয়ার উপর কয়েকটি দলিল ঃ এক. রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহ্রীমা সম্পর্কে দায়েমীভাবে বলে গেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এভাবে বলা ওয়াজিব হওয়ার আলামত। দুই. ইজমা, কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানা থেকে অদ্যাবধি তাকবীরে তাহ্রীমার ওজূবের ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তিন. আল্লাহ তা'আলার বাণী– وربك فكبر এর মধ্যকার فكبر দ্বারা আল্লাহু আকবার বলা উদ্দেশ্য। কেননা বর্ণিত আছে যখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আল্লাহু আকবার। হযরত খাদীজা (রা.) ও বলেছেন আল্লাহু আকবার এবং খুব খুশি হলেন আর ইয়াকীন করলেন যে, এটা একমাত্র আল্লাহর প্রত্যাদেশ বৈ কি? এ জন্য মুফাস্সিরীনে কেরাম একমত যে, এর দ্বারা তাকবীরে তাহ্রীমা মুরাদ। তা ছাড়া كبر শব্দটি امر -এর صيغه যা وجوب -কে চায়। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নামাজের বাইরে কোনো তাকবীর ওয়াজিব নয়। সুতরাং বুঝা গেল এর দ্বারা নামাজের তাকবীর মুরাদ। তাকবীরে তাহ্রীমা ব্যতীত নামাজের কোনো তাকবীর ওয়াজিব নয়। তাই নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, فكبر দ্বারা তাকবীরে তাহ্রীমা মুরাদ।

দ্বিতীয় ফরজ কিয়াম। ফরজ নামাজ, বিত্র এবং যা ফরজের সাথে সম্পর্কিত যেমন মান্নতের নামাজ। এগুলো দাঁড়িয়ে আদায় করা ফরজ। তবে শর্ত হলো কিয়াম ও সিজ্দা করার শক্তি থাকতে হবে। যদি কিয়াম করতে সক্ষম হয় কিন্তু সিজ্দা করতে না পারে তবে তার জন্য বসে ইশারা করে নামাজ পড়া উত্তম। কিয়াম ফরজ হওয়ার দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

কুনূত অর্থ– ইতা'আত করা। কারো মতে খুশু এবং কারো মতে চুপ থাকা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, কুনূত-এর অর্থ হলো নামাজে দীর্ঘ সময় কেয়াম করা। আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, আল্লাহ তা'আলা কিয়াম-এর امر। (আদেশ) দিয়েছেন। আর امر। (আদেশ) ওজূবের জন্য আসে। কারো মতে নামাজের বাইরে কিয়াম ওয়াজিব নয়। সুতরাং বুঝা গেল নামাজের মধ্যে কিয়াম ফরজ।

তৃতীয় ফরজ কেরাত। দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ উক্ত আয়াতে কেরাতের হুকুম দেওয়া হয়েছে আমর-এর صيغه দ্বারা। আর আমর ওজূবের জন্য আসে। আর নামাজের বাইরে কোনো কেরাত ফরজ নয়। সুতরাং বুঝা গেল নামাজের মধ্যে কেরাত ফরজ। কতটুকুন কেরাত ফরজ এ সংক্রান্ত আলোচনা فصل القراءة -এর মধ্যে করা হবে।

চতুর্থ ফরজ রুকু করা এবং পঞ্চম ফরজ সিজদা করা। দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا উক্ত আয়াতে রুকু ও সিজ্দার আদেশ امر। দ্বারা করা হয়েছে যা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কেউ কেউ বলেন, ইসলামের প্রথম যুগে কিছু কিছু লোক সিজদা করতো কিন্তু রুকু করতো না, আবার কিছু কিছু লোক রুকু করতো কিন্তু সিজদা করতো না। তাই সকলকে আদেশ দেওয়া হলো যে, রুকু ও সিজদা দ্বারা নামাজ আদায় করো। ষষ্ঠ ফরজ তাশাহহুদ পরিমাণ শেষ বৈঠক। অর্থাৎ এ পরিমাণ সময় বসা যাতে التحيات থেকে عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ পর্যন্ত পড়া সম্ভব হয়। দলিল হলো, ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম তাহাবী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) কর্তৃক বর্ণনা করেন যে,

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَخَذَ بِيَدِهٖ وَعَلَّمَ التَّشَهُّدَ

অতঃপর হাদীসের শেষাংশে রয়েছে

اِذَا قُلْتَ هٰذَا اَوْ قَضَيْتَ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلٰوتَكَ اِنْ شِئْتَ اَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ وَاِنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ

হিদায়া গ্রন্থকার উক্ত হাদীসের সমার্থবোধক শব্দ এভাবে নকল করেন–

اِذَا قُلْتَ هٰذَا اَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُكَ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাত ধরে তাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং সর্বশেষ বলেছেন যখন তুমি তা বললে বা করলে তাতে তুমি নামাজ পুরা করে ফেললে। এখন তুমি দাঁড়াতে চাইলে দাঁড়িয়ে যাও অন্যথায় বসতে চাইলে বসে যাও। উক্ত হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের সম্পূর্ণতাকে বসার কাজের সাথে معلق যুক্ত করেছেন। এতে সে তাশাহহুদ পড়ুক বা না পড়ুক। বুঝা গেল তাশাহহুদ পড়া পরিমাণ বসা ফরজ।

এ ছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইব্নুল আস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে,

اِنَّهٗ قَالَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهٗ مِنَ السَّجْدَةِ الْاٰخِيْرَةِ وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ اَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُهٗ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন সে আখেরী সাজদা থেকে মাথা উঠাল এবং তাশাহহুদ পরিমাণ বসল তারপর তার হাদাস হলো এতে তার নামাজ পূর্ণ হয়ে গেল। এ হাদীস দ্বারাও বুঝা গেল তাশাহহুদ পরিমাণ বসা ফরজ। (حاشيه شرح نقايه)।

قَالَ وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ سُنَّةٌ اَطْلَقَ اِسْمَ السُّنَّةِ وَفِيْهَا وَاجِبَاتٌ كَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَضَمِّ السُّوْرَةِ مَعَهَا وَمُرَاعَاتُ التَّرْتِيْبِ فِيْمَا شُرِعَ مُكَرَّرًا مِنَ الْاَفْعَالِ وَالْقَعْدَةِ الْاُوْلٰى وَقِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ فِى الْاَخِيْرَةِ وَالْقُنُوْتِ فِى الْوِتْرِ وَتَكْبِيْرَاتُ الْعِيْدَيْنِ وَالْجَهْرُ فِيْمَا يُجْهَرُ فِيْهِ وَالْمُخَافَتَةُ فِيْمَا تُخَافَتُ فِيْهِ وَلِهٰذَا يَجِبُ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ بِتَرْكِهَا هٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ وَتَسْمِيَتُهَا سُنَّةً فِى الْكِتَابِ لِمَا اَنَّهُ ثَبَتَ وُجُوْبُهَا بِالسُّنَّةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এ ছাড়া আর যা কিছু রয়েছে, তা সুন্নত। ইমাম কুদূরী (র.) এখানে সুন্নত শব্দটি ব্যবহার করেছেন, অথচ তাতে বিভিন্ন ওয়াজিব বিষয়ও রয়েছে। যেমন ফাতিহা পাঠ, তার সাথে সূরা যোগ করা, যে কাজ শরিয়ত কর্তৃক একাধিকবার নির্ধারিত হয়েছে, সেগুলোর মাঝে তারতীব রক্ষা করা। প্রথম বৈঠক, শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ, বিত্‌রের কুনূত, দুই ঈদের তাকবীরসমূহ এবং যে সকল নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করা সে সকল নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ এবং যে সকল নামাজে অনুচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করা হয়, সে সকল নামাজে অনুচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ। এ জন্যই এগুলোর কোনো একটি তরক করলে তার উপর দু'টি সিজ্‌দায়ে সহ্‌ব ওয়াজিব হয়, এটা-ই বিশুদ্ধ অভিমত। কুদূরীতে এগুলোকে সুন্নত বলার কারণ হলো, এগুলোর ওয়াজিবত্ব সুন্নাহ দ্বারা সাবিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শায়খে কুদূরী (র.) বলেন, উপরে বর্ণিত ফরজগুলো ছাড়া সবগুলো সুন্নত। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) সুন্নত শব্দ ব্যবহার করেছেন অথচ তাতে বিভিন্ন ওয়াজিব রয়েছে। তাই এখানে সুন্নত শব্দটির ব্যবহার ঠিক হয়নি?

হিদায়া প্রণেতা উপরোক্ত ইবারতের শেষে জবাব দিতে গিয়ে বলেন, এখানে সুন্নত দ্বারা مَاثَبَتَ بِالسُّنَّةِ মুরাদ, আর ওয়াজিবও সুন্নত দ্বারাই সাব্যস্ত। তাই ওয়াজিবসমূহের উপর সুন্নতের ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু হিদায়া গ্রন্থকারের এ জবাব সহীহ নয়। কেননা এ অবস্থায় جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ লাযিম আসে। কেননা সুন্নত দ্বারা سنن মুরাদ নেওয়া হলো (حقيقت) হাকীকত। আর মুরাদ নেওয়া হলো واجبات মুরাদ নেওয়া হলো مجاز তাই এখানে যেহেতু উভয়টি মুরাদ, এ কারণে حقيقت ও مجاز একসাথে হওয়া লাযিম আসে। এর জবাব হলো, ইমাম কুদূরী (র.)-এর فَهُوَ سُنَّةٌ দ্বারা ثَابِتٌ بِالسُّنَّةِ মুরাদ। আর سنن ও واجبات যা উক্ত অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে সেগুলো উক্ত সকলের (ثابت بالسنة) -এর অধীনে হাকীকাতান দাখিল তথা মৌলিকভাবে অন্তর্ভুক্ত। তাই جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ -এর প্রশ্ন আর উত্থাপিত হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার ওয়াজিব বিষয়গুলোর বর্ণনা দিয়ে গিতে বলেছেন যেমন– সূরায়ে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব, ফাতিহার সাথে অন্য সূরা যোগ করা ওয়াজিব। যে সকল কাজ এক রাকআতে একাধিকবার করার নির্দেশ রয়েছে সেগুলোর মাঝে তারতীব রক্ষা করাও ওয়াজিব। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি ভুলক্রমে প্রথম রাকআতের দ্বিতীয় সিজদা ছেড়ে দেয় এবং দাঁড়িয়ে নামাজ পুরা করে, তারপর তার স্মরণ হয়। এখন সে তার অনাদায়ী সিজদা আদায় করবে এবং তারতীব রক্ষা না করার কারণে সিজ্‌দায়ে সাহ্‌ব দিবে। তার এ স্মরণ সালামের আগে হোক বা পরে হোক। তবে শর্ত হলো নামাজ ভঙ্গকারী কোনো কাজ তার থেকে না হওয়া। প্রথম বৈঠক, শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ পাঠ, বিতরের নামাজে দোয়ায়ে কুনূত পড়া, দুই ঈদের তাকবীরসমূহ এবং যে সকল নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করা হয় সে সকল নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করা। আর যে সকল নামাজে অনুচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করা হয় সে সকল নামাজে অনুচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করা ও ওয়াজিব। এ কারণেই এগুলোর কোনো একটি যদি ছুটে যায় তবে সিজ্‌দায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হবে।

<u>ফায়িদা :</u> এখানে ওয়াজিব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেগুলো ব্যতীত নামাজ সহীহ হয়ে যায়। তবে ভুলক্রমে তরক করার দ্বারা সিজ্‌দায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হবে। আর সুন্নত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো। যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা করেছেন, ওজর ব্যতীত কখনো তরক করেননি। যেমন– ছানা, আউযুবিল্লাহ পড়া, রুকুর তাকবীরসমূহ ইত্যাদি। নামাজের কিছু আদাবও রয়েছে। আর নামাজের আদাব হলো, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো করেছেন তবে সর্বদা করেননি। যেমন– রুকূ সিজ্‌দায় তিনের অধিক তাসবীহ্‌ পড়া, কেরাতে মাস্‌নূনার অধিক কেরাত পড়া।

وَاِذَا شَرَعَ فِي الصَّلٰوةِ كَبَّرَ لِمَا تَلَوْنَا وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) حَتّٰى اَنَّ مَنْ يُحْرِمُ لِلْفَرْضِ كَانَ لَهُ اَنْ يُؤَدِّيَ بِهَا التَّطَوُّعَ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهَا مَا يُشْتَرَطُ لِسَائِرِ الْاَرْكَانِ وَهٰذَا اٰيَةُ الرُّكْنِيَّةِ وَلَنَا اَنَّهُ عَطَفَ الصَّلٰوةَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى وَمُقْتَضَاهُ الْمُغَايَرَةُ وَلِهٰذَا لَايَتَكَرَّرُ كَتَكْرَارِ الْاَرْكَانِ وَمُرَاعَاةُ الشَّرَائِطِ لِمَا يَتَّصِلُ بِهٖ مِنَ الْقِيَامِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرِ وَهُوَ سُنَّةٌ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهِ وَهٰذَا اللَّفْظُ يُشِيْرُ اِلٰى اِشْتِرَاطِ الْمُقَارَنَةِ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ وَالْمَحْكِيُّ عَنِ الطَّحَاوِيِّ وَالْاَصَحُّ اَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اَوَّلًا ثُمَّ يُكَبِّرُ لِاَنَّ فِعْلَهُ نَفْيُ الْكِبْرِيَاءِ عَنْ غَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالنَّفْيُ مُقَدَّمٌ ـ

অনুবাদ : যখন নামাজ শুরু করবে তখন তাকবীর বলবে। ইতঃপূর্বে আমাদের পঠিত আয়াতের কারণে। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ তাকবীর হলো নামাজের তাহ্রীম। আমাদের মতে তাকবীরে তাহ্রীমা হলো নামাজের শর্ত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। (তার মতে এটা রুকন) (আমাদের মতে শর্ত হওয়ার কারণেই) যে ফরজের তাহ্রীমা বাঁধবে, সে ঐ তাহ্রীমা দ্বারা নফল নামাজ আদায় করতে পারবে। তিনি (ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, অন্যান্য রুকনের জন্য যেসব শর্ত রয়েছে, তাহ্রীমার জন্যও সে সব শর্ত রয়েছে। আর এটি রুকন হওয়ার আলামত। আমাদের যুক্তি হলো, وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى (সে তার প্রতিপালকের নাম নিল অতঃপর নামাজ আদায় করল) এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাকবীরের উপর সালাতকে আত্ফ করেছেন। আর আত্ফ-এর দাবি হলো বৈপরীত্য। আর এ কারণেই অন্যান্য রুকনের তাকরারের মতো এটি তাকরার হয় না। (রুকন সমূহের) যাবতীয় শর্ত এখানে বিবেচনা করার কারণ হচ্ছে, কিয়াম রুকনটি তার সংলগ্ন। তাকবীরের সাথে উভয় হাত উত্তোলন করবে। এটি সুন্নত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা নিয়মিত করেছেন। আর এই (مع) শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে যে, তাকবীর ও উভয় হাতের উত্তোলন একত্রে হওয়া শর্ত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে এ মতামত বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম তাহাবী (র.) এ আমল করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তবে বিশুদ্ধতম মত হলো, প্রথমে উভয় হাত উঠাবে, তারপর তাকবীর বলবে। কেননা তার এ কাজ গায়রুল্লাহ থেকে বড়ত্বের অস্বীকৃতি জ্ঞাপক। আর অস্বীকৃতি স্বীকৃতির উপর অগ্রবর্তী হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যখন নামাজ আরম্ভ করবে, নামাজ ফরজ বা নফল হোক। তখন দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীর বলবে। সুতরাং কেউ যদি বসে তাকবীর বলে পরে দাঁড়িয়ে যায়, তবে সে নামাজ আরম্ভকারী হবে না। যদি কোনো কোনো ব্যক্তি নামাজে শরিক হওয়ার আশায় এসে ইমামকে রুকুতে পায় এবং সে পিঠ ঝুকানো অবস্থায় তাকবীর বলে। এ অবস্থায় সে যদি তাকবীর বলার সময় কিয়ামের নিকটবর্তী হয়, তবে তার তাকবীর বলা জায়েজ হবে, অন্যথায় জায়েজ হবে না। আর যদি কোনো ব্যক্তি ইমামকে রুকুতে পায়। অতঃপর দাঁড়ানো অবস্থায় রুকুর তাকবীর বলে তাও জায়েজ হবে। কেননা এ অবস্থায় তার দাঁড়ানোকেই তাকবীরে তাহরীমার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

দলিল হলো, ইতঃপূর্বে আমাদের পাঠিত আয়াত অর্থাৎ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ দ্বিতীয় দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আমাদের মতে তাকবীরে তাহ্‌রীমা শর্ত। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে রুকন।

মূল মতবিরোধ এভাবে প্রকাশ পাবে যে, আমাদের মতে যেহেতু তাকবীরে তাহ্‌রীমা শর্ত, তাই ফরজের তাহ্‌রীমা দ্বারা নফল আদায় করা জায়েজ হবে। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে যেহেতু রুকন, তাই ফরজের তাহ্‌রীমা দ্বারা নফল আদায় করা জায়েজ হবে না। কারণ হলো, এক শর্তের সাথে অনেক নামাজ আদায় করা জায়েজ; কিন্তু এক রুকনের সাথে জায়েজ নয়।

মোটকথা, তাকবীরে তাহ্‌রীমা রুকন হওয়ার উপর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, তাকবীরে তাহ্‌রীমার জন্য প্রত্যেক ঐ জিনিস শর্ত যা অন্যান্য রুকনের জন্যও শর্ত। যেমন– তাহারাত, সতর ঢাকা, কিবলামুখী হওয়া, নিয়ত এবং ওয়াক্ত। অর্থাৎ এ সকল জিনিস যেমনিভাবে কিয়াম, কেরাত, রুকু এবং সিজ্‌দা ইত্যাদি আরকানের জন্য শর্ত এমনিভাবে তাকবীরে তাহ্‌রীমার জন্যও শর্ত। আর যে সকল জিনিস সমস্ত রুকনের জন্য শর্ত হয় তা ঐ জিনিসের রুকন হওয়ার আলামত বহন করে। অর্থাৎ অন্যান্য আরকানের উপর কিয়াস করে তাকেও রুকন সাব্যস্ত করা হবে। আমাদের দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى -এর মধ্যে فَصَلّٰى -এর عطف করা হয়েছে وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ -এর উপর অর্থাৎ তাকবীরে তাহ্‌রীমার উপর করা হয়েছে। আর عطف -এর চাহিদা হলো مغايرت অর্থাৎ معطوف ও معطوف عليه -এর মাঝে ভিন্নতা হওয়া। এখন যদি তাকবীরে তাহ্‌রীমাকে রুকন ধরা হয়। তখন جزء -এর উপর كل -কে عطف করা লাযিম থাকে। আর যেহেতু كل ঐ جزء -কেও শামিল করে তাই عَطْفُ الشَّيْءِ عَلٰى نَفْسِهٖ লাযিম আসে যা জায়েজ নেই। এ জন্য আমরা বলেছি যে, তাকবীরে তাহ্‌রীমা রুকন নয় বরং শর্ত। আর যেহেতু شَرْطُ الشَّيْءِ শর্তের خارج হয়। তাই তাকবীরে তাহ্‌রীমাও নামাজের মাঝে مغاير হয়ে যাবে। আর عطفও জায়েজ হয়ে যাবে। সুতরাং বুঝা গেল তাকবীরে তাহরীমা নামাজের শর্ত, নামাজের রুকন নয়। দ্বিতীয় দলিল হলো, তাকবীরে তাহ্‌রীমা অন্যান্য আরকানের ন্যায় বারবার হয় না। যা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, তাকবীরে তাহ্‌রীমা রুকন নয়। নচেৎ অন্যান্য আরকানের ন্যায় বারবার হতো।

وَمُرَاعَاةُ الشَّرْطِ দ্বারা ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের খোলাসা হলো, উপরোক্ত শারায়েত যেমন– তাহারাত, সতর ঢাকা ইত্যাদির অবলম্বন করা শুধু তাহ্‌রীমার জন্য নয়; বরং কিয়ামের জন্য, যা তাহ্‌রীমার সাথে মুত্তাসিল। আর তা হলো রুকন। সুতরাং এর দ্বারা তাহ্‌রীমার রুকন সাবিত হয় না; বরং কিয়াসের রুকন হওয়া সাবিত হয়।

وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, পুরুষ উভয় হাত তাকবীরের সাথে উত্তোলন করবে। নামাজের শুরুতে এ হাত উত্তোলন করা সুন্নত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ সবসময় এ আমল করেছেন। আর এটা সুন্নত হওয়ার আলামত। অতঃপর হাত উত্তোলনের উত্তম সময় নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

শায়খুল ইসলাম ও কাজী খান (র.) বলেন, তাকবীর ও হাত একত্রে উত্তোলন করা উত্তম। কুদূরীর ইবারতে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা কুদূরী গ্রন্থকার বলেছেন, وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرِ এখানে مع শব্দটি مقارنت সম্পৃক্ততার উপর বুঝায়। এটাই হলো ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত এবং ইমাম তাহাবী (র.)ও এর উপর আমল করেছেন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, বিশুদ্ধতম মাযহাব হলো প্রথমে উভয় হাত উঠানো তারপর তাকবীর বলা। সাধারণ মাশায়িখগণ এ মতটিই ব্যক্ত করেছেন। দলিল হলো, নামাজির فعل -এ نفي এবং قول -এ اثبات -এর অর্থ পাওয়া যায়। আর তা এভাবে যে, যখন সে হাত উঠায় তখন গায়রুল্লাহ থেকে বড়ত্বের অস্বীকৃতি বুঝায়। আবার যখন আল্লাহু আকবার বলে তখন আল্লাহর বড়ত্ব বুঝায়। আর কায়েদা আছে যে, نفي ও اثبات -এর মধ্যে نفي টি اثبات -এর উপর মুকাদ্দাম হয়। যেমন কালিমায়ে শাহাদাতের মধ্যে نفي মুকাদ্দাম। এ কারণে উত্তম হলো প্রথমে হাত উঠাবে, তারপর তাকবীর বলবে। বিশুদ্ধ মতামতটির সমর্থন ওয়ায়েল ইবনে হুজরের হাদীস দ্বারাও পাওয়া যায়। হাদীসটি হলো এই– إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ قَامَ إِلَى الصَّلٰوةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত উঠাতেন তারপর তাকবীর বলতেন। কিন্তু হিদায়া গ্রন্থকার উক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেননি। কেননা হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস এর বিরোধী। হাদীসটি হলো عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজ আরম্ভ করতেন তাকবীর বলতেন তারপর উভয় হাত উঠাতেন।– (শরহে নিকায়া)

وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) يَرْفَعُ إِلٰى مَنْكِبَيْهِ وَعَلٰى هٰذَا تَكْبِيرَةُ الْقُنُوتِ وَالْأَعْيَادِ وَالْجَنَازَةِ لَهُ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلٰى مَنْكِبَيْهِ وَلَنَا رِوَايَةُ وَائِلِ ابْنِ حُجْرٍ وَالْبَرَاءِ وَأَنَسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ وَلِأَنَّ رَفْعَ الْيَدِ لِإِعْلَامِ الْأَصَمِّ وَهُوَ بِمَا قُلْنَاهُ وَمَا رَوَاهُ يُحْمَلُ عَلٰى حَالَةِ الْعُذْرِ وَالْمَرْأَةُ تَرْفَعُ يَدَيْهَا حِذَاءَ مَنْكِبَيْهَا هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا ـ

অনুবাদ : উভয় হাত এতটা উঠাবে, যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলী দু'টো কানের লতিকার বরাবর হয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে উভয় হাত কাধ পর্যন্ত উঠাবে। কুনূতের তাকবীর ঈদের তাকবীর ও জানাযার তাকবীর সম্পর্কেও একই মতপার্থক্য। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো আবূ হুমাইদ সাঈদী বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বলতেন, তখন উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন। আমাদের দলিল হলো, উয়ায়েল ইবনে হুজর, বারা ও আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকবীর বলতেন, তখন উভয় হাত তাঁর কান পর্যন্ত উঠাতেন। তা ছাড়া হাত উঠানোর উপকারিতা হলো বধিরদেরকে অবহিতকরণ। আর তা ঐ ভাবেই সম্ভব, যেভাবে আমরা বলেছি। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.) বর্ণিত হাদীসকে অপারগতার উপর আরোপ করা হবে। স্ত্রীলোক তার উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা এটা তার সতর রক্ষার জন্য অধিক উপযোগী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : তাকবীরে তাহ্‌রীমার সময় উভয় হাত এতটা উঠাবে যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি দু'টো উভয় কানের লতিকার বরাবর হয়। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মালিক (র.) বলেন, কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। ইমাম আহমদ (র.) থেকেও এমনটি বর্ণনা রয়েছে। কুনূতের তাকবীর, দু ঈদের তাকবীর এবং জানাযার তাকবীর সম্পর্কেও একই মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, আবূ হুমাইদ সাঈদী বর্ণিত হাদীস–

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَذَكَرْنَا صَلٰوةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَلٰوةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُهُ إِذْ أَكْبَرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ (بخاری)

মুহাম্মদ ইবনে আতা থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাহাবীদের এক জামা'আতের সাথে বসাছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে আমর বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজ নিয়ে আলোচনা করতে ছিলাম, তখন আবূ হুমাইদ সাঈদী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামাজকে আপনাদের তুলনায় বেশি হিফ্‌জ করেছি (মনে রেখেছি)। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি, যখন তিনি তাকবীর বলতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। (বুখারী) হিদায়া গ্রন্থকার উক্ত হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন– كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلٰى مَنْكِبَيْهِ উভয় হাদীস দ্বারা বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহ্‌রীমার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। আমাদের দলিল ঐ হাদীস যা ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.), বারা ইবনে আযিব এবং হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন– إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ (حاکم) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকবীর বলতেন তখন উভয় হাত কান বরাবর উঠাতেন।– (হাকিম)

দারে কুত্‌নী উক্ত হাদীস হযরত আনাস (রা.) সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ إِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ .

অর্থাৎ যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ আরম্ভ করতেন, তাকবীর বলতেন। তারপর উভয় হাত এতটা উঠাতেন যে, বৃদ্ধাঙ্গুলি দু'টো কানের লতিকার বরাবর হয়ে যেতো।

আমাদের মাযহাবের সমর্থনে আকলী দলিল হলো, তাকবীরে তাহ্‌রীমার সময় হাত উঠানো হয় বধিরদেরকে অবহিত করানোর জন্য। আর তা ঐ ভাবেই সম্ভব যেভাবে আমরা বলেছি। অর্থাৎ কান পর্যন্ত হাত উঠানোর সাথে। কেননা ইমাম যখন কান পর্যন্ত হাত উঠাবে তখন বধির লোকেরা বুঝতে পারবে যে, তাকবীর বলা হয়েছে। তখন তারাও তাকবীর বলে নামাজ আরম্ভ করে দিবে। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তাকবীরের সময় হাত উঠানো যদি বধিরদেরকে অবহিতকরণ হয় তাহলে একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি তো কান পর্যন্ত হাত উঠাবে না। কেননা তার ব্যাপারে তো এ কারণ পাওয়া যায় না? এর জবাব হলো, আসল তো হলো জামা'আতের সাথে আদায় করা। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির নামাজ তো হলো نادر আর نادر-এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কেননা ফায়দা আছে, اَلنَّادِرُ كَالْمَعْدُوْمِ তারপর অপর প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে তো মুকতাদীরও কান পর্যন্ত হাত উঠানোর কোনো প্রয়োজন নেই? জবাব হলো, বধির লোকেরা সর্বশেষ কাতারে দাঁড়াবে, তাই তারা ইমামকে দেখতে পায় না। এ অবস্থায় তারা তাদের সামনের মুকতাদীদেরকে দেখেই নামাজ আরম্ভ করবে। এ কারণে মুকতাদীদেরও কান পর্যন্ত হাত উঠানো জরুরি। গ্রন্থকার বলেন, (ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিলের জবাবে) তার বর্ণিত হাদীসকে অপারগতার অবস্থার উপর আরোপ করা হবে। যেমন ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) সূত্রে বর্ণিত–

إِنَّهُ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدْتُهُمْ يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى الْأُذُنَيْنِ ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَابِلٍ وَعَلَيْهِمُ الْأَكْسِيَةُ وَالْبَرَانِسُ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ فَوَجَدْتُهُمْ يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ .

ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় গেলাম তখন দেখলাম যে, লোকেরা (তাকবীরে তাহ্‌রীমার সময়) স্বীয় হাত কান পর্যন্ত উঠাচ্ছেন। পরবর্তী বছর আমি (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে) হাজির হলাম। লোকেরা প্রচণ্ড শীতের কারণে, কাপড়-চোপড় এবং এমন পোশাক পরে আছেন যার কিছু অংশ টুপির কাজে আসে। তখন দেখলাম তারা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাচ্ছেন। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) উক্ত হাদীসে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ঐ সকল লোকদের কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো তাদের পোশাকের কারণে ছিল। সুতরাং حَدِيْثُ إِلَى الْمَنَاكِبِ অপারগতার উপর আরোপ করা হবে।

শরহে নিকায়ার গ্রন্থকার উভয় হাদীসে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, يد দ্বারা হাতের তালু এবং তার উপরিভাগ মুরাদ। সুতরাং হতে পারে হাতের তালুর কিনারা এবং গোড়ালি কাঁধ বরাবর ছিল আর শুধু হাতের তালু কান বরাবর ছিল। এতে উভয় হাদীসের মাঝে কোনো বিরোধ থাকে না।

وَالْمَرْأَةُ تَرْفَعُ يَدَيْهَا الخ গ্রন্থকার এর দ্বারা বলতেছেন যে, স্ত্রীলোক তাকবীরে তাহ্‌রীমার সময় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, স্ত্রীলোকেরা কান পর্যন্ত হাত উঠাবে। কারণ হলো, رفع يديه হাতের তালু দ্বারা হয়। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, স্ত্রীলোকদের হাতের তালু সতর নয়। তাই কান পর্যন্ত হাত উঠানোর ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলা বরাবর।

বিশুদ্ধ মতের কারণ হলো, কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানোর সময় মহিলাদের জন্য অধিক পর্দা নিহিত। তাই তাদের কাঁধ পর্যন্তই হাত উঠানো অধিক সমীচীন।

فَإِنْ قَالَ بَدَلَ التَّكْبِيرِ اللّٰهُ أَجَلُّ أَوْ أَعْظَمُ أَوِ الرَّحْمٰنُ أَكْبَرُ أَوْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى أَجْزَاهُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَمُحَمَّدٍ (رح) وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رح) إِنْ كَانَ يُحْسِنُ التَّكْبِيْرَ لَمْ يَجُزْ إِلَّا قَوْلُهُ اللّٰهُ أَكْبَرُ أَوْ اللّٰهُ الْأَكْبَرُ أَوْ اللّٰهُ الْكَبِيْرُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يَجُوْزُ إِلَّا بِالْأَوَّلَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ (رح) لَا يَجُوْزُ إِلَّا بِالْأَوَّلِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَنْقُوْلُ وَالْأَصْلُ فِيْهِ التَّوْقِيْفُ وَالشَّافِعِيُّ (رح) يَقُوْلُ إِدْخَالُ الْأَلِفِ وَاللَّامِ أَبْلَغُ فِي الثَّنَاءِ فَقَامَ مَقَامَهُ وَأَبُوْ يُوْسُفَ (رح) يَقُوْلُ إِنَّ أَفْعَلَ وَفَعِيْلًا فِيْ صِفَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى سَوَاءٌ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ لَا يُحْسِنُ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ إِلَّا عَلَى الْمَعْنٰى وَلَهُمَا أَنَّ التَّكْبِيْرَ هُوَ التَّعْظِيْمُ لُغَةً وَهُوَ حَاصِلٌ ـ

অনুবাদ : যদি তাকবীরের পরিবর্তে اَللّٰهُ اَجَلُّ বা اَللّٰهُ اَعْظَمُ বা اَلرَّحْمٰنُ اَكْبَرُ বা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কিংবা আল্লাহর অন্যান্য নাম (ও গুণ) উচ্চারণ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা যথেষ্ট হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, যদি সে তাকবীর শুদ্ধ উচ্চারণে সক্ষম হয়, তাহলে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বা اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ অথবা اَللّٰهُ الْكَبِيْرُ ছাড়া অন্য কিছু জায়েজ হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, প্রথম দু'টি ছাড়া (اَللّٰهُ اَكْبَرُ ও اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ) অন্য কিছু জায়েজ হবে না। আর ইমাম মালিক (র.) বলেন, প্রথমটি ছাড়া (অর্থাৎ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ছাড়া) অন্য কিছু জায়েজ হবে না। কেননা (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল রূপে) এটিই বর্ণিত হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে শুধু বর্ণিত হাদীস থেকে জ্ঞান লাভ করাই আসল। ইমাম শাফি'ঈ (র.) (নীতিগতভাবে ইমাম মালিকের যুক্তি স্বীকার করে) বলেন, اَلْاَلِفُ وَاللَّامُ যুক্ত করা প্রশংসার ক্ষেত্রে অধিক অর্থবহ। সুতরাং এটিই তার স্থলবর্তী। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে اَفْعَلُ ও فَعِيْلٌ উভয় মাপের শব্দ সমার্থক। (সুতরাং اَكْبَرُ ও كَبِيْرُ উভয় শব্দেই তাকবীর বৈধ হবে) তবে তাকবীরের শুদ্ধ উচ্চারণে অক্ষমতার বিষয়টি ব্যতিক্রম। (অর্থাৎ তখন অন্যান্য শব্দে তাকবীর বলার সুযোগ দেওয়া হবে।) কেননা তখন তো সে মর্ম প্রকাশেই শুধু সক্ষম। (সুতরাং যে কোনো ভাবে মর্ম প্রকাশই তার জন্য যথেষ্ট হবে এবং নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণে বাধ্যবাধকতা তার উপর থেকে তুলে নেওয়া হবে।) ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর যুক্তি হলো, তাকবীরের আভিধানিক অর্থ হলো মর্যাদা প্রকাশ। আর তা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে নামাজ আরম্ভ করার শব্দসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তরফাইন (র.)-এর মতে প্রত্যেক ঐ শব্দ দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা জায়েজ যা আল্লাহর তা'জীম বা মর্যাদা প্রকাশ করে। যেমন– اَللّٰهُ اَكْبَرُ বা اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ বা اَللّٰهُ বা سُبْحَانَ اللّٰهِ বা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বা اَلرَّحْمٰنُ اَكْبَرُ বা اَللّٰهُ اَعْظَمُ বা اَللّٰهُ اَجَلُّ বা اَللّٰهُ الْكَبِيْرُ বা كَبِيْرُ

কিংবা আল্লাহর অন্যান্য নাম বা গুণের কোনো শব্দ। এগুলোর যে কোনো শব্দ দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা হোক সব জায়েজ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, যদি সে তাকবীরের শুদ্ধ উচ্চারণে সক্ষম হয় তবে শুধু তিন শব্দের তথা اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ - اَللّٰهُ الْكَبِيْرُ -এর মধ্য থেকে কোনো একটি শব্দ দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা জায়েজ। এগুলো ছাড়া অন্য কোনো শব্দ দ্বারা জায়েজ নেই। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, শুধু اَللّٰهُ اَكْبَرُ ও اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ দ্বারা আরম্ভ করা জায়েজ। ইমাম মালিক (র.) বলেন, শুধু اَللّٰهُ اَكْبَرُ দ্বারা জায়েজ। ইমাম আহমদ (র.) ও এ মত পোষণ করেন। ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুধু اَللّٰهُ اَكْبَرُ ই বর্ণিত হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে শুধু বর্ণিত হাদীস থেকে জ্ঞান লাভ করাই আসল। তাই অন্যকোনো শব্দ দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা জায়েজ হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ কে الف ولام এর দ্বারা যুক্ত করা প্রশংসার ক্ষেত্রে অধিক অর্থ বহ। সুতরাং এটিও اَللّٰهُ اَكْبَرُ -এর স্থলবর্তী।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলির ক্ষেত্রে اَفْعَلُ-এর ওযনে اسم تفضيل এবং فَعِيْلٌ بِمَعْنٰى فَاعِلٍ সমার্থবোধক। কেননা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিতে বেশি সাবিত করা মুরাদ নয়। কারণ, আসল বড়ত্বের মধ্যে আল্লাহর সামকক্ষ কেউ নেই। এজন্য আল্লাহর গুণাবলিতে اَفْعَلُ ও فَعِيْلٌ বরাবর। তবে সে ব্যক্তি যদি ভালোভাবে শুদ্ধ করে তাকবীর বলতে সক্ষম না হয়, তখন যেভাবে পারে তা'যীমের মর্ম আদায় করে দিবে। কেননা তখন তো সে শুধু মর্ম প্রকাশেই সক্ষম।

তরফাইনের দলিল হলো, তাকবীরের আভিধানিক অর্থ হলো মর্যাদা প্রকাশ করা। আল্লাহর বাণী– وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ অর্থাৎ فعظم অন্য আয়াত فَلَمَّا رَأَيْنَهٗ اَكْبَرْنَهٗ অর্থাৎ عظمنه -এর অর্থে এসেছে। আর মর্যাদার অর্থ ঐ সকল শব্দ দ্বারা হাসিল হয়ে যায় যা আমরা বর্ণনা করেছি। এ জন্য ঐ সকল শব্দ দ্বারা নামাজ আরম্ভ করলে আদায় হয়ে যাবে, যা আল্লাহর তা'যীমকে বুঝায়।

فَإِنِ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ قَرَأَ فِيْهَا بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ ذَبَحَ وَسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَاهُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَا يُجْزِيْهِ إِلَّا فِي الذَّبِيْحَةِ وَإِنْ لَمْ يُحْسِنِ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَاهُ أَمَّا الْكَلَامُ فِي الْإِفْتِتَاحِ فَمُحَمَّدٌ (رحـ) مَعَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) فِي الْعَرَبِيَّةِ وَمَعَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) فِي الْفَارِسِيَّةِ لِأَنَّ لُغَةَ الْعَرَبِ لَهَا مِنَ الْمَزِيَّةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْقِرَاءَةِ فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقُرْاٰنَ اِسْمٌ لِمَنْظُوْمٍ عَرَبِيٍّ كَمَا نَطَقَ بِهِ النَّصُّ إِلَّا أَنَّ عِنْدَ الْعَجْزِ يُكْتَفٰى بِالْمَعْنٰى كَالْإِيْمَاءِ بِخِلَافِ التَّسْمِيَةِ لِأَنَّ الذِّكْرَ يَحْصُلُ بِكُلِّ لِسَانٍ وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَإِنَّهُ لَفِيْ زُبُرِ الْأَوَّلِيْنَ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهَا بِهٰذِهِ اللُّغَةِ وَلِهٰذَا يَجُوْزُ عِنْدَ الْعَجْزِ إِلَّا أَنَّهُ يَصِيْرُ مُسِيْئًا لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ الْمُتَوَارِثَةِ وَيَجُوْزُ بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ سِوَى الْفَارِسِيَّةِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِمَا تَلَوْنَا وَالْمَعْنٰى لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ اللُّغَاتِ وَالْخِلَافُ فِي الْإِعْتِدَادِ وَلَا خِلَافَ فِيْ أَنَّهُ لَا فَسَادَ وَيُرْوٰى رُجُوْعُهُ فِيْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِلٰى قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الْإِعْتِمَادُ وَالْخُطْبَةُ وَالتَّشَهُّدُ عَلٰى هٰذَا الْإِخْتِلَافِ وَفِي الْأَذَانِ يُعْتَبَرُ التَّعَارُفُ ـ

অনুবাদ : যদি ফারসিতে নামাজ শুরু করে, কিংবা ফারসি ভাষায় কেরাত পাঠ করে, কিংবা জবাই করার সময় ফারসি ভাষায় বিসমিল্লাহ পড়ে অথচ সে শুদ্ধ আরবি বলতে পারে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা যথেষ্ট হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, পশু জবাই ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট হবে না। তবে যদি শুদ্ধ আরবি বলতে সক্ষম হয়, তাহলে যথেষ্ট হবে। নামাজের প্রারম্ভ (তথা তাকবীর) প্রসঙ্গে কথা হলো, তা আরবি ভাষায় হলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে একমত। (অর্থাৎ আরবি ভাষায় হলে তাযীম জ্ঞাপক যে কোনো বাক্য যথেষ্ট হবে।) পক্ষান্তরে ফারসি ভাষায় হলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সঙ্গে একমত। (অর্থাৎ ফারসি ভাষায় তাকবীরে তাহ্‌রীমা বৈধ হবে না।) কেননা আরবি ভাষায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য ভাষায় নেই। কেরাত প্রসঙ্গে সাহেবাইনের বক্তব্যের দলিল হলো, কুরআন আরবি শব্দ সমষ্টির নাম, যেমন কুরআনের আয়াতে তা বলা হয়েছে। (কেননা কুরআন রয়েছে قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا) তবে অপারগতার সময় শুধু ভাব ও মর্মকেই যথেষ্ট মনে করা হবে। যেমন– (রুকূ সিজদা আদায়ে অপারগতার সময়) ইশারাকে যথেষ্ট মনে করা হয়। (তবে জবাইয়ের সময়) বিসমিল্লাহর বিষয়টি ব্যতিক্রম। কেননা আল্লাহর জিকির যে কোনো ভাষায় হতে পারে। (অর্থাৎ সেখানে আল্লাহর জিকিরই হলো মূল উদ্দেশ্য। শব্দ বা ভাষা মুখ্য নয়।) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী– وَإِنَّهُ لَفِيْ زُبُرِ الْأَوَّلِيْنَ নিঃসন্দেহে এ কুরআন পূর্ববর্তীতের কিতাবসমূহে

বিদ্যমান ছিল। আর সেখানে তা এ ভাষায় অবশ্যই ছিল না। এ কারণেই অপারগতার সময় অন্য ভাষায় জায়েজ রয়েছে। ক্রমাগত অনুসৃত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণের কারণে সে গুনাহগার হবে। আর আমাদের পেশকৃত আয়াতের আলোকে ফারসি ছাড়া অন্য যে কোনো ভাষায়ও জায়েজ হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা ভাষার ভিন্নতার কারণে মর্ম ভিন্ন হয় না। (উপরোক্ত) মতপার্থক্যটি হলো গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে। নামাজ ফাসিদ না হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। বর্ণিত আছে যে, মূল মাসআলায় ইমাম সাহেব উক্ত ইমামদ্বয়ের বক্তব্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর তা-ই নির্ভরযোগ্য। (কেননা ইমাম সাহেবের প্রথম বক্তব্য দৃশ্যত কিতাবুল্লাহর সাথে বিরোধপূর্ণ. কেননা কুরআন নিজেকে اَلْقُرْاٰنُ الْعَرَبِیُّ আখ্যায়িত করেছে।) খুতবা ও তাশাহ্হুদ সম্পর্কেও অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে : আর আযানের ব্যাপারে স্থানীয় প্রচলন বিবেচ্য হবে। (অর্থাৎ আযানের ভাষারূপে যা প্রচলিত এবং মানুষের কাছে আযান রূপে যা পরিচিত, সেটাই হবে আযানের ভাষা। সুন্নতের বিরুদ্ধাচরণের কারণে ভীষণ গুনাহ হবে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফারসি ভাষায় নামাজ আরম্ভ করা, নামাজের মাঝখানে ফারসিতে কেরাত পড়া, জবাই করার সময় ফারসি ভাষায় বিস্মিল্লাহ বলা যেমন– بنام خدائے بزرگ বলা। ইমাম আযম (র.)-এর মতে জায়েজ। চাই সে শুদ্ধভাবে আরবি বলতে পারুক বা না পারুক। সাহেবাইন (র.)-এর মতে যদি সে আরবি বলতে সক্ষম হয় তাহলে ফারসি দ্বারা জায়েজ হবে না। তবে জবাই করার সময় ফারসি ভাষা এমনকি প্রত্যেক ভাষায় বিস্মিল্লাহ বলা জায়েজ আছে। আর যদি সে আরবির উপর সক্ষম না হয় তবে সবকিছু জায়েজ।

<u>তাকবীরে তাহ্রীমা প্রসঙ্গ :</u> তাকবীরে তাহ্রীমা আদায়ের ক্ষেত্রে আরবি ভাষা হলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফার (র.) সঙ্গে একমত। অর্থাৎ যেমনিভাবে ইমাম সাহেবের মতে প্রত্যেক ঐ শব্দ দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা জায়েজ যা আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব বুঝায়, এমনিভাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতেও ঐ সকল শব্দ দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা জায়েজ। আর ফারসি ভাষা হলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সঙ্গে একমত। অর্থাৎ আরবি ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় তাকবীরে তাহ্রীমা বলা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতেও নাজায়েজ। মোট কথা, আরবির উপর সমর্থ থাকা অবস্থায় অন্য ভাষায় তাকবীরে তাহ্রীমা বলা সাহেবাইনের মতে নাজায়েজ। এর দলিল হলো, আরবি ভাষায় এমন বিশেষত্ব রয়েছে যা অন্য কোনো ভাষায় নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাণী— تَفْضِيْلُ لِسَانِ الْعَرَبِ عَلٰى سَائِرِ الْاَلْسِنَةِ اَنَا عَرَبِیٌّ وَالْقُرْاٰنُ عَرَبِیٌّ وَلِسَانُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِیٌّ। আরবি ভাষায় ফজিলত সকল ভাষার উপর রয়েছে। কেননা আমি আরবি, কুরআন আরবি এবং জান্নাতীদের ভাষাও আরবি।

ভিন্ন ভাষায় কেরাত সম্পর্কে সাহেবাইনের দলিল হলো, নামাজের মধ্যে যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হলো কুরআনের কেরাত। আর কুরআন এমন আরবি শব্দসমষ্টির নাম যা অর্থকে বুঝায়, মাস্হাফে লিখিত এবং আমাদের পর্যন্ত ধারাবাহিকতাবে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا মোট কথা হলো مامور به হলো কুরআনের কেরাত, আর তা হলো আরবি। এ জন্য আরবি ভাষায় কেরাত পড়া ফরজ হবে। এর তাকাযা তো হলো, অপারগতার সময়ও আরবি তরক করা যাবে না। তবে অপারগতার সময় অর্থকে এ কারণে যথেষ্ট বলা হয়েছে যে, যাতে تَكْلِيْفُ مَا لَا يُطَاقُ তথা অসাধ্যের সাধন লাযিম না আসে। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি রুকু ও সিজদা করতে সক্ষম না হয় তাহলে তার জন্য ইশারা করে রুকু সিজদা করা জায়েজ। হুবহু রুকু সিজদা জরুরি নয়। তবে জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ বলার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ জবাইয়ের সময় ফারসি ভাষায় বিস্মিল্লাহ বলা জায়েজ। যদিও সে আরবির ওপর সমর্থ হয়। কেননা বিস্মিল্লাহ বলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর জিকির করা। আল্লাহর বাণী– وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ আর আল্লাহর জিকির সব ভাষা দ্বারাই হতে পারে। চাই সে আরবির উপর সমর্থ হোক বা না হোক।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ নিঃসন্দেহে এ কুরআন পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহে বিদ্যমান ছিল। আর একথা সর্বজন বিদিত যে, সে এ কুরআন অবশ্যই ছিল না। বুঝা গেল, পূর্ববর্তী কিতাসমূহে তার মর্ম বিদ্যমান ছিল। এতে প্রতীয়মান হলো কুরআন মর্মের নাম, অর্থের নাম নয়। তা ছাড়া কুরআন ফারসিতে অনুবাদ করে পড়া জায়েজ। কেননা তাতে তার মর্ম বিদ্যমান। অধিকন্তু কিরাআতে কুরআনও পাওয়া গেছে। আর যেহেতু কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে আরবি শব্দের সাথে ছিল না। এ জন্য আরবি ভাষায় সক্ষম না হলে ফারসি ভাষায় কেরাত করা জায়েজ। কিন্তু ক্রমাগত অনুসৃত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণের কারণে সে গুনাহগার হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, পারস্যের লোকেরা হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর কাছে চিঠি লিখল, যাতে তিনি ফারসি ভাষায় সূরায়ে ফাতিহা লিখে তাদের জন্য পাঠান। হযরত সালমান ফারসী (রা.) ফারসি ভাষায় সুরায়ে ফাতিহা লিখে তাদের জন্য পাঠালেন। তারা তা নামাজে পাঠ করতো। এক পর্যায়ে তারা আরবি ভাষায় শিখে নেয়। এদিকে হযরত সালমান ফারসি (রা.) তা লিখার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কোনো বিরোধিতা করেননি। এর দ্বারাও বুঝা গেল নামাজের মধ্যে ফারসি ভাষায় কেরাত পড়া জায়েজ।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যেমনিভাবে নামাজের ভিতরে কেরাত পড়া জায়েজ এমনিভাবে ফারসি ছাড়া অন্যান্য ভাষায়ও জায়েজ। আর এ-ই হলো বিশুদ্ধ মত। আবূ সাঈদ বলেন, ইমাম সাহেব শুধু ফারসি ভাষায় কেরাত পড়াকে জায়েজ বলেছেন ফার্সী ছাড়া অন্য কোনো ভাষার অনুমতি তিনি দেননি। এর কারণ হলো আরবি ভাষার সাথে ফারসি ভাষার নৈকট্যতা অধিক। এ কারণে ফারসি ভাষায় কেরাতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর অন্যান্য ভাষায় যেহেতু এ ধরনের নৈকট্যতা নেই তাই তা দ্বারা কেরাতও জায়েজ নেই।

বিশুদ্ধ মতের প্রথম দলিল হলো, আয়াতে কারীমা وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ কেননা কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবে যেমনিভাবে আরবি ভাষায় ছিল না এমনিভাবে ফারসি ভাষায়ও ছিল না। দ্বিতীয় দলিল হলো, কুরআনকে যখন অন্য ভাষায় স্থানান্তর করা হয় তখন দৃষ্টি থাকে মর্মের উপর। তা ছাড়া ভাষার ভিন্নতার কারণে মর্ম ভিন্ন হয় না। যেমন তুর্কী হিন্দী ইত্যাদি সব ভাষায়ই জায়েজ।

হিদায়া প্রণেতা বলেন, ইমাম সাহেব ও সাহেবাইনের মধ্যকার অনারবি ভাষায় কেরাত জায়েজ নাজায়েজ হওয়ার যে মতবিরোধ তা এ সম্পর্কে যে, অনারবি ভাষায় কেরাত গ্রহণযোগ্য না অগ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ তাদের মতপার্থক্যটি হলো গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে। এমনকি ইমাম সাহেবের মতে যদি অনারবি ভাষায় কেরাত পড়া হয় তবে কেরাতের ফরজ আদায় হয়ে যাবে, আর সাহেবাইনের মতে আদায় হবে না। নামাজ ফাসাদ না হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। অর্থাৎ যদি অনারবি ভাষায় কেরাত পড়া হয়, তবে সকলের মতেই নামাজ ফাসিদ হবে না। আল্লামা ইব্নুল হুমাম (র.) লিখেন যে, নাজমুদ্দীন নাসাফী ও কাযী খান লিখেছেন যে, সাহেবাইনের মতে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আবূ বকর রাযী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, মূল মাসআলায় ইমাম সাহেব সাহেবাইনের মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন অর্থাৎ ইমাম সাহেব (র.)ও সর্বশেষ এ মত পেশ করেছেন যে, নামাজের ভিতর অন্য ভাষায় কেরাত পড়া জায়েজ নেই। আর তা-ই হলো নির্ভরযোগ্য।

খুতবা ও তাশাহহুদ সম্পর্কেও অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ ইমাম সাহেব (র.)-এর মতে অন্য ভাষায় জায়েজ। সাহেবাইনের মতে জায়েজ নেই। আর আজানের ব্যাপারে স্থানীয় প্রচলন বিবেচ্য হবে। মাবসূত গ্রন্থে ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ফারসি ভাষায় আজান দিলে যদি লোকেরা বুঝে যে, এটা আযান তবে জায়েজ আর যদি লোকেরা আজান সম্পর্কে অবহিতই না হয়, তবে জায়েজ নেই। কেননা আযান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আহবান করা। লোকেরা না বুঝলে এ উদ্দেশ্য হাসিল হবে না।

وَإِنِ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ بِاللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ لَاتَجُوزُ لِأَنَّهُ مَشُوبٌ بِحَاجَتِهِ فَلَمْ يَكُنْ تَعْظِيمًا خَالِصًا وَإِنِ افْتَتَحَ بِقَوْلِهِ اَللّٰهُمَّ فَقَدْ قِيلَ يُجْزِيهِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ يَا اَللّٰهُ وَقَدْ قِيلَ لَايُجْزِيهِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ يَا اَللّٰهُ أُمَّنَا بِخَيْرٍ فَكَانَ سُوَالًا قَالَ وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى تَحْتَ السُّرَّةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلٰى مَالِكٍ (رحـ) فِي الْإِرْسَالِ وَعَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) فِي الْوَضْعِ عَلَى الصَّدْرِ وَلِأَنَّ الْوَضْعَ تَحْتَ السُّرَّةِ أَقْرَبُ إِلَى التَّعْظِيمِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ ثُمَّ الْإِعْتِمَادُ سُنَّةُ الْقِيَامِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيفَةَ وَأَبِيْ يُوسُفَ (رحـ) حَتّٰى لَايُرْسِلَ حَالَةَ الثَّنَاءِ وَالْأَصْلُ إِنْ كَانَ قِيَامٌ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ يَعْتَمِدُ فِيهِ وَمَا لَا فَلَا هُوَ الصَّحِيحُ فَيَعْتَمِدُ فِيْ حَالَةِ الْقُنُوتِ وَصَلٰوةِ الْجَنَازَةِ وَيُرْسِلُ فِي الْقَوْمَةِ وَبَيْنَ تَكْبِيرَاتِ الْأَعْيَادِ ـ

অনুবাদ : যদি اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ বলে নামাজ আরম্ভ করে, তাহলে তা জায়েজ হবে না। কেননা এতে তার স্বার্থের মিশ্রণ রয়েছে। সুতরাং তা খালিস তাযীম থাকেনি। আর যদি শুধু اَللّٰهُمَّ বলে আরম্ভ করে তাহলে কারো কারো মতে তা জায়েজ হবে। কেননা এর অর্থ হলো يَااَللّٰهُ তবে অন্য এক মতে তা জায়েজ হবে না। কেননা এর অর্থ হলো, يَا اَللّٰهُ أُمَّنَا بِخَيْرٍ (হে আল্লাহ আমাদের কল্যাণ করুন) সুতরাং এটা প্রার্থনা হলো। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সে তার নাভীর নিচে বাম হাতের উপর ডান হাত স্থাপন করবে কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন নাভীর নিচে বাম হাতের উপর ডান হাত স্থাপন সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে হাত ছেড়ে রাখার ব্যাপারে ইমাম মালিক (র.)-এর বিপক্ষে দলিল এবং হাত বুকের উপর রাখার ব্যাপারে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলিল। তা ছাড়া হাত নাভীর নিচে রাখা তাযীম প্রকাশের অধিকতর নিকটবর্তী এবং তা-ই হলো উদ্দেশ্য। আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে হাত বাধা হচ্ছে কিয়ামের সুন্নত। সুতরাং ছানা পড়ার সময় তা ছেড়ে রাখবে না। (কথিত আছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এটা কেরাতের সুন্নত। সুতরাং কেরাত শুরু করার সময় হাত বাঁধবে।) মূলনীতি, যে কিয়ামের মধ্যে কোনো জিকির সুন্নত রয়েছে তাতে হাত বেঁধে রাখা হবে, অন্যথায় নয়। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। সুতরাং কুনূতের অবস্থায় এবং জানাযার নামাজে হাত বেঁধে রাখবে। পক্ষান্তরে রুকুর পর দাঁড়ানো অবস্থায় এবং ঈদের তাকবীর সমূহের মধ্যবর্তী সময়ে হাত ছেড়ে রাখবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কেউ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ বলে নামাজ আরম্ভ করে তা জায়েজ হবে না। কেননা এতে তার স্বার্থের মিশ্রণ রয়েছে। তা ছাড়া যেহেতু এ শব্দ দ্বারা আল্লাহর বড়ত্ব বুঝায় না তাই এর দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা জায়েজ হবে না। এমনিভাবে ঐ সকল শব্দ দ্বারাও জায়েজ হবে না যা খালিছ তা'যীম বুঝায় না; বরং কোনো কোনো ভাবে প্রার্থনাকে বুঝায়। যেমন– أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ - بِسْمِ اللّٰهِ এবং لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ - مَاشَاءَ اللّٰهُ - إِنَّا لِلّٰهِ - أَعُوذُ بِاللّٰهِ (এগুলো দ্বারাও জায়েজ হবে না) আর যদি শুধু اَللّٰهُمَّ দ্বারা নামাজ শুরু করে তবে এতে মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে জায়েজ, কেননা اَللّٰهُمَّ-এর অর্থ হলো يَا اَللّٰهُ যা শুধুই আল্লাহর জিকির। এতে স্বার্থের কোনো মিশ্রণ নেই। এ মতটি হলো বসরাবাসীদের। আর কারো কারো মতে اَللّٰهُمَّ দ্বারা নামাজ শুরু করা জায়েজ হবে না। কেননা এর অর্থ হলো يَا اَللّٰهُ أُمَّنَا بِخَيْرٍ হে আল্লাহ আমাদের কল্যাণ করুন। এর দ্বারা নাকিস তাযীম বুঝা যায় না। তাই এর দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা জায়েজ হবে না। এ মতটি হলো কূফাবাসীদের।

قَالَ وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الخ : উপরোক্ত ইবারতে চারটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে— (১) নামাজে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে কিনা? (২) কিভাবে রাখবে? (৩) কোথায় রাখবে এবং (৪) কখন রাখবে? প্রথম মাসআলার ক্ষেত্রে আমাদের ওলামায়ে ছালাছার বক্তব্য হচ্ছে, নামাজে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা সুন্নত। ইমাম মালিক (র.) বলেন, ইরসাল করবে অর্থাৎ নামাজে হাত ছেড়ে দিবে, যার ইচ্ছা বেঁধে রাখবে। বুঝা গেল, ইমাম মালিক (র.)-এর মতে ছেড়ে দেওয়া আযীমত আর বেঁধে রাখা রুখসত।

আমাদের ওলামাগণের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর সর্বদা আমল করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন— إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِأَنْ نَأْخُذَ شِمَالَنَا بِأَيْمَانِنَا فِي الصَّلَاةِ আমরা নবীগণের জামা'আত আদিষ্ট হয়েছি যে আমরা নামাজে ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরে রাখব। হযরত আলী (রা.) বলেন, مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ فِي الصَّلَاةِ গ্রন্থকার উক্ত আছরটি এভাবে বর্ণনা করেছেন— إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ উভয়টির সার নির্যাস হলো, হযরত আলী (রা.) বলেন, নামাজের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা সুন্নত। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হিদায়ার মূল নুসখায় এই ইবারত এভাবে ছিল— لِقَوْلِ عَلِيٍّ (رض) إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ কেননা লেখকগণ তা لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ উল্লেখ করেছেন, যা তাদের ভুল। আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى - ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নামাজ পড়তেছিলেন। তিনি ডান হাত বাম হাতের বপর রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখে ইবনে মাসউদের ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে দিলেন। মুদ্দাকথা, উপরোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা সুন্নত। সুতরাং এ হাদীসগুলো ইমাম মালিক (র.)-এর বিপক্ষে দলিল হবে এবং আমাদের মাযহাব সাবিত হবে।

দ্বিতীয় মাসআলা : ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখার কাইফিয়ত বা তরীকা কি? তরীকা হলো, ডান হাতের তালুকে বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখবে। আর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরে রাখবে।- (ইনায়া)

তৃতীয় মাসআলা : হাত কোথায় রাখবে? আমাদের মতে নাভীর নীচে হাত বাঁধা উত্তম। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে বুকের উপর রাখা উত্তম। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ স্বীয় রবের জন্য নামাজ পড়ো, আর ডান হাতকে বাম হাতের উপর বুকের উপর রাখো। (কাওসার) আল্লামা ইবনুল হুমাম ও ইনায়া গ্রন্থকার বলেছেন, وانحر দ্বারা ডান হাতকে বাম হাতের উপর বুকের উপর রাখা মুরাদ।

দ্বিতীয় দলিল হলো, বুক হলো ঈমানের নূরের স্থান সুতরাং নামাজের সময় স্বীয় হাত দ্বারা তার হেফাজত করা জরুরি। আমাদের প্রথম দলিল হলো, হযরত আলী (রা.)-এর আছর إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ সুন্নত দ্বারা সাধারণত সুন্নতে রাসূল মুরাদ হয়ে থাকে। এতে বুঝা গেল যে, নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নত।

তৃতীয় দলিল হলো, নাভির নিচে হাত বাধার মধ্যে তা'যীম প্রকাশ করা হয়। আর নামাজ দ্বারা তো তা'যীমই উদ্দেশ্য, এ কারণেও নাভির নিচে হাত বাঁধা উত্তম।

কিফায়া গ্রন্থকার লিখেছেন, নাভির নিচে হাত বাধা দ্বারা কিতাবীদের তাশাব্বুহ থেকে দূরে থাকা হয় এবং সতর ঢাকার নিকটবর্তী হয়। এ কারণেই নাভির নিচে হাত বাঁধা উত্তম। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর وانحر শব্দ দ্বারা দলিল দেওয়া জায়েজ হবে না। কেননা আয়াতে وانحر দ্বারা ঈদের নামাজের পর কুরবানি পশু জবাই করা উদ্দেশ্য। (কিফায়া)

চতুর্থ মাসআলা : নামাজি ব্যক্তি কখন হাত বাঁধবে? এ সম্পর্কে শায়খাইনের মাযহাব হলো, হাত বাঁধা কিয়ামের সুন্নত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে কেরাতের সুন্নত। সুতরাং ছানা পড়ার সময় শায়খাইনের মতে হাত বাঁধা সুন্নত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ছানার সময় হাত ছাড়া থাকবে। আর কেরাতের সময় হাত বেঁধে নিবে। হিদায়া গ্রন্থকার হাত বাঁধা ও ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেক ঐ কিয়াম, হাকীকী বা হুকমী হোক যার মধ্যে যিক্‌রে মাসনূন রয়েছে, তাতে হাত বেঁধে রাখা হবে। আর যে কিয়াস এ ধরনের নয় তাতে হাত বেঁধে রাখা সুন্নত নয়। এ-ই হলো বিশুদ্ধ মত। এর উপরই শামসুল আইম্মা আস্‌সারাখ্‌সী, সাদ্‌রুল কাবীর বুরহানুল আইম্মা এবং সাদরুশ্‌শাহীদ হুসামুল আইম্মা ফাত্‌ওয়া দিয়েছেন। উপরোক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে কুনূত অবস্থায় এবং নামাজে জানাযায়ে হাত বেঁধে রাখা সুন্নত হবে এবং কাওমা (রুকূ ও সিজদার মাঝে) এবং ঈদের তাকবীর সমূহের মধ্যবর্তী সময়ে হাত ছেড়ে রাখা সুন্নত হবে।

ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهٗ يَضُمُّ اِلَيْهِ قَوْلَهٗ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ اِلٰى اٰخِرِهٖ لِرِوَايَةِ عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ وَلَهُمَا رِوَايَةُ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ وَقَرَأَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى هٰذَا وَمَا رَوَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلَى التَّهَجُّدِ وَقَوْلُهٗ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ لَمْ يُذْكَرْ فِى الْمَشَاهِيْرِ فَلَا يَأْتِىْ بِهٖ فِى الْفَرَائِضِ وَالْاَوْلٰى اَنْ لَّا يَأْتِىَ بِالتَّوَجُّهِ قَبْلَ التَّكْبِيْرِ لِيَتَّصِلَ النِّيَّةُ بِهٖ هُوَ الصَّحِيْحُ وَيَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مَعْنَاهُ اِذَا اَرَدْتَّ قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ وَالْاَوْلٰى اَنْ يَّقُوْلَ اَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ لِيُوَافِقَ الْقُرْاٰنَ وَيَقْرُبُ مِنْهُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ ثُمَّ التَّعَوُّذُ تَبَعٌ لِلْقِرَاءَةِ دُوْنَ الثَّنَاءِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) لِمَا تَلَوْنَا حَتّٰى يَأْتِىَ بِهِ الْمَسْبُوْقُ دُوْنَ الْمُقْتَدِىْ وَيُؤَخِّرُ عَنْ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدِ خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰكَذَا نُقِلَ فِى الْمَشَاهِيْرِ ـ

অনুবাদ : তারপর سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ থেকে শেষ পর্যন্ত ছানা পড়বে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এর সাথে اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ থেকে শেষ পর্যন্ত দোয়াটি যোগ করবে। কেননা হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ তা করতেন। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ যখন নামাজ আরম্ভ করতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তেন। এর অতিরিক্ত কিছু পাঠ করতেন না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মাশহুর হাদীসগুলোতে جَلَّ ثَنَاءُكَ বাক্যটি নেই। সুতরাং ফরজ নামাজে তা বলবে না। তাকবীরের পূর্বে اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ বলবে না, যাতে নিয়ত তাকবীরের সাথে যুক্ত থাকে। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। আর বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে) এর অর্থ হলো যখন তুমি কুরআন পাঠের ইচ্ছা করবে। اَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ বলাই হলো উত্তম, যাতে কুরআনের শব্দের সাথে মিল হয়। اَعُوْذُ بِاللّٰهِ শব্দটিও এর কাছাকাছি যা হোক। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে تعوذ হচ্ছে– কেরাতের সাথে সংযুক্ত, ছানার সাথে নয়। আমাদের পেশকৃত আয়াত এর দলিল। তাই মাসবূক تعوذ বলবে, কিন্তু মুক্তাদী বলবে না এবং ঈদের নামাজের তাকবীর সমূহের পরে বলবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। এবং بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়বে। মশহুর হাদীস গুলোতে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নামাজি ব্যক্তি হাত বাঁধার পর ছানা পড়বে। আর ছানা হলো, سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ কোনো কোনো গায়রে মাশহুর রিওয়ায়াতের মধ্যে وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ রয়েছে। তবে যেহেতু মাশহুর রিওয়ায়াতের মধ্যে নেই, এ জন্য ফরজ নামাজে এটা বলবে না। এখন ছানার সাথে অন্য কোনো দোয়া মিলানো হবে কিনা? এ ব্যাপারে তারফাইনের মাযহাব ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত হলো ছানার সাথে অন্য কোনো দোয়া মিলানো হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর আরেকটি মত হলো মুসল্লী ছানার সাথে এ দোয়াটিও মিলাবে

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ . اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

কোনো কোনো বর্ণনায় مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-এর পর এ শব্দগুলোও বর্ণিত রয়েছে–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَاهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّىْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَابِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ -

ফুকাহাগণের পরিভাষায় এ দোয়ার নাম হলো دعائے توجه ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল, হযরত আলী (রা.)-এর আছর যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছানার সাথে এ দোয়াও পড়তেন।

তরফাইন (র.)-এর দলিল, হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস–

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ وَقَرَأَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اِلٰى اٰخِرِهٖ .

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আনাস (রা.) এর অতিরিক্ত আর কিছু বলেননি। সুতরাং বুঝা গেল ছানার পর انى توجه তথা وجهت الخ পড়ার বর্ণনা সাবিত নেই। গ্রন্থকার আরো বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বর্ণিত হাদীসটি তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল নামাজে তা পড়তেন, ফরজে ছানা ব্যতীত অন্য কোনো দোয়া পড়তেন। বিজ্ঞ গ্রন্থকার বলেন, উত্তম হলো নিয়তের পর এবং তাকবীরের পূর্বেও انى وجهت الخ পড়বে না। তাহলে নিয়ত তাকবীরের সাথে যুক্ত থাকে, এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কোনো কোনো মুতায়াখ্খিরীন, তাদের মধ্য থেকে ফকীহ আবুল লাইসও বলেছেন, নিয়ত ও তাকবীরের মধ্যবর্তী সময়ে তা পড়া জায়েজ।

وَيَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الخ : উপরোক্ত ইবারতে চারটি আলোচনা করা হয়েছে। (১) নামাজের প্রারম্ভে تعوذ পড়ার শর'য়ী দৃষ্টিকোণ কি? (২) تعوذ-এর স্থান (৩) تعوذ-এর শব্দাবলি এবং (৪) بسم الله সম্পর্কে।

প্রথম আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো, আমাদের মতে নামাজের শুরুতে تعوذ সুন্নত। (ফাতহুল কাদীর) শরহে নিকায়া গ্রন্থকার লিখেছেন عامة السلف দের মতে تعوذ মোস্তাহাব। جمهور خلف ও এ-ই মত পোষণ করেন। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে নামাজের শুরুতে تعوذ পড়বে না।

সুফিয়ানে সাওরী এবং আতা (র.)-এর মতে تعوذ পড়া ওয়াজিব। তাদের দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ উক্ত আয়াতে استعذ শব্দটি امر-এর صيغه যা ওজূবকে চায়। এ দলিলের জবাবে আমরা বলি যে, وجوب-এর বক্তব্যটি ইজমা-এর বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য।

ইমাম মালিক (রা.)-এর দলিল হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস– তিনি বলেন, صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَخَلْفَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَكَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ উক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর এবং হযরত ওমর (রা.) শুধু আলহামদুলিল্লাহ দ্বারা কেরাত শুরু করতেন। এর পূর্বে আউযুবিল্লাহ বা বিসমিল্লাহ পড়তেন না।

আমাদের দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ উক্ত আয়াতের صيغه - استعذ টি যদিও امر এবং যার তাকাযা হলো تعوذ ওয়াজিব হওয়া যেমনটি বলেছেন হযরত আতা ও সুফিয়ানে সাওরী। কিন্তু পূর্ববর্তী আসলাফগণ যেহেতু তার সুন্নত হওয়ার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাই আমাদের ওলামাগণ تعوذ কে সুন্নত বলেছেন।

দ্বিতীয় আলোচনার সার সংক্ষেপ হলো, আমাদের মতে تعوذ -এর স্থান হলো কুরআনের কেরাতের পূর্বে। আসহাবে জাওয়াহিরদের মতে পরে। তাঁদের দলিল হলো, আয়াত দ্বারা অর্থাৎ اذا قرأت দ্বারা। এর বাহ্যিক অর্থ হলো, যখন তুমি কুরআনের কেরাত করে ফেলছ তখন পানাহ চাও। বুঝা গেল, কেরাতের পর تعوذ তথা পানাহ চাইতে হবে। আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাবে বলা হয়– اذا قرات -এর অর্থ হলো إِذَا أَرَدْتَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ অর্থাৎ যখন তুমি কুরআনের কেরাতের ইচ্ছা করবে তখন تعوذ তথা পানাহ চাও। বুঝা গেল تعوذ কেরাতের পূর্বে হবে।

تعوذ কেরাতের সাথে সংযুক্ত না ছানার সাথে? এ ব্যাপারে আমাদের ওলামাদের মতানৈক্য রয়েছে। তরফাইন (র.)-এর মতে تعوذ কেরাতের সাথে সংযুক্ত, ছানার সাথে নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ছানার সাথে সংযুক্ত। সুতরাং তারফাইনের মতে যার উপর কেরাত ওয়াজিব সে تعوذ পড়বে। এমনকি মাসবূকও تعوذ পড়বে। কেননা তার ছুটে যাওয়া নামাজে তার কেরাত পড়া ওয়াজিব। তবে মুক্তাদী تعوذ পড়বে না। কেননা তার উপর কেরাত ওয়াজিব নয়। ঈদের নামাজে تعوذ তাকবীর সমূহের পরে বলবে। কেননা ঈদের প্রথম রাকআতে কেরাত ঈদের তাকবীরের পরে বলা হয়। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে যে ব্যক্তি ছানা পড়বে সে تعوذও পড়বে। তাঁর দলিল হলো, ثناء ও تعوذ একই جنس -এর। কেননা যেমনিভাবে ছানা দোয়া। এমনিভাবে تعوذও দোয়া। আর কায়দা আছে কোনো شئ -এর تابع তার পরে হয়। বুঝা গেল تعوذ ছানার সাথে সংযুক্ত হবে, কেরাতের সাথে নয়। তারফাইন (র.)-এর দলিল হলো আল্লাহর বাণী– فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ -এর দ্বারা। বুঝা গেল تعوذ কেরাতের সাথে সংযুক্ত; ছানার সাথে নয়।

তৃতীয় আলোচনার হাসিল হলো, تعوذ -এর শব্দগুলো أَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ দ্বারা বলা উত্তম। তাহলে আল্লাহর বাণী فاستعذ بالله -এর সাথে মিল হয়ে যাবে। কিন্তু অধিকাংশ আখবার ও আছার -এর মধ্যে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ এসেছে। তাই হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, استعيذ بالله - اعوذبالله -এর কাছাকছি শব্দ। মুখতার মাযহাব এটাই। ফতোয়াও এর উপর। কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়েছেন। তাই এটাকেও গ্রহণ করা যায়।

চতুর্থ আলোচনার সার-সংক্ষেপ হলো, তাস্মিয়া সম্বন্ধে কয়েক ধরনের আলোচনা রয়েছে। যেমন– (১) সূরায়ে নামল-এর আয়াত إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সর্বসম্মতিক্রমে কুরআনের এবং সূরায়ে নামল উভয়টির جزء তথা অংশ বিশেষ। কিন্তু দুই সূরার মাঝখানে যে بسم الله আছে তা কুরআনের جزء কি না? এ সম্পর্কে মতাবিরোধ রয়েছে। আমাদের ওলামায়ে আহনাফের মতে কুরআনের جزء. ইমাম মালিক (র.)-এর মতে جزء না। (২) আমাদের মতে بسم الله সূরায়ে ফাতিহারও جزء না এবং অন্য কোনো সূরারও না; বরং সূরার মাঝে ব্যবধানকারী হিসাবে নাজিল হয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে সূরায়ে ফাতিহার جزء. তবে অন্য সূরার جزء হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফে'য়ী (র.)-এর দু'টো মত। (৩) بسم الله জোরে পড়া হবে না আস্তে। এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা হবে।

وَيُسِرُّ بِهِمَا لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) أَرْبَعٌ يُخْفِيْهِنَّ الْإِمَامُ وَ ذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا التَّعَوُّذَ وَالتَّسْمِيَةَ وَآمِيْنَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يَجْهَرُ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَهَرَ فِيْ صَلَاتِهِ بِالتَّسْمِيَةِ قُلْنَا هُوَ مَحْمُوْلٌ عَلَى التَّعْلِيْمِ لِأَنَّ أَنَسًا (رضـ) أَخْبَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَجْهَرُ بِهَا ثُمَّ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّهُ لَا يَأْتِيْ بِهَا فِيْ أَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ كَالتَّعَوُّذِ وَعَنْهُ أَنَّهُ يَأْتِيْ بِهَا احْتِيَاطًا وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَلَا يَأْتِيْ بِهَا بَيْنَ السُّوْرَةِ وَالْفَاتِحَةِ إِلَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) فَإِنَّهُ يَأْتِيْ بِهَا فِيْ صَلٰوةِ الْمُخَافَتَةِ .

অনুবাদ : (আউযুবিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ) দু'টোই অনুচ্চৈঃস্বরে পড়বে। কেননা ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন– চারটি বাক্য ইমাম নীরবে পড়বে। তন্মধ্যে তিনি আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ ও আমীন উল্লেখ করেছেন। (ইবনে আবী শায়বার বর্ণনা মতে চতুর্থটি হলো রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ) ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, কেরাত উচ্চৈঃস্বরে পড়ার সময় বিসমিল্লাহও উচ্চৈঃস্বরে পড়বে। কেননা বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ তাঁর নামাজে বিসমিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে পড়েছেন। এর জবাবে আমরা বলি যে, তা শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে ছিল, কেননা হযরত আনাস (রা.) অবহিত করেছেন যে, মহানবী ﷺ বিস্‌মিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা এরূপ আছে যে, تعوذ -এর ন্যায় বিসমিল্লাহ প্রত্যেক রাকআতের শুরুতে বলবে না, (বরং শুধু নামাজের শুরুতে বলবে) তবে তাঁর থেকে আরেকটি বর্ণনা আছে যে, সতর্কতামূলক প্রত্যেক রাকআতে বিসমিল্লাহ পড়বে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতও তাই। সূরা ও ফাতিহার মাঝে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নীরব কেরাত বিশিষ্ট নামাজে তা পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, تسميه ও تعوذ নিম্নস্বরে পড়বে। তাঁর দলিল হলো, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস– রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পড়তেন। যেমন– সহীহ ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান এবং নাসাঈ শরীফে নু'আইম মুজামির (রা.) সূত্রে বর্ণিত صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتّٰى بَلَغَ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ آمِيْنَ ثُمَّ يَقُوْلُ إِذَا سَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَشْبَهُكُمْ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ নু'আইম মুজামির (রা.) বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর পিছনে নামাজ পড়েছি (প্রথমে) আবূ হুরায়রা (রা.) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়লেন। তারপর উম্মুল কুরআন তথা সূরায় ফাতিহা পড়লেন এমনকি ولاالضالين পর্যন্ত পৌঁছে امين বললেন। অতঃপর সালামের পর বললেন, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ আমি নামাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বিসমিল্লাহ, সূরায়ে ফাতিহা এবং আমীন সবগুলো উচ্চৈঃস্বরে পড়েছেন। কেননা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) যদি উচ্চৈঃস্বরে না পড়তেন তবে নু'আইম মুজামির কিভাবে জানলেন? আর যেহেতু হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, আমার নামাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজের অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ, এতে বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও এগুলো উচ্চৈঃস্বরে পড়েছেন। আল্লামা দারু কুত্‌নী সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْهَرُ فِي الصَّلٰوةِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের মধ্যে بسم الله উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন। আমাদের দলিল ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, চারটি বাক্য এমন, যা ইমাম নীরবে পড়বে। ঐ চারটি বাক্য হলো, তা'আউয, তাসমিয়া, তাহমীদ এবং আমীন।

শরহে নিকায়া গ্রন্থকার তাহমীদ-এর পরিবর্তে ছানার কথা বলেছেন। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.) كتاب الاثار -এ লিখেছেন, عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَرْبَعٌ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ التَّعَوُّذُ وَبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَسُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ الخ وَآمِينَ (شرح نقايه) আমাদের দ্বিতীয় দলিল হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস- صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে এবং আবূ বকর, ওমর এবং ওসমান (রা.)-এর পিছনে নামাজ পড়েছি, (কিন্তু) তাদের কাউকেও بسم الله উচ্চৈঃস্বরে পড়তে শুনিনি।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিলের জবাব হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো লোকদেরকে শিক্ষা দানের জন্য بسم الله -কে উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন। না হয় সাধারণভাবে তিনি بسم الله নীরবে পড়তেন। যেমন- হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে بسم الله আস্তে আস্তে পড়তেন উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন না। দ্বিতীয় জবাব হলো ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ بسم الله উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন। কিন্তু তা اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً দ্বারা মানসূখ হয়ে যায়। শরহে নিকায়ার গ্রন্থকার মোল্লা আলী কারী (র.) নসখ হওয়ার ব্যাখ্যা এভাবে বয়ান করেছেন-

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَحْضُرُونَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا قَرَءَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالُوا هٰذَا مُحَمَّدٌ يَذْكُرُ رَحْمٰنَ الْيَمَامَةِ يَعْنُونَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ فَأُمِرَ أَنْ يُخَافِتَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَنَزَلَتْ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. (ابو داود)

সাঈদ ইবনে যুবাইর (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কার মুশরিকরা মসজিদে হারামে উপস্থিত থাকতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কেরাত পড়তেন, তখন তারা বলতেন এই মুহাম্মদ! ইয়ামার রহমান অর্থাৎ মুসায়লামা কাযযাবের আলোচনা করতেছে। সুতরাং তাঁকে আদেশ দেওয়া হয়েছে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -কে নীরবে পড়তে এবং তখন لَا تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ আয়াত অবতীর্ণ হয়। উক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে بِسْمِ اللّٰهِ এবং কুরআনের কেরাত উচ্চৈঃস্বরে করতেন; কিন্তু এরপর তা মানসূখ হয়ে যায়। আবূ দাউদ শরীফের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে فَخَفَضَ النَّبِيُّ ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ অর্থাৎ উক্ত ঘটনার পর আল্লাহর নবী ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -কে নিচু আওয়াজে পড়তেন। এ রিওয়ায়াতটিও উচ্চৈঃস্বরে পড়া যে منسوخ হয়ে গেছে, তার ওপর দালালাত করে। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) নু'আইম মুজামিরের রিওয়ায়াতের জবাব দিতে গিয়ে বলেন, হতে পারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর আস্তে পড়া সত্ত্বেও নু'আইম মুজামির শুনে গেছে। কেননা মুক্তাদী যদি ইমামের একবারে সন্নিকটে হয় আর ইমাম যদি ইখ্‌ফার মধ্যে মুবালাগা না করে, তখন ইমামের আওয়াজ শুনাও যায়।

এখন بسم الله প্রত্যেক রাকআতে সূরায়ে ফাতিহার পূর্বে পড়বে না শুধু প্রথম রাকআতে পড়বে? এ ব্যাপারে ইমাম আযম (রা.)-এর দু'টো রিওয়ায়াত রয়েছে। হাসান ইবনে যিয়াদের রিওয়ায়াত হলো বিসমিল্লাহ প্রত্যেক রাকআতে পড়বে না; বরং নামাজের শুরুতে মাত্র একবার পড়াই যথেষ্ট। যেমন تعوذ শুধু প্রথম রাকআতে পড়াই যথেষ্ট। দলিল হলো, বিসমিল্লাহ সূরায়ে ফাতিহার جزء বা অংশ নয়; বরং নামাজ শুরু করার জন্য পড়া হয়। আর صلوة واحدة . فعل واحد -এর অনুরূপ। তাই فعل واحد -এর জন্য একবার بِسْمِ اللّٰهِ বলাই যথেষ্ট। সুতরাং صلوة واحدة -এর জন্যও একবার بِسْمِ اللّٰهِ বলা যথেষ্ট হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর দ্বিতীয় রিওয়ায়াত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বর্ণনা করেন, আর তা হলো, প্রত্যেক রাকআতে بِسْمِ اللّٰهِ পড়বে। আর এরই মধ্যে সতর্কতা। কেননা بِسْمِ اللّٰهِ সূরায়ে ফাতিহার جزء হওয়ার ক্ষেত্রে ওলামাগণের মতবিরোধ রয়েছে। সূরায়ে ফাতিহা প্রত্যেক রাকআতে পড়া জরুরি। তাই بِسْمِ اللّٰهِ ও প্রত্যেক রাকআতে পড়া জরুরি হবে, তাহলে মতবিরোধ থেকে বাঁচা যাবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, প্রত্যেক রাকআতে বিসমিল্লাহ পড়া সাহেবাঈন (রা.)-এর মত। গ্রন্থকার আরো বলেন, সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য সূরার মাঝে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করবে না। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সিররী নামাজে সূরায়ে ফাতিহা এবং অন্য সূরার মাঝে বিস্‌মিল্লাহ পড়বে তবে জাহ্‌রী নামাজে পড়বে না।

ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً اَوْ ثَلٰثَ اٰيَاتٍ مِنْ اَيِّ سُوْرَةٍ شَاءَ فَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لَاتَتَعَيَّنُ رُكْنًا عِنْدَنَا وَكَذَا ضَمُّ السُّوْرَةِ اِلَيْهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيْ (رحـ) فِى الْفَاتِحَةِ وَلِمَالِكٍ فِيْهِمَا لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مَعَهَا وَلِلشَّافِعِىْ (رحـ) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَا يَجُوْزُ لٰكِنَّهُ يُوْجِبُ الْعَمَلَ فَقُلْنَا بِوُجُوْبِهِمَا وَاِذَا قَالَ الْاِمَامُ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ وَيَقُوْلُهَا الْمُؤْتَمُّ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا وَلَا مُتَمَسَّكَ لِمَالِكٍ (رحـ) فِىْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ وَلَاالضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ مِنْ حَيْثُ الْقِسْمَةِ لِاَنَّهُ قَالَ فِىْ اٰخِرِهٖ فَاِنَّ الْاِمَامَ يَقُوْلُهَا ـ

অনুবাদ : তারপর সূরায়ে ফাতিহা পড়বে এবং অন্য একটি সূরা কিংবা যে কোনো সূরা থেকে ইচ্ছা তিনটি আয়াত (পড়বে)। মোট কথা, আমাদের মতে ফাতিহা পাঠ রুকন হিসাবে নির্ধারিত নয়। তদ্রূপ তার সাথে সূরা মিলানোও। ফাতিহা সম্পর্কে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে এবং উভয়টি সম্পর্কে ইমাম মালিক (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مَعَهَا ফাতিহা এবং তার সাথে সংযুক্ত একটি সূরা ছাড়া নামাজ হয় না। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ সূরাতুল ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয় না। আমাদের দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاقْرَؤُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ কুরআনের যে অংশ সহজে সম্ভব হয়, তোমরা পড়ো। আর খাবরুল ওয়াহিদ হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাহর সাথে অতিরিক্ত বিষয় যোগ করা বৈধ নয়। তবে তার উপর আমল ওয়াজিব। তাই আমরা সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলানোকে ওয়াজিব বলি। ইমাম যখন وَلَا الضَّالِّيْنَ বলবে তখন اٰمِيْن বলবে এবং মুক্তাদীও তা বলবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا ইমাম যখন আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– اِذَا قَالَ الْاِمَامُ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ ইমাম যখন وَلَاالضَّالِّيْنَ বলে তখন তোমরা আমীন বলবে। এটার মর্ম বণ্টন হিসাবে গণ্য করার ব্যাপারে ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল হতে পারে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসের শেষে বলেছেন– فَاِنَّ الْاِمَامَ يَقُوْلُهَا (কেননা ইমাম তা বলবে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামাজের ভিতর কেরাতে কুরআনের কতটুকু অংশ ফরজ বা রুকন এ ব্যাপারে ওলামাগণের মতবিরোধ রয়েছে। আমাদের মাজহাব হলো, মুত্লাকান কুরআন পড়া ফরজ। সুতরাং যদি একটি আয়াত পড়া হয় তাহলে কেরাতের রুকন আদায় হয়ে যাবে। তবে সূরায়ে ফাতিহা পড়া এবং তার সাথে অন্য কোনো সূরা মিলানো আমাদের মতে ওয়াজিব। ইমাম শাফি'ঈ

(র.) বলেন, সূরায়ে ফাতিহা পড়া রুকন। ইমাম মালিক (রা.) বলেন, সূরায়ে ফাতিহা পড়া এবং অন্য কোনো সূরা মিলানো উভয়টি রুকন। তাঁর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مَعَهَا অর্থাৎ ফাতিহা ও অন্য কোনো সূরা মিলানো ছাড়া নামাজ হবে না। উল্লেখ্য যে, নামাজ হবে না এটাতো ফরজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ওয়াজিবের ক্ষেত্রে নয়। একই ধরনের হাদীস ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন–

مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُوْرَةٍ فِي فَرِيْضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا .

অর্থাৎ নামাজের চাবি হলো পবিত্রতা অর্জন, তাহরীম হলো তাকবীর, তাহলীল হলো তাসলীম, আর যে ব্যক্তি ফরজ বা অন্য কোনো নামাজে আলহামদুলিল্লাহ এবং অন্য কোনো সূরা না পড়ে তার নামাজ হবে না।– (তিরমিযী)

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ফাতিহাতুল কিতাব ব্যতীত নামাজ হবে না। আমাদের দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ উক্ত আয়াতে من القران শব্দটি مطلق সুতরাং اَلْمُطْلَقُ يَجْرِيْ عَلٰى اِطْلَاقِهٖ-এর ভিত্তিতে যা আদনা পরিমাণের কুরআন সাদিক আছে তা পড়াই ফরজ হবে। কেননা এ পরিমাণই মামূরবিহী বা আদিষ্ট। আর যেহেতু নামাজের বাহিরে কুরআন পড়া ফরজ নয় তাই নামাজের ভিতরে কুরআন পড়াই নির্ধারিত হয়ে গেল। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিলের জবাব হলো, তাদের পেশকৃত রিওয়ায়াতগুলো خبرواحد আর خبرواحد টা ظن হয়। اصول فقه-এর কায়দা আছে যে, রুকন دليل قطعى দ্বারা সাব্যস্ত হয়, دليل ظنى দ্বারা নয়। তবে دليل ظنى দ্বারা আমল ওয়াজিব হয়। এ জন্য আমাদের ওলামাগণ বলেন, উভয়টি ওয়াজিব। আর যেহেতু خبر واحد দ্বারা কিতাবুল্লাহর সাথে অতিরিক্ত বিষয় যোগ করা বৈধ নয়, তাই এ সকল হাদীস দ্বারা كتاب الله তথা فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ-এর সাথে অতিরিক্ত বিষয়ও যোগ করা যাবে না।

وَاِذَا قَالَ الْاِمَامُ وَلَا الضَّالِّيْنَ الخ : সূরায়ে ফাতিহা শেষ হওয়ার সময় ইমাম যখন وَلَاالضَّالِّيْنَ বলবে তখন ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে আমীন বলবে। ইমাম মালিক (র.) বলেন, শুধু মুক্তাদী আমীন বলবে ইমাম আমীন বলবে না। ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল হলো এই হাদীস– اِذَا قَالَ الْاِمَامُ وَلَاالضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ ইমাম মুসলিম (র.) মুসলিম শরীফে পূর্ণ হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন–

اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَلَا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا وَاِذَا قَالَ وَلَاالضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ ـ

অর্থাৎ ইমাম তো এ কারণে বানানো হয়েছে যে, তার ইকতিদা করা হবে। সুতরাং তোমরা তার সাথে মতবিরোধ করো না। সে যখন তাকবীর বলে তোমরাও তাকবীর বলো, সে যখন (কেরাত) পড়ে তোমরা চুপ থাকো। সে যখন وَلَاالضَّالِّيْنَ বলে তোমরা আমীন বলো। ইমাম মালিক (র.) উক্ত হাদীস দ্বারা এভাবে দলিল পেশ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বণ্টন করেছেন, তাই ইমামের অংশ হলো কিরাআত পূর্ণ করা আর মুক্তাদীর অংশ হলো আমীন বলা। আর যেহেতু তাকসীম শিরকাত-এর মুনাফী তাই আমীন বলার সময় ইমাম মুক্তাদী শরিক থাকবে না; বরং শুধু মুক্তাদী আমীন বলবে।

আমাদের দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস– اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهٗ مَنْ وَافَقَ تَامِيْنُهٗ تَامِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ যখন ইমাম আমীন বলে তোমরাও আমীন বলো। কেননা যার আমীন ফেরেশ্‌তার আমীনের মুতাবিক হয়ে যায় তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। ইমাম মালিক (র.) পেশকৃত হাদীসের জবাব হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ হাদীসের শেষে বলেছেন فَاِنَّ الْاِمَامَ يَقُوْلُهَا ইমামও আমীন বলে। বুঝা গেল ঐ হাদীসের মধ্যে কর্ম বণ্টন করা হয়নি।

আমাদের মাযহাবের সমর্থন ঐ হাদীসে দ্বারাও হয় যা হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُوْلُ اٰمِيْنَ وَاِنَّ الْاِمَامَ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ فَمَنْ وَافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه عبد الرزاق فى مصنفه)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি রিওয়ায়াত এমন আছে যে, ইমাম আমীন বলবে না শুধু মুক্তাদী আমীন বলবে। দলিল হলো, ইমাম হলো داعى আর মুক্তাদী হলো سامع আর আমীন সাধারণত سامع বলে থাকে داعى নয়। যেমন– নামাজ ব্যতীত অন্যান্য দোয়ার ক্ষেত্রে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাণী– اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا-এর মধ্যে ইমামকে আমীন -এর ফায়েল এ কারণে বলা হয়েছে যে, তিনি (ইমাম) সূরায়ে ফাতিহা পড়ে আমীন-এর সবব পয়দা করে দিয়েছে। আর مسبب -কে مباشر -এর নামে স্মরণ করা জায়েজ। যেমন– بنى الامير المدينة -এর মধ্যে بناء -এর নিসবত আমীরের দিকে مسبب হওয়ার কারণে করা হয়।

<u>ফায়দা</u> **:** প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, امين শব্দটির همزه কে কেউ কেউ ممدود পড়েছেন, আবার কেউ কেউ مقصورও পড়েছেন। ممدود পড়ার সুরতে তো امين -ই থাকবে। مقصور পড়ার সুরতে তো امين থাকবে। তবে উভয় অবস্থায়-ই فعيل -এর وزن -এ হবে। তবে ممدود হওয়ার সুরতে الف টা اشباع -এর জন্যে হবে। ممدود হওয়ার সুরতে মাজনূ -এর নিম্নোক্ত شعر দলিল হিসাবে পেশ করা হয়। وَيَرْحَمُ اللّٰهُ عَبْدًا قَالَ اٰمِيْنًا উক্ত শে'র-এ امين ممدودا . ব্যবহৃত হয়েছে। শেষের الف টিও اشباع -এর জন্য হয়েছে। উক্ত شعر -এর প্রেক্ষাপট হলো, যখন মাজনূ লাইলীর প্রেমে বিভোর, লাইলীর প্রেমে আসক্ত হয়ে সে দিক-বিদিক ছুটে চলতে লাগল তখন মাজনূর পিতা খুব পেরেশান হয়ে গেল। লোকেরা তাকে পরামর্শ দিল যে তাকে বায়তুল্লাহর যিয়ারতে নিয়ে যান। যেমন কথা তেমন কাজ। মাজনূর পিতা মাজনূকে নিয়ে হজের ইরাদায় মক্কায় নিয়ে গেল। মানাসেকে হজ তাকে দেখাল এবং মাজনূকে বলল কা'বার গিলাফ জড়িয়ে ধরে বলো, اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِىْ مِنْ لَيْلِىْ وَحُبِّهَا হে আল্লাহ আমা হতে লাইলীর মহব্বত সরিয়ে নিন আমাকে আরাম দিন। মাজনূ আরো পাগলপাড়া হয়ে উপরোক্ত شعر -এর পরিবর্তে বলতে লাগল– اَللّٰهُمَّ مُنَّ عَلَىَّ بِلَيْلِىْ وَقُرْبِهَا হে আল্লাহ আমাকে লাইলীর নৈকট্য দান করে আমার উপর ইহ্সান করো। মাজনূর বাবা একথা শুনেই তাকে প্রহার করতে লাগল। আর বলল, আমি তোমাকে লাইলীর প্রেম দূরীকরণের কথা বলছি আর তুমি প্রেম হাসিলের দোয়া করতেছ। তখন মাজনূ নিম্নোক্ত شعر বলতে লাগল

يَارَبِّ لَا تَسْلُبَنِّىْ حُبَّهَا اَبَدًا * وَيَرْحَمُ اللّٰهُ عَبْدًا قَالَ اٰمِيْنًا -

হে আমার রব! আমার থেকে তার মহব্বতকে কখনো দূর করবেন না।

আর আমার এ দোয়ার উপর যে আমীন বলবে তার উপর রহম করুন। এ-তো ছিল امين . مد হওয়ার দলিল। আর امين . قصر পড়া হলে তার দলিল হলো– اَمِيْنَ فَزَادَ اللّٰهُ مَا بَيْنَنَا بُعْدًا উক্ত شعر -এর মধ্যে الف টি قصر -এর সাথে এসেছে। এ شعر টি হলো جُبَيْرُ اِبْنُ اَضْبَطْ -এর। সে ফাত্হাল নামক এক ব্যক্তির কাছে উট চাইল। কিন্তু সে তাকে উট দেয়নি। তখন কবি নিম্নোক্ত شعر বলে,

تَبَاعَدَ عَنِّىْ فُطْحُلُ اِذْ دَعَوْتُهُ * اَمِيْنَ فَزَادَ اللّٰهُ مَا بَيْنَنَا بُعْدًا -

ফাতহাল আমার থেকে দূরে সরে গেছে যখন আমি আমার প্রয়োজনের জন্য তাকে ডেকে ছিলাম আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যকার দূরত্বকে আরো বাড়িয়ে দিন। এখানে امين শব্দটি প্রথমে এবং দোয়া পরে এসেছে। অথচ বাস্তব তরতীব অনুযায়ী দোয়া আগে ও امين পরে আসার কথা ছিল। এর কারণ হলো কবির নিকট দোয়া কবুল হওয়ার ইহ্তিতাম অধিক, তাই قصر হওয়ার কারণে امين -কে আগে আনা হয়েছে।

قَالَ وَيُخْفُوْنَهَا لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) وَلِأَنَّهُ دُعَاءٌ فَيَكُوْنَ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِخْفَاءِ وَالْمَدُّ وَالْقَصْرُ فِيْهِ وَجْهَانِ وَالتَّشْدِيْدُ فِيْهِ خَطَأٌ فَاحِشٌ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুক্তাদীরা তা (আমীন) অনুচ্চৈঃস্বরে পড়বে। কেননা আমাদের পূর্ব বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসে এরূপ আছে। তা ছাড়া এটা দোয়া বিশেষ। সুতরাং গোপন করার উপরই ভিত্তি হবে (امين) শব্দটিতে দীর্ঘ الف ও হ্রস্ব আলিফ দু'টো উচ্চারণই রয়েছে। শব্দে (মীমের) উপর তাশদীদ প্রয়োগ মারাত্মক ভুল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের মতে ইমাম মুক্তাদী সবার জন্য আমীন অনুচ্চঃস্বরে পড়া সুন্নত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) উচ্চৈঃস্বরে পড়ার প্রবক্তা। তাঁর দলিল হলো, আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীস– عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْنَ وَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন وَلَا الضَّالِّيْنَ বলতেন, তখন আমীন বলতেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলতেন। আমাদের দলিল ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস যা উপরে বর্ণিত হয়েছে– قَالَ اَرْبَعٌ يُخْفِيْهِنَّ الْإِمَامُ التَّعَوُّذُ وَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَآمِيْنَ অন্য রিওয়ায়াতে আছে خَمْسٌ يُخْفِيْهِنَّ الْإِمَامُ অর্থাৎ উপরোক্ত চারটি ব্যতীত سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ-এরও উল্লেখ রয়েছে। এ রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা গেল আমীন অনুচ্চৈঃস্বরে পড়বে। দ্বিতীয় দলিল হলো امين শব্দটি استجب-এর অর্থে আসে, যা দোয়া বিশেষ। আর দোয়া গোপনই হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً এ কারণে আমীন অনুচ্চৈঃস্বরে বলা মাস্‌নূন হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পেশকৃত ওয়াইল ইবনে হুজরের হাদীসের জবাব হলো, আলকামা ইবনে ওয়াইল তাঁর পিতা ওয়াইল থেকে বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ-এর উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং রিওয়ায়াতের মধ্যে বিরোধ হওয়ায় ওয়াইল ইবনে হুজরের উভয় রিওয়ায়াত অগ্রহণযোগ্য। আর ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস যা আমাদের দলিল তা গ্রহণযোগ্য হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, امين-এর الف-এর মধ্যে مد এবং قصر উভয় ভাবেই পড়া জায়েজ। যার আলোচনা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। امين-এর মীমকে تشديد দিয়ে পড়া মারাত্মক ভুল। কারো কারো মতে এর দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। কিন্তু কোনো কোনো ফকীহ্‌দের মতে নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা এ ধরনের নজীর কুরআনে বিদ্যমান। যেমন ইরশাদ হয়েছে– وَلَا آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ।

قَالَ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَيُكَبِّرُ مَعَ الْاِنْحِطَاطِ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَ رَفْعٍ وَيَحْذِفُ التَّكْبِيْرَ حَذْفًا لِاَنَّ الْمَدَّ فِيْ اَوَّلِهٖ خَطَأٌ مِنْ حَيْثُ الدِّيْنِ لِكَوْنِهٖ اِسْتِفْهَامًا وَفِيْ اٰخِرِهٖ لَحْنٌ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَيُفَرِّجُ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِاَنَسٍ (رض) اِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلٰى رُكْبَتَيْكَ وَفَرِّجْ بَيْنَ اَصَابِعِكَ وَلَايَنْدُبُ اِلَى التَّفْرِيْجِ اِلَّا هٰذِهِ الْحَالَةَ لِيَكُوْنَ اَمْكَنَ مِنَ الْاَخْذِ وَلَا اِلَى الضَّمِّ اِلَّا فِيْ حَالَةِ السُّجُوْدِ وَفِيْمَا وَرَاءَ ذٰلِكَ يُتْرَكُ عَلَى الْعَادَةِ وَيَبْسُطُ ظَهْرَهٗ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ اِذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهٗ وَلَا يَرْفَعُ رَاْسَهٗ وَلَا يُنَكِّسُهٗ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ اِذَا رَكَعَ لَايُصَوِّبُ رَاْسَهٗ وَلَايُقْنِعُهٗ وَيَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثَلٰثًا وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِيْ رُكُوْعِهٖ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثَلٰثًا ذٰلِكَ اَدْنَاهُ اَيْ اَدْنٰى كَمَالِ الْجَمْعِ ۔

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তারপর তাকবীর বলবে ও রুকু করবে। الجامع الصغير গ্রন্থে রয়েছে যে, নত হওয়ার সঙ্গে তাকবীর বলবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে প্রত্যেক উঠা-নামার সময় তাকবীর বলতেন। তাকবীরকে খাটোভাবে উচ্চারণ করবে। কেননা তাকবীরের প্রথমাংশে লম্বা করা দীনের দৃষ্টিতে ভুল। কেননা তা প্রশ্নবোধক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে শেষাংশে লম্বা করা ভাষাগত দিক থেকে ভুল। উভয় হাত দুই হাঁটুতে স্থাপন করবে এবং আঙ্গুলগুলোর মাঝে ফাঁক রাখবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আনাস (রা.)-কে বলেছেন, যখন তুমি রুকু করবে তখন তোমার দু' হাত হাঁটুতে রাখবে এবং তোমার আঙ্গুলগুলোর মাঝে ফাঁক করবে। এ অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো সময় আঙ্গুল ফাঁক রাখা মোস্তাহাব নয়, যেন শক্ত করে ধরা হয়। তদ্রূপ সিজ্দার অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো সময় আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা মোস্তাহাব নয়। এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিবে। আর পিঠকে সমতলভাবে রাখবে। কেননা মহানবী ﷺ যখন রুকু করতেন তখন তাঁর পিঠ সমতলভাবে রাখতেন। এবং নিজের মাথা উপরের দিকে উঠাবে না এবং ঝুকাবেও না। কেননা মহানবী ﷺ যখন রুকু করতেন তখন তাঁর পিঠ সমতলভাবে রাখতেন। এবং নিজের মাথা উপরের দিকে উঠাবে না এবং ঝুঁকাবেও না। কেননা মহানবী ﷺ যখন রুকু করতেন তখন তিনি মাথা উপরের দিকে উঠাতেন না এবং ঝুঁকিয়েও রাখতেন না। আর তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ বলবে। আর এটা হলো তাসবীহের সর্ব নিম্ন পরিমাণ। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রুকু করে তখন সে যেন তার রুকুতে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ বলে। আর এটা হলো তার সর্বনিম্ন পরিমাণ। অর্থাৎ বহুবচন পূর্ণ করার সর্বনিম্ন পরিমাণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কেরাত পূর্ণ করার পর সাথে সাথে তাকবীর বলবে এবং রুকূ করবে অর্থাৎ প্রথমে খাড়া হয়ে তাকবীর বলবে তারপর রুকূ করবে। ইমাম কুদূরী (র.)-এর মতে এটাই বিশুদ্ধ মাযহাব। জামে সগীর গ্রন্থে রয়েছে যে, রুকূতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলবে অর্থাৎ রুকূতে নত হওয়ার সময় তাকবীর শুরু করবে এবং রুকূতে গিয়ে পূর্ণ করবে। ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, এটাই বিশুদ্ধ। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে প্রত্যেক উঠা নামার সময় তাকবীর বলতেন। উক্ত হাদীস ইবনে মাসউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন كَانَ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ خَفْضٍ وَ رَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُوْدٍ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক উঠা-নামার সময় তাকবীর বলতেন এবং দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায়ও (তাকবীর) বলতেন এবং হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)ও। এ হাদীস দ্বারাও রুকূতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলা বুঝা যায়। শায়খ আবুল হাসান কুদূরী (র.) বলেন, তাকবীরকে খাটো করে উচ্চারণ করবে। অর্থাৎ যেখানে مد নেই সেখানে مد করা হবে না। অর্থাৎ الله اكبر -এর মধ্যে الله -এর الف -এ সামান্য فتحه দিবে এবং لام -কে مد করবে এবং ه-কে رفع দিবে। আর اكبر -এর الف ও ب -কে সামান্য فتحه দিবে এবং শেষাক্ষরে جزم দিবে। এর দলিল হলো, যদি الله -এর الف -কে مد তথা টেনে পড়া হয় অথবা اكبر -এর শুরুতে مد করা হয়, তখন তা দীনের দৃষ্টিতে ভুল হবে। কেননা এ অবস্থায় তা প্রশ্নবোধক হয়ে যাবে এবং প্রথম সুরতে অর্থ হবে কি আল্লাহ বড়? দ্বিতীয় সুরতে অর্থ হবে আল্লাহ কি বড়? উভয় সুরতে আল্লাহর বড়ত্বের মাঝে সন্দেহ এসে যায়। আর আল্লাহর বড়ত্বের মাঝে ইচ্ছাকৃত সন্দেহ পোষণ করা কুফরি। কিন্তু হিদায়া গ্রন্থকার এটাকে خطا বলেছেন كفر বলেননি। তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি اكبر -এর শেষে মদ করে اكبار পড়া হয় তখন তা ভাষাগত দিক থেকে ভুল হবে। এর দ্বারাও নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

يَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلٰى الخ : উপরোক্ত ইবারতে রুকূ করার পদ্ধতি আর রুকূর তাসবীহের আলোচনা করা হয়েছে। রুকূ করার মাসনূন তরীকা হলো, নামাজি ব্যক্তি উভয় হাত দ্বারা উভয় হাঁটু ধরবে এবং হাতের আঙ্গুল গুলোর মাঝে ফাঁক রাখবে। (উভয় পা দাঁড়ানো থাকবে) দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আনাস (রা.) (যিনি তাঁর খাদেমে খাস ছিলেন, তাকে) বলেন, (ওহে বেটা) তুমি যখন রুকূ করবে তখন তোমার দু' হাত হাঁটুতে রাখবে এবং তোমার আঙ্গুলগুলোর মাঝে ফাঁক রাখবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, রুকূ অবস্থায় আঙ্গুলগুলোর মাঝে ফাঁক রাখা মোস্তাহাব, যাতে আঙ্গুলগুলো দ্বারা হাঁটু ধরে রাখা সম্ভব হয়। রুকূ ছাড়া অন্যান্য সময় আঙ্গুল ফাঁকা রাখা মোস্তাহাব নয়। সিজ্দা অবস্থায় হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা মোস্তাহাব, যাতে আঙ্গুলগুলোর মাথা কিবলামুখী হয়ে যায়। এ দু অবস্থা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিবে। রুকূ অবস্থায় পিঠকে এমনভাবে সমতল রাখবে যে, যদি পিঠের উপর কোনো পানির পেয়ালা রাখা হয় তা স্থির থাকে। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকূ করতেন তখন পিঠকে সমতল রাখতেন। হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত إِنَّهُ كَانَ يَعْتَدِلُ لَوْ وُضِعَ عَلٰى ظَهْرِهٖ قَدَحُ مَاءٍ تَسْتَقِرُّ রাসূলুল্লাহ ﷺ পিঠকে এমন বরাবর বা সমতল রাখতেন যদি তাঁর পিঠের উপর পানি ভরা পেয়ালা রাখা হয় তবে তা স্থির থাকে। তা ছাড়া ওয়াবিসাহ ইবনে মা'বাদ-এর হাদীসে রয়েছে سَوّٰى ظَهْرَهٗ حَتّٰى لَوْصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ তার পিঠ এমন সমতল করতেন এমনকি যদি তার উপর পানি ঢেলে দেওয়া হয় তবে তা স্থির থাকবে। কদূরী প্রণেতা বলেন, রুকূ অবস্থায় মাথা বেশি উপরেও উঠাবে না এবং বেশি নিচুও করবে না। অর্থাৎ নিতম্ব বরাবর রাখবে। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকূ করতেন তখন মাথা উপরের দিকেও উঠাতেন না এবং ঝুঁকিয়েও রাখতেন না।

রুকূ অবস্থায় তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ বলবে। আর এটা হলো তাসবীহের সর্বনিম্ন পরিমাণ। না হয় পাঁচবার, সাতবার বা তার চেয়ে অধিকও পড়া জায়েজ। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহর ﷺ বাণী– إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِيْ رُكُوْعِهٖ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ তোমাদের কেউ যখন রুকূ করে তখন সে যেন তার রুকূতে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثَلٰثًا বলে। আর তিনবার বলা হলো বহুবচন পূর্ণ করার সর্বনিম্ন পরিমাণ।

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَقُوْلُ الْمُؤْتَمُّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَلَايَقُوْلُهَا الْاِمَامُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا يَقُوْلُهَا فِىْ نَفْسِهٖ لِمَا رَوٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الذِّكْرَيْنِ وَلِاَنَّهُ حَرَّضَ غَيْرَهُ فَلَايَنْسٰى نَفْسَهُ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ هٰذِهٖ قِسْمَةٌ وَاِنَّهَا تُنَافِى الشَّرْكَةَ وَلِهٰذَا لَايَاْتِى الْمُؤْتَمُّ بِالتَّسْمِيْعِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِىْ وَلِاَنَّهُ يَقَعُ تَحْمِيْدُهُ بَعْدَ تَحْمِيْدِ الْمُقْتَدِىْ وَهُوَ خِلَافُ مَوْضُوْعِ الْاِمَامَةِ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلٰى حَالَةِ الْاِنْفِرَادِ وَالْمُنْفَرِدُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِى الْاَصَحِّ وَاِنْ كَانَ يُرْوَى الْاِكْتِفَاءُ بِالتَّسْمِيْعِ وَيُرْوٰى بِالتَّحْمِيْدِ وَالْاِمَامُ بِالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ اٰتٍ بِهٖ مَعْنًى ـ

অনুবাদ : তারপর মাথা তুলবে এবং سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে। আর মুক্তাদী رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর মতে ইমাম তা বলবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, ইমাম তা মনে মনে বলবেন। কেননা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী ﷺ উভয় জিকিরকে একত্র করতেন। তা ছাড়া ইমাম অন্যকে (তা বলতে) উদ্বুদ্ধ করেছেন। সুতরাং তিনি নিজে তা ভুলতে পারেন না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ইমাম যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন তখন তোমরা رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলো। এ হলো বণ্টন, যা শরিকির পরিপন্থী। এ জন্যই তো আমাদের মতে মুক্তাদী سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে না। অবশ্য ইমাম শাফি'ঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তা ছাড়া ইমামের তাহ্‌মীদ মুক্তাদীর তাহমীদের পরে হয়ে যাবে, যা ইমামত পদবীর পরিপন্থী। আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস মুনফারিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশুদ্ধ মতে মুনফারিদ উভয়টিকে একত্রিত করবে। যদিও শুধু سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলা এবং অপর রিওয়ায়াতে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলার কথাও বর্ণিত হয়েছে। আর ইমাম মুক্তাদীকে তাহ্‌মীদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তা পালন করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বাক্যটির অর্থ قَبِلَ اللّٰهُ حَمْدَ مَنْ حَمِدَهُ যে ব্যক্তি আল্লাহর হাম্‌দ করে আল্লাহও তার হাম্‌দ কবুল করেন। মোট কথা, এ বাক্যটি হলো কবুলিয়তে হাম্‌দের দোয়া। আর سماع শব্দটি কখনো কখনো قبول -এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন– কোনো হাকিম যদি কারো দরখাস্ত কবুল করে তখন বলা হয় سَمِعَ الْاَمِيْرُ كَلَامَ فُلَانٍ । حمده -এর ه শব্দটি سكتة -এর জন্য না كناية -এর জন্য। এ সম্পর্কে দু'টো মতামত পাওয়া যায়। তবে سكتة -এর জন্য এ বক্তব্যটি মজবুত বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত।

মাসআলাটির সার সংক্ষেপ হলো, ইত্‌মিনানের সাথে রুকূ করার পর মাথা উঠানো অবস্থায় سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে। যদি ইমাম হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তা বলবে এবং উচ্চৈঃস্বরে বলবে। আর যদি মুক্তাদী হয় তাহলে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

বলবে। এটাই যাহির রিওয়ায়াত। অবশ্য কোনো কোনো রিওয়ায়াতে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বা رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ও বর্ণিত রয়েছে।- (ইনায়া)

ইমাম رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে কিনা? এ সম্পর্কে ওলামাদের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, ইমাম তা বলবে না। আর সাহেবাইন (র.) বলেন ইমাম তা বলবে এবং আস্তে বলবে। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস-

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلٰوةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِىْ سَاجِدًا ـ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজ আদায়ের ইচ্ছা করতেন, তখন তাকবীর বলতেন যখন দাঁড়াতেন। তারপর যখন রুকু করতেন তখন তাকবীর বলতেন। তারপর যখন রুকূ থেকে পিঠ উঠাতেন তখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন। তারপর দাঁড়িয়ে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলতেন, তারপর যখন সিজদায় যেতেন তখন আবার তাকবীর বলতেন।- (ফাতহুল কাদীর) উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ ﷺ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ও رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ উভয়টি বলতেন। আর সাধারণত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমামত করতেন। সুতরাং বুঝা গেল ইমাম উভয় জিকির তথা سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ও رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। দ্বিতীয় দলিল, ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তাই নিজেকেও তিনি ভুলতে পারেন না। অর্থাৎ যখন ইমাম বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তার প্রশংসা শুনেন। এর মাকসাদ তো হলো এমনটি নিজে অবশ্যই করবে এবং অন্যরাও করবে। না হয় তো اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ-এর ভয়াবহতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী- إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ দলিল এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে বণ্টন করেছেন যে, ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে আর মুক্তাদী رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। আর বণ্টন হলো শরিকির পরিপন্থী। এ জন্য ইমাম তাহ্মীদ বলার সময় মুক্তাদীর সাথে শরিক হবে না। এ কারণেই আমাদের মতে মুক্তাদী سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে না। যদিও ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

দ্বিতীয় দলীল হলো, যদি ইমাম رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলে তাহলে তার এই তাহ্মীদ মুক্তাদীর তাহ্মীদের পরে বলতে হবে। কেননা মুক্তাদী رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ তখন বলবে, যখন ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে। সুতরাং এ অবস্থায় ইমামকে অবশ্যই মুক্তাদীর পর তাহমীদ বলতে হবে, যা ইমামত পদবীর পরিপন্থী। কেননা ইমামের প্রথমে বলা উচিত আর মুক্তাদীর পরে বলা উচিত। অথচ এখানে তার উল্টো হচ্ছে। সাহেবাইন (র.)-এর পেশকৃত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের জবাব হচ্ছে, এ হাদীস মুনফারিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর বিশুদ্ধতম মতে মুনফারিদ তাসমী ও তাহমীদ উভয়টিকে একত্র করবে। এ ছাড়া আরো দু'টো রিওয়ায়াত রয়েছে যে, এক. মুনফারিদ শুধু سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে, দুই. শুধু رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। প্রথমটির কারণ হলো ইমাম শুধু سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে আর মুনফারিদও তো নিজের ব্যাপারে ইমাম। কেননা ইমামের উপর যেমনিভাবে কেরাত ওয়াজিব, এমনিভাবে মুনফারিদ-এর উপরও কেরাত ওয়াজিব। দ্বিতীয়টির কারণ হলো, মুনফারিদ যদি তাসমী ও তাহ্মীদ উভয়টিকে একত্র করে তখন তাহ্মীদ ই'তিদাল তথা কাওমা অবস্থায় বলতে হবে অথচ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় স্থানান্তরিত হওয়ার সময় ই'তিদাল অবস্থায় কোনো মাসনূন জিকির নেই। যেমন- দু' সিজদার কা'দার সময় কোনো মাসনূন জিকির নেই। এ জন্য বলা হয়েছে মুনফারিদ তাসমী বলবে না; বরং শুধু তাহ্মীদ বলবে। দ্বিতীয় রিওয়ায়াতের সমর্থন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর এ বক্তব্য দ্বারাও হয়। তিনি বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, কোনো কি ব্যক্তি ফরজ নামাজে রুকূ থেকে মাথা উঠাবার সময় اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ বলতে পারে? তিনি বলেন, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে এবং চুপ থাকবে। এমনিভাবে দু' সিজদার মাঝেও চুপ থাকবে। বিশুদ্ধতম মতের দলিল হলো সহীহ হাদীস দ্বারা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছানা জিকির তথা তাসমী ও তাহমীদকে একত্র করতেন।

সাহেবাইন (র.)-এর আকলী দলিলের জবাব হচ্ছে, যখন মুক্তাদী سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেছেন, তখন তিনি মুক্তাদীদেরকে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। সুতরাং اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ অনুযায়ী যেমন ইমামও পরোক্ষভাবে তা বলেছেন, এ জন্য ইমাম اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ-এর ভয়বহতার অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

قَالَ ثُمَّ إِذَا اسْتَوٰى قَائِمًا كَبَّرَ وَ سَجَدَ أَمَّا التَّكْبِيْرُ وَالسُّجُوْدُ فَلِمَا بَيَّنَّا وَأَمَّا الْإِسْتِوَاءُ قَائِمًا فَلَيْسَ بِفَرْضٍ وَكَذَا الْجَلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالطَّمَانِيْنَةُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) يَفْتَرِضُ ذٰلِكَ كُلُّهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ (رحـ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَهُ لِأَعْرَابِىٍّ حِيْنَ أَخَفَّ الصَّلٰوةَ وَلَهُمَا أَنَّ الرُّكُوْعَ هُوَ الْإِنْحِنَاءُ وَالسُّجُوْدُ هُوَ الْإِنْخِفَاضُ لُغَةً فَيَتَعَلَّقُ الرُّكْنِيَّةُ بِالْأَدْنٰى فِيْهِمَا وَكَذَا فِى الْإِنْتِقَالِ إِذَا هُوَ غَيْرُ مَقْصُوْدٍ وَفِىْ أٰخِرِ مَا رُوِىَ تَسْمِيَتُهُ إِيَّاهُ صَلٰوةً حَيْثُ قَالَ وَمَا نَقَصْتَ مِنْ هٰذَا شَيْئًا فَقَدْ نَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ ثُمَّ الْقَوْمَةُ وَالْجَلْسَةُ سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا وَكَذَا الطَّمَانِيْنَةُ فِىْ تَخْرِيْجِ الْجُرْجَانِىْ (رحـ) وَفِىْ تَخْرِيْجِ الْكَرْخِىْ (رحـ) وَاجِبَةٌ حَتّٰى تَجِبَ سَجْدَتَا السَّهْوِ بِتَرْكِهَا عِنْدَهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে এবং সিজদায় যাবে। তাকবীর ও সিজদার কারণ তা যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি। তবে সোজা হয়ে দাড়ানো অবশ্য ফরজ নয়। তদ্রূপ দুই সিজদার মাঝে বসা এবং রুকূ ও সিজদায়ে সুস্থির হওয়াও ফরজ নয়। এটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এগুলো সবই ফরজ। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এরও এই মত। কেননা দ্রুততার সাথে নামাজ আদায়কারী জনৈক বেদুইন সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন — দাঁড়াও এবং (পুনঃ) নামাজ আদায় করো, কেননা তুমি নামাজ আদায় করোনি। (বুঝা গেল যে, যাবতীয় রুকন ধীরস্থিরতার সাথে আদায় না করলে নামাজ জায়েজ হবে না। সুতরাং আলোচ্য হাদীসের আলোকে ধীরস্থিরতা একটি ফরজ বলে প্রমাণিত হলো।) ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, رکوع -এর আভিধানিক অর্থ– মাথা ঝুঁকানো এবং سجود -এর আভিধানিক অর্থ–মাথা পূর্ণ অবনত করা। সুতরাং রুকূ ও সিজদার সর্বনিম্ন পরিমাণের সাথে রুকনের সম্পর্ক হবে। তদ্রূপ (রুকূ থেকে সিজ্দায় বা সিজদা থেকে সিজদায়) গমনের ক্ষেত্রেও সর্বনিম্ন পরিমাণ বিবেচ্য হবে। কেননা তা উদ্দেশ্য নয়। (রুকূ ও সিজদা হলো উদ্দেশ্য। সিজদায় গমনকালে যে অঙ্গ সঞ্চালন, সেটা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং ঐ পরিমাণ অঙ্গ স্ফালনই যথেষ্ট হবে, যা দ্বারা রুকূ সিজদা থেকে এবং এক সিজদা অন্য সিজদা থেকে পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে।) আর বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে বেদুঈন সাহাবীদের আমলকে নামাজ (সালাত) আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت من صلاتك তা থেকে যে পরিমাণ তুমি কম করলে, মূলত তুমি তোমার নামাজ থেকে সেই পরিমাণ ক্ষতি করলে। (অর্থাৎ "সুস্থিরতা" বর্জন করা যদি নামাজ নষ্টের কারণ হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাকে নামাজ আখ্যায়িত করতেন না।) ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, তারপর কাওমা ও জালসা সুন্নত। তদ্রূপ ইমাম (আবূ আব্দুল্লাহ) জুরজানী (র.)-এর তাখরীজ (মাসআলা বিশ্লেষণ) মুতাবিক ধীরস্থিরতা অবলম্বন করাও সুন্নত। আর ইমাম কারখী (র.)-এর তাখরীজ মুতাবিক তা ওয়াজিব। সুতরাং তাঁর মতে ধীরস্থিরতা বর্জন করলে সিজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : নামাজি ব্যক্তি যখন রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলে সিজদায় চলে যাবে। দলিল উপরে বর্ণিত হয়েছে إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ আর সিজদার ব্যাপারে দলিল প্রথমে অধ্যায়ে আল্লাহর বাণী– وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا দ্বারা দেওয়া হয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, তা'দীলে আরকান অর্থাৎ রুকূর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাকে কাওমা বলে, দু' সিজদার মাঝে বসা এবং রুকূ ও সিজদায় সুস্থির হওয়া তরফাইন (র.)-এর মতে ফরজ নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা'দীলে আরকান ফরজ। ইমাম শাফি'ঈ (র.)ও একই মত পোষণ করেন। উক্ত মতবিরোধের ফলাফল হলো, তা'দীলে আরকান ব্যতীত তরফাইন (র.)-এর মতে নামাজ জায়েজ হবে কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না। তাঁর দলিল, এক আ'রাবীর হাদীস, আ'রাবীর নাম হলো খাল্লাদ ইবনে রাফে। বুখারী মুসলিমে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

إِنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلٰوةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِي صَلٰوتِكَ كُلِّهَا حَتّٰى تَقْضِيَهَا -

এক আ'রাবী ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামাজ আদায় করল। তারপর এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যাও পুনঃ নামাজ পড়ো কেননা তুমি নামাজ পড়নি। অর্থাৎ তোমার নামাজ হয়নি। সুতরাং সে ফিরে গিয়ে পুনরায় পূর্বের ন্যায় নামাজ পড়ল এবং এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিল। রাসূলুল্লাহ আবারো তাকে বললেন, যাও পুনরায় নামাজ পড়ো কেননা তুমি নামাজ পড়নি। আ'রাবী তৃতীয়বার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল ঐ সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন। এটা ব্যতীত অন্য আর কোন সুরত উত্তম আপনি আমাকে তা শিক্ষা দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, যখন তুমি নামাজের জন্য দাঁড়াবে, তখন তাকবীর বলো, তারপর مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করো, তারপর ইত্‌মিনানে রুকূ করো। এরপর রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাও, তারপর ইতমিনানে সিজদা করো। তারপর সিজদা থেকে ইত্‌মিনানে বসে যাও। তারপর এমনটি পুরো নামাজে করো এমনকি নামাজ শেষ হয়ে যাবে। উক্ত হাদীস দ্বারা এভাবে দলিল দেওয়া হয় যে, তা'দীলে আরকান তরক করার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ তুমি নামাজ পড়নি, তোমার নামাজ হয়নি। বুঝা গেল তা'দীলে আরকান ফরজ। কেননা ফরজ ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে এমনটি বলা হয় না। তরফাইন (র.)-এর দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا দলিল হলো এভাবে যে, রুকূ বলা হয় মাথা ঝুঁকানোকে আর সিজদা বলা হয় মাথা পূর্ণভাবে অবনত করাকে। সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা রুকূ ও সিজদা নামাজের অংশ বা রুকন সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং যে ন্যূনতম পরিমাণ দ্বারা রুকূ ও সিজদা সম্পন্ন হবে, ততটুকুই রুকন হবে। আর আয়াত দ্বারাও এটাই উদ্দেশ্য। আর যেহেতু এ আয়াত রুকূ ও সিজদার অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার ব্যাপারে খাছ। আর যা খাছ হয় তা বয়ানের মুখাপেক্ষী হয় না। এ কারণে আ'রাবীর হাদীসটি এ আয়াতের জন্য বয়ান হতে পারে না। আর যদি বলা হয় যে, হাদীসে আ'রাবী উক্ত আয়াতের জন্য নাসিখ আর আয়াতটি মানসূখ; তখন আমরা বলব এটা সম্ভব নয়। কেননা এ হাদীসটি হলো খবরে ওয়াহিদ। আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কিতাবুল্লাহকে মানসূখ করা যায় না। সুতরাং বুঝা গেল মুত্‌লাকান মাথা ঝুঁকানো বা পূর্ণ মাথা নত করাই ফরজ।— (নূরুল আনওয়ার)

وَفِيْ مَا رُوِيَ দ্বারা হাদীসে আ'রাবীর জবাব দেওয়া হচ্ছে। জবাবের খোলাসা হলো, আ'রাবী ব্যক্তি নামাজের সুরতে যা কিছু করেছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলোকে নামাজ নামে অভিহিত করেছেন। তাইতো উক্ত হাদীসের শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে وَمَا نَقَصْتَ مِنْ هٰذَا شَيْئًا فَقَدْ نَقَصْتَ مِنْ صَلٰوتِكَ তা থেকে যে পরিমাণ তুমি কম করলে মূলত তোমার নামাজ থেকে সে পরিমাণ ক্ষতি করলে। এখন তা'দীলে আরকানকে তরক করা যদি নামাজ ভঙ্গকারী হতো। তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নামাজকে নামাজ নামে আখ্যায়িত করতেন না। যেমন রুকূও সিজদা তরক করা হলে নামাজ ফাসিদ হয়ে যায় অথচ তাকে নামাজ বলা হয় না। বুঝা গেল তা'দীলের তরক দ্বারা নামাজ ক্ষতি হয় কিন্তু নামাজ ফাসিদ হয় না। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের শানতো ফরজের নয়। তাই হাদীসে আ'রাবী দ্বারা তা'দীলে আরকানের ফরযিয়ত সাবিত হয় না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কাওমা ও দু' সিজদার মধ্যকার জালসা তরফাইন (র.)-এর সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নত। তবে রুকূ ও সিজদার ধীরস্থিরতার হুকুম-এর তাখরীজ এর ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ জুরজানী (র.) -এর তাখরীজ অনুযায়ী ধীরস্থিরতা সুন্নত। ইমাম কারখী (র.)-এর তখরীজ অনুযায়ী ওয়াজিব। এমনকি ইমাম কারখী (র.)-এর মতে ধীরস্থিরতার তরক দ্বারা সাহু সিজদা ওয়াজিব। আল্লামা জুরজানী (র.)-এর বক্তব্যের কারণ হলো, এই সুস্থিরতা তাকমীলে রুকন-এর জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে। আর যে জিনিস তাকমীলে রুকন-এর জন্য প্রবর্তন করা হয় তা সুন্নত হয়ে থাকে। সুতরাং এই ধীরস্থিরতাও সুন্নত হবে। ইমাম কারখী (র.)-এর বক্তব্যের কারণ হলো, এই ধীরস্থিরতা মূলত হুবহু রুকন, এর জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে আর যা এমন হয় তা ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং এই ধীরস্থিরতাও ওয়াজিব হবে

وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْاَرْضِ لِاَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ (رضـ) وَصَفَ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَجَدَ وَ ادَّعَمَ عَلٰى رَاحَتَيْهِ وَ رَفَعَ عَجِيْزَتَهُ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَيَدَيْهِ حِذَاءَ اُذُنَيْهِ لِمَا رُوِىَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ كَذٰلِكَ قَالَ وَسَجَدَ عَلٰى اَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ لِاَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهِ فَاِنِ اقْتَصَرَ عَلٰى اَحَدِهِمَا جَازَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَايَجُوْزُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى الْاَنْفِ اِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ وَعَدَّ مِنْهَا الْجَبْهَةَ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ اَنَّ السُّجُوْدَ يَتَحَقَّقُ بِوَضْعِ بَعْضِ الْوَجْهِ وَهُوَ الْمَامُوْرُ بِهِ اِلَّا اَنَّ الْخَدَّ وَالذَّقَنَ خَارِجٌ بِالْاِجْمَاعِ وَالْمَذْكُوْرُ فِيْمَا رُوِىَ الْوَجْهُ فِى الْمَشْهُوْرِ وَ وَضْعُ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا لِتَحَقُّقِ السُّجُوْدِ دُوْنَهُمَا وَاَمَّا وَضْعُ الْقَدَمَيْنِ فَقَدْ ذَكَرَ الْقُدُوْرِىُّ (رحـ) اَنَّهُ فَرِيْضَةٌ فِى السُّجُوْدِ ـ

অনুবাদ : আর উভয় হাত মাটিতে রাখবে। কেননা ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজের স্বরূপ দেখাতে গিয়ে সিজদা করেছেন, উভয় হাতের তালুর উপর ভর দিয়েছেন এবং নিতম্ব উঁচু করে রেখেছেন। আর মুখমণ্ডল দুই হাতের তালুর মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করেছেন এবং উভয় হাত উভয় কান বরাবর রেখেছেন। কেননা বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ এরূপ করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর নিজের নাক ও কপালের উপর সিজদা করবে। কেননা মহানবী ﷺ নিয়মিত এরূপ করেছেন। তবে যদি দু'টির একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, তাহলে তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জায়েজ হবে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ওজর ছাড়া শুধু নাকের উপর সীমাবদ্ধ রাখা জায়েজ হবে না। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে প্রাপ্ত আরেক রিওয়ায়েত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ আমাকে সপ্ত প্রত্যঙ্গের উপর সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে কপালকেও তিনি গণ্য করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে– ভূমিতে মুখমণ্ডলের অংশ বিশেষ স্থাপন দ্বারাই সিজদা সম্পন্ন হয়। আর তাই আদিষ্ট বিষয়। তবে সর্বসম্মতিক্রমে গণ্ডদেশ ও চিবুক এর থেকে বহির্ভূত। আর আলোচ্য হাদীসের প্রসিদ্ধ বর্ণনায় (جبهة-এর স্থলে) وجه মুখমণ্ডল শব্দটি রয়েছে। (সুতরাং কপাল ও নাক উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উভয় হাত এবং উভয় হাঁটু মাটিতে স্থাপন করা আমাদের নিকট সুন্নত। কেননা এ দু'টো ছাড়াও সিজদা সম্পন্ন হয়। আর দুই পা মাটিতে রাখা সম্পর্কে ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন যে, সিজদায় তা ফরজ। [কেননা সিজদা সম্পন্ন হয় মাটিতে মাথা রাখা এবং মাটি থেকে মাথা তোলার মাধ্যমে। আর পায়ের পাতা মাটিতে রাখা ছাড়া এ কাজ দু'টো পালন করা সম্ভব নয়। আর যা ব্যতিরেকে সহজে ফরজ আদায় করা যায় না, তা ফরজের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং কেউ যদি সিজদায় গিয়ে পা মাটি থেকে আলগা করে রাখে, তাহলে তার সিজদা হবে না। অবশ্য একপা উঠিয়ে রাখলে জায়েজ হবে কিন্তু মাকরূহ হবে। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো, ফরজ না হওয়ার ব্যাপারে হাতের তালু ও পায়ের পাতা দু'টোই সমান।–(মাবসূত)]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে সিজদার তরীকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, সিজদার তরীকা হলো– উভয় হাত মাটিতে রাখবে, চেহারা দু' হাতের তালুর মধ্যবর্তী স্থানে রাখবে এবং উভয় হাত উভয় কান বরাবর রাখবে। দলিল হলো, হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামাজের স্বরূপ দেখাতে গিয়ে فَسَجَدَ وَادَّعَمَ عَلٰى رَاحَتَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ তিনি সিজদা করেছেন, উভয় হাত মাটির উপর রেখেছেন এবং নিতম্ব উঁচু করে রেখেছেন। কেননা নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণিত রয়েছে। ওয়াইল ইবনে হুজর থেকেই অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে–তিনি বলেন, رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ـ

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, যখন তিনি সিজদা করেছেন তখন উভয় হাত কান বরাবর রেখেছেন। এমনিভাবে আবূ ইসহাক (র.) বলেন, আমি বারা ইবনে আযিব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে,

أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَضَعُ جَبْهَتَهُ إِذَا صَلّٰى قَالَ بَيْنَ كَفَّيْهِ ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজ পড়তেন তখন নিজের কপাল কোথায় রাখতেন? তিনি বলেন, উভয় হাতের তালুর মাঝখানে।

قَالَ وَسَجَدَ عَلٰى أَنْفِهِ الخ ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, সিজদার কাইফিয়ত ও সিজদা থেকে দাঁড়ানোর কাইফিয়তের ব্যাপারে মূলনীতি হলো– যে অঙ্গ জমিনের অধিক কাছে সিজদার সময় প্রথমে সে অঙ্গ জমিনে রাখবে। আর যে অঙ্গ আসমানের অধিক কাছে সিজদা হতে উঠার সময় প্রথমে সে অঙ্গ উঠাবে। সুতরাং সিজদা করার পদ্ধতি হলো, প্রথমে জমিনের উপর উভয় হাঁটু রাখবে; তারপর উভয় হাত, তারপর চেহারা। কারো কারো মতে জমিনে হাত রাখার পর নাক রাখবে তারপর কপাল রাখবে। আর উঠার সময় প্রথমে চেহারা উঠাবে, তারপর উভয় হাত, তারপর উভয় হাঁটু।

উপরোক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো, নাক ও কপাল উভয়টি দ্বারা সিজদা করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা এরূপ করতেন। আর যদি একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় তবে এর দুই অবস্থা রয়েছে। এক. শুধু কপালের ওপর সিজদা করবে। দুই. শুধু নাকের উপর সিজদা করবে। প্রথম সুরতে আমাদের ওলামাদের সর্বসম্মত অভিমত হল, সিজদা জায়েজ। দ্বিতীয় সুরতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কারাহাতসহ জায়েজ। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, ওজর ব্যতীত এমনটি করা জায়েজ নয়। তবে ওজর থাকলে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকেও জায়েজ। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল ঐ হাদীস যা সিহাহ্ সিত্তাহ্তে বর্ণিত হয়েছে –

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ـ

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আমাকে সপ্ত অঙ্গের উপর সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কপাল, উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের অগ্রভাগ। দলিল হলো, সাত অঙ্গের উপর সিজদার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে নাক এর কথা নেই। এতে বুঝা গেল নাক সিজ্‌দার স্থান নয়। সুতরাং শুধু নাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা জায়েজ নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে– কুরআনে কারীমে মুত্‌লাকান সিজ্‌দার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর সিজদা মুখমণ্ডলের অংশ বিশেষ স্থাপন দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে যায়। কেননা পুরো চেহারা জমিনে রাখা অসম্ভবও বটে। কারণ, নাক এবং কপালের হাড় এমন ভাসমান উত্থিত যা পুরো চেহারাকে জমিনে রাখার ক্ষেত্রে প্রতি বন্ধক। এ কারণে পুরো চেহারা জমিনে রাখা অসম্ভব। তাই চেহারার অংশ বিশেষ জমিনে রাখাটাই আদিষ্ট বিষয় বলে পরিগণিত হবে। তবে গণ্ডদেশ ও চিবুক সর্বসম্মতিক্রমে এ হুকুমের বহির্ভূত। অর্থাৎ আয়াতটি মুত্‌লাক হওয়ার কারণ যদিও এগুলো শামিল কিন্তু সর্ববিদিত মতে আয়াত দ্বারা এগুলো মুরাদ নয়। কেননা সিজ্‌দা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তা'যীম প্রদর্শন করা। আর গণ্ডদেশ ও চিবুক জমিনে রাখার দ্বারা

তা'যীম আদায় হয় না। এ জন্য এগুলো সিজ্‌দার বহির্ভূত হবে। তবে নাক ও কপাল উভয়টি সিজদার মহল বা স্থান; এ জন্য এগুলোর উপর সিজদা করা জায়েজ। আর যেহেতু কপালের উপর সীমাবদ্ধ করা জায়েজ তাই নাকের উপরও সীমাবদ্ধ করা জায়েজ হবে।

وَالْمَذْكُورُ فِيْمَا رُوِيَ উক্ত বাক্যের দ্বারা সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সার হচ্ছে- মশহুর রিওয়ায়াতের মধ্যে جبهه -এর স্থালে وجه এসেছে যেমন সুনানে আরবা'আতে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব সূত্রে বর্ণিত—

إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَ رُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ .

অর্থাৎ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইরশাদ করতে শুনেছেন যে, বান্দা যখন সিজদা করে তখন তার সাথে তার সাতটি অঙ্গ সিজদা করে। তার চেহারা, তার উভয় হাতের তালু, তার উভয় হাঁটু এবং তার উভয় পা। উক্ত হাদীসে وجه-এর কথা এসেছে। আর উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, وجه দ্বারা নাক ও কপাল উভয়টি মুরাদ। এ জন্য আমরা বলেছি সিজদার ক্ষেত্রে নাক ও কপাল উভয়টি বরাবর। হিদায়া প্রণেতা বলেন, আমাদের মতে হাত ও হাঁটু জমিনের উপর রাখা সুন্নত। ইমাম যুফার, ইমাম শাফি'ঈ এবং ফকীহ আবুল্লাইস (র.) বলেন ওয়াজিব। তাঁদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস- أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ الخ দলিল এভাবে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে সাত অঙ্গের উপর সিজদা করার امر (নির্দেশ) দেওয়া হয়েছে। আর امر . وجوب-কে চায়। বুঝা গেল যে, সাত অঙ্গ জমিনের উপর রাখা ওয়াজিব। আর এ সাত অঙ্গের মধ্যে হাত এবং উভয় হাঁটুও রয়েছে। এর কারণে উভয় হাত এবং উভয় হাঁটু জমিনের উপর রাখা ওয়াজিব। আমাদের দলিল হলো উভয় হাত ও উভয় হাঁটু জমিনের উপর রাখা ছাড়াও সিজদা করা সম্ভব। এ জন্য এগুলো জমিনের উপর রাখা সিজদার অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর হাদীসের জবাব হচ্ছে- এ হাদীস শুধু এ কথা বুঝায় যে, এ সাত অঙ্গ সিজদার মহল বা স্থান। কিন্তু এগুলো যে জমিনের উপর রাখা জরুরি এর উপর কোনো দলিল নেই। বাকি হাদীসে যে امرت শব্দটি এসেছে তার জবাব হচ্ছে- امر যেমনিভাবে وجوب-এর জন্যে আসে তেমনিভাবে ندب-এর জন্যেও আসে। এখানে امر . وجوب-এর জন্য আসেনি। সিজ্‌দায় উভয় পা জমিনের উপর রাখার ক্ষেত্রে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সিজদায় উভয় পা জমিনে রাখা ফরজ। সুতরাং সিজদার সময় পা জমিন থেকে আলাদা হলে নামাজ জায়েজ হবে না। ইমাম কারখী ও আবূ বকর জাস্‌সাস (র.)ও এ মতই পোষণ করেন। আর যদি এক পা জমিনের মধ্যে এবং অপর পা জমিন থেকে আলাদা হয় তা জায়েজ। ফকীহ কাযীখানের মতে কারাহাতের সাথে জায়েজ। ইমাম তামারতাশী বলেন, عدم فرضيت-এর ক্ষেত্রে উভয় হাত এবং উভয় পা বরাবর।

فَإِنْ سَجَدَ عَلٰى كَوْرِ عِمَامَتِهٖ أَوْ فَاضِلِ ثَوْبِهٖ جَازَ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَسْجُدُ عَلٰى كَوْرِ عِمَامَتِهٖ وَيُرْوٰى أَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلّٰى فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِيْ بِفُضُوْلِهٖ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا وَيُبْدِيْ ضَبْعَيْهِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَبْدِ ضَبْعَيْكَ وَيُرْوٰى وَأَبِدْ مِنَ الْإِبْدَادِ وَهُوَ الْمَدُّ وَالْأَوَّلُ مِنَ الْإِبْدَاءِ وَهُوَ الْإِظْهَارُ وَيُجَافِيْ بَطْنَهٗ عَنْ فَخِذَيْهِ لِأَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافٰى حَتّٰى أَنَّ بُهْمَةً لَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ وَقِيْلَ إِذَا كَانَ فِيْ صَفٍّ لَا يُجَافِيْ كَيْلَا يُؤْذِيْ جَارَهٗ وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا سَجَدَ الْمُؤْمِنُ سَجَدَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ فَلْيُوَجِّهْ مِنْ أَعْضَائِهِ الْقِبْلَةَ مَا اسْتَطَاعَ ـ

অনুবাদ : আর যদি পাগড়ীর প্যাঁচের উপর বা বাড়তি কাপড়ের উপর সিজ্দা করে তবে তা জায়েজ হবে। কেননা মহানবী ﷺ তাঁর পাগড়ীর প্যাঁচের উপর সিজদা করেছেন। আরো বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ এক কাপড়ে নামাজ আদায় করেছেন এবং বাড়তি অংশ দ্বারা ভূমির গরম ও ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে রক্ষা করতেন এবং নিজের উভয় বাহু খোলা রাখবে। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন– তুমি তোমার উভয় বাহু খোলা রাখবে। কোনো কোনো বর্ণনায় ابْدِ (এর স্থলে) ابِدْ রয়েছে। এটা ابداد থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ– প্রসারিত করা। আর প্রথমটি ابداء থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ– প্রকাশ করা এবং তার পেট উভয় উরু থেকে পৃথক রাখবে। কেননা মহানবী ﷺ সিজদা করার সময় এতটা পৃথক রাখতেন যে, বকরির ছোট বাচ্চা ইচ্ছা করলে তাঁর নিচ দিয়ে অতিক্রম করতে পারতো। ফকীহদের কেউ কেউ বলেন, কাতারে নামাজ আদায়ের সময় বাহু বেশি ছড়িয়ে রাখবে না, যাতে পার্শ্ববর্তী মুসল্লী কষ্ট না পায়। আর পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মু'মিন যখন সিজ্দা করে তখন তার প্রতিটি অঙ্গ সিজ্দা করে। সুতরাং সে যেন তার অঙ্গগুলোকে যতদূর সম্ভব কিব্লামুখী করে রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : আমাদের মতে পাগড়ীর প্যাঁচ বা বাড়তি কাপড়ের উপর সিজ্দা করা জায়েজ। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, পাগড়ীর প্যাঁচের উপর সিজ্দা করা জায়েজ নেই। কেননা তাঁর মতে সিজ্দার সময় কপাল খোলা রাখা ওয়াজিব। আমাদের দলিল হচ্ছে– ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْجُدُ عَلٰى كَوْرِ عِمَامَتِهٖ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পাগড়ীর প্যাঁচের উপর সিজ্দা করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত

قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ عَلٰى كَوْرِ عِمَامَتِهٖ .

তিনি বলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি তাঁর পাগড়ীর প্যাচের উপর সিজ্দা করতেন। দ্বিতীয় দলিল হলো ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে–

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِيْ بِفُضُوْلِهٖ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا .

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক কাপড়ে নামাজ আদায় করেছেন এবং বাড়তি অংশ দ্বারা ভূমির গরম ও ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে রক্ষা করেন।

অন্য এক রিওয়ায়েত হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে–

كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَحَدُنَا اَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْاَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে প্রচণ্ড গরমে নামাজ পড়তাম। যখন জমিনের উপর চেহারা রাখা অসম্ভব হতো তখন কাপড় বিছিয়ে তার উপর সিজ্দা করতাম।

وَيُبْدِىْ ضَبْعَيْهِ لِقَوْلِهِ الخ : সিজদা করা অবস্থায় নামাজি ব্যক্তি তার বাহু খোলা রাখবে। হিংস্র প্রাণীর ন্যায় জমিনের উপর বিছিয়ে দিবে না। দলিল হলো নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত—

عَنْ اٰدَمَ بْنِ عَلِىِّ الْبَكْرِىْ قَالَ رَاٰى ابْنُ عُمَرَ وَاَنَا اُصَلِّىْ لَاتَجَافِىْ عَنِ الْاَرْضِ بِذِرَاعَىَّ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ لَا تَبْسُطْ بَسْطَ السَّبُعِ وَادَّعِمْ عَلٰى رَاحَتَيْكَ وَاَبْدِ ضَبْعَيْكَ فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ سَجَدَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْكَ

আদম ইবনে আলী আল বকরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমাকে ইবনে ওমর এ অবস্থায় নামাজ পড়তে দেখেছেন যে, আমি জমিন থেকে হাত উপরে উঠাচ্ছিলাম না। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! হিংস্র প্রাণীর ন্যায় জমিনে হাত বিছিয়ে দিয়ো না এবং নিজের হাতের তালুর উপর ভর করবে এবং নিজের বাহুকে খোলা রাখবে। কেননা যখন তুমি এমনটি করবে তখন তোমার প্রত্যেক অঙ্গ সিজদায় রত হয়ে যাবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, অন্য একটি রিওয়ায়াতে ابد - (تشديد)-এর সাথে এসেছে। ابداد থেকে নির্গত। যার অর্থ হলো– প্রসারিত করা। অর্থাৎ নিজের বাহুকে প্রসারিত করে রাখবে। আর প্রথমটি ابداء থেকে নির্গত যার অর্থ হলো– প্রকাশ করা অর্থাৎ নিজের বাহুকে প্রকাশ করে রাখো খুলে রাখো।

وَيُجَافِى بَطْنَهُ অর্থাৎ নামাজি ব্যক্তি সিজদার সময় নিজের পেট উভয় উরু থেকে পৃথক রাখবে। দলিল হচ্ছে– রসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন পেটকে উরু থেকে পৃথক রাখতেন। কনুইগুলো জমিনে থেকে আলাদা রাখতেন এমনকি যদি বকরির ছোট বাচ্চা তাঁর নিচ দিয়ে অতিক্রম করতে চাইতো অতিক্রম করতে পারতো।

ফকীহদের কেউ কেউ বলেন, কাতারে নামাজ আদায়ের সময় বাহু বেশি প্রসারিত করে রাখবে না, যেন পার্শ্ববর্তী মুসল্লী কষ্ট না পায়।

وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى ثَلٰثًا وَ ذٰلِكَ أَدْنَاهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى ثَلٰثًا وَ ذٰلِكَ أَدْنَاهُ أَيْ أَدْنٰى كَمَالِ الْجَمْعِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثَّلٰثِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بَعْدَ أَنْ يَخْتِمَ بِالْوِتْرِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَخْتِمُ بِالْوِتْرِ وَإِنْ كَانَ إِمَامًا لَا يَزِيدُ عَلٰى وَجْهٍ يُمِلُّ الْقَوْمَ حَتّٰى لَا يُؤَدِّيَ إِلَى التَّنْفِيرِ ثُمَّ تَسْبِيحَاتُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سُنَّةٌ لِأَنَّ النَّصَّ تَنَاوَلَهُمَا دُونَ تَسْبِيحَاتِهِمَا فَلَا يُزَادُ عَلَى النَّصِّ وَالْمَرْأَةُ تَنْخَفِضُ فِي سُجُودِهَا وَتَلْزَقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا لِأَنَّ ذٰلِكَ أَسْتَرُ لَهَا ـ

অনুবাদ : আর সিজদার মধ্যে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى বলবে। আর এ হলো তার সর্বনিম্ন পরিমাণ। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আর তোমাদের কেউ যখন সিজদা করবে তখন সে যেন তার সিজদায় তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى বলে। আর এটি হলো তার সর্বনিম্ন পরিমাণ। রুকূ ও সিজদার ক্ষেত্রে বেজোড় সংখ্যায় শেষ করাসহ তিনবারের অধিক বলা মোস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বেজোড় সংখ্যায় শেষ করতেন। আর কেউ যদি ইমাম হয় তাহলে সংখ্যা এত বৃদ্ধি করবে না যা মুসল্লীগণের ক্লান্তির কারণ হয় এবং অবশেষে (জাম'আতের প্রতি) তা বিরক্তি সৃষ্টি করে। রুকূ ও সিজদায় তাসবীহ পাঠ করা সুন্নত। কেননা আয়াতে উভয়টি তাসবীহ ব্যাতিরেকেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের উপর বৃদ্ধি করা যাবে না। আর স্ত্রীলোক নিচু ও জড়সড় হয়ে সিজদা করবে এবং তার পেট উরুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা এটি তার জন্য সতরের অধিক উপযোগী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সিজদার মধ্যে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى বলবে। আর তিনবার বলা হলো সর্বনিম্ন পরিমাণ। তাই ওলামায়ে কেরাম লিখেন, এ তাসবীহ তরক করা বা এর থেকে কম করা মাকরূহ। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى ثَلٰثًا আর তোমাদের কেউ যখন সিজদা করবে তখন সে যেন তার সিজদায় তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى বলে। রুকূ ও সিজদায় তিনবারের অধিক বলা মোস্তাহাব। তবে শর্ত হলো বেজোড় হতে হবে। এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকূ ও সিজদার তাসবীহগুলোকে বেজোড় সংখ্যায় শেষ করতেন। তা ছাড়া হাদীসে মাশহুর إِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ দ্বারাও দলিল দেওয়া হয়েছে। হিদায়া প্রণেতা বলেন, কেউ যদি ইমাম হয় তবে সে যেন তিনের অধিক না বলে, যা মুসল্লীগণের ক্লান্তির কারণ হয় এবং জামাআতের প্রতি তাদের বিরক্তি সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য যে, রুকূ ও সিজদার তাসবীহগুলো সুন্নত। কেননা আয়াতে কারীমায় وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا রুকূ ও সিজদার কথা তাসবীহ ব্যতিরেকেই এসেছে। কাজেই এতে বুঝা গেল যে, রুকূ ও সিজদার তাসবীহগুলো ফরজ নয়। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ফরজ না হওয়ার দ্বারা এ কথা কিভাবে বুঝে আসে যে, সুন্নত হবে? বরং এখানে তো ওয়াজিব দেখা যাচ্ছে– (১) কেননা রুকূ ও সিজদার তাসবীহগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত পাঠ করেছেন। যা ওয়াজিব হওয়ার দলিল (২) রুকূর তাসবীহগুলোর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন اجعلوها আর সিজদার তাসবীহের ব্যাপারে বলেছেন فليقل যা امر-এর সীগাহ। আর امر - وجوب-কে চায়। সুতরাং রুকূ ও সিজদার তাসবীহগুলোকে ওয়াজিব বলা উচিত। এর জবাব হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ বেদুঈন সাহাবীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় এ তাসবীহগুলোর কথা বলেননি। এতে বুঝা গেল যে, রুকূ ও সিজদার তাসবীহের নির্দেশ ওয়াজিব হিসাবে ছিল না; বরং ইস্তিহবাব হিসাবে ছিল।

وَالْمَرْأَةُ تَنْخَفِضُ الخ **:** উক্ত ইবারতের মধ্যে মহিলাদের সিজদার তরীকা বয়ান করা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, মহিলা নিচু হয়ে সিজদা করবে। অর্থাৎ একেবারে জমিনের নিকটবর্তী হয়ে যাবে এবং পেট উরুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে রাখবে। দলিল হলো, এ ধরনের সেজদা করা তার জন্য সতরের অধিক উপযোগী আর মহিলাদের ক্ষেত্রে সতরই হলো মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

قَالَ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيُكَبِّرُ لِمَا رَوَيْنَا فَإِذَا اطْمَأَنَّ جَالِسًا كَبَّرَ وَسَجَدَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَسْتَوِيَ جَالِسًا وَلَوْ لَمْ يَسْتَوِ جَالِسًا وَكَبَّرَ وَسَجَدَ أُخْرَى أَجْزَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَمُحَمَّدٍ (رح) وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَتَكَلَّمُوا فِي مِقْدَارِ الرَّفْعِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِلَى السُّجُودِ أَقْرَبَ لَايَجُوزُ لِأَنَّهُ يُعَدُّ سَاجِدًا وَإِنْ كَانَ إِلَى الْجُلُوسِ أَقْرَبَ جَازَ لِأَنَّهُ يُعَدُّ جَالِسًا فَتَتَحَقَّقُ الثَّانِيَةُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর সে তার মাথা উঠাবে এবং তাকবীর বলবে। এর দলিল ইতঃপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস; যখন সুস্থির হয়ে বসবে তখন তাকবীর বলবে ও সিজদায় যাবে। কেননা বেদুঈন সাহাবীকে (নামাজ শিক্ষাদান) সম্পর্কিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তারপর তুমি তোমার মাথা তুলবে এমনকি সোজা হয়ে বসবে। যদি সোজা হয়ে না বসে তাকবীর বলে আরো এক সিজদায় চলে যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) -এর মতে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। পূর্বেই আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। মাথা তোলার পরিমাণ সম্পর্কে মাশায়িখগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তবে বিশুদ্ধমত হলো, যদি সে সিজদার অধিক নিকটবর্তী থেকে যায়, তাহলে জায়েজ হবে না। কেননা এটাকে (পূর্ববর্তী) সিজদায় রয়ে গেছে বলে গণ্য করা হবে। আর যদি বসার অধিক নিকটবর্তী হয় তাহলে জায়েজ হবে। কেননা এ অবস্থায় তাকে উববিষ্ট গণ্য করা হবে। তাতে দ্বিতীয় সিজদা হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে দ্বিতীয় সিজদার তরীকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, প্রথম সিজদা থেকে মাথা উঠাবে এবং তাকবীর বলবে। দলিল হলো ঐ রিওয়ায়াত যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি তথা إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ তারপর যখন স্থির হয়ে বসবে তখন তাকবীর বলবে এবং দ্বিতীয় সিজদায় যাবে। বেদুঈন সাহাবীকে নামাজ শিক্ষাদানের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَسْتَوِيَ جَالِسًا তারপর তুমি তোমার মাথা তুলবে এমনকি সোজা হয়ে বসে যাবে। আর যদি নামাজি ব্যক্তি প্রথম সিজদা থেকে সোজা হয়ে না বসে এবং তাকবীর বলে দ্বিতীয় সিজ্দা করে, তবে তরফাইন (র.)-এর মতে তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। পূর্বেই আমরা তাদীলে আরকানের আলোচনায় এ বিষয়টি উল্লেখ করেছি। গ্রন্থকার বলেন মাশায়িখগণের এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। দ্বিতীয় সিজ্দা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য প্রথম সিজ্দা থেকে কতটুকু পরিমাণ মাথা তোলা জরুরি? কোনো কোনো ফকীহ্ বলেন, যখন কপাল দ্বিতীয় সিজদা থেকে সরে যায় এবং পুনরায় সিজদায় চলে যায় তখন উভয় সিজ্দা আদায় হয়ে যাবে। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) বলেন, যখন সে জমিন থেকে মাথা এতটুকু পরিমাণ উঠায় যে, সেখান দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে এ অবস্থায় উভয় সিজদা আদায় হয়ে যাবে। এ বক্তব্যটি প্রথম বক্তব্যের কাছাকাছি। মুহাম্মদ ইবনে সালামা (র.) বলেন, যদি সে এতটুকু পরিমাণ মাথা তোলে যে, দর্শক দেখলে বুঝে যে সে দ্বিতীয় সিজদার জন্য মাথা তুলেছে তবে তার উভয় সিজ্দা আদায় হয়ে যাবে। নতুবা এক সিজ্দা আদায় হবে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে পরিমাণ মাথা তোলা দ্বারা رفع শব্দটি ব্যবহার করা যায় সে পরিমাণ মাথা তোলা গ্রহণযোগ্য। হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, বিশুদ্ধতম মত হলো, যদি সে সিজদার অধিক নিকটবর্তী থেকে যায়, তাহলে দ্বিতীয় সিজদা জায়েজ হবে না। কেননা এ অবস্থায় সে প্রথম সিজদাতেই রয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। আর যদি বসার অধিক নিকটবর্তী হয় তাহলে দ্বিতীয় সিজ্দা জায়েজ হবে। কেননা তাকে উপবিষ্ট বলে গণ্য করা হবে। তাই দ্বিতীয় সিজ্দা হয়ে যাবে।

প্রত্যেক রাকআতে এক রুকু এবং দুই সিজ্দা কেন? এ ব্যাপারে অধিকাংশ ওলামাদের অভিমত হলো, এটা توقيفى তথা খোদা প্রদত্ত জিনিস যেখানে আকলের কোনো স্থান নেই। আবার কেউ কেউ এই দর্শন বলেছেন যে, দু' সিজদা শয়তানকে অপদস্ত করার জন্য। কেননা আদম সৃষ্টির পর আল্লাহ শয়তানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আদমকে সিজদা করার জন্য। কিন্তু সে আদমকে সিজদা করেনি। এ জন্য আমরা শয়তানকে লাঞ্ছিত করার জন্য দু' সিজ্দা আদায় করি। যেমন– সিজদায়ে সাহুর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ এদিকে ইশারা করেছেন هُمَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ দু'টো সিজদায়ে সাহ্ব শয়তানকে হেয় করার জন্য। কেউ কেউ বলেন, প্রথম সিজদায় এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় সিজদা দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, তাদের পুনরায় মাটিতেই ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ـ

قَالَ فَاِذَا اطْمَانَّ سَاجِدًا كَبَّرَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَاسْتَوٰى قَائِمًا عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَلَا يَقْعُدُ وَلَا يَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْاَرْضِ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) يَجْلِسُ جَلْسَةً خَفِيْفَةً ثُمَّ يَنْهَضُ مُعْتَمِدًا عَلَى الْاَرْضِ لِاَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ ذٰلِكَ وَلَنَا حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَنْهَضُ فِى الصَّلٰوةِ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلٰى حَالَةِ الْكِبَرِ وَلِاَنَّ هٰذِهٖ قَعْدَةُ اِسْتِرَاحَةٍ وَالصَّلٰوةُ مَا وُضِعَتْ لَهَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন সিজদায় গিয়ে সুস্থির হবে তখন তাকবীর বলবে। এর দলিল আমরা পূর্বে বলে এসেছি। আর উভয় পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, বসবে না এবং উভয় হাত দ্বারা জমিনের উপর ভরও দিবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, সামান্য সময় বসার পর জমিনের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবে। কেননা মহানবী ﷺ এরূপ করেছেন। আমাদের দলিল হলো হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, মহানবী ﷺ নামাজে তাঁর উভয় পায়ের সম্মুখ ভাগের উপর ভর করে দাঁড়াতেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি বার্ধক্যের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। তা ছাড়া এটি হল বিশ্রাম বৈঠক, আর নামাজ তো বিশ্রাম লাভের জন্য প্রবর্তিত হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার বলেন, যখন সিজদায় গিয়ে স্থির হবে তখন দাঁড়াবার জন্য তাকবীর বলবে। দলিল উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَ رَفْعٍ। ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, গ্রন্থকারের নিজস্ব অভ্যাস অনুযায়ী পূর্বে বর্ণিত হাদীসের দিকে ইশারা করার জন্য ما روينا বলা উচিত ছিল। কিন্তু সম্ভবত পূর্বের মাসআলায় ঐ হাদীসের দিকে ইশারা করার জন্য لما روينا বলেছিলেন। এখন এখানে ঐ لما روينا-এর দিকে وقد ذكرناه দ্বারা ইশারা করলেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দ্বিতীয় সিজদা থেকে ফারিগ হওয়ার পর উভয় পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর করে সোজা দাড়িয়ে যাবে। বসবে না এবং উভয় হাত দ্বারা জমিনের উপর ভরও দিবে না। ওজর না হলে এটাই মোস্তাহাব। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, সামান্য সময় বসার পর জমিনের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবে। তাঁর দলিল মালিক ইবনে হুয়াইরিস (রা.)-এর হাদীস اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ السُّجُوْدِ قَعَدَ ثُمَّ يَنْهَضُ রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন সাজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন সামান্য বসতেন তারপর দাড়াতেন। আমাদের দলিল আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস। اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْهَضُ فِى الصَّلٰوةِ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। তাছাড়া ইমাম শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত كَانَ عُمَرُ وَعَلِىٌّ وَاَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ يَنْهَضُوْنَ فِى الصَّلٰوةِ عَلٰى صُدُوْرِ اَقْدَامِهِمْ ইমাম শা'বী বলেন, হযরত ওমর, হযরত আলী (রা.) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ নামাজের মধ্যে তাদের পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পেশকৃত দলিলের জবাব হচ্ছে– হাদীসটি বার্ধক্যের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ বার্ধক্যের সময় তিনি এমনটি করেছেন।

আমাদের আকলী দলিল হচ্ছে– এ বৈঠকটি হলো বিশ্রামের বৈঠক। আর নামাজতো বিশ্রাম লাভের জন্য প্রবর্তিত হয়নি। এ জন্য এ বৈঠক করবে না।

وَيَفْعَلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى لِاَنَّهٗ تَكْرَارُ الْاَرْكَانِ اِلَّا اَنَّهٗ لَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ لِاَنَّهُمَا لَمْ يُشْرَعَا اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا فِى التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ (رح) فِى الرُّكُوْعِ وَفِى الرَّفْعِ مِنْهُ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاتُرْفَعُ الْاَيْدِىْ اِلَّا فِىْ سَبْعِ مَوَاطِنَ تَكْبِيْرَةِ الْاِفْتِتَاحِ وَتَكْبِيْرَةِ الْقُنُوْتِ وَتَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ وَ ذَكَرَ الْاَرْبَعَ فِى الْحَجِّ وَالَّذِىْ يُرْوٰى مِنَ الرَّفْعِ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْاِبْتِدَاءِ كَذَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (رضـ) ـ

অনুবাদ : প্রথম রাকাআতে যা করেছে, দ্বিতীয় রাকাআতে তাই করবে। কেননা দ্বিতীয় রাকাআত হচ্ছে রুকনসমূহের পুনরাবৃত্তি। তবে ছানা পড়বে না এবং আউযুবিল্লাহ পড়বে না। কেননা উভয়টি একবারই পাঠ করা শরিয়তে প্রমাণিত। প্রথম তাকবীর ছাড়া আর কখনো হাত উঠাবে না। রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে উঠার ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। আমাদের দলিল হচ্ছে– মহানবী ﷺ বলেছেন, সাতটি স্থান ছাড়া অন্য কোথাও হাত তোলা হবে না। তাকবীরে তাহরীমা, কুনূতের তাকবীর ও ঈদের তাকবীরসমূহ। বাকি চারটির কথা হজ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। হাত তোলা সম্পর্কে যে হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে তা ইসলামের প্রথম যুগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রথম রাকআত থেকে ফারিগ হওয়ার পর নামাজি ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকআত শুরু করবে। আর দ্বিতীয় রাকআতে তা-ই করবে যা প্রথম রাকআতে করা হয়েছিল। দলিল হলো, দ্বিতীয় রাকআত হলো রুকনসমূহের পুনরাবৃত্তি। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় রাকআতে প্রথম রাকআতের ন্যায়ই কাজগুলো করবে। তবে পার্থক্য হলো এতটুকু যে দ্বিতীয় রাকআতে ছানা ও আউযুবিল্লাহ পড়বে না। কেননা এগুলো একবারই পাঠ করা শরিয়তে প্রমাণিত। এ জন্য যে, সকল সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজের রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁরা এগুলোর কথা একবারই রিওয়ায়াত করেছেন।

মাসআলা : তাকবীরে তাহ্‌রীমা ব্যতীত অন্য কোনো তাকবীরের সময় হাত উঠাবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, তাকবীরে তাহ্‌রীমা ব্যতীত অন্য দুই তাকবীরের সময়ও হাত উঠাবে। এক. রুকুতে যাওয়ার সময়। দুই. রুকু থেকে মাথা তোলার সময়। তাঁর দলিল ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوْعِ ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় হাত উঠাতেন রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময়।

আমাদের দলিল ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস لَا تُرْفَعُ الْاَيْدِىْ اِلَّا فِىْ سَبْعِ مَوَاطِنَ الخ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সাতটি স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও হাত উঠানো হবে না (১) তাকবীরে তাহরীমার সময় (২) কুনূতের তাকবীর (৩) ঈদের তাকবীরসমূহের সময় (৪) আরাফার তাকবীরসমূহের সময় (৫) উভয় জামরাহ [কঙ্কর নিক্ষেপ]-এর তাকবীরসমূহের সময় (৬) সাফা ও মারওয়ার তাকবীরের সময় (৭) হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার সময়। আর হাত তোলা সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণনা করা হয় তা ইসলামের প্রথম যুগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এরূপ হাদীস ইবনে যুবায়ের (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে–

إِنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ لَاتَفْعَلْ فَإِنَّ هٰذَا شَيْءٌ فَعَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَرَكَهُ .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে মাসজিদুল হারামে নামাজ পড়তে দেখলেন। সে রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে ওঠার সময় হাত তুলছিল। লোকটি নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর হযরত ইবনে যুবায়ের (রা.) তাকে বললেন, এটা করো না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে এটা করেছেন কিন্তু পড়ে বাদ দিয়ে দিয়েছেন।-(নিহায়া)

<u>ফায়েদা</u> : প্রকাশ থাকে যে হিদায়ার ব্যাখ্যাতাগণ (ইনায়া ফাত্হুল কাদীর, কিফায়া) উক্ত মাসআলার একটি আকর্ষণীয় ঘটনা লিখেছেন। তা হলো হলো, একবার মসজিদে হারামের মধ্যে ইমাম আওযায়ি (র.)-এর সাথে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাক্ষাৎ হয়। ইমাম আওযায়ী (র.) বলেন, কি ব্যাপার ইরাকের লোকেরা রুকু করার সময় এবং রুকু থেকে মাথা তোলার সময় হাত উঠায় না। অথচ আমার নিকট زهری عن سالم عن ابن عمر এর সূত্রে এ হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল স্থানে হাত উঠাতেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন–

حَدَّثَنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْاِفْتِتَاحِ ثُمَّ لَايَعُودُ .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহ্রীমার সময় হাত উঠাতেন কিন্তু পরে তা বন্ধ করে দিয়েছেন, ইমাম আওযায়ী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফার ব্যাপারে আমার আশ্চর্য লাগছে যে, আমি হাদীস বয়ান করতেছি زهری عن سالم عن ابن عمر আর তিনি হাদীস বয়ান করতেছেন حماد عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود অর্থাৎ ইমাম আওযা'য়ী (র.) علو سند-এর দিকে লক্ষ্য করে ইবনে ওমরের হাদীসকে ترجيح দিয়েছেন। তখন ইমামে আ'যম (র.) বলেন,

أَمَّا حَمَّادٌ فَكَانَ أَفْقَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ كَانَ أَفْقَهُ مِنْ سَالِمٍ وَلَوْلَا سَبْقُ ابْنِ عُمَرَ لَقُلْتُ بِأَنَّ عَلْقَمَةَ أَفْقَهُ مِنْهُ أَمَّا عَبْدُ اللّٰهِ فَعَبْدُ اللّٰهِ .

অর্থাৎ হাম্মাদ যুহ্রীর মোকাবেলায় বড় ফকীহ্ আর ইব্রাহীম সালিম থেকে افقه (বড় ফকীহ) আর যদি ইবনে ওমর পূর্বের না হতেন অর্থাৎ সাহাবী না হতেন, তবে আমি বলতাম আলকামাহ ইবনে ওমরের মোকাবেলায় বড় ফকীহ। আর আব্দুল্লাহ তো আব্দুল্লাহ-ই অর্থাৎ তার কোনো নযীরই নেই। মোটকথা, ইমাম আবূ হানীফা (রা.) فقه روات-এর দিকে লক্ষ্য করে ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রিওয়ায়াতকে ترجيح দিয়েছেন। উক্ত ঘটনা দ্বারা এতটুকু বুঝা গেল যে, رفع يدين-এর ক্ষেত্রে ইবনে ওমর ও ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস পরস্পর বিরোধী তাই উভয় হাদীস বাদ পড়ে যাবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী لَاتُرْفَعُ الْاَيْدِيْ إِلَّا فِيْ سَبْعَةِ مَوَاطِنَ -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে। অধিকন্তু এ হাদীসটি হাদীসে মাশহুর। এছাড়া ইবনে ওমরের হাদীস এ কারণেও বাদ পড়ে যায় যে প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মুজাহিদ (র.) বলেছেন—

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ سَنَتَيْنِ فَلَمْ أَرَهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ .

আমি দু' বছর ইবনে ওমরের পিছনে নামাজ পড়েছি; কিন্তু তাকে তাকবীরে তাহারীমা ব্যতীত আর কোথাও হাত উঠাতে দেখেনি। আর কায়দা আছে রাবী যখন তার নিজ রিওয়ায়েতের খিলাফ আমল করে তখন তার পূর্বের বর্ণিত রিওয়ায়াত সাকিত তথা বাদ পড়ে যায়।—(নূরুল আনওয়ার)

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ الْيُمْنٰى نَصْبًا وَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ هٰكَذَا وَصَفَتْ عَائِشَةُ (رض) قُعُوْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلٰوةِ وَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَتَشَهَّدَ يُرْوٰى ذٰلِكَ فِي حَدِيْثِ وَائِلٍ وَلِأَنَّ فِيْهِ تَوْجِيْهَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَإِنْ كَانَتْ اِمْرَأَةً جَلَسَتْ عَلٰى أَلْيَتِهَا الْيُسْرٰى وَأَخْرَجَتْ رِجْلَيْهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا ـ

অনুবাদ : দ্বিতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সাজ্‌দা থেকে যখন মাথা তুলবে, তখন বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা সম্পূর্ণ দাঁড় করিয়ে রাখবে আর আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে। নামাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বসার এরূপ বিবরণই হযরত আয়েশা (রা.) দিয়েছেন। আর উভয় হাত উরুদ্বয়ের উপর রাখবে, আঙ্গুলগুলো বিছিয়ে রাখবে এবং তাশাহ্হুদ পড়বে। ওয়াইল (রা.)-এর হাদীসে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া এতে হাতের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী হয়। আর যদি নামাজ আদায়কারী মহিলা হয়, তবে সে বাম নিতম্বের উপর বসবে এবং ডান দিক দিয়ে উভয় পা বের করে দেবে। কেননা এটা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে বসার পদ্ধতি ও নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। তাই গ্রন্থকার বলেন, নামাজি যখন দ্বিতীয় রাকাআতের দ্বিতীয় সিজ্‌দা থেকে নিজের মাথা উঠাবে তখন সে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা সম্পূর্ণরূপে দাঁড় করিয়ে রাখবে আর উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে। দলিল হলো, হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজে বসার এরূপই বর্ণনা দিয়েছেন। বসার পর উভয় হাত উভয় উরুর উপর রাখবে এবং আঙ্গুলগুলো বিছিয়ে রাখবে। অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে দিবে। মিলিয়ে রাখবে না এবং হাত দ্বারা হাঁটু ধরবে না। দলিল– হযরত ওয়াইল ইবনে হুজরের হাদীসে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। আর আকলী দলিল হলো, এ ধরনের রাখা দ্বারা হাতের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী থাকে। আর যতটুকু সম্ভব প্রত্যেক অঙ্গকেই কিবলামুখী করা উত্তম।

ইনায়া গ্রন্থকার লিখেছেন– ইমাম মুহাম্মদ (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করতেন। তাই আমরাও এভাবে করব। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আমাদের বক্তব্য। ইশারা করার পদ্ধতি এভাবে যে, ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে বন্ধ করে বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং মধ্যমা দ্বারা গোলাকার বানাবে তারপর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। ইমাম হুলওয়ানী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাশাহ্হুদের মধ্যে لا اله-এর সময় শাহাদাত আঙ্গুল দাঁড় করাবে এবং الا الله-এর বলার সময় নিচু করবে। যাতে আঙ্গুল দাঁড় করাবার দ্বারা গায়রুল্লাহ থেকে নফী আর নিচু করার সময় আল্লাহর যাতের اثبات হয়ে যায়।

স্ত্রীলোকদের বসার তরীকা হলো, সে বাম নিতম্বের উপর বসে যাবে এবং উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে দিবে। কেননা এটা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী।

وَالتَّشَهُّدُ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَهٰذَا تَشَهُّدُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) فَاِنَّهٗ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِيْ وَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ كَمَا كَانَ يُعَلِّمُنِيْ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْاٰنِ وَقَالَ قُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَالْاَخْذُ بِهٰذَا اَوْلٰى مِنَ الْاَخْذِ بِتَشَهُّدِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) وَهُوَ قَوْلُهٗ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ سَلَامٌ عَلَيْنَا اِلٰى اٰخِرِهٖ لِاَنَّ فِيْهِ الْاَمْرَ وَاَقَلُّهُ الْاِسْتِحْبَابُ وَالْاَلِفُ وَاللَّامُ وَهُمَا لِلْاِسْتِغْرَاقِ وَ زِيَادَةُ الْوَاوِ وَهِيَ لِتَجْدِيْدِ الْكَلَامِ كَمَا فِي الْقَسَمِ وَتَاكِيْدِ التَّعْلِيْمِ ـ

অনুবাদ : আর তাশাহ্হুদ হলো– যাবতীয় মৌখিক ইবাদত আল্লাহর জন্য এবং যাবতীয় দৈহিক ইবাদত আল্লাহ্রই জন্য এবং যাবতীয় আর্থিক ইবাদতও আল্লাহ্রই জন্য। হে নবী আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক [শেষ পর্যন্ত] বলা। এটা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত তাশাহ্হুদ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিলেন, যেমন তিনি আমাকে কুরআনের কোনো সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বললেন বলো আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ...... শেষ পর্যন্ত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহহুদ গ্রহণ করা উত্তম ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত তাশাহ্হুদ থেকে। তাঁর তাশাহহুদ হচ্ছে اَلتَّحِيَّاتُ - اَلْمُبَارَكَاتُ الخ কেননা, ইবনে মাসউদের হাদীসে قل আদেশবাচক ক্রিয়া রয়েছে, যার ন্যূনতম চাহিদা হলো মোস্তাহাব হওয়া। তা ছাড়া السلام এ الف ও لام যুক্ত রয়েছে, যা استغراق বা সামগ্রিকতা বুঝায়। আর এর মধ্যে যে واو অতিরিক্ত রয়েছে, তা বক্তব্যের নবায়ন বুঝায়। যেমন কসমের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তা ছাড়া এতে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অধিক জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো, প্রথম বৈঠকের মধ্যে তাশাহহুদ পড়া বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী ওয়াজিব। এখন তাশাহ্হুদ-এর ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে, যেমন– হযরত ওমর (রা.)-এর তাশাহ্হুদ, হযরত আলী (রা.)-এর তাশাহ্হুদ, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাশহহুদ, ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহ্হুদ, হযরত আয়েশা (রা.)-এর তাশাহ্হুদ এবং হযরত জাবির (রা.)-এর তাশাহ্হুদ। এছাড়াও আরো অনেক সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাশাহ্হুদের বর্ণনা রয়েছে। ওলামায়ে আহ্নাফ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহ্হুদকে ইখতিয়ার করেছেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাশাহ্হুদকে গ্রহণ করেছেন। ইব্নে আব্বাস (রা.)-এর তাশাহ্হুদটি হলো–

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

আর ইব্নে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহহুদ হলো–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ـ

ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাশাহহুদটি গ্রহণ করা বিভিন্ন কারণে উত্তম। যথা- (১) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাশাহহুদে কালিমায়ে مباركات অধিক, যা ইবনে মাস'উদ (রা.)-এর তাশাহহুদে নেই। (২) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাশাহহুদটি কুরআন অনুযায়ী। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً (৩) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাশাহহুদে سلام শব্দটি الف ও لام ছাড়া এসেছে। কুরআনুল কারীমেরও বহু স্থানে سلام শব্দটি الف ولام ছাড়া এসেছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ، قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ আর সর্বত্তোম কথা তা হলো তা যা কুরআন অনুযায়ী হয়। (৪) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাশাহহুদটি ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহহুদের পর প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা ইবনে আব্বাস (রা.) ছোট ছিলেন আর ইবনে মাসউদ (রা.) হলেন বৃদ্ধদের মধ্য থেকে। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, مؤخر ، مقدم-এর জন্য ناسخ হয়। সুতরাং ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাশাহহুদটি ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহহুদের জন্য নাসিখ হবে।

ওলামায়ে আহনাফের হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহ্হুদ গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও বিবিধ কারণ নিহিত আছে। যেমন- (১) ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন قل التحيات لله উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্যে قل শব্দটি امر-এর সীগাহ্। আর امر-এর সর্বনিম্ন পর্যায় হলো ইসতিহ্বাব হওয়া। (২) এতে বর্ণিত السلام عليك বাক্যে الف لام-এর মধ্যে استغراق তথা সামগ্রিকতা রয়েছে (৩) والصلوت শব্দটি واو-এর সাথে বক্তব্যের নবায়ন বুঝায়। (৪) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধরা এবং কুরআনের সূরার ন্যায় শিক্ষা দেওয়া অধিক গুরুত্ব বুঝায়। (৫) التحيات ، صلوة ও غيرصلوة সবগুলোকে শামিল করে। কিন্তু ইবনে আব্বাসের তাশাহ্হুদে الصلوات শব্দটি واو ছাড়া এসেছে যার মধ্যে তাখ্সীস এসে গেছে। তাই التحيات দ্বারা শুধু صلوات বুঝাবে। কিন্তু والصلوات যখন واو সহ হয় যেমন ইব্নে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহ্হুদের মধ্যে রয়েছে তখন তা صلوة ও غير صلوة সবকিছুকে শামিল করে। আর যেহেতু كلمة عام দ্বারা প্রশংসা করা ابلغ সেহেতু ইবনে মাসউদের তাশাহহুদই উত্তম হবে। (৬) عامة المحدثين বলেছেন, ইবনে মাসউদের তাশাহ্হুদটি سند-এর দিক থেকে احسن। (৭) عام সাহাবায়ে কেরামও ইবনে মাসউদের তাশাহুদকে গ্রহণ করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বরে ইবনে মাসউদের তাশাহহুদের তা'লীম দিতেন। একই বর্ণনা সালমান ফারসী, হযরত জাবির এবং হযরত মু'আবিয়া (রা.) থেকেও পাওয়া যায়। (৮) ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহহুদে রয়েছে وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ। আর عبد দ্বারা পরিপূর্ণতা বুঝানো হয়। যেমন মিরাজের ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কামালিয়তকে বুঝাবার জন্য عبد শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ (৯) ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহ্হুদটি যবত তথা মুখস্থ করার ক্ষেত্রেও সহজ এবং ভালো। যেমন ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত-

إِنَّهُ قَالَ أَخَذَ أَبُوْ يُوْسُفَ بِيَدِيْ وَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ وَقَالَ أَخَذَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ بِيَدِيْ فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ أَخَذَ حَمَّادٌ بِيَدِيْ فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ وَقَالَ حَمَّادٌ أَخَذَ إِبْرَاهِيْمُ بِيَدِيْ فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِيْ وَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ وَقَالَ عَلْقَمَةُ أَخَذَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِيَدِيْ وَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِيْ وَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَدِيْ فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ .

তিনি বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, হাম্মাদ (র.) আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন। হাম্মাদ (র.) বলেন, ইব্রাহীমে নাখয়ী (র.) আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন। ইব্রাহীমে নাখয়ী (র.) বলেন, আলকামা (র.) আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা

দিয়েছেন। আলকামা (র.) বলেন, ইব্‌নে মাসউদ (রা.) আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়েছেন। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়েছেন।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দলিলের জবাব : ১মটির জবাব হলো– কোনো কালিমার زيادتى যদি اولى হওয়ার সবব হয় তবে তো হযরত জাবির (রা.)-এর তাশাহ্‌হুদটি তারজীহ্ পাবে এবং اولى হবে। কেননা তাঁর তাশাহহুদে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-এর زيادتى রয়েছে। আর ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহ্‌হুদের মধ্যে واو . الف ولام এবং عبده রয়েছে। এতে তো বুঝা যায় যে, ইব্‌নে মাসউদের তাশাহ্‌হুদটিই উত্তম হবে। ২য়টির জবাব হলো, শুধু কুরআনের মুয়াফিক হওয়াই اولى হওয়ার কারণে নয়; কেননা বসা অবস্থায় কুরআন পড়া মাকরূহ। তাহলে কিরাআতে কুরআনের সাদৃশ্য হওয়া কিভাবে মোস্তাহাব হলো। ৩য় কারণের জবাব হলো, سلام শব্দটি যেমনিভাবে الف ও لام ছাড়া কুরআনে এসেছে এমনিভাবে الف ولام সহও কুরআনে এসেছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– وَالسَّلَامُ عَلٰى يَوْمَ وُلِدْتُّ - وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى। ৪র্থ কারণের জবাব হলো, তাশাহ্‌হুদের ক্ষেত্রে হাদীসে ইবনে আব্বাস مؤخر এমনটি নয়; বরং হাদীসে ইব্‌নে মাসউদ-ই مؤخر। যেমন– ইমাম কারখী (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে اَلتَّحِيَّاتُ الطَّاهِرَاتُ اَلْمُبَارَكَاتُ الزَّاكِيَاتُ বলা হতো। এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, ইবনে মাসউদের হাদীস ইবনে আব্বাসের হাদীস থেকে مؤخر।

<u>ফায়েদা :</u> উল্লেখ্য যে, التحيات দ্বারা মুরাদ عبادات قوليه আর صلوات দ্বারা মুরাদ عبادات بدنيه আর الطيبات দ্বারা মুরাদ عبادات ماليه। এবং السلام عليك এটা ঐ সালাম যা মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিন জিনিসের সাথে প্রশংসার জবাবে আল্লাহ বলেছিলেন। যেমন– السلام হচ্ছে –التحيات-এর মোকাবেলায়, رحمت হচ্ছে– صلوات-এর মোকাবেলায় এবং بركت হচ্ছে –التحيبات-এর মুকাবেলায় বরকত অর্থ– বৃদ্ধি পাওয়া। মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাহিয়্যা পেশ করলেন اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে সালাম হাদিয়া দিলেন এবং বললেন اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের নেক বান্দাদেরকেও তাঁর সেই সালামের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। এবং বললেন اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ এর পর আল্লাহ ও রাসূলের বাক্যালাপ শুনে ফেরেশ্‌তাকুল বলে উঠলেন,

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ -

وَلَا يَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا فِى الْقَعْدَةِ الْأُوْلٰى لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِىْ وَسْطِ الصَّلٰوةِ وَاٰخِرِهَا فَاِذَا كَانَ وَسْطَ الصَّلٰوةِ نَهَضَ اِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ وَاِذَا كَانَ اٰخِرَ الصَّلٰوةِ دَعَا لِنَفْسِهٖ بِمَا شَاءَ وَيَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا لِحَدِيْثِ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَرَأَ فِى الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَهٰذَا بَيَانُ الْأَفْضَلِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّ الْقِرَاءَةَ فَرْضٌ فِى الرَّكْعَتَيْنِ عَلٰى مَا يَاْتِيْكَ مِنْ بَعْدُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ

অনুবাদ : প্রথম বৈঠকে এর থেকে কিছু অতিরিক্ত করবে না। কেননা ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নামাজের মাঝের এবং নামাজের শেষের তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন। যখন নামাজের মধ্যবর্তী তাশাহ্হুদ হতো, তখন তিনি তাশাহ্হুদ শেষ করে দাঁড়িয়ে যেতেন। আর যখন নামাজের শেষ দিকের তাশাহ্হুদ হতো তখন তিনি (এরপর) নিজের জন্য যা ইচ্ছা তা দোয়া করতেন। শেষ দুই রাকআতে শুধু সূরায়ে ফাতিহা পড়বে। কেননা আবূ কাতাদা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, মহানবী ﷺ শেষ রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা পড়েছেন। এ বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো একথা প্রমাণ করা যে, ফাতিহা পাঠ উত্তম। (অর্থাৎ শেষ দুই রাকআতে সূরায়ে ফাতিহার পাঠ ওয়াজিব নয়; বরং উত্তম মাত্র) এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা প্রথম দুই রাকা'আতের কিরাআত ফরজ, যার বিবরণ ইনশাআল্লাহ পরে আসবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার বলেন, প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদের সাথে আর কিছু বাড়াবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর قول جديد হলো, প্রথম বৈঠকে দরূদ শরীফ পড়াও সুন্নত। তাঁর দলিল হলো উম্মে সালামা (রা.)-এর হাদীস- فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَشَهُّدٌ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ প্রত্যেক দু' রাকআতে তাশাহ্হুদ এবং নবী-রাসূলগণের প্রতি সালামের বিধান রয়েছে। আমাদের দলিল হলো ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বক্তব্য عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِىْ وَسْطِ الصَّلٰوةِ وَاٰخِرِهَا فَاِذَا كَانَ فِىْ وَسْطِ الصَّلٰوةِ نَهَضَ اِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ وَاِذَا كَانَ اٰخِرَ الصَّلٰوةِ دَعَا لِنَفْسِهٖ بِمَا شَاءَ (ইব্‌নে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নামাজের মাঝের এবং নামাজের শেষের তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন। নামাজের মধ্যবর্তী তাশাহ্হুদ হতো। তখন তিনি তাশাহ্হুদ শেষ করে দাঁড়িয়ে যেতেন। আর নামাজের শেষ দিকের তাশাহ্হুদ হলে (এরপর) নিজেদের জন্য যা ইচ্ছা দোয়া করতেন) উম্মে সালামার হাদীসের জবাব হচ্ছে- سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ দ্বারা দরূদ শরীফ মুরাদ নয়; বরং سلام تشهد মুরাদ। অর্থাৎ ঐ সালাম যা তাশাহ্হুদে রয়েছে—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ ـ

মাসআলা : জোহর, আসর এবং ইশার শেষ দুই রাকআতে এবং মাগরিবের শেষ এক রাকআতে শুধু সূরায়ে ফাতিহা পড়বে। দলিল হলো, হযরত আবূ কাতাদা (রা.)-এর হাদীস اِنَّهٗ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَفِى الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ـ متفق عليه রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহর ও আসরের প্রথম দুই রাকা'আতে সূরায়ে ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়তেন আর শেষ দুই রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা পড়তেন। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা হলো উত্তম অর্থাৎ শেষ দুই রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা পড়াও মোস্তাহাব। সুতরাং যদি শেষের উভয় রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা ও তাসবীহ তরক করে তবে কোনো অসুবিধা নেই। এতে সিজদায়ে সাহ্বও ওয়াজিব হবে না। তবে সূরায়ে ফাতিহা পড়া ভালো, এটাই হলো বিশুদ্ধ মত। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি রিওয়ায়াত এমনও বর্ণনা করেছেন যে, শেষ দুই রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। সুতরাং যদি ভুলক্রমে তরক করে তবে সিজদায়ে সাহ্ব দিতে হবে। দলিল হলো শেষ দুই রাকআতে দাঁড়ানো হলো উদ্দেশ্য। সুতরাং এ দাড়ানোকে জিকির ও কিরাআত থেকে খালি রাখা মাকরূহ। যেমন- রুকূ ও সিজদাকে জিকির থেকে খালি রাখা মাকরূহ। বিশুদ্ধ মতের দলিল হলো- কিরাআত শুধু প্রথম দুই রাকআতে পড়া ফরজ। এর বিবরণ পরে আসবে ইনশা'আল্লাহ।

وَجَلَسَ فِي الْاٰخِيْرَةِ كَمَا جَلَسَ فِي الْأُوْلٰى لِمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ حَدِيْثِ وَائِلٍ وَعَائِشَةَ (رضـ) وَلِأَنَّهَا اَشَقُّ عَلَى الْبَدَنِ فَكَانَ اَوْلٰى مِنَ التَّوَرُّكِ الَّذِيْ يَمِيْلُ اِلَيْهِ مَالِكٌ وَالَّذِيْ يُرْوٰى اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَعَدَ مُتَوَرِّكًا ضَعَّفَهُ الطَّحَاوِيُّ (رحـ) اَوْ يُحْمَلُ عَلٰى حَالَةِ الْكِبَرِ وَيَتَشَهَّدُ وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَنَا وَصَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ لَيْسَ بِفَرِيْضَةٍ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِيْهِمَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا قُلْتَ هٰذَا اَوْ فَعَلْتَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ اِنْ شِئْتَ اَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَارِجَ الصَّلٰوةِ وَاجِبَةٌ اِمَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَهُ الْكَرْخِيُّ اَوْ كُلَّمَا ذُكِرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا اِخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ فَكُفِيْنَا مُؤْنَةَ الْاَمْرِ وَالْفَرْضُ الْمَرْوِيُّ فِي التَّشَهُّدِ هُوَ التَّقْدِيْرُ ـ

অনুবাদ : আর শেষ বৈঠকে ঐ অবস্থাতেই বসবে যে অবস্থায় প্রথম বৈঠকে বসেছিল। কেননা ওয়াইল (রা.) ও আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এরূপই আছে। তা ছাড়া এরূপ বসা শরীরের জন্য কষ্টদায়ক। সুতরাং তা উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসা, যা ইমাম মালিক (র.) গ্রহণ করেছেন, তার তুলনায় উত্তম হবে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিতম্বের উপর বসেছেন বলে বর্ণিত হাদীসকে ইমাম তাহাবী (র.) দুর্বল বলেছেন, অথবা তা বার্ধক্যের অবস্থার উপর আরোপ করা হবে। আর তাশাহ্হুদ পড়বে। আমাদের নিকট তা ওয়াজিব। আর মহানবী ﷺ -এর উপর দরুদ পড়বে। আমাদের নিকট তা ফরজ নয়। উভয় ক্ষেত্রেই ইমাম শাফি'ঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। (আমাদের দলিল) কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তুমি এটা বলবে বা করবে তখন তোমার নামাজ পূর্ণ হয়ে গেল। যদি তুমি উঠে পড়তে চাও তাহলে উঠে পড়ো; আর যদি আরো বসতে চাও তাহলে বসো। আর নামাজের বাইরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর দরুদ পাঠ ওয়াজিব। ইমাম কারখী (র.)-এর মতে শুধু একবার আর ইমাম তাহাবী (র.)-এর মতে যখনই মহানবী ﷺ -এর আলোচনা হয়। এভাবেই আমাদের উপর অবতীর্ণ আদেশের দায়িত্ব পালিত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ আয়াতে কারীমায় মহানবী ﷺ -এর উপর দরুদ পাঠের যে নির্দেশ রয়েছে, তার দাবিতো হলো জীবনে মাত্র একবারের জন্য ওয়াজিব হওয়া, সে দাবিতো পূরণ হয়ে গেছে। সুতরাং নামাজের ভিতরেও একই আয়াতের প্রেক্ষিতে দরুদ ওয়াজিব করার অবকাশ নেই।) আর তাশাহহুদের ক্ষেত্রে فرض শব্দটি যে বর্ণিত রয়েছে। (তার উত্তর হলো,) এখানে এ শব্দটি تقدير এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার বলেন, শেষ বৈঠকে ঐ অবস্থায়ই বসবে যে অবস্থায় প্রথম বৈঠকে বসেছিল। ইমাম মালিক (র.) বলেন, উভয় বৈঠকে নিতম্বের উপর বসা সুন্নত। অর্থাৎ মহিলার ন্যায় উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসা। ইমাম মালিক (র.) দলিল পেশ করেন ঐ হাদীস দ্বারা اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَعَدَ مُتَوَرِّكًا আর আমাদের দলিল ঐ হাদীস যা আমরা ওয়াইল ইবনে হুজর ও হযরত আয়েশা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করে এসেছি। দ্বিতীয় দলিল হলো আকলী দলিল, অর্থাৎ এরূপ বসা শরীরের

জন্য কষ্টদায়ক। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে যা নফসের উপর কষ্টকর হয় তাই হওয়া উত্তম। এতে ছওয়াব বেশি হয়। এ জন্য আমরা বলেছি যে, এ অবস্থায়ই বসা উত্তম। ইমাম মালিক (র.)-এর পেশকৃত হাদীসের জবাবে বলা হয়। ইমাম তাহাবী (র.) হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। কেননা হাদীসটির মধ্যে عبد الحميد بن جعفر নামক এক রাবী আছেন। যিনি মুহাদ্দিসীনে কেরামের দৃষ্টিতে দুর্বল রাবী। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যদি ঐ হাদীসকে সহীহও মেনে নেওয়া হয় তখন জবাব হবে ঐ ধরনের বসা বার্ধক্য অবস্থার ক্ষেত্রে আরোপ করা হবে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন তখন ঐভাবে বসেছেন।

ويتشهد وهو واجب الخ শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া আমাদের মতে ওয়াজিব। আর দরুদ শরীফ পড়া সুন্নত। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে তাশাহ্হুদ পড়া এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব। ইমাম শাফি'ঈ (র.) তাশাহহুদ পড়ার ক্ষেত্রে ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

إِنَّهُ قَالَ كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ اَنْ يُّفْتَرَضَ التَّشَهُّدُ اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلٰى جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الخ.

অতঃপর সবিশেষ বললেন إِذَا قُلْتَ هٰذَا اَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُكَ উক্ত হাদীস দ্বারা তিনভাবে দলিল দেওয়া যায়। এক. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– قَبْلَ اَنْ يُّفْتَرَضَ التَّشَهُّدُ অর্থাৎ তাশাহ্হুদের ক্ষেত্রে فرض শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা তাশাহ্হুদ পড়া ফরজ। দুই. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ-এর মধ্যে قولوا শব্দটি امر-এর সীগাহ যা وجوب-এর জন্য আসে। বুঝা গেল التحيات পড়া ওয়াজিব। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে ফরজ ও ওয়াজিব উভয়টি একই পর্যায়ের। এ জন্য التحيات পড়া ওয়াজিব হলে ফরজও হবে। তিন. রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পূর্ণ হওয়াকে তাশাহ্হুদের সাথে معلق করেছেন। বুঝা গেল তাশাহ্হুদ ব্যতীত নামাজ পরিপূর্ণ হয় না। আর যা ছাড়া নামাজ পূর্ণ হয় না তা-তো ফরজই হয়। বুঝা গেল তাশাহ্হুদ পড়া ফরজ।

আমাদের পক্ষ থেকে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিলের সবগুলো তরীকার জবাব দেওয়া হচ্ছে– প্রথম তরীকার জবাব হলো; রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী قَبْلَ اَنْ يُّفْتَرَضَ التَّشَهُّدُ-এর মধ্যে فرض-এর আভিধানিক অর্থ মুরাদ অর্থাৎ, নির্ধারণ করা। যেমন, আল্লাহর বাণী– فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اَىْ قَدَّرْتُمْ এখন হাদীসের মতলব হবে তাশাহ্হুদ নির্ধারিত হওয়ার পূর্বে আমরা اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ الخ বলতাম। দ্বিতীয় তরীকার জবাব হলো, এখানে امر-এর সীগাহটি تلقين ও تعليم-এর জন্যে এসেছে। সুতরাং এর দ্বারা ফরযিয়্যত সাবিত হয় না।

তৃতীয় তরীকার জবাব হলো, হাদীসের মধ্যে নামাজ পূর্ণ হওয়া তাশাহ্হুদ পড়া এবং শেষ বৈঠক উভয়টির যে-কোনো একটির উপর معلق করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, নামাজ পূর্ণ হওয়া শেষ বৈঠকের সাথে معلق। কেননা যদি শেষ বৈঠক ছুটে যায় তবে নামাজই জায়েজ হবে না। এতে বুঝা গেল যে, নামাজ পূর্ণ হওয়া যখন শেষ বৈঠকের সাথে معلق হয়ে গেল তখন তা আর তাশাহ্হুদ পড়ার সাথে معلق হবে না।

ইমাম শাফি'ঈ (র.) দরূদ শরীফ ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর বাণী يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ দ্বারা দলিল পেশ করেন। অর্থাৎ صلوا শব্দটি امر-এর সীগাহ। আর امر-এর চাহিদা হলো ওয়াজিব হওয়া। আর নামাজের বাইরে দরূদ পড়া ওয়াজিব নয় বিধায় নামাজের ভিতরেই দরূদ ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয় দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ فِىْ صَلٰوتِهٖ যে ব্যক্তি তার নামাজের মধ্যে আমার উপর দরূদ পড়ল না তার নামাজই হল না। উল্লেখ্য যে, নামাজ না হওয়া তা তো ফরজ তরক করার কারণে হয়ে থাকে, সুন্নত তরক করার কারণে নয়। বুঝা গেল দরূদ পড়া ফরজ। صَلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ ফরজ না হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের আলিমগণ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। আর তা হলো এভাবে যে, ইবনে মাসউদ (রা.)-কে তাশাহ্হুদের তা'লীম দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন। إِذَا

قُلْتَ هٰذَا اَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُكَ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পূর্ণ হওয়াকে তাশাহ্হুদ পড়া এবং শেষ বৈঠক-এর মধ্য থেকে যে কোনো একটির সাথে معلق করেছেন। সুতরাং যিনি صَلٰوةً عَلَى النَّبِيِّ-এর সাথে معلق করেছেন, তিনি نص তথা ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসের পরিপন্থী করেছেন।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বক্তব্য "নামাজের বাইরে দরুদ পড়া ওয়াজিব নয়" কথাটি আমরা মানি না। কেননা ইমাম কারখী (র.) বলেন, জীবনে কমপক্ষে একবার নামাজের বাইরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব। কেননা صلوا হলো امر-এর সীগাহ, যা তাকরার তথা বার বার কে চায় না। ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম উচ্চারণ করবে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম শুনবে তখনই পাঠ করা ওয়াজিব। তবে বারবার দরুদ পাঠ করা এ কারণে ওয়াজিব নয় যে, امر তাকরারকে চায় বরং দরুদের উজূব سبب متكرر-এর সাথে সম্পৃক্ত। আর ঐ سبب متكرر হলো যিক্‌রে নবী। তাই তাকরারে যিক্‌র দ্বারা দরুদও মুকাররার হবে। যেমন আওকাতের তাকরার দ্বারা নামাজের উজূব মুকাররার হয়ে যায়। মোটকথা, নামাজের বাইরে যখন দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে গেল তাই صلوا عليه-এর সীগায়ে আমরের উপর আমল হয়ে গেল। কাজেই নামাজের ভিতর দরুদ ওয়াজিব হওয়াকে সাবিত করার কোনোই প্রয়োজন নেই।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পেশকৃত হাদীস لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ الخ-এর জবাব হলো হলো, এখানে نفى اصل মুরাদ নয় বরং نفى كمال দ্বারা نفى كمال মুরাদ। অর্থাৎ দরুদ ব্যতীত নামাজ পরিপূর্ণ হয় না। যেমন– لَاصَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِى الْمَسْجِدِ-এর মধ্যে نفى كمال দ্বারাও نفى كمال মুরাদ। আর এর উপর করীনা হলো হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বেদুঈন ব্যক্তিকে নামাজের তা'লীম দিয়েছিলেন তখন তিনি صَلٰوةً عَلَى النَّبِيِّ-এর কথা উল্লেখ করেননি। যদি صَلٰوةً عَلَى النَّبِيِّ ফরজ হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন।

<u>ফায়েদা :</u> রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর কিভাবে দরুদ পড়া হবে? এ পর্যায়ে ঈসা ইবনে আবান (র.) اَلْحَجُّ عَلٰى اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, একবার ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে صَلٰوةً عَلَى النَّبِيِّ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বলেন, দরুদ শরীফ এভাবে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

কিফায়া গ্রন্থকার লিখেন এ দরুদটি কা'ব ইবনে উজ্‌রা-এর হাদীসের অনুরূপ।

হযরত আলী, ইবনে আব্বাস এবং জাবির (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমাদের তো আপনার প্রতি সালাম প্রেরণের তরীকা জানা আছে কিন্তু দরুদ আমরা কিভাবে প্রেরণ করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন এভাবে বলো–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَّاٰلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعٰلَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

قَالَ وَ دَعَا بِمَا يُشْبِهُ أَلْفَاظَ الْقُرْاٰنِ وَالْاَدْعِيَةِ الْمَأْثُوْرَةِ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ اخْتَرْ مِنَ الدُّعَاءِ اَطْيَبَهَا وَاَعْجَبَهَا اِلَيْكَ وَيَبْدَأُ بِالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيَكُوْنَ اَقْرَبَ اِلَى الْاِجَابَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর কুরআনের শব্দাবলি ও হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দোয়া করবে। প্রমাণ ইতিপূর্বে আমাদের বর্ণিত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস। মহানবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, এরপর তুমি তোমার কাছে উত্তম ও পছন্দনীয় দোয়া নির্ধারণ করে নাও। আর এ দোয়ার আগে মহানবী ﷺ -এর উপর দরুদ পাঠ করবে, যাতে দোয়া কবুলিয়াতের অধিক সম্ভাবনাপূর্ণ হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : শেষ বৈঠকে صلوة على النبى-এর পর আরবিতে দোয়া পড়বে। কেননা নামাজের মধ্যে আরবি ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় দোয়া করা মাকরূহ তাহ্‌রীমী। উল্লেখ্য যে, দোয়ার শব্দাবলি কুরআনুল কারীমের শব্দাবলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া উচিত। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ـ رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ـ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ (الاية) رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا الخ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ الخ ـ

অথবা দোয়ার শব্দাবলি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত শব্দাবলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া চাই। হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে–

اِنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهِ فِيْ صَلٰوتِيْ فَقَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا فَاِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ নিম্নোক্ত শব্দাবলিতে দোয়া করতেন

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ ـ

দলিল হলো হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীস اِذَا كَانَ اٰخِرَ الصَّلٰوةِ دَعَا لِنَفْسِهِ بِمَا شَاءَ অতঃপর হাদীসের শেষাংশে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে বলেছিলেন, ثُمَّ اخْتَرْ مِنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبَهُ وَاَطْيَبَهُ اِلَيْكَ এখানে اعجبه ও اطيبه -এর ضمير দ্বয় مذكر – যা সুনানের রিওয়ায়াত অনুযায়ী আছে। কিন্তু হিদায়ার কোনো কোনো ছাপায় اعجبها ও اطيبها রয়েছে যা সহীহ নয়। আর যদি ضمير مؤنث-কে সহীহও বলা হয় তখন كلمات বা دعوات-এর সাথে تاويل করেই সহীহ করতে হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ উপর দরুদ পাঠ করবে তারপর দোয়া করবে, তাহলে দোয়া কবুলিয়াতের বিষয়টি অধিক সম্ভাবনাপূর্ণ হবে। দলিল হলো হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য দোয়া করা হলে অবশ্যই কবুল হবে। আর আল্লাহ তা'আলার জন্য এটা অসম্ভব যে, তিনি কোনো দোয়া কবুল করবেন আর কোনো দোয়া কবুল করবেন না; বরং পুরো দোয়াই কবুল করে নিবেন।

وَلَا يَدْعُو بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ تَحَرُّزًا عَنِ الْفَسَادِ وَ هٰذَا يَأْتِي بِالْمَأْثُورِ وَالْمَحْفُوظِ وَمَا لَا يَسْتَحِيلُ سُؤَالُهُ مِنَ الْعِبَادِ كَقَوْلِهِ اَللّٰهُمَّ زَوِّجْنِي فُلَانَةَ يُشْبِهُ كَلَامَهُمْ وَمَا يَسْتَحِيلُ كَقَوْلِهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ لَيْسَ مِنْ كَلَامِهِمْ وَقَوْلُهُ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ مِنْ قَبِيلِ الْاَوَّلِ لِاِسْتِعْمَالِهَا فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ يُقَالُ رَزَقَ الْاَمِيْرُ الْجَيْشَ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ فَيَقُولُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ لِمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْسَرِ وَ نَوٰى بِالتَّسْلِيْمِ الْاُوْلٰى مَنْ عَلٰى يَمِيْنِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْحَفَظَةِ وَكَذٰلِكَ فِى الثَّانِيَةِ لِاَنَّ الْاَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ وَلَا يَنْوِي النِّسَاءَ فِيْ زَمَانِنَا وَلَا مَنْ لَاشِرْكَةَ لَهُ فِيْ صَلَاتِهِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّ الْخِطَابَ حَظُّ الْحَاضِرِيْنَ ـ

অনুবাদ : মানুষের কাথাবার্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ভাষায় দোয়া করবে না যাতে নামাজ নষ্ট না হয়। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত ও সংরক্ষিত শব্দ দ্বারাই দোয়া করা উচিত। আর যে সকল প্রার্থনা মানুষের কাছে করা অসম্ভব নয়, সেগুলোই মানুষের কালামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন– এ কথা বলা, হে আল্লাহ! আমাকে অমুক নারী বিয়ে করিয়ে দিন। পক্ষান্তরে যা মানুষের কাছে চাওয়া সম্ভব নয়, তা মানুষের কালামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। যেমন– এ কথা বলা اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ (হে আল্লাহ আমাকে মাফ করুন।) আর اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ বলাটা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। কেননা মানুষের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার রয়েছে। বলা হয় رَزَقَ الْاَمِيْرُ الْجَيْشَ শাসক বাহিনীকে বেতন বা রেশন দিলেন। এরপর اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ বলে নিজের ডান দিকে সালাম ফিরাবে এবং বাম দিকেও অনুরূপভাবে সালাম ফিরাবে। কেননা ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী ﷺ তাঁর ডান দিকে এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর ডান গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেতো এবং তাঁর বাম দিকে এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর বাম গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেতো। প্রথম সালাম দ্বারা তাঁর ডান দিকের নারী, পুরুষ ও ফেরেশতাদের নিয়ত করবে। তদ্রূপ দ্বিতীয় সালামেও। কেননা আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। তবে বর্তমান জমানায় স্ত্রীলোকদের নিয়ত করবে না। (কেননা জমানা খারাপ হয়ে গেছে। সুতরাং নারী প্রসঙ্গ চিন্তা করে সেদিকে মনোযোগী হওয়া ইমামের পক্ষে সমীচীন হবে না।) এবং তাদেরও নিয়ত করবে না, যারা তার শরিক নয়। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা সম্বোধন উপস্থিতদের প্রাপ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : صَلٰوةٌ عَلَى النَّبِيِّ-এর পর এমন শব্দাবলি দ্বারা দোয়া করবে না যা মানুষের কথাবার্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যাতে নামাজের ঐ অংশ যা মানুষের কথাবার্তার সাথে সম্পৃক্ত তা ফাসিদ হওয়া থেকে বেঁচে যায়। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, নামাজির উচিত বর্ণিত দোয়াসমূহ পড়া।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তাশাহ্হুদের পর যদি এমন শব্দাবলি দ্বারা দোয়া করা হয় যা মানুষের কথাবার্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তার দ্বারা পুরো নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা তাশাহ্হুদের পর যদি বাস্তবেই কালামুন্নাস পাওয়া যায় তার দ্বারা নামাজ ফাসিদ

হয় না। তাহলে তো কালামুন্নাসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কালাম পাওয়া গেলেও নামাজ ফাসিদ হবে না। এ হুকুমটি সাহেবাইনের মতে যাহির। এমনিভাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতেও ফাসিদ হবে না। কেননা কালামুন্নাস মুসল্লীর পক্ষ থেকে خُرُوْج بِصُنْعِه-এর অনুরূপ। তাই এর দ্বারা নামাজ পুরো হয়ে যাবে। আর ঐ দোয়া যা তাশাহহুদের পর কালামুন্নাসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দাবলির মাধ্যমে করা হয়েছে তাতো নামাজের বাইরে হয়েছে, তাই নামাজ নষ্টকারী হবে না।— (ইনায়া)

কোন কোন দোয়া মানুষের কথাবার্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং কোন কোন দোয়া মানুষের কথা বার্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় এ পর্যায়ে গ্রন্থকার বলেন। যে সকল প্রার্থনা মানুষের কাছে করা অসম্ভব নয় যেমন এ কথা বলা اَللّٰهُمَّ زَوِّجْنِىْ فُلَانَةَ হে আল্লাহ! আমাকে অমুক নারী বিয়ে করিয়ে দিন। এটা মানুষের কথাবার্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর সকল প্রার্থনা মানুষের কাছে করা অসম্ভব, যেমন এ কথা বলা اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করুন। এটা সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আর যদি মুসল্লী বলে اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ হে আল্লাহ আমাকে রিজিক দাও। তখন এটা প্রথম তথা মানুষের কথাবার্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। আর এটাই হলো সহীহ। দলিল হলো হলো, মানুষের ক্ষেত্রে এগুলো বহুল প্রচলন রয়েছে যেমন, বলা হয় رَزَقَ الْاَمِيْرُ الْجَيْشَ আমীর সৈন্যদেরকে রিজক দিয়েছেন।

ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ الخ : উপরোক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো, তাশাহহুদ, সালাত আলান্নাবী এবং দোয়ার পর উভয় দিকে সালাম ফিরাবে। প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে। আর সালামের শব্দাবলি হলো– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ তোমাদের উপর সালাম ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। জমহুর ওলামা, কিবারে সাহাবা, হযরত ওমর, হযরত আলী এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখের এটাই মাযহাব। দলিল হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস, اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْسَرِ। ইমাম মালিক (র.) বলেন, শুধু সামনের দিকে একবার সালাম ফিরাবে। তাঁর দলিল হলো, হযরত আয়েশা এবং সাহ্ল ইবনে সা'দ আসসায়িদী (রা.) বর্ণিত হাদীস اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ فَعَلَ كَذَالِكَ রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এমনটিই করেছেন। অর্থাৎ নামাজ থেকে বের হবার জন্য এক সালাম করেছেন। আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো, কিবারে সাহাবাদের কাউলকে গ্রহণ করা উত্তম ইমাম মালিক (র.)-এর কাউল গ্রহণ করার তুলনায়। হযরত আয়েশা ও সাহাল ইবনে সা'দ আস্সায়িদী-এর এক সালাম ওয়ালা রিওয়ায়াতের জবাব হলো, হযরত আয়েশা (রা.) মহিলাদের কাতারে থাকতেন, আর সাহাল (রা.) থাকতেন শিশুদের কাতারে। হতে পারে তাঁরা উভয়ে দ্বিতীয় সালাম শুনেননি। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বিতীয় সালাম প্রথম সালামের তুলনায় নিচু আওয়াজে হতো। সুতরাং এ সম্ভাবনাময় অবস্থার কারণে হযরত আয়েশা ও সাহল (রা.)-এর হাদীস দলিলযোগ্য হতে পারে না।

গ্রন্থকার বলেন, প্রথম সালাম ফিরাবার সময় ঐ সমস্ত লোকদের নিয়ত করবে যারা তার ডান দিকে থাকে। তারা পুরুষ বা মহিলা হোক এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশ্তাদেরও নিয়ত করবে। এমনিভাবে বাম দিকে সালাম ফিরাবার সময় তাদের নিয়ত করবে যারা তার বাম দিকে থাকে। দলিল হলো, আমাল নিয়তের উপর নির্ভরশীল, যার বর্ণনা হাদীসে রয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আমাদের জমানায় স্ত্রীলোকদের নিয়ত করবে না। কেননা এ জমানার মহিলাদের জামাআতে উপস্থিত হওয়া মুতায়াখিখরীন ফুকাহায়ে কেরামের ঐকমত্যে মাতরূক তথা বর্জনীয়। আর যে সকল মুসলমান নামাজে শরিক নয় তাদেরও নিয়ত করবে না। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। হাকিম শহীদ (র.) বলেন, সমস্ত পুরুষ ও মহিলার নিয়ত করবে, চাই তারা নামাজে শরিক হোক বা না হোক। যাতে নিয়ত সালামে তাশাহহুদ তথা اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ-এর সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায়। কাউলে সহীহ-এর দলিল হলো হলো, সালাম হলো তাহ্লীলে খেতাব তথা সম্বোধনকে হালালকারী। আর খেতাব হলো উপস্থিতদের প্রাপ্য। এ জন্য যারা নামাজে শরিক নয় তারা এই সালামে শামিল হবে না। এর বিপরীত হলো সালামে তাশাহ্হুদ। কেননা তা হলো তাহিয়্যায়ে আম্মাহ যা সর্বজন ব্যাপৃত। আল্লাহর সকল নেক বান্দাদেরকে শামিল করবে চাই তারা উপস্থিত হোক বা অনুপস্থিত হোক। তাইতো রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

اِذَا قَالَ الْمُصَلِّىْ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ مِنْ اَهْلِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ .

অর্থাৎ নামাজি যখন اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ বলে তখন তা আসমান ও জমিনের অধিবাসী আল্লাহর সকল নেক বান্দার নিকট পৌছে যায়।

وَلَابُدَّ لِلْمُقْتَدِيْ مِنْ نِيَّةِ إِمَامِهِ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مِنَ الْجَانِبِ الْاَيْمَنِ وَالْاَيْسَرِ نَوَاهُ فِيْهِمْ وَإِنْ كَانَ بِحِذَائِهِ نَوَاهُ فِي الْأُوْلٰى عِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) تَرْجِيْحًا لِلْجَانِبِ الْاَيْمَنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) نَوَاهُ فِيْهِمَا لِأَنَّهُ ذُوْ حَظٍّ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَالْمُنْفَرِدُ يَنْوِي الْحَفَظَةَ لَا غَيْرَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ سِوَاهُمْ وَالْإِمَامُ يَنْوِيْ بِالتَّسْلِيْمَتَيْنِ هُوَ الصَّحِيْحُ وَلَا يَنْوِيْ فِي الْمَلَائِكَةِ عَدَدًا مَحْصُوْرًا لِأَنَّ الْاَخْبَارَ فِيْ عَدَدِهِمْ قَدِ اخْتَلَفَتْ فَاَشْبَهَ الْاِيْمَانَ بِالْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ثُمَّ إِصَابَةُ لَفْظَةِ السَّلَامِ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا وَلَيْسَ بِفَرْضٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيْ (رحـ) هُوَ يَتَمَسَّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) وَالتَّخْيِيْرُ يُنَافِي الْفَرْضِيَّةَ وَالْوُجُوْبَ إِلَّا إِنَّا أَثْبَتْنَا الْوُجُوْبَ بِمَا رَوَاهُ إِحْتِيَاطًا وَبِمِثْلِهِ لَا يَثْبُتُ الْفَرْضِيَّةُ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : (সালামের সময়) মুক্তাদীর জন্য তার ইমামের নিয়ত করা জরুরি। সুতরাং ডানে বা বামে থাকলে তাদের সাথেই তার নিয়ত করে নিবে। আর যদি তার বরাবরে থাকেন, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ডান দিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম সালামের সময় তার নিয়ত করবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে প্রাপ্ত একটি মত; উভয় সালামে তার নিয়ত করবে। কেননা তিনি উভয় দিকের অংশীদার। আর একা একা নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি শুধু ফেরেশ্‌তাদের নিয়ত করবে; অন্য কারো নিয়ত করবে না। কেননা তার সাথে তারা ব্যতীত অন্য কেউ নেই। আর ইমাম উভয় সালামে উক্ত (মুক্তাদী ও ফেরেশ্‌তাদের) নিয়ত করবে। এটি-ই বিশুদ্ধ মত। ফেরেশ্‌তাদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার নিয়ত করবে না। কেননা তাদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত আছে। সুতরাং তা আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি ঈমান আনয়নের সদৃশ। (কোনো বর্ণনায় দু'জন, কোনো বর্ণনায় পাঁচজন, কোনো বর্ণনায় ষাটজন এবং কোনো বর্ণনায় একশ' ষাটজনের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান পোষণের ক্ষেত্রে যেমন আমরা নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার নিয়ত করি না, তেমনি এখানেও ফেরেশ্‌তাদের নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার নিয়ত করব না।) আমাদের মতে 'সালাম' শব্দ উচ্চারণ করা ওয়াজিব; ফরজ নয়। এ সম্পর্কে ইমাম শাফি'য়ী (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেন– নামাজ শুরু করবে তাকবীর দ্বারা, আর তা থেকে বের হবে সালাম দ্বারা। আমাদের দলিল হলো, ইবনে মাস্‌উদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস (যাতে শেষ বৈঠকের পর বসে থাকার কিংবা উঠে পড়ার ইখ্‌তিয়ার প্রদান করা হয়েছে)। আর এ এখ্‌তিয়ার প্রদান ফরজ বা ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থী। তবে আমরা সতর্কতা অবলম্বনে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত করেছি। আর এ পর্যায়ের হাদীস দ্বারা ফরজ হওয়া প্রমাণিত হয় না। আল্লাহ্-ই অধিক জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাস্আলা : সালাম ফেরানোর সময় মুক্তাদীর জন্য জরুরি হলো, সে তার ইমামের নিয়ত করবে। ইমাম যদি ডান দিকে হয়, তাহলে ডানদিকে সালাম ফেরানোর সময় নিয়ত করবে। আর যদি বাম দিকে হয়, তাহলে বাম দিকে সালাম ফেরানোর সময় ইমামের নিয়ত করবে। আর যদি মুক্তাদী ঠিক ইমামের বরাবরে থাকে, তখন এ সুরতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মাযহাব হলো, মুক্তাদী ডান দিকের সালামের সময় ইমামের নিয়ত করবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মাযহাব হলো, মুক্তাদী উভয় দিকের সালামের সময় ইমামের নিয়ত করবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এরও একটি মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ডান দিককে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ হলো, শরিয়তের মধ্যে ডান দিকটিই হলো অধিক গ্রহণযোগ্য। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর দলিল হলো, 'বরাবর' দাড়ানো ব্যক্তি উভয় দিকের অংশীদার। তাই উভয় দিকের সালামের সময় ইমামের নিয়ত করবে। তা ছাড়া তাআরুযের সময় যদি জমা করা সম্ভব হয়, তবে তো তারজী'-এর দিকে রুজু করা হয় না। এ কারণেও ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেছেন, উভয় দিকের সালামের সময়ই ইমামের নিয়ত করবে।

وَالْإِمَامُ يَنْوِيْ بِالتَّسْلِيْمَتَيْنِ الخ : ইমাম তার উভয় সালাম ফিরানোর সময় রক্ষণা-বেক্ষণকারী ফেরেশ্তা এবং মুসল্লী উভয়ের নিয়ত করবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেউ কেউ বলেন, ইমাম নিয়তের মুখাপেক্ষী নয়। আবার কেউ কেউ বলেন, এক সালামের সময় নিয়ত করা-ই যথেষ্ট। 'হিদায়া' গ্রন্থকার বলেন, ফেরেশ্তাদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার নিয়ত করবে না; বরং স্বাভাবিকভাবেই ফেরেশ্তার নিয়ত করবে। কেননা তাদের সম্পর্কে হাদীস বিভিন্নভাবেই বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে,

اِنَّهُ قَالَ مَعَ كُلِّ مُؤْمِنٍ خَمْسَةٌ مِنَ الْحَفَظَةِ وَاحِدٌ مِنْ يَمِيْنِهِ يَكْتُبُ الْحَسَنَاتِ وَاٰخَرُ عَنْ يَسَارِهِ يَكْتُبُ السَّيِّئَاتِ وَاٰخَرُ اَمَامَهُ يُلَقِّنُهُ الْخَيْرَاتِ وَاٰخَرُ وَرَاءَهُ يَدْفَعُ عَنْهُ الْمَكَارِهَ وَاٰخَرُ عِنْدَ نَاصِيَتِهِ يَكْتُبُ مَا يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَلِّغُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রত্যেক মু'মিনের সাথে রক্ষণা-বেক্ষণকারী পাঁচজন ফেরেশ্তা থাকে। একজন ডান দিকে, যিনি নেকীসমূহ লিখেন। আরেকজন বাম দিকে, যিনি খারাবিগুলো লিখেন। আরেকজন সামনের দিকে, যিনি তাকে নেকী করার জন্য তাল্‌কীন দেন। আরেকজন পেছনের দিকে, যিনি তাকে খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে রাখেন। পঞ্চমজন তার কপালের দিকে, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর প্রেরিত দরূদসমূহ লিখেন এবং তা আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ পর্যন্ত পৌঁছে দেন। অন্য রিওয়ায়াতে আছে– مَعَ كُلِّ مُؤْمِنٍ سِتُّوْنَ مَلَكًا (প্রত্যেক মু'মিনের সাথে ষাটজন ফেরেশ্তা থাকেন)। অন্য রিওয়ায়াতে আছে– مِائَةٌ وَسِتُّوْنَ (একশ' ষাটজন ফেরেশ্তা থাকেন)। যেহেতু রক্ষণা-বেক্ষণকারী ফেরেশ্তাদের কোনো সংখ্যা নির্ধারিত নেই, সেহেতু অনির্ধারিত রেখেই নিয়ত করবে। আর এ মাসআলাটি আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর ঈমান রাখার সদৃশ। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা ছাড়াই সকল নবীর উপর ঈমান রাখা জরুরি। প্রকাশ থাকে যে, আমাদের মতে, 'সালাম' শব্দ উচ্চারণ করা ওয়াজিব; ফরজ নয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে, 'সালাম' শব্দ উচ্চারণ করা রুকন এবং ফরজ। তাঁর দলিল হলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী– تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ। দলিল এভাবে যে, যেমনিভাবে তাক্‌বীর ব্যতীত নামাজে দাখিল হওয়া সহীহ নয়, তেমনিভাবে সালাম ব্যতীতও নামাজ থেকে বের হওয়া সহীহ নয়। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা ফরজ। তাই নামাজ থেকে বের হওয়ার জন্য 'সালাম' শব্দটি উচ্চারণ করাও ফরজ হবে।

আমাদের দলিল হলো হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ (রা.)-কে তাশাহ্‌হুদ-এর তালীম দিয়েছিলেন, তখন তিনি ইবনে মাস্‌উদ (র.)-কে বলেছেন–

اِذَا قُلْتَ هٰذَا اَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ فَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ ـ

দলিল এভাবে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ সালাম দ্বারা নামাজ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন, অত:পর তাকে বসা ও দাঁড়ানোর মাঝে ইখ্‌তিয়ার দিয়েছেন। আর ইখ্‌তিয়ার দেওয়া কোনো জিনিসের ফরজ বা ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থী। বুঝা গেল, তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ পড়ার পর সালাম ইত্যাদি কোনো জিনিস-ই ফরজ নয়। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে, ইখ্‌তিয়ার দেওয়া তো উজূবের পরিপন্থী, তাহলে তো সালাম বলা ওয়াজিবও হয় না। অথচ ওলামায়ে আহ্‌নাফ সালামকে ওয়াজিব বলেন। জবাব হলো, আমরা সতর্কতা অবলম্বনে ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা ওয়াজিব সাবিত করেছি। আর এ হাদীসটি হলো খবরে ওয়াহিদ। আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ওয়াজিব তো সাবিত হয়, কিন্তু ফরযিয়াত সাবিত হয় না। আল্লাহ্-ই সম্যক অবহিত।

فَصْلٌ فِى الْقِرَاءَةِ : قَالَ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِى الْفَجْرِ وَالرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِنْ كَانَ إِمَامًا وَيُخْفِى فِى الْأُخْرَيَيْنِ هٰذَا هُوَ الْمُتَوَارَثُ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ لِأَنَّهُ إِمَامٌ فِى حَقِّ نَفْسِهِ وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ لِأَنَّهُ لَيْسَ خَلْفَهُ مَنْ يُسْمِعُهُ وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْجَهْرُ لِيَكُونَ الْأَدَاءُ عَلٰى هَيْئَةِ الْجَمَاعَةِ وَيُخْفِيهَا الْإِمَامُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ كَانَ بِعَرَفَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلٰوةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ أَىْ لَيْسَتْ فِيهَا قِرَاءَةٌ مَسْمُوعَةٌ وَفِى عَرَفَةَ خِلَافٌ لِمَالِكٍ (رح) وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ ـ

কিরাআত অনুচ্ছেদ

অনুবাদ : ইমাম হলে ফজরে এবং মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই রাকআতে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়বে; শেষ দুই রাক্আতে অনুচ্চৈঃস্বরে পড়বে। এটাই পরম্পরায় চলে এসেছে। আর যদি মুন্ফারিদ হয়, তাহলে সে ইচ্ছাধীন। চাইলে সে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করবে এবং নিজকে শোনাবে। (অর্থাৎ মুন্ফারিদও এক হিসাবে ইমাম। কেননা সে অন্য কারো জন্য না হলেও নিজের জন্য তো ইমামের দায়িত্ব পালন করছে। আর উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত হলো ইমামতির বৈশিষ্ট্য। সুতরাং তাকে উচ্চৈঃস্বরে পড়ার অধিকার দেওয়া হবে। তবে ন্যূনতম পরিমাণ উচ্চৈঃস্বরে পড়বে। অর্থাৎ শুধু নিজেকে শুনিয়ে পড়বে। কেননা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলার আয়াত সম্পর্কে চিন্তার জন্য মনোযোগ নিবদ্ধ করা। আর তার ক্ষেত্রে শুধু নিজেকে শুনিয়ে পড়লেই তা হাসিল হয়ে যায়। তবে ইমাম না হওয়ার দিকটি বিবেচনা করে ইচ্ছা করলে অনুচ্চস্বরেও পড়তে পারবে।) কেননা নিজের ব্যাপারে সে নিজের ইমাম। আর চাইলে চুপে চুপে পাঠ করবে। কেননা তার পেছনে এমন কেউ নেই, যাকে সে শোনাবে। তবে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করাই উত্তম, যাতে জামাআতের অনুরূপ আদায় হয়ে যায়। জোহ্র ও আসরে ইমাম কিরাআত চুপে চুপে পড়বে, এমনকি আরাফাতে হলেও। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দিবসের নামাজ নির্বাক অর্থাৎ তাতে এমন কিরাআত নেই যা শোনা যাবে। আরাফা সম্পর্কে ইমাম মালিক (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। আর আমাদের বর্ণিত হাদীসটি তাঁর বিপক্ষে দলিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রাসঙ্গিক কথা ঃ গ্রন্থকার নামাজের সিফাত, কাইফিয়াত, আর্কান, ফারায়েয, ওয়াজিবাত এবং সুনান-এর আলোচনা থেকে ফারিগ হয়ে এ অনুচ্ছেদে কিরাআতের আহ্কাম সম্পর্কে আলোচনা শুরু করছেন। অথচ কিরাআতও নামাজের আরকানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অন্যান্য আরকানের তুলনায় কিরাআতের আহকাম যেহেতু আরো অধিক, তাই গ্রন্থকার কিরাআতের আহ্কামকে আলাদা অনুচ্ছেদে আলোচনা করছেন।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, মুসল্লী যদি ইমাম হয়, তাহলে ফজরের দুই রাকআত, মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই রাকআতে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। আর অবশিষ্ট রাকআতগুলো, অর্থাৎ মাগরিবের তৃতীয় রাকআত এবং ইশার শেষ দুই রাকআতে চুপে চুপে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। এটাই রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবী এবং তাবিয়ীন থেকে বর্ণিত। উল্লেখ্য, জোরের নামাজে জোরে, আর আস্তের নামাজে আস্তে পড়া ওয়াজিব। আর এ ওয়াজিব হাদীস দ্বারা সাবিত। যেমন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত– إِنَّهُ قَالَ فِى كُلِّ صَلٰوةٍ يَقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفٰى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, প্রত্যেক নামাজে কুরআন পাঠ করা হতো। যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শুনিয়েছেন, আমরাও তোমাদেরকে শুনিয়েছি। আর যেখানে গোপন করেছেন (শোনাননি), আমরাও গোপন করেছি। অর্থাৎ যেসব নামাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ জেহের করেছেন আমাদেরকে শুনিয়েছেন, সেগুলোতে আমরাও জেহের করেছি এবং তোমাদেরকে শুনিয়েছি। আর যেসব নামাজে ইখ্‌ফা করেছেন, সেগুলোতে আমরাও ইখ্‌ফা করেছি। বোঝা গেল, জেহেরী নামাজে জেহের করা, আর সির্‌রী নামাজে ইখ্‌ফা করা হাদীস দ্বারা সাবিত। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে উম্মতের ইজ্‌মাও অন্যতম দলিল। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত জেহ্‌রী নামাজে জেহের, আর সির্‌রী নামাজের ইখ্‌ফা-এর উপর পুরো উম্মতের ইজ্‌মা রয়েছে।

আক্‌লী দলিল হলো, কিরাআত নামাজের অন্যান্য রোকনের ন্যায় একটি রোকন। সুতরাং যেমনিভাবে সকল রোকনের ইয্‌হার জরুরি, তেমনিভাবে কিরাআতেরও ইয্‌হার জরুরি হবে। এ কারণে ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সমস্ত নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ করতেন। এদিকে মুশ্‌রিকরা কিরাআত শুনে শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কষ্ট দিতো এবং বেহুদা বকাবকি করতো। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করলেন- وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا (আপনি সকল নামাজে জেহের করবেন না এবং সকল নামাজে ইখ্‌ফাও করবেন না;) বরং وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا (উভয়ের মাঝামাঝি রাস্তা অবলম্বন করবেন)। অর্থাৎ রাতের নামাজে জেহের করবেন, আর দিনের নামাজে ইখ্‌ফা করবেন। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহর এবং আসরের নামাজে ইখ্‌ফা তথা আস্তে পড়া শুরু করে দেন। কেননা সাধারণত কাফিররা এ দুই ওয়াক্তে তাঁকে কষ্ট দিতো। আর যেহেতু কাফিররা মাগরিবের সময় খাওয়ায় লিপ্ত থাকতো, আর ইশা ও ফজরের সময় ঘুমের ঘোরে বিভোর থাকতো, তাই সেসব নামাজে তিনি জেহের করতেন। আর জুমা ও দুই ঈদের নামাজে জেহের করার কারণ হলো, এ নামাজগুলো মদীনায় প্রবর্তিত হয়েছিল। আর মদীনায় কষ্ট পৌঁছানো কাফিরদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। আর এ ওজর তথা কাফিরদের পক্ষ থেকে কষ্ট পৌঁছানো যদিও মুসলমানদের আধিক্যের কারণে দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল, তথাপিও সির্‌রী নামাজে ইখ্‌ফার হুকুম অবশিষ্ট রয়ে গেছে। কেননা بقاء حكم . بقاء سبب থেকে مستغنى হয়ে থাকে। যেমন- তওয়াফের মধ্যে রমলের হুকুম এখানে অবশিষ্ট আছে যদিও এর সবব এখন আর অবশিষ্ট নেই।

আর মুসল্লী যদি মুনফারিদ হয়, তখন সে ইচ্ছাধীন। চাইলে সে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করবে এবং নিজেকে শুনাবে। কেননা নিজের ব্যাপারে সে নিজের ইমাম। আর চাইলে চুপে চুপে পাঠ করবে। কেননা তার পিছনে এমন কোনো লোক নেই যাকে সে শুনাবে। আর আল্লাহ তা'আলা তো প্রত্যেকের আস্তে-জোরে, সবকিছুই শুনেন। মোটকথা, মুনফারিদের উপর জেহেরও ওয়াজিব নয় এবং ইখ্‌ফাও ওয়াজিব নয়। তবে জেহের করা উত্তম, যাতে মুনাফিকদের নামাজ জামাআতের অনুরূপ হয়ে যায়।

وَيُخْفِيهَا الْإِمَامُ فِي الظُّهْرِ জোহর ও আসরের নামাজে ইমামের চুপে চুপে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। সুতরাং জামাআতের হালাতে যখন ইখ্‌ফা করা ওয়াজিব তখন মুনফারিদের জন্য জোহর ও আসরে ইখ্‌ফা করা অবশ্যই ওয়াজিব হবে। দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী صَلٰوةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ দিবসের নামাজে এমন কিরাআত নেই যা শুনা যায়। মোটকথা, দিবসের নামাজে কিরাআত তো আছে তবে বিস্‌সির আছে বিলজেহের নয়। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাফসীর হলো لَا قِرَاءَةَ فِي هَاتَيْنِ الصَّلٰوتَيْنِ দিবসের এই দুই নামাজে কিরাআত নেই। বিল জেহেরও না বিস্‌সিরও না। তবে ইব্‌নে আব্বাস (রা.)-এর উপরোক্ত তাফসীর সহীহ নয়। সহীহ্ না হওয়ার উপর দলিল হলো হলো, একবার হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, بِمَ عَرَفْتُمْ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ ـ আপনারা কিভাবে বুঝতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহর ও আসরের নামাজে কিরাআত পড়তেন? খাব্বাব ইবনে আরাত (রা.) বলেন, তাঁর দাড়ীর নড়াচড়া দ্বারা। হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُسْمِعُنَا الْآيَتَيْنِ فِي الظُّهْرِ أَحْيَانًا রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো আমাদেরকে জোহরের নামাজে দু' এক আয়াত শুনাতেন। এতে বুঝা গেল যে, দিবসের নামাজের কিরাআত চুপে চুপে পড়তে হবে। আমাদের মতে জোহর ও আসরের নামাজে সাধারণভাবেই চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব। আর নামাজ আরাফায় পড়া হোক বা অন্য কোথাও পড়া হোক ততে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু ইমাম মালিক (র.) বলেন, আরাফার ময়দানে ঐ দুই নামাজে জোরে জোরে কিরাআত করে পড়া ওয়াজিব। তাঁর দলিল হলো হলো, আরাফার ময়দানে বিশাল জামাআত নিয়ে নামাজ আদায় করা হয়। তাই জুমার উপর কিয়াস করে তিনি বলেন, এখানেও জোরে জোরে কিরাআত পড়বে। তবে আমাদের বর্ণিত হাদীস صَلٰوةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ ইমাম মালিক (র.)-এর বিপক্ষে দলিল হবে।

وَيَجْهَرُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ لِوُرُودِ النَّقْلِ الْمُسْتَفِيضِ بِالْجَهْرِ وَفِي التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ يُخَافِتُ وَفِي اللَّيْلِ يَتَخَيَّرُ اِعْتِبَارًا بِالْفَرْضِ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ وَهٰذَا لِاَنَّهُ مُكَمِّلٌ لَهُ فَيَكُونُ تَبَعًا لَهُ وَمَنْ فَاتَتْهُ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ اِنْ اَمَّ فِيهَا جَهَرَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حِينَ قَضَى الْفَجْرَ غَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ بِجَمَاعَةٍ وَاِنْ كَانَ وَحْدَهُ خَافَتَ حَتْمًا وَلَا يَتَخَيَّرُ هُوَ الصَّحِيحُ لِاَنَّ الْجَهْرَ يَخْتَصُّ بِالْجَمَاعَةِ حَتْمًا اَوْ بِالْوَقْتِ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ وَلَمْ يُوجَدْ اَحَدُهُمَا ـ

অনুবাদ : আর জুমা ও দুই ঈদে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ করবে। কেননা উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠের ব্যাপারে মশহুর হাদীস রয়েছে। দিবসে নফল নামাজে চুপে চুপে কিরাআত পাঠ করবে। আর ফরজ নামাজের উপর কিয়াস করে রাতের নামাজে মুনফারিদের ইখতিয়ার রয়েছে। কেননা নফল নামাজ হলো ফরজের সম্পূরক। সুতরাং (কিরাআতের বেলায়) নফল ফরজের অনুরূপ হবে। যে ব্যক্তির ইশার নামাজ ফউত হয়ে যায় এবং সূর্যোদয়ের পর তা পড়ে সে যদি উক্ত নামাজে ইমামতি করে তাহলে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়বে। لَيْلَةُ التَّعْرِيسِ -এর সকালে জামাআতের সাথে ফজরের নামাজ কাযা করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন করেছিলেন। আর যদি সে একা নামাজ পড়ে, তাহলে অবশ্যই নীরবে কিরাআত পড়বে। (উভয় রকম পড়ার) ইখ্‌তিয়ার থাকবে না, এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠের বিষয়টি সম্পৃক্ত রয়েছে জামাআতের সাথে অবশ্যম্ভাবীরূপে, কিংবা সময়ের সাথে স্বেচ্ছামূলকভাবে মুনফারিদের ক্ষেত্রে। অথচ এখানে দু'টোর কোনোটাই পাওয়া যায়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা ঃ জুমা এবং দুই ঈদের নামাজেও ইমামের উপর উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ করা ওয়াজিব। দলিল হলো, আহাদীসে মাশ্‌হুরাহ। ইমাম বুখারী ব্যতীত মুহাদ্দিসীনে কেরামের এক জামাআত বর্ণনা করেছেন যে,

اِنَّهُ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

আর মুসলিমের রিওয়ায়াত হলো

عَنْ اَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ سَاَلَنِي عُمَرُ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِقٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

আবূ ওয়াকিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত ওমর (রা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতরের নামাজে কোন কোন সূরা পড়তেন। তিনি বলেন, সূরায়ে ক্বাফ ও সূরায়ে ইক্‌তারাবাতিস সা'আহ্ পড়তেন। এ সকল বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল যে, তিনি জুমা ও দুই ঈদের নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়তেন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, দিবসের নফল নামাজে চুপে চুপে কিরাআত পাঠ করা ওয়াজিব। আর রাতের নফল নামাজে ইচ্ছাধীন। আস্তে জোরে উভয়ভাবেই পাঠ করা যায়। দলিল হলো, নফল আদায়কারী ব্যক্তিকে একাকী ফরজ আদায়কারী ব্যক্তির উপর কিয়াস করা হয়েছে। অর্থাৎ একাকী ফরজ আদায়কারীর উপর দিবসের ফরজ নামাজে চুপে চুপে কিরাআত পড়া

ওয়াজিব। আর রাতের নামাজে ইচ্ছাধীন, জোরেও পড়তে পারে বা চুপে চুপেও পড়তে পারে। আর এ কিয়াসের কারণ হলো নফল ফরজের সম্পূরক। তাই নফল ফরজের অনুরূপ হবে। আর রাতের ফরজে মুনফারিদের ইখ্‌তিয়ার রয়েছে। জোরে বা আস্তে পড়বে। এমনিভাবে রাতের নফলেও ইখ্‌তিয়ার রয়েছে। আর যেহেতু দিনের ফরজে চুপে চুপে পড়া নির্ধারিত, তাই দিনের নফলেও চুপে চুপে পড়াই নির্ধারিত হবে।

وَمَنْ فَاتَتْهُ الْعِشَاءُ الخ যদি কোনো ব্যক্তির ইশা, মাগরিব অথবা ফজর নামাজ ফউত হয়ে যায়, তারপর তা সূর্যোদয়ের পর কাজা করতে চায়, তবে এর দুই সুরত রয়েছে। এক জামাআতের সাথে কাজা করবে। দুই একাকী কাজা করবে। যদি জামাআতের সাথে কাজা করে তবে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়বে। দলিল হলো হলো, لَيْلَةُ التَّعْرِيْسِ-এর ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের নামাজ জামাআতের সাথে কাযা করেছিলেন তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়েছিলেন। لَيْلَةُ التَّعْرِيْسِ-এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো হলো, এক জিহাদের সফর থেকে প্রত্যাবর্তন কালে সাহাবায়ে কেরামের আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে নিয়ে একস্থানে অবস্থান করলেন। জাগানোর দায়িত্ব ছিল হযরত বিলালের উপর। কিন্তু হযরত বিলালও ঘুমিয়ে পড়লেন। আর রোদ্র প্রখর হয়ে যাবার পর জাগ্রত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সূর্য যখন এক নেযা বরাবর উপরে উঠল তখন সামনে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবতরণ করলেন এবং অজু করলেন। আর মুয়াজ্জিনকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর দুই রাকআত নামাজ পড়লেন অর্থাৎ ফজরের সুন্নত। তারপর নামাজের জন্য ইকামত দেওয়া হলো, তারপর ফজরের ফরজ নামাজ আদায় করলেন। যেমনটি অন্যান্য দিন আদায় করতেন। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের ফরজে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়েছেন-এতে বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ لَيْلَةُ التَّعْرِيْسِ-এর সময় ফজরের নামাজের কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেছেন। আর যদি উপরোক্ত নামাজগুলো একাকী কাজা করে, তবে নীরবে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। তখন জোরে ও চুপে পড়ার ইখতিয়ার বাকি থাকবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত। শামসুল আইম্মা আস্‌সারাখ্‌সী এবং ফখরুল ইসলাম (র.) প্রমুখের মতে উচ্চৈঃস্বরে পড়া উত্তম। দলিল হলো, সাধারণত কাজা আদা (اداء) অনুযায়ী হয়ে থাকে। আর রাতের নামাজের আদায়ের ক্ষেত্রে মুনফারিদের ইখ্‌তিয়ার রয়েছে যে, জোরেও পড়তে পারে আবার চুপে চুপেও পড়তে পারে, তবে জোরে পড়া উত্তম। এমনটি কাজার ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে। তথা জোরে পড়া উত্তম হবে। বিশুদ্ধ কাউলের দলিল হলো, উচ্চৈঃস্বরে পড়া দুই সুরতের সাথে খাস। এক. নামাজ জামাআতের সাথে হওয়া দুই. নামাজ সময়ের ভিতরে হওয়া। প্রথম সুরতে উচ্চৈঃস্বরে পড়া উত্তম। আর দ্বিতীয় সুরতে মুনফারিদের ক্ষেত্রে ইখতিয়ারাধীন। মোট কথা, জোরে ও আস্তে পড় শরিয়তের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী হবে। আর আমরা শরিয়তের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে পড়াকে দুইভাবে পেয়েছি। এক. উচ্চৈঃস্বরে পড়া ওয়াজিব। এটা হলো তখন যখন জামাআতের সাথে জেহ্‌রী নামাজ পড়া হবে তা আদা হোক বা কাজা হোক। দুই. জেহের ইচ্ছাধীন, এটা তখন যখন মুনফারিদ ওয়াক্তের ভিতর জেহ্‌রী নামাজ পড়ে। আর এখানে মুনফারিদ যখন সূর্যোদোয়ের পর জেহ্‌রী নামাজ পড়ে তখন তো উপরোক্ত দুই সুরতের এক সুরতও পাওয়া যায় না। অর্থাৎ জামাআতও না ওয়াক্তও না। এ জন্য এ সুরতে জেহেরও ওয়াজিব হবে না এবং জেহরে মুখায়য়ারাও নয়। তাই ইখ্‌ফা তথা চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব হবে।

وَمَنْ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي الْأُوْلَيَيْنِ السُّوْرَةَ وَلَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ لَمْ يُعِدْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَإِنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ الْفَاتِحَةَ وَالسُّوْرَةَ وَجَهَرَ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) لَايَقْضِيْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا لِاَنَّ الْوَاجِبَ اِذَا فَاتَ عَنْ وَقْتِهِ لَا يُقْضٰى اِلَّا بِدَلِيْلٍ وَلَهُمَا وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ اَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ شُرِعَتْ عَلٰى وَجْهٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا السُّوْرَةُ فَلَوْ قَضَاهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ تَتَرَتَّبُ الْفَاتِحَةُ عَلَى السُّوْرَةِ وَهٰذَا خِلَافُ الْمَوْضُوْعِ بِخِلَافِ مَا اِذَا تَرَكَ السُّوْرَةَ لِاَنَّهُ اَمْكَنَ قَضَاؤُهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوْعِ ثُمَّ ذَكَرَ هٰهُنَا مَايَدُلُّ عَلَى الْوُجُوْبِ وَفِي الْاَصْلِ بِلَفْظَةِ الْاِسْتِحْبَابِ لِاَنَّهَا اِنْ كَانَتْ مُؤَخَّرَةً فَغَيْرُ مَوْصُوْلَةٍ بِالْفَاتِحَةِ فَلَمْ يُمْكِنْ مُرَاعَاةُ مَوْضُوْعِهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ইশার প্রথম দুই রাকআতে সূরা পাঠ করল কিন্তু সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করেনি, সে শেষ দুই রাকআতে তা দোহ্‌রাবে না। পক্ষান্তরে যদি সূরায়ে ফাতিহা পড়ে থাকে কিন্তু তার সাথে অন্য সূরা যোগ না করে থাকে, তাহলে শেষ দুই রাকআতে ফাতিহা ও সূরা দু'টোই পড়বে এবং উচ্চৈঃস্বরে পড়বে। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মত। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, দু'টোর মধ্যে কোনোটাই কাজা করবে না। কেননা ওয়াজিব যখন নিজ সময় থেকে ফউত হয়ে যায়, তখন পরবর্তীতে বিনা দলিলে সেটাকে কাজা করা যায় না। তরফাইন (র.)-এর দলিল যা উভয় অবস্থায় পার্থক্যের সাথে সম্পৃক্ত যে, সূরায়ে ফাতিহাকে শরিয়তে এমন অবস্থায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, তার পরে সূরা সংযুক্ত হবে। সুতরাং যদি ফাতিহাকে শেষ দুই রাকআতে কাজা করা হয় তাহলে তারতীবের দিক থেকে সূরার পর সূরায়ে ফাতিহা এসে যাবে। অর্থাৎ এটা নির্ধারিত অবস্থানের বিপরীত। আর (প্রথম দুই রাকআতে) সূরা ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা শরিয়ত নির্ধারিতরূপে কাজা করা সম্ভব। উল্লেখ্য যে, এখানকার পাঠে এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে (কাজা করা) ওয়াজিব হওয়া বুঝায়। আর মূল গ্রন্থের উল্লেখিত শব্দে মোস্তাহাব হওয়া বুঝায়। কেননা সূরার কাজা যদিও ফাতিহার পরে হচ্ছে তবু এ সূরা ফাতিহার সাথে সংযুক্ত হচ্ছে না। এ কারণে নির্ধারিত অবস্থান সর্বাংশে বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : এক ব্যক্তি ইশার প্রথম দুই রাকআতে সূরা পড়েছে কিন্তু সূরায়ে ফাতিহা পড়েনি এখন এ ব্যক্তি শেষ দুই রাকআতে সূরায়ে ফাতিহার কাজা করবে না। আর যদি প্রথম দুই রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা পড়ে কিন্তু অন্য কোনো সূরা পড়েনি; তাহলে শেষ দুই রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে এবং উভয়টি উচ্চৈঃস্বরে পড়বে। এ হুকুম হলো তরফাইন (র.)-এর মতে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য কোনো সূরা কোনোটিরই কাজা করতে হবে না। তাঁর দলিল হলো হলো, সূরায়ে ফাতিহা ও এর সাথে অন্য সূরা মিলানো উভয়টিই ওয়াজিব। (এ কারণেই

উভয়টির যে কোনো একটি যদি ভুলক্রমে তরক করা হয় তখন সিজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয়। চাই شفع ثاني তে তার কাজা করুক বা না করুক।) আর ওয়াজিব যখন তার নিজের সময় হতে ফউত হয়ে যায় তখন তার কাজা ফরজ হয় না, তবে যদি কাজার কোনো দলিল বিদ্যমান থাকে তা হলে কাজা করতে হবে। আর এখানে কাজার কোনো দলিল নেই। এ জন্য এগুলোর কাজা করাও জরুরি নয়। দলিল এ কারণে বিদ্যমান নেই যে, কাজা বলা হয় مَالَهُ مَشْرُوْعًا-কে- مَاعَلَيْهِ-এর দিকে ফিরিয়ে দেওয়াকে। অর্থাৎ শরিয়তে তার জন্য যে হক প্রবর্তন করেছে তাকে তার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যা তার উপর ওয়াজিব। আর এখানে অবস্থা হলো, শেষ দুই রাকআতে কোনো সূরা প্রবর্তিত হয়নি। তাই যখন শেষ দুই রাকআতে সূরা তার হক হিসাবে প্রবর্তিত হয়নি তাই প্রথম দুই রাকআতের ফউত হওয়া সূরা শেষ দুই রাকআতে কাযা করা হবে না।

তরফাইন (র.)-এর দলিল এবং যা উভয় সুরতের সাথে পার্থক্যের কারণও বটে, তাহলো হলো, শরিয়ত সূরায়ে ফাতিহাকে এমনভাবে প্রবর্তন করেছে যে, তারপর কোনো সূরাকে অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ সূরায়ে ফাতিহা এমনভাবে পড়বে যে তার পরেও কোনো সূরা পড়বে। এখন প্রথম সুরতে যখন কোনো সূরা পড়ল কিন্তু সূরায়ে ফাতিহা পড়েল না, যদি শেষ দুই রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা কাজা করা হয় তাহলে সূরায়ে ফাতিহা অন্য সূরার পরে সংযুক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রথমে সূরা পড়া হবে তারপর সূরায়ে ফাতিহা। আর এটাতো খেলাফে শরা তথা নির্ধারিত অবস্থানের বিপরীত। কেননা শরিয়ত প্রথমে সূরায়ে ফাতিহা তারপর অন্য সূরার প্রবর্তন করেছে। আর এখানে হচ্ছে তার উল্টো। এ কারণে এ সুরতে সূরায়ে ফাতিহা কাজা করার হুকুম দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয় সুরত অর্থাৎ যখন প্রথম দুই রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা পড়ল; কিন্তু অন্য কোনো সূরা পড়ল না তখন শেষ দুই রাকআতে এগুলোর কাজা করবে। কেননা এ সুরতে শরিয়ত প্রবর্তিত নির্ধারিত তরীকা অনুযায়ী কাজা করা সম্ভব। কেননা শরিয়তের প্রবর্তিত তরীকা হলো ফাতিহার পর সূরা পড়া, যা এখানে বিদ্যমান।

ইনায়া গ্রন্থকার ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে বলেন যে, আমরা এ কথা মানি না যে, শেষ দুই রাকআতে কোনো সূরা প্রবর্তিত হয়নি। কেননা ফখরুল ইসলাম শরহে জামে সগীরে লিখেছেন যে, শেষ দুই রাকআতে কোনো সূরা পড়া মোস্তাহাব। এ কারণেই যদি শেষ দুই রাকআতে কোনো সূরা পড়া হয় তবে সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয় না। ثُمَّ ذَكَرَ هٰهُنَا বাক্যটুকু দ্বারা ইবারতসমূহের ইখতিলাফ দেখানো হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, জামে সগীরের মধ্যে এমন শব্দ উল্লেখ রয়েছে যাতে শেষ দুই রাকআতের সূরার কাজাও ওয়াজিব বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা জামে সগীরে রয়েছে قَرَأَ فِى الْأُخْرَيَيْنِ যা امر -এর স্থলবর্তী, আর امر উজূবের উপর দালালাত করে। সুতরাং জামে সগীরের ইবারত দ্বারা বুঝা গেল শেষ দুই রাকআতে কাজা করা ওয়াজিব। আর দলিল হলো যে, উহাই পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মাবসূতের মধ্যে ইস্তিহবাবের সাথে বর্ণিত হয়েছে। মাবসূতের ইবারত হলো إِذَا تَرَكَ السُّوْرَةَ فِى الْأُوْلَيَيْنِ اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ يَقْضِيَهَا প্রকাশ থাকে যে, احب শব্দটি استحباب-এর উপর দালালত করে। মাবসূতের ইবারত দ্বারা বুঝা গেল যে, যদি প্রথম দুই রাকআতে কিরাআতকে তরক করা হয় তবে শেষ দুই রাকআতে তার কাজা করা মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। ইস্তিহবাবের দলিল হলো, সূরা মিলানোর বিষয়টি অবশ্যই সূরায়ে ফাতিহার পরে হয়ে গেছে কিন্তু প্রথম ফাতিহার সাথে সংযুক্ত নয়। কেননা প্রথম ফাতিহা ও সূরার মাঝে দ্বিতীয় ফাতিহা দ্বারা (ঐ ফাতিহা যাকে শেষ দুই রাকআতে পড়া উত্তম) ফাসিলা হয়ে গেছে। সুতরাং নির্ধারিত অবস্থান সর্বাংশে বজায় রাখা সম্ভব নয়। এ জন্য মাবসূতে বলা হয়েছে সূরার কাজা করা মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

وَيَجْهَرُ بِهِمَا هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ فِى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ شَنِيْعٌ وَتَغْيِيْرُ النَّفْلِ وَهُوَ الْفَاتِحَةُ اَوْلَى ثُمَّ الْمُخَافَتَةُ اَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَالْجَهْرُ اَنْ يُسْمِعَ غَيْرَهُ وَهٰذَا عِنْدَ الْفَقِيْهِ اَبِى جَعْفَرِ الْهِنْدَوَانِىْ (رحـ) لِاَنَّ مُجَرَّدَ حَرَكَةِ اللِّسَانِ لَايُسَمَّى قِرَاءَةً بِدُوْنِ الصَّوْتِ وَقَالَ الْكَرْخِىْ اَدْنَى الْجَهْرِ اَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَاَدْنَى الْمُخَافَتَةِ تَصْحِيْحُ الْحُرُوْفِ لِاَنَّ الْقِرَاءَةَ فِعْلُ اللِّسَانِ دُوْنَ الصِّمَاخِ وَفِى لَفْظِ الْكِتَابِ اِشَارَةٌ اِلَى هٰذَا وَعَلٰى هٰذَا الْاَصْلِ كُلُّ مَايَتَعَلَّقُ بِالنُّطْقِ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَالْاِسْتِثْنَاءِ وَغَيْرِ ذَالِكَ ـ

অনুবাদ : আর উভয়টিকে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা একই রাকআতে সরব ও নীরব [দু]ইভাবে কিরাআত পাঠ করা মানায় না। কাজেই নফল তথা ফাতিহার মধ্যে পরিবর্তন আনা এর থেকে উত্তম। [অ]নুচ্চৈঃস্বরে পাঠ হলো যেন নিজে শুনতে পায়। আর উচ্চৈঃস্বরের পাঠ হলো অপরে শুনতে পায়। এ হলো ফকীহ [আ]বূ জাফর হিন্দওয়ানীর মত। কেননা আওয়াজ ব্যতীত শুধু জিহবা সঞ্চালনকে কিরাআত বলা হয় না। ইমাম কারখী [(]র.)-এর মতে উচ্চৈঃস্বরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো নিজেকে শুনানো আর অনুচ্চৈঃস্বরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো [হ]রফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ। কেননা কিরাআত বা পাঠ মুখের কাজ, কানের কাজ নয়। কুদূরী গ্রন্থের শব্দে এর প্রতি [ই]ঙ্গিত রয়েছে– (কেননা ইমাম কুদূরী جهر-এর ব্যাখ্যা করেছেন يُسْمِعَ نَفْسَهُ 'নিজেকে শুনাবে' দ্বারা। সুতরাং [অ]নুচ্চৈঃস্বরীয় পাঠের অর্থ হবে নিঃশব্দ উচ্চারণ।) তালাক প্রদান, আযাদ করা, استثناء তথা ব্যতিক্রম যোগ করা [ই]ত্যাদি শব্দ উচ্চারণমূলক যাবতীয় মাসআলার মধ্যে মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো উক্ত নীতির পার্থক্যের উপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যখন শেষ দুই রাকআতে সূরার কাজা করবে তখন সূরায়ে ফাতিহা এবং অন্য কোনো সূরা উভয়টি [উ]চ্চৈঃস্বরে পড়বে। এটাই বিশুদ্ধ মত। ইবনে সামা'আহ ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণনা করেন [যে], শুধু সূরা উচ্চৈঃস্বরে পড়বে। হিশাম (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন আদৌ উচ্চৈঃস্বরে পড়বে না। সূরায়ে [ফা]তিহাও না বা অন্য কোনো সূরাও না। হিশামের রিওয়ায়াতের কারণ হলো, জোরে এবং আস্তে উভয়টিকে এক রাকআতে একত্রিত করা মানায় না। আর সূরাকে পরিবর্তন করা অর্থাৎ জোরের স্থলে সূরাকে আস্তে পড়া উত্তম। কেননা ফাতিহা তার [স্থা]নেও আছে এবং সূরার আগেও আছে। এ জন্য ফাতিহা হলো اصل আর সূরা হলো তার তাবে'। আর শেষ দুই রাকআতে [ফা]তিহার হক হলো আস্তে পড়া। তাই তার তাবে' হয়ে সূরাকেও ইখফা করা হবে। ইবনে সামা'আর রিওয়ায়াতের কারণ [হ]লো, শেষ দুই রাকআতে ফাতিহা পড়া হলো আদা (ادا), আর সূরা পড়া হলো কাজা। আর আদা তার মহল অনুযায়ী হয়ে [থা]কে, আর কাযা بِحَسْبِ الْفَوَائِتْ অর্থাৎ, ফায়িতা অনুযায়ী হয়। যেহেতু সূরা জেহেরের সাথে ফউত হয়েছে তাই তার [কা]যাও জেহেরের সাথে হবে। আর ফাতিহা যেহেতু তার মহলেই রয়েছে এ জন্য ফাতিহার মধ্যে তার সিফতের رعايت করা হবে। আর শেষ দুই রাকাআতে ফাতিহার সিফত হলো নীরবে পড়া। এ জন্য ফাতিহাকে নীরবে পড়া হবে। কিন্তু এ অবস্থায় [তো] একই রাকআতে জোরে ও আস্তে দুই প্রক্রিয়া একত্রিত হওয়া লাযিম আসে। তাই এর জবাব হলো, কাজা তার মাকামের সাথে সম্পৃক্ত হয়। সূরা যদিও শেষ দুই রাকআতে পড়া হয়েছে কিন্তু তার হিসাব হবে প্রথম দুই রাকআতে। এই হিসাবে একই রাকআতে জোরে ও আস্তে একত্রিত হওয়া লাযিম আসে না। কাউলে সহীহ-এর দলিল হলো, একই রাকআতে সরবে ও নীরবে

পড়া শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে মানায় না। এখন দুটোই সুরত এক. উভয়টাই নীরবে পড়বে। যেমন– ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে হিশাম রিওয়ায়াতে করেছেন দুই. উভয়টি উচ্চৈঃস্বরে পড়বে। এখন প্রথম সুরতে اقوى -কে ادنى -এর তাবে করা লাযিম আসে, যা কোনো ভাবেই মুনাসিব নয়। কেননা উচ্চৈঃস্বরে সূরা পড়া ওয়াজিব ছিল। আর শেষ দুই রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা চুপে চুপে পড়া সুন্নত, যা নফলের পর্যায়। এখন ফাতিহা যা সুন্নত তার সিফত অর্থাৎ চুপে চুপে পড়া হিসাবে সূরা যা ওয়াজিব তার সিফত অর্থাৎ জেহেরকে পরিবর্তন করা মানে اقوى-কে ادنى-এর তাবে' বানানো, যা কিছুতেই সমীচীন নয়। এজন্য এ সুরত জায়েজ হবে না। এখন দ্বিতীয় সুরত অর্থাৎ উভয়টিকে জোরে পড়ার এর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এই সুরতে ওয়াজিব (সূরা)-এর সিফত (জেহের)-এর কারণে নফল (ফাতিহা)-এর সিফত (ইখ্ফা)-কে পরিবর্তন করতে হবে। আর এটা উত্তম। কেননা এ সুরতে اقوى ادنى -এর তাবে' হবে।

ثُمَّ الْمُخَافَتَةُ اَنْ يُسْمِعَ الخ উপরোক্ত ইবারতে জেহের ও ইখ্ফা -এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ইনায়া গ্রন্থকারের বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত ইবারতের সারসংক্ষেপ হলো হলো, কালিমার আজ্যা (اجزاء) যা মুখে উচ্চারিত হয় তা দুই প্রকার। এক. কালাম দুই. কিরাআত। কেননা এর দ্বারা মুখাতাবকে নিসবতের ফায়িদা পৌঁছানো উদ্দেশ্য হবে অথবা হবে না। যদি প্রথমটি হয় তবে কালাম। আর না হলে কিরাআত। অতঃপর প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকার। এক. জেহের দুই মুখাফাতাত। কিন্তু উভয়টির মাঝের حد فاصل -এর ক্ষেত্রে আমাদের ওলামাদের ইখতিলাফ রয়েছে। ফকীহ আবূ জাফর হিন্দওয়ানী (র.) বলেন, ইখ্ফা হলো নিজেকে শুনিয়ে দেওয়া। যদি এর চেয়েও কম হয় তবে তাকে عمجمه বা دندنه বলা হয়, কালাম বা কিরাআত বলা হয় না। আর জেহের হলো অন্যকে শুনিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ এমন আওয়াজে পড়া যে কাছের লোকটি তা শুনতে পায়। দলিল হলো, আওয়াজ ব্যতীত শুধু জিহবার সঞ্চালনকে কিরাআত বলা হয় না। আভিধানিকভাবেও না এবং পারিভাষায়ও না। ইমাম কারখী (র.) বলেন, জেহের-এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো নিজেকে শুনানো আর ইখ্ফা-এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো হরফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ। কেননা কিরাআত হলো মুখের কাজ, কানের কাজ নয়। ইখ্ফার এ সংজ্ঞার উপর প্রশ্ন হয় যে, কিতাবাতের সাথেও শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ পাওয়া যায়, কিন্তু আওয়াজ না হওয়ার কারণে তাকে কিরাআত বলা হয় না। বুঝা গেল কিরাআতের জন্য শুধু শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণই যথেষ্ট নয়, আওয়াজেরও প্রয়োজন আছে। এর জবাব হলো, মুত্লাকান শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণকে কিরাআত বলা হয় না বরং জবান দ্বারা শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণকে কিরাআত বলা হয়। এ কারণেই ইমাম কারখী (র.) বলেছেন, কিরাআত মুখের কাজ, কানের কাজ নয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম কুদূরীর ইবারতেও ইমাম কারখীর মতের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে فَهُوَ مُخَيَّرٌ اِنْ شَاءَ جَهَرَ وَاَسْمَعَ نَفْسَهُ وَاِنْ شَاءَ خَافَتَ হিদায়া প্রণেতা বলেন, এই ইখ্তিলাফই প্রত্যেক ঐ জিনিসের মধ্যে প্রযোজ্য হবে যার সম্পর্ক কথার সাথে রয়েছে। যেমন, তালাক প্রদান, আজাদ করা এবং ইসতিস্না তথা ব্যতিক্রম যোগ করা ইত্যাদি। যেমন– কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে اَنْتِ طَالِقٌ অথবা গোলামকে انت حر বলল কিন্তু বক্তা নিজে তা শুনেনি। তখন ইমাম কারখীর মতে তালাক ও আজাদ হয়ে যাবে, আর ফকীহ আবূ জাফর হিন্দুওয়ানীর মতে হবে না। এমনিভাবে যদি উভয়টি উচ্চৈঃস্বরে বলে আর ইস্তিসনাকে এত নিচু স্বরে বলে যে নিজেও না শুনে তবে ইমাম কারখীর মতে তালাক ও আজাদ হবে না, তবে ইস্তিস্না গ্রহণযোগ্য হবে। আর আবূ জাফর হিন্দুওয়ানীর মতে উভয়টি তাৎক্ষণিকভাবে পতিত হয়ে যাবে। কিন্তু ইস্তিস্না গ্রহণযোগ্য হবে না। একই ইখতিলাফ জবাই-এর ক্ষেত্রে তাসমিয়া আর সিজ্দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রেও।

وَادْنٰى مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِى الصَّلٰوةِ اٰيَةٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا ثَلٰثُ اٰيَاتٍ قِصَارٍ اَوْ اٰيَةٌ طَوِيْلَةٌ لِاَنَّهُ لَايُسَمّٰى قَارِيًا بِدُوْنِهٖ فَاَشْبَهَ قِرَاءَةَ مَا دُوْنَ الْاٰيَةِ وَلَهٗ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ اِلَّا اَنَّ مَا دُوْنَ الْاٰيَةِ خَارِجٌ وَالْاٰيَةُ لَيْسَتْ فِىْ مَعْنَاهُ وَفِى السَّفَرِ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاَىِّ سُوْرَةٍ شَاءَ لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَرَأَ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فِىْ سَفَرِهٖ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَلِاَنَّ لِلسَّفَرِ اَثَرًا فِىْ اِسْقَاطِ شَطْرِ الصَّلٰوةِ فَلَاَنْ يُؤَثِّرَ فِىْ تَخْفِيْفِ الْقِرَاءَةِ اَوْلٰى وَهٰذَا اِذَا كَانَ عَلٰى عَجَلَةٍ مِنَ السَّيْرِ وَاِنْ كَانَ فِىْ اَمَنَةٍ وَقَرَارٍ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ نَحْوَ سُوْرَةِ الْبُرُوْجِ وَانْشَقَّتْ لِاَنَّهٗ يُمْكِنُهٗ مُرَاعَاةُ السُّنَّةِ مَعَ التَّخْفِيْفِ ـ

অনুবাদ : নামাজে যে পরিমাণ কিরাআত যথেষ্ট হয়, তার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এক আয়াত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ছোট তিন আয়াত অথবা দীর্ঘ এক আয়াত। কেননা এর চেয়ে কম পরিমাণ হলে তাকে কারী বলা হয় না। সুতরাং তা এক আয়াতের কম পাঠ করার সমতুল্য। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ কুরআনের যতটুকু পরিমাণ সহজ হয়, তা তোমরা পড়ো। এখানে (এক আয়াত বা তার অধিকের মাঝে) কোনো পার্থক্য করা হয়নি। তবে এক আয়াতের কম পরিমাণ (সর্বসম্মতিক্রমেই কুরআন রূপে গণ্য হওয়ার হুকুমের) বহির্ভূত। আর পূর্ণ আয়াত আয়াতের অংশ বিশেষের সমার্থক নয়। আর সফরে সূরায়ে ফাতিহার সাথে অন্য যে কোনো সূরা ইচ্ছা হয় পড়বে। কেননা বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ তাঁর সফরে ফজরের নামাজে সূরায়ে ফালাক ও সূরায়ে নাস পাঠ করেছিলেন। তা ছাড়া নামাজের অর্ধেক রহিত করার ক্ষেত্রে সফরের প্রভাব রয়েছে। সুতরাং কিরাআত হ্রাসকরণের ব্যাপারে তার প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন সফরে তাড়াহুড়া থাকে। পক্ষান্তরে যদি (মুসাফির) ব্যক্তি ও শান্তি ও নিরাপদ অবস্থায় থাকে, তাহলে ফজরের নামাজে সূরা বুরূজ ও ইনশাক্কাত পরিমাণ সূরা পাঠ করবে। কেননা এভাবে তাখফীফ সহকারে সুন্নতের উপরও আমল সম্ভব হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামাজের মধ্যে কিরাআত ইকামত অবস্থায় হবে অথবা সফর অবস্থায়; যদি ইকামত অবস্থায় হয় তবে তা তিন প্রকার। এক. مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ অর্থাৎ এমন পরিমাণ যে পরিমাণের সাথে নামাজ জায়েজ হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। যা ছাড়া নামাজ জায়েজ হবে না। **দুই.** যে পরিমাণের সাথে حد كراهت থেকে বেরিয়ে যায়। তিন. যে পরিমাণের সাথে حد استحباب-এর মধ্যে দাখিল হয়ে যায়। আর যদি সফর অবস্থায় হয়, তবে তার আবার দুই সুরত। নামাজি ব্যক্তি তাড়াহুড়োর মধ্যে হবে অথবা শান্তির অবস্থায় থাকবে। উপরোক্ত ইবারতের মধ্যে مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ-এর পরিমাণের বয়ান করা হয়েছে। চাই ইকামত বা সফর অবস্থায় হোক। গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কিরাআতের সর্বনিম্ন পরিমাণ যার দ্বারা নামাজ জায়েজ হবে তা হলো এক আয়াত। এখন আয়াতটি যদি দুই বা ততোধিক শব্দ বিশিষ্ট হয়, তবে সকল মাশায়িখের মতেই নামাজ জায়েজ হয়ে যাবে। যেমন– আল্লাহর বাণী– فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ আর যদি এক শব্দ বিশিষ্ট আয়াত হয় যেমন مُدْهَامَّتَانِ অথবা এক হরফ বিশিষ্ট হয় যেমন– ص . ن . ق তবে এতে মাশায়িখদের ইখতিলাফ রয়েছে। কারো মতে যথেষ্ট

হয়ে যাবে, কারো মতে যথেষ্ট হবে না। সাহেবাইন (র.)-এর মতে مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ -এর পরিমাণ হলো ছোট তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াত পরিমাণ হওয়া। যেমন, আয়াতুল কুরসী। তাঁদের দলিল হলো হলো, ছোট তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াতের কম পড়নে ওয়ালা ব্যক্তিকে পরিভাষায় কারী বলা হয় না। সুতরাং তা এক আয়াতের কম পাঠ করার সমতুল্য হয়ে গেল। আর এক আয়াতের কম পাঠ করা দ্বারা নামাজ জায়েজ হয় না। তাই ছোট তিন আয়াত বা বড় এক আয়াতের কম পাঠ করার দ্বারা নামাজ যথেষ্ট হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ কুরআনের যতটুকু পরিমাণ সহজ হয়, তা তোমরা পড়। আয়াতটি মুত্লাক, এখানে এক আয়াত বা তার অধিকের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। তাই যেমনিভাবে مَا فَوْقَ الْاٰيَةِ নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য যথেষ্ট, এমনিভাবে এক আয়াতও যথেষ্ট হবে। কারণ একটি আয়াত হাকীকাতান ও হুকমান উভয়ভাবেই কুরআনের অন্তর্ভুক্ত। হাকীকাতান কুরআন হওয়া তো যাহির। হুক্মান কুরআন এভাবে যে, এক আয়াতের কিরাআত হায়িযা এবং জুনূবীর উপর হারাম। সুতরাং اٰيَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ-এর ইতলাকের মধ্যে দাখিল হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ আয়াতটি হলো মুত্লাক। এর মধ্যে তাফসীল করা হয়নি। তাহলে যেমনিভাবে এক আয়াতের কমও নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য যথেষ্ট তেমনিভাবে এক আয়াতের কমও নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। কেননা ইত্লাক উভয়টাকেই শামিল করে। অথচ مَادُوْنَ الْاٰيَةِ দ্বারা নামাজ জায়েজ হয় না, তাহলে তো এক আয়াত দ্বারাও নামাজ জায়েজ না হওয়া উচিত। অথচ ইমাম সাহেব জায়েজ হওয়ার কথা বলেন। এর জবাব হলো, مَادُوْنَ الْاٰيَةِ সর্বসম্মতিক্রমে مِنَ الْقُرْاٰنِ-এর ইত্লাকের মধ্যে দাখিল নয়। কেননা মুত্লাকান যখন বলা হয় তখন তার দ্বারা فرد كامل মুরাদ হয়। আর কুরআনের فرد كامل হলো যা হাকীকাতান ও হুকমান উভয়ভাবেই কুরআন। আর مَادُوْنَ الْاٰيَةِ- مَا دُوْنَ الْاٰيَةِ যদিও হাকীকাতান কুরআন কিন্তু হুকমান কুরআন নয়। এ কারণে مَادُوْنَ الْاٰيَةِ-এর কিরাআত জুনূবী ও হায়িযার জন্য জায়েজ। সুতরাং مَادُوْنَ الْاٰيَةِ সর্বসম্মতিক্রমে فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ-এর ইত্লাকের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এখন যদি বলে যে, যখন مَادُوْنَ الْاٰيَةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ-এর ইত্লাকের অন্তর্ভুক্ত নয়, তখনতো এক পূর্ণ আয়াতকেও তার সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া যায়? এর জবাবে হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এক পূর্ণ আয়াত مَا دُوْنَ الْاٰيَةِ-এর সমার্থক নয়। এ কারণে এক পূর্ণ আয়াত আয়াতের অংশ বিশেষের সাথে সংযুক্ত হবে না।

وَفِى السَّفَرِ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الخ : উপরোক্ত ইবারতে গ্রন্থকার সফরের অবস্থায় নামাজের কিরাআত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাই গ্রন্থকার বলেন, সফরের অবস্থায় মাসনূন কিরাআত হলো, সূরায়ে ফাতিহা এবং যে কোনো সূরা ইচ্ছা হয় পড়বে। যদি ছোট ছোট সূরা পড়া হয় তবুও সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। কেননা বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর অবস্থায় ফজরের নামাজে قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ পড়েছেন। এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসায়ী হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের শেষে রয়েছে فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ صَلّٰى بِهِمَا صَلٰوةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সকালের নামাজের জন্য অবতরণ করলেন তখন তিনি লোকদেরকে ঐ দুই সূরা দ্বারা নামাজ পড়িয়েছেন। আকলী দলিল হলো, নামাজের অর্ধেক রহিত করার ক্ষেত্রে সফরের বিরাট প্রভাব রয়েছে। সুতরাং যখন সফরের নামাজ অর্ধেক করার ক্ষেত্রে প্রভাব রয়েছে তখন কিরাআত তাখফীফ ক্ষেত্রেও এর অবশ্যই প্রভাব থাকবে। মোট কথা, যখন সফরের কারণে মূল নামাজে তাখফীফ তথা কম হয়ে গেছে তখন তার وصف তথা কিরাআতের মধ্যে অবশ্যই তাখফীফ হবে। সাহেবে হিদায়া বলেন, এ পরিমাণ তাখফীফ তখন, যখন এ ব্যক্তি তাড়াহুড়ার অবস্থায় থাকে। আর যদি নিরাপদ ও শান্তির পরিবেশে থাকে যেমন– সে কারো ঘরে অবস্থান করে, মনে মনে ইরাদা করছে যে, এখানে কিছুক্ষণ থেকে ইত্মিনানের সাথে রওয়ানা হবে তখন এ অবস্থায় ফজরের নামাজে وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ এবং اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ পড়বে। কেননা এ সুরতে তাখফীফও হবে এবং সুন্নতও আদায় হবে।

وَيَقْرَأُ فِي الْحَضَرِ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِأَرْبَعِيْنَ آيَةً أَوْ خَمْسِيْنَ آيَةً سِوٰى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُرْوٰى مِنْ أَرْبَعِيْنَ إِلٰى سِتِّيْنَ وَمِنْ سِتِّيْنَ إِلٰى مِائَةٍ وَّبِكُلِّ ذٰلِكَ وَرَدَ الْأَثَرُ وَجْهُ التَّوْفِيْقِ أَنَّهُ يَقْرَأُ بِالرَّاغِبِيْنَ مِائَةً وَبِالْكُسَالٰى أَرْبَعِيْنَ وَبِالْأَوْسَاطِ مَا بَيْنَ خَمْسِيْنَ إِلٰى سِتِّيْنَ وَقِيْلَ يَنْظُرُ إِلٰى طُوْلِ اللَّيَالِيْ وَقِصَرِهَا وَإِلٰى كَثْرَةِ الْإِشْغَالِ وَقِلَّتِهَا قَالَ وَفِي الظُّهْرِ مِثْلُ ذٰلِكَ لِإِسْتِوَائِهِمَا فِيْ سَعَةِ الْوَقْتِ وَقَالَ فِي الْأَصْلِ أَوْ دُوْنَهُ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْإِشْتِغَالِ فَيَنْقُصُ عَنْهُ تَحَرُّزًا عَنِ الْمَلَالِ وَالْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ سَوَاءٌ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْمَغْرِبِ دُوْنَ ذٰلِكَ يَقْرَأُ فِيْهَا بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَالْأَصْلُ فِيْهِ كِتَابُ عُمَرَ (رض) إِلٰى أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ (رض) أَنِ اقْرَأْ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَلِأَنَّ مَبْنَى الْمَغْرِبِ عَلَى الْعَجَلَةِ وَالتَّخْفِيْفُ أَلْيَقُ بِهَا وَالْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ يُسْتَحَبُّ فِيْهِمَا التَّأْخِيْرُ وَقَدْ يَقَعَانِ بِالتَّطْوِيْلِ فِيْ وَقْتٍ غَيْرِ مُسْتَحَبٍّ فَيُوَقَّتُ فِيْهِمَا بِالْأَوْسَاطِ وَيُطِيْلُ الرَّكْعَةَ الْأُوْلٰى مِنَ الْفَجْرِ عَلَى الثَّانِيَةِ إِعَانَةً لِلنَّاسِ عَلٰى إِدْرَاكِ الْجَمَاعَاتِ ـ

অনুবাদ : মুকীম অবস্থায় ফজরের উভয় রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা ছাড়া চল্লিশ বা পঞ্চাশ আয়াত পড়বে। চল্লিশ থেকে ষাট এবং ষাট থেকে একশ আয়াত পাঠ করার কথাও বর্ণিত রয়েছে। আর এ সব সংখ্যার সমর্থনে হাদীস এসেছে। বর্ণনাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান এভাবে হতে পারে যে, (কিরাআত শ্রবণে) আগ্রহীদের ক্ষেত্রে একশ আয়াত এবং অলসদের ক্ষেত্রে চল্লিশ আয়াত এবং মধ্যমদের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ থেকে ষাট আয়াত পাঠ করবে। কারো কারো মতে রাত ছোট বড় হওয়া এবং কর্মব্যস্ততা কমবেশি হওয়ার অবস্থা বিবেচনা করা হবে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জোহরের নামাজেও অনুরূপ পরিমাণ পাঠ করবে। কেননা সময়ের প্রশস্ততার দিক দিয়ে উভয় নামাজ সমান। মাবসূত গ্রন্থে বলা হয়েছে, কিংবা তার চেয়ে কম। কেননা তা কর্মব্যস্ততার সময়। সতুরাং অনীহা এড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে ফজর থেকে কমানো হবে। আসর ও ইশা একই রকম। দু'টোতেই আওসাতে মুফাস্সাল পাঠ করবে। আর মাগরিবে তার চেয়ে কম অর্থাৎ তাতে কিসারে মুফাস্সাল পাঠ করবে। এ বিষয়ে মূল দলিল হলো আবূ মূসা আশআরী (রা.)-এর নামে প্রেরিত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর এই মর্মে লিখিত পত্র যে, ফজরে ও জোহরে তিওয়ালে মুফাস্সাল পড়ো আর আসর ও ইশায় আওসাতে মুফাস্সাল পড়ো এবং মাগরিবে কিসারে মুফাস্সাল পড়ো। তা ছাড়া মাগরিবের ভিত্তিই হলো দ্রুততার উপর। সুতরাং হালকা কিরাআতই এর জন্য অধিকতর উপযোগী। আর আসর ও ইশায় মোস্তাহাব হলো বিলম্বে পড়া। আর কিরাআত দীর্ঘ করলে দু'টি নামাজই মোস্তাহাব ওয়াক্ত অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। সুতরাং এ দুই নামাজে আওসাতে মুফাস্সাল নির্ধারণ করা হয়। ফজরের প্রথম রাকআতকে দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায় দীর্ঘ করবে। যাতে লোকদের জামাআত ধরার ব্যাপারে সহায়ক হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুকীম অবস্থায় ফজরের উভয় রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা ব্যতীত চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ আয়াত পড়বে। অর্থাৎ প্রত্যেক রাকআতে বিশ অথবা পঁচিশ আয়াত পড়বে। অন্য এক রিওয়ায়াতে চল্লিশ থেকে ষাট আয়াত পর্যন্ত এবং অন্য আরেক রিওয়ায়াতে ষাট থেকে একশ আয়াতের কথাও বর্ণিত হয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ সব সংখ্যার সমর্থনে হাদীস রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِى الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ اَتٰى, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার দিন ফজরের নামাজে সূরায়ে الٓمّٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةَ এবং هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ পড়েছেন। প্রথম সূরায় ত্রিশ দ্বিতীয় সূরায় একত্রিশ আয়াত রয়েছে। সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির ইবনে সামুরার হাদীস كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ, আর আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ بِقٓ। يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ مَابَيْنَ السِّتِّيْنَ اِلَى مِائَةِ اٰيَةٍ ﷺ হিদায় গ্রন্থকার বলেন, এ সকল রিওয়ায়াতের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান এভাবে হতে পারে যে, মুক্তাদী যদি কিরাআত শুনতে আগ্রহী হয় তবে একশ আয়াত পড়বে। আর যদি অলস হয় তবে চল্লিশ আয়াত পড়বে। আর যদি মধ্যম ধরনের লোক হয় তবে পঞ্চাশ থেকে ষাট আয়াত পড়বে। কেউ কেউ বলেন, রাতের ছোট বড় হওয়ার বিবেচনা করা হবে। অর্থাৎ ঠাণ্ডার রাতে লম্বা কিরাআত পড়বে, আর গরমের রাতে ছোট কিরাআত পড়বে। আর ইমামের উচিত তার মুক্তাদীদের কর্মব্যস্ততা কমবেশি হওয়ার দিকেও লক্ষ্য রাখবে। অর্থাৎ মুক্তাদীর যদি বেশি কর্মব্যস্ততা থাকে তবে কিরাআত ছোট পড়বে আর যদি ঝামেলা মুক্ত হয় তবে দীর্ঘ কিরাআত পড়বে।

قَالَ وَفِى الظُّهْرِ مِثْلُ الخ জোহরের নামাজেও অনুরূপ পরিমাণ পড়বে, যেমনটি ফজরের নামাজে পড়া হয়। কেননা সময়ের প্রশস্ততার দিক থেকে উভয় নামাজ সমান। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহরের নামাজে الم السجدة পড়তেন। হযরত আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহরের নামাজে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত আদায় করেছেন। আমরা মনে করেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ الم تنزيل السجدة পড়েছেন। আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের প্রথম রাকআতে الم تنزيل السجده আর দ্বিতীয় রাকআতে هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ পড়তেন। বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহরের নামাজে তাই পড়তেন যা ফজরের দুই রাকআতে পড়তেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন او دونه। অর্থাৎ জোহরের নামাজে ফজরের তুলনায় কম পরিমাণ তিলাওয়াত করবে। কেননা জোহরের সময় হলো কর্মব্যস্ততার সময়। এ জন্য কিরাআত কম পরিমাণে পড়বে। তাহলে মানুষের মাঝে অনীহা আসবে না। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلٰثِيْنَ اٰيَةً وَهُوَ نَحْوُ سُوْرَةِ الْمُلْكِ রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহরের নামাজে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ কিরাআত পড়তেন। আর তাও সূরায়ে মুলক পরিমাণ ছিল।

وَالْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ سَوَاءٌ يَقْرَأُ الخ : কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, সময়ের প্রশস্ততার দিক থেকে আসর ও ইশা একই সমান। এ জন্য এ দুই নামাজে আওসাতে মুফাস্‌সালের সাথে কিরাআত পড়বে। দলিল হলো হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস–

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের প্রথম দুই রাকআতে وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ এবং وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ পড়তেন। দ্বিতীয় দলিল হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

إِنَّ قَوْمَهُ شَكَوْا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَطْوِيْلَ قِرَاءَتِهِ فِى الْعِشَاءِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَفَتَّانٌ اَنْتَ يَامُعَاذُ اَيْنَ اَنْتَ مِنْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)-এর কাউমের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করল যে, মুয়ায ইশার নামাজে খুব দীর্ঘ কিরাআত পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়াযকে বললেন, হে মুয়ায! তুমি কি লোকদেরকে ফিতনায় নিক্ষেপ করতে চাও? কোথায় তুমি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى ও وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا থেকে? অর্থাৎ এ দু'টো সূরা কেন পড়ো না? মোট কথা, উপরোক্ত রিওয়ায়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা গেল আসর ও ইশায় আওসাতে মুফাস্‌সালের সাথে কিরাআত পড়া ভালো ও মোস্তাহাব। আর মাগরিবের নামাজে কিসারে মুফাস্‌সালের সাথে কিরাআত পড়বে। দলিল হলো নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতে اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَرَأَ فِىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের নামাজে মু'আওওয়াতাইন পড়তেন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সকল নামাজের মোস্তাহাব কিরাআতের ক্ষেত্রে দলিল হলো– ঐ ফরমান যা খলীফায়ে ছানী আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদিনা ওমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.) আবূ মূসা আশ্'আরীর নামে প্রেরণ করেছিলেন। আর সে ফরমানটি হলো নিম্নরূপ

اَنِ اقْرَأْ فِى الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَفِى الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ بِاَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ وَفِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ -

অর্থাৎ জোহর ও ফজরে তিওয়ালে মোফাস্‌সাল থেকে পড়বে। আসর ও ইশায় আওসাতে মুফাস্‌সাল এবং মাগরিবের নামাজে কিসারে মুফাস্‌সাল থেকে পড়বে।

আকলী দলিল হলো, মাগরিবের নামাজের ভিত্তিই হলো দ্রুততার উপর। আর দ্রুততার জন্য মুনাসিব হলো হালকা কিরাআত। আসর ও ইশার নামাজ বিলম্বে পড়া মোস্তাহাব। কিরাআত যদি দীর্ঘ করে আরম্ভ করা হয় তবে এ দুই নামাজ মোস্তাহাব ওয়াক্ত অতিক্রম করে অন্য ওয়াক্তে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। এ জন্য এ দুই নামাজে আওসাতে মুফাস্‌সালকে নির্ধারণ করা হয়েছে।

<u>ফায়েদা ঃ</u> তিওয়ালে মুফাস্‌সাল হলো সূরায়ে হুজুরাত হতে وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ পর্যন্ত, আর আওসাতে মুফাস্‌সাল হলো সূরায়ে তারিক থেকে لَمْ يَكُنْ সূরা পর্যন্ত, আর কিসারে মুফাস্‌সাল হলো সূরায়ে যিলযাল থেকে শেষ পর্যন্ত। কোনো কোনো ফুকাহাদের রায় হলো সূরায়ে হুজুরাত থেকে সূরায়ে আবাসা পর্যন্ত তিওয়ালে মুফাস্‌সাল। আর اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ থেকে وَالضُّحٰى পর্যন্ত আওসাতে মুফাস্‌সাল। আর وَالضُّحٰى থেকে শেষ পর্যন্ত কিসারে মুফাস্‌সাল। وَيُطِيْلُ الرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى বাক্যটি দ্বারা একটি মাসআলা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। মাসআলাটি হলো, ফজরের প্রথম রাকআতে দীর্ঘ কিরাআত পড়বে আর দ্বিতীয় রাকআত প্রথম রাকআতের তুলনায় ছোট কিরাআত পড়বে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি এ তরীকা চলে এসেছে। আর দ্বিতীয় কথা হলো, এটি লোকদের জামাআত ধরার ব্যাপারে সহায়ক হবে।

قَالَ وَ رَكْعَتَا الظُّهْرِ سَوَاءٌ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ يُطِيْلَ الرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى عَلَى الثَّانِيَةِ فِى الصَّلٰوَاتِ كُلِّهَا لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُطِيْلُ الرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى عَلٰى غَيْرِهَا فِى الصَّلٰوَاتِ كُلِّهَا وَلَهُمَا اَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ اِسْتَوَيَا فِىْ اِسْتِحْقَاقِ الْقِرَاءَةِ فَيَسْتَوِيَانِ فِى الْمِقْدَارِ بِخِلَافِ الْفَجْرِ لِاَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ وَالْحَدِيْثُ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْاِطَالَةِ مِنْ حَيْثُ الثَّنَاءِ وَالتَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ بِمَا دُوْنَ ثَلٰثِ اٰيَاتٍ لِعَدَمِ اِمْكَانِ الْاِحْتِرَازِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জোহরের উভয় রাকআত সমান। তা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সব নামাজেই প্রথম রাকআতকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করা আমার কাছে পছন্দনীয়। কেননা বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ সব নামাজেই প্রথম রাকআতকে অন্য রাকআতের তুলনায় দীর্ঘ করতেন। শায়খাইনের (র.) দলিল হলো, উভয় রাকআতই কিরআতের সমান হকদার। সুতরাং পরিমাণের ক্ষেত্রেও উভয় রাকআত সমান হতে হবে। তবে ফজরের নামাজ এর বিপরীত। কেননা তা ঘুম ও গাফলতের সময়। আর উদ্ধৃত হাদীসটি ছানা, আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার প্রেক্ষিতে দীর্ঘ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। আর কমবেশির ক্ষেত্রে তিন আয়াতের কম ধর্তব্য নয়। কেননা অনায়াসে এতটুকু কমবেশি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরের মাসআলায় বর্ণিত হয়েছে যে, ফজরের নামাজে সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম রাকআতের কিরাআত দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায় দীর্ঘ হবে। কিন্তু ফজর ব্যতীত অন্যান্য নামাজের ক্ষেত্রে শায়খাইন-এর মাযহাব হলো হলো, উভয় রাকআত সমান হবে। প্রথম রাকআতকে দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায় দীর্ঘ করবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, প্রত্যেক নামাজের প্রথম রাকআতকে দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায় দীর্ঘ করা মোস্তাহাব। তাঁর দলিল হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) বর্ণিত হাদীস اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُطِيْلُ الرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى عَلٰى غَيْرِهَا فِى الصَّلٰوَاتِ كُلِّهَا রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাজে প্রথম রাকআতকে অন্যান্য রাকআতের তুলনায় দীর্ঘ করতেন। শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো হলো, উভয় রাকআতই কিরাআতের সমান হকদার। কেননা উভয় রাকআতে কিরাআত হলো রোকন। সুতরাং যখন হকের ক্ষেত্রে উভয় রাকআত সমান, তখন পরিমাণের ক্ষেত্রেও উভয় রাকআত সমান হবে। তবে ফজরের নামাজ এর বিপরীত। কেননা ফজরের নামাজ হলো ঘুম ও গাফলতের সময়। এ জন্য পুরো নামাজে লোকদেরকে শরিক করার জন্য প্রথম রাকআতকে দীর্ঘ করা হবে। আবূ কাতাদার হাদীসের জবাব হলো হলো, প্রথম রাকআতকে এ কারণে দীর্ঘ করা হয়েছে যে, তাতে ছানা, আউযুবিল্লাহ এবং বিস্মিল্লাহ পড়া হয়, যা অন্যান্য রাকআতে পড়া হয় না। আর কিরাআতের পরিমাণের হকের ক্ষেত্রে উভয় রাকআত সমান। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কমবেশির ক্ষেত্রে তিন আয়াতের কম ধর্তব্য নয়। অর্থাৎ যদি এক রাকআতে তিন আয়াতের বেশি পড়া হয় দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায়, তবে এ বেশি ধর্তব্য হবে। আর যদি এক বা দুই আয়াত হয় তখন তা কোনো ধর্তব্য হবে না। বরং তা সাকিত হয়ে যাবে। কেননা এতটুকু থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আর শরিয়তে ইসলামি কষ্টকে দূর করেছে। তাই এ কমবেশির কষ্টকেও দূর করে দিয়েছে। সহীহ রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই মাগরিবের নামাজে قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ আর قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ পড়েছেন। অথচ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ-এর মধ্যে পাঁচ আয়াত আর اَلنَّاسِ-এর মধ্যে ছয় আয়াত রয়েছে। অর্থাৎ সূরায়ে নাস-এর মধ্যে সূরায়ে ফালাকের তুলনায় এক আয়াত বেশি।

وَلَيْسَ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ قِرَاءَةُ سُوْرَةٍ بِعَيْنِهَا لَا يَجُوْزُ غَيْرُهَا لِاِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا وَيُكْرَهُ اَنْ يُوَقِّتَ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ لِمَا فِيْهِ مِنْ هَجْرِ الْبَاقِيْ وَاِيْهَامَ التَّفْضِيْلِ وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ خَلْفَ الْاِمَامِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيْ (رحـ) فِي الْفَاتِحَةِ لَهُ اَنَّ الْقِرَاءَةَ رُكْنٌ مِنَ الْاَرْكَانِ فَيَشْتَرِكَانِ فِيْهِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ وَعَلَيْهِ اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَهُوَ رُكْنٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا لٰكِنَّ حَظَّ الْمُقْتَدِيْ الْاِنْصَاتُ وَالْاِسْتِمَاعُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا وَيُسْتَحْسَنُ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِحْتِيَاطِ فِيْمَا يُرْوٰى عَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَيُكْرَهُ عِنْدَهُمَا لِمَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ ـ

অনুবাদ : আর কোনো নামাজের সাথে এমন কোনো সূরা নির্দিষ্ট নেই যে, এটি ছাড়া নামাজ জায়েজ হবে না। কেননা আমরা পূর্বে যে আয়াত (فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ) পেশ করেছি তা নিঃশর্ত; বরং কোনো নামাজের জন্য কুরআনের কোনো অংশকে নির্ধারণ করে নেওয়া মাকরূহ। কেননা তাতে অবশিষ্ট কুরআনকে বর্জন করা হয় এবং বিশেষ সূরার ফজিলতের ধারণা জন্মে। মুক্তাদী ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করবে না। সূরায়ে ফাতিহার ব্যাপারে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। তাঁর দলিল হলো, কিরাআত হলো নামাজের অন্যান্য রোকনের মতো একটি রোকন। সুতরাং তা পালনে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে শরিক থাকবে না। আমাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ যে ব্যক্তির ইমাম রয়েছে, সে ক্ষেত্রে ইমামের কিরাআত তার কিরাআত রূপে গণ্য এবং এর উপরই সাহাবীদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর কিরাআত হলো উভয়ের মাঝে শরীকানামূলক রোকন। তবে মুক্তাদীর অংশ হলো নীরব থাকা ও মনোযোগসহ শ্রবণ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا (ইমাম) যখন কুরআন পাঠ করেন তখন তোমরা খামুশ থাকবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সতর্কতা অবলম্বন হিসাবে পাঠ করাই উত্তম। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা মাকরূহ। কেননা এ সম্পর্কে হুশিয়ারী রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কোনো নামাজে কোনো সূরাকে এমনভাবে নির্দিষ্ট করা যে, এ সূরা ছাড়া নামাজই জায়েজ হবে না, এমনটি করা জায়েজ নেই। দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ আয়াতটি মুত্লাক। আর মুত্লাকের চাহিদা হলো কোনো সূরা নির্দিষ্ট না করা। তা ছাড়া কোনো নামাজের জন্য কোনো সূরা বা আয়াতকে নির্ধারিত করা মাকরূহ। কারণ একেতো এতে অবশিষ্ট কুরআনকে বর্জন করা হয়। দ্বিতীয়ত এতে বিশেষ কোনো সূরার ফজিলতের ধারণা জন্মে যায়। অথচ ফজিলতের দিক থেকে পুরো কুরআন সমান।

وَقَوْلُهُ لَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ خَلْفَ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) আহনাফের মাযহাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মুক্তাদী ইমামের পিছনে আদৌ কিরাআত পড়বে না। ফাতিহাও না বা অন্য কোনো সূরাও না। নামাজ জেহ্‌রী হোক বা সিররী হোক। সূরায়ে ফাতিহার ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দ্বিমত রয়েছে অর্থাৎ তার মতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরায়ে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর قول قديم তো হলো মুক্তাদীর উপর সিররী নামাজ এবং যে সকল রাকআতে জেহেরী কিরাআত নেই সেগুলোতে সূরায়ে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। এটাই ইমাম মালিক (র.)-এরও মত। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর قول جديد এবং সহীহ মাযহাব হলো, মুক্তাদীর উপর প্রত্যেক নামাজে সূরায়ে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব, নামাজ জেহ্‌রী হোক বা সিররী হোক। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর আকলী দলিল হলো, কিরাআত একটি রোকন আর সমস্ত রোকনের মধ্যে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে শরিক। যেমন– কিয়াম, রুকু, সিজ্দা ইত্যাদিতে উভয়ে শরিক। তাহলে কিরাআতের মধ্যেও উভয়ে শরিক

থাকবে। আর নকলী দলিল হলো হযরত আবূ উবাদা (রা.)-এর হাদীস। আবূ উবাদা বলেন, صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّىْ لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُوْنَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا اَجَلْ قَالَ لَاتَفْعَلُوْا ذٰلِكَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَاصَلٰوةَ لِمَنْ يَقْرَأْهَا রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সকালের নামাজ পড়ালেন। কিন্তু কিরাআত পড়তে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। তাই সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে দেখছি যে, তোমরা ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ো? আমরা বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, এমনটি করো না তবে ফাতিহা। কেননা যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতিহা পড়বে না তার নামাজই হবে না। আমাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ দলিল হলো এভাবে যে, ইমামের কিরাআত হুকমান মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে। যেহেতু মুক্তাদীর পক্ষ থেকে হুকমান কিরাআত পাওয়া গেছে তাই মুক্তাদী আর দ্বিতীয়বার কিরাআত পড়বে না। না হয় মুক্তাদীর দুইবার কিরাআত পড়া লাযিম আসে। অথচ নামাজে দুই বার কিরাআত পড়ার কোনো বিধান প্রবর্তিত হয়নি। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এর উপর সাহাবায়ে কিরামেরও ইজমা রয়েছে যে, মুক্তাদী ইমামের পিছনে কেরাআত পড়বে না। তবে এখানে প্রশ্ন জাগে যে, কোনো কোনো সাহাবায়ে কেরাম قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ-এর উজূবের প্রবক্তা। যেমন– হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.)। এর জবাব হলো, এ স্থানে অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামের ইজমা উদ্দেশ্য। যেমন প্রায় আশিজন কেবারে সাহাবা قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ-কে অস্বীকার করেছেন। ইমাম শা'বী (র.) বলেন, আমি সত্তরজন বদরী সাহাবীকে قِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ থেকে বারণ করতে পেরেছি। তবে সত্তর অথবা আশির সংখ্যা অধিকাংশ সাহাবীর সংখ্যা হয় না, তাই একে অধিকাংশ সাহাবীর ইজমা বলা ঠিক হবে না। এ কারণে কোনো কোনো হাযারাত এ জবাব দিয়েছেন যে, মুজতাহিদীন সাহাবা ও কিবারে সাহাবার ইজমা মুরাদ। মুজতাহিদীন সাহাবা হলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.), ওসমান ইবনে আফফান (রা.), আলী ইবনে আবী তালিব (রা.), আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), সা'আদ ইব্নে আবী ওয়াক্কাস (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)। আর এটাও হতে পারে, যারা قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ-এর প্রবক্তা, তারা তাদের বক্তব্য থেকে রুজু করেছেন, এ হিসাবে ইজমায়ে তাম হয়ে গেল। অথবা এটাও হতে পারে যে, যখন উপরোক্ত দশজন সাহাবী থেকে قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ-এর নিষেধ সাবিত, কিন্তু এর বিপরীত কোনো সাহাবার বক্তব্য নেই। অথবা ঐ সময় সাহাবায়ে কেরামের বিরাট জামাআত বিদ্যমান ছিলেন। এতে ইজমায়ে সুকূতী সাবিত হয়ে গেল। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর এ কথা যে, 'কিরাআত ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের মাঝে শরিক' এ কথা আমরা মানি, তবে মুক্তাদীর অংশ হলো খামুশ থাকা আর মনোযোগসহ শুনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا যখন ইমাম কিরাআত পড়বে তখন তোমরা খামুশ থাকবে। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী– إِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا যখন কুরআন পড়া হয় তখন মনোযোগসহ শুনো আর খামুশ থাকো। আর এ আয়াত নামাজের ব্যপারে নাজিল হয়েছে। কেননা ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, إِنَّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَرَؤُوْا خَلْفَهُ فَخَلَطُوْا عَلَيْهِ الْقُرْاٰنَ فَنَزَلَتْ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁর পিছনে কিরাআত পড়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিরাআত খলত মলত হয়ে যায়। তখন উপরোক্ত আয়াত নাজিল হয়। এমনিভাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে إِنَّهُ ﷺ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَئَ فَأَنْصِتُوْا ইমাম তো এ কারণেই বানানো হয়েছে যে, তাঁর ইক্তিদা করা হবে। যখন ইমাম তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। আর যখন কিরাআত পড়ে তখন তোমরা খামুশ থাকবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর একটি রিওয়ায়াত হলো সতর্কতা অবলম্বন হিসাবে ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়া উত্তম। কেননা উপরে হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.)-এর হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, لَاتَفْعَلُوْا ذٰلِكَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْهَا শায়খায়নের মতে قِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ মাকরূহ। কেননা قِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ সম্পর্কে হুশিয়ারী রয়েছে। যেমন বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَفِىْ فِيْهِ جَمْرَةٌ وَقَالَ قَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়েছে তার মুখে আগুন। তিনি আরো বলেন, সে সুন্নতের বিরোধিতা করেছে। সা'আদ ইবনে আবী ওয়াককাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلٰوتُهُ যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ল তার নামাজ ফাসিদ হয়ে গেছে। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ে হায় যদি তার মুখে পাথর ইত্যাদি হতো।

وَيَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ وَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ اٰيَةَ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ لِأَنَّ الْاِسْتِمَاعَ وَالْاِنْصَاتَ فَرْضٌ بِالنَّصِّ وَالْقِرَاءَةُ وَسُؤَالُ الْجَنَّةِ وَالتَّعَوُّذُ مِنَ النَّارِ كُلُّ ذٰلِكَ مُخِلٌّ بِهِ وَكَذٰلِكَ فِي الْخُطْبَةِ وَكَذٰلِكَ اِنْ صَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِفَرْضِيَّةِ الْاِسْتِمَاعِ اِلَّا اَنْ يَقْرَاَ الْخَطِيْبُ قَوْلَهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ الْاٰيَةَ فَيُصَلِّي السَّامِعُ فِيْ نَفْسِهِ وَاخْتَلَفُوْا فِي النَّائِيْ عَنِ الْمِنْبَرِ وَالْاَحْوَطُ هُوَ السُّكُوْتُ اِقَامَةً لِفَرْضِ الْاِنْصَاتِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ـ

অনুবাদ : আর মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং নীরব থাকবে। যদিও ইমাম আশা ও ভয়ের আয়াত পাঠ করেন। কেননা নীরবে শ্রবণ ও নীরবতা আয়াত দ্বারা ফরজ সাব্যস্ত হয়েছে। আর নিজে পাঠ করা, কিংবা জান্নাত প্রার্থনা করা এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়া এ সকল এতে বাধা সৃষ্টি করে। খুতবার হুকুমও অনুরূপ। তেমনি হুকুম মহানবী ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করার সময়ও। কেননা মনোযোগ সহকারে খুতবা শ্রবণ করা ফরজ। তবে যদি খতীব এ আয়াত পড়েন يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا তখন শ্রোতা মনে মনে দরুদ পড়বে। অবশ্য মিম্বার থেকে দূরের লোকদের সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে নীরব থাকার মধ্যে ইহ্‌তিয়াত রয়েছে। যাতে (কমপক্ষে) খামুশ থাকার ফরজ পালিত হয়। সঠিক বিষয় আল্লাহই উত্তম জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ইমাম যখন কিরাআত পড়েন তখন মুক্তাদী খুব মনোযোগসহ তা শুনবে এবং খামুশ থাকবে, যদিও ইমাম আশা ও ভয়ের আয়াত পড়েন। দলিল হলো, মনোযোগসহ শুনা এবং খামুশ থাকা কুরআনের আয়াত اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا দ্বারা সাবিত। আর ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া, জান্নাত প্রার্থনা করা, জাহান্নাম থেকে পানাহ্ চাওয়া এ সবগুলো মনোযোগ এবং খামুশের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে। এ জন্য এ সবগুলো না করা উচিত। ইমাম অথবা মুনফারিদ জান্নাত প্রার্থনা বা জাহান্নাম থেকে পানাহ চাইতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে কিতাবে কোনো কিছুই নেই। তবে ইনায়া গ্রন্থকার লিখেছেন, ইমাম এ কাজগুলো ফরজ ও নফল কোনো নামাজেই করতে পারবে না। কেননা এগুলো না রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে না রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর কোনো ইমাম থেকে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় দলিল হলো, ইমামের এভাবে দোয়া করা দ্বারা মুক্তাদীদের উপর নামাজ দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর এটা হলো মাকরূহ। এ জন্য ইমাম এগুলো করবে না। এমনিভাবে মুনফারিদও যখন ফরজ নামাজ আদায় করবে তখন নামাজের মাঝখানে এ দোয়াগুলো করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর কোনো ইমাম থেকে এর বর্ণনা নেই। আর যদি নফল পড়ে তখন জান্নাত প্রার্থনা করা জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়া ইত্যাদি করা উত্তম। এ জন্য যে, হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে এক হাদীস বর্ণিত রয়েছে তিনি বলেন,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ اللَّيْلِ فَمَا مَرَّ بِاٰيَةٍ فِيْهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ اِلَّا وَقَفَ وَسَاَلَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ فَمَا مَرَّ بِاٰيَةٍ فِيْهَا ذِكْرُ النَّارِ اِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ

হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রাতের নামাজ পড়েছি। যখনই জান্নাতের কোনো আয়াত আসতো তিনি থামতেন এবং আল্লাহর নিকট জান্নাতের জন্য আবেদন করতেন। এমনিভাবে যখনই জাহান্নাম সম্পর্কিত কোন আয়াত আসত তখনই তিনি থামতেন এবং জাহান্নাম থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চেয়ে নিতেন। এমনিভাবে খতীবের খুতবার সময় লোকেরা মনোযোগের সাথে তা শুনবে আর খামুশ থাকবে। কেননা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে—

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَا صَلٰوةَ لَهٗ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি খুতবার মাঝখানে তার সাথীকে বলে খামুশ থাকো। সে অহেতুক কাজ করল। আর যে ব্যক্তি অহেতুক কাজ করল তার নামাজ হলো না। এমনিভাবে ইমাম যদি তার খুতবায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরুদ পড়ে তখনও লোকেরা মনোযোগসহ শুনবে আর চুপ থাকবে। দলিল হলো, صَلٰوةٌ عَلَى النَّبِيِّ ফরজ নয়; কিন্তু খুত্‌বা শুনা ফরজ। তাই গায়রে ফরজের কারণে ফরজকে তরক করা যাবে না। হ্যাঁ খতীব যদি খুতবার মাঝখানে নিম্নোক্ত আয়াত পড়ে—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

তখন শ্রোতা মনে মনে দরুদ শরীফ পড়বে। মোট কথা, খুত্‌বার মাঝখানে দরুদ পড়া নিষিদ্ধ। তবে খতীব যখন উপরোক্ত আয়াত পড়ে তখন এর হুকুম ভিন্ন হবে। দলিল হলো, খতীব আল্লাহ তা'আলার নিকট হিকায়াত করতেছে যে, তিনি صَلٰوةٌ عَلَى النَّبِيِّ করতেছেন। ফেরেশ্‌তাদের কাছেও হিকায়াত করতেছেন যে, তিনি দরুদ পড়তেছেন। আর এ কথারও হিকায়াত করতেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা দরুদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর অবস্থা হলো, খতীব নিজেই দরুদ শরীফে মশগুল। তাই মুসল্লীদের উপরও ওয়াজিব যে, তারা যেন দরুদে মশগুল হয়ে যায়। তবেই তো ঐ জিনিস সাব্যস্ত হয়ে যাবে যা তার কাছে চাওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত হুকুমটি হলো তখন যখন মুসল্লী মিম্বরের কাছাকাছি স্থানে অবস্থান করে। আর যদি মিম্বর থেকে দূরে থাকে তখন তার ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। অর্থাৎ যদি মিম্বর থেকে এ পরিমাণ দূরে হয় যে খুতবা শুনতে পায় না তখন এ সুরতে কুরআন পড়া উত্তম না খামুশ থাকা উত্তম এ ব্যাপারে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ থেকে বর্ণিত আছে যে খামুশ থাকা উত্তম। এ মতটি ইমাম কারখী (র.)-ও গ্রহণ করেছেন এবং এটা মুসান্নিফ (র.)-এরও মুখতার বা পছন্দনীয় মাযহাব। দলিল হলো হলো, কুরআনের কিরাআতের সময় মনোযোগসহ শুনা বা খামুশ থাকা দু'টো ফরজ ছিল। কিন্তু দূরের কারণে শুনা সম্ভব নয় তবে অপর ফরজ খামুশ থাকা সম্ভব। তাই খামুশই থাকবে। ইমাম ফযলী (র.) বলেন, কিরাআতে কুরআন উত্তম। দলিল হলো, খামুশ থাকার নির্দেশ এ কারণে ছিল যে, যাতে কুরআন শুনে তাদাব্বুর তথা চিন্তা-গবেষণা করে। আর এখন যেহেতু শ্রবণের বিষয়টি ফউত হয়ে গেল তাই কুরআনের কিরাআত করবে, যাতে কুরআন পড়ার ছওয়াব হাসিল হয়ে যায়।

بَابُ الْاِمَامَةِ

اَلْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْجَمَاعَةُ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى لَايَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا الْمُنَافِقُ وَ اَوْلَى النَّاسِ بِالْاِمَامَةِ اَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَقْرَؤُهُمْ لِاَنَّ الْقِرَاءَةَ لَابُدَّ مِنْهَا وَالْحَاجَةُ اِلَى الْعِلْمِ اِذَا نَابَتْ نَائِبَةٌ وَنَحْنُ نَقُوْلُ الْقِرَاءَةُ مُفْتَقِرَةٌ اِلَيْهَا لِرُكْنٍ وَاحِدٍ وَالْعِلْمُ لِسَائِرِ الْاَرْكَانِ ـ

অনুচ্ছেদ : ইমামত

অনুবাদ : জামাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— জামাআত সুন্নতে হুদা তথা সুন্নতে মুয়াক্কাদার অন্তর্ভুক্ত। মুনাফিক ব্যতীত কেউ তা থেকে পিছিয়ে থাকে না। ইমামতির সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি নামাজের মাসাইল সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যিনি কিরাআতে সর্বোত্তম। কেননা নামাজে কিরাআত অপরিহার্য। আর ইলমের প্রয়োজন হয় কোনো ঘটনার উদ্ভব ঘটলে। এর উত্তরে আমরা বলি, এক রুকন আদায়ের জন্য কিরাআতের প্রয়োজন আর ইলমের প্রয়োজন সকল রুকন আদায়ের ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার পূর্বে ইমামের افعال-এর আলোচনা করেছেন অর্থাৎ উজূবে জেহের, উজূবে ইখ্‌ফা, তাজ্‌দীদে কিরাআত ইত্যাদি এবং মুক্তাদীর افعال -এর আলোচনা করেছেন- অর্থাৎ উজূবে ইস্‌তিমা ও ইনসাত-এর আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায় থেকে তিনি مَشْرُوْعِيَّتْ اِمَامَتْ -এর সিফাত-এর আলোচনা শুরু করছেন। তাই সর্বাগ্রে مُسْتَحِقْ اِمَامَتْ-এর আলোচনা এবং এরপর ইমামতের خواص-এর আলোচনা করেছেন। জামাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জামাআত সুন্নাতে হুদার অন্তর্ভুক্ত তা থেকে একমাত্র মুনাফিকই পিছনে থাকে। সুন্নত দুই প্রকার। এক. سنت هدى দুই سنت زائده সুন্নতে হুদা বলা হয় যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবাদত হিসেবে নিয়মিত করেছেন। তবে কদাচিৎ ছেড়েও দিয়েছেন। ইহা তরক করা গুমরাহী। এটা শাআয়িরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। আর সুন্নতে যায়িদা হলো যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদত হিসেবে করেছেন। তা তরক করলে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন তাহাজ্জুদের নামাজ। মোট কথা, জামাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্, ওজর ব্যতীত তরক করা জায়েজ নেই। এমনকি যদি শহরের লোকেরা জামাআতকে তরক করে তখন তাদেরকে ইকামতে জামাআতের নির্দেশ দেওয়া হবে। যদি তারা এর উপর আমল করে তবে খুবই ভালো। নতুবা তাদের সাথে লড়াই করা বৈধ হবে। জামাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদা হওয়ার সমর্থন ঐ সকল হাদীসে পাওয়া যায় যেগুলোর মধ্যে জামাআতের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوةِ اَحَدِكُمْ وَحْدَهٗ بِخَمْسَةٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً জামা'আতে নামাজ পড়াতে একাকী নামাজ পড়ার তুলনায় পঁচিশ গুণ বেশি ফজিলত রয়েছে। অন্য বর্ণনায় আছে, সাতাশ গুণ বেশি ছওয়াব রয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) উবাই ইবনে কা'বের হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন যে, صَلٰوةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰى مِنْ صَلَاتِهٖ وَحْدَهٗ وَصَلٰوةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَزْكٰى مِنْ صَلَاتِهٖ مَعَ رَجُلٍ وَمَا زَادَ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى দুইজনের জামাআতে নামাজ পড়া উত্তম একজনের নামাজ পড়া থেকে। আর তিনজনের জামাআতে নামাজ পড়া উত্তম দুইজনের জামা'আত থেকে। জামাআত লোক যত বেশি হবে তা আল্লাহর নিকট তত বেশি পছন্দনীয় হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) غير رواية اصول -এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, জামাআত ওয়াজিব। আর আহ্নাফের

عامة المشائخ একথাই বলেন। দলিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত বাণী– لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالْمُؤَذِّنِ فَيُؤَذِّنَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيْ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمُ الْحَطَبِ إِلٰى قَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الصَّلٰوةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ – رَوَاهُ الشَّيْخَانِ - রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার মনে চায় যে, মুয়াজ্জিনকে নির্দেশ দেই সে যেন আযান দেয় অতঃপর একজনকে হুকুম দেই সে যেন লোকদেরকে নামাজ পড়িয়ে দেয়। অতঃপর আমি কিছু লোককে নিয়ে যাদের নিকট লাকড়ীর গাঠুরী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের নিকট যাই যারা নামাজ থেকে পিছনে রয়ে গেছে অর্থাৎ জামাআতে শরিক হয়নি। অতঃপর আগুন দ্বারা তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেই। উক্ত হাদীসে নামাজ তরককারীদের জন্য এ শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়নি। বরং জামাআত তরককারীদের জন্য এ শাস্তির কথা ঘোষিত হয়েছে—(বুখারী ও মুসলিম) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও দাউদে জাহিরী বলেন, জামাআত ফরযে আইন। তারা لَا صَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِى الْمَسْجِدِ দ্বারা দলিল পেশ করেন। অর্থাৎ মস্‌জিদের প্রতিবেশিদের নামাজ মস্‌জিদ ব্যতীত আদায় হবে না। আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো, উক্ত হাদীসে صَلٰوةٌ كَامِلَةٌ -এর মধ্যে لَاصَلٰوةَ لِلْعَبْدِ الْاٰبِقِ وَلَالِلْمَرْأَةِ النَّاشِزَةِ –এর نفى করা হয়েছে। যেমন–صلوة كامله-এর (পূর্ণাঙ্গ নামাজ)-এর نفى করা হয়েছে। ইমাম কারখী, ইমাম তাহাবী এবং অধিকাংশ শাফি'ঈ মতামলম্বীদের মতে জামাআত ফরজে কিফায়া। তাঁদের দলিল হলো ফরজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো شعائر اسلام ইসলামি নিয়মনীতিকে প্রকাশ করা। আর এ উদ্দেশ্য কতেক লোকের ফেয়েল (কর্ম) দ্বারা হাসিল হয়ে যায়। তবে এ দলিল একেবারেই দুর্বল। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে মসজিদে জামাআত হতো। তারপরও তিনি জামাআত তরককারীদের প্রতি কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করেছেন।

وَ أَوْلَى النَّاسِ الخ : ইমামতির জন্য সর্বাধিক যোগ্য ঐ ব্যক্তি যে সুন্নতের ব্যাপারে অধিকতর জ্ঞানী। অর্থাৎ ঐ সকল শরয়ী আহকাম সম্পর্কে জ্ঞাত যা নামাজের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন– নামাজের শারায়েত, নামাজের আরকান, নামাজের সুনান এবং নামাজের আদাব ইত্যাদি। তবে শর্ত হলো مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ পরিমাণ কিরাআতে পারদর্শী হতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর এক রিওয়ায়েত হলো, ইমামতের অধিক যোগ্য ঐ ব্যক্তি যিনি কুরআন পাঠে সর্বোত্তম। তবে শর্ত হলো প্রয়োজন অনুযায়ী ইল্‌ম থাকতে হবে। তাঁর দলিল হলো ঃ কিরাআত নামাজের এমন একটি রুকন, যা ছাড়ার কোনো উপায় নেই। আর ইলমের জরুরত তো তখন দেখা দেয় যখন কোনো ঘটনা ঘটে যায়। যাতে ইল্‌ম দ্বারা নামাজকে সঠিকভাবে আদায় করা যায়। আর এ ধরনের ঘটনা নামাজের ভিতর কখনো ঘটতেও পারে আবার নাও ঘটতে পারে। বুঝা গেল সুন্নতের তুলনায় কিরাআতের ইলম অধিক প্রয়োজন। এ জন্য أَقْرَأُ -কে أَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ -এর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা তরফাইন (র.)-এর পক্ষ থেকে-এর জবাবে বলব যে, কিরাআতের প্রয়োজন শুধু একটি রুকনের ক্ষেত্র আর ইলমের প্রয়োজন সকল রুকনের ক্ষেত্রে। কেননা নামাজ ফাসিদকারী বস্তুও ইলম দ্বারা জানা যায় আবার নামাজ সহীহকারী বস্তুও ইল্‌ম দ্বারা জানা যায়। বুঝা গেল ইল্‌মের জরুরত কিরাআতের তুলনায় বেশি। এ জন্য أَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ -কে أَقْرَأُ-এর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তরফাইন (র.)-এর সমর্থন হাকিমের রিওয়ায়াতেও বিদ্যমান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَفْقَهُهُمْ فِى الدِّيْنِ فَإِنْ كَانُوْا فِى الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَقْرَأُهُمْ لِلْقُرْاٰنِ - (شرح نقايه) কাওমের ইমামত তিনি করবেন যিনি সর্বাগ্রে হিজরত করেছেন। যদি হিজ্‌রতে সবাই সমান হয় তবে أَفْقَهُ فِى الدين (দীন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ব্যক্তি) ইমামত করবে। যদি ফিকায় সবাই সমান হয় তবে أَقْرَأُ لِلْقُرْاٰنِ (বিশুদ্ধতম কুরআন পাঠকারী) ইমামত করবে। এ হাদীসে أَفْقَهُ فِى الدِّيْنِ -কে اقراء-এর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস– إِنَّ الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْقُرْاٰنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْاَنْصَارِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُوْ زَيْدٍ فَهٰؤُلَاءِ أَكْثَرُ قِرَاءَةً مِنْ أَبِىْ بَكْرٍ (رض) حَتّٰى قَالَ ﷺ أَقْرَأُكُمْ أُبَىٌّ - রিসালাতের যুগে চার ব্যক্তি জামে কুরআন ছিলেন। আর তারা চারজনই আনসারী ছিলেন, (চারজন হলেন) উবাই ইব্‌নে কা'ব, মুয়ায ইবনে জাবাল, যায়েদ ইবনে সাবিত এবং আবূ যায়েদ (রা.)। এ চার জনই আবূ বকর (রা.)-এর তুলনায় কুরআনের ব্যাপারে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমামতের জন্য সিদ্দীকে আকবর (রা.)-কে সামনে অগ্রসর করে দিলেন। বুঝা গেল, যখন اقرأ ও اعلم সমান হয়ে যায়, তখন اعلم-কে প্রাধান্য দেয়া হবে اقرأ-এর উপর।

فَإِنْ تَسَاوَوْا فَأَقْرَؤُهُمْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَإِنْ كَانُوْا سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَأَقْرَؤُهُمْ كَانَ أَعْلَمَهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَتَلَقَّوْنَهُ بِأَحْكَامِهِ فَقُدِّمَ فِي الْحَدِيْثِ وَلَا كَذٰلِكَ فِيْ زَمَانِنَا فَقَدَّمْنَا الْأَعْلَمَ فَإِنْ تَسَاوَوْا فَأَوْرَعُهُمْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ صَلّٰى خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيٍّ فَكَأَنَّمَا صَلّٰى خَلْفَ نَبِيٍّ فَإِنْ تَسَاوَوْا فَأَسَنُّهُمْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنَيْ أَبِيْ مُلَيْكَةَ وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا سِنًّا وَلِأَنَّ فِيْ تَقْدِيْمِهِ تَكْثِيْرَ الْجَمَاعَةِ وَيُكْرَهُ تَقْدِيْمُ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّغُ لِلتَّعَلُّمِ وَالْأَعْرَابِيِّ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيْهِمُ الْجَهْلُ وَالْفَاسِقِ لِأَنَّهُ لَا يَهْتَمُّ لِأَمْرِ دِيْنِهِ وَالْأَعْمٰى لِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّى النَّجَاسَةَ وَوَلَدِ الزِّنَاءِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَبٌ يَشْفَقُهُ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الْجَهْلُ وَلِأَنَّ فِيْ تَقْدِيْمِ هٰؤُلَاءِ تَنْفِيْرَ الْجَمَاعَةِ فَيُكْرَهُ وَإِنْ تَقَدَّمُوْا جَازَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلُّوْا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَلَا يُطَوِّلُ الْإِمَامُ بِهِمُ الصَّلٰوةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُصَلِّ بِهِمْ صَلٰوةَ أَضْعَفِهِمْ فَإِنَّ فِيْهِمُ الْمَرِيْضَ وَالْكَبِيْرَ وَ ذَا الْحَاجَةِ۔

অনুবাদ : ইলমের ক্ষেত্রে সকলে সমান হলে যিনি কিরাআতে সর্বোত্তম তিনিই অগ্রগণ্য। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহর কিতাব পাঠে সর্বোত্তম ব্যক্তি কাওমের ইমাম হবে। যদি এতে সকলে বরাবর হয় তাহলে সুন্নত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তি (ইমাম হবে)। উল্লেখ্য যে, সে যুগে কিতাবুল্লাহ পাঠে উত্তম ব্যক্তি সর্বাধিক জ্ঞানীও হতেন। কেননা তাঁরা আহ্‌কাম ও মাসায়িলসহ কুরআন শিক্ষা করতেন। তাই হাদীসে কিতাবুল্লাহ পাঠে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের যুগে অবস্থা সেরূপ নয়। তাই আমরা (দীনি ইলমে) সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। এ ক্ষেত্রে সকলে সমান হলে (তিনিই ইমাম হবেন) যিনি অধিক পরহেযগার। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি একজন পরহেযগার আলিমের পিছনে নামাজ আদায় করল, সে যেন একজন নবীর পিছনে নামাজ আদায় করল। এ ক্ষেত্রেও সকলে সমান হলে যিনি অধিকতর বয়োজ্যেষ্ঠ তিনিই অগ্রগণ্য। কেননা মহানবী ﷺ আবূ মুলায়কার পুত্রদ্বয়কে বলেছিলেন وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا سِنًّا তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে-ই যেন ইমামতি করে। তা ছাড়া বয়োজ্যেষ্ঠকে আগে বাড়ালে জামাআতে লোক সমাগম অধিক হয়। গোলামকে (ইমামতির জন্য) আগে বাড়ানো মাকরূহ। কেননা শিক্ষালাভের জন্য (সাধারণত) সে সুযোগ পায় না এবং বেদুঈন (গ্রাম্য)-কেও (ইমামতির জন্য দেওয়া মাকরূহ)। কেননা মূর্খতাই তাদের মাঝে প্রবল এবং ফাসিককেও (ইমামতির জন্য দেওয়া মাকরূহ)। কেননা সে দীনি বিষয়ে যত্নবান নয় এবং অন্ধকেও কেননা সে পূর্ণ রূপে নাপাকি থেকে বেঁচে থাকতে পারে না। আর জারজ সন্তানকেও। কেননা তার পিতা (ও অভিভাবক) নেই, যে তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করবে। অতএব অজ্ঞতাই তার উপর প্রভাবিত হয়। তা ছাড়া এদের আগে বাড়ানোর কারণে জনগণের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি হয় (অর্থাৎ এদের প্রতি অশ্রদ্ধাবশত জামাআতে মানুষ কম আসবে) সুতরাং তা মাকরূহ। তবে যদি তারা আগে বেড়ে যায় তাহলে নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নামাজ আদায় করবে নেককার বদকার যে কোনো ব্যক্তির পেছনে। ইমাম মুক্তাদীদের নিয়ে নামাজ আদায় করতে দীর্ঘ করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জামাআতের ইমামতি করে, সে যেন তাদের দুর্বলতম ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী নামাজ আদায় করে। কেননা তাদের মধ্যে রুগী, বৃদ্ধ ও প্রয়োজনগ্রস্ত ব্যক্তি থাকতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ হলো, ইলমের ক্ষেত্রে উপস্থিত সকলে যদি বরাবর হয় তবে তাদের মধ্যে যিনি কিরাআতে সর্বোত্তম তিনি অগ্রগণ্য হবেন। দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَإِنْ كَانُوْا سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ এ হাদীস দ্বারা وجه استدلال (দলিল পেশ করার পদ্ধতি) একেবারেই স্পষ্ট। কিন্তু এখানে দুইভাবে প্রশ্ন হয়। প্রথম প্রশ্ন يؤم القوم বাক্যাংশটি امر-এর অর্থে এসেছে। আর امر উজূবকে চায়। সুতরাং যে তারতীব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব হবে অর্থাৎ اقرأ-কে اعلم-এর উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। এ জন্য হাদীসে বর্ণিত তারতীব بيان افضليت-এর জন্য হবে, بيان جواز-এর জন্য হবে না। দ্বিতীয় প্রশ্ন এ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করা مدعى-এর বিপরীত। কেননা مدعى হলো اَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ-কে অগ্রাধিকার দেওয়া। আর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় اَقْرَأُ لِكِتَابِ اللّٰهِ-এর অগ্রাধিকারের কথা। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা দলিল দেওয়া কিভাবে সহীহ হবে? প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো, يَؤُمُّ الْقَوْمَ বাক্যটি امر-এর অর্থে আসেনি; বরং বাক্যটি صيغه اخبار, বয়ানে مشروعيت-এর জন্য এসেছে। আর এটির উপর আমল করাটাই হলো হাকীকত। এবং নিয়ম আছে যতক্ষণ পর্যন্ত হাকীকতের উপর আমল করা সম্ভব ততক্ষণ পর্যন্ত মাজাযের দিকে রুজু করা যাবে না। এ জন্য এখানে মাজাযের দিকে রুজু করা যাবে না। সুতরাং এটা صيغه امر-এর অর্থে নেওয়া যাবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যিনি اقرأ ছিলেন তিনি اعلم ও ছিলেন। কেননা ঐ যুগে লোকেরা কুরআনকে তার আহকামসহ শিখতেন। যেমন হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি দীর্ঘ বারো বছরে সূরায়ে বাকারাহ হিফ্জ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, হযরত ওমরের এ দীর্ঘ সময়ে সূরায়ে বাকারাহ হিফ্জ করা নিশ্চয় তার আহকামসহ ছিল। সুতরাং যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের যুগে যিনি اقرأ ছিলেন, তিনি اعلم ও ছিলেন সেহেতু হাদীসের মধ্যে اقرأ কে اعلم-এর উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আর আমাদের যুগে যেহেতু অবস্থা সেরূপ নয়, তাই আমরা اعلم কে اقرأ-এর উপর অগ্রাধিকার দিয়েছি।

قَوْلُهُ فَإِنْ تَسَاوَوْا فَاَوْرَعُهُمْ الخ : ورع ও تقوى-এর মাঝে পার্থক্য হলো, ورع বলা হয় সন্দেহ থেকে পরহেয করাকে। আর تقوى বলা হয় মুহাররামাত থেকে বেঁচে থাকাকে। অতএব মাসআলা হলো যদি সকলে ইল্‌ম ও কিরাআতে সমান হয়ে যায় তবে যিনি অধিক পরহেযগার তিনি ইমাম হবেন। দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– مَنْ صَلّٰى خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيٍّ فَكَاَنَّمَا صَلّٰى خَلْفَ نَبِيٍّ (তবে এ হাদীসের ব্যাপারে মোল্লা আলী কারী লিখেছেন যে, হাদীসটি موضوع।)

قَوْلُهُ فَإِنْ تَسَاوَوْا فَاَسَنُّهُمْ الخ : মাসআলা হলো যদি সকলে ইলম, কিরাআত ও পরহেযগারীতে সমান হয় তবে যিনি অধিকতর বয়োজ্যেষ্ঠ তিনিই ইমামতের অধিক যোগ্য হবেন। দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ মুলায়কার পুত্রদ্বয়কে বলেছিলেন وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا سِنًّا দ্বিতীয় দলিল হলো বয়োজ্যেষ্ঠকে আগে বাড়ালে জামাআতে লোক সমাগম অধিক হয়। উপরে বর্ণিত হয়েছে, জামাআতের মানুষের আধিক্য আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়। আর হাদীসেও এসেছে مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا যে বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান দেখায়না সে আমার মধ্য থেকে নয়। সুতরাং তাকে নিজের ইমাম বানানো দ্বারা তাকে সম্মান প্রদর্শন করা হলো। তবে হিদায়া গ্রন্থকার এ কথা বলেননি যে, যদি বয়সে সকলে সমান হয়। কিন্তু অপরাপর গ্রন্থকারগণ উল্লেখ করেছেন, যদি সকলে বয়সে সমান হয় তবে তাদের মধ্যে যিনি উত্তম আখলাকের অধিকারী তিনি ইমামতের জন্য উত্তম হবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– خِيَارُكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا তোমাদের মধ্যে সে সর্বোত্তম যার আখলাকে সবচেয়ে উত্তম। আর যদি আখলাকে সকলে সমান হয় তখন তাদের মধ্যে যিনি দেখতে সবচেয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত তিনি ইমামতের অধিক যোগ্য হবেন। মোট কথা, ইমামতের অধিক যোগ্য তিনি হবেন যিনি, ইলম, কিরাআত, পরহেযগারী, বয়োজ্যেষ্ঠতা, আখলাক এবং সৌন্দর্যে অপরাপর সকলের চেয়ে উত্তম হন। কেননা এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ অনুকরণ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমৃত্যু ইমামত করেছেন। উপরোক্ত গুণাবলির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলের থেকে অগ্রে ছিলেন, ثُمَّ الْاَفْضَلُ فَالْاَفْضَلُ

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ تَقْدِيْمُ الْعَبْدِ الخ : উক্ত ইবারতে বর্ণিত মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ হলো, গোলামকে ইমামতির জন্য আগে বাড়ানো মাকরূহ। যদিও সে আজাদকৃত গোলাম হোক না কেন? অর্থাৎ যদি আজাদকৃত গোলাম ও প্রকৃত স্বাধীন ব্যক্তি একত্রিত হয়, তবে প্রকৃত স্বাধীন, ইমামতের যোগ্য হবে। দলিল হলো ব্যক্তি গোলাম নামাজের আহকাম শিখার কোনো সুযোগ পায় না। তাই তার পিছনে নামাজ পড়া মাকরূহ এবং ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, যদি স্বাধীন ব্যক্তি গোলাম উভয়ে কিরাআত, ইলম এবং পরহেযগারীতে সমান হয় তবে স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলামের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না . কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– إِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَلَوْ اُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ اَجْدَعُ শুনো, ইতা'আত করো, যদিও তোমাদের উপর হাবশী গোলামকে আমীর নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দলিল, আবূ সাঈদ মাওলা উসায়েদ (র.) থেকে বর্ণিত اَنَّهُ قَالَ دَعَوْتُ رَهْطًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهِمْ اَبُوْ ذَرٍّ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَقَدَّمُوْنِىْ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ عَبْدٌ আবূ সাঈদ (র.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণের এক জামাআতকে দাওয়াত করেছিলাম। তাদের মধ্যে হযরত আবূ যরও ছিলেন। নামাজের সময় হলো, ইমামতের জন্য আমাকে আগে বাড়িয়ে দেওয়া হলো। তখন আমি গোলাম ছিলাম এ ঘটনার দ্বারা বুঝা যায় গোলামকে ইমামতের জন্য আগে বাড়ানো মাকরূহ নয়।

আমাদের পক্ষ থেকে প্রথম দলিলের জবাব হলো, গোলামকে আগে বাড়ানো জামাআতে লোক সমাগম কম হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কেননা মানুষ তার অনুকরণ করার ক্ষেত্রে নাক ছিটকাবে। আর যে জিনিস জমাআতে লোক সমাগম কম হওয়ার কারণ হয়, তা মাকরূহ। আর হাদীস দ্বারা অধিনায়কত্ব মুরাদ, ইমামত মুরাদ নয়।

হযরত আবূ সাঈদের হাদীসের জবাব হলো, সাহাবায়ে কেরাম আবূ সাঈদকে আগে বাড়িয়ে দিয়েছেন তার মেজবান হওয়ার কারণে। কেননা ঘরের মালিক ইমামতের অধিক যোগ্য হয়ে থাকে। বেদুইনকেও ইমামতের জন্য আগে বাড়ানো মাকরূহ, কেননা মূর্খতাই তার মাঝে প্রবল। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– اَلَا لَا يَؤُمَّنَّ اِمْرَاَةٌ رَجُلًا وَلَا اَعْرَابِيٌّ খবরদার মহিলা যাতে পুরুষের ইমামত না করে এবং কোনো বেদুঈনও যেন ইমামত না করে। ফাসিককেও ইমামতের জন্য আগে বাড়ানো মাকরূহ। কেননা সে দীনি বিষয়ে যত্নবান নয়। ইমাম মালিক (র.) বলেন, ফাসিকের পিছনে নামাজ জায়েজ নেই। কেননা যখন তার থেকে দীনি ব্যাপারে খেয়ানত পাওয়া গেল তখন সে নামাজের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমীন তথা দায়িত্বশীল হতে পারবে না। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবী ও তাবিয়ীগণ রঈসুল ফুস্‌সাক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পিছনে নামাজ পড়েছেন। ইমামতের জন্য অন্ধ ব্যক্তিকেও আগে বাড়ানো মাকরূহ। কেননা সে অন্ধ হওয়ার কারণে নাপাকি থেকে পূর্ণরূপে বেঁচে থাকতে পারে না। আর জারজ সন্তানকেও আগে বাড়ানো মাকরূহ। কেননা তার পিতা নেই যে তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করবে।

হিদায়া গ্রন্থকার একসাথে দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন, এদেরকে আগে বাড়ানোর দ্বারা জনগণের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক হবে, এ কারণে তাদেরকে আগে বাড়ানো মাকরূহ। তবে যদি তারা আগে বেড়ে যায় তাহলে নামাজ হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন صَلُّوْا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ তোমরা নেককার এবং বদকার সকল ইমামের পেছনেই নামাজ পড়বে।

قَوْلُهُ وَلَا يُطَوِّلُ الْاِمَامُ بِهِمْ الخ ইমাম কোনো জামাআতকে নিয়ে নামাজ পড়লে সে নামাজ বেশি দীর্ঘায়িত করবে না। দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জামাআতের ইমামতি করে সে যেন তাদের দুর্বলতম ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী নামাজ আদায় করে, কেননা মুক্তাদীদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ এবং প্রয়োজনগ্রস্ত লোকও রয়েছে। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)-এর হাদীসও দলিল হতে পারে। হযরত মুয়ায তাঁর গোত্রের লোকদেরকে লম্বা নামাজ পড়িয়েছিলেন, তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অভিযোগ উথাপন করার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন اَفَتَّانٌ اَنْتَ يَا مُعَاذُ এ হাদীসটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। তবে এ কথাটিও সাব্যস্ত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজে সূরায়ে ফালাক ও নাস তিলাওয়াত করেছিলেন। নামাজ শেষ হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আপনি নামাজ খুব সংক্ষেপ করেছেন? তখন তিনি বললেন, বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ দ্বারা আমার ভয় হয়েছিল তাদের মা যেন ফিতনায় না পড়ে যায়। এতে বুঝা গেল ইমাম মুক্তাদীদের হালাত অনুযায়ী ইমামত করবে।

وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّيْنَ وَحْدَهُنَّ الْجَمَاعَةَ لِأَنَّهَا لَاتَخْلُو عَنْ اِرْتِكَابِ مُحَرَّمٍ وَهُوَ قِيَامُ الْاِمَامِ وَسْطَ الصَّفِّ فَيُكْرَهُ كَالْعُرَاةِ وَاِنْ فَعَلْنَ قَامَتِ الْاِمَامُ وَسْطَهُنَّ لِأَنَّ عَائِشَةَ (رض) فَعَلَتْ كَذٰلِكَ وَحُمِلَ فِعْلُهَا الْجَمَاعَةَ عَلٰى اِبْتِدَاءِ الْاِسْلَامِ وَلِأَنَّ فِي التَّقَدُّمِ زِيَادَةَ الْكَشْفِ وَمَنْ صَلّٰى مَعَ وَاحِدٍ اَقَامَهُ عَنْ يَمِيْنِهِ لِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) فَاِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلّٰى بِهِ وَاَقَامَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنِ الْاِمَامِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) اَنَّهُ يَضَعُ اَصَابِعَهُ عِنْدَ عَقِبِ الْاِمَامِ وَالْاَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ وَاِنْ صَلّٰى خَلْفَهُ اَوْ فِيْ يَسَارِهِ جَازَ وَهُوَ مُسِيْئٌ لِأَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةَ ـ

অনুবাদ : স্ত্রী লোকদের এককভাবে জামাআত করা মাকরূহ। কেননা তা একটি নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে মুক্ত নয় এবং সেটা হলো কাতারের মাঝে ইমামের দাঁড়ানো। অতএব তা মাকরূহ হবে, যেমন উলঙ্গদের জামাআতের হুকুম। তবে যদি তারা তা করে তাহলে ইমাম তাদের মাঝে দাঁড়াবে। কেননা হযরত আয়েশা (রা.) অনুরূপ করেছেন। আর তাঁর এই জামাআত অনুষ্ঠান ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তা ছাড়া এ জন্য যে, আগে বেড়ে দাঁড়ানোতে অতিরিক্ত প্রকাশ ঘটে। যে ব্যক্তি এক মুক্তাদী নিয়ে নামাজ আদায় করবে, সে তাকে তার নিজের ডান পাশে দাঁড় করাবে। কেননা ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে মুক্তাদী করে নামাজ আদায় করেছেন এবং তাকে নিজের ডান পাশে দাঁড় করিয়েছেন। আর সে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মুক্তাদী তার পায়ের আঙ্গুল ইমামের গোড়ালি বরাবর রাখবে। তবে প্রথম মতটি স্পষ্ট। অবশ্য যদি এক মুক্তাদী ইমাম পিছনে তা বামে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে তাহলে জায়েজ হবে। তবে সুন্নতের বিরোধিতার কারণে সে গুনাহগার হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : স্ত্রী লোকদের একাকী জামাআতে নামাজ পড়া মাকরূহে তাহ্রীমী। কেননা স্ত্রীলোকদের জামাআত একটি নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে মুক্ত নয়। এ জন্য তাদের ইমাম মুক্তাদী স্ত্রীলোকদের আগে দাঁড়াবে অথবা তাদের মাঝে দাঁড়াবে। প্রথম অবস্থায় সতর খুলে যাওয়ার ভয় বেশি। আর সতর খুলে যাওয়াটা হলো মাকরূহ। আর দ্বিতীয় অবস্থায় ইমাম তার স্থান ছেড়ে দেওয়া লাযেম আসে অথচ এটাও মাকরূহ। আর জামা'আত হলো সুন্নত। অপর দিকে কায়দা আছে, কোনো মাকরূহ বা অপছন্দনীয় কার্যে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে সুন্নতকে তরক করা উত্তম। এ জন্য স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে জামাআতের সুন্নতকে তরক করে দেওয়া হয়েছে। আর স্ত্রীলোকদের অবস্থা হলো উলঙ্গদের অবস্থার অনুরূপ অর্থাৎ যেমনিভাবে উলঙ্গদের জামাআত মাকরূহ ঠিক তেমনিভাবে স্ত্রীলোকদের জামাআতও মাকরূহ।

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, মাকরূহে তাহ্রীমী হওয়া সত্ত্বেও যদি স্ত্রীলোকেরা জামা'আত করে তখন ইমাম তাদের মাঝে দাঁড়াবে। কেননা হযরত আয়েশা (রা.) অনুরূপ করেছেন। তবে এখানে প্রশ্ন জাগে যে, যখন হযরত আয়েশা (রা.) জামাআতের সাথে নামাজ পড়েছেন, তাহলে তাদের জামাআত মাকরূহ তাহ্রীমী কেন? এর জবাব হলো হযরত আয়েশা (রা.)-এর অনুষ্ঠিত জামাআত ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। তবে এ জবাবের উপর পুনরায় প্রশ্ন হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ

নবুওয়াতের পর ১৩ বছর মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। তারপর মদীনায় হযরত আয়েশা (রা.) ৬ বৎসরের সময় তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তারপর ৯ বৎসরের সময় হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একত্রে জীবন যাপন করেন। এতে তো বুঝা যায় হযরত আয়েশা (রা.)-এর জামাআতে নামাজ পড়া বালিগ হওয়ার পর হয়েছে। তাহলে এ অবস্থায় হযরত আয়েশার এ কাজ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় কিভাবে হয়? এর জবাব হলো হলো, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় হওয়ার দ্বারা মুরাদ হলো– স্ত্রীলোকদের জামাআতের হুকুম মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهٗ وَمَنْ صَلّٰى مَعَ وَاحِدٍ الخ : যদি কোনো ব্যক্তি একজন মুক্তাদী নিয়ে নামাজ আদায় করে তবে ঐ মুক্তাদীকে তার ডান দিকে দাঁড় করাবে। দলিল, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাদীস তিনি বলেন,

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ لِاُرَاقِبَ صَلٰوةَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ فَانْتَبَهَ فَقَالَ نَامَتِ الْعُيُوْنُ وَغَابَتِ النُّجُوْمُ وَبَقِىَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ثُمَّ قَرَأَ اٰخِرَ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلٰى اٰخِرِهَا ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقٍ فَتَوَضَّاَ وَافْتَتَحَ فَقُمْتُ وَوَقَفْتُ عَلٰى يَسَارِهٖ وَاَخَذَ بِاُذُنَىَّ وَاَدَارَنِىْ خَلْفَهٗ حَتّٰى اَقَامَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهٖ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

একদা আমি আমার খালা মায়মূনার ঘরে রাত যাপন করলাম, যাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামাজ দেখতে পাই। (দেখলাম) রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে উঠলেন আর বললেন, চক্ষুসমূহ শুয়ে পড়েছে। তারকারাজি ডুবে গেছে। শুধু حَىٌّ قَيُّوْمٌ তথা আল্লাহ তা'আলা বাকি আছে। তারপর তিনি সূরায়ে আলে ইমরানের শেষ আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলেন তথা اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর তিনি একটি ঝুলন্ত মশক থেকে পানি নিয়ে অজু করলেন এবং নামাজ আরম্ভ করলেন। (হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,) আমিও উঠে অজু করলাম এবং গিয়ে তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কান ধরে পিছনের দিক থেকে ঘুরালেন এবং আমাকে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, যদি ইমামের সাথে একজন মুক্তাদী হয় তবে তাকে ডান দিকে দাঁড় করানো উত্তম। যাহিরী রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, মুক্তাদী একজন হলে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে মুক্তাদী তার পায়ের আঙ্গুলগুলোকে ইমামের গোড়ালি বরাবর রাখবে। প্রথম মতটি হলো যাহিরে রিওয়ায়াতের। আর যদি একজন মুক্তাদী ইমামের পিছনে অথবা বামে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে তবুও নামাজ হয়ে যাবে। তবে সুন্নতের পরিপন্থী করার কারণে সে গুনাহগার হবে।

وَاِنْ اَمَّ اِثْنَيْنِ تَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ يَتَوَسَّطُهُمَا وَنُقِلَ ذٰلِكَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَلَنَا اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَقَدَّمَ عَلٰى اَنَسٍ وَالْيَتِيْمِ حِيْنَ صَلّٰى بِهِمَا فَهٰذَا لِلْاَفْضَلِيَّةِ وَالْاَثَرُ دَلِيْلُ الْاِبَاحَةِ وَلَا يَجُوْزُ لِلرِّجَالِ اَنْ يَّقْتَدُوْا بِامْرَاَةٍ اَوْ صَبِيٍّ اَمَّا الْمَرْاَةُ فَلِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَخِّرُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَخَّرَهُنَّ اللّٰهُ فَلَا يَجُوْزُ تَقْدِيْمُهَا وَاَمَّا الصَّبِيُّ فَلِاَنَّهٗ مُتَنَفِّلٌ فَلَا يَجُوْزُ اِقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِهٖ وَفِى التَّرَاوِيْحِ وَالسُّنَنِ الْمُطْلَقَةِ جَوَّزَهٗ مَشَائِخُ بَلْخٍ (رحـ) وَلَمْ يُجَوِّزْهُ مَشَايِخُنَا وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّقَ الْخِلَافَ فِى النَّفْلِ الْمُطْلَقِ بَيْنَ اَبِىْ يُوْسُفَ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَالْمُخْتَارُ اَنَّهٗ لَا يَجُوْزُ فِى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِاَنَّ نَفْلَ الصَّبِيِّ دُوْنَ نَفْلِ الْبَالِغِ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بِالْاِفْسَادِ بِالْاِجْمَاعِ وَلَا يَبْنِى الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيْفِ بِخِلَافِ الْمَظْنُوْنِ لِاَنَّهٗ مُجْتَهَدٌ فِيْهِ فَاعْتُبِرَ الْعَارِضُ عَدَمًا بِخِلَافِ اِقْتِدَاءِ الصَّبِيِّ بِالصَّبِيِّ لِاَنَّ الصَّلٰوةَ مُتَّحِدَةٌ ـ

অনুবাদ : আর যদি কেউ দুই ব্যক্তির ইমামতি করেন, তাহলে সে তাদের আগে দাঁড়াবেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এরূপ করেছেন বলে বর্ণিত আছে। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আনাস (রা.) ও তাঁর এতিমকে নিয়ে নামাজ আদায়ের সময় উভয়ের আগে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুতরাং এ হাদীসের দ্বারা উত্তম প্রমাণিত হয়। আর সাহাবীর আমল দ্বারা এরূপ দাঁড়ানো মুবাহ প্রমাণিত হয়। পুরুষদের জন্য কোনো নারী বা নাবালেগের পিছনে ইক্‌তিদা দ্বারা জায়েজ নয়। স্ত্রীলোকের পিছনে জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, মহানবী ﷺ বলেছেন– আল্লাহ যেমন তাদের পিছনে রেখেছেন, তেমনি তোমরাও তাদেরকে পিছনে রাখো। সুতরাং তাদের (ইমামতির জন্য) আগে বাড়ানো জায়েজ নয়। আর নাবালেগের পিছনে জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, সে নফল আদায়কারী। সুতরাং তার পিছনে ফরজ আদায়কারীর ইক্‌দিতা জায়েজ হবে না। তবে তারাবীহ ও নিয়মিত সুন্নত-এর ক্ষেত্রে বাল্‌খ-এর মাশায়িখগণ জায়েজ বলেছেন। আর আমাদের মাশায়িখগণ তা অনুমোদন করেননি। আবার কারো কারো তাহকীক অনুযায়ী সাধারণ নফলের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো, কোনো নামাজেই তাদের (ইমামতিতে) জায়েজ নয়। কেননা নাবালেগের নফল বালেগের নফলের চেয়ে নিম্ন মানের। কেননা ইজমায়ী মতানুসারে নামাজ ভঙ্গ করার কারণে নাবালেগের উপর কাজা অপরিহার্য হয় না। আর দুর্বলের উপর প্রবলের ভিত্তি হতে পারে না। ধারণা ভিত্তিক নামাজ এর ব্যতিক্রম, কেননা (ভঙ্গ হলে কাজা করতে হবে কিনা) এতে মতভেদ রয়েছে। সুতরাং উদ্ভূত ধারণা (মুক্তাদীর বেলায়) অস্তিত্বহীন বলে বিবেচিত। অবশ্য নাবালেগের পিছনে নাবালেগের ইক্‌তিদার হুকুম ভিন্ন। (অর্থাৎ জায়েজ) কেননা উভয়ের নামাজ এক পর্যায়ের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি ইমাম ব্যতীত মুক্তাদী দু'জন হয় তবে ইমাম তাদের আগে দাঁড়াবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম তাদের মাঝে দাঁড়াবে। আর এভাবে দাঁড়ানো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। আর তা হলো, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) আলকামা ও আসওয়াদকে নামাজ পড়িয়েছিলেন। আর তিনি তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হযরত আনাস ও এতিম নামক ব্যক্তিকে নামাজ পড়িয়েছিলেন এবং তিনি তাদের আগে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগে দাড়ানো উত্তম হওয়ার দলিল আর ইবনে মাসউদের আমল মুবাহ হওয়ার দলিল। ইব্রাহীমে নাখয়ী (র.) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি স্থান কম হওয়ার কারণে এমনটি করেছিলেন। এ হিসাবে ইবনে মাসউদের আমল দ্বারা মুবাহও সাবিত হয় না।

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوْزُ لِلرِّجَالِ اَنْ يَقْتَدُوْا الخ : পুরুষদের জন্য কোনো নারী বা নাবালেগের পিছনে ইকতিদা করা জায়েজ নয়। স্ত্রীলোকদের পিছনে ইক্তিদা না জায়েজ হওয়ার কারণ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– اَخِّرُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَخَّرَهُنَّ اللّٰهُ। আল্লাহ যেমন তাদেরকে পিছনে রেখেছেন তেমনি তোমরাও তাদেরকে পিছনে রাখো। দলিল হলো এভাবে যে, حَيْثُ শব্দটি দ্বারা মুরাদ হলো مَكَان বা স্থান। যে সকল স্থানে স্ত্রীলোকদেরকে পিছনে রাখা ওয়াজিব সেগুলো নামাজের স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান নয়। তাই বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীলোকদেরকে নামাজের স্থানে পিছনে রেখেছেন। অর্থাৎ তাদেরকে পুরুষদের ইমাম হওয়ার অধিকার দেননি। কেউ কেউ বলেছেন, حَيْثُ শব্দটি تَعْلِيْل-এর জন্যে এসেছে এ হিসাবে হাদীসের অর্থ দাঁড়াবে যে, স্ত্রীলোকদেরকে পিছনে রাখো। কেননা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পিছনে রেখেছেন। তাইতো আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাহাদাত, উত্তরাধিকার রাজত্ব এবং সমস্ত পদে পিছনে রেখেছেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা যখন তাদেরকে পিছনে রেখেছেন, সেহেতু তাদেরকে আগে বাড়ানো তথা ইমাম বানানো জায়েজ হবে না।

নাবালেগের ইমামতি। তা এ কারণে নাজায়েজ যে, সেতো নফল আদায়কারী। সুতরাং তার পিছনে ফরজ আদায়কারীর ইক্তিদা জায়েজ হবে না। অর্থাৎ বালেগের ফরজ নামাজ তার পিছনে জায়েজ হবে না। হিদায়া প্রণেতা বলেন, তবে তারাবীহ্ ও নিয়মিত সুন্নতের ব্যাপারে ইখ্তিলাফ রয়েছে। মাশায়িখে বলখের মতানুযায়ী তারাবীহ্ এবং সুন্নতে মুত্লাকাহ তথা নিয়মিত সুন্নতের মধ্যে নাবালেগের পিছনে ইক্তিদা করা জায়েজ। আর আমাদের মাশায়িখ তথা মাশায়িখে مَا وَرَاءَ النَّهْر-এর মতে জায়েজ নেই। سُنَن مُطْلَقَه দ্বারা ঐ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ মুরাদ যা ফারায়িযের আগে এবং পরে প্রবর্তিত হয়েছে। এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী ঈদের নামাজও সুন্নত। বিত্র, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্র গ্রহণ এবং বৃষ্টির নামাজও সাহেবাইনের মতে সুন্নত। মোট কথা, সুন্নত নামাজে যদি নাবালেগ ইমামত করে তবে মাশায়িখে বলখ-এর মতে বালেগ পুরুষদের জন্য তার ইকতিদা করা জায়েজ। আর مَا وَرَاءَ النَّهْر তথা বুখারা, সমরকন্দ এর ওলামা ও মাশায়িখের মতে নাজায়েজ। মশায়ায়িখে বলখ ধারণা ভিত্তিক নামাজের উপর কিয়াস করেছেন। আর ধারণা ভিত্তিক নামাজ হলো, এক ব্যক্তি ধারণা করল যে, তার জিম্মায় ওয়াজিব নামাজ রয়েছে এবং এ ধারণা নিয়ে সে নামাজও শুরু করে দিয়েছে। অতঃপর নামাজের মাঝখানে কোনো কারণ বশত নামাজ ভেঙ্গে গেছে। তারপর তার মনে পড়ল যে, তার জিম্মায় কোনো ওয়াজিব নামাজ ছিল না। এখন নামাজ শুরু করার কারণে এর কাজা করা ওয়াজিব কিনা? এ ব্যাপারে আইম্মায়ে ছালাছার মতে হুকুম হলো, তার কাজা ওয়াজিব নয়। তবে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে এর কাজা ওয়াজিব। অতঃপর নফল আদায়কারী বালেগ ব্যক্তি যদি ধারণা ভিত্তিক নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির ইক্তিদা করে তবে তা জায়েজ হবে। মাশায়িখে বলখ-এর কিয়াসের হাসিল হলো, নফল নামাজ আরম্ভ করার দ্বারা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর ধারণা ভিত্তিক নামাজ ওয়াজিব হয় না। সুতরাং যেহেতু নফল নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির ধারণা ভিত্তিক নামাজ আদায়কারীর পিছনে ইকতিদা করা জায়েজ তাই নফল আদায়কারী ব্যক্তির নাবালেগের পিছনেও ইক্তিদা করা জায়েজ হবে। আমাদের মাশায়িখদের মধ্য থেকে কেউ কেউ نَفْل مُطْلَق-এর সুরতের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে ইখ্তিলাফের কথা বয়ান করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, نَفْل مُطْلَق-এর মধ্যেও বালেগ পুরুষদের ইক্তিদা নাবালেগের পিছনে জায়েজ নেই। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জায়েজ।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, বালেগ পুরুষের ইক্তিদা নাবালেগের পিছনে কোনো নামাজেই জায়েজ নেই। চাই নফলে মুত্লাক হোক বা মুয়াক্কাত হোক। এটাই مَاوراء النهر-এর মাশায়িখে কিরামের মাযহাব। এর দলিল হলো, নাবালেগের নফল নামাজ বালেগের নফল নামাজের তুলনায় নিম্ন মানের। কেননা নাবালেগ কোনো কারণে নফল নামাজ ভঙ্গ করলে তার উপর কাজা ওয়াজিব নয়। কিন্তু বালেগের নফল নামাজ ফাসিদ করা দ্বারা কাজা করা ওয়াজিব। আর কায়দা আছে, প্রবলের ভিত্তি দুর্বলের উপর হতে পারে না। এ জন্য বালেগের নফলের ভিত্তি নাবালেগের নফলের উপর করা যাবে না।

بِخِلَافِ الْمَظْنُوْنِ দ্বারা গ্রন্থকার মাশায়িখে বলখ-এর কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের খোলাসা হলো, বালেগের নাবালেগের পিছনে ইকতিদা করাকে ধারণা ভিত্তিক নামাজ আদায়কারীর ইক্তিদার উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা ধারণা ভিত্তিক নামাজ হলো مُخْتَلَفٌ فِيْهِ তথা বিরোধপূর্ণ নামাজ। যেমন ইমাম যুফার (র.)-এর মতে ফাসিদ করার সুরতে 'যান (ظن)তথা ধারণাকারী ব্যক্তির উপর কাজা করা ওয়াজিব। অথচ নাবালেগের নামাজ সর্বসম্মতিক্রমে ফাসিদ হওয়ার সুরতে কাজা করা ওয়াজিব নয়। তা ছাড়া শিশুকাল এমন ব্যাপার যা বালেগ হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং বালেগ ও নাবালেগের নামাজ এক পর্যায়ের হবে না। কেননা ফাসিদ করার সুরতে বালেগের উপর কাজা ওয়াজিব কিন্তু নাবালেগের উপর কাজা ওয়াজিব নয়। কিন্তু ধারণা ভিত্তিক নামাজ এর ব্যতিক্রম। কেননা উদ্ভূত ধারণা একটি عارضى তথা আকস্মিক জিনিস। তাই তাকে অস্তিত্বহীন (عدم) ধরা হয়েছে। সুতরাং এখন নফল আদায়কারী ব্যক্তি যদি ধারণা ভিত্তিক নামাজ আদায়কারীর পিছনে ইক্তিদা করে তখন উভয়ের নামাজ এক পর্যায়ের হয়ে যাবে। বিশেষ করে ইমাম যুফারের মতানুযায়ী। কেননা ফাসাদের সুরতে উভয়ের উপর কাজা ওয়াজিব। মুদ্দাকথা বালেগ ও নাবালেগের নামাজ এক পর্যায়ের নয়। তবে বালেগ ও ظن-এর নফল নামাজ এক পর্যায়ের বিশেষ করে ইমাম যুফারের মতে। সুতরাং এ পার্থক্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় اِقْتِدَاءٌ الْبَالِغِ بِالصَّبِيِّ-কে اِقْتِدَاءٌ بِالظَّنِّ-এর উপর কিয়াস করা قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ। এর বিপরীত নাবালেগের পিছনে নাবালেগের ইকতিদা জায়েজ। কেননা উভয়ের নামাজ এক পর্যায়ের। এ কারণে উভয়ের কারো উপর কাজা ওয়াজিব নয়। সুতরাং এটা দুর্বলের ভিত্তি দুর্বলের উপরই হবে।

وَيَصِفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ النِّسَاءُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيَلِيَنِيْ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهٰى لِأَنَّ الْمُحَاذَاةَ مُفْسِدَةٌ فَيُؤَخَّرْنَ وَإِنْ حَاذَتْهُ امْرَأَةٌ وَهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِيْ صَلٰوةٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ إِنْ نَوَى الْإِمَامُ إِمَامَتَهَا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَّاتَفْسُدَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيْ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ اِعْتِبَارًا بِصَلَاتِهَا حَيْثُ لَاتَفْسُدُ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ مَا رَوَيْنَاهُ وَإِنَّهُ مِنَ الْمَشَاهِيْرِ وَهُوَ الْمُخَاطَبُ بِهِ دُوْنَهَا فَيَكُوْنُ هُوَ التَّارِكُ لِفَرْضِ الْمَقَامِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ دُوْنَ صَلَاتِهَا كَالْمَأْمُوْمِ إِذَا تَقَدَّمَ عَلَى الْإِمَامِ ـ

অনুবাদ : প্রথমে পুরুষের কাতার করবে। তারপর নাবালেগ এরপর স্ত্রী লোকেরা। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের প্রাপ্তবয়স্ক এবং জ্ঞানবানরা যেন আমার কাছাকাছি থাকে। আর যেহেতু নারী পুরুষ এক সমানে দাঁড়ানো নামাজ ভঙ্গকারী, সুতরাং তাদের পশ্চাদবর্তিনী রাখা হবে। যদি স্ত্রীলোক পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়ায় আর উভয়ে একই নামাজে শরিক হয় তাহলে পুরুষের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে, যদি ইমাম স্ত্রীলোকের ইমামতির নিয়ত করে থাকেন। আর সাধারণ কিয়াসের চাহিদা হলো নামাজ ফাসিদ না হওয়া। এবং এটিই ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মত। স্ত্রীলোকটির নামাজের উপর কিয়াস অনুযায়ী। যেহেতু তার নামাজ ফাসিদ হয় না। আর সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো আমাদের বর্ণিত হাদীস, যা মাশহুর শ্রেণীভুক্ত, আর সেই হাদীসে পুরুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে, স্ত্রীলোককে নয়। সুতরাং পুরুষ হচ্ছে স্থানগত ফরজ বর্জনকারী। সুতরাং তার নামাজই ফাসিদ হবে, স্ত্রীলোকটির নামাজ নয়। যেমন মুক্তাদী (এর নামাজ ফাসিদ হয়) ইমামের আগে দাঁড়ালে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে ইমামের পিছনে দাঁড়াবার তারতীব বয়ান করা হয়েছে। তাই গ্রন্থকার বলেন, ইমামের পিছনে প্রথমে পুরুষেরা দাঁড়াবে। তারপর তাদের পিছনে নাবালেগ দাঁড়াবে। তারপর তাদের পিছনে স্ত্রীলোকেরা দাঁড়াবে। দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত বাণী– لِيَلِيَنِيْ مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهٰى এখানে يل শব্দটি امر-এর সীগাহ্। ولى থেকে নির্গত। অর্থ হলো কাছাকাছি হওয়া। احلام শব্দটি (بالضم) حُلُمٌ-এর বহুবচন حُلُمٌ ঐ জিনিস যা শয়নকারী ব্যক্তি দেখে অর্থাৎ স্বপ্ন। কিন্তু তার অধিকাংশ ব্যবহার বালেগের স্বপ্নের উপর হয়।

نهى - শব্দটি نهية-এর বহুবচন; অর্থ-জ্ঞান। এ হিসাবে হাদীসের মর্ম এই দাঁড়ায়– তোমাদের মধ্যে থেকে আমার কাছাকাছি তারা হবে যারা আকিল তথা জ্ঞানবান এবং বালেগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক। এখন কেউ যদি বলে যে, এ হাদীস দ্বারা তো পুরুষদেরকে বাচ্চাদের আগে দাঁড়ানো বুঝে আসে কিন্তু বাচ্চাদের স্ত্রীলোকদের আগে দাঁড়ানো তো বুঝে আসে না? তা হলে এর জবাব কি?

এর জবাব হলো, احتمال رجوليت তথা পুরুষত্বের সম্ভাবনার কারণে বাচ্চারা (নাবালেগ) পুরুষদের تابع হবে। আর تابع সাধারণত متبوع-এর পরে হয়। তাই বাচ্চারা (নাবালেগ-পুরুষদের পরে হবে, আর স্ত্রীলোকদের আগে হবে। অধিকন্তু এর জবাবে এটাও বলা যায় যে, নাবালেগের স্ত্রীলোকদের আগে হওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফেয়েল তথা কাজের দ্বারা সাবিত হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বৃদ্ধা মহিলাকে ইয়াতীম নামী এক নাবালেগের পিছনে দাঁড় করিয়েছিলেন। সর্বোত্তম দলিল নিম্নের হাদীসটি যা ইমাম আহমদ (র.) তাঁর মুসনাদে আবূ মালিক আশ্‌আরী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তা হলো এই–

اِنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اجْتَمِعُوْا وَاجْمِعُوْا نِسَاءَكُمْ وَاَبْنَاءَكُمْ حَتّٰى اُرِيَكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاجْتَمَعُوْا وَجَمَعُوْا اَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَاَرَاهُمْ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفَّ الرِّجَالَ فِىْ اَدْنَى الصَّفِّ وَصَفَّ الْوِلْدَانَ خَلْفَهُمْ وَصَفَّ النِّسَاءَ خَلْفَ الصِّبْيَانِ ـ

আবূ মালিক আশআরী (র.) বলেন, ওহে আশ্আরী গোত্রের লোকেরা! তোমরা নিজেরাও একত্রিত হও এবং তোমাদের স্ত্রীলোক ও নাবালেগদেরকেও একত্রিত করো। আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজ দেখাব। সুতরাং তারা নিজেরাও একত্রিত হলো এবং তাদের নাবালেগ শিশু এবং স্ত্রীলোকদেরকেও একত্রিত করল। অতঃপর [আবূ মালিক আশআরী (রা.)] অজু করলেন এবং তাদেরকে দেখালেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে অজু করতেন। অতঃপর আবূ মালেক (র.) আগে গেলেন। প্রথমে পুরুষদের কাতার করলেন। তারপর তাদের পিছনে নাবালেগদের। তারপর তাদের পিছনে স্ত্রীলোকদের কাতার করলেন।

আকলী দলিল হলো, নারী পুরুষ এক সমানে দাঁড়ানো দ্বারা নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়। তাই স্ত্রী লোকদেরকে সর্বপিছনে দাঁড় করানো হবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ حَاذَتْهُ اِمْرَأَةٌ وَهُمَا الخ : যদি কোনো স্ত্রীলোক নামাজে কোনো পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়ায় এবং উভয়ে একই নামাজে শরিক হয় আর ইমাম ঐ স্ত্রীলোকের নিয়তও করে, এ অবস্থায় পুরুষের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। সাধারণ কিয়াসের চাহিদা হলো পুরুষের নামাজ ফাসিদ না হওয়া। এই হলো ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এরও মত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) পুরুষের নামাজকে স্ত্রীলোকের নামাজের উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ মুহাযাতের কারণে স্ত্রীলোকটির নামাজ সর্বসম্মতিক্রমে ফাসিদ হয় না তাই পুরুষের নামাজও ফাসিদ হবে না। কিয়াসের কারণ হলো, محاذات এমন একটি ফেয়েল যা উভয়ের দ্বারা সাব্যস্ত হয় সুতরাং محاذات যখন স্ত্রীলোকের নামাজকে ফাসাদ করে না তখন পুরুষের নামাজকেও ফাসাদ করবে না। ইস্তিহ্সান তথা সুক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো, ঐ হাদীস যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَخِّرُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَخَّرَهُنَّ اللّٰهُ ـ

এ হাদীসের মধ্যে পুরুষদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা স্ত্রীলোকদেরকে নামাজের মধ্যে পিছনে রাখবে। সুতরাং স্ত্রীলোক যখন তার محاذى হয়ে গেল, তখন যেন পুরুষ লোকটি তার স্থানগত ফরজ বর্জন করল। কেননা এমন নামাজের মধ্যে যার মধ্যে উভয়ে শরিক থাকে, স্ত্রীলোককে পিছনে দাঁড় করানো পুরুষের জন্য ফরজ। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যে ব্যক্তি ফরজ তরক করেছে তার নামাজ ফাসাদ হয়ে যাবে, অন্যের নামাজ ফাসাদ হবে না। এ জন্য আমরা বলেছি محاذات-এর কারণে পুরুষের নামাজ ফাসিদ হবে, স্ত্রীলোকের নামাজ ফাসিদ হবে না।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এ হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ, আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ফরযিয়ত সাব্যস্ত হয় না? এর জবাব হিদায়ায় গ্রন্থকার وَاِنَّهُ مِنَ الْمَشَاهِرِ দ্বারা দিয়েছেন। অর্থাৎ এ হাদীসটি আহাদীসে মাশহুরার অন্তর্ভুক্ত যা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এখন আর কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই। وَهُوَ الْمُخَاطَبُ দ্বারা কিয়াসের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের হাসিল হলো, স্ত্রীলোকের নামাজ ফাসিদ না হওয়ার দ্বারা পুরুষের নামাজ ফাসিদ না হওয়া লাযিম আসে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী اخروهن-এর মুখাতাব পুরুষ, মহিলা নয়। সুতরাং পুরুষ ফরজ বর্জনকারী হলো, মহিলা নয়। এ জন্য শুধু পুরুষের নামাজ ফাসিদ হবে, মহিলার নামাজ ফাসিদ হবে না। যেমন– মুক্তাদী যখন ইমামের আগে চলে যায় এবং নিজের স্থানগত ফরজ তরক করে তখন তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। এমনিভাবে যখন স্ত্রীলোকও তার স্থানগত ফরজকে বর্জন করে তখন তার নামাজও ফাসিদ হয়ে যাবে।

<u>ফায়েদা :</u> محاذات - নামাজ বিনষ্টকারী তখন হবে যখন নামাজের মধ্যে স্ত্রীলোকের পা পুরুষের কোনো অঙ্গের বরাবর হয়ে যায়।

وَإِنْ لَمْ يَنْوِ إِمَامَتَهَا لَمْ تَضُرَّهُ وَلَاتَجُوزُ صَلَاتُهَا لِأَنَّ الْإِشْتِرَاكَ دُوْنَهَا لَايَثْبُتُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ أَلَا تَرٰى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّرْتِيْبُ فِي الْمَقَامِ فَيَتَوَقَّفُ عَلٰى اِلْتِزَامِهِ كَالْاِقْتِدَاءِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ إِذَا ائْتَمَّتْ مُحَاذِيَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِجَنْبِهَا رَجُلٌ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ وَالْفَرْقُ عَلٰى أَحَدِهِمَا أَنَّ الْفَسَادَ فِي الْأَوَّلِ لَازِمٌ وَفِي الثَّانِيْ مُحْتَمَلٌ وَمِنْ شَرَائِطِ الْمُحَاذَاتِ أَنْ تَكُوْنَ الصَّلٰوةُ مُشْتَرِكَةً وَأَنْ تَكُوْنَ مُطْلَقَةً وَأَنْ تَكُوْنَ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الشَّهْوَةِ وَأَنْ لَّا يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ لِأَنَّهَا عُرِفَتْ مُفْسِدَةً بِالنَّصِّ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فَيُرَاعٰى جَمِيْعُ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ وَيُكْرَهُ لَهُنَّ حُضُوْرُ الْجَمَاعَاتِ يَعْنِي الشَّوَابَّ مِنْهُنَّ لِمَا فِيْهِ مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ ـ

অনুবাদ : আর যদি ইমাম স্ত্রীলোকের ইমামতির নিয়ত না করে থাকেন, তাহলে পুরুষের নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে স্ত্রীলোকটির নামাজ জায়েজ হবে না। কেননা আমাদের মতে ইমামের নিয়ত ছাড়া সে নামাজে শামিল হওয়া সাব্যস্ত হবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, স্থানে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ইমামের কর্তব্য। সুতরাং তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের উপর বিষয়টি নির্ভর করবে। যেমন ইক্‌তিদার ক্ষেত্রে, (মুক্তাদীর জন্য ইমামের নিয়ত করা জরুরি) তবে ইমামের নিয়ত তখনই শর্ত হবে, যখন সে কোনো পুরুষের পার্শ্বে ইক্‌তিদা করে। পক্ষান্তরে যদি তার পার্শ্বে কোনো পুরুষ না থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে দুটি মত রয়েছে। উক্ত দুটি মতের একটির ক্ষেত্রে পার্থক্যের কারণ হলো, প্রথম সুরতে তো নামাজ ফাসিদ হওয়া অনিবার্য, আর দ্বিতীয় সুরতে সম্ভাবনাযুক্ত। নামাজ নষ্টকারী مُحَاذَاةٌ তথা-এক সমানে দাঁড়ানো"-এর জন্য শর্ত হলো (উভয়ের) নামাজ অভিন্ন হওয়া এবং (রুকূ সিজদা বিশিষ্ট) সাধারণ নামাজ হওয়া। (অর্থাৎ জানাযার নামাজের ক্ষেত্রে কোনো স্ত্রীলোকের পার্শ্ব অবস্থান দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা এটা প্রকৃতপক্ষে নামাজ নয়; বরং মাইয়েতের জন্য দোয়া) আর স্ত্রীলোকটি কামোত্তেজনাযোগ্য হওয়া এবং উভয়ের মাঝে কোনো আড়াল না থাকা। কেননা কিয়াস ও যুক্তির বিপরীতে শরিয়তের বাণী দ্বারা তা (নামাজ) ফাসিদ বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং নস সংক্রান্ত সকল বিষয় এক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে হবে। স্ত্রীলোকদের জামাআতে হাজির হওয়া মাকরূহ, অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা যুবতী। (তাদের জন্য এ হুকুম)। কেননা তাতে ফিতনার আশংকা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উক্ত ইবারতে একটি সুরত বয়ান করা হয়েছে। আর তা হলো– যখন ইমাম স্ত্রীলোকের ইমামতির নিয়ত না করে অর্থাৎ এ নিয়ত না করে যে, আমি এ স্ত্রীলোকের ইমাম, তখন এ সুরতে পুরুষের নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না, তবে ঐ স্ত্রীলোকের নামাজও জায়েজ হবে না।

দলিল : আমাদের মতে নিয়ত ব্যতীত اِشْتِرَاكٌ فِى الصَّلٰوةِ সাধিত হয় না। যদিও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে সাধিত হয়। কেননা ইমাম যুফার (র.)-এর মতে স্ত্রীলোকটি যখন পুরুষের নামাজে দাখিল হয়ে গেছে তখন পুরুষের নামাজ ফাসিদ হওয়ার জন্য স্ত্রীলোকের ইমাম হওয়ার নিয়ত করা শর্ত নয়। এ কারণে যে, পুরুষ-পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের ইমামত করতে পারে। উল্লেখ্য যে, পুরুষের ঐ পুরুষ ইমামের ইকতিদা করা ইমামতের নিয়ত ছাড়াও সহীহ, অর্থাৎ যদি ইমাম এ নিয়ত না করে যে, আমি তার ইমাম, তখনও পুরুষ ঐ ইমামের ইকতিদা করতে পারে। তাই এমনিভাবে ইমামতের নিয়ত ব্যতীত স্ত্রীলোকের ইক্‌তিদা করাও সহীহ হবে। সুতরাং বুঝা গেল, পুরুষের নামাজ ফাসিদ হওয়ার জন্য স্ত্রীলোকের ইমাম হওয়ার

নিয়ত করা শর্ত নয়। কিন্তু আমাদের মতে ইমামতের নিয়ত ব্যতীত ইশ্‌তিরাক সাধিত হয় না। তার কারণ হলো, হাদীসে বর্ণিত اخروهن এর কারণে মুক্তাদীদেরকে ধারাবাহিকভাবে দাঁড় করাবার দায়িত্ব ইমামের উপর এসে গেছে। অর্থাৎ স্থানের ধারাবাহিকতা ইমামের উপর লাযিম। আর যার উপর কোনো জিনিস লাযিম হয় তা আবার তার লাযিম করার উপর মওকুফ থাকে। অর্থাৎ সে লাযিম করলে লাযিম হবে নতুবা হবে না। যেমন– ইক্‌তিদা করার অবস্থা। মুক্তাদীর ইক্‌তিদা করার নিয়ত করা শর্ত, কেননা ঐ ইক্‌তিদার নিয়ত দ্বারা যে তার নামাজকে ইমামের জিম্মায় দিয়ে দিবে। যাতে ইমামের কোনো কাজ দ্বারা নামাজের ক্ষতি হলে তখন মুক্তাদীর তা কবুল করা এবং এ ব্যাপারে সম্মত থাকার দ্বারা তা তার উপর লাযিম হয়ে যাবে। এমনিভাবে ইমামের স্ত্রী লোকদের ইমামতের নিয়ত করা শর্ত। যাতে স্ত্রীলোকদের পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতি হলে তখন তা ইমামের পক্ষ থেকে কবুল করা হয়ে যায়।

শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.) ইমামতের নিয়ত ব্যতীত ইমামের নামাজ ফাসিদ না হওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত কারণ বয়ান করেছেন যে, যদি ইমামতের নিয়ত ব্যতীত স্ত্রীলোকের ইক্‌তিদাকে সহীহ বলা হয় তখন প্রত্যেক স্ত্রীলোক যা ইচ্ছে তাই করে পুরুষদের নামাজ ফাসিদ করে দেওয়ার শক্তি রাখবে। এভাবে যে, পুরুষের ইক্‌তিদা করে তার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, এতে পুরুষের ক্ষতি, এ কারণে পুরুষদের উপর ইমামতের নিয়ত করাকে শর্ত করে দেওয়া হয়েছে। যাতে, এ ক্ষতি পুরুষের সম্মতিতে তার উপর আপতিত হয়।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْاِمَامَةِ : বাক্যটি দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমামের উপর ইমামতের নিয়ত করা তখনই শর্ত যখন স্ত্রীলোক ইমামের মুহাযিয়া তথা বরাবর হয়ে ইমামের মুক্তাদী হয়। অর্থাৎ মুহাযাতের কারণে ইমামের নামাজ তখনই ফাসিদ হবে যখন স্ত্রীলোক তার মুহাযী হয়ে ইক্‌তিদা করে এবং ইমামও তার ইমামতের নিয়ত করে। আর যদি স্ত্রীলোকটি ইমামের পিছনে দাঁড়ায় তখন তার দু'টো সুরত রয়েছে। এক. এ স্ত্রীলোকটি কোনো পুরুষ মুক্তাদীর (محاذى) মুহাযী হয়ে দাড়াবে। দুই. কোনো পুরুষ মুক্তাদীর মুহাযী হয়ে দাঁড়াবে না। অর্থাৎ তার পার্শ্বে কোনো পুরুষ লোক নেই। যদি মহিলা বাশ্ববর্তী কোনো পুরুষ মুক্তাদীর মুহাযী হয়ে দাঁড়ায় তখন বিশুদ্ধ মত হলো, ইমামের নিয়ত ব্যতীত এ স্ত্রীলোকটি মুক্তাদিয়াহ হবে না। আর যদি স্ত্রীলোকটির পার্শ্বে কোনো পুরুষ না থাকে অর্থাৎ তার মুহাযী কোনো পুরুষ নেই তখন এতে দু'টো রিওয়ায়াত রয়েছে। এক রিওয়ায়াতে ইমামতের নিয়ত করা ইমামের জন্য শর্ত, আর অন্য রিওয়ায়েতে শর্ত নয়। উভয় রিওয়ায়াতের কারণ হলো, এ সুরতে বিল-ফেয়েল স্ত্রীলোকটি মুহাযী নয়। তাই তার যাতের দ্বারা কোনো ফাসাদও সৃষ্টি হয় নি। তবে এর সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে আগে বেড়ে গিয়ে মুহাযিয়া হয়ে যেতে পারে। এখন এ সম্ভাবনাকে যদি গ্রহণ করা হয়, তবে ইমামতের নিয়ত করা শর্ত হবে। তাহলে নামাজ ফাসিদ হওয়া তার ইল্‌তিযাম করার দ্বারা হবে। আর যদি এ সম্ভাবনাকে গ্রহণ না করা হয়, তখন ইমামতের নিয়ত করা শর্ত হবে মা। এখন কথা হলো এই দুই রিওয়ায়াতের মধ্য থেকে নিয়ত শর্ত হওয়ার রিওয়ায়াত আর প্রথম সুরতের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে?

এর জবাব হলো হলো, প্রথম সুরতের মধ্যে তথা যখন স্ত্রীলোক কোনো পুরুষের মুহাযীহ দাঁড়াবে তখন فَسَادٌ بِالْفِعْلِ হয়। আর দ্বিতীয় সুরতে ফাসাদের ইমকান আছে, অর্থাৎ যখন স্ত্রীলোক ইমামের পিছনে দাঁড়ায় এবং তার পার্শ্বে কোনো পুরুষ না থাকে, তখন এ সুরতে ফাসাদের সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে আগে বেড়ে গিয়ে পুরুষের মুহাযী হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এ محتمل-কে واقع-এর উপর কিয়াস করে নিয়তের শর্ত করা হয়েছে। এমনকি যদি محتمل-এর ইতিবার না করা হয় তবে নিয়ত শর্ত হবে না। যেমন– দ্বিতীয় রিওয়ায়াতে আছে।— (ইনায়া)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হিদায়ার ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, বিজ্ঞ মুসান্নিফের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রথম সুরত ও দ্বিতীয় রিওয়ায়াতের মাঝে পার্থক্য করতে হবে। পার্থক্য হলো, প্রথম সুরতে যেহেতু নামাজ ফাসিদ হয়ে যায় এ জন্য নিয়ত শর্ত, যাতে নামাজ ফাসিদ হওয়া তার ইল্‌তিযাম দ্বারা হয়। আর দ্বিতীয় সুরতের মধ্যে ফাসাদ যেহেতু মুহ্‌তামাল তথা সম্ভাবনাময়, তাই তার জন্য নিয়ত শর্ত করা হয়নি।

قَوْلُهُ وَمِنْ شَرَائِطِ الْمُحَاذَاتِ الخ : উপরোক্ত ইবারতে مُحَاذَاةٌ مُفْسِدَةٌ তথা এক সমানে দাঁড়ানোর দ্বারা নামাজ নষ্টকারী কাজের কতকগুলো শর্ত-সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক. উভয়ের নামাজ তাহ্‌রীমা ও আদা (اداء) উভয় মধ্যে মুশ্‌তারাক হওয়া। তাহরীমার মধ্যে মুশ্‌তারাক হওয়ার অর্থ হলো, উভয়ের তাহ্‌রীমার বেনা বা ভিত্তি ইমামের তাহ্‌রীমার উপর হওয়া অথবা উভয়ের মধ্য থেকে একজন অপরজনের তাহ্‌রীমার উপর বেনা করেছে এভাবে যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্য থেকে একজন ইমাম আর অপরজন মুক্তাদী। আর আদা-এর মধ্যে মুশ্‌তারাক হওয়ার অর্থ হলো– যে নামাজ তারা উভয়ে আদায় করবে উহার মধ্যে তাদের উভয়ের কোনো একজন হাকীকাতান বা হুকমান হবে। যেমন– একজন পুরুষ ও একজন মহিলা তৃতীয় রাকআতে ইমামের ইক্‌তিদা করেছে, পরে তাদের হাদাস হওয়ায় তারা অজু করতে গেছে অতঃপর এসে নামাজ

আরম্ভ করে দিল পথিমধ্যে কোনো স্ত্রীলোক তাদের মুহাযী হয়ে গেল। এমতাবস্থায় স্ত্রীলোকটি যদি ইমামের তৃতীয় বা চতুর্থ রাকআতে মুহাযী হয় যা তাদের উভয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআত। তখন পুরুষের নামাজ ঐ মুহাযাতের কারণে ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে তাহ্রীমা এবং আদা উভয় দিক থেকে ইশ্তিরাক আছে. اِشْتِرَاكْ فِى التَّحْرِيْمَةِ তো এ কারণে যে, উভয়ের তাহরীমার বেনা ইমামের তাহরীমার উপর। আর اِشْتِرَاكْ فِى الْاَدَاءِ এ জন্য যে, তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে তাদের উভয়ের ইমাম একজন, যদিও হুক্মান। হুক্মান এ কারণে যে, যখন তারা উভয়ে অজু করতে গেল তখন ইমাম তার নামাজ পূর্ণ করে ফেলেছে। তাই তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে তারা উভয়ে লাহিক হয়ে গেছে। আর লাহেকের জন্য যদিও হাকীকাতান ইমাম হয় না কিন্তু হুকমান ইমাম হয়, আর যদি শেষের দুই রাকআত পড়ে নিজের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে (যা মূলত তার প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআত) গিয়ে মুহাযী হয় তখন পুরুষের নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতে তারা উভয়ে মাসবূক। আর মাসবূক যখন তার ফউত হওয়া নামাজগুলো আদায় করে তখন তার কোনো ইমাম থাকে না। হাকীকাতানও না, হুকমানও না। সুতরাং ঐ দুই রাকআতে যদিও شِرْكَتْ فِى التَّحْرِيْمَةِ বিদ্যমান কিন্তু شِرْكَتْ فِى الْاَدَاءِ নেই। এ জন্য এ সুরতে মুহাযাতের কারণে নামাজ ফাসিদ হবে না।

দ্বিতীয় শর্ত হলো, রুকূ ও সিজ্দা বিশিষ্ট সাধারণ নামাজ হওয়া। যদিও কোনো ওজর বশত তা ইশারা করে আদায় করা হয়। সুতরাং জানাযার নামাজে মুহাযাতের যে নামাজ ফাসিদ হবে না।

তৃতীয় শর্ত হলো, স্ত্রীলোকটি কামোত্তেজনাযোগ্য হওয়া, চাই এ স্ত্রীলোকটি দাসী, বা আযাদ হোক, স্ত্রী কিংবা মা বা বোন ইত্যাদি মাহরাম হোক।

চতুর্থ শর্ত হলো, উভয়ের মাঝে কোনো আড়াল না থাকা, যেমন খাম বা অন্য কোনো জিনিস থাকা, অথবা এতটুকু পরিমাণ স্থান খালি থাকা, যাতে একজন পুরুষ দাঁড়াতে পারে। উপরোক্ত শর্তগুলোর দলিল হলো, মুহাযাতের কারণে নামাজ বিনষ্ট হওয়া খোলাফে কিয়াস নস তথা اَخِّرُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَخَّرَهُنَّ اللّٰهُ দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং ঐ সকল বিষয় বিদ্যমান থাকতে হবে যার সাথে নস সংশ্লিষ্ট আছে।

ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, উক্ত দলিল ঠিক নয়। কেননা এ হাদীসের মধ্যে তো নামাজের কোনো কথাই নেই। তবে কিভাবে ঐ قَيْد গুলোর কথা থাকবে? তবে কোনো কোনো আলিম ঐ قَيْد গুলো সাব্যস্ত করার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। এগুলো জানার জন্য আল্লামাতুল হিন্দ মাওলানা আব্দুল হাই (র.)-এর কৃত হিদায়ার হাশিয়া অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

وَيُكْرَهُ لَهُنَّ حُضُوْرُ যুবতী স্ত্রীলোকদের জামাআতে হাজির হওয়া মাকরূহ। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, স্ত্রীলোকদের মসজিদে যাওয়া মুবাহ। তাঁর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– لَا تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদসমূহ থেকে বারণ করো না। অন্য রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, اِذَا اسْتَاْذَنَتْ اَحَدَكُمْ اِمْرَاَتُهُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا. যখন তোমাদের মধ্য থেকে কারো বিবি মসজিদে যাবার জন্য ইজাযত চায় তখন তাকে নিষেধ করো না।

আমাদের প্রথম দলিল : যুবতী স্ত্রীলোকদের উপস্থিতি দ্বারা ফিত্নার আশংকা রয়েছে। তাই তাদেরকে মস্জিদে হাজির হওয়া থেকে বারণ করা হবে।

দ্বিতীয় দলিল : যখন হযরত ওমর (রা.) স্ত্রীলোকদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করলেন, তখন স্ত্রীলোকেরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট গিয়ে অভিযোগ করল। তখন উম্মুল মু'মিনীন (রা.) বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ অবস্থার ইল্ম থাকতো যার ইলম হযরত ওমরের (এখন) আছে, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ একেবারেই ইজাজত দিতেন না। অন্য রিওয়ায়াতে আছে উম্মুল মু'মিনীন (রা.) বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এখনকার নামাজীদের হালাত দেখতেন তাহলে যেমনিভাবে বনী ইসরাঈলের স্ত্রীলোকদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তোমাদেরকে তেমনিভাবে তিনি নিষেধ করতেন।

আমাদের মাযহাবের সমর্থন ঐ হাদীস দ্বারাও হয় যাকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল বার স্বীয় সনদে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, রিওয়ায়াতটি হলো— اَيُّهَا النَّاسُ اِنْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّيْنَةِ وَالتَّبَخْتُرِ فِى الْمَسَاجِدِ فَاِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يُلْعَنُوْا حَتّٰى لَبِسَتْ نِسَاءُهُمُ الزِّيْنَةَ وَتَبَخْتَرُوْا فِى الْمَسَاجِدِ. অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমাদের স্ত্রীলোকদেরকে সুসজ্জিত ও তাকাব্বুরের পোশাক পরিধান করে মসজিদে গমন করা থেকে নিষেধ করে দাও। কেননা বনী ইসরাইলের লোকেরা তখনই অভিশপ্ত হয়েছে যখন তাদের স্ত্রীলোকেরা সুসজ্জিত ও অহংকার জনিত পোশাক পরিধান করে মস্জিদে গমন করেছে। আর যেহেতু আমাদের যুগে ফাসিক ফুজ্জারের প্রবণতা বেশি, তাই সকল স্ত্রীলোকদেরই মসজিদে যাওয়া নিষেধ।

وَلَابَأْسَ لِلْعَجُوْزِ اَنْ تَخْرُجَ فِى الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا يَخْرُجْنَ فِى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِاَنَّهُ لَافِتْنَةَ لِقِلَّةِ الرَّغْبَةِ فَلَايُكْرَهُ كَمَا فِى الْعَبْدِ وَ لَهُ اَنَّ فَرْطَ الشَّبَقِ حَامِلٌ فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ غَيْرَ اَنَّ الْفُسَّاقَ اِنْتِشَارُهُمْ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْجُمُعَةِ اَمَّا فِى الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ هُمْ نَائِمُوْنَ وَفِى الْمَغْرِبِ بِالطَّعَامِ مَشْغُوْلُوْنَ وَالْجَبَّانَةُ مُتَّسِعَةٌ فَيُمْكِنُهَا الْاِعْتِزَالُ عَنِ الرِّجَالِ فَلَايُكْرَهُ ـ

অনুবাদ : বৃদ্ধাদের জন্য ফজর, মাগরিব ও ঈশার জামাআতের উদ্দেশ্যে বের হওয়াতে অসুবিধা নেই। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে কোনো নামাজেই তারা বের হতে পারে। কেননা আকর্ষণ না থাকায় ফিতনার আশংকা নেই। তাই মাকরূহ হবে না। যেমন, ঈদের জামাআতে (শরিক বা হাজির হওয়া মাকরূহ নয়)। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, প্রবৃত্তির প্রাবল্য (দুষ্কর্মে) উদ্বুদ্ধ করে থাকে। সুতরাং ফিতনা ঘটতে পারে। তবে জোহর, আসর ও জুমার সময় ফাসিকদের উপদ্রব থাকে। আর ফজর ও ঈশার সময় (সাধারণত) তারা ঘুমিয়ে থাকে এবং মাগরিবে পানাহারে মশগুল থাকে। আর (ঈদের) মাঠ প্রশস্ত হওয়ার কারণে পুরুষদের থেকে পাশ কেটে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব; তাই মাকরূহ হয় না। (মূল কথা, ইসলামের শুরুতে স্ত্রীলোকদের জন্য জামাআতে হাজির হওয়ার অনুমতি ছিল। কিন্তু যখন তাদের বের হওয়াটা ফিতনার কারণ হয়ে দেখা দিল তখন তাদেরকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদেরকে জোহর এবং আসরের সময় বের হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। তবে ফজর, ঈশা এবং মাগরিবের সময় বের হওয়ার ইজাজত দিয়েছেন। সাহেবাইন (র.) বৃদ্ধাদেরকে সকল নামাজে বের হওয়ার ইজাজত দিয়েছেন। তাদের দলিল হলো, বৃদ্ধাদের মধ্যে আকর্ষণ কম থাকায় কোনো ফিতনার আশংকা নেই। এ জন্য তাদের বের হওয়া মাকরূহও নয়। যেমন ঈদের নামাজের জন্য বের হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঈদের মধ্যে বের হওয়া ঈদের নামাজেব জন্য, নাকি নামাজের জন্য নয়? এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে দু'টো বর্ণনা রয়েছে। এক রিওয়ায়াত যা হাসান ইবনে রিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা ঈদের নামাজের জন্য বের হবে এবং কাতারের শেষে দাঁড়িয়ে পুরুষের সাথে নামাজ আদায় করবে। কেননা স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের অনুগত হয়ে জামাআত ওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় রিওয়ায়াত যা মু'আল্লা (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ঈদের মধ্যে বৃদ্ধাদের বের হওয়া জামাআতের সমাগম অধিক্যের জন্য, অর্থাৎ তারা একদিকে দাঁড়িয়ে থাকবে। পুরুষদের সাথে নামাজ পড়বে না। কেননা বিশুদ্ধ সূত্রে এ কথা সাব্যস্ত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঋতুমতী স্ত্রীলোকদেরকে ঈদের মধ্যে বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ তারা এ অবস্থায় নামাজের যোগ্য নয়। বুঝা গেল যে, ঈদের মধ্যে বের হওয়া ঈদের নামাজের জন্য নয়; বরং জামাআতের আধিক্যের জন্য।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, প্রবৃত্তির প্রাবল্য সহবাসের কারণ। তাই বৃদ্ধাদের বের হওয়ার দ্বারাও ফিতনা ঘটতে পারে। তবে ফাসিক লোকেরা জোহর, আসর এবং জুমার সময় ঘুরাফিরা করে, তাই ঐ সময়গুলোতে বৃদ্ধারা বের হবে না। আর ফজর ও ইশার সময় তারা ঘুমিয়ে থাকে আর মাগরিবের সময় খানা-পিনায় মাশগুল থাকে। বুঝা গেল যে, এ তিন সময় ফাসিকদের থেকে নিরাপদ সময়। তাই এ তিন সময়ে বৃদ্ধাদেরকে নামাজের জন্য বের হওয়ার ইজাজত দেওয়া হয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সাহেবাইনের ঈদের মধ্যে বের হওয়ার উপর কিয়াস করা জায়েজ হবে না। কেননা ঈদের নামাজ সাধারণত মাঠে-ময়দানে হয়ে থাকে। আর মাঠ-ময়দান প্রশস্ত হওয়ায় বৃদ্ধাদের পুরুষদের থেকে আলাদা থাকা সম্ভব। এ জন্য তাদের ঈদের মধ্যে বের হওয়া মাকরূহ নয়।

ফায়েদা ঃ আজকাল যেহেতু ফিতনা ফ্যাসাদ ব্যাপক, তাই সমস্ত নামাজেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের বের হওয়া মাকরূহ।− (ঈনায়া)

قَالَ وَلَا يُصَلِّى الطَّاهِرُ خَلْفَ مَنْ هُوَ فِىْ مَعْنَى الْمُسْتَحَاضَةِ وَلَا الطَّاهِرَةُ خَلْفَ الْمُسْتَحَاضَةِ لِاَنَّ الصَّحِيْحَ اَقْوٰى حَالًا مِنَ الْمَعْذُوْرِ وَالشَّيْئُ لَايَتَضَمَّنُ مَا هُوَ فَوْقَهُ وَالْاِمَامُ ضَامِنٌ بِمَعْنٰى تَضْمَنُ صَلَاتُهُ صَلٰوةَ الْمُقْتَدِىْ وَلَا يُصَلِّى الْقَارِئُ خَلْفَ الْاُمِّىِّ وَلَا الْمُكْتَسِىْ خَلْفَ الْعَارِىْ لِقُوَّةِ حَالِهِمَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পবিত্র ব্যক্তি মুস্তাহাযা এর শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির পিছনে নামাজ আদায় করবে না। সেরূপ পবিত্র স্ত্রীলোকও মুস্তাহাযা-এর পিছনে নামাজ আদায় করবে না। কেননা সুস্থ ব্যক্তির (তাহারাতের) অবস্থা মাজুর ব্যক্তির চেয়ে উন্নততর। আর কোনো কিছু তার চেয়ে উন্নত কিছুর দায়িত্ব বহন করতে পারে না। আর ইমাম হচ্ছেন দায়িত্ব বহনকারী। অর্থাৎ মুক্তাদীর নামাজ তার নামাজের আওতাভুক্ত। কুরআন পাঠে সক্ষম ব্যক্তি উম্মী লোকের পিছনে এবং বস্ত্রধারী ব্যক্তি উলঙ্গ ব্যক্তির পিছনে নামাজ আদায় করবে না। কেননা তাদের দু'জনের অবস্থা উন্নততর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুস্তাহাযা এবং যারা মুস্তাহাযার হুকুমে ফুকাহাদের পরিভাষায় তাদেরকে মাজুর বলা হয়। এখন সূরতে মাসআলা হলো, পবিত্র ব্যক্তি মাজুরের পিছনে নামাজ পড়বে না। পাক মহিলা মুস্তাহাযা মহিলার পিছনে নামাজ পড়বে না। দলিলের পূর্বে একথা বুঝতে হবে যে, এ ধরনের সকল মাসআলার আসল বা মূল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ। হাদীসের অর্থ হলো, ইমামের নামাজ মুক্তাদীর নামাজের জন্য متضمن। এর অর্থ এ নয় যে, ইমাম মুক্তাদীর নামাজের জিম্মাদার। দ্বিতীয় কথা হলো, কোনো কিছু তার চেয়ে অনুন্নত বা তার সমপর্যায়ের কোনো কিছুর দায়িত্ব বহন করতে পারে কিন্তু তার চেয়ে উন্নত কিছুর দায়িত্ব বহন করতে পারে না। উক্ত দলিলের হাসিল হলো, উপরোক্ত সুরতে মুক্তাদী যেহেতু পাক এবং গায়রে মাজুর আর ইমাম মাজুরের হুকুমে। তাই মুক্তাদীর নামাজের অবস্থা ইমমের নামাজের অবস্থার চেয়ে উন্নততর। আর ইমামের নামাজের অবস্থা অনুন্নত। আর যেহেতু অনুন্নত কোনো কিছু উন্নত কিছুকে বহন করতে পারে না; তাই এখানে ইমামের নামাজও মুক্তাদীর নামাজকে বহন করতে পারবে না। অথচ ইমামের নামাজ মুক্তাদীর নামাজকে বহন করে থাকে। এ জন্য পাকও গায়রে মাজুরের ইক্‌তিদা মাজুরের পিছনে জায়েজ নেই। এমনিভাবে পাক স্ত্রীলোকের ইকতিদা মুস্তাহাযা মহিলার পিছনে জায়েজ নেই। কেননা মুস্তাহাযার নামাজের অবস্থা মুক্তাদী স্ত্রী লোকের নামাজের অবস্থার চেয়ে নিম্নতর।

وَيَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِيْنَ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ وَأَبِىْ يُوسُفَ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) لَايَجُوْزُ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُوْرِيَّةٌ وَالطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ اَصْلِيَّةٌ وَلَهُمَا أَنَّهُ طَهَارَةٌ مُطْلَقَةٌ وَلِهٰذَا لَايَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَيَؤُمُّ الْمَاسِحُ الْغَاسِلِيْنَ لِاَنَّ الْخُفَّ مَانِعٌ سِرَايَةَ الْحَدَثِ إِلَى الْقَدَمِ مَاحَلَّ بِالْخُفِّ يُزِيْلُهُ الْمَسْحُ بِخِلَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِاَنَّ الْحَدَثَ لَمْ يُعْتَبَرْ زَوَالُهُ شَرْعًا مَعَ قِيَامِهِ حَقِيْقَةً ـ

অনুবাদ : আর জায়েজ রয়েছে তায়াম্মুমকারীর জন্য অজুকারীদের ইমামতি করা। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জায়েজ হবে না। কেননা তায়াম্মুম জরুরি অবস্থার তাহারাত। আর পানি হলো তাহারাতের মূল উপাদান। ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, এটা (সাময়িক তাহারাত নয় বরং) সাধারণ তাহারাত। (অর্থাৎ ওয়াক্তের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যেমন মুস্তাহাযার তাহারাত ওয়াক্তের সাথে সীমাবদ্ধ) সুতরাং এ কারণেই তা প্রয়োজনের সাথে সীমিত থাকে না। (মোজায়) মাসেহকারী ব্যক্তি পা ধৌতকারীদের ইমামতি করতে পারবে। কেননা মোজা পায়ের পাতায় হাদাস-এর অনুপ্রবেশে বাধা দেয়। আর মোজায় যে হাদাস যুক্ত হয়, সেটাকে মাসেহ্ দূর করে দেয়। মুস্তাহাযার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা বাস্তবে হাদাস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় শরিয়তে তা বিদূরীত হয়ে গেছে বলে গণ্য করা যায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অজুকারী ব্যক্তি তায়াম্মুমকারীর পিছনে ইক্‌তিদা করতে পারে কিনা এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে? শায়খাইন (র.)-এর মতে ইকতিদা করা জায়েজ আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জায়েজ নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, তায়াম্মুম হলো জরুরি অবস্থার তাহারাত। আর পানি দ্বারা তাহারাত হলো তাহারাতে আসলিয়া, আর এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই যে, তাহারাতে আসলিয়ার অধিকারী ব্যক্তি শক্তিশালী– তাহারাতে জরুরিয়ার অধিকারী ব্যক্তির তুলনায়। বুঝা গেল যে, মুক্তাদীর অবস্থা ইমামের অবস্থার চেয়ে শক্তিশালী। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, অনুন্নত হালাতের অধিকারী ব্যক্তি উন্নত হালাতের অধিকারীর ইমামত করতে পারে না। এ জন্য আমরা বলেছি তায়াম্মুমকারীর জন্য অজুকারীর ইমামত করা জায়েজ নেই।

শায়খাইন (র.) -এর দলিল হলো, তায়াম্মুম তাহারাতে মুত্‌লাকাহ তথা সাধারণ তাহারাত। মুস্তাহাযার ন্যায় সাময়িক তাহারাত নয়। এ কারণেই তায়াম্মুম প্রয়োজনের সাথে সীমিত থাকে না; বরং দশ বছরও যদি পানি না পাওয়া যায় অথবা পানি ব্যবহারে কুদরত হাসিল না হয় তারপরও তায়াম্মুম বহাল থাকবে। যেহেতু তায়াম্মুম তাহারাতে মুতলাকাহ সেহেতু তায়াম্মুমকারী আর অজুকারী উভয়ের অবস্থা সমান হয়ে গেল। আর যখন উভয়ের অবস্থা সমান হলো, তখন একে অপরের ইমামত করতে পারবে।

قَوْلُهُ وَيَؤُمُّ الْمَاسِحُ الْغَاسِلِيْنَ الخ : মোজায় মাসেহকারী ব্যক্তি, পা ধৌতকারীদের ইমামতি করতে পারবে। দলিল হলো, মোজাধারী ব্যক্তি তার পা ধৌত করে মোজা পরিধান করেছে। আর মোজা পায়ের পাতা পর্যন্ত হাদাস এর অনুপ্রবেশে বাধা দেয়। এখন এ ব্যক্তি পা ধৌতকারী ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেছে। প্রশ্ন হলো, হাদাস তো মোজার পূর্বেই ঢুকে পড়েছে? জবাব হলো, যা কিছু মোজার মধ্যে ঢুকেছে তাকে মাসেহ্ দূরীভূত করে দিয়েছে। এ জন্য মোজাধারীর তাহরত ধৌতকারীর তাহারাতের ন্যায় হয়ে গেছে। মুস্তাহাযার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ তার পিছনে মাজুর হওয়ার কারণে ইক্তিদা করা জায়েজ নেই। এর কারণ হলো, মাজুরের হাদাস মূলত বিদ্যমান। তাই হাদাস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় শরিয়ত তাকে মাজুরই আখ্যা দিয়েছে। এমন নয় যে হাদীসকে দূরীভূত করে দিয়েছে। সুতরাং যেহেতু মাজুরের সাথে হাদাস বিদ্যমান, তাই গায়রে মাজুরের জন্য তার পিছনে ইক্‌তিদা করা জায়েজ হবে না।

وَيُصَلِّى الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ لَايَجُوْزُ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِقُوَّةِ حَالِ الْقَائِمِ نَحْنُ تَرَكْنَاهُ بِالنَّصِّ وَهُوَ مَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى اٰخِرَ صَلَاتِهِ قَاعِدًا وَالْقَوْمُ خَلْفَهُ قِيَامٌ وَيُصَلِّى الْمُؤْمِىْ خَلْفَ مِثْلِهِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِى الْحَالِ اِلَّا اَنْ يُوْمِىَ الْمُؤْتَمُّ قَاعِدًا وَالْاِمَامُ مُضْطَجِعًا لِاَنَّ الْقُعُوْدَ مُعْتَبَرٌ فَيَثْبُتُ بِهِ الْقُوَّةُ ـ

অনুবাদ : দাঁড়ানো ব্যক্তি বসা ব্যক্তির পিছনে (ইক্‌তিদা করে) নামাজ আদায় করতে পারবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তা জায়েজ হবে না। কিয়াসের দাবি এই। কেননা দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারীর অবস্থা উন্নততর। আমরা হাদীসের কারণে কিয়াস বর্জন করেছি। কেননা বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ তাঁর শেষ নামাজ বসে আদায় করেছেন আর লোকজন তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইশারায় নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি অনুরূপ ব্যক্তির পিছনে নামাজ আদায় করতে পারবে। কেননা উভয়ের অবস্থা সমান, তবে যদি মুক্তাদী বসে আর ইমাম শুয়ে ইশারা করে তবে তার পিছনে ইকতিদা জায়েজ হবে না। কেননা বসা শরিয়তে স্বীকৃত। (তাইতো বসতে সক্ষম অবস্থায় চিত হয়ে ইশারার মাধ্যমে নফল নামাজ আদায় করা জায়েজ নয়) সুতরাং এর দ্বারা তা উন্নত হওয়া প্রমাণিত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির বসে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে ইক্‌তিদা করা জায়েজ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জায়েজ নেই। কিয়াসের দাবিও তাই। কেননা দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারীর অবস্থা বসে আদায়কারীর তুলনায় উন্নততর। সুতরাং যেমনিভাবে সুস্থ ব্যক্তির ইক্‌তিদা ঐ অসুস্থ ব্যক্তির পিছনে জায়েজ নেই যে ইশারা করে নামাজ আদায় করে। কেননা সুস্থ ব্যক্তির অবস্থা অসুস্থ ব্যক্তির তুলনায় উন্নততর। এমনিভাবে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারীর ইক্‌তিদাও বসে আদায়কারীর পিছনে জায়েজ হবে না। কিন্তু আমরা এ কিয়াসকে নস তথা হাদীসের কারণে বর্জন করেছি। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন তিনি বললেন, আবূ বকরকে বলো, সে যেন লোকদেরকে নামাজ পড়িয়ে দেয়। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) হযরত হাফসা (রা.)-কে বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে গিয়ে বলো যে, আবূ বকর নরম হৃদয়ের লোক, যখন সে তাঁর মুসল্লায় দাঁড়াবেন তখন নিজের উপর শক্তি হারিয়ে ফেলবেন। এ জন্য তিনি যেন অন্য কাউকে নামাজ পড়াবার জন্য বলেন। হযরত আয়েশা (রা.) এ কথাগুলো দু'বার বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, اَنْتُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوْسُفَ তোমরাতো ইউসুফ (র.)-এর জীবন সঙ্গীনীদের ন্যায়। আবূ বকরকে বলো সে যেন লোকদেরকে নামাজ পড়িয়ে দেয়। অতঃপর যখন সিদ্দীকে আকবর (রা.) নামাজ শুরু করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুটা স্বস্তিবোধ করছিলেন। তাই হযরত আব্বাস ও আলী (রা.)-এর উপর ভর করে তিনি মসজিদে তাশরীফ নিলেন। যখনই হযরত আবূ বকর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের অবস্থা অনুভব করলেন, সাথে সাথে তিনি পিছনে চলে গেলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে গেলেন এবং বসে বসে নামাজ পড়ালেন। আবূ বকর (রা.) রাসূলের নামাজের সাথে নামাজ পড়লেন। আর লোকেরা আবূ বকরের নামাজের সাথে নামাজ পড়ল। মোটকথা রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে বসে ইমামত করলেন, আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাকবীর শুনে তাকবীর বলতেন আর লোকেরা আবূ বকরের তাকবীর শুনে তাকবীর বলতো। এটা রাসূলুল্লাহর ﷺ সর্বশেষ নামাজ যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমামত করেছেন। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি বসে নামাজ আদায়কারীর পিছনে ইকতিদা করতে পারবে।

মাসআলা : ইশারায় নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির অনুরূপ ব্যক্তির পিছনে ইক্‌তিদা করা জায়েজ। যদিও ইমাম বসে বসে ইশারা করে। আর মুক্তাদী দাঁড়িয়ে ইশারা করে। কেননা দাঁড়িয়ে ইশারা করে নামাজ আদায়ের সুরতে কিয়াম রুকন থাকে না; বরং তা তরক করা উত্তম, তাই এ কিয়াম আদমে কিয়ামের হুকুমে। দলিলের খোলাসা হলো– ইমাম আর মুক্তাদী অবস্থার দিক থেকে উভয়ে সমান। তাই একে অপরের ইক্‌তিদা করা জায়েজ হবে। তবে মুক্তাদী যদি বসে বসে ইশারা করে আর ইমাম শুয়ে শুয়ে ইশারা করে তবে এ সুরতে ইক্‌তিদা জায়েজ হবে না। কেননা এ বসাতো গ্রহণযোগ্য রুকন। আর গ্রহণযোগ্য হওয়ার দলিল হচ্ছে– যদি কারো বসে ইশারা করে নামাজ আদায়ের শক্তি থাকে তবে তার শুয়ে ইশারা করে নফল নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না। এতে বুঝা গেল যে, বসা-এটা একটি গ্রহণযোগ্য রুকন। আর বসা যখন গ্রহণযোগ্য রুকন হলো তখন তার সাথে মুক্তাদীর অবস্থা উন্নত হয়ে যায়– যা ইমামের জন্য হয় না। আর যেহেতু উন্নত অবস্থার অধিকারী ব্যক্তির জন্য অনুন্নত অবস্থার অধিকারীর পিছনে ইক্‌তিদা জায়েজ নেই; সেহেতু বসে ইশারাকারী ব্যক্তির জন্য শুয়ে ইশারাকারী পিছনে ইক্‌তিদা করা জায়েজ হবে না।

وَلَا يُصَلِّي الَّذِيْ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمُوْمِيْ لِاَنَّ حَالَ الْمُقْتَدِيْ اَقْوٰى وَفِيْهِ خِلَافُ زُفَرَ (رحـ) وَلَا يُصَلِّي الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ لِاَنَّ الْاِقْتِدَاءَ بِنَاءٌ وَ وَصْفُ الْفَرْضِيَّةِ مَعْدُوْمٌ فِيْ حَقِّ الْاِمَامِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْبِنَاءُ عَلَى الْمَعْدُوْمِ قَالَ وَلَا مَنْ يُصَلِّيْ فَرْضًا خَلْفَ مَنْ يُصَلِّيْ فَرْضًا اٰخَرَ لِاَنَّ الْاِقْتِدَاءَ شِرْكَةٌ وَمُوَافَقَةٌ فَلَابُدَّ مِنَ الْاِتِّحَادِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيْ (رحـ) يَصِحُّ فِيْ جَمِيْعِ ذَالِكَ لِاَنَّ الْاِقْتِدَاءَ عِنْدَهُ اَدَاءٌ عَلٰى سَبِيْلِ الْمُوَافَقَةِ وَعِنْدَنَا مَعْنَى التَّضَمُّنِ مُرَاعًى ـ

অনুবাদ : রুকূ সিজদাকারী ব্যক্তি ইশারাকারী ব্যক্তির পেছনে নামাজ আদায় করবে না। কেননা মুক্তাদীর অবস্থা উন্নততর। এ সম্পর্কে ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। ফরজ আদায়কারী নফল আদায়কারীর পিছনে নামাজ আদায় করবে না। কেননা ইক্তিদা অর্থ ভিত্তি করা, আর এখানে ইমামের ক্ষেত্রে "ফরজ" গুণটি নেই। সুতরাং যে গুণ নেই, তার উপর ভিত্তি স্থাপিত হবে না। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এক ফরজ আদায়কারী ব্যক্তি ভিন্ন ফরজ আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে নামাজ আদায় করবে না। কেননা ইক্তিদা হলো (একই তাহ্‌রীমায়) শামিল হওয়া এবং সামঞ্জস্য রক্ষা করা। সুতরাং (নামাজে) অভিন্নতা অপরিহার্য। ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর মতে উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রে ইক্তিদা সহীহ। কেননা তাঁর মতে ইক্তিদা হলো সমন্বিত রূপে আদায় করা। আর আমাদের মতে দায়িত্বের অন্তর্ভুক্তির অর্থ বিবেচ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : রুকূ সিজ্‌দাকারী ব্যক্তি ইশারাকারী ব্যক্তির পিছনে নামাজ পড়বে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, ইশারাকারী ব্যক্তি রুকূ সিজ্‌দাকারী ব্যক্তির ইমামত করতে পারবে। তাঁর দলিল হচ্ছে– ইশারাকারী ব্যক্তি থেকে রুকূ এবং সিজদা ইশারার বিনিময়ে রহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ রুকূ ও সিজ্‌দা যদিও রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু তার বদলা তথা ইশারা বিদ্যমান। আর বদলার সাথে আদায় করা এমন যেমন আসল-এর সাথে আদায় করা। এ কারণে তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি অজুকারীর ইমামত করতে পারে।

আমাদের দলিল হচ্ছে– এই মাসআলায় মুক্তাদীর অবস্থা উন্নত, আর ইমামের অবস্থা অনুন্নত। উপরে এ নীতি বর্ণিত হয়েছে যে, অনুন্নত অবস্থাধারী ব্যক্তি উন্নত অবস্থাধারীর ইমামত করতে পারবে না। ইমাম যুফারের বক্তব্য "ইশারা রুকূ ও সিজ্‌দার বদলা" - তা আমরা মানি না। কেননা ইশারা রুকূ ও সিজদার بعض বা অংশ বিশেষ। আর بعض شئ – অন্য شئ-এর বদলা হতে পারে না। وَلَايُصَلِّي الْمُفْتَرِضُ الخ – ফরজ আদায়কারীর জন্য নফল আদায়কারীর পিছনে ইকতিদা করা জায়েজ নেই। কেননা ইকতিদা মানে– ভিত্তি করা। আর ভিত্তি হলো اَمْرِ وُجُوْدِيْ,اَمْرِ عَدَمِيْ . নয়। কেননা ভিত্তি (بناء) হলো কোনো ব্যক্তির অপরের افعال -কে صفات-এর সাথে অনুসরণ করা। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, অনুসরণ করা এটা مفهوم وجودى ,مفهوم سلبى নয়। তা ছাড়া امر وجودى-এর ভিত্তি امر عدمى-এর উপর সহীহ নয়। তাই যেহেতু উপরোক্ত মাসআলায় ফরজ গুণটি ইমামের নেই; তাই তার বেনা করা সাব্যস্ত হবে না। আর যখন বেনা করা সাব্যস্ত হলো না তখন ইকতিদা করাও সহীহ হবে না।

قَوْلُهُ وَلَامَنْ يُصَلِّيْ فَرْضًا الخ : এক ফরজ আদায়কারী ব্যক্তি অপর ফরজ আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে ইক্তিদা করবে না। যেমন– জোহর আদায়কারীর ইক্তিদা আসর আদায়কারীর পিছনে জায়েজ নেই। দলিল হলো, ইক্তিদা বলা হয় একই তাহ্‌রীমায় শামিল হওয়া এবং শারিরিক কার্যাবলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা। আর এ শামিল হওয়া ও মুওয়াফাকাত তখনই

হবে যখন উভয়ের তাহরীমা আর আফয়াল এক ও অভিন্ন হবে। যেহেতু উপরোক্ত সুরতে অভিন্নতা নেই তাই ইক্তিদাও সহীহ হবে না।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে উপরোক্ত সকল সুরতে ইক্তিদা জায়েজ আছে। অর্থাৎ রুকু সিজ্দাকারী ব্যক্তি ইশারাকারীর ইক্তিদা করতে পারে। এমনিভাবে ফরজ আদায়কারী নফল আদায়কারীর এবং এক ফরজ আদায়কারী অপর ফরজ আদায়কারীর ইক্তিদা করতে পারে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হচ্ছে– ইক্তিদা عَلٰى سَبِيْلِ الْمُوَافَقَةِ তথা সমন্বিত রূপে আরকান আদায় করার নাম। অর্থাৎ শুধু আমলের মধ্যে সমন্বিত রূপ হবে। সুতরাং তার মতে যেন প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় নামাজের ক্ষেত্রে মুনফারিদ। আর জামা'আত তো শুধু এতটুকুনের মধ্যে যে, যে আফয়াল (افعال) প্রত্যেকে আদায় করার তা একসাথে আদায় করবে। সুতরাং এ দলিল দ্বারা বুঝা গেল যে, শাওয়াফেদের মতে শুধু আফয়ালের মধ্যে সমন্বিত হওয়া জরুরি, তাহ্রীমায় শরিক থাকা জরুরি নয়। আর যেহেতু তাহ্রীমায় শরিক থাকা জরুরি নয় সেহেতু এক ফরজ আদায়কারী অপর ফরজ আদায়কারীর পিছনে ইক্তিদা করতে পারবে। আর আমাদের মতে সমন্বিত (موافقت) হওয়ার সাথে সাথে দায়িত্বের অন্তর্ভুক্তির অর্থও বিবেচ্য হবে। অর্থাৎ ইমামের নামাজ মুক্তাদীর নামাজকে শামিল করে। এমনকি ইমামের নামাজ ফাসিদ হওয়া দ্বারা মুক্তাদীর নামাজও ফাসিদ হয়ে যায়, ইমামের নামাজ সহীহ হওয়ার দ্বারা মুক্তাদীর নামাজ সহীহ হয়ে যায়। ইমামের যামানাত হওয়ার দলিল হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ হাদীস। মোটকথা, আমাদের মতে জামা'আতের সাথে নামাজ আদায় করা এমন– যেমন কোনো ব্যক্তি কিছু লোককে দাওয়াত করল এবং খাওয়ার ইন্তিযামও নিজেই করল। এখন দাওয়াতকারী ব্যক্তি যেন মাদউ তথা দাওয়াতকৃতদের খাওয়ার শামিল হয়ে গেল। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করা এমন যেমন কিছু লোক তাদের নিজেদের ঘর থেকে খানা নিয়ে কোনো এক ব্যক্তির দস্তরখানে একত্রিত হলো এবং সকলে একত্রে খানা খেলো। এখানে তারা একে অপরের সাথে যেন শুধু খানার মধ্যে সমন্বয় করল। কেউ কারো জিম্মাদার বা জামিন হলো না। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল ফরজ আদায়কারীর ইক্তিদা নফল আদায়কারীর পিছনে জায়েজ – হযরত মু'আয (রা.)-এর হাদীস,

اِنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّيْهَا بِقَوْمِهٖ فِىْ بَنِىْ سَلَمَةَ فَكَانَ صَلٰوةُ قَوْمِهٖ فَرْضًا وَصَلَاتُهٗ نَفْلًا .

মু'আয (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ঈশার নামাজ পড়তেন অতঃপর বনূ সালামায় গিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে নামাজ পড়াতেন। তখন মু'আয (রা.)-এর কাওমের নামাজ হতো ফরজ আর মু'আয (রা.)-এর নফল। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল ফরজ আদায়কারীর নামাজ নফল আদায়কারীর পিছনে জায়েজ।

আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো যে, হতে পারে হযরত মু'আয (রা.) নফলের নিয়তে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামাজ পড়তেন, আর তাঁর সম্প্রদায়কে ফরজ পড়াতেন। এ সম্ভাবনাময় সুরতে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল ঠিক হবে না।

দ্বিতীয় জবাব হলো, ফরজ আদায়কারীর ইক্তিদা যদি নফল আদায়কারীর পিছনে জায়েজ হতো তবে খাওফের নামাজে এ তরীকা প্রবর্তিত হতো না যে, ইমাম অর্ধেক নামাজ একদলকে পড়াবে আর অর্ধেক অপর দলকে পড়াবে; বরং প্রত্যেক দলকেই তো পুরোপুরি নামাজ পড়াতে পারতেন। সর্বোপরি এ কথা সাবিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের অনেকদিন পর দু'টি দলকে এক নামাজ অর্ধেক করে অর্ধেক পড়িয়েছেন। নামাজের মাঝখানে প্রত্যেক দলের নামাজের বিপরীত কাজ করতে হয়েছে। যদি ফরজ আদায়কারীর জন্য নফল আদায়কারীর পিছনে ইক্তিদা জায়েজ হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক দলকে পুরো নামাজ পড়াতেন, আধা আধা পড়াতেন না।

وَيُصَلِّى الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ لِاَنَّ الْحَاجَةَ فِىْ حَقِّهٖ اِلٰى اَصْلِ الصَّلٰوةِ وَهُوَ مَوْجُوْدٌ فِىْ حَقِّ الْاِمَامِ فَيَتَحَقَّقُ الْبِنَاءُ وَمَنِ اقْتَدٰى بِاِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ اَنَّ اِمَامَهٗ مُحْدِثٌ اَعَادَ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ اَمَّ قَوْمًا ثُمَّ ظَهَرَ اَنَّهٗ كَانَ مُحْدِثًا اَوْ جُنُبًا اَعَادَ صَلَاتَهٗ وَاَعَادُوْا وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِىْ (رحـ) بِنَاءً عَلٰى مَا تَقَدَّمَ وَنَحْنُ نَعْتَبِرُ مَعْنَى التَّضَمُّنِ وَ ذٰلِكَ فِى الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ وَاِذَا صَلّٰى اُمِّىٌّ بِقَوْمٍ يَقْرَءُوْنَ وَبِقَوْمٍ اُمِّيِّيْنَ فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَقَالَا صَلٰوةُ الْاِمَامِ وَمَنْ لَمْ يَقْرَأْ تَامَّةٌ لِاَنَّهٗ مَعْذُوْرٌ اَمَّ قَوْمًا مَعْذُوْرِيْنَ فَصَارَ كَمَا اِذَا اَمَّ الْعَارِىْ عُرَاةً وَلَابِسِيْنَ وَلَهٗ اَنَّ الْاِمَامَ تَرَكَ فَرْضَ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا فَتَفْسُدُ صَلَاتُهٗ وَهٰذَا لِاَنَّهٗ لَوِ اقْتَدٰى بِالْقَارِئِ تَكُوْنُ قِرَاءَتُهٗ قِرَاءَةً لَهٗ بِخِلَافِ تِلْكَ الْمَسْاَلَةِ وَاَمْثَالِهَا لِاَنَّ الْمَوْجُوْدَ فِىْ حَقِّ الْاِمَامِ لَا يَكُوْنُ مَوْجُوْدًا فِىْ حَقِّ الْمُقْتَدِىْ ـ

অনুবাদ : নফল আদায়কারী ফরজ আদায়কারীর পিছনে নামাজ আদায় করতে পারবে। কেননা নফল আদায়কারীর জন্য শুধু মূল নামাজ থাকাই হলো প্রয়োজন। আর ইমামের ক্ষেত্রে মূল নামাজ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এর উপর বিনা متحقق সাব্যস্ত হবে। যে ব্যক্তি কোনো ইমামের পিছনে ইক্তিদা করল তারপর জানতে পারল যে, তার ইমাম হাদাসগ্রস্ত, তখন তাকে নামাজ দোহরাতে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জামাআতের ইমামতি করল, তারপর প্রকাশ পেল যে, সে হাদাসগ্রস্ত অথবা জুনুবী, তখন সে নিজেও নামাজ দোহ্রাবে এবং মুক্তাদিরাও দোহরাবে। এ বিষয়ে ইমাম শাফি'ঈ (র.) পূর্ব বর্ণিত যুক্তির ভিত্তিতে ভিন্নমত পোষণ করেন। কিন্তু আমরা অন্তর্ভুক্তির মর্ম বিবেচনা করি। আর তা জায়েজ হওয়া ও ফাসিদ হওয়া উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। কোনো উম্মী ব্যক্তি যদি কুরআন পাঠে সক্ষম একদল লোক এবং উম্মী একদল লোকের ইমামতি করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সকলের নামাজ ই ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ইমামের নামাজ এবং যারা কুরআন পাঠে সক্ষম নয়, তাদের নামাজ পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। কেননা ইমাম নিজে মাজুর এবং তিনি একদল মাজুর লোকের ইমামতি করেছেন। সুতরাং এটি ঐ অবস্থার সদৃশ, যখন কোনো উলঙ্গ ব্যক্তি একদল উলঙ্গ ও একদল বস্ত্রধারীর ইমামতি করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলিল হচ্ছে– ইমাম কিরাআতের উপর সক্ষমতা সত্ত্বেও কিরাআতের ফরজ তরক করেছে। সুতরাং তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। সক্ষমতার কারণ হচ্ছে– সে যদি কারীর পিছনে ইক্তিদা করতো তাহলে কারীর কিরাআত তার–কিরাআত হতো। আর ঐ মাসআলাটি এবং এর অনুরূপ মাসআলার হুকুম ভিন্ন। কেননা ইমামের ক্ষেত্রে যা বিদ্যমান, তা মুক্তাদীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান বলে গণ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নফল আদায়কারী ফরজ আদায়কারীর পিছনে ইক্তিদা করতে পারবে। দলিল হলো, নফল আদায়কারীর জন্য শুধু মূল নামাজ থাকাই হলো প্রয়োজন। আর মূল নামাজ ইমামের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণে নফল আদায়কারীর ফরজ আদায়কারীর পিছনে বিনা করা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এর কারণ হলো, নফল নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য সাধারণ নিয়ত যথেষ্ট। আর সাধারণ নিয়তের মধ্যে ফরজও শামিল। এজন্য নফল আদায়কারীর ইক্তিদা ফরজ আদায়কারীর পিছনে জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَمَنِ اقْتَدٰى بِاِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ الخ : যদি কোনো ব্যক্তি ইমামের ইক্তিদা করে। অতঃপর মুক্তাদী জানতে পারে যে তার ইমাম হাদাসগ্রস্ত। তখন এ ব্যক্তি নিজের নামাজ দোহরাবে। আর যদি ইক্তিদা করার পূর্বে জানতে পারে যে, ইমাম হাদাসগ্রস্ত তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার ইক্তিদাই জায়েজ হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, ইক্তিদা করার পর যদি ইমামের মুহদাস হওয়া জানতে পারে তখন মুক্তাদীর নামাজ দোহরানো ওয়াজিব নয়। তার দলিল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তার মতে ইক্তিদা হলো, সমন্বিত রূপে কিছু আফ'আল আদায় করার নাম। অর্থাৎ ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্য থেকে প্রত্যেকের নামাজ আলাদা আলাদা। ইমামের নামাজ মুক্তাদীর নামাজকে শামিল করে না। তাই ইমামের নামাজ ফাসিদ হওয়ার দ্বারা মুক্তাদীর নামাজ ফাসিদ হবে না; বরং মুক্তাদীর নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। যদিও হাদাসের কারণে ইমামের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

. তবে আমাদের পক্ষ থেকে জবাব হলো হচ্ছে– আমাদের মতে তায়াম্মুম তথা অন্তর্ভুক্তির মর্ম বিবেচনা করা হবে। এর ব্যাখ্যা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ দুই অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়তো এর দ্বারা মুরাদ হলো ইমাম তার নামাজের জামিন, অথবা এর দ্বারা মুরাদ হলো সে মুক্তাদীর নামাজের জামিন। প্রথম সুরতের মধ্যে কোনো ফায়েদা নেই। কেননা প্রত্যেক লোক তার নিজের নামাজের জামিন। তাই দ্বিতীয় সুরতই সহীহ। অতঃপর এরও আবার দুই সুরত রয়েছে। কেননা ইমাম হয়তো তার কাওমের ওয়াজিব হিসেবে ও আদা হিসেবে জামিন হবে অথবা সহীহ ও ফাসাদ হিসাবে জামিন হবে। সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব হিসেবে ও আদায় হিসেবে জামিন হওয়া মুরাদ নয়। তাহলে নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, সহীহ ও ফাসাদ হওয়ার দিক থেকে জামিন। অর্থাৎ ইমামের নামাজ সহীহ হওয়ার দ্বারা মুক্তাদীর নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। আর ইমামের নামাজ ফাসিদ হওয়ার দ্বারা মুক্তাদীর নামাজও ফাসিদ হয়ে যাবে।

আমাদের দলিল নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى بِاَصْحَابِهٖ ثُمَّ تَذَكَّرَ جَنَابَةً فَاَعَادَهَا وَقَالَ مَنْ اَمَّ قَوْمًا ثُمَّ ظَهَرَ اَنَّهٗ كَانَ مُحْدِثًا اَوْ جُنُبًا اَعَادَ صَلَاتَهٗ وَاَعَادُوْا .

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদেরকে নামাজ পড়িয়েছিলেন। পরে তাঁর জুনুবী থাকার কথা মনে পড়ল তখন তিনি নামাজ দোহরালেন, আর বললেন, যে ব্যক্তি কোনো কাওমের ইমামত করে পরে প্রকাশ পায় যে, সে হাদাসগ্রস্ত বা জুনুবী; তখন সে নিজেও নামাজ দোহরাবে এবং মুক্তাদীদেরকেও নামাজ দোহরাতে বলবে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, ইমামের নামাজ ফাসিদ হওয়ার দ্বারা মুক্তাদীর নামাজও ফাসিদ হয়ে যায়।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) আহনাফের সমর্থনে হযরত জাফর থেকে হযরত আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত কার্যের কথা বর্ণনা করেছেন,

اِنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلّٰى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ اَوْ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ فَاَعَادَ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يُعِيْدُوْا .

হযরত আলী (রা.) লোকদেরকে জানাবাত অবস্থায় অথবা অজুহীন অবস্থায় নামাজ পড়িয়েছিলেন। পরে নিজে নামাজ পুনরায় পড়েছেন এবং লোকদেরকেও দোহরাতে বলেছেন। এতে বুঝা গেল যে, মুক্তাদীর নামাজ ইমামের নামাজ ফাসিদ হওয়ার কারণে ফাসিদ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَاِذَا صَلَّى اُمِّىٌّ بِقَوْمٍ الخ : উম্মী, অর্থ নিরক্ষর। এ শব্দটি اُم তথা মা-এর সাথে সম্পর্কিত ও সম্বন্ধিত। এর মর্ম হল, মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ অবস্থার মতো নিরক্ষর। কুরআন, হাদীস, আরবি ভাষায় যেখানে এ শব্দটি এসেছে– তার দ্বারা ঐ ব্যক্তি মুরাদ যে লেখা-পড়ায় অক্ষম। যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াতও জানে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সে উম্মীর অন্তর্ভুক্ত নয়। সাহেবাইনের মতে যে তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াত জানে সে উম্মী নয়।— (ইনায়া)

মাসআলা : যদি উম্মী ব্যক্তি অন্য উম্মীদের এবং কারীদের ইমামতি করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে তাদের সকলের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। সাহেবাইনের মতে ইমাম ও গায়রে কারীদের নামাজ তো পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে যে সকল মুক্তাদী কুরআন পাঠে সক্ষম তাদের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। তাদের দলিল হচ্ছে– এক মাজুর উম্মী অপর মাজুর উম্মীর ইমামত করতে পারে এটা সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ। সুতরাং এ মাসআলাটি ঐ অবস্থার সদৃশ, যেমন একজন উলঙ্গ ব্যক্তি একদল উলঙ্গ ও একদল বস্ত্রধারীর ইমামত করে। এ সুরতে সর্বসম্মতিক্রমে উলঙ্গ ইমাম আর উলঙ্গ মুক্তাদীদের নামাজ জায়েজ হয়ে যাবে; তবে বস্ত্রধারীর নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এমনিভাবে এখানেও উম্মী ইমাম ও উম্মী মুক্তাদীর নামাজ জায়েজ হবে। তবে কারীদের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলিল হচ্ছে– কোনো ব্যক্তি যদি কিরাআতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ফরজ কিরাআত তরক করে তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর উক্ত মাসআলায়ও ইমাম অর্থাৎ উম্মী কিরাআতের উপর সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ফরজ কিরাআত তরক করেছে; এ জন্য ইমামের নামাজ ফাসিদ হয়ে গেছে। আর যখন ইমামের নামাজ ফাসিদ হয়ে গেল তখন সকলের নামাজই ফাসিদ হয়ে গেল। কেননা ইমামের নামাজ মুক্তাদীর নামাজের সহীহ ও ফাসিদ হওয়ার দিক থেকে মুতাযাম্মিন তথা শামিল করে। তবে ইমামে উম্মী কিরাআতের উপর সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও ফরজ কিরাআত কিভাবে তরক করল ? এর জবাব হলো, যদি উম্মী ইমাম কোনো কারী মুক্তাদীর ইক্তিদা করতো তবে কারীর কিরাআত তার কিরাআত হয়ে যেতো। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ – আর এ ইকতিদা করা তার ইখ্‌তিয়ারে ছিল। অথচ সে তার ইখ্‌তিয়ারকে ছেড়ে দিয়েছে। নতুবা কারীর কিরাআত তার কিরাআত হয়ে যেতো। এর বিপরীত হলো উলঙ্গ ও বস্ত্রধারীর মাসআলা এবং এর অনুরূপ অন্যান্য মাসআলাও। যেমন– বোবা ব্যক্তি বোবা এবং কারীদের ইমামত করা, অথবা এক ইশারাকারী একদল ইশারাকারীর এবং কিছু রুকূ ও সিজদাকারীর ইমামত করা। এর কারণ হলো, এ সকল মাসআলার মধ্যে যে কথা ইমামের জন্য প্রযোজ্য তা মুক্তাদীর জন্য বিদ্যমান নেই। অর্থাৎ যদি বস্ত্রধারী ব্যক্তি ইমামত করে তখন মুক্তাদির বেলায় শরিয়ত এ হুকুম দেয়নি যে, মুক্তাদি বস্ত্রধারী হয়ে গেছে। অথবা ইমামের রুকূ ও সিজ্‌দা আদায় করার দ্বারা মুক্তাদির রুকূ সিজদা আদায় হয়ে গেছে। সুতরাং এ পার্থক্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় একটাকে অপরটির উপর কিয়াস করা সহীহ হবে না।

وَلَوْكَانَ يُصَلِّى الْاُمِّىُّ وَحْدَهُ وَالْقَارِىُ وَحْدَهُ جَازَ هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمَا رَغْبَةٌ فِى الْجَمَاعَةِ فَاِنْ قَرَأَ الْاِمَامُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ ثُمَّ قَدَّمَ فِى الْاُخْرَيَيْنِ اُمِّيًّا فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) لَاتَفْسُدُ لِتَادِّى فَرْضِ الْقِرَاءَةِ وَلَنَا اَنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ صَلٰوةٌ فَلَاتَخْلُوْ عَنِ الْقِرَاءَةِ اِمَّا تَحْقِيْقًا اَوْتَقْدِيْرًا وَلَاتَقْدِيْرَ فِى حَقِّ الْاُمِّىِّ لِانْعِدَامِ الْاَهْلِيَّةِ وَكَذَا عَلٰى هٰذَا لَوْ قَدَّمَهُ فِى التَّشَهُّدِ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ـ

অনুবাদ : যদি উম্মী ও কারী একা একা নামাজ আদায় করে, তবে জায়েজ কেননা এটাই বিশুদ্ধ মত; কেননা তাদের থেকে জামাতের আকাঙ্খা পাওয়া যায়নি। যদি ইমাম প্রথম দু রাকাতে কেরাত পড়ে; অতঃপর শেষ দুই রাকআতে কোনো উম্মী.কে (নায়িব হিসাবে) আগে বাড়িয়ে দেয়, তাহলে সকলের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা কিরাআতের ফরজ আদায় হয়ে গেছে। আমাদের দলিল হলো, প্রতিটি রাকআতই নামাজ। সুতরাং তা কিরাআত থেকে খালি হতে পারে না। চাই তা تحقيقا (বাস্তবে) হোক বা تقديرا (ধরে নেওয়া) হোক। আর উম্মীর ক্ষেত্রে যোগ্যতা না থাকার কারণে কিরাআতকে تقديرا গণ্য করার অবকাশ নেই। তাশাহ্হুদের সময় তাকে আগে বাড়ালেও অনুরূপ মত পার্থক্য রয়েছে। সঠিক বিষয় আল্লাহই অধিক জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি উম্মী ও কারী আলাদা আলাদা নামাজ পড়ে তবে তা জায়েজ। আর এটাই বিশুদ্ধ হুকুম। ইমাম মালিক (র.)-এর মত হলো, এ সুরতে উম্মীর নামাজ জায়েজ হবে না। তাঁর দলিল হলো, এই মাসআলায়ও উম্মী কিরাআতে সক্ষম। কেননা উম্মী যদি কারীর পিছনে ইক্তিদা করতো তখন উম্মীর জন্যও কিরাআত হাসিল হয়ে যেতো। আমাদের দলিল হলো, উম্মী এবং কারী তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে জামআতের প্রতি কোনো আগ্রহ পাওয়া যায়নি। আর যখন জামআতের আগ্রহ-ই পাওয়া যায়নি তখন উম্মীর কিরাআতের উপর সক্ষম হওয়াও যাহির হলো না। এ জন্য তাকে অপারগই ধরা হবে।

قَوْلُهُ فَاِنْ قَرَأَ الْاِمَامُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ الخ : উক্ত ইবারতের সূরতে মাসআলা হলো, ইমাম প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত পাঠ করেছে। অতঃপর হাদাস হয়ে গেছে এবং শেষ দুই রাকআতে অথবা মাগরিবের এক রাকআতের জন্য কোনো উম্মীকে খলীফা হিসাবে আগে বাড়িয়ে দিয়েছে তাহলে সব মুক্তাদীর নামাজই ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম যুফারের মাযহাব হলো ফাসিদ হবে না। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এরও একটি রিওয়ায়াত। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, ফরজ কিরাআত তো আদায় হয়ে গেছে। শেষ দুই রাকআতে তো কিরাআত ফরজ নয় বরং সুন্নত। এ কারণে শেষ দুই রাকআতে খলীফা বানানোর ক্ষেত্রে কারী ও উম্মী উভয়ে বরাবর। সুতরাং শেষ দুই রাকআতে উম্মীকে খলীফা বানানোর দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। আমাদের দলিল হলো, প্রত্যেক রাকআতই মূলত স্বতন্ত্র নামাজ। এজন্য কোনো রাকআতই কিরাআত থেকে খালি হতে পারে না। চাই কিরাআত হাকীকাতান হোক অথবা তাক্দীরান। অর্থাৎ প্রথম দু রাকআতের কিরাআত হাকীকাতান। আর শেষের দুই রাকআতের কিরাআত তাক্দীরান। কেননা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রথম দুই রাকআতের কিরাআত-ই শেষ দুই রাকআতের কিরাআত। আর উম্মীর ক্ষেত্রে এ উভয়টার কোনোটাই নেই। তাহ্কীকান না হওয়া তো যাহির। আর তাকদীরান এ কারণে নেই যে, তার মধ্যে কিরাআতের যোগ্যতাই নেই।

এমনিভাবে তাশাহ্হুদের মধ্যে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পূর্বে যদি কোনো উম্মীকে খলীফা বানানো হয় তবে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে নামাজ ফাসিদ হবে না। আমাদের মতে ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর খলীফা করা হয় তখন ইমাম সাহেবের মতে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে ফাসিদ হবে না। আর কোনো কোনো ফকীহ্ বলেছেন, ইমামত্রয়ের কারো মতেই নামাজ ফাসিদ হবে না। আল্লাহই অধিক জানেন।

بَابُ الْحَدَثِ فِى الصَّلٰوةِ

وَمَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِى الصَّلٰوةِ انْصَرَفَ فَاِنْ كَانَ اِمَامًا اِسْتَخْلَفَ وَتَوَضَّا وَبَنٰى وَالْقِيَاسُ اَنْ يَسْتَقْبِلَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ لِاَنَّ الْحَدَثَ يُنَافِيْهَا وَالْمَشْىُ وَالْاِنْحِرَافُ يُفْسِدَانِهَا فَاَشْبَهَ الْحَدَثُ الْعَمَدَ وَلَنَا قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَاءَ اَوْ رَعَفَ اَوْ اَمْذٰى فِىْ صَلَاتِهٖ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّاْ وَلْيَبْنِ عَلٰى صَلَاتِهٖ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَقَاءَ اَوْ رَعَفَ فَلْيَضَعْ يَدَهٗ عَلٰى فَمِهٖ وَلْيُقَدِّمْ مَنْ لَمْ يُسْبَقْ بِشَىْءٍ وَالْبَلْوٰى فِيْمَا يَسْبِقُ دُوْنَ مَا يَتَعَمَّدُ فَلَا يُلْحَقُ بِهٖ ـ

পরিচ্ছেদ ঃ নামাজের মধ্যে হাদাস হওয়া

অনুবাদ : নামাজের মধ্যে যে ব্যক্তির হাদাস ঘটে যায় সে ফিরে যাবে। যদি সে ইমাম হয় তাহলে (পিছনে দাঁড়ানো) একজনকে স্থলবতী করবে এবং অজু করে বেনা করবে। কিয়াসের দাবি হচ্ছে– নতুনভাবে নামাজ শুরু করবে। এটাই হলো ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মত। কেননা হাদাস নামাজের বিপরীত। আর কিবলা থেকে ফিরে যাওয়া এবং হাঁটাচলা করা নামাজকে ফাসিদ করে দেয়। সুতরাং তা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটানোর সদৃশ। আমাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী নামাজে যে ব্যক্তির বমি হয় কিংবা নাক থেকে রক্ষরণ হয় কিংবা মজী (তরল পদার্থ) বের হয়, সে যেন ফিরে গিয়ে এবং অজু করে আর নিজের (পূর্ব) নামাজের উপর বিনা করে, যতক্ষণ না সে কথা বলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাজ শুরু করে, তারপর তার বমি হয় কিংবা নাক থেকে রক্তক্ষরণ হয়, তখন সে যেন তার মুখে হাত রাখে এবং কাউকে (ইমামতির জন্য) আগে বাড়িয়ে দেয়, যার কোনো রাকআত ছুটেনি। সাধারণ ওজর রূপে তাই গণ্য, যা অনিচ্ছায় ঘটে যায়। আর যা ইচ্ছাকৃত ঘটে, তা তার মধ্যে গণ্য নয়। সুতরাং একে তার সাথে যুক্ত করা যায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসান্নিফ (র.) পূর্বের অধ্যায়ে مُفْسِدَاتُ الصَّلٰوةِ-এর অনুষঙ্গিক বিষয় থেকে বেঁচে থাকার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখন এ অধ্যায়ে ঐ সকল আনুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করা হবে যা নামাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় এবং নামাজকে ফাসিদ করে দেয়। বস্তুত: সালামতের আহকাম হলো আসল। আর আসল مقدم হয় তাই মুসান্নিফ (র.) সালামতের আহকামকে পূর্বে আলোচনা করেছেন।

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তির নামাজের মধ্যে হাদাস ঘটে যায় অর্থাৎ বেলা ইখ্‌তিয়ার হাদাস হয়ে যায়। যাকে হাদাসে সামাভী বলা হয় তখন এ সুরতে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো রকমের বিলম্ব ব্যতিরেকে নামাজ থেকে ফিরে যাবে। তাৎক্ষণিকভাবে নামাজ থেকে ফিরে যাবার হুকুম এ কারণে দেওয়া হয়েছে যে, হাদাসের পর যদি কিছু সময় অবস্থান করে তখন সে নামাজের একটি অংশ হাদাসের সাথে আদায়কারী হয়ে যাবে। আর হাদাসের সাথে নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। সুতরাং নামাজের যে অংশ হাদাসের সাথে সম্পৃক্ত অবস্থায় আদায় করা হবে তা ফাসিদ হয়ে যাবে, আর যেহেতু جزء ফাসিদ হওয়ার দ্বারা كل ফাসিদ হয়ে যায় এ জন্য পুরো নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর جزء ফাসিদ হওয়ার দ্বারা كل এ কারণে ফাসিদ হয়ে যায় যে, ফাসাদকে (تجزى) ভাগ করা যায় না। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, যখন নামাজের একটি অংশ ফাসিদ হয়ে যাবে তখন পুরো নামাজই ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা একই নামাজ সহীহ এবং ফাসাদকে এক সাথে কবুল করে না।

এখন যে ব্যক্তি হাদাসগ্রস্ত হলো সে যদি ইমাম হয় তখন মুক্তাদীর মধ্য থেকে কাউকে নিজের খলীফা নির্ধারণ করে নিবে। আর খলীফা নির্ধারণ করার সুরত হলো, তার কাপড় ধরে তাকে মেহরাবের দিকে টেনে নিবে এবং নিজে অজু করে 'বিনা' করবে অর্থাৎ ঐ নামাজকে অজুর পর পুরো করে নিবে।

কিয়াসের দাবি হলো নতুনভাবে নামাজ শুরু করবে। এটাই ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর অভিমত। ইমাম মালিক (র.)-ও এ মত পোষণ করেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, হাদাস নামাজের বিপরীত। কেননা নামাজের জন্য তাহারাত জরুরি। আর হাদাস তাহারাতের বিপরীত। আর যা লাযিমের বিপরীত তা মালযূমেরও বিপরীত হয়। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, হাদাস তাহারাতের ابطال, য় নামাজের অন্তরায়। আর কায়দা আছে, কোনো (شئ) জিনিস তার বিপরীতের সাথে বাকি থাকে না। সুতরাং হাদাসের সাথে নামাজও বাকি থাকবে না। তাই নতুনভাবে শুরু থেকেই নামাজ পড়া ওয়াজিব।

দ্বিতীয় দলিল হলো, বেনা করার সুরতে নামাজের মাঝখানে হাঁটাচলা করা এবং কিবলা থেকে ফিরে যাওয়া লাযিম আসে। আর এই উভয় কাজ নামাজকে ফাসিদ করে দেয়। আর কায়দা আছে, যে জিনিস নামাজকে ফাসিদ করে দেয় নামাজ তার সাথে বাকি থাকে না। যেমনিভাবে ইচ্ছাকৃত হাদাসের সাথে নামাজ বাকি থাকে না। বুঝা গেল, হাঁটাচলা এবং কিবলা থেকে ফিরে যাবার দ্বারা নামাজ বাকি থাকবে না। আর যখন নামাজই বাকি থাকল না তখন তার দোহরানো জরুরি। মোটকথা, তা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটানোর সদৃশ হয়ে গেল। আর ইচ্ছাকৃত হাদাসের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে বেনা জায়েজ নেই। সুতরাং ঐ হাদাসের মধ্যেও বেনা জায়েজ হবে না; বরং শুরু থেকে নামাজ পড়া জরুরি।

আমাদের দলিল নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ أَوْ أَمْذَى فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ .

দ্বিতীয় দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস – إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ وَلْيُقَدِّمْ مَنْ لَمْ يُسْبَقْ بِشَيْءٍ. যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামাজ শুরু করে, তারপর তার বমি হয় কিংবা নাক থেকে রক্তক্ষরণ হয় তখন যেন তার মুখে হাত রাখে এবং কাউকে আগে বাড়িয়ে দেয়, যার কোনো রাকআত ছুটেনি। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মুদরিককে স্থলবর্তী বানানো হবে, মাসবূককে নয়। কেননা যদি মাসবূককে স্থলবর্তী বানানো হয় তখন সে সালাম ফিরাবার পূর্বেই কোনো মুদরিককে খলীফা বানাবে, যাতে মুদরিক সালাম দ্বারা লোকদের নামাজ পুরা করে দেয়। আর মাসবূক ইমাম তার নামাজ পূর্ণ করবে। সুতরাং মাসবূককে খলীফা বানানোর দ্বারা বারবার খলীফা বানানো লাযিম আসে। এ জন্য উত্তম হলো, প্রথমেই গায়রে মাসবূক তথা মুদরিককে খলীফা বানাবে। তাহলে বারবার খলীফা বানানোর খারাবি থেকে নাজাত পাওয়া যাবে। মোটকথা, উপরোক্ত হাদীস দ্বারা 'বিনা' জায়েজ হওয়ার সুরত এভাবে হয় যে, হাদীসে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ, وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ -এর لِيَبْنِ -এর শব্দটি হচ্ছে, امر -এর সর্বনিম্ন পর্যায় হলো اباحت। তথা মুবাহ হওয়ার পর্যায়। এ জন্য বেনা-র মুবাহ হওয়া সাবিত হয়। তবে এখানে প্রশ্ন জাগে যে, হাদীসের মধ্যে وَلْيَتَوَضَّأْ - امر -এর সীগাহ উজূবের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে তো وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ -এর امر ও উজূবের জন্য হওয়া উচিত। অথচ ফুকাহায়ে আহনাফ উজূব বলেন না? এর জবাব হলো– আমাদের মতে قران فى النظم ـ قران فى الحكم কে ওয়াজিব করে না। সুতরাং এ প্রশ্ন অবান্তর।

তাছাড়া খোলাফায়ে রাশিদীন, ফুকাহায়ে সাহাবা (যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আনাস ইবনে মালিক, সালমান ফারসী (রা.) ঐ কথার উপর একমত যা আমরা বলেছি। অর্থাৎ 'বিনা' জায়েজ হওয়ার উপর, উজূবের উপর নয়। আর ইজমার কারণে কিয়াসকে তরক করা যায়। তাই وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ -কে وَلْيَتَوَضَّأْ -এর উপর কিয়াস করা যাবে না। দ্বিতীয় হাদীসের মধ্যে শুধু খলীফা বানানোর (استخلاف) বয়ান রয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী مَنْ لَمْ يُسْبَقْ بِشَيْءٍ-এর মধ্যে উত্তম হওয়ার বয়ান রয়েছে। কেননা মুদরিক – মাসবূকের তুলনায় নামাজ পূর্ণ করার অধিক যোগ্য। তাই মাসবূককে খলীফা বানালে খেয়ানত হবে।

وَالْبَلْوَى فِيْمَا سَبَقَ দ্বারা ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর কিয়াসের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের খোলাসা হলো, অনিচ্ছায় ঘটে যাওয়া হাদাসকে ইচ্ছাকৃত হাদাস-এর উপর কিয়াস করা সহীহ নয়। কারণ উভয়টির মধ্যে পার্থক্যকারী বিদ্যমান। কেননা অনিচ্ছায় ঘটে যাওয়া হাদাসের মধ্যে ইব্তিলা রয়েছে। কেননা তা তার ফেয়েল ছাড়াই হাসিল হয়ে যায়। এ জন্য তাকে মাজুর ধরা হবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃত হাদাসের মধ্যে এমনটি নেই। তাই এই পার্থক্য থাকা অবস্থায় একটাকে অপরটির উপর কিয়াস করা সহীহ হবে না।

وَالْاِسْتِيْنَافُ اَفْضَلُ تَحَرُّزًا عَنْ شُبْهَةِ الْخِلَافِ وَقِيْلَ الْمُنْفَرِدُ يَسْتَقْبِلُ وَالْاِمَامُ وَالْمُقْتَدِيْ يَبْنِيْ صِيَانَةً لِفَضِيْلَةِ الْجَمَاعَةِ وَالْمُنْفَرِدُ اِنْ شَاءَ اَتَمَّ فِيْ مَنْزِلِهٖ وَاِنْ شَاءَ عَادَ اِلٰى مَكَانِهٖ وَالْمُقْتَدِيْ يَعُوْدُ اِلٰى مَكَانِهٖ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ اِمَامُهٗ قَدْ فَرَغَ اَوْ لَا يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ ـ

অনুবাদ : তবে নতুন করে পড়ে নেওয়াই উত্তম। যাতে মতপার্থক্যের দ্বিধা থেকে বাঁচা যায়। কারো কারো মতে একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি নতুনভাবে পড়বে। আর ইমাম ও মুকতাদী হলে জামাআতের ফজিলত সংরক্ষণ করার জন্য বেনা করবে। আর মুনফারিদ ইচ্ছা করলে নিজের (অজুর) স্থানেই নামাজ পুরা করে নিবে, আবার ইচ্ছা করলে নিজের নামাজের স্থানে ফিরে আসবে। কিন্তু মুক্তাদী নিজের স্থানে ফিরে আসবে। তবে যদি তার ইমাম (নামাজ থেকে) ফারিগ হয়ে যায় কিংবা যদি উভয়ের মাঝে কোনো আড়াল না থাকে (তাহলে ফিরে আসার প্রয়োজন নেই)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত মাসআলায় যদিও 'বেনা' করা জায়েজ তবে নতুনভাবে শুরু থেকে পড়াই উত্তম। যাতে মতপার্থক্যের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু কেউ যদি বলে যে, শুরু করার মধ্যে আমলকে বাতিল করা (ابطال عمل) হয়? তখন আমরা জবাবে বলব, এতে অবশ্যই ابطال عمل আছে, তবে তা ইকমাল তথা পরিপূর্ণ করার জন্য। আর এ ধরনের ইবতালে আমল প্রশংসনীয়, অ-প্রশংসনীয় বা ঘৃণ্য নয়। কোনো কোনো মাশায়িখ বলেন, মুনফারিদের নতুনভাবে পড়া উত্তম। আর ইমাম ও মুক্তাদীর 'বিনা' করা উত্তম। তাহলে জামাআতের ফজিলত সংরক্ষিত থাকবে। আর কেউ কেউ বলেন, যদি ইমাম ও মুক্তাদীর দ্বিতীয় জামাআত পাবার সম্ভাবনা থাকে তবে নতুনভাবে শুরু থেকে পড়া উত্তম। নতুবা 'বেনা' করা উত্তম।

قَوْلُهٗ وَالْمُنْفَرِدُ اِنْ شَاءَ اَتَمَّ الخ : গ্রন্থকার বলেন, মুনফারিদের ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে বেনা করে সেখানেই নামাজ পুরা করবে যেখানে অজু করেছে। কেননা এর মধ্যে হাঁটাচলা কম। আবার ইচ্ছা করলে নিজের স্থানে ফিরে আসতে পারবে। যাতে তার পুরো নামাজ একই স্থানে আদায় হয়ে যায়। প্রথম মতটি আমাদের কোনো কোনো মাশায়িখের, আর দ্বিতীয় মতটি শামসুল আইম্মা সারাখ্সী এবং শায়খুল ইসলাম খাহারযাদাহ (র.)-এর।

অবশ্য মুক্তাদী নিজের স্থানে ফিরে এসে নামাজ পুরা করবে। যদিও এ মুক্তাদী হাদাসগ্রস্ত ইমাম হয় যিনি খলীফা বানিয়েছিলেন। মুক্তাদীর জন্য এ হুকুম ওয়াজিব। তবে দু'টো সুরত এর থেকে বহির্ভূত। এক. তার ইমাম নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে গেছে। দুই. তার ও ইমামের মাঝে কোনো আড়াল না থাকে। অর্থাৎ মুক্তাদী যেখানে অজু করেছে সেখান থেকে ইমামের সাথে ইকতিদা করার মধ্যে মাঝখানে এমন কোনো প্রতিবন্ধক নেই যা ইক্তিদা বারণকারী। যেমন– প্রশস্ত রাস্তা, বড় নদী, জানালাবিহীন উঁচু দেয়াল ইত্যাদি থাকা। এ দুই স্থানে মুক্তাদী যদি অজুর স্থানে নামাজ পুরা করতে চায় তবে কোনো অসুবিধা নেই।

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَحْدَثَ فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ اِسْتَقْبَلَ الصَّلٰوةَ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ يُصَلِّيْ مَابَقِيَ وَالْقِيَاسُ فِيْهِمَا الْاِسْتِقْبَالُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ (رح) لِوُجُوْدِ الْاِنْصِرَافِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اَنَّهُ انْصَرَفَ عَلٰى قَصْدِ الْاِصْلَاحِ اَلَاتَرٰى اَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ مَاتَوَهَّمَهُ بَنٰى عَلٰى صَلَاتِهٖ فَاُلْحِقَ قَصْدُ الْاِصْلَاحِ بِحَقِيْقَتِهٖ مَالَمْ يَخْتَلِفِ الْمَكَانُ بِالْخُرُوْجِ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তির মনে হলো যে, তার হাদাস হয়েছে এবং এই মনে করে সে মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়ল, পরে বুঝতে পারল যে, তার হাদাস হয়নি, তবে সে নতুনভাবে নামাজ আদায় করবে। আর যদি মসজিদ থেকে বের না হয়ে থাকে, তাহলে অবশিষ্ট নামাজ পড়ে নিবে। অবশ্য উভয় অবস্থাতেই কিয়াসের দাবি হলো নতুন করে আদায় করা। এটাই ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর একটি বর্ণনা ও বটে। কেননা এ ক্ষেত্রে ওজর ছাড়া নামাজ থেকে ফিরে যাওয়া পাওয়া গেছে। ইস্‌তিহ্‌সানের কারণ হলো, সে সংশোধনের উদ্দেশ্যে ফিরে গেছে। দেখুন না, যদি তার ধারণা বাস্তব হতো তাহলে তো অবশ্যই সে নিজের নামাজের উপর 'বিনা' করতো। সুতরাং সংশোধনের ইচ্ছাকে বাস্তব সংশোধনের সাথে যুক্ত করা হবে যতক্ষণ না বের হওয়ার কারণে স্থানের ভিন্নতা দেখা দেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : এক ব্যক্তির নামাজে থাকা অবস্থায় মনে পড়ল তার হাদাস হয়েছে। তাই সে নামাজের স্থান থেকে ফিরে গেল। অতঃপর বুঝতে পারলা যে তার হাদাস হয়নি। এখন দেখতে হবে তার কিবলা থেকে মুখ ফিরানো তা নামাজের সংশোধনের জন্যে ছিল না নামাজ ভঙ্গ করার ইচ্ছায় ছিল? যদি দ্বিতীয়টি হয় তবে তার 'বিনা' করা সহীহ হবে না। চাই সে মস্‌জিদ থেকে বের হোক বা না হোক। আর যদি প্রথমটি হয় তবে তারও দু'টো সুরত রয়েছে। কেননা তখন মসজিদ থেকে বের হয়েছে অথবা হয়নি। যদি মসজিদ থেকে বের হয়ে থাকে তখন এ সুরতে শুরু থেকে নামাজ নতুনভাবে পড়বে, 'বিনা' করা জায়েজ হবে না। আর যদি মসজিদ থেকে বের না হয়ে থাকে তখন সে তার অবশিষ্ট নামাজ পূর্ণ করবে। শুরু থেকে নতুনভাবে নামাজ আদায় করার কোনো প্রয়োজন নেই।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, উভয় সুরতে (মসজিদ থেকে বের হোক বা না হোক) কিয়াসের দাবি হলো, নামাজ শুরু থেকে পড়া; বিনা না করা। এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে, কিয়াসের দলিল হলো, এ ক্ষেত্রে কোনো ওজর ব্যতীত কিবলা থেকে মুখ ফিরানো পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য যে, বিনা ওজরে কিবলা থেকে মুখ ফিরানো দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। উপরোক্ত উভয় সুরতে ওজর ছাড়া কিবলা থেকে মুখ ফিরানো পাওয়া যাবার কারণে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর নামাজ ফাসিদ হয়ে গেলে তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। 'বিনা' করা ওয়াজিব নয়। এ জন্য ঐ দুই সুরতে নামাজ পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হবে।

ইস্‌তিহ্‌সানের কারণ হলো, এ ব্যক্তি নামাজ সংশোধনের উদ্দেশ্যে ফিরে গেছে। এ জন্য এর দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। তাইতো যদি তার ধারণা বাস্তব হতো তাহলে তো অবশ্যই সে নিজের নামাজের উপর 'বিনা' করতো। সুতরাং সংশোধনের ইচ্ছাকে বাস্তব সংশোধনের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। শরিয়তে এমনটি সাবিতও আছে। যেমন– যদি কাফিররা মুসলমান বন্দীদেরকে নিজেদের ঢাল বানিয়ে নেয় তবে মুসলমানদের জন্য তাদের দিকে তীর চালানো জায়েজ। কিন্তু শর্ত হলো, মুসলমান তীরন্দাজদের ইরাদা رَمْىٌ اِلَى الْكُفَّارِ হতে হবে। মুসলমান বন্দীদের দিকে তীর চালানো হতে পারবে না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সংশোধনের ইচ্ছাকে বাস্তব সংশোধনের সাথে তখনই যুক্ত করা হবে যখন মসজিদ থেকে বের হওয়া সত্ত্বেও স্থান পরিবর্তন না হয়। কেননা স্থানের পরিবর্তন দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয়ে যায়। আর স্থান ঠিক থাকলে তাহরীমা ঠিক থাকে।

وَإِنْ كَانَ اِسْتَخْلَفَ فَسَدَتْ لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيْرٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ افْتَتَحَ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ فَانْصَرَفَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عَلٰى وُضُوْءٍ حَيْثُ تَفْسُدُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ لِأَنَّ الْاِنْصِرَافَ عَلٰى سَبِيْلِ الرَّفْضِ أَلَا تَرٰى أَنَّهُ لَوْتَحَقَّقَ مَا تَوَهَّمَهُ يَسْتَقْبِلُهُ فَهٰذَا هُوَ الْحَرْفُ وَمَكَانُ الصُّفُوْفِ فِي الصَّحْرَاءِ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ وَلَوْ تَقَدَّمَ قُدَّامَهُ فَالْحَدُّ السُّتْرَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَمِقْدَارُ الصُّفُوْفِ خَلْفَهُ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَمَوْضَعُ سُجُوْدِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ـ وَإِنْ جُنَّ أَوْ نَامَ فَاحْتَلَمَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ اِسْتَقْبَلَ لِأَنَّهُ يَنْدُرُ وُجُوْدُ هٰذِهِ الْعَوَارِضِ فَلَمْ يَكُنْ فِيْ مَعْنٰى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ وَكَذٰلِكَ إِذَا قَهْقَهَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ وَهُوَ قَاطِعٌ وَإِنْ حَصِرَ الْإِمَامُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فَقَدَّمَ غَيْرَهُ أَجْزَاهُمْ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَا يُجْزِيْهِمْ لِأَنَّهُ يَنْدُرُ وُجُوْدُهُ فَأَشْبَهَ الْجَنَابَةَ وَلَهُ أَنَّ الْاِسْتِخْلَافَ بِعِلَّةِ الْعَجْزِ وَهُوَ هٰهُنَا أَلْزَمُ وَالْعَجْزُ عَنِ الْقِرَاءَةِ غَيْرُ نَادِرٍ فَلَا يُلْحَقُ بِالْجَنَابَةِ ـ

অনুবাদ : আর যদি (ইমাম হওয়ার কারণে) সে কাউকে স্থলবর্তী করে থাকে তাহলে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা এখানে ওজর ছাড়া আমলে কাছীর হয়েছে। আর এটি নিম্নোক্ত মাসআলার বিপরীত যে, এক ব্যক্তির ধারণা যে, সে অজু ছাড়া নামাজ শুরু করেছে এবং ফিরে যায় তারপর বুঝতে পারে যে, সে অজু অবস্থায় আছে, তাহলে (মসজিদ থেকে) বের না হলেও তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা এই ফিরে আসাটা নামাজ তরক করার ভিত্তিতে হয়েছে। দেখুন না যদি তার ধারণা বাস্তব হতো তাহলে তো অবশ্যই তার নতুন করে নামাজ শুরু করতে হতো এই মূল কথা। আর খোলা মাঠের কাতারের স্থানের বিষয়টি হলো মসজিদের হুকুমভুক্ত। যদি সামনের দিকে যায় তাহলে সুত্‌রা (বা লাঠি) হলো সীমানা। আর যদি সুতরা না থাকে তাহলে (সীমানা হলো) তার পিছনের কাতারসমূহের পরিমাণ। আর মুনফারিদ হলে চারদিকে তার সিজদার জায়গা পরিমাণ। আর কেউ যদি (নামাজের মধ্যে) পাগল হয়ে যায়, কিংবা ঘুম আসার পর ইহ্‌তিলাম হয়ে যায়, কিংবা অজ্ঞান হয়ে যায়, তাহলে নতুন করে নামাজ শুরু করবে। কেননা এরূপ ঘটনা ঘটে যাওয়া বিরল। সুতরাং যে সকল ঘটনা সম্পর্কে نص (নস) রয়েছে, এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত হবে না। সেরূপ যদি অট্টহাস্য করে। কেননা এটা 'কথা' বলার পর্যায়ের। আর কথা বলা নামাজ ভঙ্গকারী। যদি ইমাম কিরাআতে আটকে যাওয়ার কারণে অন্যকে আগে বাড়িয়ে দেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে তাদের নামাজ দুরস্ত হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তাদের নামাজ দুরস্ত হবে না। কেননা এ ধরনের ঘটনা বিরল। সুতরাং তা (নামাজরত অবস্থায়) জানাবাতের সদৃশ হলো। (অর্থাৎ নামাজের মাঝে যদি রোগ বশত কারো বীর্যস্খলন হয় তবে বিরল ব্যাপার হিসাবে এ ক্ষেত্রে হুকুম হলো নামাজ নতুন করে শুরু করা। তদ্রূপ এটিও বিরল ঘটনা হিসাবে একই হুকুম ভুক্ত হবে।) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, স্থলবর্তী করা হয় অক্ষমতার কারণে। তা এখানে অধিক প্রযোজ্য। আর কিরাআতের অক্ষমতা বিরল নয়। সুতরাং জানাবাতের সাথে যুক্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি হাদাসগ্রস্ত ব্যক্তি (ইমাম) কাউকে স্থলবর্তী বানায়; পরে মনে হয় যে, তার হাদাস হয়নি, তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। যদিও সে মস্‌জিদ হতে বের না হয়ে থাকে। দলিল হলো, খলীফা বানানো আমলে কাছীর। আর ওজর ছাড়া আমলে কাছীর দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। এ জন্য ঐ সুরতে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে যদি মুসল্লীরা খলীফা বানায় তাহলে ইমাম ব্যতীত সকলের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি মুসল্লীর মনে হয় যে, হাদাস হয়ে গেছে তবে খলীফা বানানোর দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা এ সুরতে ওজর বিদ্যমান। সুতরাং খলীফা বানানো خُرُوْجُ مِنَ الْمَسْجِدِ-এর সদৃশ। অর্থাৎ মসজিদ থেকে বের হওয়া যদি নামাজের সংশোধনের জন্য হয়ে থাকে এবং ওজরও বিদ্যমান থাকে; তবে মসজিদ থেকে বের হওয়ার দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। এমনিভাবে খলীফা বানানোও যদি নামাজের সংশোধনের জন্য হয়ে থাকে এবং ওজরও থাকে তবে খলীফা বানানোর দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, নামাজের সংশোধনের জন্য ফিরে আসা তার বিপরীত। যেমন– সে মনে করল যে, বিনা অজুতে সে নামাজ শুরু করেছে। অতঃপর অজু করার জন্য সে রওয়ানা হলো, পরে মনে পড়ল যে, তার অজু আছে। এতে তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। এ সুরতেও তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। যদিও সে মসজিদ থেকে বেরিয়ে না থাকে। কেননা এই ফিরাটা ছিল নামাজকে ভঙ্গ করার জন্যে। নামাজকে সংশোধন করার জন্যে নয়। সুতরাং সে যদি অজু ছাড়া হতো তবে তো তার শুরু থেকে নামাজ পড়তে হতো। আর কায়দা আছে, যদি নামাজ থেকে ফিরাটা নামাজের সংশোধনের জন্য হয় তবে নামাজ ফাসিদ হবে না, শর্ত হলো মসজিদ থেকে বের না হওয়া এবং খলীফা বানানো – না পাওয়া যাওয়া। আর যদি নামাজ ভঙ্গ করার ইরাদায় ফিরা হয়ে থাকে তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

وَمَكَانُ الصُّفُوْفِ – এর দ্বারা গ্রন্থকার একথা বলতে চাচ্ছেন যে, উপরোক্ত ব্যাপারগুলো যদি মস্‌জিদে না হয়ে খোলা মাঠে বা ময়দানে হয়ে থাকে। আর মনে পড়ে যে হাদাস হয়ে গেছে, তখন কাতারগুলোর কাতারের স্থানের হুকুম মসজিদের হুকুমের অনুরূপ হবে। অর্থাৎ হাদাস ধারণাকারী ব্যক্তি যদি পিছনের দিকে যায় এবং কাতারগুলো অতিক্রম করে যায়, পরে জানা যায় যে হাদাস হয়নি, তবে তার 'বিনা' করা জায়েজ হবে না। এমনিভাবে যদি ডান দিকে বা বাম দিকে কাতার অতিক্রম করে যায় – তাহলেও 'বিনা' করা জায়েজ হবে না। আর যদি কাতারগুলো অতিক্রম না করে তবে 'বিনা' করা জায়েজ হবে। আর যদি সে সামনের দিকে যায় এবং সামনে সুতরা থাকে, তবে সুতরাই হলো তার সীমানা। এমনকি যদি সে সুতরা অতিক্রম করে যায় তাহলে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি সামনে সুতরা না থাকে তখন পিছনের কাতার অনুযায়ী তার সীমানা নিরূপিত হবে। যেমন পিছনের কাতার যদি পাঁচ গজ পর্যন্ত হয় – তবে সামনের কাতারও পাঁচ গজ পর্যন্ত হবে। এর অধিক অতিক্রম করলে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

আর যদি হাদাস এর ধারণাকারী ব্যক্তি মুনফারিদ হয় (তখন তার সীমানা) চারদিকে সিজ্‌দার জায়গা পরিমাণ হবে। অর্থাৎ ডানে, বায়ে, পিছনের দিকে সর্বত্র একই সীমানা হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ جُنَّ أَوْ نَامَ فَاحْتَلَمَ الخ : যদি মুসল্লী পাগল হয়ে যায়। চাই সে ইমাম, মুক্তাদী বা মুনফারিদ হোক। অথবা নামাজে ঘুম আসায় ইহ্‌তিলাম হয়ে গেছে কিংবা সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। এ সকল সুরতে নতুন করে নামাজ শুরু করবে। দলিল হলো, নামাজের মধ্যে এ ধরনের ঘটনা ঘটা বিরল। সুতরাং এ ধরনের ঘটনা ঐ সকল ঘটনার অর্থে নয় যেগুলো সম্পর্কে نص (নস) এসেছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فِيْ صَلَاتِهِ الخ। মোটকথা, حَدَثٌ غَيْرُ نَادِرِ الْوُقُوْعِ তথা এমন হাদাস যা ঘটে যাওয়া বিরল নয়, যেমন বায়ু, বমি, নাকরীস ইত্যাদির মধ্যে 'বিনা' করা জায়েজ। তবে এমন হাদাস যা ঘটা বিরল এর মধ্যে কেনা করা জায়েজ নেই। এমনিভাবে যদি সে নামাজে অট্টহাসি দেয় তাহলেও 'বিনা' করা জায়েজ হবে না; বরং শুরু থেকে নামাজ পড়তে হবে। কেননা এটা 'কথা' বলার পর্যায়ের। আর কথা হলো নামাজ ভঙ্গকারী। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ তথা (যতক্ষণ না কথা বলে) "বিনা" করতে পারবে। বুঝা গেল, কথা বললে 'বিনা' জায়েজ হবে না।

حصر -এর অর্থ হলো, মন সংকোচিত হওয়া, কথা বলায় অপারগ হওয়া। ইনায়া গ্রন্থকার লিখেছেন, যে ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে এমনভাবে অপারগ হয়ে পড়ে যে, তা করার আর সামর্থ্য রাখে না তার ক্ষেত্রে বলা হয় قَدْ حَصَرَ عَنْهُ সুতরাং ইমামের যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ ছিল তার পুরোটা ভুলে যাবার কারণে যদি সে কিরাআতে আটকে যায় তখন বলা হবে যে, সে কিরাআত করতে অপারগ। সুতরাং যদি সে মুক্তাদীদের মধ্য থেকে কাউকে খলীফা (স্থলবর্তী) বানায় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জায়েজ হবে। আর এটাই ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। সাহেবাইনের মতে (এ ধরনের স্থলবর্তী নির্ধারণ করা) জায়েজ নেই। তাদের দলিল, কিরাআতে আটকে যাওয়া– বিরল ঘটনা। যেমন– নামাজের ভিতরে জুনূবী হওয়া বিরল। সুতরাং জানাবাতের ন্যায় এটাও مَاوَرَدَ بِهِ النَّصُّ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যখন مَاوَرَدَ بِهِ النَّصُّ-এর অন্তর্ভুক্ত হলো না তখন যেমনিভাবে জানাবাতের সুরতে শুরু থেকে নামাজ পড়া জরুরি এমনিভাবে কিরাআতে আটকে গেলেও শুরু থেকে নামাজ পড়া জরুরি হবে। খলীফা বানানো জায়েজ হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, হাদাস হওয়া অবস্থায় খলীফা নির্ধারণ করা জায়েজ। কেননা এ সুরতে ইমাম নামাজ পুরা করতে অক্ষম। আর এখানে অর্থাৎ কিরাআত আটকে যাওয়া অবস্থায় অপারগতা আরো বেশি। কেননা মুহদিস-এর জন্যে তো এটারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, মসজিদে পানি বিদ্যমান, আর সে খলীফা বানানো ছাড়াই নিজের নামাজ পূর্ণ করে নিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পুরো মাহফূয কুরআনকে ভুলে যায় সে তো নামাজ পুরা করার কোনো ক্ষমতাই রাখে না। তবে হ্যাঁ, যদি দ্বিতীয়বার মুখস্থ করে এবং পুরো কুরআন শিখে, (তবে ভিন্নকথা)। সুতরাং যখন হাদাসের সূরতে খলীফা বানানো জায়েজ অথচ এ সুরতে অপারগতা কম, তাহলে তো কিরাআত আটকে যাওয়ার সুরতে অবশ্যই খলীফা বানানো জায়েজ হবে। কেননা এ সুরতে অপারগতা অনেক বেশি।— (ইনায়া)

وَالْعَجْزُ مِنَ الْقِرَاءَةِ দ্বারা সাহেবাইনের অভিমতের জবাব দেওয়া হচ্ছে। জবাবের খোলাসা হলো, কিরাআতে আটকে যাওয়া এটা বিরল ঘটনা নয়; বরং স্বাভাবিকভাবেই এরূপ হয়ে থাকে। বরং নামাজে জুনুবী হওয়া এটা হলো বিরল। সুতরাং এক অ-বিরল ঘটনাকে বিরল ঘটনার সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত করা দুরস্ত হবে? তাই কিরাআতে আটকে যাওয়া-তা জানাবাতের সাথে যুক্ত হবে না।

وَلَوْ قَرَأَ مِقْدَارَ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلٰوةُ لَايَجُوزُ بِالْاِجْمَاعِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ اِلَى الْاِسْتِخْلَافِ وَاِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ لِاَنَّ التَّسْلِيْمَ وَاجِبٌ فَلَابُدَّ مِنَ التَّوَضِّىْ لِيَأْتِىَ بِهٖ وَاِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِىْ هٰذِهِ الْحَالَةِ اَوْتَكَلَّمَ اَوْ عَمِلَ عَمَلًا يُنَافِى الصَّلٰوةَ تَمَّتْ صَلَاتُهٗ لِاَنَّهٗ تَعَذَّرَ الْبِنَاءُ لِوُجُوْدِ الْقَاطِعِ لٰكِنْ لَا اِعَادَةَ عَلَيْهِ لِاَنَّهٗ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنَ الْاَرْكَانِ فَاِنْ رَاٰى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ فِىْ صَلَاتِهٖ بَطَلَتْ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ .

অনুবাদ ঃ আর যদি নামাজ জায়েজ হওয়া পরিমাণ কিরাআত পড়ে থাকে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে খলীফা বানান জায়েজ নয়। কেননা এ ক্ষেত্রে খলীফা বানানোর প্রয়োজন নেই। যদি তাশাহ্‌হুদের পরে সে হাদাসগ্রস্ত হয়, তাহলে অজু করবে এবং সালাম ফিরাবে। কেননা সালাম ফিরানো ওয়াজিব। সুতরাং তা আদায় করার জন্য অজু করা জরুরি। আর যদি এ অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটায় কিংবা কথা বলে কিংবা এমন কোনো কাজ করে যা নামাজের বিপরীত, তাহলে তার নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা নামাজ ভঙ্গকারী বিদ্যমান হওয়ার কারণে 'বিনা' সম্ভব নয়; কিন্তু নামাজ দোহরানোও তার উপর জরুরি নয়। কেননা কোনো রোকন তার জিম্মায় বাকি নেই। তায়াম্মুমকারী যদি নামাজের মধ্যে পানি দেখতে পায়, তাহলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আগে এর আলোচনা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি ইমাম مَايَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ কিরাআত পড়ে থাকে। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে এক আয়াত আর সাহেবাইনের মতে তিন আয়াত পড়ে থাকে, এরপর কিরাআত পড়তে অপারগ হয়ে যায়, তবে তার খলীফা বানানো জায়েজ নেই। যদি সে কাউকে খলীফা নির্ধারণ করে ফেলে তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। দলিল হলো, যখন কোন মুসল্লী নামাজ জায়েজ হয়ে যায় পরিমাণ কিরাআত পড়ে ফেলল তখন আর খলীফা বানানোর কোনো প্রয়োজন নেই। আর একথা স্মর্তব্য যে, শরয়ী জরুরত ব্যতীত খলীফা বানানো জায়েজ নেই।

قَوْلُهٗ وَاِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ الخ : কোনো নামাজির তাশাহহুদের পর হাদাস হলো তখন হুকুম হলো, সে অজু করবে অতঃপর সালাম ফিরাবে। কেননা সালাম ফিরানো ওয়াজিব। সুতরাং এ কারণে তার অজু করা জরুরি, তাহলে সে উজূবে সালাম ঠিকভাবে আদায় করতে পারবে।

قَوْلُهٗ وَاِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِىْ هٰذِهِ الْحَالَةِ الخ : কোনো মুসল্লী যদি তাশাহহুদের পর ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটায় কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলে অথবা এমন কোনো কাজ করে যা নামাজের বিপরীত, তাহলে তার নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। দলিল হলো, নামাজ ভঙ্গকারী পাওয়া যাওয়ার কারণে 'বিনা' করা তো সম্ভব নয়, তবে তার উপর নামাজ দোহ্‌রানোও জরুরি নয়। কেননা আরকানের মধ্য থেকে কোনো একটি রোকনও তার জিম্মায় বাকি নেই। তবে تحليل অর্থাৎ خُرُوْج بِصُنْعِه – তাও ইচ্ছাকৃতভাবে ফেয়েল করার দ্বারা আদায় হয়ে গেছে। যদিও সালাম (سلام) শব্দটি দ্বারা تحليل ওয়াজিব ছিল। তবে এর দ্বারা অন্য রুকনের কোনো ক্ষতি হয়নি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর জাহিরে হাদীস (অর্থাৎ যার মধ্যে তাশাহহুদ খতম করে বলেছিলেন, যদি তোমার দাঁড়াতে মনে চায় তখন দাঁড়িয়ে যেও)ও এদিকে ইঙ্গিতবহ।

فَإِنْ رَاٰهُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ اَوْ كَانَ مَاسِحًا فَانْقَضَتْ مُدَّةُ مَسْحِهٖ اَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ بِعَمَلٍ يَسِيْرٍ اَوْ كَانَ اُمِّيًّا فَتَعَلَّمَ سُوْرَةً اَوْعُرْيَانًا فَوَجَدَ ثَوْبًا اَوْ مُوْمِيًا فَقَدَرَ عَلَى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ اَوْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً عَلَيْهِ قَبْلَ هٰذِهٖ اَوْ اَحْدَثَ الْاِمَامُ الْقَارِئُ فَاسْتَخْلَفَ اُمِّيًّا اَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فِى الْفَجْرِ اَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَهُوَ فِى الْجُمُعَةِ اَوْكَانَ مَاسِحًا عَلَى الْجَبِيْرَةِ فَسَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ اَوْ كَانَ صَاحِبَ عُذْرٍ فَانْقَطَعَ عُذْرُهٗ كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَمَنْ بِمَعْنَاهَا بَطَلَتِ الصَّلٰوةُ فِىْ قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَ قَالَا تَمَّتْ صَلَاتُهٗ وَقِيْلَ الْاَصْلُ فِيْهِ اَنَّ الْخُرُوْجَ عَنِ الصَّلٰوةِ بِصُنْعِ الْمُصَلِّىْ فَرْضٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَلَيْسَ بِفَرْضٍ عِنْدَهُمَا فَاعْتِرَاضُ هٰذِهِ الْعَوَارِضِ عِنْدَهٗ فِىْ هٰذِهِ الْحَالَةِ كَاعْتِرَاضِهَا فِىْ خِلَالِ الصَّلٰوةِ وَعِنْدَهُمَا كَاعْتِرَاضِهَا بَعْدَ التَّسْلِيْمِ لَهُمَا مَارَوَيْنَا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَلَهٗ اَنَّهٗ لَايُمْكِنُهٗ اَدَاءُ صَلٰوةٍ اُخْرٰى اِلَّا بِالْخُرُوْجِ مِنْ هٰذِهٖ وَمَا لَا يُتَوَصَّلُ اِلَى الْفَرْضِ اِلَّا بِهٖ يَكُوْنُ فَرْضًا وَمَعْنٰى قَوْلِهٖ تَمَّتْ قَارَبَتِ التَّمَامَ وَالْاِسْتِخْلَافُ لَيْسَ بِمُفْسِدٍ حَتّٰى يَجُوْزَ فِىْ حَقِّ الْقَارِئِ وَاِنَّمَا الْفَسَادُ ضَرُوْرَةُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَهُوَ عَدَمُ صَلَاحِيَّةِ الْاِمَامَةِ ـ

অনুবাদ : যদি তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর পানি দেখতে পায়, কিংবা সে মোজার উপর মাসাহকারী ছিল, কিন্তু মাসহ মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, কিংবা আমলে কালীল (অতি সামান্য কাজ) দ্বারা মোজা জোড়া খুলে ফেলে, কিংবা উম্মী ছিল কিন্তু সূরা শিখে ফেলল, কিংবা উলঙ্গ ছিল কিন্তু কাপড় পেয়ে গেল, কিংবা ইশারা যোগে নামাজ আদায় করছিল, কিন্তু রুকু সিজ্দা করতে সক্ষম হয়ে গেল, কিংবা এই নামাজের পূর্ববর্তী কোনো কাজা নামাজ তার স্মরণ হল, কিংবা কিরাআত পাঠে সক্ষম ইমাম হাদাসগ্রস্ত হয়ে কোনো উম্মীকে খলীফা বানাল, কিংবা ফজরে সূর্যোদয় হয়ে গেল, কিংবা জুমার নামাজে থাকা অবস্থায় আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেল, কিংবা সে জখমের পট্টির উপর মাসাহ্কারী ছিল, কিন্তু জখম ভাল হওয়ার কারণে পট্টি খুলে পড়ে গেল, কিংবা সে মাজুর ছিল, কিন্তু তার ওজর দূর হয়ে গেল, যেমন মুস্তাহাযা নারী ও তার সমশ্রেণীভুক্ত অন্যান্যরা—এই সকল অবস্থায় নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তার নামাজ পূর্ণ হয়ে গেছে। কারো কারো মতে এ বিষয়ে আসল কথা হলো হলো, আবূ হানীফা (র.) -এর মতে মুসল্লীর নিজস্ব কোনো 'কর্ম' দ্বারা নামাজ থেকে বের হয়ে আসা ফরজ, কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে তা ফরজ নয়। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ অবস্থায় (অর্থাৎ তাশাহ্হুদের পরে) এ সকল ঘটনা ঘটা নামাজের মধ্যে ঘটারই সমতুল্য। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে সালামের পরে ঘটার সমতুল্য। উক্ত ইমাম দ্বয়ের দলিল হলো ইতঃপূর্বে বর্ণিত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস। ইমাম আবূ হানীফা (র.)

-এর দলিল হলো, বর্তমান নামাজ থেকে বের হওয়া ছাড়া অন্য নামাজ আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর যে কাজ ছাড়া কোনো ফরজ কাজে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না, সে কাজটাও ফরজ। আর হাদীসে বর্ণিত تمت শব্দটির অর্থ হলো সম্পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি এসেছে। আর স্থলবর্তী করা (স্বকীয়ভাবে) নামাজ ভঙ্গকারী নয়। এ জন্যই কিরাআত পাঠে সক্ষম ব্যক্তিকে (স্থলবর্তী) করা জায়েজ; বরং এখানে ফাসাদ এসেছে একটি শরীয়তী হুকুমের অনিবার্য প্রয়োজনে। আর তা হলো (উম্মী ব্যক্তিটির) ইমামতি করার অযোগ্যতা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে مَسَائِلُ اِثْنَا عَشَرَ -এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐ বারটি মাসআলার বর্ণনা করা হয়েছে যা তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর পেশ আসে। বারটি মাসআলা নিম্নরূপ : (১) তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ বসার পর পানি দেখল, (২) কিংবা কেউ মোজার উপর মাসাহকারী ব্যক্তি ছিল তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ বসার পর মাসাহ তার মেয়াদ শেষ হয়ে গেল, (৩) কিংবা তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ বসার পর আমলে কালীল দ্বারা মোজা জোড়া খুলে ফেলল, অথবা দুই মোজার একটি খুলে ফেলল। আমলে কালীল হলো, মোজা এ পরিমাণ ঢিলা ছিল যে, হাতের জরুরত ছাড়া শুধু পায়ের ইশারা দ্বারা মোজা খুলে পড়েছে। (৪) কিংবা মুসল্লী উম্মী ছিল কিন্তু তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ বসার পর সে কুরআনের কোনো সূরা শিখে ফেলল। ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, এর দ্বারা মুরাদ হলো কুরআন ভুলে গিয়েছিল কিন্তু তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ সময়ের পর তার তা স্মরণ হয়ে গেছে। এ মতলব নয় যে, সে নতুন করে শিখেছে। কেননা تعلم তথা শিক্ষা নেওয়ার জন্য تعليم তথা শিক্ষা দেওয়া জরুরি। আর শিক্ষা দেওয়া হলো নামাজের বিপরীত কাজ। কেউ কেউ বলেন, সূরা শিক্ষা গ্রহণ করার মতলব হলো সে বে-ইখতিয়ার কুরআন শুনেছে এবং কোনো ধরনের চেষ্টা ছাড়াই তার কুরআন স্মরণ হয়ে গেছে। (৫) কিংবা মুসল্লী উলঙ্গ ছিল, কিন্তু তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ বসার পর কাপড় পেয়ে গেল। (৬) কিংবা মুসল্লী ইশারাযোগে রুকু-সিজ্‌দাকারী ছিল কিন্তু তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ বসার পর রুকু-সিজ্‌দা করতে সক্ষম হয়ে গেল। (৭) কিংবা মুসল্লীর তাশাহ্‌হুদের পরিমাণ বসার পর কাজা নামাজ স্মরণ হয়ে গেল– যা তার উপর এ নামাজের পূর্বে وَاجِبُ الْقَضَاءِ ছিল, যেমন– জোহরের নামাজের দ্বিতীয় বৈঠকের পর মনে পড়ল যে, তার ফজরের নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছিল, অথচ তারতীবের ফরযিয়ত হিসাবে তা আগে আদায় করা উচিত ছিল। (৮) কিংবা তাশাহুদের পরিমাণ বসার পর কারী ইমামের হাদাস হল আর সে কোনো উম্মীকে খলীফা বানাল। (৯) কিংবা তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ বসার পর ফজরের নামাজে সূর্যোদয় হয়ে গেল। (১০) কিংবা তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ বসার পর আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেল অথচ এ ব্যক্তি জুমার নামাজরত। (১১) কিংবা মুসল্লী জখমের পট্টির উপর মাসাহকারী ছিল, কিন্তু তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ বসার পর জখম ভাল হওয়ার কারণে পট্টি খুলে পড়ে গেল। (১২) কিংবা সে মাজুর ছিল কিন্তু তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ বসার পর তার ওজর দূর হয়ে গেল। অর্থাৎ সে ওজরই চলে গেছে। যেমন– মুস্তাহাযা নারী অথবা তার সমশ্রেণীর অন্যান্যরা। যেমন– যার সর্বদা পেশাব ঝরার ওজর রয়েছে।

উক্ত বারোটি মাসাইলের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, উক্ত সকল সুরতে তার নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। কোনো কোনো মাশায়িখ বলেন, এ বিষয়ে আসল কথা হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে মুসল্লীর নিজস্ব কোনো ফেয়েল তথা কর্ম দ্বারা নামাজ থেকে বের হয়ে আসা ফরজ। কিন্তু সাহেবাইনের মতে তা ফরজ নয়। সুতরাং উপরোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে তাশাহহুদের পর এ সকল ঘটনা ঘটে যাওয়া এমন যেমন নামাজের মধ্যেই দেখা দিয়েছে। (অর্থাৎ নামাজের মধ্যে দেখা দেওয়ারই সমতুল্য) আর যেহেতু নামাজের মধ্যে এ সকল ঘটনা ঘটা নামাজ বিনষ্টকারী। এ জন্য তাশাহ্‌হুদের পরেও যদি এগুলো দেখা দেয় তাহলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর সাহেবাইনের মতে তাশাহ্‌হুদের পর এগুলো দেখা দেওয়া এমন– যেমন সালামের পর দেখা দিয়েছে। (অর্থাৎ সালামের পর দেখা দেওয়ার সমতুল্য) আর স্মর্তব্য বিষয় যে, সালামের পর কোনো ঘটনা ঘটার দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয় না। সুতরাং তাশাহ্‌হুদের পর এ সকল ঘটনা ঘটালেও দেখা নামাজ ফাসিদ হবে না। তাঁদের দলিল, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে বলেছিলেন, إِذَا قُلْتَ هٰذَا أَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ (যখন তুমি এটা (অর্থাৎ তাশাহ্‌হুদ) বললে কিংবা এটা করলে (অর্থাৎ তাশাহ্‌হুদ পরিমাণ বসলে) তবে

তোমার নামাজ পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন দাঁড়াতে মনে চাইলে দাঁড়িয়ে যাও।) উক্ত হাদীস দ্বারা استدلال এভাবে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পূর্ণ হওয়াকে তাশাহ্হুদ পড়া যা তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার সাথে যুক্ত করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি পুরো নামাজকে তৃতীয় কোনো জিনিসের সাথে যুক্ত করেছে, সে نص -এর বিরোধিতা করেছে। মোদ্দাকথা, উক্ত মাসআলাগুলোর মধ্যে শেষ বৈঠকের পর ঐ সকল ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। আর শেষ বৈঠকে নামাজ পূর্ণ হয়ে গেছে, তাই তারপর নামাজ বাতিল হওয়ার কি প্রশ্ন থাকতে পারে?

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, এ সময়ে অন্য নামাজ আদায় করা ফরজ। আর এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না যতক্ষণ না সে বর্তমান নামাজ থেকে বের হয়। সুতরাং বুঝা গেল বর্তমান নামাজ থেকে বের হওয়া অন্য ফরজ নামাজ আদায় করার মাধ্যম হলো। অর্থাৎ অন্য ফরজ নামাজ আদায় করা বর্তমান নামাজ থেকে বের হওয়ার উপর موقوف। আর যেহেতু ফরজের مَوْقُوْفٌ عَلَيْهِ ও ফরজ হয়, এ জন্য বর্তমান নামাজ থেকে বের হওয়াও ফরজ হবে। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে মুসল্লীর নিজস্ব কর্ম (خُرُوجٌ بِصُنْعِ الْمُصَلِّي) দ্বারা নামাজ থেকে বের হওয়া ফরজ। এর (نظر) নজির হলো, যেমন এক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হল কাউকে খোর-পোষ দেওয়া। আর তা রোজগার করা ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই তার উপর এ রোজগার করাও ফরজ। অথবা কারো উপর সিজদা করা ফরজ। আর তা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না যতক্ষণ না সে রুকু থেকে ফিরে যায়। সুতরাং এ ফিরে যাওয়াও তার উপর ফরজ। কেননা ফরজের موقوف عليه -ও ফরজ হয়।

وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَمَّتْ الخ - ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসের জবাব দেওয়া হচ্ছে। জবাবের খোলাসা হলো, হাদীসের মধ্যে تَمَّتْ صَلَاتُكَ -এর অর্থ হলো, قَارَبَتِ التَّمَامَ অর্থাৎ যখন তুমি এটা করলে বা বললে তখন তোমার নামাজ সম্পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি এসে গেছে। এটা এমন– যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ - যে আরাফায় অবস্থান করেছে তার হজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অথচ উকূফে আরাফার পর এখনো তাওয়াফে যিয়ারত যা ফরজ তা বাকি রয়ে গেছে। সুতরাং বুঝা গেল, এখানেও এ অর্থ হবে যে, তার হজ সম্পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি এসে গেছে।

وَالْاِسْتِخْلَافُ لَيْسَ بِمُفْسِدٍ দ্বারা একটি سؤال مقدر -এর জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো হলো, কারী ইমামের হাদাস হয়েছে। আর সে উম্মীকে খলীফা করেছে। এতে তো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নামাজ ফাসিদ না হওয়া উচিত। কেননা খলীফা বানানো নামাজ ভঙ্গকারী নয়। সুতরাং যদি এক হাদাসগ্রস্ত ক্বারী অপর ক্বারীকে খলীফা বানায় তবে নামাজ ফাসিদ হয় না সুতরাং এমনিভাবে এখানেও নামাজ ফাসিদ না হওয়া উচিত? জবাব হচ্ছে, নিশ্চয়ই খলীফা বানানো নামাজ ভঙ্গকারী নয়। এ কারণেই এক ক্বারী আরেক ক্বারীকে খলীফা বানানো জায়েজ। কিন্তু উপরোক্ত সুরতে নামাজ ভঙ্গ হওয়া খলীফা বানানোর কারণে নয় বরং অন্য কারণে। আর তা হলো শরিয়তী হুকুমের জরুরত। আর শরিয়তী হুকুমের জরুরত হলো, উম্মী যাকে খলীফা বানায় তার মধ্যে ইমামতী করার যোগ্যতা নেই। সুতরাং ইমাম অযোগ্য হওয়ার কারণে নামাজ ফাসিদ হয়, তাকে খলীফা বানানোর কারণে নয়। (অর্থাৎ খলীফা বানানোর কারণে নামাজ ফাসিদ হয় না; বরং খলীফা ইমামের অযোগ্যতার কারণে নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়।)

وَمَنِ اقْتَدٰى بِالْإِمَامِ بَعْدَمَا صَلّٰى رَكْعَةً فَاَحْدَثَ الْإِمَامُ فَقَدَّمَهُ اَجْزَاهُ لِوُجُوْدِ الْمُشَارَكَةِ فِى التَّحْرِيْمَةِ وَالْاَوْلٰى لِلْإِمَامِ اَنْ يُقَدِّمَ مُدْرِكًا لِاَنَّهُ اَقْدَرُ عَلٰى اِتْمَامِ صَلَاتِهٖ وَيَنْبَغِىْ لِهٰذَا الْمَسْبُوْقِ اَنْ لَّا يَتَقَدَّمَ لِعَجْزِهٖ عَنِ التَّسْلِيْمِ فَلَوْ تَقَدَّمَ يَبْتَدِئُ مِنْ حَيْثُ اِنْتَهٰى اِلَيْهِ الْاِمَامُ لِقِيَامِهٖ مَقَامَهُ وَاِذَا انْتَهٰى اِلَى السَّلَامِ يُقَدِّمُ مُدْرِكًا يُسَلِّمُ بِهِمْ فَلَوْ اَنَّهُ حِيْنَ اَتَمَّ صَلٰوةَ الْاِمَامِ قَهْقَهَ اَوْ اَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا اَوْ تَكَلَّمَ اَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ الْقَوْمِ تَامَّةٌ لِاَنَّ الْمُفْسِدَ فِىْ حَقِّهٖ وُجِدَ فِىْ خِلَالِ الصَّلٰوةِ وَفِىْ حَقِّهِمْ بَعْدَ تَمَامِ اَرْكَانِهَا وَالْاِمَامُ الْاَوَّلُ اِنْ كَانَ فَرَغَ لَاتَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَاِنْ لَمْ يَفْرُغْ تَفْسُدُ هُوَ الْاَصَحُّ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ইমামের এক রাকআত হওয়ার পর ইক্তিদা করল, তারপর ইমাম হাদাসগ্রস্ত হয়ে তাকে আগে বাড়িয়ে দিলেন, তার পক্ষে (ইমামের স্থলবর্তী হওয়ার) অবকাশ আছে। কেননা তাহ্‌রীমাতে (উভয়ের) অংশীদারিত্ব রয়েছে। তবে ইমামের জন্য উত্তম হলো প্রথম থেকে অংশ গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তিকে আগে বাড়ানো। কেননা সে ইমামের নামাজকে সম্পন্ন করার ব্যাপারে (মাসবূকের তুলনায়) অধিকতর সক্ষম। আর মাসবূকের উচিত সালাম ফিরানোর ব্যাপারে নিজের অপারগতার কথা বিবেচনা করে অগ্রসর না হওয়া। মাসবূক যদি (ইমামের স্থলবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে) অগ্রসর হয়, তাহলে ইমাম যেখানে এসে শেষ করেছেন, সেখান থেকে সে শুরু করবে। কেননা এখন সে ইমামের স্থলবর্তী। আর যখন সে সালাম পর্যন্ত উপনীত হবে তখন ইমামের সাথে প্রথম থেকে অংশগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তিকে আগে বাড়িয়ে দিবে। সে মুক্তাদীদের নিয়ে সালাম ফিরাবে। কিন্তু এই মাসবূক যদি ইমামের নামাজ সম্পন্ন করার পর অট্টহাসি দেয় বা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটায় বা কথা বলে বা মস্‌জিদ থেকে বের হয়ে আসে, তাহলে তার নামাজ ফাসিদ হবে আর মুক্তাদীদের নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা তার ক্ষেত্রে নামাজ বিনষ্টকারী বিষয়টি নামাজের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে কিন্তু মুক্তাদীদের ক্ষেত্রে সকল রোকন সম্পন্ন হওয়ার পর পাওয়া গিয়েছে। আর প্রথম ইমাম যদি (অন্যান্যদের সাথে দ্বিতীয় ইমামের পিছনে) নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে থাকে, তাহলে তার নামাজ ফাসিদ হবে না। আর ফারিগ না হয়ে থাকলে ফাসিদ হয়ে যাবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : এক ব্যক্তি এমন ইমামের ইক্তিদা করেছে- যে এক রাকআত নামাজ আদায় করেছে পরে ঐ ইমাম হাদাসগ্রস্থ হয়ে পড়েছে এবং ইমাম ঐ মাসবূককে খলীফা করেছে এমনটি করা জায়েজ আছে। কেননা খলীফা বানানো সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো তাহরীমায় উভয়ে শরিক থাকা, আর এখানে তা পাওয়া গেছে। সুতরাং খলীফা বানানো সহীহ আছে। তবে উত্তম হলো, ইমাম কোনো মুদরিক তথা প্রথম থেকে অংশগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তিকে খলীফা বানাবে। কেননা সে ইমামের নামাজকে সম্পন্ন করার ব্যাপারে মাসবূকের তুলনায় অধিকতর সক্ষম। কেননা যদি মাসবূককে খলীফা বানানো হয়

তবে তার সালাম ফিরানোর পর অন্য কাউকে খলীফা বানানোর প্রয়োজন দেখা দেবে। স্মর্তব্য যে, এ সুরতে দু'বার খলীফা বানানো লাযিম আসে। আর দু'বারের তুলনায় একবারই খলীফা বানানো উত্তম। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মাসবূকের উচিত হলো সামনে অগ্রসর না হওয়া অর্থাৎ সে, খলীফা হবে না। কেননা সে সালাম ফিরানোর ব্যাপারে অপারগ। তবে খলীফা হওয়া তো জায়েজ। কিন্তু উত্তম নয়।

قوله فلو تقدم يبتدئ الخ : যদি হাদাসগ্রস্ত ইমাম মাসবূককে খলীফা বানায় আর এ মাসবূক সামনে অগ্রসর হয়, তাহলে সেখান থেকে নামাজ শুরু করবে যেখানে এসে ইমাম শেষ করেছেন। কেননা সে ইমামের স্থলবর্তী। আর যখন এ মাসবূক ইমামের নামাজ সম্পন্ন করে সালাম পর্যন্ত উপনীত হবে তখন নিজে পিছনের দিক সরে পড়বে এবং কোনো মুদ্‌রিককে আগে বাড়িয়ে দিবে, যাতে সে (মুদারিক) মুক্তাদীদের নিয়ে সালাম ফিরিয়ে তাদের নামাজ সম্পন্ন করতে পারে। আর মাসবূক মুদ্‌রিককে আগে বাড়াবে মাসবূক নিজে সালাম ফিরাতে অপারগ হওয়ার কারণে। কেননা এখনো তার এক রাকআত বাকি, তাই সে এমন ব্যক্তির সাহায্য নিবে যে সালাম ফিরাতে সক্ষম। আর যদি এরূপ অবস্থা হয় যে, মাসবূক খলীফা যখন ইমামের নামাজ সম্পন্ন করল, পরে অট্টহাসি দেয় বা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটায় বা কথাবার্তা বলে বা মস্‌জিদ থেকে বের হয়ে যায় – এ সকল অবস্থায় মাসবূকের নিজস্ব নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি মুক্তাদীদের মাঝেও কেউ মাসবূক থাকে তাহলে তার নামাজও ফাসিদ হয়ে যাবে। আর মুক্তাদীদের নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো, এ মুক্তাদী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইমামের সাথে শরিক থাকতে হবে।

দলিল হলো, নামাজ বিনষ্টকারী কাজ মাসবূকের ক্ষেত্রে নামাজের মধ্যে পাওয়া গেছে। আর মুক্তাদীদের ক্ষেত্রে নামাজের সকল রোকন সম্পন্ন হওয়ার পর পাওয়া গেছে। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, নামাজের মধ্যে নামাজ বিনষ্টকারী পাওয়া গেলে নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। নামাজের সকল রোকন সম্পন্ন হওয়ার পর পাওয়া গেলে مفسد صلوة ফাসিদ হয় না, তবে প্রথম ইমামের দু'অবস্থা হতে পারে। এক. হয়তো সে ছুটে যাওয়া নামাজ খলীফা ইমামের পেছনে আদায় করে নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে যাবে। দুই. অথবা এখনো নামাজ থেকে ফারিগ হয়নি। প্রথম অবস্থায় তার নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা সেও মুদরিকের সদৃশ। যদিও মাঝখানে লাহিক হয়েছিল। আর দ্বিতীয় অবস্থায় তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। যেমন, মাসবূকের নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। এটাই বিশুদ্ধতম মত।

فَإِنْ لَمْ يُحْدِثِ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ قَهْقَهَ أَوْ أَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا فَسَدَتْ صَلٰوةُ الَّذِيْ لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ صَلَاتِهِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا لَاتَفْسُدُ وَإِنْ تَكَلَّمَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لَمْ تَفْسُدْ فِيْ قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا لَهُمَا أَنَّ صَلٰوةَ الْمُقْتَدِيْ بِنَاءٌ عَلٰى صَلٰوةِ الْإِمَامِ جَوَازًا وَفَسَادًا وَلَمْ تَفْسُدْ صَلٰوةُ الْإِمَامِ فَكَذَا صَلَاتُهُ وَصَارَ كَالسَّلَامِ وَالْكَلَامِ وَلَهُ أَنَّ الْقَهْقَهَةَ مُفْسِدَةٌ لِلْجُزْءِ الَّذِيْ يُلَاقِيْهِ مِنْ صَلٰوةِ الْإِمَامِ فَيُفْسِدُ مِثْلَهُ مِنْ صَلٰوةِ الْمُقْتَدِيْ غَيْرَ أَنَّ الْإِمَامَ لَايَحْتَاجُ إِلَى الْبِنَاءِ وَالْمَسْبُوْقُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ وَالْبِنَاءُ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ بِخِلَافِ السَّلَامِ لِأَنَّهُ مِنْهُ وَالْكَلَامُ فِيْ مَعْنَاهُ يَنْقُضُ وُضُوْءَ الْإِمَامِ لِوُجُوْدِ الْقَهْقَهَةِ فِيْ حُرْمَةِ الصَّلٰوةِ ـ

অনুবাদ ঃ আর যদি প্রথম ইমামের হাদাস না ঘটে বরং তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসেন তারপর অট্টহাসি করেন কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটান, তাহলে ঐ লোকের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে, যে নামাজের প্রথম দিক পায়নি। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ফাসিদ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যদি কথা বলেন কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যান তাহলে কারো মতেই ফাসিদ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, জায়েজ হওয়া ও ফাসিদ হওয়া উভয় ক্ষেত্রেই মুক্তাদীর নামাজের ভিত্তি হলো ইমামের নামাজের উপর। যেহেতু এখানে (কারোর মতেই) ইমামের নামাজ ফাসিদ হয়নি, সেহেতু মুক্তাদীর নামাজও ফাসিদ হবে না। বিষয়টি সালাম এবং কথা বলার মতো হলো। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, অট্টহাসি ইমামের নামাজের ঐ অংশকে ফাসিদ করে দেয় যে অংশ অট্টহাসির সাথে যুক্ত। সুতরাং মুক্তাদীর নামাজেরও ততটুকু ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে ইমামের আর বিনা করার প্রয়োজন নেই। আর মাসবূকের বিনা করার প্রয়োজন রয়েছে। আর ফাসিদের উপর বিনা করাও ফাসিদ, সালামের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা সালাম তো নামাজ সমাপ্তকারী। আর কথা সালামের সমমানের। এ ক্ষেত্রে ইমামের অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে, যেহেতু অট্টহাসি নামাজে থাকা অবস্থায় হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতের মধ্যে ইমামকে اول তথা প্রথম শব্দের সাথে مقيد করা تساهل অর্থাৎ যথার্থ নয়। কেননা এ মাসআলায় খলীফার কোনো প্রসঙ্গ নেই তাই দ্বিতীয় ইমামও নেই। অতএব শুধু "ইমাম" বলাই যুক্তিযুক্ত। এখানে সূরতে মাসআলা হলো, ইমামের হাদাস হয়নি বরং তিনি পুরো নামাজ পড়িয়েছেন এবং তাশাহহুদ পরিমাণ সময় বসেছেনও। অতঃপর তিনি অট্টহাসি দেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটান। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এতে এমন মুক্তাদীর নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে যে ইমামের নামাজের প্রথমাংশ পায়নি। অর্থাৎ মাসবূকের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। গ্রন্থকার মাসবূকের নামাজের সাথে فساد-এর قيد এ জন্য যোগ্য করেছেন যে, মুদরিকের নামাজ কারো মতেই ফাসিদ হয় না। তবে লাহিকের নামাজের ক্ষেত্রে দুটো বর্ণনা রয়েছে। এক. ফাসিদ হওয়ার, দুই. ফাসিদ না হওয়ার। সাহেবাইন (র.) বলেন, মাসবূকের নামাজও ফাসিদ হবে না। আর যদি তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর ইমাম কথা বলে বা মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, তবে সর্ব সম্মত অভিমত অনুসারে কারো নামাজ ফাসিদ হবে না। মাসআলাটির সারমর্ম হলো, ইমাম একদল মুদরিক ও একদল মাসবূকের ইমামতি করেছেন। সালাম ফিরানোর স্থানে এসে তিনি অট্টহাসি করলেন কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাসগ্রস্ত হলেন। তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে মাসবূকদের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর মতে ফাসিদ হবে না। পক্ষান্তরে সালাম ফিরানোর স্থানে এসে যদি কথা বলেন কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যান তবে কারো মতেই নামাজ ফাসিদ হবে না।

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) সালামের মুহূর্তে এসে অট্টহাসি দেওয়া কিংবা ইচ্ছাকৃত হাদাস সৃষ্টি করা এবং কথা বলা কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার মাঝে পার্থক্য করেন। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্য করেন না।

সাহেবাইন (র.) -এর দলিল হলো, জায়েজ হওয়া ও ফাসিদ হওয়া উভয় ক্ষেত্রেই মুক্তাদীর নামাজের ভিত্তি হলো ইমামের নামাজের উপর। যেমন اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ হাদীস-এর মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কোনো ইমামের মতেই ইমামের নামাজ ফাসিদ হয়নি, তাই মুক্তাদীর নামাজও ফাসিদ হবে না। চাই মুক্তাদী মাসবূক, মুদরিক বা লাহিক হোক। বিষয়টি ইচ্ছাকৃত হাদাস, অট্টহাস্য, সালাম এবং কথা বলার মতো হয়ে গেল। অর্থাৎ যেমনিভাবে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর ইমামের সালাম এবং কথা বলার দ্বারা মুক্তাদীর নামাজ ফাসিদ হয় না এমনিভাবে অট্টহাসি এবং ইচ্ছাকৃত হাদাস সৃষ্টির দ্বারাও নামাজ ফাসিদ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, অট্টহাসি ইমামের নামাজের ঐ অংশকে ফাসিদ করে দেয় যে অংশ অট্টহাসির সাথে যুক্ত সুতরাং মুক্তাদীর নামাজও ততটুকু ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা মুক্তাদীর নামাজের ভিত্তি হলো ইমামের নামাজের উপর। যখন মুক্তাদীর (মাসবূকের) নামাজের এক অংশ ফাসিদ হয়ে গেল তখন বাকি নামাজের উপর 'বিনা' করতে পারবে না। কেননা ফাসিদের উপর 'বিনা' করাও ফাসিদ। মোদ্দাকথা, মাসবূকের নামাজের 'বিনা' করার প্রয়োজন নেই। কেননা তার সকল রোকন পূর্ণ হয়ে গেছে এখন তো শেষ করার সময়। কারণ ইমামের নামাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এমনিভাবে মুদরিক মুক্তাদীর নামাজও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তবে মাসবূকের 'বিনা' করার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা তার প্রথম দিকের কিছু নামাজ বাকি রয়ে গেছে। আর উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, যে অংশের উপর বিনা করবে সে অংশ অট্টহাস্যের কারণে ফাসিদ হয়ে গেছে। আর ফাসিদ অংশের উপর বিনা করাও ফাসিদ। এ জন্য মাসবূকের বিনা করা অসম্ভব। আর যখন 'বিনা' করা অসম্ভব হয়ে গেল তাই নামাজও ফাসিদ হয়ে গেল। তবে সালামের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা সালাম হলো নামাজ সমাপ্তকারী, নামাজ বিনষ্টকারী নয়। আর কথা বলা ও সালামের সমমানের। কেননা সালাম মূলত ডানের ও বামের লোকদের সম্বোধন করে কথা বলারই নামান্তর। কেননা সালাম তথা اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ-এর মধ্যে সম্বোধন বাচক সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে যা কথা বলাকে বুঝায়। মোদ্দাকথা যখন কথা বলাও সালামের সমমানের হলো তখন কথা বলাও নামাজ সমাপ্তকারী হবে, বিনষ্টকারী হবে না। সুতরাং যেমনিভাবে সালামের পর মাসবূক তার পূর্বের ছুটে যাওয়া নামাজ সম্পন্ন করতে পারে এমনিভাবে কথা বলার পরও সম্পন্ন করতে পারবে।

নিহায়া গ্রন্থকার ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এভাবে লিখেছেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটান আর অট্টহাসি উভয়টির কোনটিই مُوْجِبَاتُ تَحْرِيْمَةٌ (তাহরীমা ওয়াজিবকারী)-এর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং مَمْنُوْعَاتُ تَحْرِيْمَةٌ (তাহ্‌রীমা বারণকারী)-এর অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য উভয়টি ইমামের নামাজের ঐ অংশকে ফাসিদ করে দিবে যা তার সাথে যুক্ত। আর যেহেতু ইমামের নামাজ জায়েজ হওয়া ও ফাসিদ হওয়া উভয় ক্ষেত্রেই মুক্তাদীর নামাজকে শামিল করে, তাই মুক্তাদীর নামাজেরও এ অংশ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর মাসবূক যেহেতু অবশিষ্ট নামাজ সম্পন্ন করার জন্য 'বিনা' করার মুখাপেক্ষী, কিন্তু ফাসিদের উপর বিনা করাও ফাসিদ, এ জন্য উভয় সুরতে (ইচ্ছাকৃত হাদাস ও অট্টহাসি) মাসবূকদের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর সালাম ও মসজিদ থেকে বের হওয়া উভয়টি مُوْجِبَاتِ تَحْرِيْمَةٌ -এর অন্তর্ভুক্ত। সালাম مُوْجِبْ تَحْرِيْمَةٌ এভাবে যে, রাসলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, تَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ – (নামাজ থেকে হালাল হওয়ার উপায় হলো সালাম ফিরানো) আর خُرُوْجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ ও مُوْجِبْ تَحْرِيْمَةٌ এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ (যখন নামাজ আদায় সম্পন্ন হবে তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে) সুতরাং যখন এ দু'টি مُوْجِبْ تَحْرِيْمَةٌ তাই নামাজ বিনষ্টকারী হবে না; বরং নামাজ সমাপ্তকারী হবে। এখন যখন ইমামের নামাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে কোনো অংশ ফাসিদ হয়নি। তাই মাসবূকও তার নামাজের 'বিনা' করতে পারবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর ইমামের অট্টহাসি আইম্মায়ে ছালাছার মতে অজু ভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ সুরতে অজু ভঙ্গকারী নয়। ইমাম যুফার (র.) এ কায়দা বয়ান করেছেন যে, যে অট্টহাসি দ্বারা নামাজ দোহরানো ওয়াজিব হয় তা অজু ভঙ্গকারী। আর যা এমনটি নয় তা অজু ভঙ্গকারীও নয়। সুতরাং যেহেতু ঐ সুরতে ইমামের অট্টহাসি দ্বারা নামাজ দোহরানো ওয়াজিব হয় না সেহেতু তা অজু ভঙ্গকারীও হবে না।

আইম্মায়ে ছালাছার দলিল হলো, অট্টহাসি নামাজে থাকা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং এ অবস্থায় যদি কোনো ভুল হয়ে যেতো তবে তার উপর সাহু সিজ্‌দা ওয়াজিব হতো। আর যে অট্টহাসি নামাজের মধ্যে পাওয়া যায় তা অজুভঙ্গকারী হয়। এ জন্য এ অট্টহাসিও অজু ভঙ্গকারী হবে।

وَمَنْ اَحْدَثَ فِىْ رُكُوْعِهِ اَوْ سُجُوْدِهِ تَوَضَّأَ وَبَنٰى وَلَا يَعْتَدُّ بِالَّتِىْ اَحْدَثَ فِيْهَا لِاَنَّ اِتْمَامَ الرُّكْنِ بِالْاِنْتِقَالِ وَمَعَ الْحَدَثِ لَايَتَحَقَّقُ فَلَابُدَّ مِنَ الْاِعَادَةِ وَلَوْ كَانَ اِمَامًا فَقَدَّمَ غَيْرَهُ دَامَ الْمُقَدَّمُ عَلَى الرُّكُوْعِ لِاَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْاِتْمَامُ بِالْاِسْتِدَامَةِ وَلَوْ تَذَكَّرَ وَهُوَ رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌ اَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةً فَانْحَطَّ مِنْ رُكُوْعِهِ لَهَا اَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُوْدِهِ فَسَجَدَهَا يُعِيْدُ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ وَهٰذَا بَيَانُ الْاَوْلٰى لِتَقَعَ الْاَفْعَالُ مُرَتَّبَةً بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ وَاِنْ لَمْ يُعِدْ اَجْزَاهُ لِاَنَّ التَّرْتِيْبَ فِى الصَّلٰوةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلِاَنَّ الْاِنْتِقَالَ مَعَ الطَّهَارَةِ شَرْطٌ وَقَدْ وُجِدَ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ اَنَّهُ يَلْزَمُهُ اِعَادَةُ الرُّكُوْعِ لِاَنَّ الْقَوْمَةَ فَرْضٌ ـ

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তির রুকুতে কিংবা সিজদায় হাদাস হয়ে যায়, সে অজু করে বিনা করবে এবং যে রুকনে হাদাস হয়েছে, তা গ্রহণীয় হবে না। কেননা রোকন পূর্ণ হয় তা থেকে প্রস্থানের মাধ্যমে। আর হাদাস অবস্থায় প্রস্থান সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং (উক্ত রোকনটি) দোহ্‌রানো জরুরি। আর যদি তিনি ইমাম হয়ে থাকেন আর অন্যকে আগে বাড়িয়ে থাকেন, তবে যাকে আগে বাড়ানো হয়েছে, সে রুকু দীর্ঘায়িত করবে। কেননা দীর্ঘায়িত করার দ্বারা তা পূর্ণ করা তার পক্ষে সম্ভব। (অর্থাৎ রুকু প্রলম্বিত করাই নতুনভাবে রুকু করার সমতুল্য) যদি রুকুতে বা সিজদায় মনে পড়ে যে, তার জিম্মায় একটি সিজ্‌দা রয়ে গেছে, তখন সে রুকু থেকেই সিজদায় অবতরণ করল কিংবা সিজদা থেকে মাথা তুলে ঐ সিজদাটি করে নিল তবে রুকু বা সিজ্‌দাকে দোহ্‌রাবে। এটা হলো উত্তম হওয়ার বর্ণনা, যাতে রোকনগুলো যথাসম্ভব তারতীব মুতাবিক হয়। আর যদি না দোহ্‌রায় তবুও চলবে। কেননা নামাজের রোকনগুলোর মাঝে তারতীব রক্ষা করা শর্ত নয়। তবে তাহারাতের অবস্থায় (অন্য রোকনে) গমন শর্ত। আর তা তো পাওয়া গেছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তার জন্য রুকু দোহরানো জরুরি। কেননা তাঁর মতে "কাওমা' হলো ফরজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যার রুকু বা সিজ্‌দার অবস্থায় হাদাস হয়েছে, সে মুন্‌ফারিদ, ইমাম বা মুক্তাদী যাই হোক তার উচিত অজু করে 'বিনা' করা, আর যে রোকনে হাদাস হয়েছে তা গ্রহণীয় হবে না। দলিল হলো, একটি রোকন তখনই পূর্ণ হয় যখন তা থেকে অন্য রোকনের দিকে প্রস্থান করা হয়। আর এ প্রস্থান করা ফরজ। আর হাদাসের সাথে প্রস্থান হতে পারে না। কেননা منتقل اليه তথা যার দিকে প্রস্থান করা হয় তা নামাজের অংশ বিশেষ। আর হাদাস আসার পর নামাজের কোনো রোকন আদায় করা নামাজ বিনষ্টকারী। এ জন্য এ রোকন পুনরায় আদায় করা জরুরি। যেমন– যদি রুকুতে হাদাস হয়ে থাকে তবে অজু করে সে রোকনই আদায় করবে।

ইনায়া গ্রন্থকার লিখেছেন, কিয়াসের চাহিদা তো এই ছিল, যে পরিমাণ নামাজ আদায় করেছে তা সম্পূর্ণ ফাসিদ হয়ে যাওয়া। কিন্তু আমরা কিয়াসকে ঐ হাদীসের কারণে তরক করেছি যা নামাজের 'বিনা'র ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং কিয়াস অনুযায়ী শুধু ঐ রোকনের ফাসিদ হওয়া বাকি রয়েছে যার মধ্যে হাদাস সৃষ্টি হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إِمَامًا الخ : আর যদি হাদাসগ্রস্ত ব্যক্তি ইমাম হয় এবং রুকুতে তাঁর হাদাস হয়েছিল, অতঃপর ইমাম অন্যকে খলীফা বানায় তাহলে ঐ খলীফার শুরু থেকে রুকু করার প্রয়োজন নেই; বরং রুকুর পরিমাণ ঐ রুকুতে অবস্থান করবে। দলিল হলো, যে ফেয়েল তথা কর্মের উপর دوام (দীর্ঘায়িত) করা হয় তার মধ্যে استدامت (অবস্থান করা)-কে শুরু থেকে করার হুকুম দেওয়া হয়। সুতরাং এখানেও খলীফার استدامت -এর সাথে রুকু সম্পন্ন করা সম্ভবপর। এ জন্য বলা হয়েছে সে রুকুতে রুকু পরিমাণ অবস্থান করবে। শুরু থেকে রুকু করার কোনোই প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ وَلَوْ تَذَكَّرَ وَهُوَ رَاكِعٌ الخ : কোনো মুসল্লীর রুকুতে মনে পড়েছে যে তার একটি সিজদা রয়ে গেছে অথবা সিজদায় মনে পড়েছে যে তার জিম্মায় একটি সিজদা বাকি আছে। চাই তা তিলাওয়াতী সিজদা হোক কিংবা নামাজী সিজ্দা হোক। এখন যদি তার রুকুতে মনে পড়ে আর রুকু থেকেই তার কাজার জন্য সিজ্দায় চলে যায় এবং সিজ্দা কাজা করে নেয়। অথবা যদি সিজ্দার অবস্থায় তার কাজা সিজ্দার কথা মনে পড়ে, আর সে বর্তমান সিজদা থেকে মাথা তুলে সিজদা কাজা করলো। তবে যে রুকু বা সিজ্দায় কাজা সিজ্দা আদায় করলো–ঐ রুকু ও সিজ্দা দোহরাবে। আর এ দোহ্রানো হলো উত্তম এবং মোস্তাহাব। যাতে যথাসম্ভব রুকনগুলো তারতীব মুতাবিক আদায় হয়। অর্থাৎ বর্তমান রুকুর উপর সিজদাকে আগে করা সম্ভব। এ জন্য তাকে আগে করা উত্তম। আর যদি সে রুকু ও সিজ্দা না দোহ্রায় তবুও দুরুস্ত আছে। কেননা যে রুকু ও সিজদায় কাজা সিজ্দার কথা মনে পড়েছে প্রকৃতপক্ষে তাতো হয়ে গেছে। দোহ্রানোতো হলো শুধু তারতীবের দিকে লক্ষ্য করে। কিন্তু যেহেতু নামাজের রোকনগুলোতে তারতীব শর্ত নয়, এ জন্য তারতীব না পাওয়া যাওয়ার কারণে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না। রোকনগুলোতে তারতীব শর্ত না হওয়ার দলিল, মাসবূক তার স্বীয় নামাজ সেখান থেকে আরম্ভ করে যেখান থেকে ইমামকে পায়। তারপর ইমামের সালামের পর – তার প্রথমে ছুটে যাওয়া নামাজ আদায় করে, যেন মাসবূক পরের নামাজকে প্রথমে আদায় করল আর প্রথম নামাজকে পরে আদায় করল। সুতরাং তারতীব যদি শর্ত হতো তবে মাসবূকের জন্য জামাআতের ওজরের কারণে তা তরক করা জায়েজ হতো না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, এই রুকু বা সিজ্দা যার মধ্যে কাজা সিজ্দা আদায় করল তার থেকে অন্য রোকনের দিকে তাহারাতের সাথে প্রস্থান করা শর্ত। সুতরাং যখন উক্ত ব্যক্তি রুকু থেকে সোজা সিজ্দায় চলে গেল বা সিজদা থেকে মাথা তুলে কাজার জন্য সিজ্দা করল তখন তো তাহারাতের সাথে প্রস্থান করা পাওয়া গেছে। তাই ঐ রুকু বা সিজ্দা যার মধ্যে কাজা সিজ্দার কথা মনে পড়েছিল তা আদায় হয়ে গেছে। পুনরায় তা আর দোহ্রানোর আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি রুকু থেকে মাথা উঠানো ছাড়া সোজা সিজ্দায় চলে যায় তবে তার রুকু দোহরানো জরুরি। দলিল হলো, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে "কাওমা" অর্থাৎ রুকু থেকে মাথা উঠানো ফরজ। সুতরাং যখন সে রুকু থেকে মাথা উঠাল না; বরং রুকু থেকে সোজা সিজদায় চলে গেল এতে সে ফরজকে তরক করেছে। আর যেহেতু সে ফরজ কাওমাকে তরক করেছে তাই তার রুকু আদায় হয়নি। আর যেহেতু তার রুকু আদায় হয়নি তাই, তা দোহরানো জরুরি।

وَمَنْ اَمَّ رَجُلًا وَاحِدًا فَاَحْدَثَ وَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَالْمَأْمُوْمُ إِمَامٌ نَوٰى اَوْ لَمْ يَنْوِ لِمَا فِيْهِ مِنْ صِيَانَةِ الصَّلٰوةِ وَتَعْيِيْنُ الْاَوَّلِ لِقَطْعِ الْمُزَاحَمَةِ وَلَامُزَاحَمَةَ وَيُتِمُّ الْاَوَّلُ صَلَاتَهُ مُقْتَدِيًا بِالثَّانِيْ كَمَا اِذَا اسْتَخْلَفَهُ حَقِيْقَةً وَلَوْ لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ اِلَّا صَبِيٌّ اَوْ اِمْرَأَةٌ قِيْلَ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لِاسْتِخْلَافِ مَنْ لَّايَصْلُحُ لِلْاِمَامَةِ وَقِيْلَ لَاتَفْسُدُ لِاَنَّهُ لَمْ يُوْجَدِ الْاِسْتِخْلَافُ قَصْدًا وَهُوَ لَايَصْلُحُ لِلْاِمَامَةِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি মাত্র একজন মুক্তাদীর ইমামতি করছে, এমতাবস্থায় তার হাদাস ঘটল আর সে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল তখন মুক্তাদী ইমাম হয়ে যাবে তাকে স্থলবর্তী করার নিয়ত করুন বা না করুন। কেননা এতে নামাজ রক্ষার উপায় হয়। উল্লেখ্য যে, প্রথম ইমাম (কাউকে) স্থলবর্তী নিযুক্ত করে প্রতিযোগিতা এড়ানোর জন্য। আর এখানে সে ছাড়া অন্য কেউ নেই। অতঃপর প্রথমজন দ্বিতীয়জনের মুক্তাদী হয়ে নামাজ সম্পূর্ণ করবে। প্রকৃতই তাকে স্থলবর্তী করলে যেমন করতো। যদি তার পিছনে বালক ও স্ত্রীলোক ছাড়া অন্য কেউ না থাকে, তবে কারো কারো মতে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা যার ইমামতি জায়েজ নেই সে খলীফা হয়েছে। অন্য মতে তার নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে "স্থলবর্তীকরণ" পাওয়া যায়নি এবং তার ইমামতি করার যোগ্যতাও নেই। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : এক ব্যক্তি মাত্র অপর একজন ব্যক্তির ইমামতি করছে, অতঃপর ইমামের হাদাস হলো এবং সে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল, তখন মুক্তাদী ইমাম হয়ে যাবে। প্রথম ইমাম তাকে স্থলবর্তীর করার নিয়ত করুক বা না করুক। তবে শর্ত হলো সে ইমামতের যোগ্য হতে হবে। উক্ত ইবারতের মধ্যে একটি সম্ভাবনা এটাও আছে ঐ মুক্তাদী স্থলবর্তী হওয়ার নিয়ত করুক বা না করুক।" দলিল, ঐ সুরতে অর্থাৎ মুক্তাদী ইমাম নিযুক্ত হওয়ার দ্বারা তার নামাজের হেফাজত হয়। কেননা যদি ইমাম নিযুক্ত না হয় তখন ইমামতের স্থান শূন্য হয়ে থাকবে। আর এর দ্বারা মুক্তাদীর নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। তাই আমরা বলেছি উপরোক্ত সুরতে মুক্তাদী নিজেই ইমাম হয়ে যাবে।

وَتَعْيِيْنُ الْاَوَّلِ দ্বারা গ্রন্থকার একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, تعيين (নিযুক্ত হওয়া) بِغَيْرِ تَعْيِيْنٍ (নিযুক্তি ছাড়া) হতে পারে না। আর এখানে অবস্থা হলো, হাদাসগ্রস্ত ইমাম মুক্তাদীকে ইমামতের জন্য নিযুক্তি করেনি তারপরও সে ইমাম হয়ে গেছে। সুতরাং মুক্তাদী কিভাবে ইমাম হবে? জবাব হলো, হাদাসগ্রস্ত ইমাম কাউকে খলীফা নিযুক্ত করে প্রতিযোগিতা এড়ানোর জন্য, আর এখানে যেহেতু কোনো প্রতিযোগী নেই এ জন্য حكما নিযুক্তি বিদ্যমান আছে। আর যেহেতু حكما নিযুক্তি বিদ্যমান আছে তাই ব্যাপারটি এমন হলো– যেন হাদাসগ্রস্ত ইমামই তাকে খলীফা নিযুক্ত করেছে। এখন এই হাদাসগ্রস্ত ইমাম নিজের নামাজ অন্য জনের ইক্তিদা করে সম্পূর্ণ করবে। যেমন তিনি যদি তাকে হাকীকাতান (প্রকৃতপক্ষে) খলীফা করতেন তখন তার ইক্তিদা করে নামাজ সম্পূর্ণ করতেন। যদি হাদাসগ্রস্ত ইমামের পিছনে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বা স্ত্রীলোক ছাড়া অন্য কেউ না থাকে, তবে এ ব্যাপারে মাশায়িখে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে ইমামের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা তিনি এমন ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করেছেন, যে ইমামতের যোগ্য নয়। সুতরাং যখন বালক বা স্ত্রীলোকটি ইমামতের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল যদিও হুকমান এবং হাদাসগ্রস্ত ইমাম তার পেছনে ইকতিদাকারী হয়ে গেল। আর কায়দা আছে, যে ব্যক্তি এমন ব্যক্তির ইকতিদা করে যে ইমামতের যোগ্য নয় তখন তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, হাদাসগ্রস্ত ইমামের নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা নামাজ ফাসিদ হওয়া তো মুক্তাদীর খলীফা নিযুক্ত হওয়ার উপর موقوف যা এখানে নেই। কেননা খলীফা নিযুক্ত করা হয়তো হাকীকাতান হবে অথবা হুকমান হবে। এখানে দু'টার কোনোটিই নেই। হাকীকাতান তো এ কারণে নেই যে, হাদাসগ্রস্ত ইমামের পক্ষ থেকে তো قصدا ইচ্ছাকৃতভাবে খলীফা নিযুক্ত করা পাওয়া যায়নি। আর হুকমান এ জন্য নেই যে, বালক বা স্ত্রীলোক ইমামতের যোগ্যতা রাখে না। সুতরাং যখন তাদের উভয়ের মাঝে ইমামতের যোগ্যতা নেই তখন হুকমানও খলীফা হতে পারবে না। তাই হাকীকাতান ও হুকমান খলীফা না হওয়ার কারণে হাদাসগ্রস্ত ইমামের নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা ইমামের নামাজ ফাসিদ হওয়া মুক্তাদীর খলীফা নিযুক্ত হওয়ার উপর ভিত্তি। আল্লাহই সম্যক অবহিত।

بَابُ مَايُفْسِدُ الصَّلٰوةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا

وَمَنْ تَكَلَّمَ فِىْ صَلَاتِهٖ عَامِدًا اَوْ سَاهِيًا بَطَلَتْ صَلَاتُهٗ خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ (رحـ) فِى الْخَطَاءِ وَالنِّسْيَانِ وَمَفْزَعُهُ الْحَدِيْثُ الْمَعْرُوْفُ وَلَنَا قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ صَلَاتَنَا هٰذِهٖ لَايَصْلُحُ فِيْهَا شَيْئٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَاِنَّمَا هِىَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّهْلِيْلُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلٰى دَفْعِ الْاِثْمِ بِخِلَافِ السَّلَامِ سَاهِيًا لِاَنَّهٗ مِنَ الْاَذْكَارِ فَيُعْتَبَرُ ذِكْرًا فِى حَالَةِ النِّسْيَانِ وَكَلَامًا فِىْ حَالَةِ التَّعَمُّدِ لِمَا فِيْهِ مِنْ كَافِ الْخِطَابِ ـ

পরিচ্ছেদ : যা নামাজকে ভঙ্গ করে এবং যা নামাজকে মাকরূহ করে

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে বা ভুলে নামাজের মধ্যে কথা বলে, তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। خطا ও نسيان তথা বিচ্যুতি বা ভুলবশত কথা বলার ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর দলিল হলো সেই প্রসিদ্ধি হাদীসটি। আর আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের এ নামাজ কোনো মানুষের কথাবার্তার উপযোগী নয়। নামাজতো তাস্‌বীহ, তাহলীল ও কুরআন পাঠ করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বর্ণিত হাদীসটি গুনাহ্ রহিত হওয়ার উপর প্রযোজ্য। ভুলে সালাম করার বিষয়টি-এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা এটা জিকিরের এর মধ্যে গণ্য। সুতরাং ভুলের অবস্থায় একে জিকির ধরা হবে এবং সেচ্ছায় বললে কথা ধরা হবে। কেননা এতে সম্বোধনের ك সর্বনাম রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা ঃ পিছনের অধ্যায়ে ঐ সকল عارض তথা পরিস্থিতির আলোচনা করা হয়েছে যেগুলো নামাজের মধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে এসে যায়। আর এ অধ্যায়ে ঐ সকল عارض -এর আলোচনা হবে যেগুলো নামাজের মধ্যে নামাজির ইচ্ছায় হয়। মোদ্দাকথা, পিছনের অধ্যায়ে غير اختيارى عوارض -এর আলোচনা ছিল আর এ অধ্যায়ে اختيارى عوارض -এর আলোচনা করা হবে।

سهو বলা হয় قوة مدركه তথা উপলব্ধি শক্তি থেকে সূরত দূরীভূত হয়ে যাওয়া। نسيان বলা হয় قوة حافظه তথা স্মরণশক্তি থেকে সূরত এমনভাবে দূর হয়ে যাওয়া যাতে كسب جديد -এর মুখাপেক্ষী হতে হয়। خطا বলা হয়, সূরত তো বাকি আছে কিন্তু এক জিনিস বলার ইরাদা করা অবস্থায় বেলা ইরাদা অন্য জিনিস মুখ থেকে বের হয়ে যাওয়া। এ স্থানে سهو শব্দটি عام বা ব্যাপক যা উক্ত তিন প্রকারকেই অন্তর্ভুক্ত করে। যেহেতু سهو আর نسيان -এর মাঝে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো পার্থক্য নেই তাই গ্রন্থকারও এ দুয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য করেননি।

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি তার নামাজে ইচ্ছা করে বা ভুলে কথা বলে তবে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। كلام আক্ষরিক অর্থবোধক শব্দকে বলা হয়, তা কখনো এক অক্ষর দ্বারা যথেষ্ট হয়ে যায় যেমন قِ বাঁচো, আর যদি নিরর্থক শব্দ হয় তাকে كلام বলা হয় না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর মতে خطا ও نسيان তথা বিচ্যুতি ও ভুলবশত কথা বললে নামাজ ফাসিদ হবে না। শর্ত হলো দীর্ঘ না হওয়া। কেননা দীর্ঘ কথা বলা বিচ্যুতি ও ভুলের বিপরীত। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল, رُفِعَ عَنْ اُمَّتِى الْخَطَاُ وَالنِّسْيَانُ প্রসিদ্ধ হাদীসটি। উক্ত হাদীসের অর্থ হল, আমার উম্মত থেকে ভুল ও বিস্মৃতি রহিত করা হয়েছে।

দলিল এভাবে যে, হুকুম দু'প্রকার (১) দুনিয়াবী (دنياوى) (নামাজ বিনষ্টকারী হওয়া) (২) উখরোবী (اخروى) (গুনাহ্গার হওয়া) রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন বলেছেন, আমার উম্মত থেকে ভুল ও বিস্মৃতির দুনিয়াবী এবং উখরুবী হুকুমকে রহিত করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐ দু'টো জিনিস দ্বারা কোনো জিনিস ফাসিদও হবে না এবং আখিরাতেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গুনাহ্গার হবে না। ইনায়া গ্রন্থকার লিখেছেন, দলিল এভাবে যে, এ দুটোর حقيقت তো غير مرفوع (রহিত হয়নি)। কেননা এগুলো মানুষের মাঝে বিদ্যমান। তাই এগুলোর হুকুম অর্থাৎ নামাজ বিনষ্টকারী হওয়া রহিত (مرفوع) বলে গণ্য হবে। আমাদের দলিল, মু'আবিয়া ইবনে আল-হাকাম আস্সুলামী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস! পুরো হাদীসটি নিম্নরূপ–

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَطَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ اُمَّاهُ مَالِيْ اَرَاكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَيَّ شَزْرًا فَضَرَبُوْا بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى اَفْخَاذِهِمْ فَعَلِمْتُ اَنَّهُمْ يُسْكِتُوْنَنِيْ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ دَعَانِيْ فَوَاللّٰهِ مَارَأَيْتُ مُعَلِّمًا اَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ مَاكَهَرَنِيْ وَلَازَجَرَنِيْ وَلٰكِنْ قَالَ اِنَّ صَلٰوتَنَا هٰذِهٖ لَايَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَاِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّهْلِيْلُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ ـ

হযরত মু'আবিয়া ইবনে হাকাম (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামাজ পড়েছি, ইতিমধ্যে কেউ হাঁচি দিল, আমি বললাম يرحمك الله। লোকেরা আমাকে খুব ক্ষীপ্রদৃষ্টিতে দেখতে লাগল; আমি বললাম তার মা তাকে হারিয়ে ফেলুন! আমার কি হলো! আমি তোমাদেরকে দেখছি যে, তোমরা আমাকে অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টিতে দেখছ। তারা তাদের রানের উপর তাদের হাত মারল, আমি বুঝলাম তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে আমাকে ডাকলেন, আল্লাহর কসম! আমি তার থেকে উত্তম শিক্ষক আর কখনো দেখিনি! তিনি আমাকে ধমকালেনও না এবং ডাটলেনও না; বরং বললেন, আমাদের এ নামাজ কোনো মানুষের কথাবার্তার উপযোগী নয়। নামাজ তো তাসবীহ, তাহলীল ও কুরআন পাঠ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, নামাজে কথা না বলা নামাজের হক। যেমনিভাবে পবিত্র হওয়া নামাজের হক। সুতরাং যেমনিভাবে তাহারাত ব্যতীত নামাজ হয় না এমনিভাবে কথা বললেও নামাজ হবে না।

ইমাম শাফি'ঈ (র.) বর্ণিত হাদীসটির জবাব হলো, হাদীসটি গুনাহ রহিত হওয়ার উপর প্রযোজ্য। হাদীসটির মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে আখিরাতের হুকুম অর্থাৎ 'গুনাহ' মুরাদ। এখন যদি দুনিয়াবী হুকুম তথা মুফসিদ হওয়া মুরাদ নেওয়া হয় তবে عموم مشترك লাযিম আসে, অথচ عموم مشترك জায়েজ নেই।

بخلاف السلام – বাক্যটি দ্বারা গ্রন্থকার ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন, কিয়াসের সরাকথা হচ্ছে– সালাম কালামের অনুরূপ। কেননা উভয়টি নামাজ ভঙ্গকারী। সালামের ক্ষেত্রে ইচ্ছা ও ভুলের মাঝে তাফসীল আছে। অর্থাৎ ভুলে কাউকে সালাম করলে নামাজ নষ্ট হয় না, ইচ্ছা করে সালাম করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এ তাফসীল তো কালামের ক্ষেত্রেও হওয়া উচিত ছিল? অর্থাৎ ভুলে কথা বললে নামাজ ফাসিদ না হওয়া আর ইচ্ছা করে কথা বললে ফাসিদ হওয়া। কিন্তু এমনিট হল না কেন?

জবাবের হাসিল হলো, সালাম من كل وجه (পুরোপুরি) كلام-এর অনুরূপ নয়। কেননা সালাম নামাজে জিকিরের মধ্যে গণ্য। এমনটি আত্তাহিয়্যাতু এর মধ্যেও পড়া হয় اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ (আপনার প্রতি সালাম হে নবী) আর سلام আল্লাহর اسماء حسنى-এর একটি নাম। তবে সালামের সাথে كاف خطاف (সম্বোধনের ك সর্বনাম) যুক্ত হওয়ায় তা কালামের হুকুমে হয়ে গেছে। মোদ্দাকথা, السلام عليك - من وجه জিকির আর من وجه কালাম। তাই আমরা উভয়টির উপর আমল করেছি। আমরা বলেছি যদি ভুলে সালাম করা হয় তবে তা জিকিরের সাথে যুক্ত হবে এবং তা দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। আর যদি ইচ্ছা করে সালাম করে তবে কথার সাথে যুক্ত হবে, এবং এতে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

فَإِنْ أَنَّ فِيهَا أَوْتَأَوَّهَ أَوْ بَكَى فَارْتَفَعَ بُكَاؤُهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ لَمْ يَقْطَعْهَا لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْخُشُوعِ وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجَعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ قَطَعَهَا لِأَنَّ فِيهِ إِظْهَارُ الْجَزْعِ وَالتَّأَسُّفِ فَكَانَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ قَوْلَهُ أَهْ لَمْ يُفْسِدْ فِي حَالَيْنِ وَأُوهُ يُفْسِدُ وَقِيلَ الْأَصْلُ عِنْدَهُ أَنَّ الْكَلِمَةَ إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى حَرْفَيْنِ وَهُمَا زَائِدَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَاتَفْسُدُ وَإِنْ كَانَتَا أَصْلِيَّتَيْنِ تَفْسُدُ وَحُرُوفُ الزَّوَائِدِ جَمَعُوهَا فِي قَوْلِهِمْ اَلْيَوْمَ تَنْسَاهُ وَهٰذَا لَايَقْوٰى لِأَنَّ كَلَامَ النَّاسِ فِي مُتَفَاهَمِ الْعُرْفِ يَتْبَعُ وُجُودَ حُرُوفِ الْهِجَاءِ وَإِفْهَامَ الْمَعْنٰى وَيَتَحَقَّقُ ذٰلِكَ فِي حُرُوفٍ كُلُّهَا زَوَائِدُ ـ

অনুবাদ ঃ যদি নামাজের মধ্যে কাতরায় কিংবা উহ্ আহ্ শব্দ করে বা শব্দ করে কাঁদে, এগুলো যদি জান্নাত জাহান্নামের স্মরণের কারণে হয়ে থাকে তবে নামাজ নষ্ট হবে না। কেননা এতে অধিক খুশুখুযু প্রমাণিত হয়। আর যদি ব্যথা বা কোনো বিপদের কারণে হয়, তবে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা তাতে অস্থিরতা ও আক্ষেপ প্রকাশ পায়। সুতরাং তা মানুষের কথার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আহ্ শব্দটি উভয় অবস্থার কোনো অবস্থাতেই নামাজ নষ্ট করবে না। আর اوه শব্দটি নামাজ নষ্ট করবে। কেউ কেউ বলেছেন, আবূ ইউসূফ (র.) -এর মূল ব্যক্তব্য হলো, উচ্চারিত শব্দ যদি দুই হরফ বিশিষ্ট হয় আর উভয় হরফ কিংবা একটি যদি (আরবি ব্যাকরণ মতে) অতিরিক্ত حروف-এর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে নামাজ ফাসিদ হবে না। আর উভয়টি যদি মূল হরফের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে ফাসিদ হয়ে যাবে, আর অতিরিক্ত হরফ সমষ্টিকে ফকীহ্গণ اَلْيوم تَنْسَاهُ বাক্যে একত্রিত করেছেন। এ বক্তব্য সবল নয়। কেননা প্রচলিত অর্থে মানুষের কথা বর্ণোচ্চারণ ও অর্থ বুঝানোর অনুগামী হয়ে থাকে। আর তা এমন ধ্বনির ক্ষেত্রেও সাব্যস্ত হতে পারে, যার সব কটি বর্ণ অতিরিক্ত বর্ণসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

انين দুঃখ-বেদনায় লিপ্ত ব্যক্তির আওয়াজ যাকে উর্দুতে كراهنا এবং বাংলায় 'কাতরানো' বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, انين অর্থ আহ্ বলা আর تأوه অর্থ উহ্ বলা। ارتفاع بكاء দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমনভাবে কাঁদা যার দ্বারা শব্দধ্বনি হয়। মাসআলার সারমর্ম হলো, নামাজের মধ্যে কাতরানো, আহ্ উহ্ শব্দ করা এবং এমনভাবে কাঁদা যাতে শব্দ সৃষ্টি হয়ে যায়। এখন এগুলোর প্রত্যেকটি জান্নাত জাহান্নামের স্মরণের কারণে হবে কিংবা কোনো দুঃখ বা মসিবতের কারণে হবে। যদি প্রথমটি অর্থাৎ জান্নাত-জাহান্নামের স্মরণের কারণে হয় অথবা উহ্ বলে তবে নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা এতে অধিক খুশুখুজু রয়েছে। আর যেহেতু নামাজ দ্বারা খুশুখুযুই উদ্দেশ্য, এ জন্য অধিক খুশুখুযু দ্বারা কিভাবে নামাজ ফাসিদ হবে?

দ্বিতীয়ত এ ব্যক্তি যদি স্পষ্টভাবে اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُبِكَ مِنَ النَّارِ বলে তবে নামাজ ফাসিদ হয় না তাহলে كنايه -এর সুরতে অবশ্যই নামাজ ফাসিদ হবে না। পক্ষান্তরে যদি কোনো দুঃখ বা মুসিবতের কারণে এ শব্দগুলো বলে তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এটাই ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.) -এর মত। কেননা এতে অস্থিরতা ও আক্ষেপ প্রকাশ পায়। এ কারণে তা মানুষের কথার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং এতেও নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত এ ব্যক্তি যদি দুঃখ বা মসিবতের প্রকাশ স্পষ্টভাবে করে, যেমন বলে انى مصاب – হে খোদা! আমায় সাহায্য করো আমি মসিবতে আক্রান্ত। তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এমনিভাবে دلالة এবং كناية অস্থিরতা এবং আক্ষেপের প্রকাশ দ্বারাও নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। উভয় সুরত (উহ্-আহ্)-এর উপর নিম্নোক্ত اثر ও দলিল হতে পারে, سُئِلَتْ عَائِشَةُ (رض) عَنِ الْأَنِيْنِ فِي الصَّلٰوةِ فَقَالَتْ إِنْ كَانَ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَاتَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَلَمِ تَفْسُدُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

طُوْبٰى لِلْبَكَّائِيْنَ فِى الصَّلٰوةِ আয়েশা (রা.)-কে নামাজের মধ্যে কাতরানো আহ, উহ্ শব্দ এবং কান্নাকাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন, যদি তা আল্লাহর ভয়ের কারণে হয় তবে নামাজ ফাসিদ হবে না। আর যদি দুঃখ ও মসিবতের কারণে হয় তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নামাজের মধ্যে ক্রন্দনকারীদের জন্য খোশখবরী। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, اٰه - হামযায় ফাতাহ এবং হা'তে জযমের সাথে বলা কোনো অবস্থায়ই নামাজ ভঙ্গকারী নয়। তা জান্নাত-জাহান্নামের স্মরণে হোক বা দুঃখ মসিবতের কারণে হোক। তবে اُوْه উহ্ বলার দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মূল বক্তব্য হচ্ছে– উচ্চারিত শব্দ যদি দু' হরফ বিশিষ্ট হয় আর উভয় হরফ কিংবা এর একটি হরফ যদি আরবি ব্যাকরণ মতে অতিরিক্ত হরফ সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয় তবে নামাজ ফাসিদ হবে না। আর উভয়টি যদি মূল হরফ সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয় তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এর কারণ হলো, كلام عرب তথা আরবি ভাষার ভিত্তি হলো তিন অক্ষরের উপর। কেননা এক অক্ষরের জরুরত তো এ কারণে যে তার দ্বারা ইব্‌তিদা করা হয়। দ্বিতীয় অক্ষরের জরুরত এ কারণে যে, তার উপর ওয়াক্‌ফ করা হয়। আর তৃতীয় অক্ষরের জরুরত হলো উক্ত দুই অক্ষরের মাঝে পার্থক্য করার জন্য। সুতরাং এক অক্ষর হলো اقل جملة সর্বনিম্ন বাক্য। এর উপর কালিমা বা কালামের ইত্‌লাক হয় না। দুই অক্ষর যদি এর মধ্যে অতিরিক্ত হয় তবে আসল অক্ষরের দিকে খেয়াল করে তার ভিত্তিও এক অক্ষরের উপরই থাকবে। আর যদি দু'টি আসল অক্ষর হয়, তবে তো তিন অক্ষরের অধিক পাওয়া গেল। আর اكثر - كل -এর স্থলবর্তী হয়। সুতরাং দুই আসল অক্ষরের উপর ব্যবহৃত কালিমা (বাক্য) দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। সুতরাং এ নীতিমালা অনুযায়ী اٰه আহ্ বললে নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা এ বাক্যটি দু'টো অক্ষর (হামযা ও হা) দ্বারা গঠিত। আর উভয় (অক্ষর) অতিরিক্ত অক্ষর সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত। আর اُوْه উহ বললে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা এর মধ্যে দুয়ের অধিক শব্দ রয়েছে। দুয়ের অধিক অতিরিক্ত অক্ষরের মধ্যে তার মূল এবং অতিরিক্ত অক্ষরের মধ্য থেকে হওয়ার দিকে লক্ষ্য করা হয় না বরং দুয়ের অধিক অতিরিক্ত অক্ষর সম্বলিত বাক্য নামাজকে ফাসিদ করে দেয়। চাই সবগুলো অতিরিক্ত অক্ষরের অন্তর্ভুক্তই হোকনা কেন। বিজ্ঞ গ্রন্থকার বলেন, অতিরিক্ত অক্ষরের সমষ্টিকে ভাষাবিদগণ اَلْيَوْمَ تَنْسَاهُ বাক্যে একত্রিত করেছেন। শায়খ রবী (র.) حروف زوائد -এর উপর একটি ঘটনা নকল করেছেন। ঘটনাটি হলো, একবার এক ছাত্র তার শিক্ষককে حروف زوائد সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, শিক্ষক জবাবে বললেন سَأَلْتَ ছাত্র মনে করলো শিক্ষক পূর্বের পাঠের দিকে ইশারা করেছেন। অথচ পূর্বে আমি প্রশ্নও করিনি আর শিক্ষকও জবাব দেননি। এজন্য সাথে সাথে ছাত্র বলল مَاسَأَلْتُ قَطُّ (হযরত!) আমি তো আপনাকে কখনো প্রশ্ন করিনি? পুনরায় শিক্ষক জবাবে বললেন, اَلْيَوْمَ تَنْسَاهُ ছাত্র মনে করল (শিক্ষক মহোদয়) শব্দ বলে শুধু তার মর্ম উদ্দেশ্য নিয়েছেন। অর্থাৎ শিক্ষক আমার স্মরণশক্তিকে দুর্বল মনে করে আমাকে পরীক্ষা করে নিতে চাচ্ছেন। শিক্ষক বলেছিলেন, আমি যদি তোমাকে বলে দেই তুমি আজকেই ভুলে যাবে। এ জন্য ছাত্র সাথে সাথেই বলল وَاللّٰهِ لَا اَنْسَاهُ, শিক্ষক যখন বুঝলেন ছাত্রের জন্য ইশারা যথেষ্ট নয়, তাই তিনি সতর্ক করলেন বললেন يَا اَحْمَقُ اَجَبْتُكَ مَرَّتَيْنِ – ওহে নির্বোধ! আমি তোমাকে দু'বার জবাব দিয়েছি।

وَهٰذَا لَا يَقْوٰى দ্বারা গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) যে নীতিমালা বর্ণনা করেছেন তা শক্তিশালী নয়। কেননা كلام الناس হলো নামাজ বিনষ্টকারী। আর كلام الناس এ عرف عام দু'টো জিনিসের অনুগত। এক. حروف هجا পাওয়া যাওয়া সুতরাং নামাজির আওয়াজে যদি কোনো শব্দই না হয় তবে কারো মতেই নামাজ ফাসিদ হবে না। দুই. حروف هجا গুলো অর্থবহ হওয়া। সুতরাং অক্ষরগুলো যদি অর্থবহ না হয় তবে নামাজ ফাসিদ হবে না। এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, كلام তখনও হয় যখন তার সবগুলো অক্ষর অতিরিক্ত অক্ষরের অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন কেউ বলল, اَنْتُمُ الْيَوْمَ سَاَلْتُمُوْنِيْهَا এ বাক্যটি مبتدأ ও خبر সম্বলিত বাক্য। এতে সবগুলো حروف زوائد -এর অন্তর্ভুক্ত। এতদ্‌সত্ত্বেও এর দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। বুঝা গেল যে, مطلقا كلام নামাজ ভঙ্গকারী। চাই তা حروف زوائد সম্বলিত হোক বা حروف اصلى সম্বলিত হোক। কিন্তু নিহায়া গ্রন্থকার এর জবাবে বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বক্তব্য দুই অক্ষরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; অর্থাৎ كلام যদি দুই অতিরিক্ত অক্ষর সম্বলিত হয় তবে নামাজ ফাসিদ হবে না। আর যদি দুয়ের অধিক অক্ষর সম্বলিত হয় তবে সবগুলো অক্ষর অতিরিক্ত অক্ষরের অন্তর্ভুক্ত হলেও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত তরফাইন (র.) -এর মতের সদৃশ। অর্থাৎ নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

وَاِنْ تَنَحْنَحَ بِغَيْرِ عُذْرٍ بِاَنْ لَمْ يَكُنْ مَدْفُوعًا اِلَيْهِ وَحَصَلَ بِالْحُرُوْفِ يَنْبَغِى اَنْ يَفْسُدَ عِنْدَهُمَا وَاِنْ كَانَ بِعُذْرٍ فَهُوَ عَفْوٌ كَالْعُطَاسِ وَالْجُشَاءِ اِذَا حَصَلَ بِهٖ حُرُوْفٌ وَمَنْ عَطَسَ فَقَالَ لَهٗ اٰخَرُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهٗ لِاَنَّهٗ يَجْرِىْ فِىْ مُخَاطَبَاتِ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ كَلَامِهِمْ بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ الْعَاطِسُ اَوِ السَّامِعُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا قَالُوْا لِاَنَّهٗ لَمْ يُتَعَارَفْ جَوَابًا ـ

অনুবাদ : কেউ যদি বিনা ওজরে কাশি দেয়, অর্থাৎ অনন্যোপায় অবস্থায় নয়, আর তার ফলে হুরূফ সৃষ্টি হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) -এর মতে নামাজ ফাসিদ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আর যদি ওজরের কারণে হয় তবে তা মাফ। যেমন হাঁচি ও ঢেকুর, যদি এতে হরফ প্রকাশিত হয়। কেউ হাঁচি দিল আর অন্যজন নামাজের মধ্যেই তাকে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলে উঠল তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা এটি ব্যবহৃত হয় মানুষের পরস্পরের সম্বোধনের ক্ষেত্রে। সুতরাং উক্ত দোয়া কাজের কথার মধ্যে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে হাঁচিদাতা অথবা শ্রোতা যদি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে তবে নামাজ ফাসিদ হবে না বলে ফকীহগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেননা এটা জবাব হিসাবে প্রচলিত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো মুসল্লী গলা খাকারি দেয় আর তার কারণে অক্ষরও সৃষ্টি হয় যেমন– اَخ বা اُخ বললো, তবে এর দু'টো সুরত রয়েছে। এ শব্দ ধ্বনি ওজরের কারণে হবে অথবা বিনা ওজরে হবে। যদি বিনা ওজরে হয় অর্থাৎ অনন্যোপায় অবস্থায় হয় তবে তরফাইন (র.) -এর মতে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাওয়া উচিত। আর যদি ওজরের কারণে হয় তবে তা ক্ষমার যোগ্য। অর্থাৎ নামাজ ফাসিদ হবে না। যেমন হাঁচি ও ঢেকুর দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয় না। যদি এর দ্বারা حروف هجاء বের হয়ে যায়। وَمَنْ عَطَسَ الخ মাসআলা হলো, এক ব্যক্তির হাঁচি আসলে অন্যজন নামাজের মধ্যেই জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলল, এতে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা يَرْحَمُكَ اللّٰهُ -এর মধ্যে সম্বোধনের كاف অব্যয় রয়েছে, যা মানুষের পরস্পর সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। এ জন্য তা মানুষের কথার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর মানুষের কথা নামাজ বিনষ্টকারী। তাই এটাও নামাজ বিনষ্টকারী হবে। পক্ষান্তরে যদি হাঁচিদাতা অথবা শ্রোতা নামাজি ব্যক্তি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে, তবে মাশায়িখদের মত অনুযায়ী নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলা জবাব হিসাবে প্রচলিত নয়; বরং এটা আল্লাহর জিকির। আর আল্লাহর জিকির দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয় না। এ জন্য বলা হয়েছে যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলা দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। ইনায়া গ্রন্থকার মুহীতের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনায় এই রয়েছে যে, হাঁচিদাতা মনে মনে আলহামদুলিল্লাহ বলবে, জবান নড়াচড়া করবে না, যদি জবান নড়াচড়া করে তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

وَإِنِ اسْتَفْتَحَ فَفَتَحَ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ تَفْسُدُ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَفْتَحَ الْمُصَلِّي عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ لِأَنَّهُ تَعْلِيمٌ وَتَعَلُّمٌ فَكَانَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ثُمَّ شَرْطُ التَّكْرَارِ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلٰوةِ فَيُعْفَى الْقَلِيلُ مِنْهُ وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِأَنَّ الْكَلَامَ بِنَفْسِهِ قَاطِعٌ وَإِنْ قَلَّ ـ

অনুবাদ : আর যদি কিরাআত পাঠকারী ব্যক্তি আটকা পড়ে লোকমা চায়, আর অন্য ব্যক্তি নামাজে থেকেই তাকে লোকমা দেয় তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এর অর্থ হলো মুসল্লি নিজে ইমাম ছাড়া অন্য কাউকে লোকমা দেয়। কেননা এরূপ করা শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত, তা মানুষের কথার মধ্যে গণ্য হবে। তবে মাবসূত কিতাবে একাধিকবার করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কেননা এটা নামাজের আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই অল্প মাফ হবে। কিন্তু জামেউস্ সাগীর কিতাবে এ শর্ত আরোপ করা হয়নি। কেননা স্বয়ং মানুষের কথা অল্প হলেও তা নামাজ ভঙ্গকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

استفتاح অর্থ লোকমা চাওয়া। সাহায্য চাওয়া, আল্লাহ তা'আলার বাণী يَسْتَفْتِحُوْنَ অর্থাৎ يَسْتَنْصِرُوْنَ অর্থ– তারা সাহায্য কামনা করে। যুক্তির দিক থেকে استفتاح চার ভাগে বিভক্ত। কেননা লোকমাদাতা, আর লোকমা গ্রহণকারী উভয়ে নামাজে হবে অথবা হবে না। কিংবা লোকমা গ্রহণকারী নামাজে, আর লোকমাদাতা নামাজের বাইরে। কিংবা তার উল্টো অর্থাৎ লোকমাদাতা নামাজে হয় আর গ্রহণকারী নামাজের বাইরে। প্রথম সুরত, অর্থাৎ যদি উভয়ে নামাজ রত না হয় তবে তা আমাদের আলোচনা বহির্ভূত। দ্বিতীয় সুরত অর্থাৎ যখন উভয়ে নামাজে থাকে। এর আবার দু'টো সুরত রয়েছে। (ক) হয়তো উভয়ের নামাজ একই নামাজ হবে অর্থাৎ লোকমা গ্রহণকারী ইমাম হবে আর লোকমাদাতা মুক্তাদী হবে (খ) কিংবা উভয়ের নামাজ ভিন্ন ভিন্ন হবে। প্রথম সুরতের আলোচনা সামনে করা হবে। আর দ্বিতীয় সুরত (অর্থাৎ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন নামাজ হলে) এতে উভয়ের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা এরূপ করা শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ লোকমাদাতা শিক্ষা দিল আর লোকমা গ্রহণকারী শিক্ষা গ্রহণ করল। এ কারণে এটা মানুষের কথার মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে। আর মানুষের কথা দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। সুতরাং এগুলো দ্বারাও নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, যদি একাধিকবার লোকমা দেওয়া হয় তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি একাধিকবার না হয় তবে নামাজ ফাসিদ হবে না। দলিল হলো, লোকমা এমন একটি আমল যা নামাজের আমলের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর কায়দা আছে, নামাজ বিরোধী আমল যদি অধিক হয় তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি কম হয় নামাজ ফাসিদ হবে না। সুতরাং একবার লোকমা দেওয়া হলো عمل قليل (স্বল্প আমল) আর এর চেয়ে অধিক দেওয়া عمل كثير (অধিক আমল)। এ জন্য ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি একাধিকবার লোকমা দেওয়া হয়, তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে, অন্যথা নয়। তবে জামেউস সগীর গ্রন্থে উক্ত শর্ত নেই। কেননা লোকমা দেওয়া মানে কথা বলা। আর কথা বলা সত্তাগতভাবেই নামাজ ভঙ্গকারী, যদিও স্বল্প হয়। মোদ্দাকথা, লোকমা দেওয়াকে মাবসূতে فعل -এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর জামেউস সগীরে قول ও كلام বলা হয়েছে। আর فعل كثير দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়, فعل قليل দ্বারা নয়। আর كلام قليل দ্বারাও নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। হিদায়া গ্রন্থকার যদিও কোনোটিকে ترجيح বা প্রাধান্য দেননি; কিন্তু কোনো কোনো মাশায়িখ জামেউস সগীরের রিওয়ায়াতকে اصح বিশুদ্ধ বলেছেন।

وَإِنْ فَتَحَ عَلٰى إِمَامِهٖ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا اِسْتِحْسَانًا لِاَنَّهٗ مُضْطَرٌّ إِلٰى إِصْلَاحِ صَلٰوتِهٖ فَكَانَ هٰذَا مِنْ أَعْمَالِ صَلَاتِهٖ مَعْنًى وَيَنْوِى الْفَتْحَ عَلٰى إِمَامِهٖ دُوْنَ الْقِرَاءَةِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّهٗ مُرَخَّصٌ فِيْهِ وَقِرَاءَتُهٗ مَمْنُوْعٌ عَنْهَا ـ

অনুবাদ ঃ আর যদি নিজের ইমামের কিরাআত বলে দেয় তবে তা ইস্‌তিহ্‌সান তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে 'কথা' রূপে গণ্য হবে না। কেননা মুক্তাদী নিজের নামাজ সংশোধন করতে বাধ্য। সুতরাং এরূপ বলে দেওয়া প্রকৃতপক্ষে তার নামাজের আমল হিসাবে গণ্য হবে। অবশ্য ইমামের কিরাআত বলে দেওয়ার নিয়ত করবে। নিজে পাঠ করার নিয়ত করবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত, কেননা তাকে বলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিরাআত পাঠের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উক্ত ইবারতে প্রথম সুরত যার ওয়াদা পূর্বের পৃষ্ঠায় করা হয়েছিল তার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ লোকমা গ্রহণকারী আর লোকমা দানকারী উভয়ের নামাজ যদি একই নামাজ হয় অর্থাৎ লোকমা গ্রহণকারী ইমাম আর লোকমাদাতা মুক্তাদী হয়। তবে এটা সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে কালাম হিসাবে হবে না। দলিল হলো নিম্নোক্ত اثر ঃ

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِى الصَّلٰوةِ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ مِنْهَا كَلِمَةً ـ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ ﷺ أَلَمْ تَكُنْ فِيْكُمْ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ﷺ هَلَّا فَتَحْتَ فَقَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهَا نُسِخَتْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ نُسِخَتْ لَاَنْبَأْتُكُمْ ـ

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে সূরায়ে মু'মিনূন পড়লেন, একটি বাক্য (এতে) ছুটে গেল। যখন তিনি নামাজ থেকে ফারিগ হলেন, তখন বললেন তোমাদের মাঝে কি উবাই ইবনে কা'ব নেই? উবাই ইবনে কা'ব বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, বান্দা হাজির। তিনি বললেন, তুমি লোকমা দিলে না কেন? উবাই ইবনে কা'ব বললেন, আমি মনে করেছিলাম এ বাক্যটি হয়তো রহিত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি রহিত হতো তবে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে জানাতাম। –(ইনায়া) এ اثر দ্বারা বুঝা গেল নিজের ইমামকে লোকমা দেওয়া নামাজ ভঙ্গকারী রূপে গণ্য নয়। হযরত আলী (রা.) বলেন, إِذَا اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَاَطْعِمْهُ (ইমাম যখন তোমার কাছে লোকমা চায় তখন তুমি লোকমা দাও) –ফাত্‌হুল কাদীরে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে ইমামদেরকে লোকমা দিতাম। –(হাকিম)

আকলি দলিল হলো, মুক্তাদী নিজের নামাজ সংশোধন করতে বাধ্য। তাই এরূপ লোকমা দেওয়া প্রকৃতপক্ষে তার আমল হিসাবে গণ্য হবে। আর নামাজের কোনো আমল নামাজ বিনষ্টকারী নয়। এ জন্য লোকমা দেওয়াও নামাজ বিনষ্টকারী হবে না। মাশায়িখদের এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, মুক্তাদী নিজের ইমামের লোকমা দেওয়ার নিয়ত করবে না, কুরআনের কিরাআতের নিয়ত করবে। কেউ কেউ বলেছেন, কিরাআত ও তিলাওয়াতের নিয়ত করবে, লোকমা দেওয়ার নিয়ত করবে না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, বিশুদ্ধ মত হচ্ছে– লোকমা দেওয়ার নিয়ত করবে, কুরআন পাঠের নয়। কেননা মুক্তাদীকে লোকমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিরাআত পাঠের অনুমতি দেওয়া হয়নি। এ জন্য যার অনুমতি তাকে দেওয়া হয়েছে তা ছেড়ে দিয়ে ঐ কাজ করবে না যা নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই কুরআন পাঠের নিয়ত করবে না।

وَلَوْ كَانَ الْاِمَامُ اِنْتَقَلَ اِلٰى اٰيَةٍ اُخْرٰى تَفْسُدُ صَلٰوةُ الْفَاتِحِ وَتَفْسُدُ صَلٰوةُ الْاِمَامِ لَوْ اَخَذَ بِقَوْلِهٖ لِوُجُوْدِ التَّلْقِيْنِ وَالتَّلَقُّنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ وَيَنْبَغِىْ لِلْمُقْتَدِىْ اَنْ لَّا يُعَجِّلَ بِالْفَتْحِ وَلِلْاِمَامِ اَنْ لَّا يُلْجِئَهُمْ اِلَيْهِ بَلْ يَرْكَعُ اِذَا جَاءَ اَوَانُهٗ اَوْ يَنْتَقِلُ اِلٰى اٰيَةٍ اُخْرٰى فَلَوْ اَجَابَ فِى الصَّلٰوةِ رَجُلًا بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَهٰذَا كَلَامٌ مُفْسِدٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) لَا يَكُوْنُ مُفْسِدًا وَهٰذَا الْخِلَافُ فِيْمَا اِذَا اَرَادَ بِهٖ جَوَابَهٗ لَهٗ اَنَّهٗ ثَنَاءٌ بِصِيْغَتِهٖ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِعَزِيْمَتِهٖ وَلَهُمَا اَنَّهٗ اَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ وَهُوَ يَحْتَمِلُهٗ فَيُجْعَلُ جَوَابًا كَالتَّشْمِيْتِ وَالْاِسْتِرْجَاعِ عَلَى الْخِلَافِ فِى الصَّحِيْحِ ۔

অনুবাদ : আর যদি ইমাম অন্য আয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তবে লোকমাদাতার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এবং ইমামের নামাজও ফাসিদ হয়ে যাবে যদি সে তার লোকমা গ্রহণ করে। কেননা এখানে বিনা প্রয়োজনে পাঠদান ও পাঠগ্রহণ সংঘটিত হলো। আর মুক্তাদীর উচিত নয় লোকমা দেওয়ার ব্যাপারে জলদি করা। আবার ইমামেরও উচিত নয় মুক্তাদীদের বলে দেওয়ার জন্য (লোকমা দেওয়ার জন্য) বাধ্য করা। বরং তিনি রুকুর সময় হয়ে গেলে রুকুতে চলে যাবেন কিংবা অন্য আয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন। যদি নামাজের মধ্যে কারো উত্তরে لا اله الا الله বলে, তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে তা নামাজ ফাসিদকারী কালাম বলে গণ্য হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এটা নামাজ ফাসিদকারী হবে না। এ মতভিন্নতা তখনই, যখন এ বাক্য দ্বারা উত্তর দেওয়ার নিয়ত করবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, এ বাক্যটি আল্লাহর প্রশংসার অর্থেই গঠিত। সুতরাং তার নিয়তের কারণে তা পরিবর্তিত হবে না। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, বাক্যটি উত্তরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়েছে। আর উত্তর হওয়ার উপযোগিতা বাক্যটির রয়েছে। সুতরাং একে উত্তম রূপেই গণ্য করা হবে। যেমন– হাঁচির উত্তরে (ইয়ারহামুকাল্লাহ) আর اِنَّا لِلّٰهِ -এর বিষয়টিও বিশুদ্ধ মতে মতবিরোধপূর্ণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ইমাম কোনো আয়াতে আটকে গেল তা এখনো ছুটেনি, এমতাবস্থায় ইমাম অন্য আয়াত পড়া শুরু করে দিল। অতঃপর মুক্তাদী লোকমা দিয়ে বসল। এতে লোকমাদাতার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি ইমাম তার লোকমা গ্রহণ করে তাহলে ইমামের নামাজও ফাসিদ হয়ে যাবে। দলিল হলো, মুক্তাদীর পক্ষ থেকে পাঠদান ও ইমামের পক্ষ থেকে পাঠগ্রহণ পাওয়া গেছে, যা ছিল নিষ্প্রয়োজন। এ জন্য ইস্তিহ্সান তো নেই তবে কিয়াসের চাহিদা হলো এ কথা বলা নামাজ ভঙ্গকারী হবে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত মতটি হলো কোনো কোনো মাশায়িখের যা হিদায়া গ্রন্থকার (উল্লেখ) অবলম্বন করেছেন। আবার কোনো কোনো মাশায়িখ বলেন, ইমাম ও মুক্তাদী কারো নামাজই ফাসিদ হবে না। অর্থাৎ লোকমাদাতা ও লোকমা গ্রহণকারী কারো নামাজই ফাসিদ হবে না। কেননা পূর্বে যে আছর (اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِى الصَّلٰوةِ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ) অতিবাহিত হয়েছে তা মুতলাক। আর তার ইত্লাকের চাহিদা হলো, লোকমাদাতা এবং ইমাম কারো নামাজ কোনো অবস্থায়ই ফাসিদ হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম মুক্তাদী উভয়কে হিদায়েত করেছেন যে, মুক্তাদী লোকমা দেওয়ার ক্ষেত্রে জলদী করবে না। আর ইমাম মুক্তাদীদেরকে লোকমা দেওয়ার জন্য বাধ্য করবে না। যেমন– বারবার কোনো আয়াতকে দোহরানো, কিংবা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা এমনটি করবে না; বরং যখন مقدار مفروض অর্থাৎ ইমাম সাহেবের মতে এক আয়াত আর

সাহেবাইনের মতে তিন আয়াত পড়া হবে তবে রুকুতে চলে যাবে। আর কেউ কেউ মোস্তাহাব কিরাআতকে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ মোস্তাহাব কিরাআত পড়া হলে রুকুতে চলে যাবে। অথবা ইমাম অন্য আয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। অর্থাৎ যে আয়াতে আটকে গেছে সে আয়াত ছেড়ে দিয়ে অন্য আয়াত আরম্ভ করবে। মোদ্দাকথা তাদেরকে লোকমা দিতে বাধ্য করবে না।

فَلَوْ أَجَابَ فِي الصَّلٰوةِ الخ : যদি মুসল্লীর সামনে কেউ বলে اله مع الله । আল্লাহর সাথে কি কোনো ইলাহ আছে? এর উত্তরে মুসল্লী নামাজের মধ্যে বলে উঠল لا اله الا الله এখন তার এ কথার দু' অবস্থা হতে পারে। হয়তো এর দ্বারা সে জবাবের ইচ্ছা করেছে অথবা নিজের নামাজে থাকার কথা জানানোর ইরাদা করেছে। যদি দ্বিতীয়টি হয়, তবে তার হুকুম সামনে আলোচিত হবে। আর যদি প্রথমটি হয় তবে তরফাইন (র.)-এর মতে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে নামাজ ফাসিদ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, এ বাক্যটি মূলতঃ معنى موضوع له হিসাবে حمد باری تعالی ও ثناء باری تعالی তথা আল্লাহর প্রশংসার অর্থে গঠিত। আর যে বাক্য معنى موضوع له হিসাবে আল্লাহর প্রশংসায় গঠিত হয় তা متكلم -এর ইরাদা দ্বারা পরিবর্তন হয় না। যেমন– মুসল্লী যখন তার এ বাক্য দ্বারা নিজের নামাজে থাকার খবর দেওয়ার ইরাদা করে তবে এর দ্বারা معنى موضوع له এর পরিবর্তন হবে না। এমনিভাবে জবাব দেওয়ার ইচ্ছা করার সুরতেও معنى موضوع له পরিবর্তন হবে না। আর معنى موضوع له যেহেতু حمد ও ثناء আর حمد ও ثناء দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয় না তাই لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলা দ্বারাও নামাজ ফাসিদ হবে না।

তরফাইন (র.) -এর দলিল হচ্ছে– لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বাক্যটি এমন যা ثناء باری تعالی তথা আল্লাহর প্রশংসা এবং জবাব উভয়টির সম্ভাবনা রাখে। তাই এটা كلام مشترك – যৌথ বাক্যের সদৃশ। আর مشترك معاني -এর মধ্য থেকে 'ইরাদার' দ্বারা একটি অর্থকে নির্ধারিত করা জায়েজ। সুতরাং যখন মুসল্লী لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ দ্বারা জবাবের ইরাদা করেছে তখন তাকে জবাবই ধরা হবে। যেমন– হাঁচির জবাব অর্থাৎ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ যেহেতু জবাব, এ জন্য তা মানুষের কথার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর মানুষের কথার দ্বারা যেহেতু নামাজ ফাসিদ হয়ে যায় সেহেতু لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ দ্বারাও জবাব মুরাদ নেওয়ার সুরতে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। ইনায়া গ্রন্থকার এখানে একটি প্রশ্ন ও তার জবাব উল্লেখ করেছেন। প্রশ্নটি হলো, একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হওয়ার অনুমতি চাইলেন। অথচ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنَ । এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবের ইচ্ছা করেছেন। অথচ তাঁর নামাজ ফাসিদ হয়নি। বুঝা গেল যে, যদি কোনো আয়াত কিংবা كلمة توحيد দ্বারা জবাবের ইচ্ছা করা হয় তখনো নামাজ ফাসিদ হয় না? শামসুল আইম্মা সারাখ্‌সী (র.) এর জবাবে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পিছন থেকে তিলাওয়াত করতে করতে ইবনে মাসউদের ইজাজত চাওয়ার সময়ে উক্ত আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। সুতরাং বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত আয়াত তিলাওয়াতের ইরাদায় পড়েছেন, জবাব দেওয়ার ইচ্ছায় পড়েননি। সুতরাং এর দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপন করা জায়েজ হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যদি মুসল্লীর সামনে কেউ বলে, অমুক মরে গেছে। মুসল্লী বলল إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ তবে এর মধ্যে মাশায়িখদের মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ সুরতটিও মতবিরোধপূর্ণ। অর্থাৎ তারফাইন (র.)-এর মতে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ফাসিদ হবে না। আর কোনো কোনো মাশায়িখ বলেন, এ সুরতটি متفق عليه অর্থাৎ ইন্না লিল্লাহি -এর ক্ষেত্রে নামাজ ফাসিদ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) তরফাইন (র.) -এর সাথে একমত পোষণ করেন। তবে প্রশ্ন হলো, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর নিকট পার্থক্য কি? যে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ নামাজ ভঙ্গকারী নয় আর إِنَّا لِلّٰهِ নামাজ ভঙ্গকারী? এর জবাব হলো, استرجاع অর্থাৎ ইন্নালিল্লাহি বলা হয় মসিবত প্রকাশের জন্যে আর নামাজ তো তার জন্য প্রবর্তিত হয়নি। আর لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ তাযীম ও তাওহীদের জন্য, আর নামাজতো এর জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে। মোদ্দাকথা হলো, استرجاع নামাজ বিমুখী হওয়ার কারণে নামাজ ভঙ্গকারী আর لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ যেহেতু নামাজ বিমুখী নয় তাই নামাজ ভঙ্গকারী নয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মাসআলাটি বিশুদ্ধ মতে মতবিরোধপূর্ণ।

وَإِنْ أَرَادَ بِهِ إِعْلَامَهُ أَنَّهُ فِي الصَّلٰوةِ لَمْ تَفْسُدْ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا نَابَتْ أَحَدَكُمْ نَائِبَةٌ فِي الصَّلٰوةِ فَلْيُسَبِّحْ وَمَنْ صَلّٰى رَكْعَةً مِنَ الظُّهْرِ ثُمَّ افْتَتَحَ الْعَصْرَ أَوِ التَّطَوُّعَ فَقَدْ نَقَضَ الظُّهْرَ لِأَنَّهُ صَحَّ شُرُوعُهُ فِي غَيْرِهِ فَيَخْرُجُ عَنْهُ وَلَوِ افْتَتَحَ الظُّهْرَ بَعْدَمَا صَلّٰى مِنْهَا رَكْعَةً فَهِيَ هِيَ وَيَجْتَزِئُ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ لِأَنَّهُ نَوَى الشُّرُوعَ فِي عَيْنِ مَا هُوَ فِيهِ فَلَغَتْ نِيَّتُهُ وَبَقِيَ الْمَنْوِيُّ عَلٰى حَالِهِ ـ

অনুবাদ : যদি সে এ দ্বারা এ কথা জানানোর ইচ্ছা করে থাকে যে, সে নামাজে রয়েছে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, إِذَا نَابَتْ أَحَدَكُمْ نَائِبَةٌ فِي الصَّلٰوةِ فَلْيُسَبِّحْ (তোমাদের কেউ যদি নামাজে কোনো ঘটনার সম্মুখীন হয়, তবে সে যেন তাসবীহ পড়ে)। যে ব্যক্তি জোহরের এক রাকআত আদায় করল, তারপর আসর বা সাধারণ নফল শুরু করে দিল, তাহলে তার জোহর ভঙ্গ হয়ে গেল। কেননা অন্য নামাজ শুরু করা তার সহীহ হয়েছে। সুতরাং সে (বর্তমান নামাজ) জোহর থেকে বের হয়ে যাবে। যদি জোহরের এক রাকআত আদায়ের পর আবার জোহরই শুরু করে, তাহলে সেটা জোহরই হবে এবং ঐ রাকআতই যথেষ্ট হবে। কেননা যে নামাজে সে বিদ্যমান আছে, হুবহু সেটাকেই সে শুরু করার নিয়ত করেছে। সুতরাং তার নিয়ত বাতিল হবে এবং নিয়তকৃত নামাজ বহাল থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ إِعْلَامَهُ الخ : পূর্বের মাসআলায় দ্বিতীয় সম্ভাবনার ওয়াদা করা হয়েছিল। উক্ত ইবারতে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোনো নামাজি ব্যক্তি কালিমায়ে তাওহীদ অথবা কুরআনের কোনো আয়াত এ নিয়তে পড়েছে যে, যেন এর দ্বারা তার নামাজে থাকার কথা জানা যায়। তবে সকলের মতে এর দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। দলিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী।

إِذَا نَابَتْ أَحَدَكُمْ نَائِبَةٌ فِي الصَّلٰوةِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّ التَّسْبِيْحَاتِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقَ لِلنِّسَاءِ তোমাদের কেউ যদি নামাজে কোনো ঘটনার সম্মুখীন হয়, তবে সে যেন তাসবীহ পড়ে। কেননা তাসবীহ হলো পুরুষের জন্য আর তাসফীক হলো স্ত্রীলোকদের জন্য। তাসফীক হলো, স্ত্রীলোক তার ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের পিঠের উপর আঘাত করবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ صَلّٰى رَكْعَةً مِنَ الظُّهْرِ : গ্রন্থকার বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নামাজ যেমন, জোহরের এক রাকআত পড়ল পরে আসর কিংবা নফল নামাজের নিয়ত করল। আর এ নিয়ত মনে মনে করা হয়েছে। জবান দ্বারা নয় এবং কান পর্যন্ত হাতও উঠানো হয়নি। তাহলে এ সুরতে প্রথম নামাজ অর্থাৎ জোহরের নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। দলিল হলো, উক্ত ব্যক্তির দ্বিতীয় নামাজ শুরু করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সহীহ হয়েছে। আর দ্বিতীয় নামাজ শুরু করার জন্য প্রথম নামাজ থেকে বের হওয়া জরুরি, এ জন্য প্রথম নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَوِ افْتَتَحَ الظُّهْرَ الخ : প্রথমে জোহর আরম্ভ করে তার এক রাকআত আদায়ের পর পুনরায় দ্বিতীয়বার একই জোহরের নিয়তে তাকবীরে তাহ্রীমা বলে, জবান দ্বারা নিয়ত করা ছাড়া। তবে এই দ্বিতীয় নামাজ মূলত প্রথম নামাজই। অর্থাৎ সে প্রথম নামাজ থেকে বের হয়েছে বলে হবে না। আর যে রাকআত পড়েছে তাও গণ্য হবে। এমনকি যদি তার পরের তিন রাকআত পড়ে তবে জোহরের ফরীযা আদায় হয়ে যাবে। আর যদি তারপর চার রাকআত পড়ে এ ধারণায় যে, প্রথম রাকআত তো বাতিল হয়ে গেছে এবং তৃতীয় রাকআতের মাথায় বসেওনি। তবে শেষ বৈঠক ফউত হওয়ার কারণে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। দলিল হলো, এই মুসল্লী হুবহু ঐ নামাজেরই নিয়ত করেছে যার মধ্যে সে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান আছে, এ জন্য তার এ নিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। আর পূর্বের নিয়তকৃত নামাজ বহাল থাকবে।

وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ مِنَ الْمُصْحَفِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) وَقَالَا هِيَ تَامَّةٌ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ إِنْضَافَتْ إِلَى عِبَادَةٍ إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ بِصُنْعِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) أَنَّ حَمْلَ الْمُصْحَفِ وَالنَّظْرَ فِيهِ وَتَقْلِيبَ الْأَوْرَاقِ عَمَلٌ كَثِيرٌ وَلِأَنَّهُ تَلَقُّنٌ مِنَ الْمُصْحَفِ فَصَارَ كَمَا إِذَا تَلَقَّنَ مِنْ غَيْرِهِ وَعَلَى هٰذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَحْمُوْلِ وَالْمَوْضُوْعِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَفْتَرِقَانِ ـ

অনুবাদ : ইমাম যদি কুরআন দেখে পাঠ করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নামাজ পূর্ণ হয়ে গেছে। কেননা এখানে এক ইবাদতের সঙ্গে অন্য ইবাদত যুক্ত হয়েছে। তবে এরূপ করা মাকরূহ। কেননা এটা কিতাবীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, কুরআন শরীফ বহন করা, দেখা এবং পাতা উল্টানো, এগুলো আমলে কাছীর (বেশি মাত্রার কাজ) তা ছাড়া এটা হচ্ছে কুরআন শরীফ থেকে পাঠ গ্রহণ। সুতরাং অন্য কারো কাছ থেকে পাঠ গ্রহণের মতো এটাও নামাজ ফাসিদকারী হবে। দ্বিতীয় দলিলের আলোকে হাতে বহনকৃত এবং কোনো স্থানে রক্ষিত কুরআনের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু প্রথম দলিলের আলোকে উভয়ের মাঝে পার্থক্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি ইমাম কিংবা মুনফারিদ কুরআন মাজীদ দেখে পাঠ করে। তা কম হোক বা বেশি হোক তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে মাকরূহ হবে। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মাকরূহ ছাড়াই নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, কুরআন পাঠ একটি ইবাদত। আর কুরআন মাজীদ দেখে পড়াও ইবাদত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, أَعْطُوا أَعْيُنَكُمْ مِنَ الْعِبَادَةِ حَظَّهَا قِيلَ وَمَا حَظُّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ قَالَ النَّظْرُ فِي الْمُصْحَفِ ـ (ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমরা চোখের প্রাপ্য অংশ দান করো, আরজ করা হলো চোখের প্রাপ্য অংশ কি? তিনি বললেন, কুরআন মাজীদ দেখা) উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, কুরআন দেখে পড়া চোখের ইবাদত। সুতরাং এখানে এক ইবাদতের সাথে অন্য ইবাদত যুক্ত হয়েছে। আর শুধু এক ইবাদত নামাজ ফাসিদকারী নয়। তাই যখন দুই ইবাদত যুক্ত হবে তখনো তা নামাজ ফাসিদকারী হবে না। দ্বিতীয় দলিল, হযরত যাকওয়ান (রা.)-এর হাদীস, إِنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ عَائِشَةَ فِي رَمَضَانَ وَكَانَ يَقْرَأُ مِنَ الْمُصْحَفِ (হযরত হায়েশা (রা.)-এর আজাদকৃত গোলাম হযরত যাকওয়ান রমজান মাসে (উম্মুল মু'মিনীন হযরত) আয়েশা (রা.) -এর ইমামতি করতেন। আর তিনি কুরআন থেকে সূরা পড়তেন।

মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো, এ সুরত কিতাবীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ। কেননা কিতাবীরা জিকির আযকার মুখস্থ না হওয়ার কারণে তারা হাতে কিতাব নিয়ে দেখে দেখে পড়ে। আর আমাদেরকে কিতাবীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং যে সুরতে সাদৃশ্য হওয়া ছাড়া শরিয়তের উপর আমল করা সম্ভব, ঐ সুরতে কিতাবীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া মাকরূহ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, কুরআন মাজীদ বহন করা, দেখা এবং পাতা উল্টানো এসবগুলো আমলে কাছীর। আর আমলে কাছীর নামাজ ফাসিদকারী হয়, এ জন্য এগুলোও নামাজ ফাসিদকারী হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, কুরআন দেখে পড়া কুরআন মাজীদ থেকে পাঠ গ্রহণ করারই নামান্তর। সুতরাং এ সুরতেও নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, দ্বিতীয় দলিলের আলোকে কোনো জিনিসে রক্ষিত কুরআন মাজীদ থেকে পড়া আর হাতে বহনকৃত কুরআন মাজীদ থেকে পড়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা, পাঠ গ্রহণ উভয় সুরতেই বিদ্যমান। আর এটাই নামাজ ভঙ্গের কারণ। কিন্তু প্রথম দলিলের আলোকে উভয় মাঝে পার্থক্য হবে। কেননা কুরআন যদি কোনো স্থানে রক্ষিত থাকে, আর মুসল্লী সেখান থেকে দেখে দেখে পড় তবে এটা আমলে কাছীর নয়। আর হাতে বহন করে যদি কুরআন পড়ে তবে এটা আমলে কাছীর। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.) দ্বিতীয় দলিলকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

وَلَوْ نَظَرَ إِلَى مَكْتُوْبٍ وَفَهِمَهُ فَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِالْإِجْمَاعِ بِخِلَافِ مَا إِذَا حَلَفَ لَا يَقْرَأُ كِتَابَ فُلَانٍ حَيْثُ يَحْنِثُ بِالْفَهْمِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ هُنَاكَ الْفَهْمُ أَمَّا فَسَادُ الصَّلٰوةِ فَبِالْعَمَلِ الْكَثِيْرِ وَلَمْ يُوْجَدْ .

অনুবাদ : যদি (মুসল্লী কুরআন ব্যতীত) অন্য কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টি দেয় আর বিষয়বস্তু (মুখে না পড়ে) বুঝে ফেলে, তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে সর্বসম্মতিক্রমে তার নামাজ ফাসিদ হবে না। পক্ষান্তরে যদি কসম করে থাকে যে, অমুকের চিঠি পড়বে না, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে শুধু বুঝার দ্বারাই কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সেখানে বুঝাই হলো উদ্দেশ্য। আর নামাজ ফাসিদ হয় আমলে কাছীর দ্বারা। আর তা এখানে পাওয়া যায়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুসল্লী কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো জিনিস লিখিত দেখল এবং তার বিষয়বস্তুও বুঝে ফেলল কিন্তু মুখে উচ্চারণ করেনি। এ ব্যাপারে কোনো কোনো মাশায়িখের মতানুযায়ী ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে নামাজ ফাসিদ হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। যেমন, কোনো ব্যক্তি কসম করল অমুকের চিঠি পড়বে না। অতঃপর তার দিকে নজর করল এমনকি তার বিষয়বস্তুও বুঝে ফেলল কিন্তু মুখ দ্বারা উচ্চারণ করেনি, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, মুখ দ্বারা পড়ার মাকসাদ বা উদ্দেশ্য হলো তার মর্ম বুঝা। সুতরাং বুঝাটাও পড়ার সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ যেমনিভাবে পড়া এবং বলা দ্বারা কসম ভঙ্গকারী হয়ে যায় এমনিভাবে মর্ম বুঝার দ্বারাও কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, কিরাআত (পড়া) জবান দ্বারা হয়। কেননা কিরাআত কালামের অনুরূপ। আর কালাম জবান দ্বারা হয়। বুঝা গেল, কিরাআতও জবান দ্বারা হয়। আর মাসআলা হলো, শপথকারী জবান দ্বারা কিছু পড়েনি, বরং লিখা দেখে শুধু তার মর্ম বুঝেছে; এজন্য সে কসমভঙ্গকারী হবে না। আর যদি সে মুসল্লী হয় তবে তার নামাজ ফাসিদ হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত মাসআলায় সর্বসম্মতিক্রমে নামাজ ফাসিদ হবে না। অর্থাৎ উপরোক্ত মাসআলায় হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মুহাম্মদ (র.)ও নামাজ ফাসিদ না হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সাথে একমত। এখন মোট আলোচনা হলো, কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখিত কিছু দেখে যদি মর্ম বুঝে যায় এবং জবান দ্বারা উচ্চারণ না করে তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে নামাজ ফাসিদ হবে না এবং যদি না পড়ার কসম করে থাকে তবে কসম ভঙ্গকারীও হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) নামাজ ফাসিদ না হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সাথে। কিন্তু যদি শপথ করে যে, আমি অমুক চিঠি পড়ব না। পরে তা দেখে এবং তার মর্ম বুঝে যায় কিন্তু জবান দ্বারা উচ্চারণ না করে; তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত অনুযায়ী উভয় মাসআলার মাঝে পার্থক্য হলো, مسئلہ یمین শপথের মাসআলায় অর্থাৎ বুঝা হলো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ শপথকারীর উদ্দেশ্য হলো, অমুকের ভেদের কথা তার লেখা দ্বারা বুঝার চেষ্টা করব না। সুতরাং যখন সে তা দেখে বুঝে ফেলেছে তখন কসম ভঙ্গকারী হয়ে গেল। তা জবান দ্বারা পড়ুক বা না পড়ুক। কেননা শপথের মাকসাদ পাওয়া গিয়েছে। বাকি নামাজ ফাসিদ হওয়ার ব্যাপারে বক্তব্য হলো, নামাজ তো আমলে কাছীর দ্বারা ফাসিদ হয় আর এখানে আমলে কাছীর পাওয়া যায়নি। কেননা বুঝে নেওয়া এটা হলো আমলে খফীফ অর্থাৎ এমন আমল যা অপ্রকাশ্য বিষয়, এজন্য এ সূরতে নামাজ ফাসিদ হবে না।–(ইনায়া)

وَاِنْ مَرَّتْ اِمْرَاةٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّى لَمْ يَقْطَعِ الصَّلٰوةَ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَايَقْطَعُ الصَّلٰوةَ مُرُوْرُ شَيْئٍ اِلَّا اَنَّ الْمَارَّ اٰثِمٌ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ عَلِمَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْوِزْرِ لَوَقَفَ اَرْبَعِيْنَ وَاِنَّمَا يَأْثَمُ اِذَا مَرَّ فِىْ مَوْضِعِ سُجُوْدِهٖ عَلٰى مَا قِيْلَ وَلَا يَكُوْنُ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ يُحَاذِىْ اَعْضَاءُ الْمَارِّ اَعْضَاءَهٗ لَوْكَانَ يُصَلِّىْ عَلَى الدُّكَّانِ ـ

অনুবাদ : আর যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে কোনো স্ত্রীলোক অতিক্রম করে, তবে নামাজ ভঙ্গ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, لَايَقْطَعُ الصَّلٰوةَ مُرُوْرُ شَيْئٍ (কোনো কিছুর অতিক্রম নামাজ ভঙ্গ করে না) তবে অতিক্রমকারী গুনাহ্‌গার হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি জানতো যে, তার কত গুনাহ হবে, তাহলে সে চল্লিশ (দিন বা মাস বা বছর) পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতো। কথিত মতে, যদি সে মুসল্লীর সিজ্‌দার স্থান দিয়ে অতিক্রম করে এবং উভয়ের মাঝে কোনো আড়াল না থাকে সে ক্ষেত্রে উক্ত হুকুম হবে। তদ্রূপ দোকানে (বা অন্য কোনো উঁচু স্থানে) যদি নামাজ আদায় করে এবং অতিক্রমকারীর অঙ্গসমূহ তার অঙ্গের সোজাসুজি হয় তবে গুনাহ্‌গার হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুসল্লীর সামনে দিয়ে স্ত্রীলোকের অতিক্রম দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয় না। স্ত্রীলোকটি হায়েযা হোক বা না হোক, এমনিভাবে গাধা ও কুকুরের অতিক্রম দ্বারাও নামাজির নামাজ ফাসিদ হয় না। আসহাবে জাওয়াহির বলে, উপরোক্ত প্রাণীসমূহের অতিক্রম দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মাশহুর রিওয়ায়াত হলো, কালো রঙ্গের কুকুরের অতিক্রম দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর স্ত্রীলোক এবং গাধার ক্ষেত্রেও এমন একটি রিওয়ায়াত রয়েছে।

আসহাবে যাওয়াহিরের দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ الصَّلٰوةَ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ এ হাদীস হযরত আবূ যর (রা.) সূত্রে বর্ণিত। (ইনায়া, কিফায়া) অর্থাৎ স্ত্রীলোক, কুকুর এবং গাধা নামাজ বিচ্ছিন্নকারী। আল্লামা জালালুদ্দীন ইবনে শামসুদ্দীন আল-খাওয়ারিযিমী –(কিফায়া গ্রন্থকার) উক্ত দলিলের জবাবে বলা হয় যে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট যখন উক্ত হাদীস পৌঁছল তখন তিনি তা অস্বীকার করলেন। আর হরযত উরওয়াহ (রা.)-কে লক্ষ্য করে তিনি বললেন

يَا عُرْوَةُ مَاذَا يَقُوْلُ اَهْلُ الْعِرَاقِ قَالَ يَقُوْلُوْنَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ مُرُوْرُ الْمَرْأَةِ وَالْحِمَارِ وَالْكَلْبِ فَقَالَتْ يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ قَرَنْتُمُوْنَا بِالْكِلَابِ وَالْحُمُرِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ وَاَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اِعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ فَاِذَا سَجَدَ حَبَسْتُ رِجْلَىَّ وَاِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا ـ

হে উরওয়া! ইরাকবাসী কি বলে? উরওয়া বললেন, ইরাকবাসী বলে স্ত্রীলোক, গাধা এবং কুকুরের অতিক্রম করা দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যাবে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, ওহে আহলে ইরাক, ওয়াশশিকাক, ওয়ান্নিফাক! তোমরা আমাদেরকে কুকুর ও গাধার সাথে মিলিয়ে দিয়েছ (অথচ) রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে নামাজ পড়তেন, আর আমি তার সামনে জানাযার ন্যায় পড়ে থাকতাম। যখন তিনি সিজদায় ঝুঁকতেন আমি পাগুলো টেনে নিতাম। আবার যখন তিনি দাঁড়াতেন আমি পা গুলো ছড়িয়ে দিতাম। এ ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আবূ যর (রা.)-এর হাদীসকে কঠোরভাবে বর্জন করলেন এবং নামাজির সামনে দিয়ে স্ত্রীলোকের অতিক্রম দ্বারা নামাজ ফাসিদ হওয়াকে কঠিনভাষায় প্রত্যাখ্যান করলেন। বেশির চেয়ে বেশি এখানে এ প্রশ্ন হতে পারে যে, আমাদের বক্তব্য হলো, নামাজির সামনে অতিক্রম প্রসঙ্গে, পা ছড়ানো প্রসঙ্গে

নয়। হযরত আয়েশার বর্ণনা দ্বারা তো পা ছড়ানো সাবিত হয় নামাজীর সামনে দিয়ে অতিক্রম সাবিত হয় না? জবাব হচ্ছে হলো, নামাজীর সামনে পা ছড়ানো যখন নামাজ ভঙ্গকারী নয় তখন অতিক্রম দ্বারা তো অবশ্যই নামাজ ফাসিদ হবে না।

জমহুর ওলামায়ে কেরামের দলিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– لَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ مُرُوْرُ شَيْءٍ فَادْرَؤُوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنَّهُ الشَّيْطَانُ – কোনো কিছুর অতিক্রম নামাজ ভঙ্গ করে না, যতটুকু সম্ভব তা প্রতিহত কর কেননা সে শয়তান। তবে হ্যাঁ নামাজি ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার দ্বারা অবশ্যই সে গুনাহ্গার হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, لَوْ عَلِمَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْوِزْرِ لَوَقَفَ اَرْبَعِيْنَ – (নামাজির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি যদি জানতো যে, তার কত গুনাহ্ হবে, তাহলে সে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতো। বর্ণনাকারী বলেন, আমার জানা নেই চল্লিশ বছর, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ দিবস। কোনো কোনো আলিম বলেন, হযরত আবূ হুরায়রার বর্ণনা দ্বারা বিশুদ্ধভাবে জানা যায় যে, এর দ্বারা চল্লিশ বছর উদ্দেশ্য। وَاِنَّمَا يَأْثَمُ اِذَا مَرَّ الخ – বাক্যটি দ্বারা ঐ স্থানের বয়ান করা উদ্দেশ্য যার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করা হারাম। অর্থাৎ যে স্থানের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করা হারাম তার সীমা হলো, মুসল্লীর পা থেকে নিয়ে তার সিজদার স্থান পর্যন্ত। এটাই বিশুদ্ধ মত। এ মতকেই শামসুল আইম্মা আস্‌সারাখসী, শায়খুল ইসলাম এবং কাযী খান প্রমুখ গ্রহণ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, তার সীমা হলো, যখন মুসল্লী তার দৃষ্টি সিজ্‌দার স্থানের দিকে রেখে নামাজ পড়ে তখন অতিক্রমকারীর উপর তার দৃষ্টি পড়ে না। অর্থাৎ সীমাটি হলো সিজ্‌দার স্থান থেকেও আগ পর্যন্ত। সিজ্‌দার স্থানে দৃষ্টি রাখা অবস্থায় যতটুকু আগেও দৃষ্টি যায়। আর যেখানে দৃষ্টি যায় না সেখান দিয়ে অতিক্রম করা মাকরূহ নয়। কেউ কেউ দুই কাতার কিংবা তিন কাতার-এর পরিমাণকে সীমানা বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ তিন গজ, কেউ কেউ পাঁচ গজকে সীমা নির্ধারণ করেছেন। কেউ কেউ চল্লিশ গজকে সীমা হিসাবে ধরে নিয়েছেন। উপরোক্ত বিধানটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন নামাজি ব্যক্তি মাঠে ময়দানে নামাজ পড়ে। আর যদি মস্‌জিদে নামাজ পড়ে তবে কারো মতে পঞ্চাশ গজ ছেড়ে দিয়ে অতিক্রম করতে পারে। আবার কারো মতে নামাজি আর কিবলার মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করা সীমচীন নয়; বরং দেয়ালের পিছন দিক থেকে অতিক্রম করতে পারবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, নামাজির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা তখনই মাকরূহ যখন নামাজি এবং অতিক্রমকারীর মাঝে কোনো আড়াল না থাকে। যেমন খাম, দেয়াল, সুতরা, কিংবা কোনো মানুষের পিঠ ইত্যাদি। আর যদি কোনো আড়াল থাকে তবে অতিক্রমকারী গুনাহগার হবে না।

এরপর গ্রন্থকার বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো উঁচু স্থানে নামাজ পড়ে, তার সামনে দিয়ে পথ অতিক্রম করলে অতিক্রমকারী তখনই গুনাহ্গার হবে যখন অতিক্রমকারীর অঙ্গসমূহ নামাজি ব্যক্তির অঙ্গসমূহের সোজাসোজি হয়ে যায়। আর যদি এক মানুষ সমান উঁচু স্থানে নামাজ পড়ে তবে সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে অতিক্রমকারী ব্যক্তি গুনাহ্গার হবে না।

وَيَنْبَغِي لِمَنْ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ أَنْ يَتَّخِذَ أَمَامَهُ سُتْرَةً لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الصَّحْرَاءِ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةً وَمِقْدَارُهَا ذِرَاعٌ فَصَاعِدًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى فِي الصَّحْرَاءِ أَنْ يَكُونَ أَمَامَهُ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ وَقِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي غِلَظِ الْأُصْبَعِ لِأَنَّ مَا دُونَهُ لَا يَبْدُو لِلنَّاظِرِينَ مِنْ بَعِيدٍ فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ .

অনুবাদ : আর যে ব্যক্তি মরুভূতিতে (বা খোলা মাঠে) নামাজ আদায় করে তার জন্য উচিত নিজের সামনে একটি সুতরা স্থাপন করা। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মরুভূমিতে বা মাঠে ময়দানে নামাজ আদায় করে, তখন সে যেন নিজের সামনে সুতরা স্থাপন করে নেয়। সুতরা এর পরিমাণ হলো একগজ বা তার বেশি। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন (তোমাদের কেউ যখন মরুভূমিতে নামাজ আদায় করে তখন সে কি নিজের সামনে হাউদার পিছনের কাঠের মতো কিছু একটা স্থাপন করতে পারে না। বলা হয়েছে যে, তা আঙ্গুলের মতো মোটা হওয়া দরকার। কেননা এর চেয়ে সরু হলে দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে না। ফলে উদ্দেশ্যও হাসিল হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি ময়দান বা খোলা মাঠে নামাজ পড়ে তবে সে তার সামনে এটি সুতরা গেড়ে দিবে। আর এটা হলো মোস্তাহাব। দলিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الصَّحْرَاءِ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةً তোমাদের কেউ যখন ময়দানে নামাজ পড়ে, তখন সে যেন তার সামনে সুতরা গেড়ে রাখে। সুতরা কেমন হবে? এ সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেন, সুতরার পরিমাণ সর্বনিম্ন একগজ হওয়া উচিত। বেশি উপর যুতটুক হয় অসুবিধা নেই। দলিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِنْ صَلَّى فِي الصَّحْرَاءِ أَنْ يَكُونَ أَمَامَهُ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ (তোমাদের কেউ যখন ময়দানে নামাজ আদায় করে তখন সে কি নিজের সামনে হাউদার পিছনের কাঠের মতো কিছু একটা স্থাপন করতে পারে না!) مُؤْخِرَه শব্দটি ميم-এর ضمه আর خا-এর كسره-এর সাথে পড়া হয়। তা ঐ কাঠিকে বলা হয় যা হাউদার পিছনে উপবেশনকারীর মাথা বরাবর হয়। خاء কে تشديد দিয়ে পড়া ভুল। رحل অর্থ হাউদা। কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, সুতরা আঙ্গুলের মতো মোটা হওয়া দরকার। কেননা এর চেয়ে কম মোটা হলে দ্রষ্টার দৃষ্টিগোচর হবে না। অধিকন্তু এর দ্বারা মাকসাদও হাসিল হবে না। এ জন্য বলা হয়েছে, সর্বনিম্ন আঙ্গুলের সমান মোটা হওয়া উচিত।

وَيَقْرُبُ مِنَ السُّتْرَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا وَيَجْعَلُ السُّتْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ عَلَى الْأَيْسَرِ بِهِ وَرَدَ الْأَثَرُ وَلَا بَأْسَ بِتَرْكِ السُّتْرَةِ إِذَا أَمِنَ الْمُرُورَ وَلَمْ يُوَاجِهِ الطَّرِيقَ وَسُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِلْقَوْمِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى بِبَطْحَاءَ مَكَّةَ إِلَى عَنَزَةٍ وَلَمْ يَكُنْ لِلْقَوْمِ سُتْرَةٌ وَيُعْتَبَرُ الْغَرْزُ دُونَ الْإِلْقَاءِ وَالْخَطِّ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ بِهِ ـ

অনুবাদ : মুসল্লী সুতরা-এর কাছাকাছি দাঁড়াবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সুত্‌রা স্থাপন করে এর দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করে, সে যেন সুতরা-এর নিকটবর্তী দাঁড়ায়। সুত্‌রা ডান ভ্রূ বা বাম ভ্রূ বরাবর স্থাপন করবে। হাদীসে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। যদি অতিক্রমণের আশংকা না থাকে এবং রাস্তার সামনে রেখে না দাঁড়ায়, তবে সুতরা বাদ দেওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই। ইমামের সুতরা জামাআতের মুসল্লীদের সুতরা বলে গণ্য হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার সমতল ভূমিতে লাঠি সামনে রেখে নামাজ আদায় করেছেন। কিন্তু জামাআতের সামনে কোনো সুতরা ছিল না। (সুতরা) মাটিতে গেড়ে রাখাই গ্রহণীয়, ফেলে রাখা বা মাটিতে দাগ কাটা নয়। কেননা তা দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে বলা হয়েছে মুসল্লী সুতরার কাছাকাছি দাঁড়াবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সুতরা সামনে রেখে নামাজ আদায় করে সে যেন সুতরা-এর নিকটবর্তী দাঁড়ায়।

সুতরা মুসল্লীর ডান ভ্রূ বা বাম ভ্রূ বরাবর থাকবে। অর্থাৎ উভয় চোখের মাঝখানে রাখবে না। কেননা হাদীসে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। যেমন– ইমাম আবূ দাউদ (র.) দাবাআহ বিনতুল মিকদাদ ইবনে আল-আসওয়াদ থেকে, তিনি স্বীয় পিতা মিকদাদ ইবনে আল-আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন যে,

قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ إِلَى عُوْدٍ وَلَا عَمُوْدٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ وَلَمْ يَصْمُدْ لَهُ صَمْدًا ـ

তিনি (হযরত মিকদাদ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনো কোনো কাঠ কিংবা খুঁটি বা গাছ সামনে রেখে নামাজ পড়তে দেখেনি কিন্তু তিনি তা ডান ভ্রূ বা বাম ভ্রূ বরাবর রাখতেন। একেবারে সোজা রাখতেন না। –(ফাত্‌হুল কাদীর) ইনায়া গ্রন্থকার উক্ত হাদীস নিম্নোক্ত শব্দে নকল করেছেন ঃ

إِنَّهُ ﷺ مَا صَلَّى إِلَى شَجَرَةٍ وَلَا إِلَى عُوْدٍ وَلَا عَمُوْدٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ وَلَمْ يَصْمُدْهُ صَمْدًا أَيْ ثُمَّ لَمْ تَقْصُدْهُ قَصْدًا إِلَى الْمُوَاجَهَةِ ـ

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সুতরা বাদ দেওয়ার দ্বারা তখন কোনো অসুবিধা নেই যখন মানুষের অতিক্রমণের কোনো আশংকা না থাকে এবং সামনে কোনো রাস্তা না থাকে। উক্ত ইবারতে এ দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, সুতরা-এর علت হলো অতিক্রম। সুতরাং যেখানে কারো অতিক্রমের প্রবল ধারণা না থাকে সেখানে সুতরা বাদ দেওয়ার দ্বারা কোনো অসুবিধা নেই। যদিও নিরাপদ থাকা সত্ত্বেও সুতরা স্থাপন করা মোস্তাহাব।

قَوْلُهُ وَسُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِلْقَوْمِ الخ : বাক্যটি দ্বারা গ্রন্থকার বলেন, জামাআতে নামাজ আদায়ের সময় ইমামের সুতরা মুক্তাদীদের জন্যও যথেষ্ট। দলিল হলো ঐ হাদীস যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আবূ জুহাইফা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, আল্লামা ইবনুল হুমামের বর্ণনা মতে, হাদীসটি নিম্নরূপঃ

إِنَّهُ ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا .

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমতল ভূমিতে লোকদেরকে নিয়ে নামাজ পড়ছিলেন, তাঁর সামনে দিয়ে একটি লাঠি ছিল। স্ত্রীলোক ও গাধা লাঠির ভিতর দিয়ে অতিক্রম করছিল। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, তখন মুক্তাদীদের কোনো সুতরা ছিল না। এর দ্বারা বুঝা গেল, ইমামের সুতরা মুক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট।

قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ الْغَرْزُ الخ : এর দ্বারা মাতিন বলেন, সুতরা মাটিতে গেড়ে রাখাই গ্রহণীয়। সুতরাং জমিনে ফেলে রাখা বা মাটিতে দাগ টানা গ্রহণযোগ্য নয়। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি জমি নরম হয় এবং সুতরা তাতে সুতরা স্থাপন করা সম্ভব হয়। আর যদি ভূমি শক্ত হয়। সুতরা গাড়া সম্ভবপর না হয় তাহলে লম্বালম্বি করে সুতরা জমিনে রেখে দিবে। কারণ এতে জমিনে গাড়ার সাদৃশ্য হয়ে যাবে। আর যদি সুতরা বানানোর জন্য কোনো কাঠি বা অন্য কোনো জিনিস না পাওয়া যায় তখন জমিনের উপর দাগ কাটা গ্রহণীয় হবে কিনা এ সম্পর্কে ইনায়া গ্রন্থকারের বর্ণনা মতে তরফাইন (র.) থেকে বর্ণিত আছে, যে দাগ কাটা গ্রহণীয় নয়। আর এটা কোনো কিছুই নয়। তবে ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, একটি দীর্ঘ দাগ কাটবে। কোনো কোনো মাশায়িখে মুতায়াখ্খিরীন উক্ত মত পোষণ করেছেন। হিদায়াগ্রন্থকার তরফাইনের দলিল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সুতরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুসল্লী ও অতিক্রমকারীর মাঝে আড়াল সৃষ্টি করা। আর এ উদ্দেশ্য দাগ কাটা দ্বারা হাসিল হয় না। তাই দাগ কাটা না কাটা উভয়ই সমান।

وَيَدْرأُ الْمَارَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ أَوْ مَرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ وَيَدْرأُ بِالْإِشَارَةِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ بِوَلَدَيْ أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ يَدْفَعُ بِالتَّسْبِيْحِ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَيُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ بِأَحَدِهِمَا كِفَايَةً .

অনুবাদ ঃ যদি মুসল্লীর সামনে সুতরা না থাকে অথবা তার এবং সুতরাহ্‌র মাঝখান দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে চায়, তবে অতিক্রমকারীকে বাধা দিবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, فَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ (যতটা পারো বাধা দাও) আর ইশারার মাধ্যমে বাধা দিবে। উম্মে সালামা (রা.) -এর দুই সন্তান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনই করেছেন। কিংবা তাসবীহ পড়ে রোধ করবে। দলিল হলো ঐ হাদীস, যা ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। (ইশারা ও তাসবীহ) উভয়টি একত্রে করা মাকরূহ হবে। কেননা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য একটিই যথেষ্ট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি মুসল্লীর সামনে সুতরা না থাকে, কিংবা সুতরা থাকে কিন্তু সুতরাও মুসল্লীর মাঝ দিয়ে কারো অতিক্রমের সম্ভাবনা থাকে তবে মুসল্লী ঐ অতিক্রমকারীকে রোধ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, فَادْرَؤُوا مَااسْتَطَعْتُمْ (যতটা পারো বাধা দাও) মুসল্লী অতিক্রমকারী ব্যক্তিকে কিভাবে বাধা দিবে? এ ব্যাপারে গ্রন্থকার বলেন, ইশারা দ্বারা বাধা দিবে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে সালামার দু'সন্তানকে বাধা দিয়েছিলেন। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা কিফায়া ও ইনায়া গ্রন্থকার এভাবে উল্লেখ করেছেন–

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَامَ وَلَدُهَا عُمَرُ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ قِفْ فَوَقَفَ ثُمَّ قَامَتْ بِنْتُهَا زَيْنَبُ لِتَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيْهَا أَنْ قِفِي فَأَبَتْ فَمَرَّتْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ نَاقِصَاتُ الْعَقْلِ نَاقِصَاتُ الدِّيْنِ صَوَاحِبُ يُوسُفَ صَوَاحِبُ كُرْسُفَ يَغْلِبْنَ الْكِرَامَ وَيَغْلِبُهُنَّ اللِّئَامُ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে সালামার ঘরে নামাজ পড়ছিলেন ইত্যবসরে উম্মে সালামার ছেলে এসে দাঁড়াল (এ নিয়তে) যে, রাসূলুল্লাহ সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতের ইশারায় তাকে বাধা দিলেন, থামো। সে থেমে গেল। পরে যায়নাব বিনতে উম্মে সালামা এসে দাড়াল। (এ নিয়তে) যে রাসূলুল্লাহর ﷺ সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতের ইশারায় তাকে বাধা দিলেন থামো, কিন্তু সে থামেনি, বাধা ডিঙিয়ে অতিক্রম করে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ শেষ করে বললেন, এরা نَاقِصَاتُ الْعَقْلِ কম জ্ঞান সম্পন্ন, نَاقِصَاتُ الدِّيْنِ স্বল্প দীনদারী, صَوَاحِبُ يُوسُفَ ইউসুফের সখী صَوَاحِبُ كُرْسُفَ নেকড়াধারী। এরা ভালো লোকদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, খারাপ লোক তাদের উপর চড়ে বসে। মোদ্দাকথা এ হাদীস দ্বারা ইশারার মাধ্যমে রোধ করা সাবিত হলো।

অথবা তাকে তাসবীহ পড়ে বারণ করবে। দলিল পূর্বে আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বাণী– إِذَا نَابَتْ أَحَدَكُمْ نَائِبَةٌ فِي الصَّلٰوةِ فَلْيُسَبِّحْ (তোমাদের কেউ যদি নামাজে কোনো ঘটনার সম্মুখীন হয়, তবে সে যেন তাসবীহ্‌ পড়ে) এটা তো পুরুষদের ক্ষেত্রে। আর স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে হলো তাসফীক। অর্থাৎ ডান হাতের আঙ্গুলের পিঠ দিয়ে বাম হাতের তালুর উপরে আঘাত করবে। তবে ইশারা ও তাসবীহ উভয়টি একত্রে করা মাকরূহ হবে। কেননা উদ্দেশ্য হাসিলের ক্ষেত্রে উভয়টির একটিই যথেষ্ট।

فَصْلٌ وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّيْ اَنْ يَّعْبَثَ بِثَوْبِهٖ اَوْ بِجَسَدِهٖ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَرِهَ لَكُمْ ثَلٰثًا وَ ذَكَرَ مِنْهَا الْعَبَثَ فِى الصَّلٰوةِ وَلِاَنَّ الْعَبَثَ خَارِجَ الصَّلٰوةِ حَرَامٌ فَمَا ظَنُّكَ فِى الصَّلٰوةِ وَلَا يُقَلِّبُ الْحَصَا لِاَنَّهٗ نَوْعُ عَبَثٍ اِلَّا اَنْ لَا يُمْكِنَهُ مِنَ السُّجُوْدِ فَيُسَوِّيْهِ مَرَّةً لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّةً يَا اَبَاذَرٍّ وَاِلَّا فَذَرْ وَلِاَنَّ فِيْهِ اِصْلَاحَ صَلَاتِهٖ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ নামাজের মাকরূহ

অনুবাদ : মুসল্লীর জন্য নিজের কাপড় দিয়ে বা শরীর (-এর কোনো অঙ্গ) নিয়ে (নামাজরত অবস্থায়) খেলা করা মাকরূহ। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহু তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস মাকরূহ করেছেন, তন্মধ্যে তিনি নামাজরত অবস্থায় ক্রীড়া করার কথাও উল্লেখ করেছেন। নামাজের বাইরেও ক্রীড়া-কৌতুক হারাম। সুতরাং নামাজের ভিতরে (তা হারাম হওয়া সম্পর্কে) তোমার কি ধারণা? আর পাথর-কণা সরাবে না। কেননা এও এক ধরনের ক্রীড়া, অবশ্য যদি সিজ্‌দা দেওয়া সম্ভব না হয় তবে একবার মাত্র সরতে পারবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আবূ যার! কেবল একবার (পরিষ্কার করতে পারো) অন্যথায় ছেড়ে দাও। তা ছাড়া যেহেতু তাতে তার নামাজের সংশোধন রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরে নামাজ ফাসিদ ও বিনষ্টকারী বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। আর এ পরিচ্ছেদে নামাজের মাকরূহসমূহের আলোচনা করা হচ্ছে। ইমাম বদরুদ্দীন (র.)-এর কাউল অনুযায়ী عبث বলা হয় এমন কাজকে যার মধ্যে উদ্দেশ্য রয়েছে তবে তা শরয়ী নয়। আর سفه বলা হয়, এমন কাজকে যার মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য নেই। মাসআলা, নামাজি ব্যক্তির নিজের কাপড় বা শরীর নিয়ে খেলা করা মাকরূহ। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস মাকরূহ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো নামাজরত অবস্থায় খেলা করা। অপর দু'টির একটি হলো রোজা অবস্থায় খারাপ কথা বলা। আর দ্বিতীয়টি হলো কবরস্থানে গিয়ে অট্টহাসি দেওয়া। দ্বিতীয় দলিল হলো– فعل عبث অহেতুক কর্ম, নামাজের বাইরেও হারাম। সুতরাং নামাজের ক্ষেত্রে তোমার কি খেয়াল? অর্থাৎ নামাজের তো তা মধ্যে অবশ্যই হারাম।

وَلَا يُقَلِّبُ الْحَصَا الخ গ্রন্থকার বলেন, নামাজরত অবস্থায় পাথর-কণা সরাবে না। কেননা এটাও এক ধরনের অহেতুক কাজ। হ্যাঁ যদি সিজদা করা অসম্ভব হয় তবে একবার মাত্র সরাতে পারবে। অর্থাৎ একবার সিজদার স্থানকে পরিষ্কার করতে পারবে। غير ظاهر الرواية -এর মধ্যে দু'বার সরানোরও বর্ণনা রয়েছে। দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী مرة يا باذر والا فذر হে আবূ যার! কেবলমাত্র একবার। অন্যথায় ছেড়ে দাও। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সিজ্‌দার স্থান থেকে মাত্র একবার পাথর-কণা সরানোর অনুমতি রয়েছে। আর যদি একবারও না সরায় তবে এটা অতি উত্তম।

হিদায়ার ব্যাখ্যাতা আল্লামা ইব্‌নুল হুমাম লিখেছেন, উপরোক্ত الفاظ -এ হাদীসটি غريب। আব্দুর রায্‌যাক হযরত আবূ যার থেকে উক্ত হাদীস এভাবে নকল করেছেন যে, سَئَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى سَأَلْتُهٗ عَنْ مَسْحِ الْحَصٰى فَقَالَ وَاحِدَةً اَوْ دَعْ আবূ যার (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রত্যেক ব্যাপারে প্রশ্ন করেছি এমনকি পাথর-কণা সরানোর ব্যাপারেও। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, একবার, অন্যথায় বাদ দাও। হযরত মু'আইকীব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, اِنَّهٗ ﷺ قَالَ لَا تَمْسَحِ الْحَصٰى وَاَنْتَ تُصَلِّىْ فَاِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلَهٗ فَوَاحِدَةً - রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পাথর কণা সরাবে না। তবে যদি জরুরত হয়েই পড়ে তবে একবার সরাবে।

আকলী দলিল হলো– পাথর–কণা সরানোর দ্বারা নিজের নামাজ সংশোধন হয়। আর যে আমল দ্বারা নামাজের সংশোধন করা উদ্দেশ্য হয় তা করাতে কোনো অসুবিধা নেই।

وَلَا يُفَرْقِعُ اَصَابِعَهُ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاتُفَرْقِعْ اَصَابِعَكَ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ وَلَايَتَخَصَّرُ وَهُوَ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنِ الْاِخْتِصَارِ فِى الصَّلٰوةِ وَلِاَنَّ فِيْهِ تَرْكَ الْوَضْعِ الْمَسْنُوْنِ وَلَا يَلْتَفِتُ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ عَلِمَ الْمُصَلِّىْ مَنْ يُنَاجِىْ مَا الْتَفَتَ وَلَوْ نَظَرَ بِمُؤْخِرِ عَيْنَيْهِ يُمْنَةً وَيُسْرَةً مِنْ غَيْرِ اَنْ يَلْوِىَ عُنُقَهُ لَا يُكْرَهُ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُلَاحِظُ اَصْحَابَهُ فِىْ صَلَاتِهٖ بِمُوْقِ عَيْنَيْهِ وَلَا يُقْعِىْ وَلَايَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ لِقَوْلِ اَبِىْ ذَرٍّ نَهَانِىْ خَلِيْلِىْ عَنْ ثَلٰثٍ اَنْ اَنْقُرَ نَقْرَ الدِّيْكِ وَاَنْ اُقْعِىَ اِقْعَاءَ الْكَلْبِ وَ اَنْ اَفْتَرِشَ اِفْتِرَاشَ الثَّعْلَبِ وَالْاِقْعَاءُ اَنْ يَّضَعَ اِلْيَتَيْهِ عَلَى الْاَرْضِ وَيَنْصِبَ رُكْبَتَيْهِ نَصْبًا هُوَ الصَّحِيْحُ وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهٖ لِاَنَّهُ كَلَامٌ وَلَا بِيَدِهٖ لِاَنَّهُ سَلَامٌ مَعْنًى حَتّٰى لَوْ صَافَحَ بِنِيَّةِ التَّسْلِيْمِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَلَايَتَرَبَّعُ اِلَّا مِنْ عُذْرٍ لِاَنَّ فِيْهِ تَرْكَ سُنَّةِ الْقُعُوْدِ وَلَايَعْقِصُ شَعْرَهُ وَهُوَ اَنْ يَّجْمَعَ شَعْرَهُ عَلٰى هَامَتِهٖ وَيَشُدَّهُ بِخَيْطٍ اَوْ بِصَمْغٍ لِيَتَلَبَّدَ فَقَدْ رُوِىَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى اَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ وَهُوَ مَعْقُوْصٌ .

অনুবাদ : আর আঙ্গুল মটকাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নামাজরত অবস্থায় তুমি তোমার আঙ্গুল মটকিয়ো না। আর কোমরে হাত রাখবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করেছেন। এতে সুন্নতসম্মত অবস্থা তরক করা হয়। আর অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসল্লী যদি জানতো যে, কার সঙ্গে কথোপকথন করছে, তাহলে সে অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করতো না। যদি মুসল্লী ঘাড় বাঁকা না করে চোখের কোণ দিয়ে ডানে– বামে তাকায়, তবে তা মাকরূহ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে থেকে চোখের কোণ দিয়ে তাঁর সাহাবীদের দিকে তাকাতেন। আর হাঁটু তুলে বসবে না এবং (সিজদার সময়) ডানা ভূমিতে বিছিয়ে রাখবে না। কেননা আবূ যর (রা.) বলেছেন, আমার হাবীব আমাকে তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, মোরগের মতো ঠোকর দেওয়া, কুকুরের মতো বসা এবং শৃগালের মতো ডানা বিছিয়ে দেওয়া। হযরত আবূ যর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত اقعاء -এর অর্থ উভয় নিতম্ব মাটিতে রেখে উভয় হাঁটু খাড়া করে রাখা। এটাই বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা। আর মুখে সালামের জবাব দিবে না। কেননা তা কথা বলার অনুরূপ এবং হাতেও না। কেননা এটাও পরোক্ষভাবে সালাম। এমনকি কেউ যদি সালামের নিয়তে মুসাফাহা করে, তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কোনো ওজর ছাড়া আসন করে বসবে না। কেননা তাতে বসার সুন্নত তরক হয়। আর চুল ঝুঁটি করবে না। ঝুঁটি করা মানে চুলগুলো মাথার উপরে একত্র করে সুতা দিয়ে কিংবা রাবার দিয়ে বাঁধা, যাতে চুল স্থির থাকে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ চুল ঝুঁটি করা অবস্থায় নামাজ আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামাজের মধ্যে আঙ্গুল মটকানোও মাকরূহ। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে বলেছিলেন, إِنِّيْ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِيْ لَاتَفَرْقَعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ تُصَلِّيْ আমি তোমার জন্য তা পছন্দ করি যা আমার জন্য পছন্দ করি। তুমি নামাজরত অবস্থায় নিজের আঙ্গুল মটকাবে না। কারো কারো মতে আঙ্গুল মটাকানো নামাজের বাইরেও মাকরূহ। মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো, এ কাজটি লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কাজ ছিল। নামাজরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখাও মাকরূহ। কেননা নামাজরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখতে রাসূলুল্লাহ নিষেধ করেছেন। যেমন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত ঃ إِنَّهُ ﷺ نَهٰى عَنْ إِخْتِصَارٍ فِى الصَّلٰوةِ রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করেছেন। আকলী দলিল হলো, কোমরে হাত রাখার সুরতে সুন্নত তরীকাকে তরক করা লাযিম আসে। নামাজের বাইরে পুরুষ মহিলা সকলের জন্য কোমরে হাত রাখা মাকরূহে তানযীহী।

تخصر-এর এক ব্যাখ্যা তো হিদায়া গ্রন্থকার উপরে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ কোমরে হাত রাখা। এ ব্যাখ্যাটিই উত্তম। কেউ কেউ বলেছেন, تخصر হলো লাঠির উপর ভর দেওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, تخصر হলো সিজ্দার আয়াতকে বাদ দিয়ে অন্য আয়াত তিলাওয়াত করা।

قَوْلُهُ وَلَايَلْتَفِتُ الخ : অর্থাৎ ঘাড় বাঁকা করে অন্য দিকে তাকাবে না। কেননা এর মধ্যে কারাহাত রয়েছে। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি মুসল্লী জানতো যে, কার সাথে কথোপকথন করছে তবে সে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করতো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যত্র ইরশাদ করেন, إِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُ الْعَبْدَ مَادَامَ فِىْ صَلَاتِهٖ فَإِذَا الْتَفَتَ أَعْرَضَ عَنْهُ. বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অনবরত আল্লাহর রহমত বান্দার দিকে متوجه থাকে। যখন বান্দা অন্য দিকে তাকায় তখন আল্লাহ তা'আলা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

আকলী দলিল হলো– ঘাড় মুড়িয়ে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করার দ্বারা শরীরের কোনো অঙ্গ কিব্লা থেকে ফিরে যেতে পারে। যদি পুরো শরীর কিব্লামুখী হওয়া থেকে ফিরে যায় তবে তো তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এজন্য যদি শরীরের কিছু অংশ কিব্লা থেকে সরে যায় তবে নামাজ মাকরূহ হবে। যেমন নামাজের ভিতর عمل قليل মাকরূহ। কেননা عمل كثير হলো নামাজ ভঙ্গকারী। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ إِلْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِى الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ إِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ.

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পুরুষের নামাজে অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, এটা হলো শয়তানের ধোঁকা। যার দ্বারা সে বান্দার নামাজে ধোঁকা দেয়। –(বুখারী) মোদ্দাকথা, উপরোক্ত রিওয়ায়াত ও আকলী দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, অন্যদিকে তাকানো নামাজ ফাসিদকারী নয়। যদিও ডানে বামে তাকানো অবস্থায় চেহারা কিবলার দিক থেকে সরে যায়। তবে শর্ত হলো কিবলার দিকে পিঠ না দেওয়া। যদি মুসল্লী ঘাড় বাঁকা করা ব্যতীত ডানে বায়ে চোখের কোণ দিয়ে তাকায় তবে তা মাকরূহ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে থেকে চোখের কোণ দিয়ে তাঁর সাহাবীদের দিকে তাকাতেন, তবে আকাশের দিকে তাকানো মাকরূহ।

قَوْلُهُ وَلَا يُقْعِىْ وَلَايَفْتَرِشُ الخ : কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, হাঁটু গেড়ে বসা এবং সিজ্দা অবস্থায় উভয় হাত ভূমিতে বিছিয়ে রাখা মাকরূহ। হিদায়া গ্রন্থকার দলিল দিতে গিয়ে হযরত আবূ যর (রা.)-এর কাওল পেশ করেছেন। কিন্তু হিদায়া ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন ইমাম আহমদ (র.) তার مسند-এ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর কাওল বর্ণনা করেছেন। মুরাদ হলো, হযরত আবূ যর (রা.)-এর মতটি غريب। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রিওয়ায়াতের متن হলো নিম্নরূপ ঃ

نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيْكِ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ.

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। **এক.** মোরগের ন্যায় ঠোকর মারা থেকে অর্থাৎ সিজদা এমনভাবে করা যেমন মোরগ ঠোকর মারে। **দুই.** কুকুরের মতো বসা থেকে অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু এবং উভয় সিজদার মাঝে কুকুরের মতো বসা থেকে নিষেধ করেছেন। **তিন.** শৃগালের মতো এদিক সেদিক

তাকানো থেকে নিষেধ করেছেন। আর আবূ যরের হাদীস যা হিদায়া গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে তৃতীয়টি ছিল হলো- إِنْ اِفْتَرَشَ اِفْتِرَاشَ الثَّعْلَبِ - অর্থাৎ শৃগালের মতো (অর্থাৎ সিজদার সময়) হাত বিছানো থেকে নিষেধ করেছেন।

اِقْعَاءٌ-এর দু'টো তাফসীর রয়েছে, একটি ইমাম তাহাবী (র.) থেকে দ্বিতীয়টি ইমাম কারখী (র.) থেকে। ইমাম তাহাবী (র.) -এর মতে اقعاء হলো, নিজের নিতম্বের উপর বসা। উভয় রান দাঁড় করে রাখা। উভয় হাঁটু সিনার সাথে মিলিয়ে রাখা। আর উভয় হাত ভূমিতে রাখা। এটাই বিশুদ্ধ তাফসীর। হিদায়া গ্রন্থকারও এটাই গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম কারখী (র.)-এর মতে اقعاء হলো, নিজের উভয় পা দাঁড় করিয়ে রাখা। নিতম্বের উপর বসা এবং উভয় হাত ভূমিতে রাখা।

قَوْلُهُ وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ الخ : গ্রন্থকার বলেন, নামাজীর মুখে সালামের জবাব দিলে নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। কেননা এটা কথা বলারই নামান্তর। আর কথা বলা দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। সুতরাং সালামের জবাব দিলেও নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। সালাম ও সালামের জবাব 'কথা বলা' হওয়ার দলিল হলো, যদি কেউ শপথ করে যে, আমি অমুকের সাথে কথা বলব না, অতঃপর তাকে সালাম দিল, এতে সে ব্যক্তি শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। হাত দ্বারা সালামের জবাব দেওয়া মাকরূহ। কেননা এটাও পরোক্ষভাবে সালাম। সুতরাং সালামের নিয়তে কেউ যদি মুসাফাহা করে তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

এখানে একটি এমর্মে প্রশ্ন হয় যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি হযরত বেলালকে (রা.)-কে বলেছিলাম,

كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِ حِيْنَ كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ كَانَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ -

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে রত থাকতেন এবং লোকেরা তাঁকে সালাম করতো, তখন তিনি কিভাবে সালামের জবাব দিতেন? বেলাল (রা.) বলেন, হাত দ্বারা ইশারা করতেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, হাত দ্বারা জবাব দেওয়া মাকরূহ নয়? জবাব হলো, উপরোক্ত ঘটনা مَاقَبْلَ التَّحْرِيْمِ -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ জন্য তাকে 'কারাহাত না'-এর দলিল দেওয়া ঠিক হবে না।

قَوْلُهُ وَلَا يَتَرَبَّعُ اِلَّا مِنْ عُذْرٍ الخ : নামাজের মধ্যে ওজর ব্যতীত আসন করে বসা মাকরূহ। কারণ এ ধরনের বসার দ্বারা বসার সুন্নত তরক হয়। কেউ কেউ বলেছেন, মাকরূহ হওয়ার ইল্লত হলো, এ ধরনের বসা-অহঙ্কারীদের বসা। এ ইল্লতের ভিত্তিতে নামাজের বাহিরেও এভাবে বসা মাকরূহ। কিন্তু শামসুল আইম্মা সারাখ্সীসহ অনেকে উপরোক্ত মতকে রদ করেছেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের বাইরে সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে আসন করে বসতেন।-(ফাতহুল কাদীর) এমনিভাবে মসজিদে নব্বীতেও হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর আম বৈঠক আসন করে ছিল। আসল কথা হলো, আসন করে বসার তুলনায় উভয় হাঁটুর উপর বসা তাওয়াযু'-এর অধিক কাছাকাছি। এ জন্য নামাজের মধ্যেও এ ধরনের বসা (হাঁটুর উপর বসা) উত্তম হবে। তবে যদি কোনো ওজর থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। নামাজের মধ্যে মাথার চুল ঝুটি করে বাঁধাও মাকরূহ।

কিফায়া গ্রন্থকার চুলকে ঝুটি করার তিনটি সুরত উল্লেখ করেছেন। এক. মাথার আশ-পাশে চুলের খোপা বানিয়ে বাধা যেমন স্ত্রীলোকেরা বাঁধে। দুই. কপালের উপর একত্রিত করে রশি দ্বারা বাঁধা। তিন. আঠা জাতীয় কোনো জিনিস দ্বারা মোড়ানো। (ঝুটি নিষেধের উপর) দলিল হলো, আবূ রাফে (রা.)-এর হাদীস-

قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ وَ رَأْسُهُ مَعْقُوْصٌ -

রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদেরকে চুলের ঝুটি করা অবস্থায় নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةٍ وَاَنْ لَا اَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا -

আমাকে সাত অঙ্গের উপর সিজ্দা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং চুল ঝুটি করা ও কাপড় গুটাতে নিষেধ করেছেন। হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে,

اِنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ سَاجِدٍ عَاقِصٍ شَعْرَهُ فَحَلَّهُ حَلًّا عَنِيْفًا وَقَالَ اِذَا طَوَّلَ اَحَدُكُمْ شَعْرَهُ فَلْيُرْسِلْهُ لِيَسْجُدَ مَعَهُ -

হযরত ওমর (রা.) এক লোকের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তখন সে সিজ্দারত ছিল, তার চুল ঝুটি করা অবস্থায় ছিল। হযরত ওমর (রা.) তা অত্যন্ত কঠোরভাবে খুললেন। আর বললেন, তোমাদের মধ্যে যখন কারো চুল লম্বা হয়ে যায় তখন সে তা ছেড়ে রাখবে। যাতে তার সাথে ঐ চুলও সিজ্দা করতে পারে।

وَلَايَكُفُّ ثَوْبَهُ لِاَنَّهُ نَوْعُ تَجَبُّرٍ وَلَايَسْدُلُ ثَوْبَهُ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنِ السَّدْلِ وَهُوَ اَنْ يَّجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلٰى رَأْسِهٖ وَكَتِفَيْهِ ثُمَّ يُرْسِلُ اَطْرَافَهُ مِنْ جَوَانِبِهٖ وَلَايَأْكُلُ وَلَايَشْرَبُ لِاَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَعْمَالِ الصَّلٰوةِ فَاِنْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ عَامِدًا اَوْ نَاسِيًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِاَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيْرٌ وَحَالَةُ الصَّلٰوةِ مُذَكِّرَةٌ ـ

অনুবাদ : নামাজে নিজের কাপড় আটকিয়ে ও গুটিয়ে রাখবে না। কেননা এতে এক ধরনের অহঙ্কার রয়েছে। আর কাপড় ঝুলিয়ে দেবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ কাপড় ঝুলিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন, سدل অর্থ মাথায় ও কাঁধে কাপড় রেখে প্রান্তগুলো দু'দিক দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া। আর পানাহার করবে না। কেননা এটা নামাজভুক্ত কাজ নয়। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলে পানাহার করে তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা এটা আমলে কাছীর (বা অতিমাত্রার কাজ) আর নামাজের অবস্থা হলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া (সুতরাং নামাজ অবস্থায় ভুলে পানাহার রোজা অবস্থায় ভুলে পানাহারের মতো হবে না)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كف ثوب হলো, সিজদা করার সময় আগ-পিছের কাপড় গুটানো। এখন মূল মাসআলা হলো, কাপড় যদি জমিনে পড়ে তবে তা বাধা দান না করা। কেননা এর মধ্যে এক ধরনের অহঙ্কার প্রকাশ পায়। কাপড় অযথা ঝুলিয়েও রাখবে না। দলিল হলো, ইমাম আবূ দাউদ (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, اِنَّهُ ﷺ نَهٰى فِيْهِ عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلٰوةِ وَاَنْ يُّغَطِّىَ الرَّجُلُ فَاهُ – রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে সদল করতে নিষেধ করেছেন এবং পুরুষদেরকে মুখ ঢাকতে নিষেধ করেছেন। سدل হলো, মাথায় ও কাঁধে কাপড় রেখে প্রান্তগুলো দু'দিক দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া।

কিফায়া গ্রন্থকার বলেন, سدل হলো– চাদর কিংবা কাবা কাঁধের উপর রাখা এবং হাতগুলো আস্তীনের ভিতর না রাখা। তা জামার উপরে হোক বা নিচে হোক।

নামাজের মধ্যে পানাহার করবে না। কেননা এগুলো নামাজের অন্তর্ভুক্ত কাজ নয়। তবে দাঁতে যদি কোনো জিনিস লাগা থাকে এবং তা গিলে ফেলে তবে তার নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা যে সকল জিনিস দাঁতের ভিতর থাকে সেগুলো থুথু তুল্য। থুথু খেলে নামাজ ভঙ্গ হয় না, তাই এগুলোর দ্বারাও নামাজ ভঙ্গ হবে না।

قَوْلُهُ فَاِنْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ الخ : অর্থাৎ নামাজের হালাতে পানাহার করা নামাজ ফাসিদকারী।' চাই নামাজ ফরজ হোক বা নফল হোক। খানা-পিনা সেচ্ছায়, অনিচ্ছায় বা ভুলবশত হোক। দলিল, খানা-পিনা প্রত্যেকটি আমলে কাছীর। আর আমলে কাছীর দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়। এ জন্য এগুলো দ্বারাও নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَحَالَةُ الصَّلٰوةِ مُذَكِّرَةٌ : দ্বারা গ্রন্থকার একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, প্রশ্নটি হলো, নামাজের মধ্যে ভুলে খানা-পিনা এমনভাবে মাফ হওয়া উচিত যেমনটি রোজার হালাতে মাফ করা হয়? জবাব হলো, নামাজের অবস্থা রোজার মতো নয়। কেননা নামাজের অবস্থা হলো স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অবস্থা, তাই নামাজের অবস্থায় খানা-পিনা ভুলবশত হতে পারে না। পক্ষান্তরে রোজা তা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অবস্থা নয়। এ জন্য রোজার অবস্থায় ভুলবশত পানাহারকে ক্ষমার যোগ্য ধরা হয়েছে।

وَلَابَأْسَ بِاَنْ يَكُوْنَ مَقَامَ الْاِمَامِ فِى الْمَسْجِدِ وَسُجُوْدُهُ فِى الطَّاقِ وَيُكْرَهُ اَنْ يَقُوْمَ فِى الطَّاقِ لِاَنَّهُ يُشْبِهُ صَنِيْعَ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ حَيْثُ تَخْصِيْصِ الْاِمَامِ بِالْمَكَانِ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ سُجُوْدُهُ فِى الطَّاقِ وَيُكْرَهُ اَنْ يَكُوْنَ الْاِمَامُ وَحْدَهُ عَلَى الدُّكَّانِ لِمَا قُلْنَا وَكَذَا عَلَى الْقَلْبِ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِاَنَّهُ اِزْدِرَاءٌ بِالْاِمَامِ وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يُصَلِّىَ اِلَى ظَهْرِ رَجُلٍ قَاعِدٍ يَتَحَدَّثُ لِاَنَّ ابْنَ عُمَرَ رُبَمَا كَانَ يَسْتَتِرُ بِنَافِعٍ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ وَلَابَأْسَ بِاَنْ يُصَلِّىَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ اَوْ سَيْفٌ مُعَلَّقٌ لِاَنَّهُمَا لَايُعْبَدَانِ وَبِاعْتِبَارِهِ تَثْبُتُ الْكَرَاهَةُ وَلَابَأْسَ بِاَنْ يُصَلِّىَ عَلَى بِسَاطٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ لِاَنَّ فِيْهِ اِسْتِهَانَةً بِالصُّوَرِ وَلَا يَسْجُدُ عَلَى التَّصَاوِيْرِ لِاَنَّهُ يُشْبِهُ عِبَادَةَ الصُّوْرَةِ وَاَطْلَقَ الْكَرَاهِيَةَ فِى الْاَصْلِ لِاَنَّ الْمُصَلّٰى مُعَظَّمٌ -

অনুবাদ ঃ ইমামের দাঁড়ানোর স্থান মসজিদে আর সিজদার স্থান মেহরাবে হওয়াতে অসুবিধা নেই। তবে মেহরাবে দাঁড়ানো মাকরূহ। কেননা ইমামের জন্য আলাদা স্থান নির্ধারণের দিক থেকে এটা আহলে কিতাবের আচরণ সদৃশ্য। তবে (পদদ্বয় মসজিদে থাকা অবস্থায়) মেহরাবে সিজদা দেওয়ার বিষয়টি আলাদা। ইমামের একা উঁচুস্থানে দাঁড়ানো মাকরূহ। কারণ তা-ই যা আমরা বলে এসেছি। তদ্রূপ যাহিরী বর্ণনা মুতাবিক (বিপরীত অবস্থাটিও) মাকরূহ হবে। কেননা এতে ইমামের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়। বসা, আলাপরত কোনো মানুষের পিঠ সামনে রেখে নামাজ আদায়ে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা ইবনে ওমর (রা.) কোনো কোনো সফরে (আপন আজাদকৃত দাস) নাফি'কে সুতরা বানিয়ে নামাজ আদায় করতেন। সামনে ঝুলন্ত কুরআন শরীফ বা ঝুলন্ত তলোয়ার রেখে নামাজ আদায়ে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এ দুটো ইবাদতযোগ্য বস্তু নয়। আর সে হিসাবেই মাকরূহ হওয়া সাব্যস্ত হয়। ছবি সম্বলিত বিছানায় নামাজ আদায়ে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এতে ছবিকে তুচ্ছই করা হয়। আর ছবিগুলোর উপর সিজদা করবে না। কেননা এটা ছবি পূজার সদৃশ। মাবসূত কিতাবে (মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি) নিঃশর্ত করা হয়েছে। কেননা অন্যান্য বিছানার মোকাবেলায় মুসল্লাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ইমামের পা যদি মসজিদে থাকে। আর সিজ্‌দা মেহরাবে করা হয় তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা পা-ই ধর্তব্য বিষয়। সুতরাং পা যেহেতু মসজিদে, তাই তিনি (ইমাম) মুক্তাদীদের সমান হয়ে গেলেন, যদিও সিজ্‌দা মেহ্‌রাবেই করতে হবে। আর যদি ইমামের পাও মেহরাবে হয় তবে তা মাকরূহ হবে। কারণ এতে আহ্‌লে কিতাবের সাদৃশ্য হয়ে যায়। কেননা কিতাবীরা ইমামের স্থান বিশেষভাবে নির্ধারিত করে রাখে। পক্ষান্তরে যদি ইমামের পা মেহ্‌রাবের বাহিরে হয় আর সিজদা মেহরাবে হয় তবে এতে তাদের সাদৃশ্য হয় না। আর এতে মাকরূহ হওয়ার কারণই হলো কিতাবীদের সাদৃশ্য হওয়া। সুতরাং যে সুরতে সাদৃশ্য পাওয়া যাবে সেখানে মাকরূহ হবে আর যেখানে পাওয়া যাবে না সেখানে মাকরূহ হবে না। কেউ কেউ মাকরূহ হওয়ার এ কারণ বয়ান করেছেন যে, ইমাম যদি একাকী মেহ্‌রাবে দাঁড়ায় অর্থাৎ তার পা মেহরাবের ভিতর

হয় তখন ইমামের ডানে-বামে দাঁড়ানো মুক্তাদীদের নিকট তার অবস্থান অস্পষ্ট থাকে। সুতরাং যদি মেহরাব এমন হয় যে, ইমামের অবস্থান অস্পষ্ট থাকে না তবে ইমামের একাকী মেহরাবে দাঁড়ানো মাকরূহ হবে না। এই ইমাম আবূ জাফর তাহাবীরও এ-ই অভিমত। –(ইনায়া)

আর এটাও মাকরূহ যে, ইমাম একা উঁচু স্থানে দাঁড়াবে আর সকল মুক্তাদী নিচে দাঁড়াবে। কেননা এর দ্বারাও ইহুদিদের সাথে সদৃশ হয়ে যায়। আর যদি ইমামের সাথে কিছু লোকও দাঁড়ায় তবে মাকরূহ নয়। হিদায়া গ্রন্থকার উচ্চতার সীমা বলেননি। এ সম্পর্কে অনেকগুলো মতামত রয়েছে। ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, মাঝারি গড়নের মানুষের দেহের উচ্চতা পরিমাণ হলে মাকরূহ হবে, অন্যথায় নয়। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন, এতটুকুন উচ্চে হওয়া যার দ্বারা পার্থক্য বুঝা যায়। কেউ কেউ বলেন, একগজ পরিমাণ উঁচু হওয়া। তৃতীয় মতকে সুতরা -এর উপর কিয়াস করা হয়েছে। আর এরই উপর নির্ভরতা। উল্লেখ্য যে, মাকরূহ তখনই হবে যখন কোনো ওজর না থাকে। পক্ষান্তরে ওজরের কারণে ইমামের একা উচু স্থানে দাঁড়ালে তা মাকরূহ হবে না।

গ্রন্থকার বলেন, যদি ব্যাপারটি উল্টা হয় অর্থাৎ ইমাম নিচে আর মুক্তাদী উপরে হয় তখনও যাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী মাকরূহ হবে। কেননা এ সুরতে যদিও ইহুদিদের সাথে মুশাবাহ নেই কিন্তু ইমামের জন্য এটি অবমাননাকর। অথচ ইমামকে সম্মান করা উচিত। ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, যেহেতু উপরোক্ত সুরতে ইহুদিদের সাথে মুশবাহ নেই তাই এ সুরত মাকরূহ হবে না। কিন্তু এর জবাব পিছনে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَابَأْسَ بِاَنْ يُّصَلِّيَ اِلٰى ظَهْرِ رَجُلٍ قَاعِدٍ الخ : মাসআলা হলো, কোনো এমন ব্যক্তির পিঠের দিকে ফিরে নামাজ পড়া যে ব্যক্তি কথা বলছে, মাকরূহ নয়। দলিল হলো, হযরত ইবনে ওমর (র.) সফর ইত্যাদিতে সুতরার জন্য যখন কোনো গাছ বা ডালা পেতেন না তখন তিনি স্বীয় আযাদকৃত গোলাম নাফিকে বলতেন, স্বীয় পিঠ ফিরিয়ে দাও। পক্ষান্তরে যদি অন্য ব্যক্তির চেহারার দিকে ফিরে নামাজ পড়া হয় তবে মাকরূহ হবে। কেননা বর্ণিত আছে যে,

اِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ رَاٰى رَجُلًا يُصَلِّيْ اِلٰى وَجْهِ غَيْرِهٖ فَعَزَرَ هُمَا بِالدُّرَّةِ وَقَالَ لِلْمُصَلِّيْ اَتَسْتَقْبِلُ صُوْرَةً فِيْ صَلَاتِكَ وَقَالَ لِلْقَاعِدِ اَتَسْتَقْبِلُ الْمُصَلِّيْ بِوَجْهِكَ .

হযরত ওমর (রা.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে অন্য ব্যক্তির চেহারার দিকে ফিরে নামাজ পড়ছে। তিনি উভয়কে দুররা মারলেন। অতঃপর মুসল্লীকে বললেন, তুমি স্বীয় নামাজে সুরতের ইস্‌তিকবাল করো। আর বসা ব্যক্তিকে বললেন, তুমি তোমার চেহারা দ্বারা মুসল্লীর ইস্‌তিকবাল করতেছ। এ ঘটনার দ্বারা বুঝা গেল যে, অপরের মুখের দিকে ফিরে নামাজ পড়া মাকরূহ। না হয় ফারূকে আযম (রা.) এতো কঠোরতা অবলম্বন করতেন না। হ্যাঁ; যদি কোনো লোকের চেহারার দিকে ফিরে নামাজ পড়ে আর মুসল্লী এবং ঐ ব্যক্তির মাঝে এক তৃতীয় ব্যক্তি থাকে; যার পিঠ মুসল্লীর চেহারার দিকে তবে এ সূরতে মাকরূহ হবে না।

ماتن-এর কাউল اِلٰى ظَهْرِ رَجُلٍ يَتَحَدَّثُ দ্বারা বুঝা যায় যে, এর মধ্যেও কোনো অসুবিধা নেই যে, এক ব্যক্তি নামাজ পড়ে আর তার পাশে বসে কিছু লোক কথাবার্তা বলে, তবে কেউ কেউ একেও মাকরূহ বলেছেন। মাকরূহ হওয়ার কারণ নিম্নোক্ত হাদীস, اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُّصَلِّيَ الرَّجُلُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ يَتَحَدَّثُوْنَ اَوْ نَائِمُوْنَ .

আল্লাহর নবী নিষেধ করেছেন যে, মানুষ নামাজ পড়বে আর তার পাশে লোকেরা কথা বলবে কিংবা ঘুমিয়ে থাকবে আমাদের পক্ষ থেকে হাদীসের জবাব হলো, এ নিষেধাজ্ঞা তখনই প্রযোজ্য হবে যখন এ সকল লোকদের আওয়াজ এমন উঁচু হবে-যার কারণে নামাজে ভুল হওয়ারসমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কিংবা এ সম্ভাবনাও রয়েছে শায়িত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ বায়ু নিঃসরণ করবে যার দরুন নামাজে হাসির রুল পড়ে যাবে। আর যদি এ ধরনের আশংকা না থাকে তবে কোনো অসুবিধা নেই।

قَوْلُهُ وَلَابَأْسَ بِاَنْ يُّصَلِّيَ وَبَيْنَ الخ : গ্রন্থকার বলেন, যদি মুসল্লীর সামনে কুরআন শরীফ বা তলোয়ার ঝুলন্ত থাকে তবে, এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এগুলোর ইবাদত করা হয় না অথচ ইবাদত করার কারণেই মাকরূহ হয়। সুতরাং যখন এগুলোর ইবাদত করা হয় না তখন এগুলো সামনে ঝুলন্ত থাকাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেউ কেউ বলেন,

এরূপ করা মাকরূহ। দলিল হলো, তলোয়ার যুদ্ধের অস্ত্র, আর লোহা ও অস্ত্র দ্বারা সাধারণত যুদ্ধ করা হয় এবং যুদ্ধের মধ্যে তার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ জন্য নামাজের মতো বিনয়ের স্থানে অস্ত্র ইত্যাদিকে সামনে রাখা মুনাসিব নয়। বলা হয়, এ মতটি ইবনে ওমর (রা.)-এর। কুরআন শরীফকে সামনে রাখা মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো, এতে আহ্‌লে কিতাবের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। কেননা কিতাবীরা তাদের কিতাবের সাথে এমনটিই করে থাকে। এটা ইব্রাহীম ইবনে নাখয়ী (র.)-এর অভিমত। আমাদের পক্ষ থেকে প্রথমটির (ইবনে ওমরের মতের) জবাব হলো, অবশ্যই তলোয়ার যুদ্ধের অস্ত্র। কিন্তু নামাজওতো موضع حرب যুদ্ধের স্থান। এ কারণেই ইমামের স্থানকে محراب বলা হয়। সুতরাং নামাজ যখন যুদ্ধের স্থান (موضع حرب), তাই নামাজির কাছে অস্ত্র রাখা সমীচীন হবে। কেননা আমাদেরকে صَلٰوةُ الْخَوْف এ অস্ত্র কাঁধে নিয়ে নামাজ পড়তে হুকুম দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلْيَأْخُذُوْا أَسْلِحَتَهُمْ সুতরাং যখন তলোয়ার নামাজির সামনে ঝুলানো থাকবে তখনই প্রয়োজনের সময় তা হাতে নেওয়া সম্ভব হবে। বুঝা গেল নামাজির সামনে তলোয়ার ঝুলানো মাকরূহ নয়। অধিকন্তু সফর ইত্যাদিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে নেযা গেড়ে দেওয়া হতো। আর তিনি সেদিকে ফিরে নামাজ আদায় করতেন। উল্লেখ্য যে, নেযাও তো হাতিয়ার বা অস্ত্র। বুঝা গেল, মুসল্লীর সামনে হাতিয়ার রাখতে কোনো অসুবিধা নেই।

দ্বিতীয়টির (অর্থাৎ ইব্রাহীম নাখয়ীর) জবাব হলো, কিতাবীরা কিতাবকে মুসল্লীদের সামনে এ জন্য রাখতনা যে, তা ইবাদত। বরং এজন্য রাখতো যে, যাতে নামাজের মধ্যে তার থেকে দেখে দেখে পড়তে পারে। উল্লেখ্য যে, এটাতো আমাদের নিকটও মাকরূহ; বরং নামাজ ফাসিদকারী। কিন্তু যদি মুসল্লীর সামনে এমনিই রেখে দেওয়া হয়, এতে কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং যদি সামনে ঝুলিয়েও দেওয়া হয় এতেও কোনো অসুবিধা হবে না। –(ফাত্‌হুল কাদীর, কিফায়া)

قَوْلُهُ وَلَابَأْسَ بِاَنْ يُّصَلِّيَ الخ : এমন বিছানা যাতে ছবি রয়েছে এর উপর নামাজ পড়াতে কোনো অসুবিধা নেই। অর্থাৎ বেলা-কারাহাত জায়েজ। দলিল হলো, এমনটি করার দ্বারা ছবিগুলোর তাচ্ছিল্যই প্রদর্শন করা হয়; আর আমাদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, কেউ যদি কোনো প্রাণীর ছবি বানিয়ে তার হিমাকাতকে জাহির করে তখন আমাদের করণীয় ঐ ছবিকে তুচ্ছ ভাবা এবং তার সাথে হেয়তার আচরণ করা।

গ্রন্থকার বলেন, ছবির উপর সিজদা করবে না। কেননা এটা ছবি পূজার সদৃশ। জামে সগীরের উক্ত ইবারতের হাসিল হলো, ছবিবিশিষ্ট বিছানায় নামাজ পড়া জায়েজ। কিন্তু ছবির উপর সিজদা করবে না। মাবসূত নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ছবি বিশিষ্ট বিছানায় নামাজ পড়া নিঃশর্তভাবে (مطلقا) মাকরূহ। চাই ছবির উপর সিজ্‌দা করুক বা না করুক। দলিল হলো– যে বিছানা নামাজের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা সম্মানযোগ্য। অর্থাৎ সত্তাগতভাবে বিছানা সম্মানিত। এখন যদি তার মধ্যে ছবি থাকে তবে এ ছবিগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা লাযিম আসে। অথচ আমাদেরকে ছবির ইহানত-এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্য জায়নামাজে ছবি থাকা নিঃশর্তভাবে অনুচিত। চাই সে ছবিগুলোর উপর সিজ্‌দা করা হোক বা না করা হোক।

<u>ফায়েদা</u> ঃ ছবি উহাই যাকে আল্লাহর মাখলুকের সদৃশ বানানো হয়। চাই ذی روح (প্রাণী) হোক বা غير ذی روح (প্রাণহীন) হোক। تمثال প্রাণীর সাথে খাস। এখানে ذی روح-এর ছবি মুরাদ। কেননা غير ذی روح-এর ছবিতে কোনো কারাহাত নেই। দলিল হলো ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আছর। তিনি এক ছবি নির্মাতাকে বলেছিলেন,

اِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلَهٗ فَعَلَيْكَ تِمْثَالُ غَيْرِ ذِي الرُّوْحِ .

যদি তোমাকে ছবি বানাতেই হয় তবে غير ذی روح প্রাণহীনের ছবি বানাও। –(ফাত্‌হুল কাদীর)

وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُوْنَ فَوْقَ رَأْسِهِ فِي السَّقْفِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بِحِذَائِهِ تَصَاوِيْرُ أَوْصُوْرَةٌ مُعَلَّقَةٌ لِحَدِيْثِ جِبْرِيْلَ إِنَّا لَانَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ أَوْ صُوْرَةٌ وَلَوْكَانَتِ الصُّوْرَةُ صَغِيْرَةً بِحَيْثُ لَاتَبْدُوْ لِلنَّاظِرِ لَايُكْرَهُ لِأَنَّ الصِّغَارَ جِدًّا لَاتُعْبَدُ.

অনুবাদ : মাথার উপরে ছাদে কিংবা সামনে কিংবা বরাবরে ছবি থাকা কিংবা ঝুলন্ত ছবি রাখা মাকরূহ। কেননা হযরত জিবরাঈল কথিত হাদীসে রয়েছে– যে ঘরে কুকুর বা প্রাণীর ছবি থাকে, সে ঘরে আমরা প্রবেশ করি না। –(বুখারী) ছবি যদি এত ছোট হয় যে, মানুষের চোখে পড়ে না তবে মাকরূহ হবে না। কেননা খুব ছোট ছবি পূজ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার বলেন, মুসল্লীর মাথার উপরে ছাদে কিংবা সামনে কিংবা ডানে, বামে যদি ছবি থাকে তবে ঐ স্থানে নামাজ আদায় করা মাকরূহ। এমনিভাবে যদি ছবি ঝুলন্ত থাকে তবুও মাকরূহ। দলিল হযরত জিব্রাঈল (আ.) কথিত হাদীস ঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِسْتَأْذَنَ جِبْرَئِيْلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أُدْخُلْ فَقَالَ كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِيْ بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ إِمَّا أَنْ تَقْلَعَ رَأْسَهَا أَوْتَجْعَلَ بِسَاطًا يُوْطَأُ فَإِنَّ مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ لَايَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ.

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর নবীর ﷺ কাছে (প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন, মহানবী ﷺ বললেন, প্রবেশ করুন। জিবরাঈল (আ.) বললেন, কিভাবে প্রবেশ করব! আপনার ঘরে একটি ছবি বিশিষ্ট পরদা রয়েছে? (তাই) তার মাথা কেটে দেওয়া হোক কিংবা তাকে পদদলিত বিছানা করে দেওয়া হোক। কেননা আমরা ফেরেশতাকুল এমন ঘরে প্রবেশ করি না যেখানে ছবি রয়েছে। –(শরহে নিকায়া) উক্ত হাদীস দ্বারা এভাবে দলিল দেওয়া হয় যে, যে স্থানে ফেরেশ্তা প্রবেশ করে না সে স্থান সর্ব নিকৃষ্ট স্থান। আর এ ধরনের নিকৃষ্ট ঘরে নামাজ পড়া মাকরূহ। এ কারণে এ ধরনের ঘরে নামাজ পড়া মাকরূহ হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হাদীসের মধ্যে ফেরেশ্তা দ্বারা রহমতের ফেরেশ্তা উদ্দেশ্য। কেননা সার্বক্ষণিক নিয়োজিত ফেরেশ্তা মাত্র দু' সময় ব্যতীত কখনো মানুষ থেকে পৃথক হয় না। দু' সময় হলো, (১) পায়খানা প্রস্রাবের সময় (২) এবং স্ত্রীর সাথে সহবাসের সময়। –(শরহে নিকায়া)

আর যদি ছবি এত ছোট হয় যে, মানুষের চোখে পড়ে না তবে মাকরূহ হবে না। কেননা খুব ছোট ছবি পূজা করা হয় না। এ জন্য এ ধরনের ছবি মূর্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। এর সমর্থন হযরত আবূ হুরায়রার (রা.) -এর আমল দ্বারাও হয় অর্থাৎ তাঁর নিকট এমন একটি আংটি ছিল যার উপর দুটো মাছির ছবি ছিলো। এ পর্যায়ে ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার 'কিফায়া গ্রন্থকার এবং মোল্লা আলী কারী (র.) সহ প্রায় সকলেই একটি ঘটনার অবতারণা করেছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত দানিয়াল (আ.) নবীর একটি আংটি পাওয়া গিয়েছিলো। এ আংটির নগীনার উপর একটি বাঘ ও বাঘীনী এবং তাদের মাঝখানে একটি বাচ্চার ছবি ছিল। ছবিতে দেখানো হয়েছিল বাঘ ও বাঘীনী উভয়ে ঐ বাচ্চাটিকে চেটে খাচ্ছে। ফারূকে আ'যম (রা.) ছবিটি অশ্রুভরা চোখে দেখলেন এবং আংটিটি হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.)-এর হাওয়ালা করলেন। উপরোক্ত ঘটনাটির প্রেক্ষাপট হলো, অগ্নিপূজক বখতে নসর যখন ক্ষমতায় অধিষ্টিত হলো, তখন তাকে জনৈক গণক বলেছিল আপনার সাম্রাজ্যে এমন একটি বাচ্চার জন্ম হবে যে, আপনাকে ধ্বংস করে দিবে। একথা শুনে বখতে নসর ভূমিষ্ঠ প্রত্যেক বাচ্চাকে হত্যা করতে আরম্ভ করে দিল। এ বছরেই হযরত দানিয়াল (আ.) ভূমিষ্ঠ হন। তাই তাঁর মাতা তার নিরাপত্তার জন্যে তাঁকে এক গভীর জঙ্গলে রেখে আসেন। যেখানে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আদম সন্তান বা অন্য কোনো কিছু ছিল না। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা এ নিষ্পাপ শিশু এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আলোকবর্তিকা -এর হিফাজত এভাবে করলেন, একটি বাঘ পাঠালেন যাতে সে এ নবজাতক শিশুটিকে হিংস্র প্রাণী থেকে হিফাজত করে। আর এক বাঘিনী পাঠালেন তাকে দুধ পান করানোর জন্য। আর এরা উভয়ে এ শিশুটি চাটতে থাকতো। বড় হওয়ার পর হযরত দানিয়াল (আ.) আংটির নগীনায় এ নকশাটি অংকন করলেন, যাতে তা দেখে আল্লাহর অপূরণীয় নিয়ামতের কথা মনে পড়ে। উক্ত ঘটনার দ্বারা বুঝা গেল যে, ছোট ছবি ঘরে রাখা মাকরূহ নয়। না হয় ফারূকে আযম (রা.) উক্ত আংটি আবূ মূসা আশআরী (রা.)-কে কিভাবে দিলেন

وَاِذَا كَانَ التِّمْثَالُ مَقْطُوْعَ الرَّأْسِ اَىْ مَمْحُوَّ الرَّأْسِ فَلَيْسَ بِتِمْثَالٍ لِاَنَّهُ لَاتُعْبَدُ بِدُوْنِ الرَّأْسِ وَصَارَ كَمَا اِذَا صَلَّى اِلَى شَمْعٍ اَوْ سِرَاجٍ عَلَى مَاقَالُوْا وَلَوْ كَانَتِ الصُّوْرَةُ عَلَى وِسَادَةٍ مُلْقَاةٍ اَوْ عَلَى بِسَاطٍ مَفْرُوْشٍ لَايُكْرَهُ لِاَنَّهَا تُدَاسُ وَتُوْطَأُ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَتِ الْوِسَادَةُ مَنْصُوْبَةً اَوْ كَانَتْ عَلَى السِّتْرِ لِاَنَّهُ تَعْظِيْمٌ لَهَا وَاَشَدُّهَا كَرَاهَةً اَنْ تَكُوْنَ اِمَامَ الْمُصَلِّىْ ثُمَّ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ ثُمَّ عَلَى يَمِيْنِهِ ثُمَّ عَلَى شِمَالِهِ ثُمَّ خَلْفَهُ وَلَوْ لَبِسَ ثَوْبًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ يُكْرَهُ لِاَنَّهُ يُشْبِهُ حَامِلَ الصَّنَمِ وَالصَّلٰوةُ جَائِزَةٌ فِىْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ لِاِسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهَا وَتُعَادُ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مَكْرُوْهٍ وَهُوَ الْحُكْمُ فِىْ كُلِّ صَلٰوةٍ اُدِّيَتْ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَلَايُكْرَهُ تِمْثَالُ غَيْرِ ذِى الرُّوْحِ لِاَنَّهُ لَايُعْبَدُ .

অনুবাদ : আর মূর্তি যদি কর্তিত মস্তক বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ যদি মাথা ফেলে দেওয়া হয় তবে তা মূর্তি নয়। কেননা মস্তকহীন অবস্থায় মূর্তিপূজা করা হয় না। সুতরাং তা প্রদীপ বা মোমবাতি সামনে রেখে নামাজ আদায় করার মতো হলো। যেমন, ওলামায়ে কেরাম বলেছেন। যদি মাটিতে পড়ে থাকা বালিশ কিংবা বিছিয়ে রাখা বিছানায় ছবি থাকে তবে তা মাকরূহ হবে না। কেননা এ অবস্থায় তো তা পায়ে মাড়ানো হয়। পক্ষান্তরে বালিশ খাড়া করে রাখা অবস্থায় কিংবা ঝুলন্ত পর্দায় ছবি থাকলে এর ভিন্ন হুকুম হবে। কেননা এতে ছবির প্রতি সম্মান প্রকাশ পায়। কঠিনতম মাকরূহ হলো, ছবি মুসল্লীর সামনে থাকা, অতঃপর মাথার উপরে থাকা, এরপর ডান দিকে থাকা, এরপর বাম দিকে থাকা, অতঃপর পিছনে থাকা। আর যদি ছবি যুক্ত কাপড় পরিধান করে তবে মাকরূহ হবে। কেননা, সে মূর্তি বহনকারীর সদৃশ হবে। তবে এ অবস্থায় নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা নামাজের যাবতীয় শর্ত পাওয়া গিয়েছে। তবে গায়রে মাকরূহ যুক্ত অবস্থায় তা দোহরাতে হবে। মাকরূহসহ আদায়কৃত সমস্ত নামাজের এই একই হুকুম। তবে অপ্রাণীর ছবি মাকরূহ হবে না। কেননা সেগুলোর পূজা করা হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি ছবির মাথা কর্তিত হয় অর্থাৎ তার মস্তক একেবারেই ফেলে দেওয়া হয় তবে যেহেতু এটা ছবি নয়; বরং جمادات তথা প্রাণহীন বস্তু সদৃশ্য তাই এর দিকে ফিরে নামাজ পড়া মাকরূহ নয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মস্তকবিহীন ছবির পূজা করা হয় না। সুতরাং তা এমন যেমন কোনো ব্যক্তি মোমবাতি বা প্রদীপ সামনে রেখে নামাজ আদায় করল। যেমনিভাবে এগুলোর ইবাদত করা হয় না এমনিভাবে মস্তকবিহীন ছবিরও পূজা করা হয় না। আর মুসল্লীর সামনে রাখা মাকরূহ হওয়ার কারণ এটাই ছিল যে, তার পূজা করা হয় যেহেতু এখানে এ কারণ পাওয়া যায় না তাই মাকরূহও হবে না। মাশায়িখগণ এটাই বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, সামনে মোমবাতি ও প্রদীপ রেখে নামাজ পড়াও মাকরূহ। যেমন মুসল্লীর সামনে যদি সিগারেট ফেলার জন্য ছাইদানা থাকে আর তার থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয় তবে তা মাকরূহ হবে। কিন্তু বিশুদ্ধতম মত হলো মোমবাতি ও প্রদীপ সামনে রেখে নামাজ পড়া মাকরূহ নয়।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتِ الصَّلٰوةُ عَلٰى وِسَادَةٍ الخ : অর্থাৎ যদি মাটিতে পড়ে থাকা বালিশ কিংবা বিছিয়ে রাখা বিছানায় ছবি থাকে তবে তা মাকরূহ হবে না। কেননা এ অবস্থায় বালিশ পায়ে মাড়ানো হয় আর বিছানাও বিছানো হয়। (তাও পায়ে মাড়ানো হয়)

উল্লেখ্য যে, এর দ্বারা ছবির অসম্মান প্রকাশ পায় সম্মান প্রকাশ পায় না। এর সমর্থন একটি ঘটনা দ্বারাও হয়। ঘটনা হলো, একবার হাসান বসরী আর হযরত আতা (র.) এমন এক স্থানে প্রবেশ করলেন যার উপর ছবি বিশিষ্ট একটি বিছানা বিছানো ছিল। হযরত আতা-এর উপর দাঁড়িয়ে গেলেন, আর হাসান বসরী (র.) তার উপর বসে গেলেন। হযরত হাসান বসরী (র.) বললেন, ছবির উপর না বসাটা ছবির প্রতি সম্মান প্রকাশ পায়। তবে হ্যাঁ, বালিশ যদি খাড়া করে রাখা হয় কিংবা ছবির বিশিষ্ট পর্দা। যদি ঝুলন্ত থাকে তবে মাকরূহ হবে কেননা এতে ছবির সম্মান প্রকাশ পায়।

قَوْلُهُ وَأَشَدُّهَا كَرَاهَةً : বাক্যটি দ্বারা বয়ান করা হচ্ছে যে, কারাহাত তার افراد واحاد -এর কঠোরতাও দুর্বলতার ভিত্তিতে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তাই তো কঠিনতম মাকরূহ হলো ছবি মুসল্লীর সামনে থাকা। এরচেয়ে কম হলো মুসল্লীর মাথার উপরে থাকা, এরচেয়ে কম হলো মুসল্লীর ডান দিকে থাকা, এরচেয়ে কম হলো মুসল্লীর বাম দিকে থাকা, এরচেয়ে কম হলো মুসল্লীর পিছনে থাকা। কেউ কেউ বলেছেন, যদি ছবি মুসল্লীর পিছনে হয় তবে নামাজ মাকরূহ হবে না। তবে ছবি ঘরে থাকা মাকরূহ। কেননা নামাজের স্থান এমন জিনিস থেকে পাক করা মোস্তাহাব যা ফেরেশতার প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

قَوْلُهُ وَلَوْ لَبِسَ ثَوْبًا الخ : ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা মাকরূহ। কেননা এর দ্বারা সে ছবি বহনকারীর সদৃশ হয়ে যায়। সদৃশ বলার কারণ হলো, কাপড়ে তো বাস্তবে কোনো মূর্তি নেই। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ সকল মাকরূহ সূরতে নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা এ সকল ক্ষেত্রে নামাজের যাবতীয় শর্ত পাওয়া যায়। গ্রন্থকার আরো বলেন, নামাজ যদি মাকরূহ তরীকায় আদায় করা হয় তবে সতর্কতা হলো, তাকে মাকরূহ মুক্ত অবস্থায় দোহরাতে হবে। এতে শায়খ কওয়ামুদ্দীন কাকী (র.) শরহে মানারের মধ্যে واجب শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ নামাজ যদি কারাহাতসহ আদায় করা হয় তবে তা দোহ্‌রানো ওয়াজিব। তবে সত্য কথা হলো, নামাজ যদি কারাহাতে তাহরীমীর সাথে আদায় করা হয় তবে তা দোহরানো ওয়াজিব। কেননা মাকরূহে তাহরীমী ওয়াজিবের মোকাবেলায় আসে। আর যদি নামাজ কারাহাতে তানযীহীর সাথে আদায় করা হয় তবে তা দোহ্‌রানো মোস্তাহাব। কেননা মাকরূহে তানযীহী মোস্তাহাবের মোকাবেলায় আসে। —(ফাতহুল কাদীর)

وَلَابَأْسَ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِى الصَّلٰوةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اُقْتُلُوا الْاَسْوَدَيْنِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِى الصَّلٰوةِ وَلِاَنَّ فِيْهِ اِزَالَةَ الشُّغْلِ فَاَشْبَهَ دَرْءَ الْمَارِّ وَيَسْتَوِىْ جَمِيْعُ اَنْوَاعِ الْحَيَّاتِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِاِطْلَاقِ مَارَوَيْنَا وَيُكْرَهُ عَدُّ الْاٰيِ وَالتَّسْبِيْحَاتِ بِالْيَدِ فِى الصَّلٰوةِ وَكَذٰلِكَ عَدُّ السُّوَرِ لِاَنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ مِنْ اَعْمَالِ الصَّلٰوةِ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ اَنَّهُ لَابَأْسَ بِذٰلِكَ فِى الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ جَمِيْعًا مُرَاعَاةً لِسُنَّةِ الْقِرَاءَةِ وَالْعَمَلُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ قُلْنَا يُمْكِنُهُ اَنْ يَعُدَّ ذٰلِكَ قَبْلَ الشُّرُوْعِ فَيَسْتَغْنِىْ عَنِ الْعَدِّ بَعْدَهُ . وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

অনুবাদ ঃ নামাজের মধ্যে সাপ ও বিচ্ছু হত্যা করায় কোনো অসুবিধা নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা দুই কালো (সাপ ও বিচ্ছু) মেরে ফেলবে, এমনকি তোমরা যদি নামাজের মধ্যেও থাকো তবুও। তাছাড়া এর দ্বারা নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কাজকে দূরীভূত করা হয়। সুতরাং তা সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে বোধ করার অনুরূপ বলে গণ্য। সবরকম সাপেরই সমান হুকুম। এটাই সহীহ অভিমত। কেননা আমাদের বর্ণিত হাদীসটি নিঃশর্ত। আর নামাজের মধ্যে হাতে আয়াত ও তাসবীহর সংখ্যা, তদ্রূপ সূরা গণনা করাও মাকরূহ। কেননা তা নামাজের আমল বা কার্যভুক্ত নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কিরাআতের সুন্নত পরিমাণ রক্ষা করার জন্য এবং হাদীসে যে সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে, তা রক্ষা করার জন্য ফরজ ও নফল নামাজে গণনা করা মাকরূহ হবে না। (উত্তরে) আমরা বলি, নামাজ শুরু করার আগেই তো তা গণনা করে নিতে পারে, যাতে পরে গণনা করার প্রয়োজন না হয়। (তদ্রূপ সালাতুত্ তাসবীহেও হাতে গণনা করার প্রয়োজন নেই। কেননা হাতের আঙ্গুলের মাথা চাপ দিয়ে তা গণনা করা সম্ভব।) আল্লাহই উত্তম জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামাজের অবস্থায় সাপ ও বিচ্ছু হত্যা করা জায়েজ। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী اُقْتُلُوا الْاَسْوَدَيْنِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِى الصَّلٰوةِ তোমরা দুই কালো (সাপ ও বিচ্ছু) মেরে ফেলবে, যদিও তোমরা নামাজের মধ্যে থাকো। আর আকলী দলিল হলো– সাপ ও বিচ্ছু হত্যা করা এ কারণে জায়েজ যে, এর দ্বারা অন্তর তার সাথে মাশগুল হওয়া দূর হয়ে যায়। অর্থাৎ নামাজির দৃষ্টি যতক্ষণ তার দিকে থাকে ততক্ষণ অন্তর এ ব্যাপারে দুঃশ্চিন্তায় থাকে, নামাজের রূহ তথা হুযূরে কলব তখন আর থাকে না। এজন্য বলা হয়েছে যে, সাপ বিচ্ছু মেরে ফেলো, তাহলে মনের মাশগুলিয়ত দূর হয়ে যাবে এবং হুযূরে কলব সৃষ্টি হয়ে যাবে। সুতরাং এ সাপ বিচ্ছু মারা নামাজির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে রোধ করার সদৃশ হবে। ইনায়া গ্রন্থকার লিখেছেন, হিদায়া গ্রন্থকার এর কোনো ব্যাখ্যা দেননি যে, একবার প্রহার করে তাকে হত্যা করবে, কিংবা একাধিকবার প্রহার করার প্রয়োজন দেখা দিলে একাধিকবার প্রহার করে তাকে হত্যা করবে। একই মত শামসুল আইম্মা আস্সারাখসী (র.)-এর। অর্থাৎ যদি একবার মারার দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায় তবে একবারই কাজে লাগাবে। আর যদি একাধিকবার প্রহারের প্রয়োজন দেখা দেয় তবে তা কাজে লাগাবে। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اُقْتُلُوا الْاَسْوَدَيْنِ-এর মধ্যে কোনো ব্যাখ্যা নেই।

কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, যদি একবার প্রহার করে একে হত্যা করা সম্ভব হয় তবে মেরে ফেলবে কিন্তু নামাজ দোহরাবে না। আর যদি একাধিকবার প্রহারের দ্বারা হত্যা করা হয় তবে নামাজ দোহরাবে। কেননা এটা আমলে কাছীর : আর আমলে কাছীর নামাজ বিনষ্টকারী। তবে এর জবাব হলো, অবশ্যই একাধিকবার প্রহারের দ্বারা আমলে কাছীর হয় তবে এটা এমন আমলে কাছীর যা করার ইজাজত শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে রয়েছে। যেমন, নামাজে অজু চলে গেলে নামাজি ব্যক্তির হাঁটা-চলা করা, কূপ থেকে পানি বের করা, অজু করা ইত্যাকার কাজগুলোও আমলে কাছীর। কিন্তু শরয়ীভাবে অনুমতি থাকায় তা নামাজ বিনষ্টকারী নয়। এমনিভাবে এখানেও যেহেতু শরিয়তের ইজাজত রয়েছে। তাই বারবার প্রহারের দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। বিজ্ঞ গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত হুকুমে সব ধরনের সাপ অন্তর্ভুক্ত। চাই সাপ সাদা হোক বা লম্বাকেশরাজি বিশিষ্ট হোক কিংবা কালো ফনাতোলা জাতি সাপ হোক। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা আমরা যে হাদীস বর্ণনা করেছি তাহলো মুত্লাক তথা নিঃশর্ত, যা সবগুলোকে শামিল করে। ফকীহ আবূ জা'ফর হিন্দওয়ানী বলেন, কিছু কিছু সাদা সাপ ঘরে অবস্থান করে। এগুলো সাধারণত জিন হয়ে থাকে। এগুলো হত্যা করা জায়েজ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, إِيَّاكُمْ وَالْحَيَّةَ الْبَيْضَاءَ، فَإِنَّهَا مِنَ الْجِنِّ – তোমরা সাদা রঙ্গের সাপকে হত্যা করা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা সেগুলো জিন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত হাদীসে নামাজ এবং গায়রে নামাজের কোনো ব্যাখ্যা করা হয়নি। এ জন্য এ ধরনের সাপকে নামাজ ছাড়া অন্য সময়েও হত্যা করা জায়েজ নেই। হ্যাঁ যদি প্রথমে এভাবে বলে দেওয়া হয় যে, তুমি চলে যাও। মুসলমানদের রাস্তা ছেড়ে পালাও, নতুবা আমরা তোমাকে হত্যা করব। এরপরও যদি না যায় তবে তাকে হত্যা করা জায়েজ। ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র.) বলেন, সাপগুলোর মাঝে পার্থক্য করা ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ জিন জাতি থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তারা মানুষের সামনে সাপের আকৃতিতে বের হবে না এবং মানুষের ঘরে প্রবেশ করবে না। যখন তারা কৃত অঙ্গীকার লঙ্ঘন করল এবং মানুষের বাসা বাড়িতে অবস্থান শুরু করল। তাই এগুলোকে হত্যা করা জায়েজ হবে। এ মতটি শামসুল আইম্মা সারাখ্সী গ্রহণ করেছেন, আর হাদীসের মধ্যে اسودين দ্বারা কালো সাপ মুরাদ নয়; বরং এ শব্দটি আরবদের পরিভাষায় সাধারণত সবধরনের সাপের ক্ষেত্রে বলা হয়।

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ عَدُّ الْآيِ وَالتَّسْبِيحَاتِ الخ : নামাজের মধ্যে হাত দ্বারা তাসবীহ এবং আয়াত গণনা করা মাকরূহ। নামাজ ফরজ হোক বা নফল হোক। এমনিভাবে সূরা গণনা করাও মাকরূহ। কেননা আয়াত, তাসবীহাত এবং সূরাগুলো গণনা করা নামাজের আমালের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটাই যাহিরী রিওয়ায়াত। باليد -এর قيد দ্বারা দু'টো জিনিস বুঝা যায়। এক. আঙ্গুলের মাথা চাপ দিয়ে গণনা করা মাকরূহ নয়। দুই. জবান দ্বারা গণনা করবে না। কেননা জবান দ্বারা গণনা করা দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়।

গ্রন্থকার في الصلوة -এর قيد দ্বারা এদিকে ইশারা করেছেন যে, নামাজের বাহিরে গণনা করা মাকরূহ নয়। কিন্তু আল্লামা ফখরুল ইসলাম (র.) বলেছেন, নামাজের বাহিরেও তাসবীহ গণনা করা বিদ'আত। তিনি বলেছেন, كَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ نُذْنِبُ وَلَا نُحْصِي وَنُسَبِّحُ وَنُحْصِي – আসলাফে কেরাম বলতেন, আমরা গুনাহ করি গণনা করি না। কিন্তু তাসবীহ পড়ি তা গণনা করি।

غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ -এর মধ্যে সাহেবাইন (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াত ও তাসবীহকে ফরজ ও নফল উভয় নামাজে গণনা করা যায়। দলিল হলো– মানুষের অনেক সময় আয়াত গণনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন, সে চায় যে, ফরজ নামাজে সুন্নত তরীকায় কিরাআত পড়বে অর্থাৎ চল্লিশ কিংবা ষাট আয়াত পড়বে– যা সুন্নাতে রাসূল দ্বারা সাবিত আছে। কিংবা সালাতুত্ তাসবীহে সুন্নত তরীকার আমল করতে চায়। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত উভয় সুরত গণনা ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং ঐ সময়ে গণনা করার দ্বারা কোনো অসুবিধা নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, কিরাআতে মাসনূনের উপর আমল করা এভাবেও সম্ভব যে, নামাজ শুরু করার আগেই নির্ধারণ করে নিবে যে, প্রথম রাক্আতে এখান থেকে এখন পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় রাক্আতে অমুক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত পড়ব। এ সুরতে নামাজে গণনার কোনো জরুরত হবে না। এমনিভাবে সালাতুত্ তাসবীহেও হাত দ্বারা গণনা করার কোনো জরুরত নেই : কেননা হাতের আঙ্গুলের মাথা চাপ দিয়েও গণনা করা সম্ভব। আল্লাহই সম্যক অবহিত।

فَصْلٌ وَيُكْرَهُ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْفَرْجِ فِى الْخَلَاءِ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ وَالْاِسْتِدْبَارُ يُكْرَهُ فِىْ رِوَايَةٍ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَرْكِ التَّعْظِيْمِ وَلَايُكْرَهُ فِىْ رِوَايَةٍ لِاَنَّ الْمُسْتَدْبِرَ فَرْجَهُ غَيْرُ مُوَازٍ لِلْقِبْلَةِ وَمَا يَنْحَطُّ مِنْهُ يَنْحَطُّ اِلَى الْاَرْضِ بِخِلَافِ الْمُسْتَقْبِلِ لِاَنَّ فَرْجَهُ مُوَازٍ لَهَا وَمَا يَنْحَطُّ مِنْهُ يَنْحَطُّ اِلَيْهَا ـ

অনুচ্ছেদ : বিবিধ মাসাইল

অনুবাদ : পায়খানায় লজ্জাস্থান কিবলামুখী করে বসা মাকরূহ। কেননা নবী করীম ﷺ তা নিষেধ করেছেন। এক বর্ণনা মতে কিবলার দিকে পিছন দিয়ে বসা মাকরূহ। কেননা তাতে সম্মান তরক করা হয়। অন্য বর্ণনা মতে তা মাকরূহ হয় না। কেননা যে ব্যক্তি (কিবলার দিকে) পিছন দিয়ে বসেছে, তার লজ্জাস্থান কিবলার দিকে নয়। আর যে নাজাসাত তার থেকে বের হয়, তা ভূমির দিকে পড়ে। পক্ষান্তরে যে কিবলামুখী হয়ে বসে, তার লজ্জাস্থান কিবলামুখী হয়ে থাকে। আর তা থেকে যা নির্গত হয়, তা সে মুখী হয়ে মাটিতে পড়ে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত অধ্যায়ে مكروهات صلوة সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। উক্ত পরিচ্ছেদে নামাজের বাইরের مكروهات-এর আলোচনা করা হচ্ছে। মাসআলা, قضاء حاجت অর্থাৎ পেশাব পায়খানার সময় স্বীয় লজ্জাস্থান কিবলামুখী করা মাকরূহ তাহরীমী, খোলা ময়দানে হোক বা বদ্ধ ঘরে হোক। সামনের দিকে কোনো পর্দা থাকুক বা না থাকুক, সর্বাবস্থায় মাকরূহে তাহ্‌রীমী। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা থেকে নিষেধ করেছেন। যেমন, বর্ণিত আছে যে, عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيْلَ لَهُ لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ اَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا ﷺ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ ـ ابو داود ـ হযরত সালমান ফার্সী (রা.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি তাকে বলল, তোমাদেরকে তোমাদের নবী সব বিষয়ের তালীম দিয়েছেন। এমনকি পেশাব পায়খানা করারও? (তার এ কথা বিদ্রূপাত্মক ছিল) হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলেন, জী হ্যাঁ, আমাদেরকে আমাদের নবী পেশাব পায়খানার অবস্থায় কিবলামুখী হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ) আবূ দাউদ শরীফেরই অন্য বর্ণনায় রয়েছে (ابو داود) اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَاتَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَابَوْلٍ وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا ـ যখন তোমরা কাজায়ে হাজাতের জন্য যাবে তখন استقبال قبله ও استدبار قبله করবে না। তবে তোমরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দিকে ফিরে ইসতিন্‌জা করবে। উল্লেখ্য যে, وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا-এর হুকুম বিশেষ করে মদীনাবাসীর জন্য। কেননা কা'বা শরীফ মদীনা শরীফের পূর্বেও নয় এবং প্রতীচ্যেও নয় বরং দক্ষিণ দিকে। এ হুকুম আমাদের ভারত মহাদেশের জন্য নয়; বরং আমাদের জন্য হলো, وَلٰكِنْ شَمِّلُوْا اَوْ جَنِّبُوْا অর্থাৎ কাযায়ে হাজাতের সময় উত্তর কিংবা দক্ষিণ দিকে ফিরে বসবে। استدبار قبله তথা কা'বার দিকে পিছন দিয়ে বসা সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দু'টো বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা অনুযায়ী استدبار قبله ও মাকরূহ। এর কারণ হলো, যেমনিভাবে استقبال قبله দ্বারা কিবলার সম্মান তরক করা হয়, এমনিভাবে استدبار قبله দ্বারাও সম্মান তরক হয়। আর দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী استدبار قبله মাকরূহ নয়। কেননা যে ব্যক্তি কিবলার দিকে পিছন দিয়ে বসেছে, তার লজ্জাস্থান কিবলার দিকে হয় না। আর যা কিছু লজ্জাস্থান থেকে বের হয় তা জমিনের দিকে পড়ে। অর্থাৎ পেশাবের স্রোত বিভিন্ন দিকে চলে যায়, কিবলার দিকে যায় না। পক্ষান্তরে যে কিবলামুখী হয়ে বসে তার লজ্জাস্থান কিবলামুখী হয়ে থাকে, যা তার থেকে বের হয় তাও কিবলামুখী হয়ে পড়ে। এ জন্য استقبال قبله-কে মাকরূহ বলা হয়েছে। উপরোক্ত মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা ফিকহের কিতাবে বিদ্যমান।

وَيُكْرَهُ الْمُجَامَعَةُ فَوْقَ الْمَسْجِدِ وَالْبَوْلُ وَالتَّخَلِّى لِاَنَّ سَطْحَ الْمَسْجِدِ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَصِحَّ الْاِقْتِدَاءُ مِنْهُ بِمَنْ تَحْتَهُ وَلَايَبْطُلُ الْاِعْتِكَافُ بِالصُّعُوْدِ اِلَيْهِ وَلَايَحِلُّ لِلْجُنُبِ الْوُقُوْفُ عَلَيْهِ وَلَابَأْسَ بِالْبَوْلِ فَوْقَ بَيْتٍ فِيْهِ مَسْجِدٌ وَالْمُرَادُ مَا اُعِدَّ لِلصَّلٰوةِ فِى الْبَيْتِ لِاَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ حُكْمَ الْمَسْجِدِ وَاِنْ نُدِبْنَا اِلَيْهِ وَيُكْرَهُ اَنْ يُغْلَقَ بَابُ الْمَسْجِدِ لِاَنَّهُ يُشْبِهُ الْمَنْعَ مِنَ الصَّلٰوةِ وَقِيْلَ لَابَأْسَ بِهِ اِذَا خِيْفَ عَلٰى مَتَاعِ الْمَسْجِدِ غَيْرَ اَوَانِ الصَّلٰوةِ۔

অনুবাদ ঃ মসজিদের উপরে স্ত্রী সহবাস করা, পেশাব করা এবং পায়খানা করা মাকরূহ। কেননা মসজিদের ছাদ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য মসজিদের ছাদে দাড়ানো মুসল্লীর জন্য ছাদের নিচে দাঁড়ানো ইমামের পিছনে ইক্তিদা করা বৈধ এবং ছাদে আরোহণের কারণে ই'তিকাফ বাতিল হয়নি এবং জানাবাতের অবস্থায় সেখানে অবস্থান করা জায়েজ নয়। ঐ ঘরের ছাদে পেশাব করার দ্বারা কোনো অসুবিধা নেই যার নিচে মসজিদ ইবাদতখানা রয়েছে। মসজিদ দ্বারা বাড়ির ঐ অংশকে বুঝানো হয়েছে, যা নামাজের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা তা শরঈ মসজিদের হুকুমের আওতায় পড়েনি। যদিও আমাদেরকে বাড়িতে নামাজের জন্য নির্ধারিত স্থান রাখার আহবান জানানো হয়েছে। আর মসজিদের দরজা তালাবদ্ধ রাখা মাকরূহ। কেননা তা নামাজ থেকে নিষেধ করার সদৃশ। কোনো কোনো ফকীহর মতে মসজিদের আসবাবপত্র হারানোর ভয় থাকলে নামাজ ছাড়া অন্য সময়ে বন্ধ রাখাতে অসুবিধা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মসজিদের ছাদের উপর স্ত্রী সহবাস করা, পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহে তাহরীমী। কেননা মসজিদের ছাদ মসজিদের হুকুমভুক্ত। সুতরাং মসজিদের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে কেউ যদি ছাদের নিচে দাঁড়ানো ইমামের পেছনে ইক্তিদা করে তবে তা জায়েজ। মসজিদের ছাদে উঠার কারণে মু'তাকিফের ই'তিকাফ নষ্ট হয় না। জুনূবী ব্যক্তির জন্য মসজিদের ছাদের উপর দাঁড়ানো জায়েজ নয়, যেমনিভাবে মসজিদের ভিতরেও দাঁড়ানো জায়েজ নেই। বুঝা গেল মসজিদের ছাদ মসজিদেরই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আর যেহেতু মসজিদের ভিতর এ সকল কাজ হারাম সেহেতু মসজিদের ছাদের উপরও এগুলো হারাম হবে।

قَوْلُهُ وَلَابَأْسَ بِالْبَوْلِ الخ : ঘরের মধ্যে যদি কোনো স্থান নামাজের জন্য নির্ধারণ করা হয়, তবে ঐ ঘরের ছাদে পেশাব-পায়খানা করায় কোনো অসুবিধা নেই। দলিল হলো– ঐ স্থানকে হাকীকী মস্জিদের হুকুমের আওতাভুক্ত করা যায় না। এমনকি ঐ স্থানটি বিক্রি করাও জায়েজ এবং এর উত্তরাধিকারীও সাবিত হবে। আমাদেরকে ঘরের মধ্যে মস্জিদ বানানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মুস্তাহাব হলো স্বীয় ঘরের কোনো স্থানকে নামাজের জন্য নির্ধারণ করা যাতে সেখানে সুন্নত ও নফল আদায় করা যায়। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনায় বলেছিলেন اِجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً – নিজের ঘরগুলোকে কিবলা বানাও। অর্থাৎ নিজের ঘরের কোনো স্থানকে নির্ধারণ করো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, لَاتَتَّخِذُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিও না। অর্থাৎ ঘরের মধ্যে নামাজকে তরক করে ঘরগুলোকে কবরস্থানের সদৃশ করো না; বরং ঘরগুলোতে নামাজ পড়ো এবং ইবাদত করো।

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ اَنْ يُغْلَقَ بَابُ الْمَسْجِدِ الخ : অর্থাৎ মসজিদের তালাবদ্ধ রাখা মাকরূহ। কেননা এটা নামাজ থেকে নিষেধ করা সদৃশ। আর নামাজ থেকে বারণ করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ – এর চেয়ে বড় জালিম কে! যে মস্জিদগুলোতে আল্লাহর জিকির করতে বারণ করে। তবে কেউ কেউ বলেছেন, যদি মস্জিদের আসবাবপত্র নষ্ট হওয়ার বা চুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তালা বন্ধ করায় কোনো অসুবিধা নেই। কেননা কালের বিবর্তনের কারণে মানুষের হালাতও পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন– এক সময় স্ত্রীলোকদের মস্জিদে আসার অনুমতি ছিল; কিন্তু ফিতনার ভয়ে তা থেকে তাদেরকে বারণ করা হয়েছে, কাজেই এ জমানায় তাদেরকে মস্জিদে আসতে নিষেধ করা জায়েজ। এমনিভাবে এ ফিতনার জমানায় মসজিদে তালাবদ্ধ করাতে কোনো অসুবিধা নেই; বরং সঠিক তবে তা নামাজের সময়ে করা যাবে না।

وَلَابَأْسَ بِاَنْ يُنَقَّشَ الْمَسْجِدُ بِالْجِصِّ وَالسَّاجِ وَمَاءِ الذَّهَبِ وَقَوْلُهُ لَابَأْسَ يُشِيْرُ اِلَى اَنَّهُ لَايُوْجَرُ عَلَيْهِ لٰكِنَّهُ لَايَاثَمُ بِهِ وَقِيْلَ هُوَ قُرْبَةٌ وَهٰذَا اِذَا فَعَلَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ اَمَّا الْمُتَوَلِّيْ يَفْعَلُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ مَايَرْجِعُ اِلَى اَحْكَامِ الْبِنَاءِ دُوْنَ مَا يَرْجِعُ اِلَى النَّقْشِ حَتّٰى لَوْ فَعَلَ يَضْمَنُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ـ

অনুবাদ : মসজিদের চুনকাম করা, শালকাঠ দ্বারা এবং স্বর্ণের পানি দ্বারা কারুকার্য করাতে কোনো অসুবিধা নেই। 'অসুবিধা নেই' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এ কাজে কোনো ছওয়াব নেই। তবে গুনাহও হবে না। কোনো কোনো ফকীহর মতে এটি ছওয়াবের কাজ। তবে এটি নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ করার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে মুতাওয়াল্লী ওয়াকফের মাল হতে শুধু ঐ সমস্ত কাজই করতে পারেন, যা নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কারুকার্য সংশ্লিষ্ট নয়। এতদসত্ত্বেও যদি কিছু কারুকার্য করেন তবে ব্যয়কৃত অর্থের দায় তাকেই বহন করতে হবে। আল্লাহই উত্তম জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মসজিদ সুসজ্জিত করার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে মসজিদ সুসজ্জিত করা মাকরূহ। কেননা একবার হযরত আলী (রা.) এক মসজিদের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, لِمَنْ هٰذِهِ الْبِيْعَةُ - এই গির্জাটি কার? উল্লেখ্য যে, হযরত আলী (রা.) -এর এভাবে বলার দ্বারা সুসজ্জিত করার আমল মাকরূহ হওয়া বুঝায়। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদ সুসজ্জিত করাকে কিয়ামতের আলামত বলে অভিহিত করেছেন। একবার ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিক মসজিদে নববী সুসজ্জিত করার জন্য মদীনা শরীফে আসবাবপত্র পাঠালে ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) তা গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দেন। উপরোক্ত দলিলগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, মসজিদ সুসজ্জিত করা মাকরূহ। তবে ফুকাহায়ে আহনাফের মতে এতে কোনো অসুবিধা নেই। দলিল হলো, ফারূকে আ'যম (রা.) তাঁর খিলাফত কালে মসজিদে নববী প্রশস্তও করেছেন এবং সুসজ্জিতও করেছেন। দ্বিতীয় দলিল হলো, মসজিদ সুন্দর করার কারণে লোকেরা অধিকহারে ই'তিকাফের প্রতি ধাবিত হবে এবং দীর্ঘসময় নামাজের অপেক্ষায় বসে থাকবে। উল্লেখ্য যে, এটাতো খুবই উত্তম কাজ, তাই মসজিদগুলো সুন্দর করাও উত্তম কাজ হবে। আর যদি উত্তম না হয় তবে কমছে কম খারাপ তো আর হবে না? যা আমাদের মাযহাবে রয়েছে।

শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.) বলেন, মাতিন -এর কওল لَابَأْسَ দ্বারা এ দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, মসজিদ সুসজ্জিত করার দ্বারা কোনো ছওয়াব হবে না এবং কোনো গুনাহও হবে না। কেউ কেউ বলেছেন, মসজিদ সুসজ্জিত করা ইবাদত। দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মসজিদ আবাদ এবং সুন্দর করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন, আল্লাহর বাণী- اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ তা ছাড়া খানায়ে কা'বাকে স্বর্ণ ও রুপার পানি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে এবং রেশম কাপড়ের গিলাফ পরানো হয়েছে। বুঝা গেল খানায়ে কা'বাকে সুসজ্জিত করা ইবাদত এবং ছওয়াবের কারণ। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, মস্‌জিদগুলো সুসজ্জিতকরণ এ কারণে ইবাদত বলে গণ্য–যেহেতু এগুলো দ্বারা মসজিদের তা'যীম ও সম্মান করা হয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মসজিদ সুসজ্জিতকরণ ইবাদত রূপে গণ্য হওয়া বা এতে কোনো অসুবিধা না হওয়া এটা তখন যখন মুতাওয়াল্লী তার নিজস্ব টাকা পয়সা দ্বারা তা করবে। শর্ত হলো মাল হালাল হতে হবে। মসজিদ নির্মাতাগণ যে মাল মসজিদে ওয়াক্‌ফ করেছেন তা ব্যয় করতে পারবে না। তাইতো মুতাওয়াল্লী শুধু ঐ সকল মাল খরচ করতে পারেন যা নির্মাণ সংশ্লিষ্ট, কারুকার্য সংশ্লিষ্ট নয়। এমনকি মুতাওয়াল্লী যদি কিছু করেন তবে ব্যয়কৃত অর্থের দায় তাকেই বহন করতে হবে। আবূ বকর রাযী বলেন, আমাদের এ জমানায় জালিমদের অত্যাচারের ভয়ে অবশিষ্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট জিনিস দ্বারা মসজিদ সুসজ্জিত করা জায়েজ অর্থাৎ এর দ্বারা মুতাওয়াল্লী দায় বহন করতে হবে না। আল্লাহই উত্তম জানেন।

بَابُ صَلٰوةِ الْوِتْرِ

اَلْوِتْرُ وَاجِبٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا سُنَّةٌ لِظُهُوْرِ اٰثَارِ السُّنَنِ فِيْهِ حَيْثُ لَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ وَلَا يُؤَذَّنُ لَهُ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى زَادَكُمْ صَلٰوةً اَلَا وَهِىَ الْوِتْرُ فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ اَمْرٌ وَهُوَ لِلْوُجُوْبِ وَلِهٰذَا وَجَبَ اَلْقَضَاءُ بِالْاِجْمَاعِ وَاِنَّمَا لَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ لِاَنَّ وُجُوْبَهُ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَهُوَ الْمَعْنٰى بِمَا رُوِىَ عَنْهُ اَنَّهُ سُنَّةٌ وَهُوَ يُؤَدّٰى فِىْ وَقْتِ الْعِشَاءِ فَاكْتُفِىَ بِاَذَانِهٖ وَاِقَامَتِهٖ ـ

পরিচ্ছেদ : সালাতুল বিত্‌র

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে সালাতুল বিত্‌র ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, এটি সুন্নত। কেননা তাতে সুন্নতের আলামতসমূহ সুপ্রকাশিত রয়েছে। কারণ, বিত্‌র অস্বীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত করা যায় না এবং এর জন্য আলাদা আজান দেওয়া হয় না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো হাদীস, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য একটি নামাজ বৃদ্ধি করেছেন। সেটা হলো বিত্‌র। সুতরাং তা তোমরা ইশা ও ফজর উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করবে। এখানে 'আমর' বা আদেশবাচক শব্দ এসেছে। আর তা দ্বারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে। এ জন্যই সর্বসম্মতিক্রমে তা কাজা করা ওয়াজিব। তবে বিত্‌র অস্বীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত না করার কারণ হলো, তার ওয়াজিব হওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আবূ হানীফা (র.) থেকে বিত্‌র সুন্নত হওয়ার যে বর্ণনা রয়েছে, তার অর্থ হলো, তা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত। আর যেহেতু তা ইশার সময় আদায় করা হয়, সেহেতু ইশার আযান ও ইকামতকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : গ্রন্থকার مفروضات এবং এর متعلق তথা আওকাত, আদায়ের কাইফিয়ত বা পদ্ধতি, আদায়ে কামিল ও কাছিরের বয়ান থেকে ফারিগ হওয়ার পর উক্ত অনুচ্ছেদে ঐ নামাজের আলোচনা শুরু করছেন, যা ফরজের চেয়ে কম আর নফলের চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ। অর্থাৎ সালাতুল বিত্‌র। সামনে নফলের আলোচনা আসছে সুতরাং ওয়াজিব তথা বিত্‌রকে ফরজ ও নফলের মাঝখানে উল্লেখ করাই যথার্থ।

সালাতুল বিত্‌রের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে তিন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। এক. বিত্‌র ওয়াজিব। দুই. বিত্‌র সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। এ মতটিই সাহেবাইন ও ইমাম শাফি'ঈ (র.) গ্রহণ করেছেন। তিন. বিত্‌র ফরজ। এ মতটি ইমাম যুফার ও মালিকিয়াগণ অবলম্বন করেছেন। সাহেবাইন (র.) -এর দলিল হলো, বিত্‌রের মধ্যে সুন্নতের নমুনা রয়েছে। যেমন– সুন্নতের ন্যায় বিত্‌র অস্বীকারকারী কাফির হয় না। এমনিভাবে বিত্‌রের জন্য স্বতন্ত্র কোনো আযান দেওয়া হয় না। যেমনিভাবে সুন্নতের জন্য আযান দেওয়া হয় না। বুঝা গেল, বিত্‌র হলো সুন্নত। শরহে নিকায়া গ্রন্থকার সাহেবাইন (র.) -এর পক্ষে নকলী দলিলও পেশ করেছেন। দলিল হলো হলো. এক. রাসূলুল্লাহ ﷺ এক গ্রাম্য লোককে বলেছিলেন خَمْسُ صَلٰوةٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন।

গ্রাম্য লোকটি বলল, এ ছাড়াও আর কোনো কিছু আমার উপর ফরজ আছে কী? তিনি বললেন, না, বরং নফল পড়বে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতীত বাকি সব নফল। সুতরাং বিত্‌র ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হয় না, কেননা বিত্‌রও তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বাইরে। **দুই.** বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيْرِ – নবী করীম ﷺ উটের (বাহনের) উপর বিত্‌রের নামাজ আদায় করেছেন। উল্লেখ্য যে, বাহনের উপর নফল নামাজ আদায় করা জায়েজ, ফরজ ও ওয়াজিব জায়েজ নয়। সুতরাং বিত্‌রের নামাজ যদি ওয়াজিব হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহনের উপর তা আদায় করতেন না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল নিম্নোক্ত হাদীস, إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى زَادَكُمْ صَلٰوةً أَلَا وَهِيَ الْوِتْرُ فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ. ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, উক্ত হাদীস দ্বারা বিভিন্নভাবে দলিল হতে পারে। এক. زيادت -এর نسبت আল্লাহর দিকে করা হয়েছে, আর সুন্নতের নিসবত রাসূলের দিকে করা হয়। সুতরাং যদি বিত্‌রের নামাজ সুন্নত হতো তবে হাদীসের মধ্যে আল্লাহর দিকে نسبت করার পরিবর্তে রাসূলের দিকে করা হতো। কিন্তু যেহেতু রাসূলের দিকে نسبت করা হয়নি সেহেতু বিত্‌রের নামাজ সুন্নত হবে না; বরং ওয়াজিব হবে। দুই. কোনো জিনিসের উপর زيادتي তখনই হয় যখন شئ مزيد عليه (যার উপর যিয়াদতী করা হয়) محدود العدد (নির্ধারিত পরিমাণ) হয়। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, নাওয়াফেল হলো غير محدود তথা অ-নির্ধারিত, যার কোনো সীমা নেই। সুতরাং زيادتي ফারায়িযের উপর হবে। কেননা এটিই محدود العدد নির্ধারিত। আর যেহেতু مزيد আর مزيد عليه এক جنس হওয়া জরুরি। এ জন্য এর চাহিদা হলো, ফারায়িযের উপর যার যিয়াদতী করা হয়েছে অর্থাৎ বিত্‌রের তাও ফরজ হবে। কিন্তু যেহেতু হাদীস খবরে ওয়াহিদ তাই তা دليل غير قطعي। আর دليل غير قطعي দ্বারা ওয়াজিব তো সাবিত হয় কিন্তু ফরজ সাবিত হয় না। এ জন্য সালাতুল বিত্‌র ওয়াজিব হবে। তিন. উপরোক্ত হাদীসের মধ্যে فصلوها - امر -এর সীগাহ এসেছে। আর আমর ওজূবের জন্য আসে। সুতরাং এর দ্বারাও বিত্‌রের ওয়াজিব হওয়া সাবিত হয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, বিত্‌র যেহেতু ওয়াজিব তাই তার কাযাও ওয়াজিব, অথচ সুন্নতের কাজা ওয়াজিব নয়। ইমাম সাহেবের সমর্থন নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اَلْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا – বিত্‌র হক ওয়াজিব। যে ব্যক্তি বিত্‌রের নামাজ পড়ল না সে আমাদের থেকে নয়। (আবূ দাউদ) মুসলিম শরীফে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস রয়েছে إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَوْتِرُوْا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوْا – রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, সকাল হওয়ার আগে আগেই বিত্‌র পড়ে নাও। উক্ত হাদীসে اوتروا – শব্দটি ও امر -এর সীগাহ যার দ্বারা ওয়াজিব সাবিত হয়।

সাহেবাঈন (র.)-এর পেশকৃত আকলী দলিলের জবাব হলো, বিত্‌র অস্বীকারকারী ব্যক্তি এ জন্য কাফির হয় না যে বিত্‌রের সুবূত হলো سنت غير متواتره দ্বারা (যা দ্বারা ওয়াজিব সাবিত হয়)। আর ইমাম সাহেব কর্তৃক বিতর সুন্নত হওয়ার যে কথাটি বর্ণিত আছে এর অর্থ হলো, বিত্‌রের সুবূত হলো সুন্নত দ্বারা। আর যেহেতু বিত্‌রের নামাজ ইশার ওয়াক্তে আদায় করা হয় সেহেতু ইশার আযান ও ইকামতকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। এ কারণে বিত্‌রের আলাদা কোনো আযান ও ইকামতের প্রয়োজন নেই। সাহেবাইনের পেশকৃত حديث اعرابي -এর জবাব হলো, এ হাদীসটি হলো বিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার পূর্বের হাদীস। আর ইবনে ওমরের হাদীস أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيْرِ -এর জবাবে ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, ইবনে ওমরের হাদীসটি حديث حنظله। (تعارض) حديث حنظله بن ابى سفيان عن نافع عن ابن عمر -এর সাথে বিরোধপূর্ণ -এর শব্দাবলি হলো, إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَيُوْتِرُ بِالْأَرْضِ وَيَزْعَمُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ ذٰلِكَ ইবনে ওমর তাঁর বাহনের উপর নামাজ পড়তেন কিন্তু বিত্‌র জমিনে পড়তেন। ইবনে ওমর বলেন, মহানবী ﷺ এমনটিই করেছেন। অর্থাৎ বিত্‌রের নামাজ জমিনের উপর আদায় করতেন। সুতরাং ইবনে ওমরের উভয় হাদীসে যেহেতু تعارض হয়ে গেল, তাই উভয়টিই ساقط হয়ে যাবে। কেননা إِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا দু'টো জিনিসে تعارض হলে উভয়টিই ساقط হয়ে যায়।

قَالَ الْوِتْرُ ثَلٰثُ رَكَعَاتٍ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ لِمَارَوَتْ عَائِشَةُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلٰثٍ وَحَكَى الْحَسَنُ (رح) إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى الثَّلٰثِ وَهٰذَا أَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ (رح) وَفِيْ قَوْلٍ يُوْتِرُ بِتَسْلِيْمَتَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (رح) وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا مَا رَوَيْنَا وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) بَعْدَهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَنَتَ فِيْ اٰخِرِ الْوِتْرِ وَهُوَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَلَنَا مَارُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَمَا زَادَ عَلٰى نِصْفِ الشَّيْءِ اٰخِرُهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিত্‌র হলো তিন রাকআত, যার মাঝে সালাম দ্বারা ব্যবধান করা হবে না। কেননা হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী ﷺ তিন রাকআতের বিতর আদায় করতেন। তদুপরি হাসান (র.) বিতরের তিন রাকআতের ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র.)-এরও একটি মত এটা। অন্যমতে বিত্‌র দুই সালামে আদায় করার কথা রয়েছে। ইমাম মালিক (র.)-এরও এই মত। আমাদের বর্ণিত হাদীস তাদের বিপক্ষে দলিল। আর বিতরের তৃতীয় রাকআতে রুকুর পূর্বে কুনূত পড়বে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, রুকুর পরে পড়বে। কেননা বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌রের শেষে কুনূত পড়েছেন, আর তা রুকুর পরেই হবে। আমাদের দলিল হলো বর্ণিত হাদীস যে, নবী করীম ﷺ রুকুর পূর্বে কুনূত পড়েছেন। আর যা অর্ধেকের বেশি, তাকে শেষাংশই বলা যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিত্‌রের রাকআতের সংখ্যার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে ইখ্‌তিলাফ রয়েছে এবং এর মধ্যেও ইখ্‌তিলাফ আছে যে, বিত্‌র এক সালামে হবে না দুই সালামে হবে? ওলামায়ে আহনাফের মতে বিত্‌র হলো তিন রাকআত এক সালামের সাথে। মাঝে অন্য আরেকটি সালাম দ্বারা ব্যবধান করা হবে না এ ব্যাপারে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দুটো রিওয়ায়াত রয়েছে। এক রিওয়ায়াত আহ্‌নাফের অনুরূপ। দ্বিতীয়টি হলো, বিত্‌র তিন রাকআত দুই সালামে আদায় করবে। এটাই ইমাম মালিক (র.) -এর মত। কেউ কেউ বলেন, বিত্‌র হলো এক রাকআত। এক রাকআতের প্রবক্তাদের দলিল হলো, ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস। হাদীসটি হলো, إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ صَلَاةَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَإِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً تُوْتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ - এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট صلاة الليل রাতের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দুই দুই রাকআত। যদি তোমার ভোর হয়ে যাবার আশংকা হয় তবে এক রাকআত পড়ে নিবে যা তোমার আদায়কৃত নামাজকে বিত্‌র করে দিবে। এমনিভাবে মুসলিম শরীফে ইবনে ওমর (রা.) থেকে مرفوعا বর্ণিত আছে যে, قَالَ مَنْ - اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ - শেষ রাতে বিত্‌র এক রাকআত। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ - রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে বিত্‌রের পাঁচ রাকআত পছন্দ করে সে তা করবে, আর যে এক রাকআত পছন্দ করে সে তা করবে। তাছাড়া বিত্‌র সম্পর্কে সাত, নয় এবং এগার রাকআতের বর্ণনাও রয়েছে।– (ইনায়া)

আমাদের দলিল : (১) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ - রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌র তিন রাকআত আদায় করতেন।

(২) হাসান বসরী (র.) বিতর তিন রাকআত এক সালামের উপর মুসলমানদের ইজমা নকল করেছেন। সুতরাং হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, قَالَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى أَنَّ الْوِتْرَ ثَلٰثٌ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِيْ اٰخِرِهِنَّ - মুসলমানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, বিতর তিন রাকআত। শুধু শেষ রাকআতে সালাম ফিরাবে।

(৩) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُسَلِّمُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ . আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌রের প্রথম দুই রাকআতে সালাম ফিরাতেন না।

(৪) ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلْثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ – রাতের বিত্‌র তিন রাকআত যেমন দিনের বিত্‌র তিন রাকআত। দিনের বিত্‌র দ্বারা মুরাদ হলো মাগরিবের নামাজ। –(ফাত্‌হুল কাদীর)

(৫) আবূ খালিদ বলেন, আমি আবুল আলিয়াকে বিত্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন,

عَلَّمَنَا اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْوِتْرَ مِثْلُ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ هٰذَا وِتْرُ اللَّيْلِ وَهٰذَا وِتْرُ النَّهَارِ .

আমাদেরকে আসহাবে রাসূল ﷺ তালীম দিয়েছেন যে, বিত্‌র মাগরিবের নামাজের অনুরূপ। এটা হলো রাতের বিত্‌র, আর ওটা অর্থাৎ মাগরিব হলো দিনের বিত্‌র। এর দ্বারা বুঝা গেল মাগরিবের নামাজের ন্যায় বিত্‌রও তিন রাকআত।

(৬) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِىْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَ فِى الثَّانِيَةِ قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ . রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌র তিন রাকআত পড়তেন। প্রথম রাকআতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى দ্বিতীয় রাকআতে قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ এবং তৃতীয় রাকআতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ও مُعَوِّذَتَيْنِ তথা সূরায়ে ফালাক ও নাস পড়তেন।

(৭) মশহুর একটি আছর (اثر) আছে, نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبُتَيْرَاءِ – রাসূলুল্লাহ ﷺ صلوة بتيرا তথা এক রাক্‌আত নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন।

যারা বিত্‌রের এক রাকআতের প্রবক্তা তাদের পেশকৃত হাদীসে ইবনে ওমরের জবাব ইমাম তাহাবী -এর মতে হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর قول فصل ركعة -এর অর্থ হলো, صَلِّ رَكْعَةً مَعَ ثِنْتَيْنِ قَبْلَهَا – অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এর পূর্বের দুই রাকআতের সাথে মিলিয়ে আরো এক রাকআত পড়বে। সুতরাং এখন মোট তিন রাকআত হলো, এক রাকআত নয়। দ্বিতীয় জবাব হলো, এক, পাঁচ, সাত, নয় কিংবা এগার রাকআতের রিওয়ায়াতগুলো হলো استقرار وتر তথা বিত্‌রের রাকআত নির্ধারিত হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। কিন্তু পরে যখন বিত্‌র তিন রাকআত সাব্যস্ত হয়ে যায় তখন অন্যান্য রাকাআতগুলো মানসূখ হয়ে যায়।

قَوْلُهٗ وَيَقْنُتُ فِى الثَّالِثَةِ الخ : উপরোক্ত ইবারতে দু'আয়ে কুনূতের মহল -এর আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের মতে দু'আয়ে কুনূতের মহল হলো রুকুর পূর্বে। আর শাওয়াফেদের মতে রুকুর পরে। শাওয়াফেদের দলিল হলো, اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَنَتَ فِىْ اٰخِرِ الْوِتْرِ রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌রের শেষে কুনূত পড়তেন। আর বিত্‌রের শেষ রুকুর পরই হয়ে থাকবে। সুতরাং কুনূতও রুকুর পরে পড়া হবে। আমাদের দলিল হলো উবাই ইবনে কা'ব (র.)-এর রিওয়ায়াত اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌র পড়তেন। আর কুনূত রুকুর পূর্বে পড়তেন। হিদায়া গ্রন্থকার হাদীসের যে আলফায নকল করেছেন তা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তা ছাড়া আমাদের মাযহাবের সমর্থন নিম্নোক্ত বর্ণনা দ্বারাও হয় যে,

عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ سَأَلْتُ اَنَسًا عَنِ الْقُنُوْتِ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ اَكَانَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَهٗ قَالَ قَبْلَهٗ قُلْتُ فَاِنَّ فُلَانًا اَخْبَرَنِىْ عَنْكَ اَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهٗ قَالَ كَذَبَ اِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا .

আসিমে আহ্‌ওয়াল (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি হযরত আনাস (রা.)-কে قُنُوْتٌ فِى الصَّلٰوةِ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম রুকুর পূর্বে না পরে? তিনি বলেন, রুকুর পূর্বে। আমি বললাম অমুক আমাকে আপনার পক্ষ থেকে এ খবর দিয়েছে যে, আপনি বলেছেন যে, তা রুকুর পরে। আনাস (রা.) বলেন, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু একমাস রুকুর পর কুনূত পড়েছেন। এ হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা গেল যে, কুনূত রুকুর পূর্বে, রুকুর পরে নয়। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর পেশকৃত দলিলের জবাব হলো, হাদীসের মধ্যে قَنَتَ فِىْ اٰخِرِ الْوِتْرِ -এর আলফায এসেছে। উল্লেখ্য যে, কোনো জিনিসের অর্ধেকের বেশি যা হয় তার উপর اخر শব্দটি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। সুতরাং তৃতীয় রাকআতের রুকুর পূর্বের অবস্থার উপরও اخر বিত্‌রের শব্দটি প্রয়োগ করা সহীহ আছে। সুতরাং এ হাদীসও আমাদের খেলাফ হবে না।

وَيَقْنُتُ فِيْ جَمِيْعِ السَّنَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيْ (رح) فِيْ غَيْرِ النِّصْفِ الْاَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِيْنَ عَلَّمَهُ دُعَاءَ الْقُنُوْتِ اِجْعَلْ هٰذَا فِيْ وِتْرِكَ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَيَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَاقْرَؤُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَاِنْ اَرَادَ اَنْ يَقْنُتَ كَبَّرَ لِاَنَّ الْحَالَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَنَتَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاتُرْفَعُ الْاَيْدِىْ اِلَّا فِيْ سَبْعِ مَوَاطِنَ ذَكَرَمِنْهَا الْقُنُوْتَ وَلَايَقْنُتُ فِيْ صَلٰوةٍ غَيْرِهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيْ فِي الْفَجْرِ لِمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَنَتَ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ فَاِنْ قَنَتَ الْاِمَامُ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ يَسْكُتُ مَنْ خَلْفَهُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) يَتَّبِعُهُ لِاَنَّهُ تَبَعٌ لِاِمَامِهِ وَالْقُنُوْتُ فِي الْفَجْرِ مُجْتَهَدٌ فِيْهِ وَلَهُمَا اَنَّهُ مَنْسُوْخٌ وَلَامُتَابَعَةَ فِيْهِ ثُمَّ قِيْلَ يَقِفُ قَائِمًا لِيُتَابِعَهُ فِيْمَا تَجِبُ مُتَابَعَتُهُ وَقِيْلَ يَقْعُدُ تَحْقِيْقًا لِلْمُخَالَفَةِ لِاَنَّ السَّاكِتَ شَرِيْكُ الدَّاعِىْ وَالْاَوَّلُ اَظْهَرُ وَ دَلَّتِ الْمَسْاَلَةُ عَلٰى جَوَازِ الْاِقْتِدَاءِ بِالشَّافِعِيَّةِ وَعَلَى الْمُتَابَعَةِ فِيْ قِرَاءَةِ الْقُنُوْتِ فِي الْوِتْرِ وَاِذَا عَلِمَ الْمُقْتَدِىْ مِنْهُ مَايَزْعَمُ بِهِ فَسَادُ صَلَاتِهِ كَالْفَصْدِ وَ غَيْرِهِ لَايُجْزِئُهُ الْاِقْتِدَاءُ بِهِ وَالْمُخْتَارُ فِي الْقُنُوْتِ الْاِخْفَاءُ لِاَنَّهُ دُعَاءٌ۔

অনুবাদ ঃ সারা বছরই কুনূত পড়া হবে। রামজানের শেষার্ধ ছাড়া অন্য সময়ের ব্যাপারে ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর ভিন্নমত রয়েছে। কেননা হাসান ইবনে আলী (রা.)-কে কুনূতের দোয়া শিক্ষা দেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اِجْعَلْ هٰذَا فِيْ وِتْرِكَ এটা তোমার বিত্‌রের মধ্যে পড়বে, একথা তিনি কোনো তাফসীল ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। বিত্‌রের প্রত্যেক রাকআতে সুরাতুল ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَاقْرَؤُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ কুরআনের যে অংশ তোমাদের জন্য সহজ হয় পড়বে। আর যখন কুনূত পড়ার ইচ্ছা করবে তখন তাকবীর বলবে। কেননা অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে । আর উভয় হাত উঠাবে এবং কুনূত পড়বে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাতটি ক্ষেত্র ব্যতীত কোথাও হাত উঠানো হবে না। তন্মধ্যে কুনূতের কথাও তিনি বলেছেন। এছাড়া অন্য কোনো নামাজে কুনূত পড়বে না। ফজরের ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। কেননা ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজে কুনূত পড়েছেন, পরে তা ছেড়ে দিয়েছেন। ইমাম যদি ফজরের নামাজে কুনূত পড়েন তবে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার মুক্তাদীরা নীরব থাকবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবে (অর্থাৎ কুনূত পড়বে)। কেননা সে তার ইমামের অনুগত। আর ফজরে কুনূত পড়ার বিষয়টি ইজ্‌তিহাদ নির্ভর। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো, ফজরের কুনূত রহিত হয়ে গেছে। আর যা রহিত হয়ে গেছে, তা অনুসরণযোগ্য নয়। তবে কথিত আছে যে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে যেন যে বিষয়ে ইমামের অনুসরণ আবশ্যক, সে বিষয়ে যথাসম্ভব ইমামের অনুসরণ বজায় থাকে। অন্য মতে মতভিন্নতা সাব্যস্ত করার জন্য বসা অবস্থায় থাকবে। কেননা নীরবতা অবলম্বনকারী আহ্বানকারীর সাথে শরিক বলেই গণ্য হয়ে থাকে। তবে প্রথম মতটি অধিক যুক্তিযুক্ত। এ মাসআলাটি শাফি'ঈ মাযহাব অনুসারীদের পিছনে ইক্‌তিদার বৈধতা এবং বিত্‌রে কুনূত পড়ার ক্ষেত্রে

অনুসরণের বৈধতা প্রমাণ করে। মুক্তাদী যদি ইমামের পক্ষে থেকে এমন কিছু দেখতে পায়, যাতে সে ইমামের নামাজ ফাসিদ মনে করে, যেমন সিঙ্গা লাগানো ইত্যাদি তাহলে তার পিছনে ইকতিদা করা জায়েজ নয়। কুনূতের ক্ষেত্রে পছন্দনীয় হলো তা নীরবে পড়া, কেননা এটা দোয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের মতে বিত্‌রের মধ্যে সারা বছর দোয়ায়ে কুনূত পড়া ওয়াজিব। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে শুধু রমজানের শেষার্ধে দোয়ায়ে কুনূত পড়া মোস্তাহাব। আর পুরো বছর কারাহাত ছাড়াই জায়েজ। (আইনুল হিদায়া) ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর দলিল হলো, إِنَّ عُمَرَ أَمَرَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ بِالْإِمَامَةِ فِيْ لَيَالِ رَمَضَانَ وَأَمَرَ بِالْقُنُوْتِ فِي النِّصْفِ الْأَخِيْرِ مِنْهُ.

হযরত ওমর (রা.) উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে রমজানের রাতে ইমামত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর রমজানের শেষার্ধে দোয়ায়ে কুনূত পড়তে বলেছেন। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাসান ইবনে আলীকে দোয়ায়ে কুনূতের তালীম দিয়েছেন। পরে বলেছেন اِجْعَلْ هٰذَا فِيْ وِتْرِكَ এ দোয়াকে তোমার বিত্‌রের মধ্যে পড়বে। এর মধ্যে রমজান কিংবা গায়রে রমজানের কোনো তাফসিল করা হয়নি। সুতরাং সারা বছরই দোয়ায়ে কুনূত পড়তে হবে।

. ইমাম শাফিঈ (র.)-এর পেশকৃত اثر ابن عمر -এর জবাব হলো, قنوت দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নামাজের মধ্যে طول قراءة তথা দীর্ঘ কিরাআত পড়া অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.) উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে রমজানের শেষার্ধে দীর্ঘ কিরাআত -এর নির্দেশ দিয়েছেন। এ জবাবের পর উপরোক্ত আছর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হয় না। আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, قنوت দ্বারা দোয়ায় কুনূত মুরাদ, দীর্ঘ কিরাআত মুরাদ নয় তাহলে আমরা জবাবে বলব, এটা সাহাবীর আছর (اثر) আর ইমাম শাফি'ঈ (র.) اثر صحابى -কে দলিলযোগ্য মনে করেন না। কাজেই এ হাদীস ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পক্ষে দলিল হতে পারবে না। তবে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর পক্ষ থেকে এ কথা বলা হয় যে, এই اثر টি দলিলযোগ্য এ কারণে যে, এখানে معنى اجماع হয়েছে। কেননা উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বিশাল জামাআতের উপস্থিতিতে ইমামত করতেন। আর কোনো সাহাবী থেকে এর উপর কোনো ইনকার পাওয়া যায়নি এ জন্য এটা اجماع -এর সদৃশ। এর জবাবে আমরা বলব, ইবনে ওমর থেকে ইখ্‌তিলাফ তথা ভিন্ন মত পাওয়া যায়। কেননা ইবনে ওমর (রা.) বলেন, لَا أَعْرِفُ الْقُنُوْتَ إِلَّا طُوْلَ الْقِيَامِ আমার মতে طول قيام ব্যতীত কুনূতের ভিন্ন কোনো অর্থ নেই। সুতরাং ইবনে ওমরের ইখ্‌তিলাফ থাকা অবস্থায় ইজমা কিভাবে হয়?

قَوْلُهُ وَيَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ الخ : বিত্‌রের প্রত্যেক রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা পড়া এবং অন্য একটি সূরা মিলানো সকলের মতে ওয়াজিব। সাহেবাইনের মতে তো এ কারণে যে, বিত্‌র হলো সুন্নত। আর সুন্নত ও নফলের প্রত্যেক রাকআতে কিরাআত পড়তে হয়। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিত্‌র যদিও ওয়াজিব; কিন্তু যেহেতু বিত্‌রের উজূবের সুবূত হলো সুন্নত দ্বারা, এর দ্বারা ইয়াকীনের ফায়িদা হয় না, তাই বিতরের ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ রয়ে গেল। সুতরাং সতর্কতা বশত ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রত্যেক রাকআতে কিরাআত পড়াকে ওয়াজিব বলেছেন, যেমন সুন্নত ও নফলের প্রত্যেক রাকআতে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। হিদায়া গ্রন্থকারের আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ দ্বারা مطلق কিরাআতের উজূবের উপর তো দলিল হয়, কিন্তু সূরায়ে ফাতিহার تعيين এবং সূরা মিলানোর تعيين -এর উপর দলিল হয় না।

قَوْلُهُ وَاِنْ أَرَادَ أَنْ يَقْنُتَ كَبَّرَ الخ : তৃতীয় রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা পড়া এবং সূরা মিলানোর পর যখন দোয়ায়ে কুনূত পড়ার ইরাদা করবে তখন উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাবে। তাকবীর বলবে, তারপর দোয়ায়ে কুনূত পড়বে। তাকবীর বলা ওয়াজিব। দলিল হলো, মুসল্লীর হালাতের পরিবর্তন ঘটেছে। কেননা সে প্রথমে حقيقت قراءة -এ মশগুল ছিল আর এখন شبه قراءة তথা দোয়ায়ে কুনূতে মশগুল হলো। আর যেহেতু তাকবীরকে প্রবর্তন করা হয়েছে হালাত পরিবর্তনের সময়, তাই এখানেও তাকবীর বলা ওয়াজিব। তবে এ দলিলের উপর কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন যে, তাকবীর তো তখন شروع করা হয়েছে যখন افعال -এর ভিতর পরিবর্তন হয় অর্থাৎ এক فعل থেকে অন্য فعل -এর দিকে প্রত্যাবর্তনের সময়। যেমন, ঝুঁকার সময় এবং উঠার সময় তাকবীর বলা হয়। اقوال -এর মধ্যে ইখ্‌তিলাফের সময় তাকবীর তো مشروع হয়নি। যেমন,

মুসল্লী যখন ছানা শেষ করে কিরাআত শুরু করে তখন তাকবীর বলা হয় না অথচ ছানা থেকে কিরাআতের দিকে হালাত পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল اقوال ও احوال -এর ইখতিলাফের সময় তাকবীর বলা مشروع নয়; বরং افعال -এর ইখতিলাফের সময় তাকবীরকে مشروع করা হয়েছে। এর জবাব হলো, এ হালাতে হাত উঠানো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী لَاتُرْفَعُ الْاَيْدِيْ اِلَّا فِيْ سَبْعِ مَوَاطِنَ দ্বারা সাবিত।

আর নামাজের মাঝখানে হাত উঠানোর কোনো সুরত নেই। যেমনটি আছে, تكبير افتتاح ও تكبيرات عيدين -এর মধ্যে। সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা তাকবীর বলাও সাবিত হয়। وَلَايَقْنُتُ فِيْ صَلٰوةٍ غَيْرِهَا ওলামায়ে আহনাফের মতে বিত্‌র ব্যতীত অন্য কোনো নামাজে কুনূত নেই। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, ফজরের নামাজে কুনূত সুন্নত। আবূ নসর বাগদাদী বলেন, ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর মতে ফজরের নামাজে কুনূত পড়া সুন্নত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর দলিল হলো হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস- كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْنُتُ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ اِلٰى اَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজে কুনূত পড়তেন। এমনকি (এ অবস্থায় তিনি) ইহধাম ত্যাগ করলেন। আহনাফের দলিল, ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীস- اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى حَيٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাস পর্যন্ত ফজরের নামাজে কুনূত পড়েছেন। (এতে তিনি) আরবের জনৈক গোত্রের জন্য বদ দোয়া করতেন।

স্বয়ং আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা রয়েছে যে, قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ شَهْرًا اَوْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا عَلٰى اَهْلِ ذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ حِيْنَ قَتَلُوا الْقُرَّاءَ وَهُمْ سَبْعُوْنَ رَجُلًا اَوْ ثَمَانُوْنَ রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাস কিংবা চল্লিশ দিন পর্যন্ত কুনূত পড়েছেন। উদ্দেশ্য ছিল ঐ সকল লোকদেরকে বদ্ দোয়া করা যারা সত্তর কিংবা আশিজন কারীকে শহীদ করেছিল। এ হাদীস দ্বারাও বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজে মাত্র কিছু দিন ব্যতীত দোয়ায়ে কুনূত পড়েননি। আবূ ওসমান নাহ্দী বলেন, صَلَّيْتُ خَلْفَ اَبِيْ بَكْرٍ (رض) سَنَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ (رض) كَذٰلِكَ فَلَمْ اَرَ وَاحِدًا مِنْهُمَا يَقْنُتُ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ আমি হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.) -এর পিছনে দুই বছরকাল নামাজ পড়েছি তাদের কাউকে ফজরের নামাজে কুনূত পড়তে দেখিনি।

قَوْلُهُ فَاِنْ قَنَتَ الْاِمَامُ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ الخ : যদি شافعى المسلك ইমাম ফজরের নামাজে দোয়ায়ে কুনূত পড়ে আর মুক্তাদী حنفى المذهب হয়, তবে তরফাইনের মতে حنفى المسلك মুক্তাদী নীরব থাকবে, কুনূত পড়বে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ইমামের অনুসরণ করবে অর্থাৎ حنفى المسلك মুক্তাদীও কুনূত পড়বে। ইমামে আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, মুক্তাদী অবশ্যই ইমামের অনুগত। আসল (اصل) হলো, মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবে। আর ফজরের নামাজে কুনূত পড়ার বিষয়টি বিরোধপূর্ণ (مختلف فيه)। কেননা কারো মতে ফজরের নামাজে কুনূত পড়া সুন্নত, আবার কারো মতে ফজরের নামাজে কুনূত পড়া সুন্নত ছিল কিন্তু পরে রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং উপরোক্ত ইখতিলাফের কারণে ফজরের নামাজে কুনূত পড়া বা না পড়া মাশকূক এবং মুহ্তামাল (محتمل)। আর আসল اصل রয়েছে اَلْيَقِيْنُ لَايَزُوْلُ بِالشَّكِّ সন্দেহ দ্বারা ইয়াকীন দূরীভূত হয় না। এ জন্য ইমামের অনুসরণ করাকে তরক করা যাবে না স্বয়ং ইমামের অনুসরণ করে حنفى المسلك মুক্তাদীও কুনূত পড়বে।

তরফাইন (র.) -এর দলিল হলো, ফজরের নামাজে কুনূত পড়ার বিধান রহিত হয়ে গেছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজে দীর্ঘ একমাস কুনূত পড়েছিলেন কিন্তু পরে তা তিনি ছেড়ে দেন। আর যা রহিত হয়ে গেছে তা অনুসরণযোগ্য নয়। এ জন্য حنفى المسلك মুক্তাদী কুনূত পড়ার সময় ইমামের অনুসরণ করবে না বরং নীরব থাকবে।

তবে যেহেতু তারা ইমামের অনুসরণ করবে না তখন কি করবে? এ বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মুক্তাদীগণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে, তাহলে যে জিনিসের মধ্যে অনুসরণ করা ওয়াজিব তার অনুসরণ হয়ে যায় আর তা হলো قنوت ও قيام অর্থাৎ حنفى المسلك মুক্তাদী قيام -এর ক্ষেত্রে স্বীয় ইমামের অনুসরণ করবে। আর কুনূতের মধ্যে অনুসরণ করবে না। আবার কেউ কেউ বলেন, যখন شافعى المسلك ইমাম কুনূত পড়া শুরু করে দিবে তখন حنفى المسلك মুক্তাদী বসে যাবে, তাহলে ইমামের পরিপূর্ণ মুখালাফাত হবে। কেননা নীরব থাকা ব্যক্তিকে দোয়াকারীর শরিক মনে করা হয়। যেমন মুক্তাদী কিরাআত পড়ে না বরং নীরব থাকে এতদসত্ত্বেও সে কিরাআতের মধ্যে ইমামের সাথে শরিক আছে

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, قَوْلٌ أَوْلَ اظْهَرُ অর্থাৎ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকাই উত্তম। ইনায়া গ্রন্থকার এর কারণ (وجه اظهر) বয়ান করেছেন যে, ইমামের ফে'ল مشروع ও غَيْر مَشْرُوْع উভয়টিকে শামিল করে। সুতরাং قيام যা مشروع তাতে ইমামের অনুসরণ করবে আর কুনূত যা غَيْر مَشْرُوْع তাতে অনুসরণ করবে না; বরং নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবে। عَيْنُ الْهِدَايَةِ তে উল্লেখ রয়েছে যে, قَوْلٌ أَوْلَ اظْهَرُ এ কারণে যে, নামাজের মধ্যে ইমামের মুখালাফাত (مخالفات) করা যদিও কোনো রোকন বা শর্তে না হয় তথাপিও তা দুই কারণে অনুচিত। এক. এ ধরনের কাজ ইকতিদার শান ও মানের খিলাফ। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ইমাম তো এ জন্যই যে তার অনুসরণ করা হবে। দুই. এ কাজটি যদিও অধিক না হওয়ার দরুন বিনষ্টকারী নয় কিন্তু অল্প হলেও তা মাকরূহ। কেউ কেউ বলেছেন, যখন ইমাম কুনূত পড়বে তখন حنفى المذهب মুক্তাদী বসে আত্তাহিয়্যাতু ইত্যাদি পড়ে ইমামের পূর্বেই সালাম ফিরিয়ে দিবে। কেননা ইমাম حنفى المسلك মুক্তাদীর নিকট বিদ'আতে মশগুল হয়ে গেছে তাই তার অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই। হিদায়া গ্রন্থকার এ মতটি উল্লেখ করেননি। কেননা এ সুরতে সালাম যা امر مشروع তার মধ্যে ইমামের বিরোধিতা করা লাযিম আসে।

قَوْلُهُ وَ دَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى جَوَازِ الْاِقْتِدَاءِ الخ : উক্ত বাক্যটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ কথা বয়ান করা যে, উপরোক্ত মাসআলাটি দু'টো জিনিসকে বুঝায়। এক. حنفى المذهب-এর ইক্তিদা شافعى المذهب-এর পিছনে জায়েজ আছে। এমনিভাবে মালিকী এবং হাম্বলীর পিছনেও জায়েজ। দুই. মুক্তাদী বিত্‌রের কুনূতে তার ইমামের অনুসরণ করবে। কেননা ইখতিলাফ হলো ফজরের কুনূতে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে, বিত্‌রের কুনূতের ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং যেখানে কুনূতে মাসনূন বরং ওয়াজিব সেখানে মুক্তাদী নীরব থাকবে না; বরং কুনূত পড়বে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যদি حنفى المسلك মুক্তাদী তার شافعى المسلك ইমাম সম্পর্কে ইয়াকীনীভাবে আহনাফের মাযহাব অনুযায়ী তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়, তবে ঐ হানাফী মুক্তাদীর জন্য তার ইকতিদা করা জায়েজ নেই। যেমন, شافعى المسلك ইমাম অজু করল, পরে সে শিঙ্গা লাগাল এবং এতে রক্ত বের হল কিন্তু সে পুনরায় অজু করল না। এ অবস্থায় হানাফী মুক্তাদীর জন্য তার পিছনে ইকতিদা করা জায়েজ হবে না। কেননা ইহা যদিও শাওয়াফেদের মতে অজু ভঙ্গকারী নয়, কিন্তু আহনাফের মতে অজু ভঙ্গকারী। এ জন্য حنفى المذهب মুক্তাদীর ধারণা মতে ইমাম হলো মুহদাস। আর মুহ্‌দাসের পিছনে ইক্তিদা করা জায়েজ নেই।

গ্রন্থকার বলেন, কুনূতের মধ্যে ইখ্‌ফা হলো মুখতার। চাই কুনূত পড়নেওয়ালা ইমাম হোক বা মুক্তাদী হোক বা মুনফারিদ হোক। কেননা কুনূত হলো দোয়া। আর দোয়ার মধ্যে ইখফা (নীরবে) উত্তম। কেউ কেউ বলেছেন, কুনূত জোরে জোরে পড়বে। কেননা কুনূত হলো কুরআনের অনুরূপ। এ কারণেই اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ-এর ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম ইখতিলাফ করেছেন যে, এটা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত কিনা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মত হলো কুনূত কুরআনের একটি সূরা। উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, কুরআন নয়। অধিকাংশ ওলামাদের মতও এটাই। তবে সতর্কতার তাকাযা হলো হলো, হায়িযা, নুফাসা এবং জুনুবী ব্যক্তি কুরআন পড়া থেকে বিরত থাকবে।

ফায়িদা ঃ কিফায়া গ্রন্থকার লিখেছেন, হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত দোয়ায়ে কুনূতই সবচেয়ে দীর্ঘ দোয়ায়ে কুনূত। তা হলো এই–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ ـ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ اَهْلِ الْكِتٰبِ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَاءَكَ اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَ زَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لَاتَرُدُّهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

কোনো কোনো বর্ণনায় اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ দ্বারা দোয়ায়ে কুনূত আরম্ভ করা হয়েছে।

بَابُ النَّوَافِلِ

اَلسُّنَّةُ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَاَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَانِ وَاَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ وَاِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَاَرْبَعٌ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَاَرْبَعٌ بَعْدَهَا وَاِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ ثَابَرَ عَلٰى ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَفَسَّرَ عَلٰى نَحْوِمَا ذُكِرَ فِى الْكِتَابِ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْاَرْبَعَ قَبْلَ الْعَصْرِ فَلِهٰذَا اسَمَّاهُ فِى الْاَصْلِ حَسَنًا وَخَيَّرَ لِاِخْتِلَافِ الْاٰثَارِ وَالْاَفْضَلُ هُوَ الْاَرْبَعُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْاَرْبَعَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَلِهٰذَا كَانَ مُسْتَحَبًّا لِعَدَمِ الْمُوَاظَبَةِ وَذُكِرَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَفِىْ غَيْرِهٖ ذُكِرَ الْاَرْبَعُ فَلِهٰذَا خُيِّرَ اِلَّا اَنَّ الْاَرْبَعَ اَفْضَلُ خُصُوْصًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ عَلٰى مَاعُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهٖ وَالْاَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَنَا كَذَا قَالَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِىْ -

পরিচ্ছেদ ঃ নফল নামাজ

অনুবাদ : সুন্নত নামাজ ফজরের পূর্বে দু'রাকআত। যুহরের পূর্বে চার রাকাআত এবং তারপর দু'রাকআত এবং আসরের পূর্বে চার রাকআত, তবে ইচ্ছা করলে দু'রাকআত এবং মাগরিবের পরে দু'রাকআত এবং ঈশার পূর্বে চার রাকআত এবং ইশার পরে চার রাকআত, তবে ইচ্ছা করলে দু'রাকআত। এ সম্পর্কে মূলভিত্তি হলো রাসূল ﷺ-এর হাদীস-"যে ব্যক্তি দিনে ও রাত্রে বার রাকআত সুন্নত নামাজ নিষ্ঠার সাথে আদায় করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।" এরপর রাসূল ﷺ ঐ ভাবেই তাফসীর করেছেন। যেভাবে (মবসূত) কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে আসরের পূর্ববর্তী চার রাকআতের কথা হাদীসে উল্লেখ নেই। এ কারণেই (ইমাম মুহাম্মদ (র.) আল আসল (মবসূত) নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার (র.) একে (সুন্নতের পরিবর্তে) হাসান বা উত্তম বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই চার রাকআত পড়া না পড়ার ইখতিয়ার দিয়েছেন এ সম্পর্কে হাদীস বিভিন্ন রকমের হওয়ায়। তবে চার রাকাআতই উত্তম। ঈশার পূর্ববর্তী চার রাকআতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এজন্যই عَدَمِ مُوَاظَبَة তথা নিয়মিত ভাবে আদায় না করার কারণে এটাকে মোসতাহাব ধরা হয়েছে। তদ্রূপ আলোচ্য হাদীসে ঈশার পরে দু রাকআতের কথা বলা হয়েছে। এ জন্য ইমাম কুদূরী (র.) "ইচ্ছা করলে" কথাটি বলেছেন- তবে চার রাকআতই উত্তম। বিশেষতঃ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সুপরিচিত মত অনুসারে। (কেননা তাঁর মতে রাত্রে এক সালামে চার রাকাআত আদায় করা উত্তম)। আর যুহরের পূর্বের চার রাকআত আমাদের মতে এক সালামে আদায় করা উত্তম। যেমন (ইমাম আবূ দাউদ বর্ণিত হাদীসে) রাসূল ﷺ আবূ আইয়ুব আনসারী (রা.)-কে বলেছেন। এ বিষয়ে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর ভিন্ন অভিমত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা ঃ পূর্বে ফরজ এবং ওয়াজিব নামাজের আলোচনা ছিল এখানে সুন্নত এবং নফলের আলোচনা শুরু করা হয়েছে। নফল ফরজ ব্যতীত অন্যান্য সব ইবাদতকে শামিল করে এবং সুন্নতকেও শামিল করে বিধায় শিরোনামে শুধু নফল এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সুন্নতের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

হিদায়া গ্রন্থকার এ অধ্যায়ে যদিও সুন্নত এবং নফল উভয়ের আলোচনা করেছেন, তবে গুরুত্ব এবং মর্যাদার বিবেচনায় সুন্নতের আলোচনা পূর্বে এনেছেন। সুন্নত দু'প্রকার– এক. মুয়াক্কাদা (مؤكده) দুই. গায়রে মুয়াক্কাদা (غير مؤكده)

মুয়াক্কাদা ঃ ঐ সুন্নতকে বলা হয়, যা মহানবী ﷺ সর্বদা পড়েছেন তবে কখনো তিনি তা ছেড়েও দিয়েছেন।

গায়র মুয়াক্কাদা ঃ ঐ সুন্নতকে বলা হয়, যা মহানবী ﷺ সর্বদা পড়েননি। সুন্নতে মুয়াক্কাদা বার রাকআত। ফজরের পূর্বে দুই রাকআত যুহরের পূর্বে চার রাকআত এবং তারপরে দুই রাকআত। মাগরিবের পরে দুই রাকআত। ঈশার পর দুই রাকআত এছাড়া অন্যান্য সব নামাজ সুন্নতে গায়র মুয়াক্কাদা। কুদূরী গ্রন্থকার মুয়াক্কাদা এবং গায়র মুয়াক্কাদা এর আলোচনা এভাবে করেছেন যে, ফজরের পূর্বে দুই রাকআত যুহরের পূর্বে চার রাকআত তারপর দুই রাকআত, আসরের পূর্বে চার রাকআত, ইচ্ছা করলে দুই রাকআত। মাগরিবের পর দুই রাকআত। ঈশার পূর্বে চার রাকআত এবং ঈশার পরে চার রাকআত ইচ্ছা করলে দুই রাকআত।

প্রশ্ন ঃ কুদূরী গ্রন্থকার আলোচনার সূচনা ফজরের সুন্নত দ্বারা কেন করলেন?

জবাব ঃ ফজরের সুন্নত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল ﷺ ফজরের সুন্নতের গুরুত্ব সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন– صَلُّوهَا وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ অর্থ– তোমরা ফজরের সুন্নত পড়তে থাকো যদিও ঘোড়া তোমাদেরকে পাড়িয়ে যায়। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি ফজরের সুন্নত কোনো ওজর ব্যতীত বসে পড়ে তাহলে তা জায়েজ হবে না। ওলামা ও মাশায়িখে কেরাম লেখেছেন, কোনো আলিমকে যদি লোকেরা ব্যাপকহারে ফতোয়া এবং শরয়ী মাস্‌আলা জিজ্ঞাসাবাদ করে তাহলে লোকদের জরুরতের প্রেক্ষিতে তার জন্য সকল সুন্নত তরক করা জায়েজ আছে ফজরের সুন্নত ব্যতীত। এর দ্বারাও ফজরের সুন্নতের গুরুত্ব প্রতিভাত হয়। ইনায়ার গ্রন্থকার ফজরের সুন্নতের আলোচনা আগে আনার একটি কারণ বর্ণনা করেছেন যে, সময়ই যেহেতু নামাজকে স্মরণ করিয়ে দেয় আর ফজরের সময়টি হল, সর্বাগ্রে, তাই ফজরের সুন্নতের আলোচনা অন্যান্য সুন্নতের আলোচনার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মবসূত নামক গ্রন্থে যুহরের সুন্নতের আলোচনা প্রথমে এনেছেন এবং এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, সুন্নত ফরজের তাবে (تابع), আর রাসূল ﷺ-এর উপর সর্বপ্রথম যুহরের নামাজ ফরজ হয়েছে বিধায় যুহরের সুন্নতের আলোচনা প্রথমে এনেছেন। ফজরের সুন্নতের পর কোন সুন্নতটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এ ব্যাপারে কিছু মতানৈক্য আছে। ইমাম হালওয়ানী (حلواني)-এর মতে ফজরের সুন্নতের পর মাগরিবের সুন্নত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রাসূল ﷺ মাগরিবের সুন্নত সফরে এবং বাড়িতে কখনো ছাড়েননি। অতঃপর তিনি (হালওয়ানী (র.)) বলেছেন, যে মাগরিবের সুন্নতের পর যুহরের সুন্নত অধিক গুরুত্বপূর্ণ, এর কারণ উল্লেখ করে বলেন যে, যুহরের পরের সুন্নত সর্বসম্মতি ক্রমে সুন্নত এবং যুহরের পূর্বের সুন্নত মতানৈক আছে। অতঃপর তিনি বলেছেন যে, যুহরের সুন্নতের পর ঈশার পরের সুন্নত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতঃপর যুহরের পূর্বের সুন্নতের স্থান। অতঃপর আসরের পূর্বের সুন্নতের স্থান অতঃপর ঈশার পূর্বের সুন্নতের স্থান।

কোনো আলিমের মতে ফজরের সুন্নতের পর যুহরের পূর্বের সুন্নত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ মতই অধিক বিশুদ্ধ। কেননা তাহা তরক করার ক্ষেত্রে ধমকী এসেছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

مَنْ تَرَكَ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ تَنَلْهُ شَفَاعَتِيْ .

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নত তরক করবে, সে আমার শাফাআত পাবে না। আল্লামা হালওয়ানী (র.) এ কথাও বলেছেন যে, তারাবীহ ব্যতীত অন্যান্য সুন্নতসমূহ ঘরে পড়া উত্তম, কেননা তারাবীহ-এর ক্ষেত্রে সকল সাহাবাদের ঐকমত্য হলো যে, তারা তারাবীহ-এর নামাজ মসজিদে পড়তেন– (ইনায়া) হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন যে, উক্ত বার রাকআত সুন্নতে মুয়াক্কাদা হওয়ার ক্ষেত্রে মূলভিত্তি এবং দলিল হলো রাসূল ﷺ-এর বাণী–

عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ثَابَرَ عَلٰى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ـ

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন রাসূল বলেছেন, সে ব্যক্তি বার রাকাআত সুন্নত নামাজ সর্বদা আদায় করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে এক ঘর তৈরি করবেন। বার রাকাআত নামাজ হচ্ছে– চার রাকাআত যুহরের পূর্বে, তারপর দু রাকআত, দু রাকআত মাগরিবের পর, ঈশার পর দু রাকআত, এবং ফজরের পূর্বে দু রাকআত। ইমাম বুখারী (র.) ব্যতীত অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ সকলেই ঐ হাদীসকে নিম্নোক্ত শব্দে উম্মে হাবীবা বিন্‌তে আবী সুফিয়ান (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন

إِنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيْ لِلّٰهِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ إِلَّا بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ـ

অর্থ ঃ উম্মে হাবীবা (রা.) রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন– যে বান্দা ইখ্‌লাসের সাথে প্রতিদিন ফরজ নামাজ ব্যতিরেকে অতিরিক্ত বার রাকআত নামাজ আদায় করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য অবশ্যই জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, রাসূল ﷺ বার রাকআতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যা কিতাবের মতনে উল্লেখ আছে। তবে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আসরের পূর্বের চার রাকাআতের উল্লেখ নেই। এ কারণে ইমাম মুহাম্মদ (র.) মবসূত গ্রন্থে এ চার রাকআতকে মোসতাহাব আখ্যা দিয়েছেন এবং ইখ্‌তেয়ার দিয়েছেন যে আসরের পূর্বে চার রাকআত পড়া যায় এবং ইচ্ছা করলে দু' রাকআতও পড়া যায়। কেননা আসরের পূর্বের নামাজের রাকআতের ক্ষেত্রে রেওয়ায়েতের মধ্যে ইখতেলাফ আছে যেমন ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত আছে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً صَلّٰى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ـ

অর্থ ঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন। মহান আল্লাহ ঐ বান্দার উপর রহমত করুন, যে আসরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ পড়ে থাকে।

হযরত আলী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ অর্থ– রাসূল ﷺ আসরের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়তেন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে উত্তম হলো যে আসরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ পড়া। কেননা চার রাকআতের সংখ্যা অধিক এবং এতে তাহরীমা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত থাকবে। বিধায় দু রাকআতের তুলনায় চার রাকআত পড়ায় অধিক ছওয়াব হবে। বিজ্ঞ গ্রন্থকার বলেন যে, রাসূল ﷺ বার রাকআতের ব্যাখ্যার সময় ঈশার পূর্বে চার রাকআতের কথা উল্লেখ করেন নি। তাই এ চার রাকআত নামাজও মোস্‌তাহাবের পর্যায় ভুক্ত। কেননা তিনি ঐ চার রাকআত নামাজ সদা সর্বদা আদায় করেন নি। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন مَنْ ثَابَرَ الخ এ হাদীসে ঈশার পরে দুই রাকআতের কথা উল্লেখ হয়েছে, তবে উক্ত (مَنْ ثَابَرَ الخ) হাদীস ব্যতীত অন্যান্য হাদীসে চার রাকআতের উল্লেখ আছে।

যেমন বারা ইব্‌নে আযিব (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا كَانَ كَأَنَّمَا تَهَجَّدَ مِنْ لَيْلَتِهٖ وَمَنْ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَانَ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ـ

হযরত বারা ইব্‌নে আযিব (রা.) বলেছেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাকাআত নামাজ পড়ল, যেন সে রাত্রিভর ইবাদত করল এবং যে ব্যক্তি ঈশার নামাজের পর চার রাকআত নামাজ পড়ল, যেন সে লাইলাতুল কদরে চার রাকআত নামাজ আদায় করল। যেহেতু চার রাকআত এবং দুই রাকআতের হাদীসের শব্দের মধ্যে ইখতেলাফ আছে, এই জন্য ইমাম কুদূরী ইখতেয়ার দিয়েছেন– ঈশার পর চার রাকআত পড়তে পারে এবং দুই রাকআতও পড়তে পারে। তবে উত্তম হলো চার রাকআত পড়া। বিশষতঃ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং সাহেবাইন (র.) মাঝে একটি মূলনীতিতে ইখতেলাফ আছে তা হলো যে, ইমাম সাহেব এর মতে রাত্রের নামাজ চার রাকআত করে পড়া উত্তম। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে দু রাকআত করে পড়া উত্তম। উক্ত মূল নীতির ভিত্তিতে ইমাম সাহেবের মতে ঈশার পর চার রাকআত নামাজ পড়া উত্তম। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, আমাদের (হানাফীদের) মতে যুহরের পূর্বে চার রাকআত একই সঙ্গে আদায় করতে হবে। অতএব যদি কেউ উক্ত চার রাকআত নামাজ দুই সালামের সহিত আদায় করে তাহলে আমাদের মতে ঐ নামাজ জায়েজ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে উত্তম হলো দুই সালামের সাথে আদায় করা। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল–

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيهِنَّ بِتَسْلِيْمَتَيْنِ .

অর্থ রাসূল ﷺ উক্ত চার রাকআত নামাজ দুই সালামে আদায় করতেন। অন্য হাদীসের আছে

إِنَّ النَّبِيَّ الله ﷺ قَالَ صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى .

অর্থ ঃ রাসূল ﷺ বলেছেন, রাত্রের এবং দিনের নামাজ দুই দুই রাকআত করে।

আমাদের দলিল আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর হাদীস,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الزَّوَالِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ الصَّلاَةُ الَّتِيْ تُدَاوِمُ عَلَيْهَا فَقَالَ هٰذِهِ سَاعَةٌ تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ فَقُلْتُ فِيْ كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَبِتَسْلِيْمَةٍ أَمْ بِتَسْلِيْمَتَيْنِ قَالَ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ

অর্থ ঃ রাসূল ﷺ সূর্য হেলে যাওয়ার পরে চার রাকআত নামাজ পড়তেন। আমি (আবূ আইয়ুব আনসারী) বললাম, এ কোন নামাজ যা আপনি সর্বদা পড়ে আসছেন? উত্তরে তিনি বললেন, ইহা এমন মুহূর্ত যাতে আসমানের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। আমি পছন্দ করি যে, ঐ মূহূর্তে আমার নেক আমল উপরে উঠুক। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তিনি, প্রত্যেক রাকাতে কিরআত আছে কি? রাকআতে উত্তর দিলেন হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, এক সালামের সাথে না দুই সালামের সাথে? জবাবে তিনি বললেন, এক সালামের সাথে। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে যুহরের পূর্বে এক সালামের সাথে চার রাকআত সুন্নত। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর বর্ণিত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের উত্তর উক্ত হাদীসে تسليمتين দ্বারা تشهدين উদ্দেশ্য অর্থাৎ রাসূল ﷺ যুহরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ দুই تشهد (তাশাহহুদ) দ্বারা আদায় করতেন। হাদীসে হাল (حال) অর্থাৎ تسليم এর উল্লেখ করে মহল (محل) অর্থাৎ تشهد (তাশাহহুদ) উদ্দেশ্য করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, এ ব্যাখ্যা ফকীহুল উম্মত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় হাদীসের উত্তর – صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى -এর শব্দ মাশ্‌হুর বা প্রসিদ্ধ এবং والنهار-এর শব্দ গরীব বা বিরল যা দলিল হওয়ার যোগ্য নয়। অতএব এ হাদীসের দ্বারা যুহরের পূর্বে চার রাকআত দুই সালামে আদায় করার পক্ষে দলিল দেওয়া সহীহ হবে না।

قَالَ وَنَوَافِلُ النَّهَارِ اِنْ شَاءَ صَلَّى بِتَسْلِيْمَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَاِنْ شَاءَ اَرْبَعًا وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلٰى ذٰلِكَ فَاَمَّا نَافِلَةُ اللَّيْلِ قَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ اِنْ صَلَّى ثَمَنَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةٍ جَازَ وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلٰى ذٰلِكَ وَقَالَا لَايَزِيْدُ بِاللَّيْلِ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيْمَةٍ وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَانِىْ فِىْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ وَدَلِيْلُ الْكَرَاهَةِ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ وَلَوْلَا الْكَرَاهَةُ لَزَادَ تَعْلِيْمًا لِلْجَوَازِ وَالْاَفْضَلُ فِى اللَّيْلِ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ مَثْنٰى مَثْنٰى وَفِى النَّهَارِ اَرْبَعٌ اَرْبَعٌ وَعِنْدَ الشَّافِعِىْ فِيْهِمَا مَثْنٰى مَثْنٰى وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ فِيْهِمَا اَرْبَعٌ اَرْبَعٌ لِلشَّافِعِىْ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلٰوةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَلَهُمَا الْاِعْتِبَارُ بِالتَّرَاوِيْحِ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْعِشَاءِ اَرْبَعًا رَوَتْهُ عَائِشَةُ (رض) وَكَانَ يُوَاظِبُ عَلَى الْاَرْبَعِ فِى الضُّحٰى وَلِاَنَّهٗ اَدْوَمُ تَحْرِيْمَةً فَيَكُوْنُ اَكْثَرَ مَشَقَّةً وَاَزْيَدَ فَضِيْلَةً وَلِهٰذَا لَوْنَذَرَ اَنْ يُّصَلِّىَ اَرْبَعًا بِتَسْلِيْمَةٍ لَايَخْرُجُ عَنْهُ بِتَسْلِيْمَتَيْنِ وَعَلَى الْقَلْبِ يَخْرُجُ وَالتَّرَاوِيْحُ تُؤَدّٰى بِجَمَاعَةٍ فَيُرَاعٰى فِيْهَا جِهَةُ التَّيْسِيْرِ وَمَعْنٰى مَارَوَاهُ شَفْعًا لَا وِتْرًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ ঃ ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দিনের নফল ইচ্ছা করলে এক সালামে দুই রাকআত আদায় করবে। আর ইচ্ছা করলে চার রাকআতও আদায় করতে পারবে। এর বেশি আদায় করা মাকরূহ হবে। আর রাতের নফল সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, এক সালামে আট রাকআত পর্যন্ত আদায় করা জায়েজ আছে। কিন্তু এর বেশি আদায় করা মাকরূহ। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন ঃ রাত্রে এক সালামে দুই রাকআতের বেশি আদায় করবে না। জামেউস সগীর কিতাবে রাত্রের নফলের ক্ষেত্রে আট রাকাআতের উল্লেখ নেই। মাকরূহ হওয়ার দলিল হচ্ছে– রাসূল ﷺ-এর থেকে বেশি আদায় করেননি। যদি মাকরূহ না হতো তাহলে বৈধতার বিষয়টি শিক্ষাদানের জন্য অবশ্যই তিনি বেশি আদায় করতেন। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে রাত্রে দুই রাকআত করে পড়া আর দিনে চার রাকআত করে আদায় করা উত্তম। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে উভয় ক্ষেত্রেই দুই রাকআত করে আদায় করা উত্তম। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উভয় ক্ষেত্রেই চার রাকআত করে আদায় করা উত্তম।

ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল হলো, রাসূল ﷺ-এর হাদীস صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى - অর্থ– রাত্র ও দিনের নামাজ দুই রাকআত করে আদায় করা হবে। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) তারাবীহের নামাজের উপর কিয়াস করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর প্রমাণ হলো হলো, রাসূল ﷺ ঈশার পর চার রাকআত পড়তেন। হযরত আয়েশা (রা.) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন– (আবূ দাউদ)। তাছাড়া তিনি চাশতের সময় নিয়মিত চার রাকআত পড়তেন। উপরন্তু এতে তাহরীমা দীর্ঘতর হয়। সুতরাং তা অধিক কষ্ট কর হবে এবং অধিক

ফজিলতপূর্ণও হবে। এ কারণেই যদি কেউ এক সালামে চার রাকআত নামাজ পড়ার মান্নত করে থাকে তবে দুই সালামে নামাজ পড়ার দ্বারা মান্নত থেকে সে মুক্ত হবে না। পক্ষান্তরে এর বিপরীত করার দ্বারা দায়িত্ব মুক্ত হবে। (সাহেবাইনের দলিলের জবাব হচ্ছে– তারাবীহ এর উপর সাধারণ নফলকে কিয়াস করা ঠিক নয়) কেননা তারাবীহ জামাআতের সাথে আদায় করা হয়। সুতরাং তাতে সহজ হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। ইমাম শাফেঈ (র.) এর হাদীসের জবাব হলো উক্ত হাদীসের অর্থ হলো জোড় রাকআত আদায় করতেন বেজোড় রাকআত আদায় করতেন না। আল্লাহই উত্তম জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বে সুন্নতের আলোচনা ছিল, এখানে নফলের আলোচনা করা হয়েছে। আলিমগণ বৈধ এবং উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে রাত্র ও দিনের নফলের পরিমাণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দিনের নফলের ক্ষেত্রে এক সালামে দুই রাকআত পড়া এবং চার রাকআত পড়া উভয়টিই জায়েজ। এর থেকে অধিক পড়া মাকরূহ এবং রাত্রে এক সালামে আট রাকআত পর্যন্ত পড়া জায়েজ আছে। আট থেকে অধিক পড়া মাকরূহ। জামেউস সগীর গ্রন্থে আট রাকআতের উল্লেখ নেই। বরং ছয় রাকআতের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামেউস সগীর গ্রন্থে বলেছেন, রাত্রে এক সালামে ছয় রাকআত পর্যন্ত আদায় করতে পারে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, রাত্রে এক সালামে আট রাকআতের অধিক (পড়া) মাকরূহ হওয়ার দলিল হলোঃ রাসূল ﷺ আট রাকআতের অধিক পড়েননি। যদি আট রাকআতের অধিক পড়তেন, তাহলে মাকরূহ হতো না। বৈধতা শিক্ষাদানের জন্য অবশ্যই তিনি একবার বা দু'বার আট রাকআতের অধিক পড়তেন। যেহেতু তিনি কখনো এক সালামে আট রাকআতের অধিক নফল পড়েননি তাই এক সালামে আট রাকআতের অধিক নফল আদায় করা মাকরূহ। কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, সালাতুল লাইল صلاة الليل বা রাত্রের নামাজে আট রাকআতের অধিক নামাজ পড়া হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। যেমন হাদীসে আছে যে,

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصَلِّيْ بِاللَّيْلِ خَمْسَ رَكَعَاتٍ سَبْعَ رَكَعَاتٍ تِسْعَ رَكَعَاتٍ أَحَدَ عَشَرَ رَكْعَةً ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً .

অর্থ ঃ রাসূল ﷺ রাত্রে (কখনো) পাঁচ রাকআত, (কখনো) সাত রাকআত, (কখনো) নয় রাকআত, (কখনো) এগার রাকআত এবং কখনো তের রাকআত নামাজ পড়তেন।

আমাদের পক্ষ হতে এর জবাব হলো– পাঁচ রাকআতের মধ্যে দুই রাকআত রাত্রের নফল, আর তিন রাকআত বিত্র এবং সাত রাকআতের মধ্যে চার রাকআত রাত্রের নফল আর তিন রাকআত বিত্র এবং নয় রাকআতের মধ্যে ছয় রাকআত রাত্রের নফল আর তিন রাকআত বিত্র এবং এগার রাকআতের মধ্যে আট রাকআত রাত্রের নফল আর তিন রাকআত বিত্র এবং তের রাকআতের মধ্যে আট রাকআত রাত্রের নফল, তিন রাকআত বিতর আর দুই রাকআত ফজরের সুন্নত। রাসূল ﷺ এসব একই সালামে আদায় করতেন। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর আর কোনো আপত্তি উত্থাপনের অবকাশ নেই।

–(ফতহুল কাদীর)

কুদূরী-এর ইবারত وَقَالَا لَا يَزِيْدُ بِاللَّيْلِ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيْمَةٍ -এর বাহ্যিক দ্বারা বুঝা যায় যে, সাহেবাইনের মতে রাত্রে এক সালামে দুই রাকআতের আধিক নামাজ পড়া জায়েজ নেই। অথচ বিষয়টি এমন নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো তাদের মতে এক সালামে দুই রাকআতের অধিক নামাজ পড়া উত্তম নয়। قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ إِنْ صَلّٰى ثَمَانَ رَكْعَةٍ দ্বারা ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতের থেকে পরহেজ করেছেন। কেননা ইমাম শাফেঈ (র.) বলেছেন, এক সালামে চার রাকআতের অধিক পড়া জায়েজ নেই। যদি চার রাকআতের অধিক পড়ে তাহলে মাকরূহ হবে।

وَالْاَفْضَلُ فِى اللَّيْلِ – এখানে নফল নামাজের রাকআতের ব্যাপারে উত্তম কি? সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সাহেবাইনের মতে রাত্রে দুই রাকআত করে পড়া এবং দিনে চার রাকআত করে পড়া উত্তম। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে রাত্রে ও দিনে দুই রাকআত করে পড়া উত্তম। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে রাত্রে ও দিনে চার রাকআত করে পড়া উত্তম।

ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল, ইব্‌নে ওমর (রা.)-এর হাদীস صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى অর্থ– রাসূল ﷺ বলেছেন, রাত্রে ও দিনের নামাজ (নফল) দুই রাকআত করে পড়া উত্তম।

সাহেবাইনের দলিল, তারা তারাবীহ-এর নামাজের উপর কিয়াস করেছেন। তারাবীহ-এর নামাজ যেহেতু সর্বসম্মতি ক্রমে দু' রাকআত করে পড়া উত্তম। অতএব রাত্রের অন্যান্য নফল নামাজ দুই রাকআত করে আদায় করা উত্তম।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল, ইমাম আবূ দাউদ (র.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস সংকলন করেছেন, তা হলঃ রাসূল ﷺ ঈশার পর চার রাকআত নামাজ এক সালামে পড়তেন এবং সদা সর্বদা চাশ্‌তের নামাজ চার রাকআত করে পড়তেন। উক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা গেল যে, রাত্রে ও দিনে নফল নামাজ চার রাকআত করে পড়া উত্তম।

যুক্তি ভিত্তিক দলিল হলো, এক সালামে চার রাকআত পড়ার দ্বারা তাহরীমা দীর্ঘ হয়; বিধায় কষ্ট বেশি হয় অতএব এটিই উত্তম হবে। পক্ষান্তরে দুই রাকআতে কষ্ট কম। এ কারণে যদি কোনো ব্যক্তি এক সালামে চার রাকআত নামাজ পড়ার মান্নত করে তবে দুই সালামে চার রাকআত নামাজ আদায় করে তাহলে মান্নত হতে মুক্ত হবে না। কেননা সে উত্তম তরীকায় চার রাকআত আদায় করার মান্নত করেছিল কিন্তু এখন সে অনুত্তম তরীকায় চার রাকআত আদায় করল। মূলনীতি আছে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বস্তু অনুত্তম এবং অশ্রেষ্ঠ বস্তু দ্বারা আদায় হবে না। পক্ষান্তরে যদি কেউ দুই সালামে চার রাকআত পড়ার মান্নত করে তাহলে এক সালামের সাথে আদায় করার দ্বারা মান্নত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা অনুত্তম বস্তু উত্তম বস্তু দ্বারা আদায় হবে।

قَوْلُهُ اَلتَّرَاوِيحُ تُؤَدّٰى بِجَمَاعَةٍ الخ : -এর দ্বারা সাহেবাইনের কিয়াসের জবাব দেওয়া হয়েছে, জবাবের সারকথা হলো নিশঃসন্দেহে তারাবীহ-এর নামাজ দুই রাকআত করে পড়া উত্তম, তবে যেহেতু তারাবীহ-এর নামাজ জামাআতের সাথে আদায় করা হয়। তাই জামাআতবন্দী কাজে সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ্য করে সহজ করার হুকুম এসেছে। যেমন পবিত্র হাদীসে এ মর্মে নির্দেশ এসেছে যে, ইমামের জন্য উচিৎ যেন সে জামাআতের নামাজ সংক্ষেপে পড়ায়। প্রকাশ থাকে যে, রাসূল (সা.) এর এ নির্দেশে জন মানুষের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অতএব যেহেতু তারাবীহ-এর নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা হয়। তাই সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ্য করে সহজ করার নিমিত্তে তারাবীহ-এর নামাজ দুই রাকআত করে পড়ার হুকুম দিয়েছেন। পক্ষান্তরে যদি কেউ তারাবীহ-এর নামাজ একাকী পড়ে তাহলে চার রাকআত করে পড়া উত্তম, যদি সে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে নফল নামাজ যেহেতু জামাতের সাথে পড়া হয় না তাই নফল নামাজে সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ্য করার কোনো বিষয় নেই।

قَوْلُهُ وَمَعْنٰى مَا رَوَاهُ شَفْعًا لَا وِتْرًا الخ : -এর দ্বারা ইমাম শাফেঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের জবাব দেওয়া হয়েছে, জবাবের সারকথা হলো যে, صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى -এর মর্ম হলো রাত্র ও দিনের নামাজ জোড়, বেজোড় নয়, এ হাদীস দ্বারা রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য দুই দুই সংখ্যা বর্ণনা করা নয়; বরং রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য হলো নফল নামাজ বেজোড় আদায় করা হবে না; বরং নফল নামাজ জোড়ভাবে আদায় করা হবে। চাই এক সালামে দুই রাকআত হোক বা চার রাকআত বা আট রাকআত হোক।

فَصْلٌ فِي الْقِرَاءَةِ : وَالْقِرَاءَةُ فِي الْفَرْضِ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الرَّكَعَاتِ كُلِّهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِقِرَاءَةٍ وَكُلُّ رَكْعَةٍ صَلٰوةٌ وَقَالَ مَالِكٌ فِيْ ثَلٰثِ رَكَعَاتٍ إِقَامَةً لِلْاَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِّ تَيْسِيْرًا وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ اَلْاَمْرُ بِالْفِعْلِ لَايَقْتَضِى التَّكْرَارَ وَاِنَّمَا اَوْجَبْنَا فِى الثَّانِيَةِ اِسْتِدْلَالًا بِالْاُوْلٰى لِاَنَّهُمَا تَتَشَاكَلَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَاَمَّا الْاُخْرَيَانِ تَفَارُقَانِهِمَا فِىْ حَقِّ السُّقُوْطِ بِالسَّفَرِ وَصِفَةِ الْقِرَاءَةِ وَقَدْرِهَا فَلَا تَلْحَقَانِ بِهِمَا وَالصَّلٰوةُ فِيْمَا رُوِىَ مَذْكُوْرَةٌ صَرِيْحًا فَتَنْصَرِفُ اِلَى الْكَامِلَةِ وَهِىَ الرَّكْعَتَانِ عُرْفًا كَمَنْ حَلَفَ لَايُصَلِّىْ صَلٰوةً بِخِلَافِ مَا اِذَا حَلَفَ لَايُصَلِّىْ -

কিরাআত সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ

অনুবাদ ঃ ফরজ নামাজের দুই রাকআতে কিরাআত ওয়াজিব[১]। ইমাম শাফেঈ (র.) এর মতে সকল রাকাআতে কিরাআত ওয়াজিব। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِقِرَاءَةٍ-কিরাআত ছাড়া নামাজ শুদ্ধ নয়। আর প্রতিটি রাকআতই নামাজ। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে তিন রাকআতে কিরআত ফরজ। সহজ করার নিমিত্তে অধিকাংশকে সমগ্রের তুল্য করেছেন।

আমাদের দলিল আল্লাহর বাণী – কুরআনের যতটুকু সহজ হয় পাঠ কর [৭৩, ২০] আর কোনো কাজের নির্দেশ পুনরাবৃত্তির দাবি রাখে না। তবে দ্বিতীয় রাকআতে আমরা কিরাআত ওয়াজিব করে দিয়েছি প্রথম রাকআতের সাথে তুলনা করে। কেননা উভয় রাকআত সকল দিক থেকে সাদৃশ। পক্ষান্তরে শেষের দুই রাকআতের পার্থক্য রয়েছে প্রথম দুই রাকআত থেকে। সফরে ঐ দু'রাকআত মাফ হওয়ার এবং কিরআতের গুণে (উচ্চৈঃস্বরে ও নীরবে পড়ার ক্ষেত্রে) এবং কিরআতের পরিমাণের ব্যাপারে। কাজেই শেষের দু' রাকআত প্রথম দু' রাকআতের সহিত মিলিত হবে না।

আর ইমাম শাফেঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে সালাত শব্দটি স্পষ্ট রূপে উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং তা পূর্ণ সালাতের উপরই প্রযোজ্য হবে। আর তা সাধারণ ব্যবহারে দুই রাকআতই হয়। যেমন কেউ শপথ করে বলল যে, لَا يُصَلِّىْ صَلٰوةً (সে কোনো সালাত আদায় করবে না।) এহেন অবস্থায় দুই রাকআত পড়লেই তার শপথ ভঙ্গ হবে। পক্ষান্তরে যদি শপথ করে বলে যে, لَايُصَلِّىْ (সে সালাত আদায় করবে না) তা হলে এক রাকআত পড়লেও সে শপথ ভঙ্গকারী হবে।

১. ওয়াজিব শব্দটি এখানে সুপরিচিত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং ফরয অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হিদায়া গ্রন্থকার ফরজ, ওয়াজিব, এবং নফলের বিবরণ থেকে ফারিগ হবার পর কিরাআত সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন। চার রাকআত বিশিষ্ট ফরজ নামাজের কিরাআত সম্পর্কে পাঁচটি মতামত আছে।

১. হানাফী আলিমদের মতে দুই রাকআতে কিরাআত ফরজ। ২. ইমাম শাফেঈ (র.) এর মতে প্রতি রাকআতে কিরাআত ওয়াজিব। ৩. ইমাম মালিক (র.) এর মতে তিন রাকআতে কিরআত পড়া ওয়াজিব। ৪. হাসান বসরী (র.) -এর মতে এক রাকআতে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। ৫. আবূ বকর আসাম (اصم) (র.)-এর মতে নামাজে কিরাআত সুন্নত। আবূ বকর আসাম (র.) কিরাআত-কে অন্যান্য জিকিরের উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ যেমন নামাজের রুকূ এবং সিজদার তাসবীহ এবং ছানা সুন্নত অনুরূপভাবে প্রতি রাকাআতে কিরাআত পড়াও সুন্নত।

হাসান বসরী (র.)-এর দলিল فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ এ আয়াতের মধ্যে فاقرؤا শব্দটি আমর (امر)-এর সীগাহ। আর আমর বা নির্দেশ কোনো কাজের পুনরাবৃত্তির দাবি রাখে না। অতএব এক রাকআতেই কিরাআত পড়া ফরজ হবে।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল ঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন। لاصلوة الا بقراءة অর্থ কিরাআত ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হবে না। আর প্রতিটি রাকআতই নামাজ বিধায় কোনো রাকআতই কিরাআত ছাড়া শুদ্ধ হবে না। যেহেতু তিন রাকআত অধিকাংশ, তাই সহজ করার নিমিত্তে অধিকাংশকে সমগ্রের তুল্য ধরা হয়েছে এবং তিন রাকআতে কিরাআত ফরজ করা হয়েছে।

ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিলও এই হাদীস, কেননা রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন কিরাআত ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হয় না। আর প্রতিটি রাকআতই নামাজ। অতএব প্রতি রাকআতে কিরাআত ফরজ হবে। প্রত্যেক রাকআতই নামাজ এর দলিল হলো ঃ যদি, কেউ শপথ করে যে আমি নামাজ পড়ব না অতঃপর সে এক রাকআত পড়ল তাহলে তার শপথ ভেঙ্গে যাবে। এক রাকআত পড়ার দ্বারা শপথ ভেঙ্গে যাওয়াই দলিল হলো যে, এক রাকআতও নামাজ। অন্যথায় কসম ভেঙ্গে যেত না। হানাফীদের দলিল মহান আল্লাহর বাণী فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ। এ আয়াতে فاقرءوا শব্দটি আমর (امر)-এর সীগাহ। আর আমর পুনরাবৃত্তির দাবি রাখে না। এক রাকআতে কিরাআত ফরজ হওয়াটা কুরআনের عبارة النص দ্বারা প্রমাণিত। আর দ্বিতীয় রাকআত যেহেতু সম্পূর্ণভাবে প্রথম রাকআতের সাথে সাদৃশ পূর্ণ। এই জন্য دلالة النص দ্বারা দ্বিতীয় রাকআতের কিরাআতও ফরজ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতের মাঝে مشابهت বা সাদৃশ্যতা নেই; বরং উভয়ের মাঝে مفارقت বা ভিন্নতা আছে। তা এভাবে যে, প্রথম রাকআতে ছানা, তায়াব্বুয (تعوذ) এবং বিস্‌মিল্লাহ আছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় রাকআতে এসব জিনিস নেই। অতএব প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতের মাঝে বিসাদৃশ্য প্রমাণিত হল।

জবাব ঃ এসব জিনিস অতিরিক্ত। ধর্তব্য শুধু আরকানের (اركان)। মূল আরকানের ক্ষেত্রে উভয় রাকআত সমান। পক্ষান্তরে শেষের দু' রাকআত প্রথম দু' রাকআত থেকে ভিন্ন। এ ভিন্নতা কয়েক দিক থেকে।

১. সফরের কারণে শেষের দু' রাকআত মাফ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে প্রথম দু' রাকআতে মাফ হয় না। ২. প্রথম দু' রাকআতে উচ্চৈঃ স্বরে কিরাআত পড়া হয় পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দু' রাকআত কিরাআত ধ্বনি বিহীন পড়া হয়। ৩. প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতেহার সাথে সূরা মিলানো ওয়াজিব। পক্ষান্তরে শেষের দুই রাকআতে সূরা মিলানো ওয়াজিব নয়। উভয়ের মাঝে যেহেতু অনেক ব্যবধান অতএব শেষের দুই রাকআতকে প্রথম দুই রাকআতের সাথে মিলানো যাবে না।

وَالصَّلٰوةُ فِيْمَا يُرْوٰى -এর দ্বারা ইমাম শাফেঈ (র.)-এর বর্ণিত হাদীস لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِقِرَاءَةٍ -এর জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সার কথা হচ্ছে– হাদীসে সুস্পষ্ট শব্দ صلاة দ্বারা صَلٰوةً كَامِلَةً বা পূর্ণ নামাজ উদ্দেশ্য। আর সাধারণ ব্যবহারে পূর্ণ নামাজের দ্বারা দুই রাকআতকেই বুঝায়। অতএব হাদীস দ্বারা দুই রাকআতের জন্য কিরাআত সাবিত হবে। প্রতি রাকআতের জন্য কিরাআত সাবিত হবে না।

প্রশ্ন ॥ সাধারণ ব্যবহারে সুস্পষ্ট ভাবে صلاة শব্দ উল্লেখ করার দ্বারা দুই রাকআত বুঝা যায়। এর প্রমাণ কি?

জবাব ঃ যদি কেউ শপথ করে যে لَايُصَلِّىْ صَلٰوةً অর্থাৎ صلاة শব্দটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে, তবে দুই রাকআত নামাজ পড়লে তার শপথ ভেঙ্গে যাবে। পক্ষান্তরে যদি সে لايصلى বলে এবং صلاة শব্দটি উল্লেখ না করে তাহলে এক রাকআত পড়ার দ্বারা শপথ ভেঙ্গে যাবে।

وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَعْنَاهُ إِنْ شَاءَ سَكَتَ وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى وَهُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ (رض) إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَقْرَأَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَاوَمَ عَلَى ذٰلِكَ وَلِهٰذَا لَا يَجِبُ السَّهْوُ بِتَرْكِهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ النَّفْلِ وَفِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ الْوِتْرِ أَمَّا النَّفْلُ فَلِأَنَّ كُلَّ شَفْعٍ مِنْهُ صَلٰوةٌ عَلَى حِدَةٍ وَالْقِيَامُ إِلَى الثَّالِثَةِ كَتَحْرِيْمَةٍ مُبْتَدَأَةٍ وَلِهٰذَا لَا يَجِبُ بِالتَّحْرِيْمَةِ الْأُوْلَى إِلَّا رَكْعَتَانِ فِي الْمَشْهُوْرِ عَنْ أَصْحَابِنَا وَلِهٰذَا قَالُوا يَسْتَفْتِحُ فِي الثَّالِثَةِ أَيْ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَأَمَّا الْوِتْرُ فَلِلْاِحْتِيَاطِ قَالَ مَنْ شَرَعَ فِي نَافِلَةٍ ثُمَّ أَفْسَدَهَا قَضَاهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ فِيْهِ وَلَا لُزُوْمَ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ وَلَنَا أَنَّ الْمُؤَدّٰى وَقَعَ قُرْبَةً فَيَلْزَمُ الْإِتْمَامُ ضَرُوْرَةَ صِيَانَتِهِ عَنِ الْبُطْلَانِ .

অনুবাদ ঃ শেষ দুই রাকআত তার ইচ্ছার উপর ন্যস্ত অর্থাৎ ইচ্ছা করলে সে নীরব থাকবে, ইচ্ছা করলে কিরআত পড়বে। আবার ইচ্ছা করলে তাসবীহ পাঠ করবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত হযরত আলী (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.) এবং আয়েশা (রা.) থেকে এই অভিমতটি বর্ণিত হয়েছে। তবে কিরাআত পড়াই উত্তম। কেননা রাসূল ﷺ সর্বদা এরূপ করেছেন। এ কারণেই যাহিরী রিওয়ায়াত মতে তা তরক করার কারণে সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হয় না। নফলের সকল রাকআতে এবং বিতরের সকল রাকআতে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। নফলে ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, নফলের প্রতি দুই রাকআত আলাদা নামাজ এবং তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ানো নতুন তাহরীমা বাঁধার সমতুল্য। এ কারণেই আমাদের ইমামদের প্রসিদ্ধ মতে প্রথম তাহরীমার দ্বারা শুধু দুই রাকআতই ওয়াজিব হয়। তাই ফকীহগণ বলেছেন যে, তৃতীয় রাকআতে প্রথম রাকআতের ন্যায় ছানা পড়বে। অর্থাৎ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ الخ পড়বে। আর বিত্‌রে ওয়াজিব করা হয়েছে احتياط তথা সতর্কতা হিসাবে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি নফল শুরু করে তা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে সে এর কাজা করবে। আর ইমাম শাফিঈ (র.) বলেছেন, তার উপর কাযা ওয়াজিব নয়। কেননা সে তা স্বেচ্ছায় আরম্ভ করেছে। আর যে সেচ্ছায় কিছু করে তার উপর বাধ্য বাধকতা আরোপিত হয় না। আমাদের দলিল হচ্ছে– আদায়কৃত অংশটুকু ইবাদতে গণ্য হয়েছে। সুতরাং তা পূর্ণ করা অনিবার্য। যেহেতু আমলকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা জরুরি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার বলেছেন যে, শেষের দুই রাকআতে নামাজি ব্যক্তির ইখতিয়ার আছে সে ইচ্ছা করলে সূরা ফাতিহা পড়তে পারে, তিন তাসবীহ পরিমাণ নীরব থাকতে পারে, অথবা তাসবীহও পড়তে পারবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এরূপই বর্ণিত আছে। এটিই যাহিরী রিওয়ায়াত এবং তাসবীহ পড়া হযরত আলী (রা.), হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তবে শেষের দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়াই উত্তম। কেননা রাসূল ﷺ সর্বদাই তা

পড়েছেন। এ কারণেই যদি শেষের দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা তরক করা হয় তাহলে সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হয় না। এর দ্বারা শেষ দুই রাকআতে সূরা পড়া উত্তম হওয়া জানা গেল। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটিই যাহিরুর রিওয়ায়াত।

ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আ'যম (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, শেষ দুই রাকআতে যদি মুসল্লী কিরাআত না পড়ে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তাসবীহও না পাঠ করে তাহলে গুনাহগার হবে এবং যদি ভুলে এগুলো তরক করে তাহলে সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে। দলিল হলো যে, শেষ দুই রাকআতে কিয়াম قيام হলো উদ্দেশ্য। সুতরাং তাকে কিরাআত ও জিকির থেকে শূন্য করা মাকরূহ হবে। ইনায়া গ্রন্থকার বলেছেন যে, যাহিরুর রিওয়ায়াতই অধিক বিশুদ্ধ। কেননা কিয়ামের মধ্যে মূল হলো কিরাআত। যখন কিরাআত মাফ হলো তখন সাধারণ কিয়াম (مطلق قيام) বিদ্যমান থাকল। অতএব এটা সাধারণ মুক্তাদীর কিয়ামের মতো হলো।– (ইনায়া)

নফল এবং বিত্‌রের সকল রাকআতে কিরাআত ওয়াজিব। নফলের প্রতি রাকআতে কিরাআত ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো যে, নফলের প্রতি দুই রাকআতই আলাদা নামাজ। এ কারণেই প্রথম তাহরীমা দ্বারা দুই রাকআত ওয়াজিব হয়। যদিও দুই রাকআতের অধিক নিয়ত করে। হানাফী আলিমদের প্রসিদ্ধ মত এটিই। অতএব যদি কেউ চার রাকআত নামাজের নিয়ত করে অতঃপর দুই রাকআত পূর্ণ করার পূর্বেই নামাজ ফাসেদ করে দেয় তাহলে নামাজ শুরু করার কারণে শুধু দুই রাকআত কাযা করা ওয়াজিব হবে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রথম তাহরীমার দ্বারা শুধু দুই রাকআত ওয়াজিব হবে।

যেহেতু প্রতি দুই রাকআত আলাদা নামাজ, এই জন্য হানাফী মাশায়িখে কেরাম বলেছেন যে, তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ানোর সময় ছানা পড়বে, কেননা তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ানো নতুন তাহরীমার পর্যায় ভুক্ত। বিত্‌রের প্রতি রাকআতে কিরাআত এই জন্য ওয়াজিব যে, নামাজের মধ্যে কিরাআত প্রত্যক্ষভাবে রুকন (ركن) এবং মূল উদ্দেশ্য। আর বিতর ওয়াজিব হওয়াটা যেহেতু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তাই বিতরে নফল হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলো। অতএব সতর্কতার কারণে বিত্‌রের প্রতি রাকআতে কিরাআত ওয়াজিব করা হয়েছে। মোটকথা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিত্‌রের নামাজ যদিও ওয়াজিব কিন্তু উহাতে নফলের আলামত (اثار) প্রকাশ পাওয়ার কারণে সতর্কতার দৃষ্টিকোণে আমরা সুন্নত এবং নফলের ন্যায় বিতরের প্রত্যেক রাকআতে কিরাআত ওয়াজিব করেছি।

قَوْلُهُ قَالَ مَنْ شَرَعَ فِىْ نَافِلَةٍ الخ : নফল নামাজ এবং রোজা শুরু করার দ্বারা ওয়াজিব হয় কিনা? এ সম্পর্কে ফকীহদের মাঝে মতানৈক্য আছে। হানাফী আলিমদের মতে নফল নামাজ ও রোজা শুরু করার দ্বারা ওয়াজিব হয়। অতএব শুরু করার পর যদি একে ফাসেদ করে দেয় তাহলে এর কাজা ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে নফল শুরু করার দ্বারা ওয়াজিব হয় না। অতএব যদি কোনো ব্যক্তি নফল নামাজ শুরু করার পর তা ফাসেদ করে দেয় তাহলে তার উপর এর কাজা ওয়াজিব হবে না। ইমাম শাফেঈ (রা.)-এর দলিল হচ্ছে– নফল আদয়কারী ব্যক্তি নামাজ স্বেচ্ছায় আরম্ভ করে। আর যে স্বেচ্ছায় কিছু করে তার উপর কোনো বাধ্য বাধকতা নেই। কেননা মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ অর্থ– স্বেচ্ছায় পুণ্যকারীদের উপর কোনো বাধ্য বাধকতা নেই। [৯ : ৯১] অতএব নফল শুরুকারীর উপরও কোনো বাধ্য বাধকতা নেই। আমাদের দলিল– শুরু করার পর নফলের আদায়কৃত অংশ ইবাদতে গণ্য হয়েছে। সুতরাং তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। কেননা আমল নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা জরুরি। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ অর্থ– তোমরা স্বীয় আমল নষ্ট করো না। [৪৭-৩৩] নফল শুরু করার দ্বারা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়। অতএব মধ্যখানে তা ফাসেদ করলেও এর কাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেঈ (র.) -এর দলিলের জবাব– স্বেচ্ছায় নফল আরম্ভকারীর উপর প্রথমে কোনো জিনিস আবশ্যক ছিল না। তবে শুরু করার দ্বারা আবশ্যক হয়েছে। আর مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ আয়াতটি প্রথম অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, দ্বিতীয় অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا وَقَرَأَ فِى الْأُولَيَيْنِ وَقَعَدَ ثُمَّ أَفْسَدَ الْأُخْرَيَيْنِ قَضَى رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّ الشَّفْعَ الْأَوَّلَ قَدْ تَمَّ وَالْقِيَامُ إِلَى الثَّالِثَةِ بِمَنْزِلَةِ التَّحْرِيمَةِ مُبْتَدَأَةٍ فَيَكُونُ مُلْزِمًا هٰذَا إِذَا أَفْسَدَ الْأُخْرَيَيْنِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِمَا وَلَوْ أَفْسَدَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِى الشَّفْعِ الثَّانِى لَا يَقْضِى الْأُخْرَيَيْنِ وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ أَنَّهُ يَقْضِى أَرْبَعًا اِعْتِبَارًا لِلشُّرُوعِ بِالنَّذْرِ وَلَهُمَا أَنَّ الشُّرُوعَ مُلْزِمٌ مَاشَرَعَ فِيهِ وَمَالَاصِحَّةَ لَهُ إِلَّا بِهِ وَصِحَّةُ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ لَاتَتَعَلَّقُ بِالثَّانِى بِخِلَافِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَعَلَى هٰذَا سُنَّةُ الظُّهْرِ لِأَنَّهَا نَافِلَةٌ وَقِيلَ يَقْضِى أَرْبَعًا اِحْتِيَاطًا لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ صَلٰوةٍ وَاحِدَةٍ .

অনুবাদ ঃ যদি কেউ চার রাকআত নামাজ শুরু করে এবং প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত পড়ে ও বৈঠক করে অতঃপর শেষ দুই রাকআত নষ্ট করে ফেলে তাহলে দুই রাকআত কাজা করবে। কেননা প্রথম দুই রাকাআত পূর্ণ হয়ে গেছে। আর তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ানো নতুনভাবে তাহরীমা করার সমতুল্য। সুতরাং তা সে ওয়াজিব করে নিয়েছে। এ হুকুম তখনকার জন্য যখন শেষ দুই রাকআত শুরু করার পর নষ্ট করে ফেলে। আর যদি শেষের দুই রাকআত শুরু করার আগেই নষ্ট করে ফেলে, তাহলে শেষ দুই রাকআত কাজা করতে হবে না। (প্রথমদুই রাকআত কাজা করলেই হবে)

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নামাজ শুরু করাকে মান্নতের উপর কিয়াস করে বলেন যে, চার রাকআত কাজা করবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হচ্ছে– আরম্ভ অবশ্য পালনীয় করে ঐ অংশকে যা আরম্ভ করা হয়েছে এবং যে অংশ ছাড়া ঐ কর্ম শুদ্ধ হয় না। আর প্রথম দুই রাকাআতের শুদ্ধতা দ্বিতীয় অংশের সাথে সম্পৃক্ত নয়। দ্বিতীয় রাকআতের বিষয়টি এর বিপরীত। যুহরের সুন্নত সম্পর্কেও একই মত পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা মূলত এটাও নফল। তবে কারো কারো মতে সতর্কতা হিসাবে চার রাকআত কাজা করবে। কেননা যুহরের ফরজের পূর্বের চার রাকআত সুন্নত একই নামাজ হিসাবে গণ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ নফলের নিয়তে চার রাকআত নামাজ শুরু করে প্রথম রাকআতে ওয়াজিব কিরাআত পড়েছে এবং দুই রাকআতের শেষে বৈঠক করেছে অতঃপর শেষের দুই রাকআত ফাসেদ করে দিয়েছে তাহলে তার উপর শেষের দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। মুসান্নিফ (র.) এই মাসআলায় দুই রাকআতের পর বসার শর্ত এই জন্য উল্লেখ করেছেন যে, যদি দুই রাকআতের শেষে বৈঠক না করে এবং শেষের দুই রাকআত ফাসেদ করে দেয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে চার রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। সারকথা হলো যে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ানোর পর যদি শেষ দুই রাকআত নষ্ট করে দেয় তাহলে শেষের দুই রাকাআতের কাজা ওয়াজিব হবে। কেননা প্রথম দুই রাকআত পূর্ণ হয়েছে। আর তৃতীয় রাকআতের জন্য দাড়ানো নতুন তাহরীমার সমতুল্য। অতএব এই তাহরীমার দ্বারা শুধু শেষের দুই রাকআত ওয়াজিব হয়েছে। বিধায় উহাকে ফাসেদ (فاسد) করার কারণে শুধু উহার কাজা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ানোর পূর্বে ফাসেদ করে দেয় তার পর হলে তার উপর কোনো কাজা ওয়াজিব হবে না। কেননা প্রথম দুই রাকআতে বৈঠক করার কারণে প্রথম দুই রাকআত পূর্ণ

হয়েছে এবং শেষের দুই রাকআত এখনো আরম্ভ করেনি। মোটকথা, প্রথম দুই রাকআতের কাজা তো এই জন্য ওয়াজিব নয় যে উহা পূর্ণ হয়েছে। আর শেষের দুই রাকআতের কাযা এ জন্য ওয়াজিব হবে না যে, সে এখনো তা শুরুই করেনি। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) চার রাকআত নফল নামাজ আরম্ভ করাকে নযর বা মান্নতের উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ যেরূপ চার রাকআত নফল নামাজের মান্নত করার দ্বারা চার রাকআতই ওয়াজিব হবে, অনুরূপ ভাবে চার রাকআতের নিয়তে নফল শুরু করার দ্বারা চার রাকআতই ওয়াজিব হবে। অতএব প্রথম দুই রাকআত নামাজ ফাসিদ করুক বা দুই রাকআতের পর ফাসেদ করুক সর্বাবস্থায় চার রাকআতই ওয়াজিব হবে। এই কিয়াসের ইল্লত (علت) বা কারণ হচ্ছে যে যেরূপ মান্নত শুরু করার দ্বারা ওয়াজিব হয় অনুরূপভাবে নফল নামাজও শুরু করার দ্বারা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো যে, শুরু করাটা ঐ জিনিসের জন্য ইল্লত (علت) বা কারণ হবে যা শুরু করা হয়েছে এবং ঐ জিনিসের ওয়াজিব (وجوب) হওয়ারও কারণ হবে যার উপর আরম্ভকৃত জিনিসের বিশুদ্ধতা (صحت) নির্ভরশীল। যেমন ঃ নফল নামাজ শুরু করার দ্বারাই প্রথম রাকআত ওয়াজিব হয়। কেননা প্রথম রাকআত শুরু কৃত জিনিস। আর প্রথম রাকআতের সিহ্হাত (صحت) বা বিশুদ্ধতা দ্বিতীয় রাকআতের উপর নির্ভরশীল। অতএব শুরু করার দ্বারা দ্বিতীয় রাকআতও ওয়াজিব হবে ।

প্রশ্ন ঃ প্রথম রাকআতের সিহ্হাত (صحت) বা বিশুদ্ধতা দ্বিতীয় রাকআতের উপর নির্ভরশীল কেন?

জবাব ঃ উহার কারণ হলো; যদি প্রথম রাকআত নামাজ দ্বিতীয় রাকআত ছাড়া থাকে তাহলে একে সালাতে বুতায়রা (صَلَاةً بُتَيْرًا) বা এক রাকআত হিসাবে অভিহিত করা হবে, আর রাসূল ﷺ এক রাকআত নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রথম রাকআতের সিহ্হাত বা বিশুদ্ধতা দ্বিতীয় রাকআতের উপর নির্ভরশীল।

পক্ষান্তরে শেষের দুই রাকআত সেখানে শুরু করেনি এবং এর উপর প্রথম দুই রাকআতের সিহ্হাত বা বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল নয়। অতএব প্রথম দুই রাকআত আরম্ভ করার দ্বারা শেষের দুই রাকআত ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে যদি শেষের দুই রাকআত ফাসেদ করে দেয় তাহলে শুধু শেষের দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। প্রথম দুই রাকাআতের কাযা ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে যদি কেউ এক সালামে চার রাকআত নামাজ পড়ার মান্নত করে তাহলে তাহলে এক সালামে চার রাকআতই ওয়াজিব হবে। যদি দুই সালামে চার রাকআত পড়ে তাহলে মান্নত পূর্ণ হবে না। অনুরূপ মতানৈক্য রয়েছে যুহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নতের ব্যাপারে। অর্থাৎ কেউ যদি যুহরের চার রাকআত সুন্নতের নিয়ত করে নামাজ পড়া আরম্ভ করে। প্রথম দুই রাকআত পড়ার পর তৃতীয় রাকআতের জন্য দাড়িয়ে তা ফাসেদ করে দেয়। তাহলে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে চার রাকআত কাজা করতে হবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে দুই রাকআত কাজা করতে হবে।

কোনো কোনো শাইখের মতে এই সূরতে احتياط। তথা সতর্কতার দৃষ্টি কোণে চার রাকআত কাজা করবে। কেননা এই চার রাকআত একই নামাজ হিসাবে গণ্য। যেমন– কোনো মহিলাকে ঐ চার রাকআত নামাজের প্রথম দুই রাকআতের অবস্থায় তৃতীয় রাকআত আরম্ভ করার পূর্বে তার স্বামী তালাকের খিয়ার (خيار) দিল। সে চার রাকআত পূর্ণ করার পর সালাম ফিরাল। তাহলে ঐ মহিলার খিয়ার বাতিল হবে না। অথচ মজলিস পরিবর্তন হওয়ার দ্বারা খিয়ার (خيار) বাতিল হয় এবং কর্ম পরিবর্তন হওয়ার দ্বারা মজলিস পরিবর্তন হয়। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, যুহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নত এক নামাজ হিসাবে গণ্য। অন্যথায় যদি প্রথম দুই রাকআত আলাদা নামাজ হতো এবং শেষের দুই রাকআত নামাজ আলাদায় হত। তাহলে শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করার দ্বারাই ঐ মহিলার খিয়ার (خيار) বাতিল হয়ে যেতো। কেননা কর্ম পরিবর্তনের কারণে মজলিস পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।

وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهِنَّ شَيْئًا أَعَادَ رَكْعَتَيْنِ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَقْضِي أَرْبَعًا وَهٰذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلٰى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ وَالْأَصْلُ فِيْهِ أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) تَرْكَ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ أَوْفِي أَحَدِهِمَا يُوجِبُ بُطْلَانَ التَّحْرِيْمَةِ لِأَنَّهَا تُعْقَدُ لِلْأَفْعَالِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رح) تَرْكُ الْقِرَاءَةِ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ لَايُوجِبُ بُطْلَانَ التَّحْرِيْمَةِ وَإِنَّمَا يُوجِبُ فَسَادَ الْأَدَاءِ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ رُكْنٌ زَائِدٌ أَلَاتَرٰى أَنَّ لِلصَّلٰوةِ وُجُوْدًا بِدُوْنِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَاصِحَّةَ لِلْأَدَاءِ إِلَّا بِهَا وَفَسَادُ الْأَدَاءِ لَايَزِيْدُ عَلٰى تَرْكِهِ فَلَا يَبْطُلُ التَّحْرِيْمَةُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ يُوجِبُ بُطْلَانَ التَّحْرِيْمَةِ وَفِي إِحْدَيْهِمَا لَايُوجِبُ لِأَنَّ كُلَّ شَفْعٍ مِنَ التَّطَوُّعِ صَلٰوةٌ عَلٰى حِدَةٍ وَفَسَادُهَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَقَضَيْنَا بِالْفَسَادِ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَحَكَمْنَا بِبَقَاءِ التَّحْرِيْمَةِ فِي حَقِّ لُزُوْمِ الشَّفْعِ الثَّانِي اِحْتِيَاطًا إِذَا ثَبَتَ هٰذَا نَقُوْلُ إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي الْكُلِّ قَضٰى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ التَّحْرِيْمَةَ قَدْ بَطَلَتْ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ عِنْدَهُمَا فَلَمْ يَصِحَّ الشُّرُوْعُ فِي الثَّانِي وَبَقِيَتْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رح) فَصَحَّ الشُّرُوْعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي ثُمَّ إِذَا فَسَدَ الْكُلُّ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأَرْبَعِ عِنْدَهُ .

অনুবাদ : আর যদি কেউ চার রাকআত (নফল নামাজ) আদায় করে কিন্তু তাতে কোনো কিরাআত পড়ে না তাহলে সে দু' রাকআতই দোহ্‌রাবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে চার রাকআত কাজা করবে। এই মাসআলাটি আট প্রকার। মাসআলার মূল হলো হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে প্রথম দুই রাকআতে অথবা দুই রাকআতের যে কোনো একটিতে কিরাআত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে দেয়। কেননা তাহরীমা বাঁধা হয় কর্ম সম্পাদনের জন্য। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে প্রথম দুই রাকআতে কিরআত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে না; বরং সালাত আদায় হওয়াকে ফাসেদ করে। কেননা কিরাআত হলো সালাতের অতিরিক্ত রুকন (رکن)। তাই তো দেখা যায় যে, কিরাআত ছাড়াও নামাজের অস্তিত্ব হয়ে যায়। (যেমন বোবা মানুষের নামাজ) তবে কিরাআত (زائد) ছাড়া নামাজ আদায় বিশুদ্ধ হয় না। আর আদায় ফাসেদ হওয়া রুকন তরক করার চেয়ে গুরুতর নয়। সুতরাং তাহরীমা বাতিল হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে দেয় কিন্তু দুই রাকআতের শুধু এক রাকআতে কিরাআত তরক করার দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয় না। কেননা প্রতি দুই রাকআত স্বতন্ত্র নামাজ। আর এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে নামাজ নষ্ট হওয়া বিতর্কিত বিষয়। তাই

সতর্কতা হেতু আমরা কাজা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে নামাজ নষ্ট হওয়ার রায় দিয়েছি। আর শেষের রাকআতদ্বয় আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে তাহরীমা অব্যাহত থাকার রায় দিয়েছি। এই মূলনীতি সাব্যস্ত হওয়ার পর আমাদের বক্তব্য হলো; কোনো রাকআতেই যদি কিরাআত না পড়ে থাকে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দুই রাকআত কাজা করতে হবে। কেননা প্রথমের দুই রাকআতে কিরাআত তরক করায় তাদের মতে তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং শেষের রাকআতদ্বয় আরম্ভ করা শুদ্ধ হয়নি। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে তাহ্রীমা অব্যাহত আছে। সুতরাং শেষের রাকআতদ্বয় আরম্ভ করা শুদ্ধ হয়েছে। অতঃপর যেহেতু কিরাআত তরক করার কারণে পূর্ণ নামাজ ফাসেদ হয়ে গেছে সেহেতু তাঁর মতে চার রাকআতই কাজা করতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো ব্যক্তি চার রাকআত নফল নামাজ পড়ল। কিন্তু কোনো রাকআতেই কিরাআত পড়ল না; তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দুই রাকআত কাজা করা ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে চার রাকআত কাজা করা ওয়াজিব। ইনায়া গ্রন্থকরের মতে এ মাসআলার নাম মাসআলায়ে সামানিয়্যা (مسئلة ثمانية) বা আট মাসআলা। এ মাসআলার সম্ভাব্য সূরত আটটি। তবে আর একটু তলিয়ে চিন্তা করলে ষোল সূরত হয়। ১. চার রাকআতে কিরাআত পাঠ করেছে। (২) চার রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। (৩) প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। (৪) শেষের দুই রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। (৫) শুধু প্রথম রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। (৬) শুধু দ্বিতীয় রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। (৭) শুধু তৃতীয় রাকাআতে কিরাআত তরক করেছে। (৮) শুধু চতুর্থ রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। (৯) প্রথম দুই রাকআত এবং তৃতীয় রাকআতে কিরাআত তরক করেছে (১০) প্রথম দুই রাকআত এবং চতুর্থ রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। (১১) প্রথম রাকআত এবং শেষের দুই রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। (১২) দ্বিতীয় রাকআত এবং শেষের দুই রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। (১৩) প্রথম রাকআত এবং তৃতীয় রাকআতে কিরাআত তরক করেছে (১৪) প্রথম এবং চতুর্থ রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। (১৫) দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। (১৬) দ্বিতীয় এবং চতুর্থ রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। গ্রন্থকার প্রথম সূরত বর্ণনা করেননি। কেননা উদ্দেশ্য হলো ফাসেদ প্রকারগুলো বর্ণনা করা। প্রথম সূরতে সব রাকআতে কিরাআত পাঠ করেছে। বিধায় তা ফাসেদ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। অন্য সাত সূরত ইত্তেহাদে হুকুম (اتحاد حكم) বা এক হুকুম হওয়ার কারণে ঐ আট প্রকারের মধ্যে সংযুক্ত হয়েছে। অতএব এখন আট সূরত বিদ্যমান থাকল। যা সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেছেন, هٰذِهِ الْمَسْئَلَةُ عَلٰى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ এ মাসআলাটির আট সূরত।

হিদায়া গ্রন্থকারের দৃষ্টিতে ঐ আট সূরত নিম্নরূপ–

১. চার রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। ২. শেষ দুই রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। ৩. প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। ৪. শেষ দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। (৫) প্রথম দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকাআতে কিরআত তরক করেছে। ৬. প্রথম দুই রাকআতের যে কোন এক রাকআতে এবং শেষের দুই রাকআতের যেকোনো এক রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। (৭) শেষ দুই রাকআতে এবং প্রথম দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। (৮) প্রথম দুই রাকআতে এবং শেষের দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকআতে কিরাআত তরক করেছে (الكفاية)। এসব মাসআলার তাখরীজ (تخريج) তিন ইমামের আলাদা আলাদা উসূল বা মূলনীতির উপর নির্ভরশীল। এই জন্য হিদায়ার গ্রন্থকার প্রথমে ঐসব উসূল (اصول) বা মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। যেমন ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মূলনীতি হলো প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করা অথবা এর কোনো একটিতে কিরাআত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে। কেননা তাহরীমা সংঘটিত করা হয় কর্মের জন্যে আর কর্ম

কিরাআত তরক করার দ্বারা ফাসেদ বা নষ্ট হয়ে যায়। অতএব যে তাহ্রীমা কর্মের জন্য সংঘটিত করা হয়েছে তাও নষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মূলনীতি হলো– প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে না; বরং নামাজ আদায় হওয়াকে ফাসেদ করে দেয়। কেননা কিরাআত হলো নামাজের অতিরিক্ত রুকন। চিন্তা করে দেখুন, যে কিরাআত ছাড়াও নামাজের অস্তিত্ব হয়ে যায়। যেমন বোবা মানুষের ক্ষেত্রে কিরাআত বিহীন নামাজ। তবে কিরাআত ছাড়া নামাজ সহীহ হয় না। মোটকথা প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করা ফাসাদে আদা (فساد اداء) বা আদায় ফাসেদের কারণ; তবে তাহরীমাকে বাতিল করার কারণ হবে না। আদায় ফাসেদ হওয়াটা রুকন তরক করার চেয়ে গুরুতর নয়। অর্থাৎ যদি আদায়কে তরক করে যেমন কারো অজু ভেঙ্গে গেল এবং সে অজু করতে গেল, তাহলে সে এ অবস্থায় আদায়কে ছেড়ে দিল। কিন্তু তাহরীমা বাতিল হবে না। অতএব যখন তরকে আদা (ترك اداء) বা আদায় তরকের দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয় না তাহলে ফাসাদে আদা (فساد اداء) বা আদায় ফাসেদ হওয়ার দ্বারা অবশ্যই তাহরীমা বাতিল হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মূলনীতি হলো– প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে দেয়। তবে প্রথম দুই রাকআতের এক রাকআতে কিরাআত তরক করা তাহ্রীমাকে বাতিল করে না। প্রথম মাসআলার দলিল নফলের প্রতি দুই রাকআত নামাজ স্বতন্ত্র নামাজ। এতে কিরাআত তরক করা নামাজকে কিরাআত শূন্য করার শামিল। নামাজকে কিরাআত শূন্য করার দ্বারা নামাজ এমনভাবে ফাসেদ হবে যে, এতে এর তাহরীমা বাতিল হবে এবং কাজা ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয় মাসআলার দলিল ঃ এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে যুক্তির দাবি ছিল যে, প্রথম মাসআলার ন্যায় তাহরীমা বাতিল হয়ে যাওয়া এবং নামাজ ফাসেদ হয়ে যাওয়া। যেমন ফজরের এক রাকআতে কিরাআত তরক করার দ্বারা নামাজ ফাসেদ হয়ে যায়। তবে এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে নামাজ নষ্ট হওয়াটা বিতর্কিত বিষয়। কেননা হাসান বস্রী (র.)-এর মত হলো যে, নামাজের এক রাকআতে কিরাআত পড়া যথেষ্ট। যদি দুই রাকআতের মধ্যে হতে এক রাকআতে কিরাআত পড়ে অন্য রাকআতে কিরাআত না পড়ে তাহলে নামাজ ফাসেদ হবে না। তাই সতর্কতা অবলম্বন হেতু আমরা বলেছি যে এক রাকআতে কিরাআত তরক করার দ্বারা নামাজ ফাসেদ হবে এবং কাজা ওয়াজিব হবে। তবে শেষের রাকআতদ্বয় আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে তাহরীমা অব্যাহত থাকবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, এপর্যন্ত প্রত্যেক (তিনজন) ইমামের মূলনীতি বর্ণিত হলো এখন মতন (متن)-এর মাসআলার বিশ্লেষণ পেশ করা হবে– যদি মুসল্লী নফল নামাজের চার রাকআতে কিরাআত তরক করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে তাহরীমা বাতিল হয়ে গিয়েছে। আর যেহেতু তাহ্রীমা বাতিল হয়ে গিয়েছে তাই শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করাই সহীহ হয়নি। অতএব মনে করা হবে যে, সে শুধু দুই রাকাআতেরই তাহরীমা বেঁধেছে এবং ঐ দুই রাকআতকে ফাসেদ করে দিয়েছে। সুতরাং শুধু দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে তাহ্রীমা বাতিল হয়নি বিধায় শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করা সহীহ্ হয়েছে। তবে কিরাআত তরক করার কারণে চার রাকআত ফাসেদ হয়ে গিয়েছে। অতএব চার রাকআতেরই কাজা ওয়াজিব হবে (আল্লাহই উত্তম জানেন)।

وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ لَاغَيْرَ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُخْرَيَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ التَّحْرِيْمَةَ لَمْ تَبْطُلْ فَصَحَّ الشُّرُوْعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِيْ ثُمَّ فَسَادُهُ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ لَايُوْجِبُ فَسَادَ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ. وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ لَاغَيْرَ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُولَيَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الشُّرُوْعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِيْ وَعِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ اِنْ صَحَّ فَقَدْ اَدَّاهُمَا .

অনুবাদ ঃ যদি শুধু প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত পড়ে থাকে তাহলে সর্বসম্মতি ক্রমে শেষ দুই রাকআত কাজা করবে। কেননা এ ক্ষেত্রে তাহ্রীমা বাতিল হয় নি। সুতরাং শেষের রাকআতদ্বয় শুরু করা সহীহ হয়েছে। অতঃপর কিরাআত তরক করার কারণে তা ফাসেদ হওয়া প্রথম দুই রাকআত ফাসেদ হওয়াকে সাব্যস্ত করে না। যদি শুধু শেষ দুই রাকআতে কিরাআত পড়ে থাকে তাহলে সর্বসম্মতি ক্রমে প্রথম দুই রাকআতের কাজা করা ওয়াজিব হবে। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করা শুদ্ধ হয়নি। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে (শেষের দুই রাকআতের) শুরু করা যেমনিভাবে শুদ্ধ হয়েছে তেমনি তা আদায়ও হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি নফল নামাজের প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত পড়ে এবং শেষ দুই রাকআতে কিরাআত না পড়ে তাহলে সর্বসম্মতি ক্রমে শেষ দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। কেননা প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত পাঠ করার কারণে তাহরীমা বাতিল হয়নি বিধায় শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করা সহীহ হয়েছে। তবে কিরাআত তরক করার কারণে শেষের দুই রাকআত ফাসেদ হওয়ার দ্বারা প্রথম দুই রাকআত নষ্ট হবে না। যেহেতু প্রথম দুই রাকআত ফাসেদ হয়নি তাই এর কাজা ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে শেষের দুই রাকআত ফাসেদ হয়েছে বিধায় এর কাজা ওয়াজিব হবে।

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই হুকুম ঐ সময় যখন প্রথম দুই রাকআতের পর বৈঠক করবে। পক্ষান্তরে যদি দুই রাকআতের মাথায় বৈঠক না করে তাহলে চার রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। কিরাআত তরক করার কারণে শেষের দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। আর বৈঠক তরক করার কারণে প্রথম দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে।

মুসল্লী যদি শেষের দুই রাকআতে কিরাআত পড়ে এবং প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করে তাহলে সর্বম্মতি ক্রমে প্রথম দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। এই মাসআলার হুকুমের ক্ষেত্রে ইমামত্রয় সকলেই একমত। তবে তাখরীজের (تخريج)-এর ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে। অতএব যদি শেষের দু' রাকআতে কেউ তার ইক্তেদা (اقتداء) করে তাহলে তার ইকতেদা সহীহ হবে না। এমনিভাবে যদি শেষের দু' রাকআতে এই (ইক্তেদাকারী) ব্যক্তি অট্ট হাসি দেয় তাহলে তার অজু ভেঙ্গে যাবে না। যদি তাহ্রীমা বাতিল না হতো এবং শেষ দুই রাকআত আরম্ভ করা সহীহ হতো তাহলে তার ইক্তেদা করা জায়েজ হতো এবং অট্ট হাসি দ্বারা অজু ভেঙ্গে যেত।

মোটকথা হলো, প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করার দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে। আর তাহরীমা বাতিল হওয়ার কারণে শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করাই সহীহ হয়নি। আর যেহেতু শেষের দু' রাকআত আরম্ভ করা সহীহ হয়নি। তাই এর কাজা ওয়াজিব হবে না। শুধু প্রথম দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে তাহরীমা বাতিল হয় নি।

অতএব শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করা সহীহ হয়েছে। আর যেহেতু শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করা সহীহ হয়েছে। তাই তা আদায় করাও সহীহ হবে। সুতরাং শেষের দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে না। শুধু প্রথম দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে।

وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُخْرَيَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُولَيَيْنِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُولَيَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ قَضَاءُ الْأَرْبَعِ وَكَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ بَاقِيَةٌ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ قَضَاءُ الْأُولَيَيْنِ لِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ قَدْ إِرْتَفَعَتْ عِنْدَهُ وَقَدْ أَنْكَرَ أَبُويُوسُفَ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْهُ وَقَالَ رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ رَكْعَتَيْنِ وَمُحَمَّدٌ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ وَلَوقَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُولَيَيْنِ لَاغَيْرَ قَضَى أَرْبَعًا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ قَضَى رَكْعَتَيْنِ وَلَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ لَا غَيْرَ قَضَى أَرْبَعًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَايُصَلِّي بَعْدَ صَلٰوةٍ مِثْلَهَا يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ بِقِرَاءَةٍ وَرَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ فَيَكُونُ بَيَانُ فَرْضِيَّةِ الْقِرَاءَةِ فِي رَكَعَاتِ النَّفْلِ كُلِّهَا .

অনুবাদ ঃ যদি প্রথম দুই রাকআতে এবং শেষের দুই রাকআতের মধ্য হতে এক রাকআতে কিরাআত পড়ে থাকে তাহলে সর্বসম্মতি ক্রমে শেষ দুই রাকআত কাজা করতে হবে। আর যদি শেষ দুই রাকআতে এবং প্রথম রাকআতদ্বয়ের এক রাকআতে কিরাআত পড়ে তাহলে সর্বসম্মতি ক্রমে প্রথম দুই রাকআত কাজা করতে হবে। আর যদি উভয় অংশের এক এক রাকআতে কিরাত পড়ে থাকে তাহলে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মত তাই। কেননা তাহরীমা অব্যাহত রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে প্রথম দুই রাকআত কাজা করতে হবে। কেননা (প্রথম রাকআতের এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে) তার মতে তাহরীমা বাতিল হয়ে গিয়েছে। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে এই বর্ণনার কথা অস্বীকার করেছেন। (ইমাম মুহাম্মদ (র.) কে সম্বোধন করে) তিনি বলেছেন, আমি তোমাকে আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে এ বর্ণনা শুনিয়েছি যে, তাকে দুই রাকআত কাজা করতে হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে তার এ বর্ণনা প্রত্যাহার করেননি। যদি শুধু প্রথম দুই রাকআতের এক রাকআতে কিরাআত পড়ে তাহলে শাইখাইন (র.)-এর মতে চার রাকআত কাজা করবে। আর মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দুই রাকআত কাজা করবে। আর যদি শেষের দুই রাকআতের শুধু এক রাকআতে কিরাআত পড়ে তাহলে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) -এর মতে চার রাকআত কাজা করবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে দুই রাকআত কাজা করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, রাসূল ﷺ-এর হাদীস "কোনো নামাজের পর অনুরূপ নামাজ পড়বে না।" এর মর্ম হলো এরূপ পড়বে না যে, দুই রাকআত কিরআতসহ আর দু' রাকআত কিরাআত ছাড়া। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা নফলের সকল রাকআতে কিরাআত ফরজ হওয়া বয়ান করা উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উক্ত ইবারতে তিনটি সূরত উল্লেখ করা হয়েছে, ১. প্রথম দুই রাকআত এবং শেষের কোনো এক রাকআতে কিরাআত পড়েছে। এই সূরতে সর্বসম্মতি ক্রমে শেষের দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। ২. শেষ দুই রাকআত এবং প্রথম দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকাআতে কিরআত পড়েছে, এই সূরতে প্রথম দুই রাকআতের সর্বসম্মতি ক্রমে কাজা করা ওয়াজিব। ৩. প্রথম দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকআতে এবং শেষের দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকআতে কিরাআত পড়েছে। এই সূরতে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে চার রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আজম (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ -এর মতে প্রথম দুই রাকআতে একাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হচ্ছে– প্রথম দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মূলনীতি হলো প্রথম দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকআতে কিরাআত তরক করা তাহরীমা বাতিল হওয়ার কারণ। তাহরীমা বাতিল হওয়ার কারণে শেষের দুই রাকআত শুরু করাই সহীহ হয়নি। আর তা শুরু করা সহীহ না হওয়ার কারণে কাজা করা ওয়াজিব হবে না। বরং শুধু প্রথম দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসূফ

(র.)-এর মতে কিরাআত তরক করার কারণে তাহরীমা বাতিল হয়নি বিধায় শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করা সহীহ হয়েছে। শেষের দুই রাকআত শুরু করা বিশুদ্ধ হয়েছে। বিধায় উভয়ের এক এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে চার রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে।

وَقَدْ اَنْكَرَ اَبُوْ يُوْسُفَ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ : উক্ত ইবারতের মাধ্যমে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাযহাব বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এবং আবূ ইউসূফ (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য আছে। সারকথা হলো যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) উক্ত মাসআলায় জামেউস সগীর গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর বরাতে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, চার রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) "জামিউস সগীর গ্রন্থ সংকলন সমাপ্ত করার পর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-কে তা শুনালেন, তখন ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.) কে বললেন যে, আমি তোমার নিকট ইমাম আবূ হানীফার এই রিওয়ায়াত বা মত বর্ণনা করিনি। বরং আমি তোমার নিকট আবূ হানীফা (র.)-এর এই মত বর্ণনা করেছি যে, তার উপর দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বললেন যে, না। আপনি আমার নিকট এই রিওয়ায়েত বা মত বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে চার রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) স্বীয় স্মৃতি শক্তির উপর এত অটল থাকলেন যে, ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর অস্বীকার করার পরও তিনি তা প্রত্যাহার করলেন না। ভাষ্যকার মন্তব্য করেছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বর্ণনাই সঠিক। কেননা পূর্বে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করা তাহরীমা বাতিল হওয়ার কারণ। এক রাকআতে কিরাআত তরক করলে তাহরীমা বাতিল হয় না। উক্ত মাসআলায় এই সূরতই ধরে নেওয়া হয়েছে যে, উভয়ের এক এক রাকআতে কিরাআত পড়েছে এবং উভয়ের এক এক রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। অতএব যখন প্রথম দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে ইমাম আযম (র.)-এর মতে তাহরীমা বাতিল হয় না তাই শেষের দুই রাকআত শুরু করা সহীহ হবে। সুতরাং উভয়ের এক এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে চার রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে, দুই রাকআতের নয়।

وَلَوْ قَرَأَ فِىْ اِحْدَى الْاُوْلَيَيْنِ الخ : যদি কেউ প্রথম দুই রাকআতের মধ্যে হতে কোনো এক রাকআতে কিরাআত পড়ে এবং অবশিষ্ট রাকআতে কিরাত কেউ তরক করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে চার রাকআত কাজা করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে।

শাইখাইনের দলিল ঃ তাদের মতে তাহরীমা বিদ্যমান আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তো এই জন্য যে, প্রথম দুই রাকআতের মধ্য হতে এক রাকআতে কিরাআত তরক করার দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয় না। আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে কোনো অবস্থায়ই তাহরীমা বাতিল হয় না। তাদের মতে যেহেতু তাহরীমা বাতিল হয়নি; তাই শেষের দুই রাকআত শুরু করা শুদ্ধ হয়েছে এবং প্রথম شفع -এর এক রাকাআতে এবং দ্বিতীয় شفع -এর উভয় রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে চার রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হচ্ছে- প্রথম দুই রাকআতের এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে। তাই শেষ দুই রাকআত আরম্ভ করাই সহীহ হয় নি। যেহেতু আরম্ভ করা বৈধ হয়নি তাই এর কাজাও ওয়াজিব হবে না। অবশ্য প্রথম দুই রাকআতে এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে প্রথম দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে।

দ্বিতীয় মাসআলা ঃ যে শেষের দুই রাকআতের এক রাকআতে কিরাআত পড়েছে আর অবশিষ্ট তিন রাকআতে কিরআত তরক করেছে। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে চার রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর দলিল, তার মতে উক্ত সূরতে তাহরীমা বাতিল হয়নি বিধায় শেষ দুই রাকআতের শুরু করা বৈধ হয়েছে। যেহেতু সে প্রথম দুই রাকআতে এবং শেষ দুই রাকাআতের এক রাকআতে কিরাআত তরক করেছে তাই চার রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করার দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে। এ কারণে শেষ রাকআতদ্বয়ের আরম্ভ করা বৈধ হয়নি। কাজেই শেষ দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হওয়ার প্রশ্নই আসে না। অবশ্য প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে এর কাজা ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার هٰذِهِ الْمَسْئَلَةُ عَلٰى ثَمَانِيَةِ اَوْجُهٍ (এ মাসআলাটির আটটি সূরত) বলে যে আট সূরতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন অধম (জামীল সাহেব) সেগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করেছে এবং দলিলসহ এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষ ও উল্লেখ করা হয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর উক্তি "وَتَفْسِيْرُ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُصَلّٰى بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا" -এর দ্বারা নফলের প্রতি রাকআত কিরাআত ফরজের পক্ষে দলিল দিয়েছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো ফরজের মতো এরপর অনুরূপ চার রাকাআত পড়বে না অর্থাৎ দুই রাকআত কিরাতের সাথে আর দুই রাকআত কিরআত বিহীন বরং চার রাকআতের প্রতি রাকআতই কিরাআত সহ হবে। অতএব এ হাদীস দ্বারা নফলের প্রতি রাকআতে কিরাআত ফরজ হওয়া প্রমাণিত হলো।

وَيُصَلِّى النَّافِلَةَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلٰوةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلٰوةِ الْقَائِمِ وَلِاَنَّ الصَّلٰوةَ خَيْرُ مَوْضُوْعٍ وَرُبَمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فَيَجُوْزُ لَهُ تَرْكُهُ كَيْلَا يَنْقَطِعَ عَنْهُ وَاخْتَلَفُوْا فِىْ كَيْفِيَّةِ الْقُعُوْدِ وَالْمُخْتَارُ اَنْ يَقْعُدَ كَمَا يَقْعُدُ فِىْ حَالَةِ التَّشَهُّدِ لِاَنَّهُ عُهِدَ مَشْرُوْعًا فِى الصَّلٰوةِ.

অনুবাদ : দাঁড়ানোর সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বসে নফল পড়তে পারবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, বসা অবস্থার নামাজের ছওয়াব দাঁড়ানো অবস্থার নামাজের অর্ধেক। তাছাড়া নামাজ হলো শ্রেষ্ঠ ইবাদত (যা সব সময় আদায়যোগ্য) অথচ মাঝে মধ্যে দাঁড়ানো তার জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। তাই কিয়াম (قيام) তরক করা তার জন্য জায়েজ হবে। যাতে নামাজ পড়া হতে (শুধু এ কারণে) তাকে নিবৃত থাকতে না হয়। বসার ধরন সম্পর্কে আলিমগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তবে পছন্দনীয় (যা ফতোয়া রূপে গৃহীত) মত হচ্ছে– তাশাহহুদের অবস্থার ন্যায় বসবে। কেননা এটা নামাজে বসার সুন্নত তরীকা রূপে পরিচিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দাঁড়ানোর সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বসে নফল নামাজ পড়া জায়েজ আছে। দলিল রাসূল ﷺ বলেছেন, صَلٰوةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلٰوةِ الْقَائِمِ. অর্থ : বসা অবস্থায় নামাজের ছওয়াব দাঁড়ানো অবস্থায় নামাজের অর্ধেক। বসে নামাজ পড়া দুই কারণে হতে পারে। ওজরের কারণে বসে পড়া অথবা ওজর ছাড়া বসে পড়া। তবে এ ক্ষেত্রে প্রথমটি হতে পারে না। কেননা ওজরের কারণে বসে পড়া এবং দাঁড়িয়ে পড়া ছওয়াবের ক্ষেত্রে সমান। অতএব হাদীসের উদ্দেশ্য ওজর ছাড়া বসে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হলো।

প্রশ্ন : নামাজ দ্বারা ফরজ নামাজ উদ্দেশ্য না নফল নামাজ?

উত্তর : কারো মতেই এখানে ফরজ নামাজ উদ্দেশ্য নয়, কেননা ওজর ব্যতীত ফরজ নামাজ বসে পড়া জায়েজ নেই। অতএব উক্ত হাদীসে নামাজ দ্বারা নফল নামাজই উদ্দেশ্য। সারকথা, নফল নামাজ ওজর ছাড়া বসে পড়া জায়েজ আছে তবে দাঁড়িয়ে আদায় করা নামাজের অর্ধেক ছওয়াব হবে। দলিলে আকলী (دليل عقلى) বা যুক্তিভিত্তিক দলিল, নফল নামাজ ওয়াজিব নয়। যে জিনিস এমন অবস্থায় থাকে তাতে এমন শর্ত আরোপ করা ঠিক হবে না যা তা ছেড়ে দেওয়ার কারণ হয়। কেননা তরকে খায়র (ترك خير) বা কল্যাণকর বস্তু ছেড়ে দেওয়ার সবব (سبب) বা কারণ হওয়া খায়র (خير) বা ভাল হতে পারে না। নফল নামাজে কিয়ামের (قيام) শর্তারোপ করা নফল নামাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণ হতে পারে। কেননা কোনো কোনো সময় মুসল্লীর জন্য দাঁড়ানো কষ্টকর হয়। সুতরাং যদি নফল নামাজে দাঁড়ানোকে শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয় তবে মাঝে মধ্যে দাঁড়ানো কষ্টকর হওয়ার কারণে নফল নামাজ তরক করা লাযেম (لازم) আসবে। অথচ নফল নামাজ উত্তম ইবাদত যা সব সময়ে আদায় করা সম্ভব। এ কারণে নফল নামাজে কিয়াম (قيام)-এর শর্তারোপ করা হয়নি।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন– নফল নামাজের বৈঠকের কাইফিয়্যাত (كيفيت) বা অবস্থার ক্ষেত্রে আলিমগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে রিওয়ায়েত করেছেন যে, নফল আদায়কারী ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছামত মতো বসে নফল নামাজ পড়তে পারবে। কেননা তার জন্য যখন কিয়াম (قيام) ছাড়া জায়েজ আছে তাহলে তার জন্য বৈঠকের নির্দিষ্ট কাইফিয়্যাত (كيفيت) ছেড়ে দেওয়া অবশ্যই জায়েজ হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে হাবওয়া (حبوا.) বানিয়ে বসবে অর্থাৎ উভয় হাটু দাড় করে রাখবে এবং উভয় নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে দিবে এবং হস্তদ্বয় দিয়ে দুই হাটুতে পেঁচিয়ে ধরবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে, আসন পেতে বসবে। ইমাম যুফার (র.) বলেছেন, তাশাহহুদ অবস্থার ন্যায় বসবে। গ্রন্থকারের নিকট এমত-ই অধিক পছন্দনীয়। এটি ফতোয়া রূপে গৃহীত। কেননা এটা নামাজের বসার সুন্নত তরীকা রূপে পরিচিত।

وَاِنِ افْتَتَحَهَا قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ جَازَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَهٰذَا اِسْتِحْسَانٌ وَعِنْدَهُمَا لَايُجْزِيْهِ وَهُوَ قِيَاسٌ لِاَنَّ الشُّرُوْعَ مُعْتَبَرٌ بِالنَّذْرِ لَهُ اَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرِ الْقِيَامَ فِيْمَا بَقِىَ وَلِمَا بَاشَرَ صَحَّ بِدُوْنِهٖ بِخِلَافِ النَّذْرِ لِاَنَّهُ اِلْتَزَمَهُ نَصًّا حَتّٰى لَوْ لَمْ يَنُصَّ عَلَى الْقِيَامِ لَايَلْزَمُهُ الْقِيَامُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ وَمَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ تَنَفَّلَ عَلٰى دَابَّةٍ اِلٰى اَىِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ يُوْمِىْ اِيْمَاءً لِحَدِيْثِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ عَلٰى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ اِلٰى خَيْبَرَ يُوْمِىْ اِيْمَاءً وَلِاَنَّ النَّوَافِلَ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِوَقْتٍ فَلَوْ اَلْزَمْنَاهُ النُّزُوْلَ وَالْاِسْتِقْبَالَ تَنْقَطِعُ عَنْهُ النَّافِلَةُ اَوْيَنْقَطِعُ هُوَ عَنِ الْقَافِلَةِ اَمَّا الْفَرَائِضُ مُخْتَصَّةٌ بِوَقْتٍ وَالسُّنَنُ الرَّوَاتِبُ نَوَافِلُ وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اَنَّهُ يَنْزِلُ لِسُنَّةِ الْفَجْرِ لِاَنَّهَا اٰكَدُ مِنْ سَائِرِهَا وَالتَّقْيِيْدُ بِخَارِجِ الْمِصْرِ يَنْفِىْ اِشْتِرَاطَ السَّفَرِ وَالْجَوَازَ فِى الْمِصْرِ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ اَنَّهُ يَجُوْزُ فِى الْمِصْرِ اَيْضًا وَوَجْهُ الظَّاهِرِ اَنَّ النَّصَّ وَرَدَ خَارِجَ الْمِصْرِ وَالْحَاجَةُ اِلَى الرُّكُوْبِ فِيْهِ اَغْلَبُ.

অনুবাদ : যদি দাঁড়ানো অবস্থায় নামাজ শুরু করে তারপর ওজর ছাড়া বসে পড়ে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে জায়েজ হবে। এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াস। আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না। এটা হলো সাধারণ কিয়াস, কেননা আরম্ভ করা মান্নতের সাথে তুলনীয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর যুক্তি হচ্ছে– অবশিষ্ট নামাজে তো সে কিয়াম গ্রহণ করেনি। আর নামাজের যতটুকু অংশ সে আদায় করেছে কিয়াম ছাড়াই তার বিশুদ্ধতা রয়েছে। নযর বা মান্নতের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সে স্পষ্ট ভাষায় এই বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। এমনকি যদি কিয়ামের বিষয়টি স্পষ্ট না বলে থাকে তবে কোনো কোনো মাশায়েখের মতে তার জন্য কিয়াম জরুরি হবে না। যে ব্যক্তি শহরের বাহিরে রয়েছে সে তার সাওয়ারির জন্তুর উপর ইশারা করে নফল পড়তে পারবে। সাওয়ারি যেদিকে অভিমুখী হোক। কেননা বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, রাসূল ﷺ কে আমি খায়বর অভিমুখী হয়ে গাধার পিঠে ইশারা করে নামাজ পড়তে দেখেছি। (মুসলিম শরীফ) তা ছাড়া নফল বিশেষ কোনো ওয়াক্তের সথে সম্পৃক্ত নয়। এমতাবস্থায় যদি আমরা সাওয়ারি হতে নামা এবং কিবলামুখী হওয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক করে দেই তবে সে হয় নফল ছেড়ে দিবে অথবা কাফেলা থেকে পিছনে পড়ে যাবে। পক্ষান্তরে ফরজ নামাজগুলো নির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। নিয়মিত সুন্নত নামাজগুলো নফলের অন্তর্ভুক্ত। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত, এক রেওয়ায়াত মতে ফজরের সুন্নতের জন্য সাওয়ারি হতে নামতে হবে। কেননা এটা অন্যান্য সুন্নতের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। শহরের বাইরে হওয়ার শর্ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নিয়মিত সফর হওয়া শর্ত নয়। তদ্রূপ শহরের ভিতরে এরূপ আদায় করা জায়েজ হবে না। আব ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) হতে বর্ণিত এক মতে শহরেও জায়েজ আছে। জাহিরী রিওয়ায়াতের কারণ হচ্ছে– হাদীসটি শহরের বাইরের সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে। আর সাওয়ারির প্রয়োজনীয়তা শহরের বাইরেই বেশি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি দাঁড়ানো অবস্থায় নামাজ শুরু করে তারপর ওজর ছাড়া বসে পড়ে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে জায়েজ হবে না। প্রথম হুকুমটি ইসতিহাসন তথা সুক্ষ্ম কিয়াস ভিত্তিক, আর দ্বিতীয় হুকুমটি সাধারণ কিয়াস ভিত্তিক। সাহেবাইনের দলিল ঃ তারা নফল নামাজকে মান্নতের উপর কিয়াস করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নফল নামাজ পড়ার মান্নত করে তাহলে তার জন্য বসে পড়া জায়েজ হবে না। অনুরূপভাবে দাঁড়িয়ে নফল নামাজ আরম্ভ করলে তার জন্য তা বসে পড়া জায়েজ হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল, পূর্বে গেছে যে, কোনো জিনিস শুরু করার দ্বারা শুরুকৃত জিনিসটি ওয়াজিব হয় এবং যার উপর বিশুদ্ধতা বা সহীহ হওয়া নির্ভরশীল তাও ওয়াজিব বা আবশ্যক হয়। যেমন প্রথম রাকআতের সিহ্হাত (صحت) বা বিশুদ্ধতা দ্বিতীয় রাকআতের উপর নির্ভরশীল। অতএব নফল শুরু করার দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআত ওয়াজিব হবে। প্রথম রাকআত এই জন্য যে, তা আরম্ভ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় রাকআত এই জন্য যে, এর উপর প্রথম রাকআতের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল। কেননা এক রাকাআত নামাজ শরিয়তে নিষিদ্ধ। তবে উল্লেখিত মাসআলায় প্রথম রাকআত দাঁড়িয়ে শুরু করলেও এর বিশুদ্ধতা যেহেতু দ্বিতীয় রাকআত দাঁড়িয়ে পড়ার উপর নির্ভরশীল নয়, অতএব প্রথম রাকআত দাঁড়িয়ে পড়া দ্বিতীয় রাকআত দাঁড়িয়ে পড়াকে আবশ্যক করে না।

পক্ষান্তরে মান্নতের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা মান্নতের মধ্যে সে স্পষ্টভাবে নিজের উপর কিয়াম (قيام) কে লাযেম (لازم) বা আবশ্যক করে নিয়েছে। তাই দাঁড়িয়ে পড়লে মান্নত পূর্ণ হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ কিয়াম এর বিষয়টি স্পষ্ট না করে বরং শুধু বলেছে আমি নামাজ পড়ব। তাহলে কোনো কোনো মাশায়েখের মতে তার উপর কিয়াম জরুরি হবে না।

قَوْلُهُ وَمَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ الخ : শহরের বাইরে সওয়ারির উপর নামাজ পড়া জায়েজ আছে। ওজর থাক বা না থাক, নামাজ শুরু করার সময় কিব্‌লামুখী হোক বা না হোক। সাওয়ারি যেদিকে অভিমূখী হবে সেদিকে ফিরেই নামাজ পড়বে। তবে ইমাম শাফেঈ (র.) নামাজের শুরুতে কিব্‌লামূখী হওয়া ওয়াজিব বলেছেন। অতঃপর সওয়ারি যে দিকে অভিমূখী হবে সে দিকে মুখ করে নামাজ পড়বে। প্রকাশ থাকে যে, সওয়ারিতে নামাজ ইশারায় আদায় করবে। সিজদার জন্য ইশারাটি রুকূর এর ইশারা থেকে অধিক নিচু করবে।

ঐসবগুলোর দলিল হযরত ইবনে ওমর (র.)-এর হাদীস, رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ عَلٰى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلٰى خَيْبَر يُوْمِيْ إِيْمَاءً. আমি রাসূল ﷺ-কে গাধার উপর খায়বর মুখী হয়ে ইশারা করে নামাজ আদায় করতে দেখেছি।

আকলী দলিল (عقلى دليل : যুক্তি ভিত্তিক দলিল) ঃ সওয়ারির উপর নফল পড়া এই জন্য জায়েজ আছে যে, নফল কোনো ওয়াক্তের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এমতাবস্থায় যদি আমরা মুসল্লীর জন্য সওয়ারি হতে নামা এবং কিবলামূখী হওয়া আবশ্যক করে দেই তাহলে দুই অবস্থা। ১। হয়তো সে সওয়ারি হতে নেমে কিবলামুখী হবে ২। অথবা সওয়ারি হতে নামবে না এবং কিবলামূখীও হবে না। দ্বিতীয় অবস্থায় তার থেকে নফল ছুটে যাবে। কেননা সাওয়ারিতে থাকা অবস্থায় নফল পড়তে পারতেছে না। অথচ নফল শ্রেষ্ঠ ইবাদত, তা থেকে সে বঞ্চিত হলো। এমনিভাবে নফল নামাজের নেকি সব সময় হাসিল করা যায়। আর যদি দ্বিতীয় অবস্থা হয় অর্থাৎ সওয়ারি থেকে নেমে কিবলামূখী হয়ে নফল নামাজ পড়ে তাহলে সে কাফেলা হতে পিছনে পড়ে যাবে। এই ওজরের কারণে সওয়ারির উপর নফল নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

পক্ষান্তরে ফরজ নামাজগুলো নির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। অতএব নির্ধারিত সময়ে সওয়ারি থেকে নেমে কিবলামূখী হওয়ার মধ্যে কোনো জটিলতা বা সংকীর্ণতা নেই। এ কারণে সাওয়ারির উপর ফরজ নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। তবে হাঁ ওজরের কারণে সওয়ারির উপরে ফরজ পড়া জায়েজ আছে। যেমন চোরের ভয়, হিংস্র জন্তুর ভয় হয় যে, সওয়ারি হতে নেমে ফরজ নামাজ আদায় করলে সওয়ারি এবং এর সমান চোরে নিয়ে যাবে অথবা হিংস্র জন্তু ধ্বংস করে দিবে, অথবা জমিনে এমন কাঁদা অথবা গর্ত যে এর উপর সিজদা করা সম্ভব নয় অথবা সওয়ারিতে আরোহণকারী ব্যক্তি এমন বৃদ্ধ যে একবার সে সওয়ারি থেকে নামলে পুনরায় একা উঠতে পারবে না, উক্ত সূরতগুলোতে সওয়ারির উপর ফরজ নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে। কেননা মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا অর্থ– যদি তোমরা আশঙ্কা বোধ কর তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা সওয়ারিতে চড়ে নামাজ পড়।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে সুন্নতে মুয়াক্কাদা নফলের মতো সওয়ারিতে পড়া জায়েজ আছে। তবে বিত্র-এর নামাজ ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে সওয়ারিতে পড়া জায়েজ নেই। কেননা তাঁর মতে বিত্রের নামাজ ওয়াজিব। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে বিত্রের নামাজে সাওয়ারিতে পড়া জায়েজ আছে। কেননা তাদের মতে বিত্রের নামাজ সুন্নত। আর সুন্নত নফলের মতো সাওয়ারিতে পড়া জায়েজ আছে।

ইমাম আযম (র.)-এর একটি বর্ণনা হলো– ফজরের সুন্নত সাওয়ারি থেকে নেমে পড়বে। কেননা ফজরের সুন্নত অন্যান্য সুন্নতের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য উহার হুকুম অপরাপর সুন্নতের হুকুম থেকে ভিন্ন। ফকিহ ইবনে শুজা বলেন যে, আমার মনে হয় যে এ হুকুম উত্তম, জরুরি নয়।

قَوْلُهُ وَالتَّقْيِيْدُ بِخَارِجِ الْمِصْرِ الخ : -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– এই শর্তের (শহরের বাইরে) দ্বারা দু'টি জিনিস সাব্যস্ত করা হয়েছে, (এক) সাওয়ারির উপর নফল নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য মুসাফির হওয়া শর্ত নয়; বরং শহরের বাইরে থাকাই যথেষ্ট, চাই সে মুকীম হোক বা মুসাফির হোক।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, সওয়ারির উপর নফল জায়েজ হওয়াটা মুসাফিরের সঙ্গে নির্দিষ্ট। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ৪৮ মাইলের নিয়ত করে শহর থেকে বের হবে তার জন্য সাওয়ারির উপর নামাজ পড়া জায়েজ হবে। দলিল হলো, ইশারার দ্বারা নামাজ জায়েজ হয়েছে জরুরত বা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে। মুকীম অবস্থায় যেহেতু কোনো জরুরত বা প্রয়োজন নেই তাই মুকীম অবস্থায় নফল নামাজ সওয়ারির উপরে পড়া জায়েজ হবে না। তবে বিশুদ্ধমত হচ্ছে– এ হুকুমে মুসাফির এবং মুকীম সকলের ক্ষেত্রে সমান অর্থাৎ উভয়েই সওয়ারিতে নফল পড়তে পারবে। তবে শর্ত হলো যে, শহরের বাইরে হতে হবে।

প্রশ্ন ঃ শহর থেকে কতটুকু দূরে হতে হবে?

জবাব ঃ এ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে– মবসূত নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক মাইল দূর হতে হবে। কোনো কোনো ফকীহের মতে যেখান থেকে মুসাফিরের জন্য কসর (قصر) পড়া জায়েজ হয়, সেখান থেকে সাওয়ারিতে নফল পড়া জায়েজ হবে। (দুই) শহরের ভিতরে সাওয়ারির উপর নফল পড়া জায়েজ নেই। কেননা শহরের বাইরে সওয়ারির উপরে নামাজ খিলাফে কিয়াস (خلاف قياس) হাদীসের দ্বারা সাবিত হয়েছে। শহর শহরের বাইরের হুকুমের মধ্যে শামিল নয়। অতএব শহরের ক্ষেত্রে কিয়াসের উপর আমল করা হবে অর্থাৎ সাওয়ারির উপর নফল নামাজ পড়বে না। পক্ষান্তরে শহরের বাইরে খেলাফে কিয়াস হাদীসের উপর আমল করা হবে। অর্থাৎ সওয়ারির উপর নফল নামাজ পড়বে।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, শহরের ভিতরেও বিলা কারাহাত (بلاكراهت) সওয়ারির উপর নফল পড়া জায়েজ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, কারাহাতের (كراهت) সাথে জায়েজ হবে।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর দলিল ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ الْحِمَارَ فِي الْمَدِيْنَةِ يَعُوْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَكَانَ يُصَلِّيْ وَهُوَ رَاكِبٌ .

অর্থ– নবীজী ﷺ মদীনায় গাধার উপর আরোহণ করে সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.)-এর বীমারদারী (শুশ্রূষা) করতে গেলেন এবং তখন তিনি সওয়ারিতে নামাজ পড়েছিলেন। এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, শহরে সাওয়ারির উপর নফল নামাজ পড়া জায়েজ আছে। ইবনে হুমাম (র.) লিখেছেন যে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন যে, শহরে সাওয়ারির উপরে নফল নামাজ পড়া জায়েজ নেই। তখন ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট উক্ত হাদীস পেশ করলেন, এ হাদীস শ্রবণ করে তিনি মাথা উঁচু করেন নি। কোনো কোনো আলিম বলেন যে, মাথা উঁচু না করার মর্ম হলো যে, তিনি পূর্বের মতো প্রত্যাহার করেছেন এবং রাসূল ﷺ -এর হাদীসের সামনে মাথা নত করেছেন অর্থাৎ রাসূলের হাদীস মাথা পেতে মেনে নিয়েছেন। কোনো আলিম বলেছেন রাসূল ﷺ -এর শহরে সাওয়ারির উপরে নফল নামাজ পড়াটা বিরল (شاذ) ঘটনা। আর বিরল (شاذ) ঘটনা শরিয়তের প্রমাণ্য দলিল হয় না। অতএব এ হাদীস ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিরুদ্ধে দলিল হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিলও এই হাদীস। কিন্তু তার নিকট মাকরূহ হওয়ার কারণ হল যে, শহরে ভীড় বেশি থাকে বিধায় কিরাআত ভুল হওয়া থেকে নিরাপদে থাকে না। এ কারণে শহরে সাওয়ারির উপরের নফল নামাজ পড়া মাকরূহ। যাহিরুর রিওয়ায়েতের কারণ হল যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর উক্ত হাদীস শহরের বাইরের জন্য বর্ণিত হয়েছে। আর সাওয়ারির প্রয়োজনীয়তা শহরের বাইরেই বেশি। অতএব শহরকে বাইরের উপর কিয়াস করা যাবে না।

فَإِنِ افْتَتَحَ التَّطَوُّعَ رَاكِبًا ثُمَّ نَزَلَ يَبْنِي وَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً نَازِلًا ثُمَّ رَاكِبًا اِسْتَقْبَلَ لِأَنَّ إِحْرَامَ الرَّاكِبِ اِنْعَقَدَ مُجَوِّزًا لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُوْدِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى النُّزُوْلِ فَإِذَا أَتَى بِهِمَا صَحَّ وَإِحْرَامُ النَّازِلِ اِنْعَقَدَ لِوُجُوْبِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُوْدِ فَلَايَقْدِرُ عَلَى تَرْكِ مَالَزِمَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَعَنْ أَبِيْ يُوسُفَ (رح) أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ إِذَانَزَلَ أَيْضًا وَكَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ (رح) إِذَا نَزَلَ بَعْدَ مَا صَلَّى رَكْعَةً وَالْأَصَحُّ هُوَ الظَّاهِرُ ـ

অনুবাদ : যদি নফল নামাজ সাওয়ার অবস্থায় শুরু করে তারপর সাওয়ারি থেকে নেমে যায় তাহলে বিনা (بناء) করবে। আর যদি নামা অবস্থায় এক রাকআত পড়ে তারপর আরোহণ করে তাহলে নতুন ভাবে শুরু করবে। কেননা নামতে সক্ষম হওয়ার কারণে আরোহীর তাহরীমা সংগঠিত হয়েছে রুকূ সাজ্‌দার বৈধতা সহকারে। সুতরাং যখন সে নেমে রুকূ সাজদা আদায় করবে তখন তা জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে অবতরণ কারীর তাহ্‌রীমা রুকূ সাজদা ওয়াজিবকারী রূপে সংগঠিত হবে। সূতরাং যা তার উপর বাধ্যতা মূলক হয়ে গিয়েছে, তা সে বিনা ওজরে তরক করতে পারবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে একটি বর্ণনা আছে যে, সাওয়ারি হতে নামলেও নতুন করে পড়বে। তদ্রূপ ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক রাকাআত পড়ার পর অবতরণ করলে নতুন করে শুরু করবে। তবে উপরোক্ত যাহিরী রিওয়ায়তই হল অধিকতর বিশুদ্ধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো ব্যক্তি সওয়ারিতে ইশারায় নফল নামাজ আরম্ভ করে তারপর সওয়ারি থেকে মাটিতে নেমে যায় তাহলে সে বিনা (بناء) করবে। নতুন করে নামাজ পড়ার দরকার নেই।

দলিলের পূর্বে একটি ভূমিকা উপলব্ধি করা আবশ্যক। ভূমিকা হলো যে, এক নামাজকে অন্য নামাজের উপর বিনা করা ঐ সময় জায়েজ হয় যখন একই তাহরীমা উভয় নামাজকে শামিল করে। পক্ষান্তরে যদি একই তাহরীমা উভয় নামাজকে শামিল না করে তাহলে বিনা করা জায়েজ হবে না।

মূল দলিল হচ্ছে– সওয়ারির উপর আরোহণ করে যে, তাহরীমা বাধা হয়েছে এতে রুকূ সাজদা ইশারায় আদায় না করে রুকূ সাজদা সহকারে আদায় করাও জায়েজ আছে। কেননা সে বাতিলকারী না হয়েও সওয়ারি থেকে নেমে রুকূ সাজদা করতে সক্ষম। অতএব, সে যে নামাজ সওয়ারিতে ইশারায় পড়েছে এবং যে নামাজ সওয়ারি হতে নেমেও রুকূ সাজদার সাথে পড়েছে; উভয়কে একই তাহরীমা শামিল করে বিধায় একটি অপরটির উপর বিনা করা সহীহ হবে। সওয়ারি থেকে নেমে মাটিতে যে তাহরীমা বেধেছে তা রুকূ সাজদা ওয়াজিবকারী রূপে সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ সওয়ারি থেকে নামার কারণে রুকূ-সাজদা করা ওয়াজিব হয়েছে। ইশারা ওয়াজিব হয়নি। কেননা বাতিলকারী হওয়া ছাড়া সে সওয়ারীতে আরোহণ করতে সক্ষম হবে না। আর বাতিলকারী হওয়া আমলে কাসীর (عمل كثير) রূপে গণ্য। অতএব সে যে নামাজ জমিনে রুকূ সাজদা সহ পড়েছে। আর যে নামাজ সওয়ারিতে আরোহণ করে ইশারায় পড়েছে, ঐ দুটোকে একই তাহরীমা শামিল করে না, বিধায় দুটোর মধ্য হতে একটির বিনা অপরটির উপর সহীহ হবে না।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি সাওয়ারির উপর নফল নামাজ শুরু করে তারপর জমিনে নেমে আসে তাহলে বিনা করবে না। বরং নতুন করে নামাজ পড়বে। দলিল ঐ সূরতে দুর্বলের উপর শক্তিশালী জিনিসের বিনা করা হচ্ছে। কেননা যে নামাজ সওয়ারিতে ইশারায় আদায় করেছে তা দুর্বল। আর যে নামাজ সওয়ারি থেকে নেমে জমিনে রুকূ সাজদা করে আদায় করেছে তা শক্তিশালী। শক্তিশালী জিনিসের বিনা দুর্বলের উপর জায়েজ নেই। যেমন যে রুগী ইশারায় নামাজ পড়ে সে যদি নামাজের মাঝে রুকূ-সাজদা করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে নতুন করে নামাজ পড়তে হবে। যাতে শক্তিশালী জিনিসের বিনা দুর্বলের উপর না হয়।

জবাব ঃ আমাদের পক্ষ থেকে উত্তরে ঐ ভূমিকা উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে, যা অধম ভূমিকা হিসাবে উল্লেখ করেছে। সুস্পষ্ট করা হলো যে, ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর কিয়াস ফাসিদ। কেননা যে রুগী রুকূ সাজদা করতে অক্ষম, তার তাহরীমা অক্ষমতার কারণে রুকূ সিজদাকে শামিল করবে না। অতএব তাহরীমা যাকে শামিল করেনা তার বিনা এ জিনিসের উপর কিভাবে জায়েজ হবে যাকে তাহরীমা শামিল করে। এ কারণে যে রুগী রুকূ সাজদা করতে অক্ষম সে যদি নামাজের মাঝে রুকূ সাজদা করতে সক্ষম হয় তাহলে তার বিনা সহীহ হবে না। পক্ষান্তরে যদি কেউ সওয়ারিতে নফল নামাজ আরম্ভ করে তারপর সওয়ারি হতে নেমে যায়, তাহলে তার জন্য বিনা সহীহ হবে। কেননা সওয়ারিতে যে তাহরীমা বেঁধেছিল তা রুকূ সাজদাকে বৈধ করে। বিধায় এই তাহরীমা ঐ নামাজকে শামিল করে যা সওয়ারিতে পড়েছে এবং ঐ নামাজকেও শামিল করে যা সওয়ারি থেকে নেমে রুকূ সাজদা করে আদায় করেছে। মোটকথা তাহরীমা উভয়কে শামিল করার কারণে একটির বিনা অপরটি উপর সহীহ হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি সওয়ারিতে এক রাকআত পূর্ণ করে নেমে আসে তাহলে নতুনভাবে পড়বে বিনা করবে না। কেননা এক রাকআতও নামাজ। অতএব এ ক্ষেত্রে শক্তিশালীকে দুর্বলের উপর বিনা করবে না। পক্ষান্তরে যদি এক রাকআত পূর্ণ না করে সওয়ারি থেকে নেমে আসে তাহলে বিনা করতে পারবে। কেননা এক রাকআতপূর্ণ হওয়ার পূর্বে শুধু তাহরীমা পাওয়া গিয়েছে। তাহরীমা নামাজের শর্ত। যে শর্ত দুর্বলের জন্য সংঘটিত হয়েছে তা শক্তিশালীর জন্যও শর্ত হবে। যেমন যে অজু নফলের জন্য করা হয়েছে তা ফরজের জন্যও যথেষ্ট। অতএব এক রাকআতে পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নেমে আসলে বিনা করতে পারবে। এতে শক্তিশালীর বিনা দুর্বলের উপর হচ্ছে না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন যে, মতনে উল্লেখিত প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ এবং এটিই যাহিরুর রিওয়ায়াত।

فَصْلٌ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ : يُسْتَحَبُّ اَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَيُصَلِّيْ بِهِمْ اِمَامُهُمْ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ كُلُّ تَرْوِيْحَةٍ بِتَسْلِيْمَتَيْنِ وَيَجْلِسُ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيْحَتَيْنِ مِقْدَارَ تَرْوِيْحَةٍ ثُمَّ يُوْتِرُبِهِمْ ذَكَرَ لَفْظَ الْاِسْتِحْبَابِ وَالْاَصَحُّ اَنَّهَا سُنَّةٌ كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِاَنَّهُ وَاظَبَ عَلَيْهَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيَّنَ الْعُذْرَ فِيْ تَرْكِهِ الْمُوَاظَبَةَ وَهُوَ خَشْيَةُ اَنْ تُكْتَبَ عَلَيْنَا ـ

অনুচ্ছেদ : কিয়ামে রামাজান

অনুবাদ : মোস্তাহাব হলো, মানুষ রমজান মাসে ইশার পরে একত্র হবে এবং ইমাম সাহেব তাদেরকে নিয়ে পাঁচ তারবীহা (অর্থাৎ চার চার রাকআতী সালাত) পড়বেন। প্রতিটি তারবীহা (চার রাকআত) দুই সালামে হবে এবং প্রতিটি তারবীহার পর এক তারবীহা পরিমাণ সময় বসবে। এরপর ইমাম সাহেব তাদেরকে নিয়ে (জামাআতে) বিতর পড়বেন। ইমাম কুদূরী (র.) মোস্তাহাব শব্দটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকতর বিশুদ্ধ মতে– তা সুন্নত। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে তাই বর্ণনা করেছেন। কেননা খোলাফায়ে রাশেদীন [ওমর (রা.) ওসমান (রা.) এবং আলী (রা.) এই তিন খলীফা] তা নিয়মিত আদায় করেছেন। আর মহানবী ﷺ নিজে নিয়মিত আদায় বর্জন করার কারণ বর্ণনা করেছেন যে, তাহলে আমাদের উপর ফরজ হয়ে যাওয়ার আশংকা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা ঃ তারাবীহ-এর নামাজ যেহেতু নফল হতে এক ধাপ ভিন্ন, এই জন্য মুসান্নিফ (র.) তারাবীহকে আলাদা অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। সাধারণ নফল হতে তারাবীহের কয়েক দিক থেকে ভিন্নতা আছে। ১. সাধারণ নফলে জামাআত নেই। পক্ষান্তরে তারাবীহতে জামাআত আছে ২. নফলের রাকআত সীমাবদ্ধ নয়; পক্ষান্তরে তারাবীহ-এর রাকআত সীমাবদ্ধ ৩. নফল কোনো সময়ে সাথে নির্দিষ্ট নয় পক্ষান্তরে তারাবীহ রমজানের রাত্রের সাথে নির্দিষ্ট। ৪. তারাবীহ-এর মধ্যে পবিত্র কুরআন একবার খতম করা সুন্নত; পক্ষান্তরে নফলের মধ্যে সুন্নত নয়।— (ইনায়া)

হিদায়া গ্রন্থকার কিয়ামে রামাজানের শিরোনাম হাদীসের অনুসরণে গ্রহণ করেছেন। যেমন হাদীসে আছে اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ মহান আল্লাহ তোমাদের উপর রমজানের রোজা ফরজ করেছেন। আর আমি তোমাদের জন্য কিয়ামকে সুন্নত করেছি।— (ইবন মাজাহ) যেহেতু হাদীসে কিয়ামে রমজান এসেছে এ কারণেই শিরোনাম ঐ শব্দ দ্বারাই চয়ন করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (রা.) বলেন, রমজান মাসে ইশার ফরজ আদায় করার পর তারবীহের উদ্দেশ্যে মানুষের একত্রিত হওয়া মোস্তাহাব। লোকদেরকে নিয়ে ইমাম সাহেব পাঁচটি তারবীহা দুই সালামের সাথে আদায় করবেন এবং প্রতিটি তারবীহের সাথে এক তারবীহা পরিমাণ আরামের জন্য বসে থাকবে। এর পর ইমাম সাহেব তাদেরকে নিয়ে বিতর নামাজ পড়বেন।

ইনায়া গ্রন্থকার লিখেছেন, তারবীহা চার রাকাআত নামাজকে বলা হয়। আর তারবীহা এর অর্থ শান্তি দেওয়া। যেহেতু চার রাকআতের পর চার রাকআত সমপরিমাণ সময় আরামের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেহেতু প্রতি চার রাকআতকে এর তারাবীহ বলা হয়। ইমাম কুদূরী (র.) এর ইবারত দ্বারা বুঝা যায় যে, তারাবীহ-এর নামাজ মোস্তাহাব। তবে হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে বিশুদ্ধমত হচ্ছে– পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য তারাবীহ সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে অদ্রূপ বর্ণিত আছে যে, তারাবীহ সুন্নতে মোয়াক্কাদা। দলিল হলো, খুলাফায়ে রাশিদীন নিয়মিতভাবে সর্বদ. তারাবীহ-এর নামাজ পড়েছেন। রাসূল ﷺ বলেছেন عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ অর্থ– তোমার আমার সুন্নত ধর, আমার পর খোলাফায়ে রাশেদীনের বা চার খলীফার সুন্নত ধর। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, যেরূপ রাসূল ﷺ-এর কৃত আমল ও গৃহীত পথকে সুন্নত বলে তদ্রূপ খুলাফায়ে রাশেদার কৃত আমল ও গৃহীত পথকেও সুন্নত বলে। এখানে একটি

বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা বাঞ্ছনীয় যে, হিদায়া গ্রন্থের ইবারতে খুলাফা (خلفاء) শব্দটি অধিকাংশের প্রতি লক্ষ্য করে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, এখানে খুলাফা দ্বারা ওমর (রা.), ওসমান (রা.) এবং আলী (রা.) তিন খলীফা উদ্দেশ্য। কেননা নিয়মতান্ত্রিকভাবে জামাআতের সাথে বিশ রাকআত তারাবীহ এর সূচনা হযরত ফারুকে আযম (রা.)-এর খিলাফতকালে হয়েছে। এর পূর্বে লোকেরা একাকিভাবে তারাবীহ পড়তেন। হযরত ওমর (রা.) বলেন যে, إِنِّي أَرٰى أَنْ أَجْمَعَ النَّاسَ عَلٰى إِمَامٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمْ عَلٰى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَصَلّٰى بِهِمْ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً আমি লোকদেরকে এক ইমামের পিছনে সমবেত করা সমীচীন মনে করলাম, অতঃপর ওমর (রা.) তাদেরকে উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর পিছনে একত্রিত করলেন। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) তাঁদের পাঁচ তারাবীহায় বিশ রাকআত নামাজ পড়ালেন।

প্রশ্ন ঃ যদি তারাবীহ-এর নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদা হয় তাহলে রাসূল ﷺ তা নিয়মিত পড়লেন না কেন।

উত্তর ঃ হিদায়া গ্রন্থকার এ প্রশ্নের উত্তরের প্রতি ইশারা করেছেন। রাসূল ﷺ নিয়মিত আদায় বর্জন করার কারণ বর্ণনা করেছেন যে, আমি নিয়মিত আদায় করলে উম্মতের উপর ফরজ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এই জন্যে নিয়মিত আদায় করিনি। কখনো কখনো ছেড়ে দিয়েছি। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ لَيَالِ رَمَضَانَ وَصَلّٰى عِشْرِيْنَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ اِجْتَمَعَ النَّاسُ فَخَرَجَ وَصَلّٰى بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ كَثُرَ النَّاسُ فَلَمْ يَخْرُجْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ عَرَفْتُ اِجْتِمَاعَكُمْ لٰكِنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ فَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَهَا فُرَادٰى إِلٰى زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ.

অর্থ ঃ রাসূল ﷺ রমজানের কোনো এক রাত্রে তাশরীফ আনলেন এবং লোকদেরকে বিশ রাকাআত নামাজ পড়ালেন। যখন দ্বিতীয় রাত আসল তখন লোকেরা একত্রিত হলেন, রাসূল ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং লোকদেরকে নিয়ে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়লেন। যখন তৃতীয় রাত আসল তখন অনেক লোক একত্রিত হলেন। রাসূল ﷺ তাশরীফ আনলেন না। বললেন যে, আমি তোমাদের সমবেত হওয়ার কথা জেনেছি। তবে আমার অশঙ্কা হয় ঐ নামাজ তোমাদের উপর ফরজ হয়ে যাওয়ার (এজন্য বের হইনি)। হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতের আগ পর্যন্ত লোকেরা একাকী তারাবীহ পড়তেন।

প্রশ্ন ঃ তারাবীহ-এর নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদা। তাহলে ইমাম কুদূরী একে মুস্তাহাব কেন বললেন?

উত্তর ঃ পূর্ববর্তী মাশায়িখে কিরাম (مشايخ متقدمين) মোস্তাহাব শব্দকে অতি উত্তম বা বেশি ভাল এর জন্য ব্যবহার করেছেন যে, "বেশি ভাল" শব্দটি ওয়াজিবকেও শামিল করে। (অর্থাৎ সুন্নতকে তো শামিল করেই) হতে পারে যে মোস্তাহাব শব্দটি এখানে এই অর্থে ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ তারাবীহ-এর জন্য সমবেত হওয়া বেশি ভাল ও বড় মর্যাদাপূর্ণ জিনিস এবং তা সুন্নত। দ্বিতীয় উত্তর ঃ ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র.) লোকদের সমবেত হওয়াকে মোস্তাহাব বলেছেন, তারাবীহ-এর নামাজকে মোস্তাহাব বলেন নি। ইমাম কুদূরী (র.)-এর উত্তরের সারকথা হলো পবিত্র রমজানে ইশার নামাজের পর লোকদের সমবেত হওয়া মোস্তাহাব তবে তারাবীহ এর নামাজ সুন্নত।

তৃতীয় উত্তর ঃ কোনো কোনো সহীহ রিওয়ায়াত দ্বারা সাবিত হয় যে, রাসূল ﷺ বিতরসহ তারাবীহ বিশ রাকআত পড়েছেন। আবার কোনো কোনো রিওয়ায়াত দ্বারা তারাবীহ বিশ রাকআত সাবিত হয়। এগার রাকআত আবূ সালমা ইবনে আবদুর রহমান (র.) -এর হাদীস দ্বারা সাবিত হয়। যার শব্দ নিম্নরূপ,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَاغَيْرِهٖ عَلٰى إِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً ـ (فتح القدير)

অর্থ ঃ আবূ সালমা ইবনে আবদুর রহমান (র.) বলেন যে, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রমজানে রাসূল ﷺ-এর নামাজ কিরূপ ছিল ? তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি রমজান ও রমজানের বাইরে এগার রাকআতের অধিক নামাজ পড়েন নি। (তন্মধ্যে আট রাকআত তারাবীহ। তিন রাকআত বিত্র)। এবং ইবনে আব্বাস (রা.) -এর রিওয়ায়াত দ্বারা তারাবীহ বিশ রাকআত সাবিত হয় যেমন– ইরশাদ হয়েছে, إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ ـ (فتح القدير)

অর্থ ঃ রাসূল ﷺ রমজানে বিশ রাকআত পড়তেন বিত্র ব্যতীত। (ফতহুল কাদীর) কোনো কোনো আলিম উক্ত হাদীস দ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করেছেন। আট রাকআত তারাবীহ সুন্নত, বিতর ব্যতীত। আর বিশ রাকআত তারাবীহ মোস্তাহাব। হতে পারে যে কুদূরী গ্রন্থকার উক্ত মতের ভিত্তিতে তারাবীহ-এর নামাজকে মোস্তাহাব বলেছেন।

وَالسُّنَّةُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ لٰكِنَّ عَلٰى وَجْهِ الْكِفَايَةِ حَتّٰى لَوِامْتَنَعَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ عَنْ اِقَامَتِهَا كَانُوْا مُسِيْئِيْنَ وَلَوْ اَقَامَهَا الْبَعْضُ فَالْمُتَخَلِّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ تَارِكٌ لِلْفَضِيْلَةِ لِاَنَّ اَفْرَادَ الصَّحَابَةِ يُرْوٰى عَنْهُمُ التَّخَلُّفُ وَالْمُسْتَحَبُّ فِى الْجُلُوْسِ بَيْنَ التَّرْوِيْحَتَيْنِ مِقْدَارُ التَّرْوِيْحَةِ وَكَذَا بَيْنَ الْخَامِسَةِ وَبَيْنَ الْوِتْرِ لِعَادَةِ اَهْلِ الْحَرَمَيْنِ وَاسْتَحْسَنَ الْبَعْضُ الْاِسْتِرَاحَةَ عَلٰى خَمْسِ تَسْلِيْمَاتٍ وَلَيْسَ بِصَحِيْحٍ وَقَوْلُهٗ ثُمَّ يُوْتِرُ بِهِمْ يُشِيْرُ اِلٰى اَنَّ وَقْتَهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ قَبْلَ الْوِتْرِ وَبِهٖ قَالَ عَامَّةُ الْمَشَائِخِ وَالْاَصَحُّ اَنَّ وَقْتَهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ اِلٰى اٰخِرِ اللَّيْلِ قَبْلَ الْوِتْرِ وَبَعْدَهٗ لِاَنَّهَا نَوَافِلُ سُنَّتْ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ الْقِرَاءَةِ وَاَكْثَرُ الْمَشَائِخِ (رح) عَلٰى اَنَّ السُّنَّةَ فِيْهَا الْخَتْمُ مَرَّةً فَلَا يُتْرَكُ لِكَسْلِ الْقَوْمِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ مِنَ الدَّعَوَاتِ حَيْثُ يَتْرُكُهَا لِاَنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ وَلَا يُصَلِّى الْوِتْرَ بِجَمَاعَةٍ فِىْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَيْهِ اِجْمَاعُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : তারাবীহ-এর নামাজ জামাআতে পড়া সুন্নত। তবে তা সুন্নতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া সুতরাং কোনো মসজিদের মুসল্লীরা যদি তারাবীর জামাআত কায়েম করা হতে বিরত থাকে, তাহলে সকলে গুনাহগার হবে। আর যদি কিছু সংখ্যক লোক তা কায়েম করে, তাহলে অন্যরা শুধু জামাআতের ফজিলত হতে বঞ্চিত হবে। কেননা কিছু সংখ্যক সাহাবী তারাবীর জামাআতে হাজির হননি বলেও বর্ণিত আছে। দুই তারবীহার মধ্যে এক তারবীহা পরিমাণ সময় বসা মোস্তাহাব। তদ্রূপ পঞ্চম তারাবিহা ও বিতরের মাঝেও (ঐ পরিমাণ বসা মোস্তাহাব)। কেননা হারামাইনের অধিবাসীদের মধ্যে এরূপ চলে আসছে। আবার কেউ কেউ পাঁচ সালামের পর বিশ্রাম নেওয়া" উত্তম বলেছেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। ইমাম কুদূরী (র.)-এর উক্তি "অতঃপর তিনি তাদেরকে নিয়ে বিত্‌র পড়বেন"। এটি এদিকে ইঙ্গিত করে যে, তারাবীহ-এর সময় হলো ইশার নামাজের পর বিতরের আগে। আর অধিকাংশ মাশায়েখগণ এ মতই পোষণ করেছেন। তবে বিশুদ্ধতম মত হলো, তারাবীর সময় হলো ইশার পর হতে শেষ রাত পর্যন্ত। এটা বিতরের পূর্বেও হতে পারে, পরেও হতে পারে। কেননা তারাবীহ হলো নফল বিশেষ, যা ইশার পরে আদায় করার জন্য সুন্নত হিসাবে প্রবর্তিত হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) কিরাতের পরিমাণ উল্লেখ করেননি, তবে অধিকাংশ মাশায়েখের মতে সুন্নত হলো তারাবীহর নামাজে কুরআন খতম করা। সুতরাং মুসল্লীদের অলসতার কারণে তা বাদ দেওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে তাশাহ্হুদের পরে দু'আগুলো বাদ দেওয়া যেতে পারে। কেননা এগুলো সুন্নত নয়। রমজান ছাড়া অন্য কোনো সময় জামাআতের সাথে বিত্‌র পড়বে না। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ইজ্‌মা রয়েছে। (আল্লাহই উত্তম জানেন)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, অধিকাংশ মাশায়িখে কিরামের মতে তারাবীর জামাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া। অতএব যদি কোনো মসজিদের অধিবাসীরা তারাবীর জামাআত তরক করে, তাহলে সকলে গুনাহগার হবে। তবে যদি কিছু সংখ্যাক লোক তা কায়েম করে এবং অন্যরা তা তরক করে, তাহলে জামাআতে অনুপস্থিত ব্যক্তিরা ফজিলত তরককারী হবে।

দলিল হলো যে, কিছু সংখ্যক সাহাবী (রা.)-এর তারাবীর জামাআতে শরিক না হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা একাকী তারাবীর নামাজ পড়েছেন। ইমাম তাহাবী (র.) ইবনে ওমর (রা.) এবং ওরওয়া ইব্‌নে যুবাইর (রা.) -এর সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন।

কোনো কোনো আলিম তারাবীর জামাআতকে সুন্নতে আইন অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য সুন্নত বলেছেন। অতএব তাঁদের মতে যদি কেউ একাকি তারাবীর নামাজ আদায় করে তাহলে সুন্নত তরকের কারণে গুনাহ্‌গার হবে। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) হতে বর্ণিত আছে, যদি সুন্নত কিরাতের রিয়ায়েত (رعايت) করে বাড়িতে তারাবীহ পড়া সম্ভব হয়, তাহলে একাকি তারাবীহ পড়া জায়েজ হবে বাড়িতে। পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তি প্রখ্যাত প্রবীণ ফকিহ্ হয় এবং সাধারণ জনমানুষ তার আমলের অনুসরণ করে থাকে, তাহলে বাড়িতে তারাবীর নামাজ আদায় করা সমীচীন হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর দলিল,

عَلَيْكُمْ بِالصَّلٰوةِ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ خَيْرَ صَلٰوةِ الْمَرْأِ فِىْ بَيْتِهٖ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ .

অর্থ ঃ রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা অবশ্যই গৃহে (নফল) নামাজ পড়। কেননা মানুষের গৃহের নামাজই শ্রেষ্ঠ নামাজ ফরজ ব্যতীত। উক্ত দলিলকে ওলামায়ে আহনাফ এ ভাবে খণ্ডন করেছেন যে, রমজানের তারাবীর নামাজ উক্ত হুকুমের ব্যতিক্রম। কেননা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ মসজিদে এসে তারাবীর নামাজ পড়েছেন আর যখন মসজিদে আসেননি তখন তিনি পরবর্তিতে না আসার কারণ বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং খোলাফায়ে রাশিদীনের আমলও তদ্রূপ ছিল যে, তারা তারাবীর নামাজ জামাআতের সাথে মসজিদে পড়েছেন। এ কারণে ওজর ব্যতীত তারাবীর জামাআত তরক করার অনুমতি নেই।

قَوْلُهٗ وَالْمُسْتَحَبُّ فِى الْجُلُوْسِ الخ : এই ইবারতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুই তার্‌বীহার মধ্যে এবং পঞ্চম তারবীহা বিত্‌রের মাঝে বসা মোস্তাহাব। দলিল হলো মক্কা ও মদীনাবাসীদের অভ্যাস তথা আমল এমনই ছিল। মক্কার অধিবাসীরা দুই তারবীহার মাঝে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতেন। পক্ষান্তরে মদীনার অধিবাসীরা তার পরিবর্তে চার রাক'আত নফল নামাজ পড়তেন।

তবে প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের ইখ্‌তিয়ার আছে যে, দুই তারবীহার মাঝে তাসবীহ পড়বে অথবা কলেমা তায়্যেবা পাঠ করবে অথবা নিরবে অপেক্ষা করবে। ফত্‌হুলকাদীর এর গ্রন্থকার আল্লামা ইব্‌নে হুমাম (র.) এবং ইনায়া গ্রন্থকার লিখেছেন যে, প্রতি দুই তারবীহার মাঝে নীরবে বসে অপেক্ষা করা মোস্তাহাব। কেননা তারাবীহ (تراويح) এবং তারবীহা (ترويحه) রাহাত (راحت) আরাম হতে নির্গত। অতএব এমন কাজ করবে যাতে আরাম হাসিল হয়। বলা বাহুল্য যে নীরব থাকার মাঝেই আরাম। অতএব নিরবে বসে অপেক্ষা করা উত্তম এবং মোস্তাহাব হবে।

আশরাফুল হিদায়ার লেখক বলেন যে, উক্ত বক্তব্যে অধমের আপত্তি আছে। তা হলো নিঃসন্দেহে তারাবীহ (تراويح) রাহাত (راحت) হতে নির্গত। কিন্তু পার্থিব আরামই শুধু উদ্দেশ্য, এমন নয়; বরং অনেক সময় পারলৌকিক আরামও উদ্দেশ্য হয়। বলা বাহুল্য যে, পারলৌকিক আরাম নীরবে বসে থাকার মাঝে নেই; বরং নেক আমলের মাঝে নিহিত রয়েছে। অতএব ঐ সময়ে তাসবীহ পাঠ করবে, অথবা কলেমা তায়্যেবা পড়বে, অথবা নফল পড়বে। আল্লাহই ভাল জানেন (জামীল আহমদ)

আবার কেউ কেউ পাঁচ সালামের (অর্ধেক তারাবীহ) পর বিশ্রাম নেওয়া উত্তম বলেছেন। কিন্তু ইহা সঠিক নয়।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, হিদায়া গ্রন্থকারের এই ইবারত وَالْمُسْتَحَبُّ فِى الْجُلُوْسِ-এর মধ্যে তাসামুহ (تسامح) অর্থাৎ ভুল আছে – কেননা উক্ত ইবারতের দ্বারা বুঝা যায় যে, দুই তারবীহার মাঝে বসা মুস্‌তাহাব। এর দলিল হিসাবে পেশ করেছেন হারামাইনের অধিবাসীদের অভ্যাস। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কার অধিবাসীরা (দুই তারবীহার মাঝে) তাওয়াফ করতেন। আর মদীনার অধিবাসীরা নফল নামাজ পড়তেন।

বুঝা গেল যে দুই তারবীহার মাঝে বসে থাকা তাঁদের অভ্যাস ছিল না; বরং অপেক্ষা করা তাঁদের অভ্যাস ছিল। তা বসে হোক বা না বসে হোক। এজন্য এরূপ বলা সমীচীন ছিল وَالْمُسْتَحَبُّ فِى الْاِنْتِظَارِ بَيْنَ التَّرْوِيْحَتَيْنِ مِقْدَارُ التَّرْوِيْحَةِ অর্থ দুই তারবীহার মাঝে এক তারবীহা পরিমাণ অপেক্ষা করা মোস্তাহাব।— (ইনায়া, ফত্‌হুল কাদীর, কিফায়া)

وَقَوْلُهٗ ثُمَّ يُوْتِرُ بِهِمْ الخ – এই ইবারতে তারাবীহের নামাজের সময় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তারাবীহের সময় ঈশার পর বিতরের আগে। আর অধিকাংশ ফকীহদের মত এরূপই। পক্ষান্তরে যদি কেউ ঈশার আগে এবং বিতরের পরে তারাবীহের নামাজ পড়ে তাহলে তারাবীহের নামাজ সহীহ হবে না কেননা তারাবীর ইল্‌ম সাহাবাদের কর্মের দ্বারা হাসিল

হয়েছে। অতএব সাহাবারা যে সময় তারাবীহের নামাজ পড়েছেন, ঐ সময়ই তারাবীহের সময় হিসেবে গণ্য হবে। তবে একথা স্বীকৃত যে, সাহাবারা ইশার পর এবং বিত্‌রের পূর্বে তারাবীহ পড়েছেন। সুতরাং তারাবীর জন্য এটিই অনুমোদিত সময় হবে। বলখের মাশায়েখদের মত হলো যে, পূর্ণরাত সুব্‌হি সাদিক পর্যন্ত তারাবীর সময়, ইশার আগেও ইশার পরেও। কেননা তারাবীর নামাজের নাম হলো "কিয়ামুল লাইল" (قيام الليل) বা রাতের নামাজ সুতরাং এর সময় (পূর্ণ) রাত হবে।

তবে বিশুদ্ধতম মত হলো তারাবীর নামাজের সময় ইশার পর থেকে শেষ রাত পর্যন্ত। বিতরের আগেও (বিতরের) পরেও। কেননা তারাবীহ নফল, যা ইশার পরে পড়ার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব তারাবীর নামাজ ইশার নামাজের তাবে (تابع) বা অনুগামী। আর সাধারণ নিয়ম হলো, তাবে (تابع) মত্‌বূ (متبوع) বা পূর্বগামীর পর হয়। অতএব তারাবীর নামাজ ইশার পরে হবে, পূর্বে হবে না।

তারাবীর নামাজ রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। কেউ কেউ বলেছেন রাত্রের অর্ধেকাংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। কিন্তু যদি অর্ধেক রাত্রের পর তারাবীহ পড়ে তাহলে কারো কারো মতে মাকরূহ হবে। কেননা তারাবীহ ইশার নামাজের তাবে (تابع) আর ইশা অর্ধেক রাত্রের পর মাকরূহ, সুতরাং অর্ধেক রাত্রের পর তারাবীহ ও মাকরূহ হবে।

তবে বিশুদ্ধতম মত হলো যে অর্ধেক রাত্রের পর তারাবীহ মাকরূহ নয়। কেননা তারাবীহ হলো রাত্রের নামাজ। আর রাত্রের নামাজ শেষ রাত্রে উত্তম। সুতরাং তারাবীর নামাজ শেষ রাত্র পর্যন্ত বিলম্ব করা উত্তম মাকরূহ নয়।

قوله ولم يذكر قدر القراءة الخ : হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মাতিন (ماتن) এ ব্যাপারে কোনো কিছুই বর্ণনা করেননি যে, তারাবীর বিশ রাকআত নামাজে কি পরিমাণ কুরআন পড়তে হবে? তবে এ সম্পর্কে ফকীহ্‌দের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, তারাবীর প্রতি দুই রাক'আতে মাগরিবের দুই রাক'আতের সমপরিমাণ কিরাআত পড়বে। কেননা তারাবীর নামাজ নফল। আর নফল ফরজের তুলনায় হালকা হয়। অতএব তারাবীহর কিরাতের পরিমাণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ছোট কিরাআত ওয়ালা ফরজ অর্থাৎ মাগরিবের উপর কিয়াস করা হবে। কিন্তু এ অভিমতটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা পূর্ণ মাসে এ পরিমাণ কিরআত পড়ার দ্বারা তারাবীহতে পূর্ণ কুরআন খতম হবে না। অথচ তারাবীহতে এক বার কুরআন খতম করা সুন্নত। কেউ কেউ বলেছেন, তারাবীর প্রতি দুই রাক'আতে ইশার সমপরিমাণ কিরাআত পড়বে। কেননা তারাবীহ ইশার তাবে (تابع)। হাসন ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আযম (র.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, প্রতি রাক'আতে দশ আয়াত সমপরিমাণ কিরাআত পড়বে। এটাই হলো বিশুদ্ধতম অভিমত। কেননা এতে মানুষের জন্য সহজ হবে এবং পূর্ণ কুরআন খতম করার সুন্নতও আদায় হবে। ত্রিশ রাত্রে তারাবীর ছয় শত রাক'আত নামাজ হয়। আর পবিত্র কুরআনের আয়াতের সংখ্যা ছয় হাজারের কিছু বেশি। অতএব যখন প্রতি রাক'আতে দশ আয়াত তিলাওয়াত করবে তাহলে এক মাসের তারাবীহতে পূর্ণ কুরআন খতম হয়ে যাবে এবং এটাই সুন্নত। হিদায়া গ্রন্থকারের মত হলো, তারাবীতে একবার কুরআন খতম করা সুন্নত। এমনকি অলসতার কারণেও সুন্নত তরক করা যাবে না। কিফায়া নামক গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, দুই বার কুরআন খতম করা উত্তম। আর মুজতাহিদীনে উম্মতগণ তো এক দশকের মধ্যে এক খতম করতেন।

ইমামুল হুমাম কুদ্‌ওয়াতুল আনাম ইমামে রাব্বানী আবূ হানীফা (র.) রমজান মাসে একষট্টি বার কুরআন খতম করতেন। ত্রিশ খতম রমজানের রাত্রে, ত্রিশ খতম রমজানের দিনে এবং তারাবীহ্‌তে এক খতম, মোট একষট্টি খতম। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) হে আল্লাহ! তুমি স্বীয় মকবূল বান্দার সমাধি নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমি পাপিষ্টের গুনাহও ক্ষমা করে দাও। (আমিন)

পক্ষান্তরে তাশাহ্‌হুদের পরবর্তী দোয়ার বিধান হলো যে, যদি আত্‌তাহিয়্যাতু (التحيات)-এর পরের দোয়াসমূহ পড়া মুক্তাদীর জন্য কঠিন হয়, তাহলে তা তরক করলে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা তা সুন্নত নয়। তবে আত্‌তাহিয়্যাতুর পর দরুদ শরীফ পড়া উচিত। তা তরক করবে না। কেননা দরুদ পরা ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে ফরজ। সাবধানতার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের মতেও তা পড়বে।

قوله ولا يصلى الخ : রমজান ছাড়া অন্যান্য মাসে বিত্‌রের নামাজ জামাআত সাথে অনুমোদিত নয়। কেননা বিত্‌র একদিক থেকে নফল। আর রমজান ছাড়া নফল জামাআতসহ পড়া মাকরূহ। তবে পবিত্র রমজানে বিতর জামআতে পড়া মাকরূহ নয়। কিন্তু উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য আছে। আল্লামা ইব্‌নে হুমাম (র.) বলেছেন, যে রমজান মাসে বিতর জামাআতে পড়া উত্তম। কেননা ওমর (রা.) বিতর জামাআতের সহিত পড়তেন। আবূ আলী নাসাফী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের আলিমদের নিকট বিতর জামাআতের সাথে না পড়া উত্তম। কেননা হযরত উবাই ইব্‌নে কাআব (রা.) বিত্‌র জামাআতের সাথে পড়তেন না। (আল্লাহই উত্তম জানেন)

بَابُ إِدْرَاكِ الْفَرِيْضَةِ

وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الظُّهْرِ ثُمَّ أُقِيمَتْ يُصَلِّيْ أُخْرٰى صِيَانَةً لِلْمُؤَدّٰى عَنِ الْبُطْلَانِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ إِحْرَازًا لِفَضِيْلَةِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدِ الْأُوْلٰى بِالسَّجْدَةِ يَقْطَعُ وَيَشْرَعُ مَعَ الْإِمَامِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِأَنَّهُ بِمَحَلِّ الرَّفْضِ وَالْقَطْعُ لِلْإِكْمَالِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي النَّفْلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِكْمَالِ وَلَوْكَانَ فِي السُّنَّةِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ فَأُقِيْمَ أَوْ خُطِبَ يَقْطَعُ عَلٰى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ يُرْوٰى ذٰلِكَ عَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ وَقَدْ قِيْلَ يُتِمُّهَا .

পরিচ্ছেদ ঃ জামাআত পাওয়া বা তাতে শামিল হওয়ার মাসাইল

অনুবাদ : কোনো ব্যক্তি এক রাক'আত পড়ল, তারপর ইকামাত হলো, তাহলে সে আরেক রাক'আত পড়ে নেবে, আদায়কৃত অংশকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য। এরপর লোকদের সাথে (জামাআতে) শামিল হবে, জামাআতের ফজিলত হাসিল করার জন্য। আর যদি প্রথম রাক'আতে সেজদা না দিয়ে থাকে তাহলে নামাজ ছেড়ে দিয়ে ইমামের সাথে নামাজ শুরু করবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত। কেননা সে ছেড়ে দেওয়ার স্থানে রয়েছে। আর আমল ভঙ্গ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ রূপে আদায় করা। তবে নফলের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন রূপ। কেননা তা ভঙ্গ করা পূর্ণাঙ্গ রূপে আদায় করার জন্য নয়। আর যদি যুহর বা জুমু'আর পূর্ববর্তী সুন্নত নামাজে রত থাকে, আর এমতাবস্থায় ইকামত বা খুৎবা শুরু হয়; তাহলে (জামাআতের ফজিলত হাসিল করার জন্য) দুই রাক'আতের মাথায় নামাজ শেষ করে দিবে। এটা ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) হতে বর্ণিত। কারো কারো মতে চার রাক'আত পূর্ণ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : পূর্বের অধ্যায়গুলোতে ফরজ, ওয়াজিব এবং নফলের আলোচনা করা হয়েছে। আর এ অধ্যায়ে নামাজ পূর্ণভাবে আদায় অর্থাৎ জামাআতের সাথে আদায় করার আলোচনা করা হয়েছে।

কোনো ব্যক্তি একাকী যুহরের নামাজ শুরু করে এক রাকআত পূর্ণ করেছে অর্থাৎ সেজদাও করেছে। তারপর যদি ইমাম জামাআতে নামাজ শুরু করে। তাহলে সে আর এক রাক'আত পড়ে দুই রাক'আতের মাথায় সালাম ফিরাবে। তবে এক রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাবে না। উক্ত বিধানের দলিল হলো, যদি এক রাক'আতের মাথায় সালাম ফিরায় তাহলে এ রাক'আত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা হাদীসে صَلَاةُ بُتَيْرَاء তথা এক রাক'আত নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং আদায়কৃত রাক'আতকে বাতিল হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য দ্বিতীয় রাক'আত পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুই রাক'আতের মাথায় সালাম ফিরানোর পর এই ব্যক্তি ইমামের সাথে জামাআতে শরিক হবে যাতে জামাআতের ফজিলত হাসিল করতে পারে। আর এ হুকুমটি এমন যেমন কোনো ব্যক্তি জুমার দিন জামে মসজিদে যুহরের নামাজ শুরু করল এবং এক রাক'আত পূর্ণ করল। অতঃপর জুমার নামাজ শুরু করা হলো। তাহলে এ ব্যক্তি এক রাক'আতের সাথে আরো এক রাক'আত মিলাবে। অতঃপর দুই রাকাতের মাথায় সালাম ফিরাবে এবং জুমার ফজিলত হাসিল করার নিমিত্তে জুমার নামাজে শরিক হবে। তবে এখানে ইনায়া গ্রন্থকার একটি প্রশ্ন উত্তরসহ উত্থাপন করেছেন ।

প্রশ্ন ঃ যুহরের নামাজ হলো ফরজ। অপর দিকে জামাআতে শরিক হওয়া সুন্নত। অতএব একাকী যুহরের নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি সুন্নত আদায় করার জন্য ফরজ কিভাবে বাতিল করবে?

উত্তর ঃ যুহরের যে ফরজ একাকী শুরু করা হয়েছিল, তা সুন্নত আদায় করার জন্য ভেঙ্গে দেওয়া হয়নি; বরং ফরজকে পূর্ণাঙ্গ রূপে আদায় করার জন্য ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য যে اكمال। বা পূর্ণাঙ্গ রূপে আদায় করার জন্য ভেঙ্গে দেওয়াও ইক্মাল (اكمال।) বা পূর্ণাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। যেমন মসজিদ পুনঃনির্মাণের জন্য ভেঙ্গে দেওয়া ছওয়াবের কাজ। আজাবের কারণ নয়। প্রকাশ থাকে যে, জামাআতের সাথে নামাজে একাকী নামাজ পড়ার তুলনায় সাতাশ গুণবেশি ছওয়াব।

কুদূরী গ্রন্থকার দ্বিতীয় সূরত বর্ণনা করেছেন, যদি সে ব্যক্তি প্রথম রাক'আতের সিজদা না করে, এমতাবস্থায় জামাআত দাঁড়ায়, তাহলে নামাজ ভেঙ্গে ইমামের সাথে জামাআতে শরিক হবে। আর এটিই হলো বিশুদ্ধ মত এবং ফখরুল ইসলাম বযদুবীর মতও এটিই। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, এ (দ্বিতীয়) সূরতেও দু'রাক'আত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। অতঃপর ইমামের সাথে জামাআতে শরিক হবে এবং শাম্সুল আইম্মা সারাখ্সী (র.)-এর মতও এটিই। শাম্সুল আইম্মা সারাখ্সী (র.)-এর দলিল প্রথম রাক'আতের সিজদা করার পূর্বে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও সে নামাজে রত; কিন্তু পক্ষান্তরে তা কুরবত ও ইবাদত। আর জামাআত হলো সুন্নত মাত্র, আর সুন্নতের রিয়ায়ত করে ইবাদত বাতিল করা কিভাবে জায়েজ হবে? যেমন কোনো ব্যক্তি নফল নামাজ আরম্ভ করল এবং প্রথম রাক'আতের সিজদা করেনি, এমতাবস্থায় ফরজ নামাজের জামাআত শুরু হলো। তাহলে নফল পড়নেওয়ালা ব্যক্তি নফল নামাজ ছেড়ে দিবে না; বরং দুই রাক'আত পূর্ণ করে ইমামের সাথে জামাআতে শরিক হবে। অতএব যেহেতু প্রথম রাক'আতের সিজদা না করার সূরতে নফল নামাজ ভেঙ্গে দেওয়া হয় না, তাহলে ফরজ তো কোনো ক্রমেই ভেঙ্গে দেওয়া যাবে না।

তবে বিশুদ্ধতম মতের দলিল হলো প্রথম রাক'আতের সিজদা দেওয়ার পূর্বে তা ভেঙ্গে দেওয়া জায়েজ হওয়াটা তার নযীর হয়ে যাবে। যদি কোনো ব্যক্তি চতুর্থ রাক'আতের মাথায় না বসে পঞ্চম রাক'আতের জন্য দাঁড়ায়, তাহলে পঞ্চম রাক'আতের সাজদা করার পূর্ব পর্যন্ত সেটা (পঞ্চম রাক'আত) ভেঙ্গে দিতে পারে। অর্থাৎ পঞ্চম রাক'আতের সিজদা করার পূর্বেই সে শেষ বৈঠকের দিকে ফিরে আসতে পারে। তার উপর ৬ষ্ঠ রাক'আত মিলানো জরুরি নয়। তবে তার উপর ফরজকে বাতিল করার যে اشكال। লাজেম আসছে।

সে ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে এভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, এখানে ভঙ্গ করার উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে আদায় করা بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِى النَّفْلِ - এর দ্বারা শামসুল আইম্মাসারাখসী (র.) -এর নফলের উপর কিয়াসের জবাব দিয়েছেন। জবাবের সারসংক্ষেপ হলো যে, যুহরের ফরজকে ভেঙ্গে জামাআতে শরিক হওয়া ফরজ পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করার জন্য অর্থাৎ জামাআতের ফজিলত আদায় করার জন্য। পক্ষান্তরে নফলকে ভেঙ্গে দেওয়া পূর্ণাঙ্গ রূপে আদায় করার জন্য হয় না। সুতরাং এই পার্থক্যের কারণে ফরজকে নফলের উপর কিয়াস করা জায়েজ হবে না।

আর যদি যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নত নামাজ শুরু করা অবস্থায় যুহরের জামাআত আরম্ভ হয়। অথবা জুমার পূর্বে সুন্নতের নিয়ত করা অবস্থায় ইমাম জুমার খুৎবা আরম্ভ করে, তাহলে উক্ত সূরতদ্বয়ের হুকুম হলো দুই রাক'আত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। অতঃপর যুহরের জামাআতে এবং খুৎবায় শরিক হবে। আর এ হুকুম ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) হতে বর্ণিত হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, চার রাক'আত পূর্ণ করে যুহরের জামাআতে এবং খুৎবায় শরিক হবে। কেননা যুহরের এবং জুমার চার রাকআত একই নামাজ হিসেবে গণ্য বিধায় তাকে দুভাগে বিভক্ত করবে না; বরং চার রাকা'আত এক সাথে পড়বে।

যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ সুগদী (র.) বলেন যে, আমি এরূপ ফতোয়া দিতাম যে, যুহরের পূর্বে চার রাক'আতের নিয়ত করা অবস্থায় জামাআত শুরু হলে চার রাক'আত সুন্নত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। পক্ষান্তরে নফল নামাজে দুই রাক'আতের মাথায় সালাম ফিরাবে। কিন্তু যখন আমি নাওয়াদির গ্রন্থে ইমাম আযম (র.)-এর এ রিওয়ায়াত দেখলাম যে, "জুমার সুন্নত শুরু করার পর যদি ইমাম সাহেব খুৎবার জন্য বের হয় এমতাবস্থায় যদি এক রাক'আত পূর্ণ হয়, তাহলে দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে"। তখন আমি স্বীয় ফতোয়া প্রত্যাহার করলাম এবং ইমাম আযম (র.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়াতের অনুসারী হয়ে গেলাম।

وَلَوْ كَانَ قَدْ صَلّٰى ثَلٰثًا مِنَ الظُّهْرِ يُتِمُّهَا لِاَنَّ لِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ فَلَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ فِى الثَّالِثَةِ بَعْدُ وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِالسَّجْدَةِ حَيْثُ يَقْطَعُهَا لِاَنَّهُ بِمَحَلِّ الرَّفْضِ وَيَتَخَيَّرُ اِنْ شَاءَ عَادَ فَقَعَدَ وَسَلَّمَ وَاِنْ شَاءَ كَبَّرَ قَائِمًا يَنْوِى الدُّخُولَ فِى صَلٰوةِ الْاِمَامِ وَاِذَا اَتَمَّهَا يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ وَالَّذِى يُصَلِّى مَعَهُمْ نَافِلَةٌ لِاَنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَكَرَّرُ فِى وَقْتٍ وَاحِدٍ ـ

অনুবাদ : আর যদি যুহরের তিন রাক'আত পড়ে থাকে তবে তা পূর্ণ করে নিবে। কেননা لِاَنَّ لِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ অধিকাংশের উপর সমষ্টির বিধান প্রযোজ্য হয়। সুতরাং তা ভঙ্গ করার কোনো অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে যদি সে তৃতীয় রাক'আতে রত থাকে এবং এখনও তার সাথে সিজদা না মিলায়। তবে এ ক্ষেত্রে তা ভঙ্গ করে ফেলবে। কেননা সে ভঙ্গ করার অবস্থানে অবস্থিত। এমতাবস্থায় তার ইখ্‌তিয়ার আছে। ইচ্ছা করলে সে ফিরে এসে বসবে এবং সালাম ফিরাবে আর ইচ্ছা করলে দাঁড়ানো অবস্থানে থেকেই ইমামের নামাজে শরিক হওয়ার নিয়তে তাক্‌বীর বলবে। আর যখন যুহরের নামাজ পূর্ণ করে ফেলবে তখন জামাআতে শামিল হয়ে যাবে। তবে জামাআতের সাথে যা পড়বে তা নফল হবে। কেননা এক ওয়াক্তে ফরজের পুনরাবৃত্তি হতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো ব্যক্তি তিন রাক'আত পড়ার পর জামাআত দাঁড়ায়, তাহলে সে চার রাক'আত পূর্ণ করবে। কেননা সে নামাজের অধিকাংশ পড়ে ফেলেছে, আর অধিকাংশের উপর সমষ্টির হুকুম প্রযোজ্য হয়ে থাকে। এর দ্বারা নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার উপক্রম হয়। আর যদি কোনো ব্যক্তি নামাজ থেকে প্রকৃতপক্ষে ফারিগ হয় তাহলে তার নামাজ ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব যখন ফারিগ হওয়ার উপক্রম হবে তখনও নামাজ ভেঙ্গে যাবে না বলে ধরা হবে। পক্ষান্তরে যদি সে ব্যক্তি এখনও তৃতীয় রাকআতের সিজদা না করে তাহলে নামাজ ভেঙ্গে জামাআতে শরিক হবে। সুতরাং যখন উক্ত অবস্থায় নামাজ ভেঙ্গে দেওয়ার ইচ্ছা করল তবে তার ইচ্ছাধীন রয়েছে, ইচ্ছা করলে তৃতীয় রাক'আতের কিয়াম তরক করে বসে সালাম ফিরাবে যাতে নামাজ শরিয়ত অনুমোদিত পন্থায় সমাপ্ত হয়। তবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার তাশাহ্‌হুদ বসা অবস্থায় পড়বে কি পড়বে না।

কেউ কেউ বলেছেন, তাশাহ্‌হুদ পড়বে। কেননা প্রথম দুই রাক'আতের বৈঠকটি শেষ বৈঠক ছিল না; বরং এটিই শেষ বৈঠক। আর শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ পড়া ওয়াজিব। অতএব এ ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার তাশাহ্‌হুদ পড়তে হবে।

আর কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম তাশাহ্‌হুদই যথেষ্ট। কেননা বসার দিকে ফিরে আসার কারণে তৃতীয় রাক'আতের কিয়াম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অতএব ধরে নেওয়া হবে যে তৃতীয় রাকআতের কিয়াম একেবারেই পাওয়া যায়নি। সুতরাং এ বৈঠকই শেষ বৈঠক হিসেবে গণ্য হবে। আর এতে পূর্বে তাশাহ্‌হুদ পড়া হয়েছে। তাই দ্বিতীয়বার আবার তাশাহ্‌হুদ পড়ার প্রয়োজন নেই। তবে এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে যে, এ বৈঠকে এক দিকে সালাম ফিরাবে না উভয় দিকে সালাম ফিরাবে?

কারো কারো মতে দুই সালাম ফিরাবে। কেননা নামাজ হতে বের হওয়ার জন্য শরিয়ত কর্তৃক দুই সালামই অনুমোদিত। কারো কারো মতে এক সালামই যথেষ্ট। কেননা দ্বিতীয় সালাম মূলত নামাজ হতে বের হওয়ার জন্য ধার্যকরা হয়েছে। এখানে যেহেতু নামাজ হতে বের হচ্ছে না; বরং আংশিকভাবে নামাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, তাই এক সালামই যথেষ্ট।

আর ইচ্ছা করলে দাঁড়ানো অবস্থায় ইমামের সাথে নামাজে শরিক হওয়ার জন্য তাক্‌বীরও বলতে পারবে। কেননা এর দ্বারা জামআতের ফজিলত হাসিল করার প্রতি দ্রুত অগ্রসর হওয়া বুঝায়– যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কাজ। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমরা তোমাদের প্রতিপালক কর্তৃক ক্ষমার প্রতি দ্রুত ধাবিত হও।

তবে তাক্‌বীর বলার সময় তার ইখতিয়ার আছে হাত কান পর্যন্ত উঠাতে পারে, নাও উঠাতে পারে। মতনে উল্লেখ রয়েছে যে, একাকী তিন রাক'আত পড়ার পর জামাআত দাঁড়িয়ে গেলে, সে জোহরের চার রাক'আত পূর্ণ করবে। অতঃপর মুক্‌তাদীদের সাথে জামাআতে শামিল হবে। তবে জামাআতে শামিল হওয়া জরুরি নয়। কেননা জামাআতের নামাজ তার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে। আর পূর্বে একাকী আদায়কৃত নামাজ যুহরের ফরজ হিসেবে গণ্য হবে। অতএব জামাআতে আদায়কৃত নামাজকেও যদি ফরজ ধরা হয় তাহলে এক ওয়াক্তে একই ফরজ দুই বার আদায় করা লাজেম আসবে। অথচ এক ওয়াক্তে ফরজের পুনরাবৃত্তি অনুমোদিত নয়; বরং এক ওয়াক্তে একটি ফরজ অনুমোদিত। নফল নামাজ যেহেতু জরুরি বা ওয়াজিব নয়। তাই জামাআতে শামিল হওয়া জরুরি নয়। তবে জামাআতে শামিল হয়ে নফল পড়া উত্তম। কেননা মুক্‌তাদীদের সাথে শরিক হওয়ার দ্বারা জামাআত হতে বিমুখ হওয়ার অপবাদ দূর হবে। অন্যথায় অযথা জামাআত হতে বিমুখ হওয়ার দোষারোপ করা হবে।

প্রশ্ন ঃ কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রমজান ব্যতীত অন্য মাসে জামাআতের সাথে নফল পড়া মাকরূহ অথচ উক্ত আলোচ্য মাস্‌আলায় জামাআতে নফল পড়া লাজেম আসছে, তার কারণ কি?

উত্তর ঃ মাকরূহ ঐ সময় হবে যখন ইমাম এবং মুক্‌তাদী উভয় নফল পড়বে। পক্ষান্তরে যদি ইমাম ফরজ এবং মুক্‌তাদী নফল পড়ে, তাহলে মাকরূহ হবে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَغَ مِنَ الظُّهْرِ فَرَأَى رَجُلَيْنِ فِيْ أُخْرَيَاتِ الصُّفُوْفِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهٗ فَقَالَ عَلَيَّ بِهِمَا فَأُتِيَ بِهِمَا وَفَرَائِصُهُمَا تَرْتَعِدُ فَقَالَ عَلٰى رِسْلِكُمَا فَإِنِّيْ إِبْنُ امْرَأَةٍ كَانَتْ تَأْكُلُ الْقَدِيْرَ ثُمَّ قَالَ مَا لَكُمَا لَمْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَا كُنَّا صَلَّيْنَا فِيْ رِحَالِنَا ـ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا صَلَّيْتُمَا فِيْ رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا صَلَاةَ قَوْمٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ وَاجْعَلَا صَلَاتَكُمَا مَعَهُمْ سُبْحَةً أَيْ نَافِلَةً ـ(عنايه، كفايه)

অর্থ ঃ একদা রাসূল ﷺ যুহরের নামাজ হতে ফারিগ হলেন তখন সর্বশেষ কাতারে দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তাঁরা রাসূল ﷺ-এর পিছনে নামাজ পড়েননি। রাসূল ﷺ বললেন, তাঁদেরকে আমার নিকট নিয়ে এসো, তাঁদেরকে রাসূল ﷺ-এর নিকট আনা হলো। ভয়ে তাদের স্কন্দ থরথর করে কাঁপতে ছিল। তখন রাসূল ﷺ তাঁদেরকে বল্‌লেন, তোমরা শান্ত হও! (ভয় করো না) আমি এমন মহিলার ছেলে, যিনি শুকনা গোশত খেতেন অর্থাৎ আমি গরিব পরিবারের সন্তান। অতঃপর রাসূল ﷺ তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমরা আমাদের সাথে নামাজ পড়নি কেন? তারা উত্তর দিলেন যে, আমরা আমাদের বাড়িতে নামাজ পড়েছি। তখন রাসূল ﷺ তাঁদেরকে সম্বোধন করে বল্‌লেন, যদি তোমরা নিজ বাড়িতে নামাজ পড়। অতঃপর কোনো দলের বা জামাআতের নামাজের সময়ে উপস্থিত হয়ে যাও। তাহলে তাঁদের সাথেও নামাজ পড়তে। আর তাঁদের সাথে যে নামাজ আদায় করা হবে, তা নফল হিসাবে গণ্য করবে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, যদি ইমাম ফরজ আদায় করে আর মুকতাদী নফল পড়ে, তাহলে তা মাকরূহ হবে না।

فَإِنْ صَلَّى مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً ثُمَّ أُقِيمَتْ يَقْطَعُ وَيَدْخُلُ مَعَهُمْ لِأَنَّهُ لَوْ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى تَفُوتُهُ الْجَمَاعَةُ وَكَذَا إِذَا قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ يُقَيِّدَهَا بِالسَّجْدَةِ وَبَعْدَ الْإِتْمَامِ لَايَشْرَعُ فِيْ صَلٰوةِ الْإِمَامِ لِكَرَاهِيَّةِ النَّفْلِ بَعْدَهُ وَكَذَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ التَّنَفُّلَ بِالثُّلُثِ مَكْرُوهٌ وَفِيْ جَعْلِهَا أَرْبَعًا مُخَالَفَةٌ لِإِمَامِهِ وَمَنْ دَخَلَ مَسْجِدًا قَدْ أُذِّنَ فِيهِ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يُصَلِّيَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَايَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ يُرِيْدُ الرُّجُوعَ قَالَ إِلَّا إِذَا كَانَ يَنْتَظِمُ بِهِ أَمْرُ جَمَاعَةٍ لِأَنَّهُ تَرْكُ صُورَةٍ تَكْمِيلُ مَعْنًى ـ

অনুবাদ : যদি ফজরের এক রাকআত পড়ার পর ইকামত হয়, তাহলে তা ভঙ্গ করে জামাআতে শামিল হয়ে যাবে। কেননা যদি তার সাথে আরেক রাকআত যুক্ত করে, তবে তার জামাআত ফউত হয়ে যাবে। তেমনি যদি দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তবে তার সাথে সিজদা মিলানোর পূর্ব পর্যন্ত এ হুকুম হবে। আর ফজরের নামাজ পূর্ণ করার পর ইমামের সাথে জামাআতের নামাজে শামিল হবে না। কেননা ফজরের পর নফল পড়া মাকরূহ যাহিরুর রিওয়ায়াত মুতাবিক মাগরিবের পরও এই হুকুম, কেননা তিন রাকআত নফল পড়া মাকরূহ। পক্ষান্তরে তাকে চার রাকআতে রূপান্তরিত করলে ইমামের বিরোধিতা হয়। আজান হয়ে গেছে, এমন সময় মসজিদে যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে তার জন্য নামাজ না পড়ে সেখান থেকে বের হওয়া মাকরূহ। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, আজান হয়ে যাওয়ার পর মসজিদ থেকে ঐ ব্যক্তি ছাড়া কেউ বের হয় না, যে মুনাফিক কিংবা ঐ ব্যক্তি যে ফিরে আসার ইচ্ছা নিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তবে যদি তার উপর অন্য কোনো জামাআতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকে তাহলে সেও যেতে পারবে। কেননা এটা বাহ্যত বর্জন হলেও প্রকৃতপক্ষে তা পূর্ণাঙ্গতা দানের শামিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো ব্যক্তি ফজরের এক রাকআত পড়ার পর জামাআত দাঁড়ায়, তাহলে সে নামাজ ভঙ্গ করে লোকদের সাথে জামাআতের নামাজে শামিল হবে। কেননা যদি আরেক রাকআত মিলায় তাহলে একাকী তার নামাজ পূর্ণ হবে এবং জামাআত ফউত হবে। অথচ জামাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদা। অতএব জামাআতের ফজিলত হাসিল করার জন্য ঐ নামাজ ভেঙ্গে দিবে, যা একাকী আরম্ভ করেছিল। অনুরূপভাবে যদি এ ব্যক্তি ফজরের দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে যদি দ্বিতীয় রাকআতের সিজদা না করে থাকে, তাহলে নামাজ ভঙ্গ করে জামাআতের নামাজে শামিল হবে। পক্ষান্তরে কেউ ফজরের নামাজ একাকী পড়েছে, তারপর জামাআত দাঁড়িয়েছে, তাহলে সে ইমামের সাথে জামাআতে শামিল হবে না। কেননা এমতাবস্থায় ইমামের সাথে যে নামাজ আদায় করবে, তা নফল হবে। অথচ ফজরের নামাজের পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত নফল পড়া মাকরূহ। তদ্রূপ আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নফল পড়া মাকরূহ। যাহিরুর রিওয়ায়াত মুতাবিক মাগরিবের নামাজ একাকী পড়ার পর জামাআতের নামাজে শামিল হবে না। কেননা ইমামের সাথে শরিক হলে দুই সুরত।

(১) হয়তো ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে।

(২) অথবা ইমাম নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর আরেক রাকআত মিলাবে, যাতে চার রাকআত হয়। তিন রাকআত ইমামের সাথে, আর এক রাকআত ইমাম ফারিগ হওয়ার পর। প্রথম সুরতে তিন রাকআত নফল হচ্ছে, অথচ তিন রাকআত

নফল পড়া মাকরূহ। আর দ্বিতীয় সুরতে ইমামের বিরোধিতা হয়, এটা জায়েজ নেই। এজন্যে আমরা বলেছি যে, যদি কোনো ব্যক্তি মাগরিবের নামাজ একাকী আদায় করে অতঃপর জামাআত দাঁড়ায়, তাহলে সে ব্যক্তি জামাআতের নামাজে আর শরিক হবে না।

قَوْلُهُ وَمَنْ دَخَلَ مَسْجِدًا الخ : যদি কেউ এমন মসজিদে প্রবেশ করে যাতে আজান হয়ে গেছে; তাহলে এ সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা আছে। উক্ত মসজিদে প্রবেশকারী ব্যক্তির দুই অবস্থা– (১) হয়তো সে নামাজ পড়েছে (২) অথবা সে নামাজ পড়েনি। যদি নামাজ পড়ে থাকে, তাহলে তার হুকুম পরে বর্ণনা করব। আর যদি নামাজ না পড়ে তাহলে দুই সুরত– এক. এটি তার মহল্লার মসজিদ দুই. অথবা এটি মহল্লার মসজিদ নয়।

যদি এটি তার মহল্লার মসজিদ হয়, তাহলে জামাআতের সাথে নামাজ পড়ার পূর্বে মসজিদ হতে বের হওয়া মাকরূহ হবে। কেননা মুয়াজ্জিন তাকে নামাজের দাওয়াত দিয়েছে। সুতরাং তা কবুল করবে। নামাজ না পড়ে বের হবে না। পক্ষান্তরে যদি এটি তার মহল্লার মসজিদ না হয়, তাহলে দুই অবস্থা– এক. তার মহল্লার লোকেরা স্বীয় মসজিদে নামাজ পড়েছে। দুই. অথবা নামাজ পড়েনি। প্রথম অবস্থায় নামাজ না পড়ে এই মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরূহ। কেননা এ মসজিদে প্রবেশ করার কারণে এ ব্যক্তি এ মসজিদের অধিবাসী বা পরিবার বলে গণ্য হয়ে গেছে।

দুই. দ্বিতীয় অবস্থায় এ ব্যক্তি স্বীয় মহল্লার মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য এই মসজিদ হতে বের হতে পারবে। কেননা তার জন্য নিজ মহল্লার মসজিদে নামাজ পড়া ওয়াজিব। (ইনায়া)

হিদায়া গ্রন্থকার উক্ত মাসআলাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি এমন মসজিদে প্রবেশ করে যাতে আজান হয়ে গেছে, তাহলে নামাজ না পড়ে ঐ মসজিদ হতে বের হওয়া তার জন্য মাকরূহ। দলিল রাসূল ﷺ-এর হাদীস– لَايَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ اِلَّا مُنَافِقٌ اَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ يُرِيْدُ الرُّجُوْعَ এ হাদীসটি "مراسيل ابى داود" এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ইমাম ইবনে মাজাহ উক্ত হাদীসটি নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ مَوْلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْرَكَ الْاَذَانَ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ ثُمَّ يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَايُرِيْدُ الرُّجُوْعَ فَهُوَ مُنَافِقٌ -

মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ (র.) বলেন যে– রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান দেওয়ার পর মসজিদে প্রবেশ করল, অতঃপর কোনো প্রয়োজন ব্যতীত এবং ফিরে আসার ইচ্ছা ব্যতীত সে বের হলো, তাহলে সে ব্যক্তি মুনাফিক।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন যে, যদি ঐ ব্যক্তির উপর অন্য কোনো মসজিদের জামাআতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকে, যেমন সে ব্যক্তি ইমাম অথবা মুয়াজ্জিন, তাহলে তার জন্য আজানের পরও বের হওয়া জায়েজ হবে। কেননা এ বের হওয়াটা যদিও বাহ্যত বর্জন হলেও প্রকৃতপক্ষে তা পূর্ণাঙ্গতা দানের শামিল।

প্রশ্ন : হাদীসের দ্বারা সাবিত হয় যে, আজানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া নিষেধ। চাই তার সাথে অন্য কোনো মসজিদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাক বা না থাক? এহেন অবস্থায় উক্ত তাবীলের অবকাশ আছে কী?

উত্তর : হাদীসে নিষেধের উদ্দেশ্য হলো দোষারোপ অর্থাৎ আযানের পর মসজিদ হতে যারা বের হবে লোকেরা তাদেরকে নামাজ হতে বিমুখ হওয়ার দোষে অভিযুক্ত করবে। কিন্তু ইমাম ও মুয়াজ্জিনের ক্ষেত্রে এ অভিযোগ বিদ্যমান নয়। অর্থাৎ সকল লোক জানে যে তাঁরা অন্য মসজিদে জামাআতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে। অতএব তাঁদের বের হলে কোনো অসুবিধা নেই।

وَاِنْ كَانَ قَدْ صَلّٰى وَكَانَتِ الظُّهْرُ وَالْعِشَاءُ فَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَّخْرُجَ لِاَنَّهٗ اَجَابَ دَاعِىَ اللّٰهِ مَرَّةً اِلَّا اِذَا اَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِى الْاِقَامَةِ لِاَنَّهٗ يُتَّهَمُ بِمُخَالَفَةِ الْجَمَاعَةِ عَيَانًا وَاِنْ كَانَتِ الْعَصْرُ اَوِ الْمَغْرِبُ اَوِ الْفَجْرُ خَرَجَ وَاِنْ اَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِيْهَا لِكَرَاهِيَةِ النَّفْلِ بَعْدَهَا ـ

অনুবাদ : আর জোহর ও ইশার ক্ষেত্রে যদি কেউ ঐ ওয়াক্তের নামাজ পড়ে থাকে, তাহলে (আজানের পরও মসজিদ থেকে) বের হওয়াতে কোনো দোষ নেই। কেননা আল্লাহর আহ্বানকারীর ডাকে সে একবার সাড়া দিয়েছে। তবে যদি মুয়াজ্জিন ইকামত শুরু করে দেয়, তাহলে বের হওয়া ঠিক হবে না কেননা এ অবস্থায় সে জামাআত তরক করার দোষে অভিযুক্ত হবে। বাহ্যত! জামাআতের বিরোধিতার কারণে। আর আসর, মাগরিব এবং ফজরের সময় মুয়াজ্জিন ইকামত শুরু করে দিলেও (মসজিদ হতে) বের হয়ে যাবে। কেননা এ সকল নামাজের পর নফল পড়া মাকরূহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ ইবারতে ঐ সুরত উল্লেখ করা হয়েছে, যা বর্ণনা করার প্রতিশ্রুতি পূর্বের মাসআলায় দেওয়া হয়েছে। তা হলো যে, এক ব্যক্তি এমন মসজিদে প্রবেশ করেছে যাতে আজান হয়ে গেছে এবং এ ব্যক্তি এই ওয়াক্তের নামাজ নিজ বাড়িতে বা অন্য কোনো মসজিদে আদায় করেছে। যদি এ নামাজটি জোহর অথবা ইশার নামাজ হয়, তাহলে তার জন্য এ মসজিদ হতে বের হওয়ায় কোনো দোষ নেই। কেননা সে একবার আল্লাহর আহ্বানকারী অর্থাৎ মুয়াজ্জিনের ডাকে সাড়া দিয়েছে। তবে যদি মুয়াজ্জিন ইকামত শুরু করে দেয়, তাহলে সে মসজিদ হতে বের হবে না; বরং জামাআতে শরিক হবে। দলিল, ইকামত এবং জামাআত শুরু করার পর মসজিদ হতে বের হলে, লোকেরা জামাআতের বিরোধিতার দোষ আরোপ করবে। অতএব দোষারোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জামাআতে শামিল হবে। তবে জামাআতে আদায়কৃত নামাজ নফল হিসাবে গণ্য হবে। কেননা পূর্বেই সে ফরজ আদায় করেছে। পক্ষান্তরে যদি ঐ নামাজ আসর, মাগরিব এবং ফজরের হয়, তাহলে মুয়াজ্জিন ইকামত শুরু করার পরও মসজিদ হতে বের হতে পারবে। কেননা পূর্বেই সে ফরজ আদায় করেছে। এমতাবস্থায় যদি সে ঐসব নামাজের জামাআতে শামিল হয়, তাহলে তা নফল হবে। অথচ আসর এবং ফজরের পর নফল পড়া মাকরূহ। তবে মাগরিবের পর যদিও নফল পড়া মাকরূহ নয় তবে ইমামের সাথে শরিক হওয়ার কারণে নফল তিন রাকআত হয়ে যাবে অথচ তিন রাকআত নফল পড়া মাকরূহ।

প্রশ্ন : যদি কেউ বলে যে, ইমাম সালাম ফিরানোর পর সে আরো এক রাকআত নফল পড়ে নিবে, তাহলেই তা চার রাকআত হয়ে যাবে।

উত্তর : এ সূরতে ইমামের বিরোধিতা হয়। কেননা ইমাম তিন রাকাআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিয়েছে। আর এ ব্যক্তি চার রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়েছে। অথচ ইমামমের বিরোধিতা করা জায়েজ নেই।

وَمَنِ انْتَهٰى اِلَى الْاِمَامِ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ اِنْ خَشِىَ اَنْ تَفُوْتَهُ رَكْعَةٌ وَيُدْرِكُ الْاُخْرٰى يُصَلِّىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ لِاَنَّهُ اَمْكَنَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفَضِيْلَتَيْنِ وَاِنْ خَشِىَ فَوْتَهَا دَخَلَ مَعَ الْاِمَامِ لِاَنَّ ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ اَعْظَمُ وَالْوَعِيْدُ بِالتَّرْكِ اَلْزَمُ بِخِلَافِ سُنَّةِ الظُّهْرِ حَيْثُ يَتْرُكُهَا فِى الْحَالَيْنِ لِاَنَّهُ يُمْكِنُهُ اَدَاؤُهَا فِى الْوَقْتِ بَعْدَ الْفَرْضِ هُوَ الصَّحِيْحُ وَاِنَّمَا الْاِخْتِلَافُ بَيْنَ اَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِىْ تَقْدِيْمِهَا عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ وَتَاخِيْرِهَا عَنْهُمَا وَلَا كَذٰلِكَ سُنَّةُ الْفَجْرِ عَلٰى مَا نُبَيِّنُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالتَّقْيِيْدُ بِالْاَدَاءِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِى الْمَسْجِدِ اِذَا كَانَ الْاِمَامُ فِى الصَّلٰوةِ وَالْاَفْضَلُ فِىْ عَامَّةِ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ اَلْمَنْزِلُ هُوَ الْمَرْوِىُّ عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ফজরের নামাজে এমন সময় পৌঁছল যে, ইমাম নামাজ শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু সে এখনো ফজরের দুই রাকআত সুন্নত পড়েনি। এমতাবস্থায় যদি তার আশংকা হয় যে, এক রাকআত ফউত হয়ে যাবে এবং এক রাকআত পাবে, তাহলে মসজিদের দরজার সামনে ফজরের দুই রাকআত সুন্নত পড়ে নিবে, তারপর ইমামের সাথে শরিক হবে। কেননা এভাবে তার জন্য সুন্নত এবং জামাআতের উভয় ফজিলতই হাসিল করা সম্ভব। আর যদি দ্বিতীয় রাকআতও ফউত হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে ইমামের সাথে শরিক হয়ে যাবে। কেননা জামাআতের ছওয়াব অতিবেশি এবং জামাআত তরক করার ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে। জোহরের সুন্নতের হুকুম হলো ভিন্ন অর্থাৎ উভয় অবস্থায় তা ছেড়ে দিবে। কেননা ওয়াক্তের ভিতরে ফরজের পর তা আদায় করা সম্ভব। এটাই বিশুদ্ধ মত। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্য শুধু এই ব্যাপারে যে, উক্ত চার রাকআত সুন্নতকে দুই রাকআতের আগে পড়বে, না পরে পড়বে। কিন্তু ফজরের সুন্নতের বেলায় এ সুযোগ নেই। ইন্‌শাআল্লাহ পরবর্তীতে তা আলোচনা করা হবে। মসজিদের দরজার সামনে আদায় করার শর্তারোপ করা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম নামাজরত থাকা অবস্থায় মসজিদের ভিতরে (সুন্নত আদায় করা) মাকরূহ। সাধারণ সুন্নত ও নফলসমূহ ঘরে আদায় করাই উত্তম। এটাই রাসূল ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এক ব্যক্তি মসজিদে এমন সময়ে প্রবেশ করেছে যে ইমাম ফজরের নামাজে রত অথচ এ ব্যক্তি এখনও ফজরের সুন্নত পড়েনি, তাহলে তার হুকুম হলো যে, যদি প্রথমে সুন্নত পড়ে তাহলে ফরজের এক রাকআত ফউত হয়ে যাবে আর দ্বিতীয় রাকআত পাবে, তাহলে মসজিদের দরজায় সুন্নত পড়ে জামআতে শরিক হবে। দলিল, ফজরের সুন্নত সমস্ত সুন্নত হতে শ্রেষ্ঠ এবং শক্তিশালী। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন صَلُّوْهُمَا وَاِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ অর্থ– তোমরা ফজরের সুন্নত পড়বে যদিও ঘোড়া তোমাদের পাড়িয়ে যায় বা পদদলিত করে।

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন– رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ফজরের দুই রাকআত (সুন্নত) দুনিয়া এবং তার মাঝে যা কিছু আছে সব থেকে উত্তম। আর ইমামের সাথে ফজরের এক রাকআত পাওয়া ফজরের পূর্ণ ফরজকে পাওয়ার সমতুল্য। কেননা রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلٰوةَ যে ব্যক্তি ফজরের এক রাকআত পেল সে পূর্ণ নামাজ পেল। (ইনায়া) এখানে উভয় ফজিলত অর্থাৎ ফজরের সুন্নতের ফজিলত এবং ফজরের জামাআতের ফজিলত একত্রে হাসিল করা সম্ভব। এ কারণে প্রথম সুন্নত পড়বে অতঃপর জামাআতে শামিল হবে এতে উভয় ফজিলতই হাসিল হবে।

আর যদি তার আশংকা হয় যে, ফজরের সুন্নতে মশগুল হলে ফজরের ফরজের উভয় রাকআত ফউত হয়ে যাবে তাহলে সুন্নত না পড়ে ইমামের সাথে জামাআতে শামিল হবে। কেননা জামাআতের ছওয়াব বেশি। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً জামাআতের নামাজে একাকী নামাজের তুলনায় সাতশ গুণ বেশি ছওয়াব। আর জামাআত তরক করা সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– تَارِكُ الْجَمَاعَةِ مَلْعُوْنٌ জামাআত তরককারী অভিশপ্ত। রাসূল ﷺ অন্যত্রে ইরশাদ করেছেন–
لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَسْتَخْلِفَ مَنْ صَلّٰى بِالنَّاسِ وَاَنْظُرَ اِلٰى مَنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجَمَاعَةَ فَاٰمُرَ بَعْضَ فِتْيَانٍ بِاَنْ يُحَرِّقُوْا بُيُوْتَهُمْ .

অর্থাৎ, আমি ইচ্ছা করেছি যে, কোনো ব্যক্তিকে আমার খলীফা নিযুক্ত করব, সে লোকদের নামাজ পড়াবে এবং আমি দেখব ঐসব লোকদেরকে যারা জামাআতে আসেনি। অতঃপর নওজোয়ানদেরকে নির্দেশ দিব যেন তারা তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেয়। দলিলের সারকথা হলো, জামাআতের ছওয়াবও বেশি এবং জামাআত তরকে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে। অতএব এ ব্যক্তি ফজরের সুন্নত ছেড়ে দিয়ে জামাআতে শামিল হয়ে যাবে।

যদি কোনো ব্যক্তি জোহরের সুন্নত না পড়ে মসজিদে এমন সময় দাখিল হয় যখন ইমাম সাহেব জোহরের ফরজ নামাজ পড়াতে রত, তাহলে তার হুকুম সম্পর্কে বিজ্ঞ গ্রন্থকার (صاحب هداية) বলেছেন যে, যদি জোহরের সুন্নত পড়ার কারণে ইমামের সাথে জোহরের পূর্ণ নামাজ ফউত হওয়ার আশংকা থাকে অথবা অংশ বিশেষ ফউত হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে উভয় সুরতে জোহরের সুন্নত ছেড়ে দিয়ে জামাআতের নামাজে শামিল হবে। কেননা ওয়াক্তের মধ্যে ফরজের পর জোহরের সুন্নত আদায় করা সম্ভব। তাই সুন্নতের কারণে জামাআতের ফজিলত ছেড়ে দিবে না। এটিই বিশুদ্ধ মত। কেননা একবার রাসূল ﷺ -এর জোহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নত ছুটে গিয়েছিল তখন রাসূল ﷺ জোহরের পর এর কাযা করেছেন। এটা হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত।– (ইনায়া)

জোহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নত ফউত হলে, তা জোহরের পর দুই রাকআত সুন্নতের পূর্বে আদায় করবে অথবা পরে আদায় করবে? এ সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত হলো প্রথমে জোহরের পরের দুই রাকআত সুন্নত আদায় করবে অতঃপর জোহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নতের কাজা করবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত হলো যে, প্রথমে জোহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নতের কাজা করবে অতঃপর জোহরের পরের দুই রাকআত সুন্নত আদায় করবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল, এ চার রাকআত তো তার সুন্নতের স্থান (জোহরের পূর্বে) থেকে ফউত হয়েছে। সুতরাং জোহরের পরের দুই রাকআতকে স্বীয় স্থান হতে ফউত করবে না; বরং জোহরের ফরজের পর ঐ দুই রাকআত আদায় করবে। অতঃপর জোহরের পূর্বের চার রাকআত কাজা করবে। দুনিয়ার আইনে তার নজির পাওয়া যায়। আমরা নৈনন্দিন প্রত্যক্ষ করে আসছি যে, যদি স্টেশনে দুই গাড়ির ক্রস হয় তাহলে রেলওয়ের নীতি হলো, যে গাড়ি স্টেশনে প্রথমে আসছে তা পরে ছাড়া হবে। আর যে গাড়ি পরে আসছে তা আগে ছাড়া হবে। কেননা যে গাড়ি স্টেশনে প্রথমে দাঁড়িয়েছে তা নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্ব করেছে। পরের গাড়িকে অযথা বিলম্ব করাবে না। এ জন্য পরের গাড়িকে আগে রওয়ানা করাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর দলিল ঃ জোহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নত তো এমনিই বিলম্বিত হয়ে গিয়েছে কাজেই একে আর অধিক বিলম্ব না করাই বাঞ্ছনীয়। এজন্য এটাই যুক্তি সঙ্গত যে, প্রথমে জোহরের পূর্বের চার রাকআত পড়বে অতঃপর জোহরের পরের দুই রাকআত পড়বে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, ফজরের সুন্নতের অবস্থা অনুরূপ নয়, এর বিস্তারিত আলোচনা আসন্ন।

قَوْلُهُ وَالتَّقْيِيْدُ بِالْاَدَاءِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ الخ : এ ইবারতে ইমাম কুদূরী (র.) দরজার নিকট ফজরের সুন্নত পড়ার ফায়েদা বর্ণনা করেছেন। সারকথা হলো যে, ইমাম জামাআতের নামাজ রত অবস্থায় মসজিদে সুন্নত পড়া মাকরূহ, কেননা এ ব্যক্তি মসজিদে নফল আদায়কারী এবং ইমাম ফরজ আদায়কারী। আর এটা মাকরূহ এ জন্যই বলা হয়েছে যে, সুন্নত মসজিদের দরজায় আদায় করবে। তবে যদি দরজায় নামাজ পড়ার স্থান না থাকে, তাহলে মসজিদের ভিতরে খুঁটির পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে।

যে কাতারে মানুষ ফরজ পড়ছে সেই কাতারে সুন্নত পড়া অধিক মাকরূহ। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে তারাবীহ ব্যতীত অন্যান্য সুন্নত এবং নফল ঘরে আদায় করা উত্তম। এতদ বিষয়ে রাসূল ﷺ -এর থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণিত আছে,

(১) نَوِّرُوْا بُيُوْتَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَلَاتَجْعَلُوْهَا قُبُوْرًا তোমরা স্বীয় গৃহসমূহ নামাজ দ্বারা আলোকিত কর। একে কবরস্থান বানিও না।

(২) إِنَّ جَمِيْعَ سُنَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ وِتْرَهُ كَانَ فِىْ بَيْتِهٖ . অর্থ– রাসূল ﷺ ! সমূহ সুন্নত ও বিতর গৃহে আদায় করতেন।

(৩) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِىْ مَسْجِدِ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ لَمَّا رَاٰهُمْ يُصَلُّوْنَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هٰذِهٖ صَلٰوةُ الْبُيُوْتِ . ابوداؤد وترمذى ، نسائى .

অর্থ– রাসূল ﷺ বনী আব্‌দুল আশ্‌হালের মসজিদে যখন লোকদের দেখলেন যে, তারা মাগরিবের পর মসজিদে নামাজ পড়ছে, তখন রাসূল ﷺ বললেন যে, এটা গৃহের নামাজ। অর্থাৎ ফজর ব্যতীত অন্যান্য নামাজ গৃহে পড়া উচিত।

(৪) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِهٖ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ

অর্থ– হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ জোহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নত নিজ ঘরে পড়তেন। অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে লোকদেরকে নিয়ে ফরজ পড়তেন। অতঃপর গৃহে প্রবেশ করে দুই রাকআত (সুন্নত) পড়তেন। তিনি লোকদের নিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়তেন। অতঃপর গৃহে দাখিল হয়ে দুই রাকআত (সুন্নত) পড়তেন। এ হাদীস দ্বারা গৃহে সুন্নত পড়া সাবিত হয়।

(৫) عَنْ حَفْصَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّهُ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِىْ بَيْتِهٖ . متفق عليه .

অর্থ– বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত হাফসা (রা.) এবং ইবনে ওমর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ জুমার পর দুই রাকআত নামাজ নিজ ঘরে পড়তেন।

(৬) عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهٖ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ

অর্থ– তোমরা অবশ্যই নিজ নিজ ঘরে নামাজ পড়বে। কেননা মানুষের ঘরের নামাজই সর্বোত্তম, ফরজ ব্যতীত।

(৭) صَلَاةُ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهٖ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهٖ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ . ابوداود

অর্থ– লোকদের জন্য নিজ ঘরে নামাজ পড়া উত্তম। আমার এই মসজিদের (মসজিদে নববী) নামাজের তুলনায় ফরজ ব্যতীত। উক্ত হাদীসগুলো দ্বারা সাবিত হয় যে, ফরজ ব্যতীত সুন্নত ও নফল নামাজ ঘরে পড়া উত্তম।— (ফতহুল কাদীর)।

وَإِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ لَايَقْضِيْهِمَا قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ لِأَنَّهُ يَبْقَى نَفْلًا مُطْلَقًا وَهُوَ مَكْرُوْهٌ بَعْدَ الصُّبْحِ وَلَابَعْدَ اِرْتِفَاعِهَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ يَّقْضِيَهُمَا اِلٰى وَقْتِ الزَّوَالِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَضَاهُمَا بَعْدَ اِرْتِفَاعِ الشَّمْسِ غَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيْسِ وَلَهُمَا اَنَّ الْاَصْلَ فِى السُّنَّةِ اَنْ لَاتُقْضٰى لِاِخْتِصَاصِ الْقَضَاءِ بِالْوَاجِبِ وَالْحَدِيْثُ وَرَدَ فِىْ قَضَائِهِمَا تَبْعًا لِلْفَرْضِ فَبَقِىَ مَاوَرَاءَهُ عَلَى الْاَصْلِ وَاِنَّمَا تُقْضٰى تَبْعًا لَهُ وَهُوَ يُصَلِّىْ بِالْجَمَاعَةِ اَوْ وَحْدَهُ اِلٰى وَقْتِ الزَّوَالِ وَفِيْمَا بَعْدَهُ اِخْتِلَافُ الْمَشَائِخِ وَاَمَّا سَائِرُ السُّنَنِ سِوَاهَا لَاتُقْضٰى بَعْدَ الْوَقْتِ وَحْدَهَا وَاخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِىْ قَضَائِهَا تَبْعًا لِلْفَرْضِ وَمَنْ اَدْرَكَ مِنَ الظُّهْرِ رَكْعَةً وَلَمْ يُدْرِكِ الثَّلٰثَ فَاِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) قَدْ اَدْرَكَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ لِاَنَّ مَنْ اَدْرَكَ اٰخِرَ الشَّىْءِ فَقَدْ اَدْرَكَهُ فَصَارَ مُحْرِزًا ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ لٰكِنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا بِالْجَمَاعَةِ حَقِيْقَةً وَلِهٰذَا يَحْنِثُ بِهِ فِىْ يَمِيْنِهِ لَايُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ وَلَايَحْنِثُ فِىْ يَمِيْنِهِ لَا يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْجَمَاعَةِ ـ

অনুবাদ : যদি ফজরের দুই রাকআত (সুন্নত) ফউত হয়ে যায়, তবে সূর্যোদয়ের পূর্বে তা কাজা করবে না। কেননা তা কেবল নফল হয়ে যায়। আর ফজরের পর নফল পড়া মাকরূহ। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সূর্য উপরে উঠে যাওয়ার পরেও তা কাযা করবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আমার কাছে পছন্দনীয় হলো সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত তা কাজা করবে। কেননা রাসূল ﷺ لَيْلَةُ التَّعْرِيْسِ তথা শেষ রাত্রে যাত্রা বিরতির ঘটনায় পরবর্তী সকালে সূর্য উপরে উঠার পরে ফজরের দুই রাকআত সুন্নত কাজা করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো হলো, সুন্নতের ক্ষেত্রে কাযা না করাই হলো আসল হুকুম। কেননা কাজার বিষয়টি ওয়াজিবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর উক্ত হাদীসের ঘটনায় দুই রাকআতের কাজা করার কথা এসেছে ফরজের অনুসরণে। সুতরাং অন্য ক্ষেত্রে আসল হুকুম (সুন্নতের কাজা নেই) মূলনীতি হিসাবে বহাল থাকবে। ফরজ জামাআতের সাথে আদায় করা হোক বা একা। সুন্নতকে ফরজের অনুসরণে কাজা করা হবে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত। আর সূর্য ঢলে যাওয়ার পর কাজা করা সম্পর্কে মাশায়েখগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ফরজ ছাড়া অন্য সকল সুন্নত ওয়াক্তের পরে এককভাবে কাজা করা হবে না। আর ফরজের অনুসরণে কাজা করা হবে কিনা? সে সম্পর্কে মাশায়িখে কেরামের মতভেদ রয়েছে। যে ব্যক্তি জোহরের নামাজ এক রাকআত পেল কিন্তু বাকি তিন রাকআত পায়নি, সে জোহরের নামাজ জামাআতের সাথে আদায় করেনি। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জামাআতের ফজিলত সে লাভ করবে। কেননা কোনো কিছুর শেষাংশ যে পায়, সে যেন ঐ বস্তু পেয়ে গেছে।

সুতরাং সে জামাআতের ছওয়াব অর্জনকারী হবে। তবে প্রকৃতপক্ষে সে জামাআতের সথে নামাজ আদায়কারী হয়নি। এ কারণেই যদি কেউ কসম খায় যে, সে কখনো জামাআত ধরবে না, তবে শেষ রাকআতে জামাআতে শরিক হওয়ার দ্বারা সে কসম ভঙ্গকারী হবে। কিন্তু "জোহরের নামাজ জামাআতের সাথে পড়বে না", এই কসম করলে, সে কসম ভঙ্গকারী হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফজরের সুন্নত কাজা হয়ে গেলে তা কাজা করবে কিনা? এ কথার উপর একমত যে, সূর্যোদয়ের পূর্বে কাজা করবে না। কেননা সুন্নত যখন নিজ ওয়াক্ত হতে ফউত হয়েছে তখন তা নফল হয়েছে। আর ফজরের নামাজের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত নফল পড়া মাকরূহ অতএব সূর্যোদয়ের পূর্বে উহা কাজা করবে না। আর সূর্যোদয়ের পর কাজা করা সম্পর্কে মাশায়েখগণের মাঝে মতানৈক্য আছে। শায়খাইন অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সূর্যোদয়ের পরও উহার কাজা ওয়াজিব নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন যে, কাজা করা ওয়াজিব নয়। তবে পছন্দনীয় হলো কাজা করা। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল লায়লাতুত্‌ তা'রীস (لَيْلَةَ التَّعْرِيْسِ)-এর সকালে সূর্য উঁচু হওয়ার পর রাসূল ﷺ ফজরের সুন্নত কাজা করেছেন। এর দ্বারা সাবিত হয় যে, সূর্যোদয়ের পর ফজরের সুন্নত কাজা করা যায়।

শাখাইনের দলিল, মূল হুকুম হলো যে, সুন্নতের কাজা নেই। কেননা কাজা ওয়াজিবের সাথে সম্পৃক্ত। এর কারণ হলো, কাজা বলা হয়, تَسْلِيْمُ مِثْلُ مَا وَجَبَ بِالْأَمْرِ নির্দেশের দ্বারা যা ওয়াজিব হয়েছে তার অনুরূপ জিনিস সোপর্দ করা। আর যেহেতু সুন্নত ওয়াজিব নয়, অতএব مثل واجب বা ওয়াজিবের মতো কিভাবে হবে?

ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রদত্ত দলিলের জবাব ঃ লাইলাতুত তা'রীসে (لَيْلَةَ التَّعْرِيْسِ) রাসূল ﷺ ফজরের ফরজের অনুসরণে ফজরের সুন্নত কাজা করেছেন। যেহেতু রাসূল ﷺ এর ফজরের ফরজও ফউত হয়েছিল, তাই রাসূল ﷺ ফরজের কাজা করেছেন এবং তার অনুসরণে সুন্নতেরও কাজা করেছেন। অতএব তা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল হুকুম অনুযায়ী সুন্নতের কাজা করা হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, ফজরের সুন্নত ফরজের অনুসরণে কাজা করা হবে। অর্থাৎ ফজরের ফরজ কাজা করলে সুন্নতও কাজা করবে। চাই ফরজ জামাআতে পড়ুক বা একাকী পড়ুক। প্রকাশ থাকে যে, ফজরের সুন্নত ফরজের অনুসরণে কাজা করতে পারবে সূর্য হেলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। আর সূর্য হেলে গেলে কাজা করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, সূর্য হেলে যাওয়ার পর ফজরের সুন্নতের কাজা নেই, যদিও ফজরের ফরজের অনুসরণে হয়। কেননা রাসূল ﷺ সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে ফরজের অনুসরণে ফজরের সুন্নতের কাজা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, ফরজের অনুসারে সূর্য হেলে যাওয়ার পর ফজরের সুন্নতের কাজা করবে। তবে ফজরের সুন্নত ব্যতীত অন্যান্য সুন্নতের কাজার ব্যাপারে বিধান হলো, ওয়াক্ত অতিক্রান্ত হওয়ার পর একাকী সুন্নতের কাজা করা যাবে না। কিন্তু ফরজের অনুসরণে কাজা করবে কিনা? এ ব্যাপারে মাশায়িখে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, কাজা করবে। কেননা অনেক জিনিস যিমনান (ضمنا) সাবিত হয় যদিও তা ইচ্ছাকৃতভাবে সাবিত হয় না। কেউ কেউ বলেছেন যে, কাজা করবে না। কেননা কাজা ওয়াজিবের সাথে সম্পৃক্ত। এটিই বিশুদ্ধ মত।

قَوْلُهُ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الظُّهْرِ الخ : যদি কেউ চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজের এক রাকআত ইমামের সাথে পায় আর তিন রাকআত না পায়, তাহলে সে জামাআতের সাথে নামাজ পড়ল না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে জামাআতের ফজিলত পেয়েছে। মতনে (متن) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নাম এমনিই উল্লেখ করা হয়েছে এর কোনো হেতু নেই। কেননা এটা আহনাফের সর্ববাদী অভিমত। দলিল হলো যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর শেষ অংশ পেল, সে যেন ঐ বস্তুটি পূর্ণ পেল। অতএব এ ব্যক্তি জামাআতের মর্যাদা অর্জনকারী হবে। তবে প্রকৃতপক্ষে সে জামাআতের সাথে নামাজ আদায়কারী হয়নি। এ কারণে কেউ কসম খেল আল্লাহর কসম আমি জামাআত ধরব না। অতঃপর সে এক রাকআত নামাজ জামাআতের সাথে পেল, তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে। কেননা সে জামাআতের ফজিলত পেয়েছে। আর যদি এরূপ কসম খায় যে وَاللّٰهِ لَا أُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْجَمَاعَةِ। অর্থাৎ আল্লাহর কসম আমি জোহরের নামাজ জামাআতের সাথে পড়ব না। অতঃপর সে ইমামের সাথে জামাআতে এক রাকআত পেল, তাহলে এ ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে সে জোহরের নামাজ জামাআতের সাথে পড়েনি।

وَمَنْ أَتَى مَسْجِدًا قَدْ صُلِّيَ فِيْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ مَا بَدَا لَهُ مَادَامَ فِي الْوَقْتِ وَمُرَادُهُ إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ وَإِنْ كَانَ فِيْهِ ضَيْقٌ تَرَكَهُ قِيْلَ هٰذَا فِيْ غَيْرِ سُنَّةِ الظُّهْرِ وَالْفَجْرِ لِأَنَّ لَهُمَا زِيَادَةَ مَزِيَّةٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ صَلُّوْهَا وَلَوْطَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ وَقَالَ فِي الْأُخْرَى مَنْ تَرَكَ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ تَنَلْهُ شَفَاعَتِيْ وَقِيْلَ هٰذَا فِي الْجَمِيْعِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَدَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ بِالْجَمَاعَةِ وَلَا سُنَّةَ دُوْنَ الْمُوَاظَبَةِ وَالْأَوْلٰى أَنْ لَّا يَتْرُكَهَا فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا لِكَوْنِهَا مُكَمِّلَاتٌ لِلْفَرَائِضِ إِلَّا إِذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ ـ

অনুবাদ : আর যে ব্যক্তি জামাআত হয়ে গেছে এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হলো, সে ফরজ আদায় করার পূর্বে ওয়াক্তের ভিতরে যতক্ষণ ইচ্ছা নফল পড়তে পারে। ইমাম কুদূরী (র.)-এর এ বক্তব্য ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যখন সময়ের মধ্যে অবকাশ থাকে। পক্ষান্তরে সময় সংকীর্ণ হয়ে পড়লে সুন্নত ও নফল ছেড়ে দিবে। আর কেউ কেউ বলেছেন (নফল ছেড়ে দেওয়ার) এ হুকুম হলো জোহর ও ফজরের সুন্নত ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে। কেননা এ'দুটি সুন্নতের অতিরিক্ত মর্যাদা রয়েছে। ফজরের সুন্নত সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন, অশ্বদল তোমাকে তাড়া করলেও তোমরা তা পড়। অপর সুন্নতটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, জোহরের পূর্ববর্তী চার রাকআত সুন্নত যে ছেড়ে দিবে, সে আমার শাফায়াত লাভ করবে না। আর কেউ কেউ বলেছেন, এটা সকল সুন্নতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা রাসূল ﷺ জামাআতের সাথে ফরজ আদায় করার সময় নির্ধারিত সুন্নতগুলো নিয়মিত আদায় করেছেন। আর নিয়মিত ছাড়া সুন্নত সাব্যস্ত হয় না। তবে উত্তম হল, কোনো অবস্থাতেই তা তরক না করা। কেননা সুন্নতগুলো হচ্ছে ফরজসমূহের সম্পূরক। তবে ওয়াক্ত ফউত হওয়ার আশংকা থাকলে ছেড়ে দিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো ব্যক্তির জামাআত ফউত হয়ে যায় এবং সে এমন মসজিদে আসে যেখানে জামাআত হয়ে গেছে অথবা সে ঘরে ফরজ পড়ার ইচ্ছা করেছে। তাহলে ফরজের পূর্বে ওয়াক্তের মধ্যে যে পরিমাণ সুন্নত ও নফল আদায় করতে চায় আদায় করে নিবে। আর যদি সময় সংকীর্ণ হয় তাহলে প্রথমে ফরজ আদায় করে নিবে। যাতে ফরজ ছুটে না যায়। কেউ কেউ বলেছেন, সময় সংকীর্ণের সুরতে সুন্নত এবং নফল ছেড়ে দেওয়ার এ হুকুম জোহর এবং ফজর এর সুন্নত ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে। কেননা জোহর এবং ফজরের সুন্নতের অন্যান্য সুন্নতের তুলনায় অধিক ছওয়াব। এ জন্য ওয়াক্তের সংকীর্ণতা সত্ত্বেও তা অবশ্যই পড়বে। তবে যদি সময় বেশি সংকীর্ণ হয় তাহলে জোহরের এবং ফজরের সুন্নত ছেড়ে দিবে। ফজরের সুন্নতের গুরুত্বের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর বাণী صَلُّوْهَا وَلَوْطَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ আর জোহরের নামাজের গুরুত্বের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর বাণী مَنْ تَرَكَ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ تَنَلْهُ شَفَاعَتِيْ ।

কেউ কেউ বলেছেন, সময় সংকীর্ণতার সুরতে সুন্নত তরক করার হুকুম সকল (নামাজের) সুন্নতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চাই তা জোহর ও ফজরের হোক বা অন্য ওয়াক্তের সুন্নত হোক। কেননা রাসূল ﷺ যখন ফরজ নামাজ জামাআতের সাথে আদায় করতেন, তখন তিনি সুন্নতসমূহও নিয়মিতভাবে আদায় করতেন। পক্ষান্তরে যখন ফরজ একাকী আদায় করতেন তখন সুন্নত নিয়মিত আদায় করতেন না। নিয়মিত আদায় করা ছাড়া কোনো আমল সুন্নত বলে সাব্যস্ত হয় না। অতএব একাকী ফরজ আদায়কারীর ক্ষেত্রে এসব নামাজ (বারো রাকআত) সুন্নত হবে না; বরং নফল হবে। আর নফলের ক্ষেত্রে তার এখতিয়ার থাকবে পড়তে পারে নাও পড়তে পারে। এজন্য বলা হয়েছে যে, না পড়ার হুকুম সমস্ত সুন্নতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, উত্তম হলো ঐসব সুন্নতকে কোনো অবস্থায়ই ছাড়বে না, ওয়াক্ত সংকীর্ণ হোক বা প্রশস্ত হোক, ফরজ নামাজ জামাআতে পড়ুক বা একাকী পড়ুক, চাই মুসাফির হোক বা মুকীম। কেননা সুন্নতগুলো হচ্ছে ফরজের সম্পূরক। অতএব, ফরজের ছওয়াব পূর্ণ করার লক্ষ্যে ওগুলোকে কখনো ছাড়বে না। এছাড়া খুলাফায়ে রাশেদীন, প্রবীণ সাহাবীগণ এবং তাবেঈগণ ও এর উপর আমল করেছেন যে, তারা কোনো অবস্থায় সুন্নত ছাড়েননি। তবে হ্যাঁ যদি ওয়াক্ত ফউত হওয়ার সম্ভবনা থাকে, তাহলে সুন্নত তরক করবে এবং ফরজ আদায় করবে।— (ইনায়া)

وَمَنْ اِنْتَهٰى اِلَى الْاِمَامِ فِىْ رُكُوْعِهٖ فَكَبَّرَ وَ وَقَفَ حَتّٰى رَفَعَ الْاِمَامُ رَأْسَهٗ لَا يَصِيْرُ مُدْرِكًا لِتِلْكَ الرَّكْعَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ هُوَ يَقُوْلُ اَدْرَكَ الْاِمَامَ فِيْمَا لَهٗ حُكْمُ الْقِيَامِ وَلَنَا اَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الْمُشَارَكَةُ فِىْ اَفْعَالِ الصَّلٰوةِ وَلَمْ يُوْجَدْ لَا فِى الْقِيَامِ وَلَا فِى الرُّكُوْعِ ـ

অনুবাদ : কেউ যদি এসে ইমামকে রুকূতে পায় এবং তাকবীর বলে দাড়িয়ে থাকে আর এ অবস্থায় ইমাম মাথা তুলে ফেলে তাহলে সে ঐ রাকআত পেয়েছে বলে গণ্য হবে না। এ বিষয়ে ইমাম যুফার (র.) -এর মত ভিন্ন রয়েছে। তিনি বলেন, ইমাম কে যে এমন অবস্থায় পেয়েছে যা কিয়ামের হুকুমভুক্ত। কাজেই সে রাকআত পেয়েছে। আমাদের দলিল হচ্ছে– নামাজের কার্যসমূহে (ইমামের সাথে) অংশ গ্রহণ করা হল শর্ত। আর তা এখানে পাওয়া যায়নি, কিয়ামের অবস্থায়ও না এবং রুকূর অবস্থায়ও না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো ব্যক্তি ইমামকে রুকূ অবস্থায় পায় এবং সে তাকবীরে তাহরীমা বলে নামাজে শরিক হয়ে যায়, অতঃপর দাড়িয়ে থাকে এবং ইমামের সাথে রুকুতে শরিক না হয় এমতাবস্থায় ইমাম রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে নেয় তাইলে তিন ইমামের (আবূ হানীফা (র.) আবূ ইউসূফ (র.) মুহাম্মদ (র.) মতে এ ব্যক্তি ঐ রাকআত পেয়েছে বলে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে এ ব্যক্তি ঐ রাকআত পেয়েছে বলে গণ্য হবে। সুফয়ান সাওরী (র.) ইবনে আবী লায়লা (র.) আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র.)-এর মতও অনুরূপ।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল, সে ব্যক্তি ইমামকে রুকূ অবস্থায় পেয়েছে, যদিও সে নিজে রুকূ পায়নি, রুকূকে কিয়ামের হুকুমে ধরা হয়ে থাকে। সুতরাং রুকূর অবস্থায় পাওয়ার অর্থই হলো যেন প্রকৃত কিয়াম অবস্থায়ই পেয়েছে। আর কিয়াম অবস্থায় পাওয়ার দ্বারা রাকআত পানে ওয়ালা হলো। অতএব রুকূ অবস্থায় ইমামকে পাওয়ার দ্বারা রাকআত পেয়েছে বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে তিন ইমামের দলিল হল ইক্তেদা (اقتداء) বলা হয়। নামাজের কর্মে অংশ গ্রহণ করাকে। আর এখানে অংশ গ্রহণ করা পাওয়া যায়নি, কিয়াম অবস্থাও নয় এবং রুকূ অবস্থায়ও নয়। যেহেতু সে এই রাকআতের কিয়ামে এবং রুকূতে অংশ গ্রহণ করেনি। তাই সে এই রাকআত পেয়েছে বলে গণ্য করা হবে না।

ইমাম যুফর (র.)-এর দলিলের জবাব! আমরা রুকূকে কিয়ামের হুকুমে ধরা স্বীকার বা সমর্থন করি না। কেননা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

اِذَا اَدْرَكْتَ الْاِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ قَبْلَ اَنْ يَّرْفَعَ رَاْسَهٗ فَقَدْ اَدْرَكْتَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَاِنْ رَفَعَ رَاْسَهٗ قَبْلَ اَنْ تَرْكَعَ فَاتَتْكَ تِلْكَ الرَّكْعَةُ ـ

অর্থ– যখন তুমি ইমাম কে রুকুতে এবং ইমাম (রুকূ হতে) মাথা উঠানোর পূর্বে তুমি রুকূ করে নাও, তাহলে তুমি ঐ রাকআত পেয়েছ বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে তোমার রুকূ করার পূর্বে যদি ইমাম রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে নেয় তাহলে ঐ রাকাআত ফউত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

وَلَوْ رَكَعَ الْمُقْتَدِيْ قَبْلَ إِمَامِهِ فَأَدْرَكَهُ الْإِمَامُ فِيْهِ جَازَ وَ قَالَ زُفَرُ لَايُجْزِيْهِ لِأَنَّ مَا أَتٰى بِهٖ قَبْلَ الْإِمَامِ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهٖ فَكَذَا مَا يُبْنٰى عَلَيْهِ وَلَنَا أَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الْمُشَارَكَةُ فِيْ جُزْءٍ وَاحِدٍ كَمَا فِيْ طَرَفِ الْأَوَّلِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : মুক্তাদী যদি ইমামের আগে রুকূতে চলে যায়, আর ইমাম তাকে রুকূতে গিয়ে পায়, তাহলে নামাজ জায়েজ হবে। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন এটা তার জন্য জায়েজ হবে না। কেননা ইমামের আগে যা সে করেছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এর উপর যা বিনা করা হয়েছে তাও শুদ্ধ হবে না। আমাদের দলিল হচ্ছে– শর্ত হলো নামাজের কোনো অংশে (ইমামের সাথে) শরিক হয়ে যাওয়া। যেমন প্রথম অংশে (শরিক হলে তা গণ্য হয়)। আল্লাহই উত্তম জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি মুক্তাদী ইমামের পূর্বে রুকূতে চলে যায়। অতঃপর ইমামও রুকূতে যায় এবং উভয় রুকূতে গিয়ে শরিক হয় তাহলে এই সূরতে মুক্তাদীর নামাজ নষ্ট হবে না। তদ্রূপ হুকুম যদি এ অবস্থা সাজদাতে হয়। তবে মুক্তাদীর নামাজ মাকরূহ হবে। মাক্রূহ হওয়ার কারণ হলো রাসূল ﷺ-এর হাদীস,

أَمَا يَخْشَى الَّذِيْ يَرْكَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ رَأْسَهُ رَأْسَ الْحِمَارِ ـ

অর্থ– যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে রুকূতে যায় তার ভয় করা উচিৎ যে তার মাথা গর্ধবের মাথায় রূপান্তর করা হবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, উক্ত সূরতে মুক্তাদীর নামাজ জায়েজ হবে না বিধায়, মুক্তাদীর জন্য ঐ রুকু পুনঃ আদায় করা ওয়াজিব। যদি পুনঃআদায় না করে তাহলে তার নামাজ আদায় হবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল, মুক্তাদী রুকূর যে অংশ ইমামের পূর্বে আদায় করেছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَلَا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ ـ

অর্থ– ইমাম এই জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যে তার অনুসরণ করা হবে। অতএব তোমরা ইমামের সাথে ইখতেলাফ বা বিরোধিতা করবে না।

সুতরাং মুক্তাদীর একাকী আদায়কৃত অংশ গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় উহার উপর যা বিনা করা হবে তা ফাসিদ হয়ে যাবে। আর মূলনীতি হচ্ছে–

اَلْبِنَاءُ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ ـ

অর্থ– ফাসিদের উপর যার বিনা হয় তা ফাসিদ হয়। এটাকে ধরে নেওয়া হবে যে, ইমাম রুকূ করার পূর্বেই মুক্তাদী রুকূ থেকে স্বীয় মাথা উঠিয়ে নিয়েছে।

<u>আমাদের দলিল :</u> জায়েজের শর্ত হলো, কোনো এক অংশে শরিক হওয়া। আর এখানে এক অংশে শরিক হওয়া পাওয়া গেছে। নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য এ পরিমাণ শিরকতই (شركت) যথেষ্ট। যেমন ঃ প্রথম অংশে মুক্তাদী ইমামের সাথে শরিক হলো, অতঃপর ইমামের পূর্বে রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে নিল। তাহলে নামাজ জায়েজ হয়। কেননা এক অংশে শরিক হওয়া পাওয়া গেছে।

পক্ষান্তরে যদি ইমামের পূর্বে রুকূতে যায় এবং ইমাম রুকূ করার পূর্বেই মুক্তাদী মাথা রুকূ হতে উঠিয়ে নেয় তাহলে নামাজ জায়েজ হবে না। কেননা এই সূরতে কোনো অংশেই ইমামের সাথে শরিক হওয়া পাওয়া যায়নি। অথচ কোনো অংশে শরিক থাকা শর্ত।

بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

مَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةٌ قَضَاهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَقَدَّمَهَا عَلٰى فَرْضِ الْوَقْتِ وَالْاَصْلُ فِيْهِ اَنَّ التَّرْتِيْبَ بَيْنَ الْفَوَائِتِ وَفَرْضِ الْوَقْتِ عِنْدَنَا مُسْتَحَقٌّ وَعِنْدَ الشَّافِعِىْ مُسْتَحَبٌّ لِاَنَّ كُلَّ فَرْضٍ اَصْلٌ بِنَفْسِهٖ فَلَايَكُوْنُ شَرْطًا لِغَيْرِهٖ وَلَنَا قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلَمْ يَذْكُرْهَا اِلَّا وَهُوَ مَعَ الْاِمَامِ فَلْيُصَلِّ الَّتِىْ هُوَ فِيْهَا ثُمَّ لِيُصَلِّ الَّتِىْ ذَكَرَهَا ثُمَّ لِيُعِدِ الَّتِىْ صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ . وَلَوْخَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ يُقَدِّمُ الْوَقْتِيَّةَ ثُمَّ يَقْضِيْهَا لِاَنَّ التَّرْتِيْبَ يَسْقُطُ بِضَيْقِ الْوَقْتِ وَكَذَا بِالنِّسْيَانِ وَكَثْرَةِ الْفَوَائِتِ كَيْلَايُؤَدِّيَ اِلٰى تَفْوِيْتِ الْوَقْتِيَّةِ . وَلَوْقَدَّمَ الْفَائِتَةَ جَازَ لِاَنَّ النَّهْىَ عَنْ تَقْدِيْمِهَا لِمَعْنًى فِىْ غَيْرِهَا بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ فِى الْوَقْتِ سَعَةٌ وَقَدَّمَ الْوَقْتِيَّةَ حَيْثُ لَايَجُوْزُ لِاَنَّهٗ اَدَّاهَا قَبْلَ وَقْتِهَا الثَّابِتِ بِالْحَدِيْثِ .

পরিচ্ছেদ : কাজা নামাজের বিবরণ

অনুবাদ : যদি কারো কোনো নামাজ কাজা হয়ে যায়, তবে যখনই স্মরণ হবে তখন তা পড়ে নেবে এবং ওয়াক্তিয়া (وقتيه) নামাজের আগে তা পড়ে নিবে। এ বিষয়ে মূলনীতি হলো– ওয়াক্তিয়া ফরজ নামাজ এবং কাজা নামাজসমূহের মাঝে তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আমাদের মতে ওয়াজিব। আর ইমাম শাফেঈ (র.) -এর মতে তা মোস্তাহাব। কেননা প্রতিটি ফরজ নামাজ اصل بنفسه বা নিজস্বভাবে সাব্যস্ত। সুতরাং অন্য ফরজের জন্য তা শর্ত হতে পারে না। আমাদের দলিল হলো রাসূল ﷺ -এর বাণী, যে ব্যক্তি নামাজের সময় ঘুমিয়ে থাকে অথবা নমাজের কথা ভুলে যায়, আর তা ইমামের সাথে নামাজে শরিক হওয়ার পরই মনে মনে পড়ে। তবে সে যে নামাজ আরম্ভ করেছে, তা পড়ে নেবে। এর পর যে নামাজের কথা মনে পড়েছে তা পড়ে অতঃপর ইমামের সাথে যে নামাজ আদায় করেছে তা পুণরায় আদায় করবে। যদি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে ওয়াক্তিয়া নামাজ আগে পড়ে নিবে, এরপর কাজা নামাজ আদায় করবে, সময়ের সংকীর্ণতার কারণে। তেমনি ভুলে যাওয়ার কারণে এবং কাজা বেশি হওয়ার কারণে তরতীব রহিত হয়ে যায়, যাতে ওয়াক্তিয়া নামাজ ফউত হয়ে যাওয়ার উপক্রম না হয়ে পড়ে। আর যদি কাজা নামাজ আগে পড়ে নেয় তবে তা জায়েজ হবে। কেননা তা আগে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে অন্যের কারণে (কাজা নামাজের নিজস্ব কোনো কারণে নয়)। পক্ষান্তরে যদি সময়ের মধ্যে প্রশস্ততা থাকে এবং ওয়াক্তিয়া নামাজকে আগে আদায় করে, তবে তা জায়েজ হবে না। কেননা হাদীস দ্বারা উক্ত নামাজের জন্য যে সময় সাব্যস্ত করা হয়েছে তার পূর্বে সে তা আদায় করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রাসঙ্গিক কথা ঃ পূর্বের অধ্যায়ে আদা (ادا،) নামাজ সম্পর্কীয় আহকামের আলোচনা হয়েছে। এ অধ্যায়ে কাজা নামাজের আহকাম আলোচনা হবে। যেহেতু আদা (ادا،) নামাজ আসল আর কাজা (قضاء) নামাজ উহার খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত এজন্য আদা নামাজের আলোচনা আগে আর কাজা নামাজের আলোচনা পরে আনা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আইনে ওয়াজিবকে তার মুস্তাহিক বা হকদারের নিকট সোপর্দ করা কে আদা (ادا،) বলে। ওয়াজিবের মতো জিনিসকে মুস্তাহিক বা হকদারের নিকট সোপর্দ করে দেওয়াকে কাজা (قضاء) বলে।

যদি কারো নামাজ কাজা হয়ে যায় তাহলে যখনই স্মরণ হবে তখনই তা পড়ে নিবে এবং ওয়াক্তিয়া নামাজের আগে তা পড়ে নিবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, মূলনীতি হলো আমাদের মতে কাজা নামাজ এবং ওয়াক্তিয়া নামাজের মাঝে তরতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ কাজা নামাজ ওয়াক্তিয়া নামাজের অগ্রে পড়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে তরতীব বা ক্রম রক্ষা করা মোস্তাহাব। তাই কাজা নামাজকে ওয়াক্তিয়ার অগ্রে আদায় করা ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল, প্রতিটি ফরজ নামাজ নিজস্বভাবে সাব্যস্ত। সুতরাং তা অন্য ফরজের জন্য শর্ত হতে পারে না। কেননা শর্ত তাবে (تابع) হয়। আর মূল (اصالت) এবং তাবইয়্যাত (تبعيت) বা তাবের মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যমান। অতএব যদি ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করার জন্য কাজা নামাজকে অগ্রে আদায় করা শর্ত আরোপ করা হয়, তাহলে কাজা নামাজ তাবে হচ্ছে অথচ কাজা নামাজ ফরজ হওয়ার কারণে নিজেস্ব ভাবে আসল বা মূল। অতএব সাবিত হলো যে, কাজা নামাজ ওয়াক্তিয়া নামাজের অগ্রে আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

আমাদের দলিল ঃ রাসূল ﷺ বলেছেন–

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلَمْ يَذْكُرْهَا اِلَّا وَهُوَ مَعَ الْاِمَامِ فَلْيُصَلِّ الَّتِىْ هُوَ فِيْهَا ثُمَّ لْيُصَلِّ الَّتِىْ ذَكَرَهَا ثُمَّ لْيُعِدِ الَّتِىْ مَعَ الْاِمَامِ.

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সে যে নামাজ ইমামের সাথে পড়েছে তা কাজা নামাজের অগ্রে হয়েছে। অথচ কাজা নামাজ অগ্রে পড়া ওয়াজিব। এ কারণে ঐ নামাজ (ওয়াক্তিয়া) দোহরানোর হুকুম দেওয়া হয়েছে। যাতে কাজা এবং ওযাক্তিয়া নামাজের মাঝে তরতীব রক্ষা হয়।

প্রশ্ন ঃ এ হাদীসটি হলো আখবারে আহাদ (اخبار احاد)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর খবরে ওয়াহিদ (خبر واحد) দ্বারা ফরজ সাবিত হয় না। অতএব এ হাদীস দ্বারা তারতীবের ফরজ সাবিত হবে না।

উত্তর ঃ এ হাদীস খবরে ওয়াহিদ (خبر واحد) নয় বরং খবরে মশ্‌হুর (خبر مشهور) আর খবরে মাশহুর দ্বারা ওয়াজিব বা ফরজ সাবিত হয়। আর যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এ হাদীসটি খবরে ওযাহিদ তাহলে জবাব হলো যে, তারতীব আল্লাহর কিতাব اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ-এর দ্বারা সাবিত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব এ ক্ষেত্রে মুজমাল (مجمل) আর উক্ত হাদীসটি কিতাবের মুজমালের ব্যাখ্যা স্বরূপ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَوْخَافَ فَوْتَ الخ ঃ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাজা এবং ওয়াক্তিয়া নামাজের মাঝে তরতীব ওয়াজিব। তবে যদি সময় সংকীর্ণ হয় যে, কাজা নামাজে রত হলে ওয়াক্ত শেষ হওয়ার অশঙ্কা থাকে, তাহলে ওয়াক্তিয়া নামাজ আগে আদায় করবে, অতঃপর কাজা নামাজ আদায় করবে। কেননা তিন জিনিসের দ্বারা তারতীব রহিত হয়ে যায় ১. সময়ের সংকীর্ণতা ২. ভুলে যাওয়া। ৩. কাজা নামাজ বেশি হওয়া। বেশির সীমা হলো ছয় ওয়াক্ত নামাজ উক্ত জিনিসগুলো দ্বারা তারতীব এই জন্য রহিত হয় যে, কাজা নামাজসমূহ আদায়ের কারণে ওয়াক্তিয়া নামাজ যেন ফউত না হয়।

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, কাজা এবং ওয়াক্তিয়া নামাজের মাঝে তরতীর ওয়াজিব। তবে তা সময়ের সংকীর্ণতার কারণে ত রহিত হয়ে যায়। যদি সময়ের সংকীর্ণতা সত্ত্বেও কাজা নামাজ আগে পড়ে এবং ওয়াক্তিয়া ছেড়ে দেয়, তাহলে কাজা নামাজ জায়েজ হবে। কেননা তা সময় সংকীর্ণতার অবস্থায় অগ্রে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে অন্যের কারণে। অর্থাৎ ওয়াক্তিয়া ছেড়ে দেওয়ার কারণে। এখানে ওয়াক্তিয়া ছাড়ার কারণে কাজা নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি হয় নি; তবে ওয়াক্তিয়া নামাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণে তার গুনাহ হবে। পক্ষান্তরে যদি সময়ের মধ্যে প্রশস্ততা থাকে এবং ওয়াক্তিয়াকে অগ্রে আদায় করে নেয়, তবে তা জায়েজ হবে না : কেননা হাদীস দ্বারা উক্ত নামাজের জন্য যে ওয়াক্ত সাব্যস্ত হয়েছে তার পূর্বে সে ত আদায় করেছে। অর্থাৎ হাদীস দ্বারা সাবিত হয়েছে যে, ওয়াক্তিয়ার সময় কাজা আদায়ের পর। আর যে নামাজ সময়ের পূর্বে আদায় করা হয় তা জায়েজ হয় না। কাজেই সময়ের মধ্যে প্রশস্ততা থাকলে ওয়াক্তিয়া নামাজ কাজার অগ্রে পড়লে জায়েজ হবে না

وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ رَتَّبَهَا فِي الْقَضَاءِ كَمَا وَجَبَتْ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ شُغِلَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَضَاهُنَّ مُرَتَّبًا ثُمَّ قَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي إِلَّا أَنْ يَزِيدَ الْفَوَائِتُ عَلَى سِتِّ صَلَوَاتٍ لِأَنَّ الْفَوَائِتَ قَدْ كَثُرَتْ فَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ فِيمَا بَيْنَ الْفَوَائِتِ بِنَفْسِهَا كَمَا يَسْقُطُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَقْتِيَّةِ وَحَدُّ الْكَثْرَةِ أَنْ تَصِيرَ الْفَوَائِتُ سِتًّا بِخُرُوجِ وَقْتِ الصَّلٰوةِ السَّادِسَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْمَذْكُورِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِنْ فَاتَتْهُ أَكْثَرُ مِنْ صَلَوَاتِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَجْزَأَتْهُ الَّتِي بَدَأَ بِهَا لِأَنَّهُ إِذَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تَصِيرُ سِتًّا وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ اعْتَبَرَ دُخُولَ وَقْتِ السَّادِسَةِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْكَثْرَةَ بِالدُّخُولِ فِي حَدِّ التَّكْرَارِ وَذٰلِكَ فِي الْأَوَّلِ ـ

অনুবাদ : যদি কয়েক ওয়াক্ত নামাজ ফউত হয়ে যায় তাহলে মূলতঃ নামাজ যে তরতীবে ওয়াজিব হয়েছিল কাজা নামাজও সে তারতীবে আদায় করবে। কেননা খন্দকের যুদ্ধে মহানবী ﷺ-এর চার ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়েছিল। তখন তিনি সেগুলো তারতীবের সাথে কাজা করেছিলেন। এরপর বলেছিলেন, আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখেছো, সেভাবে তোমরাও নামাজ পড়ো। তবে যদি কাজা নামাজ ছয় ওয়াক্তের বেশি হয়ে যায় তবে এর হুকুম ভিন্ন। কেননা কাজা নামাজ বেশি পরিমাণে হয়ে যাওয়ায় কাজা নামাজগুলোর মাঝেও তরতীব রহিত হয়ে যাবে, যেমন– কাজা নামাজ ও ওয়াক্তিয়া নামাজের মাঝে রহিত হয়ে যায়। আধিক্যের পরিমাণ হলো– কাজা নামাজ ছয় ওয়াক্ত হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ ষষ্ঠ নামাজের ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়া। জামিউস সাগীর কিতাবের নিম্নোক্ত ইবারতের অর্থ এটাই। "যদি একদিন একরাত্রের অধিক নামাজ ফউত হয়ে যায় তাহলে যে ওয়াক্তের নামাজই প্রথমে কাজা করবে, তা জায়েজ হবে। কেননা একদিন এক রাত্রের অধিক হলে নামাজের সংখ্যা ছয় হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত যে, তিনি ষষ্ঠ ওয়াক্ত দাখিল হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। তবে প্রথমোক্ত মতটিই বিশুদ্ধ। কেননা পুনঃ আরোপিত হওয়ার সীমায় উপনীত হওয়া দ্বারা আধিক্য সাব্যস্ত হয়। আর তা প্রথমোক্ত সূরতে রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যেমন ওয়াক্তিয়া এবং কাজা নামাজের মাঝে তরতীব ফরজ তদ্রূপ কাজা নামাজসমূহের মাঝেও তরতীব ফরজ। যদি একাধিক নামাজ ফউত হয়ে যায় তাহলে এর কাজা ঐ তারতীব (ধারাবাহিকতা) অনুযায়ী পড়বে যে তারতীব অনুযায়ী আদা ওয়াজিব হয়েছিল। হাদীস–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتّٰى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ـ

অর্থ– হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বলেন যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় মুশরিকরা হযরত রাসূল ﷺ-কে চার ওয়াক্ত নামাজ থেকে বিরত রেখেছে। এমনকি রাতের কিয়াদংশ অতিবাহিত হয়ে গেছে। হযরত রাসূল ﷺ হযরত বিলাল (রা.) কে হুকুম দিলেন। হযরত বিলাল (রা.) আযান দিলেন; তারপর ইকামত দিলেন, অতঃপর যুহরের নামাজ পড়লেন। তারপর ইকামত দিলেন এবং আসরের নামাজ পড়লেন। অতঃপর (মাগরিবের) ইকামত দিলেন এবং মাগরিবের নামাজ পড়লেন, তারঃপর ইশার আজান দিলেন এবং ইশার নামাজ পড়লেন।

অতঃপর বললেন صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ অর্থ– তোমরা যেভাবে আমাকে নামাজ পড়তে দেখছো, সেভাবে তোমরাও নামাজ পড়বে। হাদীসে চিন্তা-ভাবনা করার দ্বারা জানা যায় যে, যে তরতীব অনুযায়ী নামাজ ফউত হয়েছে, হযরত রাসূল ﷺ সে তরতীব অনুযায়ীই নামাজ কাজা করেছেন।

অতঃপর নির্দেশ স্বরূপ বলেছেন– صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখেছো, তোমরা সেভাবে নামাজ পড়ও। প্রকাশ থাকে যে, আগামী সময়ের জন্য পড়বে এ হুকুম প্রযোজ্য। মোটকথা এ হাদীসের দ্বারা কাজা নামাজের মধ্যে তরতীব সাবিত হয়। তবে হ্যাঁ; যদি কাজা নামাজের সংখ্যা ছয় ওয়াক্তের বেশি হয়, তাহলে তারতীব ওয়াজিব হওয়ার হুকুম রহিত হয়ে যাবে। দলিল কাজা নামাজ বেশি হলে অসুবিধার কারণে তরতীব পালনের হুকুম রহিত হবে। যেমন অনেক কাজা এবং ওয়াক্তিয়ার মাঝে তরতীব রহিত হয়ে যায়। আধিক্যের পরিমাণ হলো ষষ্ঠ নামাজের ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়া।

উক্ত মাসআলা জামেউস সাগীর গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কাজা নামাজ যদি একদিন এক রাত্রের বেশি হয়, তাহলে যে ওয়াক্তের নামাজই প্রথমে কাজা করবে তা জায়েজ হবে। কেননা একদিন এক রাত্রের অধিক হলে নামাজের সংখ্যা ছয় হয়ে যাবে। আর ছয় নামাজ হওয়া আধিক্যের আলামত। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাজা নামাজ অধিক পরিমাণ হলে তরতীব রহিত হয়ে যায়। অতএব যে ওয়াক্তের নামাজই প্রথমে কাজা করে, তা জায়েজ হবে। তরতীব অনুযায়ী পড়ুক বা তরতীব বিহীন পড়ুক।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, ষষ্ঠ নামাজের ওয়াক্ত দাখিল হওয়ার দ্বারা কাজা অধিক হিসাবে সাব্যস্ত হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, প্রথম মতটি বিশুদ্ধ। অর্থাৎ ষষ্ঠ ওয়াক্তের শেষ সময় ধর্তব্য, প্রথম সময় দাখিল হওয়া ধর্তব্য নয়।

প্রথমোক্ত মতটি বিশুদ্ধ হওয়ার দলিল- আধিক্য ঐ সময় বলা হবে যখন নামাজের মধ্যে তাকরার تكرار বা পুনঃসম্পাদনের আরোপিত হবে। আর তাকরার (تكرار) ষষ্ঠ নামাজের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার দ্বারা হয়ে থাকে। কেননা যখন ষষ্ঠ নামাজের সময় শেষ হয় তখনই কাজা নামাজে তাকবার সাব্যস্ত হয়।

ইনায়া গ্রন্থকার বলেছেন, উক্ত মাসআলার মূল হচ্ছে قضاء بالاغماء-এর বিষয়টি। অর্থাৎ যদি অচেতনের কারণে কাজা নামাজ অনেক বেশি হয় তাহলে এর কাজা ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে যদি কাজা নামাজ কম হয় তা হলে এর কাজা ওয়াজিব হবে। এ বর্ণনা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, হযরত আলী (রা.) একদিন ও একরাত থেকে কম অচেতন ছিলেন, তখন তিনি একদিন ও এক রাতের নামাজ কাজা করেছেন। আম্মার ইব্‌নে ইয়াসীর (রা.) পূর্ণ এক দিন এক রাত অচেতন ছিলেন তিনি একদিন একরাতের নামাজ কাজা করেছেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) একদিন ও এক রাত থেকে অধিক অচেতন ছিলেন তিনি নামাজ কাজা করেননি। উক্ত তিন হযরতের ঘটনার দ্বারা বুঝা গেল যে, আধিক্যের সংজ্ঞায় তাকবার (تكرار)-এর বিষয়টি ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ ষষ্ঠ নামাজের সময় শেষ হওয়া।

وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْفَوَائِتُ الْقَدِيْمَةُ وَالْحَدِيْثَةُ قِيْلَ يَجُوْزُ الْوَقْتِيَّةُ مَعَ تَذَكُّرِ الْحَدِيْثَةِ لِكَثْرَةِ الْفَوَائِتِ وَقِيْلَ لَاتَجُوْزُ وَيُجْعَلُ الْمَاضِيْ كَانْ لَمْ يَكُنْ زَجْرًا لَهُ عَنِ التَّهَاوُنِ . وَلَوْقَضٰى بَعْضَ الْفَوَائِتِ حَتّٰى قَلَّ مَابَقِيَ عَادَ التَّرْتِيْبُ عِنْدَ الْبَعْضِ وَهُوَ الْاَظْهَرُ فَاِنَّهُ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيْ مَنْ تَرَكَ صَلٰوةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَجَعَلَ يَقْضِيْ مِنَ الْغَدِ مَعَ كُلِّ وَقْتِيَّةٍ فَائِتَةً فَالْفَوَائِتُ جَائِزَةٌ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَالْوَقْتِيَّاتُ فَاسِدَةٌ اِنْ قَدَّمَهَا لِدُخُوْلِ الْفَوَائِتِ فِيْ حَدِّ الْقِلَّةِ وَاِنْ اَخَّرَهَا فَكَذٰلِكَ اِلَّا الْعِشَاءَ الْاَخِيْرَةَ لِاَنَّهُ لَا فَائِتَةَ عَلَيْهِ فِيْ ظَنِّهِ حَالَ اَدَائِهَا .

অনুবাদ : যদি পূর্বের ও সাম্প্রতিক কাজা নামাজ একত্রিত হয়ে যায়। তবে কোনো কোনো আলিমের মতে সাম্প্রতিক কাজা নামাজ স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে। কেননা কাজা নামাজ অধিক হয়ে গেছে। কোনো কোনো আলিমের মতে জায়েজ হবে না এবং বিগত কাজা নামাজ গুলোকে যেন তা হয়নি বলে ধরে নেওয়া হবে। যাতে ভবিষ্যতে সে এ ধরনের অলসতা থেকে সতর্ক হয়ে যায়। যদি কোনো ব্যক্তি কিছু কাজা নামাজ আদায় করে ফেলে এবং অল্প পরিমাণ কাজা তার উপর অবশিষ্ট থাকে।,তাহলে কোনো কোনো আলিমের মতে তারতীবের হুকুম পুনঃ আরোপিত হবে। এই মতই অধিক সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ একদিন ও এক রাত্রের নামাজ তরক করে, আর পরবর্তী দিন প্রতি ওয়াক্তিয়া নামাজের সাথে এক ওয়াক্তের কাজা নামাজ আদায় করতে থাকে তবে কাজা নামাজগুলো সর্বাবস্থায় জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে যদি ওয়াক্তিয়া নামাজ (কাজা নামাজের) আগে আদায় করে তবে তা ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা কাজা নামাজগুলো অল্প– এর গন্ডিতে এসে গেছে। আর যদি ওয়াক্তিয়াকে (কাজা নামাজের) পরে আদায় করে, তবে একই হুকুম হবে (অর্থাৎ ফাসিদ হবে) কিন্তু পরবর্তী ইশার নামাজের হুকুম ভিন্ন (অর্থাৎ তা আদায় হয়ে যাবে)। কেননা তার ধারণা মতে ইশার নামাজ আদায় করার সময় তার যিম্মায় কোনো কাজা নামাজ ছিল না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাজা নামাজ দুই প্রকার পুরাতন কাজা, নতুন কাজা। যেমন কোনো ব্যক্তি এক মাসের নামাজ কাজা করেছে। অতঃপর স্বীয় কর্মের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে কাজা নামাজগুলো আদায় করা শুরু করেছে ওয়াক্তিয়ার মাঝে। সবগুলো কাজা আদায় করার পূর্বেই আরো কিছু নামাজ নতুন করে কাজা করেছে। তবে তা ছয় ওয়াক্তের কম। পূর্বের ফউত হওয়া নামাজকে পুরাতন কাজা আর পরবর্তীতে ফউত হওয়া নামাজকে নতুন কাজা বলা হবে। এমতাবস্থায় যদি সে ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়ে এবং তার নতুন কাজা নামাজের কথা স্মরণ থাকে। তাহলে ওয়াক্তিয়া নামাজ জায়েজ হবে কিনা? পরবর্তী আলিমদের মতে ওয়াক্তিয়া নামাজ জায়েজ হবে। কেননা পুরাতন কাজা এবং নতুন কাজা একত্র করলে তা অধিকের পরিমাণে পৌঁছে। আর আধিক্য তরতীবকে রহিত করে দেয়। অতএব ওয়াক্তিয়া নামাজকে অগ্রবর্তী করতে কোনো অসুবিধা নেই। ফতোয়া এর উপরই। কেউ কেউ বলেছেন, নতুন কাজার পূর্বে ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। এর দলিল হলো, সে পুরাতন কাজা আদায় করতে অলসতা করেছে। তাই শরিয়ত তাকে শাসনের জন্য পুরাতন কাজাকে শূন্য ঘোষণা করেছে মনে হয়, যেন তার দায়িত্বে তা ছিল না। সুতরাং এখন তার দায়িত্বে শুধু নতুন কাজা রয়েছে। কাজা এবং ওয়াক্তিয়ার মাঝে তরতীব ওয়াজিব। তাই ওয়াক্তিয়া নামাজকে অগ্রবর্তী করা জায়েজ নেই।

সূরতে মাস্‌আলা, যেমন কোনো ব্যক্তির এক মাসের নামাজ ফউত হয়েছে। অতঃপর সে কাজা নামাজগুলো পড়া আরম্ভ করে দিল। অতঃপর তা ছয় ওয়াক্তের কম রয়ে গেল। তারপর সে ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়ল, অবশিষ্ট কাজা নামাজ স্মরণ থাকা সত্ত্বেও। এমতাবস্থায় ওয়াক্তিয়া নামাজ জায়েজ হবে কিনা? এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মুতাবিক জায়েজ হবে না। অন্য বর্ণনা মুতাবিক জায়েজ হবে। এটাই আবূ হাফ্‌স কাবীর (র.), আল্লামা ফখরুল ইসলাম (র.), শামসুল আইম্মা (মুহীত প্রণেতা) (র.) এবং কাজী খাঁন প্রমুখ ফকীহগণের মত। দ্বিতীয় বর্ণনার দলিল, এই ব্যক্তির দায়িত্বে এক মাসের নামাজ ছিল। বলা বাহুল্য যে, এক মাসের নামাজ আধিক্যের গন্ডী ভুক্ত। আর আধিক্যের পরিমাণে পৌঁছলে তরতীব রহিত হয়ে যায়। এখানেও কাজা নামাজ অধিক হওয়ার কারণে তরতীব রহিত হয়ে গেছে। মূলনীতি আছে اَلسَّاقِطُ لَا يَعُوْدُ অর্থ– যা একবার রহিত হয়ে যায়, তা আর ফিরে আসে না। যেমন অল্প নাপাক পানি, এই নাপাক পানি যদি প্রবাহমান

পানিতে ঢেলে দেওয়া হয় তারপর তা বেশি হয়ে যায় এবং প্রবাহিত হয় অতঃপর তা কালীল (قليل) বা কম হয়ে যায় তাহলে এই পানি নাপাক হবে না। কেননা ঐ পানি অধিক এবং প্রবাহমান হওয়ার কারণে এর নাপাকি দূর হয়ে গেছে। আর মূলনীতি আছে اَلسَّاقِطُ لاَ يَعُوْدُ অতএব দূর হয়ে যাওয়া নাপাকি পুনরায় আর ফিরে আসবে না। তদ্রূপ কাজা নামাজ অধিক হওয়ার কারণে তরতীব রহিত হয়ে গিয়েছে। অতঃপর কাজা নামাজ কমের গণ্ডিতে এসে গেছে। বিধায় কমের গণ্ডির কারণে তরতীব পুনরায় ফিরে আসবে না। সুতরাং ওয়াক্তিয়া নামাজ অবশিষ্ট কাজা নামাজের অগ্রে পড়া জায়েজ হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, প্রথম বর্ণনা যুক্তির দৃষ্টিকোণে এবং রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে অগ্রগণ্য। যুক্তির দৃষ্টিকোণে তরতীব রহিত হওয়ার ইল্লত (علت) বা কারণ হলো অধিক্য যা জটিলতার সৃষ্টি করে। আর যেহেতু সে কাজা নামাজের অধিকাংশ আদায় করেছে। ছয় ওয়াক্ত নামাজের কম অবশিষ্ট আছে। এই জন্য তরতীব রহিত হওয়ার ইল্লত বা কারণ নেই। তাই তরতীব রহিত হবে না এবং কেননা ইল্লত চূড়ান্ত হওয়ার দ্বারা হুকুমও চূড়ান্ত হয়; সুতরাং তারতীব পুনরায় ফিরে আসবে। তাই অবশিষ্ট কাজা নামাজের উপর ওয়াক্তিয়া নামাজকে আগে আদায় করা জায়েজ হবে না। কেননা অল্প কাজা এবং ওয়াক্তিয়া নামাজের মাঝে তরতীব ফরজ।

রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে এই মতই শক্তিশালী যে, ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি এক দিন এক রাত্রের নামাজ ছেড়ে দিবে, যেমন কারো ফজর হতে ঈশা পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফউত হয়ে গেল তারপর আগামীকাল প্রতি ওয়াক্তিয়া নামাজের সাথে এক ওয়াক্ত কাজা নামাজ আদায় করতে লাগল। যেমন ফজরের নামাজের সময় গতকালের ফজরের নামাজ এবং যুহরের নামাজের সময়; গতকালের যুহরের নামাজ আদায় করল অনুরূপভাবে অন্যান্য নামাজ আদায় করে নিল, তাহলে কাজা নামাজ হয়ে যাবে। চাই কাজা নামাজ ওয়াক্তিয়া নামাজের আগে পড়ুক বা পরে পড়ুক। পক্ষান্তরে ওয়াক্তিয়া নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে, চাই ওয়াক্তিয়া নামাজ কাজা নামাজের আগে পড়ুক বা পরে পড়ুক। তবে এতটুকু পার্থক্য আছে যে, ওয়াক্তিয়া নামাজ আগে আদায় করার সূরতে পাঁচ ওয়াক্ত ফজর হতে ইশা পর্যন্ত ফাসিদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ওয়াক্তিয়া নামাজ পরবর্তীতে পড়ার সূরতে ইশা ব্যতীত অন্য চার ওয়াক্ত ফাসিদ হয়ে যাবে।

এর ব্যাখ্যা হলো– যে ব্যক্তির ফজর হতে ইশা পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফউত হয়েছে, সে পরের দিন হতে কাজা পড়া আরম্ভ করে দিল। এভাবে আদায় করা আরম্ভ করল যে, প্রথমে ফজরের ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করল, অতঃপর গতকালের ফজর আদায় করল। যেহেতু এ ব্যক্তির উপর তরতীব ওয়াজিব। এই জন্য ওয়াক্তিয়া নামাজকে কাজা নামাজের আগে করার কারণে ওয়াক্তিয়া নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এখন কাজা নামাজের সংখ্যা ছয় হলো গতকালের পাঁচ ওয়াক্ত এবং আজকের ফজরের এক ওয়াক্ত (মোট ছয় ওয়াক্ত) গতকালের ফজরের নামাজ আদায় করার কারণে কাজা নামাজের সংখ্যা পাঁচ হয়েছে গতকালের যুহর হতে ইশা পর্যন্ত চার ওয়াক্ত এবং আজকের ফজর। এমতাবস্থায় যদি আজকের যুহর আগে আদায় করে এবং গতকালের যুহর পরে আদায় করে তাহলে আজকের যুহরের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা তার উপর তারতীব ওয়াজিব থাকা সত্ত্বেও সে ওয়াক্তিয়া নামাজকে কাজা নামাজের আগে আদায় করেছে। আজকের যুহর ফাসিদ হওয়ার কারণে কাজা নামাজের সংখ্যা ছয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ গতকালের যুহর হতে আজকের যুহর পর্যন্ত। তবে আজকের যুহরের নামাজ পড়ার দ্বারা কাযা নামাজের সংখ্যা পাঁচে এসে যাবে। অর্থাৎ গতকালের আসর থেকে আজকের যুহর পর্যন্ত। অতঃপর যদি আজকের আসরকে প্রথমে আদায় করে তাহলে তার উপর তরতীব ওয়াজিব হওয়ার কারণে আসরের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। বিধায় কাজা নামাজের সংখ্যা ছয়ে দাঁড়াবে। তবে গতকালের আসর আদায় করার কারণে কাজা নামাজের সংখ্যা পাঁচে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ মাগরিব হতে আসর পর্যন্ত। তারপর যদি মাগরিবের সময় ওয়াক্তিয়া নামাজকে আগে আদায় করে, তাহলে তার উপর তরতীব ওয়াজিব হওয়ার কারণে মাগরিবের ওয়াক্তিয়া নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে এবং কাজা নামাজের সংখ্যা ছয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ গতকালের মাগরিব হতে আজকের মাগরিব পর্যন্ত। তবে গতকালের মাগরিবের কাজা আদায় করার কারণে কাজা নামাজের সংখ্যা পাঁচে এসে দাঁড়াল। এমতাবস্থায় ইশার সময় ওয়াক্তিয়া নামাজ আগে করল। বিধায় তার উপর তরতীব ওয়াজিব হওয়ার কারণে ইশার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। তাই কাজা নামাজের সংখ্যা দাঁড়াবে ছয়ে। অর্থাৎ গতকালের ইশা হতে আজকের ইশা পর্যন্ত তবে গতকালের ইশার নামাজ আদায় করেছে এবং উহা জায়েজ হয়েছে তাই কাজা নামাজের সংখ্যা পাঁচে এসে দাঁড়িয়েছে। এ বিস্তারিত ব্যাখ্যার দ্বারা আমরা জানতে পেরেছি যে, যদি ওয়াক্তিয়া নামাজকে কাজা নামাজের আগে আদায় করে তাহলে ওয়াক্তিয়া নামাজ ফাসিদ হবে, তবে কাজা নামাজ জায়েজ হবে এবং ইহাও সাবিত হয়েছে যে, যদি কাজা নামাজ ছয় ওয়াক্তের কম হয় তাহলে তারতীবের ওজুব (وجوب) পুনঃ আরোপিত হবে। এখানে একে সাবিত করাই লক্ষ্য। পক্ষান্তরে যদি ওয়াক্তিয়া নামাজ কাজা নামাজের পরে আদায় করে। তাহলে এর বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে– কেউ আজকের ফজরের সময়ে গতকালের ফজর আগে পড়েছে। তারপর আজকের ফজর পড়েছে। তাহলে গতকালের ফজর বিশুদ্ধ হয়েছে, তবে আজকের ফজর সহীহ হবে না। কেননা আজকের ওয়াক্তিয়া ফজরকে কাজা নামাজের আগে পড়েছে অথচ তরতীব বা ক্রম রক্ষা ওয়াজিব হওয়ার কারণে কাজা নামাজকে ওয়াক্তিয়া নামাজের আগে পড়া আবশ্যক ছিল। এভাবে অন্যান্য নামাজগুলোকে কিয়াস করুন। তবে ইশার সময় গতকালের ইশা আগে পড়লে। তারপর আজকের ইশা পড়লে, এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, আজকের ইশা জায়েজ হবে। কেননা সে এ ধারণায় আছে যে, আমার দায়িত্বে কোনো কাজা নামাজ নেই। অথচ তার জিম্মায় আজকের চার ওয়াক্ত নামাজ কাজা আছে। এ ব্যক্তিকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় ধরা হবে যে কাজা নামাজ ভুলে গিয়েছে। পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, ভুলে যাওয়ার কারণে তারতীব রহিত হয়ে যায়। তাই ইশার নামাজ জায়েজ হয়ে যাবে। প্রকাশ থাকে যে, এ হুকুম ঐ সময় যখন এ ব্যক্তি অজ্ঞাত থাকবে। পক্ষান্তরে যদি এ ব্যক্তি জ্ঞাত হয় এবং এই মাসআলা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয় তাহলে ইশার নামাজও জায়েজ হবে না।

وَمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ فَهِيَ فَاسِدَةٌ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي أٰخِرِ الْوَقْتِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ التَّرْتِيْبِ وَإِذَا فَسَدَتِ الْفَرْضِيَّةُ لَا يَبْطُلُ أَصْلُ الصَّلٰوةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَأَبِي يُوْسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَبْطُلُ لِأَنَّ التَّحْرِيْمَةَ عُقِدَتْ لِلْفَرْضِ فَإِذَا بَطَلَتِ الْفَرْضِيَّةُ بَطَلَتِ التَّحْرِيْمَةُ أَصْلًا وَلَهُمَا أَنَّهَا عُقِدَتْ لِأَصْلِ الصَّلٰوةِ بِوَصْفِ الْفَرْضِيَّةِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ ضَرُوْرَةِ بُطْلَانِ الْوَصْفِ بُطْلَانُ الْأَصْلِ ثُمَّ الْعَصْرُ يَفْسُدُ فَسَادًا مَوْقُوْفًا حَتّٰى لَوْ صَلّٰى سِتَّ صَلَوَاتٍ وَلَمْ يُعِدِ الظُّهْرَ اِنْقَلَبَ الْكُلُّ جَائِزًا وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَفْسُدُ فَسَادًا بَاتًّا لَا جَوَازَ لَهَا بِحَالٍ وَقَدْ عُرِفَ ذٰلِكَ فِي مَوْضِعِهِ .

অনুবাদ : যোহর আদায় করেনি, একথা স্মরণ থাকা অবস্থায় কেউ যদি আসরের নামাজ পড়ে তবে তা ফাসিদ হবে। কিন্তু একেবারে শেষ ওয়াক্তে স্মরণ থাকা অবস্থায় পড়ে থাকলে ফাসিদ হবে না। এটা তরতীব সংক্রান্ত মাসআলা। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) -এর মতে (উক্ত আসরের নামাজের) ফরজগুণ নষ্ট হয়ে গেলেও মূল নামাজ বাতিল হবে না (বরং তা নফল রূপে গণ্য হবে)। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে মূল নামাজও বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ফরযিয়্যাতের জন্যই নিয়ত বাধা হয়েছিল। সুতরাং যখন ফরযিয়্যাত বাতিল হয়ে গেল, তখন মূল তাহরীমাও বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) -এর দলিল হচ্ছে– তাহরীমা বাঁধা হয়েছে মূলতঃ নামাজের জন্য ফরযিয়্যাতের গুণ সহকারে। সুতরাং ফরযিয়্যাতের গুণ বিনষ্ট হওয়ার কারণে মূল নামাজ বিনষ্ট হওয়া জরুরি নয়। তবে আসর ফাসিদ হবে স্থগিতাবস্থায়। অতএব যদি যোহরের কাজা আদায় না করে ধারাবাহিক ছয় ওয়াক্ত নামাজ পড়ে ফেলে তবে সবকটি ওয়াক্তের নামাজই জায়েজে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে চূড়ান্তভাবে তা ফাসিদ হয়ে যাবে। কোনো অবস্থায় তা পুনঃ বৈধতা পাবে না। এ বিষয়ে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো ব্যক্তি আসরের নামাজ পড়েছে এবং তার স্মরণ আছে যে, সে যুহরের নামাজ পড়েনি, তা হলে তার আসরের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা সে তরতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি– যা তার উপর ওয়াজিব ছিল। পক্ষান্তরে যুহর পড়েনি, এ কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও আসরের নামাজ যদি আসরের শেষ সময়ে পড়ে, তাহলে আসরের নামাজ জায়েজ হবে। কেননা সময়ের সংকীর্ণতার কারণে তরতীব রহিত হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ॥ তরতীব ফউত হয়ে যাওয়ার কারণে ফরযিয়্যাত বাতিল হয়ে গেছে; এহেন অবস্থায় মূল নামাজও কি বাতিল হয়ে যাবে?

জবাব ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে তরতীব ফউত হওয়ার কারণে আসরের ফরজ যদিও বাতিল হয়ে যাবে; কিন্তু মূল নামাজ বাতিল হবে না; বরং তা নফল রূপে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, ফরজের গুণ নষ্ট হওয়ার কারণে মূল নামাজও বাতিল হয়ে যাবে। তাই ঐ নামাজ না ফরজ হিসাবে গণ্য হবে, না নফল হিসাবে গণ্য হবে। উক্ত মতানৈক্যের ফলাফল এই সূরতে প্রকাশ পাবে যে, এক ব্যক্তি আসরের নামাজ বেলা ডুবার

অনেক আগেই আরম্ভ করল, এমতাবস্থায় যে, তার যুহরের কাজা ইয়াদ আছে। অতঃপর সে নামাজ অবস্থায় অট্টহাসি দিল তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) -এর মতে তার অজু ভেঙ্গে যাবে। কেননা তাঁদের (শায়খাইনের) মতে মূল নামাজ বিদ্যমান আছে। আর নামাজ অবস্থায় অট্টহাসী অজুকে ভেঙ্গে দেয়। এই জন্য তাঁদের মতে অজু ভেঙ্গে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মূল নামাজ বাতিল হয়ে গেছে। তাই এ অট্টহাসি নামাজ অবস্থায় দেয় নি। আর নামাজের অবস্থা ব্যতীত অট্টহাসি অজুকে ভঙ্গ করে না। এই জন্য ঐ সূরতে অট্টহাসি অজুকে ভেঙ্গে দিবে না। মূল মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হচ্ছে– তাহরীমা আসরের ফরজের জন্য বাঁধা হয়েছে। অতএব যার জন্য তাহরীমা বাঁধা হয়েছিল তা যখন বাতিল হয়ে গেল, তাহলে তাহরীমাও বাতিল হয়ে যাবে। কেননা তাহরীমা ঐ বস্তুকে অর্জন করার মাধ্যম। আর যেহেতু উদ্দেশ্য বাতিল হয়ে গেছে। তাই মাধ্যমও বাতিল হয়ে যাবে। আর তাহরীমা বাতিল হওয়ার কারণে মূল নামাজও বাতিল হয়ে যাবে। অতএব তা ফরজ হিসাবে ও গণ্য হবে না এবং নফল হিসাবেও গণ্য হবে না।

শায়খাইনের দলিল তাহরীমা বাঁধা হয়েছে মূল নামাজের জন্য– যা ফরজের গুণে গুণান্বিত। আর তরতীব ফউত হওয়ার কারণে আসরের নামাজের ফরজ গুণ বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং ফরযিয়্যাতের গুণ নষ্ট হওয়ার কারণে মূল নামাজ বিনষ্ট হওয়া জরুরি নয়। অর্থাৎ গুণ নষ্ট হওয়ার কারণে মূল নষ্ট হওয়া জরুরি নয়। যেমন কোনো ব্যক্তি আর্থিক সংকটের কারণে কসমের কাফ্‌ফারার জন্য রোজা রাখা আরম্ভ করেছিল। অতঃপর দিনের মধ্যে সম্পদশালী হয়ে গেল। তাহলে মূল রোজা বাতিল হবে না। তবে তা কসমের কাফ্‌ফারা হিসাবে গণ্য হবে না। বরং নফল রোজা রূপে গণ্য হবে। কসমের কাফ্‌ফারা হিসাবে গণ্য না হওয়ার কারণ হচ্ছে যে, মালদার ব্যক্তির জন্য কসমের কাফ্‌ফারায় খাবার প্রদান করা বা গরিবদেরকে কাপড় দেওয়া অথবা গোলাম আজাদ করা জরুরি। উক্ত তিনটির কোনো একটি আদায় করতে সক্ষম না হলে তখন রোজা রাখার হুকুম। অতএব সে আর্থিক সংকটের কারণে কসমের কাফ্‌ফারা রোজার দ্বারা আরম্ভ করেছিল। তবে দিনের মধ্যে রোজা অবস্থায় সে মালদার হয়েছে। তাই তার রোজার কাফ্‌ফারার গুণ বাতিল হয়ে গেছে, তবে মূল রোজা বাতিল হয়নি। যেভাবে এখানে গুণ বাতিল হওয়ার কারণে মূল বাতিল হয়নি তদ্রূপ মতনের মাসআলার ক্ষেত্রেও ফরযিয়্যাতের গুণ বাতিল হওয়ার কারণে মূল নামাজ বাতিল হবে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْعَصْرُ يَفْسُدُ الخ ঃ সূরতে মাসআলা, কোনো ব্যক্তি আসরের নামাজ পড়েছে, এমতাবস্থায় যে তার স্মরণ আছে যে, সে যোহরের নামাজ পড়েনি, তাহলে তরতীব ফউত হওয়ার কারণে তার আসরের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে এতে মতা নৈক্য আছে যে, আসরের নামাজ স্থগিতাবস্থায় ফাসিদ হবে না চূড়ান্তভাবে ফাসিদ হবে? ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ফাসিদ হবে স্থগিতাবস্থায়। তবে যদি ছয় ওয়াক্ত নামাজ আজকের আসর হতে আগামীকালের আসর পর্যন্ত পড়ে ফেলে এবং যুহরের কাজা নামাজ এখনো পড়েনি তাহলে এসব নামাজ জায়েজ হবে।

দলিল হলো ঃ আসরের নামাজ এবং তার পরবর্তী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফাসিদ হওয়ার কারণ হচ্ছে তরতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা ওয়াজিব হওয়া। অর্থাৎ আসর, মাগরিব, ইশা এবং ফজর এবং আগামীকালের যোহর, এই জন্য ফাসিদ হবে যে, এখনো গতকালের যোহর আদায় করা হয়নি। অথচ তরতীবের দাবি ছিল প্রথমে গতকালের যোহর আদায় করা। তবে যখন সে আগামী দিনের আসর আদায় করেছে তখন মনে হয় যেন গতকালের যোহরের পরের ছয় ওয়াক্ত নামাজ ফাসিদ হয়েছে। ছয় ওয়াক্ত নামাজের দ্বারা আধিক্য সাবিত হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাজা নামাজ বেশি হওয়ার দ্বারা তরতীব রহিত হয়ে যায়। অতঃপর যখন সে আগামী দিনের আসর আদায় করল। তখন কাজা নামাজের আধিক্যের কারণে তরতীব রহিত হয়ে যাবে। তাই সকল নামাজ জায়েজ হবে।

সাহেবাইনের মতে আসরের নামাজ চূড়ান্তভাবে ফাসিদ হয়ে যাবে। কোনো অবস্থায়ই তা জায়েজ হবে না। এর সূরত হচ্ছে কোনো ব্যক্তি যোহরের নামাজ পড়েনি, তারপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিজ নিজ ওয়াক্তে পড়ে নিয়েছে তাহলে সাহেবাইনের দলিল, তরতীব রহিত হয়ে যাওয়ার ইল্লত (علت) বা কারণ কাজা নামাজের আধিক্য। মূলনীতি আছে যে, হুকুম ইল্লতের (علت) পরে হয়। অতএব ধারাবাহিকতা রহিত হয়ে যাওয়ায় হুকুম হবে যখন কাজা নামাজ বেশি (ছয়) হবে। তাই যোহরের কাজা ব্যতীত পাঁচ ওয়াক্ত যা স্ব স্ব ওয়াক্তে পড়েছে, তা চূড়ান্তভাবে ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা তরতীব রহিত হওয়ার ইল্লত (علت) পাওয়া যায় নি।

وَلَوْ صَلَّى الْفَجْرَ وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُوْتِرْ فَهِيَ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ (رحـ) خِلَافًا لَهُمَا وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلٰى أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ عِنْدَهُ سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا وَلَا تَرْتِيْبَ فِيْمَا بَيْنَ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَعَلٰى هٰذَا إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّى السُّنَّةَ وَالْوِتْرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ صَلَّى الْعِشَاءَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ فَعِنْدَهُ يُعِيْدُ الْعِشَاءَ وَالسُّنَّةَ دُوْنَ الْوِتْرِ لِأَنَّ الْوِتْرَ فَرْضٌ عَلٰى حِدَةٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُعِيْدُ الْوِتْرَ أَيْضًا لِكَوْنِهٖ تَبْعًا لِلْعِشَاءِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : বিতর পড়েনি, একথা স্মরণ থাকা অবস্থায় কেউ যদি ফজরের নামাজ আদায় করে, তবে তা ফাসিদ হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মত। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। এ মতভিন্নতার ভিত্তি হলো এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিতর হলো ওয়াজিব। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে তা সুন্নত। আর সুন্নত ও ফরজ নামাজসমূহের মাঝে তরতীব জরুরি নয়। বিতরের ব্যাপারে এই মতপার্থক্যের ভিত্তিতেই এ মাসআলা রয়েছে যে, কেউ যদি ইশার নামাজ পড়ার পর পুনরায় অজু করে সুন্নত ও বিতর আদায় করে। অতঃপর প্রকাশ পেল যে, ইশার নামাজ সে বিনা অজুতে পড়েছে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে শুধু ইশা ও সুন্নত পুনঃ আদায় করতে হবে। কেননা বিতর ভিন্ন ফরজ। সাহেবাইনের মতে বিতরও পুনরায় পড়বে। কেননা তা ইশা এর তাবে (تابع) বা অনুবর্তী। আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি ফজরের নামাজ পড়েছে। কিন্তু সে বিত্‌র পড়েনি। একথা তার স্মরণও আছে। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ফজরের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে ফাসিদ হবে না। ইমাম সাহেব এবং সাহেবাইনের মাঝে মতনৈক্যের ভিত্তি হলো যে, ইমাম সাহেবের মতে বিত্‌রের নামাজ ওয়াজিব। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে তা সুন্নত। ইহা সর্বজন স্বীকৃত কথা যে, শুধু ফরজ নামাজসমূহের মাঝে তরতীব ওয়াজিব। সুন্নত নামাজসমূহের মাঝে ওয়াজিব নয়। যেহেতু ইমাম সাহেবের মতে বিতর ওয়াজিব এই জন্য বিত্‌র এবং ফজরের মাঝে তরতীব ওয়াজিব হবে। উল্লেখিত সূরতে তরতীব না থাকার কারণে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে বিত্‌র সুন্নত। এই জন্য ফজর এবং বিতরের মাঝে তরতীব ওয়াজিব হবে না; যদিও একথা স্মরণ থাকে যে, সে বিতর পড়েনি। এই মূলনীতির ভিত্তিতে (ইমাম সাহেবের মতে বিত্‌র ওয়াজিব আর সাহেবাইনের মতে সুন্নত) যদি কেউ ইশার নামাজ পড়ল, তারপর অজু করে সুন্নত পড়ল এবং বিত্‌র আদায় করল। অতঃপর প্রকাশ পেল যে, সে বিনা অজুতে ইশার নামাজ পড়েছে। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইশার নামাজ এবং সুন্নত নামাজ উভয় কাজা করতে হবে। তবে বিতরের নামাজ কাজা করতে হবে না। বিতর এই জন্য কাজা করতে হবে না যে, বিতর ইমাম সাহেবের নিকট ওয়াজিব। তা যথা সময়ে পবিত্রতার সাথে আদায় করেছে। কেননা ইশার সময় যতটুকু, বিতরের সময়ও ততটুকু। এ ক্ষেত্রে শুধু এ কথা বলার অবকাশ আছে যে, ইশা এবং বিতরের মাঝে তরতীব পাওয়া যায়নি। এর জবাব হলো যে, ভুলে যাওয়ার কারণে তরতীব রহিত হয়ে গিয়েছে। অতএব বিতরের নামাজ পুনরায় পড়তে হবে না। পক্ষান্তরে সুন্নত নামাজ এই জন্য পুনঃ আদায় করতে হবে যে, তা ফরজের তাবে (تابع) বা অনুবর্তী। অতএব ইশার ফরজ পুনরায় আদায় করার কারণে সুন্নতকেও পুনরায় আদায় করা জরুরি হবে। সাহেবাইনের মতে বিতর সুন্নত। আর সুন্নত ইশার তাবে (تابع) বা অনুবর্তী। এজন্য ইশার নামাজের সাথে বিতর পুনরায় আদায় করা জরুরি। আল্লাহই ভাল জানেন।

بَابُ سُجُوْدِ السَّهْوِ

يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ فَتَعَارَضَتْ رِوَايَتَا فِعْلِهِ فَبَقِيَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ سَالِمًا وَلِأَنَّ سُجُوْدَ السَّهْوِ مِمَّا لَا يَتَكَرَّرُ فَيُؤَخَّرُ عَنِ السَّلَامِ حَتّٰى لَوْ سَهٰى عَنِ السَّلَامِ يَنْجَبِرُ بِهٖ وَهٰذَا الْخِلَافُ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ يَأْتِي بِتَسْلِيْمَتَيْنِ هُوَ الصَّحِيْحُ صَرْفًا لِلسَّلَامِ الْمَذْكُوْرِ إِلٰى مَا هُوَ الْمَعْهُوْدُ وَيَأْتِي بِالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالدُّعَاءِ فِي قَعْدَةِ السَّهْوِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِأَنَّ الدُّعَاءَ مَوْضِعُهُ اٰخِرُ الصَّلٰوةِ ـ

পরিচ্ছেদ : সাজদায়ে সাহ্ব-এর বিবরণ

অনুবাদ : নামাজে কম বেশি করার কারণে (শেষ বৈঠকে) সালামের পর দু'টি সাজদায়ে সাহ্ করবে। অতঃপর তাশাহহুদ পাঠ করবে এবং সালাম ফিরাবে। ইমাম সাফেঈ (র.) -এর মতে সালামের আগে সিজদা করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ আগেই সিজদায়ে সাহ্ব করেছেন। আমাদের দলিল এই যে, নবী করীম ﷺ এর বাণী–প্রতিটি সাহ্ব (ভুল)-এর জন্য সালামের পর দু'টি সিজদা– (আবূ দাউদ)। আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ এরপর দু'টি সিজদা করেছেন– (মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ)। এখানে রাসূল ﷺ -এর আমল সংক্রান্ত বর্ণনা দুটিতে পরস্পর বৈপরীত্য রয়েছে। সুতরাং প্রমাণ রূপে তার বাণী গ্রহণ করা অক্ষুণ্ন থেকে যাবে। আর এ কারণেও যে, সিজদায়ে সাহ্বও এক নামাজে বারংবার হয় না। সুতরাং একে সালাম থেকে বিলম্বিত করতে হবে, যাতে সালামের ব্যাপারে ভুল হলে সাজদায়ে সাহ্ব দ্বারা তা পূরণ হতে পারে। (সাজদায়ে সাহ্বও এর) উল্লিখিত সালামকে (নামাজে) পরিচিত সালামের সাদৃশ্য হিসাবে দুই সালাম সহ সিজদা করবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। নবী করীম ﷺ -এর উপর দরূদ এবং দোয়া 'সাজদায়ে সাহ্ব' পরবর্তী বৈঠকে পড়বে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা নামাজের শেষাংশই হলো দোয়ার প্রকৃত স্থান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আদা নামাজ এবং কাজা নামাজের আলোচনা হতে অবসর হওয়ার পর ওয়াক্তিয়া নামাজ এবং কাজা নামাজের মাঝে সংঘটিত ত্রুটিকে লাঘবকারী জিনিসের আলোচনা করবেন অর্থাৎ সাজদায়ে সাহুর আলোচনা। মুসান্নিফ (র.) সুজূদুস্ সাহু (سجود السهو)-এর মধ্যে মুসাব্বাব (مسبب) বা হুকুমকে সবব (سبب) বা কারণের দিকে ইযাফত (اضافت) করেছেন। কেননা নামাজের মধ্যে সাহু (سهو) বা ভুলের কারণে সিজদা ওয়াজিব হয়।

প্রশ্ন ঃ নামাজের মধ্যে সাহুর জন্য দুই সিজদা নির্ধারণ হওয়ার কারণ কি?

উত্তর ঃ হাকীমুল উম্মাহ আশরাফ আলী থানবী (র.) -এর উক্তি লক্ষণীয়। প্রথম সিজদা মনকে এ কথার প্রতি সতর্ক করা যে, আমি এ মাটি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছি, আর দ্বিতীয় সিজদা এ কথার প্রতি সতর্ক করার জন্য যে, আমাকে এই মাটিতে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। মুফতী জামীল আহমদ সাহেব হযরত থানবী (র.) কর্তৃক সংকলিত "احکام اسلام عقل کی نظر میں" -এর টীকায় লেখেছেন যে, শয়তান সিজদা করতে অস্বীকার করেছে, তাকে অবমাননা করার জন্য দুই সিজদা ফরজ হয়েছে। (احکام اسلام عقل کی نظر میں) যদি নামাজের মধ্যে কোনো কম বা বেশি করে তাহলে দু'টি সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে। প্রকাশ থাকে যে, সাজদায়ে সাহ্ব সালামের আগেও জায়েজ আছে, পরেও জায়েজ আছে, তবে রিওয়ায়াতে ইখতেলাফ আছে। ইমামদের মাঝে এই মত নৈক্য আছে যে, সিজদা যে সাহ্ব সালামের আগে উত্তম? না সালামের পরে উত্তম?

হানাফীদের মতে সালামের পরে সিজদায়ে সাহ্ব উত্তম পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে সালামের পূর্বে উত্তম। ইমাম মালিক (র.) বলেছেন, নামাজি ব্যক্তি যদি নামাজে কোনো কিছু কম করে, তাহলে সিজাদায়ে সাহ্ব সালামের পূর্বে করবে। আর যদি কোনো কিছু বেশি করে, তাহলে সালামের পরে সাজদায়ে সাহ্ব করবে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মত হলো, রাসূল ﷺ থেকে যেসব স্থানে সালামের আগে সাজদায়ে সাহ্ব করা সাবিত আছে, সেখানে আগে করবে। আর যেখানে রাসূল ﷺ থেকে সালামের পরে সাজদায়ে সাহব করা সাবিত আছে, সেখানে পরে করবে। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল, রাসূল ﷺ সাজদায়ে সাহব সালামের পূর্বে করেছেন. আবদুল্লাহ ইবনে মালিক (র.) -এর সূত্রে সিহা সিত্তায় (صحاح ست) বর্ণিত হাদীস, বুখারী শরীফের শব্দ নিম্নরূপ–

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ .

অর্থ– রাসূল ﷺ জোহরের নামাজ পড়লেন, প্রথম দুই রাকআতে প্রথম বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে গিয়েছে. তাঁর সাথে লোকেরাও দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যখন নামাজ সমাপ্ত করার উপক্রম হলেন, তখন লোকেরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিলেন। রাসূল ﷺ বসে বসে তাকবীর বললেন এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাজদা দিলেন. এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, সাজদায়ে সাহ্ব সালামের পূর্বে হয়।

হানাফীদের দলিল– রাসূল ﷺ -এর বাণী لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلَامِ অর্থ– প্রতিটি সাহব বা ভুলের জন্য সালামের পরে দুটি সিজদা।– (আবূ দাউদ, ইব্‌নে মাজাহ)

দ্বিতীয় দলিল হলো হাদীসে ফেলী (حديث فعلى) রাসূল ﷺ সালামের পরে দু'টি সিজদা করেছেন। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, দু'টি ফেলী হাদীসের মাঝে পরস্পর বিরোধ। তাই এ দু'টি ছেড়ে দিয়ে কওলী হাদীস (قولى حديث) -এর উপর আমল করা হবে। রাসূলে ﷺ -এর হাদীস আছে যে সাজদায়ে সাহ্ব-এর দু'টি সিজদা সালামের পরে।

হানাফীদের যুক্তি হলো, আলিমগণের সর্বসম্মতিক্রমে সাজদায়ে সাহ্ব-এর مكرر বা দ্বিত্ব হয় না। সালামের পূর্বে সাজদায়ে সাহ্ব করার সুরতে تكرار বা বারংবার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তার সুরত এই যে, সালামের পূর্বে সাজদায়ে সাহ্ব করল তারপর যখন সালাম ফিরানোর সময় আসল তখন তার সংশয় হলো যে, নামাজ তিন রাকআত হলো নাকি চার রাকআত হলো? এ চিন্তায় রত থাকার কারণে সালাম ফিরাতে বিলম্ব হলো। অতঃপর স্মরণ আসল যে, (নামাজ) চার রাকআত হয়েছে। এমতাবস্থায় সালাম বিলম্ব করার কারণে পুনরায় সাজদায়ে সাহ্ব করতে হবে। এখন পুনরায় সাজদায়ে সাহ্ব করবে কিনা? দুই সুরত– এক, যদি দ্বিতীয় বার সাজদায়ে সাহ্ব না করে, তাহলে নামাজে ত্রুটি থেকে যায়, যা লাঘব করা হচ্ছে না বা দূর করা হচ্ছে না। আর যদি দ্বিতীয় বার সিজদা করে তাহলে সাজদায়ে সাহ্ব مكرر বা দ্বিত্ব হচ্ছে যা আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত নয়। এজন্য এটাই যুক্তিসঙ্গত সালামের পর সাজদায়ে সাহ্ব করবে, যাতে সমূহ ভুলের লাঘব হয়। সাজদায়ে সাহ্ব-এর পূর্বে দুই দিকে সালাম ফিরাবে না এক দিকে সালাম ফিরাবে? এক্ষেত্রে হিদায়া গ্রন্থকারের নিকট বিশুদ্ধ মত হলো যে, দুই দিকে সালাম ফিরাবে। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.), সদরুল ইসলাম (র.) এবং ফকীহ আবূল লাইস (র.)-এর মত অনুরূপ। তবে শাইখুল ইসলাম খাহারযাদা (র.), আল্লামা ফখরুল ইসলাম (র.) এবং ঈযাহ গ্রন্থের প্রণেতা প্রমুখ ফকীদের নিকট প্রাধান্য হলো শুধু ডানে সালাম ফিরাবে।

হিদায়া গ্রন্থকারের মতের দলিল ঃ হাদীসে যেখানে সালাম শব্দ উল্লেখ হয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুপরিচিত সালাম, আর সুপরিচিত সালাম উভয় দিকে ফিরানো অতএব দুই দিকে সালাম ফিরানো জরুরি।

শাইখুল ইসলাম খাহারযাদা এবং অন্যান্য ফকীহদের মতের দলিল ঃ সালামের দু'টি হুকুম একটি হলো কওমের জন্য অভিনন্দন আর দ্বিতীয়টি নামাজ হতে تحليل বা হালাল হওয়ার জন্য। বলা বাহুল্য যে, تحليل বা হালাল হওয়ার মধ্যে তাকরার (تكرار) বা দ্বিত্ব নেই। অতএব সালামের তাক্‌রারের কোনো প্রয়োজন নেই। ডান দিকে সালাম ফিরানোই যথেষ্ট। দরুদ এবং দু'আয়ে মাসূরা হয়তো নামাজের বৈঠকে পড়বে অথবা সাজ্‌দায়ে সাহ্ব-এর বৈঠকে পড়বে। নামাজের বৈঠক দ্বারা সাজদায়ে সাহ্ব-এর পূর্বের বৈঠক আর সাজদায়ে সাহ্ব-এর বৈঠক দ্বারা সাজদায়ে সাহ্ব-এর পরের বৈঠক উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে ইমাম তাহাবী (র.) বলেছেন যে, উভয় বৈঠকে দরুদ এবং দু'আ মাসূরা পড়বে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, সাজদায়ে সাহ্ব-এর পরের বৈঠকে পড়বে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, এটাই বিশুদ্ধ মত।

ইমাম তাহাবী (র.) স্বীয় মতের সমর্থনে একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, যে বৈঠকের শেষে সালাম আছে সেখানে দরুদ পড়া হবে। এই মূলনীতির আলোকে উভয় বৈঠকে (সাজদায়ে সাহ্ব-এর পূর্বে ও পরে) দরুদ পড়া হবে। কেননা উভয় বৈঠকের শেষে সালাম আছে।

শায়খাইনের দলিল, দরুদ এবং দু'আ মাসূরা শেষ বৈঠকে পড়া হয়। যে ব্যক্তির উপর সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হয়। তার সাজদায়ে সাহ্ব-এর জন্য প্রদত্ত সালাম তাকে নামাজ থেকে বের করে দেয়। তাহলে নামাজের বৈঠকই শেষ বৈঠক হিসাবে গণ্য হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যেহেতু এ সালাম তাকে নামাজ থেকে বের করে দেয় না বরং সাজদায়ে সাহ্ব পরবর্তী সালাম তাকে নামাজ থেকে বের করে দেয়। এই সাজদায়ে সাহ্ব এর বৈঠকই শেষ বৈঠক হিসাবে গণ্য হবে। নামাজের বৈঠক শেষ বৈঠক হিসাবে গণ্য হবে না। আর দরুদ এবং দোয়ার স্থান হলো নামাজের শেষে, এ জন্য সাজদায়ে সাহ্ব এর বৈঠকে দরুদ এবং দোয়া পড়বে নামাজের বৈঠকে পড়বে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের উপর ফতোয়া।

قَالَ وَيَلْزَمُهُ السَّهْوُ إِذَا زَادَ فِيْ صَلَاتِهٖ فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا لَيْسَ مِنْهَا وَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى أَنَّ سَجْدَةَ السَّهْوِ وَاجِبَةٌ هُوَ الصَّحِيْحُ لِأَنَّهَا تَجِبُ لِجَبْرِ نُقْصَانٍ تَمَكَّنَ فِى الْعِبَادَةِ فَتَكُوْنُ وَاجِبَةً كَالدِّمَاءِ فِى الْحَجِّ وَإِذَا كَانَ وَاجِبًا لَا يَجِبُ إِلَّا بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْتَاخِيْرِهٖ أَوْتَاخِيْرِ رُكْنٍ سَاهِيًا هٰذَا هُوَالْاَصْلُ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ بِالزِّيَادَةِ لِأَنَّهَا لَاتَعْرِىْ عَنْ تَاخِيْرِ رُكْنٍ أَوْتَرْكِ وَاجِبٍ قَالَ وَيَلْزَمُهُ إِذَا تَرَكَ فِعْلًا مَسْنُوْنًا كَأَنَّهُ أَرَادَ بِهٖ فِعْلًا وَاجِبًا إِلَّا أَنَّهُ أَرَادَ بِتَسْمِيَتِهٖ سُنَّةً أَنَّ وُجُوْبَهَا بِالسُّنَّةِ ـ قَالَ أَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ أَوِ الْقُنُوْتَ أَوِ التَّشَهُّدَ أَوْتَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ لِأَنَّهَا وَاجِبَاتٌ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَرْكِهَا مَرَّةً وَهِىَ إِمَارَةُ الْوُجُوْبِ وَلِأَنَّهَا تُضَافُ إِلٰى جَمِيْعِ الصَّلٰوةِ فَدَلَّ أَنَّهَا مِنْ خَصَائِصِهَا وَ ذٰلِكَ بِالْوُجُوْبِ ثُمَّ ذِكْرُ التَّشَهُّدِ يَحْتَمِلُ الْقَعْدَةَ الْأُوْلٰى وَالثَّانِيَةَ وَالْقِرَاءَةَ فِيْهِمَا وَكُلُّ ذٰلِكَ وَاجِبٌ وَفِيْهَا سَجْدَةُ السَّهْوِ هُوَ الصَّحِيْحُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নামাজের মধ্যে যদি এমন কোনো কাজ বৃদ্ধি করে যা নামাজ জাতীয় কিন্তু নামাজ ভুক্ত নয়, তবে সে ক্ষেত্রে সাজদায়ে সাহ্ব আবশ্যক হবে। আবশ্যক শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হয় ইবাদতে সৃষ্ট ক্রটির ক্ষতি পূরণ করার জন্য। সুতরাং সেটা ওয়াজিবই হবে। যেমন হজের ক্ষেত্রে দম দেওয়া ওয়াজিব। যখন এটা ওয়াজিব সাব্যস্ত হলো তখন ভুলে কোনো ওয়াজিব তরক করা কিংবা বিলম্বিত করা কিংবা কোনো রোকন বিলম্বিত করার কারণেই শুধু সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে। সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে এটাই মূল নীতি। অতিরিক্ত কোনো কাজ যুক্ত হওয়ার দ্বারা সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, তা কোনো রোকন বিলম্বিত হওয়া বা কোনো ওয়াজিব তরক হওয়া থেকে মুক্ত নয়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন যে, যদি কোনো মাসনূন আমল তরক করে তাহলে সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে। সম্ভবতঃ এখানে মাসনূন দ্বারা ওয়াজিব আমল বুঝানো হয়েছে তবে মাসনূন বলার কারণ, এই আমল ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি সুন্নাহ বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম কুদূরী বলেন, যদি কেউ ফাতিহা পড়া তরক করে। কেননা তা ওয়াজিব। অথবা দোয়ায়ে কুনূত, তাশাহহুদ বা দুই ঈদের তাকবীরসমূহ তরক করে। কেননা এগুলোও ওয়াজিব। কেননা রাসূল ﷺ একবারও তরক না করে এগুলো অব্যাহতভাবে পালন করেছেন। আর এটা ওয়াজিব হওয়ার আলামত। সর্বোপরি এ সমস্ত আমলকে পুরা নামাজের সাথে সম্বন্ধ করা হয়। আর এ সম্বন্ধ প্রমাণ করে যে, এগুলো নামাজের সাথে বৈশিষ্ট্য। আর বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত হয় ওয়াজিব হওয়ার মাধ্যমে। তাশাহহুদ শব্দের দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠক উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা এই সবই ওয়াজিব। আর তাতে সাজদায়ে সাহ্ব আবশ্যক। এটাই বিশুদ্ধ মত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অনুচ্ছেদের শুরুতে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, নামাজে কম বা বেশি করার কারণে সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয়। কিন্তু একথা বর্ণনা করা হয়নি যে, কোন ধরনের কম বা বেশি করাটা সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব করে। এখন এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আরম্ভ করা হচ্ছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন যে, নামাজের মধ্যে যদি এমন কোনো কাজ অতিরিক্ত করে ফেলে, যা নামাজ জাতীয় কিন্তু নামাজভুক্ত নয়। তবে সে ক্ষেত্রে সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে। যেমন এক রাকআতে দুইটি রুকু করল অথবা তিনটি সিজদা করল, একটি রুকু এবং একটি সিজদা অতিরিক্ত করল। এ দুটো যদিও নামাজ জাতীয় কিন্তু নামাজের অংশ নয়। অর্থাৎ অতএব যদি এক রুকুর স্থানে দুই রুকু করল অথবা দুই সিজদার স্থানে তিন সাজদা করল, তাহলে এই অতিরিক্তের কারণে তার উপর সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, মাতিন (ماتن)-এর কওল وَيَلْزَمُهُ السَّهْوُ إِذَا زَادَ-এর দ্বারা সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হওয়া বুঝায়। ওয়াজিব হওয়ার মতই বিশুদ্ধ। ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) -এর মতও অনুরূপই। পক্ষান্তরে হানফীদের কোনো আলিম যেমন আবুল হাসান কারখী (র.)-এর মতে সাজদায়ে সাহব সুন্নত। বিশুদ্ধ মতের দলিল হলো যে, সাজদায়ে সাহ্ব নামাজে সৃষ্ট ত্রুটি ক্ষতি পূরণ করার জন্য ওয়াজিব হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি সাজদায়ে সাহ্ব-এর দ্বারা ত্রুটি পূরণ না হয়, তাহলে নামাজ পুনরায় আদায় করা জরুরি হবে, যাতে ত্রুটির ক্ষতিপূরণ হয়। যেহেতু ত্রুটি ক্ষতিপূরণ করার জন্য নামাজ পুনরায় পড়া ওয়াজিব অতএব সাজদায়ে সাহ্ব ও ওয়াজিব হবে। কেননা উহা দ্বারাও ত্রুটি পূরণ হয়। সাজদায়ে সাহ্ব-এর উদাহরণ হলো যেমন হজে ত্রুটি করলে দম ওয়াজিব হয় অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় কোনো জেনায়েত করলে হজে ত্রুটি আসে। আর ঐ ত্রুটির ক্ষতি পূরণ দম বা কুরবানি দ্বারা হবে। তাই যেভাবে হজে ত্রুটির কারণে দম বা কুরবানী ওয়াজিব হয়, তদ্রূপ নামাজেও সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হয়। বিজ্ঞ গ্রন্থকার বলেছেন সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব। আর তা কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে অথবা কোনো ওয়াজিব অথবা কোনো রুকন আদায় করতে বিলম্ব হওয়ার কারণে ওয়াজিব হয়। ওয়াজিব তরক করার উদাহরণ, যেমন– প্রথম বৈঠক তরক করা অথবা দুই ঈদের নামাজের অতিরিক্ত তাকবীরসমূহ (تكبيرات زوائد) তরক করা (তবে যদি দুই ঈদের নামাজে প্রচণ্ড ভিড় হয় তবে সাজদায়ে সাহ্ করা হবে না।) ওয়াজিব বিলম্ব করার উদাহরণ, যেমন– পঞ্চম রাকআত নামাজের জন্য ভুলে দাঁড়িয়ে গেল এবং এ দ্বারা সালাম ফিরাতে বিলম্ব হলো। আর সালাম ফিরানো নামাজে ওয়াজিব। কোনো রুকন বিলম্ব করার উদাহরণ যেমন প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরুদ পড়া আরম্ভ করল। তৃতীয় রাকআতে দাঁড়ানো ফরজ, এতে বিলম্ব হলো। মোটকথা সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হওয়ার মূলনীতি হচ্ছে নিম্নোক্ত তিনটি বস্তু– ওয়াজিব তরক করা, অথবা ওয়াজিব বিলম্ব করা, অথবা রুকন বিলম্ব করা।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ بِالزِّيَادَةِ الخ : এর দ্বারা গ্রন্থকার একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। গ্রন্থকার বলেছেন যে, ওয়াজিব তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হয় অথবা ওয়াজিব বিলম্ব করার দ্বারা ওয়াজিব হয় অথবা রুকন বিলম্ব করার দ্বারা ওয়াজিব হয়। কিন্তু অতিরিক্ত করার দ্বারা ওয়াজিব তরকও হয় না এবং বিলম্বও হয় না। অতএব অতিরিক্ত করার সূরতে সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব না হওয়া উচিত। অথচ অনুচ্ছেদের প্রথমে বলা হয়েছে যে অতিরিক্ত করার দ্বারা ও সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হয়।

জবাব ঃ অতিরিক্ত করার দ্বারাও রোকন তরক হয় অথবা ওয়াজিব তরক হয়। যেমন তিন সিজদা করার দ্বারা কিয়াম (قيام) যা ফরজ তা আদায় বিলম্ব হয়ে যায়। আর যদি ভুলে পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং একে সিজদার সাথে সম্পৃক্ত করে, তাহলে হুকুম হলো এর সাথে ষষ্ঠ রাকআত মিলানো যাতে চার রাকআত ফরজ আর দু' রাকআত নফল হয়। আপনি লক্ষ্য করুন এ দুই রাকআত অতিরিক্ত করার কারণে চার রাকআতের মাথায় সালাম ফিরানো ওয়াজিব ছিল, তা তরক হয়ে গেছে। এর দ্বারা সাবিত হয় যে অতিরিক্ত করাটাও রুকন বিলম্ব অথবা ওয়াজিব তরক হওয়াকে আবশ্যক করে।

قَوْلُهُ قَالَ وَيَلْزَمُهُ إِذَا تَرَكَ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন যে, যদি মুসল্লী কোনো মাস্নূন আমল তরক করে তাহলে তার উপর সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, মতনে (متن) মাসনূন আমল দ্বারা ওয়াজিব আমল উদ্দেশ্য। কেননা মাস্নূন আমল তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয় না; বরং ওয়াজিব তরক করার দ্বারা (সাজদায়ে সাহ্ব) ওয়াজিব হয়।

প্রশ্নঃ তাহলে মতনে ফেলে মামনূন কেন বলা হল?

উত্তর ঃ একথা বুঝানোর জন্য যে সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হওয়াটা সুন্নাহ বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ أَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ الخ : উক্ত ইবারতে ঐসব জিনিসের বিশ্লেষণ করা হয়েছে যেগুলো তরক করার কারণে সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হয়। যেমন তিনি বলেছেন, নামাজে সূরা ফাতিহা পড়া ছেড়ে দেওয়াটা সাজদায়ে সাহ্বকে ওয়াজিব করে। কেননা নামাজে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। তবে এ কথা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হয়। পক্ষান্তরে শেষ দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হয় না। কেননা শেষ দুই রাকআতে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয় বরং মোস্তাহাব। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর একটি বর্ণনা আছে যে, শেষ দুই রাকআতেও সূরা ফাতেহা তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হয়।

বিতরের নামাজে দোয়ায়ে কুনূত ছেড়ে দেওয়া। তাশাহহুদ ছেড়ে দেওয়া এবং দুই ঈদের তাকবীর ছেড়ে দেওয়া সাজদায়ে সাহ্বকে ওয়াজিব করে। দলিল হলো যে, উক্ত তিনটি বস্তু ওয়াজিব। আর ওয়াজিব তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হয়। অতএব এগুলো তরক করার দ্বারাও সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে। উক্ত জিনিসগুলো ওয়াজিব হওয়ার দলিল হল, রাসূল ﷺ এগুলো অব্যাহতভাবে পালন করেছেন, কখনো ছেড়ে দেননি। আর রাসূল ﷺ -এর কোনো আমল তরক না করে অব্যাহতভাবে পালন করাটা ওয়াজিব হওয়ার আলামত।

দ্বিতীয় দলিল হলো, এসব আমলকে পুরা নামাজের সাথে সম্বন্ধ করা হয় যেমন বলা হয়ে থাকে কুনূতুল বিত্র (قنوت الوتر) তাক্বীরাতু সালাতিল ঈদাইন (تَكْبِيرَاتُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ) তাশাহ্হুদে সালাত (تشهد صلاة)। আর এই সম্বন্ধ প্রমাণ করে যে, এগুলো নামাজের সাথে বৈশিষ্ট্য। আর বৈশিষ্ট্য সাবিত হওয়া ওয়াজিব হওয়ার মাধ্যমে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, আবূল হাসান কুদূরী (র.) এখানে তাশাহ্হুদ শব্দ উল্লেখ করেছেন। তাশাহ্হুদ শব্দটি প্রথম বৈঠক, শেষ বৈঠক এবং তাশাহহুদ পাঠ করা এই সবগুলোর ক্ষেত্রে বলা হয়। আর এই সবগুলোর প্রতিটি ওয়াজিব আমল। এগুলো তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে এটাই সহীহ মত।

প্রশ্ন ঃ হিদায়ার এই ইবারতে প্রশ্ন হয় যে, হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন كُلُّ ذَالِكَ وَاجِبٌ " ঐ সবগুলো ওয়াজিব" এর দ্বারা বুঝা যায় যে, শেষ বৈঠকও ওয়াজিব অথচ শেষ বৈঠক ওয়াজিব নয় বরং শেষ বৈঠক ফরজ, যা তরক করার দ্বারা নামাজই ফাসিদ হয়ে যায়।

জবাব ঃ ইবারতে তাখ্সীস (تخصيص) বা ব্যতিক্রম আছে অর্থাৎ শেষ বৈঠক ব্যতীত প্রতিটিই ওয়াজিব। দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে যে, শেষ বৈঠক তরক করার দ্বারা উদ্দেশ্য তা বিলম্বে আদায় করা যেমন কেউ শেষ বেঠক না করে পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে গেল। তারপর পঞ্চম রাকআতের সিজদা না করে বৈঠকের দিকে ফিরে আসল তাহলে সাজদায়ে সাহ্ব করে নামাজ পূর্ণ করবে। কেননা বিলম্ব করাটাও এক ধরনের তরক করা। এ জন্য বিলম্বকে তরক-এর দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

وَلَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِيْمَا يُخَافَتُ أَوْ خَافَتَ فِيْمَا يُجْهَرُ تَلْزَمُهُ سَجْدَتَا السَّهْوِ لِأَنَّ الْجَهْرَ فِيْ مَوْضِعِهِ وَالْمُخَافَتَةَ فِيْ مَوْضِعِهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَاخْتَلَفَ الرِّوَايَةُ فِي الْمِقْدَارِ وَالْأَصَحُّ قَدْرُ مَا تَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ فِي الْفَصْلَيْنِ لِأَنَّ الْيَسِيْرَ مِنَ الْجَهْرِ وَالْإِخْفَاءِ لَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ وَعَنِ الْكَثِيْرِ مُمْكِنٌ وَمَا تَصِحُّ بِهِ الصَّلٰوةُ كَثِيْرٌ غَيْرَ أَنَّ ذٰلِكَ عِنْدَهُ اٰيَةٌ وَاحِدَةٌ وَعِنْدَهُمَا ثَلٰثُ اٰيَاتٍ وَهٰذَا فِيْ حَقِّ الْإِمَامِ دُوْنَ الْمُنْفَرِدِ لِأَنَّ الْجَهْرَ وَالْمُخَافَتَةَ مِنْ خَصَائِصِ الْجَمَاعَةِ ـ

অনুবাদ : আর চুপে চুপে কিরাআতের ক্ষেত্রে ইমাম যদি উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়েন অথবা উচ্চৈঃস্বরে কিরাআতের ক্ষেত্রে যদি চুপে চুপে পড়েন, তাহলে এ অবস্থায় সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে উচ্চৈঃস্বরে কিরাতের স্থানে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়া এবং চুপে চুপে কিরাআতের স্থানে চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

পরিমাণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। বিশুদ্ধতম মত হলো— যে পরিমাণ কিরাআত দ্বারা নামাজ জায়েজ হয় উভয় ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ বিবেচ্য। কেননা সামান্য পরিমাণ উচ্চৈঃস্বরে বা চুপে চুপে পাঠ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আর যে পরিমাণে নামাজ শুদ্ধ হয় সেটাই হলো অধিক। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সেটা হলো এক আয়াত, আর সাহেবাইনের মতে তিন আয়াত। এটা হল ইমামের ক্ষেত্রে একা নামাজ আদায়কারীর ক্ষেত্রে নয়। কেননা উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ ও চুপে চুপে কিরাআত পাঠ জামাআতের নামাজের বৈশিষ্ট্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের মতে কেউ যদি চুপে চুপে কিরাআতের ক্ষেত্রে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়ে অথবা উচ্চৈঃস্বরে কিরাআতের ক্ষেত্রে চুপে চুপে পড়ে তাহলে সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.) বলেছেন যে, উক্ত সুরতদ্বয়ে সিজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে। ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেছেন যে, যদি চুপে চুপে কিরাআতের ক্ষেত্রে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়ে তাহলে সালামের পর সাজদায়ে সাহ্ব করবে, আর যদি উচ্চৈঃস্বরে কিরাআতের ক্ষেত্রে চুপে চুপে কিরাআত পড়ে তাহলে সালামের পূর্বে সাজদায়ে সাহ্ব করবে। ইমাম আহমদ (র.) থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, যদি উক্ত সুরতগুলোতে সিজদায়ে সাহ্ব করে তাহলে ভাল। আর যদি সাজদায়ে সাহ্ব না করে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

ইমাম শাফেঈ (র.) -এর দলিল আবূ কাতাদা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ وَالْاٰيَتَيْنِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ অর্থ– রাসূল ﷺ আমাদেরকে জোহর এবং আসরের নামাজে একটি, দুটি আয়াত শুনাতেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, যুহর এবং আসরে চুপেচুপে কিরাআত পড়া ওয়াজিব নয়। যেহেতু উক্ত নামাজদ্বয়ে কিরাআত চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব নয়। তাহলে রাতের নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়া কিভাবে ওয়াজিব হবে? উচ্চৈঃস্বরে কিরাআতের স্থানে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়া এবং চুপে চুপে কিরাআতের স্থানে চুপে চুপে কিরাআত পড়া ওয়াজিব নয়। তাই তা ছেড়ে দেওয়ার দ্বারাও সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে না।—(আল-কিফায়া)

উত্তর ঃ আমাদের পক্ষ হতে জবাব হলো যে, রাসূল ﷺ জোহর এবং আসরে এ জন্য উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়েছেন যে, লোকেরা যেন অবগত হয় যে, জোহর এবং আসরের নামাজেও কিরাআত পড়া শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত। রাসূল ﷺ এর এই উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হয়নি।

আমাদের দলিল হলো— যেসব নামাজে কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পড়া হয় সেগুলোতে কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পড়া ইমামের উপর ওয়াজিব। যাতে ইমামের কিরাআত মুক্তাদীও শ্রবণ করে। আর ইমামের কিরাআতই মুক্তাদীর কিরাতের স্থলাভিষিক্ত বা স্থলবর্তী হয়। আর দিনের নামাজে ইমামের উপর চুপে চুপে কিরাআত পড়া এ জন্য ওয়াজিব যে, চুপে চুপে কিরাআত পড়া মূলত অনুমোদিত হয়েছে, যাতে কাফিরদের বিভ্রান্তি হতে পবিত্র কুরআনকে সংরক্ষণ করা যায়। যেমন আমরা জানি যে, রাসূল

ﷺ চুপে চুপে কিরাআত পড়ার নির্দেশ ঐ সময় প্রদান করেছেন যখন কাফির বা রাসূল ﷺ -কে তিলাওতের সময় বিভ্রান্তিতে ফেলতে চেষ্টা করেছিল। এ কারণে দিনের নামাজে চুপে চুপে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে রাত্রের নামাজে (চুপে চুপে কিরাআত পড়া) ওয়াজিব নয়। কেননা রাত্রে তারা শায়িত অবস্থায় পড়ে থাকে। মোটকথা হলো দিনের নামাজে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের প্রেক্ষিতে চুপে চুপে কিরাআত অনুমোদিত হয়েছে। এরূপ নামাজে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ করা ওয়াজিব। যেহেতু চুপে চুপে কিরাআতের স্থানে চুপে চুপে পড়া আর উচ্চৈঃস্বরে কিরাআতের স্থানে উচ্চৈঃস্বরে পড়া ওয়াজিব। তাই তা তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হবে। কেননা ওয়াজিব তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হয়।

প্রশ্ন ঃ উচ্চৈঃস্বরে কিরাআতের স্থানে কি পরিমাণ চুপে চুপে পড়লে, আর চুপে চুপে কিরাআতের স্থানে কি পরিমাণ উচ্চৈঃস্বরে পড়লে সাজদায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হয়।

উত্তর ঃ এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা আছে, যাহিরুর রিওয়ায়াতে আছে যে, উভয় সুরতে কম (قليل) বা বেশির (كثير) একই হুকুম অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে কিরাআতের স্থানে চুপে চুপে পড়ল অথবা চুপে চুপে কিরাআতের স্থানে উচ্চৈঃস্বরে পড়ল চাই পারমাণ কম হোক বা বেশি হোক, উভয় সুরতে সাজদায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, বিশুদ্ধ মত হলো এই যে, যে পরিমাণ কিরাআত পড়া দ্বারা নামাজ বিশুদ্ধ হয় ঐ পরিমাণ চুপে চুপে পড়া, অথবা উচ্চৈঃস্বরে পড়ার কারণে উভয় সুরতে সাজদায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ যদি দিনের নামাজে مَا يَجُوزُ بِهِ الصَّلٰوةُ যে পরিমাণের দ্বারা নামাজ জায়েজ হয় ঐ পরিমাণ উচ্চৈঃস্বরে পড়ল অথবা রাত্রের নামাজে ঐ পরিমাণ চুপে চুপে পড়ল তাহলে (উভয় সুরতে) সাজদায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হবে। কেননা উচ্চৈঃস্বরে এবং চুপিসারে অল্প পরিমাণ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু অধিক পরিমাণ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। এ জন্য সাজদায়ে সাহ্‌ব এর হুকুম অধিক পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত। অল্প পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত নয়। যে পরিমাণের দ্বারা নামাজ জায়েজ হয় তা কাসীর (كثير) বা অধিক আর যে পরিমাণের দ্বারা নামাজ জায়েজ হয় না তা কালীল (قليل) বা কম।

প্রশ্ন ঃ مَا يَجُوزُ بِهِ الصَّلٰوةُ (যে পরিমাণের দ্বারা নামাজ জায়েজ হয়) এর পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে– ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এক আয়াত। আর সাহেবাইনের মতে তিন আয়াত। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, চুপে চুপে কিরাআতের স্থানে উচ্চৈঃস্বরে পড়ার কারণে, আর উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়ার স্থানে চুপে চুপে কিরাআত পড়ার কারণে ইমামের উপর সাজদায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হয়। একাকী নামাজ আদায়কারীর উপর ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ যদি ইমাম এরূপ করে তাহলে তার উপর সাজদায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি এরূপ করে তাহলে তার উপর সাজদায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হবে না। দলিল এই যে, উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ এবং চুপে চুপে কিরাআত পাঠ জামাআতের নামাজের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে যদি কেউ একাকী নামাজ পড়তে চায় তবে তার ইখতিয়ার আছে, উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়তে পারে অথবা চুপে চুপেও কিরাআত পড়তে পারে। একা নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির উপর উচ্চঃস্বর কিরাআত পড়া এবং চুপে চুপে কিরাআত পাঠ করা ওয়াজিব নয়। তাই তা তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হবে না।

পক্ষান্তরে ইমামের উপর তা ওয়াজিব এজন্য তা তরক করলে সাজদায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হবে।

প্রশ্ন ঃ জাহরী নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআতের ওজূব (وجوب) টি জামাতের নামাজের বৈশিষ্ট্য। এটা স্বীকৃত, কেননা জাহেরী (جهري) নামাজে একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির এখ্‌তিয়ার আছে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়তে পারে অথবা চুপে চুপে কিরাআত পড়তে পারে। পক্ষান্তরে সিররী (سري) নামাজে চুপে চুপে কিরাআত পড়ার ওজূব (وجوب) টি জামাআতের নামাজের বৈশিষ্ট্য হওয়াটা স্বীকৃত নয়। কেননা সিররী নামাজে একাকী ব্যক্তির জন্য চুপে চুপে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। অতএব সিররী নামাজে চুপে চুপে কিরাআত পড়া তরক করার কারণে একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির উপরও সাজদায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হওয়া চাই। অথচ হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন যে, একাকী নামাজ আদায়কারীর উপর সাজদায় সাহ্‌ব ওয়াজিব হবে না।

উত্তর : ইহা নাওয়াদির (نوادر) গ্রন্থের বর্ণনা অর্থাৎ সিররী নামাজে মুনফারিদ (منفرد)-এর উপর চুপে চুপে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। এটা নাওয়াদির গ্রন্থের বর্ণনা। পক্ষান্তরে যাহিরুর রিওয়ায়াত মুতাবিক মুনফারিদের উপর চুপে চুপে কিরাআত পড়া ওয়াজিব নয়। কেননা দিনে কিরাআত চুপে চুপে পড়া এ জন্য ওয়াজিব ছিল, যাতে কাফিরদের পক্ষ থেকে সৃষ্ট ভ্রান্তি দূর হয়ে যায়। বলা বাহুল্য যে, কাফিরদের পক্ষ হতে ভ্রান্তি ঐ সময় সৃষ্টি হবে যখন নামাজের ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে আদায় করা হবে। পক্ষান্তরে মুনফারিদ-এর নামাজ ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে আদায় হয় না, এজন্য তার জন্য চুপে চুপে কিরাত পড়া ওয়াজিব হবে না। বরং তার এখ্‌তিয়ার আছে সিররী নামাজে চুপে চুপে কিরাআত পড়তে পারে অথবা উচ্চৈঃস্বরেও কিরাআত পড়তে পারে। এখ্‌তিয়ারের কারণে চুপে চুপে কিরাআত পড়া দ্বারা তার (মুনফারিদ) উপর সাজদায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হবে না।–(ইনায়া)

قَالَ وَسَهْوُ الْإِمَامِ يُوْجِبُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ السُّجُوْدَ لِتَقَرُّرِ السَّبَبِ الْمُوْجِبِ فِىْ حَقِّ الْاَصْلِ وَلِهٰذَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْإِقَامَةِ بِنِيَّةِ الْإِمَامِ فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ لَمْ يَسْجُدِ الْمُؤْتَمُّ لِاَنَّهُ يَصِيْرُ مُخَالِفًا وَمَا الْتَزَمَ الْاَدَاءَ إِلَّا مُتَابِعًا فَإِنْ سَهَى الْمُؤْتَمُّ لَمْ يَلْزَمِ الْإِمَامَ وَلَا الْمُؤْتَمَّ السُّجُوْدُ لِاَنَّهُ لَوْسَجَدَ وَحْدَهُ كَانَ مُخَالِفًا لِإِمَامِهِ وَلَوْتَابَعَهُ الْإِمَامُ يَنْقَلِبُ الْاَصْلُ تَبَعًا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী বলেন, ইমামের ভুল মুক্তাদীর উপর সাজদা (সাহ্ব) ওয়াজিব। কেননা যায় উপর নামাজ নির্ভরশীল (ইমাম) তার উপর সিজদা (সাহ্ব) ওয়াজিব হওয়ার কারণ সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এজন্যই মুক্তাদীর উপর মুকীম হওয়ার হুকুম সাব্যস্ত হয়ে যায় ইমামের নিয়তের কারণে। আর যদি ইমাম সিজদা না করে তাহলে মুক্তাদীও সিজদা করবে না। কেননা সে এমতাবস্থায় ইমামের বিরুদ্ধাচারণকারী হয়ে যাবে। অথচ সে ইমামের অনুসারী হিসাবে নামাজ আদায় করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আর যদি মুক্তাদী ভুল করে তবে ইমাম এবং সেই মুক্তাদীর উপর সিজদায়ে (সাহ্ব) ওয়াজিব হবে না। কেননা যদি সে একা সিজদা করে, তবে ইমামের বিরুদ্ধাচারণকারী হবে। পক্ষান্তরে যদি ইমাম মুক্তাদীর অনুসরণ করে, তাহলে যে অনুসরণীয়, সে অনুসরণকারীতে পরিণত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা ঃ ইমামের কোনো ভুল হলে, ইমাম এবং মুক্তাদী উভয়ের উপর সিজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে। কেননা ইমামের উপর সিজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব করার কাজটি মুক্তাদীর ক্ষেত্রেও সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা মুক্তাদী নামাজ সহীহ হওয়া, ফাসিদ হওয়া এবং মুকীম হওয়ার ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। অতএব ইমামের ভুলের কারণে ইমামের নামাজে যে ক্রটি এসেছে, ঐ ক্রটি মুক্তাদীর নামাজেও এসেছে। ইমামের নামাজের ক্রটি পূরণ করার জন্য যেরূপ সিজদায় সাহ্ব করতে হয় তদ্রূপ মুক্তাদীর ক্ষেত্রেও নামাজের ক্রটি পূরণ করার জন্য সিজদায়ে সাহ্ব করা জরুরি।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন যে, মুক্তাদীর নামাজ ইমামের নামাজের তাবে (تابع) বা অনুবর্তী, এই জন্য যদি ইমাম এবং মুক্তাদী উভয় মুসাফির হয় এবং নামাজের মাঝে ইমাম ইকামতের নিয়ত করে, তাহলে সকল মুক্তাদীর রুবায়ী (رباعى) নামাজ চার রাকআত পড়তে হবে। যদিও মুক্তাদীরা নিয়ত না করে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন যে, সিজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও যদি ইমাম সিজদায়ে সাহ্ব আদায় না করে, তাহলে মুক্তাদীর উপরও সিজদায়ে সাহ্ব করা ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.), ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে মুক্তাদীর উপর সিজদায়ে সাহ্ব করা ওয়াজিব হবে; যদিও ইমাম সিজদায়ে সাহ্ব না করে। আমাদের দলিল হলো, ইমাম সিজদায়ে সাহ্ব না করার অবস্থায় যদি মুক্তাদী সিজদায়ে সাহ্ব করে, তাহলে ইমামের বিরুদ্ধাচরণকারী হয়ে যায়। অথচ সে ইমামের অনুসারী হিসাবে নামাজ আদায় করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সারকথা হলো, মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তারপর ইমামের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। অনুসরণ এবং বিরুদ্ধাচারণের মাঝে বৈপরীত্য। অতএব মুক্তাদীর সিজদায়ে সাহ্ব-এর কারণে বিরুদ্ধাচারণ সাব্যস্ত হয়েছে, কাজেই এ অবস্থায় মুতাবায়াত (متابعت) থাকতে পারবে না।

فَإِنْ سَهَى الْمُؤْتَمُّ থেকে মুসান্নিফ (র.) বলতে চাচ্ছেন যে, যদি মুক্তাদীর নামাজে কোন ভুল হয়ে যায় যেমন প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া ভুলে গেল তাহলে এর কারণে ইমাম এবং মুক্তাদীর উপর সিজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে না। কেননা নামাজ বিশুদ্ধ এবং ফাসিদ হওয়ার ক্ষেত্রে ইমামের নামাজ মুক্তাদীর নামাজের উপর নির্ভরশীল নয়। ইমামের নামাজে ক্রটি না হওয়ার কারণে তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় নি, অতএব মুক্তাদীর উপরও সিজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে না। কেননা যদি মুক্তাদীর উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় তাহলে সে একা সিজদা সাহ্ব করবে অথবা তার ইমামও তার সাথে সিজদায়ে সাহ্ব করবে। প্রথম সূরতে ইমামের বিরুদ্ধাচারণ হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় সূরতে উল্টা হয়ে যায় অর্থাৎ ইমাম বা অনুসরণীয় ব্যক্তি, অনুসরণকারীতে পরিণত হয় আর মুকতাদী বা অনুসারী, সে অনুসরণীয় হয়ে যায়। এ দুটিই নাজায়েজ। তাই মুক্তাদীর উপর সিজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে না।

وَمَنْ سَهَى عَنِ الْقَعْدَةِ الْاُولٰى ثُمَّ تَذَكَّرَ وَهُوَ اِلٰى حَالَةِ الْقُعُوْدِ اَقْرَبُ عَادَ وَقَعَدَ وَتَشَهَّدَ لِاَنَّ مَايَقْرُبُ مِنَ الشَّيْءِ يَأْخُذُ حُكْمَهُ ثُمَّ قِيْلَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِلتَّاخِيْرِ وَالْاَصَحُّ اَنَّهُ لَايَسْجُدُ كَمَا اِذَا لَمْ يَقُمْ وَلَوْكَانَ اِلَى الْقِيَامِ اَقْرَبُ لَمْ يَعُدْ لِاَنَّهُ كَالْقَائِمِ مَعْنًى وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِاَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ . وَاِنْ سَهَى عَنِ الْقَعْدَةِ الْاَخِيْرَةِ حَتّٰى قَامَ اِلَى الْخَامِسَةِ رَجَعَ اِلَى الْقَعْدَةِ مَالَمْ يَسْجُدْ لِاَنَّ فِيْهِ اِصْلَاحُ صَلَاتِهِ وَاَمْكَنَهُ ذٰلِكَ لِاَنَّ مَادُوْنَ الرَّكْعَةِ بِمَحَلِّ الرَّفْضِ قَالَ وَاَلْغَى الْخَامِسَةَ لِاَنَّهُ رَجَعَ اِلٰى شَيْءٍ مَحَلُّهُ قَبْلَهَا فَيَرْتَفِضُ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ لِاَنَّهُ اَخَّرَ وَاجِبًا ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি মুক্তাদী প্রথম বৈঠক ভুলে যায়, পরে বসার অধিকতর নিকটবর্তী থাকা অবস্থায় তা স্মরণ হয়, তাহলে সে ফিরে এসে বসে যাবে এবং তাশাহহুদ পড়বে। কেননা যা কোনো বস্তুর নিকটবর্তী, তা ঐ জিনিসেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়। কারো কারো মতে এমতাবস্থায় বিলম্ব জনিত কারণে সিজদায়ে সাহ্ব করবে। কিন্তু বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে– সিজদায়ে সাহ্ব করবে না। যেমন না দাঁড়ালে সিজদা করতে হয় না। পক্ষান্তরে যদি দাঁড়ানো অবস্থার অধিকতর নিকটবর্তী হয়, তাহলে (বৈঠকের দিকে) ফিরে আসবে না। কেননা প্রকৃত পক্ষে সে দাঁড়ানো ব্যক্তির মতোই এবং এ অবস্থায় সে সিজদায়ে সাহ্ব করবে। কেননা সে ওয়াজিব তরক করেছে। আর কেউ যদি শেষ বৈঠক ভুলে যায়, এমন কি পঞ্চম রাআকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে সিজদা করার পূর্ব পর্যন্ত বৈঠকে ফিরে আসবে। কেননা এই ফিরে আসার মধ্যে তার নামাজের সংশোধন রয়েছে। আর তার জন্য এটা সম্ভব। কেননা যা এক রাকআতের কম, তা পরিহারযোগ্য। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পঞ্চম রাকআত বাতিল করে দিবে। কেননা সে এমন বিষয়ের দিকে ফিরে এসেছে– যার স্থান উক্ত রাকআতের পূর্বে। সুতরাং তা আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যাবে এবং সিজদায়ে সাহ্ব করবে। কেননা সে ওয়াজিব বিলম্বিত করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কেউ সুলাসী (ثلاثى) - তিন রাকআত, রুবায়ী (رباعى) – চার রাকআত বিশিষ্ট ফরজ নামাজের প্রথম বৈঠক ভুলে যায়; অতঃপর স্মরণ হয় তবে এর দুটি সূরত– একটি হচ্ছে সে হয়তো বসার অধিকতর নিকটবর্তী হবে এর নিরুপণের সূরত হচ্ছে যে, সে হাটু জমিন থেকে উঠায়নি। দ্বিতীয় সূরত হচ্ছে যে, সে দাঁড়ানো অবস্থার অধিক নিকটবর্তী হবে। যেমন সে হাটু জমিন থেকে উঠিয়ে নিয়েছে।

প্রথম সূরতে যে ফিরে এসে বসে পড়বে এবং তাশাহ্হুদ পড়বে। কেননা যে বস্তু কোনো বস্তুর নিকটবর্তী, তা ঐ বস্তুরই অর্ন্তভুক্ত বলে গণ্য হয়। যেমন– জুমুআর নামাজ এবং দুই ঈদের নামাজের ক্ষেত্রে শহরতলীকে শহরের হুকুমে গণ্য করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, এমতাবস্থায় সিজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে কিনা?

উত্তর ঃ কারো কারো মতে সিজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে। কেননা প্রথম বৈঠক ওয়াজিব। এতে বিলম্ব হয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হলো সিজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে না। কেননা যা কোনো বস্তুর নিকটবর্তী তাকে ঐ বস্তুর হুকুমে গণ্য করা হয় অতএব মনে করা হবে যে, সে দাঁড়ায় নি এবং প্রথম বৈঠক ছেড়ে না দাঁড়ানোর কারণে, তার প্রথম বৈঠকে বিলম্বও হয়নি. সুতরাং তার উপর সিজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে না।

দ্বিতীয় সূরতে সে বৈঠকের দিকে ফিরে আসবে না; বরং তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, যে কোনো জিনিসের নিকটবর্তী, তা ঐ জিনিসের হুকুমে গণ্য হয়। এ ব্যক্তি যেহেতু কিয়ামের নিকটবর্তী তাই তাকে কিয়ামের হুকুমে গণ্য করা হবে। আর দাঁড়ানো বা দণ্ডায়মান ব্যক্তির জন্য প্রথম বৈঠকের দিকে ফিরে যাওয়া জায়েজ নেই কেননা তৃতীয় রাকআতের কিয়াম ফরজ আর প্রথম বৈঠক ওয়াজিব। সুতরাং ওয়াজিবের কারণে ফরজ ছেড়ে দেওয়া জায়েজ হবে না; তবে এই সূরতে প্রথম বৈঠক তরক করার কারণে সিজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ سَهٰى عَنِ الْقَعْدَةِ الخ ঃ যদি কেউ শেষ বৈঠক ভুলে যায় এবং রুবায়ী (رباعى) নামাজে পঞ্চম রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে দায় অথবা ছুলাছী (ثلاثى) নামাজে (মাগরিব, বিতর) চতুর্থ রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় অথবা সুনায়ী (ثنائى) বা দুই রাকআত বিশিষ্ট নামাজে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় তাহলে রুবায়ী নামাজে পঞ্চম রাকআতের সিজদা করার পূর্ব পর্যন্ত বৈঠকে ফিরে আসবে। দলিল হচ্ছে– বৈঠকের দিকে ফিরে আসার মধ্যে তার নামাজের সংশোধন রয়েছে। আর তার জন্য এটা সম্ভব, কেননা যা এক রাকআতের কম, তা ছেড়ে দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এক রাকআতের কম حقيقة বা প্রকৃত অর্থে নামাজ হয় না এবং حكما বা হুকুমের দিক থেকেও নামাজ হয় না এই কারণে যদি কেউ কসম খায় যে, আমি নামাজ পড়ব না তারপর যদি এক রাকআতের কম পড়ে, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না।

পঞ্চম রাকআতের ক্ষেত্রে ইমাম কুদূরী বলেছেন যে, একে বাতিল করে দিবে। কেননা সে শেষ বৈঠকের দিকে ফিরেছে। আর শেষ বৈঠকের স্থান পঞ্চম রাকআতের পূর্বে। এ ক্ষেত্রে এর মূলনীতি হচ্ছে– যে ব্যক্তি নামাজের কোনো কর্ম থেকে এমন জিনিসের দিকে ফিরে যাবে যার স্থান এর পূর্বে, তাহলে তা (مرجوع عنه) আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যাবে। যেমন– কেউ তাশাহহুদ পরিমাণ বসল তারপর স্মরণ হলো যে, সে সিজদা করেনি অথবা সিজদায়ে তিলাওয়াত করেনি, তারপর ফউত হওয়া সিজদা আদায় করল, তাহলে তার সিজদা করার পূর্বের বৈঠক বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সিজদার স্থান শেষ বৈঠকের পূর্বে ছিল। মোটকথা পঞ্চম রাকআত ছেড়ে শেষ বৈঠকের দিকে ফিরে আসবে। তখন তার উপর ওয়াজিব সিজদায়ে সাহ্ব করা এবং ফরজ এবং ওয়াজিব বিলম্বিত হওয়ার কারণে। ফরজে বিলম্ব এভাবে হয়েছে যে, শেষ বৈঠকে বিলম্ব হয়েছে। আর শেষ বৈঠক ফরজ। আর ওয়াজিব বিলম্ব হয়েছে এভাবে যে, সালাম শব্দ বলা ওয়াজিব। আর তা নির্ধারিত সময়ে হতে বিলম্বিত হয়েছে।

হিদায়ার ইবারত لانه اخر واجبا -এর মধ্যে ওয়াজিব (واجب) শব্দ তার সুপরিচিত অর্থ– ও উদ্দেশ্য হতে পারে। আর واجب قطعى ফরজও উদ্দেশ্য হতে পারে। প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য হলে সালাম বিলম্বিত হওয়া মুরাদ হবে। আর দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য হলে শেষ বৈঠক বিলম্বিত করা উদ্দেশ্য হবে।

وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ بَطَلَ فَرْضُهُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ اسْتَحْكَمَ شُرُوعَهُ فِي النَّافِلَةِ قَبْلَ إِكْمَالِ أَرْكَانِ الْمَكْتُوبَةِ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ خُرُوجُهُ عَنِ الْفَرْضِ وَهٰذَا لِأَنَّ الرَّكْعَةَ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ صَلٰوةٌ حَقِيقَةً حَتّٰى يَحْنَثَ بِهَا فِي يَمِينِهِ لَا يُصَلِّي وَتَحَوَّلَتْ صَلَاتُهُ نَفْلًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ عَلٰى مَامَرَّ ـ فَيَضُمُّ إِلَيْهَا رَكْعَةً سَادِسَةً وَلَوْ لَمْ يَضُمَّ لَاشَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَظْنُونٌ ثُمَّ إِنَّمَا يَبْطُلُ فَرْضُهُ بِوَضْعِ الْجَبْهَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ سُجُودٌ كَامِلٌ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بِرَفْعِهِ لِأَنَّ تَمَامَ الشَّيْءِ بِآخِرِهِ وَهُوَ الرَّفْعُ وَلَمْ يَصِحَّ مَعَ الْحَدَثِ وَثَمَرَةُ الْإِخْتِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي السُّجُودِ بَنٰى عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ ـ

অনুবাদ : আর যদি পঞ্চম রাকআতের এক সিজদাও করে ফেলে তাহলে আমাদের মতে তার ফরজ বাতিল হবে। ইমাম শাফেঈ (র.) এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আমাদের দলিল হচ্ছে- ফরজ নামাজের রুকনসমূহ পূর্ণ করার পূর্বেই সে তার নফল নামাজের আরম্ভকে পোক্ত করে নিয়েছে। আর এটার অবশম্ভাবী দাবি হলো, ফরজ থেকে বের হয়ে আসা। এর কারণ হচ্ছে- এক সিজদাসহ রাকআত আদায়কে প্রকৃত অর্থেই নামাজ বলে গণ্য করা হয়। তাই "নামাজ পড়বে না।" বলে কসমের বেলায় এক সিজদা সহ এক রাকআত আদায় করলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর তার এই নামাজ নফলে পরিণত হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আবূ ইউসূফ (র.)-এর মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। কাজা নামাজ অধ্যায়ে এটা আলোচিত হয়েছে। সুতরাং উক্ত রাকআতের সাথে ষষ্ঠ রাকআত যুক্ত করবে। যদি কোনো রাকআত যুক্ত না করে, তাহলে তার উপর (সিজদায়ে যে সাহ্ব বা কাজা) কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা এটা ধারণা বশীভূত কাজ। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে মাটিতে কপাল রাখা মাত্র তার ফরজ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এটাই পূর্ণ সিজদা। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মাথা উঠানোর পর তা বাতিল হবে। কেননা কোনো কিছু পূর্ণতা লাভ করে শেষাংশের মাধ্যমে। আর তা হলো মাথা উঠানো। অতএব হাদাস (حدث) অবস্থায় মাথা উঠানো বিশুদ্ধ হবে না। মতভিন্নতার ফলাফল প্রকাশ পাবে সিজদার মধ্যে হাদাস দেখা দিলে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে বিনা (بناء) করবে আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে বিনা করতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা ঃ যদি কেউ শেষ বৈঠক ভুলে যায় এবং পঞ্চম রাকআতের সিজদা করে ফেলে। তাহলে আমাদের মতে তার ফরজ বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম শাফেঈ (র.) বলেছেন যে, তার ফরজ বাতিল হবে না। বরং সে বসার দিকে ফিরে আসবে এবং তাশাহহুদ পড়বে এবং সিজদায়ে সাহ্ব করে সালাম ফিরাবে। এ হুকুম ঐ সময় যখন ভুলে পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং শেষ বৈঠক না করে থাকে, তাহলে আমাদের মতে এ সূরতেও পঞ্চম রাকআতের সিজদা না করলে তার নামাজ ফাসিদ হবে না যেমন ভুলে দাঁড়িয়ে গেলে নামাজ ফাসিদ হয় না। তবে ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন, যখনই ইচ্ছাকৃত ভাবে পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে গেল তখনই তার নামাজ ফাসিদ হয়ে গেল। সারকথা হচ্ছে- এই মাসআলায় আমাদের এবং শাফি'ঈ মতাবলম্বীদের মাঝে দুই স্থানে ইখতিলাফ আছে-

এক. ভুলে যদি চার রাকআতের স্থানে পাঁচ রাকআত পড়ে ফেলে, তাহলে আমাদের মতে পঞ্চম রাকআতের সাথে ষষ্ঠ রাকআত যুক্ত করবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে পঞ্চম রাকআতকে ছেড়ে দিবে। যেমন- এক রাকআতের কম নামাজকে ছেড়ে বসার দিকে ফিরে আসে।

দুই. এক রাকআতের কম ইচ্ছাকৃতভাবে অতিরিক্ত করা হলো তাহলে আমাদের মতে নামাজ ফাসিদ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.) -এর মতে নামাজ ফাসিদ হবে।

যদি পঞ্চম রাকআতের জন্য ভুলে দাঁড়িয়ে যায় এবং পঞ্চম রাকআতের জন্য সিজদা করে নেয়, তাহলে আমাদের মতে তার ফরজ বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে তার ফরজ বাতিল হবে না।

ইমাম শাফেঈ (র.) -এর দলিল اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا রাসূল ﷺ যুহরের নামাজ পাঁচ রাকআত পড়েছেন। এ কথা বর্ণিত নেই যে, রাসূল ﷺ চার রাকআতের মাথায় বৈঠক করেছেন এবং ইহাও বর্ণিত নেই যে, তিনি এ নামাজ পুনরায় আদায় করেছেন। দ্বিতীয় দলিল হলো- ঐ ব্যক্তি ভুলের ফলে নামাজে এমন জিনিস বৃদ্ধি করেছে, যা নামাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং তার নামাজ ফাসিদ হবে না। যেমন- এক রাকআতের কম অথবা অধিক করার দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয় না।

আমাদের দলিল হলো- ঐ ব্যক্তি সিজদাসহ পঞ্চম রাকআত আদায় করার কারণে উক্ত নামাজ নফলে পরিণত হয়ে গেছে। অথচ এখনো তার ফরজ নামাজের আরকান পূর্ণ হয়নি। কেননা শেষ বৈঠক ফরজ তা, সে আদায় করেনি। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ফরজ নামাজের আরকান পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সে নফল নামাজের আরম্ভ পোক্ত করে ফলেছে, তাই তার ফরজ ফাসিদ হয়ে গেছে। এর কারণ হলো- ফরজ এবং নফলের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে। দুটি বিপরীত বস্তুর একটি নফল হওয়ার কারণে অপর (ফরজ) টি শেষ হয়ে গিয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, সিজদা ছাড়া রাকআত প্রকৃত পক্ষে কোনো নামাজই নয়। কারণ সিজদার দ্বারা প্রকৃত পক্ষে নামাজের অস্তিত্ব হয়। যেমন কেউ কসম খেল যে, وَاللّٰهِ لَا اُصَلِّيْ, আল্লাহর কসম আমি নামাজ পড়ব না, তাহলে এক রাকআত সাজ্দার সাথে পড়ার দ্বারাও তার শপথ ভেঙ্গে যাবে।

ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র.) বলেন যে, পঞ্চম রাকআতের সিজদা করার কারণে ফরজ বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে- শায়খাইনের মতে ফরজ হওয়ার গুণ বাতিল হয়েছে। আর মূল নামাজ বাকি আছে।

অর্থাৎ উক্ত নামাজের ফরযিয়্যাত বাতিল হয়ে যাবে এবং তা নফল হিসাবে বাকি থাকবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মূল নামাজই বাতিল হয়ে যাবে অর্থাৎ যে নামাজ শেষ বৈঠক ছাড়া পড়া হয়েছে; তা ফরজ হিসাবে গণ্য হবে না এবং নফল হিসাবেও গণ্য হবে না। উভয় দলের দলিল কাজা নামাজের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যে, শায়খাইনের মতে গুণ নষ্ট হওয়ায় মূল নষ্ট হওয়াকে আবশ্যক করে না। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে গুণনষ্ট হওয়াটা মূল নষ্ট হওয়াকে আবশ্যক করে।

ইমাম শাফেঈ (র.) কর্তৃক জবাব হলো যে, ইনায়া গ্রন্থকার বলেছেন, যে রাসূল ﷺ চতুর্থ রাকাআতের মাথায় শেষ বৈঠকে বসেছেন, এ কাথার দলিল হচ্ছে- হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا যুহর বলা হয় সমস্ত আরকানকে, আর সমস্ত আরকানে বৈঠকও অন্তর্ভুক্ত আছে। আর পঞ্চম রাকআতের জন্য রাসূল ﷺ এই ধারণায় দাঁড়িয়ে গেছেন যে, ইহা তৃতীয় রাকআত। সুতরাং হাদীসের এই ব্যাখ্যার পর এ হাদীসটি ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল হিসাবে গণ্য হবে না।

قَوْلُهُ فَيَضُمُّ اِلَيْهَا رَكْعَةً سَادِسَةً الخ ঃ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন পঞ্চম রাকআতের সিজদা করল তখন শায়খাইনের মতে তার ফরজ নামাজ নফলে পরিণত হয়ে যাবে। অর্থাৎ ফরজ নষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মূলতঃ নামাজই বাতিল হয়ে যাবে। শায়খাইনের মতে মূল নামাজ নষ্ট না হওয়ার কারণে পঞ্চম রাকআতের সাথে ষষ্ঠ রাকআত যুক্ত করবে। যাতে নফল নামাজ জোড় হয় বিজোড় না হয়। কেননা নফল নামাজ জোড় অনুমোদিত হয়েছে। বিজোড় অনুমোদিত হয় নি।

প্রশ্ন ঃ এমতাবস্থায় তার উপর সিজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে কি না?

জবাব ঃ কারো মতে সিজদায়ে সাহ্ব করবে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো সিজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে না। কেননা শেষ বৈঠক না করার কারণে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে গেছে। ফাসিদ হওয়ার কারণে যে ত্রুটি হয়েছে তা সিজদায়ে সাহ্ব দ্বারা পূরণ হবে না।

সুতরাং সিজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হবে না। কেননা সিজদায়ে সাহ্ব ত্রুটি পূরণ করার নিমিত্তে অনুমোদিত হয়েছে এবং যদি সে ষষ্ঠ রাকআত যুক্ত না করে, তাহলে তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা পঞ্চম রাকআতের নামাজটি ধারণাবশীভূত।

অর্থাৎ সে ইচ্ছাকৃতভাবে নফল শুরু করেনি। এর কারণ এই যে, সে একে (পঞ্চম রাকআতকে) ৪র্থ রাকআত মনে করে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চম রাকআত মনে করে দাঁড়ায়নি। মোটকথা হচ্ছে– পঞ্চম রাকাআত হতে আরম্ভকৃত নামাজ হচ্ছে– مظنون বা ধারণা বশীভূত। আর مظنون টা غير مضمون (মূল আলোচনার বহির্ভূত) হয়। সুতরাং ঐ নামাজের কাজা ওয়াজিব হবে না।

ثُمَّ إِنَّمَا يَبْطُلُ এর দ্বারা এ কথা বুঝিয়েছেন যে, যখন পঞ্চম রাকআতের সিজদা করল, তখন ফরজ বাতিল হয়ে যাবে। তবে সিজদার সূচনা হলো জমিনে কপাল রাখা। আর সিজদার শেষ হলো জামিন থেকে মাথা উঠানো।

প্রশ্ন ঃ জমিনে কপাল রাখার দ্বারাই কি ফরজ বাতিল হবে না জমিন থেকে মাথা উঠানোর দ্বারা?

জবাব ঃ হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, এ সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) -এর মতে মাটিতে কপাল রাখা মাত্র তার ফরজ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এটাই পূর্ণ সিজদা। প্রকৃত পক্ষে সিজদা বলা হয় জমিনে কপাল রাখা। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, মাটি থেকে মাথা উঠানোর পর তার ফরজ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা কোনো বস্তুর পূর্ণতা তার পরিসমাপ্তি দ্বারাই হয়ে থাকে। আর এর শেষ হচ্ছে– মাথা উঠানো। কাজেই যখন মাটি হতে মাথা উঠাবে তখনই সিজদা পূর্ণ হবে। আর যখন মাথা উঠানো দ্বারা সিজদার পূর্ণতা পেল, তখন মাথা উঠানোর পরেই ফরজ বাতিল হয়ে যাবে। এর পূর্বে বাতিল হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) স্বীয় মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত বাক্য لَمْ يَصِحَّ مَعَ الْحَدَثِ দ্বারা দলিল দিয়েছেন অর্থাৎ হাদাস (حدث) অবস্থায় মাথা উঠানো বিশুদ্ধ হয়নি। সারকথা হলো যে, যে রুকনে হাদাস পাওয়া যায় ঐ রুকন পুনরায় আদায় করা জরুরি বা ওয়াজিব। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মাটিতে মাথা রাখার দ্বারা সিজদাপূর্ণ হয় না। মাটিতে মাথা রাখার দ্বারা সিজদাপূর্ণ হলে হাদাস পাওয়ার সূরতে তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হতো না। কেননা হাদাস আসার পূর্বেই সিজদা পূর্ণ হয়েছে। মোটকথা, ইহা সাবিত হলো যে, মাটি হতে কপাল উঠানোর দ্বারা সিজদা পূর্ণ হয়। মাটিতে মাথা রাখার দ্বারা পূর্ণ হয় না।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানৈক্যের ফলাফল ঐ সূরতে প্রকাশ পাবে যে, ঐ ব্যক্তির পঞ্চম রাকাআতের সিজদায় হাদাস (حدث) হল এবং সে অজু করতে গেল এখন তার স্মরণ হলো যে, সে চতুর্থ রাকআতের পরে শেষ বৈঠক করেনি তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অজু করবে এবং শেষ বৈঠকের দিকে ফিরে যাবে এবং ফরজ নামাজ এভাবে পূরা করবে যে, তাশাহ্হুদ পড়বে, সিজদায়ে সাহ্ব করবে এবং সালাম ফিরাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট মাটি হতে মাথা উঠানোর পূর্বে সিজদা পূর্ণ হবে না এবং হাদাসের সাথে মাথা উঠানো বিশুদ্ধ নয়। অতএব ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এই সিজদা নির্ভরযোগ্য হয়নি। আর যেহেতু সিজদাই ধর্তব্য হয়নি, তাই সে যেন পঞ্চম রাকাআতকে সিজদার সাথে যুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। আর যখন পঞ্চম রাকআতকে সিজদার সাথে যুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়নি, তাই তার ফরজ বাতিল হবে না। অতএব ফরজ বাতিল না হওয়ার কারণে শেষ বৈঠকের দিকে ফিরে যাবে এবং ফরজ পুরা করবে।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে স্বীয় নামাজের উপর বিনা করবে না। কেননা তাঁর মতে কপাল মাটিতে রাখার দ্বারাই সিজদা পূর্ণ হয়ে যায়। আর পঞ্চম রাকআতের সিজদা পূর্ণ হওয়ার কারণে তার ফরজ বাতিল হয়ে গেল। যেহেতু তার ফরজই বাতিল হয়ে গেল তাই বিনা করা জায়েজ হবে না। কেননা বাতিল জিনিসের উপর বিনা করা যায় না।

وَلَوْ قَعَدَ فِى الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يُسَلِّمْ عَادَ اِلَى الْقَعْدَةِ مَالَمْ يَسْجُدْ لِلْخَامِسَةِ وَسَلَّمَ لِاَنَّ التَّسْلِيْمَ فِىْ حَالَةِ الْقِيَامِ غَيْرُ مَشْرُوْعٍ وَاَمْكَنَهُ الْاِقَامَةُ عَلٰى وَجْهِهٖ بِالْقُعُوْدِ لِاَنَّ مَادُوْنَ الرَّكْعَةِ بِمَحَلِّ الرَّفْضِ وَاِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ ضَمَّ اِلَيْهَا رَكْعَةً اُخْرٰى وَتَمَّ فَرْضُهٗ لِاَنَّ الْبَاقِىَ اِصَابَةُ لَفْظَةِ السَّلَامِ وَهِىَ وَاجِبَةٌ وَاِنَّمَا يَضُمُّ اِلَيْهَا اُخْرٰى لِتَصِيْرَ الرَّكْعَتَانِ نَفْلًا لِاَنَّ الرَّكْعَةَ الْوَاحِدَةَ لَاتُجْزِيْهِ لِنَهْيِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْبُتَيْرَاءِ ثُمَّ لَاتَنُوْبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّ الْمُوَاظَبَةَ عَلَيْهَا بِتَحْرِيْمَةٍ مُبْتَدَأَةٍ ـ

অনুবাদ : আর যদি চতুর্থ রাকআতের পর বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে পঞ্চম রাকআতের সিজদা না করা পর্যন্ত বৈঠকে ফিরে আসবে এবং সালাম ফিরাবে। কেননা দাঁড়ানো অবস্থায় সালাম করা বিধি সম্মত নয়। আর বৈঠকে ফিরে এসে বিধি সম্মতভাবে সালাম ফিরানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা যা এক রাকআতের কম, তা পরিহারযোগ্য। আর যদি পঞ্চম রাকআতে সিজদা করার পর স্মরণ হয় (যে সে পঞ্চম রাকআত অতিরিক্ত করেছে) তাহলে তার সাথে আর এক রাকআত মিলিয়ে নিবে, এতে তার ফরজ পূরা হয়ে যাবে। কেননা এখন শুধু সালাম শব্দটি বাকি আছে। আর তা হচ্ছে ওয়াজিব। উল্লেখ্য যে এ ক্ষেত্রে আরেক রাকআত এ জন্য মিলাবে, যাতে দুই রাকআত নফল হয়। (আর চার রাকআত ফরজ হয়, যদি চতুর্থ রাকআতের মাথায় বসে।) কেননা এক রাকআত নামাজ জায়েজ নেই। রাসূল ﷺ এক রাকআত নামাজ পড়তে নিষেধ করে। তবে এ দুই রাকআত যোহরের পরবর্তী দুই রাকআত সুন্নতের স্থলবর্তী হবে না। ইহাই বিশুদ্ধ মত। কেননা রাসূল ﷺ থেকে নতুন তাহরীমা দ্বারা এর উপর নিয়মিত আমল রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা ঃ যদি মুসল্লী চতুর্থ রাকআতে তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক করে এবং সালাম না ফিরিয়ে ভুলে চতুর্থ রাকআতের জন্য দাড়িয়ে যায়। তাহলে পঞ্চম রাকআতের সিজদার পূর্ব পর্যন্ত সে বৈঠকের দিকে ফিরে আসবে। তবে বৈঠকের দিকে ফিরে আসার পর তাশাহহুদ পুনরায় পড়বে না। বরং সিজদায়ে সাহ্‌ব করে সালাম ফিরাবে। নকলী দলিল হচ্ছে– একবার রাসূল ﷺ পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। এ জন্য পশ্চাত থেকে তাসবীহ দ্বারা তাঁকে অবগত করলেন তখন তিনি বৈঠকের দিকে ফিরে গেলেন। তখন তিনি সালাম ফিরালেন এবং সাজ্‌দায়ে সাহ্‌ব করলেন। আকলী দলিল হলো– দাঁড়ানো অবস্থায় সালাম ফিরানো শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত নয়। আর এখানে অনুমোদিত পদ্ধতিতে সালাম ফিরানো সম্ভব। তা এভাবে যে, বৈঠকের দিকে ফিরে আসবে।

প্রশ্ন ঃ এই সূরতে পঞ্চম রাকআত বর্জন করা আবশ্যক হয়ে পড়ছে।

উত্তর ঃ পঞ্চম রাকআতের সিজদা করার পূর্বে তা এক রাকআতের কম হয়। আর যা এক রাকআতের কম তা বর্জন করলে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন কোনো ব্যক্তি কোনো নামাজের এক রাকআতে আছে, এখনো সিজদা করেনি। এমতাবস্থায় মুয়াজ্জিন তাকবীর বলা আরম্ভ করল, তাহলে ঐ ব্যক্তির উচিত ঐ রাকআত ছেড়ে জামাআতের নামাজে শরিক হওয়া।

প্রশ্ন ঃ এক রাকআতের কম নামাজ কেন বর্জন করা হবে?

জবাব ঃ এক রাকআতের সিজদা করলে এবং এক রাকআত পুরা করলে। তা নামাজের হুকুমে গণ্য হলো, আর নামাজকে বাতিল করা জায়েজ নেই। কেননা আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, لَاتُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ অর্থ– তোমরা স্বীয় আমল বাতিল কর না। তবে সিজদা করার পূর্ব পর্যন্ত ঐ রাকআত অসম্পূর্ণ (نَاقِص) তা নামাজের হুকুমে গণ্য নয়। অতএব উহা বাতিল করতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা উহা لَاتُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ -এর আওতা ভুক্ত হবে না।

قَوْلُهٗ وَاِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ الخ **ঃ** যদি পঞ্চম রাকআতের সিজদা করার পর স্মরণ হয় (যে, সে পঞ্চম রাকআত অতিরিক্ত করেছে) তাহলে তার সাথে আরো এক রাকআত মিলিয়ে নিবে। এহেন অবস্থায় ফরজ পূরা হয়ে যাবে। দুই রাকআত নফল হবে, আর চার রাকআত ফরজ হয়ে যাবে। ফরজ এ জন্য পূর্ণ হবে যে, আমাদের নিকট সালাম শব্দ দ্বারা নামাজ থেকে ফারিগ হওয়া ওয়াজিব। আর এই সুরতে শুধু সালাম বাকি আছে। বলা বাহুল্য যে, ওয়াজিব তরক করার দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয় না। সুতরাং ঐ সুরতে ফরজও ফাসিদ হবে না। ওয়াজিব তরকের ত্রুটি সাজদায়ে সাহ্ব দ্বারা পূরণ হবে।

ইমাম শাফেঈ (র.) বলেছেন, এমতাবস্থায় যদি ষষ্ঠ রাকআত যোগ করে তাহলে তার ফরজ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ঐ সুরতে সে অন্য নামাজের দিকে চলে গেছে। অথচ সালাম শব্দ এখনো বাকি আছে। আর সালাম শব্দ ইমাম শাফেঈ (র.) -এর মতে ফরজ। বলা বাহুল্য যে, ফরজ তরক করার দ্বারা নামাজ বাতিল হয়ে যায়। অতএব ঐ সুরতেও নামাজ বাতিল বা ফাসিদ হয়ে যাবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, ষষ্ঠ রাকআত যোগ করার হুকুম এ জন্য দেওয়া হয়েছে যাতে দুই রাকআত নফল হয়। কেননা রাসূল ﷺ বিচ্ছিন্ন এক রাকআত নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। তাই এক রাকআত নামাজ পড়া জায়েজ নেই। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে যেহেতু এক রাকআত নামাজ পড়া জায়েজ আছে এ জন্য তাঁর মতে ষষ্ঠ রাকআত যোগ করার তেমন প্রয়োজন নেই।

ইমাম কুদূরী (র.) -এর ইবারতের দ্বারা বুঝা যায় যে, ষষ্ঠ রাকআত যোগ করা ওয়াজিব অথবা মোস্তাহাব অথবা জায়েজ। তবে মবসূত (مبسوط) -এর ইবারত হলো এই– عَلَيْهِ اَنْ يُّضِيْفَ। على শব্দটি ওয়াজিব করা জন্য ব্যবহার হয়। সুতরাং মবসূত (مبسوط) -এর ইবারত ওয়াজিব বুঝাবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, এ দুই রাকআত অর্থাৎ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ রাকআত যোহর পরবর্তী দুই রাকআত সুন্নতের স্থলবর্তী হবে না। এটিই বিশুদ্ধ মত। তবে কারো কারো মত হলো যে, এই দুই রাকআত জোহর পরবর্তী দুই রাকআত সুন্নতের স্থলবর্তী হবে। বিশুদ্ধ মতের দলিল এই যে, রাসূল ﷺ জোহর পরবর্তী সুন্নত নিয়মিতভাবে নতুন তাহরীমা দ্বারা আদায় করতেন। প্রথমোক্ত সুরতে নতুন তাহরীমা পাওয়া যায়নি তাই তা জোহর পরবর্তী সুন্নতের স্থলবর্তী হবে না।

وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ اِسْتِحْسَانًا لِتَمَكُّنِ النُّقْصَانِ فِى الْفَرْضِ بِالْخُرُوجِ لَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُوْنِ وَفِى النَّفْلِ بِالدُّخُوْلِ لَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُوْنِ وَلَوْ قَطَعَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ لِاَنَّهُ مَظْنُوْنٌ وَلَوِ اقْتَدٰى بِهِ اِنْسَانٌ فِيْهِمَا يُصَلِّىْ سِتًّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) لِاَنَّهُ الْمُؤَدّٰى بِهٰذِهِ التَّحْرِيْمَةِ وَعِنْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ لِاَنَّهُ اِسْتَحْكَمَ خُرُوْجُهُ عَنِ الْفَرْضِ وَلَوْ اَفْسَدَهُ الْمُقْتَدِىْ لَاقَضَاءَ عَلَيْهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) اِعْتِبَارًا بِالْاِمَامِ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) يَقْضِىْ رَكْعَتَيْنِ لِاَنَّ السُّقُوْطَ بِعَارِضٍ يَخُصُّ الْاِمَامَ ـ

অনুবাদ : আর ভুলের জন্য সিজদা করবে। এটা সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি। কেননা সুন্নত তরীকার বিপরীতে (ফরজ হতে) বের হওয়ার কারণে ফরজে ত্রুটি হয়েছে। আর সুন্নত তরীকার বিপরীত (নফল নামাজে) দাখিলের কারণে নফল নামাজেও ত্রুটি হয়েছে। এহেন অবস্থায় সে যদি আর এই নফল নামাজ ছেড়ে দেয়, তবে তার উপর কাজা আবশ্যক হবে না। কেননা এ রাকআতটা ধারণা বশীভূত।

এ রাকআতদ্বয়ে কেউ যদি তার সাথে ইকতেদা করে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে ছয় রাকআত পড়বে। কারণ এ তাহরীমা দ্বারা ছয় রাকআত আদায় করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে দুই রাকআত আদায় করবে। কেননা ফরজ হতে তার বের হয়ে আসা পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মুক্তাদী যদি এই নামাজ ফাসিদ করে ফেলে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ইমামের উপর কিয়াস করে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে (মুক্তাদীকে) দুই রাকআত কাজা করতে হবে। কেননা عارض (বিশেষ কারণে) এর কারণে কাজা রহিত হওয়ার বিষয়টি ইমামের সাথে খাস।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা ঃ যদি কোনো মুসল্লী চার রাকআতের মাথায় তাশাহহুদ পরিমাণ বসে, তারপর ভুলে পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং (পঞ্চম রাকআতের) সিজদা করে, তাহলে এর হুকুম হলো, এর সাথে ষষ্ঠ রাকআত মিলাবে। এমতাবস্থায় প্রথম চার রাকআত ফরজ হবে এবং পরের দুই রাকআত নফল হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, সাজদায়ে সাহ্ব-এর হুকুম সূক্ষ্ম যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। অন্যথায় সাধারণ যুক্তির দাবি হলো যে, সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে না। কেননা সালাম দেওয়া ওয়াজিব। যা তরক করে দিয়েছে এবং মুসল্লী পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়ানোর দ্বারা ফরজের থেকে নফলের দিকে ধাবিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে যে, যে নামাজে সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হয়েছে ঐ নামাজে তা আদায় করা ওয়াজিব। অন্য নামাজে তা (সাজদায়ে সাহ্ব) আদায় করা ওয়াজিব হয় না। সুতরাং এখানে যদি সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব ধরা হয়, তাহলে সাজদায়ে সাহ্ব তো ওয়াজিব হয়েছে ফরজে আর তা আদায় করা হচ্ছে নফল নামাজে। এটা জায়েজ নেই। অতএব যুক্তির আলোকে প্রমাণ হলো যে, তার উপর সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব নয়।

সূক্ষ্ম যুক্তি ঃ সূক্ষ্ম যুক্তি বুঝার পূর্বে উপলব্ধি করতে হবে যে, এখানে ফরজ এবং নফল উভয়ের মধ্যে ত্রুটি অনুপ্রবেশ করেছে। ফরজ এভাবে যে, চার রাকআতের পর সালাম দিয়ে নামাজ থেকে বের হওয়া ওয়াজিব। অথচ সে সালাম তরক করে দিয়েছে। সুতরাং ওয়াজিব তরক করার কারণে ফরজে ত্রুটিযুক্ত হলো। এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মাযহাব। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে নফলে এভাবে ত্রুটি হয়েছে যে, তার মতে নফল নামাজ নতুন তাহরীমা দ্বারা শুরু করা ওয়াজিব, আর এই ব্যক্তি তা তরক করেছে। সারকথা হলো ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সালাম শব্দ তরক করার কারণে ফরজ ত্রুটিযুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে নফলের মধ্যে নতুন তাহরীমা না পাওয়ার কারণে নফল ত্রুটিযুক্ত হয়েছে।

এই ভূমিকার পর আমাদের বক্তব্য হলো যে, উক্ত সুরতে সূক্ষ্ম যুক্তির আলোকে সাজদায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হবে শুধু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত অনুযায়ী। কেননা ইমাম মুহাম্মদ মতে ফরজে ত্রুটি পাওয়া গিয়েছে এবং সে ফরজ নামাজ হতে নফল নামাজের দিকে ধাবিত হয়েছে। সাধারণ যুক্তির দাবি হলো যে, ফরজ নামাজের ক্ষতি নফল নামাজের দ্বারা পূরণ হবে । এর উদাহরণ এরূপ যে, এক ব্যক্তি এক সালামে ছয় রাকআত নফল পড়া শুরু করল। তারপর প্রথম দুই রাকআতে স ক্রদায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হলো, তাহলে নামাজের শেষে সাজদায়ে সাহ্‌ব আদায় করবে। যদিও নফলের প্রতি দুই রাকআত ভিন্ন া স্বতন্ত্র নামাজ। কিন্তু একই তাহরীমার কারণে ছয় রাকআত একই নামাজ হিসাবে গণ্য। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে যেহেতু নতুন তাহরীমা না পাওয়ার কারণে নফল ত্রুটি যুক্ত হয়েছে, তাই তার মতে সাধারণ যুক্তি এবং সূক্ষ্ম যুক্তি উভয়ের আলোকে সাজদায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, যদি ঐ ব্যক্তি এ নফল নামাজ ভেঙ্গে দেয় যেমন পঞ্চম রাকআত পূর্ণ করার পর নামাজ ভেঙ্গে দিল, তাহলে তার উপর ঐ দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যুফর (র.) বলেছেন যে, ঐ দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে।

মূল ইখতিলাফ (اخـتـلاف) হলো! যদি কোনো নামাজ বা রোজা সন্দেহের ভিত্তিতে শুরু করে, তাহলে তা আমাদের মতে ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে ওয়াজিব হবে। কেননা সে ফরজের ধারণা করে পঞ্চম রাকআত শুরু করেছে অথচ তার দায়িত্বে কোনো ফরজ অবশিষ্ট নেই। সুতরাং আমাদের মতে এরূপ শুরু করার দ্বারা নফল ওয়াজিব হবে না বিধায় তা ভেঙ্গে দেওয়ার কারণে কাজাও ওয়াজিব হবে না। ইমাম যুফার (র.) -এর মতে যেহেতু সন্দেহের ভিত্তিতে নফল শুরু করলে তা ওয়াজিব হয়, তাই তা ভেঙ্গে দেওয়ার কারণে কাজা ওয়াজিব হবে। وَلَوْ اِقْتَدٰى بِهٖ اِنْسَانٌ বিজ্ঞ গ্রন্থকার বলেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি ঐ দুই (পঞ্চম ও ষষ্ঠ) রাকআতে ঐ ব্যক্তির ইক্তেদা করে তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে এ মুসল্লী ছয় রাকআত নামাজ পড়বে। অর্থাৎ যদি পঞ্চম রাকআতে ইক্তেদা করে, তাহলে ইমাম সালাম ফিরানোর পর আরো চার রাকআত পড়বে। আর যদি ষষ্ঠ রাকআতে ইক্তেদা করে, তাহলে ইমাম নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর আরো পাঁচ রাকআত পড়বে। তা এভাবে যে, আরো এক রাকআত পড়ে বৈঠক করবে, তারপর দুই রাকআতের মাথায় বৈঠক করবে, অতঃপর দুই রাকআত পড়ে শেষ বৈঠক করবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল, এ মুক্তাদী ইমামের তাহ্‌রীমার সাথে নামাজ শুরু করেছে। সুতরাং যে পরিমাণ নামাজ ইমাম আদায় করেছে, ঐ পরিমাণ নামাজ মুক্তাদীর উপর ওয়াজিব হবে। যেহেতু ইমাম ছয় রাকআত নামাজ আদায় করেছে, সুতরাং মুক্তাদীর উপরও ছয় রাকআত ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে শায়খাইনের মতে এ মুক্তাদী শুধু দুই রাকআত নামাজ পড়বে।

শায়খাইনের দলিল, ইমাম যখন পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়াল তখন ইমাম সাহেবের ফরজ নামাজ থেকে বের হওয়া সুনিশ্চিত হল, আর ফরজ নামাজ থেকে বের হওয়া নিশ্চিত হওয়ার কারণে তার (ইমামের) ফরজের তাহরীমা বাতিল হয়ে গিয়েছে। কেননা একই সময়ে দু'টি ভিন্ন নামাজের তাহরীমায় অবস্থান করা সম্ভব নয়। সারকথা হলো যে, ফরজের তাহরীমা ছিন্ন হয়ে নফলের তাহরীমা শুরু হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, এ মুক্তাদী নফলের তাহরীমায় ইক্তেদা করেছে। সুতরাং তার উপর এই দুই রাকআত নফল ব্যতীত অন্য কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهٗ وَاَفْسَدَهُ الْمُقْتَدِىْ الخ ঃ এই ইবারতের সারকথা হলো যে, যদি কোনো ব্যক্তি পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাকআতে ইমামের ইক্তেদা করার পর ঐ নামাজকে ফাসিদ করে দেয়, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ঐ মুক্তাদীর উপর ঐ দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ঐ মুক্তাদীর উপর ঐ দু রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল যে, তিনি মুক্তাদীর অবস্থাকে ইমামের অবস্থার উপর কিয়াস (তুলনা) করেছেন। কয়েক লাইন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি ইমাম দুই রাকআত ফাসিদ করে দেয়, তাহলে তার উপর কাজা ওয়াজিব হয় না। ইমামের অবস্থার উপর কিয়াস করে বলা হয়েছে যে, মুক্তাদীর উপর ঐ দু' রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল, যুক্তির (কিয়াসের) দাবি ছিল যে, ইমামের উপর কাজা ওয়াজিব হওয়া। কেননা ইমামও পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাকআত (নফল) শুরু করার পর তা বাতিল করে দিয়েছে। সুতরাং এ সুরতে ইমামের উপরও কাজা ওয়াজিব হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একটি বাধার কারণে ইমামের নামাজের কাজা রহিত হয়ে গেছে। আর এ বাধা বা প্রতিবন্ধক হচ্ছে যে, ইমাম ফরজ নামাজ আদায় করার নিয়তে নফল শুরু করেছে। এ প্রতিবন্ধক ইমামের সাথে নির্দিষ্ট। আর যে জিনিস ইমামের সাথে নির্দিষ্ট তা অন্যের প্রতি সম্প্রসারিত হবে না এই প্রতিবন্ধকের কারণে ইমামের দায়িত্ব থেকে কাজা রহিত হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে মুক্তাদীর ক্ষেত্রে এ প্রতিবন্ধক নেই। সুতরাং তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে।

قَالَ وَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا فَسَهَى فِيْهِمَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ أُخْرَيَيْنِ لَمْ يَبْنِ لِأَنَّ السُّجُوْدَ يَبْطُلُ لِوُقُوْعِهِ فِيْ وَسَطِ الصَّلٰوةِ بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ إِذَا سَجَدَ لِلسَّهْوِ ثُمَّ نَوَى الْإِقَامَةَ حَيْثُ يَبْنِيْ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْنِ تَبْطُلُ جَمِيْعُ الصَّلٰوةِ وَمَعَ هٰذَا الْوَادِيْ صَحَّ لِبَقَاءِ التَّحْرِيْمَةِ وَيَبْطُلُ سُجُوْدُ السَّهْوِ هُوَ الصَّحِيْحُ .

অনুবাদ : জামেউস সগীর গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি দুই রাকআত নফল পড়ল আর তাতে ভুল করল এবং সাজদায়ে সাহ্‌ব করল। অতঃপর (একই তাহরীমার দ্বারা) আরও দুই রাকআত পড়ার ইচ্ছা করল তাহলে (পরবর্তী রাকআত দ্বয়ের উপর) সে বিনা (بناء) করতে পারবে না। কেননা তখন সালাতের মধ্যবর্তী স্থানে হওয়ার কারণে সাজদায়ে সাহ্‌ব বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মুসাফির যদি সাজদায়ে সাহ্‌ব করার পর মুকীম হওয়ার নিয়ত করে তাহলে সে (পূর্ববর্তী রাকআত দ্বয়ের উপর পরবর্তী রাকআতের) বিনা করতে পারবে। কেননা মুসাফির যদি বিনা না করে তাহলে তার সম্পূর্ণ নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও যদি সে (পরবর্তী দুই রাকআত নফল) আদায় করে, তাহলে তার তাহরীমা বাকি থাকার কারণে তা সহীহ হবে। কিন্তু সাজদায়ে সাহ্‌ব বাতিল হয়ে যাবে। এটিই বিশুদ্ধ মত। (সুতরাং শেষে পুনঃ সাজদায়ে সাহ্‌ব আদায় করে নিবে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা, কোনো ব্যক্তি দুই রাকআত নফল পড়ল এবং তাতে কোনো ভুল করল এবং ভুলের কারণে সাজদায়ে সাহ্‌ব করল, অতঃপর ইচ্ছা করল যে, ঐ দুই রাকআতের সাথে (একই তাহরীমার দ্বারা) আরও দুই রাকআত পড়বে। তাহলে তার বিনা করা জায়েজ হবে না; বরং প্রথম দুই রাকআতের মাথায় সালাম ফিরিয়ে নতুন তাহরীমা বেঁধে দুই রাকআত পড়ে নিবে। একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সাজদায়ে সাহব নামাজের শেষাংশে অনুমোদিত নামাজের দুই শুফআ (شفع)-এর মাঝখানে অনুমোদিত নয়। দলিলের সারকথা হলো যে, এমতাবস্থায় সাজদায়ে সাহব করার পর যদি শেষের দুই রাকআতের বিনা করা হয় তাহলে তা বিনা প্রয়োজনে সাজদায়ে সাহবকে বাতিল করে দিচ্ছে। কেননা সাজদায়ে সাহ্‌ব নামাজের মাঝখানে পতিত হয়েছে। অথচ নামাজের মাঝে সাজদায়ে সাহব অনুমোদিত নয়; বরং নামাজের শেষাংশে অনুমোদিত। বিনা প্রয়োজনের কথা আমরা এ জন্য বলেছি যে, যদি এ ব্যক্তি পরবর্তী দুই রাকআত নতুন তাহরীমা দ্বারা আদায় করে বিনা করা ছাড়া, তাহলে তা জায়েজ হবে। এ জন্য বিনা করে সাজদায়ে সাহবকে বাতিল করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবে হ্যাঁ একথা বলা যায় যে, বিনা করলে এক সালামে চার রাকআতে আদায় করার ফজিলত অর্জন হত। কেননা এক সালামে চার রাকআত আদায় করা দুই সালামে চার রাকআত আদায় করার তুলনায় উত্তম। এর উত্তর ঃ বিনা করার সুরতে নিঃসন্দেহে চার রাকআত নিরবিচ্ছিন্নভাবে আদায় করার ফজিলত হাসিল হয়, তবে এতে একটি জটিলতা হচ্ছে– সাজদায়ে সাহব যা ওয়াজিব তা নামাজের মাঝে পতিত হবার কারণে বাতিল হয়ে যাচ্ছে। ওয়াজিব (সাজদায়ে সাহব) নষ্ট করার থেকে বেঁচে থাকা উত্তম, ফজিলত হাসিল করার তুলনায়। এ জন্য বলা হয়েছে যে, এ ব্যক্তি পূর্ববর্তী দুই রাকআতের উপর বিনা করবে না; বরং নতুন তাহরীমা দ্বারা পরবর্তী দুই রাকআত আদায় করবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তির বিনা করা উচিত নয়, তবে যদি এতদসত্ত্বেও বিনা করে তাহলে তার পরবর্তী দুই রাকআত আদায় করা সহীহ হবে। কেননা এখনও তার তাহরীমা বিদ্যমান আছে। তবে হ্যাঁ সাজদায়ে সাহ্‌ব বাতিল হয়ে যাবে। কেননা বিনা করার কারণে সাজদায়ে সাহ্‌ব নামাজের মাঝখানে পতিত হয়ে গেছে। অথচ নামাজের মাঝে সাজদায়ে সাহব অনুমোদিত নয়। এ জন্য সাজদায়ে সাহব গ্রহণযোগ্য হবে না। তার উপর পুনরায় সাজদায়ে সাহ্‌ব করা ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ الخ ঃ এ ইবারতের হুকুম মতনের মাসআলার বিপরীত। মোটকথা হলো, কোনো মুসাফির ব্যক্তি চার রাকআত পড়ল এবং নামাজে কোনো ভুল হওয়ার কারণে সাজদায়ে সাহ্‌ব করল, তারপর সালাম ফিরানোর পূর্বে মুকীম হওয়ার নিয়ত করল, তাহলে এ মুসাফির ঐ তাহরীমার উপর বিনা (بناء) করবে এবং চার রাকআত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। কেননা মুকীম হওয়ার নিয়ত করার কারণে তার উপর চার রাকআত পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় যদি সে বিনা না করে তাহলে তার পূর্ণ নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর বিনা করার দ্বারা ওয়াজিব নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সাজদায়ে সাহ্‌ব বাতিল হয়ে যায়। বলা বাহুল্য যে, ওয়াজিব নষ্ট করা বা ভেঙ্গে দেওয়া উত্তম, ফরজ বাতিল করার তুলনায়। মূলনীতি আছে যে, বড় ত্রুটি দূর করার জন্য ছোট ত্রুটি বরদাশত করা যায়। এ জন্য ফরজ বাতিল হওয়া থেকে রক্ষা করা উত্তম হবে সাজদায়ে সাহ্‌ব ভেঙ্গে দেওয়ার তুলনায়।

وَمَنْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فِىْ صَلَاتِهٖ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ فَإِنْ سَجَدَ الْإِمَامُ كَانَ دَاخِلًا وَإِلَّا فَلَا وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ دَاخِلٌ سَجَدَ الْإِمَامُ اَوْلَمْ يَسْجُدْ لِاَنَّ عِنْدَهٗ سَلَامٌ مَنْ عَلَيْهِ السَّهْوُ لَا يُخْرِجُهٗ عَنِ الصَّلٰوةِ اَصْلًا لِاَنَّهَا وَجَبَتْ جَبْرًا لِلنُّقْصَانِ فَلَابُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ فِىْ اِحْرَامِ الصَّلٰوةِ وَعِنْدَهُمَا يُخْرِجُهٗ عَلٰى سَبِيْلِ التَّوَقُّفِ لِاَنَّهٗ مُحَلِّلٌ فِىْ نَفْسِهٖ وَاِنَّمَا لَا يَعْمَلُ لِحَاجَتِهٖ اِلٰى اَدَاءِ السَّجْدَةِ فَلَا يَظْهَرُ دُوْنَهَا وَلَاحَاجَةَ عَلٰى اِعْتِبَارِ عَدَمِ الْعَوْدِ وَيَظْهَرُ الْاِخْتِلَافُ فِىْ هٰذَا وَفِىْ اِنْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ بِالْقَهْقَهَةِ وَتَغَيُّرِ الْفَرْضِ بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ فِىْ هٰذِهِ الْحَالَةِ ـ

অনুবাদ : কেউ (নামাজের শেষে) সালাম ফিরাল অথচ তার জিম্মায় সাজদায়ে সাহ্‌ব রয়ে গেছে এমন সময় সালামের পর কোনো ব্যক্তি সে মুসল্লী নামাজে দাখিল হলো, এহেন অবস্থায় ইমাম যদি সিজদায় যায়, তাহলে মুক্তাদী নামাজে শামিল বলে গণ্য হবে। অন্যথায় নামাজে শামিল বলে গণ্য হবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ইমাম সিজদা করুন আর না করুন মুক্তাদী নামাজে শামিল বলে গণ্য হবে। কেননা তার মতে যার জিম্মায় সাজ্‌দায়ে সাহব আছে তার সালাম মূলত তাকে নামাজ হতে বের করে না। কারণ এ সিজদা ওয়াজিব হয়েছে ক্ষতি পূরণের জন্য। সুতরাং নামাজের তাহরীমায় থাকা তার জন্য অপরিহার্য। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সালাম তাকে তায়াক্‌কুফ (توقف) স্থগিতাবস্থায় নামাজ থেকে বের করে। কেননা বস্তুত সালাম মুসল্লীকে নামাজ থেকে বের করে দেয়। কিন্তু সিজদা আদায়ের প্রয়োজনে এখানে তা কার্যকারী হবে না। সুতরাং সিজদা ছাড়া এর কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে না। আর সিজদায় ফিরে না আসার প্রেক্ষিতে কার্যকারিতার প্রয়োজনও নেই।

এ মতপার্থক্যের ফলাফল আলোচ্য মাসআলায় যেমন প্রকাশ পাচ্ছে, তেমনি প্রকাশ পাবে এ অবস্থায় অট্টহাসি দ্বারা অজু ভঙ্গ হওয়ার ক্ষেত্রে এবং মুকীম হওয়ার নিয়ত দ্বারা ফরজ পরিবর্তন হওয়ার ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা. কোনো ব্যক্তি সালাম ফিরাল অথচ তার জিম্মায় সাজদায়ে সাহ্‌ব রয়ে গেছে। এমন সময় অন্য কোনো ব্যক্তি তার সালাম ফিরানোর পর তার নামাজে ইক্তেদার নিয়ত করে শামিল হয়ে গেল। তাহলে শায়খাইনের মতে তার হুকুম হলো যে, ইমাম সাজদায়ে সাহ্‌ব করে থাকলে মুকতাদীর নামাজে দাখিল হওয়া গণ্য হবে। অন্যথায় মুকতাদীর নামাজে দাখিল হওয়া গণ্য হবে না। আলোচ্য মাসআলা এবং আরো অনেক মাসআলা এই মূলনীতির উপর নির্ভরশীল যে, "যার উপর সাজদায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হয় তার সালাম ফিরানো তাকে নামাজের তাহরীমা থেকে বের করে দেয় কিনা"? এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত হলো যে, তার সালাম তাকে নামাজ থেকে বের করে না স্থগিতাবস্থায় নয় এবং অনিবার্য এবং নিশ্চিতভাবেও

নয়। এটিই ইমাম যুফার (র.) এর মত। পক্ষান্তরে শায়খাইনের মত হলো তার সালাম তাকে নামাজ থেকে স্থগিতাবস্থায় বের করে দেয়। স্থগিতাবস্থায় মর্ম হলো যে, সালামের পর যদি সাজদায়ে সাহ্‌ব করে তাহলে তাহরীমা বাকি থাকবে। অতএব অন্যান্য মুসল্লীদের ইক্তেদা করা জায়েজ হবে। আর যদি সালামের পর সিজদা না করে, তাহলে তাহরীমা বাকি থাকবে না অতএব অন্যান্য মুসল্লীদের ইক্তেদা (اقتداء) করা সহীহ হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো যে, সাজদায়ে সাহ্‌ব আদায়কৃত নামাজের ত্রুটি দূর করার জন্য ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ সংঘটিত বা চলমান নামাজের ত্রুটি দূর করার জন্য সাজদায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হয়। আর নামাজের অস্তিত্ব তাহরীমা বাকি থাকার উপর নির্ভরশীল। উক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, যার উপর সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয় তার সালাম তাকে নামাজ থেকে বের করে দেয় না; বরং সালাম ফিরানো সত্ত্বেও তাহরীমা বিদ্যমান থাকে। সালামের পর তাহরীমা বাকি থাকার কারণে তার সাথে অন্যের ইক্তেদা করা সহীহ হবে। চাই ইমাম সাজদায়ে সাহ্‌ব করুক বা না করুক।

শায়খাইনের দলিল, সালাম প্রত্যক্ষভাবে মুসল্লীকে নামাজ থেকে বের করে দেয়। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ সালাম নামাজি ব্যক্তির জন্য সবকিছুকে হালাল করে। তবে হ্যাঁ যদি কোনো প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয় তাহলে সালামের কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে না। আর কার্যকারিতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হলো সাজদায়ে সাহব আদায় করার প্রয়োজনীয়তা। অতএব যদি সাজদায়ে সাহ্‌ব আদায় করে তাহলে প্রতিবন্ধক পাওয়ার কারণে সালামের কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে না অর্থাৎ ঐ মুসল্লীকে নামাজ থেকে বের করবে না। আর যদি সাজদায়ে সাহ্‌ব না করে তাহলে নামাজ থেকে হালাল হওয়ার প্রতিবন্ধক না পাওয়ার কারণে সালামের কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে, অর্থাৎ মুসল্লীকে নামাজ থেকে বের করে দিবে। এই দলিলের দ্বারা সাবিত হলো, যে ব্যক্তির উপর সাজদায়ে সাহ্‌ব ওয়াজিব হয় তার সালাম তাকে স্থগিতাবস্থায় নামাজ থেকে বের করে দেয়।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) এবং শায়খাইনের ইখতেলাফের ফলাফল আলোচ্য মাসআলা এবং অন্যান্য মাসআলায় প্রকাশ পাবে। ১: সালামের পর ঐ ব্যক্তি অট্টহাসি বা উচ্চহাসি দিলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এবং ইমাম যুফার (র.) -এর মতে অজু ভেঙ্গে যাবে। কেননা সাজদায়ে সাহ্‌ব করার কারণে নামাজের মাঝে অট্টহাসি পাওয়া গেল, আর যদি সাজদায়ে সাহ্‌ব না করে তাহলে অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা এমতাবস্থায় নামাজের পর উচ্চ হাসি পাওয়া গেল। ২. সালামের পর এবং সাজদায়ে সাহ্‌ব-এর পূর্বে কোনো মুসাফির যদি ইকামতের নিয়ত করে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার ফরজ নামাজ দুই রাকআতের স্থানে চার রাকআত পড়তে হবে। চাই সাজদায়ে সাহ্‌ব করুক বা না করুক। আর শায়খাইনের মতে যদি সাজদায়ে সাহ্‌ব করে তাহলে ইকামতের (اقامت) নিয়তের কারণে তার ফরজ নামাজ চার রাকআত পড়তে হবে। আর যদি সাজদায়ে সাহ্‌ব না করে তাহলে চার রাকআত হবে না।– (শরহে নিকায়া)

وَمَنْ سَلَّمَ يُرِيدُ بِهِ قَطْعَ الصَّلٰوةِ وَعَلَيْهِ سَهْوٌ فَعَلَيْهِ اَنْ يَسْجُدَ لِسَهْوِهِ لِاَنَّ هٰذَا السَّلَامَ غَيْرُ قَاطِعٍ وَنِيَّتُهُ تَغْيِيرٌ لِلْمَشْرُوعِ فَلَغَتْ . وَمَنْ شَكَّ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ اَثَلٰثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا وَ ذٰلِكَ اَوَّلُ مَا عَرَضَ لَهُ اِسْتَانَفَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ اَنَّهُ كَمْ صَلّٰى فَلْيَسْتَقْبِلِ الصَّلٰوةَ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি নামাজ শেষ করার নিয়তে সালাম ফিরাল, অথচ তার জিম্মায় সাজদায়ে সাহ্ব রয়ে গিয়েছে, তাহলে তার কর্তব্য হলো নামাজে সাজদায়ে সাহ্ব করা। কেননা এ সালাম নামাজ সমাপ্তকারী নয়। আর তার নিয়তের লক্ষ্য হচ্ছে শরিয়ত অনুমোদিত বিষয়ের পরিবর্তন। সুতরাং এ নিয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি নামাজরত অবস্থায় সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়ে, ফলে তিন রাকআত পড়েছে না চার রাকআত পড়েছে তা বলতে পারে না। আর এই প্রথমে সে এ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তাহলে সে পুনরায় নামাজ আদায় করবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় নামাজে সন্দিহান হয়ে পড়ে যে, সে কত রাকআত পড়েছে? তাহলে সে যেন পুনরায় নামাজ আদায় করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা, যে ব্যক্তির দায়িত্বে সাজদায়ে সাহ্ব ওয়াজিব হয়েছে সে যদি সালাম ফিরায় নামাজ শেষ করার জন্য তবে, নামাজ ভঙ্গকারী জিনিস পাওয়ার পূর্বেই তার উপর সাজদায়ে সাহ্ব করা ওয়াজিব। কেননা যে ব্যক্তির উপর সাজদায়ে সাহ্ব করা ওয়াজিব তার সালাম ফিরানো নামাজকে ভঙ্গ করে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর নিকট এ সালাম মুহাল্লিল (محلل) বা নামাজ থেকে বহিষ্কারকারী হিসাবে অনুমোদিত নয়। পক্ষান্তরে শায়খাইনের থেকে বহিষ্কারকারী স্থগিতাবস্থায়, চূড়ান্তভাবে নামাজ থেকে বহিষ্কারকারী নয়। মোটকথা এ সালাম নামাজ ভঙ্গকারী রূপে শরিয়তে অনুমোদিত নয়। আর যে জিনিস নামাজ ভঙ্গকারীরূপে শরিয়তে অনুমোদিত নয়। তা– নামাজকে ভঙ্গ করতে পারে না। কাজেই এ সালামের কারণে নামাজ ভঙ্গ হবে না। এতদ্বসত্বেও এ ক্ষেত্রে যে নামাজ ভঙ্গ করার নিয়ত করা হয়েছে তা শরিয়ত বিরোধী হওয়ার কারণে বাতিল হয়ে যাবে। তাই তা ধর্তব্য হবে না।

قَوْلُهُ وَمَنْ شَكَّ فِيْ صَلَاتِهِ الخ : যদি কোনো মুসল্লীর নিজ নামাজে সন্দেহ হয় যে, তিন রাকআত হয়েছে না চার রাকআত হয়েছে? আর সে এই প্রথম বার এরূপ সন্দেহের সম্মুখীন হয়েছে তাহলে সে নতুন করে নামাজ পড়ে নিবে। দলিল হিদায়া গ্রন্থকার কর্তৃক উল্লিখিত হাদীস। اَوَّلُ مَا عَرَضَ لَهُ এ ইবারতের দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

এ সম্পর্কে কোনো কোনো শায়খ বলেছেন যে, এর মর্ম হল, ভুল হওয়া তার আদত বা অভ্যাস নয়; বরং কখনও কখনও ভুল হয়ে থাকে। এ মর্ম নয় যে, জীবনে তার কখনও ভুল হয়নি এটিই প্রথম ভুল। এটি শামসুল আয়িম্মা সারাখসী (র.)-এর মত।

ফখরুল ইসলাম বযদবী (র.) বলেছেন, এর মর্ম হলো ঐ নামাজের প্রথম ভুল। কেউ কেউ বলেছেন যে, এরমর্ম হল, এটিই জীবনের প্রথম ভুল, বয়ঃসপ্রাপ্ত হওয়ার পর কখনো তার নামাজে ভুল হয়নি। এটিই অগ্রগণ্য। (জামীল আহমদ)

وَاِنْ كَانَ يَعْرِضُ لَهُ كَثِيْرًا بَنٰى عَلٰى اَكْبَرِ رَأْيِهٖ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ شَكَّ فِىْ صَلَاتِهٖ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ رَأْىٌ بَنٰى عَلَى الْيَقِيْنِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ شَكَّ فِىْ صَلَاتِهٖ فَلَمْ يَدْرِ اَثَلٰثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا بَنٰى عَلَى الْاَقَلِّ وَالْاِسْتِقْبَالُ بِالسَّلَامِ اَوْلٰى لِاَنَّهٗ عُرِفَ مُحَلِّلًا دُوْنَ الْكَلَامِ وَمُجَرَّدُ النِّيَّةِ تَلْغُوْ وَعِنْدَ الْبِنَاءِ عَلَى الْاَقَلِّ يَقْعُدُ فِىْ كُلِّ مَوْضِعٍ يُتَوَهَّمُ اٰخِرَ صَلَاتِهٖ كَيْلَا يَصِيْرَ تَارِكًا فَرْضَ الْقَعْدَةِ ـ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : আর যদি এ অবস্থা তার বহুবার হয়ে থাকে তাহলে সে নিজের প্রবল ধারণার ভিত্তিতে বিনা করবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার নামাজে সন্দিহান হয়ে পড়ে, সে যেন চিন্তার মাধ্যমে কোনটি সঠিক তা সাব্যস্ত করে। আর যদি তার কোনো ধারণা না থাকে, তাহলে নিম্ন সংখ্যার উপর নির্ভর করবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার নামাজে সন্দিহান হয়ে পড়ে, ফলে সে বলতে পারে না যে, তিন রাকআত পড়েছে না চার রাকআত পড়েছে, তাহলে সে কম-এর উপর নির্ভর করবে। আর সালাম দ্বারা (সন্দেহগ্রস্ত নামাজ শেষ করে) নতুন নামাজ শুরু করা উত্তম। কেননা সালামই নামাজ সমাপ্তকারী রূপে পরিচিত, কথাবার্তা দ্বারা নয়। সালাত বাতিল করার নিয়তে বাতিল বলে গণ্য হবে। আর কম সংখ্যার উপর নির্ভর করার সুরতে যে রাকআতকে নামাজের শেষ রাকআত হিসাবে ধারণা করা হবে এমন প্রত্যেক স্থানে বসবে, যেন সে ফরজ বৈঠক তরককারী না হয়। আল্লাহই উত্তম জানেন

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা, যদি আদায়কৃত নামাজের পরিমাণের ব্যাপারে অধিক সন্দেহ হয় তাহলে এর দুই সুরত– কোনো এক দিকে প্রবল ধারণা হবে অথবা হবে না। যদি প্রবল ধারণা হয় তাহলে সে মুতাবেক আমল করবে। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَرِّ الصَّوَابَ وَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ـ

অর্থ– যদি তোমাদের কেউ নামাজে সন্দিহান হয় তাহলে সে সঠিক তথ্যের জন্য চিন্তা-ভাবনা করবে এবং চিন্তা-ভাবনাও প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করবে। তারপর সালাম ফিরাবে এবং দু'টি সাজদায়ে সাহু দিবে। যুক্তি-ভিত্তিক দলিল হলো যে, যদি প্রতিবার নামাজ পুনরায় পড়ার হুকুম দেওয়া হয় তাহলে জটিলতা এবং সংকীর্ণতা সৃষ্টি হবে। এজন্য এই জটিলতা বা সংকীর্ণতা দূর করার লক্ষ্যে প্রবল ধারণার উপর আমল করবে। আর যদি তার কোনো দিকে প্রবল ধারণা না হয় তাহলে কম সংখ্যার উপর নির্ভর করবে অর্থাৎ তিন রাকআত ধারণা করা হবে। দলিল রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ شَكَّ فِىْ صَلَاتِهٖ فَلَمْ يَدْرِ اَثَلٰثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا بَنٰى عَلَى الْاَقَلِّ ـ

ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীস নিম্নোক্ত শব্দে নকল করেছেন,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَهٰى اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهٖ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلّٰى اَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلٰى وَاحِدَةٍ فَاِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلّٰى اَوْ ثَلٰثًا فَلْيَبْنِ عَلٰى ثِنْتَيْنِ فَاِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلٰثًا صَلّٰى اَوْ اَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلٰى ثَلٰثٍ ـ

وَالْاِسْتِقْبَالُ بِالسَّلَامِ -এর দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হলো যদি নতুনভাবে নামাজ পড়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে সন্দেহযুক্ত নামাজ সালামের দ্বারা ভেঙ্গে দেওয়া উত্তম, কথাবার্তা দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে দেওয়া উত্তম নয়। কেননা শরিয়তে সালামকে মুহালালল (محلل) বা নামাজ সমাপ্তকারী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কথাবার্তাকে নামাজ সমাপ্তকারী হিসাবে গণ্য করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে কথাবার্তা নামাজকে ফাসিদ বা বাতিল করে দেয়। রাসূল ﷺ বলেছেন تَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ। সালাম মুসল্লীকে নামাজ থেকে বৈধভাবে বের করে দেয়। তাই সালাম দিয়ে নামাজ থেকে বের হওয়া উত্তম, কথাবার্তা দ্বারা নয়। যদি শুধু নামাজ থেকে বের হওয়ার নিয়ত করে তাহলে নামাজ ভঙ্গকারী আমল না পাওয়ার কারণে তার নামাজ ভঙ্গ হবে না এবং তার কোনো প্রভাব নামাজের উপর পড়বে না।

قَوْلُهُ وَعِنْدَ الْبِنَاءِ عَلَى الْاَقَلِّ الخ ঃ এ ইবারতের সারকথা হলো, কম এর উপর নির্ভর করার সুরতে বৈঠক করবে এবং তাশাহহুদ পড়বে যেমন রুবাই (رباعى) বা চার রাকআত নামাজে সন্দেহ হয়েছে যে, এটা প্রথম রাকআত না দ্বিতীয় রাকআত এবং কোনো দিকে তার প্রবল ধারণা নেই, তাহলে একে প্রথম রাকআত ধরে নিবে। তবে তা পুরা করার পর বৈঠক করবে। কেননা এতে সম্ভাবনা আছে যে, এটা তার দ্বিতীয় রাকআত, আর দ্বিতীয় রাকআতে বৈঠক করা ওয়াজিব। এ জন্য প্রথম রাকআত পুরা করে বৈঠক করবে তারপর দাঁড়াবে, অতঃপর দ্বিতীয় রাকআত পড়ে বৈঠক করবে। কেননা মুসল্লী একে দ্বিতীয় রাকআতের হুকুমে ধরে নিয়েছে। অতঃপর দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাকআত পড়ে বৈঠকে করবে। কেননা হতে পারে যে, এটিই চতুর্থ রাকআত। আর চতুর্থ রাকআতের মাথায় বৈঠক করা ফরজ। তারপর চতুর্থ রাকআত পড়ে শেষ বৈঠক করবে। কেননা এটা মুসল্লীর মতে চতুর্থ রাকআতের হুকুমে, আর চতুর্থ রাকআতে বৈঠক করা ফরজ।

সারকথা হলো যে, ফরজ বৈঠক এবং ওয়াজিব বৈঠক ছুটে যাওয়ার আশংকার ভিত্তিতে প্রত্যেক রাকআতের মাথায় বৈঠক করবে। যার সূরত অধম বর্ণনা করেছে। আল্লাহই ভাল জানেন। (জামীল আহমদ)

بَابُ صَلٰوةِ الْمَرِيْضِ

إِذَا عَجَزَ الْمَرِيْضُ عَنِ الْقِيَامِ صَلّٰى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى الْجَنْبِ تُوْمِي إِيْمَاءً وَلِأَنَّ الطَّاعَةَ بِحَسْبِ الطَّاقَةِ.

পরিচ্ছেদ : অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ

অনুবাদ : অসুস্থ ব্যক্তি যখন দাঁড়াতে অক্ষম হয়, তখন সে বসে রুকু সিজদা করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা.)-কে বলেছেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে। যদি তা না পার তবে বসে পড়বে। যদি তা না পার তবে পার্শ্বের উপর শয়ন করে ইঙ্গিতের মাধ্যমে পড়বে। তা ছাড়া যুক্তি হলো, ইবাদত সামর্থ্য অনুযায়ী হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : صلوة -এর اضافت - مريض -এর দিকে إِضَافَةُ الْفِعْلِ إِلَى الْفَاعِلِ -এর অন্তর্ভুক্ত। হিদায়া গ্রন্থকার অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের আলোচনা سجود سهو -এরপর এ জন্য করেছেন যে, سهو ও مريض উভয়টি عوارض سماويه তথা আসমানী অবস্থাদির অন্তর্ভুক্ত। আর سهو যেহেতু আম তথা ব্যাপক যা অসুস্থ সুস্থ সকলকে শামিল করে এ জন্য سجدہ سهو -এর আলোচনা পূর্বে করেছেন আর নামাজের আলোচনা পরে করেছেন।

মাসআলা : অসুস্থ ব্যক্তি যদি দাঁড়াতে অক্ষম হয়, অর্থাৎ দাঁড়ালে সুস্থতা বিলম্বে হাসিল হওয়ার ভয় আছে কিংবা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে দুর্বল হয়ে যাওয়ার ভয় হয় কিংবা দাঁড়াতে ব্যথা লাগে এ ধরনের ব্যক্তির জন্য কিয়ামকে তরক করা জায়েজ আছে এবং এ ব্যক্তি বসে বসে রুকু সিজদা দ্বারা নামাজ আদায় করবে। দলিল হলো, হযরত ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা.) -এর হাদীস, قَالَ كَانَتْ بِيْ بَوَاسِيْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ. ইমাম নাসায়ী (র.) এ শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা.) বলেন, আমার بواسير -এর রোগ ছিল। (بواسير বলা হয় অর্শ্ব রোগকে) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ অবস্থায় নামাজ পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে। যদি তা না পার তবে বসে আদায় কর। আর যদি তাও না পার তবে পার্শ্বে শয়ন করে আদায় কর। যদি তাও না পার তবে চিৎ হয়ে শুয়ে আদায় কর। আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না। হিদায়া গ্রন্থকার আকলী দলিল বয়ান করতে গিয়ে উক্ত বাক্যটির (لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) সার-সংক্ষেপ বলেছেন। সুতরাং গ্রন্থকার বলেন, طَاعَتٌ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ অর্থাৎ ইবাদত সামর্থ্য অনুযায়ী হয়ে থাকে। যার যতটুকু সম্ভব এবং যখন সম্ভব তা সে তখন ঐ পরিমাণ আদায় করবে।

ফায়দা : যদি অসুস্থ ব্যক্তি সামান্য দাঁড়াতে সক্ষম হয় যেমন, এক আয়াত বা তাকবীর বলা পরিমাণ, পুরো দাঁড়াতে পারে না। তবে তাকে এ পরিমাণ দাঁড়ানোর-ই নির্দেশ দেওয়া হবে। যখন অপারগ হয়ে যাবে তখন বসে যাবে। কেননা সামর্থ্য অনুযায়ী ইবাদত হয়ে থাকে। এমনিভাবে যদি সে কোনো জিনিসের উপর ঠেস দিয়ে বা কোনো লাঠির উপর ভর করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। তবে তার জন্য দাঁড়ানোকে বর্জন করা জায়েজ হবে না।

قَالَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ أَوْمَى إِيْمَاءً يَعْنِى قَاعِدًا لِأَنَّهُ وَسْعُ مِثْلِهِ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُمَا فَأَخَذَ حُكْمَهُمَا وَلَا يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ فَاسْجُدْ وَإِلَّا فَأَوْمِ بِرَأْسِكَ وَإِنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ وَهُوَ يَخْفِضُ رَأْسَهُ أَجْزَأَهُ لِوُجُودِ الْإِيْمَاءِ وَإِنْ وَضَعَ ذَٰلِكَ عَلَى جَبْهَتِهِ لَا يُجْزِيهِ لِانْعِدَامِهِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি রুকু সিজদা করতে না পারে তাহলে ইশারায় তা আদায় করবে। অর্থাৎ বসা অবস্থায় (ইশারায় রুকু সিজ্দা করবে)। কেননা এতটুকু করার সামর্থ্য তার রয়েছে। তবে সিজ্দার ইশারাকে রুকুর ইশারার তুলনায় অধিক অবনমিত করবে। কেননা ইশারা হলো রুকু-সিজ্দার স্থলবর্তী। রুকু-সিজ্দার হুকুম গ্রহণ করবে। সিজ্দা করার জন্য কোনো কিছু কপালের সামনে উঁচু করে ধরা হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ فَاسْجُدْ وَإِلَّا فَأَوْمِ بِرَأْسِكَ যদি তুমি জমিনে সিজদা করতে পার তবে সিজ্দা করো। অন্যথায় মাথা দিয়ে ইশারা করো। আর যদি কিছু তুলে ধরা হয় এবং সেই সাথে আপন মাথাও কিঞ্চিত অবনত করে, তবে ইশারা আদায় যাওয়ার কারণে তা যথেষ্ট হবে। আর যদি উক্ত উত্তোলিত বস্তুকে কপালের উপর শুধু স্থাপন করে তবে ইশারা না হওয়ার কারণে তা যথেষ্ট হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, যদি কেউ রুকু-সিজদা করতে অক্ষম হয় তবে বসে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা আদায় করবে। কেননা এ সময় তার এটুকুই শক্তি আছে। আর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবাদত শক্তি অনুযায়ী হয়ে থাকে। তবে সিজ্দার ইশারা রুকুর ইশারার তুলনায় কিছুটা নিচু হবে। অর্থাৎ সিজ্দার ইশারার সময় মাথা তুলনামূলক কিছুটা বেশি নিচু করবে। দলিল হলো, ইশারা হলো রুকু ও সিজ্দার স্থলবর্তী। তাই এতেও রুকু ও সিজ্দার হুকুমে হবে। আর যেহেতু হাকীকী সিজ্দায় হাকীকী রুকুর তুলনায় একটু বেশি অবনমিত হতে হয় তাই সিজ্দার ইশারাও রুকুর ইশার তুলনায় নিচু হবে। শায়খ আবুল হাসান কুদূরী (র.) বলেন, সিজ্দা করার জন্য কোনো জিনিসকে মাথার দিকে উঠাবে না। দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী- إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ فَاسْجُدْ وَإِلَّا فَأَوْمِ بِرَأْسِكَ ইমাম বায্যায (র.) তার মুসনাদের মধ্যে উক্ত হাদীসটির শব্দমালা এভাবে নকল করেছেন যে,

عَنْ جَابِرٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ مَرِيضًا فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا فَأَخَذَ عُودًا لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهَا وَقَالَ صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيْمَاءً وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ

হযরত জাবির (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক অসুস্থ ব্যক্তির সেবার জন্য তাশরীফ নিয়েছিলেন। গিয়ে দেখলেন, সে বালিশের উপর নামাজ আদায় করছে। তিনি বালিশটি ছুড়ে ফেলে দিলেন। অতঃপর সে একখণ্ড খড়ি নিল তাতে নামাজ আদায় করার জন্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাও ছুড়ে ফেললেন। আর বললেন, যদি সক্ষম হও তবে জমিনের উপর নামাজ পড়ো, আর যদি সক্ষম না হও, তবে ইশারা করো এবং রুকুর তুলনায় সিজদাতে অবনমিত একটু বেশি হবে। এ হাদীসটি এ কথার উপর প্রযোজ্য যে, অসুস্থ ব্যক্তিটি বালিশ উঠিয়ে মাথার সাথে লাগাচ্ছিল আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা থেকে বারণ করলেন। সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল সিজদার জন্য কোনো কিছুকে মাথা পর্যন্ত উঠানো জায়েজ নেই। হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, অসুস্থ ব্যক্তি যদি বালিশ উঠিয়ে কপালের সাথে লাগায় তবে তার দুঅবস্থা রয়েছে। সে সিজ্দার জন্য মাথা নিচু করবে অথবা নিচু করবে না। যদি নিচু করে তবে তা যথেষ্ট হবে। কেননা মাথা নত করার দ্বারা ইশারা পাওয়া গিয়েছে। আর এটাই তার উপর ফরজ, তবে এরূপ করা মাকরূহ। আর যদি বালিশ উঠিয়ে মাথার সাথে লাগায় আর মাথা একদম নত না করে, তবে এর দ্বারা রুকু-সিজ্দা আদায় হবে না। কেননা এ সুরতে ইশারা পাওয়া যায়নি অথচ ইশারাই তার উপর ফরজ ছিল।

وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْقُعُودَ اِسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ أَوْمَى بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى قَفَاهُ يُومِئُ إِيمَاءً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاللّٰهُ تَعَالَى أَحَقُّ بِقَبُولِ الْعُذْرِ مِنْهُ وَإِنِ اسْتَلْقَى عَلَى جَنْبِهِ وَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ جَازَ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ إِلَّا أَنَّ الْأَوْلَى هُوَ الْأَوْلَى عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِأَنَّ إِشَارَةَ الْمُسْتَلْقِي تَقَعُ إِلَى هَوَاءِ الْكَعْبَةِ وَ إِشَارَةَ الْمُضْطَجِعِ عَلَى جَنْبِهِ إِلَى جَانِبِ قَدَمَيْهِ وَبِهِ تَتَأَدَّى الصَّلٰوةُ .

অনুবাদ : আর যদি বসতে না পারে তবে পিঠের উপর চিত হয়ে শুইবে এবং দু'পা কিবলামুখী করবে এবং ইশারায় রুকু-সিজদা করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে, যদি তা না পারে তাহলে বসে আদায় করবে, যদি তা না পারে তাহলে চিত হয়ে ইশারায় আদায় করবে। যদি তাও না পারে তাহলে আল্লাহ তা'আলাই তার ওজর কবুল করার অধিক হকদার। আর যদি পার্শ্বের উপর কাৎ হয়ে শয়ন করে আর তার চেহারা কিবলামুখী থাকে তবে তা জায়েজ হবে। প্রমাণ হলো ইতঃপূর্বে আমাদের বর্ণিত (ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা.)-এর) হাদীস। কিন্তু আমাদের মতে প্রথম সুরতটি উত্তম। ইমাম শাফি'ঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা চিত হয়ে শয়নকারী ব্যক্তির ইশারা কা'বা শরীফের অভিমুখী হয়। পক্ষান্তরে পার্শ্বের উপর কাৎ হয়ে শয়নকারী ব্যক্তির ইশারা তার পদদ্বয় অভিমুখী হয়। অবশ্য এ অবস্থায়ও নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি অসুস্থ ব্যক্তি বসতে না পারে তবে পিঠের উপর চিত হয়ে শুইবে এবং মাথার নিচে উঁচু করে একটি বালিশ রাখবে যাতে বসার সাদৃশ্য হয়ে যায় এবং ইশারায় রুকু-সিজদা করা সম্ভব হয়। কেননা এ ছাড়া সুস্থ ব্যক্তিও ইশারা করতে সক্ষম নয়, অসুস্থ ব্যক্তির ইশারা করার প্রশ্নই আসে না এবং দু'পা কিবলামুখী করবে আর ইশারায় রুকূ ও সিজদা করবে। দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী–

يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى قَفَاهُ يُومِئُ إِيمَاءً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاللّٰهُ تَعَالَى أَحَقُّ بِقَبُولِ الْعُذْرِ مِنْهُ .

উক্ত হাদীসের শেষাংশ فَاللّٰهُ تَعَالَى أَحَقُّ بِقَبُولِ الْعُذْرِ مِنْهُ -এর ব্যাখ্যায় আলিমগণের মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ইশারা করতে সক্ষম না থাকা অবস্থায়ও কাযা রহিত হবে না। তবে নামাজকে বিলম্ব করা যাবে। সুস্থ হলে এর কাজা আদায় করে নিবে। এ সকল আলিমগণের মতে উক্ত অংশের ব্যাখ্যা হবে, আল্লাহ তা'আলা عذر تاخير তথা বিলম্বের ওজরকে কবুল করার অধিক হকদার। আর কারো মতে এ অবস্থায় কাযা রহিত হয়ে যাবে। তাদের মতে উক্ত অংশের ব্যাখ্যা হবে আল্লাহ তা'আলা عذر اسقاط -কে কবুল করার অধিক হকদার, ইনায়া গ্রন্থকার এ মতকে اصح (বিশুদ্ধতম) বলেছেন।

وَإِنِ اسْتَلْقَى عَلَى جَنْبِهِ কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, অসুস্থ ব্যক্তি যদি পার্শ্বের উপর কাৎ হয়ে শয়ন করে আর তার চেহারা কিবলামুখী থাকে তবে তা জায়েজ হবে। দলিল হলো ইতঃপূর্বে আমাদের বর্ণিত ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা.) -এর হাদীস। তা ছাড়া আল্লাহর বাণী– يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ও উপরের মাসআলার প্রমাণ বহন করে। মোদ্দাকথা, ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা.)-এর হাদীস فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى الْجَنْبِ تُومِئُ إِيمَاءً এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের হাদীস فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى قَفَاهُ يُومِئُ إِيمَاءً পরস্পর বিপরীতমুখী। কেননা ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা.)-এর হাদীসের মধ্যে পার্শ্বের উপর শয়ন করে নামাজ আদায় করার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের হাদীসে চিৎ হয়ে নামাজ আদায় করার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর অসুস্থ ব্যক্তির হালাত হলো ওজরের হালাত, এ জন্য উপরোক্ত উভয় হালাতেই নামাজ পড়া জায়েজ। তবে উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। আমাদের মতে চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ পড়া উত্তম, আর ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে পার্শ্বের উপর কাৎ হয়ে শয়ন করে নামাজ পড়া উত্তম। আমাদের মতের কারণ হলো, চিত হয়ে শয়নকারী ব্যক্তির ইশারা কা'বা শরীফের দিকে হয়। পক্ষান্তরে পার্শ্বের উপর কাৎ হয়ে শয়নকারী ব্যক্তির ইশারা তার পদদ্বয়ের দিকে হয়। অবশ্য তা দ্বারাও নামাজ জায়েজ হয়ে যাবে।

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْإِيْمَاءَ بِرَأْسِهِ أُخِّرَتْ عَنْهُ وَلَا يُوْمِي بِعَيْنَيْهِ وَلَا بِقَلْبِهِ وَلَا بِحَاجِبَيْهِ خِلَافًا لِزُفَرَ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَلِأَنَّ نَصْبَ الْإِبْدَالِ بِالرَّأْيِ مُمْتَنِعٌ وَلَا قِيَاسَ عَلَى الرَّأْسِ لِأَنَّهُ يَتَأَدّٰى بِهِ رُكْنُ الصَّلٰوةِ دُوْنَ الْعَيْنِ وَأُخْتَيْهَا وَقَوْلُهُ أُخِّرَتْ عَنْهُ إِشَارَةٌ إِلٰى أَنَّهُ لَا تَسْقُطُ الصَّلٰوةُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ الْعَجْزُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِذَا كَانَ مُفِيْقًا وَهُوَ الصَّحِيْحُ لِأَنَّهُ يَفْهَمُ مَضْمُوْنَ الْخِطَابِ بِخِلَافِ الْمُغْمٰى عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ : যদি অসুস্থ ব্যক্তি মাথা দিয়ে ইশারা করতে সক্ষম না হয় তবে তার নামাজ বিলম্বিত হবে। কিন্তু চোখ দ্বারা, অন্তর দ্বারা বা চোখের ভ্রু দ্বারা ইশারা করা যাবে না। ইমাম যুফার (র.) -এর এ থেকে ভিন্নমত রয়েছে। আমাদের দলিল হলো ইতঃপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস। তা ছাড়া যুক্তি হলো, নিজস্ব মত দ্বারা স্থলবর্তী নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আর মাথা দিয়ে ইশারা-এর উপর কিয়াস করাও সঙ্গত নয়। কেননা মাথা দ্বারা নামাজের রুকন আদায় করা হয় অথচ চোখ বা অপর দু'টি দ্বারা তা করা যায় না। "নামাজ বিলম্বিত করা" হবে– ইমাম কুদূরীর এ বক্তব্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাজের ফরজ তার থেকে রহিত হবে না। যদিও অক্ষমতা একদিন এক রাত্রের বেশি হয়; আর সে সজ্ঞানে থাকে। এটিই বিশুদ্ধ মত। কেননা সে শরিয়তের সম্বোধন উপলব্ধি করতে পারে। অজ্ঞান লোকের বিষয়টি এর বিপরীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শায়খ আবুল হাসান কুদূরী (র.) বলেন, রোগ যদি এমন বেড়ে যায় যে মাথা দ্বারা ইশারা করার শক্তিও না থাকে, তবে নামাজ বিলম্ব করে দিবে অর্থাৎ পরে আদায় করবে। কিন্তু চক্ষুদ্বয়, অন্তর এবং চোখের ভ্রু দ্বারা ইশারা করা যথেষ্ট নয়। ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ ধরনের ব্যক্তি তার চোখ এবং অন্তর দ্বারা ইশারায় নামাজ আদায় করবে এবং সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় তা পড়বে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এরও অনুরূপ অভিমত। আমাদের দলিল ঐ হাদীস যা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ فَاسْجُدْ وَإِلَّا فَأَوْمِ بِرَأْسِكَ উক্ত হাদীসের মধ্যে مقام بيان -এর স্থানে আলোচনাকে মাথার উপর সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। মাথা ব্যতীত যদি অন্য কোনো অঙ্গ দ্বারা ইশারা করা জায়েজ হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই তা বয়ান করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়ান না করা জায়েজ না হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

আকলী দলিল হলো, ইশারা হলো মূলত রুকু ও সিজদার বদল। আর বদলকে রায় দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। হাদীসের মধ্যে শুধু মাথা দিয়ে ইশারা করার বর্ণনা রয়েছে, চোখ ইত্যাদি দ্বারা ইশারা করার বর্ণনা নেই। সুতরাং যদি এগুলো দ্বারা ইশারা করার ইজাযত দেওয়া হয় তবে বদলকে রায় দ্বারা নির্ধারণ করা লাযিম আসে, যা জায়েজ নেই। এ জন্য চোখ ইত্যাদি দ্বারা ইশারা করা জায়েজ হবে না। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মতো দ্বারা বদলকে নির্ধারণ করা নয়; বরং এখানে তো মাথার হুকুমের উপর কিয়াস করা হয়েছে। অর্থাৎ যেমনিভাবে মাথা দ্বারা ইশারা করা রুকু ও সিজদার জন্য যথেষ্ট, এমনিভাবে চোখ ইত্যাদি দ্বারা ইশারা করাও যথেষ্ট হওয়া উচিত। তবে এর জবাব হলো, চোখ ইত্যাদিকে মাথার উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা মাথা দ্বারা নামাজের একটি রুকন তথা সিজদা আদায় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে চোখ, অন্তর এবং ভ্রু দ্বারা সিজ্দা আদায় করা যায় না। অর্থাৎ উক্ত তিন অঙ্গের সিজ্দা আদায় করার ক্ষেত্রে কোনো দখল নেই। সুতরাং এ ধরনের পার্থক্য থাকা অবস্থায় একটাকে অপরটির উপর কিভাবে কিয়াস করা সহীহ হবে?

কুদূরীর ইবারত– اخرت عنه দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ ধরনের অসুস্থ ব্যক্তি থেকে নামাজের ফরজ রহিত হবে না; বরং নামাজ তার জিম্মায় বাকি থাকবে। সুস্থ হওয়ার পর তার কাজা করা ওয়াজিব হবে। যদি এ অবস্থা একদিন এক রাতের বেশি হয়, তবে শর্ত হলো ঐ সময়ে অসুস্থ ব্যক্তির হুঁশ থাকতে হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা এ অসুস্থ ব্যক্তি যখন হুঁশ অবস্থায় আছে তখন সে নামাজের আদায়ের হুকুমকে বুঝে। আর যখন সে হুকুম বুঝে তখন হুকুম তার উপর আবর্তিত হয় যার দ্বারা তার উপর আদায় ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে ওজরের কারণে তাকে সাথে সাথে আদায় করা থেকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে। যাতে তার পূর্ণ শক্তি অর্জন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি একদিন ও রাতের অধিক বেহুঁশ থাকে, তখনতো সে সম্বোধন উপলব্ধি করা থেকে অপারগ। তাই এ অবস্থায় নামাজ তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, অসুস্থ অবস্থায় মাথা দ্বারা ইশারা করতেও যদি সক্ষম না হয় আর তা একদিন ও রাতের অধিক হয়, তখন তার উপর কাজা ওয়াজিব নয়। আর একদিন ও রাতের কম হলে কাজা ওয়াজিব হবে।

وَاِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ لَمْ يَلْزَمِ الْقِيَامُ وَيُصَلِّى قَاعِدًا يُوْمِىْ اِيْمَاءً لِاَنَّ رُكْنِيَّةَ الْقِيَامِ لِلتَّوَسُّلِ بِهِ اِلَى السَّجْدَةِ لِمَا فِيْهَا مِنْ نِهَايَةِ التَّعْظِيْمِ فَاِذَا كَانَ لَايَتَعَقَّبُهُ السُّجُوْدُ لَايَكُوْنُ رُكْنًا فَيَتَخَيَّرُ وَالْاَفْضَلُ هُوَ الْاِيْمَاءُ قَاعِدًا لِاَنَّهُ اَشْبَهُ بِالسُّجُوْدِ وَاِنْ صَلَّى الصَّحِيْحُ بَعْضَ صَلَاتِهِ قَائِمًا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ مَرَضٌ اَتَمَّهَا قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ اَوْ يُوْمِىْ اِنْ لَمْ يَقْدِرْ اَوْ مُسْتَلْقِيًا اِنْ لَمْ يَقْدِرْ لِاَنَّهُ بَنَى الْاَدْنٰى عَلَى الْاَعْلٰى فَصَارَ كَالْاِقْتِدَاءِ ـ

অনুবাদ : যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয় কিন্তু রুকূ-সিজদা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে কিয়াম করা জরুরি নয়; বরং বসে ইশারায় (রুকূ-সিজদা করে) নামাজ আদায় করবে। কেননা কিয়াম রুকন হয়েছে সিজদায় যাওয়ার মাধ্যম হিসাবে। কারণ, কিয়াম থেকে সিজ্‌দায় যাওয়ার মধ্যে চূড়ান্ত তাজীম প্রকাশ পায়। সুতরাং কিয়ামের পরে সিজদা না হলে তা রুকন রূপে গণ্য হবে না। সুতরাং অসুস্থ ব্যক্তিকে ইখ্‌তিয়ার দেওয়া হবে। তবে উত্তম হলো বসা অবস্থায় ইশারা করা। কেননা তা সিজ্‌দার সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। সুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আংশিক নামাজ আদায় করার পর যদি অসুস্থতা দেখা দেয় তাহলে বসে রুকূ-সিজদা করে নামাজ পূর্ণ করবে। আর অক্ষম না হলে ইশারা দ্বারা আদায় করবে। আর (বসতে) সক্ষম না হলে চিত হয়ে শুয়ে আদায় করবে। কেননা সে নিম্নস্তরকে উচ্চস্তরের উপর "বিনা" করেছে। সুতরাং এটা ইকতিদার মতো হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি এমন রোগাক্রান্ত হয় যে, দাঁড়াত সক্ষম কিন্তু রুকূ-সিজ্‌দায় সক্ষম নয়। তখন তার দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা জরুরি নয়; বরং বসে ইশারায় নামাজ আদায় করবে। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয় কিন্তু রুকূ ও সিজদায় সক্ষম না হয় তাহলে তার জিম্মা থেকে কিয়াম রহিত হয় না। তাঁদের দলিল হলো, কিয়াম হলো রুকন, আর অসুস্থ ব্যক্তি তা থেকে অক্ষম নয়; বরং অন্যান্য রুকন তথা রুকূ ও সিজ্‌দা থেকে অপারগ। তাই রুকূ ও সিজ্‌দায় অপারগ হওয়ার কারণে কিয়াম তার জিম্মা থেকে কিভাবে রহিত হবে? আমাদের দলিল হলো, কিয়াম শুধু এ কারণে রুকন যে, তা সিজ্‌দা আদায়ের অসিলা হয়। আর কিয়াম সিজ্‌দা আদায়ের রুকন হলো এ কারণে যে, কিয়ামের পর সিজ্‌দা করার দ্বারা অধিক তাজীম প্রকাশ পায়। সুতরাং কিয়ামের পর সিজ্‌দা না হলে কিয়াম রুকনই থাকবে না। আর ঐ অবস্থায় যখন কিয়াম রুকন থাকল না তখন অসুস্থ মুসল্লীর কিয়াম করা আর না করার মধ্যে ইখতিয়ার থাকবে। তবে উত্তম হলো বসে ইশারায় রুকূ-সিজদা আদায় করবে। কেননা বসে ইশারায় সিজদা করা হাকীকী সিজদার অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা বসে সিজ্‌দা করার সময় মাথা জমিনের অধিক নিকটবর্তী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে দাঁড়িয়ে ইশারা করার দ্বারা এমনটি হয় না।

وَاِنْ صَلَّى الصَّحِيْحُ الخ মাসআলা হলো, যদি সুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আংশিক নামাজ আদায় করার পর এমনভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, তার আর দাঁড়াবার ক্ষমতা থাক না, তবে যদি সে রুকূ-সিজদা করতে সক্ষম হয় তাহলে বসে রুকূ-সিজ্‌দা করে নামাজ পূর্ণ করবে। আর যদি রুকূ-সিজদা করতে সক্ষম না হয় তবে ইশারায় রুকূ-সিজ্‌দা করে নামাজ পূর্ণ করবে। আর যদি এমন অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, বসতেও না পারে তবে চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ পুরো করবে। দলিল হলো, উপরোক্ত সুরতগুলোতে নিম্নস্তরকে উচ্চস্তরের উপর বিনা করা হয়েছে, আর এমনটি করা জায়েজ। যেমন– নিম্নাবস্থার ব্যক্তির জন্য উচ্চাবস্থার ব্যক্তির পিছনে ইক্‌তিদা জায়েজ। অর্থাৎ যেমনিভাবে বসে নামাজ আদায়কারীর ইক্‌তিদা দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারীর পিছনে জায়েজ। এমনিভাবে নামাজের আংশিক দাঁড়িয়ে অতঃপর ওজরের কারণে পরের অংশ বসে আদায় করাও জায়েজ।

وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لِمَرَضٍ ثُمَّ صَحَّ بَنَى عَلَى صَلٰوتِهٖ قَائِمًا عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ وَ أَبِى يُوْسُفَ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) إِسْتَقْبَلَ بِنَاءً عَلَى اِخْتِلَافِهِمْ فِى الْاِقْتِدَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهٗ وَاِنْ صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهٖ بِاِيْمَاءٍ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ اِسْتَأْنَفَ عِنْدَهُمْ جَمِيْعًا لِاَنَّهٗ لَايَجُوْزُ اِقْتِدَاءُ الرَّاكِعِ بِالْمُوْمِىْ فَكَذَا الْبِنَاءُ وَمَنِ افْتَتَحَ التَّطَوُّعَ قَائِمًا ثُمَّ اَعْيٰى لَابَاْسَ اَنْ يَّتَوَكَّأَ عَلَى عَصًا اَوْ حَائِطٍ اَوْ يَقْعُدَ لِاَنَّ هٰذَا عُذْرٌ وَاِنْ كَانَ الْاِتِّكَاءُ بِغَيْرِ عُذْرٍ يُكْرَهُ لِاَنَّهٗ اِسَاءَةٌ فِى الْاَدَبِ وَقِيْلَ لَايُكْرَهُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِاَنَّهٗ لَوْ قَعَدَ عِنْدَهٗ يَجُوْزُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَكَذَا لَايُكْرَهُ الْاِتِّكَاءُ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ لِاَنَّهٗ لَايَجُوْزُ الْقُعُوْدُ عِنْدَهُمَا فَيُكْرَهُ الْاِتِّكَاءُ وَاِنْ قَعَدَ بِغَيْرِ عُذْرٍ يُكْرَهُ بِالْاِتِّفَاقِ وَتَجُوْزُ الصَّلٰوةُ عِنْدَهٗ وَلَاتَجُوْزُ عِنْدَهُمَا وَقَدْ مَرَّ فِىْ بَابِ النَّوَافِلِ .

অনুবাদ : কোনো ব্যক্তি অসুস্থতা বশত বসে রুকু-সিজদা করে নামাজ শুরু করল। এরপর (নামাজের মাঝেই) সুস্থ হয়ে গেল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সে তার পূর্ববর্তী নামাজের উপরই বিনা করে অবশিষ্ট নামাজ দাঁড়িয়ে আদায় করবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নতুন করে নামাজ শুরু করবে। এ মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো তাদের ইক্তিদা সংক্রান্ত মতপার্থক্য। পূর্বে এর বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। আর যদি আংশিক নামাজ ইশারা দ্বারা আদায় করার পর রুকু সিজদা করতে সক্ষম হয়, তাহলে সকলের মতেই নতুন করে নামাজ শুরু করতে হবে। কেননা ইশারা দ্বারা আদায়কারীর পিছনে রুকু-সিজ্দাকারীর ইক্তিদা করা জায়েজ নয়। সুতরাং বিনাও জায়েজ হবে না। যে ব্যক্তি দাঁড়ানো অবস্থায় নামাজ শুরু করে পরবর্তীতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে লাঠিতে বা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াবে কিংবা বসে যাবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এটা ওজর, বিনা ওজরে হেলান দেওয়া অবশ্য মাকরূহ। কারণ তা আদবের পরিপন্থী। কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা মাকরূহ নয়। কেননা তাঁর মতে বসা জায়েজ আছে। সুতরাং হেলান দেওয়াও মাকরূহ হতে পারে না। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যেহেতু (বিনা ওজরে) বসা জায়েয নেই, সেহেতু হেলান দেওয়াও মকরূহ হবে। যদি (দাঁড়িয়ে নামাজ আরম্ভ করার পর) বিনা ওজরে বসে পড়ে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমেই তা মাকরূহ হবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নামাজ দুরস্ত হবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে দুরস্ত হবে না। নফল অনুচ্ছেদে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : এক ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে বসে রুকু-সিজ্দা দ্বারা আংশিক নামাজ আদায় করল, পরে নামাজের মাঝেই সুস্থ হয়ে গেল এবং কিয়ামের শক্তি ফিরে পেল। শায়খাইন (র.)-এর মতে সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার নামাজের বিনা করবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নতুন করে নামাজ শুরু করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও শায়খাইন (র.)-এর মূল মতপার্থক্য হলো এ ব্যাপারে যে, দাঁড়ানো ব্যক্তির বসা ব্যক্তির পিছনে ইক্তিদা করা জায়েজ কিনা? ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দাঁড়ানো ব্যক্তির ইক্তিদা বসা ব্যক্তির পিছনে জায়েজ নেই। শায়খাইন (র.)-এর মতে জায়েজ আছে। সুতরাং যেহেতু ইমাম মুহাম্মদ

(র.)-এর মতে দাঁড়ানো ব্যক্তির ইক্তিদা বসা ব্যক্তির পিছনে জায়েজ নেই সেহেতু দাঁড়ানো অবস্থার বিনাও বসা অবস্থার উপর জায়েজ নেই। আর শায়খাইন (র.)-এর মতে যেহেতু জায়েজ আছে; সেহেতু দাঁড়ানো অবস্থার নামাজের বিনা বসা অবস্থার নামাজের উপর জায়েজ হবে।

وَإِنْ صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ الخ : এক ব্যক্তি অপারগতার কারণে আংশিক নামাজ ইশারা করে আদায় করল, পরে নামাজের মাঝেই রুকু ও সিজ্‌দার উপর শক্তি পেয়ে গেল, তাহলে আইম্মায়ে ছালাছার মতে শুরু থেকে নামাজ আরম্ভ করবে। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ সুরতেও বিনা করা জায়েজ আছে। দলিল হলো, আমাদের মতে রুকূকারী ব্যক্তির ইক্তিদা ইশারাকারীর পিছনে জায়েজ নেই। আর ইমাম যুফার (র.) -এর মতে জায়েজ আছে। আর বিনা করার অবস্থাও তথৈবচ।

وَمَنِ افْتَتَحَ التَّطَوُّعَ الخ কেউ যদি নফল নামাজ দাঁড়িয়ে শুরু করে অতঃপর কোনো জিনিসের উপর হেলান দেয় তবে এর দুই সুরত হতে পারে। হেলান হয়তো ওজরের কারণে দিয়েছে কিংবা ওজর ছাড়া দিয়েছে। যদি ওজরের কারণে হেলান দিয়ে থাকে এতে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি বিনা ওজরে দিয়ে থাকে তবে কোনো কোনো মাশায়িখ বলেন, উলামায়ে আহ্নাফের সর্বসম্মত অভিমত অনুসারে তা মাকরূহ। কারণ হলো, বিনা ওজরে হেলান দেওয়া আদবের পরিপন্থী এবং বেআদবি, তবে এ বক্তব্যের ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে বিনা ওজরে হেলান দেওয়ার মাঝে পার্থক্য বয়ান করতে হবে। কেননা ইমাম সাহেবের মতে বিনা ওজরে বসা মাকরূহ নয় কিন্তু বিনা ওজরে হেলান দেওয়া মাকরূহ। সুতরাং উভয়ের মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো, শুরুতেই দাঁড়িয়ে নফল আরম্ভ করা আর বসে শুরু করার মধ্যে নফল পড়নেওয়ালার ইখ্তিয়ার আছে। সুতরাং তার এ ইখ্তিয়ার শেষেও বেলা কারাহাত বাকি থাকবে। তবে তার এ ইখ্তিয়ার নেই যে, শুরুতেই নফল নামাজ হেলান দিয়ে শুরু করবে। সুতরাং শুরুতে যখন তার ইখতিয়ার নেই, তখন শেষেও তার ইখতিয়ার বাকি থাকবে না। (পার্থক্য হয়ে গেল) কোনো কোনো মাশায়িখ বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে নামাজের মাঝখানে যদি ওজর ব্যতীত হেলান দেওয়া হয় তবে তা বেলা কারাহাত জায়েজ। দলিল হলো, ইমাম সাহেবের মতে ওজর ব্যতীত নফল নামাজের মাঝখানে বসা মাকরূহ নয়, তাই হেলান দেওয়াও মাকরূহ হবে না। কেননা বসা যা দাঁড়ানোর বিপরীত যখন তা মাকরূহ হলো না তখন হেলান দেওয়া যা দাঁড়ানোর বিপরীত নয় তা অবশ্যই মাকরূহ হবে না। সাহেবাইনের মতে বিনা ওজরে হেলান দেওয়া মাকরূহ। কেননা তাঁদের মতে বিনা ওজরে বসা মাকরূহ, তাই হেলান দেওয়াও মাকরূহ হবে।

وَإِنْ قَعَدَ بِغَيْرِ عُذْرٍ الخ : কোনো ব্যক্তি যদি দাঁড়িয়ে নফল নামাজ আরম্ভ করে পরে বিনা ওজরে বসে যায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তা মাকরূহ হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। আর সাহেবাইনের মতে নামাজ সহীহ-ই হবে না।

উপরোক্ত ইবারতের মধ্যে কিছুটা تسامح হয়েছে। কারণ, উপরোক্ত সুরতে সাহেবাইন عدم جواز-এর প্রবক্তা। আর عدم جواز-কে কারাহাতের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না। তাই সাহেবাইনের মাসলাকের ভিত্তিতে يُكْرَهُ بِالْاِتِّفَاقِ বলা কিভাবে সহীহ হবে? দ্বিতীয় কথা হলো, উপরোক্ত মাসআলা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মাযহাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল: নফল নামাজের মাঝখানে বিনা ওজরে বসা মাকরূহ। অথচ এর পূর্বের মাসআলায় বলা হয়েছিল যে, ইমাম সাহেবের মতে বিনা ওজরে বসা মাকরূহ নয়? এ উভয় বর্ণনায় সামঞ্জস্য বিধান হবে এভাবে যে, মাবসূতের বর্ণনা মতে ইমাম সাহেবের বিশুদ্ধ মত হলো মাকরূহ না হওয়ার। তার অপর একটি মত মাকরূহ হওয়ারও রয়েছে। সুতরাং পূর্বের মাসআলায় বিশুদ্ধ মত আর এ মাসআলায় দ্বিতীয় মতকে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَمَنْ صَلَّى فِي السَّفِيْنَةِ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَالْقِيَامُ أَفْضَلُ وَقَالَا لَا يُجْزِيْهِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَقْدُوْرٌ عَلَيْهِ فَلَا يُتْرَكُ وَلَهُ أَنَّ الْغَالِبَ فِيْهَا دَوَرَانُ الرَّأْسِ وَهُوَ كَالْمُتَحَقِّقِ إِلَّا أَنَّ الْقِيَامَ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ شُبْهَةِ الْخِلَافِ وَالْخُرُوْجُ أَفْضَلُ مَا أَمْكَنَهُ لِأَنَّهُ أَسْكَنُ لِلْقَلْبِ وَالْخِلَافُ فِي غَيْرِ الْمَرْبُوْطَةِ وَالْمَرْبُوْطَةُ كَالشَّطِّ هُوَ الصَّحِيْحُ .

অনুবাদ : কোনো ব্যক্তি নৌকায় (জলযানে) বিনা ওজরে বসে নামাজ পড়লে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা জায়েজ হবে। তবে দাঁড়িয়ে আদায় করা উত্তম। আর সাহেবাইন (র.) বলেন যে, ওজর ছাড়া তা জায়েজ হবে না। কেননা তার কিয়ামের সামর্থ্য আছে। সুতরাং তা পরিত্যাগ করা যাবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, সেখানে মাথা ঘুরানোর সম্ভাবনাই প্রবল; সুতরাং সেটা বাস্তবতুল্য। তবে দাঁড়িয়ে পড়া হলো উত্তম। কেননা তা মতপার্থক্যের সংশয় থেকে ঊর্ধ্বে। আর যতটা সম্ভব নৌকা থেকে বের হয়ে যাওয়াটাই উত্তম। কেননা তা অন্তরের জন্য অধিক প্রশান্তিকর। এ মতপার্থক্য নোঙ্গরহীন নৌকার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে বাঁধা নৌকা নদীর তীরের (ভূমির) মতোই। এটাই বিশুদ্ধ মত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইনায়া গ্রন্থকার লিখেছেন, নৌকায় নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির দু' অবস্থা, হয়তো সে দাঁড়াতে অপারগ হবে কিংবা হবে না। যদি অপারগ হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে। আর যদি অপারগ না হয় তবে দু' অবস্থা, নৌকা বাঁধা অবস্থায় থাকবে অথবা চলমান অবস্থায় থাকে। যদি বাঁধা অবস্থায় থাকে, তবে সকলের মতে বসে নামাজ পড়া জায়েজ হবে না। আর যদি নৌকা চলা অবস্থায় থাকে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কোনো অসুস্থতা ছাড়াই বসে নামাজ পড়া জায়েজ হবে। তবে দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, বিনা ওজরে বসে নামাজ পড়া জায়েজ নেই। একই মাযহাব ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফি'ঈ (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর। সাহেবাইনের দলিল হলো, তার কিয়ামের সামর্থ্য রয়েছে। আর কিয়ামের সামর্থ্য থাকা অবস্থায় কিয়ামকে তরক করা জায়েজ নেই। তাই ঐ সুরতেও কিয়ামকে তরক করা যাবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, নৌকায় চলা অবস্থায় নামাজ পড়া দ্বারা সাধারণত মাথা ঘুরার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। আর প্রবল সম্ভাবনা তা বাস্তবতুল্য। যেমন, পার্শ্বের উপর শোয়াকে হাদাস বলা হয়েছে, কারণ সাধারণত এ অবস্থায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলা হয়ে যাবার কারণে বায়ু নিঃসরণ হয়ে যায়। তাই প্রবলকে বাস্তবতুল্য মনে করে অজু ভেঙ্গে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে এখানেও মাথা ঘুরানোর প্রবল ধারণাকে বাস্তবতুল্য মনে করে বলা হয়েছে যে, যেন এ ব্যক্তি কিয়াম থেকে অপারগ। আর যেহেতু সে কিয়াম থেকে অপারগ তাই বসে নামাজ পড়াতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে ইমাম সাহেবের মতেও দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা উত্তম। কেননা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া তা মতপার্থক্যের সংশয় মুক্ত। অর্থাৎ বসে নামাজ আদায়ের মধ্যে ওলামাদের মতবিরোধ রয়েছে কিন্তু দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যদি সম্ভব হয় তবে নামাজের জন্য নৌকা থেকে বের হওয়া উত্তম। কেননা এর দ্বারা অন্তর অধিক প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু যদি নৌকা থেকে বের হওয়া সম্ভবপর হওয়ার পরও সে বের না হয় এবং নৌকাতেই নামাজ আদায় করে নেয় তবে তাও জায়েজ হয়ে যাবে। গ্রন্থকার আরো বলেন, বিনা ওজরে বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ বা নাজায়েজ এর উপরোক্ত মতবিরোধ ঐ সকল নৌকার ক্ষেত্রে যেগুলো পারে বাঁধা নয় বরং চলমান আছে। আর যে সকল নৌকা কিনারায় বাঁধা অবস্থায় থাকে সেগুলো নদীর কিনারারই সাদৃশ্য। অর্থাৎ যেমনিভাবে ওজর ব্যতীত নদীর কিনারায় বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই, এমনিভাবে বাঁধা নৌকায়ও বিনা ওজরে বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না এটাই হলো সহীহ অভিমত।

وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ أَوْ دُونَهَا قَضٰى وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ لَمْ يَقْضِ وَهٰذَا اِسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَاقَضَاءَ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوْعَبَ الْإِغْمَاءُ وَقْتَ صَلٰوةٍ كَامِلٍ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ فَشَبَهُ الْجُنُونِ وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْمُدَّةَ إِذَا طَالَتْ كَثُرَتِ الْفَوَائِتُ فَيَحْرُجُ فِي الْأَدَاءِ وَإِذَا قَصُرَتْ قَلَّتْ فَلَاحَرَجَ وَالْكَثِيرُ أَنْ تَزِيدَ عَلٰى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي حَدِّ التَّكْرَارِ وَالْجُنُونُ كَالْإِغْمَاءِ كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ بِخِلَافِ النَّوْمِ لِأَنَّ اِمْتِدَادَهُ نَادِرٌ فَيَلْحَقُ بِالْقَاصِرِ ثُمَّ الزِّيَادَةُ تُعْتَبَرُ مِنْ حَيْثُ الْأَوْقَاتِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ التَّكْرَارَ يَتَحَقَّقُ بِهِ وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَيْثُ السَّاعَاتِ هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ـ

অনুবাদ : যদি কোনো ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কিংবা তার চেয়ে কম সময় বেহুঁশ থাকে, তবে সে কাজা আদায় করবে। আর যদি পাঁচ ওয়াক্তের বেশি সময় বেহুঁশ থাকে, তাহলে কাজা পর্যন্ত করবে না। এটা সূক্ষ্ম কিয়াস তথা ইস্‌তিহ্‌সানের সিদ্ধান্ত। আর সাধারণ কিয়াস অনুযায়ী অজ্ঞানতা যদি এক পূর্ণ নামাজের ওয়াক্ত স্থায়ী হয়, তাহলে কাজা ওয়াজিব হবে না। কেননা অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তা পাগল হওয়ার সমতুল্য। ইস্‌তিহ্‌সানের ব্যাখ্যা হলো, সময় দীর্ঘ হলে কাজা নামাজের সংখ্যা বেড়ে যায়, ফলে আদায় করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে সময় সংক্ষিপ্ত হলে কাজা নামাজের সংখ্যা কম হয়। ফলে তাতে কষ্ট হয় না। আর বেশির পরিমাণ হলো কাজা নামাজ একদিন ও একরাতের অধিক হয়ে যাওয়া। কেননা তখন তা পুনরাবৃত্তির গণ্ডিতে প্রবেশ করে। আর পাগল হওয়ার হুকুম অজ্ঞান হওয়ার মতো। আবূ সুলায়মান (র.) এরূপই উল্লেখ করেছেন। ঘুমের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ঘুম এত দীর্ঘ হওয়া বিরল। সুতরাং সেটা সংক্ষিপ্ত ওজরের পর্যায়ভুক্ত বলেই গণ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে বেশির পরিমাণ হিসাব করা হবে নামাজের ওয়াক্ত হিসাবে। কেননা সেটা দ্বারা পুনরাবৃত্তি সাব্যস্ত হয়। আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে সময় হিসাবে। হযরত আলী ও ইবনে ওমর (রা.) থেকে এটাই বর্ণিত হয়েছে। নির্ভুল তথ্য সম্পর্কে আল্লাহই উত্তম জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কোনো ব্যক্তি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় বা তার চেয়ে কম সময় বেহুঁশ থাকে তবে তার কাজা করা ওয়াজিব হবে। আর যদি পাঁচ ওয়াক্তের চেয়ে অধিক সময় বেহুঁশ থাকে তবে কাজা ওয়াজিব হবে না। এটা হলো ইস্‌তিহ্‌সানের সিদ্ধান্ত। আর কিয়াসের চাহিদা হলো, যদি বেহুঁশী এক নামাজের পূর্ণ ওয়াক্ত স্থায়ী হয় তাহলে তার কাজা ওয়াজিব হবে না। এটা ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মালিক (র.)-এরও মত। হানাবেলাদের মতে ফউত হওয়া নামাজের কাজা ওয়াজিব হবে। যদিও এক হাজার নামাজ ফউত হয়। মোটকথা, হানাবেলাদের মতে বেহুঁশীর কারণে ফউত হওয়া নামাজ কম বা বেশি হোক সর্বাবস্থায় কাজা করা ওয়াজিব। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে যদি বেহুঁশী এক নামাজের পূর্ণ ওয়াক্ত স্থায়ী হয় এবং একটি মাত্র নামাজ ফউত হয় তবুও কাজা ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ বেহুঁশীর কারণে ফউত হওয়া নামাজ কম বা বেশি হোক কোনো অবস্থাতেই কাজা ওয়াজিব হবে না। আমাদের ওলামায়ে কেরাম মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে বলেছেন, যদি বেহুঁশীর কারণে ফউত হয়ে যাওয়া নামাজের সংখ্যা কম হয় তবে তার কাজা করা ওয়াজিব। আর যদি বেশি হয় তবে কাজা ওয়াজিব হবে না। হানাবেলাদের দলিল হলো, বেহুঁশী এক ধরনের রোগ। আর রোগের কারণে যত নামাজ ফউত হয় তার

কাজা করা ওয়াজিব। সুতরাং এ সুরতেও কাজা ওয়াজিব হবে। ফউত হওয়া নামাজ যত বেশিই হোক না কেন। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, যদি বেহুঁশী এক নামাজের পূর্ণ ওয়াক্ত স্থায়ী হয় তবে-এতে অপারগতা পাওয়া যায়। আর কারো কারো মতে এটি পাগল- এর সাদৃশ্য হয়ে গেল। সুতরাং তাদের মতে যেমনিভাবে পূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাজের জুনূনী কাজা ওয়াজিব করে না এমনিভাবে বেহুঁশী অবস্থায়ও কাজা ওয়াজিব হবে না। ইস্‌তিহ্‌সানের কারণ যা ওলামায়ে আহনাফের দলিল তা হলো, বেহুঁশীর সময় যত দীর্ঘ হবে ফউত হওয়া নামাজের সংখ্যাও তত বেশি হবে। এখন যদি অনেক ফায়িতা-এর কাজা করার হুকুম দেওয়া হয় তখন সে ব্যক্তি কষ্টের মধ্যে পড়ে যাবে। আর যেহেতু ইসলামি শরিয়ত মানুষের দুঃখ-কষ্টকে লাঘব করার পক্ষে তাই অনেক ফায়িতা-এর কাজা ওয়াজিব হবে না। আর যদি বেহুঁশীর সময় স্বল্প হয় তবে ফউত হওয়া নামাজের সংখ্যাও কম হবে। আর অল্প নামাজের কাজা করাতে যেহেতু কোনো কষ্ট নেই তাই তার কাজা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আহ্‌নাফের দলিলকে এভাবেও বয়ান করা যায় যে, ওজর তিন ধরনের– এক. ممتد তথা দীর্ঘ যেমন– শিশুকাল, সর্বসম্মতিক্রমে এটা ফরযিয়তের প্রতিবন্ধক। দুই. قاصر তথা অসম্পূর্ণ যেমন ঘুম, এটা সর্বসম্মতিক্রমে ফরযিয়তের প্রতিবন্ধক নয়। এমনকি ঘুমের কারণে যদি নামাজ ফউত হয়ে যায় তবে তার কাজা ওয়াজিব। তিন. মাঝামাঝি পর্যায়ের যেমন পাগল ও বেহুঁশী। এগুলো যদি স্থায়ী হয় তবে ممتد-এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তার কাজা রহিত হয়ে যাবে। আর যদি কম হয় তবে قاصر-এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তার কাজা ওয়াজিব হবে। উল্লেখ্য যে, كثير -এর সীমা হলো, ফউত হওয়া নামাজের সংখ্যা একদিন ও রাতের চেয়ে বেড়ে যাওয়া। এমনকি ষষ্ঠ নামাজের ওয়াক্তও পার হয়ে যাওয়া। কেননা ষষ্ঠ নামাজের ওয়াক্ত অতিক্রম করার দ্বারা নামাজের মধ্যে তাকরার শুরু হয়ে যায়। আর তাকরারের পর كثرت হওয়া যাহির-বাহির কথা।

وَالْجُنُونُ كَالْإِغْمَاءِ দ্বারা গ্রন্থকার ইমাম মালেক ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর কিয়াসের জবাব দিয়েছেন। জবাবের হাসিল হলো, اغماء তথা বেহুঁশী জুনূনের মতো নয় বরং جنون হলো اغماء -এর অনুরূপ। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অধিক সময় যদি জুনূন থাকে তবে কাজা রহিত হয়ে যায়। আর যদি কম হয় তবে রহিত হয় না। আবূ সুলাইমান (র.) এটাই উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ঘুম যদি বেশিও হয় তথাপিও কাজা রহিত হবে না। কিন্তু ঘুমের অধিক দীর্ঘ হওয়ার ব্যাপারটি নাদির তথা খুব কমই হয়ে থাকে।

এ জন্য তাকে عذر قاصر -এর সাথে সম্পৃক্ত করা হবে, عذر ممتد -এর সাথে নয়।

ওলামায়ে আহনাফ এ ব্যাপারে একমত যে, كثير -এর সীমা হলো কাজা নামাজের সংখ্যা একদিন ও একরাত থেকে বেড়ে যাওয়া। তবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এ বৃদ্ধি পাওয়াটা مِنْ حَيْثُ الْأَوْقَاتِ না مِنْ حَيْثُ السَّاعَاتِ গ্রহণযোগ্য হবে? ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, مِنْ حَيْثُ الْأَوْقَاتِ গ্রহণযোগ্য হবে অর্থাৎ যদি ছয় নামাজ ফউত হয়ে যায় এবং ষষ্ঠ নামাজের ওয়াক্ত অতিক্রম করে তবে كثرت সাবিত হয়ে যাবে। আর كثرت فوائت -এর কারণে কাজা ওয়াজিব হবে না। আর যদি ষষ্ঠ নামাজের ওয়াক্ত পরিপূর্ণভাবে অতিক্রম না করে; বরং কিছু সময় অতিক্রম করে তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে كثرت সাবিত হবে না এবং তার জিম্মা থেকে কাজা রহিত হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন, "তাকরার" ছয় ওয়াক্ত নামাজের ফউত হওয়া দ্বারাই সাবিত হয়ে যাবে। আর ছয় নামাজের ওয়াক্ত ফউত হওয়াই مفضى الى الحرج-কে আবশ্যক করে যা কাজাকে সাকিতকারীও বটে। এ জন্য كثرت -এর সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নামাজ ফউত হয়ে যাওয়ার বিষয়টিই ধর্তব্য হবে। শায়খাইন (র.) বলেন, كثرت -এর সীমার মধ্যে ساعات -এর ই'তিবার করা হবে; اوقات -এর নয়। অর্থাৎ একদিন ও একরাত থেকে যদি দুই ঘণ্টাও বেশি হয়ে যায় তবে كثرت সাবিত হয়ে যাবে। এটা হযরত আলী এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। উপরোক্ত মতবিরোধের ফলাফল বের হবে এভাবে যে, এক ব্যক্তি চাশ্‌তের সময় থেকেই বেহুঁশ হয়ে গেল। অতঃপর পরের দিন সূর্য হেলে পড়ার এক ঘণ্টা পূর্বেই সে হুশ ফিরে পেল। এখন এটা ساعات হিসাবে একদিন ও একরাতের চেয়ে বেশি। তাই শায়খাইনের মতে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। কেননা এ সুরতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অধিক নামাজ পাওয়া যায়নি। নির্ভুল জ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন।

بَابٌ فِى سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ

قَالَ سُجُوْدُ التِّلَاوَةِ فِى الْقُرْاٰنِ اَرْبَعَةَ عَشَرَ فِىْ اٰخِرِ الْاَعْرَافِ وَفِى الرَّعْدِ وَالنَّحْلِ وَبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَمَرْيَمَ وَالْاُوْلٰى مِنَ الْحَجِّ وَالْفُرْقَانِ وَالنَّمْلِ وَالٓمّٓ تَنْزِيْلَ وَصٓ وَحٰمٓ السَّجْدَةِ وَالنَّجْمِ وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاِقْرَأْ كَذَا كُتِبَ فِىْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ (رض) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالسَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ فِى الْحَجِّ لِلصَّلٰوةِ عِنْدَنَا وَمَوْضَعُ السَّجْدَةِ فِىْ حٰمٓ السَّجْدَةِ عِنْدَ قَوْلِهٖ لَايَسْأَمُوْنَ فِىْ قَوْلِ عُمَرَ (رض) وَهُوَ الْمَاْخُوْذُ لِلْاِحْتِيَاطِ وَالسَّجْدَةُ وَاجِبَةٌ فِىْ هٰذِهِ الْمَوَاضِعِ عَلَى التَّالِىْ وَالسَّامِعِ سَوَاءٌ قَصَدَ سِمَاعَ الْقُرْاٰنِ اَوْ لَمْ يَقْصِدْ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلسَّجْدَةُ عَلٰى مَنْ سَمِعَهَا وَعَلٰى مَنْ تَلَاهَا وَهِىَ كَلِمَةُ اِيْجَابٍ وَهُوَ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالْقَصْدِ وَاِذَا تَلَا الْاِمَامُ اٰيَةَ السَّجْدَةِ سَجَدَهَا وَسَجَدَهَا الْمَأْمُوْمُ مَعَهٗ لِاِلْتِزَامِهٖ مُتَابَعَتَهٗ وَاِذَا تَلَا الْمَأْمُوْمُ لَمْ يَسْجُدِ الْاِمَامُ وَلَا الْمَأْمُوْمُ فِى الصَّلٰوةِ وَلَابَعْدَ الْفَرَاغِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) يَسْجُدُوْنَهَا اِذَا فَرَغُوْا لِاَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَقَرَّرَ وَلَامَانِعَ بِخِلَافِ حَالَةِ الصَّلٰوةِ لِاَنَّهٗ يُؤَدِّىْ اِلٰى خِلَافِ وَضْعِ الْاِمَامَةِ اَوِ التِّلَاوَةِ وَلَهُمَا اَنَّ الْمُقْتَدِىْ مَحْجُوْرٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ لِنِفَاذِ تَصَرُّفِ الْاِمَامِ عَلَيْهِ وَتَصَرُّفُ الْمَحْجُوْرِ لَاحُكْمَ لَهٗ بِخِلَافِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ لِاَنَّهُمَا مَنْهِيَانِ عَنِ الْقِرَاءَةِ اِلَّا اَنَّهٗ لَايَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ بِتِلَاوَتِهَا كَمَا لَايَجِبُ بِسِمَاعِهَا لِاِنْعِدَامِ اَهْلِيَّةِ الصَّلٰوةِ بِخِلَافِ الْجُنُبِ ۔

পরিচ্ছেদ : তিলাওয়াতে সিজদার বিবরণ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুরআন শরীফে মোট চৌদ্দটি সিজদায়ে তিলাওয়াত রয়েছে। (১) সূরাতুল আ'রাফের শেষে, (২) সূরাতুর রা'দ, (৩) সূরাতুন্ নাহল, (৪) সূরা বনী ইসরাঈল, (৫) সূরা মারইয়াম, (৬) সূরাতুল হাজ্জ-এর প্রথমটি, (৭) সূরাতুল ফুরকান, (৮) সূরা আন্নাম্‌ল, (৯) আলিফ-লাম-মীম তানযীল, (১০) সূরা সা-দ, (১১) সূরা হামীম সাজ্‌দা, (১২) সূরাতুন্ নাজম, (১৩) সূরা ইযাস্‌-সামাউন শাক্কাত ও (১৪) সূরা ইকরা। মাসহাফে ওসমানীতে এভাবেই লিখিত হয়েছে এবং এটাই নির্ভরযোগ্য। সূরাতুল হাজ্জ-এর সিজদার দ্বিতীয় আয়াতটি আমাদের মতে নামাজের সিজদা সংক্রান্ত। আর হামীম আস্‌ সাজদা-এর সিজদাস্থল হলো, لَايَسْأَمُوْنَ আয়াতটি। এটা ওমর (রা.)-এর মত এবং সতর্কতা অবলম্বনে এটাই গ্রহণীয়। এ সকল স্থানে পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের উপর সিজদা ওয়াজিব। কুরআন শ্রবণের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সিজদার আয়াত যে শ্রবণ করেছে এবং যে তিলাওয়াত করেছে উভয়ের উপর সিজদা ওয়াজিব। على অব্যয়টি ওয়াজিব নির্দেশক। আর তা ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি। ইমাম যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করেন, তখন তিনি সিজদা করবেন এবং

মুক্তাদীও তাঁর সঙ্গে সিজদা করবে। কেননা, সে ইমামের অনুসরণ নিজ কর্তব্য রূপে গ্রহণ করেছে। মুক্তাদী তিলাওয়াত করলে ইমাম ও মুক্তাদী কেউ সিজদা করবে না, নামাজের মধ্যেও না নামাজের পরেও না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, নামাজ শেষ করার পর সকলেই সিজদা করবে। কেননা, সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ সাব্যস্ত হয়েছে এবং কোনো প্রতিবন্ধকতাও নেই। নামাজের অবস্থা এর বিপরীত। কেননা, নামাজের ভিতরে সিজদা করা ইমামতির অথবা তিলাওয়াতের অবস্থার বৈপরীত্যের দিকে নিয়ে যাবে। শায়খাইনের যুক্তি হলো, মুক্তাদীর উপর ইমামের কর্মকাণ্ড আরোপিত হওয়ার কারণে সে কিরাআত পড়া থেকে বাধাপ্রাপ্ত। বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্মের উপর কোনো হুকুম আরোপিত হয় না। জুনুবী ও হায়েযগ্রস্ত নারীর অবস্থা এর বিপরীত। কেননা, তাদের কিরাআত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তবে হায়েযগ্রস্ত নারীর উপর তিলাওয়াতের কারণে সিজদা ওয়াজিব হবে না, তদ্রূপ শ্রবণের কারণেও ওয়াজিব হবে না। কেননা, তার নামাজ আদায়ের যোগ্যতাই নেই। জুনূবী ব্যক্তির বিষয়টি এর বিপরীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উচিত তো ছিল সিজ্দায়ে তিলাওয়াতকে সিজদায়ে সাহুর সাথে সাথেই উল্লেখ করা। কেননা, তন্মধ্যকার উভয়টিই হলো সিজদা সংক্রান্ত বিষয়। কিন্তু যেহেতু অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ عارض سماويه-এর কারণে হয় এবং সিজদায়ে সাহুর নামাজও عارض سماويه-এর কারণে হয়, এই মুনাসাবাতেব কারণে সিজদায়ে সাহুর পর অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং যখন মুনাসাবাতের কারণে সিজদায়ে সাহুর পর অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের আলোচনা করা হয়েছে, তাই তিলাওয়াতে সিজদার আলোচনা স্বাভাবিক কারণেই পরে এসে গেছে।

সিজদায়ে তিলাওয়াতের মধ্যে حكم-এর اضافة - سبب-এর দিকে করা হয়েছে। কেননা, সিজদার سبب হলো তিলাওয়াত-ই। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, তিলাওয়াত ছাড়া سماع ও তো সিজদার سبب, তাহলে তো এভাবে বলা উচিত ছিল بَابُ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ وَالسَّمَاعِ এর জবাব হলো তিলাওয়াত যেমনিভাবে সিজদার سبب, এমনিভাবে سماع ও সিজদার سبب। সুতরাং তিলাওয়াতের আলোচনা দ্বারা سماع-এর আলোচনাও من وجه হয়ে গেছে। এ কারণেই শুধু তিলাওয়াতের আলোচনার উপর নির্ভর করা হয়েছে।

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, কুরআনে কারীমে মোট চৌদ্দটি আয়াতে সিজদা রয়েছে। যথা–

১. সূরায়ে আ'রাফের শেষে, যেমন– إِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ

২. সূরায়ে রা'দের মধ্যে, যেমন– وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ

৩. সূরায়ে নাহলের মধ্যে, যেমন– يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

৪. সূরায়ে বনী ইসরাঈলের মধ্যে, যেমন– وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا

৫. সূরায়ে মারয়ামের মধ্যে, যেমন– اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا

৬. সূরায়ে হাজ্জের প্রথমটি, যেমন– وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

৭. সূরায়ে ফুরকানের মধ্যে, যেমন–
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا.

৮. সূরায়ে নামলের মধ্যে, যেমন– اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

৯. সূরায়ে সাজদা (আলিফ- লাম-মীম- তানযীল)-এর মধ্যে, যেমন–
اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

১০. সূরায়ে সা-দ-এর মধ্যে, যেমন– فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ. وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ

১১. সূরায়ে হামীম সাজদার মধ্যে, যেমন– يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْاَمُوْنَ

১২. সূরায়ে নাজমের মধ্যে, যেমন- فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوا

১৩. সূরায়ে ইযাস সামাউন শাক্কাতের মধ্যে, যেমন- وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ

১৪. সূরায়ে আলাক -এর মধ্যে, যেমন- وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

হিদায়া গ্রন্থকার উপরোক্ত সিজদার চৌদ্দ স্থানের ক্ষেত্রে মাসহাফে ওসমানীর দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। আর মাসহাফে ওসমানী হলো সবচে নির্ভরযোগ্য।

وَالسَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْحَجِّ الخ দ্বারা গ্রন্থকার একটি ইখতিলাফী মাসআলা বর্ণনা করতেছেন। আর তা হলো, ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতেও সিজদার আয়াত চৌদ্দটি। তবে তাঁর মতে সূরায়ে হাজ্জের উভয় সিজদাই হলো তিলাওয়াতের সিজদা। আর সূরায়ে ص -এর মধ্যে কোনো সিজদা নেই; বরং সিজদায়ে শুকর আছে। আর আমাদের মতে সূরায়ে হজ্জের প্রথম সিজদা হলো তিলাওয়াতে সিজদা আর দ্বিতীয় সিজদা দ্বারা নামাজের সিজদা মুরাদ, তিলাওয়াতে সিজদা মুরাদ নয়। আর আমাদের মতে সূরায়ে ص -এর সিজদা তিলাওয়াতে সিজদা।

সূরায়ে হজ্জের দুই সিজদার ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.)-এর হাদীস-

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُضِّلَتِ الْحَجُّ بِسَجْدَتَيْنِ مَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا لَمْ يَقْرَأْهُمَا

সূরায়ে হজ্জকে দুই সিজদা দ্বারা ফজিলত দেওয়া হয়েছে, সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ দুই সিজদা আদায় করল না সে যেন সূরাই পড়েনি। আমাদের দলিল হলো, হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, قَالَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ فِي الْحَجِّ هِيَ الْأُولٰى وَالثَّانِيَةُ سَجْدَةُ الصَّلٰوةِ তাঁরা বলেন, সূরায়ে হাজ্জের মধ্যে প্রথমটি হলো সিজদায়ে তিলাওয়াত আর দ্বিতীয়টি হলো নামাজের সিজদা। এর সমর্থন একথা দ্বারাও বুঝে আসে যে, দ্বিতীয় সিজদাকে রুকুর সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- বলা হয়েছে وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا রুকু করো, সিজদা আদায় করো। আর কায়দা আছে যে, যে সিজদা রুকুর সাথে মিলে থাকে তার দ্বারা নামাজের সিজদা মুরাদ হয়ে থাকে। যেমন- হযরত মারইয়াম (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল, وَاسْجُدِي وَارْكَعِي এখানেও নামাজের সিজদা মুরাদ।

হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো, রাসূলুল্লাহর বাণী- فُضِّلَتِ الْحَجُّ بِسَجْدَتَيْنِ -এর ব্যাখ্যা হলো, প্রথম সিজদা তিলাওয়াতের সিজদা আর দ্বিতীয় সিজদা নামাজের সিজদা। সূরায়ে ص -এর মধ্যে সিজদায়ে শুকরের ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল কি? ইনায়া গ্রন্থকারের বর্ণনা মতে দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস-

تَلَا فِي خُطْبَةٍ سُورَةَ ص فَتَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ فَقَالَ عَلَامَ تَشَزَّنْتُمْ إِنَّهَا تَوْبَةُ نَبِيٍّ وَقَالَ ﷺ سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا .

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা খুতবার মধ্যে সূরায়ে ص তিলাওয়াত করলেন (সিজদার আয়াত তিলায়াতের সময়) লোকেরা সিজদার জন্য তৈরি হয়ে গেল। তিনি বললেন, তোমরা সিজদার জন্য কেন তৈরি হচ্ছ? এটাতো হলো নবীর তওবা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এই স্থানে পৌঁছে হযরত দাউদ (আ.) সিজদা করেছিলেন তওবা হিসাবে, আর আমরা সিজদা করি শুকরিয়া হিসাবে। আমাদের পক্ষ থেকে উক্ত হাদীসের জবাব হলো, সিজদায়ে শুকর সিজদায়ে তিলাওয়াতের মুনাফী নয়। কেননা, কোনো ইবাদত এমন নেই যার মধ্যে শুকরের অর্থ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এটাও সাবিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবার মাঝখানে তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা সূরায়ে ص-এর সিজদাটি তিলাওয়াতে সিজদা হওয়া বুঝে আসে। আর যদি একথা মেনেও নেওয়া হয় যে, তিনি এ স্থানে সিজদা করেননি। তখন বলা হবে যে এটা ছিল جواز تاخير অর্থাৎ বিলম্বের বৈধতার তালীমের জন্য। এ কারণে নয় যে, এ স্থানে সিজদায়ে তিলাওয়াতে ওয়াজিব নয়।

আমাদের মাযহাবের সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, এক সাহাবী একবার বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যাপারে আপনার কি খেয়াল, একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে দেখছে যে, সে সূরায়ে ص লিখতেছে। যখন সিজদার স্থান পর্যন্ত পৌঁছল তখন দেখল যে, দোয়াত ও কলম সিজদা করা আরম্ভ করল। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দোয়াত ও কলমের তুলনায় আমরা সিজদা

করার অধিক হকদার। পরে তিনি নির্দেশ দিলেন সিজদার আয়াত পড়া হলো এবং তিনিও সাহাবীর সাথে সিজদা করলেন। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, حم سجده -এর মধ্যে সিজদার আয়াত হলো لَا يَسْأَمُونَ। যেমন- হযরত ওমর (রা.) বলেছেন; আর এর উপর আমল করার মধ্যেই সতর্কতা রয়েছে।

وَالسَّجْدَةُ وَاجِبَةٌ فِي هٰذِهِ الْمَوَاضِعِ الخ : ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র.) বলেন, উপরোক্ত চৌদ্দ স্থানে কারী এবং শ্রবণকারী উভয়ের উপর সিজদা করা ওয়াজিব। শ্রবণকারী শ্রবণের ইচ্ছা করুক বা না করুন। ইমাম মালিক (র.) ইমাম শাফি'ঈ (র.) এবং হানাবেলাদের মতে সিজদায়ে তিলাওয়াত সুন্নত। তাঁদের দলিল হলো, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে সূরায়ে নাজম তিলাওয়াত করেছিলেন, কিন্তু যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কেউ সিজদা আদায় করেননি। এ ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল, সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নত। কেননা, যদি ওয়াজিব হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং হযরত যায়েদ (রা.) কেউই উভয় সিজদাকে তরক করতেন না। আমাদের দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস- اَلسَّجْدَةُ عَلٰى مَنْ سَمِعَهَا وَعَلٰى مَنْ تَلَاهَا। দলিল হলো এভাবে যে, হাদীসের মধ্যে على শব্দটি এসেছে, যা ওয়াজিব নির্দেশক। আর যেহেতু হাদীসটি ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত নয় এ জন্য প্রত্যেক শ্রবণকারীর উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে। শ্রবণের ইচ্ছা করুক বা না করুক। ইমাম মালিক (র.) এবং অন্যান্যদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত দলিলের জবাব হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা করেননি। আর আমাদের মতে তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা না করা জায়েজ। তা ছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা না করার দ্বারা على الاطلاق সিজদা না করা বুঝে আসে না। সুতরাং হতে পারে রাসূলুল্লাহ ﷺ পরে সিজদা আদায় করেছেন। উক্ত সম্ভাবনার কারণে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব না হওয়া সাবিত হয় না।

قَوْلُهُ وَإِذَا تَلَا الْإِمَامُ آيَةَ السَّجْدَةِ الخ : ইমাম যদি নামাজের মধ্যে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করেন তবে ইমাম নামাজের মধ্যে সাথে সাথে সিজদা আদায় করবে, আর তাঁর সাথে মুক্তাদীরাও সিজদা করবে। দলিল হলো, মুক্তাদী ইক্তিদার নিয়ত দ্বারা ইমামের অনুসরণ করাকে তার উপর লাযিম করে নিয়েছে। এ অবস্থায় যদি মুক্তাদী ইমামের সাথে সিজদায়ে তিলাওয়াত না করে, তবে তো ইমামের বিরোধিতা করা লাযিম আসে। আর যদি মুক্তাদী নামাজের মধ্যে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে শায়খাইন (র.)-এর মতে ইমাম ও মুক্তাদী কেউ সিজদা আদায় করবে না। নামাজের মধ্যেও না, নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পরও না। এটাই হলো عامة العلماء -এর মাযহাব। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ইমাম ও মুক্তাদী যখন নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে যাবে তখন সকলে সিজদা আদায় করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ সাব্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ মুক্তাদীর সিজদার আয়াত পড়া আর অন্যান্যদের তা শুনা। আর সিজদার প্রতিবন্ধকতা (অর্থাৎ তার নামাজের ভিতরে থাকা) দূর হয়ে গেছে। আর কায়দা রয়েছে, যখন কোনো জিনিসের সবব পাওয়া যায় এবং প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায় তখন ঐ জিনিস অবশ্যই সাব্যস্ত হয়ে যায়। এ জন্য নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের উপর সিজদা ওয়াজিব হবে। এর বিপরীত হলো নামাজের অবস্থা। অর্থাৎ নামাজের ভিতরে ইমাম ও মুক্তাদী কেউ সিজদা আদায় করবে না। কেননা, নামাজের ভিতরে সিজদা করার দ্বারা ইমামতের অথবা সিজদায়ে তিলাওয়াতের পরিপন্থী লাযিম আসবে। কেননা, যে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করল সে প্রথমে সিজদা করবে অথবা ইমাম প্রথমে সিজদা করবে। যদি তিলাওয়াতকারী অর্থাৎ মুক্তাদী প্রথমে সিজদা করে আর ইমাম তার অনুসরণ করে, তবে তো ইমামতের পরিপন্থি কাজ করা লাযিম আসবে। অর্থাৎ ইমাম যিনি متبوع ছিলেন তিনি تابع হয়ে গেলেন, আর মুক্তাদী যিনি تابع ছিলেন তিনি متبوع হয়ে গেলো। আর যদি ইমাম প্রথমে সিজদা করে, আর তিলাওয়াতকারী অর্থাৎ মুক্তাদী তার অনুসরণ করে তবে তো তিলাওয়াতের পরিপন্থী কাজ করা লাযিম আসবে। কেননা, সাধারণত تالى (তিলাওয়াতকারী) ব্যক্তি سامع তথা শ্রবণকারী ব্যক্তির ইমাম হয়ে থাকে। সুতরাং তিলাওয়াতকারীর সিজদা অগ্রে করা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াতকারী সম্বন্ধে বলেছিলেন- كُنْتَ إِمَامَنَا فَلَوْ سَجَدْتَ لَسَجَدْنَا مَعَكَ তুমি আমাদের ইমাম, তুমি যদি সিজদা কর তোমার সাথে আমরাও সিজদা করব। মোটকথা, তিলাওয়াতকারীর সিজদা আগে করা ওয়াজিব। আর এখানে ব্যাপারটি উল্টো হয়ে গেল। অর্থাৎ ইমাম আগে সিজদা করল আর মুক্তাদী পরে সিজদা করল। তাই নামাজের ভিতরে সিজদা করার দ্বারা যখন কোনো না কোনো খারাবি লাযিম আসে তাই নামাজের ভিতরে ইমাম ও মুক্তাদী কেউ সিজদা করবে না।

শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাআত পড়া শরয়ীভাবে নিষিদ্ধ। কেননা, মুক্তাদীর কিরাআত দ্বারা ইমামের কর্মকাণ্ড তার উপর আরোপিত হয়ে যায়, যেমন– রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ যার ইমাম রয়েছে, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত রূপে গণ্য। মোটকথা, মুক্তাদী কিরাআত পড়া থেকে বাধাপ্রাপ্ত। আর যে ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে বাধাগ্রস্ত হয়ে যায়, তার সে কাজের মধ্যে কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। সুতরাং মুক্তাদী যেহেতু কিরাআত পড়া থেকে বাধাগ্রস্ত তাই তার কিরাআতের ধার্তব্য হবে না। আর যেহেতু তার কিরাআতের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, তাই তার উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে না।

بِخِلَافِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ الخ দ্বারা একটি কিয়াসের জবাব দেওয়া হয়েছে। কিয়াসটি হলো, মুক্তাদী কিরাআত পড়া থেকে বাধাগ্রস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে জুনুবী ও হায়েযা স্ত্রীলোকের ন্যায়, তাদের সিজদা কিরাআত শুনার কারণেই ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ তাদের উভয়ের মধ্যে থেকে যদি কেউ সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে এবং অন্য কেউ তা শুনে, তবে শ্রবণকারীর উপর তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এমনিভাবে মুক্তাদী যদি কিরাআত পড়া থেকে বাধাগ্রস্ত হয়, তা সত্ত্বেও সে যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে আর ইমাম তার কিরাআত শুনে তবে ইমামের উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয়ে যাওয়া উচিত। অথচ শায়খাইন (র.) ইমামের উপরও সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কথা মানেন না।

উপরোক্ত কিয়াসের জাবাব হলো, জুনুবী আর হায়েযা হলো مَمْنُوعٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ, আর মুক্তাদী হলো مَحْجُورٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ। উল্লেখ্য যে, مَمْنُوعٌ ও مَحْجُورٌ-এর মধ্যে পার্থক্য হলো, مَحْجُورٌ عَنْهُ-এর فِعْل গ্রহণযোগ্য হয় না; এমনিভাবে হারামও না এবং মাকরূহও না। আর مَمْنُوعٌ-এর فِعْل গ্রহণযোগ্য হয়। চাই হারাম হোক বা মাকরূহ হোক। যেমন– بَيْع হলো مَمْنُوعٌ। কিন্তু কেউ যদি بَيْعِ فَاسِدْ করে, আর ক্রেতা মূল পণ্যকে গ্রহণ করে, তখন ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যদি مَحْجُورٌ عَنْهُ যেমন– অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু কিংবা পাগল ব্যক্তি بَيْعِ فَاسِدْ করে, আর ক্রেতা পণ্য গ্রহণও করে নেয়, তাহলেও ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং যেহেতু জুনুবী ও হায়েযা مَمْنُوعٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ কিন্তু مَحْجُورٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ নয়, সেহেতু তাদের তিলাওয়াত সিজদার সবব হবে। যার ফলে যে ব্যক্তি তাদের থেকে সিজদার আয়াত শ্রবণ করবে তার উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মুক্তাদী হলো مَحْجُورٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ। তাই যেহেতু তার কিরাআতের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, সেহেতু তা সিজদার সবব হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, مَمْنُوعٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ হওয়ার ক্ষেত্রে জুনুবী ও হায়েযা বরাবার। তবে এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, হায়েযা নারীর নিজের তিলাওয়াত দ্বারাও সিজদা ওয়াজিব হবে না এবং অন্যের তিলাওয়াত শুনার দ্বারাও হবে না। আর জুনূবী ব্যক্তি যদি নিজে তিলাওয়াত করে তখনও সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে। আর যদি অন্যের থেকে শুনে তখনও ওয়াজিব হবে। কারণ, সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নামাজের আহলিয়তযোগ্য হওয়া জরুরি চাই নামাজ أدا হোক কিংবা قَضَاء হোক। হায়েযা নারী উভয় দিক থেকেই নামাজের আহাল নয়। কিন্তু জুনূবীর মধ্যে নামাজের আহলিয়ত বিদ্যমান। কেননা, জুনূবী ব্যক্তি যদি ওয়াক্তের ভিতরেই গোসল করে নেয় তবে তার উপর আদা ওয়াজিব হয়ে যায়, আর ওয়াক্তের বাহিরে গোসল করলে কাযা ওয়াজিব হবে।

وَلَوْ سَمِعَهَا رَجُلٌ خَارِجَ الصَّلٰوةِ سَجَدَهَا هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّ الْحَجَرَ ثَبَتَ فِىْ حَقِّهِمْ فَلَايَعْدُوْهُمْ وَاِنْ سَمِعُوا وَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ سَجْدَةً مِنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ لَمْ يَسْجُدُوْهَا فِى الصَّلٰوةِ لِاَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاتِيَّةٍ لِاَنَّ سِمَاعَهُمْ هٰذِهِ السَّجْدَةَ لَيْسَ مِنْ اَفْعَالِ الصَّلٰوةِ وَسَجَدُوْهَا بَعْدَهَا لِتَحَقُّقِ سَبَبِهَا وَلَوْ سَجَدُوْهَا فِى الصَّلٰوةِ لَمْ يُجْزِهِمْ لِاَنَّهُ نَاقِصٌ لِمَكَانِ النَّهْىِ فَلَايَتَأَدّٰى بِهِ الْكَامِلُ .

অনুবাদ : যদি উক্ত নামাজ বহির্ভূত কোনো ব্যক্তি (ইমাম বা মুক্তাদী থেকে) উক্ত আয়াত শ্রবণ করে তবে সে সিজদা করবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা, (শরিয়ত কর্তৃক) প্রতিবন্ধকতা মুক্তাদীর ক্ষেত্রে সাব্যস্ত ছিল। সুতরাং তাদের অতিক্রম করে অন্যদের উপর তা আরোপিত হবে না। যদি নামাজের ভিতরে থেকে তারা এমন লোকের তিলাওয়াত শ্রবণ করে, যে নামাজে তাদের সাথে শরিক নেই, তাহলে তারা নামাজে ঐ তিলাওয়াতে সিজদা করবে না। কেননা, এটি নামাজভুক্ত সিজদায়ে তিলাওয়াত নয়। কারণ, তাদের এই সিজদার আয়াত শ্রবণ নামাজের কোনো আমল নয়, তবে নামাজের পরে এর জন্য তারা সিজদা করবে। কেননা, সিজদার কারণ পাওয়া গেছে। যদি তারা নামাজের মধ্যেই সিজদা আদায় করে, তবে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা, নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তা নিম্নমানের সিজদা। সুতরাং তা দ্বারা পূর্ণমানের সিজদা আদায় হতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামাজের বাইরে এমন ব্যক্তি যদি ইমাম কিংবা মুক্তাদী থেকে সিজদার আয়াত শুনে এবং শুনার পর নামাজে শামিল না-ও হয় তারপরও সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেউ কেউ বলেন, উপরোক্ত হুকুমটি হলো مختلف منه তথা বিরোধপূর্ণ। যেমন– শায়খাইন (র.)-এর মতে উক্ত ব্যক্তি সিজদা করবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সিজদা করবে। বিশুদ্ধ মতের দলিল হলো, محجور عن القراءة মুক্তাদীদের ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। তাই তাদেরকে অতিক্রম করে অন্যদের উপর তা আরোপিত হবে না; বরং তার উপরই তা আরোপিত হবে।

وَاِنْ سَمِعُوْا وَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ الخ মাসআলা, যদি কিছু লোক নামাজরত অবস্থায় এমন ব্যক্তি থেকে সিজদার আয়াত শুনে যে নামাজে তারা শরিক নয় তবে তারা নামাজের হালাতে সিজদা করবে না। কেননা, এ সিজদা নামাজের সিজদা নয়। কারণ, তাদের এ সিজদার আয়াতটি শুনা নামাজের কোনো আমল নয়। কেননা নামাজের আমল হয় ফরজ হবে, না হয় ওয়াজিব কিংবা সুন্নত হবে। আর উক্ত আয়াতটি শুনা কোনোটিই নয়। মোটকথা, উক্ত সিজদা নামাজের কোনো আমলের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যা নামাজের আমল নয় তা নামাজের ভিতরে আদায় করাও জায়েজ নয়। সুতরাং বুঝা গেল এরা নামাজের ভিতরে তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করবে না। তবে নামাজের পর সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা ওয়াজিব হবে। কেননা, সিজদা আদায়ের সবব তথা আয়াতে সিজদা তারা শ্রবণ করেছে।

وَلَوْ سَجَدُهَا فِى الصَّلٰوةِ الخ মাসআলা, পূর্বের মাসআলায় বলা হয়েছে যে, ঐ সকল লোকদের জন্য নামাজের ভিতরে সিজদা করা নিষেধ। কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যদি তারা সিজদা করে তবে তা আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে না। তবে নামাজও ফাসিদ হবে না। সিজদা গ্রহণ না হওয়ার দলিল হলো, এ সিজদাটি হলো নিম্নমানের সিজদা। কেননা, শরিয়াত নামাজের ভিতরে প্রত্যেক ঐ কাজ করতে নিষেধ করেছে যা নামাজের আমলের অন্তর্ভুক্ত নয়। বুঝা গেল, এ সিজদাটি হলো নিম্নমানের সিজদা, আর এদিকে শ্রবণের কারণে যে সিজদা ওয়াজিব হয় তা হলো, পূর্ণমানের সিজদা। আর কায়দা আছে যে, পূর্ণমাণের কাজ নিম্নমানের কাজ দ্বারা আদায় হয় না। এ জন্য তাদের নামাজের মধ্যে সিজদা করার দ্বারা সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় হবে না।

قَالَ وَاعَادُوهَا لِتَقَرُّرِ سَبَبِهَا وَلَمْ يُعِيدُوا الصَّلٰوةَ لِاَنَّ مُجَرَّدَ السَّجْدَةِ لَا يُنَافِى اِحْرَامَ الصَّلٰوةِ وَفِى النَّوَادِرِ اَنَّهَا تَفْسُدُ لِاَنَّهُمْ زَادُوْا فِيْهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا وَقِيْلَ هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ فَاِنْ قَرَاَهَا الْاِمَامُ وَسَمِعَهَا رَجُلٌ لَيْسَ مَعَهُ فِى الصَّلٰوةِ فَدَخَلَ مَعَهُ بَعْدَ مَا سَجَدَهَا الْاِمَامُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ اَنْ يَسْجُدَهَا لِاَنَّهُ صَارَ مُدْرِكًا لَهَا بِاِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ وَاِنْ دَخَلَ مَعَهُ قَبْلَ اَنْ يَسْجُدَهَا سَجَدَهَا مَعَهُ لِاَنَّهُ لَوْلَمْ يَسْمَعْهَا سَجَدَهَا مَعَهُ فَهٰهُنَا اَوْلٰى وَاِنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ سَجَدَهَا لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ ـ

অনুবাদ : গ্রন্থকার বলেন, পুনরায় তারা এ সিজদা করবে। কেননা, সিজদার কারণ পাওয়া গেছে; তবে নামাজ দোহরাতে হবে না। কেননা, কেবলমাত্র সিজদা নামাজের তাহরীমার পরিপন্থী নয়। "নাওয়াদির"-এর বর্ণনা মতে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, নামাজে তারা এমন কাজ বৃদ্ধি করেছে যা নামাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। ইমাম যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করেন আর তা এমন ব্যক্তি শুনতে পায় যে নামাজে ইমামের সাথে শরিক নয়; এরপর ইমাম সিজদা করার পর সে ইমামের সাথে নামাজে শরিক হলো, তাহলে ঐ সিজদা করা তার জন্য জরুরি নয়। কেননা, ঐ রাকআতে শরিক হওয়ার দ্বারা ঐ সিজদাতেও সে শরিক বলে গণ্য হয়েছে। আর যদি ঐ সিজদা করার আগেই সে ইমামের সঙ্গে শরিক হয়ে যায়, তাহলে ইমামের সঙ্গে সেও ঐ সিজদা করবে। কেননা, ঐ আয়াতটি যদি সে শ্রবণ নাও করতো, তবুও ইমামের সঙ্গে তাকে সিজদা করতে হতো। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সিজদা করা অধিকতর সংগত হবে। আর যদি ইমামের সঙ্গে নামাজে মোটেই শরিক না হয়, তাহলে সে সিজদা করে নেবে। কেননা, সিজদার কারণ পাওয়া গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : গ্রন্থকার বলেন, তারা নামাজের মধ্যে যে সিজদা তিলাওয়াত করেছে তা যেহেতু শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয় সেহেতু নামাজের পর সে সিজদা তারা পুনরায় আদায় করবে। কেননা, সিজদায়ে তিলাওয়াতের কারণ তথা শ্রবণ করা পাওয়া গেছে। আর যেহেতু নামাজ ফাসিদ হয়নি, তাই দ্বিতীয়বার নামাজ আদায়ের কোনো দরকার নেই। নামাজ ফাসিদ না হওয়ার কারণ হলো, নামাজতো ফাসিদ হয় কোনো রুকন তরক করার দ্বারা কিংবা নামাজের বিপরীত কোনো কাজ করার দ্বারা। আর এখানে কোনোটিই পাওয়া যায়নি। কেননা, সিজদা নামাজের মুনাফী নয়।

নাওয়াদির এর বর্ণনা মতে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, তারা নামাজের মধ্যে এমন কাজ বৃদ্ধি করেছে যা নামাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেউ কেউ বলেছেন, এটা হলো ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মত। শায়খাইনের মতে ঐ সুরতে নামাজ ফাসিদ হবে না। তাঁদের মধ্যকার মতবিরোধের মূল কথা হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অতিরিক্ত সিজদা নামাজ ফাসিদ করে দেয়। পক্ষান্তরে শায়খাইন (র.)-এর মতে এক রাকআতের কম অতিরিক্ত হলে তা নামাজকে ফাসিদ করে না

فَاِنْ قَرَاَهَا الْاِمَامُ الخ মাসআলা, ইমাম সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করেছে আর তা এমন ব্যক্তি শুনেছে যে ইমামের নামাজের সাথে শরিক নয়, অতঃপর এ ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাজে শরিক হয়েছে, এর দু'টো সুরত রয়েছে। হয়তো সে ইমামের সিজদা করার পর নামাজে শরিক হয়েছে কিংবা সিজদা করার পূর্বে শরিক হয়েছে; যদি প্রথম সুরত হয়, তবে তার উপর সিজদা করা জরুরি নয়। কেননা, এ রাকআতে শরিক হওয়ার দ্বারা এ সিজদাতেও সে শরিক হয়েছে বলে গণ্য হয়েছে আর যদি সে দ্বিতীয় রাকআতে ইমামের সাথে শরিক হয়, তাহলে নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করবে; কেননা, সে যখন ঐ রাকআত পায়নি যার মধ্যে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছিল, তবে তো সে কিরাআতও পায়নি এবং তার متعلقات তথা সিজদাও পায়নি। আর যেহেতু সে সিজদা পায়নি তাই নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর তার সিজদা আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি দ্বিতীয় সুরত হয়, অর্থাৎ ইমামের সিজদা করার আগে ইমামের সাথে শরিক হয় তবে ইমামের সাথে সিজদা করবে। কেননা, এ ব্যক্তি যদি সিজদার আয়াত না শুনতো, যথা ইমাম চুপে চুপে আয়াতে সিজদা পড়তো, তথাপিও ইমামের সাথে তার সিজদা করা ওয়াজিব হতো। সুতরাং এ সুরতে যখন সে সিজদার আয়াতও শুনল সুতরাং তার তো ইমামের সাথে সিজদা করা ওয়াজিব। আর এ ব্যক্তি ইমাম থেকে আয়াতে সিজদা শুনে নামাজে শরিক হয়নি তাই নামাজের বাইরে তার সিজদা করা ওয়াজিব হবে। কেননা, সিজদার সবব অর্থাৎ আয়াতে সিজদা শ্রবণ করা পাওয়া গেছে।

وَكُلُّ سَجْدَةٍ وَجَبَتْ فِي الصَّلٰوةِ فَلَمْ يَسْجُدْهَا فِيْهَا لَمْ تُقْضَ خَارِجَ الصَّلٰوةِ لِأَنَّهَا صَلَاتِيَّةٌ وَلَهَا مَزِيَّةُ الصَّلٰوةِ فَلَاتَتَادّٰى بِالنَّاقِصِ وَمَنْ تَلَا سَجْدَةً فَلَمْ يَسْجُدْهَا حَتّٰى دَخَلَ فِي صَلٰوةٍ فَأَعَادَهَا وَسَجَدَ أَجْزَأَتْهُ السَّجْدَةُ عَنِ التِّلَاوَتَيْنِ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ أَقْوٰى لِكَوْنِهَا صَلٰوتِيَّةً فَاسْتَتْبَعَتِ الْأُوْلٰى وَفِي النَّوَادِرِ يَسْجُدُ أُخْرٰى بَعْدَ الْفَرَاغِ لِأَنَّ لِلْأُوْلٰى قُوَّةَ السَّبْقِ فَاسْتَوَتَا قُلْنَا لِلثَّانِيَةِ قُوَّةُ إِتِّصَالِ الْمَقْصُوْدِ فَتَرَجَّحَتْ بِهَا ـ

অনুবাদ : যে সিজদা নামাজের মধ্যে ওয়াজিব হলো কিন্তু সে নামাজের মধ্যে আদায় করল না, তবে নামাজের বাইরে আর কাজা করবে না। কেননা, এ হলো নামাজের মধ্যকার সিজদা। তার নামাজভিত্তিক অতিরিক্ত মর্যাদা রয়েছে। সুতরাং নিম্নমানের সিজদা দ্বারা তা আদায় হবে না। যে ব্যক্তি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করল, এরপর সিজদা না করেই নামাজ শুরু করে উক্ত আয়াত পুনঃ পাঠ করল এবং সিজদা করল, তার দু'বারের তিলাওয়াতের জন্য এ সিজদাই যথেষ্ট হবে। কেননা, দ্বিতীয় সিজদাটি সালাতভুক্ত হওয়ার কারণে অধিকতর শক্তিশালী। সুতরাং তা প্রথম সিজদাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিবে। তবে 'নাওয়াদির'-এর বর্ণনা মতে নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর আর এক সিজদা করে নিবে। কেননা, প্রথম সিজদাটি অগ্রগামিতার প্রাধান্য রাখে। সুতরাং উভয়টি সমমানের হয়ে গেল। আমাদের বক্তব্য হলো, উদ্দেশ্যের সাথে আদায় নিজে সংযুক্ত হওয়ার কারণে এর অতিরিক্ত মর্যাদা রয়েছে। সুতরাং এদিক থেকে তা অগ্রগণ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদূরী গ্রন্থকার (র.) একটি নীতি বর্ণনা করেছেন। নীতিটি হলো, প্রত্যেক ঐ সিজদা যা নামাজের মধ্যে আয়াতে সিজদা তিলাওয়াতের কারণে ওয়াজিব হয়। কিন্তু নামাজের মধ্যে সিজদা আদায় করা হয় না। ঐ সিজদা নামাজের বাইরে আদায় করার দ্বারা আদায় হবে না। দলিল হলো, এ সিজদাটি হলো নামাজের সিজদা। নামাজের সিজদা হওয়ার অর্থ হলো, আয়াতে সিজদার তিলাওয়াত যা সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ তা নামাজের আফয়াল তথা কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। আর নামাজের সিজদার মধ্যে নামাজের ফজিলত রয়েছে। এ জন্য নামাজের মধ্যে সিজদায়ে তিলাওয়াতের উজুব কামিল তথা পরিপূর্ণ হলো। আর যে জিনিসে وجوب كامل হয় তা নাকিস তথা অসম্পূর্ণতার সাথে আদায় করার দ্বারা আদায় হয় না। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, নামাজের বাইরে যেহেতু নামাজের ফজিলত নেই। এ জন্য নামাজের বাইরে যে সিজদা আদায় করা হবে তা নাকিস হবে, তথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

وَمَنْ تَلَا سَجْدَةً الخ উক্ত ইবারতের মধ্যে সিজদায়ে তিলাওয়াতের تداخل -এর বর্ণনা করা হয়েছে। মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি নামাজের বাইরে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে এবং সিজদা আদায় না করেই কোনো নফল বা ফরজ নামাজে দাখিল হয়ে যায়। অতঃপর পুনরায় ঐ সিজদার আয়াত নামাজের মধ্যে তিলাওয়াত করে এবং নামাজের মধ্যেই সিজদা আদায় করে তবে তার এ সিজদা উভয় তিলাওয়াতের জন্য যথেষ্ট হবে। দলিল হলো, দ্বিতীয় সিজদাটি নামাজের সিজদা হওয়ার কারণে অধিকতর শক্তিশালী। সুতরাং তা প্রথম সিজদাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিবে। এ জন্য দ্বিতীয় সিজদা আদায় করার দ্বারা প্রথম সিজদাও আদায় হয়ে যাবে। তবে 'নাওয়াদির' নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, নামাজের মধ্যে সিজদা আদায় করার দ্বারা এক সিজদা আদায় হবে। দ্বিতীয় সিজদা নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর আদায় করা জরুরি। দলিল হলো, দ্বিতীয় সিজদা নামাজভুক্ত হওয়ার কারণে যদিও শক্তিশালী, কিন্তু প্রথম সিজদা অগ্রগামিতার কারণেও শক্তি রাখে। তাই শক্তিতে উভয়টি এক সমান, সুতরাং একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত হবে না। এ কারণে একটি সিজদা আদায়ের দ্বারা অপর সিজদা আদায় হবে না। আমাদের পক্ষ থেকে উপরোক্ত বক্তব্যের জবাব হলো, দ্বিতীয় সিজদা বরাবর হওয়ার পরও অতিরিক্ত একটি শক্তি রাখে, তা হলো, তিলাওয়াতটি আদায়ের সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার যখন নামাজের মধ্যে আয়াতে সিজদাটি তিলাওয়াত করল, তখন তো তার সাথে সাথেই সিজদা আদায় করেছে। পক্ষান্তরে প্রথমবার যখন নামাজের বাইরে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেছিল তখন সিজদা আদায় করা হয়নি। এতে প্রতীয়মান হলো যে, প্রথম সিজদার তুলনায় দ্বিতীয় সিজদাটি অধিকতর শক্তিশালী। এ কারণে দ্বিতীয় সিজদা অগ্রগণ্য হবে এবং দ্বিতীয় সিজদা আদায় করার দ্বারা প্রথমটিও আদায় হয়ে যাবে।

وَإِنْ تَلَاهَا فَسَجَدَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلٰوةِ فَتَلَاهَا سَجَدَ لَهَا لِأَنَّ الثَّانِيَةَ الْمُسْتَتْبِعَةُ وَلَا وَجْهَ إِلَى إِلْحَاقِهَا بِالْأُولٰى لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى سَبْقِ الْحُكْمِ عَلَى السَّبَبِ وَمَنْ كَرَّرَ تِلَاوَةَ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَتْهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ قَرَأَهَا فِي مَجْلِسِهِ فَسَجَدَهَا ثُمَّ ذَهَبَ وَرَجَعَ فَقَرَأَهَا سَجَدَهَا ثَانِيَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ لِلْأُولٰى فَعَلَيْهِ سَجْدَتَانِ وَالْأَصْلُ أَنَّ مَبْنَى السَّجْدَةِ عَلَى التَّدَاخُلِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَهُوَ تَدَاخُلٌ فِي السَّبَبِ دُوْنَ الْحُكْمِ وَهُوَ أَلْيَقُ بِالْعِبَادَاتِ وَالثَّانِي بِالْعُقُوْبَاتِ وَإِمْكَانُ التَّدَاخُلِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ لِكَوْنِهِ جَامِعًا لِلْمُتَفَرِّقَاتِ فَإِذَا اخْتَلَفَ عَادَ الْحُكْمُ إِلَى الْأَصْلِ وَلَا يَخْتَلِفُ بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ بِخِلَافِ الْمُخَيَّرَةِ لِأَنَّهُ دَلِيْلُ الْإِعْرَاضِ وَهُوَ الْمُبْطِلُ هُنَالِكَ وَفِي تَسْدِيَةِ الثَّوْبِ يَتَكَرَّرُ الْوُجُوْبُ وَفِي الْمُنْتَقِلِ مِنْ غُصْنٍ إِلَى غُصْنٍ كَذٰلِكَ فِي الْأَصَحِّ وَكَذَا فِي الدِّيَاسَةِ لِلْاِحْتِيَاطِ .

অনুবাদ : আর যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াতের পর সিজদা করে, এরপর নামাজে দাখিল হয়ে পুনরায় উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে এর জন্য আবার সিজদা করবে। কেননা, দ্বিতীয়বার আয়াতে সিজদা তার পশ্চাতে এসেছে। অতএব, এটিকে প্রথমটির সাথে যুক্ত করার কোনো যুক্তি নেই। কেননা, এমতাবস্থায় "কারণ"-এর উপর "কার্য" অগ্রবর্তী হয়ে পড়বে। যদি কোনো ব্যক্তি একই মজলিসে একটি মাত্র সিজদার আয়াত পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে একই সিজদা তার জন্য যথেষ্ট হবে। কিন্তু যদি নিজ স্থানে আয়াত তিলাওয়াত পূর্বক সিজদা করে এরপর অন্যত্র গিয়ে উক্ত আয়াত আবার তিলাওয়াত করে, তবে দ্বিতীয়বার সিজদা করতে হবে। আর প্রথম তিলাওয়াতের জন্য সিজদা না করে থাকলে তার উপর দু'টি সিজদাই ওয়াজিব হবে। মূল নিয়ম হলো, কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াতে সিজদার ভিত্তি হলো একত্রীকরণের উপর। আর এ একত্রিকরণও সাধিত হবে (সিজদার) কারণ (অর্থাৎ তিলাওয়াত)-এর ক্ষেত্রে, হুকুম বা বিধানের ক্ষেত্রে নয়। ইবাদতের ব্যাপারে এটাই মুনাসিব। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি শাস্তি বিষয়ক ক্ষেত্র অধিক যুক্তিযুক্ত। আর একত্রীকরণ তখনই সম্ভব, যখন মজলিস অভিন্ন হবে। কেননা, মজলিসই হলো বিক্ষিপ্তগুলোকে একত্রকারী। সুতরাং মজলিস যখন বিভিন্ন হবে তখন হুকুম বা বিধান মূল অবস্থায় ফিরে যাবে। শুধু দাঁড়ানো দ্বারা মজলিস ভিন্ন হয় না। তালাকের ইখতিয়ার প্রাপ্ত নারীর বিষয়টি এ থেকে ভিন্ন। কেননা, এ ক্ষেত্রে দাঁড়ানো গ্রহণ না করার ইঙ্গিত বহন করে, আর তা ইখতিয়ারকে বাতিল করে দেয়। কাপড়ের সুতা তানা করার সময় আসা-যাওয়াতে ওয়াজিব পুনরাবৃত্ত হতে থাকবে। বিশুদ্ধতম মত অনুসারে গাছের এক ডাল থেকে আরেক ডালে যাতায়াতের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে শস্য মাড়াইয়ের ক্ষেত্রেও সতর্কতার খাতিরে একই বিধান হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কেউ নামাজের বাইরে আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করে, এরপর নামাজে দাখিল হয়ে পুনরায় উক্ত আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করে, তবে নামাজের মধ্যে আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করার কারণে তার উপর আবার সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে। দলিল হলো, উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, দ্বিতীয় সিজদা নামাজভুক্ত হওয়ার কারণে অধিকতর শক্তিশালী। আর শক্তিশালী হওয়ার কারণে তা প্রথম সিজদাকে অন্তর্ভুক্তকারী। আর দ্বিতীয় সিজদা যখন প্রথম সিজদার অন্তর্ভুক্তকারী, তাই দ্বিতীয় সিজদাকে প্রথম সিজদার সাথে সংযুক্ত করার কোনোই যৌক্তিকতা নেই। কেননা, দ্বিতীয় সিজদাকে যদি প্রথম সিজদার সাথে সংযুক্ত করা হয় তখন তার মতলব এই দাঁড়াবে যে, দ্বিতীয় সিজদার জন্য

তিলাওয়াত পরে করা হয়েছে, আর সিজদা প্রথমে করা হয়েছে। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার সবব হলো তিলাওয়াত করা। সুতরাং উপরোক্ত সুরতে سبب তথা কারণ এর مؤخر হওয়া আর حكم -এর مقدم হওয়া লাযিম আসে, যা দুরস্ত নেই। সুতরাং বুঝা গেল উপরোক্ত সুরতে تداخل কঠিন। আর যখন تداخل কঠিন হলো তখন দ্বিতীয় সিজদা দ্বিতীয় তিলাওয়াতের কারণে ওয়াজিব হবে।

وَمَنْ كَرَّرَ تِلَاوَةَ سَجْدَةٍ الخ সুরতে মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি একই মাজলিসে একটি মাত্র আয়াতে সিজদাকে বারবার তিলাওয়াত করেছে, তাহলে সমস্ত তিলাওয়াতের জন্য একটি মাত্র সিজদাই যথেষ্ট হয়ে যাবে। দ্বিতীয় মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি এক মজলিসে আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করল, অতঃপর অন্যত্র গিয়ে পুনরায় ফিরে আসল এবং ঐ আয়াত পুনরায় তিলাওয়াত করল, তবে দ্বিতীয়বার সিজদা আদায় করে নিবে। আর যদি সে প্রথমবার সিজদা আদায় না করে থাকে তবে তার উপর দুই সিজদা আদায় করা ওয়াজিব হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, মূল নিয়ম হলো, استحسان। সিজদার ভিত্তি হলো تداخل তথা একত্রি করণের উপর। নতুবা কিয়াসের তাকাযা হলো, প্রত্যেক তিলাওয়াতের কারণে সিজদা ওয়াজিব হওয়া, মজলিস এক হোক বা বিভিন্ন হোক। কেননা, সিজদা হলো তিলাওয়াত -এর হুকুম, আর হুকুম سبب -এর বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন হয়। এ জন্য বারবার তিলাওয়াত দ্বারা বারবার সিজদাও ওয়াজিব হওয়া উচিত। বারবার তিলাওয়াত একই মজলিসে হোক বা বিভিন্ন মজলিসে হোক। استحسان -এর কারণ হলো, লোকদের থেকে কষ্টকে লাঘব করা। কেননা, মুসলমান কুরআনের تعليم ও تعلم -এর অধিক মুখাপেক্ষী। আর تعليم ও تعلم তাকরার ব্যতীত হাসিল হয় না। সুতরাং একই মজলিসে সিজদার এক আয়াতকে বারবার পড়ার কারণে যদি বারবার সিজদা করাকে অবধারিত করা হয়, তবে মানুষের কষ্ট হবে। অথচ শরিয়ত কর্তৃক কষ্ট দূরিভূত হয়েছে। এ জন্য বলা হয়েছে যে, উপরোক্ত সুরতে একই সিজদা ওয়াজিব হবে।

হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে যে, জিব্রাঈল আমীন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সিজদার একটি আয়াত নিয়ে আসতেন, আর তা বারবার দোহরাতেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি মাত্র সিজদা আদায় করতেন। অথচ সিজদায়ে তিলাওয়াতের সবব যেমনিভাবে তিলাওয়াত এমনিভাবে سماع তথা শ্রবণ করাও। তা ছাড়া হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, তিনি কূফার মসজিদে বসে লোকদেরকে কুরআনের তালীম দিতেন। যদি সিজদার আয়াত আসতো তাও বারবার পড়তেন। কিন্তু যেহেতু একই মজলিসে পড়তেন তাই একটি মাত্র সিজদা আদায় করতেন। (কিনায়া, ইনায়া)

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, تداخل (একত্রিতকরণ) দুই প্রকার। এক. تَدَاخُلٌ فِي السَّبَبِ. দুই. تَدَاخُلٌ فِي الْحُكْمِ। ইবাদাতের ব্যাপারে تَدَاخُلٌ فِي السَّبَبِ মুনাসিব। আর উকূবাত তথা শাস্তি বিষয়ক ক্ষেত্রে تَدَاخُلٌ فِي الْحُكْمِ মুনাসিব। ইবাদতের মধ্যে تَدَاخُلٌ فِي السَّبَبِ মুনাসিব হওয়ার কারণ হলো, যদি حكم -এর মধ্যে تداخل হয় আর سبب -এর মধ্যে تداخل না হয় তবে اسباب -এর تعدد বাকি থাকবে। আর যখন اسباب -এর মধ্যে تعدد বাকি থাকবে তখন سبب যা موجب للعبادة ছিল তা ইবাদত বিহীন পাওয়া যাবে। আর এর মধ্যে ترك احتياط রয়েছে। অথচ ইবাদত করার মধ্যে احتياط রয়েছে; তরক করার মধ্যে নয়। এ জন্য আমরা বলেছি ইবাদতের মধ্যে تَدَاخُلٌ فِي السَّبَبِ মুনাসিব। যাতে সব সবব এক সববের ন্যায় হয়ে যায় অতঃপর তার উপর হুকুম দেওয়া যায়। এর বিপরীত হলো عقوبات কেননা এগুলো আদায় করার মধ্যে কোনো احتياط তথা সর্তকতা নেই; বরং এগুলো দূর করার মধ্যে احتياط রয়েছে। এ জন্য عقوبات -এর ক্ষেত্রে تَدَاخُلٌ فِي الْحُكْمِ মুনাসিব تَدَاخُلٌ فِي السَّبَبِ মুনাসিব নয়। যাতে سبب موجب পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও হুকুম না পাওয়া যায়। আর سبب موجب পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও عقوبت পাওয়া না যাওয়া নিরেট আল্লাহর ফযল ও করমের নতীজা হবে। কেননা, কারীম (ক্ষমাশীল) কখনো কখনো শাস্তির কারণ থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন। উক্ত মতভেদের ফলাফল নিচের উদাহরণের মধ্যে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে। যেমন কোনো ব্যক্তি একবার জেনা করল এবং এ কারণে তাকে একবার হদ্দ লাগানো হলো। যদি এই ব্যক্তি পুনরায়য়ে জেনা করে তবে তাকে পুনরায় হদ্দ লাগানো হবে।

কেউ যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা আদায় করে নেয় অতঃপর পুনরায় ঐ মজলিসে ঐ আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে তার উপর দ্বিতীয় সিজদা ওয়াজিব হবে না। কেননা, সববের মধ্যে তাদাখুলের কারণে দুই তিলাওয়াত এক সববের স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে

وَاِمْكَانُ التَّدَاخُلِ الخ দ্বারা তাদাখুলের শর্ত বয়ান করা হয়েছে। তাই গ্রন্থকার বলেন, تداخل -এর শর্ত হলো সিজদার আয়াত আর মজলিস এক হওয়া। কেননা, نص (নস) ইজমা এবং حرج واحدة مجلس واحدة এবং ايت واحدة -এর সুরতে পাওয়া যায়। সুতরাং, তা ব্যতীত সব সুরত আসল কিয়াসের দিকে ফিরে যেতে হবে। দ্বিতীয় দলিল হলো, تداخل তখন সহীহ হবে যখন এমন কোনো জামে সবব পাওয়া যাবে যা সব সববকে একত্র করে এবং এক সববের পর্যায়ে নিয়ে আসে। আর এমন জামে সবব হলো মজলিস। কেননা, মজলিসই হলো বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলোকে একত্রকারী। যেমন– কোনো মজলিসে যদি ঈজাব ও কবূল উভয়টি পাওয়া যায় তখন বলা হয় কবূল ঈজাবের সাথে متصل হয়েছে। অথচ মূলত উভয়টি منفصل। সুতরাং বুঝা গেল, মজলিস ঈজাব ও কবূল উভয়ের একত্রকারী। এমনিভাবে কেউ যদি একই মজলিসে কিছু কিছু করে কয়েকবার বমি করে তখন একটি মাত্র বমি হয়েছে বলে ধরা হবে। এর দ্বারা বুঝা গেল মজলিস বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলোর একত্রকারী। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মজলিস এক থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বারবার তিলাওয়াত করা সত্ত্বেও একটি মাত্র সিজদা ওয়াজিব হবে। কিন্তু মজলিস যদি পরিবর্তন হয়ে যায় তবে হুকুম তার আসলের দিকে ফিরে যাবে। অর্থাৎ একই সিজদার আয়াত বারবার তিলাওয়াত করার দ্বারা বারবার সিজদা করা ওয়াজিব হবে।

মজলিস কখন পরিবর্তন হয়েছে বলে ধরা হবে? এ পর্যায়ে কিফায়া গ্রন্থকার বলেন, প্রথম মজলিস থেকে উঠে যদি দূরে কোথাও চলে যায়, তবে মজলিস পরিবর্তনের হুকুম দেওয়া হবে। আর যদি নিকটে কোথাও যায় তবে মজলিস একই থাকবে। আর কাছে ও দূরের পার্থক্যটি এভাবে সাব্যস্ত হবে যে, দুই তিন কদম পরিমাণ হলে কাছে ধরা হবে। এর থেকে বেশি হলে দূর ধরা হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, শুধু দাঁড়ানো দ্বারা মজলিস ভিন্ন হয় না। তবে مخيرة -এর ব্যাপারটি এ থেকে ভিন্ন. مخيرة ঐ নারীকে বলা হয় যাকে তার স্বামী اختارى نفسك বলে তালাকের ইখতিয়ার দিয়েছে। এখন এ مخيرة তথা ইখতিয়ারপ্রাপ্ত নারী যদি خيار -এর শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে যায় তবে তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। তবে খেয়ার এ জন্য বাতিল হয়নি যে, তার মজলিস ভিন্ন হয়ে গেছে। বরং এ জন্য যে, "দাঁড়ানো" গ্রহণ না করার ইঙ্গিত বহন করে। আর اعراض সরাসরি হোক বা ইঙ্গিতে হোক খেয়ারকে বাতিল করে দেয়। বিজ্ঞ গ্রন্থকার বলেন, কাপড়ের সুতা তানা করার সময় আসা-যাওয়াতে উজূবে সিজদা পুনরাবৃত্ত হতে থাকবে। অর্থাৎ তানা করার সময় যদি একটি সিজদার আয়াতকে বারবার তিলাওয়াত করে তবে যতবার তিলাওয়াত করা হবে ততগুলো সিজদা ওয়াজিব হবে। কেননা, আসা-যাওয়ার দ্বারা মজলিস পরিবর্তন হয়ে যায়। এমনিভাবে যদি গাছের এক ডালে বসে একটি আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করে অতঃপর অন্য ডালে গিয়ে ঐ আয়াতের পুনরাবৃত্তি করে তবে দুই সিজদা ওয়াজিব হবে। এটিই বিশুদ্ধ মত। এমনিভাবে শস্য মাড়াইয়ের ক্ষেত্রেও সতর্কতার খাতিরে একই বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এক আয়াতকে বারবার তেলাওয়াত করার দ্বারা বারবার সিজদা ওয়াজিব হবে। এতেই রয়েছে সর্তকতা।

وَلَوْ تَبَدَّلَ مَجْلِسُ السَّامِعِ دُوْنَ التَّالِيْ يَتَكَرَّرُ الْوُجُوْبُ عَلَى السَّامِعِ لِاَنَّ السَّبَبَ فِيْ حَقِّهِ السَّمَاعُ وَكَذَا اِذَا تَبَدَّلَ مَجْلِسُ التَّالِيْ دُوْنَ السَّامِعِ عَلٰى مَا قِيْلَ وَالْاَصَحُّ اَنَّهُ لَايَتَكَرَّرُ الْوُجُوْبُ عَلَى السَّامِعِ لِمَا قُلْنَا وَمَنْ اَرَادَ السُّجُوْدَ كَبَّرَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ اِعْتِبَارًا بِسَجْدَةِ الصَّلٰوةِ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) وَلَا تَشَهُّدَ عَلَيْهِ وَلَاسَلَامَ لِاَنَّ ذٰلِكَ لِلتَّحَلُّلِ وَهُوَ يَسْتَدْعِيْ سَبْقَ التَّحْرِيْمَةِ وَهُوَ مُنْعَدِمَةٌ ـ

অনুবাদ : যদি পাঠকারীর মজলিস অভিন্ন থেকে শ্রোতার মজলিস ভিন্ন হয় তাহলে শ্রোতার উপর ওয়জিব সিজদা পুনরাবৃত্ত হবে। কেননা, তার ক্ষেত্রে শ্রবণই হলো সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ। তদ্রূপ যদি শ্রোতার মজলিস অপরিবর্তিত থাকে আর পাঠকারীর মজলিস পরিবর্তিত হয়। এরূপই বলা হয়েছে। তবে বিশুদ্ধতম মত হলো, শ্রোতার উপর ওয়াজিব সিজদার হুকুম পুনরায় বর্তিবে না। কারণ আমরা আগেই বলেছি। যে ব্যক্তি সিজদা করার ইচ্ছা করবে, সে উভয় তাকবীর বলবে এবং সিজদায় যাবে। এরপর তাকবীর বলে মাথা উঠাবে, নামাজের সিজদার অনুসরণে। ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এমনই বর্ণিত হয়েছে। আর তার উপর তাশাহহুদ বা সালাম ওয়াজিব নয়। কেননা, তা তো করা হয় হালাল হওয়ার জন্য আর তার চাহিদা হয় পূর্ববর্তী তাহরীমার উপস্থিতি যা এখানে নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি সিজদার আয়াত শ্রবণকারীর মজলিস পরিবর্তন হয়ে যায় আর তিলাওয়াতকারীর মজলিস পরিবর্তন না হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রোতার উপর উজূবে সিজদার পুনরাবৃত্ত হবে। দলিল হলো, শ্রোতার ক্ষেত্রে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার সবব হলো শ্রবণ করা। আর যেহেতু মজলিস পরিবর্তন হওয়ার কারণে শ্রবণ বারবার হয়েছে এ জন্য উজূবে সিজদাও বারবার হবে। আর যদি তিলাওয়াতকারীর মজলিস পরিবর্তন হয়ে যায় কিন্তু শ্রোতার মজলিস পরিবর্তন না হয় তবে আল্লামা ফখরুল ইসলাম (র.)-এর মত অনুযায়ী এ সূরতেও সিজদার উজূব শ্রোতার উপর পুনরাবৃত্ত হবে। দলিল হলো, সিজদার আয়াত শ্রবণ করার ভিত্তি হলো তিলাওয়াতের উপর। আর তিলাওয়াতের মজলিস পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাই শ্রবণকেও তিলাওয়াতের উপর কিয়াস করা হবে। অর্থাৎ এভাবে বলা হবে যে, যখন তিলাওয়াতের মজলিস পরিবর্তন হয়ে গেল তখন حكما শ্রবণের মজলিসও পরিবর্তন হয়ে গেছে। কেউ কেউ এ দলিল বয়ান করেছেন যে, সিজদায়ে তিলাওয়াতের সবব তিলাওয়াতকারী ও শ্রোতা উভয়ের ক্ষেত্রেই তিলাওয়াত। মজলিস পরিবর্তন হওয়ার দরুন তিলাওয়াত বারবার হয়েছে, এ জন্য সিজদার উজূব তিলাওয়াতকারী ও শ্রোতা উভয়ের উপর বারবার হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত সুরতে শ্রোতার উপর উজূবে সিজদা বারবার হয় না। কেননা, শ্রোতার ক্ষেত্রে সিজদা ওয়াজিব হওয়ার سبب হলো শ্রবণ করা, আর শ্রবণের মজলিসে তাকরার হয়নি। এ জন্য তার উপর উজূবে সিজদাও বারবার হবে না।

وَمَنْ اَرَادَ السُّجُوْدَ كَبَّرَ الخ উপরোক্ত ইবারতে সিজদায়ে তিলাওয়াতের কায়ফিয়ত তথা পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। আর তা হলো যখন সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করার ইচ্ছা করা হবে তখন উভয় হাত উঠানো ব্যতীত তাকবীর বলে সিজদা করবে। তারপর তাকবীর বলে মাথা জমিন থেকে উঠাবে। দলিল হলো, নামাজের সিজদার উপর কিয়াস। এটাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত উভয় তাকবীর সুন্নত, ওয়াজিব নয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায়কারীর উপর তাশাহহুদও নেই; সালামও নেই। কেননা, তাশাহহুদ ও সালাম নামাজ থেকে বের হওয়ার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। আর নামাজ থেকে বের হওয়ার তাকাযা হলো প্রথমে তাহরীমা থাকা। অথচ এখানে তাহরীমা নেই। সুতরাং তাহরীমা না থাকার কারণে تحلل ও হবে না। আর تحلل (তথা নামাজ থেকে বের হওয়া) না হওয়ার কারণে তাশাহহুদ ও সালামও হবে না।

ফায়দা : কুদূরী ও হিদায়ার ইবারতে এ ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি যে, সিজদায়ে তিলাওয়াতের সময় কি পড়বে। তবে এ পর্যায়ে কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাজের সিজদায় যা পড়ে তাই পড়বে। আবার কেউ কেউ বলেছেন সিজদায়ে তিলায়াতে এ দোয়া পড়বে- سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ।

قَالَ وَيُكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ السُّوْرَةَ فِي صَلٰوةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَيَدَعَ آيَةَ السَّجْدَةِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْاِسْتِنْكَافَ عَنْهَا وَلَابَأْسَ بِأَنْ يَقْرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ وَيَدَعَ مَا سِوَاهَا لِأَنَّهُ مُبَادَرَةٌ إِلَيْهَا قَالَ مُحَمَّدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْرَأَ قَبْلَهَا آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ دَفْعًا لِوَهْمِ التَّفْضِيْلِ وَاسْتَحْسَنُوْا إِخْفَاءَهَا شَفَقَةً عَلَى السَّامِعِيْنَ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, নামাজের মধ্যে বা নামাজের বাইরে সিজদার আয়াত বাদ দিয়ে সূরা তিলাওয়াত করা মাকরূহ। কেননা, তা সিজদার আয়াতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের সদৃশ। তবে অন্যান্য অংশ বাদ দিয়ে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করাতে কোনো দোষ নেই। কেননা, এতে সিজদার আয়াতের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পায়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আমার কাছে পছন্দনীয় হলো, সিজদার আয়াতের পূর্বে এক বা দু' আয়াত পড়ে নেওয়া। যাতে এ ভুল ধারণা না হয় যে, আয়াতে সিজদার ফজিলত অধিক রয়েছে। শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে ফকীহগণ সিজদার আয়াত চুপি চুপি পড়া উত্তম মনে করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, নামাজ বা নামাজের বাইরে পুরো সূরা পড়া আর সিজদার আয়াতকে বাদ দেওয়া মাকরূহ। কারণ, এতে আয়াতে সিজদার প্রতি অবজ্ঞা বুঝা যায়। আর কুরআনে কারীমের কোনো আয়াতকে অবজ্ঞা করা হারাম এবং এটা কুফরি। সুতরাং যখন মৌলিকভাবে অবজ্ঞা করা হারাম তাহলে যা অবজ্ঞা সদৃশ তা অবশ্যই মাকরূহ হবে। আর যদি কেউ শুধু আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করে, অবশিষ্ট সূরা না পড়ে তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, এর দ্বারা সিজদার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পায়। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, পছন্দনীয় বক্তব্য হলো, সিজদার আয়াতের আগে এক বা দুই আয়াত পড়ে নেওয়া; তাহলে এ সন্দেহ হবে না যে, অপরাপর আয়াতের উপর সিজদার আয়াতের ফজিলত রয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে কুরআন হওয়ার ক্ষেত্রে সকল আয়াতই বরাবর। শ্রোতাদের যাতে কষ্ট না হয় এ জন্য ফুকাহায়ে কেরাম সিজদার আয়াত চুপি চুপি পড়া উত্তম মনে করেছেন। ইনায়া গ্রন্থকার মুহীত নামক গ্রন্থের হাওয়ালায় লিখেছেন যে, যদি তিলাওয়াতকারী একাকী হয় তবে যেভাবে ইচ্ছা তিলাওয়াত করতে পারে চুপি চুপি হোক বা স্বজোরে হোক। আর যদি তার সাথে অন্য কোনো লোক থাকে তবে মাশায়িখে হানাফিয়া বলেন, ঐ সকল লোকেরা যদি অজু অবস্থায় হয় এবং সিজদা করতে তাদের কোনো অসুবিধা নেই তবে তিলাওয়াতকারী জোরে তিলাওয়াত করবে। আর যদি তারা অজুবিহীন অবস্থায় হয় অথবা বুঝা যায় যে, তারা সিজদার আয়াত শুনে হয়তো সিজদা করবে না অথবা তাদের কষ্ট হবে, তবে তিলাওয়াতকারী ব্যক্তি চুপি চুপি তিলাওয়াত করবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

بَابُ صَلٰوةِ الْمُسَافِرِ

اَلسَّفَرُ الَّذِيْ يَتَغَيَّرُ بِهِ الْاَحْكَامُ اَنْ يَّقْصُدَ مَسِيْرَةَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا بِسَيْرِ الْاِبِلِ وَمَشْيِ الْاَقْدَامِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ كَمَالَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْمُسَافِرُ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا عَمَّتِ الرُّخْصَةُ الْجِنْسَ وَمِنْ ضَرُوْرَتِهٖ عُمُوْمُ التَّقْدِيْرِ وَقَدَّرَ اَبُوْيُوْسُفَ بِيَوْمَيْنِ وَاَكْثَرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَالشَّافِعِيُّ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِيْ قَوْلٍ وَكَفٰى بِالسُّنَّةِ حُجَّةً عَلَيْهِمَا .

পরিচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের নামাজ

অনুবাদ : যে সফর দ্বারা শরিয়তের আহকাম পরিবর্তিত হয়ে যায়, তা হলো, উটের চলার গতি বা পায়ে হেঁটে চলার গতি হিসাবে তিনদিন তিনরাত্র পরিমাণ দূরত্বে যাওয়ার ইচ্ছা করা। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুকীম ব্যক্তি মাসাহ করবে পূর্ণ একদিন একরাত, আর মুসাফির ব্যক্তি মাসাহ করবে তিনদিন তিনরাত। মাসাহ করার এই অবকাশ প্রত্যেক মুসাফিরকে শামিল করবে। এর অনিবার্য দাবি হচ্ছে সফরের সীমা ব্যাপক হওয়া। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) দু'দিন এবং তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সময়কে সফরের পরিমাণ বলে নির্ধারণ করেছেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর এক বর্ণনা মতে তিনি সফরের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন একদিন একরাত। উভয়ের বিপরীতে আলোচ্য হাদীসই প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সফর (سفر) -এর আভিধানিক অর্থ– দূরত্ব অতিক্রম করা। আর শরঈ পরিভাষায় সফর বলে এমন ভ্রমণকে যার কারণে আহকাম তথা বিধিবিধান পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন– নামাজে কসর করা, রমজান মাসে রোজা ভাঙ্গার অনুমতি, পায়ের মোজার উপর মাসাহ করার মেয়াদ একদিনের পরিবর্তে তিনদিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হওয়া, জুমা, দুই ঈদের নামাজ এবং কুরবানি করার وجوب রহিত হয়ে যাওয়া, মাহরাম ব্যতীত আজাদ মহিলাদের জন্য বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। প্রণিধানযোগ্য যে, শরঈ দৃষ্টিতে কেবলমাত্র ঐ ভ্রমণই সফর বলে গণ্য হবে, যার জন্য সফরের নিয়ত করা হয়েছে এবং কার্যত সফরও করা হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি তিনদিনের পথ অতিক্রম করার নিয়ত ব্যতীত সারা দুনিয়াও ঘুরে বেড়ায় তবুও সে শরিয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির বলে গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে শুধুমাত্র নিয়ত করে বসে থাকলেও মুসাফির বলে গণ্য হবে না।

মোটকথা, আহকাম পরিবর্তনকারী সফর ঐটাই হবে যার মাঝে কার্যত সফরের অস্তিত্ব এবং নিয়ত উভয়টা একই সাথে পাওয়া যাবে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ইকামতের জন্য শুধুমাত্র নিয়তই যথেষ্ট, অথচ সফরের জন্য শুধু নিয়ত যথেষ্ট নয়, এটা কেন? এর উত্তর হলো, সফর হচ্ছে একটি কাজ। আর কাজের ক্ষেত্রে শুধু নিয়তই যথেষ্ট হয় না; বরং এর জন্য কার্যকরী পদক্ষেপও প্রয়োজন হয়। যেমন– নামাজ একটি কর্মমূলক আমল। তাই এর জন্য শুধু নিয়তই যথেষ্ট হয় না; বরং এর সাথে সাথে দাঁড়ানো, রুকু করা, সিজদা করা ইত্যাদি কর্মমূলক আমলগুলোরও প্রয়োজন হয়, অন্যথায় নামাজ হয় না। পক্ষান্তরে ইকামত হচ্ছে ترك فعل তথা কর্ম বর্জনের (সফরের কর্ম) নাম। আর ترك فعل শুধুমাত্র নিয়ত দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এর জন্য কোনো কর্মমূলক পদক্ষেপ নিতে হয় না।

কুদূরী প্রণেতা বলেন, যে সফর দ্বারা শরিয়তের বিধিবিধানের মাঝে পরিবর্তন সাধিত হয়, তা এমন যার ক্ষেত্রে মানুষ তিনদিন তিনরাত্র সফর করার সংকল্প করে। চলার ক্ষেত্রে উটের চলা, পায়ে হাঁটা কিংবা গরুর চলা ধর্তব্য। অবশ্য এ ব্যাপারে প্রত্যেক দেশের বছরের সবচেয়ে ছোট দিনকে মাপকাঠি হিসাবে ধরা হবে। এ কথাও প্রণিধানযোগ্য যে, রাতদিন দ্বারা ২৪ ঘন্টার চলাকে বুঝানো হয়নি; বরং প্রতিদিন সকাল থেকে সূর্য হেলার সময় পর্যন্ত চলাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ একাধারে ২৪ ঘন্টা পায়ে চলার সাধ্য না মানুষের আছে, না কোনো বাহনের আছে। সুতরাং প্রতিদিন সকাল থেকে সূর্য হেলা পর্যন্ত চলার পর কোনো মঞ্জিলে অবস্থান করে পরদিন আবার এভাবে চলে কোনো মঞ্জিলে অবস্থান করবে এবং তার পরদিনও সকালে চলতে শুরু করে সূর্য হেলার পর অবস্থান করবে। এভাবে তিনদিন তিনরাত্র চলার পর যে দূরত্ব অতিক্রম করা হয় এই পরিমাণ দূরত্বই হচ্ছে সফরের পরিমাণ।

সফরের পরিমাণ তিনদিন তিনরাত নির্ধারণ করার ব্যাপারে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয় এই হাদীসটি–

يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ كَمَالَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا -

অর্থ ঃ মুকীম ব্যক্তি পূর্ণ একদিন একরাত মাসাহ করবে আর মুসাফির ব্যক্তি তিনদিন তিনরাত মাসাহ করবে।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়া হয় এভাবে যে, এখানে المسافر। কথাটির মাঝে الف لام। অব্যয়টি استغراقى। অর্থাৎ সার্বজনীন। এর দ্বারা সকল মুসাফির ব্যক্তি এই মাসাহ-এর অবকাশের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এ কথার মর্ম হচ্ছে– প্রত্যেক মুসাফির তিনদিন তিনরাত্র মাসাহ করতে পারবে। আর প্রত্যেক মুসাফির তখনই তিনদিন তিনরাত্র মাসাহ করার ক্ষমতা রাখবে যখন সফরের ন্যূনতম মেয়াদ হবে তিনদিন তিনরাত্র। যদি সফরের মেয়াদ এর চেয়ে কম ধরা হয়, তাহলে প্রত্যেক মুসাফির তিনদিন তিনরাত মাসাহ করতে সক্ষম হবে না। অথচ হাদীস দ্বারা প্রত্যেক মুসাফিরের মাসাহ করার ক্ষমতা তিনদিন তিনরাত প্রমাণিত। অতএব, এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, সফরের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিনদিন তিনরাত।

হানাফী মাযহাবের ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সফরের সর্বনিম্ন মেয়াদ পূর্ণ দু'দিন আর তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সময়। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর এক বর্ণনা মতে সফরের সর্বনিম্ন মেয়াদ একদিন একরাত। ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে সফরের সর্বনিম্ন মেয়াদ চার "ফরসখ"। এটা ইমাম শাফিঈ (র.)-এরও একটি মত। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে পেশ করা হাদীসটি বিপক্ষের উভয় মতের বিপরীতে দলিল হিসেবে যথেষ্ট।

وَالسَّيْرُ الْمَذْكُورُ هُوَ الْوَسَطُ وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَلتَّقْدِيْرُ بِالْمَرَاحِلِ وَهُوَ قَرِيْبٌ مِنَ الْاَوَّلِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْفَرَاسِخِ هُوَ الصَّحِيْحُ وَلَا يُعْتَبَرُ السَّيْرُ فِى الْمَاءِ مَعْنَاهُ لَايُعْتَبَرُ بِهِ السَّيْرُ فِى الْبَرِّ فَاَمَّا الْمُعْتَبَرُ فِى الْبَحْرِ فَمَا يَلِيْقُ بِحَالِهِ كَمَا فِى الْجَبَلِ قَالَ وَفَرْضُ الْمُسَافِرِ فِى الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَتَانِ لَايَزِيْدُ عَلَيْهِمَا وَقَالَ الشَّافِعِىُّ فَرْضُهُ الْاَرْبَعُ وَالْقَصْرُ رُخْصَةٌ اِعْتِبَارًا بِالصَّوْمِ وَلَنَا اَنَّ الشَّفْعَ الثَّانِىْ لَايُقْضَى وَلَايَاْثَمُ عَلَى تَرْكِهِ وَهٰذَا اٰيَةُ النَّافِلَةِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ لِاَنَّهُ يُقْضَى .

অনুবাদ : আর উল্লিখিত পথ চলা দ্বারা মধ্যম গতির পথ চলাকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মঞ্জিল দ্বারা দূরত্ব নির্ধারণ করেছেন। আর তা প্রথমোক্ত মতের নিকটবর্তী। ফরসখ দ্বারা দূরত্ব নির্ধারণ করা গ্রহণযোগ্য নয়। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। আর নৌপথের চলার গতিকে গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ স্থলপথের জন্য নৌপথের যাত্রাকে পরিমাপ হিসাবে গণ্য করা হবে না। অবশ্য সমুদ্রের ক্ষেত্রে তার উপযোগী পরিমাপ বিবেচ্য হবে। যেমন পার্বত্য পথের হুকুম। ইমাম কুদূরী বলেন, চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজে মুসাফিরের জন্য ফরজ হলো দু' রাকআত। এর অধিক আদায় করবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, তার ফরজ তো চার রাকআতই। তবে কসর হলো তার জন্য রুখসত রোজার উপর কেয়াস করে। আমাদের দলিল হলো, শেষের দু' রাকআত না কাজা করতে হয় না তরক করার কারণে গুনাহ হয়। আর এটা হলো নফল হওয়ার আলামত। রোজার ব্যাপারটি এর বিপরীত। কারণ রোজার কাজা করতে হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উটের চলা কিংবা পায়ে চলা বলতে মধ্যম গতির পথ চলাকে বুঝানো হয়েছে। খুব দ্রুতগতি কিংবা ধীরগতির পথ চলা উদ্দেশ্য নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে এই মর্মে একটি অভিমত বর্ণিত আছে যে, সফরের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিন মঞ্জিল। অর্থাৎ কেউ যদি তিন মঞ্জিল পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করার নিয়তে সফর শুরু করে। তাহলে সে শরিয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির বলে গণ্য হবে। হিদায়া প্রণেতা বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এই মতটিও প্রথমোক্ত মতের নিকটবর্তী। কারণ সাধারণত মানুষ একদিনে এক মঞ্জিল পথই অতিক্রম করে থাকে। বিশেষ করে ছোট দিনে। সুতরাং সফরের মেয়াদ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনদিন বলা আর তিন মঞ্জিল বলা ফলত একই কথা। হিদায়া প্রণেতা বলেন, বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী ফরসখ দ্বারা সফরের দূরত্ব নির্ণয় করা গ্রহণযোগ্য নয়। এক ফরসখের সমপরিমাণ হচ্ছে তিন মাইল। মাশায়িখে কেরামের ব্যাপক অভিমত হচ্ছে ফরসখের হিসাবকে গণ্য করা। তাই কোনো কোনো ফকীহ এগার ফরসখের কথা বলেছেন, আবার কেউ আঠার ফরসখের কথা বলেছেন। আর অপরদিকে কেউ পনের ফরসখের কথাও উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ السَّيْرُ الخ ঃ কেউ যদি সামুদ্রিক পথে নৌযান যোগে ভ্রমণ করে, তাহলে তার যাত্রা পরিমাপ করা হবে নৌপথের উপযোগী পরিমাপ অনুযায়ী। অর্থাৎ বাতাস যদি অনুকূল কিংবা প্রতিকূল না হয়ে শুধু স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হয়, তাহলে সে অবস্থায় তিনদিন তিনরাতে যে পরিমাণ পথ চলা যায়, সেটাই হবে সফরের নির্ধারিত সীমা। যেমন পার্বত্য পথের ক্ষেত্রে তিনদিন তিনরাতই পরিমাপ হিসাবে গণ্য হয়, যদিও সমতল পথে তিনদিন তিনরাতের চেয়েও কম সময়ে এই পরিমাণ পথ অতিক্রম করা যায়।

উপরোক্ত ইবারতের সারমর্ম হচ্ছে– সামুদ্রিক ভ্রমণে স্থল পথের ভ্রমণের পরিমাপকে গণ্য করা হবে না। যেমন– কোনো জায়গায় পৌঁছার জন্য দু'টি পথ আছে, একটি নৌপথ, অপরটি স্থলপথ। নৌপথে সেখানে পৌঁছতে সময় লাগে দুইদিন, আর স্থলপথে লাগে তিনদিন তিনরাত। কেউ যদি স্থলপথে সেখানে পৌঁছে তাহলে সে মুসাফির বলে গণ্য হবে। আর যদি নৌপথে পৌঁছে তাহলে সে সফরের রুখসত বা অবকাশ লাভের অধিকারী হবে না।

قَوْلُهُ قَالَ وَفَرْضُ الْمُسَافِرِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আমাদের মতে চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে মুসাফিরের জন্য দু' রাকআত ফরজ। এর চেয়ে অতিরিক্ত আদায় করা জায়েজ নেই। মোটকথা হলো, আমাদের মতে মুসাফিরের জন্য কসর হচ্ছে رخصت اسقاط, অর্থাৎ এমন রুখসত যা চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজের দু' রাকআতকে জিম্মাদারী থেকে রহিত করে দেয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, মুসাফিরের জন্য কসর হচ্ছে رخصت ترفيه, অর্থাৎ মুসাফিরের সুবিধার্থে চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজে দু' রাকআত আদায় করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য চার রাকআতে তার জন্য পুরা চার রাকআতই ফরজ এবং চার রাকআত আদায় করাই উত্তম। এটি ইমাম আহমদ (র.)-এরও অভিমত। আর ইমাম মালিক (র.)-এর এক রায়ও এ বক্তব্যের অনুরূপ।

ইমাম শাফিঈ (র.) রোজার উপর কিয়াস করে দলিল পেশ করেন। তাঁর যুক্তি হচ্ছে রমজান মাসে মুসাফিরের জন্য যেমনিভাবে রোজা না রাখার অনুমতি আছে, তবে রোজা রাখা উত্তম; তেমনি চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজের বেলায়ও দু' রাকআত পড়ার অনুমতি আছে, তবে চার রাকআত পড়াই উত্তম। দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে কুরআন মাজীদের আয়াত فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ অর্থাৎ "নামাজে কসর করতে তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই।" এই আয়াত দ্বারা দলিল দেওয়া হয় এভাবে যে, এখানে لاجناح শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয় কোনো কিছুকে প্রমাণ করার জন্য ওয়াজিব প্রমাণ করার জন্য নয়। যেমন অন্য আয়াতে বর্ণিত আছে– لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ طَلَّقْتُمُ مباح النساء। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, কসর করা ওয়াজিব নয়, বরং মুবাহ। অপরাপর মুবাহ-এর ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তির জন্য তা পালন করা না করার এখতিয়ার থাকে, তেমনি এ ক্ষেত্রেও মুসাফিরের জন্য দু' রাকআত না পড়ে চার রাকআত পড়ার এখতিয়ার থাকবে।

তৃতীয় দলিল হচ্ছে হযরত ওমর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি– عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَشْكَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ مَالَنَا نَقْصُرُ وَقَدْ اَمِنَّا وَلَا نَخَافُ شَيْئًا وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنْ خِفْتُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّمَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ - অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আয়াতটি আমাকে দ্বিধায় ফেলে দিল। তখন আমি রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আমরা কি কসর করব? অথচ আমরা নিরাপদ। আমাদের কোনো কিছুর ভয় নেই। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা ان خفتم বলে কসরকে ভয়ের সাথে শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন। উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দেওয়া সদকা। সুতরাং তাঁর প্রদত্ত সদকাকে কবুল কর।

প্রণিধানযোগ্য যে, উক্ত হাদীসে কসরকে কবুলের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। আর কসরকে বলা হয়েছে সদকা। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যাকে সদকা প্রদান করা হয়, তার জন্য সেটা গ্রহণ করা না করার এখতিয়ার থাকে। সদকা গ্রহণ করাটা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

আমাদের দলিল হলো, মুসাফির ব্যক্তি সফর অবস্থায় যে চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজে দু'রাকআত আদায় করে, তার জন্য অবশিষ্ট দু'রাকআত মুকীম অবস্থায় পুনরায় আদায় করা ফরজ নয়। আবার তা পুনরায় আদায় না করার দরুন সে গুনাহগারও হয় না। এভাবে পুনরায় আদায় করা অপরিহার্য না হওয়া এবং আদায় না করার দরুন গুনাহগার না হওয়াটাই উক্ত দু' রাকআত নফল হওয়ার আলামত। এ থেকেই বুঝা যায় যে, মুসাফির ব্যক্তির উপর দু'রাকআতই আদায় করা ফরজ।

আমাদের দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে এই হাদীসটি– عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَاُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَزِيْدَتْ فِي الْحَضَرِ - (بخارى و مسلم) অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নামাজ দু'রাকআত দু'রাকআত করেই ফরজ হয়েছে। সফরের বেলায় তা আপন অবস্থায় বহাল রয়েছে, আর মুকীমের বেলায় অতিরিক্ত দু'রাকআত যুক্ত করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে। তা হচ্ছে– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلٰوةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ . হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর মুখ দিয়ে মুকীম অবস্থার জন্য চার রাকআত এবং সফর অবস্থার

জন্য দু'রাকআত নামাজ ফরজ করেছেন। তিবরানী বর্ণিত হাদীস হচ্ছে– اِفْتَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فِى السَّفَرِ كَمَا اِفْتَرَضَ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا – অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরের জন্য দু'রাকআত নামাজ ফরজ করেছেন। যেমন, মুকীম অবস্থার জন্য ফরজ করেছেন চার রাকআত।

বুখারী শরীফে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন– صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ لَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ وَصَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ – "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম, এ সময় তিনি দু'রাকআতের বেশি আদায় করেননি। এমনিভাবে তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়। অতপঃর হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে সফর করেছি তিনিও দু'রাকআতের বেশি আদায় করেননি। এ অবস্থায়ই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এরপর আমি হযরত ওসমান (রা.)-এর সাথে সফর করেছি। তিনিও দু'রাকআতের বেশি আদায় করেননি এবং তিনিও এ অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন "আল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

উপরোক্ত সকল হাদীস দ্বারা এ কথাই প্রমাণ হয় যে, সফরের নামাজ দু'রাকআত। যদি ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দাবি অনুযায়ী সফরে চার রাকআত আদায় করাই উত্তম হতো, তাহলে খোদ রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ তা পরিত্যাগ করতেন না।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর কেয়াসের জবাব ঃ মুসাফিরের নামাজকে তাঁর রোজার উপর কেয়াস করা বিধিসম্মত নয়। কারণ মুসাফিরকে যদিও রমজানে রোজা না রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা কাজা করার দায়িত্ব তার উপর থেকে তুলে নেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে মুসাফিরকে দু'রাকআত قصر আদায় করার অবকাশ এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যে, অবশিষ্ট দু'রাকআত আর কাজা করতে হবে না। সুতরাং মুসাফিরের নামাজ আর রোজার রুখসতকে একই ধরনের রুখসত মনে করার অবকাশ নেই।

মোটকথা, কোনো আমল যদি এমন হয় যে, এর বদলও ওয়াজিব নয় আবার তা তরক করলেও গুনাহ হয় না, তাহলে এ অবস্থা উক্ত আমলটির নফল হওয়ার নিদর্শন।

ইমাম শাফি'ঈ (র.) কর্তৃক পেশকৃত আয়াতের জবাব এই যে, উক্ত আয়াতে নামাজের গুণাগুণের (اوصاف) কসরের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ দুশমনের ভয়ের দরুন কেয়াম বাদ দিয়ে قعود এখতিয়ার করা, রুকু সিজদা বাদ দিয়ে ইশারায় নামাজ আদায় করা ইত্যাদির অবকাশকে বুঝানো হয়েছে। আর আমাদের মাযহাব অনুযায়ী ভয়ের সময় اوصاف-এর কসর করা ওয়াজিব নয়; বরং মুবাহ। অতএব, এ আয়াত দ্বারা যেহেতু اوصاف-এর কসর বুঝানো হয়েছে, সেহেতু এটাকে রাকআতের কসরের পক্ষে দলিল হিসাবে পেশ করা ঠিক হবে না। যদি এ কথা মেনেও নেওয়া হয় যে, এ আয়াতে রাকআতের কসরই বুঝানো হয়েছে, তবুও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পক্ষ থেকে করা এ দাবি ঠিক নয় যে, لاجناح কথাটিকে ওয়াজিব বুঝানোর জন্য উল্লেখ করা হয় না; বরং তা উল্লেখ করা হয় মুবাহ বুঝানোর জন্য। কারণ আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন– اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা لاجناح বলে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করাকে ওয়াজিব করেছেন। এ ক্ষেত্রে খোদ ইমাম শাফি'ঈ (র.)ও لاجناح "কথা দ্বারা মুবাহ বুঝানো হয়েছে বলেননি"। যেমনটি তাফসীরে জালালাইনে উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পক্ষ থেকে পেশ করা হাদীসের জবাব হচ্ছে যে, অত্র হাদীসটি ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর নয়; বরং আমাদের দলিল। কারণ হাদীসে فاقبلوا আমর তথা আদেশসূচক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। আর আমাদের মাযহাব অনুযায়ী আমর ওয়াজিব বুঝানোর জন্য আসে। সুতরাং যে কসরকে সদকা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তা গ্রহণ করা মুবাহ নয় বরং ওয়াজিব। অপর আরেকটি জবাব হলো, সদকা দু' প্রকার। এক. মালিকানামূলক যেমন আর্থিক সদকা। দুই. اسقاط তথা ফেলে দেওয়া মূলক। যেমন– গোলাম আজাদ করা, কেসাসের হক ক্ষমা করে দেওয়া ইত্যাদি।

মূলনীতি হলো, যদি মালিকানামূলক সদকা হয়, তাহলে তা রদ করে দিলে রদ হয়ে যায়। কিন্তু যদি اسقاط মূলক সদকা হয়, তাহলে রদ করার দ্বারা রদ হয় না। আর কসরও হচ্ছে اسقاط মূলক সদকা। তাই এটাকেও রদ করার দ্বারা রদ হবে না। অতএব, তা মান্য করা ওয়াজিব বলেই সাব্যস্ত হলো।

وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا وَقَعَدَ فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَجْزَأَتْهُ الْأُولَيَانِ عَنِ الْفَرْضِ وَالْأُخْرَيَانِ لَهُ نَافِلَةٌ إِعْتِبَارًا بِالْفَجْرِ وَيَصِيرُ مُسِيئًا لِتَأْخِيرِ السَّلَامِ وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَهَا بَطَلَتْ لِإِخْتِلَاطِ النَّافِلَةِ بِهَا قَبْلَ إِكْمَالِ أَرْكَانِهَا وَإِذَا فَارَقَ الْمُسَافِرُ بُيُوتَ الْمِصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ تَتَعَلَّقُ بِدُخُولِهَا فَيَتَعَلَّقُ السَّفَرُ بِالْخُرُوجِ عَنْهَا وَفِيهِ الْأَثَرُ عَنْ عَلِيٍّ (رض) لَوْ جَاوَزْنَا هٰذَا الْخُصَّ لَقَصَرْنَا ـ

অনুবাদ : যদি মুসাফির ব্যক্তি চার রাকআতই আদায় করে এবং প্রথম দুই রাকআতের পর তাশাহহুদ পাঠ করার পরিমাণ সময় বসে, তাহলে তার প্রথম দু' রাকআত দ্বারা ফরজ আদায় হবে আর বাকি দু' রাকআত নফল হিসাবে গণ্য হবে ফজরের উপর কেয়াস করে। অবশ্য সালাম বিলম্ব করার কারণে গুনাহগার হবে। আর যদি দ্বিতীয় রাকআতে তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক না করে, তাহলে ফরজের রুকনগুলো পূর্ণ হওয়ার আগেই তার সাথে নফল যুক্ত হওয়ার কারণে ঐ নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর মুসাফির যখন শহরের আবাদী ত্যাগ করবে, তখন থেকেই দু' রাকআত আদায় করতে থাকবে। কারণ মুকীম হওয়ার সম্পর্ক হচ্ছে– এই আবাদীতে প্রবেশ করার সাথে। সুতরাং সফরের সম্পর্কও এই আবাদী ত্যাগ করার সাথেই হবে। এই সম্পর্কে হযরত আলী (রা.) থেকে নিম্নোক্ত বাণীটি বর্ণিত আছে, لَوْجَاوَزْنَا هٰذَا الْخُصَّ لَقَصَرْنَا অর্থাৎ যদি আমরা এই শহরের আবাদী ত্যাগ করি, তাহলে কসর পড়ব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য মাসআলাটি হিদায়া প্রণেতা ফজরের নামাজের উপর কেয়াস করেছেন। কেউ যদি ফজরের নামাজ চার রাকআত পড়ে এবং তা দ্বিতীয় রাকআতে বৈঠকের মাধ্যমে করে, তাহলে তার ফজরের দু' রাকআত ফরজ আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য সালাম বিলম্বে আদায়ের দায়ে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু উক্ত মুসল্লী যদি দ্বিতীয় রাকআতে তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক না করে, তাহলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। এর দলিল হলো, ফরজের রুকনগুলো পূর্ণ হওয়ার আগেই তার সাথে নফলের সংমিশ্রণ হয়ে গেছে। আর ফরজের রুকনগুলো পূর্ণ না হওয়ার কারণ হলো শেষ বৈঠক যা একটি রুকন তা বর্জন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِذَا فَارَقَ الْمُسَافِرُ الخ ঃ প্রশ্ন হলো, সফর শুরু করার পর কখন থেকে কসর করা শুরু করবে। এর হুকুম হলো আবাদী থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই মুসাফিরের উপর কসর করা ওয়াজিব হয়ে যায়। এর দলিল হলো, মুসাফির যখন নিজ শহরের আবাদীতে প্রবেশ করে, তখন থেকেই তার সাথে ইকামতের হুকুম সম্পর্কিত হয়ে যায়। সুতরাং যখন আবাদী থেকে বের হবে তখন থেকে মুসাফিরের হুকুমও তার সাথে সম্পর্কিত হবে। এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা.)-এর একটি উক্তি বর্ণিত আছে। তা হচ্ছে– لَوْ جَاوَزْنَا هٰذَا الْخُصَّ لَقَصَرْنَا - خص শব্দের অর্থ– বাঁশ বা কাঠের ঝুপড়ি। হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণিত উক্তিটির অর্থ হচ্ছে যদি আমরা এই ঝুপড়ি তথা আবাদী এলাকার গৃহসমূহ অতিক্রম করি, তখনই কসর করব। এর প্রতি সমর্থন পাওয়া যায় হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস থেকে। তিনি বলেন–

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ -

অর্থাৎ "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদীনায় জোহরের নামাজ পড়েছি চার রাকআত। আর যুল হুলায়ফায় আসরের নামাজ পড়েছি দু' রাকআত।"

وَلَا يَزَالُ عَلٰى حُكْمِ السَّفَرِ حَتّٰى يَنْوِىَ الْإِقَامَةَ فِىْ بَلْدَةٍ اَوْ قَرْيَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا اَوْ اَكْثَرَ وَاِنْ نَوٰى اَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ قَصَرَ لِاَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ مُدَّةٍ لِاَنَّ السَّفَرَ يُجَامِعُهُ اللُّبْثُ فَقَدَّرْنَاهَا بِمُدَّةِ الطُّهْرِ لِاَنَّهُمَا مُدَّتَانِ مُوْجِبَتَانِ وَهُوَ مَاْثُوْرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ (رض) وَالْاَثَرُ فِىْ مِثْلِهِ كَالْخَبَرِ وَالتَّقْيِيْدُ بِالْبَلْدَةِ وَالْقَرْيَةِ يُشِيْرُ اِلٰى اَنَّهُ لَاتَصِحُّ نِيَّةٌ فِى الْمَفَازَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ -

অনুবাদ : আর কোনো শহরে বা জনপদে ১৫ দিন কিংবা তার চেয়ে বেশি দিন অবস্থান করার নিয়ত করা পর্যন্ত সফরের হুকুম অব্যাহত থাকবে। যদি এর চেয়ে কম সময় থাকার নিয়ত করে, তাহলে কসর করবে। কারণ এর মাঝে সময়ের বিষয়টি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কেননা সফরের মাঝেও (বিরতিমূলক) অবস্থান থাকে। তাই আমরা ইকামতের মেয়াদ নির্ধারণ করেছি তুহরের মেয়াদের উপর অনুমান করে। কারণ উভয়টাই এমন মেয়াদ যা কিছু হুকুম আরোপ (واجب) করে। আর এটি ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে সাহাবীর বাণীও হাদীসের মতো। শহর বা জনপদের শর্ত এই ইঙ্গিত করে যে, মাঠে-প্রান্তরে ইকামতের নিয়ত করা সহীহ নয়। এটাই জাহির রিওয়ায়াত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসাফিরের সফরের হুকুম ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতক্ষণ না সে কোনো শহর বা গ্রামে পনেরো বা ততোধিক সময় অবস্থান করার নিয়ত করে। যদি এ ধরনের নিয়ত করে ফেলে, তাহলে তার সফরের হুকুম শেষ হয়ে যাবে। যদি পনেরো দিনের কম সময় অবস্থান করার নিয়ত করে, তাহলে আমাদের মাযহাব মতে সে মুকীম বলে গণ্য হবে না; বরং মুসাফিরের হুকুমেই থেকে যাবে। সে কসর করতে থাকবে।

ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফি'ঈ (রা.) বলেন, চার দিনের নিয়ত করলেই মুকীম হয়ে যাবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর এমন একটি মত আছে যে, যদি কোনো মুসাফির চার দিনের অতিরিক্ত সময় কোথাও অবস্থান করে, তাহলেই সে মুকীম হয়ে যাবে। ইকামতের নিয়ত করুক বা না করুক।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল কুরআন মাজীদের এই আয়াত- اِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ - অর্থাৎ এবং তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই।-(সূরা নিসা, আয়াত- ১০১)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ضَرْبٌ فِى الْاَرْضِ তথা পথচলা অবস্থায় কসর করাকে মুবাহ করেছেন। যার বিপরীত অর্থ (مفهوم مخالف) হচ্ছে, যদি পথচলা বা ضَرْبٌ فِى الْاَرْضِ না পাওয়া যায়, তাহলে কসরের অনুমতি নেই। আর মুসাফির যখন ইকামতের নিয়ত করে, তখন সে ضَرْبٌ فِى الْاَرْضِ ত্যাগ করে। যখন ضَرْبٌ فِى الْاَرْضِ ত্যাগ করে, তখন তার জন্য কসর করা মুবাহ থাকে না। অবশ্য এই দলিলের উপর এমন আপত্তি আরোপ করা যায় যে, তাহলে তো চারদিনের নিয়ত করারও কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই; বরং যখনই চারদিনের চেয়ে কম সময়ের জন্যও ইকামতের নিয়ত করবে, তখনই কসর করার অনুমতি না থাকার কথা। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পক্ষ থেকে এর জবাব হচ্ছে, আয়াতের দাবিতো এটাই, তবে আমরা ইজমা দলিলের দরুন চারদিনের শর্ত আরোপ করেছি। কারণ এর চেয়ে কম সময়ের নিয়ত দ্বারা মুকীম হওয়ার দাবি কারো পক্ষ থেকেই করা হয়নি।

আমাদের মাযহাব মতে মুকীম হওয়ার জন্য শর্ত হলো নিয়ত করা। যদি একামতের নিয়ত না করে কেউ পনেরো দিনের চেয়েও বেশি সময় অবস্থান করে, তবু সে মুকীম বলে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে মুকীম হওয়ার জন্য নিয়ত করা শর্ত নয়। তাঁর দলিল হলো হযরত ওসমান (রা.)-এর এই হাদীসটি مَنْ اَقَامَ اَرْبَعًا اَتَمَّ অর্থাৎ যে ব্যক্তি চারদিন কেয়াম করবে সে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে। এখানে নিয়তের কথা উল্লেখ নেই। অতএব, বুঝা যাচ্ছে যে, মুকীম হওয়ার জন্য নিয়ত করা শর্ত নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, একজন মুসাফিরের জন্য জরুরি নয় দিনরাত্র চব্বিশ ঘণ্টা তার সফর অব্যাহত রাখা; বরং সে চলার পথে এ সময়ের মধ্যে কোথাও অবস্থানও করে। এমনকি কখনও কখনও বেশ লম্বা সময়ও অবস্থান করে। মোটকথা, পথচলা আর অবস্থান করা উভয় মিলেই সফর। আর এটাও দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে, কোথাও অবস্থান করার নামই হচ্ছে একামত করা বা মুকীম হওয়া। তাই এ ধরনের স্বল্প মেয়াদী একামত আর শরিয়তের বিধান পরিবর্তনকারী একামতের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করার স্বার্থে একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তার তাগিদেই আমরা তুহরের মুদ্দতের উপর কেয়াস করে ইকামতের মুদ্দতও পনেরো দিন নির্ধারণ করেছি। প্রশ্ন হতে পারে যে, কেয়াসের علت مشترك টা কি? এ সম্পর্কে হিদায়া প্রণেতা বলেন, উভয়ের মাঝে এমন একটা হুকুম পাওয়া যায়, যা علت مشترك বলে বিবেচিত হতে পারে। তা হলো হায়েযের সময় সাকেত হয়ে যাওয়া আমলগুলো যেমনিভাবে তুহরের মেয়াদ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে আসে তেমনিভাবে সফরের সময়ে সাকেত হয়ে যাওয়া আমলগুলোও আবার মুকীম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে। এই মিলের কারণেই ইকামতের মেয়াদকে তুহরের মেয়াদের উপর কেয়াস করা হয়েছে। ঠিক এ কারণেই হায়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিনদিনের উপর কেয়াস করে সফরের মেয়াদও তিনদিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

হিদায়া রচয়িতা বলেন, ইকামতের মেয়াদ পনেরো দিন হওয়ার ব্যাপারটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং ইবনে ওমর (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا اِذَا دَخَلْتَ بَلْدَةً وَاَنْتَ مُسَافِرٌ وَفِىْ عَزْمِكَ اَنْ تُقِيْمَ بِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا . فَاَكْمِلِ الصَّلٰوةَ وَاِنْ كُنْتَ لَاتَدْرِىْ مَتٰى تَظْعَنُ فَاقْصِرْ .

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ইবনে ওমর (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, যদি তুমি মুসাফির অবস্থায় কোনো শহরে প্রবেশ কর, আর তোমার সংকল্প থাকে যে এখানে পনেরো দিন অবস্থান করবে, তাহলে তুমি পরিপূর্ণ সালাত আদায় করবে। আর যদি জানা না থাকে যে, কখন সফর করবে, তাহলে কসর অব্যাহত রাখো। হিদায়া প্রণেতা বলেন, পনেরো দিন ধার্য করার বিষয়টি শরয়ী পরিমাণের অন্তর্ভুক্ত। আর দিন নির্ধারণ করার কাজটি এমন, যা বুদ্ধি বা কিয়াস দিয়ে করা সম্ভব নয়। আর মূলনীতি হলো কিয়াসের আওতাভুক্ত নয় এমন বিষয়ে সাহাবীর বক্তব্য হাদীসের মর্যাদা তুল্য। এ থেকে মনে হওয়া অতি স্বাভাবিক যে, হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত ইবনে ওমর (রা.) পনেরো দিন নির্ধারণ করার বিষয়টি শরয়ী পরিমাণের অন্তর্ভুক্ত। আর দিন নির্ধারণ করার কাজটি এমন, যা বুদ্ধি বা কিয়াস দিয়ে করা সম্ভব নয়। আর মূলনীতি হলো কিয়াসের আওতাভুক্ত নয় এমন বিষয়ে সাহাবীর বক্তব্য হাদীসের মর্যাদা তুল্য। এ থেকে মনে হওয়া অতি স্বাভাবিক যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত ইবনে ওমর (রা.) পনেরো দিন নির্ধারণ করার বিষয়টি হয়তো হুযূর ﷺ-এর কাছে শুনেই বর্ণনা করেছেন।

হিদায়া প্রণেতা বলেন, ইমাম কুদূরী ইকামতের জন্য যে শহর বা গ্রামের কথা বলেছেন, এর দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, জনমানবশূন্য ময়দানে ইকামত করার সংকল্প করা বৈধ নয়। এটিই যাহেরী রায়। যদিও কাজি আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আরোহীগণ যদি পানি ও ঘাষ বিশিষ্ট এলাকায় তাঁবু স্থাপন করে এবং পনেরো দিন অবস্থান করার নিয়ত করে, তাহলে মুকীম হবে।

وَلَوْ دَخَلَ مِصْرًا عَلٰى عَزْمِ اَنْ يَّخْرُجَ غَدًا اَوْ بَعْدَ غَدٍ وَلَمْ يَنْوِ مُدَّةَ الْاِقَامَةِ حَتّٰى بَقِىَ عَلٰى ذٰلِكَ سِنِيْنَ قَصَرَ لِاَنَّ ابْنَ عُمَرَ (رضـ) اَقَامَ بِاَذْرَبَيْجَانَ سِتَّةَ اَشْهُرٍ وَكَانَ يَقْصُرُ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (رضـ) مِثْلُ ذٰلِكَ وَاِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ اَرْضَ الْحَرْبِ فَنَوَوُا الْاِقَامَةَ بِهَا قَصَرُوْا وَكَذَا اِذَا حَاصَرُوْا فِيْهَا مَدِيْنَةً اَوْ حِصْنًا لِاَنَّ الدَّاخِلَ بَيْنَ اَنْ يَّهْزِمَ فَيَقِرَّ وَبَيْنَ اَنْ يُّهْزَمَ فَيَفِرَّ فَلَمْ تَكُنْ دَارَ اِقَامَةٍ ـ

অনুবাদ : যদি কেউ এমন সুদৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে কোনো শহরে প্রবেশ করে যে, আগামীকাল অথবা পরশু এখান থেকে বের হয়ে যাবে, আর সে ব্যক্তি ইকামতের জন্য নির্ধারিত কোনো মেয়াদের নিয়ত না করে, এভাবে একাধারে বছরের পর বছর অবস্থান করতে থাকে, তবু সে কসর করবে। কারণ হযরত ইবনে ওমর (রা.) আজারবাইজান শহরে ছয়মাস অবস্থান করেছেন এবং তিনি সেখানে এ সময়ে কসর করতেছিলেন। আরো বহু সাহাবায়ে কেরাম থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। কোনো সৈন্য বাহিনী যখন শত্রু এলাকায় প্রবেশ করে এবং ইকামতের নিয়ত করে, তখন তারা কসরই পড়বে। তদ্রূপ শত্রুদেশের কোনো শহর বা কেল্লা অবরোধ করলেও। কারণ শত্রু ভূমিতে প্রবেশকারীর অবস্থা নিশ্চিত নয়। হয় সে পরাজিত হয়ে পলায়ন করবে, না হয় পরাজিত করে অবস্থান দৃঢ় করবে। তাই তা (দোদুল্যমান অবস্থার দারুল হরব) ইকামতের স্থান হতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : বর্ণিত হয়েছে যে, ইকামতের জন্য পনেরো দিনের নিয়ত করা জরুরি এর শাখা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কোনো মুসাফির ব্যক্তি কোনো শহরে এই নিয়ত নিয়ে প্রবেশ করে যে, আগামীকাল কিংবা তার পরদিন এখান থেকে চলে যাব, এমতাবস্থায় সে যদি পনের দিন অবস্থানের নিয়ত না করে আর একদিন দু' দিন করে সেখানে বছরের পর বছরও অবস্থান করে, তবু সে কসরই করবে। এমন ব্যক্তিকে মুকীম বলা হবে না। এর দলিল হলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর আমল। বর্ণিত আছে তিনি আজারবাইজানে ছয় মাস অবস্থান করেছিলেন; কিন্তু একবারও একাধারে পনেরো দিন থাকার নিয়ত করেননি। তাই তিনি উক্ত ছয়মাস যাবৎ নামাজ কসর করেছেন। অনুরূপ আমল অন্য সাহাবীগণ থেকেও বর্ণিত আছে। যেমন হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি নীশাপুরের কোনো এক গ্রামে দুই মাস অবস্থান করেছেন। আর এ সময়ে নামাজ কসর করেছেন। এমনিভাবে আলকামা ইবনে কায়স খাওয়ারযিমে দুই বৎসর অবস্থান করেও নামাজ কসর করেছেন।

قَوْلُهُ وَاِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ الخ : ইসলামি বাহিনী শত্রু ভূমিতে প্রবেশ করার পর পনেরো দিন থাকার নিয়ত করলেও তারা মুকীম হবে না; বরং মুসাফিরই থাকবে এবং কসর করবে। এই একই বিধান প্রযোজ্য হবে ঐ সৈন্যদের বেলায়ও যারা শত্রু ভূমির কোনো শহর বা কেল্লা অবরোধ করে রেখেছে। মোদ্দাকথা হলো শত্রু দেশে প্রবেশকারী ইসলামি বাহিনীর ইকামতের ক্ষেত্রে নিয়ত ধর্তব্য নয়, কারণ ইকামতের নিয়ত করার যোগ্য স্থান হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে মানুষ নিশ্চিতভাবে অবস্থান করার অবকাশ থাকে। অথচ আলোচ্য ক্ষেত্রটি এর বিপরীত। কারণ এখানে মুসলিম বাহনীর পলায়ন করা বা অবস্থান করার মাঝামাঝি এক দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে : কেননা পরাজিত হলে পলায়ন করতে হবে, আর যদি বিজয় লাভ হয় তবে অবস্থান করতে হবে। সুতরাং পলায়ন ও অবস্থানের দোদুল্যমান অবস্থায় কাফির রাষ্ট্রকে (দারুল হরব) মুসলিম সৈন্যদের জন্য অবস্থান স্থল (দারে ইকামত) বলা যাবে না। যেমন– মুসলিম রাষ্ট্রের জঙ্গল অবস্থান স্থল নয়, এ কারণে জঙ্গলের মধ্যে ইকামতের নিয়ত করলে গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَكَذَا إِذَا حَاصَرُوْا أَهْلَ الْبَغْيِ فِيْ دَارِ الْإِسْلَامِ فِيْ غَيْرِ مِصْرٍ أَوْ حَاصَرُوْهُمْ فِي الْبَحْرِ لِأَنَّ حَالَهُمْ مُبْطِلُ عَزِيْمَتِهِمْ وَعِنْدَ زُفَرَ (رح) يَصِحُّ فِي الْوَجْهَيْنِ إِذَا كَانَتِ الشَّوْكَةُ لَهُمْ لِلتَّمَكُّنِ مِنَ الْقَرَارِ ظَاهِرًا وَعِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رح) يَصِحُّ إِذَا كَانُوْا فِيْ بُيُوْتِ الْمَدَرِ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ إِقَامَةٍ وَنِيَّةُ الْإِقَامَةِ مِنْ أَهْلِ الْكَلَأِ وَهُمْ أَهْلُ الْأَخْبِيَةِ قِيْلَ لَاتَصِحُّ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُمْ مُقِيْمُوْنَ يُرْوٰى ذٰلِكَ عَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ (رح) لِأَنَّ الْإِقَامَةَ أَصْلٌ فَلَاتَبْطُلُ بِالْاِنْتِقَالِ مِنْ مَرْعًى إِلٰى مَرْعًى .

অনুবাদ : অনুরূপভাবে (কসর আদায় করবে) যদি (মুসলিম) বাহিনী দারুল ইসলামের বিদ্রোহীদেরকে শহর বহির্ভূত কোনো এলাকায় অবরোধ করে কিংবা সমুদ্রে তাদের অবরোধ করে। কেননা তাদের অবস্থা তাদের নিয়তের দৃঢ়তা বাতিল করে। যুফার (র.)-এর মতে উভয় অবস্থায় (ইকামতের নিয়ত) গ্রহণযোগ্য হবে, যদি মুসলিম বাহিনীর শক্তিতে প্রাধান্য থাকে। কেননা সে অবস্থায় বাহ্যত তারা অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে যদি তারা বস্তি এলাকায় থাকে তবে (নিয়ত) গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা বস্তি এলাকা ইকামত করার স্থান। আর তাঁবুবাসীদের সম্পর্কে ইকামতের নিয়ত কারো কারো মতে দুরস্ত নয়। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, তারা মুকীম বিবেচিত হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। কেননা ইকামত হলো (মানুষের জীবনের) আসল অবস্থা। সুতরাং এক চারণভূমি থেকে অন্য চারণ ভূমিতে যাওয়ার কারণে তা বাতিল হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি মুসলিম বাহিনী দারুল ইসলামের শহর বাহির্ভূত জঙ্গল ইত্যাদিতে বিদ্রোহীদেরকে অবরোধ করে কিংবা সমুদ্রে কোনো দ্বীপে বিদ্রোহীদেরকে অবরোধ করে এবং মুসলিম বাহিনী পনের দিন ইকামতের নিয়ত করে, তবে তাদের উক্ত নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং তাদের কসর নামাজ পড়তে হবে। দলিল হলো, মুসলিম বাহিনী উপরোক্ত অবস্থাতেও অবস্থান ও পলায়নের মাঝামাঝি দোদুল্যমনা অবস্থায় থাকে। তাই তাদের এ দোদুল্যমনা অবস্থা তাদের নিয়তের দৃঢ়তার অবস্থানকে বাতিল করে দেয়। কেননা যেমনিভাবে বিজয় লাভ করে মুসলিম বাহিনীর অবস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে এমনিভাবে পরাজিত হয়ে পলায়নেরও সম্ভাবনা আছে। হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণিত দলিল দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবারতের মধ্যে فِيْ غَيْرِ مِصْرٍ আর فِي الْبَحْرِ -এর قَيْد হলো قَيْد اِتِّفَاقِيْ। এ কারণে মুসলিম বাহিনী যদি বিদ্রোহীদের শহরে অবস্থান করে আর কিল্লার ভিতর তাদেরকে অবরোধ করে তখনও তাদের ইকামতের নিয়ত সহীহ হবে না। কেননা বিদ্রোহীদের শহর উদ্দেশ্য (বিজয়) হাসিল হওয়ার পর জঙ্গলের অনুরূপ হয়ে যায়। তাই মুসলিম বাহিনী তাতে মুকীম হবে না; বরং ফিরে চলে আসবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, মুসলিম বাহিনী কাফিরদের অবরোধ করুক কিংবা বিদ্রোহীদের অবরোধ করুক উভয় অবস্থায় ইকামতের নিয়ত সহীহ হবে। তবে এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যখন শহরের ভিতর মুসলিম বাহিনীর শক্তির প্রাধান্য থাকে। কেননা এ অবস্থায় বাহ্যত তারা অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব হলো, মুসলিম বাহিনীর কাফির বা বিদ্রোহীদেকে অবরোধ করা অবস্থায় ইকামতের নিয়ত করা তখন সহীহ হবে যখন মুসলিম বাহিনীর ইকামত মাটির ঘর বা বিল্ডিংয়ে হয়। আর যদি তাঁবুতে ইকামত করে তবে নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। দলিল হলো, ঘর ও বিল্ডিং ইকামতের স্থান, তাঁবু ইকামত করার স্থান নয়।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যে সকল লোকের জীবিকার ভিত্তি হলো পশুর উপর। যেখানে ঘাস বা পানি দেখে সেখানেই তাঁবু এটে অবস্থান করে। তারপর যখন ঘাস পানি খতম হয়ে যায় তখন অন্যত্র গিয়ে অবস্থান নেয়। এদের ইকামতের নিয়ত সহীহ কিংবা গায়রে সহীহ -এর ব্যাপারে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কোনো কোনো আলিম বলেন, তাদের ইকামতের নিয়ত সহীহ নয়। কেননা এরা ইকামতের স্থানে অবস্থান করছে না। তবে বিশুদ্ধতম মত হলো তারা মুকীম বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ শুরু থেকেই তারা মুসাফির নয়। কেননা ইকামত হলো মূল বা আসল, আর সফর হলো তার আরিযা বা প্রতিবন্ধক। সুতরাং ইকামত তখন বাতিল হবে যখন সফর তার প্রতিবন্ধক হবে। যেমন সে একস্থান থেকে অন্য স্থানের অবস্থানের নিয়ত করল, যা তিনদিন পরিমাণ দূরত্বের ব্যবধানে রয়েছে। তখন এরা রাস্তায় মুসাফির হবে। আর এক চারণভূমি থেকে অন্য চারণভূমিতে স্থানান্তরিত হওয়ার দ্বারা সফর হয় না। তাই এক চারণভূমি থেকে অন্য চারণভূমিতে যাওয়ার দ্বারা ইকামত বাতিল হবে না। আর ইকামত বাতিল না হওয়ার কারণে এরা মুকীম হবে মুসাফির হবে না।

وَاِنِ اقْتَدَى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيْمِ فِى الْوَقْتِ اَتَمَّ اَرْبَعًا لِاَنَّهُ يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ اِلٰى اَرْبَعٍ لِلتَّبْعِيَّةِ كَمَا يَتَغَيَّرُ بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ لِاِتِّصَالِ الْمُغَيِّرِ بِالسَّبَبِ وَهُوَ الْوَقْتُ وَاِنْ دَخَلَ مَعَهُ فِىْ فَائِتَةٍ لَمْ تَجْزِهِ لِاَنَّهُ لَايَتَغَيَّرُ بَعْدَ الْوَقْتِ لِاِنْقِضَاءِ السَّبَبِ كَمَا لَاتَتَغَيَّرُ بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ فَيَكُوْنُ اِقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ فِىْ حَقِّ الْقَعْدَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَاِنْ صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيْمِيْنَ رَكْعَتَيْنِ سَلَّمَ وَاَتَمَّ الْمُقِيْمُوْنَ صَلَاتَهُمْ لِاَنَّ الْمُقْتَدِىَ اِلْتَزَمَ الْمُوَافَقَةَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَيَنْفَرِدُ فِى الْبَاقِىْ كَالْمَسْبُوْقِ اِلَّا اَنَّهُ لَايَقْرَأُ فِى الْاَصَحِّ لِاَنَّهُ مُقْتَدٍ تَحْرِيْمَةً لَا فِعْلًا وَالْفَرْضُ صَارَ مُؤَدًّى فَيَتْرُكُهَا اِحْتِيَاطًا بِخِلَافِ الْمَسْبُوْقِ لِاَنَّهُ اَدْرَكَ قِرَاءَةً نَافِلَةً فَلَمْ يَتَأَدَّ الْفَرْضُ فَكَانَ الْاِتْيَانُ اَوْلٰى ـ

অনুবাদ : আর মুসাফির যদি ওয়াক্তিয়া নামাজের ক্ষেত্রে মুকীমের পিছনে ইকতিদা করে তাহলে চার রাকআত পুরা করবে। কেননা তার অনুসরণের বাধ্যবাধকতায় তার ফরজ চার রাকআতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। যেমন তার নিজের ইকামতের নিয়ত দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। কারণ, পরিবর্তনকারী বিষয় (অর্থাৎ ইকতিদা) 'সবব' -এর সাথে (অর্থাৎ ওয়াক্তের সাথে) যুক্ত হয়েছে। যদি মুকীম ইমামের কাছে কাজা নামাজে শামিল হয়, তবে তা জায়েজ হবে না। কেননা ওয়াকতের সবব বিলুপ্ত হওয়ার কারণে ফরজ পরিবর্তিত হয় না, যেমন ইকামতের নিয়ত দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। এমতাবস্থায় এটা বৈঠক ও কেরাতের ক্ষেত্রে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর ইকতিদার মতো হয়ে যাবে, যা জায়েজ নয়। মুসাফির যদি দুই রাকআতে মুকীমদের ইমামতি করে তবে সে (দুই রাকআত শেষে) সালাম ফিরাবে আর মুকীমগণ তাদের নামাজ পূর্ণ করে নিবে। কেননা দুই রাকআতের ক্ষেত্রে (মুসাফির ইমামের) অনুসরণের বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। সুতরাং অবিশিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে তারা মাসবূকের মতো একাকী হয়ে পড়বে। তবে বিশুদ্ধ মতে সে কিরাআত পড়বে না। কেননা তারা তাহরীমার বেলায় মুকতাদী, অন্যান্য কাজের বেলায় নয়। আর ফরজ (কেরাত) আদায় হয়ে গেছে। সুতরাং সর্তকতা হিসাবে কেরাত তরক করবে। মাসবূকের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সে নফল কেরাত পেয়েছে; কিন্তু ফরজ কেরাত আদায় হয়নি। সুতরাং তার ক্ষেত্রে কেরাত পড়াই উত্তম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে দু'টি মাসআলার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। এক. মুসাফিরের মুকীমের ইকতিদা করার হুকুম। দুই. মুকীমের মুসাফিরের ইকতিদা করার হুকুম। প্রথম মাসআলা ওয়াক্তের মধ্যে জায়েজ; কিন্তু ওয়াক্তের পর জায়েজ নেই। দ্বিতীয় মাসআলা ওয়াজিবের মধ্যেও জায়েজ এবং ওয়াক্তের বাইরেও জায়েজ। কুদূরী গ্রন্থকার প্রথম মাসআলার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, মুসাফির যদি ওয়াক্তের মধ্যে মুকীমের ইকতিদা করে, অর্থাৎ মুসাফির চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজের আদায়ের মধ্যে মুকীমের ইকতিদা করে তবে মুসাফির পুরা চার রাকআত আদায় করবে। দলিল হলো, মুসাফির এমন ব্যক্তির অনুসরণকে বাধ্য করেছে, যার ফরজ নামাজ হলো চার রাকআত। সুতরাং তখন অনুসরণের বাধ্যবাধকতার কারণে তার ফরজও চার রাকআতে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যেমন ইকামতের নিয়ত দ্বারা মুসাফিরের ফরজা চার রাকআতে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

بِإِتِّصَالِ الْمُغَيِّرِ দ্বারা علت جامعه-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখানে جامع বিদ্যমান আছে, আর তা হলো مغير তথা দুই রাকআতকে চার রাকআতে পরিবর্তনকারী সবব-এর সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং مغير প্রথম টির মধ্যে হলো ইকতিদা যা সবব তথা ওয়াক্তের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন দ্বিতীয়টির মধ্যে مغير যথা ইকামতের নিয়ত সবব তথা ওয়াক্তের সাথে যুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ فِيْ فَائِتَةٍ الخ : উক্ত ইবারত দ্বারা বর্ণিত মাসআলা হলো, মুসাফির যদি কাযা নামাজের মধ্যে মুকীমের ইকতিদা করে তবে এটা জায়েজ নেই। কেননা ওয়াক্তের পরিবর্তন দ্বারা মুসাফিরের ফরজ পরিবর্তিত হয় না কারণ ফরজ নামাজের সবব তো হলো ওয়াক্ত। আর ইকতিদা যে পরিবর্তন সাধিত করে তা সবরের সাথে যুক্ত হয়ে করে। আর যেহেতু কাজা নামাজের মধ্যে সবব তথা ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা এই যুক্ততা পাওয়া যায়নি, তাই মুসাফিরের ফরজ দুই রাকআত থেকে চার রাকআতের দিকে পরিবর্তিতও হবে না, যেমন কাজা নামাজ ইকামতের নিয়ত দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। অথচ ইকামতের নিয়তও দুই রাকআতকে চার রাকআতে পরিবর্তনকারী।

قَوْلُهُ فَيَكُوْنُ إِقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ الخ : দ্বারা পূর্বের ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। সার সংক্ষেপ হলো, ওয়াক্ত চলে যাবার পর মুসাফির যদি চার রাকআত বিশিষ্ট কাজা নামাজের মধ্যে মুকীমের ইকতিদা করে তবে দুই অসুবিধার এক অসুবিধা অবশ্যই হবে। হয় নিজ ইমামের বিরোধিতা করতে হবে না হয় নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর ইকতিদা করতে হবে। কেননা মুসাফিরের এ ধরনের ইকতিদার মধ্যে দু'টি সুরত রয়েছে। মুসাফির মুক্তাদী দুই রাকআতের পর সালাম ফিরাবে, কিংবা চার রাকআতের পর। যদি মুসাফির দুই রাকআতের পর সালাম ফিরায় তবে নিজ ইমামের বিরোধী হবে, যা নামাজ বিনষ্টকারী। আর যদি মুসাফির শেষ পর্যন্ত ইমামের সাথে শরিক থাকে তবে এরও দু'টি সুরত রয়েছে মুসাফির শুরু থেকেই ইকতিদা করবে কিংবা শেষ দুই রাকআতে ইকতিদা করবে। যদি প্রথম সুরতটি হয় তবে দুই রাকআতের পর বসা মুসাফিরের জন্য ফরজ। কেননা এটা হলো তার শেষ বৈঠক। আর ইমামে মুকীমের জন্য ফরজ নয় কেননা তাদের ব্যাপারে এটা হলো প্রথম বৈঠক। আর প্রথম বৈঠক ফরজ নয়। সুতরাং এ সুরতে বসার ক্ষেত্রে ফরজ আদায়কারী ব্যক্তি নফল আদায়কারীর মুক্তাদী হবে। আর যদি শেষ দুই রাকআতে ইকতিদা করা হয়, তবে শেষে তো ইমাম তথা মুকীমের কেরাত নফল আর মুক্তাদী তথা মুসাফিরের ফরজ। সুতরাং এ সুরতে কেরাতের ক্ষেত্রে ফরজ আদায়কারী ব্যক্তির নফল আদায়কারীর ইকতিদা করা জরুরি হবে। আর এ কথাটি সর্বজন স্বীকৃত যে, ফরজ আদায়কারীর ইকতিদা নফল আদায়কারীর পিছনে জায়েজ নেই। মুদ্দাকথা, ওয়াক্ত চলে যাবার পর মুসাফিরের মুকীমের মুক্তাদী হওয়ার বেলায় যেহেতু উভয় সুরতই ঠিক না, সেহেতু ওয়াক্তের পর এই ইকতিদা-ই জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَإِنْ صَلَّى الْمُسَافِرُ الخ : যদি মুকীমরা মুসাফিরের ইকতিদা করে, তবে মুসাফির তাদেরকে দুই রাকআত-এর বসার পর সালাম ফিরাবে। আর মুকীমগণ তাদের নামাজ পূর্ণ করবে। দলিল হলো, মুকীম মুক্তাদীরা ইমামকে মুসাফির মনে করে দুই রাকআতের মধ্যে তার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। আর যার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছিল তা আদায় হয়ে গেছে। অথচ মুকীম মুক্তাদীর নামাজ এখনো পূর্ণ হয়নি। এজন্য মুকীম মুক্তাদী অবশিষ্ট দুই রাকআতের ক্ষেত্রে মুনফারিদ হবে, যেমন ইমামের সালাম ফিরাবার পর মাসবূক মুনফারিদ হয়ে যায়। তবে উভয়টির মাঝে পার্থক্য এতটুকুন যে, মুকীম মুক্তাদী বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ঐ রাকআতগুলোর মধ্যে কেরাত পড়বে না, যা মুসাফির ইমামের সালাম ফিরাবার পর পড়া হয়, আর মাসবূকের কেরাত পড়তে হয়। বিশুদ্ধ মতটির দলিল হলো, মুকীম শেষ দুই রাকআতে তাহরীমার বেলায় মুক্তাদী তবে অন্যান্য কাজের বেলায় মুক্তাদী নয়। তাহরীমার বেলায় তো মুক্তাদী এ জন্য যে, সে প্রথম তাহরীমায় ইমামের সাথে আদায় করার বাধ্য-বাধকতা গ্রহণ করেছে। আর অন্যান্য কাজের বেলায় মুক্তাদী এজন্য নয় যে, দুই রাকআত শেষে সালাম ফিরাবার দ্বারা মুসাফির ইমামের কাজ শেষ হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি এমন হয় অর্থাৎ তাহরীমার বেলায় মুক্তাদী, অন্যান্য কাজের বেলায় মুক্তাদী নয়, তাকে লাহিক বলা হয়। আর লাহিকের উপর কেরাত নেই। কেননা তাহরীমার বেলায় যদি তার মুক্তাদী হওয়ার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়, তবে তার কেরাত পড়া হারাম হবে। আর যদি কাজের বেলায় মুক্তাদী না হওয়ার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়, তবে তার কেরাত পড়া মোস্তাহাব। কারণ, যে প্রথম দুই রাকআতে কেরাতে ফরজ ছিল তা আদায় হয়ে গেছে। মুদ্দাকথা, শেষ দুই রাকআতে মুকীম মুক্তাদীর কেরাত পড়া হারাম আর মোস্তাহাবের মাঝামাঝি পরিবেষ্টিত। তাই হারামকে অগ্রাধিকার দিয়ে সতর্কতা হলো এটাই যে, মুকীমে মুক্তাদী শেষ দুই রাকআতে কেরাত ছেড়ে দিবে। মাসবূকের বিষয়টি এর বিপরীত। এখানে মাসবূক দ্বারা ঐ মাসবূক উদ্দেশ্য যে চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজের প্রথম দুই রাকআতে ইমামকে পায়নি বরং শেষ দুই রাকআতে ইমামের সাথে শরিক হয়েছে। তাই ইমামের সালাম ফিরাবার পর মাসবূক যখন তার ফউত হওয়া দুই রাকআত আদায় করবে তখন সে দুইরাকআতে তার কিরাআত পড়া ওয়াজিব হবে। কেননা মাসবূক শেষের দুই রাকআতে ইমামের যে কেরাতে পেয়েছে তা হলো নফল কেরাত। আর প্রথম দুই রাকআতে যে ফরজ কেরাত ছিল তা এখনো পর্যন্ত আদায় করেনি। তাই মাসবূকের উপর কেরাতে পড়া ওয়াজিব হবে। আল্লাহই সম্যক অবহিত।

قَالَ وَيُسْتَحَبُّ لِلْاِمَامِ اِذَا سَلَّمَ اَنْ يَقُوْلَ اَتِمُّوْا صَلَاتَكُمْ فَاِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَهُ حِيْنَ صَلّٰى بِاَهْلِ مَكَّةَ وَهُوَ مُسَافِرٌ وَ اِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِىْ مِصْرِهِ اَتَمَّ الصَّلٰوةَ وَاِنْ لَمْ يَنْوِ الْمُقَامَ فِيْهِ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَصْحَابُهُ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ كَانُوْا يُسَافِرُوْنَ وَيَعُوْدُوْنَ اِلٰى اَوْطَانِهِمْ مُقِيْمِيْنَ مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ جَدِيْدٍ ـ

অনুবাদ : সালাম ফিরানোর পর (মুসাফির) ইমামের পক্ষে এ কথা বলে দেওয়া মোস্তাহাব যে, তোমরা তোমাদের নামাজ পূর্ণ করে নাও, আমরা মুসাফির কাফেলা। কেননা মুসাফির অবস্থায় মক্কাবাসীদের ইমামতি করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলেছিলেন। মুসাফির যখন আপন শহরে প্রবেশ করবে তখন নামাজ পূর্ণ করবে। যদি সেখানে সে ইকামতের নিয়ত না করে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম সফর করতেন। অতঃপর ইকামতের নতুন নিয়ত ব্যতীত ওয়াতানের দিকে ফিরে এসে মুকীম হিসাবে অবস্থান করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম যদি মুসাফির হয় তবে দুই রাকআত শেষে সালাম ফিরিয়ে বলবে– আপনারা নিজেদের নামাজ পূর্ণ করে নিন আমি মুসাফির। দলিল হলো–আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদীস,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَاَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِ عَشَرَةَ لَيْلَةً لَايُصَلِّىْ اِلَّا رَكْعَتَيْنِ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ مَكَّةَ صَلُّوْا اَرْبَعًا فَاِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ـ

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধ করেছি। তাঁর সাথে মক্কা বিজয়ের দিন শরিক ছিলাম। তিনি আঠার রাত মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। ঐ সময় তিনি (চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজের) দুই রাকআত পড়েছিলেন। আর বলেছিলেন, হে মক্কাবাসীরা! তোমরা চার রাকআত-ই পড়ো আমি মুসাফির।

ফায়েদা : কুদূরীর ইবারত দ্বারা বুঝা যায়, এটা শর্ত নয় যে, নামাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই মুক্তাদীর ইমাম মুসাফির কিংবা মুকীম জানার। কেননা মুক্তাদীগণ যদি পূর্ব থেকেই ইমাম-মুসাফির হওয়ার কথা জানে তবে সালাম ফিরাবার পর ইমামে মুসাফিরের اَتِمُّوْا صَلٰوتَكُمْ "তোমরা নিজেদের নামাজ পূর্ণ করো" বলা অযথা হয়ে যাবে। আর যদি তার (মুক্তাদীর) ইমাম মুকীম হওয়ার কথা জানা থাকে তবে মুসাফির তার কথা اِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ "আমি মুসাফির কাফেলা" -এর মধ্যে মিথ্যাবাদী হয়ে যায়।

وَاِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِىْ مِصْرِهِ : যখন মুসাফির তিন দিনের সফর শেষে আপন শহরে প্রবেশ করল তখন লোকালয়ে প্রবেশ করা মাত্রই মুকীম হয়ে যাবে, যদিও ইকামতের নিয়ত না করে। দলিল হলো– রাসূলুল্লাহ ﷺ আর সাহাবায়ে কেরাম সফর করতেন, সফর পূর্ণ হওয়ার পর যখন দেশে ফিরতেন, তখন ইকামতের নিয়ত ছাড়াই মুকীম হয়ে যেতেন।

وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ فَانْتَقَلَ مِنْهُ وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ ثُمَّ سَافَرَ فَدَخَلَ وَطَنَهُ الْاَوَّلَ قَصَرَ لِاَنَّهُ لَمْ يَبْقَ وَطَنًا لَهُ اَلَا يَرَى اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَدَّ نَفْسَهُ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُسَافِرِيْنَ وَهٰذَا لِاَنَّ الْاَصْلَ اَنَّ الْوَطَنَ الْاَصْلِيَّ تَبْطُلُ بِمِثْلِهِ دُوْنَ السَّفَرِ وَوَطَنُ الْاِقَامَةِ تَبْطُلُ بِمِثْلِهِ وَبِالسَّفَرِ وَبِالْاَصْلِيِّ وَاِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ اَنْ يُّقِيْمَ بِمَكَّةَ وَمِنًى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يُتِمَّ الصَّلٰوةَ لِاَنَّ اِعْتِبَارَ النِّيَّةِ فِىْ مَوْضِعَيْنِ يَقْتَضِىْ اِعْتِبَارَهَا فِىْ مَوَاضِعَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ لِاَنَّ السَّفَرَ لَايَعْرِىْ عَنْهُ اِلَّا اِذَا نَوٰى اَنْ يُّقِيْمَ بِاللَّيْلِ فِىْ اَحَدِهِمَا فَيَصِيْرُ مُقِيْمًا بِدُخُوْلِهِ لِاَنَّ اِقَامَةَ الْمَرْءِ مُضَافَةٌ اِلٰى مَبِيْتِهِ ـ

অনুবাদ : যদি কারো নিজস্ব আবাসভূমি থাকে অতঃপর সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে অন্য স্থানকে আবাসভূমি রূপে গ্রহণ করে, অতঃপর সফর করে প্রথম আবাসভূমিতে প্রবেশ করে, তবে সে কসর পড়বে। কেননা প্রথমটি তার আবাসভূমি থাকে না। এ কথা স্পষ্ট প্রমাণিত যে, হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেকে মক্কায় মুসাফির রূপে গণ্য করেছিলেন। এর কারণ হচ্ছে– নীতি হলো, স্থায়ী আবাসভূমি অনুরূপ আবাসভূমি দ্বারা বাতিল হয়ে যায়, সফর দ্বারা হয় না। পক্ষান্তরে অস্থায়ী আবাসস্থল অনুরূপ স্থল দ্বারা, সফর দ্বারা এবং স্থায়ী আবাসভূমি দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। মুসাফির যদি মক্কায় ও মীনায় পনের দিন থাকার নিয়ত করে তবে সে কসর পড়বে। কেননা দুই স্থানে ইকামতের নিয়তকে যদি ই'তিবার করা হয়, তাহলে বিভিন্ন স্থানের ইকামতের নিয়তকেও মিলিতভাবে গ্রহণ করতে হবে। আর তা নিষিদ্ধ। কেননা সফর তো বিভিন্ন স্থানে অবস্থান থেকে মুক্ত নয়। তবে যদি উভয়ের মধ্যে একটিতে রাত্রি যাপন করার নিয়ত করে থাকে তবে সে সে স্থানে প্রবেশ করার সাথে সাথে মুকীম হয়ে যাবে। কেননা লোকের ইকামতের বিষয়টি তার রাত্রি যাপনের স্থানের স্থলে সম্পৃক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَامَّةُ الْمَشَائِخ সাধারণ মাশায়িখগণ আবাসভূমির তিনভাগ বর্ণনা করেছেন। স্থায়ী আবাসভূমি (وطن اصلى), অস্থায়ী আবাসভূমি (وطن اقامت), বসবাসের আবাসভূমি (وطن سكنى)। স্থায়ী আবাসভূমি হলো মানুষের জন্মের স্থান। কিংবা ঐ শহর যার মধ্যে তার পরিবার-পরিজন বসবাস করে এবং সেখানে থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা তাদের নেই। অস্থায়ী আবাসভূমি বলা হয়, ঐ শহর কিংবা গ্রামকে যার মধ্যে মুসাফির পনেরো দিন অবস্থানের ইরাদা করেছে। এর অপর নাম সফরের আবাস স্থল (وطن سفر)। আর وطن سكنى ঐ শহরকে বলা হয়, যার মধ্যে মুসাফির পনেরো দিনের কম অবস্থানের নিয়ত করেছে।

محققين দের মতে وطن দুই ভাগে বিভক্ত, وطن اصلى - وطن اقامت তারা وطن سكنى-কে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। কেননা وطن سكنى-এর মধ্যে অবস্থানের বর্ণনা পাওয়া যায় না, বরং সফরের হুকুম বাকি থাকে। নীতিমালা হলো, স্থায়ী আবাসভূমি আরেকটি স্থায়ী আবাসভূমি দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। অস্থায়ী আবাসভূমি বা সফর দ্বারা বাতিল হয় না। আর অস্থায়ী আবাসভূমি আরেকটি অস্থায়ী আবাসভূমি দ্বারাও বাতিল হয় এবং সফর ও স্থায়ী আবাসভূমি দ্বারাও বাতিল হয়ে যায়। তার দলিল হলো, একটি বস্তু তার চেয়ে বড় বস্তু দ্বারা বতিল হয়ে যায়, কিংবা তার সমপর্যায়ের বস্তু দ্বারাও বাতিল হয়ে যায়। আর এ কথা সর্বসম্মত যে, স্থায়ী আবাসভূমির চেয়ে বড় অন্য কোনো কিছু নেই। তাই স্থায়ী আবাসভূমি তার বরাবর অর্থাৎ অন্য একটি

স্থায়ী আবাসভূমি দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে। এ সুরত হলো, এক ব্যক্তির একটি আবাসভূমি আছে, সে সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং অন্য স্থানকে তার আবাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এখন প্রথম আবাসভূমি বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং শরয়ী সফরের পর সে যদি তার প্রথম আবাসভূমিতে প্রবেশ করে, তবে মুকীম থাকবে না; বরং কসরের নামাজ পড়তে হবে। এটাই কারণ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মূল আবাসভূমি হলো মক্কা মুকাররমা। কিন্তু তিনি যখন হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন এবং মদীনাকে নিজের আবাসভূমি বানালেন, তখন আর মক্কা স্থায়ী আবাসভূমি হিসাবে থাকেনি। তাই তো হিজরতের পর যখন তিনি মক্কায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন তিনি নিজেকে মুসাফির হিসাবে গণ্য করেছেন এবং বলেছেন, أَتِمُّوا صَلٰوتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ আর যেহেতু স্থায়ী আবাসভূমি অস্থায়ী আবাসভূমির চেয়ে বড়। তাই অস্থায়ী আবাসভূমি স্থায়ী আবাসভূমি দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে। আর অস্থায়ী আবাস ভূমি আরেকটি অস্থায়ী আবাসভূমির বরাবর। তাই অস্থায়ী আবাসভূমি আরেকটি অস্থায়ী আবাসভূমি দ্বারাও বাতিল হয়ে যাবে এবং অস্থায়ী আবাসভূমি সফর দ্বারাও বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সফর হলো অস্থায়ী আবাসভূমির বিপরীত। আর নীতিমালা আছে যে, কোনো বস্তু তার বিপরীত বস্তু দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সফর তো স্থায়ী আবাসভূমিরও বিপরীত তাই স্থায়ী আবাসভূমিও সফর দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে, অথচ এমনটি তো হয় না?

জওয়াব হলো, স্থায়ী আবাস ভূমি সফর দ্বারা বাতিল হয় না হাদীসের কারণে। কেননা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধবিগ্রহের জন্য মদীনা থেকে বের হয়ে দূর দূরান্তে চলে যেতেন, কিন্তু এরপরও মদীনা তাঁর স্থায়ী আবাসভূমি ছিল। তাই তো তিনি সফর থেকে ফিরে আসতেন কিন্তু অস্থায়ী আবাস স্থলের নিয়ত করতেন না। যদি স্থায়ী আবাসভূমি সফর দ্বারা বাতিল হয়ে যেতো, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এসে অবশ্যই অস্থায়ীভাবে নিয়ত করতেন।

قَوْلُهُ وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الخ : মুসাফির এমন দুই স্থানে পনেরো দিন অবস্থানের নিয়ত করেছে যার মধ্যে একটি স্থায়ী (مستقل) স্থান। যেমন– মক্কা ও মীনায় অবস্থানের নিয়ত করেছে। তখন সে মুকীম হবে না বরং মুসাফির-ই থাকবে এবং নামাজ কসর পড়বে। কেননা দুই স্থানে ইকামতের নিয়তকে ই'তিবার করার দ্বারা এ কথা বুঝে আসে যে, দুইয়ের অধিক স্থানের মধ্যে নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না হয় تَرْجِيْحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ লাযিম আসবে। আর মুসাফিরের একসাথে অনেক স্থানে অবস্থানের নিয়ত করা নিষেধ। কেননা সফর বিভিন্ন স্থানে অবস্থান থেকে খালি হয় না; বরং বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করা জরুরি হয়ে যায়। সুতরাং যদি বিভিন্ন স্থানের নিয়তের ই'তিবার করা হয় তবে তার মতলব এই দাঁড়াবে যে, মানুষ কখনো মুসাফির-ই হবে না। হ্যাঁ যদি এ সুরত করা হয় যে, দুই স্থান মিলে পনেরো দিনের ইকামতের নিয়ত করা হয় এবং এ দু'টির নির্দিষ্ট কোনো একটিতে রাত কাটানোর নিয়ত করা হয়, তবে এ নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে। এখন এ ব্যক্তি যদি প্রথমে ঐ স্থানে যায় যেখানে দিনে থাকার নিয়ত করেছিল তবে সে মুকীম হবে না। আর যদি প্রথমে ঐ স্থানে যায় যেখানে রাত কাটানোর নিয়ত করেছিল তবে ঐ অধিবাসীতে প্রবেশ হওয়া মাত্র মুকীম হয়ে যাবে। অতঃপর ঐ অধিবাসীতে যাবার দ্বারা মুসাফির হবে না। যেখানে দিন অতিবাহিত করার নিয়ত করেছিল। কেননা মানুষের ইকামতের বিষয়টি তার রাত্রিযাপনের স্থানের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং আপনি দেখবেন, যে লোক বাজারে কামকাজ করে তাকে যদি বলা হয় এ সময় আপনি কোথায় থাকেন তখন সে ঐ স্থানের কথাই বলবে সেখানে সে রাত্রি যাপন করে।

وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةٌ فِى السَّفَرِ قَضَاهَا فِى الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ وَمَنْ فَاتَتْهُ فِىْ الْحَضَرِ قَضَاهَا فِى السَّفَرِ اَرْبَعًا لِاَنَّ الْقَضَاءَ بِحَسْبِ الْاَدَاءِ وَالْمُعْتَبَرُ فِىْ ذٰلِكَ اٰخِرُ الْوَقْتِ لِاَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ فِى السَّبَبِيَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْاَدَاءِ فِى الْوَقْتِ.

অনুবাদ : সফরে যার নামাজ ফউত হয়ে যায়, সে মুকীম হওয়ার পরও দুই রাকআতই কাজা করবে। তদ্রূপ যার ইকামত অবস্থায় (চার রাকআত ওয়ালা নামাজ) কাজা হয়ে যায় সফরে তা চার রাকআত-ই আদায় করবে। কেননা আদায় অনুরূপ কাজা হয়ে থাকে। অনুরূপ কাজার বেলায় ওয়াকতের শেষ সময় ধর্তব্য। কেননা শেষ ওয়াক্ত-ই সবব হিসাবে গণ্য, যখন ওয়াকতের মধ্যে নামাজ আদায় না করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : সফরে অবস্থায় যদি চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজ কাজা হয়ে যায় এবং হালাতে ইকামতে তা আদায় করতে চায় তবে দুই রাকআত কাজা করবে। আর যদি ইকামতের হালাতে কোনো চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজ ফউত হয়ে যায়, অতঃপর সফরের হালাতে তা কাজা করতে চায় তবে চার রাকআত কাজা করবে। দলিল হলো, কাজা আদায়ের অনুরূপ ওয়াজিব হয়ে থাকে। অর্থাৎ যার উপর চার রাকআত আদায় ওয়াজিব হয় সে কাযাও চার রাকআত করবে। আর যার উপর দুই রাকআত আদায় ওয়াজিব হয়, তার উপর কাযাও দুই রাকআত ওয়াজিব হবে। আদায়ের মধ্যে ওয়াক্তের শেষ সময় ধর্তব্য। ওয়াক্তের শেষ সময় দ্বারা তাহরীমা পরিমাণ সময় উদ্দেশ্য। যেমন, যদি জোহরের প্রথম ওয়াক্তের মুকীম থাকে অতঃপর ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বেই সফরের জন্য বের হয় এবং অধিবাসী থেকে তখন বের হয় যখন ওয়াক্ত শুধু এক রাকআত কিংবা এর চেয়ে কম বাকি থাকে তখন তার উপর দুই রাকআত-ই কাজা ওয়াজিব হবে। কেননা শেষ ওয়াক্তে সে মুসাফির হয়েছিল আর এটাই গ্রহণযোগ্য।

আদায়ের মধ্যে শেষ ওয়াক্ত এজন্য ধর্তব্য যে, ওয়াক্তের মধ্যে আদায় না করার সুরতে নামাজ ওয়াজিব হওয়ার সবব হিসাবে শেষ ওয়াক্ত ধর্তব্য। এখানে একটি প্রশ্ন হয় তা হলো, আমাদের আলোচনা হলো কাজা নামাজের ক্ষেত্রে আর নামাজ যখন তার ওয়াক্ত থেকে ফউত হয়ে গেল তবে উসূলে ফিকহের বর্ণনামতে পূর্ণ ওয়াক্ত নামাজের সবব হয়, শেষ অংশ সবব হয় না? জওয়াব হলো, কোনো কোনো মাশায়িখের মতে নামাজ ফউত হওয়ার সুরতে ওয়াক্তের শেষাংশ সবব হয়। হতে পারে হিদায়া গ্রন্থকার এ মতটিই গ্রহণ করেছেন।

وَالْعَاصِىْ وَالْمُطِيْعُ فِىْ سَفَرِهٖ فِى الرُّخْصَةِ سَوَاءٌ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ لَايُفِيْدُ الرُّخْصَةَ لِاَنَّهَا تَثْبُتُ تَخْفِيْفًا فَلَاتَتَعَلَّقُ بِمَا يُوْجِبُ التَّغْلِيْظَ وَلَنَا اِطْلَاقُ النُّصُوْصِ وَلِاَنَّ نَفْسَ السَّفَرِ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ مَا يَكُوْنُ بَعْدَهٗ اَوْ يُجَاوِرُهٗ فَصَلُحَ مُتَعَلِّقَ الرُّخْصَةِ ـ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : অবৈধ উদ্দেশ্যে ও বৈধ উদ্দেশ্যে সফরকারী সফরে রুখসত লাভের ক্ষেত্রে উভয়ই সমান। ইমাম শাফে'ঈ (র.) বলেন, গুনাহের সফরে রুখসত লাভ হবে না। কেননা তা কষ্ট লাঘবের জন্য কার্যকরী। সুতরাং যা কঠোরতা দাবি করে, তার সাথে তা সম্পৃক্ত হবে না। আমাদের দলিল, শরিয়তের বিধানের নিঃশর্ততা। তা ছাড়া মূলত সফর কোনো অপরাধ নয়। অপরাধ তো এর পাশাপাশি বা পরে সংযুক্ত হয়। সুতরাং রুখসত সম্পৃক্ত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। আল্লাহ-ই ভাল জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফকীহগণের বর্ণনা মতে সফর তিন প্রকার, ইবাদতের সফর যেমন হজ এবং জিহাদ। মুবাহ সফর যেমন– ব্যবসা-বাণিজ্য। অবৈধ সফর যেমন– ডাকাতী করার জন্য সফর করা, কোনো সতীলোকের মাহরাম ব্যতীত হজের সফর করা। প্রথম দুই প্রকার সর্বসম্মতিক্রমে রুখসতের সবব বা কারণ। আর তৃতীয় প্রকার আমাদের মতে তো রুখসতের সবব কিন্তু ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে সবব নয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, রুখসত মুকাল্লাফের উপর কষ্টকে লাঘব করে দেয় আর যে জিনিস লাঘবের জন্য কার্যকরী তা এমন জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না, যা কঠোরতাকে ওয়াজিব করে। অর্থাৎ আপরাধ আর নাফরমানী তো কঠোরতা আর আজাবকে ওয়াজিব করে। এর সাথে রুখসত আর তাখফীফ সম্পৃক্ত হতে পারে না। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, রুখসত হলো রহমত ও ইনআম যা আজাবের উপযোগীর নিকট আসতে পারে না। আমাদের দলিল হলো শরিয়তের বিধানের মুতলাক হওয়া। অর্থাৎ যে শরিয়ত কর্তৃক রুখসত পাওয়া গিয়েছে তা আমভাবে সকল মুসাফিরকে শামিল করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, فَرْضُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ অন্য স্থানে ইরশাদ করেছেন, يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا উক্ত আয়াত ও হাদীসগুলোর মধ্যে বাধ্য আর আবাধ্যের কোনো ব্যবধান করা হয়নি; বরং প্রত্যেক মুসাফিরকে শামিল করা হয়েছে। চাই সে তার সফরে বাধ্য হোক বা অবাধ্য হোক। দ্বিতীয় দলিল হলো, মূল সফর অপরাধ নয়। কেননা সফর বলা হয় দূরত্ব ভ্রমণ করাকে এ অর্থে কোনো অপরাধ নেই অপরাধ তো এর পরে হবে। যেমন– ডাকাতি, চুরি, কিংবা কোনো ধরনের অপরাধ সফরের সাথে সাথে হয় যেমন– কোনো গোলাম পলায়ন করা, সুতরাং মূল সফর যেহেতু অপরাধ নয়, তাই তার সাথে রুখসত সম্পৃক্ত হতে পারে। আল্লাহই ভাল জানেন।

بَابُ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ

لَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ اِلَّا فِىْ مِصْرٍ جَامِعٍ اَوْ فِىْ مُصَلَّى الْمِصْرِ وَلَاتَجُوْزُ فِى الْقُرٰى لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاجُمُعَةَ وَلَاتَشْرِيْقَ وَلَافِطْرَ وَلَااَضْحٰى اِلَّا فِىْ مِصْرٍ جَامِعٍ وَالْمِصْرُ الْجَامِعُ كُلُّ مَوْضَعٍ لَهٗ اَمِيْرٌ وَقَاضٍ يُنَفِّذُ الْاَحْكَامَ وَيُقِيْمُ الْحُدُوْدَ وَهٰذَا عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) وَعَنْهُ اَنَّهُمْ اِذَا اجْتَمَعُوْا فِىْ اَكْبَرِ مَسَاجِدِهِمْ لَمْ يَسَعْهُمْ وَالْاَوَّلُ اِخْتِيَارُ الْكَرْخِىْ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَالثَّانِىْ اِخْتِيَارُ الثَّلْجِىْ وَالْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُوْرٍ عَلَى الْمُصَلّٰى بَلْ يَجُوْزُ فِىْ جَمِيْعِ اَفْنِيَةِ الْمِصْرِ لِاَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهٖ فِىْ حَوَائِجِ اَهْلِهٖ ۔

পরিচ্ছেদ : সালাতুল জুমুআ

অনুবাদ : জুমার নামাজ সহীহ হয় না কেবল জামে শহর কিংবা শহরের ঈদগাহ ব্যতীত। গ্রামাঞ্চলে জুমা জায়েজ নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন শহর ছাড়া অন্য কোথাও জুমা, (তাকবীর) তাশরীক, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা নেই। "জামে শহর" অর্থ এমন লোকালয়, যেখানে শাসক ও বিচারক রয়েছেন, যিনি শরিয়াতের বিধি নিষেধ প্রয়োগ করতে এবং হদসমূহ কার্যকর করতে পারেন। এ হলো ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত মত। তাঁর থেকে আরেকটি মত বর্ণিত রয়েছে যে, যদি তারা তাদের সবচেয়ে বড় মসজিদে সমবেত হয় তাহলে সেখানে তাদের স্থান সংকুলান হয় না। প্রথমটি ইমাম কারখী (র.) সমর্থিত মত এবং এটাই প্রকাশ্য মাযহাব। আর দ্বিতীয় মত হলো ইমাম সালজী (র.) গৃহীত মত। তবে জুমার বৈধতা শুধু ঈদগাহের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং শহরের সমগ্র উপকণ্ঠেই জায়েজ হবে। কেননা শহরবাসীদের প্রয়োজনের লক্ষ্যে তা শহরেরই স্থলবর্তী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উক্ত অধ্যায়ও পূর্বের অধ্যায়ের সাথে মিল রয়েছে। কেননা উভয়টির মধ্যে তানসীফ (সমানভাবে দুইভাগে বিভক্তিকরণ) আছে। তবে কসরের মধ্যে সফরের কারণে তানসীফ করা হয়েছে। আর জুমার মধ্যে খুতবার কারণে। তবে যেহেতু সফর প্রত্যেক চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজ তানসীফ করে আর জুমার খুতবা শুধু জোহরের নামাজকে তানসীফ করে, এ জন্য সফর প্রত্যেক চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজের জন্য আম বা ব্যাপক আর জুমার খুতবা শুধু জোহরের নামাজের তানসীফের জন্য খাছ। আর খাছের আলোচনা যেহেতু আমের পরে হয় তাই সফরের নামাজের পর জুমার নামাজের কথা আলোচনা করা হচ্ছে। جمعه শব্দটি اجتماع থেকে নির্গত। যেমন فرقت শব্দটি افتراق থেকে নির্গত। جمعه শব্দটি ميم-এর (جمعه) ضمه এবং سكون (جمعة) সাথেও পড়া যায়। কেউ কেউ ميم-কে فتحه দিয়েও (جمعة) পড়েছেন। জুমাকে জুমা এ কারণে বলা হয় যে, সে দিন সমস্ত লোক একত্রিত হয়।

জুমার নামাজ ফরজ হওয়ার প্রমাণ কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং আকলী দলিল দ্বারা পাওয়া যায়। কুরআন দ্বারা এভাবে প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ। মশহূর বর্ণনা মতে যিকরুল্লাহ দ্বারা খুতবা মুরাদ। আর اسعوا - امر-এর সীগাহ, যা উজূবকে চায়।

সুতরাং আয়াত দ্বারা খুতবার দিকে সায়ী ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়। আর سَعْىُ إِلَى الْخُطْبَةِ (জুমার দিকে সায়ী) জুমুআর নামাজের শর্তের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যখন জুমার নামাজ জায়েজ হওয়ার শর্ত অর্থাৎ সায়ী ইলাল জুমার ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হলো, তাই জুমার নামাজ যা মূল উদ্দেশ্য তা তো অবশ্যই ওয়াজিব তথা ফরজ হবে। আর এ উজূবকে আরো গুরুত্ব দিতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে وَذَرُوا الْبَيْعَ অর্থাৎ জুমার আজানের পর বেচাকেনাকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। অথচ বেচাকেনা একটি জায়েজ বস্তু। আর এ নীতিমালা রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মুবাহ বস্তুকে অন্য কোনো ওয়াজিব বস্তু দ্বারাই হারাম করে দেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, জুমা যার কারণে আযানের পর বেচাকেনাকে হারাম করা হয়েছে তা ওয়াজিব (ফরজ)। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, বাহ্যিকভাবে মনে হয় যিকরুল্লাহ দ্বারা নামাজ উদ্দেশ্য। এই হিসাবে সরাসরি জুমার নামাজ ফরজ হওয়া সাবিত হয়ে যায়। মুফাসসিরীনে কেরাম যিকরুল্লাহর তাফসীর নামাজ এবং খুতবা উভয়টি করেছেন। আল্লাহ ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, এটা অধিক সমীচীন। কেননা এ সূরতে আয়াতটি নামাজ এবং খুতবা উভয়টির ব্যাপারে সাদিক থাকে।

যে হাদীস দ্বারা জুমার নামাজের ফরজিয়্যত প্রমাণিত হয় তা হলো, اِعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْجُمْعَةَ فِىْ يَوْمِىْ هٰذَا فِىْ شَهْرِىْ هٰذَا فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا জেনে রাখ আল্লাহ তা'আলা জুমার নামাজ তোমাদের উপর ফরজ করেছেন, আমার এই দিবসে, আমার এই মাসে, আমার এই শহরে। দ্বিতীয় হাদীস হলো, اَلْجُمْعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ اِلَّا اَرْبَعَةً مَمْلُوْكٌ اَوْ اِمْرَأَةٌ اَوْ صَبِىٌّ اَوْ مَرِيْضٌ . رَوٰى اَبُوْ دَاوُدَ জুমার নামাজ প্রত্যেক মুসলমানের জামাআতের সাথে আদায় করা হককে ওয়াজিব তথা ফরজ। কিন্তু চার প্রকারের লোকের উপর যেমন দাস, স্ত্রীলোক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু এবং অসুস্থ ব্যক্তি। তৃতীয় হাদীসে হলো, قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ . রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো ওজর ছাড়া তিন জুমা বর্জন করবে, সে মুনাফিকের দলে শামিল হয়ে যাবে। চতুর্থ হাদীস হলো, مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْاِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهٖ যে ব্যক্তি একাধারে চার জুমা বর্জন করবে সে ব্যক্তি ইসলামকে তার পিঠ পিছে ঠেলে দিয়েছে। এই দুই হাদীসের মধ্যে জুমা বর্জনের উপর কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ধমকি ফরজ বর্জন করার দ্বারাই দেওয়া হয়। সুতরাং উক্ত হাদীস দুটি দ্বারাও জুমার নামাজ ফরজ হওয়া প্রমাণিত হলো। আর যেহেতু সকল লোক জুমার নামাজ ফরজ হওয়ার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছে, তাই ইজমা দ্বারাও জুমার নামাজ ফরজ হওয়া প্রমাণিত হয়।

জুমা ফরজ হওয়ার উপর আকলী দলিল হলো, আমাদেরকে জুমার নামাজ আদায় করার জন্য জোহরের নামাজকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে জোহরের নামাজ ফরজ। আর একমাত্র সর্বজন স্বীকৃত যে, ফরজকে ফরজ দ্বারাই তরক করা হয়। নফলের দ্বারা নয়, সুতরাং এর দ্বারাও জুমার নামাজ ফরজ হওয়া প্রমাণিত হলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তিনি কুবায় আমর ইবনে আউফের মহল্লায় চৌদ্দরাত অতিবাহিত করেছিলেন। ঐ সময় তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, যাকে ইসলামের সর্বপ্রথম মাসজিদ হিসাবে অভিহিত করা হয়। যাকে কুরআনে لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। অতঃপর যখন তিনি কুবা থেকে মদীনার দিকে জুমার দিন রওয়ানা হলেন, তখন রাস্তায় সালিম ইবনে আতিকের মহল্লায় জুমার ওয়াক্ত হয়ে যায়। তখন তিনি সাওয়ারী থেকে অবতরণ করে এ মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করেছেন যা বতনে ওয়াদীতে অবস্থিত। এটা ইসলামে জুমা আদায়কারী সর্বপ্রথম মসজিদ ছিল। উক্ত জুমায় অনেক মুসলমান শরিক হয়েছিল। ইসলামে সর্ব প্রথম জুমা এবং খুতবার বিস্তারিত ব্যাখ্যা سیرت مصطفی - اصح السیر - شرح سیر کبیر এ বর্ণিত হয়েছে।

জুমার নামাজ ফরজ হওয়ার জন্য বারটি শর্ত রয়েছে, ছয়টি শর্ত তো এমন যা মুসল্লীর মধ্যে পাওয়া যাওয়া জরুরি (১) স্বাধীন হওয়া, সুতরাং গোলামের উপর জুমার নামাজ ফরজ নয়। (২) পুরুষ হওয়া; (৩) মুকীম হওয়া, মুসাফিরের উপর জুমা ফরজ নয়। (৪) সুস্থ হওয়া, অর্থাৎ এমন অসুস্থ না হওয়া যে জুমার নামাজে উপস্থিত হওয়া তার কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (৫) পা সহীহ হওয়া (৬) চোখ ঠিক হওয়া, সুতরাং লেংড়া ও অন্ধের উপর জুমা ফরজ নয়। অবশিষ্ট ছয়টি শর্ত এমন যার সম্পর্ক মুসল্লীর সাথে নয়। (১) শহর হওয়া, (২) জামাআত (৩) বাদশা (৪) ওয়াক্ত (৫) খুতবা এবং (৬) ইযনে আম তথা ব্যাপক অনুমতি থাকা।

لَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ اِلَّا فِىْ الخ মতনের দুটি শব্দ, مصر جامع আর مصلى المصر ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। مصر جامع তথা জামে শহরের সংজ্ঞায় মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জামে শহর হলো, যেখানে রাস্তা ঘাট, হাট বাজার এবং বিচারক থাকে–যারা জালিম ও মজলুমের মাঝে ইনসাফ করে। আর আলিম থাকবে যারা বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া সমস্যাবলিতে ফতওয়া দিবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর থেকে এ ব্যাপারে তিনটি রিওয়ায়াত রয়েছে : এক. জামে শহর প্রত্যেক ঐ স্থানকে বলা হয় যেখানে আমীর ও বিচারক থাকবে যারা শরিয়তের বিধি নিষেধ প্রয়োগ করতে সক্ষম : يُنَفِّذُ الْاَحْكَامَ -এর পর يُقِيْمُ الْحُدُوْدَ -এর قيد বৃদ্ধি করে মুহাক্কাম (যাকে হাকাম ও ফয়সাল নির্ধারণ করা হয়েছে) এবং মহিলা বিচারক থেকে ইহতিরায করা হয়েছে। কেননা মহিলাদের বিচার জায়েজ তবে তাদের হদসমূহ ও কিসাস প্রতিষ্ঠা করার শরয়ী শক্তি নেই। জামে শহরের ক্ষেত্রে এটাই যাহিরে মাযহাব এবং এটাই ইমাম কারখী (র.) অবলম্বন করেছেন। দুই. জামে শহর ঐ স্থানসমূহকে বলা হয়, যার সবচেয়ে বড় মসজিদে তার সকল লোক যাদের উপর জুমা ফরজ যদি সমবেত হয়, তবে তাদের সংকুলান হয় না; বরং জুমার জন্য আরেকটি মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। উক্ত রিওয়ায়াতটি আবূ আব্দুল্লাহ সালজী গ্রহণ করেছেন। তৃতীয় রিওয়ায়াত হলো, দশ হাজার জন বসতীর স্থান হলো জামে শহর। সুফিয়ানে সাওরী (র.) বলেন, জামে শহর হলো, যাকে লোকেরা শহরের আলোচনায় শহর হিসাবে অভিহিত করে।

দ্বিতীয় শব্দ হলো, مصلى । শহরের মুসাল্লা ঈদগাহ হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে মুসাল্লা দ্বারা উপশহর উদ্দেশ্য, উপশহর শহরের ঐ পরিধিকে বলা হয়, যা শহরের সাথে সম্পৃক্ত এবং শহর বাসীদের জন্য বানানো হয়েছে। যেমন, কবর স্থান, ঘোড়দৌড়ের ময়দান, ঈদগাহ, যবাইয়ের স্থান এবং আমাদের কালের পার্ক ইত্যাদি। ফানায়ে শহর এর পরিধির ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এক গালওয়ার সাথে সীমবদ্ধ করেছেন। গালওয়া বলা হয় তিনশত গজ থেকে চারশত গজকে। অর্থাৎ শহরের বাইরে চারশত গজ পর্যন্ত এলাকাকে উপশহর বলা হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) একমাইল কিংবা দুই মাইলের সাথে সীমাবদ্ধ করেছেন। তাইতো ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি ইমাম কোনো প্রয়োজন বশত শহর বাসীদের সাথে শহর থেকে বের হয়ে দুই মাইল পর্যন্ত বাইরে চলে যায়, এমনকি জুমার সময় হয়ে যায়। তবে তার জন্য জায়েজ আছে যে, ঐ স্থানেই জুমার নামাজ আদায় করিয়ে দিবে। কেউ কেউ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি শহরে দাঁড়িয়ে চিৎকার দেয়, কিংবা মুয়াজ্জিন আযান দেয় তবে যেস্থান পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছে সেস্থান পর্যন্তকে ফানায়ে শহর বলা হবে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে সূরতে মাসআলা হলো, জুমার নামাজ শহর এবং উপশহর উভয় স্থানেই জায়েজ। তবে গ্রামে-গঞ্জে জুমার নামাজ জায়েজ নেই। ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে গ্রামে-গঞ্জেও জুমার নামাজ জায়েজ। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, যে গ্রামে চল্লিশ জন স্বাধীন মুকীম ব্যক্তির আবাস হবে এবং যারা যাযাবরদের ন্যায় শীত ও গরমকালে এদিক সেদিক যায় না তাদের উপর জুমার নামাজ ফরজ হবে। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর দলিল হলো, فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ উক্ত আয়াতটি। উক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন জুমার দিন জুমার আজান হবে তখন লোকেরা সাথে সাথে হাজির হয়ে যাবে। এর দ্বারা বুঝা গেল, জুমার জন্য কোনো বিশেষ ধরনের স্থানের প্রয়োজন নেই; বরং সবস্থানে জুমা আদায় করা জায়েজ। চাই শহর হোক বা গ্রাম হোক এবং গ্রাম ছোট হোক বা বড় হোক। দ্বিতীয় দলিল হলো, ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস,

اِنَّ اَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِى الْاِسْلَامِ بَعْدَ الْمَدِيْنَةِ مَا جُمِّعَتْ بِجَوَاثِىْ وَهِىَ قَرْيَةٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ .

ইসলামের মধ্যে মদীনা শরীফের পর সর্ব প্রথম জুমা জুয়াসা নামক স্থানে পড়া হয়েছিল। আর জুয়াসা হলো বাহরাইনের একটি গ্রাম। তৃতীয় দলিল হলো কিয়াস দ্বারা। আর তা হলো, জুমার নামাজও অন্যান্য নামাজের ন্যায় একটি নামাজ। তাই অন্যান্য জামাজের মতো জুমার নামাজ ও সবজায়গায় জায়েজ হবে।

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী لَاجُمُعَةَ وَلَاتَشْرِيْقَ الخ অর্থাৎ জুমার নামাজ, তাকবীরে তাশরীক, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা শুধু শহরের মধ্যে জায়েজ। উক্ত বাণীটিকে হিদায়া গ্রন্থকার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী বলেছেন, অথচ সহীহ হলো এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী নয় বরং হযরত আলীর বাণী। যেমন– ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার

লিখেছেন যে, ইবনে আবী শায়বা উক্ত বাণীটিকে হযরত আলী (রা.)-এর উপর মওকূফ করেছেন, অর্থাৎ তার বাণী বলেছেন। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর প্রথম দলিলের জওয়াব হলো, فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ আয়াতটি আপনাদের মতেও তার ইত্লাক এর উপর নেই। কেননা আয়াতটির ইতলাক-এর চাহিদা হলো, জুমা প্রত্যেক স্থানে জায়েজ হওয়া। জনবসতী হোক বা জঙ্গল হোক। অথচ আপনাদের মতে জুমার নামাজ জঙ্গলেও জায়েজ নেই এবং এমন স্থানেও জায়েজ নেই যার বাসিন্দারা শীতে গরমে অন্যত্র চলে যায়। সুতরাং বুঝা গেল, আয়াত দ্বারা বিশেষ স্থান উদ্দেশ্য। আপনারা বিশেষ স্থান দ্বারা গ্রাম মুরাদ নিয়েছেন, আর আমরা শহর মুরাদ নিয়েছি। আর শহর মুরাদ নেওয়াটাই সমীচীন। কেননা হযরত আলী (রা.)-এর বক্তব্য এর সমর্থক। দ্বিতীয় দলিল তথা ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসের জওয়াব হলো, হাদীসের মধ্যে قرية (কারিয়া) দ্বারা শহর মুরাদ। কেননা প্রাথমিক কালে কারিয়া দ্বারা শহরকে বুঝানো হতো। যেমন, কুরআনে বর্ণিত আছে– وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ . এ আয়াতে قريتين দ্বারা মক্কা ও তায়েফ উদ্দেশ্য। আর নিঃসন্দেহে মক্কা শহর, সুতরাং বুঝা গেল হাদীসের মধ্যে قرية দ্বারা শহর উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় জওয়াব হলো, জুয়াকা বাহরাইনের একটি কিল্লার নাম। আর সাধারণত কিল্লার মধ্যে বিচারক ও আলিম থাকেন। তাই এর দ্বারাও জুয়াসা-এর শহর হওয়া প্রমাণিত হয়। এ কারণেই মাবসূত নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, জুয়াসা হলো বাহরাইনের শহরের নাম।

তৃতীয় দলিল তথা কিয়াসের জবাব হলো, আয়াত দ্বারা সব স্থানে জুমার নামাজ জায়েজ হওয়া বুঝায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত আলী (রা.) কোনো কোনো স্থানে জুমার নামাজ জায়েজ হওয়াকে নিষেধ করেছেন। যেমন– গ্রামে-গঞ্জে, বনে-জঙ্গলে। হযরত আলী (রা.)-এর কোনো কোনো স্থানে জুমাকে জায়েজ বলা বা কোনো কোনো স্থানে নাজায়েজ বলা নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেই বলেছেন, অথচ এটা কিয়াস পরিপন্থী কথা। সুতরাং যখন শহরের মধ্যে জুমা জায়েজ হওয়া আর গ্রামে-গঞ্জে নাজায়েজ হওয়া কিয়াসের খেলাফ হলো, তাই এটাকে অন্যান্য নামাজের উপর কিয়াস করা জায়েজ হবে না।

وَالْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُوْرٍ عَلَى الْمُصَلّٰى الخ ইবারত টুকুর ব্যাখ্যা হলো, জুমার নামাজ যেমনিভাবে ঈদগাহে জায়েজ। কেননা, এটা হলো উপশহর (فناء شهر) এমনিভাবে শহরের চর্তুদিকে যেখানে যেখানে উপ শহরের ইতলাক হয় সেখানেও জুমা জায়েজ। কেননা শহরবাসীদের জরুরত পূর্ণ করার ক্ষেত্রে উপশহর শহরের ভূমিকা রাখে।

وَيَجُوْزُ بِمِنًى إِنْ كَانَ الْأَمِيْرُ أَمِيْرَ الْحِجَازِ أَوْ كَانَ الْخَلِيْفَةُ مُسَافِرًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ (رح) وَأَبِي يُوْسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) لَاجُمُعَةَ بِمِنًى لِأَنَّهَا مِنَ الْقُرٰى حَتّٰى لَايُعَيَّدُ بِهَا وَلَهُمَا أَنَّهَا تَتَمَصَّرُ فِيْ أَيَّامِ الْمَوْسِمِ وَعَدَمُ التَّعْيِيْدِ لِلتَّخْفِيْفِ وَلَا جُمُعَةَ بِعَرَفَاتٍ فِيْ قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا لِأَنَّهَا فِضَاءٌ وَبِمِنًى أَبْنِيَةٌ وَالتَّقْيِيْدُ بِالْخَلِيْفَةِ وَأَمِيْرِ الْحِجَازِ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَهُمَا أَمَّا أَمِيْرُ الْمَوْسِمِ فَيَلِيْ أُمُوْرَ الْحَجِّ لَاغَيْرَ وَلَا يَجُوْزُ إِقَامَتُهَا إِلَّا لِلسُّلْطَانِ أَوْ لِمَنْ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ لِأَنَّهَا تُقَامُ بِجَمْعٍ عَظِيْمٍ وَقَدْ تَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فِي التَّقَدُّمِ وَالتَّقْدِيْمِ قَدْ تَقَعُ فِيْ غَيْرِهِ فَلَابُدَّ مِنْهُ تَتْمِيْمًا لِأَمْرِهَا ـ

অনুবাদ : মীনাতে জুমা জায়েজ হবে যদি হিজাযের আমীর উপস্থিতি থাকেন। কিংবা যদি মুসাফির অবস্থায় খলীফা উপস্থিত থাকেন। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মীনাতে জুমা জায়েজ নেই। কেননা এটি গ্রামে গণ্য। এ জন্যই সেখানে ঈদের নামাজ পড়া হয় না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসফ (র.)-এর দলিল হলো, হজের মৌসুমে মীনা শহরে পরিণত হয়ে যায়, ঈদের আনুষ্ঠান হয় না। হাজীদের দায়িত্বভার লাঘবের জন্য। আরাফাতে সকলের মতেই জুমা জায়েজ নয়। কেননা তা খোলা প্রান্তর। পক্ষান্তরে মীনাতে ঘরবাড়ি রয়েছে। খলীফা কিংবা হিজাজের আমীরের সাথে বিষয়টিকে শর্তযুক্ত করার কারণ হলো, ক্ষমতা তাদেরই রয়েছে। হজ মওসুমের আমীর তো শুধু হজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ই তদারক করে থাকেন, অন্য কিছু নয়। খলীফা কিংবা খলীফা নির্ধারিত লোক ছাড়া অন্য কারোর জন্য জুমার নামাজ কায়েম করা জায়েজ নয়। কেননা জুমা বিশাল সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। আর সেখানে ইমাম হওয়া কিংবা অন্যকে ইমাম করা এছাড়া অন্যান্য কারণেও কোনো কোনো সময় ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। সুতরাং জুমার নামাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য তা জরুরি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে হজের মৌসুমে মীনায় জুমার নামাজ আদায় করা জায়েজ। তবে শর্ত হলো হজের আমীর সে ব্যক্তি হতে হবে যে হিজাজের বিচারক। তার উপস্থিত থাকতে হবে, শুধু হজের জন্য আমীর বানানো হয়েছে সে নয়। কিংবা খলীফাতুল মুসলিমীন স্বয়ং হজের ইরাদায় সফর করে সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে। খলীফার সাথে মুসাফিরের قيد এ জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, খলীফা যদি মীনায় মুকীম থাকে, তবে তো অবশ্যই জুমার নামাজ মীনায় জায়েজ হবে। দ্বিতীয়ত এ সন্দেহকে দূর করার জন্য যে হজের মওসুমের আমীর যদি মুসাফির হয় তবে সে জুমা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। এমনিভাবে খলীফাও মুসাফির হওয়া অবস্থায় জুমার নামাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না।

ইমাম কুদূরী (র.) উক্ত সন্দেহকে দূর করার জন্য বলেছেন যে, হজের মওসুমের আমীর মুসাফির হওয়া অবস্থায় নিঃসন্দেহে জুমা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। কিন্তু খলীফাতুল মুসলিমীন মুসাফির হওয়া সত্ত্বেও জুমা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এর দ্বারা এটাও বুঝে আসল যে, খলীফা কিংবা বাদশা যদি নিজেদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহরে সফর করে তবে প্রত্যেক শহরে তাদের উপর জুমার নামাজ ওয়াজিব হবে। সুতরাং যে শহরে জুমার দিন এসে যাবে সেখানেই জুমা আদায় করবে। দলিল হলো, যখন তার নির্দেশে অন্যদেরকে জুমার ইমাম নির্ধারণ করা যায় তখন তার নিজের পক্ষে জুমার ইমামত করা অবশ্যই জায়েজ হবে। যদিও তিনি মুসাফির হোন। মুদ্দাকথা শায়খাইনের মতে উপরোক্ত শর্তের সাথে মীনায় জুমার নামাজ জায়েজ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মীনায় জুমার নামাজ একেবারেই জায়েজ নেই। তাঁর দলিল হলো, মীনা না শহর না উপশহর; বরং একটি গ্রাম, আর গ্রামে জুমার নামাজ জায়েজ নেই। এ জন্য মীনায়ও জুমার নামাজ জায়েজ হবে না। এ কারণেই মীনায় কুরবানির ঈদের নামাজ আদায় করা হয় না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মীনা ফেনায়ে শহর তথা মক্কায় এ কারণে দাখিল নয় যে, তার মতে ফেনায়ে শহর বুঝায় সেখানে এক গালওয়া তথা চারশত গজ পর্যন্ত হয়। আর মীনা মক্কা থেকে এর চেয়ে অধিক দূরত্বে অবস্থিত।

শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো, মীনা নিঃসন্দেহে শহর নয়। কিন্তু হজের মওসুমে শহর হয়ে যায়। কেননা হজের মওসুমে সেখানে বাজার বসে, বাদশাহ কিংবা তার নায়েব এবং কাজী ঐ মওসুমে সেখানে উপস্থিত থাকেন। যেহেতু হজের মওসুম ব্যতিরেকে অন্য সময় এ সকল শর্ত পাওয়া যায় না, এ জন্য হজের মওসুম ব্যতীত অন্য সময় সেখানে জুমার নামাজ জায়েজ নেই। তবে মীনায় কুরবানির ঈদ আদায় না করার কারণ এই নয় যে, মীনা হজের মওসুমে শহর হয় না; বরং এর কারণে ঐ দিন হাজীগণ হজের আহকাম, রমী, জবাই এবং মাথা মুণ্ডানো ইত্যাদির কাজে মশগুল হয়ে যায়। আর সময়ও কম থাকে, এজন্য সহজ করণার্থে হাজীগণের কুরবানির ঈদের নামাজ না পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, মীনা যেহেতু হরমের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু মীনা ফেনায়ে মক্কার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আর বাণী, هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ উক্ত আয়াতে মীনাকে কাবার সাথে গণনা (تعبير) করা হয়েছে। আর তা এভাবে যে, কুরবানি ও হাদী-এর পশু মক্কায় জবাই করা হয় না; বরং মীনায় জবাই করা হয়, এর দ্বারা বুঝা গেল মীনা মক্কা কিংবা ফেনায়ে মক্কার অন্তর্ভুক্ত। আর জুমা আদায় করা যেমনিভাবে শহরের মধ্যে জায়েজ এমনিভাবে ফেনায়ে শহর তথা উপশহরেও জায়েজ।

আরাফার ময়দানে সর্বসম্মতিক্রমে জুমার নামাজ জায়েজ নেই। কারণ হলো, আরাফা নিরেট একটি ময়দান, জনবসতি ইত্যাদি কিছুই তাতে নেই এবং ফেনায়ে মক্কারও অন্তর্ভুক্ত নয়, কেননা আরাফা হিল্ল-এর মধ্যে, হারামের মধ্যে নয়। সুতরাং আরাফা শহর কিংবা ফেনায়ে শহর কিছুই নয়, তাই সেখানে জুমার নামাজ প্রতিষ্ঠা করাও জায়েজ হবে না।

কুদূরী গ্রন্থকার মীনার মধ্যে জুমা জায়েজ হওয়ার জন্য হিজাযের আমীর কিংবা খলীফার উপস্থিতির শর্তারোপ এ কারণে করেছেন যে, জুমা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা তাদের দুজনেরই রয়েছে। আর আমীর যাকে আমীরে মওসুম বলা হয় সেতো শুধু হজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তদারককারী, অন্য কিছুর নয়। এ জন্য তার জুমা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা নেই।

وَلَا يَجُوْزُ إِقَامَتُهَا الخ : জুমার নামাজ আদায়ের জন্য সুলতান উপস্থিত থাকা আবশ্যক। সুলতান ঐ ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে বলা হয় যাঁর উপর অন্য কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তি নেই। যেমন– খলীফা কিংবা ঐ ব্যক্তি থাকবে যাকে সুলতান নির্দেশ দিয়েছে। যথা– আমীর, কাজী কিংবা খতীব থাকবে। তবে শর্ত হলো তাদের জুমা প্রতিষ্ঠা করার ইজাযত থাকতে হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, জুমা আদায়ের জন্য সুলতান কিংবা তাঁর নায়েব থাকা শর্ত নয়। (ইনায়া) তাঁর দলিল হলো, যে সময় তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা.) দাঙ্গবাজদের ভয়ে স্বীয় ঘরে মদীনায় বন্দী ছিলেন, তখন হযরত আলী (রা.) তাদেরকে নামাজ পড়িয়েছিলেন, কিন্তু একথা বর্ণিত নেই যে, ওসমান (রা.)-এর নির্দেশে পড়িয়েছেন। অথচ ঐ সময় খিলাফতের দায়িত্বভার হযরত ওসমান (রা.)-এর হাতে ছিল। এর দ্বারা বুঝা গেল জুমা আদায়ের জন্য সুলতান কিংবা তাঁর নির্ধারিত লোকের কোনো প্রয়োজন নেই।

আমাদের দলিল হলো, জুমা একটি বিশাল জামাআতের সাথে আদায় করা হয়। কেননা জুমা হলো জামেউল জামাআত তথা সমস্ত জামাআতের একত্রকরণকারী। আর অবস্থা হলো যে, আগ-পিছ নিয়ে কখনো ঝগড়া-বিবাদই বেঁধে যায়। কেউ বলে আমি ইমামত করব। অপরজন বলে আমি ইমামত করব। আবার কখনো সামনে অগ্রসর করানোর ক্ষেত্রেও ঝগড়া হয়। একদল বলে আমরা অমুক বুজুর্গকে ইমাম বানাব। অন্য দল বলে, না, আমরা অন্যজনকে ইমাম বানাব। আবার কখনো অন্যান্য ব্যাপারেও ঝগড়া হয়। যেমন– কেউ বলে আমাদের মসজিদে জুমা আদায় করা হবে। আবার কেউ বলে, না; বরং আমাদের মসজিদে আদায় করা হবে। কেউ বলে জলদী আদায় করা হবে, অপর কেউ বলে দেরি করে আদায় করা হবে। বিশাল জামাআতের এই মতবিরোধ দ্বারা শয়তানের ফিতনা সৃষ্টি করার বিরাট সুযোগ মিলে যায়। এ জন্য আমরা বলেছি জুমা আদায়ের জন্য খলীফা কিংবা তাঁর নায়েব থাকা জরুরি। খলীফা আদিল হোক বা জালিম হোক। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিলের জওয়াব হলো, হযরত আলী (রা.) হযরত ওসমানের নির্দেশক্রমে জুমার নামাজ পড়িয়েছেন। আর যদি আমরা মেনেও নেই যে হযরত ওসমান (রা.) নির্দেশ দেননি। তারপরেও জওয়াবে আমরা বলব, যখন লোকেরা হযরত আলী (রা.)-এর কাছে গেল এবং ইকামতে জুমারও মুখাপেক্ষী ছিল, তখন হযরত আলী (রা.)-এর জন্য জুমা পড়ানো জায়েজ হয়ে যায়। কেননা যখন খলীফার নির্দেশ নিতে অপারগ হয়ে গেলেন, তখন লোকেরা যার উপর ঐকমত্য পোষণ করল তা-ই করলেন, অর্থাৎ নামাজ পড়িয়ে দিলেন।

وَمِنْ شَرَائِطِهَا الْوَقْتُ فَتَصِحُّ فِيْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَلَاتَصِحُّ بَعْدَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِيْهَا إِسْتَقْبَلَ الظُّهْرَ وَلَايَبْنِيْهِ عَلَيْهَا لِاخْتِلَافِهِمَا ـ

অনুবাদ : জুমার আরেকটি শর্ত হলো সময়। সুতরাং তা জোহরের সময়ে সহীহ হবে। তার পরে সহীহ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ যখন সূর্য হেলে পড়ে তখন তুমি লোকদের নিয়ে জুমার নামাজ আদায় করো। যদি জুমার নামাজে থাকা অবস্থায় ওয়াক্ত চলে যায় তবে পুনরায় জোহর শুরু করবে, জুমার উপর জোহরের বিনা করবে না। কেননা উভয়টি ভিন্ন নামাজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : জুমার শর্তসমূহের মধ্যে ওয়াক্তও একটি শর্ত। অর্থাৎ জুমার নামাজ জোহরের ওয়াক্তে সহীহ হবে, এরপর সহীহ হবে না। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.)-কে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন, তখন বলেছিলেন– إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ সূর্য যখন হেলে যাবে তখন লোকদেরকে নিয়ে জুমার নামাজ আদায় করো। বুখারী শরীফে বর্ণত আছে যে, عَنْ أَنَسٍ (رض) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সূর্য হেলে পড়তো তখন জুমার নামাজ আদায় করতেন। মুসলিম শরীফে আছে, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ (رض) كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ, সালমা ইবনে আকওয়া (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে জুমার নামাজ পড়তাম যখন সূর্য হেলে যেতো।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি জোহরের ওয়াক্ত এ অবস্থায় বেরিয়ে আসে যে, ইমাম তখনো জুমার নামাজে মশগুল তবে জুমার নামাজ ফসিদ হয়ে যাবে, এখন শুরু থেকে জোহরের নামাজ আদায় করতে হবে। জুমার উপর জোহরের নামাজের বিনা জায়েজ হবে না। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে বিনা করা জায়েজ হবে– তাঁদের দলিল হলো, জুমা হলো জোহরের কসর নামাজ। তাই যা জোহরের ওয়াক্ত তা জুমারও ওয়াক্ত। সুতরাং যেহেতু জুমা জোহর-ই বটে সেহেতু জুমার উপর জোহরের বিনা জায়েজ হবে। আমাদের দলিল হলো, জুমা আর জোহরের মাঝে اسما . كما . كيفا শর্তের দিক থেকেও পার্থক্য রয়েছে। ইসমান পার্থক্য হলো, একটির নাম জুমা আর অপরটির নাম জোহর। কাম্মান পার্থক্য হলো, জোহরের নামাজ চার রাকআত আর জুমার নামাজ হলো দুই রাকআত। কাইফান পার্থক্য হলো, জুমার নামাজের কিরাআত সশব্দে আর জোহরের নামাজের কিরাআত হলো নিঃশব্দে। শর্তের দিকে থেকে পার্থক্য হলো, জুমার নামাজ আদায়ের জন্য কিছু এমন শর্ত রয়েছে যা জোহরের মধ্যে নেই। মুদ্দাকথা জুমা ও জোহরের মাঝে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। উল্লেখ যে, পরিবর্তন, ব্যবধান বিনাকে বারণ করে, যেমনটি ইক্তিদাকে বারণ করে। এ জন্য আমরা বলেছি যে, জোহরের বিনা জোহরের উপর জায়েজ হবে না।

وَمِنْهَا الْخُطْبَةُ لِاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَا صَلَّاهَا بِدُوْنِ الْخُطْبَةِ فِىْ عُمْرِهٖ وَهِىَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الزَّوَالِ بِهٖ وَرَدَتِ السُّنَّةُ وَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِقَعْدَةٍ بِهٖ جَرَى التَّوَارُثُ .

অনুবাদ : জুমার নামাজের জন্য আরেকটি শর্ত হলো খুতবা। কেননা নবী করীম ﷺ জীবনে কখনো খুতবা ছাড়া জুমার নামাজ আদায় করেননি। আর এই খুতবা হবে সূর্য হেলে যাওয়ার পরে নামাজের পূর্বে। হাদীসে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম দু'টি খুতবা দিবেন এবং উভয় খুতবার মাঝে একটি বৈঠক দ্বারা ব্যবধান করবেন। এর উপরই আমল চলে এসেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জুমার নামাজের আরেকটি শর্ত হলো খুতবা। সুতরাং খুতবা ব্যতীত জুমার নামাজ জায়েজ হবে না। দলিল হলো, শরিয়তের বাণী মহানবী ﷺ পুরো জিন্দেগীতে কখনো খুতবা ছাড়া জুমা পড়েননি। যদি খুতবা জুমার শর্তসমূহের মধ্য থেকে না হতো, তবে তিনি একবার হলেও জায়েজ বুঝাবার জন্য তা তরক করতেন। জুমার খুতবা জুমার নামাজের পূর্বে আর সূর্য হেলে যাওয়ার পরে ওয়াজিব। সুতরাং যদি জুমার নামাজের পর কিংবা সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে পড়া হয় তবে জায়েজ হবে না। দলিল হলো, জুমা জোহরের স্থলবর্তী বিষয়টি খেলাফে কিয়াস, হাদীস এভাবে এসেছে যে, জুমা খুতবার সাথে সম্পৃক্ত হবে। যেমন বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো জুমা খুতবা ছাড়া পড়েননি। আর কায়দা আছে যে, যে জিনিস খেলাফে কিয়াস সাবিত হয় তা তার মাওয়ারিদ তথা হাদীসের সাথে খাস হয় সুতরাং জুমা প্রবর্তন এভাবে হবে যে, খুতবা নামাজের পূর্বে পড়া হবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দু'টি খুতবা ওয়াজিব। দুই খুতবার মাঝে তিন তাসবীহ পরিমাণ বসা উত্তম। এভাবেই আমল চলে এসেছে। অর্থাৎ বুজুর্গদের থেকে একের পর এক এভাবেই করা বর্ণিত হয়েছে। আমাদের মতে এই কথাটি শর্ত নয়; বরং আরাম লাভের জন্য বসা হয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে শর্ত। এমনকি তাঁর মতে এক খুতবার উপর ইকতিফা করা জায়েজ নয়। তাঁর দলিল হলো আমলে তাওয়ারুস অর্থাৎ অতীতের সর্বকালীন আমল। আমাদের দলিল জাবির ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস– إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا خُطْبَةً وَاحِدَةً فَلَمَّا اَسَنَّ جَعَلَهَا خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ فِيْهِمَا جَلْسَةً রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে এক খুতবা পড়তেন, পরে যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেন তখন দুই দুই খুতবা পড়তে লাগলেন এবং উভয় খুতবার মাঝে বসতেন। এর দ্বারা বুঝা গেল এক খুতবার উপর ইকতিফা করা জায়েজ আছে।

وَيَخْطُبُ قَائِمًا عَلَى الطَّهَارَةِ لِاَنَّ الْقِيَامَ فِيْهَا مُتَوَارَثٌ ثُمَّ هِيَ شَرْطُ الصَّلٰوةِ فَيُسْتَحَبُّ فِيْهَا الطَّهَارَةُ كَالْاَذَانِ وَلَوْ خَطَبَ قَاعِدًا اَوْ عَلٰى غَيْرِ طَهَارَةٍ جَازَ لِحُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ اِلَّا اَنَّهُ يُكْرَهُ لِمُخَالَفَةِ التَّوَارُثِ وَلِلْفَصْلِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلٰوةِ ـ

অনুবাদ : তাহারাত অবস্থায় দাঁড়িয়ে খুতবা দিবেন। কেননা দাঁড়িয়ে খুতবা একটি সর্বকালীন আমল। অতঃপর যেহেতু খুতবা হলো নামাজের শর্ত, এতে তাহারত মুস্তাহাব। যেমন– আজানের ধ্বনি। যদি বসে কিংবা তাহারাত ছাড়া খুতবা পাঠ করে, তবে তা জায়েজ হবে। কেননা খুতবার উদ্দেশ্য তার দ্বারা হাসিল হয়ে যায়। তবে তা মাকরূহ হবে। সর্বকালীন আমলের বিরুদ্ধাচরণ এবং নামাজ ও খুতবার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টির কারণে।

প্রসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, খুতবা তাহারাতের সাথে দাঁড়িয়ে পড়া হবে। দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া আমাদের মতে সুন্নত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, বসে বসে খুতবা পড়া জায়েজ নেই। এক বর্ণনা মতে ইমাম মালিক (র.)ও উক্ত মত পোষণ করেন। এটা ইমাম আহমদ (র.)-এরও মত। খুতবার সময় তাহারাত আমাদের মতে সুন্নত, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে শর্ত। এমনকি তাঁদের মতে তাহারাত ব্যতীত খুতবা পাঠ করা জায়েজ নেই। দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়ার আমল সর্বকালীন আমল। অর্থাৎ অতীত বুজুর্গদের থেকে দাঁড়িয়ে জুমার খুতবার আমল চলে আসছে। বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন– اَلَسْتَ تَتْلُوْ قَوْلَهُ تَعَالٰى وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। ঐ সময় এক ব্যবসায়ী দল আসল। লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ছেড়ে ঐ দিকে চলে গেল। এই প্রক্ষোপটে নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়– فَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا যখন তারা কোনো তিজারত বা খেল-তামাশাকে দেখল, সেদিকে তারা চলে গেল এবং আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে গেল। উক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, খুতবা যেহেতু জুমার নামাজের শর্ত তাই খুতবার মধ্যে তাহারাত মুস্তাহাব। যেমন– আজানের মধ্যে (তাহারাত মুস্তাহাব)। গ্রন্থকার খুতবাকে আজানের সাথে তুলনা করেছেন। বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় وجه شبه শর্ত হয় যেমন, যেমনিভাবে খুতবা জুমার নামাজের শর্ত এমনিভাবে আজানও শর্ত। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। আজান নামাজের শর্ত হওয়ার বিষয়টি একেবারে ভুল। ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, كالاذان-এর সম্পর্ক فَيُسْتَحَبُّ فِيْهَا الطَّهَارَةُ-এর সাথে, وَهِيَ- شَرْطٌ لِلصَّلٰوةِ-এর সাথে নয়। এখন মর্মার্থ এই হবে যে, যেমনিভাবে আজানের জন্য তাহারাত মুস্তাহাব এমনিভাবে খুতবার মধ্যেও তাহারাত মুস্তাহাব। আল্লামাতুল হিন্দ মাওলানা আবদুল হাই (র.) হিদায়ার টীকায় লিখেছেন যে, وجه تشبيه হলো হলো, যেমনিভাবে আজান ওয়াক্ত আসার পর দেওয়া হয় এমনিভাবে খুতবাও ওয়াক্ত আসার পর দেওয়া হয়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি বসে বসে খুতবা পড়ে কিংবা তাহারাত ছাড়া খুতবা পড়ে তা জায়েজ তবে মাকরূহ হবে। জায়েজ হওয়ার কারণ হলো খুতবার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। অর্থাৎ ওয়াজ নসীহত হয়ে যায়। আর বসে পড়া মাকরূহ এ কারণে যে, তাওয়ারুস তথা সর্বকালীন আমলের খেলাফ। তাহরাত ছাড়া মাকরূহ এ কারণে যে, এ সুরতে নামাজ ও খুতবার মাঝে ব্যবধান হয়ে যাবে। কেননা তাহারাত ব্যতীত খুতবা দেওয়ার সুরতে খুতবার পর তাহারাত হাসিল করবে তারপর নামাজ আরম্ভ করবে। এভাবে নিঃসন্দেহে ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যাবে।

ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর দলিল (বসে খুতবা জায়েজ না হওয়ার উপর) হলো, খুতবা হলো দুই রাকআতের স্থলবর্তী, সুতরাং যেমনিভাবে নামাজের জন্য কিয়াম শর্ত এমনিভাবে খুতবার জন্যও কিয়াম শর্ত।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল (তাহারাত খুতবার শর্তের উপর) হলো, খুতবা হলো অর্ধ নামাজের মর্যাদায়। যেমন বর্ণিত আছে যে, اِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَعَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اِنَّمَا قُصِرَتِ الْجُمُعَةُ لِمَكَانِ الْخُطْبَةِ সুতরাং যেমনিভাবে নামাজের জন্য তাহারাত শর্ত, এমনিভাবে খুতবার জন্যও তাহারাত শর্ত।

فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ جَازَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَابُدَّ مِنْ ذِكْرٍ طَوِيْلٍ يُسَمّٰى خُطْبَةً لِاَنَّ الْخُطْبَةَ هِىَ الْوَاجِبَةُ وَالتَّسْبِيْحَةُ وَالتَّحْمِيْدَةُ لَاتُسَمّٰى خُطْبَةً وَقَالَ الشَّافِعِىْ (رحـ) لَايَجُوْزُ حَتّٰى يَخْطُبَ خُطْبَتَيْنِ اِعْتِبَارًا لِلْمُتَعَارَفِ وَلَهٗ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَعَنْ عُثْمَانَ (رضـ) اَنَّهٗ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَارْتَجَّ عَلَيْهِ فَنَزَلَ وَصَلّٰى .

অনুবাদ : যদি শুধু জিকিরের উপর শেষ করে দেয়, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা জায়েজ। আর সাহেবাইনের মতে এই পরিমাণ দীর্ঘ জিকির আবশ্যক, যাকে খুতবা বলা যায়। কেননা খুতবা হলো ওয়াজিব। শুধু তাসবীহ আর শুধু হামদকে খুতবা বলা হয় না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) প্রচলিত রীতির উপর ভিত্তি করে বলেন, দু'টি খুতবা পাঠ ছাড়া জায়েজ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল, আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ। তোমরা আল্লাহর জিকিরের দিকে ধাবিত হও। এতে কোনো বিশ্লেষণ করা হয়নি। হযরত ওসমান (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলার পর তাঁর কথা থেমে গেলে তিনি (মিম্বর থেকে) নেমে গেলেন এবং নামাজ আদায় করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

খুতবার পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে খোদ হানাফী আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমামে আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যদি খুতবার ইরাদায় শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলে কিংবা সুবহানাল্লাহ বা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তবে তা জায়েজ হবে। আর যদি হাঁচি দেওয়ার কারণে খতীব সাহেব আলহামদুলিল্লাহ বলেন, কিংবা আশ্চর্যের কোনো সংবাদের কারণে সুবহানাল্লাহ বলেন, তবে সর্বসম্মতিক্রমে খুতবা জায়েজ হবে না। সাহেবাইন বলেন, এ পরিমাণ দীর্ঘ জিকির হওয়া জরুরি যাকে সাধারণত খুতবা বলা হয়। শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলা কিংবা সুবহানাল্লাহ বলা কিংবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এগুলোর নাম খুতবা নয়। সুতরাং খতীব যদি শুধু উপরোক্ত বাক্যগুলো বলে তবে ওয়াজিব খুতবা আদায় হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, দুই খুতবা ওয়াজিব। প্রথম খুতবা আল্লাহর প্রশংসা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরুদ, তাকওয়ার উপদেশ এবং সর্বনিম্ন এক আয়াত সম্বলিত হতে হবে। আর দ্বিতীয় খুতবার মধ্যে আয়াতের স্থলে মুসলমান নর-নারীদের জন্য দোয়া করা হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল প্রচলিত রীতি এবং মানুষের স্বাভাবিক আদত বা অভ্যাস। অর্থাৎ এর চেয়ে কম পরিমাণকে মানুষের আদত বা প্রচিলত রীতি বলা হয় না। অধিকন্তু খতীব সাহেবগণ সাধারণত এর কম খুতবা দেন না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ। সমস্ত মুফাস্সিরদের মতে যিকরুল্লাহ দ্বারা খুতবা মুরাদ, এর মধ্যে কমবেশির কোনো ব্যাখ্যা করা হয়নি। এর দ্বারা বুঝা গেল, মুতলাকান যিকরুল্লাহ দ্বারা চাই কম হোক বা বেশি হোক ওয়াজিব খুতবা আদায় হয়ে যাবে। হযরত ওসমান (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, খলীফা হওয়ার পর যখন প্রথমবার জুমার খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে উঠলেন এবং আলহামদুলিল্লাহ বললেন, তখন তার কথা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি মিম্বর থেকে নেমে পড়লেন এবং লোকদেরকে জুমার নামাজ পড়িয়ে দিলেন। ঐ সময় ওলামায়ে সাহাবীও উপস্থিত ছিলেন, তবে কেউ হযরত ওসমানের উক্ত কাজকে অপছন্দ করেননি। সুতরাং সাহাবীগণের ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, শুধু আল্লাহর জিকিরের দ্বারা খুতবা জায়েজ হয়ে যায়। তবে সাহেবাইনের এই বক্তব্য যে, শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলাকে প্রচলিত রীতিতে খুতবা বলা হয় না। নিঃসন্দেহে উরফে তাকে খুতবা বলা হয় না, তবে আভিধানিকভাবে খুতবা বলা যায়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে بِئْسَ الْخَطِيْبُ নিকৃষ্ট খতীব বলে আখ্যা দিয়েছিলেন, যিনি তাঁর খুতবায় مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى . বলে ছিল। উল্লেখ্য যে, ঐ টুকুন পরিমাণ কথা দ্বারাই তাকে খতীব বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, খুতবার জন্য দীর্ঘ জিকিরের কোনো প্রয়োজন নেই। (ফাতহুল কাদীর)

وَمِنْ شَرَائِطِهَا الْجَمَاعَةُ لِاَنَّ الْجُمُعَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنْهَا وَاَقَلُّهُمْ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ ثَلٰثَةٌ سِوَى الْاِمَامِ وَقَالَا اِثْنَانِ سِوَاهُ قَالَ (رضـ) وَالْاَصَحُّ اَنَّ هٰذَا قَوْلُ اَبِىْ يُوْسُفَ وَحْدَهُ لَهُ اَنَّ فِى الْمُثَنّٰى مَعْنَى الْاِجْتِمَاعِ وَهِىَ مُنْبِئَةٌ عَنْهُ وَلَهُمَا اَنَّ الْجَمْعَ الصَّحِيْحَ اِنَّمَا هُوَ الثَّلٰثُ لِاَنَّهُ جَمْعٌ تَسْمِيَةً وَمَعْنًى وَالْجَمَاعَةُ شَرْطٌ عَلٰحِدَةٍ وَكَذَا الْاِمَامُ فَلَا يُعْتَبَرُ مِنْهُمْ .

অনুবাদ : জুমার আরেকটি শর্ত হলো জামাআত। কেননা جمعة শব্দটি جماعة শব্দ হতে গঠিত। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জামাআতের সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো ইমাম ছাড়া তিনজন। সাহেবাইনের মতে ইমাম ছাড়া দুইজন হতে হবে। গ্রন্থকার বলেন, বিশুদ্ধতম কথা হলো, এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর একার মত। তাঁর দলিল হলো, দুইয়ের মাঝে اجتماع বা সমাবেশের অর্থ রয়েছে। আর جمعة শব্দটি সমাবেশের প্রতিই ইঙ্গিত করে। তরফাইনের দলিল হলো, প্রকৃতপক্ষে جمع বা বহুবচন হলো তিন। কেননা এটিই নাম ও অর্থ উভয় দিক থেকেই جمع। আর জামাআত আলাদা শর্ত। অদ্রূপ ইমামও শর্ত। সুতরাং ইমাম জামাআতের মধ্যে গণ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জামাআত সর্বসম্মতিক্রমে জুমার শর্ত। তবে মুসল্লীদের সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইমাম ব্যতীত সর্বনিম্ন তিনজন হওয়া জরুরি। এটাই ইমাম যুফার (র.)-এর মত। সাহেবাইনের মতে ইমাম ব্যতীত দুইজন যথেষ্ট। এটাতো হলো ইমাম কুদূরী (র.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সত্যকথা হলো, ইমাম ব্যতীত দুইজন মুক্তাদী হওয়া শুধু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুরূপ। হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণনার খোলাসা হলো, তারফাইনের মতে জুমা জামাআতের জন্য ইমাম ব্যতীত তিনজন হওয়া শর্ত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে ইমাম ব্যতীত দুইজনও যথেষ্ট। জুমার জন্য জামাআত এ জন্য শর্ত যে, জুমা শব্দটি جماعت (জামাআত) থেকেই নির্গত হয়েছে। তাই জুমা জামাআত ব্যতীত সংগঠিত হবে না। যেমন- ضارب (যারিবুন) ضرب (যারবুন) থেকে নির্গত হয়েছে। ضارب (প্রহারকারী) যারব তথা প্রহার ব্যতীত সংগঠিত হবে না। জামাআতের সংখ্যার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, জুমার আভিধানিক অর্থ- جمع তথা অনেক আর দুইয়ের মধ্যে সমাবেশের অর্থ রয়েছে। কেননা তার মধ্যে একটি অপরটির সাথে একত্রিত হয়। সুতরাং যেহেতু জুমার আভিধানিক অর্থ দুইটি সংখ্যা দ্বারা সংগঠিত হয়ে যায়, সেহেতু ইমাম ব্যতীত দুইজন হওয়াই জুমা জায়েজ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

তরফাইনের দলিল হলো, নিঃসন্দেহে জুমা اجتماع তথা সমাবেশ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়. কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বাণী فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ-এর মধ্যে فاسعوا দ্বারা খিতাব جمع দ্বারা করা হয়েছে। অর্থাৎ সম্বোধনের জন্য বহুবচনের সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। আর جمع দ্বারা কমপক্ষে তিন বুঝায়। কেননা তিন সংখ্যাটি নাম এবং অর্থ উভয় দিক থেকে বহুবচন। এ জন্য আমরা বলেছি যে, ইমাম ব্যতীত কমপক্ষে তিনজন হওয়া জরুরি।

وَالْجَمَاعَةُ شَرْطٌ عَلٰحِدَةٍ الخ : ইবারতটুকু দ্বারা প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হলো, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত অনুযায়ীও ইমামসহ তিনজন হয়ে যায়। এর জবাব হলো, জামাআত আলাদা শর্ত, ইমাম হওয়া আলাদা শর্ত. কেননা আল্লাহর বাণী فاسعوا - جمع -এর সীগাহটি তিনজনকে বুঝায়। আর اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ এক বাক্যের তথা ইমামকে বুঝায়। সুতরাং আয়াত দ্বারা চারজন হওয়া প্রমাণিত হলো। অর্থাৎ একজন ইমাম, তিনজন মুক্তাদী। এর দ্বারা বুঝা গেল, ইমাম ঐ তিনজনের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং ইমাম ব্যতীত তিনজনের জামাআত হওয়া শর্ত।

وَاِنْ نَفَرَ النَّاسُ قَبْلَ اَنْ يَرْكَعَ الْاِمَامُ وَيَسْجُدَ اِلَّا النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ اِسْتَقْبَلَ الظُّهْرَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا اِذَا نَفَرُوْا عَنْهُ بَعْدَ مَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَاِنْ نَفَرُوْا عَنْهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ وَسَجَدَ سَجْدَةً بَنٰى عَلَى الْجُمُعَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) هُوَ يَقُوْلُ اَنَّهٗ شَرْطٌ فَلَابُدَّ مِنْ دَوَامِهٖ كَالْوَقْتِ وَلَهُمَا اَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطُ الْاِنْعِقَادِ فَلَايُشْتَرَطُ دَوَامُهَا كَالْخُطْبَةِ وَ لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ الْاِنْعِقَادَ بِالشُّرُوْعِ فِى الصَّلٰوةِ وَلَايَتِمُّ ذٰلِكَ اِلَّا بِتَمَامِ الرَّكْعَةِ لِاَنَّ مَادُوْنَهَا لَيْسَ بِصَلٰوةٍ فَلَابُدَّ مِنْ دَوَامِهَا اِلَيْهَا بِخِلَافِ الْخُطْبَةِ لِاَنَّهَا تُنَافِى الصَّلٰوةَ فَلَايُشْتَرَطُ دَوَامُهَا وَلَامُعْتَبَرَ بِبَقَاءِ النِّسْوَانِ وَكَذَا الصِّبْيَانُ لِاَنَّهٗ لَاتَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ فَلَاتَتِمُّ بِهِمُ الْجَمَاعَةُ .

অনুবাদ : ইমাম রুকু ও সিজদা করার পূর্বেই যদি লোকেরা চলে যায়, শুধু নারী ও শিশুরা থেকে যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইমাম পুনরায় জোহর শুরু করবেন। সাহেবাইন বলেন, ইমাম নামাজ শুরু করার পর তারা যদি তাকে ছেড়ে যায় তবুও তিনি জুমার নামাজই আদায় করবেন। আর যদি রুকু ও একটি সিজদা করার পর তারা চলে যায়, তবে (সকলের মতে) তিনি জুমাই অব্যাহত রাখবেন। ইমাম যুফার (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে তিনি বলেন, যেহেতু এটা শর্ত সেহেতু এর স্থায়িত্ব আবশ্যক। যেমন ওয়াক্তের বিষয়টি। সাহেবাইনের দলিল হলো জামাআত হলো জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত। সুতরাং তার স্থায়িত্ব শর্ত হবে না। যেমন খুতবার বিষয়টি। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, জুমা অনুষ্ঠিত হওয়া সাব্যস্ত হবে নামাজ শুরু হওয়ার মাধ্যমে। আর এক রাকআত পূর্ণ হওয়া ছাড়া নামাজের শুরু পূর্ণতা লাভ করে না। কেননা এক রাকআতের কম পরিমাণ নামাজ হয় না। সুতরাং এক রাকআত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত জামাআতের স্থায়িত্ব জরুরি। খুতবার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা নামাজের সাথে সামঞ্জস্যহীন, সুতরাং তার স্থায়িত্ব শর্ত হতে পারে না। নারী তেমনি ছেলেদের থেকে যাওয়া ধর্তব্য নয়। কেননা তাদের দ্বারা জুমা অনুষ্ঠিত হয় না। সুতরাং তাদের দ্বারা জামাআতের পূর্ণতা সাধিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি জুমার নামাজ শুরু করার পূর্বে লোকেরা ইমামকে একাধিক রেখে চলে যায় তবে সকলের মতে ইমাম জোহরের নামাজ পড়বে, জুমার নামাজ আদায়ের ইজাযত নেই। আর যদি জুমার নামাজ শুরু করার পর ইমামের রুকূ সিজদা করার পূর্বে লোকেরা ইমামকে রেখে চলে যায় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইমাম এই সুরতেও শুরু থেকে জোহরের নামাজ পড়বে আর সাহেবাইনের মতে ইমাম জুমার উপরই বিনা করবে অর্থাৎ জুমার নামাজ-ই পড়বে, জোহর পড়ার একেবারেই জরুরত নেই। আর যদি ইমামের রুকূ ও এক সিজদা করার পর লোকেরা ইমামকে ছেড়ে চলে যায়, তবে আইম্মায়ে সালাসা অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মতে জুমার উপর বিনা করবে অর্থাৎ জুমার নামাজ পূর্ণ করবে। ইমাম যুফার (র.) -এর মতে ইমাম এই সুরতেও জোহর পড়বে। তাঁর দলিল হলো, জামাআত হলো জুমা আদায়ের

জন্য শর্ত, যেমন ওয়াক্ত আদায়ের শর্ত। সুতরাং যেমনিভাবে ওয়াক্তের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাওয়া জরুরি এমনিভাবে তাহরীমার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জামাআত পাওয়া যাওয়াও শর্ত। উপরোক্ত সুরতে যেহেতু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জামআত পাওয়া যায়নি; বরং মাঝে জামাআত ছুটে গেছে, এ জন্য জুমার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে এবং ইমামের জোহরের নামাজ পড়া জরুরি। সাহেবাইনের দলিল হলো, জামাআত হওয়া জামাআত আদায়ের শর্ত নয়; বরং জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত। যেমন খুতবা জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য শর্ত। অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাওয়া জরুরি নয়; বরং অনুষ্ঠিত হওয়ার সীমা পর্যন্ত পাওয়া যাওয়া জরুরি, এরপর জরুরি নয়। সুতরাং যখন তাহরীমার সময় জামাআত পাওয়া গেছে তবে তো জুমা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এরপর জামাআত বাকি থাকা শর্ত নয়। সুতরাং জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর জামাআত ফউত হওয়ার দ্বারা জুমা ফউত হয় না। যেহেতু জুমা ফউত হয়নি; তাই ইমাম জুমাই পূর্ণ করবে জোহর পড়বে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, নিঃসন্দেহে জামাআত জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত, যেমনটি আপনারও বলেছেন। তবে নামাজ অনুষ্ঠিত হওয়া নামাজ শুরু করার দ্বারাই হয়, আর এক রাকআত পূর্ণ হওয়ার দ্বারাই নামাজের শুরু পূর্ণতা লাভ করে। কেননা এক রাকআতের কমে নামাজ হয় না। তাইতো এক রাকআতের কম ছেড়ে দিলে لَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ -এর অধীনে এসে যায় না। সুতরাং বুঝা গেল নামাজ বলতে হলে কমপক্ষে এক রাকআত পূর্ণ হতে হবে। মোদ্দাকথা হলো, জামাআত জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য শর্ত। আর জুমা অনুষ্ঠিত হয় জুমার নামাজ শুরু করার দ্বারা। সর্বনিম্ন এক রাকআতকে নামাজ বলা যায়। তাহলে বুঝা গেল জুমার নামাজ এক রাকআত পূর্ণ হওয়ার দ্বারা শুরু হবে। সুতরাং এক রাকআত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যদি জামাআত পাওয়া যায় তবে জুমা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এখন যদি ইমামের রুকু সিজদা করার পর লোকেরা পলায়ন করে এবং জামাআত ফউত হয়ে যায়, তবে জুমা ফউত হবে না। আর যদি এর পূর্বে পলায়ন করে তবে জামাআত ফউত হয়ে যাবে। সুতরাং যেহেতু জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত তথা জামাআত ফউত হয়ে যায় সেহেতু জুমা ফাসিদ হয়ে যাবে। আর ইমামের জোহর পড়া ওয়াজিব হবে। বাকি জুমার খুতবাও জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত। কিন্তু এক রাকআত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তার পাওয়া জরুরি নয়? এর জওয়াব হলো, নিঃসন্দেহে জুমার খুতবা জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত তবে যেহেতু খুতবা হলো নামাজের মুনাফী তথা বিপরীত। যদি নামাজের মধ্যে খুতবা পড়া হয় তবে নামাজই ফাসিদ হয়ে যাবে, এ জন্য এক রাকআত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তার থাকা শর্ত নয়।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, জুমার নামাজ ছেড়ে দিয়ে যদি লোকেরা চলে যায় শুধু নারী ও ছেলেরা থেকে যায়, তবে এদের কোনো ইতিবার নেই। কেননা নিরেট নারী ও ছেলেদের দ্বারা যেহেতু জুমা অনুষ্ঠিত হয় না, তাই তাদের দ্বারা জামাআতের শর্তও পূর্ণ হবে না।

ফায়দা : ইমাম সাহেবের দলিলের উপর একটি প্রশ্ন হয়– তা হলো, যখন এক রাকআতের কমে নামাজ অনুষ্ঠিত হয় না; তাহলে তো নফল শুরু করে ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা কাজা ওয়াজিব না হওয়া উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত এক রাকআত আদায় না করে নামাজ ছেড়ে দেয়?

জওয়াব, এক রাকআতের কম– এর দু'টি অবস্থা রয়েছে। এক, তাহরীমা পেল– সুতরাং এই হিসাবে তো সেটা নামাজ। দুই, যেহেতু নামাজ বলা হয় কিরাআত, রুকু, সিজদা ইত্যাদিকে যা এখানে বিদ্যমান নেই, সেহেতু এই হিসাবে তা নামাজ নয়। নফলের ক্ষেত্রে সতর্কতার উপর আমল করতে গিয়ে আমরা প্রথম অবস্থার ইতিবার করে কাজা ওয়াজিব বলেছি। কেননা এর দ্বারা নিঃসন্দেহে অপরাধ থেকে বাঁচা যাবে। আর জুমার মাসআলায় আমরা দ্বিতীয় হালাতের উপর আমল করেছি। কেননা জোহরের নামাজ পড়লে নিঃসন্দেহে ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

وَلَاتَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلٰى مُسَافِرٍ وَلَا اِمْرَأَةٍ وَلَامَرِيْضٍ وَلَاعَبْدٍ وَلَا اَعْمٰى لِاَنَّ الْمُسَافِرَ يَحْرُجُ فِىْ حُضُوْرٍ وَكَذَا الْمَرِيْضُ وَالْاَعْمٰى وَالْعَبْدُ مَشْغُوْلٌ بِخِدْمَةِ الْمَوْلٰى وَالْمَرْأَةُ بِخِدْمَةِ الزَّوْجِ فَعُذِرُوْا دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالضَّرَرِ فَاِنْ حَضَرُوْا فَصَلُّوْا مَعَ النَّاسِ اَجْزَاهُمْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ لِاَنَّهُمْ تَحَمَّلُوْهُ فَصَارُوْا كَالْمُسَافِرِ اِذَا صَامَ ـ

অনুবাদ : মুসাফির, নারী, রোগী, দাস ও শিশুর উপর জুমা ওয়াজিব নয়। কেননা জুমার উপস্থিতিতে মুসাফিরের অসুবিধা হবে। রোগী ও অন্ধ ব্যক্তি সম্পর্কেও একই কথা। তদ্রূপ দাস তার মনিবের খিদমতে এবং স্ত্রী তার স্বামীর খিদমতে ব্যস্ত থাকে। তাই ক্ষতি ও অসুবিধা দূর করার জন্য তাদের 'মাজুর' গণ্য করা হয়েছে। তবে যদি তারা উপস্থিত হয়ে লোকদের সাথে জুমার নামাজ আদায় করে, তাহলে ওয়াক্তিয়া ফরজের পরিবর্তে তা যথেষ্ট হবে। কেননা তারা নিজেই তা বরদাশত করেছে। সুতরাং তারা ঐ মুসাফিরের মতো হয়ে যাবে, যে সফরে সিয়াম পালন করল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আদায়ে জুমা, মুসাফির, নারী, অসুস্থ ব্যক্তি, দাস এবং অন্ধ কারোর উপর ওয়াজিব নয়। দলিল হলো, মুসাফির অসুস্থ ব্যক্তি এবং অন্ধের জুমায় হাজির হওয়ার দ্বারা অসুবিধা হয়। দাস তার মনিবের খিদমতে আর নারী তার স্বামীর খিদমতে নিয়োজিত থাকে। তাই ক্ষতি ও অসুবিধা দূর করার জন্য তাদেরকে জুমার উপস্থিতি থেকে মাজুর গণ্য করা হয়েছে।

فَاِنْ حَضَرُوْا الخ : যে সকল লোককে জুমা আদায় থেকে মাজুর ধরা হয়েছে তারা যদি জুমায় উপস্থিত হয়ে লোকদের সাথে জুমার নামাজ আদায় করে, তবে তাদের ওয়াক্তিয়া ফরজ আদায় হয়ে যাবে। দলিল হলো, তাদের থেকে জুমার নামাজ সাকিত হয়ে যাওয়া এমন কোনো কারণে নয় যা নামাজের মধ্যে পাওয়া যায়; বরং তাদের থেকে ক্ষতি ও অসুবিধাকে দূর করার জন্য জুমার ফরযিয়ত তাদের থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যখন তারা ক্ষতি ও কষ্টকে বরদাশত করে নিয়েছে এবং হিম্মত করে জুমার নামাজ আদায় করেছে। তাই তারা ঐ মুসাফিরের অনুরূপ হয়ে গেল যে সফরে সিয়াম পালন করেছে। অথচ কষ্টের কারণে মুসাফিরকে রমজানে রোজা না রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যদি সে রোজা রাখে তবে তা জায়েজ; বরং উত্তম। কেননা সে মুকীমের তুলনায় অধিক কষ্ট করেছে। এমনিভাবে এরাও যদি কষ্ট করে জুমা আদায় করে তবে তা জায়েজ হবে।

وَيَجُوْزُ لِلْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيْضِ اَنْ يَّؤُمَّ فِى الْجُمُعَةِ وَقَالَ زُفَرُ (رح) لَايُجْزِيْهِ لِاَنَّهُ لَافَرْضَ عَلَيْهِ فَاَشْبَهَ الصَّبِىَّ وَالْمَرْأَةَ وَلَنَا اَنَّ هٰذِهٖ رُخْصَةٌ فَاِذَا حَضَرُوْا يَقَعُ فَرْضًا عَلٰى مَا بَيَّنَّا اَمَّا الصَّبِىُّ فَمَسْلُوْبُ الْاَهْلِيَّةِ وَالْمَرْأَةُ لَاتَصْلُحُ لِاِمَامَةِ الرِّجَالِ وَتَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ لِاَنَّهُمْ صَلُحُوْا لِلْاِمَامَةِ فَيَصْلُحُوْنَ لِلْاِقْتِدَاءِ بِطَرِيْقِ الْاَوْلٰى ـ

অনুবাদ : মুসাফির, দাস ও অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে জুমার ইমামতি করা জায়েজ আছে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তা জায়েজ নেই। কেননা তাদের উপর (জুমার) ফরযিয়াত নেই। সুতরাং তারা বালক ও স্ত্রী লোকের সাদৃশ্য হলো। আমাদের দলিল হলো, এ হলো তাদের জন্য অবকাশ। সুতরাং যখন তারা উপস্থিত হয়ে থাকে তখন ফরজ হিসাবেই আদায় হবে। যেমন, (ইতঃপূর্বে) আমরা বর্ণনা করে এসেছি। পক্ষান্তরে বালকের তো যোগ্যতা নেই। আর স্ত্রীলোক পুরুষদের ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়। মুসাফির, দাস ও অুসস্থদের দ্বারা জুমা অনুষ্ঠিত হবে। কেননা তারা যখন জুমার ইমামতিরই যোগ্য, তখন তাদের মধ্যে মুক্তাদী হওয়ার যোগ্যতা আরো অধিক রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুসাফির, রোগী এবং দাসের উপর যদিও জুমা ফরজ নয় কিন্তু তাদেরকে জুমার ইমাম বানানো জায়েজ। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বিশুদ্ধমতও এটাই। ইমাম যুফার (র.) বলেন, এদের মধ্য থেকে কারো জুমার ইমাম হওয়া জায়েজ নেই। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, জুমা ফরজ না হওয়ার ব্যাপারে এরা তিনোজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু আর নারীর সাদৃশ্য। সুতরাং যেমনিভাবে বাচ্চা এবং নারীর জুমার ইমামত জায়েজ নেই এমনিভাবে এদের ইমামতও জায়েজ নেই। আমাদের দলিল হলো, মুসাফির, দাস এবং রোগীর উপর জুমার নামাজ ফরজ না হওয়া তাদের জন্য রুখসত তথা অবকাশ। অর্থাৎ জুমাতো প্রত্যেকের উপর ফরজে আইন। কেননা আল্লাহর বাণী- اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ -এর মধ্যে সম্বোধনটি ব্যাপক। কিন্তু মুসাফির ইত্যাদির থেকে ক্ষতি বা অসুবিধাকে লাঘব করার জন্য জুমার উপস্থিত না হওয়ার জন্য ইজাজত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এরা জুমা আদায়ের জন্য হাজির হয়ে গেল এবং ক্ষতি ও অসুবিধাকে বরদাশত করে নিয়েছে, তাই এ নামাজ ফরজ হিসাবে আদায় হবে নফল হিসাবে নয়, যেমনটি আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। এখন মুসাফির ইত্যাদির নামাজ যেহেতু ফরজ হিসাবে আদায় হবে তাই তাদেরকে ইমাম বানানোও জায়েজ হবে। তবে বাচ্চা ও নারীদের উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা নাবালিগ শিশুর মধ্যে ইমামতের যোগ্যতাই নেই। কেননা তারা আল্লাহ তা'আলার খেতাবের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং যেহেতু তার মধ্যে ইমামতের যোগ্যতাই নেই, সেহেতু তাকে কিভাবে ইমাম বানানো সহীহ হবে। তবে নারীদের মধ্যে যদিও ইমামতের যোগ্যতা আছে কিন্তু তারা পুরুষের ইমামতের যোগ্য নয়। আর যেহেতু তারা পুরুষদের ইমামতের যোগ্য নয়, তাই নারীকে পুরুষদের ইমামত করাও জায়েজ হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, মুসাফির, দাস এবং রোগীর জুমার ইমামত জায়েজ। কিন্তু জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য যদি শুধু ঐ লোকেরা এ পরিমাণ অনুযায়ীও হয় যে পরিমাণ দ্বারা জুমা জায়েজ হয়, তবে জুমা অনুষ্ঠিত হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বক্তব্যকে রদ করে বলেন- মুসাফির, দাস এবং রোগীর উপস্থিতির দ্বারা জুমার জামাআত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। দলিল হলো, যখন এরা ইমামতের যোগ্য, তখন মুক্তাদী হওয়ার যোগ্যতা তো আরো অধিক রয়েছে।

وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِيْ مَنْزِلِهٖ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْاِمَامِ وَلَاعُذْرَ لَهٗ كُرِهَ لَهٗ ذٰلِكَ وَجَازَتْ صَلَاتُهٗ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) لَايُجْزِيْهِ لِاَنَّ عِنْدَهٗ الْجُمُعَةَ هِيَ الْفَرِيْضَةُ اِصَالَةً وَالظُّهْرُ كَالْبَدْلِ عَنْهَا وَلَامَصِيْرَ اِلَى الْبَدْلِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْاَصْلِ وَلَنَا اَنَّ اَصْلَ الْفَرْضِ هُوَ الظُّهْرُ فِيْ حَقِّ الْكَافَّةِ هٰذَا هُوَ الظَّاهِرُ اِلَّا اَنَّهٗ مَامُوْرٌ بِاِسْقَاطِهٖ بِاَدَاءِ الْجُمُعَةِ وَهٰذَا لِاَنَّهٗ مُتَمَكِّنٌ مِنْ اَدَاءِ الظُّهْرِ بِنَفْسِهٖ دُوْنَ الْجُمُعَةِ لِتَوَقُّفِهَا عَلٰى شَرَائِطَ لَاتَتِمُّ بِهٖ وَحْدَهٗ وَعَلَى التَّمَكُّنِ يَدُوْرُ التَّكْلِيْفُ ـ

অনুবাদ : জুমার দিন যে ব্যক্তি ইমামের জুমা আদায়ের আগে আপন গৃহে জোহরের নামাজ আদায় করে ফেলল অথচ তার কোনো ওজর নেই, তার জন্য তা মাকরূহ হবে এবং তার নামাজ আদায় হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার এই নামাজ আদায়ই হবে না। কেননা তার মতে জুমা হলো মূল ফরজ আর জোহর হলো তার বিকল্প আর মূলের উপর সামর্থ্য থাকা অবস্থায় বিকল্পের অভিমুখী হওয়ার অবকাশ নেই। আমাদের দলিল হলো, সকলের ক্ষেত্রেই মূল ফরজ হলো জোহর এটাই যাহিরে মাযহাবের অভিমত। তবে জুমা আদায়ের মাধ্যমে ঐ ফরজ নিরসন করার জন্য সে আদিষ্ট। এ মত এ কারণে যে, সে নিজেই জোহর আদায় করতে সক্ষম রয়েছে, জুমা আদায় করতে সক্ষম নয়। কেননা তা এমন কতিপয় শর্তের উপর নির্ভরশীল, যা তার একার মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। আর নিজের সামর্থ্যের উপরই শরিয়তের দায়িত্ব নির্ভরশীল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কেউ যদি জুমার দিন ইমামের জুমার নামাজ পড়ার পূর্বে নিজ গৃহে জুহরের নামাজ পড়ে ফেলে অথচ তার কোনো ওজরও নেই। তবে তার নামাজ জায়েজ হয়ে যাবে; কিন্তু এমনটি করা মাকরূহ হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার নামাজ জায়েজ হবে না। এটা ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এরও অভিমত। তাদের দলিল হলো, জুমার দিন জুমাই হলো আসল ফরজ, আর জোহর হলো তার বদল তথা বিকল্প ফরজ। কেননা জুমার নামাজের দিকে সায়ী (তথা দৌড়িয়ে আসার) করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত জুমা ফউত না হবে জোহর পড়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং জুমার নামাজে مَامُوْرٌ بِالْاَدَاءِ আদায়ের জন্য আদিষ্ট হওয়া আর জোহর নিষিদ্ধ হওয়া, জুমার নামাজই মূল ফরজ হওয়ার দলিল বহন করে। আর একথা সর্বজন বিদিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আসলের উপর কুদরত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার বিকল্পের দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায় না। তাই জুমার নামাজের উপর শক্তি থাকা অবস্থায় জোহরের নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না। আমাদের দলিল হলো, জুমার দিন মূলত জোহরই ফরজ যেমনটি অন্যান্য দিনেও জোহর ফরজ। দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী اَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ জোহরের প্রথম ওয়াক্ত যখন সূর্য হেলে পড়ে। তাই সূর্য হেলে যাওয়ার পর সব দিনের মধ্যে জোহরেরই ওয়াক্ত। দ্বিতীয় দলিল হলো, বিধান সামর্থ্য অনুযায়ীই হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহর বাণী- لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا আর ঐ সময়ের মধ্যে নামাজের মুকাল্লাফ সরাসরি জোহর আদায়ের প্রতি সামর্থ্যবান, জুমা আদায়ের প্রতি নয়। কেননা জুমা এমন কতিপয় শর্ত সম্বলিত নামাজ যা একা কোনো লোক দ্বারা পূর্ণ হবার নয়। যেমন- ইমাম হওয়া, জামাআত হওয়া ইত্যাদি তাই জুমার মুকাল্লাফ বানানোর দ্বারা অসম্ভব কষ্টের মধ্যে পড়ে যায়। তবে জুমার দিন জুমা আদায় করে জোহরের নামাজ (বাদ দেওয়ার) সাকিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই শক্তি থাকা অবস্থায় জুমা বাদ দিয়ে জোহর আদায় করা মাকরূহ হবে।

فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَحْضُرَهَا فَتَوَجَّهَ إِلَيْهَا وَالْإِمَامُ فِيْهَا بَطَلَ ظُهْرُهُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) بِالسَّعْيِ وَقَالَا لَايَبْطُلُ حَتّٰى يَدْخُلَ مَعَ الْإِمَامِ لِأَنَّ السَّعْيَ دُوْنَ الظُّهْرِ فَلَايَنْقُضُهُ بَعْدَ تَمَامِهِ وَالْجُمُعَةُ فَوْقَهَا فَيُنْقِضُهَا وَصَارَ كَمَا إِذَا تَوَجَّهَ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ وَلَهُ أَنَّ السَّعْيَ إِلَى الْجُمُعَةِ مِنْ خَصَائِصِ الْجُمُعَةِ فَيُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهَا فِيْ حَقِّ إِرْتِفَاضِ الظُّهْرِ إِحْتِيَاطًا بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَعْيٍ إِلَيْهَا وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَعْذُوْرُوْنَ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمِصْرِ وَكَذَا أَهْلُ السِّجْنِ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْإِخْلَالِ بِالْجُمُعَةِ إِذْ هِيَ جَامِعَةٌ لِلْجَمَاعَاتِ وَالْمَعْذُوْرُ قَدْ يَقْتَدِيْ بِهِ غَيْرُهُ بِخِلَافِ أَهْلِ السَّوَادِ لِأَنَّهُ لَاجُمُعَةَ عَلَيْهِمْ وَلَوْ صَلّٰى قَوْمٌ أَجْزَاهُمْ لِإِسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِ وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلّٰى مَعَهُ مَا أَدْرَكَهُ وَبَنٰى عَلَيْهِ الْجُمُعَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوْا .

অনুবাদ : এরপর যদি তার জুমাতে হাজির হওয়ার ইচ্ছা হয় এবং জুমার জামাআত অভিমুখী হয়, আর ইমাম জুমার নামাজরত থাকেন, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গমনের দ্বারাই তার জোহর বাতিল হয়ে যাবে। আর সাহেবাইনের মতে ইমামের সাথে নামাজে দাখিল হওয়া পর্যন্ত জোহর বাতিল হবে না। কেননা সাঈ জোহরের চেয়ে নিম্নমানের। সুতরাং জোহর সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর সাঈ তা বাতিল হবে না। আর জুমা হলো জোহরের চেয়ে উঁচু পর্যায়ের। সুতরাং তা জোহরকে বাতিল করে দেবে। আর এটা জুমা থেকে ইমামের ফারিগ হওয়ার পর জুমা অভিমুখী হওয়ার মতো হলো। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, জুমা অভিমুখে সাঈ করা জুমার বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সতর্কতার খাতিরে জোহর বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে এটাকে জুমার স্থলবর্তী করা হবে। জুমা থেকে (ইমামের) ফারিগ হয়ে যাওয়ার পরবর্তী বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা প্রকৃতপক্ষে সেটা জুমা অভিমুখে সাঈ নয়। জুমার দিন শহরে জামাআতের সাথে জোহর আদায় করা মাজুর লোকদের জন্য মাকরূহ। জেলখানায় কয়েদীরও এ হুকুম। কেননা, তাতে জুমার ব্যাপারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়। কারণ জুমা হলো সমস্ত জামাআতকে একত্রকারী। আর মাজুরদের সাথে কোনো কোনো সময় অন্যরাও ইকতিদা করে ফেলে। গ্রামবাসীদের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাদের উপর তো জুমা নেই। তবে একদল লোক যদি জোহর জামাআতে পড়েই ফেলে তাহলে তাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে। কেননা জোহর জায়েজ হওয়ার যাবতীয় শর্ত পাওয়া গেছে। যে ব্যক্তি জুমার দিন ইমামকে নামাজের মধ্যে পাবে সে ইমামের সাথে ঐ পরিমাণ নামাজ পড়বে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে পরিমাণ নামাজ তোমরা পেয়েছ, তা পড়ে নাও, আর যে পরিমাণ ফউত হয়েছে, তা কাজা করে নাও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যে ব্যক্তি জুমার দিন নিজের ঘরে জোহরের নামাজ আদায় করেছে অথচ এখনো জুমার নামাজ আদায় করা হয়নি। অতঃপর তার মনে আসল যে, জুমার নামাজে শরিক হওয়া উচিত। এই ইচ্ছায় সে জামে মাসজিদ অভিমুখে রওয়ানা হলো, এখন এর দু'টি সুরত রয়েছে। হয়তো সে ইমামের সাথে জুমার নামাজে শরিক হবে কিংবা শরিক হবে না। যদি সে ইমামের সাথে জুমার নামাজ পেয়ে যায় তবে তার জোহরের নামাজ বাতিল হয়ে তা নফলে পরিণত হয়ে যাবে। আর যদি সে জুমার নামাজে এমন সময় রওয়ানা হয় যে, যে সময় ইমাম জুমার নামাজরত ছিল কিন্তু তার পৌঁছতে পৌঁছতে ইমাম জুমার নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে গেছে। আর এ ব্যক্তি ইমামের সাথে জুমার নামাজ পায়নি, তবে তার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব হলো, ঘর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই তার জোহরের নামাজ বাতিল হয়ে গেছে। এখন যেহেতু সে জুমার নামাজ পায়নি এবং আদায়কৃত জোহরও বাতিল হয়ে গেছে এ জন্য তার পুনরায় জোহরের নামাজ আদায় করতে হবে।

সাহেবাইন (র.)-এর মাযহাব হলো, শুধু ঘর থেকে বের হওয়ার দ্বারা জোহরের নামাজ বাতিল হবে না; বরং জুমার নামাজে শরিক হওয়ার দ্বারা বাতিল হবে। অর্থাৎ তার পৌঁছার পূর্বেই যদি ইমাম জুমার নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে যায়, তবে তার জোহর বাতিল হবে না। হ্যাঁ যদি ইমামের সাথে জুমার নামাজের কোনো অংশে শরিক হয়ে যায় তবে তার জোহর বাতিল হয়ে যাবে। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, জুমার দিকে সাঈ করা যেহেতু মূল মাকসাদ নয় বরং জুমা আদায়ের অসিলা আর ফরজ জোহর হলো মূল উদ্দেশ্য, তাই জুমার দিকে সাঈ করা জোহরের তুলনায় নিচু পর্যায়ের। আর কায়দা আছে, উঁচু পর্যায়ের বস্তু নিচু পর্যায়ের বস্তু দ্বারা বাতিল হয় না। এ জন্য শুধু জুমার দিকে সাঈ দ্বারা জোহর বাতিল হবে না। আর জুমা যেহেতু জোহর থেকে উঁচু পর্যায়ের তাই জুমার নামাজ জোহরের নামাজকে বাতিল করে দেবে। জুমা উঁচু পর্যায়ের কেন? এর জওয়াব হলো, আমাদেরকে ইসলামি শরিয়ত এই নির্দেশ দিয়েছেন, জুমার দিন জোহরকে বাদ দিয়ে জুমা আদায় করা হবে। তাই জুমার কারণে জোহর সাকিত হওয়া জুমার উঁচু পর্যায়ের হওয়ার দলিল প্রমাণ করে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, বিষয়টি এমন হলো যেমন ইমামের সাথে জুমা থেকে ফারিগ হওয়ার পর জুমা অভিমুখে রওয়ানা হলো। এই সূরতে সকলের মতে সাঈ দ্বারা জোহর বাতিল হবে না। কেননা এটা অনর্থক একটি সাঈ। এমনিভাবে জুমার দিকে সাঈ জোহরকে ঐ সূরতে বাতিল করবে না। যখন জুমার দিকে শাঈ করার সময় ইমাম জুমার নামাজে ছিল; কিন্তু তার পৌঁছার পূর্বেই ইমাম জুমার নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে গেল।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, জুমার দিকে সাঈ করা জুমার বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা জুমা এমন একটি নামাজ যা সব জায়গায় আদায় করা যায় না; বরং তার জন্য বিশেষ স্থানের প্রয়োজন রয়েছে। তাই জুমার দিকে সাঈ ব্যতীত জুমা আদায় করা সম্ভবপর হবে না। সুতরাং বুঝা গেল, জুমার দিকে সাঈ জুমার সাথেই খাস। আর সাঈ যেহেতু জুমার বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত তাই জুমার দিকে সাঈও জুমার মর্যাদায় হবে। সুতরাং যেমনিভাবে জোহর আদায় করার পর জুমার নামাজে শরিক হওয়ার দ্বারা জোহর বাতিল হয়ে যায়, এমনিভাবে জুমার নামাজের দিকে সাঈ করার দ্বারাও জোহর বাতিল হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো যে সময় সাঈ করেছে ঐ সময় ইমাম জুমার নামাজরত থাকতে হবে। পক্ষান্তরে যদি ইমামের জুমার নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর সাঈ করে তবে এ সাঈ দ্বারা জোহর বাতিল হবে না। কেননা এই সাঈটি জুমার মর্যাদায় নয়। আর মর্যাদায় এই কারণে নয় যেহেতু এটা জুমার দিকে সাঈ নয়।

ইমাম সাহেব ও সাহেবাইন (র.)-এর মধ্যকার মতবিরোধটি নিম্নোক্ত মিছাল দ্বারা পরিষ্কার হবে। যেমন এক ব্যক্তি নিজের ঘরে জোহর আদায় করে জুমার জন্য ঐ সময় বের হলো যখন ইমাম জুমার নামাজে ছিল। কিন্তু তার পৌঁছার পূর্বেই ইমাম জুমার নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে গেল। এখন ইমাম সাহেবের মতে যেহেতু জুমার দিকে সাঈ দ্বারা জোহর বাতিল হয়ে গেল তাই জোহর পুনরায় আদায় করবে। আর সাহেবাইনের মতে যেহেতু জোহর বাতিল হয়নি, তাই জোহরের নামাজ পুনরায় আদায় করবে না।

وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّىَ الْمَعْذُورُوْنَ الخ : মাজুর লোক যেমন– দাস, মুসাফির এবং রোগী জুমার দিন শহরের মধ্যে জুমার নামাজের পূর্বে কিংবা পরে যদি জামাআতের সাথে জোহরের নামাজ আদায় করে তবে তাদের এ ধরনের আমল মাকরূহ হবে। এমনিভাবে জেলখানায় কয়েদীদেরও জুমার দিন জোহরের নামাজ জামাআতে আদায় করা মাকরূহ হবে। দলিল হলো, এই ধরনের কাজ দ্বারা জুমার নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। ব্যাঘাত হচ্ছে, জুমা হলো সমস্ত জামাআতকে একত্রকারী, সুতরাং কিছু লোক জোহরকে জামআতের সাথে আদায় করল তখন জুমা আর সমস্ত জামআতের একত্রকারী থাকল না। এই দলিল দ্বারা বুঝা গেল এক শহরে বিভিন্ন জামাআত জায়েজ নেই। অথচ এক শহরে অনেক জুমা আদায় করা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জায়েজ। সুতরাং হিদায়া গ্রন্থকারের জামাআত মাকরূহ হওয়ার দলিলের মধ্যে إِخْلَالٌ بِالْجُمُعَةِ তথা জুমা দ্বারা ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। বর্ণনা করা গায়রে মাকূল। উচিত ছিল মাকরূহ হওয়ার এই দলিল বয়ান করা যে, জুমার দিন জোহরের নামাজ জামাআতে আদায় করার দ্বারা বাহ্যিকভাবে জুমার মোকাবেলা এবং জুমার সাথে সংঘাত মনে হয়।

وَالْمَعْذُورُ الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, যখন মাজুরদের উপর জুমা ফরজ নয় তখন তাদের জোহরের নামাজ জামাআতে পড়ার দ্বারা জুমার মাঝে কিভাবে ব্যাঘাত হয়? জবাব হলো, কখনো কখনো মাজুরের সাথে গায়রে মাজুরও ইক্তিদা করে ফেলে, তাই গায়রে মাজুরের ইক্তিদার কারণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এর বিপরীত গ্রামের লোক যদি জামাআতের সাথে জোহর আদায় করে, তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা গ্রামের লোকের উপর তো প্রথম থেকেই জুমা ফরজ হয়নি। কিন্তু মাজুরের উপর জুমা ফরজ ছিল তবে ওজরের কারণে তা বাদ হয়ে যায়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জুমার দিন জোহরের জামআত মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও যদি কিছু লোক জোহরের নামাজ জামাআতের সাথে আদায় করে তবে তা জায়েজ হবে। কেননা তাদের নামাজটি সমস্ত শর্তের সাথেই পাওয়া গেছে। তবে মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি তা-তো তার যাত থেকে জুমার হক খারিজ হওয়ার কারণে ছিল যা এখনো আছে।

وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ الخ : মাসআলা হলো, কেউ যদি ইমামকে জুমার দিন জুমার নামাজে পায় এবং দ্বিতীয় রাকআতের রুকুর মধ্যে ইমামের সাথে শরিক হয়ে গেল, তবে সকলের মতে উক্ত ব্যক্তি ইমামের সাথে জুমার নামাজ আদায় করবে। আর যে এক রাকআত ফউত হয়ে গেছে তা ইমামের সালাম ফিরাবার পর পূর্ণ করবে। তার এই নামাজ জুমার নামাজ হিসাবে আদায় হবে জোহর হিসাবে নয়। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوْا হাদীসের মধ্যে শারে' (আ.)-এর উদ্দেশ্য হলো, مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا কেননা مَا فَاتَكُمْ مِنْ صَلٰوةِ الْإِمَامِ-এর অর্থ হলো مِنْ صَلٰوةِ الْإِمَامِ অর্থাৎ ইমামের নামাজের যে অংশ পেলে, তা পড়ে নাও, আর যে অংশ ফউত হয়ে গেছে তার কাজা আদায় করো। অর্থাৎ ইমামের সালাম ফিরাবার পর পড়ো। উল্লেখ্য যে, ইমামের নামাজের যে অংশ ফউত হয়ে গেল তা জুমা ছিল, তাই মুক্তাদী জুমাই আদায় করবে, অন্য কোনো নামাজ নয়।

وَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ فِي سُجُوْدِ السَّهْوِ بَنٰى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) إِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَكْثَرَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَنٰى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ وَإِنْ أَدْرَكَ قَلَّهَا بَنٰى عَلَيْهَا الظُّهْرَ لِأَنَّهُ جُمُعَةٌ مِنْ وَجْهٍ ظُهْرٌ مِنْ وَجْهٍ لِفَوَاتِ بَعْضِ الشَّرَائِطِ فِيْ حَقِّهِ فَيُصَلِّيْ أَرْبَعًا اِعْتِبَارًا لِلظُّهْرِ وَيَقْعُدُ لَامَحَالَةَ عَلٰى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ اِعْتِبَارًا لِلْجُمُعَةِ وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ لِاحْتِمَالِ النَّفْلِيَّةِ وَلَهُمَا أَنَّهُ مُدْرِكٌ لِلْجُمُعَةِ فِيْ هٰذِهِ الْحَالَةِ حَتّٰى يُشْتَرَطَ نِيَّةُ الْجُمُعَةِ وَهِيَ رَكْعَتَانِ وَلَاوَجْهَ لِمَا ذُكِرَ لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ فَلَايُبْنٰى أَحَدُهُمَا عَلٰى تَحْرِيْمَةِ الْآخَرِ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكَ النَّاسُ الصَّلٰوةَ وَالْكَلَامَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ قَالَ (رض) وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا لَابَأْسَ بِالْكَلَامِ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَّخْطُبَ وَإِذَا نَزَلَ قَبْلَ أَنْ يُّكَبِّرَ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِلْإِخْلَالِ بِفَرْضِ الْاِسْتِمَاعِ وَلَااِسْتِمَاعَ هِنَا بِخِلَافِ الصَّلٰوةِ لِأَنَّهَا قَدْ تَمْتَدُّ وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَاصَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلِأَنَّ الْكَلَامَ قَدْ يَمْتَدُّ طَبْعًا فَأَشْبَهَ الصَّلٰوةَ ـ

অনুবাদ : যদি ইমামকে তাশাহহুদের মাঝে কিংবা সিজদায়ে সাহুর মাঝে পায়, তবে শায়খাইনের মতে সে এর উপর জুমার বিনা করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকআতের অধিকাংশ পায়, তবে তার উপর জুমার বিনা করবে। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় রাকআতের কম অংশ পায়, তবে তার উপর জোহরের বিনা করবে। কেননা এক দিক থেকে তা জুমা আবার অন্য দিকে তার থেকে কতিপয় শর্ত ফউত হওয়ার কারণে তা জোহর। সুতরাং জোহর বিবেচনায় সে চার রাকআত পড়বে এবং জুমা বিবেচনায় দুই রাকআতের মাথায় অবশ্যই বসবে। আর নফল হওয়ার সম্ভাবনার কারণে শেষ দুই রাকআতে কিরাআতও পড়বে। শায়খাইনের দলিল হলো, এই অবস্থাতেও সে জুমার নামাজ তো পেয়েছে, এ কারণেই জুমার নিয়ত করা শর্ত। আর জুমা তো দুই রাকআত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষ থেকে যাউল্লেখ করা হয়েছে, তার কোনো কারণ নেই। কেননা উভয় নামাজ ভিন্ন। সুতরাং একটির তাহরীমার উপর অন্যটির বিনা করা যাবে না। জুমার দিন ইমাম যখন (খুতবা দানের উদ্দেশ্যে) বের হন তখন লোকেরা খুতবা থেকে তার ফারিগ হওয়া পর্যন্ত নামাজ আদায় ও কথা বলা বন্ধ রাখবে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। সাহেবাইন (র.) বলেন, ইমামের বের হওয়ার পর থেকে খুতবা শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত এবং মিম্বর থেকে নামার পর তাকবীর বলার পূর্ব পর্যন্ত কথা বলাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো, মনোযোগের সাথে শ্রবণের ফরজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়া। অথচ এই সময়ে শ্রবণের কিছু নেই। নামাজের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা নামাজ তো দীর্ঘায়িত হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইমাম যখন বের হন, (খুতবার উদ্দেশ্যে) তখন নামাজ নেই, কথাও নেই। এতে কোনো পার্থক্য করা হয়নি, তা ছাড়া কথাবার্তা স্বভাবত কখনো দীর্ঘায়িত হয়, তাই তা নামাজের সাদৃশ্য।

প্রসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কেউ যদি ইমামকে জুমার নামাজের তাশাহহুদের মধ্যে পায় কিংবা সিজদায়ে সাহুতে পায় তবে শায়খাইনের মতে এই ব্যক্তি জুমার নামাজ পূর্ণ করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি সে দ্বিতীয় রাকআতের অধিকাংশ পায় যেমন, দ্বিতীয় রাকআতের রুকুতে ইমামের সাথে শরিক হলো, তবে জুমার নামাজ পূর্ণ করবে। আর যদি দ্বিতীয় রাকআতের অধিকাংশ না পায় যেমন–রুকুর পরে ইমামের সাথে শরিক হলো তবে জোহরের নামাজ পূর্ণ করবে। এটা ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এরও অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, তাশাহহুদ কিংবা সিজদায়ে সাহুতে শরিক হওয়া ব্যক্তির এই নামাজ একদিক থেকে জুমা আর অপর দিক থেকে জোহর। জুমা তো এ কারণে যে, জুমার নিয়ত করা জরুরি। আর জোহর তো এই কারণে যে, তার ক্ষেত্রে জুমার অনেক শর্ত যেমন জামাআত ফউত হয়ে গেছে। কেননা ইমামের সালাম ফিরাবার পর এ ব্যক্তি এক দিক জুমার নামাজ আদায় করবে। সুতরাং ঐ ব্যক্তির নামাজ যেহেতু একদিক থেকে জুমা অপর দিকে থেকে জোহর, তাই জোহরের দিকে লক্ষ্য করে সে চার রাকআত আদায় করবে, আর জুমার দিকে লক্ষ্য করে অবশ্যই দুই রাকআতের মাথায় বসবে। আর যেহেতু শেষ দুই রাকআতের নফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এ জন্য এগুলোর মধ্যে সূরায়ে ফাতিহা ব্যতীত কিরাআতও পড়বে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাবের সমর্থন নিকায়া ব্যাখ্যাতা মোল্লা আলী ক্বারী (র.)-এর পেশকৃত হাদীসে আবূ হুরায়রা (রা.) দ্বারাও হয়।

হাদীসটির ইবারত নিম্নরূপ–

مَنْ اَدْرَكَ الرُّكُوْعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاَخِيْرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ اِلَيْهَا اُخْرٰى وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوْعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاَخِيْرَةِ فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ اَرْبَعًا .

যে ব্যক্তি জুমার দিন দ্বিতীয় রাকআতের রুকু পেল সে এর সাথে আর এক রাকআত মিলিয়ে নেবে। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকআতের রুকু পেল না, সে ব্যক্তি জোহরের চার রাকআত পড়বে।

শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো, এই ব্যক্তি এ অবস্থাতেও জুমার নামাজ পেয়েছে, এমনকি তার জন্য জুমার নিয়ত করাও শর্ত। যদি জুমার নিয়ত না করে তবে ইকতিদা সহীহ হবে না। মোটকথা তাশাহহুদ কিংবা সিজদায়ে সাহবের মধ্যে শরিক হয়ে সে জুমা পেয়ে গেল আর জুমা পাওয়া ব্যক্তিই জুমা আদায় করবে, জোহর আদায় করবে না। আর জুমা যেহেতু দুই রাকআত তাই সে দুই রাকআত আদায় করবে, চার রাকআত নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সতর্কতা যে, সে জোহর ও জুমা উভয়টি আদায় করবে তা ঠিক নয়। কেননা জুমা ও জোহর দু'টি ভিন্ন ভিন্ন নামাজ। তাই সেগুলোর মধ্যে একটি অপরটির তাহরীমার উপর বিনা করা কিভাবে সহীহ হবে? শায়খাইনের মাযহাবের সমর্থন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস দ্বারাও হয়–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَاتَاْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاقْضُوْا .

যখন জুমার নামাজের জন্য ইকামত বলা হবে তখন তার দিকে দৌড়িও না; বরং শান্তভাবে আসো। সুতরাং যখন তোমরা (ইমামকে) পেয়ে গেলে তখন তা পড়ো আর যা ফউত হয়ে গেল তার কাজা করো। অর্থাৎ ইমামের সালাম ফিরাবার পর তা পুরা করো। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পেশকৃত হাদীসকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম দুর্বল বলেছেন।– (ইনায়া)

وَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইমাম খুতবার উদ্দেশ্য যখন তার কামরা থেকে বের হবেন এবং মিম্বরের দিকে যেতে থাকবেন, তখন থেকে মুসল্লীগণ নফল ও সুন্নত ইত্যাদি পড়বে না এবং কোনো কথাও বলবে না। আর এ অবস্থা ইমাম খুতবা থেকে ফারিগ হওয়া পর্যন্ত থাকবে। হ্যাঁ তবে কাজা নামাজ পড়তে পারবে। এমনিভাবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তাসবীহ পড়ারও অনুমতি রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সব ধরনের কথা বলা নিষেধ তা তাসবীহ হোক বা অন্য কোনো কথা হোক। সাহেবাইন (র.) বলেন, খুতবা আরম্ভ করার পূর্ব পর্যন্ত এবং খুতবার পর তাকবীরে

তাহরীমার পূর্বে কথা বলাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে এ সময়গুলোতে নামাজ পড়ার অনুমতি নেই। সাহেবাইনের দলিল হলো, মূলত কথা বলা তো জায়েজ কিন্তু খুতবার সময় কথা বলা খুতবা শুনার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। অথচ খুতবা শুনা ফরজ। তাই যেহেতু কথা শুনার মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, সেহেতু ঠিক খুতবার সময় কথা বলাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর যেহেতু খুতবা শুরু করার পূর্বে এবং খুতবা শেষ করার পর তাকবীরের পূর্বে কোনো কিছু শুনা ফরজ নয়, তাই এই দুই সময়ের মধ্যে কথা বলার দ্বারা ব্যাঘাত ঘটে না। আর যেহেতু ব্যাঘাত হয় না সেহেতু এই দুই সময়ে কথা বলাও নিষেধ হবে না। তবে এই দুই সময়ে নামাজ নাজায়েজ হওয়ার কারণ হচ্ছে, নামাজ কখনো কখনো দীর্ঘ হয়ে যায়। যেমন ইমাম কামরা থেকে বের হয়ে মিম্বরের দিকে গেল ঐ সময়ে কেউ সুন্নত আরম্ভ করে দিল, ইমাম মিম্বরে উঠে খুতবা আরম্ভ করে দিল অথচ এখনো ঐ ব্যক্তির সুন্নত শেষ হয়নি, এ সুরতে খুতবা শুনার মধ্যে ব্যাঘাত হবে। এ জন্য আমরা ঐ দুই সময়ে নামাজ পড়ার অনুমতি দেইনি, তবে কথা বলার অনুমতি দিয়েছি। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস– إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ.

উক্ত হাদীসের মধ্যে খুতবার পূর্বাপরের কোনো ব্যাখ্যা নেই। এ জন্য ইমামের খুতবার জন্য কামরা থেকে বের হওয়ার পর নামাজ পড়া ও কথা বলাকে নিষেধ করা হয়েছে। খুতবা শুরু করার পূর্বে এবং খুতবা শেষ হওয়ার পর তাকবীরে তাহরীমার পূর্বেও নামাজ পড়া ও কথা বলাকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে অন্য একটি হাদীস এর বিপরীত মনে হয়। হাদীসটি হলো–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ حَوَائِجِهِمْ وَعَنْ إِسْعَارِ السُّوْقِ ثُمَّ صَلّٰى.

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মিম্বর থেকে অবতরণ করতেন, তখন লোকদেরকে তাদের প্রয়োজনাদি এবং বাজারের ভাও সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন, অতঃপর নামাজ পড়তেন। উক্ত হাদীস দ্বারা খুতবার পর তাকবীরের পূর্বে কথা বলার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর জওয়াব হলো, এ ঘটনা তখনকার যখন নামাজের মধ্যেও কথা বলা জায়েজ ছিল, খুতবার মধ্যে কথা বলার অনুমতি ছিল। অতঃপর উপরোক্ত উভয় অবস্থায় কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এ জন্য উক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে না। সাহেবাইনের দলিলের জবাব হলো, নামাজের মতো কখনো কখনো কথাও দীর্ঘ হয়ে যায়। তাই যেমনিভাবে খুতবা আরম্ভ করার পূর্বে এবং খুতবা শেষ হওয়ার পর তাকবীরের পূর্বে নামাজ মাকরূহ, এমনিভাবে উক্ত সময়গুলোতে কথা বলাও মাকরূহ।

وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ تَرَكَ النَّاسُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَتَوَجَّهُوا إِلَى الْجُمُعَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ بِذَٰلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا هَٰذَا الْأَذَانَ وَلِهَٰذَا قِيلَ هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ السَّعْيِ وَحُرْمَةِ الْبَيْعِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْأَوَّلُ إِذَا كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ لِحُصُولِ الْإِعْلَامِ بِهِ .

অনুবাদ : মুয়াজ্জিনগণ যখন প্রথম আযান দিবেন, তখন লোকদের কর্তব্য হলো বেচাকেনা ছেড়ে দেওয়া এবং জুমা অভিমুখী হওয়া। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা আল্লাহর জিকির অভিমুখে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও। ইমাম যখন মিম্বরে আরোহণ করবেন, তখন তিনি বসবেন এবং মুয়াজ্জিন মিম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আজান দিবেন। এর উপর যুগ পরম্পরায় আমল চলে এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় এই আজানই শুধু প্রচলিত ছিল। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন, সাঈ ওয়াজিব হওয়া এবং বেচাকেনা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে এই আজানই ধর্তব্য। তবে বিশুদ্ধতম মত হলো, প্রথম আজান ধর্তব্য, যদি সূর্য ঢলে পড়ার পরে হয়। কেননা তা দ্বারাই জুমার অবগতি অর্জিত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুয়াজ্জিনগণ যখন প্রথম আজান দিবেন তখন লোকেরা বেচাকেনা ছেড়ে দিয়ে জুমা অভিমুখে রওয়ানা হবে। দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ . ইমাম কুদূরী (র.) মুয়াজ্জিন শব্দটিকে বহুবচন ব্যবহার করেছেন। কেননা জুমার আজানের ক্ষেত্রে এটাই প্রচলন ছিল যে, অনেক মুয়াজ্জিন একসাথে আজান দিতো। যাতে তাদের আওয়াজ শহরের সর্বত্র পৌঁছে যায়। তবে সেটা কোন আজান যার পর বেচাকেনা হারাম এবং সাঈ ওয়াজিব হয়ে যায়। এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, বেচাকেনা হারাম আর জুমা অভিমুখে যদি ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ আজানটি ধর্তব্য হবে যা ইমামের কামরা থেকে বের হওয়ার পর মিম্বরের সামনে দেওয়া হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ সিদ্দীকী জমানা এবং ফারূকী জমানায় জুমার জন্য এটাই মূল আজান ছিল। অতঃপর তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে যখন লোকদের আধিক্য ঘটে তখন প্রথম আজানের প্রবর্তন করা হয়েছে। কুরআনে কারীমে যে আহবানের কথা আলোচনা করা হয়েছে তার দ্বারা দ্বিতীয় আজান উদ্দেশ্য, প্রথম আজান নয়। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করে বলেন, বেচাকেনা হারাম আর জুমা অভিমুখে সাঈ-এর ক্ষেত্রে প্রথম আজান ধর্তব্য। দলিল হলো, যদি কোনো ব্যক্তি আযানের সময় বেচাকেনা ছেড়ে দিয়ে জুমার দিকে সাঈ করে তবে জুমার পূর্বের সুন্নতসমূহ ফউত হয়ে যাবে। খুতবা শুনা ফউত হয়ে যাবে। আর যদি ঘর জামে মসজিদ থেকে দূরে হয় তবে জুমাই ফউত হয়ে যাবে। এ জন্য প্রথম আজানই ধর্তব্য হবে। তবে শর্ত হলো সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আজান দিতে হবে। কেননা এর দ্বারা আযানের উদ্দেশ্য অর্জন হয়ে গেছে।

بَابُ الْعِيْدَيْنِ

وَتَجِبُ صَلٰوةُ الْعِيْدِ عَلٰى كُلِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ عِيْدَانِ اجْتَمَعَا فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَالْاَوَّلُ سُنَّةٌ وَالثَّانِىْ فَرِيْضَةٌ وَلَا يُتْرَكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَالَ وَهٰذَا تَنْصِيْصٌ عَلَى السُّنَّةِ وَالْاَوَّلُ عَلَى الْوُجُوْبِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَجْهُ الْاَوَّلِ مُوَاظَبَةُ النَّبِىِّ ﷺ عَلَيْهَا وَ وَجْهُ الثَّانِىْ قَوْلُهُ ﷺ فِىْ حَدِيْثِ الْاَعْرَابِىْ عَقِيْبَ سُؤَالِهِ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ وَالْاَوَّلُ اَصَحُّ وَتَسْمِيَتُهُ سُنَّةً لِوُجُوْبِهِ بِالسُّنَّةِ .

দুই ঈদ (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা)-এর বিধান

অনুবাদ : যাদের উপর জুমার নামাজ ওয়াজিব, তাদের সকলের উপর ঈদের নামাজও ওয়াজিব। জামে সাগীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, একই দিনে দু'টি ঈদ একত্র হয়েছে। প্রথমটি হলো সুন্নত আর দ্বিতীয়টি হলো ফরজ। তবে দু'টির কোনো একটিকেও তরক করা যাবে না। গ্রন্থকার বলেন, এতে সুস্পষ্টভাবে সুন্নত বলা হয়েছে। আর প্রথমটি ওয়াজিব হওয়ার সুস্পষ্ট উক্তি রয়েছে। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত। প্রথমোক্ত বর্ণনায় দলিল এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিতভাবে তা পালন করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনার দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি, যা এক গ্রাম্য সাহাবীর এ প্রশ্ন–আমার উপর এ ছাড়া আরো কোনো নামাজ ওয়াজিব আছে কি? এর উত্তরে বলেন, না নেই, তবে যদি নফল আদায় কর। (তা তোমার ইচ্ছাধীন) প্রথমোক্ত বর্ণনাটি বেশি বিশুদ্ধ। আর তাকে সুন্নত বলার কারণ এই যে, তা সুন্নাহ বা হাদীস দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের অধ্যায়ের সাথে সম্পর্ক ঃ জুমা ও ঈদাইনের নামাজের মধ্যে সম্পর্ক হলো (১) উভয়টি দিনের নামাজ। উভয়টিকে অধিক লোকের জামায়াতের সাথে আদায় করা হয়। উভয়টির কিরাআতই জোরে পড়া হয়, জুমার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে ঈদাইনের জন্যও একই শর্ত রয়েছে। তবে খুতবার বিধান ভিন্ন। কেননা খুতবা জুমার জন্য শর্ত কিন্তু ঈদাইনের জন্য নয়। যার উপর জুমার নামাজ ওয়াজিব তার উপর ঈদাইনের নামাজও ওয়াজিব। কিন্তু যেহেতু জুমা ফরজ হওয়ার দিক থেকে শক্তিশালী আর ঈদাইনের নামাজ ফরজ না হওয়ার কারণে তার মোকাবেলায় দুর্বল, এজন্য জুমার বিধিবিধান আগে বর্ণনা করা হয়েছে আর ঈদাইনের বিধিবিধান পরে বর্ণনা করা হচ্ছে। (২) জুমার নামাজ অধিক হারে আদায় করা হয়, এ জন্য জুমার অধ্যায়কে ঈদাইনের অধ্যায়ের অগ্রে আনা হয়েছে।

ঈদের নামকরণ ঃ (১) ঈদের দিনে আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর তাঁর অনুগ্রহের ই'আদা (اعادہ) তথা পুনরাবৃত্তি করেন। (২) عاد . يعود এর অর্থ হলো– প্রত্যাবর্তন করা, বারবার আসা। যেহেতু এই মহিমান্বিত দিবসটিও প্রত্যেক বছরান্তে প্রত্যাবর্তন করে এবং এ দিনে যেহেতু মহান আল্লাহর তার অনুগ্রহের পুনঃবৃত্তি ঘটান, এ জন্য একে ঈদ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ঈদুল ফিতরের নামাজ ঃ ঈদুল ফিতরের নামাজ সর্বপ্রথম প্রথম হিজরি সনে পড়া হয়েছিল। (শরহে নিকায়া) উভয় ঈদের নামাজ প্রবর্তন হওয়ার ক্ষেত্রে মূল হলো আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীস–

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْاَضْحٰى وَ يَوْمَ الْفِطْرِ . (اَبُوْ دَاوُدَ)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনা বাসীর জন্য দুটো দিন ছিল খেল তামাসা করার জন্য। তিনি বললেন এ দুটো দিন কি? তারা বললো জাহেলী যুগে আমরা এই দুই দিনে খেল তামাসা করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এই দুই দিনকে অন্য দুই দিনের দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন, যা এই দুই দিনের চেয়েও উত্তম। তা হচ্ছে, এক. ঈদুল আযহা, দুই. ঈদুল ফিতর।

ঈদুল ফিতর নির্ধাতি হওয়ার রহস্য ঃ (১) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কোনো না কোনো দিন অবশ্যই এমন আছে যার মধ্যে তারা স্বাভাবিকভাবে অনন্দ খুশি করে থাকে, উত্তম পোশাক পরিধান করে, দামী দামী খানা খায়, তাই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدٌ وَهٰذَا عِيْدُنَا প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ঈদ রয়েছে এটা হলো আমাদের ঈদ। এটা এমন দিন, যখন লোকেরা সবেমাত্র তাদের রোজা থেকে ফারিগ হয়েছে এবং এক ধরনের যাকাত আদায় করেছে। এজন্য এই দিনে তাদের জন্য দুই ধরনের আনন্দ একত্রিত হয়েছে। এক, তাবয়ী (طبعى): দুই আকলী (عقلى)। তবয়ী খুশিতো এ জন্য যে, রোযার কঠোর ইবাদত থেকে ফারিগ হয়ে যাচ্ছে এবং মুখাপেক্ষীদের সাদাকা অর্জন হয়ে যাচ্ছে। আর আকলী খুশি হলো এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ফরজ ইবাদত আদায় করার তৌফিক দিয়েছেন। আর তার পরিবার পরিজনকে এ বছর পর্যন্ত বেচে থাকার সুযোগ দিয়ে তাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। এ জন্য খুশিগুলো করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কুরবানির ঈদ নির্ধারিত হওয়ার রহস্য ঃ ইবাদতের সময় নির্ধারণের মধ্যে এ হিকমতও রয়েছে, এ সময়ের মধ্যে আম্বিয়ায়ে কেরাম যে তা'আত ও আল্লাহর ইবাদত করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করে নিয়েছেন, এ সময় আসার দ্বারা তাদের কুরবানির কথা স্মরণ হয়ে ঐ ইবাদতের দিকে মনোনিবেশ সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই ঈদুল আযহার দিন হলো ঐ দিন, যার মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আ.) স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে আল্লাহর নির্দেশে তাঁরই দরবারে পেশ করার ইরাদা করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা ইসমাঈল (আ.)-এর জানের পরিবর্তে একটি জবাইকৃত দুম্বা দান করেছিলেন। এ জন্য এ ঈদের মধ্যে কুরবানির বিধান এই মুসলিহাতে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, এর মধ্যে মিল্লাতে ইব্রাহীমীর ইমামদ্বয় তথা হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর অবস্থাদি এবং তাঁদের জান ও মাল আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করার কথা এবং তাদের সীমাহীন ধৈর্যের কথা স্মরণ করিয়ে লোকদেরকে নসিহত করা হয়েছে। তা ছাড়া এর দ্বারা হাজীদেরও সদৃশতা এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন হয়ে যায়। যে কাজের প্রতি হাজী সাহেবগণ নিয়োজিত তার দিকে অন্যান্যদেরকে উৎসহিতও করা হয়।—(আল–মাসালিহুল আকলিয়া)

قَوْلُهُ وَتَجِبُ صَلٰوةُ الْعِيْدِ الخ : ইমাম কুদূরীর বর্ণনা অনুযায়ী ঈদের নামাজ ওয়াজিব। কেননা তিনি বলেছেন, ঈদের নামাজ ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব যার উপর জুমার নামাজ ওয়াজিব। জামে সগীরের বর্ণনা অনুযায়ী ঈদের নামাজ সুন্নত। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামে সগীর গ্রন্থে বলেছেন, যদি একদিন দুই ঈদ একত্রিত হয়ে যায়, অর্থাৎ জুমা ও ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহা যদি একেই দিনে হয় তবে প্রথমটি অর্থাৎ ঈদের নামাজ হলো সুন্নত আর জুমার নামাজ হলো ফরজ। নিকায়ার ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন, বিশুদ্ধ মতানুযায়ী আমাদের নিকট ঈদের নামাজ ওয়াজিব। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফিঈ (র.) এবং কতিপয় হানাফীদের মতে ঈদের নামাজ সুন্নত। ইমাম আহমদ (র.) ফরজে কিফায়া-এর প্রবক্তা।

দুই ঈদের নামাজ ওয়াজিব হওয়ার দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়মিতভাবে সর্বদা তা পালন করা। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সর্বদা পালন করা ওয়াজিব হওয়ার দলিল হিসাবে গণ্য। দ্বিতীয় বর্ণনা অর্থাৎ সুন্নত হওয়ার দলিল হলো, নজদ বাসী এক গ্রাম্য সাহাবী অস্থির হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে আসল। উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের একটি অংশ বর্ণনা করে বললেন, দিবা-রাত্রে নামাজ হলো পাঁচ ওয়াক্ত। ইহা শ্রবণে সে বলল, هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ এগুলো ছাড়া আর কোনো নামাজ আমার উপর রয়েছে কি? প্রত্যুত্তরে তিনি ইরশাদ করলেন, لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ না, নেই, তবে নফল হিসাবে রয়েছে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতিরেকে বাকি সকল নামাজ গায়রে ফরজ তথা নফল। সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, ঈদাইনের নামাজ ওয়াজিব নয়। আমাদের পক্ষ থেকে উক্ত দলিলের জওয়াব এই যে, (১) প্রশ্নকারী গ্রামের বাসিন্দা ছিল, আর গ্রামবাসীদের উপর ঈদের নামাজ ওয়াজিব নয়। এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তার অবস্থা অনুপাতে জওয়াব দিয়েছেন। (২) জওয়াব এই যে, প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথোপকথন ঈদের নামাজ ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে ছিল। (৩) আল্লাহ তা'আলার বাণী وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ দ্বারাও ঈদের নামাজ ওয়াজিব বুঝা যায়। কেননা وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ -এর ব্যাখ্যা ঈদের নামাজ দ্বারা করা হয়েছে। আর এটা আমর-এর সীগাহ যা ওয়াজিবকে চায়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামে সগীর গ্রন্থে ঈদের নামাজকে যে সুন্নত বলেছেন তার জওয়াব হলো এই যে, ঈদের নামাজ যে ওয়াজিব তা সুন্নত তথা হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এর এ উদ্দেশ্য নয় যে ঈদের নামাজ সুন্নত।

وَيُسْتَحَبُّ فِيْ يَوْمِ الْفِطْرِ اَنْ يَّطْعَمَ قَبْلَ الْخُرُوْجِ اِلَى الْمُصَلّٰى وَيَغْتَسِلَ وَيَسْتَاكَ وَيَتَطَيَّبَ لِمَا رُوِيَ اَنَّهٗ ﷺ كَانَ يَطْعَمُ فِيْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ يَّخْرُجَ اِلَى الْمُصَلّٰى وَكَانَ يَغْتَسِلُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَلِاَنَّهٗ يَوْمُ اجْتِمَاعٍ فَيُسَنُّ فِيْهِ الْغُسْلُ وَالتَّطَيُّبُ كَمَا فِى الْجُمُعَةِ وَيَلْبَسُ اَحْسَنَ ثِيَابِهٖ لِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهٗ جُبَّةُ فَنَكٍ اَوْ صُوْفٍ يَلْبَسُهَا فِى الْاَعْيَادِ .

অনুবাদ : আর মোস্তাহাব হলো, ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু (মিষ্টি) খাবার গ্রহণ করা, গোসল করা, মিসওয়াক করা এবং খুশবু ব্যবহার করা। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে আহার করতেন এবং দুই ঈদেই গোসল করতেন। কেননা এ হলো সমাবেশের দিন। সুতরাং তাতে গোসল করা ও খুশবু ব্যবহার করা সুন্নত হবে। যেমন জুমার জন্য ক্ষেত্র হয়ে থাকে। আর নিজের সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করবে। কেননা মহানবী ﷺ-এর একটি পুস্তিনের বা পশমের জোব্বা ছিল, যা তিনি ঈদে পরিধান করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঈদুল ফিতরের দিনের মোস্তাহাবসমূহের মধ্য থেকে একটি হলো এই যে, ঈদগায় যাওয়ার পূর্বে কোনো মিষ্টি জিনিস আহার করা। ইমাম বুখারী (র.) হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন–

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَاْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَاْكُلُهُنَّ وِتْرًا . (بخارى)

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন (ঈদের নামাজের জন্য) তাশরীফ নিতেন না, যতক্ষণ না বেজোড় খেজুর আহার করতেন।– (বুখারী)

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে,

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لَايَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَاْكُلَ وَكَانَ لَايَاْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتّٰى يُضَحِّيَ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন কিছু আহার না করে বের হতেন না। আর ঈদুল আযহার দিন নামাজ না পড়ে কিছু আহার করতেন না। দ্বিতীয় মোস্তাহাব আমল হলো গোসল করা। ইবনে মাজাহ শরীফে ফাকিহা ইবনে সা'দের হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ الْعَرَفَةِ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল আযহার দিন এবং আরাফার দিন গোসল করতেন। আকলী দলিল হলো এই যে, দুই ঈদের দিন হলো মানুষের সাথে একত্রিত হওয়ার দিন, মহাসমাবেশের দিন, এজন্য সে দিন গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নত। যেমন– জুমার দিনে উক্ত উভয় আমল হলো সুন্নত। তৃতীয় মোস্তাহাব আমল হলো, নিজের যে সকল বস্ত্রাদি আছে এর মধ্যে সর্বোত্তম কাপড় পরিধান করা। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি পুস্তিনের বা পশমি জোব্বা ছিল, ঈদ জাতীয় দিনে তিনি উক্ত জোব্বা পরিধান করতেন। অন্য রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بُرْدٌ اَحْمَرُ يَلْبَسُهٗ فِى الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدِ .

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি লাল রেখা বিশিষ্ট ইয়ামেনী চাদর ছিল তিনি তা জুমা এবং ঈদের দিনে পরিধান করতেন।

وَيُؤَدِّىْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ اِغْنَاءً لِلْفَقِيْرِ لِيَتَفَرَّغَ قَلْبُهُ لِلصَّلٰوةِ وَيَتَوَجَّهُ اِلَى الْمُصَلّٰى وَلَا يُكَبِّرُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ فِىْ طَرِيْقِ الْمُصَلّٰى وَعِنْدَ هُمَا يُكَبِّرُ اِعْتِبَارًا بِالْاَضْحٰى وَلَهٗ اَنَّ الْاَصْلَ فِى الثَّنَاءِ الْاِخْفَاءُ وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِهٖ فِى الْاَضْحٰى لِاَنَّهٗ يَوْمُ تَكْبِيْرٍ وَلَاكَذٰلِكَ الْفِطْرُ .

অনুবাদ : আর সাদাকাতুল ফিতর আদায় করবে। যাতে দরিদ্র ব্যক্তি সচ্ছলতা লাভ করতে পারে এবং তার অন্তর নামাজের জন্য একাগ্র হতে পারে। অতঃপর ঈদগাহ অভিমুখে গমন করবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ঈদগাহে যাওয়ার পথে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলবে না। আর সাহেবাইনের মতে তাকবীর বলবে। তারা ঈদুল আযহার উপর কিয়াস করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, ছানা ও যিকির-এর ব্যাপারে আসল হলো গোপনীয়তা। কিন্তু ঈদুল আযহার ক্ষেত্রে শরিয়ত প্রকাশ্য যিকিরের আদশে দিয়েছে। কেননা তা তাকবীর দিবস। কিন্তু ঈদুল ফিতর সেরূপ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঈদের নামাজের পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। (১) কেননা বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে,

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِزَكٰوةِ الْفِطْرِ اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ وَكَانَ هُوَ يُؤَدِّيْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِيَوْمٍ اَوْ بِيَوْمَيْنِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদাকায়ে ফিতরের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তা লোকেরা নামাজে যাওয়ার পূর্বেই আদায় করে দেওয়া হয় এবং তিনি নিজেও তা ঈদের দুই একদিন পূর্বে আদায় করে দিতেন। (২) দলিল এই যে, এর দ্বারা দ্রুত কল্যাণ অর্জন করা হয় এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের সম্পর্কে নামাজের জন্য ফারিগ করা হয়। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اغنوهم عن المسألة ফকীরদের মনকে হাতপাতা থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে দাও। আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন লোকেরা সাদাকাতুল ফিতর তাদেরকে আদায় করে দিবে। এ ছাড়া আল্লাহ তা'আলার বাণী– قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى -এর ব্যাখ্যায় তাফসীর গ্রন্থের উল্লেখ আছে,

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى اَىْ اَعْطٰى زَكٰوةَ الْفِطْرِ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ بِتَكْبِيْرِ الْعِيْدِ فِى الطَّرِيْقِ فَصَلّٰى صَلٰوةَ الْعِيْدِ .

অর্থাৎ সে ব্যক্তি সফল যে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করেছে এবং ঈদের তাকবীর বলে স্বীয় প্রতিপালকের যিকির করেছে– তারপর ঈদের নামাজ পড়েছে।

সাদাকাতুল ফিতর আদায় করার পর ঈদগাহ অভিমুখে গমন করবে। উল্লেখ্য যে, ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া মোস্তাহাব। কেননা হযরত ওমর (রা.) বলেছেন। ঈদগাহ পায়ে হেঁটে যাওয়া সুন্নত। যদি কিছু লোক নিজেদের দুর্বলতার কারণে ঈদগাহ যেতে অপারগ হয়, তবে ইমাম অন্য একজন লোককে নির্ধারণ করে দিবে যাতে সে তাদেরকে শহরের ভিতর মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়িয়ে দেয়। কেননা বর্ণিত আছে যে,

اِنَّ عَلِيًّا لَمَّا قَدِمَ الْكُوْفَةَ اِسْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلِّىْ بِالضَّعِيْفِ صَلٰوةَ الْعِيْدَيْنِ فِى الْجَامِعِ وَخَرَجَ اِلَى الْجَبَّانَةِ مَعَ خَمْسِيْنَ شَيْخًا يَمْشِىْ وَيَمْشُوْنَ .

হযরত আলী (রা.) যখন কূফায় তাশরীফ আনলেন, তখন এমন এক ব্যক্তিকে খলীফা বানালেন যিনি দুর্বল লোকদেরকে জামে মসজিদে ঈদাইনের নামাজ পড়াবে। আর তিনি নিজে পঞ্চাশ জন বৃদ্ধ লোদেরকে নিয়ে ময়দানের দিকে চললেন, তিনি নিজেও পায়ে হেঁটে চলেছিলেন আর ঐ পঞ্চাশ ব্যক্তিও পায়ে হেঁটে চলেছিলেন।

নিম্নোক্ত মাসআলার মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে যে, ঈদুল ফিতরের দিন ঈদাগাহে যাওয়ার প্রাক্কালে তাকবীর উচ্চৈঃস্বরে বলবে না কি চুপিসারে বলবে? হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, তাকবীর উচ্চৈঃস্বরে বলবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, তাকবীর উচ্চৈঃস্বরে বলবে। তাঁদের দলিল হলো ঈদুল আযহার উপর কিয়াস। অর্থাৎ যেমনিভাবে ঈদুল আযহার মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর শরিয়ত সম্মত এমনিভাবে ঈদুল ফিতরের মধ্যেও তাকবীর বলা শরিয়ত সম্মত। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, যিকির এর ব্যাপারে আসল হলো গোপনীয়তা। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِىُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِىْ

উত্তম যিকির হলো যিকরে খফী তথা অনুচ্চৈঃস্বরে জিকির আর উত্তম রিজিক হলো, প্রয়োজন পরিমাণ রিজিক। প্রয়োজনের বেশিও না আবার কমও না। কোনো এক উর্দু সাহিত্যিক বলেছেন,

مجھے جو بھی دے وہ قبول ہے مگر التجا یہ ضرور ہے * میرے ظرف بھی سوا، نہ دے میری ارزوسے بھی کم نہ دے

আমাকে যা দেওয়া হবে তা কুবল। তবে এ অনুরোধ অবশ্যই থাকবে যে আমার পাত্র থেকে অধিকও নয় আবার আমার আশা থেকে কমও নয়। মোটকথা, জিকিরের ব্যাপারে আসল হলো গোপনীয়তা। তাবে ঈদুল আযহার ক্ষেত্রে শরিয়ত প্রকাশ্য জিকিরের নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ মুফাস্সিরীনে কেরাম বলেছেন, এখানে কুরবানির দিনগুলোতে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা উদ্দেশ্য। ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহার সমর্থবোধক নয়। কেননা ঈদুল আযহা হলো তাকবীর বলার দিন। এ কারণেই তো কুরবানির দিনগুলোতে তাকবীর বলা ওয়াজিব। কিন্তু ঈদুর ফিতল এরূপ নয়। অধিকন্তু ঈদুল আযহা হজের রুকনের মধ্য থেকে একটি রুকনের সাথে খাস, অর্থাৎ ঐ দিনে হজের কতিপয় রুকন আদায় করা হয়। আর ঈদুল ফিতরের মধ্যে এগুলো নেই। সুতরাং ঈদুল ফিতর আর ঈদুল আযহা এক নয়। এতে বুঝা গেল ঈদুল ফিতরকে ঈদুল আযহার উপর কিয়াস করাও ঠিক হবে না। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে– ইমাম সাহেব (র.)-এর এ কথা বলা যে, ঈদুল ফিতরের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা শরিয়তে নেই– এটা মানার যোগ্য নয়। কেননা আল্লাহর বাণী–

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ.

উক্ত আয়াতের মধ্যে রামজানের রোজা পূর্ণ করার পর তাকবীর বলার খবর দেওয়া হয়েছে। আর তাকবীর পড়ার কথা তো তখনই জানা যাবে যখন উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা হবে। হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيْرِ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতে বলতে বের হতেন। বুঝা গেল, ঈদুল ফিতরের দিনও উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলার ব্যাপারে, শরিয়তের আছে। জওয়াব এই যে, আয়াতের মধ্যে নামাজের ভিতর তাকবীর বলা উদ্দেশ্য। সুতরাং আয়াতের অর্থ এই দাঁড়াবে صَلُّوْا صَلٰوةَ الْعِيْدِ وَكَبِّرُوا اللّٰهَ فِيْهَا ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করো আর তার মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলো। হাদীসে ইবনে ওমরের জওয়াব এই যে, উক্ত হাদীসে সনদের মধ্যে ওয়ালীদ ইবনে মুহাম্মদ ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ওয়ালীদ হলেন মাতরূকুল হাদীস অর্থাৎ যার হাদীস বর্জনীয়। তাই এই হাদীস দলিলযোগ্য নয়।

وَلَايَتَنَفَّلُ فِي الْمُصَلّٰى قَبْلَ صَلٰوةِ الْعِيْدِ لِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ مَعَ حِرْصِهٖ عَلَى الصَّلٰوةِ ثُمَّ قِيْلَ الْكَرَاهَةُ فِي الْمُصَلّٰى خَاصَّةً وَقِيْلَ فِيْهِ وَفِيْ غَيْرِهٖ عَامَّةً لِاَنَّهٗ ﷺ لَمْ يَفْعَلْهُ وَاِذَا حَلَّتِ الصَّلٰوةُ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ دَخَلَ وَقْتُهَا اِلَى الزَّوَالِ وَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ وَقْتُهَا لِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعِيْدَ وَالشَّمْسُ عَلٰى قِيْدِ رُمْحٍ اَوْ رُمْحَيْنِ وَلَمَّا شَهِدُوْا بِالْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ اَمَرَ بِالْخُرُوْجِ اِلَى الْمُصَلّٰى مِنَ الْغَدِ ـ

অনুবাদ : ঈদের নামাজের পূর্বে ঈদগাহে নফল নামাজ পড়বে না। কেননা নামাজের প্রতি প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও মহানবী ﷺ তা করেননি। এরপর কেউ কেউ বলেন, এই মকরূহ হওয়া ঈদগাহের জন্য নির্দিষ্ট। আবার কেউ কেউ বলেন, সাধারণভাবে ঈদগাহ ও সব স্থানের জন্য ব্যাপক। কেননা মহানবী ﷺ তা করেননি। যখন সূর্য উপরে উঠে আসার মাধ্যমে নামাজ আদায় করা জায়েজ হয়ে যায় তখন থেকে যাওয়াল পর্যন্ত ঈদের নামাজের সময় থাকে। যখন সূর্য ঢলে পড়ে তখন ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য এক বা দুই বর্শা পরিমাণ উপরে উঠলে ঈদের নামাজ আদায় করতেন। আর (একবার) যখন সাহাবায়ে কেরাম যাওয়ালের পর চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলেন, তখন তিনি পরবর্তী দিন ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ঈদের নামাজের পূর্বে নফল নামাজ পড়া মাকরূহ। ইদগাহেও এবং ঈদগাহ ছাড়া অন্য স্থানেও। ইমামের জন্যও মাকরূহ, মুক্তাদীর জন্যও মাকরূহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فَصَلّٰى بِهِمُ الْعِيْدَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَابَعْدَهَا রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘর থেকে বের হয়ে লোকদেরকে ঈদের নামাজ পড়িয়েছেন। তিনি ঈদের নামাজের পূর্বাপর কোনো নফল নামাজ পড়েননি। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। যদি ঈদের নামাজের আগে-পিছনে কোনো নফল নামাজ থাকতো তবে আল্লাহর রাসূল ﷺ অবশ্যই তা আদায় করতেন। হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, কোনো কোনো মাশায়িখ বলেছেন, ঈদগাহ ও ঘর সব জায়গায়ই নফল নামাজ মাকরূহ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ঈদের নামাজের পরে ঈদগাহের মধ্যে নফল নামাজ পড়া নিঃসন্দেহে মাকরূহ। তবে ঘরে এসে নফল পড়া মাকরূহ ছাড়াই জায়েজ। আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীস, قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُصَلِّىْ قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْـئًا فَاِذَا رَجَعَ اِلٰى مَنْزِلِهٖ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ـ রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের পূর্বে কিছুই পড়তেন না। কিন্তু যখন ঘরে ফিরে আসতেন তখন দুই রাকআত নফল আদায় করতেন।

قَوْلُهٗ وَاِذَا حَلَّتِ الصَّلٰوةُ الخ : উপরোক্ত ইবারতের মধ্যে ঈদের নামাজের শুরু এবং শেষ ওয়াক্তের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র.) বলেন, ঈদের নামাজের ওয়াক্ত শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখের সূর্য এক বর্শা বা দুই বর্শা পরিমাণ উপরে উঠা হতে আরম্ভ হয়ে যায় এবং সূর্য যাওয়াল হওয়া পর্যন্ত বাকি থাকে। শুরু ওয়াক্তের উপর দলিল হলো (১) রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের নামাজ তখন পড়তেন যখন সূর্য এক বর্শা বা দুই বর্শা পরিমাণ উপরে উঠে যেতো। (২) দলিল এই যে, সূর্য উঠার হুবহু সময়ে নামাজ পড়তে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, এ জন্য সূর্য উপরে উঠার শর্তারোপ করা হয়েছে। শেষ ওয়াক্তের উপর দলিল এই যে, একবার রমাজানের চাঁদ ২৯ তারিখে দৃষ্টিগোচর হয়নি। কিছু সাহাবায়ে কেরাম পরের দিন যাওয়ালের পর চাঁদ দেখার সাক্ষী দিলেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ পরের দিন অর্থাৎ ২রা শাওয়াল ঈদের নামাজ আদায় করার নির্দেশ দিলেন। যদি যাওয়ালের পরও ঈদের নামাজ আদায় করা জায়েজ হতো, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ পরের দিন পর্যন্ত বিলম্ব করতেন না। এতে প্রতীয়মান হলো, ঈদের নামাজের সময় যাওয়াল পর্যন্ত থাকে।

وَيُصَلِّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِى الْأُولٰى لِلْاِفْتِتَاحِ وَثَلٰثًا بَعْدَهَا ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُوْرَةً وَيُكَبِّرُ تَكْبِيْرَةً يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَبْتَدِئُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلٰثًا بَعْدَهَا وَيُكَبِّرُ رَابِعَةً يَرْكَعُ بِهَا وَهٰذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) وَهُوَ قَوْلُنَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) يُكَبِّرُ فِى الْأُولٰى لِلْاِفْتِتَاحِ وَخَمْسًا بَعْدَهَا وَفِى الثَّانِيَةِ يُكَبِّرُ خَمْسًا ثُمَّ يَقْرَأُ وَفِىْ رِوَايَةٍ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا وَظَهَرَ عَمَلُ الْعَامَّةِ الْيَوْم بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِاَمْرِ بَنِيْهِ الْخُلَفَاءِ فَاَمَّا الْمَذْهَبُ فَالْقَوْلُ الْاَوَّلُ لِاَنَّ التَّكْبِيْرَ وَ رَفْعَ الْاَيْدِىْ خِلَافُ الْمَعْهُوْدِ فَكَانَ الْاَخْذُ بِالْاَقَلِّ اَوْلٰى ثُمَّ التَّكْبِيْرَاتُ مِنْ اِعْلَامِ الدِّيْنِ حَتّٰى يُجْهَرَ بِهَا فَكَانَ الْاَصْلُ فِيْهَا الْجَمْعُ وَفِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى يَجِبُ اِلْحَاقُهَا بِتَكْبِيْرَةِ الْاِفْتِتَاحِ لِقُوَّتِهَا مِنْ حَيْثُ الْفَرْضِيَّةِ وَالسَّبْقِ وَفِى الثَّانِيَةِ لَمْ يُوْجَدْ اِلَّا تَكْبِيْرَةُ الرُّكُوْعِ فَوَجَبَ الضَّمُّ اِلَيْهَا وَالشَّافِعِىُّ (رح) اَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِلَّا اَنَّهُ حَمَلَ الْمَرْوِىَّ كُلَّهُ عَلَى الزَّوَائِدِ فَصَارَتِ التَّكْبِيْرَاتُ عِنْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ اَوْ سِتَّةَ عَشَرَ ـ

অনুবাদ : ইমাম লোকদেরকে নিয়ে দুই রাকআত নামাজ আদায় করবেন। প্রথম রাকআতে এক তাকবীর বলবেন তাহরীমার জন্য। তারপর তিনবার তাকবীর বলবেন। এরপর ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন এবং তাকবীর বলে রুকূতে যাবেন। এরপর দ্বিতীয় রাকাআত কিরাআত দিয়ে শুরু করবেন। তারপর তিনবার তাকবীর বলবেন এবং চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে যাবেন। এ হলো হযরত ইবনে মাসউদ (র.)-এর মত এবং আমাদের মাযহাব। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রথম রাকআতে তাহরীমার জন্য তাকবীর বলবেন তারপর পাঁচটি তাকবীর বলবেন এবং দ্বিতীয় রাকআতেও পাঁচবার তাকবীর বলার পর কিরাআত পড়বেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, (দ্বিতীয় রাকআতে) চারবার তাকবির বলবেন। বর্তমানে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বংশধর খলীফাদের শাসন সমাজে বিদ্যমান থাকার কারণে সাধারণ লোকের আমল তাঁর মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে মাযহাব প্রথমোক্ত মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা (অতিরিক্ত) তাকবীর বলা এবং হাত উঠানো নামাজের নির্ধারিত প্রকৃতির বিপরীত। সুতরাং নিম্নতর সংখ্যাই গ্রহণ করা শ্রেয়। আর (ঈদের) তাকবীরসমূহ হলো দীনের প্রতীক। এ জন্য তা উচ্চৈঃস্বরে আদায় করা হয়। সুতরাং এর প্রকৃত চাহিদা হলো, মিলিতভাবে পাঠ করা। প্রথম রাকাআতে এই তাকবীরগুলোকে তাকবীরে তাহরীমার সাথে যুক্ত করা ওয়াজিব। যেহেতু এ তাকবীর ফরজ এবং প্রথমে হওয়ার প্রেক্ষিতে এটার শক্তি বেশি। আর দ্বিতীয় রাকআতে রুকুর তাকবীর ছাড়া অন্য কোনো তাকবীর নেই। সুতরাং (ঈদের তাকবীরগুলো) তার সাথে যুক্ত করাই ওয়াজিব। ইমাম শাফিঈ (র.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতামত গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি বর্ণিত সব কয়টি তাকবীরকে অতিরিক্ত তাকবীর হিসাব গ্রহণ করেছেন। ফলে (তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর দুই তাকবীরসহ) মোট তাকবীর তাঁর মতে পনেরটি কিংবা ষোলটি হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) ঈদের নামাজের যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, তা হলো এই যে, ইমাম লোকদেরকে দুই রাকআত এভাবে পড়াবে যে, প্রথমে তাকবীরে তাহরীমা বলবে। তারপর ছানা পড়ে তিনবার অতিরিক্ত তাকবীর বলব। তারপর কিরাআত অর্থাৎ সূরায়ে ফাতেহা পড়বে এবং অন্য একটি সূরা মিলাবে। তারপর রুকুর তাকবীর বলে রুকূ করবে এবং সিজদা আদায় করবে। এভাবে প্রথম রাকআত পূর্ণ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় রাকআতের মধ্যে প্রথমে সূরায়ে ফাতেহা পড়বে এবং অন্য একটি সূরা মিলাবে। তারপর তিনবার অতিরিক্ত তাকবীর বলবে। এরপর রুকুর তাকবীর বলে রুকূ করবে। উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী উভয় রাকআতে সর্বমোট নয়টি তাকবীর হবে। ছয়টি অতিরিক্ত তাকবীর, দুইটি রুকুর তাকবীর এবং একটি তাকবীরে তাহরীমা। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা হলো ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মত। ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে ঈদের উভয় রাকআতে সর্বমোট তাকবীর হলো নয়টি। এটাই হানাফী আলিমগণের মাযহাব। ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতের দলিল হলো–

كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَاَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىُّ فَسَأَلَهُمْ سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيْرِ فِىْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَلِ الْاَشْعَرِىَّ فَقَالَ الْاَشْعَرِىُّ سَلْ عَبْدَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ اَقْدَمُنَا وَاَعْلَمُنَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْمُ فِى الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ـ

একবার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হযরত হুযায়ফা (রা.) এবং আবূ মূসা আশআরী (রা.) কোথাও বসা ছিলেন। তাদেরকে সাঈদ ইবনুল আস (রা.) ঈদের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। হুযায়ফা (রা.) বললেন, আশআরীকে জিজ্ঞাসা করুন। আশআরী (রা.) বললেন, আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করুন। কেননা আব্দুল্লাহ আমাদের মধ্যে প্রবীন এবং জ্ঞানী। তাই তিনি ইবনে মাসউদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, চার বার তাকবীর বলবে। তারপর কিরাআত পড়বে। তারপর তাকবীর বলে রুকূ করবে। তারপর দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবে। কিরাআত পড়বে, তারপর কিরাআতের পর চারবার তাকবীর বলবে। উল্লেখ্য যে, প্রথম রাকআতের মধ্যে যে পাঁচবার তাকবীরের কথা বলা হয়েছে এর মধ্যে একটি হলো তাকবীরে তাহরীমা আর তিনটি হলো অতিরিক্ত। আর একটি হলো রুকুর তাকবীর। দ্বিতীয় রাকআতের চার তাকবীরের মধ্যে একটি হলো রুকুর তাকবীর আর তিনটি হলো অতিরিক্ত। মোটকথা ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা নয়বার তাকবীর বলার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া হযরত মাসরূক থেকে বর্ণিত আছে যে, قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيْرَ فِى الْعِيْدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيْرَاتٍ خَمْسٌ فِى الْاُوْلٰى وَاَرْبَعٌ فِى الْاٰخِيْرَةِ وَيُوَالِىْ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ ـ ইবনে মাসউদ (রা.) আমাদেরকে দুই ঈদে নয় তাকবীরের শিক্ষা দান করতেন। পাঁচটি প্রথম রাকআতে আর চারটি দ্বিতীয় রাকআতের মধ্যে এবং উভয় কিরাআতের মাঝখানে (وصل) করতেন তথা ধারাবাহিকভাবে একের পর এক পড়তেন। উক্ত রিওয়ায়াতের পাঁচ তাকবীর দ্বারা মুরাদ হলো তাকবীরে তাহরীমা, রুকূর তাকবীর এবং তিনটি অতিরিক্ত তাকবীর। আর চার তাকবীর দ্বারা মুরাদ হল, তিনটি অতিরিক্ত তাকবীর এবং একটি রুকূর তাকবীর। উক্ত আছর (اثر) দ্বারাও ঈদের তাকবীর নয়টি প্রমাণিত হলো। ছয়টি অতিরিক্ত আর তিনটি নামাজের। (শরহে নিকায়া) মোট কথা, হানাফী মাযহাবের ভিত্তি হলো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসের উপর। হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণনা মতে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমা বলবে এবং এরপর পাচবার তাকবীর বলবে। দ্বিতীয় রাকআতের মধ্যে পাঁচবার তাকবীর বলবে অতঃপর কিরাআত পড়বে। অন্য বর্ণনায় আছে দ্বিতীয় রাকআতে চারবার তাকবীর বলবে।

উল্লেখ্য যে, ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্যের মাঝে দুই স্থানে মতবিরোধ হলো, এক অতিরিক্ত তাকবীরগুলোর মধ্যে। দুই, এগুলোর স্থান নিরূপণের মধ্যে। ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে অতিরিক্ত তাকবীর হলো ছয়টি। তিনটি প্রথম রাকআতে, আর তিনটি দ্বিতীয় রাকআতে। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক বর্ণনা মতে অতিরিক্ত তাকবীর দশটি। পাঁচটি প্রথম রাকআতে, বাকি পাঁচটি দ্বিতীয় রাকআতে। অন্য বর্ণনা মতে অতিরিক্ত তাকবীর নয়টি। পাঁচটি প্রথম রাকআতে, আর চারটি দ্বিতীয় রাকআতে।

দ্বিতীয় স্থানের মতবিরোধ এই যে, ইবনে মাসউদ (রা.) -এর মতে দ্বিতীয় রাকআতের মধ্যে অতিরিক্ত তাকবীরের স্থান হলো কিরাআত থেকে ফারিগ হওয়ার পর। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে কিরাআতে পূর্বে। বিজ্ঞ লিখক আল্লামা বুরহানুদ্দীন (র.) তাঁর সময়কার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, আজকাল সাধারণ লোকের আমল হলো ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী। তার কারণ এই যে, ঐ সময় ছিল আব্বাসী খলীফাদের উত্থানের সময়। আব্বাসীয় খলীফাগণ ঈদের তাকবীরগুলোর ক্ষেত্রে তাদের দাদামহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দিতেন। এ কারণেই একবার ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বাগদাদে লোকদেরকে ঈদের নামাজ পড়িয়েছিলেন এবং তাকবীরগুলোর ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আমল করেছেন। কেননা আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁর মুক্তাদী ছিলেন। খলীফা তাঁকে তা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমনিভাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকেও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রিওয়ায়াত

অনুযায়ী আমল করার বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এ ধরনের আমল করা মাযহাব বা বিশ্বাসের দিক থেকে ছিল না বরং আব্বাসীয় খলীফাদের নির্দেশের প্রেক্ষাপটে ছিল। তবে মাযহাব তো হলো প্রথমোক্ত মত তথা ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর রিওয়ায়াত অনুযায়ী। গ্রন্থকার প্রথমোক্ত মতটি মাযাহাব হওয়ার ক্ষেত্রে আকলী পেশ করতে গিয়ে বলেন, অতিরিক্ত তাকবীর এবং হাত উঠানো নামাজের নির্ধারিত প্রকৃতির বিপরীত। এ জন্য নিম্নতর সংখ্যা গ্রহণ করাই অধিক শ্রেয়। কেননা নিম্ন সংখ্যার প্রমাণ অবশ্যই (باليقين) হয়ে থাকে।

ثُمَّ التَّكْبِيرَاتُ الخ : উক্ত ইবারত দ্বারা অতিরিক্ত তাকবীরসমূহের সস্থানের উপর প্রমাণসহ আলোচনা করা হয়েছে। তাই গ্রন্থকার বলেন, তাকবীরসমূহ হলো দীনের প্রতীক বা আলামত। তাকবীরগুলো উচ্চৈঃস্বরে বলা হয় যাতে দীনের পতাকা উঁচু হয়। অতিরিক্ত তাকবীরগুলোর মধ্যে মূল হলো। اصل তাকবীরগুলোর সাথে তা একত্রিত হওয়া। প্রথম রাকআতের মধ্যে অতিরিক্ত তাকবীরগুলোকে তাকবীরে তাহরীমার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, রুকুর তাকবীরের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি। কেননা তাকবীরে তাহরীমা ফরজ হওয়ার কারণেও শক্তিশালী এবং রুকুর তাকবীরের পূর্বেও বটে। আর যেহেতু দ্বিতীয় রাকআতের মধ্যে রুকুর তাকবীর ব্যতীত অন্য কোনো তাকবীর নেই তাই দ্বিতীয় রাকআতে রুকুর তাকবীরের সাথে সম্পৃক্ত করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম শাফিঈ (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতকে গ্রহণ করেছেন এবং ইবনে আব্বাসের মতের মধ্যে তাকবীরগুলোর যে সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে– সেগুলোকে তিনি অতিরিক্ত (زوائد) বলেছেন। এমনিভাবে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে সর্বমোট তাকবীর পনের কিংবা ষোল হবে।

গ্রন্থকারের ইবারত اِلَّا اَنَّهُ حَمَلَ الْمَرْوِى كُلَّهُ عَلَى الزَّوَائِدِ-এর মধ্যে কিছুট অস্পষ্টতা আছে। তা হলো المروى দ্বারা মুরাদ হয়তো এটা হবে যা হেদায়াতে নিম্নোক্ত শব্দাবলিতে বর্ণিত হয়েছে, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُكَبِّرُ فِى الْاُوْلٰى لِلْاِفْتِتَاحِ وَخَمْسًا بَعْدَهَا وَفِى الثَّانِيَةِ يُكَبِّرُ خَمْسًا ثُمَّ يَقْرَأُ وَ فِىْ رِوَايَةٍ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا . অথবা অন্য কোনো কিছু মুরাদ হবে। যদি দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্য হয় তবে ইবারতের মধ্যে تعقيد (জটিলতা) হবে। কারণ যা কিতাবের মধ্যে উল্লেখ নেই তার হাওয়ালা দিয়ে অনার্থক পাঠাকদেরকে পেরেশান করা হবে। আর যদি প্রথমটি উদ্দেশ্য হয় তবে তাকবীরের সংখ্যা ঐ পরিসংখ্যান পর্যন্ত পৌছে না। কেননা বর্ণিত রিওয়ায়াত অনুযায়ী অতিরিক্ত তাকবীর নয় বা দশ হয়। তিনটি মূল তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা, প্রথম রাকআতের রুকুর তাকবীর: দ্বিতীয় রাকআতের রুকূর তাকবীর) এর সাথে মিলে বার বা তেরটি তাকবীর হবে।

তা ছাড়া হেদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, وَالشَّافِعِىُّ اَخَذَ অতঃপর বলেন, وَظَهَرَ عَمَلُ الْعَامَّةِ الْيَوْمَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ উক্ত ইবারত দ্বারা বুঝা যায় হেদায়া গ্রন্থকারের জমানায় সাধারণ লোকদের আমল পনের কিংবা ষোল তাকবীরের উপর ছিল অথচ ব্যাপারটি এমন নয়; বরং ঐ জমানায় বার কিংবা তের তাকবীরের উপর আমল ছিল। তাই উপরোক্ত অস্পষ্টতার জওয়াব হলো এই যে, ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে দু'টো রিওয়ায়াত যদিও বর্ণিত রয়েছে এক, ঈদাইনের মধ্যে বার তাকবীর তের তাকবীর। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন মূল তিন তাকবীরের সাথে মিলে সর্বমোট তাকবীর হবে, বার কিংবা তেরটি অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা এবং উভয় রাকআতের রুকুর তাকবীরের সাথে মিলে বার কিংবা তের তাকবীর। আর তা এভাবে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচটি অতিরিক্ত তাকবীর, তাকবীরে তাহরীমা এবং উভয় রাকআতের দুই তাকবীর এ হিসাবে সর্বমোট তেরটি তাকবীর হবে। দ্বিতীয় রিওয়ায়াত অনুযায়ী প্রথম রাকআতে পাঁচটি অতিরিক্ত তাকবীর, দ্বিতীয় রাকআতে চারটি অতিরিক্ত তাকবীর এবং তিনটি হলো মূল তাকবীর। এ হিসাবে সর্বমোট বার তাকবীর হয়। ইবনে আব্বাসের উক্ত রিওয়ায়াতগুলোর উপরে তৎকালে সাধারণ লোকদের আমল ছিল। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, উক্ত বার কিংবা তেরো তাকবীর–সবগুলো হলো অতিরিক্ত তাকবীর। এখন এ তাকবীরগুলোর সাথে যদি মূল তিন তাকবীর অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা উভয় রাকাআতের দুই তাকবীর মিলিত হয় তবে তো বার বিশিষ্ট রিওয়ায়াত হিসাবে সর্বমোট পনের তাকবীর আর তেরো বিশিষ্ট রিওয়ায়াত হিসাবে সর্বমোট ষোল তাকবীর হয়ে যাবে। সুতরাং مروى দ্বারা মুরাদ হলো তা-ই যা ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন। এখন খোলাসা এই বের হলো যে, হানাফী আলিমগণের মতে ঈদের উভয় রাকআতে অতিরিক্ত তাকবীর হলো ছয়টি। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.) -এর মতে দশটি, ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে বার কিংবা তেরটি।— (শরহে নিকায়া)

হানাফীগণের মাযহাবের ভিত্তি হলো, ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর রিওয়ায়াতের উপর। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মাযহাবের ভিত্তি হলো ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক তের বিশিষ্ট রিওয়ায়াত। আর তা এভাবে যে, দশটি হলো অতিরিক্ত তাকবীর, তিনটি হলো মূল তাকবীর। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মাযহাবের ভিত্তি হলো ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উভয় রিওয়ায়াত (বার কিংবা তের বিশিষ্ট)-এর উপর। তবে তিনি মূল তিন তাকবীর ব্যতীত সবগুলোকে অতিরিক্ত তাকবীর বলেন। আল্লাহ-ই সম্যক অবহিত।

قَالَ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ يُرِيْدُ بِهِ مَا سِوَى التَّكْبِيْرِ فِي الرُّكُوْعِ لِقَوْلِهِ ﷺ لَاتُرْفَعُ الْاَيْدِيْ اِلَّا فِيْ سَبْعِ مَوَاطِنَ وَ ذُكِرَ مِنْ جُمْلَتِهَا تَكْبِيْرَاتُ الْاَعْيَادِ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ اِنَّهُ لَا يُرْفَعُ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا قَالَ وَيَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلٰوةِ خُطْبَتَيْنِ بِذَالِكَ وَرَدَ النَّقْلُ الْمُسْتَفِيْضُ يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيْهَا صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاَحْكَامَهَا لِاَنَّهَا شُرِعَتْ لِاَجْلِهِ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةُ الْعِيْدِ مَعَ الْاِمَامِ لَمْ يَقْضِهَا لِاَنَّ الصَّلٰوةَ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ لَمْ تُعْرَفْ قُرْبَةً اِلَّا بِشَرَائِطَ لَاتَتِمُّ بِالْمُنْفَرِدِ فَاِنْ غُمَّ الْهِلَالُ وَشَهِدُوْا عِنْدَ الْاِمَامِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّى الْعِيْدَ مِنَ الْغَدِ لِاَنَّ هٰذَا تَاخِيْرٌ بِعُذْرٍ وَقَدْ وَرَدَ فِيْهِ الْحَدِيْثُ فَاِنْ حَدَثَ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلٰوةِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِيْ لَمْ يُصَلِّهَا بَعْدَهُ لِاَنَّ الْاَصْلَ فِيْهَا اَنْ لَّاتُقْضٰى كَالْجُمُعَةِ اِلَّا اَنَّا تَرَكْنَاهُ بِالْحَدِيْثِ وَقَدْ وَرَدَ بِالتَّاخِيْرِ اِلَى الْيَوْمِ الثَّانِيْ عِنْدَ الْعُذْرِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দুই ঈদের তাকবীরগুলোতে উভয় হাত উপরে উঠাবে। এটা দ্বারা ইমাম কুদূরী (র.) রুকুর তাকবীর ছাড়া অন্যান্য তাকবীর বুঝিয়েছেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাতটি স্থান ছাড়া অন্য কোথাও হাত তোলা হবে না। তন্মধ্যে ঈদের তাকবীরসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, হাত তোলা হবে না। আমাদের বর্ণিত এ হাদীস তার বিপরীতে দলিল। গ্রন্থকার (র.) বলেন, নামাজের পর (ইমাম) দু'টি খুতবা দিবেন। এ সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে লোকদেরকে সাদাকাতুল ফিত্‌র-এর আহকাম শিক্ষা দিবেন। কেননা এ খুতবা এ উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে। যে ব্যক্তির ইমামের সাথে ঈদের নামাজ ফউত হয়ে গেছে, সে তা কাজা পড়বে না। কেননা এই প্রকৃতির নামাজ এমন কিছু শর্তসাপেক্ষেই ইবাদত রূপে স্বীকৃত হয়েছে, যা মুনফারিদ দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না। যদি চাদ মেঘাবৃত হয়ে যায় আর লোকেরা যাওয়ালের পর শাসক (বা তার নিযুক্ত ব্যক্তির) নিকট চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়, তাহলে ইমাম পরের দিন ঈদের নামাজ আদায় করবেন। কেননা এ বিলম্ব ওজরের কারণে হয়েছে। এ অনুযায়ী হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যদি কোনো ওজর বশত পরের দিনও নামাজ আদায় সম্ভব না হয়, তাহলে এর পরে তা আর পড়বে না। কেননা জুমার ন্যায় এ ক্ষেত্রেও মূলনীতি হলো কাজা না করা। তবে আমরা বর্ণিত হাদীসের কারণে তা বর্জন করেছি। আর হাদীসে ওজর বশত দ্বিতীয় দিন পর্যন্তই বিলম্বিত করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের মতে ঈদাইনের তাকবীরসমূহের মধ্যে কান পর্যন্ত হাত উঠানো হবে। এটাই ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মাযহাব। দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ বাণী لَاتُرْفَعُ الْاَيْدِيْ اِلَّا فِيْ سَبْعِ مَوَاطِنَ। ঐ সাত তাকবীরের মধ্যে ঈদাইনের অতিরিক্ত তাকবীরগুলোকেও উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, ঈদাইনের তাকবীরগুলোর মধ্যে হাত উঠানো হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল এই যে, হাত উঠানো ইফতিতাহ তথা প্রারম্ভের সুন্নত। যেহেতু অতিরিক্ত তাকবীরগুলোর মধ্যে প্রারম্ভ নেই, সেহেতু হাত উঠানো হবে না। যেমন– রুকুর তাকবীরের মধ্যে হাত উঠানো হয় না।

قَوْلُهُ لَاتُرْفَعُ الْاَيْدِيْ اِلَّا فِيْ سَبْعِ مَوَاطِنَ الخ : হাদীসটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বিপরীতে দলিল হবে। তবে অতিরিক্ত তাকবীরগুলোর মধ্যে কোনো মাসনূন জিকির আছে কিনা? এ ব্যাপারে ইনায়া গ্রন্থকারের ভাষ্য মতে কোনো মাসনূন জিকির নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক দুই তাকবীরের মাঝখানে তিন তাসবীহ পরিমাণ চুপ (সুকূত) থাকবে। কারণ, ঈদের জামাআত অনেক লোকের সমাগমে আদায় করা হয়। এখন যদি তাকবীরগুলোকে মিলিয়ে মিলিয়ে আদায় করা হয়, তাহলে যে সকল মুসল্লী ইমাম থেকে দূরে থাকবে তাদের নিকট ইমামের অবস্থা জটিল হয়ে যাবে যে, ইমাম কোন তাকবীর বলছেন। তবে সামান্য পরিমাণ অবকাশ দেওয়ার দ্বারা জটিলতা দূর হয়ে যাবে। এজন্য তাকবীরগুলোর মাঝখানে তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় চুপ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ قَالَ وَيَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلٰوةِ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, ঈদের নামাজ শেষ করে ইমাম দু'টি খুতবা দিবেন। এ সম্পর্কে হাদীসে মশহুর ও রয়েছে এবং উম্মতের আমলও রয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে ওমরের হাদীসের শব্দাবলি এই যে, قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ –রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বকর (রা.) এবং ওমর (রা.) খুতবার পূর্বে দুই ঈদের নামাজ আদায় করতেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كُلُّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ . (رواه البخاري) উভয় হাদীসের খোলাসা হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তিন খলীফা দুই ঈদের নামাজ প্রথমে আদায় করতেন তারপর খুতবা পড়তেন। তবে ঈদের খুতবা আর জুমার খুতবার মধ্যে দুই রকমের পার্থক্য বিদ্যমান। এক, জুমা খুতবা ব্যতীত জায়েজ নেই কিন্তু ঈদের নামাজ খুতবা ব্যতীতও জায়েজ আছে। দুই, জুমার খুতবা জুমার পূর্বে পড়া হয় আর ঈদাইনের খুতবা নামাজের পর পড়া হয়। কিন্তু যদি ঈদের খুতবা নামাজের পূর্বে পড়া হয় তবে তাও জায়েজ আছে, ঈদের নামাজের পর পুনরায় পড়ার দরকার নেই। উল্লেখ্য যে, ঈদুল ফিতরের খুতবার মধ্যে সাদাকাতুল ফিতর এবং তার আহকামের তালীম দেওয়া হবে। কেননা এ খুতবা এ উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةُ الْعِيْدِ الخ : মাসআলা, ইমাম ঈদের নামাজ আদায় করে ফেলেছেন এমতাবস্থায়, এক ব্যক্তি বাকি রয়ে গেছে, সে ঈদের নামাজ আদায় করতে পারেনি তাহলে এখন তার কাজা করার ইজাযত নেই। এটা-ই ইমাম মালিক (র.)-এর মত। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এ ব্যক্তি একাকী ঈদের নামাজ আদায় করতে পারবে। কেননা ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে ঈদাইনের নামাজের জন্য জামাআতও শর্ত নয় এবং বাদশাহর উপস্থিত থাকাও শর্ত নয়। এ জন্য তাঁর মতে ঈদের নামাজের কাজা আদায় করা মোস্তাহাব। আমাদের দলিল এই যে, ঈদের নামাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এমন কিছু শর্ত রয়েছে যেগুলো একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি দ্বারা সম্ভব নয়। যেমন– জামাআত হওয়া, ঐ সময়ের বাদশা হাজির থাকা ইত্যাদি। সুতরাং যেহেতু মুনফারিদের মধ্যে এ শর্তগুলো পাওয়া যায় না। তাই তার জন্যে একাকী ঈদের নামাজ আদায় করাও জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ فَاِنْ غُمَّ الْهِلَالُ وَشَهِدُوْا الخ : রমজানের ২৯ তারিখে আকাশ মেঘাকৃত হওয়ার দরুন যদি চাঁদ না দেখা যায় এবং ৩০ শে রমজান যাওয়ালের পর লোকেরা প্রশাসকের সমানে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করে আর প্রশাসকও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে তবে সকলে রোজা ভেঙ্গে দিবে এবং ইমাম আগামী দিন লোকদেরকে ঈদের নামাজ পড়াবেন। দলিল এই যে, এ বিলম্ব ওজরের কারণে হয়েছে এ জন্য এ বিলম্বের মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। এ ধরনের বিলম্ব সম্পর্কে হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। যেমন– হিদায়ার বিগত পৃষ্ঠার মধ্যে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, وَلَمَّا شَهِدُوْا بِالْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ اَمَرَ بِالْخُرُوْجِ اِلَى الْمُصَلّٰى مِنَ الْغَدِ লোকেরা যদি যাওয়ালের পর চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় তবে আগামী দিন ময়দানে বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। আর যদি শাওয়ালের দ্বিতীয় তারিখেও এমন কোনো ওজর পাওয়া যায় যা ঈদের নামাজের জন্য প্রতিবন্ধক, তবে এখন এরপর তথা শাওয়ালের তিন তারিখে ঈদের নামাজ আদায় করার ইজাযত নেই। কেননা ঈদের নামাজের মধ্যে মূলনীতি হলো এই যে, তার কাজা পড়বে না। যেমন জুমার নামাজ ফউত হলে তার কাজা করা হয় না। কিন্তু ওজরের কারণে আগামী দিন পর্যন্ত বিলম্ব করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত হাদীসের কারণে ঐ মূলনীতিকে বর্জন করা হয়েছে। সুতরাং যেহেতু হাদীসের মধ্যে আগামী দিন পর্যন্ত বিলম্ব করার কথা বর্ণিত হয়েছে, এ জন্য শাওয়ালের দ্বিতীয় তারিখ পর্যন্ত ঈদের নামাজ বিলম্ব করার অনুমতি হবে। এরপর আর অনুমতি হবে না।

وَيُسْتَحَبُّ فِيْ يَوْمِ الْاَضْحٰى اَنْ يَغْتَسِلَ وَيَتَطَيَّبَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَ يُؤَخِّرُ الْاَكْلَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلٰوةِ لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لَايَطْعَمُ فِىْ يَوْمِ النَّحْرِ حَتّٰى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ اُضْحِيَّتِهٖ وَيَتَوَجَّهُ اِلَى الْمُصَلّٰى وَهُوَ يُكَبِّرُ لِاَنَّهٗ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الطَّرِيْقِ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ كَالْفِطْرِ كَذٰلِكَ نُقِلَ وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ لِاَنَّ ﷺ كَذٰلِكَ فَعَلَ وَيُعَلِّمُ النَّاسَ فِيْهِمَا الْاُضْحِيَةَ وَتَكْبِيْرَ التَّشْرِيْقِ لِاَنَّهٗ مَشْرُوْعُ الْوَقْتِ وَالْخُطْبَةُ مَا شُرِعَتْ اِلَّا لِتَعْلِيْمِهٖ -

অনুবাদ : ঈদুল আযহার দিনও গোসল করা এবং খুশবু ব্যবহার করা মোস্তাহাব। এর দলিল আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর নামাজ থেকে ফারিগ না হওয়া পর্যন্ত আহার বিলম্বিত করবে। কেননা হাদীসে আছে যে, নবী করীম ﷺ কুরবানির দিন (ঈদগাহ থেকে) ফিরে আসার আগে কিছু খেতেন না। এরপর আপন কুরবানির গোশত থেকে খেতেন। আর তাকবীর বলতে বলতে ঈদগাহে যাবে। কেননা নবী করীম ﷺ পথে তাকবীর বলতেন। আর ঈদুল ফিতরের মতো দুই রাকআত নামাজ আদায় করবে। (সাহাবায়ে কেরাম থেকে) এরূপ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর ইমাম দু'টি খুতবা দিবেন। কেননা নবী করীম ﷺ এরূপ করেছেন। তাতে লোকদেরকে কুরবানির (আহকাম) এবং তাকবীরে তাশরীক শিক্ষা দিবেন। কেননা এ হলো সেই সময়ের আহকাম, আর তা শিক্ষা দানের জন্যই খুতবার বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুরবানির ঈদের দিন গোসল করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করাও মোস্তাহাব। এর দলিল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং নামাজের পর আহার করা এবং নিজের কুরবানির গোশত থেকে খাওয়া এটাও সুন্নত। দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল। তিনি কুরবানির দিন ঈদের নামাজের পর আহার করতেন এবং নিজের কুরবানি থেকে খেতেন। যদি কেউ কুরবানি না করে সেও ঈদের নামাজের পূর্বে আহার করবে না। কারণ ঈদের পূর্বে না খাওয়া আলাদা সুন্নত। আর নিজের কুরবানি থেকে খাওয়া আলাদা সুন্নত। তবে এমন গ্রাম যেখানে ঈদের নামাজ ওয়াজিব হয় না সেখানকার লোকদের জন্য আগে আহার করাতেও কোন অসুবিধা নেই।

قَوْلُهٗ وَيَتَوَجَّهُ اِلَى الْمُصَلّٰى الخ : মাসআলা হলো ঈদাগাহে যাওয়ার সময় উচ্চ আওয়াজে তাকবীর বলবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও এমনটি করতেন। কুরবানির ঈদের নামাজও ঈদুল ফিতরের ন্যায় দুই রাকআত। সাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপই বর্ণিত রয়েছে। ইমাম নামাজের পর দু'টি খুতবা দিবেন। কেননা আল্লাহর রাসূল ﷺ ও এমনটিই করেছেন। ঐ দুই খুতবার মধ্যে লোকদেরকে কুরবানি এবং তাকবীরে তাশরীকের আহকাম শিক্ষা দিবেন। কেননা ঐ দিনগুলোতে এ জিনিসগুলোই প্রবর্তিত হয়েছে। আর খুতবা ঐ জিনিসগুলোর শিক্ষাদানের জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে।

فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْ يَوْمِ الْاَضْحٰى صَلَّاهَا مِنَ الْغَدِ وَ بَعْدَ الْغَدِ وَ لَايُصَلِّيْهَا بَعْدَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الصَّلٰوةَ مُوَقَّتَةٌ بِوَقْتِ الْاُضْحِيَةِ فَيُقَيَّدُ بِاَيَّامِهَا لٰكِنَّهُ مُسِيْءٌ فِى التَّاخِيْرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لِمُخَالَفَةِ الْمَنْقُوْلِ وَالتَّعْرِيْفُ الَّذِىْ يَصْنَعُهُ النَّاسُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ اَنْ يَجْمَعَ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِيْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ تَشْبِيْهًا بِالْوَاقِفِيْنَ بِعَرَفَةَ لِاَنَّ الْوُقُوْفَ عُرِفَ عِبَادَةً مُخْتَصَّةً بِمَكَانٍ مَخْصُوْصٍ فَلَايَكُوْنُ عِبَادَةً دُوْنَهُ كَسَائِرِ الْمَنَاسِكِ ـ

অনুবাদ : যদি কোনো ওজর বশত ঈদুল আযহার দিন নামাজ আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে পরের দিন এবং (সে দিন সম্ভব না হলে) তার পরের দিন নামাজ আদায় করবে। এরপরে তা আদায় করবে না। কেননা এ নামাজ কুরবানির সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং কুরবানির দিনগুলোর সাথেই তা সীমিত থাকবে। তবে বিনা ওজরে করলে বর্ণিত আমলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে গুনাহগার হবে। আর আরাফা পালন নামে মানুষ যা করে থাকে, তার কোনো (শরয়ী) ভিত্তি নেই। "আরাফা পালন" অর্থ আরাফা মাঠে অবস্থানকারীদের সাথে সাদৃশ্যের উদ্দেশ্যে আরাফা দিবসে (জিলহজের নয় তারিখে) কোনো স্থানে মানুষের সমবেত হওয়া। কেননা একটি নির্দিষ্ট স্থানে (আরাফায়) অবস্থান করাই ইবাদত রূপে স্বীকৃত হয়েছে, সুতরাং ঐ স্থান ছাড়া অন্যত্র তা ইবাদত (বলে গণ্য) হবে না। যেমন– হজের অন্যান্য আমল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি জিলহজের দশ তারিখে নামাজের প্রতিবন্ধক কোনো ওজর পাওয়া যায় তবে একাদশ তারিখে নামাজ আদায় করবে। যদি উক্ত তারিখেও ওজর এসে যায় তবে দ্বাদশ তারিখে ঈদের নামাজ আদায় করবে। আর যদি এ তারিখেও ওজর বিদ্যমান থাকে তবে এরপর আর বিলম্ব করার ইজাযত নেই। দলিল এই যে, কুরবানির ঈদের নামাজ কুরবানির সাথে সম্পৃক্ত। এ জন্য নামাজের ওয়াক্তও কুরবানির দিনগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হবে। সুতরাং কুরবানির তিনদিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সূর্য উদিত হওয়ার পর যাওয়াল পর্যন্ত ঈদের নামাজের সময় থাকে। আর যদি ওজর ছাড়া বিলম্ব করে তবুও নামাজ জায়েজ হবে। তবে ওজর ছাড়া বিলম্ব করার কারণে গুনাহগার হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে এ ধরনের বিলম্ব করার বর্ণনা নেই। উল্লেখ্য যে, এই নামাজ বিলম্ব সত্ত্বেও আদায় হবে কাজা হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা এটা তার সময়েই হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالتَّعْرِيْفُ الَّذِىْ الخ : "তা'রীফ তথা আরাফা পালন" অর্থ–আরাফার মাঠে অবস্থানকারীদের সাদৃশ্যতা অবলম্ব করা। অর্থাৎ আরাফার দিবসে লোকেরা কোনো মাঠে সমবেত হয়ে হাজীদের ন্যায় দোয়া করা, কাকুতি-মিনতি ইত্যাদি করা। কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, এটা এমন কোনো কিছু নয় যে, যার দ্বারা ছওয়াব হবে। কেননা আরাফায় অবস্থান একটি নির্দিষ্ট স্থান তথা আরাফার সাথে নির্দিষ্ট ইবাদত। এ জন্য আরাফার মাঠ ব্যতীত অন্যত্র অবস্থান করা কিভাবে ইবাদত বলে গণ্য হবে? যেমন– হজের অন্যান্য আমল অন্যত্র আদায় করা যায় না। কিফায়া গ্রন্থকার তো এ পর্যন্ত লিখেছেন যে, যদি বায়তুল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ঘরের তওয়াফ করা হয় তবে তার ব্যাপারে কুফরির আশংকা রয়েছে। এখন যদি বলা হয় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বসরায় এক মাঠের মধ্যে আরাফার দিন লোকদেরকে সমবেত করেছিলেন? তবে আমাদের পক্ষ থেকে জবাব এই যে, ইবনে আব্বাসের উক্ত আমল দোয়ার উদ্দেশ্যে ছিল, আরাফায় অবস্থানকারীদের সাথে সাদৃশ্যের উদ্দেশ্যে ছিল না। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।

فَصْلٌ فِيْ تَكْبِيْرَاتِ التَّشْرِيْقِ

وَيُبْدَأُ بِتَكْبِيْرِ التَّشْرِيْقِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَخْتِمُ عَقِيْبَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَقَالَا يَخْتِمُ عَقِيْبَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ مِنْ اٰخِرِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَاَخَذَا بِقَوْلِ عَلِيٍّ اَخْذًا بِالْاَكْثَرِ اِذْ هُوَ الْاِحْتِيَاطُ فِي الْعِبَادَاتِ وَاَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَخْذًا بِالْاَقَلِّ لِاَنَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيْرِ بِدْعَةٌ وَالتَّكْبِيْرُ اَنْ يَّقُوْلَ مَرَّةً وَاحِدَةً اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ هٰذَا هُوَ الْمَاثُوْرُ عَنِ الْخَلِيْلِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীরে তাশরীক

অনুবাদ : আরাফার দিনের ফজরের নামাজের পর থেকে তাকবীরে তাশরীক শুরু করবে এবং কুরবানির দিনের আসরের নামাজের পর তা শেষ করবে। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন (র.) বলেন, আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন আসরের নামাজের পর তা শেষ করবে। বিষয়টি সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাই সাহেবাইন (র.) হযরত আলী (রা.)-এর মত গ্রহণ করেছেন, দিনের সংখ্যাধিক্যের প্রেক্ষিতে। কেননা ইবাদতের ব্যাপারে এতেই সতর্কতা রয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিম্নতর সংখ্যার উপর আমল করার উদ্দেশ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মত গ্রহণ করেছেন। কেননা উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলার মধ্যে নতুনত্ব রয়েছে। (তাই নিশ্চিতের উপর আমল করা শ্রেয়)। আর তাকবীর এ ভাবে, একবার বলবে اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ কেননা হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম থেকে এরূপই বর্ণিত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তাশরীক খোদ তাকবীর। এখন অর্থ এই হবে যে, এ অনুচ্ছেদে ঐ সকল তাকবীরের বর্ণনা হবে যার নাম হলো তাশরীক। ইনায়া গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকবীরে তাশরীক যেহেতু কুরবানির দিনগুলোর সাথে খাস এ জন্য ভিন্ন অনুচ্ছেদে তা উল্লেখ করা হয়েছে। কিফায়া গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকবীর গুলোর ইযাফত বা সম্বোধন (اِضَافَتْ) তাশরীকের দিকে সাহেবাইনের মত অনুযায়ী জায়েজ আছে। কেননা তাঁদের মতে কোনো কোনো তাকবীর তাশরীকের দিনগুলো তথা একাদশ, দ্বাদশ এবং এয়োদশ তারীখেও হয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইয়াওমে নাহ্‌র তথা জিলহজের দশম তারিখ আসরের নামাজান্তে তা শেষ হয়ে যায়। অথচ আয়্যামে তাশারীকের শুরু জিলহজের একাদশ তারিখ থেকে হয়। যেমন ইনায়া গ্রন্থকার খোলাসার রেফারেন্সে উল্লেখ করেছেন যে, আয়্যামে নাহ্‌র তিন দিন আর আয়্যামে তাশারীকও তিন দিন। কেননা যিলহজ্বের দশম তারিখ নির্দিষ্টভাবে নাহ্‌রের দিন। আর এয়োদশ তারিখ নির্দিষ্টভাবে তাশরীকের দিন। একাদশ ও দ্বাদশ নাহ্‌র ও তাশরীক উভয়ের জন্য। সুতরাং তাকবীরাতে তাশরীকের শিরোনাম ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা কিভাবে সহীহ হবে? এর এক জওয়াব তো এই যে, জিলহজের দশ তারিখ যদিও ইয়াওমে নাহ্‌র ইয়াওমে তাশরীক নয়; কিন্তু ইয়াওমে

তাশরীক তথা জিলহজের একাদশ তারিখের কাছাকাছি (قريب)-এ কুরব (قرب)-এর কারণে তাশরীক-এর দিকে তাকবীর গুলোর ইযাফত করা হয়েছে। যেমন জামে সগীর গ্রন্থে রয়েছে। قَالَ يَعْقُوْبُ صَلَّيْتُ بِهِمُ الْمَغْرِبَ يَوْمَ عَرَفَةَ ইয়াকূব বলেন, আমি তাদেরকে আরাফার দিন মাগরিবের নামাজ পড়িয়েছি। অথচ সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই আরাফার দিন শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু মাগরিবের ওয়াক্ত আরাফার দিনের নিকটবর্তী (قرب) এ জন্য আরাফার দিন বলে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, তাশরীক দ্বারা মুরাদ হলো ঈদুল আযহার নামাজ। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, لَاذَبْحَ اِلَّا بَعْدَ التَّشْرِيْقِ অন্য হাদীসে রয়েছে , لَاجُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيْقَ اِلَّا فِىْ مِصْرٍ جَامِعٍ। উভয় হাদীসের মধ্যে তাশরীক দ্বারা মুরাদ হলো ঈদের নামাজ। সুতরাং এ সুরতে সকলের মতে ইযাফত সহীহ হবে। তবে তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব না সুন্নত? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলিম ওয়াজিব আর কিছু সংখ্যক আলিম সুন্নত বলেন। ওয়াজিব হওয়ার দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ আর সুন্নত হওয়ার দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বদা তা বলা এবং এর উপর مواظبت -এর সাথে আমল করা।

তাকবীরে তাশরীকের শুরু-শেষ নিয়ে যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের মতবিরোধ ছিল সেহেতু ইমামগণের মাঝেও মতবিরোধ রয়েছে। আকাবিরে সাহাবা যেমন– হযরত ওমর, হযরত আলী, ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, তাকবীরে তাশরীকের শুরু হবে আরাফার দিন অর্থাৎ জিলহজের নয় তারিখ থেকে তা শুরু হবে। উক্ত মতকে হানাফী আলিমগণ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন। সিগারে সাহাবা অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, তাকবীরে তাশরীকের শুরু কুরবানির ঈদের দিন জোহর থেকে হবে। তাকবীরে তাশরীকের শেষ সময়ের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আয়্যামে নাহ্‌রের প্রথম দিন অর্থাৎ জিলহজের দশ তারিখের আসরের নামাজ পর্যন্ত। অর্থাৎ জিলহজের দশ তারিখের আসরের নামাজের পর তাকবীর বলে শেষ করে দিবে। সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে মোট আট নামাজের পর তথা জিলহজের নয় তারিখ ফজর থেকে দশ তারিখ আসর পর্যন্ত তাকবীরে তাশরীক পড়া হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব। হযরত আলী (রা.) বলেন, তাকবীরে তাশরীক আয়্যামে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত পড়া হবে। অর্থাৎ জিলহজের ত্রয়োদশ তারিখের আসরের নামাজের পর শেষ করবে। সুতরাং হযরত আলী (রা.)-এর মতে মোট তেইশ নামাজের পর অর্থাৎ জিলহজের নয় তারিখ ফজরের পর থেকে ত্রয়োদশ তারিখ আসর পর্যন্ত পড়া হবে। এই মতটি সাহেবাইন (র.) গ্রহণ করেছে। সাহেবাইন (র.) আধিক্যকে গ্রহণ করতে গিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর মতের উপর আমল করেছেন। কেননা, তাকবীরও ইবাদত আর ইবাদতের মধ্যে সতর্কতা এখানেই যে অধিক্যকে গ্রহণ করা। ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিম্নতর সংখ্যা এ কারণে গ্রহণ করেছেন যে, উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা বিদ্‌আত। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ

হাদীসের মধ্যে এসেছে

رَأَى النَّبِىُّ ﷺ اَقْوَامًا يَرْفَعُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فَقَالَ اِنَّكُمْ لَنْ تَدْعُوْا اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا

রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গোত্রকে দেখলেন যারা দোয়ার সময় তাদের আওয়াজকে বুলন্দ করতো। তিনি বললেন, তোমরা কোনো বধির এবং অনুপস্থিত সত্যকে ডাকছ না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উদ্দেশ্য হলো 'আল্লাহ,' যাকে তোমরা ডাকছ তিনি বধিরও নন অনুপস্থিতও নন। বরং তিনি সর্বশ্রোতা, সব স্থানে বিদ্যমান। এ জন্য উচ্চ আওয়াজে তাকে ডাকার কোনোই প্রয়োজন নেই। উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, দোয়া আর জিকিরের মধ্যে আসল হলো গোপনীয়তা। জিহ্‌র তথা উচ্চ আওয়াজ হলো আসলের খেলাফ এবং বিদ'আত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল এই যে, তাকবীরের সূচনা এমন দিনে করা হয় যার মধ্যে হজের একটি রুকন তথা আরাফার অবস্থান আদায় করা হয় সুতরাং তার সমাপ্তিও এমন নাহ্‌রের দিনে করা উচিত হবে যার মধ্যে হজের দ্বিতীয় রুকন তথা তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করা হয়। তাহলে তাকবীরের শুরু ও শেষ বরাবর হবে। উল্লেখ্য যে, আমল ও ফাত্‌ওয়া হলো সাহেবাইনের মতের উপর।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত তাকবীরে তথা اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الخ একবার বলবে। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তিন, পাঁচ কিংবা সাতবার বলবে। এই তাকবীর গুলো সায়্যিদিনা হযরত ইব্রাহীম (আ.) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। এই বাক্যগুলোর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হলো এই যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) যখন আল্লাহর দরবারে কুরবানির জন্য স্বীয় কলিজার টুকরা হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে হাত-পা বেঁধে জমিনের উপর শুইয়ে দিলেন এবং ছুরি চালালেন। কিন্তু তার গলা কর্তিত হলো না। তখন হযরত জিবরাঈলের প্রতি নির্দেশ আসল যে, ইসমাঈলের স্থলে ঐ দুম্বা নিয়ে রেখে আসো যাকে হাবিল আল্লাহর সমীপে পেশ করার জন্য পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়েছিল এবং সেটি আল্লাহর দরবারে মাকবূল হয়ে অদ্যাবধি জান্নাতে বিচরণ করছে। জিব্রাঈল (আ.) যখন দেখলেন ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি করছেন তাই বললেন اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ইবরাহীম (আ.) গ্রীবা উত্তোলন করলেন, জিবরাঈলের আওয়াজকে শুনলেন, মনের অজান্তে মুখ থেকে বেরিয়ে আসল لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ যবীহুল্লাহ যখন তা জানলেন এবং পিতা মহোদয় এবং জিব্রাঈলের বাক্যগুলো শুনলেন, তখন আল্লাহর প্রশংসার জন্য তাঁর যবান খুলে গেল আর বলতে লাগলেন اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ এই বাক্যগুলো কিয়ামত অবধি এক সৎ ছেলে এবং আল্লাহর ইশকে মাতোয়ারা পিতার কথা স্মরণ করিয়ে যাবে। কুরআনে কারীম কতটুকুন প্রাঞ্জল এবং হৃদয় স্পর্শী ভাষায় ঘোষণা করছে,

وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ - رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ - فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ - وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰاِبْرٰهِيْمُ - قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ - اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ - وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ - وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ -

অর্থাৎ, সে বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করবেন; 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর।' অতঃপর আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহীম বলল, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবাই করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল?' সে বলল, 'হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পবেন।' যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করলেন, তখন আমি তাকে আহবান করে বললাম, 'হে ইবরাহীম! 'তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে!'–এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই তা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক কুরবানীর বিনিময়ে। আমি তা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।

وَهُوَ عَقِيْبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوْضَاتِ عَلَى الْمُقِيْمِيْنَ فِى الْاَمْصَارِ فِى الْجَمَاعَاتِ الْمُسْتَحَبَّةِ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ وَلَيْسَ عَلٰى جَمَاعَاتِ النِّسَاءِ اِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَلَا عَلٰى جَمَاعَةِ الْمُسَافِرِيْنَ اِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مُقِيْمٌ وَقَالَا هُوَ عَلٰى كُلِّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ لِاَنَّهُ تَبَعٌ لِلْمَكْتُوْبَةِ وَلَهُ مَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَالتَّشْرِيْقُ هُوَ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيْرِ كَذَا نُقِلَ عَنِ الْخَلِيْلِ بْنِ اَحْمَدَ وَلِاَنَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيْرِ خِلَافُ السُّنَّةِ وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِهِ عِنْدَ اِسْتِجْمَاعِ هٰذِهِ الشَّرَائِطِ اِلَّا اَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ اِذَا اقْتَدَيْنَ بِالرَّجُلِ وَعَلَى الْمُسَافِرِيْنَ عِنْدَ اِقْتِدَائِهِمْ بِالْمُقِيْمِ بِطَرِيْقِ التَّبْعِيَّةِ قَالَ يَعْقُوْبُ صَلَّيْتُ بِهِمُ الْمَغْرِبَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَهَوْتُ اَنْ اُكَبِّرَ فَكَبَّرَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ دَلَّ اَنَّ الْاِمَامَ وَاِنْ تَرَكَ التَّكْبِيْرَ لَا يَتْرُكُهُ الْمُقْتَدِىْ وَهٰذَا لِاَنَّهُ لَا يُؤَدِّىْ فِىْ حُرْمَةِ الصَّلٰوةِ فَلَمْ يَكُنِ الْاِمَامُ فِيْهِ حَتْمًا وَاِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ ـ

অনুবাদ : এই তাকবীরগুলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে শহরে মোস্তাহাব জামাআতে নামাজ আদায়কারী মুকীমদের উপর ফরজ নামাজ সমূহের পর (ওয়াজিব)। সুতরাং স্ত্রী লোকদের জামাআতের ক্ষেত্রে যেখানে কোনো পুরুষ নেই এবং মুসাফিরদের জামাআতের বেলায় যাদের সঙ্গে কোনো মুকীম নেই, সেখানে তা ওয়াজিব হবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, তা ওয়াজিব ফরজ নামাজ আদায়কারী প্রত্যেকের উপর। কেননা এ তাকবীর ফরজ নামাজের تابع (অনুগামী)। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো ইতপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস। তাশরীক অর্থ উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা। খলীল ইবনে আহমদ থেকে এটি বর্ণিত। তা ছাড়া উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা সুন্নতের খিলাফ। আর শরিয়তে এর প্রমাণ পাওয়া যায় উপরোক্ত শর্তসমূহ একত্রিত হওয়ার বেলায়। অবশ্য স্ত্রী লোকেরা পুরুষের পিছনে ইকতিদা করলে এবং মুসাফিরগণ মুকীমের পিছনে ইকতিদা করলে অনুগামী হিসাবে তাদের উপর উপরোক্ত তাকবীরে তাশরীকে ওয়াজিব হবে। ইমাম (আবূ ইউসুফ) ইয়াকূব (র.) বলেন, আরাফার দিবসে মাগরিবের নামাজে আমি ইমামতি করলাম এবং তাকবীর বলতে ভুলে গেলাম। তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাকবীর বললেন। এতে প্রামাণিত হয় যে, ইমাম তাকবীর তরক করলেও মুক্তাদী তা তরক করবে না। কেননা এটি নামাজের তাহরীমার মধ্যে আদায় করা হয় না। সুতরাং তাতে ইমাম অপরিহার্য নন; বরং ইমামের অনুসরণ মোস্তাহাব মাত্র।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর তাকবীর পড়া ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো, ঐ ব্যক্তি মুকীম হতে হবে, শহরের মধ্যে হতে হবে এবং মোস্তাহাব তরীকায় জামাআতের সাথে নামাজ আদায়কারী হতে হবে। ইমাম সাহেব (র.) عَقِيْبَ الْفَرْضِ (ফরজের পর)-এর قيد এ জন্য বৃদ্ধি করেছেন যে, যদি ফরজের পর অন্য কোনো

আমল পাওয়া যায় যেমন মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল কিংবা কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে গেল, তবে এ ব্যক্তি তাকবীর বলবে না। مفروضات-এর قيد দ্বারা জানাযার নামাজ, বিত্‌রও ঈদের নামাজ এবং নফল বের হয়ে গেছে অর্থাৎ এ নামাজগুলোর পর তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব নয়। مقيمين-এর قيد দ্বারা মুসাফির বের হযে গেছে। কেননা মুসাফিরের উপর তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব নয়। في الامصار-এর قيد দ্বারা গ্রামের মধ্যে তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব না হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেল। جماعت-এর قيد দ্বারা মুনফারিদ বের হয়ে গেল। مستحبة-এর قيد দ্বারা শুধুমাত্র স্ত্রীলোকদের জামাআতে নামাজ পড়া বের হয়ে গেল। অর্থাৎ যদি শুধু স্ত্রীলোকেরা জামাআত করে তবে তাদের উপর উপরোক্ত তাকবীর ওয়াজিব নয়। তবে স্ত্রীলোকদের ইমাম যদি পুরুষ হয় এবং মুসাফিরদের ইমাম মুকীম হয়, তবে ঐ স্ত্রীলোক ও মুসাফিরদের উপরও তাকবীর ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির উপর তাকবীর ওয়াজিব হবে যে ফরজ নামাজ আদায় করে। সে গ্রাম্য লোক হোক বা শহরী হোক, মুসাফির হোক বা মুকীম হোক, জামাআতের সাথে নামাজ আদায়কারী হোক বা মুনফারিদ হোক, পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক হোক। এটা ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফি'ঈ (র.) এরও অভিমত। তাঁদের দলিল এই যে, তাকবীর ফরজ নামাজের তাবে বা অনুগামী। সুতরাং যে ফরজ নামাজ পড়বে সে-ই তাকবীর পড়বে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল ঐ হাদীস যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيْقَ وَلَا فِطْرَ وَلَا أَضْحٰى إِلَّا فِيْ مِصْرٍ جَامِعٍ উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতিভাত হল যে, তাকবীরে তাশরীকের জন্য শহর হওয়ার শর্ত। বিশিষ্ট ভাষাবিদ খলীল ইবনে আহমদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাশরীক বলা হয় উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলাকে। দ্বিতীয় দলিল এই যে, উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা সুন্নতের খিলাফ অর্থাৎ বিদ'আত। তবে কিছু স্থানে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলাকে শরিয়ত বাদ (استثناء) দিয়েছে। শরিয়তে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলার অনুমতি ঐ সকল সুরতে প্রদান করেছে যেখানে এ সকল শর্ত একত্রিত হয়। অর্থাৎ শহর হওয়া, মোস্তাহাব তরীকায় জামাআত হওয়া, মুকীম হওয়া ইত্যাদি। হ্যাঁ, যদি স্ত্রীলোকেরা কোনো পুরুষের ইক্‌তিদা করে কিংবা মুসাফির মুকীমের ইক্‌তিদা করে তবে স্ত্রীলোক ও মুসাফিরদেরও উপরোক্ত তাকবীর বলা ওয়াজিব হবে। এ ওয়াজিব হলো অনুগামী হিসাবে। অর্থাৎ ইমাম যিনি মাতবূ' (যার আনুগত্য করা হয়) যেহেতু তার উপর তাকবীর ওয়াজিব সেহেতু যিনি তাঁর তাবে তথা অনুগামী হবে তার উপরও তাকবীর ওয়াজিব হবে। যেমন মুকীমের ইকতিদা করার কারণে মুসাফিরের উপর চার রাকআত নামাজ আদায় করা জরুরি হয়ে যায়।

হিদায়া গ্রন্থকার এখানে একটি ঘটনা উল্লেখপূর্বক আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে, যদি ইমাম তাকবীর বলতে ভুলে যায় তবে মুক্তাদীরা তাকবীর ছাড়বে না; বরং উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলে ইমামকেও অবহিত করবে। এর বিপরীতে ইমাম যদি সিজদায়ে সাহ্‌ব ছেড়ে দেয় তবে মুক্তাদীও তা ছেড়ে দিবে। কারণ হলো, সিজদায়ে সাহ্‌ব নামাজের মাঝখানে আদায় করা হয় এ জন্য সিজদায়ে সাহ্‌ব করা না করার বেলায় ইমামের অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক। আর তাকবীর নামাজের মাঝখানে আদায় করা হয় না; বরং নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর পড়া হয়। এ জন্য তাকবীর বলার সময় ইমামের বিদ্যমান থাকা ওয়াজিব নয় বরং মোস্তাহাব। সুতরাং ইমাম যদি তাকবীর না-ও বলে তবুও মুক্তাদীগণ বলবে। ঘটনাটি হলো ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) (ইয়াকূব) বলেন, একবার আমি লোকদেরকে আরাফার দিন মাগরিবের নামাজ পড়াই। ঘটনাক্রমে আমি তাকবীরে তাশরীক বলতে ভুলে যাই। তখন আমার শিক্ষক মহোদয় ইমাম আবূ হানীফা (র.) পেছন থেকে তাকবীর বলে আমাকে সতর্ক করে দিলেন, তখন আমিও তাকবীর বললাম। উক্ত ঘটনাটি দ্বারা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মর্যাদা বুঝে আসে। ইমাম সাহেব (র.) তাঁকে ইমাম বানিয়েছেন এবং তাঁর পেছনে ইকতিদা করেছেন।

بَابُ صَلٰوةِ الْكُسُوفِ

قَالَ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ كَهَيْأَةِ النَّافِلَةِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوْعٌ وَاحِدٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) رُكُوْعَانِ لَهٗ مَارَوَتْ عَائِشَةُ وَلَنَا رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ وَالْحَالُ اَكْشَفُ عَلَى الرِّجَالِ لِقُرْبِهِمْ فَكَانَ التَّرْجِيْحُ لِرِوَايَتِهٖ ـ

পরিচ্ছেদ : সালাতুল কুসূফ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন সূর্যগ্রহণ লাগে তখন ইমাম নফলের অনুরূপ দু'রাক্আত নামাজ আদায় করবেন। প্রতি রাক্আতে একটি রুকূই হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, (প্রতি রাক্আতে) দু'টি রুকূ হবে। তাঁর দলিল হলো হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। আমাদের দলিল হলো ইবনে ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। আর যেহেতু (ইমামের সঙ্গে) নৈকট্যের কারণে বিষয়টি পুরুষদের কাছেই অধিকতর স্পষ্ট সেহেতু ইবনে ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অগ্রকথা : ঈদের নামাজ, কুসূফের নামাজ এবং ইস্তিস্কার নামাজের মধ্যকার সম্পর্ক (مناسبت) এই যে, উক্ত তিন নামাজ দিনের মধ্যে আযান ও ইকামত ছাড়া আদায় করা হয়। তবে এগুলোর মধ্যে ঈদের নামাজ যেহেতু ওয়াজিব আর কুসূফের নামাজ জমহুরের মতে সুন্নত আর ইসতিসকার নামাজ সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধপূর্ণ এ জন্য প্রথমে ঈদ, তারপর কুসূফ এবং তারপর ইসতিস্কার নামাজের আলোচনা করা হয়েছে। কুসূফ-এর অর্থ সূর্য কিছুটা কালো বর্ণের প্রতি ধাবিত হওয়া। অর্থাৎ কৃষ্ণ আচ্ছাদিত হওয়া। এর মধ্যে একটি লুগাত (ব্যবহার-বিধি) খুসূফও রয়েছে। ইমাম মুনযিরী (র.) বলেন, কুসূফ-এর হাদীস উনিশজন রাবী দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ كاف -এর সাথে كسوف আর কেউ কেউ خاء -এর সাথে خسوف বলেছেন। বুঝা গেল শব্দ দু'টি সমার্থবোধক (مرادف)। কিংবা كسوف শুধু সূর্যের সাথে খাস আর خسوف চন্দ্র সূর্য উভয়টির ক্ষেত্রে ব্যাপক। কেউ কেউ বলেছেন, সূর্য গ্রহণের বেলায় كسوف আর চন্দ্র গ্রহণের বেলায় خسوف বলা হয়। এটা হলো ফকীহগণের পরিভাষা। এর সমর্থন আল্লাহ তা'আলার বাণী فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ আয়াতেও বিদ্যমান আছে। কুসূফের নামাজের সবব বা কারণ কুসূফ তথা সূর্য গ্রহণ। তার জন্য ঐ সকল শর্ত প্রযোজ্য যা অন্যান্য নামাজের জন্য প্রযোজ্য। কুসূফের নামাজ প্রবর্তিত হওয়ার ব্যাপারে পুরো উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে, কেউ তা অস্বীকার করেননি।

মাসআলা : যদি সূর্য গ্রহণ লেগে যায়, তবে জুমার ইমাম সাহেব জামে মসজিদ কিংবা ঈদগাহে গিয়ে লোকদেরকে নফলের অনুরূপ দুই রাক্আত নামাজ আদায় করবেন। অর্থাৎ যেমনিভাবে নফল নামাজ আযান ও ইকামত ছাড়া আদায় করা হয় এমনিভাবে কুসূফের নামাজও আযান ও ইকামত ছাড়া আদায় করবেন। এক রাক্আতে একটি মাত্র রুকূ হবে। ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফি'ঈ (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.) বলেন, কুসূফের এক রাক্আতের মধ্যে দুই রুকূ হবে। তাঁদের দলিল হলো হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। হাদীসটির শব্দাবলি হলো,

قَالَتْ خُسِفَتِ الشَّمْسُ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهٗ فَكَبَّرَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً

طَوِيْلَةً هِيَ اَدْنٰى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ وَفَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ فَاسْتَكْمَلَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِاَرْبَعِ سَجْدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهٗ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهٖ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ -

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় একবার সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। তিনি মসজিদে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং দাঁড়িয়ে পিছনের লোকদেরকে কাতারবন্দী করলেন। তারপর তাকবীরে তাহরীমা বলে দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন। অতঃপর তাকবীর বলে লম্বা রুকূ করলেন। তারপর রুকূ থেকে মাথা উঠালেন এবং সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ বললেন। তারপর তিনি দাড়ালেন এবং দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন, তবে এই কিরাআত প্রথম কিরাআতের তুলনায় ছোট ছিল। তারপর তাকবীর বলে দীর্ঘ রুকূ করলেন। তবে এই রুকূ পূর্বের রুকুর তুলনায় সংক্ষিপ্ত ছিল। অতঃপর তিনি সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ বলে মাথা উঠালেন। তারপর সিজ্‌দা করলেন এবং দ্বিতীয় রাক্‌আতেও একই আমল করলেন। সুতরাং তিনি চার রাক্‌আত (রুকূ) চার সিজদার সাথে পূর্ণ করলেন। তাঁর নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পূর্বের সূর্য পরিষ্কার হয়ে যায়। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে লোকদেরকে খুতবা শুনালেন এবং আল্লাহ তা'আলার শান অনুযায়ী হাম্‌দ ছানা করে ইরশাদ করেন যে, চন্দ্র সূর্য আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলির থেকে দু'টো নিদর্শন। কারো হায়াত-মওতের কারণে গ্রহণ লাগে না। তাই তোমরা যখন তা দেখবে তখন নামাজের দিকে দৌড়িয়ে যাবে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুসূফের নামাজের মধ্যে এক রাক্‌আতে দুই সিজ্‌দা করেছেন। আমাদের দলিল আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস–

قَالَ اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ وَفَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ -

রাসূলুল্লাহ ﷺ জমানায় একবার সূর্য গ্রহণ লাগে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এত দীর্ঘ সময় দাঁড়ালেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি রুকূ করবেন না। অতঃপর তিনি এ পরিমাণ সময় রুকূ করলেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি মাথা উঠাবেন না। অতঃপর মাথা উঠালেন। মনে হচ্ছিল যে, তিনি সিজদায় যাবেন না। অতঃপর তিনি সিজ্‌দায় গেলেন। মনে হচ্ছিল যে, তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন না। তারপর তিনি মাথা উঠালেন। দ্বিতীয় সিজদা করার সম্ভাবনা মনে হচ্ছিল না। তারপর তিনি সিজদা করলেন। মনে হচ্ছিল যে, তিনি মাথা উঠাবেন না, কিন্তু তিনি মাথা উঠালেন। একই আমল তিনি দ্বিতীয় রাকআতেও করলেন। উক্ত হাদীস দ্বারা এ কথা প্রতিভাত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাক্‌আতে একটি মাত্র রুকূ আদায় করেছেন, যদিও রুকূ ও সিজদা অনেক দীর্ঘ ছিল।

এখন আয়েশা (রা.)-এর হাদীস আর আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইব্‌নুল আস (রা.)-এর হাদীস পরস্পর বিরোধী হয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)-এর হাদীসের অগ্রাধিকার হবে। কেননা পুরুষ যেহেতু ইমামের অধিক নিকটে তাই তার কাছে ইমামের অবস্থা বেশি প্রকাশিত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) হযরত আয়শা (রা.) -এর হাদীসের এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্ভবত অনেক দীর্ঘ রুকূ' করেছেন। যার কারণে প্রথম কাতারের লোকেরা ধারণা করে রুকূ থেকে মাথা উত্তোলন করে ফেলে ছিলেন। পরে যারা প্রথম কাতারের পিছনে ছিল তারাও তাদেরকে দেখে মাথা উঠিয়ে নেন। অতঃপর প্রথম কাতারের লোকেরা যখন দেখল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো এখনো রুকূতে আছেন তখন তারা আবার রুকূতে চলে গেলেন। এবং যারা তাদের পিছনে ছিলেন তারাও দ্বিতীয়বার রুকূতে চলে যান। এখন প্রথম কাতারের পিছনের লোকেরা ভাবলেন যে, তিনি দুই বার রুকূ করেছেন–এটাকেই তারা রিওয়ায়াত করতে শুরু করে দেন। এর দ্বারা সহজেই বুঝে আসে যে, হযরত আয়েশা (রা.) তো একেবারেই কাতারের পিছনে মহিলাদের কাতারে ছিলেন। সুতরাং বিষয়টি তাঁর নিকট অস্পষ্ট (مشتبه) হওয়া একেবারেই সাধারণ ব্যাপার। তাই হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস কিভাবে দলিল হতে পারে?

وَيُطَوِّلُ الْقِرَاءَةَ فِيْهِمَا وَيُخْفِى عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا يَجْهَرُ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) مِثْلُ قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اَمَّا التَّطْوِيْلُ فِى الْقِرَاءَةِ فَبَيَانُ الْاَفْضَلِ وَيُخَفِّفُ اِنْ شَاءَ لِاَنَّ الْمَسْنُوْنَ اِسْتِيْعَابُ الْوَقْتِ بِالصَّلٰوةِ وَالدُّعَاءِ فَاِذَا خَفَّفَ اَحَدَهُمَا طَوَّلَ الْاٰخَرَ وَاَمَّا الْاِخْفَاءُ وَالْجَهْرُ فَلَهُمَا رِوَايَةُ عَائِشَةَ اَنَّهُ ﷺ جَهَرَ فِيْهَا وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَالتَّرْجِيْحُ قَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ كَيْفَ وَاِنَّهَا صَلٰوةُ النَّهَارِ وَهِىَ عَجْمَاءُ.

অনুবাদ : উভয় রাকআতে (ইমাম) কিরাআত দীর্ঘ করবেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে (ইমাম) নীরবে কিরাআত পড়বেন। আর সাহেবাইনের মতে উচ্চৈঃস্বরে পড়বেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুরূপ মত বর্ণিত রয়েছে। কিরাআত দীর্ঘ হওয়ার বক্তব্যটি উত্তম হিসাবে গণ্য। সুতরাং ইচ্ছা করলে ইমাম কিরাআত সংক্ষিপ্তও করতে পারেন। কেননা, সুন্নত হলো গ্রহণের সময়টিকে নামাজ ও দোয়ার দ্বারা পরি ব্যাপ্ত রাখা। সুতরাং একটিকে সংক্ষিপ্ত করলে অন্যটিকে দীর্ঘ করবে। (তবে) নীরবে এবং উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়ার যে কথা বলা হয়েছে এ ক্ষেত্রে সাহেবাইনের দলিল হলো হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়েছেন। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, হযরত ইবনে আব্বাস ও সামূরা ইবনে জুন্দুব (রা.)-এর রিওয়ায়াত। আর অগ্রাধিকার প্রদানের কারণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর কেন হবে না? এটাতো দিনের নামাজ। আর দিনের নামাজ হলো নিঃশব্দ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কুসূফের উভয় রাক্আতে দীর্ঘ কিরাআত পড়বে। যেমন, কোনো কোনো হাদীসের মধ্যে প্রথম রাক্আত সূরায়ে আলে ইমরানের সমপরিমাণ পড়ার বর্ণিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে যে, কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পড়বে না নীরবে পড়বে? ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, কুসূফের নামাজে কিরাআত নীরবে পড়বে। এরই প্রবক্তা ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফি'ঈ (র.) এবং জমহুরে ফুকাহা। সাহেবাইন (র.) বলেন, উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়বে। এটা ইমাম আহমদ (র.)-এরও মত। ইমাম তাহাবী (র.)ও এটাকে গ্রহণ করেছেন। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর একটি বর্ণনা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুরূপ রয়েছে। এ সুরতে তরফাইন তথা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) নীরবে কিরাআত পড়ার পক্ষে হলেন। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়ার পক্ষে থাকলেন। মোটকথা, এখানে দু'টি জিনিস রয়েছে– এক. দীর্ঘ কিরাআত পড়া দুই. কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে বা নীরবে পড়া। কিরাআত দীর্ঘ পড়াতো উত্তম। কেননা এ কথা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম রাকআতে সূরায়ে বাকারার সমপরিমাণ আর দ্বিতীয় রাক্আতে সূরায়ে আলে ইমরানের সমপরিমাণ দাঁড়াতেন। সুতরাং দীর্ঘ কিরাআত পড়ার দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণ হয়। ইচ্ছা করলে (ইমাম) কিরাআত সংক্ষিপ্তও করতে পারবেন। কেননা সুন্নত তো হলো গ্রহণের সময়টিকে নামাজ ও দোয়া দ্বারা পরিপূর্ণ করে রাখা। সুতরাং একটিকে যদি সংক্ষেপ করা হয় তখন অন্যটিকে দীর্ঘ করবে।

আল্লামা ইবনে আয়হাস (র.) বলেন,

وَالْحَقُّ اَنَّ السُّنَّةَ التَّطْوِيْلُ وَالْمَنْدُوْبُ مُجَرَّدُ اِسْتِيْعَابِ الْوَقْتِ .

প্রকৃত হক হলো, কিরাআত দীর্ঘ করা সুন্নত আর কুসূফের সময়টিকে পরিপূর্ণ করে রাখা মোস্তাহাব। যেমন– হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (র.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهَا فَادْعُوا اللّٰهَ وَصَلُّوْا حَتّٰى تَنْجَلِىَ .

অতঃপর তোমরা যখন তা দেখবে (কুসূফ ইত্যাদিকে) তবে আল্লাহর নিকট দোয়া করবে এবং নামাজ পড়বে যাতে সূর্য পরিষ্কার হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের মধ্যে সূর্য পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত নামাজকে দীর্ঘ করতে বলা হয়েছে আর এটা তখনই হবে যখন কিরাআত দীর্ঘ করা হবে। সুতরাং বুঝা গেল কিরাআত দীর্ঘ করা সুন্নত।

উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়ার ব্যাপারে সাহেবাইন কিংবা শুধু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো হযরত আয়শা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস–

قَالَتْ جَهَرَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ صَلٰوةِ الْخُسُوْفِ بِقِرَاءَتِهٖ .

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুসূফের নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) কিংবা তরফাইন (র.)-এর দলিল হলো হযরত ইবনে আব্বাস এবং সামুরা ইব্‌নে জুন্‌দুব (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসদ্বয়। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসের শব্দাবলি হলো,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اَلْكُسُوْفَ فَلَمْ اَسْمَعْ مِنْهُ حَرْفًا مِنَ الْقِرَاءَةِ .

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কুসূফের নামাজ পড়েছি কিন্তু আমি তাঁর কিরাআত থেকে একটি অক্ষরও শুনিনি। এ হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস হলো সামুরা ইবনে জুন্‌দুব (রা.)-এর হাদীস

صَلّٰى بِنَا فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ لَانَسْمَعُ بِهٖ صَوْتًا .

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে কুসূফের নামাজ পড়িয়েছেন আমরা তাঁর কিরাআতের কোনো শব্দ শুনিনি। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) উচ্চৈঃস্বরে ও নীরবে কিরাআত পড়ার বিরোধপূর্ণ হাদীসদ্বয়ের সমাধান এভাবে করেছেন যে, ইবনে আব্বাস এবং সামূরা ইবনে জুন্‌দুব (রা.)-এর হাদীসের অগ্রাধিকার হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের উপর রয়েছে। আর অগ্রাধিকারের কারণ হলো, নামাজের মধ্যে পুরুষ যেহেতু ইমামের নিকটবর্তী (قريب) এ জন্য স্ত্রীলোকদের তুলনায় তাদের অবস্থা তাদের নিকট অধিক স্পষ্ট হবে। তাই ইমামের নামাজের প্রকৃত অবস্থা এবং কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে আর নীরবে পড়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের কথাই অগ্রাধিকার যোগ্য হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ইমাম সাহেবের মাযহাবকে অধিক শক্তিশালী করার জন্য দৃঢ়তার সাথে বলছেন যে, কুসূফের নামাজের মধ্যে নীরবে কিরাআত কিভাবে হবে না? অথচ কুসূফের নামাজ দিনের নামাজ। আর দিনের নামাজের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, صَلٰوةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ দিনের নামাজ বোবা অর্থাৎ দিনের নামাজগুলোর মধ্যে কিরাআত নিঃশব্দে পড়া হবে, সশব্দে পড়া হবে না।

وَيَدْعُوْ بَعْدَهَا حَتّٰى تَنْجَلِىَ الشَّمْسُ لِقَوْلِهٖ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ هٰذِهِ الْاَفْزَاعِ شَيْئًا فَارْغَبُوْا إِلَى اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ وَ السُّنَّةُ فِى الْاَدْعِيَةِ تَاخِيْرُهَا عَنِ الصَّلٰوةِ وَيُصَلِّىْ بِهِمُ الْاِمَامُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ بِهِمُ الْجُمُعَةَ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ صَلَّى النَّاسُ فُرَادٰى تَحَرُّزًا عَنِ الْفِتْنَةِ وَلَيْسَ فِىْ خُسُوْفِ الْقَمَرِ جَمَاعَةٌ لِتَعَذُّرِ الْاِجْتِمَاعِ فِى اللَّيْلِ أَوْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ وَإِنَّمَا يُصَلِّىْ كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهٖ لِقَوْلِهٖ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ الْاَهْوَالِ فَافْزَعُوْا إِلَى الصَّلٰوةِ وَلَيْسَ فِى الْكُسُوْفِ خُطْبَةٌ لِاَنَّهٗ لَمْ يُنْقَلْ.

অনুবাদ ঃ নামাজের পর সূর্য গ্রহণ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত দোয়া করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমরা এ ধরনের ভয়াবহ কোনো অবস্থা দেখতে পাবে, তখন তোমরা দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ অভিমুখী হবে। আর দোয়াসমূহের ক্ষেত্রে সুন্নত হল তা নামাজের পরে হওয়া। যে ইমাম জুমার নামাজ পড়ান, তিনিই কুসূফের নামাজ পড়াবেন। তিনি উপস্থিত না থাকলে লোকেরা একা একা নামাজ আদায় করবে। (ইমামতির জন্য কে অগ্রবর্তী হবে, এই) ফিত্না হতে বাঁচার জন্য। চন্দ্র গ্রহণের ক্ষেত্রে জামাআত নেই। কেননা রাত্রিকালে সমবেত হওয়া কষ্টকর। কিংবা ফিতনা সৃষ্টির আশংকা রয়েছে। তাই প্রত্যেকে একা একা নামাজ আদায় করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমরা এ ধরনের ভয়ংকর কিছু দেখতে পাবে তখন তোমরা নামাজের আশ্রয় গ্রহণ করবে। সূর্য গ্রহণের নামাজে কোনো খুতবা নেই। কেননা তা হাদীসে বর্ণিত হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(গ্রন্থকার বলেন,) কুসূফের নামাজ আদায়ের পর সূর্য গ্রহণ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত দোয়া করবে। কিবলামুখী হয়ে বসে দোয়া করবে। কিংবা দাড়িয়ে করবে। কিংবা লোকদের দিকে মুখ করে দোয়া করবে। লোকেরা কিবলামুখী হয়ে বসে থাকবে আর ইমামের দোয়ার সময় আমীন আমীন বলতে থাকবে। দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিম্নোক্ত বাণী–

إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ هٰذِهِ الْاَفْزَاعِ شَيْئًا فَارْغَبُوْا إِلَى اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ

গ্রন্থকার (র.) বলেন, দোয়াসমূহের মধ্যে সুন্নত হলো নামাজের পরে হওয়া। হযরত আবূ উমামা সূত্রে বর্ণিত আছে যে,

قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِيْرُ وَ دُبُرُ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন ধরনের দোয়া অধিক মাকবূল হয়ে থাকে? তিনি বলেন, রাতের শেষ মধ্যভাগের আর ফরজ নামাজের পরের দোয়া। উক্ত হাদীস দ্বারা শুধু ফরজ নামাজের পরের দোয়া সুন্নত বলে প্রমাণিত হলো। তা ছাড়া হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাজের পর দোয়া করতেন।

قَوْلُهٗ وَيُصَلِّىْ بِهِمُ الْاِمَامُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ بِهِمُ الْجُمُعَةَ الخ : উক্ত ইবারতের মাসআলা হলো, কুসূফের নামাজে ঐ ব্যক্তিকে ইমাম বানানো হবে যিনি লোকদেরকে জুমা এবং ঈদাইনের নামাজ পড়ান। আর যদি জুমার ইমাম উপস্থিত না থাকেন তবে লোকেরা একাকী নামাজ আদায় করবে। কেননা এতে ফিত্নার সম্ভাবনা নেই। তবে জামাআতের সুরতে ফিত্নার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, কেননা প্রত্যেকেই তখন ইমাম হতে চাইবে কিংবা নিজেদের চাহিদা মুতাবিক ইমাম বানাতে চাইবে। এ জন্য এ অবস্থায় উত্তম এটাই যে, একা একা কুসূফের নামাজ আদায় করবে।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِىْ خُسُوْفِ الْقَمَرِ الخ : মাসআলা : চন্দ্র গ্রহণের সময় নামাজের কোনো জামাআত নেই। কেননা প্রথমত রাত্রিকালে লোকদেরকে একত্রিত করা কষ্টকর। দ্বিতীয়তঃ রাতে ফিতনার আশংকা রয়েছে। তাই প্রত্যেক লোক একা একা নামাজ আদায় করবে। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী–

إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ الْاَهْوَالِ فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ ـ

দলিল এভাবে যে, হাদীসের মধ্যে জামাআতের কোনো কথা উল্লেখ নেই। আর আসল হলো জামাআত না হওয়া। এ জন্য বলা হয়েছে যে, চন্দ্র গ্রহণের মধ্যে কোনো জামাআত নেই। এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ -এর মধ্যে امر -এর সীগাহ ব্যবহৃত হয়েছে। আর امر ওয়াজিব হওয়াকে চায়। তাই চন্দ্র গ্রহণের নামাজকে ওয়াজিব বলা সমীচীন হবে? এর জওয়াব এই যে, চন্দ্র গ্রহণের নামাজ যেহেতু ইসলামে ফরজ ও ওয়াজিব সমূহের মধ্যে নয় বরং তা গ্রহণের কারণে পড়া হয় এ জন্য চন্দ্র গ্রহণের নামাজ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়েছেন তাই সুন্নত হবে। আর হাদীসের মধ্যে امر -এর সীগাহ ندب তথা মোস্তাহাবের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, উজূবের জন্য নয়।

ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র.) বলেন, কুসূফ ও খুসূকের নামাজের মধ্যে কোনো খুতবা নেই। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, সালামের পর দুই ঈদের মতো দু'টি খুতবা রয়েছে। দলিলের ক্ষেত্রে তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস পেশ করেছেন যে,

اِنَّهَا قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ـ

আমাদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব এই যে, খুত্‌বা দু'টি জিনিসের একটির জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। হয়তো খুতবা নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত। যেমন জুমার মধ্যে। কিংবা আহকামের তালীম দেওয়ার জন্যে যেমন দুই ঈদের নামাজের মধ্যে। কুসূফের নামাজের মধ্যে এই দুইটির একটিও নেই। তাই কুসূফের নামাজের জন্য খুতবা হবে না। হযরত আয়শা (রা.)-এর হাদীসের জওয়াব এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানায় সূর্য গ্রহণ কারণে লোকদের এ ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, এই আকস্মিক দুর্ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কলিজার টুকরা হযরত ইব্‌রাহীমের বিয়োগের কারণে সংঘটিত হয়েছে। তাই কুসূফের নামাজের পর খুতবা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত ধারণাকে দূরীভূত করলেন। আর বললেন

اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَايَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهٖ ـ

চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনাবলির দু'টো নিদর্শন, কারো জীবন মরণের কারণে গ্রহণ হয় না। কিফায়া গ্রন্থকার বলেন, হযরত আয়শা (রা.)-এর কথা خطب -এর অর্থ হলো দোয়া। কেননা দোয়াকেও খুত্‌বা বলা হয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, খুতবার হাদীস প্রসিদ্ধির সাথে বর্ণিত নয় তাই হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দলিল হিসাবে যোগ্য হবে না।

بَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَيْسَ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ صَلٰوةٌ مَسْنُوْنَةٌ فِىْ جَمَاعَةٍ فَاِنْ صَلَّى النَّاسُ وُحْدَانًا جَازَ وَاِنَّمَا الْاِسْتِسْقَاءُ اَلدُّعَاءُ وَالْاِسْتِغْفَارُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا (الاية) وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَسْقٰى وَلَمْ تُرْوَ عَنْهُ الصَّلٰوةُ وَقَالَا يُصَلِّى الْاِمَامُ رَكْعَتَيْنِ لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ كَصَلٰوةِ الْعِيْدِ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) قُلْنَا فَعَلَهٗ مَرَّةً وَتَرَكَهٗ اُخْرٰى فَلَمْ يَكُنْ سُنَّةً وَقَدْ ذُكِرَ فِى الْاَصْلِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَحْدَهٗ وَيَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ اِعْتِبَارًا بِصَلٰوةِ الْعِيْدِ ثُمَّ يَخْطُبُ لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَ ثُمَّ هِىَ كَخُطْبَةِ الْعِيْدِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا خُطْبَةَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ لِاَنَّهَا تَبَعٌ لِلْجَمَاعَةِ وَلَا جَمَاعَةَ عِنْدَهٗ ـ

পরিচ্ছেদ ঃ ইস্‌তিস্‌কা-এর নামাজ

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, ইস্‌তিস্‌কা-এর জন্য জামাআতসহ নামাজ আদায় করা সুন্নত নয়। লোকেরা যদি একা একা নামাজ পড়ে নেয় তবে তাও জায়েজ। আসলে ইসতিস্‌কা হলো দোয়া ও ইস্‌তিগ্‌ফার। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন তখন আমি বললাম, তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা চাও। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্‌তিস্‌কা করেছেন, কিন্তু তাঁর থেকে নামাজ আদায় করা বর্ণিত হয়নি। সাহেবাইন (র.) বলেন, ইমাম দুই রাক্‌আত নামাজ আদায় করবেন। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ দুই রাকআত ইসতিসকার নামাজ আদায় করেছেন ঈদের নামাজের মতো। ইবনে আব্বাস (রা.) এ কথা বর্ণনা করেছেন। আমাদের বক্তব্য হলো, তিনি একবার নামাজ আদায় করেছেন, আবার কখনো পড়েননি। সুতরাং এটি সুন্নত নয়। মাবসূত কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতামত একাকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় রাক্‌আতে কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পড়বে, ঈদের নামাজের উপর কিয়াস করে। অতঃপর (ইমাম) খুত্‌বা দিবেন। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ খুতবা দিয়েছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা হবে ঈদের খুতবার মতো। (দুই খুতবা বিশিষ্ট) আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে খুত্‌বা একটিই। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে (ইস্‌তিস্‌কার জন্য) কোনো খুতবা নেই। কেননা খুতবা হলো জামাআতের অনুগামী। আর তাঁর মতে (ইসতিসকার নামাজে) জামাআত নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : গ্রন্থকার (র.) بَابُ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ বলেননি। যেমনটি তিনি পিছনের باب গুলোতে বলেছেন কারণ হলো, ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর মতে এর মধ্যে নামাজ সুন্নত নয়। এজন্য শিরোনামে صلوة শব্দ ব্যবহার করেননি। ইস্‌তিসকা অর্থ হলো– পানি, চাওয়া। উল্লেখ্য যে, ইস্‌তিস্‌কা এমন স্থানে হয় যেখানে নদ-নদী, খাল-বিল এবং কূপ ইত্যাদি না থাকে– যার থেকে নিজে পানি পান করবে কিংবা পশু-পাখিকে পানি পান করাবে। কিংবা এগুলো থাকবে তবে তাদের প্রয়োজন অনুপাতে যথেষ্ট হবে না। কেননা এ সকল জিনিস যদি যথেষ্ট পরিমাণ থাকে তবে লোকেরা ইস্‌তিসকার জন্য বের হবে না; কেননা, ইস্‌তিস্‌কা অধিক জরুরতের সময় হয়ে থাকে। অতঃপর যখন ইস্‌তিস্‌কার ইরাদা করা হবে তখন মোস্তাহাব হলো ইমাম তাদেরকে তিন দিন পর্যন্ত রোজা রাখার আর তওবা করার জন্য বলবেন অতঃপর চতুর্থ দিন তাদেরকে নিয়ে মাঠে-ময়দানে বের হয়ে যাবেন।

এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে যে, ইস্‌তিস্‌কা কি জিনিস? ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইস্‌তিস্‌কা দোয়া ও ইস্‌তিগ্‌ফারের নাম। ইস্‌তিস্‌কার মধ্যে জামাআতের সাথে কোনো নামাজ সুন্নত নয়। হ্যাঁ যদি একা একা নামাজ পড়া হয়, তবে তা জায়েজ হবে। দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী–

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا .

তখন আমি বললাম তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। দলিল এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি প্রেরণ করাকে ইস্‌তিগ্‌ফারের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, নামাজের সাথে করেননি। এতে বুঝা গেল, ইসতিসকার মধ্যে আসল হলো দোয়া ও ইস্‌তিগ্‌ফার। দ্বিতীয় দলিল এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্‌তিস্‌কা করেছেন কিন্তু তাঁর থেকে নামাজ আদায় করার বর্ণনা নেই। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে,

اِنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُغِيْثُنَا فَقَالَ : فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا . (شرح نقايه).

এক ব্যক্তি জুমার দিন মসজিদে প্রবেশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্‌বা পাঠ করছিলেন। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল, রাস্তা-ঘাট বন্ধ হয়ে গেল, আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যাতে আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় হাত উপরে উত্তোলন করে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন।– (শরহে নিকায়া) উক্ত হাদীসের মধ্যেও ইস্‌তিস্‌কার মধ্যে দোয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, নামাজের নয়। তা ছাড়া এ-ও সাবিত আছে যে, হযরত ওমর (রা.) ইস্‌তিস্‌কা করেছেন কিন্তু নামাজ পড়েননি।

قَوْلُهٗ وَقَالَا يُصَلِّى الْاِمَامُ رَكْعَتَيْنِ الخ : ইস্‌তিসকার মধ্যে সাহেবাইনের মাযহাব এই যে, ইমাম লোকদেরকে দু' রাকআত নামাজ পড়াবেন। এটা ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফি'ঈ (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর ও মত। দলিল হলো হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীস—

خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتّٰى اَتَى الْمُصَلّٰى فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهٖ وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلْ فِى الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيْرِ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّىْ فِى الْعِيْدَيْنِ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত বিসয়ের সাথে বের হয়ে ঈদগাহে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি খুত্‌বা পড়েননি। দোয়া আর কান্না-কাটির মধ্যেই লিপ্ত ছিলেন। তিনি দুই রাক্‌আত নামাজ পড়লেন যেমনটি দুই ঈদে পড়া হয়। দ্বিতীয় দলিল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসিম (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِيْ بِهِمْ فَيُصَلِّيْ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে নিয়ে ইস্‌তিস্‌কার জন্য বের হলেন, তারপর তাদেরকে দুই রাক্‌আত নামাজ পড়ালেন এবং নিজের চাদরকে উলটালেন এবং উভয় হাত উত্তোলন করে দোয়া করলেন এবং ইস্‌তিস্‌কা করলেন এবং কিবলামুখী হলেন। উভয় রিওয়ায়াত দ্বারা ইস্‌তিস্‌কার জন্য নামাজ পড়া প্রমাণিত হলো। আমাদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব এই যে, তিনি ইস্‌তিস্‌কার মধ্যে কখনো নামাজ পড়েছেন আবার কখনো বর্জন করেছেন। এ জন্য এর দ্বারা ইস্‌তিস্‌কার নামাজ জায়েজ হওয়াতো প্রমাণিত হয়, কিন্তু সুন্নত হওয়া প্রমাণিত হয় না। উল্লেখ্য যে, জায়েজ হওয়ার কথা আমরাও অস্বীকার করি না; বরং কথাতো হলো ইস্‌তিস্‌কার নামাজ সুন্নত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে। আর সুন্নত তো হলো যা রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা করেছেন। এ স্থানে গ্রন্থকারের ইবারতের উপর এ প্রশ্ন হয় যে, গ্রন্থকার প্রথমে বলেছেন لَمْ تُرْوَ عَنْهُ الصَّلٰوةُ এবং পরে বলেছেন لما روى। উল্লেখ্য যে, উভয় ইবারত বিরোধপূর্ণ? এর জওয়াব এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ইস্‌তিস্‌কার নামাজের ক্ষেত্রে রিওয়ায়াত যেহেতু খুবই কম, তাই اَلنَّادِرُ كَالْمَعْدُوْمِ-এর কায়দার ভিত্তিতে ঐ مروى-কে غير مروى ধরা হয়েছে। সুতরাং এখন আর কোনো বিরোধ থাকল না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইস্‌তিস্‌কার নামাজ সুন্নত হওয়া শুধু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে আছেন। মাবসূত নামক গ্রন্থেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ الخ : সাহেবাইন (র.) বলেন, ঈদের নামাজের মতো ইস্‌তিস্‌কার উভয় রাক্‌আতেও উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়বে। তারপর খুতবা পড়বে। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে খুতবা পড়ার বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ঈদের ন্যায় ইস্‌তিস্‌কারও দুটো খুত্‌বা রয়েছে। উভয় খুত্‌বার মাঝখানে বসে ব্যবধান করবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে একটি-ই খুত্‌বা। জমিনের উপর দাঁড়িয়ে লোকদের দিকে ফিরে তা পড়বে।

وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالدُّعَاءِ لِمَا رُوِىَ أَنَّهُ ﷺ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَيُقَلِّبُ رِدَاءَهُ لِمَا رَوَيْنَا قَالَ هٰذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَمَّا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ فَلَا يُقَلِّبُ رِدَاءَهُ لِاَنَّهُ دُعَاءٌ فَيُعْتَبَرُ بِسَائِرِ الْاَدْعِيَةِ وَمَا رَوَاهُ كَانَ تَفَاؤُلًا وَلَا يُقَلِّبُ الْقَوْمُ اَرْدِيَتَهُمْ لِاَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ اَنَّهُ اَمَرَهُمْ بِذٰلِكَ وَلَا يَحْضُرُ اَهْلُ الذِّمَّةِ الْاِسْتِسْقَاءَ لِاَنَّهُ لِاِسْتِنْزَالِ الرَّحْمَةِ وَاِنَّمَا تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ ـ

অনুবাদ : দোয়ার সময় কিবলামুখী হবে। কেননা হাদীসে রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ কিবলামুখী হয়েছেন এবং আপন চাদর উলটিয়েছেন। আর ইমাম সাহেব আপন চাদর উলটাবেন। এর দলিল আমাদের বর্ণিত হাদীস। গ্রন্থকার বলেন, এ হলো ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে চাদর উলটাবে না। কেননা এটা-তো দোয়া। সুতরাং অন্যান্য দোয়ার সাথেই একে বিবেচনা করতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা ছিল সুলক্ষণ গ্রহণ হিসেবে। তবে মোকতাদিরা তাদের চাদর উল্‌টাবে না। কেননা এমন বর্ণিত হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে তা করার আদেশ করেছেন। জিম্মী অধিবাসীগণ ইস্‌তিস্‌কার নামাজে হাজির হবে না। কেননা ইস্‌তিস্‌কা হলো রহমত নাজিলের প্রার্থনা করার জন্য, অথচ তাদের উপর তো গজব নাজিল হওয়ার কথা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইস্‌তিস্‌কার দোয়ার মধ্যে মুস্তাহাব হলো, কিবলামুখী হয়ে দোয়া করা। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিবলামুখী হওয়া আর চাদর উলটানোর বর্ণনা রয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নিজের চাদর উল্‌টাবে। তার তরীকা হলো, চাদর যদি চতুর্কোণ বিশিষ্ট হয় তবে উপরের অংশ নিচের দিকে আর নিচের অংশ উপরের দিকে করবে। আর যদি চাদর গোলাকার হয় যেমন জুববা। তবে ডান অংশ বাম দিকে আর বাম অংশ ডান দিকে করবে। চাদর উল্‌টানোর উপর দলিল উপরে বর্ণিত রিওয়ায়াতগুলো। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, চাদর উল্‌টানোর হুকুম হলো ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী। ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফিঈ (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)ও অনুরূপ বলেন, আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব হলো, চাদর না উল্‌টানো। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাবও। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, এটাতো হলো দোয়া। সুতরাং অন্যান্য দোয়ার সাথেই তাকে বিবেচনা করতে হবে। আর অন্যান্য দোয়ার মধ্যে চাদর উলটানো নেই, এজন্য ইস্‌তিস্‌কার দোয়ার মধ্যেও চাদর উলটানো হবে না। ঐ রিওয়ায়াতের জওয়াব যার মধ্যে চাদর উলটানোর কথা রয়েছে এই যে, এটাতো সুলক্ষণ হিসাবে ছিল। কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওহীর মাধ্যমে আকাশের অবস্থা পরিবর্তন হওয়া চাদর উলটানোর সময় জানানো হয়েছিল। এ জন্য তিনি চাদর উলটিয়ে ছিলেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুক্‌তাদীরা তাদের চাদর উল্‌টাবে না। তবে এখানে প্রশ্ন জাগে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন চাদর উল্‌টিয়েছিলেন তখন তাকে দেখে অন্যান্যরাও চাদর উলটিয়েছিলেন তিনি তাদেরকে বারণ করেননি। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মুক্‌তাদীরাও চাদর উলটাবে? এর জওয়াব এই যে, ঐ স্থানে লোকদের চাদর উলটানো এমন ছিল যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাজের হালাতে জুতা খুলতে দেখে সাহাবায়ে কেরামও নিজেদের জুতা খুলে ফেলেছিলেন। সেখানে জুতা খোলা যেমনিভাবে দলিলের পর্যায় ছিল না এখানেও চাদর উলটানো দলিলের পর্যায়ে হবে না। আর তিনি তাদেরকে এ কারণে বারণ করেননি যে, চাদর উলটানো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম নয় বরং আলোচনা তো হলো তা সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইস্‌তিস্‌কার মধ্যে জিম্মী অধিবাসীগণ হাজির হবে না। কেননা মুসলমানদের বের হওয়া আল্লাহর রহমত নাজিলের দোয়ার জন্য। আর কাফিরদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلَالٍ কাফিরদের দোয়া হলো ক্ষতি ও অনিষ্ট। ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফিঈ (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.) বলেন, জিম্মীদেরকে ইস্‌তিস্‌কার জন্য বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে না। যদি তারা বের হয়ে পড়ে তবে নিষেধও করা যাবে না। তবে এ কথা লক্ষণীয় যে, জিম্মীরা যাতে কোনো দিন একা একা বের না হয়; বরং যখন তারা বের হবে তখন কিছু সংখ্যক মুসলমানও তাদের সাথে বের হবে। কেননা ইস্‌তিস্‌কা দ্বারা রিজিক চাওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আর আল্লাহ তা'আলা মু'মিন কাফির সকলকে রিজিক দান করে থাকেন। সুতরাং কাফিররা যদি একা একা বের হয় আর আল্লাহর কাছে দোয়া করে এবং ঘটনাক্রমে বৃষ্টি হয়ে যায় তবে তা বড়ই ফিত্‌নার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

بَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ

اِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ جَعَلَ الْاِمَامُ النَّاسَ طَائِفَتَيْنِ طَائِفَةً عَلٰى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَطَائِفَةً خَلْفَهٗ فَيُصَلِّىْ بِهٰذِهِ الطَّائِفَةِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مَضَتْ هٰذِهِ الطَّائِفَةُ اِلٰى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ فَيُصَلِّىْ بِهِمُ الْاِمَامُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُسَلِّمُوْا وَذَهَبُوْا اِلٰى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُوْلٰى فَصَلُّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وُحْدَانًا بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ لِاَنَّهُمْ لَاحِقُوْنَ وَتَشَهَّدُوْا وَسَلَّمُوْا وَمَضَوْا اِلٰى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى وَصَلُّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ بِقِرَاءَةٍ لِاَنَّهُمْ مَسْبُوْقُوْنَ وَتَشَهَّدُوْا وَسَلَّمُوْا وَالْاَصْلُ فِيْهِ رِوَايَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلّٰى صَلٰوةَ الْخَوْفِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِىْ قُلْنَا وَاَبُوْ يُوْسُفَ وَاِنْ اَنْكَرَ شَرْعِيَّتَهَا زَمَانَنَا فَهُوَ مَحْجُوْجٌ عَلَيْهِ بِمَا رَوَيْنَا ـ

পরিচ্ছেদ : ভয়কালীন নামাজ

অনুবাদ : যখন (শত্রুর) ভয় তীব্র হয়, তখন ইমাম লোকদেরকে দুই ভাগে ভাগ করবেন। একদলকে শত্রুর মুখোমুখি রাখবেন আর দ্বিতীয় দলকে নিজের পিছনে দাঁড় করাবেন। এরপর এই দলকে নিয়ে এক রাক্আত ও দুই সিজদা আদায় করবেন। যখন তিনি দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা তুলবেন, তখন এই দলটি শত্রুর সামনে অবস্থান নিতে চলে যাবে। এবং (শত্রুর মুখোমুখী অবস্থানকারী) ঐ দলটি চলে আসবে। আর ইমাম তাদের নিয়ে এক রাক্আত ও দুই সিজদা আদায় করবেন এবং তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরাবেন। কিন্তু পিছনে ইক্তিদাকারী দলটি সালাম ফিরাবে না; বরং শত্রুর সামনে (অবস্থান গ্রহণ করতে) চলে যাবে। এবং প্রথম দলটি এসে একা একা কিরাআত ছাড়া এক রাকআত ও দুই সিজদা আদায় করবে। (কিরাআত না পড়ার) কারণ এই যে, তারা হলো "লাহিক" আর তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরিয়ে শত্রুর মুখোমুখী চলে যাবে। আর অপর দলটি ফিরে এসে কিরাআতসহ এক রাক্আত ও দুই সিজদা আদায় করবে। কেননা তারা হলো মাসবূক। (আর মাসবূকের উপর কিরাআত পড়া ওয়াজিব) এবং তারা তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। এ বিষয়ে মূল হলো, ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যে, নবী করীম ﷺ উপরে বর্ণিত নিয়মে সালাতুল খাওফ বা ভয়কালীন নামাজ আদায় করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) যদিও আমাদের জমানায় এর শরিয়ত সম্মত হওয়া অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তার বিপরীতে দলিল রয়েছে আমাদের বর্ণিত হাদীস।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : ইসতিসকা আর ভয়কালীন নামাজের মধ্যকার সম্পর্ক এই যে, উভয়টির প্রবর্তন ভয়ের আশংকার কারণে হয়েছে। তবে এতটুকুন ব্যবধান রয়েছে যে, ইস্‌তিস্‌কার মধ্যে প্রতিবন্ধক তথা বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া আসমানী এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে। আর ভয়কালীন নামাজের প্রতিবন্ধক হলো ইখতিয়ারী তথা ইচ্ছাকৃতভাবে। যেমন, যুদ্ধ যা হওয়ার কারণ হলো কাফিরদের কুফ্‌র আর জালিমদের জুলুম। সুতরাং যেহেতু গায়রে ইখতিয়ারী তথা অনিচ্ছাকৃত কাজগুলো শক্তিশালী হয় এজন্য ইস্‌তিস্‌কার আলোচনা অগ্রে আনা হয়েছে।

ইমাম কুদূরীর ইবারত إِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, ভয়কালীন নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য তীব্র ভয় হওয়া শর্ত। অথচ আম মাশায়িখের মতে তীব্র ভয় হওয়া শর্ত নয়; বরং ভয়কালীন নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য শত্রুর নিকটবর্তী হওয়াই যথেষ্ট। এ কারণেই মাবসূত নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কিছু কিছু লোকের মতে খাওফ (خوف) দ্বারা প্রকৃত (حقيقة) খাওফ মুরাদ নয়; বরং শত্রুর উপস্থিত বা হাজির হওয়া মুরাদ। সুতরাং শত্রু বিদ্যমান থাকাকে ভয়ের স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়েছে। যেমন শুধু সফর কষ্ট-ক্লেশের স্থলাভিষিক্ত হয়ে নামাজ কিংবা রোজার রুখসতের কারণ হয়ে থাকে।

ভয়কালীন নামাজ আদায়ের পদ্ধতি এই যে, ঐ সময়কার ইমাম লোকদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করবেন। একদলকে শত্রুর মুখোমুখী দাঁড় করাবেন আর দ্বিতীয় দলকে এক রাক্‌আত নামাজ পড়াবেন। যখন ইমাম এক রাক্‌আতের দ্বিতীয় সিজ্‌দা থেকে মাথা তুলবেন তখন এই দল পায়ে হেঁটে শত্রুর মোকাবেলায় চলে যাবে। আর যে দল শত্রুর মুখোমুখি ছিল তারা এসে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। ইমাম তাদেরকে এক রাক্‌আত পড়িয়ে সালাম ফিরাবেন। কিন্তু এই লোকেরা সালাম ফিরাবে না বরং শত্রুর সামনে চলে যাবে। এখন প্রথম দল এসে এক রাক্‌আত একা একা আদায় করবে। এই রাক্‌আতটি কিরাআত ছাড়া হবে। কেননা এরা তাহরীমা দ্বারা ইমামের সাথে শরিক হওয়ার কারণে "লাহিক"। আর লাহিকের উপর কিরাআত নেই। এই দলের নামাজ পূর্ণ হয়ে গেল। সুতরাং এরা সালাম ফিরিয়ে শত্রুর সামনে চলে যাবে। আর দ্বিতীয় দল এসে তাদের এক রাকআত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। তাদের এই রাক্‌আত কিরাআত সহ হবে। কেননা এরা প্রথম রাক্‌আতে ইমামের সাথে শরিক না থাকার কারণে মাসবূক। আর মাসবূকের উপর কিরাআত পড়া ওয়াজিব। এ জন্য এরা কিরাআত পড়বে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ভয়কালীন নামাজের মধ্যে আসল হল, আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা.)-এর রিওয়ায়াত–যার শব্দাবলি নিম্নরূপ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَقَامُوْا صَفًّا خَلْفَهٗ وَ صَفًّا مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِهِمْ ﷺ رَكْعَةً . ثُمَّ جَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَقَامُوْا فِىْ مَقَامِهِمْ وَاسْتَقْبَلَ هٰؤُلَاءِ الْعَدُوَّ فَصَلّٰى بِهِمْ ﷺ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ . فَقَامَ هٰؤُلَاءِ الْعَدُوَّ فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَسَلَّمُوْا ثُمَّ ذَهَبُوْا فَقَامُوْا مَقَامَ اُولٰئِكَ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ وَ رَجَعَ اُولٰئِكَ اِلٰى مَقَامِهِمْ فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا -

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ ভয়কালীন নামাজ পড়িয়েছেন। একদল তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছে দ্বিতীয় দল শত্রুর সামনে দাঁড়িয়েছে। তিনি তাদেরকে এক রাক্‌আত নামাজ পড়ালেন। অতঃপর দ্বিতীয় দল এসে এদের স্থানে দাঁড়িয়েছে। আর (তারা) শত্রুর সামনে চলে গেছে। তিনি ﷺ এদেরকেও এক রাক্‌আত নামাজ পড়ালেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন। অতঃপর তারা (প্রথম দল) একা একা এক রাক্‌আত পড়ে সালাম ফিরাল এবং গিয়ে শত্রুর সামনে দাঁড়াল। আর তারা (দ্বিতীয় দল) এদের স্থানে এসে দাঁড়াল এবং একা একা এক রাকআত পড়ে সালাম ফিরাল।

ইনায়া গ্রন্থকার লিখেছেন যে, ভয়কালীন নামাজের উপরোক্ত পদ্ধতি তখন হবে যখন ইমাম মাত্র একজন থাকে এবং তার পিছনে দাঁড়া অন্য ইমামের পিছনে নামাজ পড়তে তারা রাজি না। কিন্তু যদি ইমাম একাধিক হয় এবং তাদের ব্যাপারে কারো কোনো মতবিরোধও নেই। তবে উত্তম হলো একজন ইমাম একদলকে পূর্ণ নামাজ পড়াবেন। এবং এদেরকে শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড় করাবেন। আর দ্বিতীয় দল যারা শত্রুর সামনে ছিল তাদের মধ্য থেকে একজনকে বলা হবে, সে যাতে তাদেরকে পূর্ণ নামাজ পড়িয়ে দেয়।

হিদায়া গ্রন্থকারের ভাষ্য মতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর ভয়কালীন নামাজের প্রবর্তনকে অস্বীকার করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) প্রাথমিক অবস্থায় তরফাইনের মতো ভয়কালীন নামাজের প্রবর্তনের পক্ষে ছিলেন পরে তিনি তার মতে থেকে সরে গিয়ে বলতে লাগলেন, ভয়কালীন নামাজের প্রবর্তন রাসূলুল্লাহ ﷺ হায়াতের সাথে খাস দলিল হলো, ভয়কালীন নামাজ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকবে তখন তাদেরকে নামাজ পড়িয়ে দিবে। উক্ত আয়াতের মধ্যে বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভয়কালীন নামাজ আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যখন তিনি ইমাম হবেন তখন প্রত্যেক দল তাঁর পিছনে নামাজ পড়ে ফজিলত অর্জন করার চেষ্টা করবে। তার ওফাতের পর উক্ত ঝগড়া দূর হয়ে গেছে এবং প্রত্যেক দল আলাদা ইমামের পিছনে পূর্ণ নামাজ পড়ার শক্তি রাখে। তার ওফাতের পর আর আসা- যাওয়ার করে এভাবে এক এক রাক্আত আদায় করা জায়েজ হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের রিওয়ায়াত ইমাম আবূ ইউসুফের বিপরীতে দলিল। কেননা ইবনে মাসউদের রিওয়ায়াত উপরে বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভয়কালীন নামাজ আদায়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কিন্তু আমি বলি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় ভয়কালীন নামাজের প্রবর্তিত হওয়ার কথা কোথায় অস্বীকার করেন? ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) তো তার জীবদ্দশায় ভয়কালীন নামাজের প্রবর্তনের প্রবক্তা তবে ওফাতের পরের প্রবক্তা নয়। তাই যেহেতু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় ভয়কালীন নামাজের প্রবর্তনের প্রবক্তা সেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভয়কালীন নামাজ পড়ানো ইমাম আবূ ইউসুফের বিপরীতে কিভাবে দলিল হবে? এর জওয়াব এই যে, ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রিওয়ায়াত ইবারতের দিক থেকে (من حيث العبارة) যদিও ইমাম আবূ ইউসুফের বিপরীতে দলিল নয় কিন্তু দালালাতের দিক থেকে (من حيث الدلالة) দলিল। আর তা এভাবে যে, ভয়কালীন নামাজের সবব বা কারণ হলো খাওফ বা ভয়। আর ভয় যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় ছিল এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওয়াতের পরও আছে। সুতরাং যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহর ﷺ -এর জমানায় ভয়ের কারণে ভয়কালীন নামাজের প্রবর্তন ছিল একই কারণে তাঁর ওফাতের পরও তা شروع থাকবে। দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরামের সালাতুল খাওফ পড়ার বর্ণনা রয়েছে। যেমন সা'দ ইবনে আবী ওয়াককাস (রা.), আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রা.), আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) ইস্ফাহানে ভয়কালীন নামাজ পড়িয়েছেন। তা ছাড়া সা'দ ইবনে আবী ওয়াককাস (রা.) তাবরিস্তানে অগ্নিপূজকদের সাথে লড়াই করেছিলেন। তাঁর সাথে হাসান ইবনে আলী (রা.), হুযায়ফা ইবনে ইসহাক (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আমরুবনুল আস (রা.) ছিলেন। সাঈদ ইবনে আবিল আস (রা.) তাদেরকে ভয়কালীন নামাজ পড়িয়ে দিলেন কেউ তা অস্বীকার করেননি। তাদের এই অস্বীকার না করা ইজমা-এর স্থলে হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর ভয়কালীন নামাজ জায়েজ হওয়ার উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা হওয়ার পর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর ভয়কালীন নামাজের প্রবর্তনকে অস্বীকার করাকে ভাল মনে হয় না।

فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُقِيمًا صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولٰى رَكْعَتَيْنِ وَبِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُولٰى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً وَاحِدَةً لِأَنَّ تَنْصِيفَ الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَجَعْلُهَا فِي الْأُولٰى أَوْلٰى بِحُكْمِ السَّبْقِ وَلَا يُقَاتِلُوْنَ فِي حَالِ الصَّلٰوةِ فَإِنْ فَعَلُوْا بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ لِأَنَّهُ ﷺ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَلَوْ جَازَ الْأَدَاءُ مَعَ الْقِتَالِ لَمَا تَرَكَهَا ـ

অনুবাদ ঃ ইমাম যদি মুকীম হোন তবে প্রথম দলটির সঙ্গে দুই রাকআত এবং দ্বিতীয় দলটির সঙ্গেও দুই রাকআত পড়বেন। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ জোহরের নামাজ উভয় দলের সঙ্গে দুই দুই রাকআত করে পড়েছেন। মাগরিবের নামাজে ইমাম প্রথম দলের সঙ্গে দুই রাকআত এবং দ্বিতীয় দলের সঙ্গে এক রাকআত পড়বেন। কেননা এক রাকআতকে ভাগ করা সম্ভব নয়। তাই অগ্রবর্তিতার ভিত্তিতে প্রথম দালের সাথে সেটা আদায় করাই উত্তম। নামাজের অবস্থায় তারা লড়াই করবে না। যদি করে তবে তাদের নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা খন্দক যুদ্ধের দিন নবী করীম ﷺ ব্যস্ততার কারণে চার ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেননি। যদি লড়াই করা অবস্থায়ও নামাজ আদায় করা জায়েজ হতো, তবে তিনি তা তরক করতেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ইমাম যদি মুকীম হোন তবে প্রত্যেক দলকে দুই দুই রাকআত করে নামাজ পড়াবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইকামত অবস্থায় জোহরের নামাজ এভাবেই পড়িয়েছেন। আর মাগরিবের নামাজ এভাবে পূর্ণ করবে যে, প্রথম দলকে দুই রাকআত পড়াবে আর দ্বিতীয় দলকে এক রাকআত পড়াবে। কেননা সালাতুল খাওফের মধ্যে এই হুকুম রয়েছে যে, ইমাম প্রত্যেক দলকে অর্ধেক নামাজ পড়াবেন। আর মাগরিবের নামাজের অর্ধেক হলো এক পূর্ণ রাকআত ও আধা রাকআত। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, এক রাক্‌আতকে আধা আধি করে ভাগ করা যায় না। এ জন্য আমরা বলেছি প্রথম দলকে অগ্রবর্তিতার ভিত্তিতে দুই রাকআত পড়াবে, আর দ্বিতীয় দলকে এক রাক্‌আত পড়াবে। হযরত ইমাম নববী (র.) বলেছেন এর উল্টা করবে। অর্থাৎ প্রথম দলকে এক রাকআত এবং দ্বিতীয় দলকে দুই রাকআত পড়াবে। কারণ এই যে, প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত পড়া ফরজ। আর উচিত হলো যে, প্রত্যেক দলের তা থেকে অংশ পাওয়া। এ জন্য বলা হয়েছে যে, প্রথম দলকে এক রাকআত আর দ্বিতীয় দলকে দুই রাকআত পড়াবে। যাতে উভয় দল ফরজ কিরাআতের মধ্যে ইমামের সাথে শরিক হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَلَا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ حَالَةِ الصَّلٰوةِ الخ : মাসআলা হলো, আমাদের মতে নামাজ অবস্থায় কোনো দল যুদ্ধবিগ্রহ করবে না। যদি করে তবে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। শুরু থেকে পড়া জরুরি হবে। ইমাম মালিক (র.) বলেন, নামাজের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করার দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। এটা ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ও পূর্ব মত (قول قديم)। ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ দলিল এভাবে যে, আয়াতের মধ্যে নামাজের ভিতরে অস্ত্র রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নামাজের মধ্যে অস্ত্র রাখা হয় যুদ্ধবিগ্রহের জন্যেই। বুঝা গেল, নামাজের হালাতে যুদ্ধবিগ্রহ করা জায়েজ। আমাদের দলিল এই যে, খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চার ওয়াক্ত নামাজ ফওত হয়েছিল। যেগুলোকে পরে তিনি কাযা করেছেন। নামাজের হালাতে যদি যুদ্ধ জায়েজ হতো তবে তিনি ঐ নামাজগুলোকে সময়মত আদায় করতে কিছুতেই ছাড়তেন না। বুঝা গেল, নামাজের হালাতে যুদ্ধ করা জায়েজ নেই। ইমাম মালিক (র.)-এর দলিলের জওয়াব এই যে, নামাজের অবস্থায় অস্ত্র সাথে রাখার নির্দেশ এ জন্য দেওয়া হয়েছে যে, যাতে কাফিররা মুসলমানদেরকে অপ্রস্তুত মনে করে হামলা না করে বসে। কিংবা যদি লড়াইয়ের প্রয়োজন দেখা দেয় তবে লড়াই করবে এবং পড়ে নামাজ দোহরাবে।

فَاِنِ اشْتَدَّ الْخَوفُ صَلُّوْا رُكْبَانًا فُرَادٰى يُؤْمُوْنَ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُودِ اِلٰى اَىِّ جِهَةٍ شَاءَ وَاِذَا لَمْ يَقْدِرُوْا التَّوَجُّهَ اِلَى الْقِبْلَةِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا وَسَقَطَ التَّوَجُّهُ لِلضَّرُوْرَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ اَنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ بِجَمَاعَةٍ وَلَيْسَ بِصَحِيْحٍ لِاِنْعِدَامِ الْاِتِّحَادِ لِلْمَكَانِ ـ

অনুবাদ : যদি ভয়ভীতি আরো তীব্র হয় তবে লোকেরা সওয়ার অবস্থায় একা একা নামাজ আদায় করবে। আর যদি কিবলামুখী হওয়া সম্ভব না হয় তবে তবে যেদিকে সম্ভব সেদিকে অভিমুখী হয়ে ইশারার মাধ্যমে রুকু সিজদা আদায় করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا যদি তোমরা ভীত হয়ে পড় তবে হাটা অবস্থায় কিংবা সওয়ার অবস্থায়, (নামাজ আদায় করবে) আর কিবলামুখী হওয়ার হুকুম প্রয়োজনের কারণে রহিত হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, (সেই অবস্থায়ও) তারা জামাআতের সাথে নামাজ পড়বে। কিন্তু এটা বিশুদ্ধ মত নয়। কেননা (জামাআতের জন্য) অভিন্ন স্থান বিদ্যমান নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি শত্রুর ভয় এত তীব্র হয় যে, শত্রু মুসলমানদেরকে সওয়ারি থেকে অবতরণ করে নামাজ পড়ার অবকাশ দিচ্ছে না তবে এ অবস্থায় মুসলমানদের জন্য সওয়ারির উপরই বসে বসে ইশারায় রুকু সিজদা দ্বারা একা একা নামাজ আদায় করা জায়েজ। কিবলামুখী হওয়ার ক্ষেত্রে হুকুম এই যে, যদি কিবলামুখী হওয়া সম্ভব না হয় তবে যেদিকে সম্ভব সেদিকে অভিমুখী হবে। দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا প্রয়োজনের কারণে কিবলামুখী হওয়ার হুকুম রহিত হয়ে গেছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে একটি রিওয়ায়েত এমন আছে যে, সওয়ারির উপর থেকেই জামাআতে নামাজ পড়া উত্তম। ইমাম শাফিঈ (র.)ও এর প্রবক্তা, তবে এ হুকুম সহীহ নয়। কেননা ইক্তিদা সহীহ হওয়ার জন্য স্থান অভিন্ন হওয়া শর্ত যা এখানে নেই। হ্যাঁ, যদি কোনো ব্যক্তি ইমামের সাথে তার সওয়ারির উপর হয়, তবে তার ইক্তিদা করা সহীহ হবে।

بَابُ الْجَنَائِز

إِذَا احْتُضِرَ الرَّجُلُ وُجِّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ اِعْتِبَارًا بِحَالِ الْوَضْعِ فِى الْقَبْرِ لِاَنَّهُ اَشْرَفَ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَارُ فِى بِلَادِنَا اِسْتِلْقَاءً لِاَنَّهُ اَيْسَرُ لِخُرُوْجِ الرُّوْحِ وَالْاَوَّلُ هُوَ السُّنَّةُ وَلُقِّنَ الشَّهَادَتَيْنِ لِقَوْلِهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالْمُرَادُ الَّذِىْ قَرُبَ مِنَ الْمَوْتِ فَاِذَا مَاتَ شُدَّ لِحْيَاهُ وَغُمِّضَ عَيْنَاهُ بِذٰلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ ثُمَّ فِيْهِ تَحْسِيْنُهُ فَيُسْتَحْسَنُ ـ

পরিচ্ছেদ : জানাযার নামাজ

অনুবাদ : যখন কোনো লোকের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাকে ডান পার্শ্বের উপর কিবলামুখী করে শোয়াবে। (এটা করা হবে) তার কবরের অবস্থানের অবস্থার প্রতি সামঞ্জস্য রেখে। কেননা সে তো কবরের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে। আমাদের দেশে চিৎ করে শোয়ানোই প্রচলিত। কেননা এ হলো রুহ বের হওয়ার জন্য অধিকতর সহজ অবস্থা। তবে প্রথম সুরত হলো সুন্নত এবং তাকে উভয় শাহাদাতের তালকীন করা হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ তোমরা তোমাদের মৃতদের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কালিমার সাক্ষ্য দানের তালকীন করো। মৃত দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যার মৃত্যু আসন্ন। যখন সে মারা যায় তখন তার চোয়াল বেঁধে দিবে এবং চোখ দুটো বন্ধ করে দিবে। যুগ যুগ ধরে এরূপই চলে আসছে। তা ছাড়া এতে তার 'সুরত' সুন্দর করা হয়। সুতরাং এরূপ করাই উত্তম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব কথা : جنائز - جنازة -এর বহুবচন। جنازة - جيم -এর যবরের সাথে মৃতব্যক্তির জন্য ব্যবহার হয়। আর যেরের সাথে ঐ খাটিয়ার জন্য ব্যবহার হয় যার উপর মুর্দাকে রাখা হয়। মউত যেহেতু সর্বশেষ পর্যায়ে আসে এ জন্য জানাযার নামাজকে সর্বশেষ বর্ণনা করা হলো। এখন কেউ যদি বলেন যে, اَلصَّلٰوةُ فِى الْكَعْبَةِ-কে তো এর পূর্বে আলোচনা করার দরকার ছিল অথচ তার আলোচনা পরে করা হয়েছে? এর জওয়াব হলো হলো, صَلٰوةٌ فِى الْكَعْبَةِ -এর আলোচনা كتاب الصلوة-এর সর্বশেষে এ কারণে করা হয়েছে যে, যাতে كِتَابُ الصَّلٰوةِ -এর সমাপ্তি এমন জিনিস দ্বারা হয় যার দ্বারা অবস্থা এবং স্থানগত দিক থেকে বরকত হাসিল করা যায়।

মৃতব্যক্তির উপর জানাযার নামাজ পড়ার কারণ : আকল বা বুদ্ধির চাহিদা হলো, যখন কোনো ব্যক্তিকে অনেক লোক মিলে কোনো আলীশান বিচারকের দরবারে নিয়ে তার জন্য সুপারিশ করে এবং তার ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করে এবং তার জন্য গড়াগড়ি করে কাঁদে। এগুলোর দ্বারা সবিশেষ তার ক্ষমা হয়ে যায়। এটাই হলো জানাযার নামাজের দর্শন। অর্থাৎ জানাযার নামাজের প্রবর্তন এ কারণে করা হয়েছে যে, মু'মিনদের একটি দল মুর্দারের সুপারিশে শরিক হয়ে মুর্দারের উপর আল্লাহর রহমত নাজিল হওয়ার ব্যাপারে বিরাট প্রভাব রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلَّا شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ কোনো মুসলমান মারা যাওয়ার পর যদি তার জানাযায় এমন চল্লিশজন ব্যক্তি উপস্থিত হয় যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেনি তবে ঐ মুর্দারের ব্যাপারে তাদের সুপারিশ কবুল করা

হয়। (উক্ত হাদীসের) ব্যাখ্যা হলো, যখন মানুষের প্রাণ তার শরীর থেকে বের হয়ে যায়, তখনো কিন্তু তার অনুভূতিগুলো অবশিষ্ট থাকে এবং যে সকল খিয়াল এবং জ্ঞানসমূহ তার সাথে ছিল মৃত্যুর পরও সেগুলো তার সাথে থাকে। অতঃপর আলমে বালা থেকে তার আরো জ্ঞান যোগ হয়। এর ভিত্তিতেই অনেকের শাস্তি কিংবা সওয়াব হয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দাদের হিম্মত যখন আলমে কুদ্স তথা আল্লাহর দরবার পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং এই মায়্যেতের জন্য লোকেরা গড়াগড়ি করে কান্নাকাটি করে কিংবা মায়্যেতের জন্য সদকা খায়রাত করে তবে তা আল্লাহর হুকুমে মায়্যেতের জন্য উপকারী হয়।

জানাযার নামাজ ফরজে কিফায়া হওয়ার দর্শন : কিছু ফরজ এমন রয়েছে যেগুলো ঐ স্থানের কিছু লোক আদায় করার দ্বারা সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। এর কারণ হলো, সব লোক যদি তা একত্রিত হয়ে করা আরম্ভ করে দেয় তবে সামাজিকভাবে তা উলট-পালট হয়ে যাবে। এতে তাদের উপকারী কর্মকাণ্ড বে-কার হয়ে যাবে। সুতরাং এ ধরনের কাজের জন্য এক এক ব্যক্তিই যথেষ্ট। সুতরাং রুগীর সেবা, জানাযার নামাজ এভাবে প্রবর্তিত হয়েছে যে, রুগী এবং মুর্দারদের কোনো ক্ষতি না হয় এবং কিছু লোক এসে যদি তা পুরা করে তবে উদ্দেশ্যও হাসিল হয়ে যায়।

(احکام اسلام عقل کی نظر میں)

ইমাম কুদূরী (র.) মওত-এর নিকটবর্তী বুঝানোর জন্য إِذَا احْتُضِرَ الرَّجُلُ (যখন কোনো লোকের মৃত্যু উপস্থিত হয়) শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে مُحْتَضَرْ বলা হয়। কিংবা এ জন্য যে, মউত তার নিকট হাজির হয়। কিংবা মওতের ফেরেশ্তা হাজির হয়। (তাই مُحْتَضَرْ বলা হয়) মওতের আলামত হলো, মৃত প্রায় ব্যক্তির উভয় পা ঢিলা হয়ে যায়, দাঁড়াতে পারে না। নাক বাঁকা হয়ে যায়, অণ্ডকোষের চামড়া লম্বা হয়ে যায়। এখন মৃতপ্রায় লোকের জন্য করণীয় হলো, তাকে ডান পার্শ্বের উপর কিবলামুখী করে শোয়াবে। কেননা মুর্দাকে কবরে রাখার এটাই সুন্নত তরীকা। তাই তার উপর কিয়াস করে মৃতপ্রায় লোককেও ঐ ভাবে রাখা হবে। কেননা এ ব্যক্তি তো কবরের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আমাদের দেশে (মা-ওয়ারাউন্ নাহারের মধ্যে) চিত করে শোয়ানই অধিক পছন্দনীয়। কেননা এ অবস্থা রুহ বের হওয়ার জন্য অধিক সহজ। এ সুরতে মৃতব্যক্তির মাথার নিচে বালিশ জাতীয় কোনো উঁচু জিনিস রেখে দিবে, যাতে চেহারা কিবলামুখী থাকে, আকাশের দিকে না থাকে। কিন্তু এ পদ্ধতির ব্যাপারে কোনো নস (نص) নেই শুধু ধারণা প্রসূত, তাই গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণে গ্রন্থকার বলেছেন, প্রথম সুরত সুন্নত। অর্থাৎ পার্শ্বের উপর শোয়ানো সুন্নত। দ্বিতীয় আমল বা কাজ হলো, মৃতপ্রায় লোককে শাহাদাতের তালকীন করবে। অর্থাৎ তার পার্শ্বে বসে উচ্চ আওয়াজে "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বলবে। তাকে উক্ত কালেমা পড়ার নির্দেশ করবে না। কেননা তার উপরে এ সময়টা অত্যন্ত কঠিন সময়। আল্লাহ না চাহেতো সে যদি অস্বীকার করে বসে তবে কুফরের উপর তার খাতেমা তথা মওত হবে। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী- لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আর موتى দ্বারা ঐ ব্যক্তি মুরাদ যার মওত সন্নিকটে। একেবারে মৃতব্যক্তি মুরাদ নয়। কেননা তালকীন তার ক্ষেত্রে কাজে আসবে না। তৃতীয় আমল বা কাজ হলো, মৃত ব্যক্তির চোয়াল কাপড় ইত্যাদি দ্বারা বেঁধে দিবে। তার চোখ দুটো বন্ধ করে দিবে। এ তরীকাই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এরূপ করার দ্বারা মৃত ব্যক্তির সূরত সুন্দর হয়। এ জন্য এরূপ আমল উত্তম এবং মুস্তাহাব হবে।

فَصْلٌ فِي الْغُسْلِ : فَإِذَا أَرَادُوا غُسْلَهُ وَضَعُوهُ عَلَى سَرِيرٍ لِيَنْصَبَّ الْمَاءُ عَنْهُ وَجَعَلُوا عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً إِقَامَةً لِوَاجِبِ السَّتْرِ وَيَكْتَفِي بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ هُوَ الصَّحِيحُ تَيْسِيرًا وَنَزَعُوا ثِيَابَهُ لِيُمَكِّنَهُمُ التَّنْظِيفُ وَ وَضُّوْءُهُ مِنْ غَيْرِ مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ لِأَنَّ الْوُضُوءَ سُنَّةُ الْاِغْتِسَالِ غَيْرَ أَنَّ إِخْرَاجَ الْمَاءِ مِنْهُ مُتَعَذِّرٌ فَيُتْرَكَانِ ثُمَّ يُفِيضُونَ الْمَاءَ عَلَيْهِ اِعْتِبَارًا بِحَالِ الْحَيٰوةِ وَيُجَمَّرُ سَرِيْرُهُ وِتْرًا لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ الْمَيِّتِ وَإِنَّمَا يُوتَرُ لِقَوْلِهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ وَيَغْلِي الْمَاءَ بِالسِّدْرِ أَوْ بِالْحُرْضِ مُبَالَغَةً فِي التَّنْظِيفِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْمَاءُ الْقَرَاحُ لِحُصُولِ أَصْلِ الْمَقْصُودِ وَيَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ لِيَكُونَ أَنْظَفَ لَهُ ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَيُغْسَلُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ حَتّٰى يَرٰى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ وَصَلَ إِلٰى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ ثُمَّ يُضْجَعُ عَلٰى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَيُغْسَلُ حَتّٰى يَرٰى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ وَصَلَ إِلٰى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ لِأَنَّ السُّنَّةَ هُوَ الْبِدَايَةُ بِالْمَيَامِنِ ثُمَّ يُجْلِسُهُ وَيُسْنِدُهُ إِلَيْهِ وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ مَسْحًا رَقِيقًا تَحَرُّزًا عَنْ تَلْوِيثِ الْكَفَنِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ وَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ وَلَا وُضُوءَهُ لِأَنَّ الْغُسْلَ عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ وَقَدْ حَصَلَ مَرَّةً ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِثَوْبٍ كَيْلَا تَبْتَلَّ أَكْفَانُهُ وَيَجْعَلُهُ أَيِ الْمَيِّتَ فِي أَكْفَانِهِ وَيَجْعَلُ الْحَنُوطَ عَلٰى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَالْكَافُورَ عَلٰى مَسَاجِدِهِ لِأَنَّ التَّطْيِيبَ سُنَّةٌ وَالْمَسَاجِدُ أَوْلٰى بِزِيَادَةِ الْكَرَامَةِ وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُ الْمَيِّتِ وَلَا لِحْيَتُهُ وَلَا يُقَصُّ ظُفْرُهُ وَلَا شَعْرُهُ لِقَوْلِهِ عَائِشَةَ عَلَامَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ وَلِأَنَّ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ لِلزِّيْنَةِ وَقَدِ اسْتَغْنَى الْمَيِّتُ عَنْهَا وَفِي الْحَيِّ كَانَ تَنْظِيفًا لِاجْتِمَاعِ الْوَسَخِ تَحْتَهُ وَصَارَ كَالْخِتَانِ ـ

অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির গোসলের বিবরণ

অনুবাদ : যখন তাকে গোসল দেওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন তাকে একটি খাটে শোয়াবে। যাতে পানি তার থেকে নিচের দিকে সরে যায়। আর তার সতরের স্থানে একখণ্ড বস্ত্র রেখে দিবে। এরূপ করা হবে সতরের ওয়াজিব রক্ষা করার জন্য। তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী গোসলের কাজ সহজ করার জন্য মূল লজ্জাস্থান ঢাকাই যথেষ্ট। আর (গোসলদানকারীরা) তার সমস্ত কাপড় খুলে ফেলবে, যাতে তাদের পক্ষে তাকে পরিষ্কার করা সহজসাধ্য হয় এবং তারা তাকে কুলি ও নাকে পানি দেওয়া ছাড়া অজু করাবে। কেননা অজু হলো গোসলের সুন্নত। তবে যেহেতু তার (মুখ ও নাক) থেকে পানি বের করা কঠিন, সেহেতু কুলি ও নাকে পানি দেওয়া তরক করবে। তারপর সারা শরীরে

পানি প্রবাহিত করবে, জীবদ্দশার গোসলের অনুসরণে। অতঃপর তার খাটিয়ায় ধুনা দেওয়া হবে বেজোড় সংখ্যায়। কেনেনা এতে মৃতব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়। বেজোড় করার কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, إِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ আল্লাহ বেজোড়, তাই তিনি বেজোড় সংখ্যা পছন্দ করেন। আর পানি বড়ই পাতা কিংবা উশনান দ্বারা সিদ্ধ করবে অধিকতর পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে। যদি তা না পাওয়া যায় তবে স্বচ্ছ পানিই যথেষ্ট। কেননা তা দ্বারা মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। আর তার মাথা ও দাড়ি খিতমী (এক প্রকার তৃণ) দ্বারা ধৌত করবে। যাতে অধিক পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। এরপর তাকে বাম পার্শ্বে শয়ন করাবে এবং বড়ই পাতা সিদ্ধ পানি দ্বারা তাকে গোসল দেবে যতক্ষণ না দেখা যায় যে, পানি তার নিচ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। অতঃপর তাকে ডান পার্শ্বে শয়ন করাবে এবং গোসল করাবে যতক্ষণ না দেখা যায় যে, পানি তার নিচ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কেননা ডান দিক থেকে শুরু করাই সুন্নত। এরপর তাকে বসাবে এবং নিজের দিকে তাকে হেলান দিয়ে তার পেট হালকাভাবে মুছবে, যাতে পরে কাফন নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়। যদি তার পেট থেকে কিছু বের হয় তবে তা ধুয়ে ফেলবে। গোসল বা অজু দোহ্‌রাবে না। কেননা গোসল দেওয়া আমরা জেনেছি নস (হাদীস)-এর মাধ্যমে। আর তা একবার পালিত হয়ে গেছে। এরপর একটি কাপড় দ্বারা তার শরীর মুছে ফেলবে। যাতে তার কাফন ভিজে না যায়। এরপর মাইয়েতকে তার কাফনে রাখবে। অর্থাৎ তাকে কাফন পড়াবে। এরপর তার মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধি মাখবে এবং সিজদার অঙ্গগুলোতে কাফুর মাখবে। কেননা সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নত। আর সিজদার অঙ্গগুলো অধিক সম্মান যোগ্য। মাইয়েতের চুল বা দাড়ি আঁচড়াবে না এবং তার নখ আর চুল কাটবে না। কেননা হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন عَلَامَ تَنْصُوْنَ مَيِّتَكُمْ কেন তোমরা তোমাদের মুর্দারের মাথার চুল পরিপাটি করছ? কেননা এ সব কাজ হলো সৌন্দর্যের জন্য। আর মাইয়েতের জন্য এগুলোর প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে জীবিত ব্যক্তির জন্য এগুলো হলো পরিচ্ছন্নতার বিষয়। কেননা এগুলোর নিচে ময়লা জমে থাকে। সুতরাং তা খত্‌নার মতো হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব কথা : হিদায়া গ্রন্থকার মৃতব্যক্তির অবস্থাদি বিভিন্ন অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। সর্বপ্রথম গোসলের আলোচনা করেছেন। কেননা মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম এরই প্রয়োজন দেখা দেয়। মৃতব্যক্তির গোসলের সবব বা কারণের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মুর্দারকে গোসল দেওয়ার কারণ হলো ঐ নাপাকী যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলা হওয়ার কারণে মুর্দারের শরীরের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পড়ে। কেননা মওতের কারণে মানুষ নাপাক হয় না। এখানে প্রশ্ন হয় যে, মায়্যেতকে গোসল দেওয়ার কারণ যেহেতু নাপাকী তাহলে অজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার উপর اِكْتِفَاء করা হয় না কেন? অথচ হাদাসের সুরতে অজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার উপর اِكْتِفَاء করা হয়? এর জওয়াব হলো, জীবদ্দশায় হাদাসের কারণে অজুর অঙ্গগুলো ধোয়ার উপর اِكْتِفَاء করা হয় কষ্ট-ক্লেশকে দূরীভূত করার জন্য। কেননা হাদাস প্রত্যহ আসে বরং একদিন কয়েকবার আসে। সুতরাং জীবদ্দশায় যদি অজুর অঙ্গগুলো ধোয়ার উপর اِكْتِفَاء না করা হতো; বরং পুরো শরীর ধোয়ার বিধান থাকতো তবে মানুষ কষ্টের মধ্যে পড়ে যেতো। এ জন্য জীবদ্দশায় হাদাসের কারণে অজুর অঙ্গগুলো ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে মওতের কারণে যে হাদাস হয় সেটা বারবার আসে না বরং একবারই আসে সুতরাং যেহেতু মওতের কারণে হাদাস একবার আসায় তেমন কোনো ক্ষতির আশংকা নেই। এজন্য এ সুরতে সমস্ত শরীর ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, মায়্যেতের গোসলের কারণ হলো মৃতব্যক্তি মওতের কারণে নাপাক হয়ে যায়। যেমন, অন্যান্য জীবজন্তু মওতের কারণে নাপাক হয়ে যায়। দলিল হলো, যদি কেউ কোনো মৃতব্যক্তিকে নিজের শরীরে বহন করে নামাজ পড়ে তবে তার নামাজ জায়েজ হবে না। আর যদি কোনো নাপাক ব্যক্তিকে বহন করে নামাজ পড়ে তবে জায়েজ হবে। এর দ্বারা বুঝা গেল, মৃতব্যক্তি নাপাক। আর নাপাক দূরীভূত হয় গোসল দ্বারা। এ জন্য মুর্দারকে গোসল করানো একান্ত আবশ্যক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুর্দা প্রাণীকে যদি গোসল দেওয়া হয় তবে পাক হবে না। কেননা মৃতব্যক্তি গোসলের দ্বারা পাক হয়ে যাওয়া এটা শুধু তার মর্যাদা ও সম্মানের কারণে।

মায়্যেতকে গোসল দেওয়া জীবিত লোকদের উপর ফরজে কিফায়া। সুতরাং কোনো মৃত ব্যক্তিকে যদি পানিতে পাওয়া যায় তখনো তাকে গোসল দিতে হবে। আর যদি ফুলে ও ফেটে যায় তবে তার উপর পানি প্রবাহিত করে দিলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ-ই সম্যক অবহিত।

فَإِذَا أَرَادُوْا غُسْلَهُ وَضَعُوْهُ الخ : উপরোক্ত পুরো ইবারতের মধ্যে মায়্যেতের গোসলের পদ্ধতির আলোচনা করা হয়েছে। তাই গ্রন্থকার বলেন, যখন মায়্যেতকে গোসল দেওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন তাকে কোনো খাটের উপর শোয়াবে। আর খাটের উপর এ জন্য শোয়াবে যাতে পানি মায়্যেতের উপর দিয়ে গড়িয়ে নিচের দিকে চলে যায়। কেননা তাকে যদি জমিনের উপর রাখা হয় তবে মায়্যেত ময়লাযুক্ত হয়ে যাবে। গ্রন্থকার খাট রাখার পদ্ধতি কিংবা খাটের উপর মুর্দারকে রাখার পদ্ধতির কথাও আলোচনা করেননি। ইনায়া গ্রন্থকারের বর্ণনা অনুযায়ী আমাদের কোনো কোনো লোক বলেছেন যে, খাট কিবলার দিকে লম্বা-লম্বি রাখা হবে অর্থাৎ খাট পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা-লম্বি রাখা হবে। যেমন, অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে ইশারায় নামাজ পড়ার সুরতে অসুস্থ ব্যক্তিকে পূর্ব-পশ্চিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ পাগুলো কিব্‌লার দিকে আর মাথা পূর্ব দিকে রাখবে। আর কেউ কেউ বলেছেন, খাট প্রস্থের (عرضا) দিক থেকে রাখা হবে যেভাবে মায়্যেতকে কবরে রাখা হয়। আল্লামা শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.) বলেন, (খাট) যেভাবে রাখা সম্ভব রাখবে। মুর্দারকে খাটের উপর শোয়ানের পদ্ধতির ব্যাপারে কোনো রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়নি। তবে স্বাভাবিক প্রথা হলো, মায়্যেতকে বিছানার উপর শুইয়ে রাখা হয়। মায়্যেতকে খাটের উপর শোয়ানোর পর তার সতরের উপর একখণ্ড কাপড় রেখে দেবে। কেননা সতর ঢাকা ফরজ। সুতরাং ঐ ফরজকে আদায় করার জন্য তার সতরের উপর পর্দা রেখে দেবে। কারণ হলো, মানুষ যেমনিভাবে জীবদ্দশায় সম্মানিত এমনিভাবে মৃত্যুর পরও সম্মানিত। সুতরাং ঐ সম্মানিত হওয়ার তাকাযা হলো, তার সতর ঢেকে দেওয়া। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সহজ করার জন্য সামনের ও পিছনের লজ্জাস্থান ঢাকাই যথেষ্ট। নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা আবশ্যক নয়। এটাই যাহিরুররিওয়ায়াহ্। নাওয়াদির -এর রিওয়ায়াত হলো নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তার সমস্ত কাপড় খুলে ফেলবে। যাতে লোকেরা সহজেই মায়্যেতকে পরিষ্কার করতে সক্ষম হয়। কারণ হলো, গোসল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মায়্যেতকে পাক করা। তাই যখন কাপড়সহ তাকে গোসল দেওয়া হবে তখন উক্ত উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। কেননা গোসলের ব্যবহৃত পানি দ্বারা যখন কাপড় নাপাক হয়ে যবে তবে এর দ্বারা দ্বিতীয়বার তার শরীর নাপাক হয়ে যাবে। সুতরাং গোসল দ্বারা পবিত্রতা অর্জন হবে না। আর যখন কাপড়সহ গোসল দ্বারা তাহারাতের উদ্দেশ্য হাসিল হবে না তখন তার কাপড় খুলে ফেলাই ওয়াজিব। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, মায়্যেতকে এমন জামা পরিহিত অবস্থায় গোসল দেওয়া সুন্নত যার হাতা এমন ঢিলা হবে যে, গোসলদানকারীর হাত তার মধ্যে অনায়াসে ঢুকে যায়। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওফাতের পর তার পরিহিত কাপড়সহ গোসল দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে জিনিস রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ক্ষেত্রে সুন্নত তা তার উম্মতের ক্ষেত্রেও সুন্নত হবে তবে শর্ত হলো, কোনো دليل مخصص না থাকতে হবে। আমাদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাপড়সহ গোসল দেওয়ার ব্যাপারে دليل مخصص বিদ্যমান আছে। তা হলো, আয়শা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا تُوُفِّيَ اِجْتَمَعَتِ الصَّحَابَةُ لِغُسْلِهِ فَقَالُوْا لَانَدْرِيْ كَيْفَ نَغْسِلُهُ كَمَا نَغْسِلُ مَوْتَانَا أَوْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَأَرْسَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِمُ النَّوْمَ فَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا نَامَ وَ ذَقْنُهُ عَلٰى صَدْرِهِ إِذْ نَادَاهُمْ مُنَادٍ أَنِ اغْسِلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثِيَابَهُ فَقَدِ اجْتَمَعَتِ الصَّحَابَةُ أَنَّ السُّنَّةَ فِيْ سَائِرِ الْمَوْتٰى التَّجْرِيْدُ وَقَدْ خُصَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِخِلَافِ ذٰلِكَ بِالنَّصِّ لِعِظَمِ حُرْمَتِهِ ـ

রাসূলাল্লাহ ﷺ-এর যখন ওফাত হলো, তখন সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে গোসল দেওয়ার জন্য একত্রিত হলেন, সাহাবীগণ বললেন, আমাদের জানা নেই যে আমরা তাঁকে কিভাবে গোসল দেব? এমনভাবে গোসল দেব কি যেমনিভাবে সাধারণ মৃত্যু ব্যক্তিকে দেওয়া হয়? কিংবা তাঁকে এভাবে গোসল দেওয়া হবে যে, তাঁর সাথে তাঁর শরীরের কাপড় বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামকে ঘুমে বিভোর করে দিলেন। তাদের মধ্যে সকলেই ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন তার ﷺ থুতনী তার সিনার উপর ছিল। এহেন অবস্থায় এক আহবানকারী আওয়াজ দিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর কাপড়সহ গোসল দিয়ে দাও। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপার একমত হয়ে গেলেন যে, সব মুর্দারকে তো কাপড় খুলে গোসল দেওয়া সুন্নত। আর নস তথা হাদীসের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উক্ত হুকুম থেকে খাস করা হয়েছে। কেননা আল্লাহর রাসূলের মান-মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। উক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল যে, সাধারণ মুর্দাদেরকে তাদের কাপড় খুলে গোসল দেওয়া সুন্নত। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তাকে কুলি ও নাকে পানি দেওয়া ছাড়া অজু করাবে। অজু তো এ কারণে করাবে যে, অজু হলো গোসলের সুন্নত। কুলি ও নাকে এ কারণে পানি দিবে না যে মৃতব্যক্তির নাকে মুখে পানি প্রবেশ করিয়ে তা বের করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, জীবদ্দশার হালাতের উপর কিয়াস করে মায়্যেতকেও কুলি করানো হবে এবং নাকে পানি দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা বলি এই কিয়াসটি ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

اَلْمَيِّتُ يُوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ وَلَا يُمَضْمَضُ وَلَا يُسْتَنْشَقُ ـ

মায়্যেতকে নামাজের অজুর অনুরূপ অজু করানো হবে তবে কুলি করানো যাবে না এবং নাকেও পানি দেওয়া যাবে না।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অজু করানোর পর মায়্যেতের সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করবে। দলিল হলো জীবদ্দশার গোসলের হালাতের উপর কিয়াস। অতঃপর তার খাটিয়া বেজোড় সংখ্যায় ধুনী দেওয়া হবে। ধুনী এ কারণে দেওয়া হয়, এতে মৃতব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়। আর বেজোড় এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ .

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে পানি দ্বারা মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়া হবে সে পানি বড়ই পাতা কিংবা উশনান দ্বারা সিদ্ধ করবে। কেননা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য এটা অধিক কার্যকর। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, মৃতব্যক্তির গোসলের জন্য ঠাণ্ডা পানি উত্তম। কেননা গরম পানি দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলা হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব হলো, মৃতব্যক্তির গোসল পরিচ্ছন্নতার জন্য مشروع হয়েছে আর গরম পানি পরিচ্ছন্নতার জন্য অধিক উপযোগী। এ জন্য গরম পানি দ্বারা গোসল দেওয়া উত্তম। তবে গরম পানি দ্বারা যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলা হয়ে যায় এর জওয়াব হলো, এ কথাতো উদ্দেশ্য তথা পরিচ্ছন্নতার জন্য আরো ভালো হবে। কেননা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলা হওয়ার দ্বারা যা কিছু পেট থেকে বের হবে তা গোসলের সময় আর থাকবে না এবং গোসল সমাপ্তির পর কাফন ইত্যাদি আর নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

আর যদি সিদ্ধ করা পানি না পাওয়া যায় তবে শুধু স্বচ্ছ পানিই ব্যবহার করা হবে। পানির উপরোক্ত ধারাবাহিকতা হলো শামসুল আইম্মা শারাখসী (র.)-এর মতে। শায়খুল ইসলাম এবং মুহীত গ্রন্থকার বলেছেন, প্রথমত শুধু পানি দ্বারা গোসল দেওয়া হবে, পরে ঐ পানি ব্যবহার করা হবে যেগুলোকে বড়ই পাতা দ্বারা সিদ্ধ করা হয়। তৃতীয়বার কাফুর মিশ্রিত পানি ব্যবহার করা হবে। এটাই ইবনে মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত রয়েছে–

قَالَ يُبْدَأُ أَوَّلًا بِالْمَاءِ الْقُرَاحِ ثُمَّ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثُمَّ بِالْمَاءِ وَشَيْءٍ مِنَ الْكَافُوْرِ وَإِنَّمَا يُبْدَأُ أَوَّلًا بِالْمَاءِ الْقُرَاحِ حَتّٰى يَبْتَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَنِ وَالنَّجَاسَةِ ثُمَّ بِمَاءِ السِّدْرِ حَتّٰى يَزُوْلَ مَا بِهٖ مِنَ الدَّرَنِ وَالنَّجَاسَةِ فَإِنَّ السِّدْرَ أَبْلَغُ فِي التَّنْظِيْفِ ثُمَّ بِمَاءِ الْكَافُوْرِ تَطْيِيْبًا لِبَدَنِ الْمَيِّتِ كَذَا فَعَلَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ غَسَلُوْهُ .

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার সময় অমিশ্রিত পানি দ্বারা শুরু করা হবে তারপর বড়ই পাতার সিদ্ধ করা পানি তারপর কাফুর (কর্পূর) মিশ্রিত পানি ব্যবহার করা হবে। প্রথমত শুধু পানি এ জন্য ব্যবহার করবে যাতে শরীরের ময়লা-আবর্জনা এবং নাপাক ইত্যাদি ভিজে গলে যায়। তারপর সিদ্ধ পানি এ জন্য ব্যবহার করা হবে যে, যাতে ময়লা-আবর্জনা দূর হয়ে যায়। কেননা বড়ই পাতা পরিচ্ছন্নতার জন্য অধিকতর কার্যকর। তারপর কাফুর মিশ্রিত পানি মৃতব্যক্তির শরীরকে সুগন্ধিযুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হবে। এ-ই আমল ফেরেশ্তাগণ আদম (আ.)-কে গোসল দেওয়ার সময় করেছিলেন।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মৃতব্যক্তির মাথা ও দাড়ি খিত্‌মী দ্বারা ধুইবে। কেননা খিত্‌মী শাবানের ন্যায় শরীর পরিচ্ছন্নকারী। এ সকল কাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর মৃতব্যক্তিকে বাম পার্শ্বের উপর শুইয়ে সিদ্ধ পানি দ্বারা গোসল দেবে। এবং এ পরিমাণ পানি ঢালা হবে যাতে নিচের অংশ যা খাটের সাথে মিলিয়ে আছে সে পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়। অতঃপর ডান পার্শ্বের উপর শুইয়ে একই আমল করবে। এই ধারাবাহিকতা এ কারণে রাখা হয়েছে যাতে গোসলের সূচনা ডান দিক থেকে হয়। কেননা ডান দিক থেকে শুরু করা হলো সুন্নত। অতঃপর গোসলদানকারীরা মৃতব্যক্তিকে নিজের শরীরের সাথে হেলান দিয়ে বসাবে আর হালকাভাবে মৃতব্যক্তির পেট মলবে। এই মুছা এ জন্য যে, তার পেটে যদি কোনো জিনিস থাকে তবে তা বের হয়ে যাবে এবং কাফন নষ্ট হবে না। এই ধারাবাহিকতার মূল রিওয়ায়াত হলো.

إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ لَمَّا غَسَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَسَحَ بَطْنَهُ بِيَدِهٖ رَفِيْقًا عَلَيْهِ طَالِبًا مِنْهُ مَا يُطْلَبُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَقَالَ طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا .

হযরত আলী (রা.) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গোসল দিয়েছিলেন, তখন নিজের হাত দ্বারা আস্তে আস্তে তাঁর পেট মর্দন করে ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ঐ জিনিস চাওয়া যা মৃত ব্যক্তিদের থেকে চাওয়া হয়। অর্থাৎ আলী (রা.)-এর উদ্দেশ্য এই ছিল, হতে পারে তাঁর পেট থেকে কোনো জিনিস বেরিয়ে আসবে কিন্তু কোনো জিনিস বের হয়নি। অতঃপর আলী (রা.) বললেন, আপনি তো জীবদ্দশায়ও পাক ছিলেন এবং মৃত্যুর পরও পাক।

পেট মর্দন করার পর যদি মৃতব্যক্তির পেট থেকে কিছু বের হয় তবে তা ধুয়ে ফেলবে, পুনরায় গোসল বা অজুর প্রয়োজন নেই। কেননা মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়া আমরা নস তথা হাদীসের মাধ্যমে জেনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়া। মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়া যা ওয়াজিব ছিল তা একবার গোসল দেওয়ার দ্বারা হাসিল হয়ে গেছে। এখন দ্বিতীয়বার গোসল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। গোসল থেকে ফারিগ হওয়ার পর মৃতব্যক্তির শরীরকে পাক কাপড় দ্বারা পরিষ্কার করবে যাতে পরে কাফন ভিজে না যায়।

وَيَجْعَلُهُ اَىِ الْمَيِّتَ فِى اَكْفَانِهِ الخ : মাইয়েতকে গোসল দেওয়ার পর তাকে কাফন পরানো হবে এবং মাইয়েতের মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধি (حنوط) মাখবে। হানূত হলো কতিপয় সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্যের সমন্বয়ে তৈরি করা এক প্রকারের আতর। যে সকল অঙ্গ সিজদার সময় জমিনে লাগে (যেমন– ললাট, নাক, উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পা) এগুলোর উপর কাফুর মাখবে। দলিল হলো, মাইয়েতের শরীরকে সুগন্ধিযুক্ত করা সুন্নত। আর যেহেতু উপরোক্ত অঙ্গগুলো দ্বারা সিজদা করা হয় এ জন্য সিজদার অঙ্গগুলো সম্মানের অধিক উপযোগী। আর সুন্নত হওয়ার দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—

كَانَ اٰدَمُ النَّبِىُّ رَجُلًا اَشْعَرَ طِوَالًا كَاَنَّهُ نَخْلَةٌ سُحُوْقٌ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ بِحَنُوْطٍ وَكَفَنٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَلَمَّا مَاتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَسَّلُوْهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا وَجَعَلُوْهُ فِى الثَّالِثَةِ كَافُوْرًا وَكَفَّنُوْهُ فِىْ وِتْرٍ مِنَ الثِّيَابِ وَحَفَرُوْا لَهُ لَحْدًا وَصَلُّوْا عَلَيْهِ وَقَالُوْا هٰذِهٖ سُنَّةُ وَلَدِ اٰدَمَ مِنْ بَعْدِهٖ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالُوْا يَابَنِىْ اٰدَمَ هٰذِهٖ سُنَّتُكُمْ مَنْ بَعْدُ هٰكَذَا لَكُمْ فَافْعَلُوْا رَوَاهُ الْحَاكِمُ . (شرح نقايه)

হযরত আদম (আ.) লম্বা চুল এবং দীর্ঘ কায়া বিশিষ্ট মানুষ ছিলেন, যেন একটি দীর্ঘ খেজুরের বৃক্ষ। অতঃপর যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনীভূত হলো তখন ফেরেশতাগণ সুগন্ধি আর জান্নাত থেকে কাফুর নিয়ে অবতরণ করলেন। তারপর আদম (আ.) যখন মৃত্যুবরণ করলেন তখন ফেরেশ্‌তাগণ আদম (আ.)-কে বড়ই পাতা দ্বারা সিদ্ধ করা পানি দিয়ে তিনবার গোসল করালেন। তিনবার কাফুর লাগালেন এবং তিনটি কাপড়ে কাফন পরালেন। তার জন্য (লাহাদ) কবর খুঁড়লেন এবং তার উপর জানাযার নামাজ পড়লেন এরপর বললেন, আদম (আ.)-এর পর এই প্রক্রিয়াই আদম সন্তানদের জন্য সুন্নত। অন্য বর্ণনায় রয়েছে ফেরেশ্‌তাগণ বললেন, হে আদম সন্তানগণ! আদম (আ.) -এর পর এটা তোমাদের সুন্নত, এমনটি তোমরাও করো।

উম্মে আতিয়ার হাদীসে রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ সর্বশেষ মাইয়েতের শরীরে কাফুর লাগাবে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মাইয়েতের চুল এবং দাড়ি আঁচড়াবে না। তার নখ আর লম্বা চুল কাটা হবে না। দলিল হলো, হযরত আয়শা (রা.)-কে মাইয়েতের চুল ও দাড়ি আঁচড়ানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেন عَلَامَ تَنْصُوْنَ مَيِّتَكُمْ-এর মধ্যে علام শব্দটি মূলত على ما ছিল অর্থাৎ ما استفهاميه -এর উপর দাখিল হয়েছে অতঃপর তার আলিফ ফেলে দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ -এর মধ্যে রয়েছে। نصا - ينصو - نصا -এর অর্থ হলো কপাল টেনে ধরা। হযরত আয়েশা (রা.) উত্তরে বললেন, তোমরা তোমাদের মৃতব্যক্তিদের মাথা ধরে কেন টানছ? যেন হযরত আয়শা (রা.) মৃতব্যক্তির চুল আঁচড়ানোর প্রতি অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করেছেন। এবং আঁচড়ানোকে মাথা ধরে টানার দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয় দলিল হলো, এ সবকিছু করা হয় সৌন্দর্যের জন্য। আর মৃতব্যক্তির এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। এ জন্য এগুলোর একেবারেই দরকার নেই। তবে জীবিত লোকদের হুকুম হলো ভিন্ন। কেননা নখ আর চুলের নিচে ময়লা-আবর্জনা জমে থাকার কারণে পবিত্রতা অর্জনের জন্য জীবিত লোকদেরকে এগুলো করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এটা খত্‌নার অনুরূপ হয়ে গেল। অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির খত্‌না করা সুন্নত, কোনো মৃতব্যক্তি যদি খত্‌নাবিহীন থাকে তবে আমাদের আর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে তাকে খত্‌না করানো যাবে না। আল্লাহই ভালো জানেন।

فَصْلٌ فِى التَّكْفِيْنِ : اَلسُّنَّةُ اَنْ يُّكَفَّنَ الرَّجُلُ فِىْ ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ اِزَارٍ وَقَمِيْصٍ وَلِفَافَةٍ لِمَا رُوِىَ اَنَّهُ ﷺ كُفِّنَ فِىْ ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ وَلِاَنَّهُ اَكْثَرُ مَا يَلْبَسُهُ عَادَةً فِىْ حَيَاتِهِ فَكَذَا بَعْدَ مَمَاتِهِ فَاِنِ اقْتَصَرُوْا عَلٰى ثَوْبَيْنِ جَازَ وَالثَّوْبَانِ اِزَارٌ وَلِفَافَةٌ وَهٰذَا كَفَنُ الْكِفَايَةِ لِقَوْلِ اَبِىْ بَكْرٍ (رضـ) اِغْسِلُوْا ثَوْبَىَّ هٰذَيْنِ وَكَفِّنُوْنِىْ فِيْهِمَا وَلِاَنَّهُ اَدْنٰى لِبَاسِ الْاَحْيَاءِ وَالْاِزَارُ مِنَ الْقَرْنِ اِلَى الْقَدَمِ وَاللِّفَافَةُ كَذٰلِكَ وَالْقَمِيْصُ مِنْ اَصْلِ الْعُنُقِ اِلَى الْقَدَمِ وَاِذَا اَرَادُوْا لَفَّ الْكَفَنِ اِبْتَدَءُوْا بِجَانِبِهِ الْاَيْسَرِ فَلَفُّوْهُ عَلَيْهِ ثُمَّ بِالْاَيْمَنِ كَمَا فِىْ حَالِ الْحَيٰوةِ وَبَسْطُهُ اَنْ تُبْسَطَ اللِّفَافَةُ اَوَّلًا ثُمَّ يُبْسَطُ عَلَيْهَا الْاِزَارُ ثُمَّ يُقَمَّصُ الْمَيِّتُ وَيُوْضَعُ عَلَى الْاِزَارِ ثُمَّ يُعْطَفُ الْاِزَارُ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ ثُمَّ مِنْ قِبَلِ الْيَمِيْنِ ثُمَّ اللِّفَافَةُ كَذٰلِكَ وَاِنْ خَافُوْا اَنْ يَّنْتَشِرَ الْكَفَنُ عَنْهُ عَقَدُوْهُ بِخِرْقَةٍ صِيَانَةً عَنِ الْكَشْفِ ـ

অনুচ্ছেদ : কাফন পরান

অনুবাদ : সুন্নত হলো, পুরুষকে ইজার, কামিজ ও চাদর এই তিন কাপড়ে কাফন দিবে। কেননা বর্ণিত রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ-কে 'সাহুলিয়া'র তৈরি তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া এই হলো স্বভাবত তার জীবদ্দশার সাধারণ পরিধেয় পোশাক। সুতরাং তার মৃত্যুর পরেও একই রকম হবে। অবশ্য যদি দুই কাপড়ে সীমিত রাখা হয় তবে তার জায়েজ আছে। আর এ দুই কাপড় হলো ইজার ও চাদর। এ হলো ন্যূনতম কাফন। কেননা হযরত আবূ বকর (রা.) বলেছেন, আমার এ কাপড় দু'টি ধুয়ে দিও এবং তাতেই আমাকে কাফন দিও। তা ছাড়া এটা হলো জীবিতদের ন্যূনতম পোশাক। ইজারের পরিমাণ হলো মাথা থেকে পা পর্যন্ত। চাদরও অনুরূপ। আর কামিজ হলো গলা থেকে পা পর্যন্ত। যখন কাফন পেঁচানোর ইচ্ছা করবে তখন মাইয়েতের বাম দিক থেকে শুরু করবে এবং সেদিক থেকে তার উপর লেপটিয়ে দিবে। অতঃপর ডান দিক। যেমন জীবিত অবস্থায় করা হয়। কাফন বিছানোর সুরত হলো, প্রথমে চাদর বিছাবে, তারপর তার উপর ইজার বিছাবে, তারপর মাইয়েতকে জামা পড়ানো হবে, তারপর তাকে ইজারের উপর রাখা হবে। অতঃপর প্রথমে বাম থেকে এরপর ডান থেকে ইজার পেঁচানো হবে। অতঃপর একইভাবে চাদর পেঁচানো হবে। যদি কাফন সরে যাওয়ার আশংকা হয় তবে একটি বস্ত্র খণ্ড দ্বারা গিরা বেঁধে দিবে যাতে অনাবৃত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসলমানদেরকে কাফন পরানো ফরজে কিফায়া। সুতরাং মৃতব্যক্তি যদি ধনাঢ্য হয় তবে তার সম্পদ দ্বারা তাকে কাফন পরানো ওয়াজিব। নতুবা যার কাছে তার নাফাকাহ (نفقة) তথা পারিবারিক ব্যয়ের দায়িত্ব রয়েছে তার উপর ওয়াজিব হবে মায়্যিতের কাফনের ব্যবস্থা করা। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে স্ত্রীর কাফনের ব্যয় নির্বাহ করা স্বামীর উপর কর্তব্য, যদিও স্ত্রী মালদার হয়। এরই উপর ফতোয়া। মালদার স্ত্রীর উপর গরীব স্বামীর কাফনের ব্যয় বহন করা জরুরি নয়।

اَلسُّنَّةُ اَنْ يُّكَفَّنَ الرَّجُلُ الخ : কাফন তিন প্রকার। কাফনে মাসনূন, কাফনে কিফায়াহ ও কাফনে যারূরত। উপরোক্ত ইবারতে কাফনে মাসনূনের আলোচনা করা হয়েছে। সুন্নত কাফন পুরুষের ক্ষেত্রে তিনটি কাপড়– (১) ইজার অর্থাৎ লুঙ্গি। এর পরিমাণ হবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত। (২) কামিজ, আস্তীন ও কল্লী ছাড়া গলা থেকে পা পর্যন্ত। (৩) লিফাফা, চাদর যদ্দারা মাথা থেকে পায়ের নিচ পর্যন্ত ঢেকে যায়। তিন কাপড় সুন্নত হওয়ার উপর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাহুলিয়ার তৈরি তিনটি সাদা কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছিল। سحول - سين-এর যবর কিংবা পেশের সাথে ইয়ামনের একটি গ্রামের নাম। আবূ দাউদ শরীফে হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিন কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল। একটি তো হলো ঐ কুর্তা যার মধ্যে তাঁর ওফাত হয়েছিল। আরেকটি হলো নাজরানের হুল্লাহ (حلة)। হুল্লাহ বলা হয় জোড়া কাপড়কে (টু পিস)। (মোট তিনটি হলো) জাবির ইবনে সামুরা (রা.) বলেন, كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ قَمِيْصٍ وَّاِزَارٍ وَّلِفَافَةٍ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনটি কাপড়ে কাফন পরানো হয়েছে। কামিজ, ইজার, চাদর। উক্ত হাদীসগুলো দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিনটি কাপড়ে কাফন পরানো প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় দলিল হলো, মানুষ সাধারণত জীবদ্দশায় তিন কাপড় পরিধান করে থাকে, তাই মৃত্যুর পরও তার তিনটি কাপড় হওয়া দরকার।

فَاِنِ اقْتَصَرُوْا عَلٰى ثَوْبَيْنِ الخ : উক্ত ইবারতের মধ্যে কাফনে কিফায়ায় বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পুরুষের ক্ষেত্রে কিফায়া কাফন দুই কাপড়। এক. ইজার, দুই. চাদর (লেফাফা)। এর উপর সিদ্দীকে আকবরের বাণী দ্বারা দলিল দেওয়া হয়। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে বর্ণিত আছে যে,

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِثَوْبَيْهِ الَّذَيْنَ كَانَ يَمْرِضُ فِيْهِمَا اِغْسِلُوْهُمَا وَكَفِّنُوْنِىْ فِيْهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ (رضـ) اَلَا نَشْتَرِىْ لَكَ جَدِيْدًا قَالَ لَا اَلْحَىُّ اَحْوَجُ اِلَى الْجَدِيْدِ مِنَ الْمَيِّتِ

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আব্বাজান বলেছেন, তাঁর ঐ দু'টি কাপড়ের ব্যাপারে যেগুলোর পরিহিত অবস্থায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, এই কাপড়গুলো ধুয়ে নিবে এবং আমাকে ঐ দু'টি কাপড়েই কাফন দিবে। আয়েশা (রা.) বলেন, আমরা কি আপনার জন্য নতুন কাপড় ক্রয় করব না? তিনি বললেন, না। জীবিত মানুষ নতুন কাপড়ের অধিক উপযোগী মৃত মানুষের তুলনায়। (ফাতহুল কাদীর) দ্বিতীয় দলিল হলো, ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস; উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় ছিল, উটনী থেকে পড়ে মারা গেছে। তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْنِ তাকে দু'টি কাপড়ে কাফন দাও। আকলী দলিল হলো, জীবিতদের ন্যূনতম পোশাক হলো দুই কাপড়। তাই মৃত্যুর পরও দুই কাপড়ে সীমাবদ্ধ রাখা জায়েজ হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার তিন কাপড়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ইজারের পরিমাণ হলো মাথা থেকে পা পর্যন্ত। চাদরও অনুরূপ। আর কামিজ হলো গলা থেকে পা পর্যন্ত। তবে এ জামার মধ্যে পকেট, কল্লি এবং আস্তীন হবে না।

وَاِذَا اَرَادُوْا لَفَّ الْكَفَنِ الخ মাইয়েতের কাফন পেঁচানোর পদ্ধতি হলো, প্রথমে চাদর বিছাবে। তারপর এর উপর ইজার বিছাবে। অতঃপর এর উপর জামা বিছাবে এবং মৃতব্যক্তির গায়ে তা পরিয়ে দিবে। তারপর ইজারের বাম দিক থেকে পেঁচাবে এরপর ডান দিক থেকে তাহলে ডান দিক উপরে থাকবে। একইভাবে চাদরও পেঁচানো হবে। হিদায়া গ্রন্থকার পুরষের কাফনের কাপড়ের মধ্যে পাগড়ির কথা আলোচনা করেননি। কেননা কেউ কেউ পাগড়িকে কাফনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করাকে মাকরূহ বলেছেন। কেননা পাগড়িকেও কাফনের অন্তর্ভুক্ত ধরা হলে কাফনের কাপড় জোড় হয়ে যায়। অথচ সুন্নত হলো কাফনের কাপড় বেজোড় হওয়া। অর্থাৎ তিনটি হওয়া। তবে কেউ কেউ পাগড়িকে উত্তম বলেছেন। দলিল হিসাবে তাঁরা বলেছেন, ইবনে ওমর (রা.) মাইয়েতকে পাগড়ি পরাতেন এবং পাগড়ির শিমলা মাইয়েতের চেহারার উপর রাখতেন। তবে এ মতটি হযরত আয়শা (রা.)-এর বাণী– كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ-এর বিপরীত হয়ে যায়।

ফায়িদা : কাফনের জন্য সুতী সাদা কাপড় ব্যবহার করা সুন্নত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন اِلْبَسُوْا مِنَ الْبَيَاضِ فَاِنَّهُ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ সাদা কাপড় পরিধান করো। কেননা এটা হলো উত্তম কাপড় এবং এগুলো দ্বারাই তোমাদের মৃতব্যক্তিদেরকে কাফন দাও।

وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَإِزَارٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَةٍ وَخِرْقَةٍ تُرْبَطُ فَوْقَ ثَدْيَيْهَا لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى اللَّوَاتِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ وَلِأَنَّهَا تَخْرُجُ فِيهَا حَالَةَ الْحَيٰوةِ فَكَذَا بَعْدَ الْمَمَاتِ ثُمَّ هٰذَا بَيَانُ كَفَنِ السُّنَّةِ وَإِنِ اقْتَصَرُوا عَلٰى ثَلٰثَةِ أَثْوَابٍ جَازَ وَهِيَ ثَوْبَانِ وَخِمَارٌ وَهُوَ كَفَنُ الْكِفَايَةِ وَيُكْرَهُ أَقَلُّ مِنْ ذٰلِكَ وَفِي الرَّجُلِ يُكْرَهُ الْاِقْتِصَارُ عَلٰى ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا فِي حَالَةِ الضَّرُوْرَةِ لِأَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ حِيْنَ اسْتُشْهِدَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَهٰذَا كَفَنُ الضَّرُوْرَةِ وَتُلْبَسُ الْمَرْأَةُ الدِّرْعَ أَوَّلًا ثُمَّ يُجْعَلُ شَعْرُهَا ضَفِيْرَتَيْنِ عَلٰى صَدْرِهَا فَوْقَ الدِّرْعِ ثُمَّ الْخِمَارُ فَوْقَ ذٰلِكَ ثُمَّ الْإِزَارُ تَحْتَ اللِّفَافَةِ قَالَ وَتُجْمَرُ الْأَكْفَانُ قَبْلَ أَنْ يُدْرَجَ فِيهَا الْمَيِّتُ وِتْرًا لِأَنَّهُ ﷺ أَمَرَ بِإِجْمَارِ أَكْفَانِ ابْنَتِهِ وِتْرًا وَالْإِجْمَارُ هُوَ التَّطْيِيْبُ فَإِذَا فَرَغُوْا مِنْهُ صَلُّوْا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا فَرِيْضَةٌ ۔

অনুবাদ : স্ত্রীলোককে পাঁচটি কাপড়ে কাফন দিবে। যথা– কোর্তা, ইজার, ওড়না, চাদর ও সিনাবন্দ যা দ্বারা তার সিনা বেঁধে রাখা হবে। কেননা উম্মু আতিয়্যাহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ তাঁর কন্যাকে গোসল দানকারিণী স্ত্রীলোকদেরকে পাঁচটি কাপড় দিয়েছিলেন এবং এ কারণে যে, জীবদ্দাশায় সাধারণত এই পাঁচ কাপড়ে সে বের হয়ে থাকে। সুতরাং মৃত্যুর পরেও অনুরূপ হবে। আর এটা হলো সুন্নত কাফনের বয়ান। যদি তিনটি কাপড়ের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখে যথা ইযার, চাদর ও ওড়না, তবে তা জায়েজ হবে। এটা হলো (মেয়েদের জন্য) ন্যূনতম কাফন (كفن كفاية)। এর চেয়ে কম করা মাকরূহ হবে। আর পুরুষের ক্ষেত্রে এক কাপড়ের উপর সীমিত করা মাকরূহ হবে জরুরি অবস্থা ছাড়া। কেননা মুস'আব ইবনে উমায়ের (রা.) যখন শহীদ হয়েছিলেন, তখন তাঁকে এক বস্ত্রে কাফন দেওয়া হয়েছিল। এ হলো জরুরি অবস্থায় কাফন (كفن ضرورت)। স্ত্রীলোককে প্রথমে কোর্তা পরানো হবে। তারপর তার চুলগুলো দুই ভাগ করে তার বুকে কোর্তার উপরে রাখতে হবে। তারপর তার উপরে ওড়না পরানো হবে। তারপর ইজার দেওয়া হবে চাদরের নিচে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কাফনের কাপড়ের মাঝে মাইয়েতকে রাখার পূর্বে বেজোড় সংখ্যায় ধুনী দেওয়া হবে। কেননা নবী করীম ﷺ তাঁর কন্যার কাফনকে বেজোড় সংখ্যায় ধুপ দিতে আদেশ করেছিলেন। আর ধুনী দেওয়ার মানে হলো সুরভিত করা। কাফন থেকে ফারিগ হয়ে মাইয়েতের উপর জানাযার নামাজ পড়বে। কেননা এ হলো ফরজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে স্ত্রীলোকদের সুন্নত কাফনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাই গ্রন্থকার বলেন, স্ত্রীলোকদের সুন্নত কাপড় পাঁচটি। কোর্তা, ইজার, ওড়না, চাদর এবং সিনাবন্দ যা দ্বারা তার সিনা বেঁধে রাখা হয়। দলিল হলো উম্মু আতিয়্যার হাদীস, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেয়ে হযরত যয়নাবের ওফাত হয়েছিল তখন যে সকল মহিলা তাঁকে গোসল দিয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ

তাদেরকে তার কাফনের জন্য এই পাঁচটি কাপড় দিয়েছিলেন। আকলী দলিল হলো, জীবদ্দশায় মহিলারা সাধারণত পাঁচ কাপড়ে থাকে, এরই উপর কিয়াস করে মৃত্যুর পরও তাদেরকে পাঁচ কাপড়ে কাফন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

وَاِنْ اِقْتَصَرُوا عَلٰى ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ الخ : উক্ত ইবারত দ্বারা মহিলাদের ন্যূনতম কাফনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের ন্যূনতম কাফনের কাপড় হলো তিনটি– ইজার, চাদর, ওড়না। তিনের কম কাপড়ে মহিলাদেরকে কাফন দেওয়া প্রয়োজন ছাড়া বরং মাকরূহ, তবে জরুরতের ভিত্তিতে জায়েজ আছে। আর এটাকে জরুরি অবস্থার কাফন বলা হবে। এমনিভাবে পুরুষদের এক কাপড়ে কাফন দেওয়া মাকরূহ। তবে প্রয়োজন সাপেক্ষে জায়েজ। পুরুষদের এক কাপড়ে কাফন হলো ন্যূনতম কাফন। দলিল হলো খাব্বাব ইবনে আরাত-এর হাদীস–

قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نُرِيْدُ وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَوَقَعَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَضٰى وَلَمْ يَاْخُذْ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَكُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَاْسَهٗ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَاِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَاْسُهٗ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُغَطِّيَ رَاْسَهٗ وَاَنْ نَجْعَلَ عَلٰى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْاِذْخِرِ .

খাব্বাব ইবনে আরাত (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করি। আমাদের প্রতিদান আল্লাহর নিকট সাব্যস্ত হয়ে আছে। আমাদের মধ্য থেকে যারা চলে গেছেন এবং দুনিয়ায় কিছু রেখে যাননি তাদের মধ্যে একজন হলেন মুস'আব ইবনে উমায়র (রা.) যিনি উহুদে শহীদ হোন। তিনি একটি ডোরা বিশিষ্ট চাদর রেখে যান। এর দ্বারা আমরা তাঁর মাথা ঢাকতে গেলে পা খুলে যায় আবার পা ঢাকতে গেলে মাথা খুলে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, আমরা যেন মুস'আবের মাথা ঢেকে দেই আর পদ দ্বয়ের উপর ইয্‌খার (ঘাস বিশেষ) দিয়ে দেই।

قَالَ وَتُجَمَّرُ الْاَكْفَانُ الخ : উক্ত ইবরাতের মধ্যে কাফনের কাপড়ে ধুনী দেওয়ার হুকুম বর্ণিত হয়েছে। اجمار বলা হলো ধুনী দিয়ে সুগন্ধিময় করাকে। ধুনী বেজোড় সংখ্যায় দেওয়া সুন্নত। যেমন উপরে বর্ণিত হাদীসে এর সাক্ষ্য রয়েছে। কাফন থেকে ফারিগ হওয়ার পর তার উপর জানাযার নামাজ পড়া হবে। কেননা জানাযার নামাজ হলো ফরজে কিফায়া।

فَصْلٌ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الْمَيِّتِ

وَاَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلٰوةِ عَلَى الْمَيِّتِ السُّلْطَانُ اِنْ حَضَرَ لِاَنَّ فِى التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ اِزْدِرَاءً بِهٖ فَاِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَالْقَاضِىْ لِاَنَّهٗ صَاحِبُ وِلَايَةٍ فَاِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيْمُ اِمَامِ الْحَيِّ لِاَنَّهٗ رَضِيَهٗ فِىْ حَالِ حَيَاتِهٖ قَالَ ثُمَّ الْوَلِيُّ وَالْاَوْلِيَاءُ عَلَى التَّرْتِيْبِ الْمَذْكُوْرِ فِى النِّكَاحِ ـ

অনুচ্ছেদ : মাইয়েতের উপর নামাজ আদায়

অনুবাদ : সুলতান যদি উপস্থিত থাকেন তবে মাইয়েতের উপর নামাজ আদায়ের ব্যাপারে তিনিই সবচেয়ে বেশি হকদার। কেননা তার উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলে এতে তাঁর অবমাননা হয়। যদি তিনি উপস্থিত না থাকেন তবে বিচারক (অধিক হকদার)। কেননা তিনিও কর্তৃত্বের অধিকারী। আর যদি তিনিও উপস্থিত না থাকেন তবে মহল্লার ইমামকে অগ্রাধিকার দান করা মুস্তাহাব। কেননা মাইয়েত তার জীবদ্দশায় তার ইমামতিতে সন্তুষ্ট ছিল। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তারপর মাইয়েতের অভিভাবক অধিক হকদার। আর ওয়ালী বা অভিভাবকদের ক্রম সেই অনুসারেই হবে, যা নিকাহ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জানাযার নামাজ শরিয়ত অনুমোদিত হওয়ার উপর দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী –صَلُّوْا عَلٰى كُلِّ بَرٍّ وَّفَاجِرٍ এবং উম্মতের ইজমা। (কিফায়া) জানাযার নামাজ ফরজে কিফায়া। ফরজ তো এ জন্য যে, কুরআনের মধ্যে وصل আর হাদীসের মধ্যে صلوا - امر-এর সীগাহ ব্যবহৃত হয়েছে। আর امر -এর চাহিদা হলো ওয়াজিব (ফরজ)। কিফায়া এ জন্য যে, সমস্ত মানুষের উপর ওয়াজিব করা অসম্ভব অথবা তার মধ্যে কষ্টসাধ্য বিষয়। এ জন্য কিছু সংখ্যকের উপর اكتفاء করা হয়েছে। যেমন– জিহাদের মধ্যে জানাযার নামাজ ওয়াজিব হওয়ার কারণ (سبب) হলো মৃত হওয়া। নামাজ জায়েজ হওয়ার প্রথম শর্ত হলো মৃতব্যক্তির মুসলমান হওয়া। কেননা কাফিরের উপর জানাযার নামাজ পড়া জায়েজ নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ দ্বিতীয় শর্ত হলো, মৃতব্যক্তির পাক পবিত্র হওয়া। সুতরাং যদি গোসল দেওয়ার পূর্বে জানাযার নামাজ পড়া হয় তবে গোসল দেওয়ার পর পুনরায় পড়তে হবে। তৃতীয় শর্ত হলো, জানাযা মুসল্লীর সামনে হওয়া। সুতরাং গায়েবানা জানাযা পড়া জায়েজ নেই। এমনিভাবে জানাযা যদি মুসল্লীর পিছনে হয় তবুও জানাযার নামাজ জায়েজ নেই।

وَاَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلٰوةِ الخ জানাযার নামাজের ইমামত-এর যোগ্যদের তারতীব এই যে, যদি বাদশাহ বা রাষ্ট্রপ্রধান উপস্থিত থাকেন তবে জানাযার ইমামতের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি তিনিই হবেন। কেননা বাদশাহর উপস্থিতিতে অন্য কাউকে ইমাম বানানোর দ্বারা তাঁর অবমাননা হয়। অথচ বাদশাহ হলো যিল্লুল্লাহ তথা আল্লাহর ছায়া। সুতরাং যে তার ইজ্জত করবে আল্লাহও তার ইজ্জত করবেন। আর যে তার অবমাননা করবে আল্লাহও তার আমাননা করবেন। যদি বাদশাহ উপস্থিত না

থাকেন তবে বিচারক ইমামতের যোগ্য বলে গণ্য হবেন। কেননা বিচারকের সকলের উপর কর্তৃত্ব আছে। যদিও বিচারক রাষ্ট্রপ্রধানের মনোনয়নের মাধ্যমেই মনোনীত হয়ে থাকে। তাই উভয়ের অগ্রাধিকার হলো ওয়াজিব। অতঃপর বিচারকও যদি উপস্থিত না থাকেন তবে মহল্লার ইমামকে অগ্রাধিকার দান করা মুস্তাহাব। কেননা মাইয়েত তার জীবদ্দশায় তার ইমামতের উপর সন্তুষ্ট ছিল। তাই মৃত্যুর পরও তার সন্তুষ্টির ইমামই উত্তম বলে গণ্য হবে। তা ছাড়া সে শরিয়াতের বিরোধীও নয়। অতঃপর মাইয়েতের অভিভাবক ইমামতের যোগ্য। আর মাইয়েতের অভিভাবকদের ইমামতের ক্ষেত্রে ঐ তারতীব তথা ক্রমধারা প্রযোজ্য হবে যে ক্রমধারা নিকাহ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে তবে নিকাহের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের ছেলে স্ত্রীলোকের পিতার উপর অগ্রাধিকার পাবে। আর এখানে পিতা ইমামতের অধিক যোগ্য। আর যদি মাইয়েতের দুই অভিভাবক সমপর্যায়ের হয়। যেমন– তার দুই সৎ ভাই রয়েছে। তবে এদের মধ্যে যার বয়স বেশি সে অগ্রাধিকার পাবে। তবে তার এই এখ্‌তিয়ার নেই যে, নিজের স্থানে অন্য কোনো অপরিচিত জনকে ইমামত করার জন্য আগে বাড়িয়ে দিবে, তবে অন্যরা যদি রাজি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হুকুম ভিন্ন। ইনায়া গ্রন্থকারের বর্ণনা অনুযায়ী হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ আবূ হানীফা (র.) থেকে ক্রমধারা এভাবে যে, প্রথম হলো সুলতান তথা খলীফা, তারপর ঐ শহরের গভর্নর, তারপর বিচারপতি, তারপর তত্ত্বাবধায়ক বিচারক, তারপর মহল্লার ইমাম, তারপর মৃত ব্যক্তির অভিভাবক। উক্ত ক্রমধারাটি অধিকাংশ মাশায়িখ গ্রহণ করেছেন। ক্রমধারার মধ্যে মাইয়েতের অভিভাবক সবার পরে হওয়া তরফাইনের মতানুযায়ী। নতুবা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত হলো, অভিভাবক সর্বাবস্থায় মাইয়েতের নামাজের অধিক হকদার। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ ـ

তরফাইনের দলিল হলো, হাসান ইবনে আলী (রা.)-এর যখন ওফাত হয়েছিল তখন জানাজার নামাজের জন্য হুসাইন (রা.)-এর আরো অন্যান্য লোকেরা এসেছিলেন। সায়্যেদেনা হুসাইন (রা.) ইমামতের জন্য সাঈদ ইবনুল আস (রা.)-কে আগ বাড়িয়ে দিলেন। যিনি ঐ সময় হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে মদীনার হাকিম ছিলেন। সাঈদ ইবনুল আস (রা.) সামনে অগ্রসর হতে অস্বীকার করলেন। তখন হুসাইন (রা.) বলেছিলেন সামনে যান, এটাই হলো সুন্নত। যদি এটা সুন্নত না হতো তবে আমি আপনাকে সামনে যেতে বলতাম না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পেশকৃত আয়াতটি وَاُولُوا الْاَرْحَامِ (الاية) মিরাস আর বিবাহের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ বিবাহের অভিভাবকত্ব একমাত্র অভিভাবকদের জন্য, বাদশাহ সহ অন্যদের জন্য নয়।

فَاِنْ صَلَّى غَيْرُ الْوَلِيِّ وَ السُّلْطَانِ اَعَادَ الْوَلِيُّ يَعْنِىْ اِنْ شَاءَ لِمَا ذَكَرْنَا اَنَّ الْحَقَّ لِلْاَوْلِيَاءِ وَاِنْ صَلَّى الْوَلِيُّ لَمْ يَجُزْ لِاَحَدٍ اَنْ يُّصَلِّىَ بَعْدَهٗ لِاَنَّ الْفَرْضَ يَتَادّٰى بِالْاَوَّلِ وَالنَّفْلُ بِهَا غَيْرُ مَشْرُوْعٍ وَلِهٰذَا رَاَيْنَا النَّاسَ تَرَكُوْا عَنْ اٰخِرِهِمُ الصَّلٰوةَ عَلٰى قَبْرِ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُضِعَ ـ

অনুবাদ : সুতরাং যদি ওলী ও বাদশাহ ছাড়া অন্য কেউ জানাযার নামাজ পড়িয়ে থাকে তবে ওলী তা পুনরায় পড়তে পারবেন, যদি ইচ্ছা করেন। কেননা আমরা বলে এসেছি যে, অধিকার বা হক হলো ওলীদের। যদি ওলী জানাযা পড়ে থাকেন তাহলে তার পরে অন্য কারো জন্য আর জানাযার নামাজ আদায় করা জায়েজ নয়। কেননা ফরজ তো প্রথমবার পড়া দ্বারাই আদায় হয়ে গেছে। আর নফল হিসাবে জানাযা পড়া শরিয়ত স্বীকৃত নয়। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই যে, সকল স্তরের লোকেরা নবী করীম ﷺ -এর রওযা শরীফে জানাযা পড়া থেকে বিরত রয়েছেন। অথচ যেভাবে কবরে রাখা হয়েছে, সে ভাবেই তাঁর পবিত্র দেহ এখন পর্যন্ত বিদ্যমান আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি ওলী ও বাদশাহ ছাড়া অন্য কেউ জানাযার নামাজ পড়িয়ে দেয়, তবে ওলী জানাযার নামাজ পুনরায় আদায় করতে পারেন। আর যদি বাদশাহ নামাজ পড়িয়ে দেন কিংবা এমন লোকে পড়িয়ে দেন যিনি জানাযার নামাজের ক্রমধারার ইমামতের মধ্যে ওলীর উপর অগ্রাধিকার রাখেন, তবে ওলী এ নামাজ পুনরায় আদায় করতে পারবে না। আর যদি ওলী জানাযার নামাজ পড়িয়ে দেন তবে এরপর অন্য কারো পক্ষে আর মাইয়েতের উপর জানাযার নামাজ পড়ার ইজাযত নেই। দলিল হলো, ওলীর নামাজ আদায় করার দ্বারা ফরজ তো একবার আদায় হয়ে গেছে। আর নফল হিসাবে জানাযা পড়া শরিয়ত স্বীকৃত নয়। এ জন্য ওলীর নামাজ পড়ার পর অন্য কারো নামাজ পড়ার অধিকার নেই। এটা হলো আমাদের মাযহাব। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, জানাযার নামাজ বারবার পড়া যায়। তাঁর দলিল হলো, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি নতুন কবর অতিক্রম করছিলেন, তিনি কবর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে বলা হলো এটা অমুক স্ত্রীলোকের কবর। তিনি বললেন, আমাকে জানাযার নামাজের জন্য কেন অবহিত করা হলো না? উত্তর দেওয়া হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এই স্ত্রীলোকটিকে রাতে দাফন করা হয়েছে। আমাদের ভয় হচ্ছিল পোকা-মাকড় আপনাকে কষ্ট দেয় কিনা, এ জন্য আমরা আর খবর দেয়নি। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং কবরের উপর নামাজ পড়লেন। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জানাযার সময় সাহাবায়ে কেরামের দলে দলে এসে নামাজ পড়ার প্রমাণ রয়েছে, উপরোক্ত ঘটনা দু'টি দ্বারা বুঝা যায় যে, জানাযার নামাজ একবারের পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার পড়ারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমাদের দলিল উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ওলী কিংবা যিনি প্রথম বার নামাজ পড়েছেন তার দ্বারা তো ফরজ আদায় হয়ে গেছে। আর জানাযার ক্ষেত্রে নফল পড়ার স্বীকৃতি শরিয়ত দ্বারা সমর্থিত নয়। এ কারণেই সকল স্তরের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কবরের উপর নামাজ পড়া থেকে বিরত রয়েছেন। যদি নফল জানাযা শরিয়ত কর্তৃক সমর্থিত হতো তবে সকলে মিলে তা থেকে বিরত থাকতেন না। অথচ রাসূলে আকরাম ﷺ আজও তাঁর কবর মুবারকে এমনভাবে শায়িত যেমনটি তাঁকে দাফন করা হয়েছিল। কেননা নবীগণের গোশ্‌ত জমিনের জন্য হারাম। আম্বিয়ায়ে কেরামের শরীরকে জমিনের মাটি পরিবর্তন করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে, ঐ স্ত্রীলোকটির কবরের উপর নামাজ পড়েছেন তা এই কারণে ছিল যে, এটা হলো তাঁর হক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্ত হক বাদ দেওয়ার অধিকার কারো নেই। দ্বিতীয় ঘটনার জওয়াব হলো, সিদ্দীকে আকবর খলীফাতুল মুসলিমীন হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জানাযার নামাজের অধিক হকদার ছিলেন। কিন্তু তিনি খিলাফতের মাসআলা সমাধান করা এবং বহুমুখী ফিতনার মোকাবিলা করতে গিয়ে তার আসতে কিছুটা বিলম্ব হয়ে যায়। লোকেরা তাঁর আগমনের পূর্বেই নামাজ পড়া শুরু করে দিয়েছে। তিনি যখন খেলাফতের কাজ সমাধা করে ফারিগ হলেন তখন জানাযার নামাজ পড়লেন। তারপর আর কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জানাযার নামাজ পড়েননি।

وَاِنْ دُفِنَ الْمَيِّتُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ صُلِّيَ عَلٰى قَبْرِهٖ لِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى عَلٰى قَبْرِ اِمْرَأَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَيُصَلّٰى عَلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يَتَفَسَّخَ وَالْمُعْتَبَرُ فِيْ مَعْرِفَةِ ذٰلِكَ اَكْبَرُ الرَّأْيِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِاِخْتِلَافِ الْحَالِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ ـ

অনুবাদ : যদি জানাযা না পড়েই মৃতব্যক্তিকে দাফন করা হয়ে থাকে তবে তার কবরের উপরেই জানাযা পড়বে। কেননা নবী করীম ﷺ জনৈক আনসারী স্ত্রীলোকের কবরের উপর জানাযা পড়েছিলেন। তবে লাশ গলিত হওয়ার পূর্বেই তার জানাযা পড়বে। আর তা বোঝার ব্যাপারে প্রবল ধারণাই হলো ধর্তব্য। এটিই বিশুদ্ধ মত। কেননা অবস্থা, সময় ও স্থান বিভিন্ন রকম রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কোনো মাইয়েতকে যদি জানাযার নামাজ আদায় করা ব্যতীত দাফন করা হয় তবে তার কবরের উপরেই নামাজ পড়া হবে। দলিল হলো, একজন আনসারী স্ত্রীলোককে এই অবস্থায় দাফন করা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযার নামাজ পড়েছিলেন না। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা জানলেন তখন তার কবরের উপর নামাজ পড়লেন।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কবরের উপর নামাজ পড়ার ইজাযত মাইয়েতের খারাপ এবং ছিন্নভিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জায়েজ হবে। ফুলে ফেটে যাওয়ার পর জায়েজ নেই। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ফুলা বা ফেটে যাওয়া চিনার উপায় হলো প্রবল ধারণার উপর। অর্থাৎ প্রবল ধারণা যদি এই হয় যে, লাশ ফুলেওনি ফাটেওনি তবে কবরের উপর জানাযার নামাজ পড়া যাবে। আর প্রবল ধারণা যদি এই হয় যে, মাইয়েত ফুলে বা ফেটে গেছে তবে তার উপর জানাযা পড়ার ইজাযত নেই। এটিই বিশুদ্ধ মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, দাফন করার পর তিনদিন পর্যন্ত কবরের উপর নামাজ পড়া জায়েজ আছে। এরপর জায়েজ নেই। বিশুদ্ধ মতের দলিল হলো, লাশ বিনষ্ট হওয়া মাইয়েতের অবস্থার বিভিন্নতার কারণে হয়ে থাকে। মোটাতাজা লাশ চীকন হালকা লাশের তুলনায় দ্রুত বিনষ্ট এবং ফুলে ফেটে যায়। এমনিভাবে মৌসম আর স্থানের বিভিন্নতার কারণেও বিভিন্ন রকম ধারণ করে। এমনকি গরম আর বর্ষার মৌসুমে ঠাণ্ডার মৌসুমের তুলনায় দ্রুত পচে গলে যায়। ভিজা ও আর্দ্র ভূমিতে শুষ্ক ভূমির তুলনায় দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। মোটকথা, যদি প্রবল ধারণা এই হয় যে, তিন দিনের পূর্বেই লাশ বিকৃত হয়ে গেছে তবে তার উপর নামাজ পড়া জায়েজ নেই। আর যদি প্রবল ধারণা এই হয় যে, তিন দিনের পরেও নষ্ট হয়নি তবে তার উপর তিন দিনের পরও নামাজ পড়া জায়েজ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দীর্ঘ আট বছর পর উহুদের শহীদানদের কবরের উপর নামাজ পড়েছেন এর জওয়াব হলো, তিনি শুহাদায়ে উহুদের জন্য দোয়া করেছেন আর দোয়াকেই صلى দ্বার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় জওয়াব হলো, শহীদগণের শরীর যেহেতু পচে না গলে না, তাই দীর্ঘদিন পরেও তাদের কবরের উপর নামাজ পড়াতে কোনো অসুবিধা নেই।

وَالصَّلٰوةُ اَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيْرَةً يَحْمَدُ اللّٰهَ عَقِيْبَهَا ثُمَّ يُكَبِّرَ تَكْبِيْرَةً وَيُصَلِّىْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَةً يَدْعُوْ فِيْهَا لِنَفْسِهٖ وَلِلْمَيِّتِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَيُسَلِّمُ لِاَنَّهٗ ﷺ كَبَّرَ اَرْبَعًا فِىْ اٰخِرِ صَلٰوةٍ صَلَّاهَا فَنُسِخَتْ مَا قَبْلَهَا وَلَوْ كَبَّرَ الْاِمَامُ خَمْسًا لَمْ يُتَابِعْهُ الْمُؤْتَمُّ خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) لِاَنَّهٗ مَنْسُوْخٌ لِمَا رَوَيْنَا وَيَنْتَظِرُ تَسْلِيْمَةَ الْاِمَامِ فِىْ رِوَايَةٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَالْاِتْيَانُ بِالدَّعْوَاتِ اِسْتِغْفَارٌ لِلْمَيِّتِ وَالْبِدَايَةُ بِالثَّنَاءِ ثُمَّ بِالصَّلٰوةِ سُنَّةُ الدُّعَاءِ وَلَا يَسْتَغْفِرُ لِلصَّبِيِّ وَلٰكِنْ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا وَلَوْ كَبَّرَ الْاِمَامُ تَكْبِيْرَةً اَوْ تَكْبِيْرَتَيْنِ لَايُكَبِّرُ الْاٰتِىْ حَتّٰى يُكَبِّرَ اُخْرٰى بَعْدَ حُضُوْرِهٖ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَحْضُرُ لِاَنَّ الْاُوْلٰى لِلْاِفْتِتَاحِ وَالْمَسْبُوْقُ يَاْتِىْ بِهٖ وَلَهُمَا اَنَّ كُلَّ تَكْبِيْرٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ رَكْعَةٍ وَالْمَسْبُوْقُ لَايَبْتَدِىْ بِمَا فَاتَهٗ اِذْ هُوَ مَنْسُوْخٌ وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فَلَمْ يُكَبِّرْ مَعَ الْاِمَامِ لَايَنْتَظِرُ الثَّانِيَةَ بِالْاِتِّفَاقِ لِاَنَّهٗ بِمَنْزِلَةِ الْمُدْرِكِ ـ

অনুবাদ : জানাযার নামাজ হলো, প্রথমে এক তাকবীর বলবে। অতঃপর ছানা পড়বে। অতঃপর আরেক তাকবীর বলে নবী করীম ﷺ -এর উপর দরুদ পড়বে। অতঃপর আরেক তাকবীর বলে নিজের জন্য, মাইয়েতের জন্য এবং মুসলমানদের জন্য দোয়া করবে। অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষ যে জানাযা পড়েছেন, তাতে চার তাকবীর বলেছিলেন। সুতরাং তা পূর্ববর্তী আমল রহিত করে দিয়েছে। ইমাম যদি পঞ্চম তাকবীর বলেন, তবে মুক্তাদী তাকে অনুসরণ করবে না। ইমাম যুফার (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। আমাদের দলিল হলো, পঞ্চম তাকবীরের হাদীসটি আমাদের পূর্ব বর্ণনার প্রেক্ষিতে রহিত হয়ে গেছে। তবে এক বর্ণনা মতে মুক্তাদী ইমামের সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করবে। এ মতই গ্রহণীয়। আর দোয়াসমূহ পাঠ করার উদ্দেশ্য হলো মাইয়েতের জন্য ইস্তিগ্ফার করা। আর প্রথমে ছানা, এরপর দরুদ পাঠ হলো দোয়ার সুন্নত। বাচ্চার জন্য ইস্তিগ্ফার করবে না; বরং এ দোয়া পড়বে اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا হে আল্লাহ তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী করুন এবং আমাদের জন্য তাকে সওয়াব লাভের মাধ্যম এবং আখিরাতের সঞ্চয় বানিয়ে দিন এবং তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী ও সুপারিশ গ্রহণকৃত বানিয়ে দিন। ইমাম যদি এক তাকবীর বা দুই তাকবীর বলে ফেলে তবে (পরে) আগত ব্যক্তি তার উপস্থিতির পর ইমামের আরেক তাকবীর বলার পূর্বে তাকবীর বলবে না। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে উপস্থিতির সময়েই তাকবীর বলবে। কেননা প্রথম তাকবীর হলো নামাজ শুরু করার তাকবীর। আর মাসবূককে এ তাকবীর বলতে হয়। উভয় ইমামের দলিল হলো, (জানাযার) প্রতিটি তাকবীর একেক রাকআতের স্থলবর্তী। আর মাসবূক ব্যক্তির নামাজের যে অংশ ফউত হয়ে যায় তা দিয়ে নামাজ শুরু করে না। কেননা এরূপ করা রহিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যদি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ইমামের সঙ্গে তাকবীর না বলে থাকে, তবে সকলের মতেই সে দ্বিতীয় তাকবীরের জন্য অপেক্ষা করবে না। কেননা সে মুদারিকের সমপর্যায়ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরে বর্ণিত ইবারতের মধ্যে জানাযার নামাজের কায়ফিয়ত তথা অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তাই গ্রন্থকার বলেন, জানাযার নামাজ চার তাকবীরের সমষ্টির নাম। তার ব্যাখ্যা হলো, নিয়তের পর তাকবীরে তাহরীমা বাঁধবে এবং উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাবে। এরপর আল্লাহর প্রশংসা করবে অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ কিংবা এই জাতীয় কোনো বাক্য পড়বে। তবে কেউ কেউ

বলেছেন سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ الخ পড়বে যেমনটি অন্যান্য নামাজে পড়া হয়। আমাদের মতে প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পড়া শরিয়ত স্বীকৃত নয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.) সূরায়ে ফাতিহা পড়ার পক্ষে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) জানাযার নামাজকে অন্যান্য নামাজের উপর কিয়াস করেছেন। সুতরাং যেমনিভাবে অন্যান্য নামাজে কুরআন পড়া জরুরি এমনিভাবে জানাযার নামাজের মধ্যেও কুরআন পড়া জরুরি।

আমাদের দলিল হলো, হযরত নাফে' (র.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, إِنَّ ابْنَ عُمَرَ (رض) كَانَ لَا يَقْرَأُ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الْجَنَازَةِ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) জানাযার নামাজে কিরাআত পড়তেন না। আকলী দলিল হলো, জানাযার নামাজে নিরেট একটি রুকন তথা কিয়াম-এর নাম। আর একটি রুকনের মধ্যে কুরআন পড়া শরিয়ত স্বীকৃত নয়। যেমন সিজদায়ে তিলাওয়াতের মধ্যে একটি মাত্র রুকন হওয়ার কারণে কিরাআত পড়া শরিয়ত স্বীকৃত নয়। অতঃপর দ্বিতীয় তাকবীর বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর দরুদ পড়বে। কেননা আল্লাহর প্রশংসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি দরুদেরই মর্যাদা। যেমন তাশাহহুদের মধ্যে এই তারতীবই রয়েছে। খুতবার মধ্যেও এই তারতীব রাখা হয়েছে। অতঃপর তৃতীয় তাকবীর বলে নিজের জন্য, মাইয়েতের জন্য এবং সমস্ত মুসলমানদের জন্য দোয়া করবে। যদি জানা থাকে তবে নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا الخ যদি এই দোয়া মনে না পড়ে তবে যে দোয়া মনে আসে তা-ই পড়বে। হামদে বারী ও রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি দরুদের পর দোয়া এ জন্য রাখা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدْعُوَ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ يَدْعُوْ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন দোয়ার ইরাদা করবে তবে সে আল্লাহর হাম্দ করবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরুদ পড়বে, তারপর দোয়া করবে। তারপর চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরাবে। চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম এ জন্য ফিরাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ জানাযার নামাজে চার তাকবীর বলেছিলেন। সুতরাং এর পূর্বের আমল যদি এর বিপরীতও হয় তবে তা রহিত হয়ে গেছে। ইনায়া গ্রন্থকার লিখেছেন চতুর্থ তাকবীরের পর আর সালামের পূর্বে যাহিরুর রিওয়ায়াত অনুযায়ী কোনো দোয়া নেই। কোনো কোনো মাশায়িখ বলেছেন সালামের পূর্বে এ দোয়া পড়বে- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ। ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম যদি পঞ্চম তাকবীর বলে তবে মুক্তাদী উক্ত পঞ্চম তাকবীরের মধ্যে ইমামের অনুসরণ করবে না। কেননা চার এর অধিক তাকবীরগুলো উপরোক্ত হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, ইমাম যদি পঞ্চম তাকবীর বলে তবে মুক্তাদী তার অনুসরণ করবে। তাঁর দলিল হলো, চার এর অধিক তাকবীরের মাসআলাটি বিরোধপূর্ণ। যেমন- বর্ণিত আছে একদা হযরত আলী (রা.) জানাযার নামাজের মধ্যে চার তাকবীরের পর পঞ্চম তাকবীর বলেছিলেন। তখন মুক্তাদীরা হযরত আলী (রা.)-এর অনুসরণ করেছিল। আমাদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব হলো, সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে পরামর্শ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বশেষ নামাজের দিকে প্রত্যাবর্তন (رجوع) করেছেন। সুতরাং হযরত আলী (রা.)-এর পঞ্চম তাকবীর বলা রহিত হয়ে গেছে। আর রহিত হওয়া বস্তুর অনুসরণ করা ভুল। মুক্তাদী যখন পঞ্চম তাকবীরে ইমামের অনুসরণ করবে না তাহলে তারা কি করবে? এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দু'টি বর্ণনা রয়েছে। এক. মুক্তাদী তাৎক্ষণিকভাবে সালাম ফিরাবে, যাতে পঞ্চম তাকবীরে ইমামের বিরোধিতা প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় রিওয়ায়াত হলো, মুক্তাদী ইমামের সালাম ফিরানোর অপেক্ষায় থাকবে, যাতে সালামের মধ্যে অনুসরণ হয়ে যায়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, দ্বিতীয় রিওয়ায়াতটি-ই গ্রহণীয়। গ্রন্থকার বলেন, দোয়াসমূহ পড়ার উদ্দেশ্য হলো মূলত মাইয়েতের জন্য মাগফিরাত চাওয়া। আর প্রথমে ছানা তারপর নবী ﷺ-এর উপর দরুদ পড়া হলো দোয়ার সুন্নত। এ কারণে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর জন্য ইস্তিগ্ফার করা হয় না। কেননা প্রাপ্ত বয়স্ক (مكلف) না হওয়ার কারণে তার থেকে কোনো গুনাহের কাজ হয় না। তবে এই দোয়া পড়বে اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَ ذُخْرًا وَ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا - কোনো ব্যক্তি যদি জানাযার নামাজে এমন সময় শামিল হয় যে, ইমাম এক বা দুই তাকবীর বলে ফেলেছেন, তবে আগন্তুক ব্যক্তি কোনো তাকবীর বলবে না; বরং তার হাজির হওয়ার পর যখন ইমাম তাকবীর বলবে তখন তার সাথে সে-ও তাকবীর বলবে এবং ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো ইমামের সালাম ফিরাবার পর কাজা করে নিবে। এটা হলো তরফাইনের মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, হাযির হওয়ার সাথে সাথেই ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো বলবে। তাঁর দলিল হলো, প্রথম তাকবীর অর্থাৎ তাকবীরে তাহ্রীমার পর আগন্তুক ব্যক্তি মাসবূকের অনুরূপ হয়ে যায়। আর মাসবূক শামিল হওয়ার পর তাকবীরে তাহরীমা অবশ্যই বলে তাই এ ব্যক্তিও বলবে। তরফাইনের দলিল হলো, এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মাসবূকের অনুরূপ। কিন্তু জানাযার নামাজের প্রতিটি তাকবীর একেক রাকআতের স্থলবর্তী। এ কারণেই তো জানাযার নামাজের ব্যাপারে বলা হয়েছে أَرْبَعٌ كَأَرْبَعِ الظُّهْرِ উল্লেখ্য যে, মাসবূক ছুটে যাওয়া রাকআত গুলোর কাজা ইমামের সালাম ফিরাবার পর করে থাকে, আগে নয়। কেননা সালামের পূর্বে কাজা করার হুকুম রহিত হয়ে গেছে। কোনো ব্যক্তি শুরু থেকে উপস্থিত ছিল কিন্তু ইমামের সাথে তাকবীর বলেনি, তবে এই ব্যক্তি ইমামের দ্বিতীয় তাকবীরের অপেক্ষা করবে না। কেননা এই ব্যক্তি মুদরিকের ন্যায়।

وَيَقُوْمُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِحِذَاءِ الصَّدْرِ لِاَنَّهُ مَوْضَعُ الْقَلْبِ وَفِيْهِ نُوْرُ الْاِيْمَانِ فَيَكُوْنُ الْقِيَامُ عِنْدَهُ اِشَارَةً اِلَى الشَّفَاعَةِ لِاِيْمَانِهِ وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ يَقُوْمُ مِنَ الرَّجُلِ بِحِذَاءِ رَأْسِهِ وَمِنَ الْمَرْأَةِ بِحِذَاءِ وَسْطِهَا لِاَنَّ اَنَسًا (رضـ) فَعَلَ كَذٰلِكَ وَقَالَ هُوَ السُّنَّةُ قُلْنَا تَاوِيْلُهُ اَنَّ جَنَازَتَهَا لَمْ تَكُنْ مَنْعُوْشَةً فَحَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ ـ

অনুবাদ : যে (ইমাম) পুরুষ বা স্ত্রীলোকের উপর (জানাযার) নামাজ পড়বে সে বুক বরাবর দাঁড়াবে। কেননা তা কলবের স্থান এবং তাতেই ঈমানের নূর বিদ্যমান থাকে। সুতরাং সেই বরাবর দাঁড়ানোর অর্থ এই দিকে ইঙ্গিত করা যে, তার ঈমানের কারণে শাফাআত করা হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ইমাম পুরুষের মাথা বরাবর এবং স্ত্রীলোকের মাঝামাঝি দাঁড়াবে। কেননা আনাস (রা.) এরূপ করেছেন এবং বলেছেন যে, এটাই সুন্নত। আনাস (রা.) সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাখ্যায় আমরা বলি যে, উক্ত মহিলার জানাযার উপর অতিরিক্ত আবরণ ছিল না। কাজেই তিনি স্ত্রীলোকটির জানাযা এবং লোকদের সাথে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : জানাযা পুরুষের হোক বা স্ত্রীলোকের হোক, নামাজের সময় ইমাম বুক বরাবর দাঁড়াবে। দলিল হলো, সিনা (বুক) হলো কলবের স্থান আর কলবের মধ্যে ঈমানের নূর বিদ্যমান থাকে। সুতরাং সিনা বরাবর দাঁড়ানোর দ্বারা এ কথার ইঙ্গিত করে শাফাআত তার ঈমানের কারণে করা হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, জানাযা যদি পুরুষের হয় তবে ইমাম তার মাথা বরাবর দাঁড়াবে। আর যদি জানাযা স্ত্রীলোকের হয় তবে ইমাম তার মাঝামাঝি দাঁড়াবে। দলিল হলো আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস– رُوِىَ عَنْ نَافِعٍ اَبِىْ غَالِبٍ قَالَ كُنْتُ فِىْ سِكَّةِ الْمَرْبَدِ فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ مَعَهَا نَاسٌ كَثِيْرٌ قَالُوْا جَنَازَةُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرٍ فَتَبِعْتُهَا فَاِذَا اَنَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ كِسَاءٌ رَقِيْقٌ عَلٰى رَأْسِهِ خِرْقَةٌ تَقِيْهِ مِنَ الشَّمْسِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا الدِّهْقَانُ قَالُوْا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ قَامَ اَنَسٌ فَصَلّٰى عَلَيْهَا وَاَنَا خَلْفَهُ لَايَحُوْلُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ شَىْءٌ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ لَمْ يُطِلْ وَلَمْ يُسْرِعْ ثُمَّ ذَهَبَ يَقْعُدُ فَقَالُوْا يَا اَبَا حَمْزَةَ الْمَرْأَةُ الْاَنْصَارِيَّةُ فَقَرَّبُوْهَا وَعَلَيْهَا نَعْشٌ اَخْضَرُ فَقَامَ عِنْدَ عَجِيْزَتِهَا فَصَلّٰى عَلَيْهَا نَحْوَ صَلٰوتِهِ عَلَى الرَّجُلِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يَا اَبَاحَمْزَةَ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ عَلَى الْجَنَائِزِ كَصَلٰوتِكَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا اَرْبَعًا وَيَقُوْمُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيْزَةِ الْمَرْأَةِ قَالَ نَعَمْ ـ হযরত নাফে' সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি জানাযা অনেক লোকজন সহ গলি দিয়ে যাচ্ছিল। লোকেরা বলল, এটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমায়রের জানাযা। (নাফে' বলেন,) আমিও জানাযার সাথে চললাম। আমি দেখলাম যে, একটি লোক যার শরীরের উপর একটি পাতলা চাদর এবং গরম থেকে পরিত্রাণের জন্য মাথার উপর একটি কাপড় রয়েছে। আমি বললাম, এটা কোন দেশী কিষাণ? লোকেরা বলল, ইনি আনাস ইবনে মালিক (রা.)! নাফে' বলেন, যখন জানাযা জমিনের উপর রাখা হলো তখন আনাস (রা.) দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ালেন। আমি তাঁর পিছনে ছিলাম। আমি আর তাঁর মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক ছিল না। (সুতরাং আমি দেখলাম যে,) তিনি মাইয়েতের মাথার নিকট দাঁড়ালেন এবং চার তাকবীর এমনভাবে বললেন যে, অতি লম্বাও করেননি এবং দ্রুতও বলেননি। অতঃপর তিনি বসতে লাগলেন। লোকেরা বলল, ওহে আবূ হামযা (আনাস ইবনে মালিক) এক আনসারী স্ত্রীলোকের জানাযাও রয়েছে। লোকেরা (ঐ জানাযা) আনাস (রা.) -এর নিকট নিয়ে গেলেন, তার উপর একটি সবুজ রংয়ের একটি না'শ খাটের উপরে তক্তা ছিল। তিনি তার নিতম্বের পাশে অর্থাৎ মাঝামাঝি দাঁড়ালেন আর নামাজ পড়ালেন যেমনটি পুরুষের পড়িয়েছিলেন। অতঃপর বসে গেলেন। আলা ইবনে যিয়াদ বললেন, হে আবূ হামযা! রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কি জানাযার নামাজ এমনটি পড়েছিলেন? আনাস (রা.) বলেন, হ্যাঁ। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, হযরত আনাস (রা.) উক্ত তরীকাকেই সুন্নত বলেছেন।

হিদায়া প্রণেতা উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আনসারী স্ত্রীলোকটির জানাযার উপর না'শ কিন্তু এর দ্বারা স্ত্রীলোকটির পর্দা হচ্ছিল না। এ জন্য আনাস (রা.) ঐ স্ত্রীলোক আর লোকদের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার জন্য মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তবে গ্রন্থকারের উক্ত ব্যাক্যাটি এ কারণে গ্রহণযোগ্য নয় যে, হাদীসের মধ্যে পরিষ্কারভাবে وَعَلَيْهَا نَعْشٌ اَخْضَرُ বাক্যটি রয়েছে। وَفِيْهِ نَظَرٌ

فَإِنْ صَـ [illegible] جَنَازَةٍ رُكْبَانًا اَجْزَاهُمْ فِى الْقِيَاسِ لِاَنَّهَا دُعَاءٌ وَفِى الْاِسْتِحْسَانِ لَاتُجْزِيْهِمْ لِاَنَّهَا صَلٰوةٌ مِنْ وَجْهٍ لِوُجُوْدِ التَّحْرِيْمَةِ فَلَايَجُوْزُ تَرْكُهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ اِحْتِيَاطًا وَلَا بَأْسَ بِالْاِذْنِ فِىْ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ لِاَنَّ التَّقَدُّمَ حَقُّ الْوَلِيِّ فَيَمْلِكُ اِبْطَالَهُ بِتَقْدِيْمِ غَيْرِهِ وَفِىْ بَعْضِ النُّسَخِ لَا بَأْسَ بِالْاَذَانِ اَىْ اَلْاِعْلَامِ وَهُوَ اَنْ يُعْلِمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِيَقْضُوْا حَقَّهُ.

অনুবাদ : যদি লোকেরা সওয়ার অবস্থায় জানাযা পড়ে তবে তা জায়েজ হবে সাধারণ কিয়াস মুতাবিক। কেননা ইহা মূলত দোয়া। কিন্তু সূক্ষ্ম কিয়াস মুতাবিক জায়েজ হবে না। কেননা তাহরীমা বিদ্যমান থাকার কারণে একদিক থেকে তাও নামাজ। সুতরাং সতর্কতার খাতিরে ওজর ছাড়া কিয়াস তরক করা জায়েজ হবে না। জানাযার নামাজের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান অবৈধ নয়। কেননা অগ্রবর্তিতা হলো ওলীর হক। সুতরাং অন্যকে অগ্রবর্তী করে নিজের হক বাতিল করার তিনি অধিকার রাখেন। কোনো কোনো নুসখা বা অনুলিপিতে اذن (অনুমতি)-এর পরিবর্তে اذان শব্দটি রয়েছে। এর অর্থ হলো লোকদের জানিয়ে দেওয়া অর্থাৎ একে অন্যকে অবহিত করবে, যাতে তারা মাইয়েতের হক আদায় করতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সওয়ারির উপর আরোহণ করে জানাযার নামাজ পড়া কিয়াস মুতাবিক জায়েজ। কিন্তু ইস্‌তিহ্‌সান তথা সূক্ষ্ম কিয়াস মুতাবিক জায়েজ নয়। কিয়াসের কারণ হলো, জানাযার নামাজ মূলত দোয়ার নাম। এ কারণেই জানাযার নামাজে কিরাআত নেই, রুকু সিজদা নেই। সুতরাং যেমনিভাবে অন্যান্য দোয়া সওয়ারির উপর পড়া জায়েজ এমনিভাবে জানাযার নামাজও জায়েজ। ইসতিহ্‌সানের কারণ হলো, জানাযার নামাজ একদিক থেকে নামাজ। কেননা জানাযার নামাজের মধ্যে তাহ্‌রীমা রয়েছে। একমাত্র ওয়াক্ত ব্যতীত অন্যান্য নামাজের জন্য যা যা শর্ত রয়েছে জানাযার জন্যও তা তা রয়েছে। সুতরাং সতর্কতার কারণে ওজর ছাড়া কিয়াসকে তরক না করাই উচিত। আর সওয়ারির উপর নামাজ পড়ার সুরতে যেহেতু কিয়াস তরক করতে হয় এ জন্য সওয়ারির উপর জানাযার নামাজ পড়া জায়েজ হবে না।

وَلَا بَأْسَ بِالْاِذْنِ الخ : উক্ত মতনটির দু'টি নুসখা বা অনুলিপি রয়েছে। একটি হলো لَابَأْسَ بِالْاِذْنِ فِىْ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ অপরটি হলো لَابَأْسَ بِالْاَذَانِ প্রথম নুসখা হিসাবে ইবারতটির দু'টি মতলব বা মর্মার্থ হবে। এক. ওলী যদি অন্য কাউকে জানাযার নামাজ পড়াবার ইজাযত দেয় তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা ইমামত হলো ওলীর হক। সুতরাং সে যদি অন্যকে ইমাম বানিয়ে নিজের হক বাতিল করতে চায়, বাতিল করতে পারবে। দ্বিতীয় মতলব হলো, জানাযার নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর যদি ওলী লোকদেরকে বাড়ি ফেরার ইজাযত দিয়ে দেয় এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা দাফন সমাধা করার পূর্বে ওলীর ইজাযত ব্যতীত লোকদের ঘরে ফিরা জায়েজ নেই। আর দ্বিতীয় নুস্‌খার ভিত্তিতে ইবারতের মর্মার্থ হলো, জানাযার নামাজের ব্যাপারে অবহিত করা এবং লোকদেরকে জানিয়ে দেওয়ার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَاٰذِنُوْنِىْ بِالصَّلٰوةِ : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মারা যায় তখন আমাকে তার নামাজের খবর দিও। কোনো কোনো মুতায়াখ্‌খিরীন ঐ ব্যক্তির জানাযার নামাজের জন্য বাজারের মধ্যে ইলান করাকে উত্তম বলেছেন যার নামাজের জন্য লোকেরা উৎসাহী যেমন– আলিম, ইবাদত গুযার ব্যক্তি প্রমুখ।

وَلَا يُصَلِّى عَلٰى مَيِّتٍ فِىْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ لِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَلَا اَجْرَ لَهٗ وَلِاَنَّهٗ بُنِىَ لِاَدَاءِ الْمَكْتُوْبَاتِ وَلِاَنَّهٗ يَحْتَمِلُ تَلْوِيْثَ الْمَسْجِدِ وَ فِيْمَا اِذَا كَانَ الْمَيِّتُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ اِخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ ـ

অনুবাদ : জামাআত হয় এমন মসজিদের ভিতরে জানাযা পড়বে না। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, مَنْ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَلَا اَجْرَ لَهٗ যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযার নামাজ পড়বে তার কোনো ছওয়াব নেই। তা ছাড়া এ জন্যও যে, মসজিদ তো তৈরি হয়েছে ফরজ নামাজ আদায় করার জন্য। তদুপরি মসজিদ নষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আর মাইয়েত যদি মসজিদের বাইরে থাকে তবে সে ক্ষেত্রে মশায়েখগণের মতবিরোধ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইনায়া গ্রন্থকার উপরোক্ত ইবারতটি বিশ্লেষণ (حل) করতে গিয়ে বলেন, যদি শুধু জানাযা (মাইয়েত) মাসজিদের মধ্যে আর ইমাম ও মুসল্লী মসজিদের বাইরে হয় তবে হানাফী আলিমগণের সর্বসম্মতিক্রমে তার জানাযার নামাজ পড়া মাকরূহ হবে। আর যদি মাইয়েত, ইমাম এবং কিছু লোক মসজিদের বাইরে হয় অন্যান্য সব মসজিদের ভিতরে হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ হবে না। যদি শুধু মাইয়েত বাইরে হয় তবে মাশায়িখদের মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন মাকরূহ হবে, আবার কেউ কেউ বলেছেন মাকরূহ হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, কোনো অবস্থাতেই মাকরূহ নয়। অর্থাৎ শুধু মাইয়েত যদি মসজিদের ভিতরে হয় তবুও তার উপর নামাজ পড়া মাকরূহ নয়। তাঁর দলিল হলো, যখন হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর ওফাত হলো, তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নির্দেশ দিলেন যে, তাঁর লাশ মসজিদের ভেতর প্রবেশ করানো হোক। এমনকি আযওয়াজে মুতাহ্হারাত সকলেই তাঁর জানাযার নামাজ পড়েছেন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর আশপাশের কিছু লোকদেরকে বললেন, কেউ কি আমাদের এই কাজের দোষ বর্ণনা করেছে? তারা বলল, হ্যাঁ (লোকেরা এর উপর প্রশ্ন তুলেছে) হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, লোকেরা কত দ্রুত ভুলে গিয়েছে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ সুহাইল ইবনে বায়যার জানাযা মসজিদের ভিতরেই পড়েছেন। উক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল যে, মসজিদের ভিতরে জানাযার নামাজ মাকরূহ ছাড়া জায়েজ আছে। অন্যথা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং ফকীহায়ে উম্মত হযরত আয়শা (রা.) মসজিদের ভিতর কিভাবে জানাযার নামাজ পড়েছেন।

আমাদের দলিল হলো হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস– اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَلَا اَجْرَ لَهٗ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদের ভিতর জানাযার নামাজ পড়ে তার কোনো ছওয়াব নেই। দ্বিতীয় দলিল হলো, মসজিদ ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে সুতরাং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো নামাজ মসজিদে আদায় না করাই সমীচীন। তৃতীয় দলিল হলো, যদি জানাযা মসজিদের মধ্যে রাখা হয় তবে এর দ্বারা মসজিদ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য ওজর ছাড়া মসজিদের মধ্যে মাইয়েতকে উপস্থিত করা মাকরূহ। আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের জওয়াব হলো, তৎকালে আনসার ও মুহাজিরগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হযরত আয়েশার আমলকে (কাজটিকে) দোষারোপ করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, ঐ সময়ও মসজিদের ভিতর জানাযার নামাজ মাকরূহ হওয়া প্রশিদ্ধ ছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যে হযরত সুহাইলের জানাযা মসজিদের ভিতরে পড়েছেন তা এ কারণে ছিল যে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফরত (معتكف) ছিলেন। তাঁর পক্ষে মসজিদের থেকে বের হয়া অসম্ভব ছিল। এ জন্য তিনি জানাযা আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। সুতরাং জানাযা মসজিদের বাইরে রাখা হলো আর তিনি মসজিদের ভিতরে থেকেই নামাজ পড়লেন। আমাদের মতে জানাযা যদি মসজিদের বাইরে হয় আর লোকেরা মসজিদের ভিতরে থেকে নামাজ পড়ে তবে মাকরূহ হবে না। তাই প্রথমত রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফের ওজর ছিল। দ্বিতীয়ত জানাযা মসজিদের ভিতরে ছিল না বরং মসজিদের বাইরে ছিল। এ জন্য উক্ত হাদীসকে দলিল হিসাবে পেশ করা সমীচীন হবে না।

وَمَنْ اِسْتَهَلَّ بَعْدَ الْوِلَادَةِ سُمِّيَ وَغُسِلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ ﷺ إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلِاَنَّ الْاِسْتِهْلَالَ دَلَالَةُ الْحَيٰوةِ فَتَحَقَّقُ فِيْ حَقِّهِ سُنَّةُ الْمَوْتٰى وَمَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ أُدْرِجَ فِيْ خِرْقَةٍ كَرَامَةً لِبَنِيْ اٰدَمَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ لِمَا رَوَيْنَا وَيُغْسَلُ فِيْ غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِاَنَّهُ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ـ

অনুবাদ : ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যে শিশু কেঁদে উঠে, তার নাম রাখা হবে ও তাকে গোসল দেওয়া হবে এবং তার জানাযা পড়া হবে। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ صُلِّيَ عَلَيْهِ নবজাতক যদি কেঁদে উঠে তবে তার জানাযা পড়া হবে। আর যদি না কাঁদে তবে তার উপর জানাযা পড়া হবে না। যেহেতু কেঁদে উঠা হলো প্রাণের অস্তিত্বের প্রমাণ। সুতরাং তার ক্ষেত্রে মৃতদের নিয়ম-কানুন কার্যকর হবে। যে শিশু কান্না-কাটি করেনি তাকে কাপড়ে জাড়িয়ে (কবরস্থ করে) দেওয়া হবে। এটা করা হবে আদম সন্তানের মর্যাদা রক্ষার্থে। তবে তার জানাযা পড়া হবে না। এর কারণ ইতিঃপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস। অবশ্য গায়রে যাহিরী রিওয়ায়াত মতে তাকে গোসলও দেওয়া হবে। কেননা এক হিসাবে সেও প্রাণী। এটি-ই পছন্দনীয় মত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِسْتِهْلَالُ صَبِيٍّ : জন্মের সময় শিশুর উচ্চ আওয়াজ। তবে এখানে উদ্দেশ্য হলো, এমন জিনিস পাওয়া যাওয়া যা শিশুর প্রাণের প্রমাণ বহন করে। যেমন নবজাতকের কোনো অঙ্গ নড়াচড়া করা, তার কান্নার শব্দ বের হওয়া ইত্যাদি। শিশু যদি জন্ম হওয়ার পরই মারা যায়, অর্থাৎ জন্মের সময় তার মধ্যে প্রাণের কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল পরে মরে গেল, তবে এই শিশুরও নাম রাখা হবে। তাকে মাইয়েতের গোসল দেওয়া হবে। তার জানাযাও পড়া হবে। দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী- إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ নবজাতক যদি কেঁদে উঠে তবে তার জানাযা পড়া হবে আর যদি না কাঁদে, তবে তার জানাযা পড়া হবে না। আকলী দলিল হলো, اِسْتِهْلَالٌ তথা শিশুর আওয়াজ বের হওয়া তার প্রাণের অস্তিত্বের প্রমাণ। তাই তার ক্ষেত্রে মৃতদের নিয়ম-কানুন প্রযোজ্য হবে না। আর যে শিশু জন্মের সময় কান্না-কাটি করেনি এবং তার জীবিত থাকার অন্য কোনো প্রমাণও পাওয়া যায়নি, তবে তাকে একটি কাপড়ে জাড়িয়ে কোনো গর্তে (কবরে) রাখা হবে। এটাও আদম সন্তানদের সম্মানার্থে করা হবে। আর তার জানাযাও পড়া হবে না। দলিল ইতঃপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস। তবে গায়রে যাহিরে রিওয়ায়াহ অনুযায়ী তাকে গোসল দেওয়া হবে। দলিল হলো, সে তো এক হিসাবে শরীরের একটি অংশ এবং এক হিসাবে প্রাণীও বটে। উভয়টির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যেহেতু শরীরের একটি জুয বা অংশ তাই তার উপর নামাজ পড়া হবে না। আর যেহেতু এক হিসাবে প্রাণী তাই তাকে গোসল দেওয়া হবে। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত এবং এটাই পছন্দনীয় মত।

وَإِذَا سُبِيَ صَبِيٌّ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ وَمَاتَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُمَا إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ يَعْقِلُ لِأَنَّهُ صَحَّ إِسْلَامُهُ اِسْتِحْسَانًا أَوْ يُسْلِمَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِيْنًا وَإِنْ لَمْ يُسْبَ مَعَهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ صُلِّيَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ ظَهَرَتْ تَبْعِيَّةُ الدَّارِ فَحُكِمَ بِالْإِسْلَامِ كَمَا فِي اللَّقِيْطِ ـ

অনুবাদ : কোনো শিশু যদি তার (অমুসলিম) মা বাবার কোনো একজনের সঙ্গে বন্দী হয় এবং মৃত্যুবরণ করে, তবে তার জানাযা পড়া হবে না। কেননা (ধর্মের দিক থেকে) সে পিতামাতার অনুবর্তী। তবে যদি সে ইসলাম স্বীকার করে নেয় এবং তার বোধশক্তি থেকে থাকে, তাহলে তার হুকুম ভিন্ন হবে। কেননা সূক্ষ্ম কিয়াস মতে তার ইসলাম গ্রহণ শুদ্ধ। কিংবা যদি পিতামাতার কোনো একজন ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। কেননা ধর্ম হিসাবে সে পিতামাতার উত্তম জনের অনুগামী হবে। যদি পিতামাতার একজনও তার সঙ্গে বন্দী না হয় তবে জানাযা পড়া হবে। কেননা তখন তার ক্ষেত্রে দারুল ইসলামের অনুবর্তিতা প্রকাশ পাবে। ফলে তাকে মুসলমান বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে, যেমন কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো শিশু পিতামাতার মধ্য থেকে কোনো একজনের সাথে বন্দী হয় এবং মৃত্যুবরণ করে, তবে তার জানাযার নামাজ পড়া হবে না। কেননা শিশুটি পিতামাতার তাবে তথা অনুবর্তী হয়ে কাফির। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اَلْوَلَدُ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِيْنًا শিশু ধর্ম হিসাবে পিতামাতার উত্তম জনের অনুগামী হবে। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, শিশু ধর্মের দিক থেকে পিতামাতার অনুগামী হয়। আর যেহেতু এখানে পিতামাতা কাফির তাই শিশুটিও কাফির হবে বলে গণ্য। আর কাফিরের উপর জানাযার নামাজ পড়া হয় না। এ জন্য এই শিশুটিরও জানাযার নামাজ পড়া হবে না। হ্যাঁ যদি শিশু বুঝমান হয় এবং ইসলাম স্বীকার করে নেয় কিংবা তার পিতামাতার কেউ মুসলমান হয়ে যায়, তবে ঐ শিশুটির উপর জানাযার নামাজ পড়া হবে। ইসলাম স্বীকার করার সুরতে এই কারণে যে সূক্ষ্ম কিয়াসের (اِسْتِحْسَانٌ) দৃষ্টিতে তার মুসলমান হওয়া সহীহ হয়েছে। আর পিতামাতার এক জনের মুসলমান হওয়ার সুরতে এ কারণে তার জানাযার নামাজ পড়া হবে যে, শিশু ধর্ম হিসাবে পিতামাতার উত্তম জনের অনুগামী হয়। আর ধর্ম হিসাবে পিতামাতার উত্তমজন সে-যিনি মুসলমান হয়ে গেছেন। সুতরাং শিশুটিও তার অনুগামী হয়ে মুসলমান বলে গণ্য হবে। আর মুসলমানের যেহেতু জানাযার নামাজ পড়া হয়, তাই এ শিশুটিরও জানাযার নামাজ পড়া হবে। আর যদি শিশুটি বন্দী হয় কিন্তু তার সঙ্গে তার পিতামাতার কেউ বন্দী না হয় এবং শিশুটি মৃত্যুবরণ করে, তবে তার জানাযা পড়া হবে। কেননা তার ব্যাপারে দারুল ইসলামের অনুবর্তিতা প্রকাশ পেয়েছে। তাই তাকে মুসলমান বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে। যেমন কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর ক্ষেত্রে হয়। অর্থাৎ এক ব্যক্তি জঙ্গল বা অন্য কোথাও একটি শিশু পেল, তার কোনো উত্তরসূরি এবং অভিভাবকও জানা নেই। এখন এ শিশুটি যদি দারুল ইসলামে পেয়ে থাকে তবে তার অনুবর্তী হিসাবে তাকে মুসলমান হিসাবে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে।

وَإِذَا مَاتَ الْكَافِرُ وَلَهُ وَلِيٌّ مُسْلِمٌ فَإِنَّهُ يُغَسِّلُهُ وَيُكَفِّنُهُ وَيَدْفِنُهُ بِذٰلِكَ أَمَرَ عَلِيٌّ (رض) فِى ... أَبِيْهِ أَبِىْ طَالِبٍ لٰكِنْ يُغْسَلُ غُسْلَ الثَّوْبِ النَّجِسِ وَيُلَفُّ فِىْ خِرْقَةٍ وَتُحْفَرُ حَفِيْرَةً مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ سُنَّةِ التَّكْفِيْنِ وَاللَّحْدِ وَلَايُوْضَعُ فِيْهِ بَلْ يُلْقٰى -

অনুবাদ : যদি কোনো কাফির মৃত্যুবরণ করে আর তার কোনো মুসলমান অভিভাবক থাকে তবে সে তার গোসল দিবে, কাফন পরাবে এবং তাকে দাফন করবে। হযরত আলী (রা.)-কে তার পিতা আবূ তালিব সম্পর্কে এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল। তবে তাকে গোসল দিবে নাপাক কাপড় ধোয়ার মতো। আর একটি বস্ত্র খণ্ডে পেঁচানো হবে এবং একটি গর্ত খোঁড়া হবে। কাফন ও কবরের বেলায় সুন্নত তরীকা অনুসরণ করা হবে না এবং যত্নের সাথে কবরে নামানো হবে না; বরং তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো কাফির মরে যায় এবং তার কোনো কাফির অভিভাবক না থাকে, বরং মুসলমান অভিভাবক থাকে অর্থাৎ ঐ কাফির ব্যক্তির কোনো নিকটতম আত্মীয় মুসলমান হয় তবে এই মুসলমান অভিভাবক তাকে নাপাক কাপড় ধোয়ার ন্যায় ধুয়ে একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে কোনো একটি গর্তে ফেলে আসবে। দলিল হলো, আবূ তালিবের ইন্তেকালের খবর যখন হযরত আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিলেন, তখন তিনি বললেন اِغْسِلْهُ وَكَفِّنْهُ وَ وَارِهِ وَلَا تُحْدِثْ بِهِ حَدَثًا حَتّٰى تَلْقَانِىْ তাকে গোসল দাও, কাফন পরাও এবং জমিনে লুকিয়ে রাখো। এরপর কোনো কথা না বলে আমার নিকট এসো। অর্থাৎ তার নামাজ পড়বে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উদ্দেশ্য হলো সুন্নত তরীকা অনুযায়ী দাফন কাফন না করা। একেই হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কাফির মাইয়েতকে নাপাক কাপড়ের ন্যায় ধোয়া হবে। সাধারণ কোনো কাপড়ে পেঁচানো হবে এবং গর্ত খুদে তাতে ফেলে দেওয়া হবে। আর যদি কাফির মাইয়েতের কাফির অভিভাবক বিদ্যমান থাকে, তবে মুসলমানের জন্য উচিত যে, সে কাফির মাইয়েত আর কাফির অভিভাবকের মাঝে সম্পর্ক করে দেবে। তারা তার সাথে যা ইচ্ছা মুয়ামালা করবে।

مَتَن-এর ইবারত وَلَهُ وَلِيٌّ مُسْلِمٌ দ্বারা নিকটতম আত্মীয় উদ্দেশ্য। কেননা মুসলমান ও কাফিরের মাঝে হাকীকী অভিভাবকত্ব থাকে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন لَاتَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ হে মুসলমান! তোমরা ইহুদি ও নাসারাদেরকে ওলী বানিও না।

فَصْلٌ فِىْ حَمْلِ الْجَنَازَةِ

وَاِذَا حَمَلُوا الْمَيِّتَ عَلٰى سَرِيْرِهٖ اَخَذُوْا بِقَوَائِمِهِ الْاَرْبَعِ بِذٰلِكَ وَرَدَتِ السُّنَّةُ وَفِيْهِ تَكْثِيْرُ الْجَمَاعَةِ وَ زِيَادَةُ الْاِكْرَامِ وَالصِّيَانَةِ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ السُّنَّةُ اَنْ يَحْمِلَهَا رَجُلَانِ يَضَعُهَا السَّابِقُ عَلٰى اَصْلِ عُنُقِهٖ وَالثَّانِىْ عَلٰى صَدْرِهٖ لِاَنَّ جَنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ هٰكَذَا حُمِلَتْ قُلْنَا كَانَ ذٰلِكَ لِاِزْدِحَامِ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ وَيَمْشُوْنَ بِهٖ مُسْرِعِيْنَ دُوْنَ الْخَبَبِ لِاَنَّهٗ ﷺ حِيْنَ سُئِلَ عَنْهُ قَالَ مَا دُوْنَ الْخَبَبِ وَاِذَا بَلَغُوْا اِلٰى قَبْرِهٖ يُكْرَهُ اَنْ يَجْلِسُوْا قَبْلَ اَنْ يُوْضَعَ عَنْ اَعْنَاقِ الرِّجَالِ لِاَنَّهٗ قَدْ تَقَعُ الْحَاجَةُ اِلَى التَّعَاوُنِ وَالْقِيَامُ اَمْكَنُ مِنْهُ وَكَيْفِيَّةُ الْحَمْلِ اَنْ تَضَعَ مُقَدَّمَ الْجَنَازَةِ عَلٰى يَمِيْنِكَ ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا عَلٰى يَمِيْنِكَ ثُمَّ مُقَدَّمَهَا عَلٰى يَسَارِكَ ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا عَلٰى يَسَارِكَ اِيْثَارًا لِلتَّيَامُنِ وَهٰذَا فِىْ حَالَةِ التَّنَاوُبِ .

অনুচ্ছেদ : জানাযা বহন করা

অনুবাদ : মাইয়েতকে খাটিয়ায় রাখার পর লোকেরা চারপায়া ধরে খাটিয়া উঠাবে। হাদীসে এমনই বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া এতে জানাযার সহযাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে এবং অধিকতর রয়েছে জানাযার সম্মান ও হেফাজত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, সুন্নত হলো, জানাযা দু'জন লোক বহন করবে। সামনের জন (খাটিয়ার হাতল) কাঁধে স্থাপন করবে। দ্বিতীয়জন বুক বরাবর ধারণ করবে। কেননা হযরত সা'আদ ইবনে মু'আয (রা.)-এর জানাযা এভাবে বহন করা হয়েছিল। এর জওয়াবে আমাদের বক্তব্য হলো, তা করা হয়েছিল সা'আদ (রা.)-এর জানাযায় ফেরেশ্‌তাগণের ভিড়ের কারণে। আর জানাযা নিয়ে দ্রুত গতিতে চলবে। তবে দৌড়ে নয়। কেনলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যখন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন مَادُوْنَ الْخَبَبِ দৌড়ের চেয়ে কম গতিতে। যখন লোকেরা মাইয়েতের কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন মাইয়েতকে কাঁধ থেকে নামানোর পূর্বে উপস্থিত লোকদের বসে পড়া মাকরূহ। কেননা কখনো সহযোগিতার প্রয়োজন হতে পারে। আর দাঁড়ানো অবস্থায় তা অধিক সম্ভবপর। আর জানাযা বহনের নিয়ম হলো, প্রথমে জানাযার সামনের অংশ তোমার ডান কাঁধে রাখবে। অতঃপর জানাযার পিছনের অংশ তোমার ডান কাঁধে রাখবে। অতঃপর জানাযার সামনের অংশ তোমার বাম কাঁধে রাখবে। এরপর পিছনের অংশ তোমার বাম কাঁধে রাখবে। এটা করা হবে ডান দিককে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য। এ নিয়ম হলো পালাক্রমে বহনের ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উক্ত অনুচ্ছেদের মধ্যে জানাযা বহনের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, মাইয়েতকে খাটিয়ায় কিংবা চৌপায়ায় রাখবে এবং চৌপায়ার চারপায়া ধরবে। অর্থাৎ চার ব্যক্তি চারপায়া ধরবে। সুন্নত তরীকা এটাই। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, مِنَ السُّنَّةِ اَنْ تُحْمَلَ الْجَنَازَةُ مِنْ جَوَانِبِهَا الْاَرْبَعَةِ সুন্নত হলো জানাযাকে তার চতুর্দিক থেকে বহন করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- مَنْ حَمَلَ الْجَنَازَةَ مِنْ جَوَانِبِهَا الْاَرْبَعَةِ غُفِرَ لَهٗ مَغْفِرَةٌ مُوْجِبَةٌ যে ব্যক্তি জানাযা তার চতুর্দিক থেকে বহন করল তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় কথা হলো, এর দ্বারা জামাআতের লোক সংখ্যা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা জানাযার সাথে যদি কোনো লোক না যায় তবে এই চারজন মিলে অবশ্যই

জানাযা হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, চারজন দ্বারা একটি জামাআত হয়ে যায়। আর চার ব্যক্তি বহন করার দ্বারা জানাযার ইকরামও হয়। কেননা একটি দল তাদের কাঁধের উপর তাকে বহন করে রাখছে আর যাকে বহন করে রাখা হয়েছে তার মর্যাদাবান ও সম্মানিত হওয়ার ক্ষেত্রে কি সন্দেহ থাকতে পারে? তাছাড়া চার ব্যক্তির জানাযা বহন করার দ্বা[illegible] জমিনের উপর পড়ে যাওয়া থেকে হিফাজতেও থাকে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, সুন্নত হলো দুই জন লোক জানাযা এভাবে বহন করবে যে, সামনের ব্যক্তি জানাযা তার কাঁধের উপর রাখবে আর পিছনের ব্যক্তি তার বুকে ধারণ করবে। দলিল হলো, হযরত সা'আদ ইবনে মু'আয (রা.) -এর জানাযা এভাবে বহন করা হয়েছিল। আমাদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব হলো, হযরত সা'আদ (রা.)-এর জানাযার সময় ফেরেশ্‌তাগণের ভিড়ের কারণে এমনটি করা হয়েছিল। তাইতো বর্ণিত আছে যে, হযরত সা'আদ ইবনে মু'আয (রা.) শাহাদাতের সময় সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা জমিনে অবতরণ করেছিলেন। এর পূর্বে কখনো এই পরিমাণ সংখ্যক ফেরেশতা জমিনে অবতরণ করেনি। মোট কথা, হযরত সা'আদ (রা.)-এর জানাযা দুইজনে বহন করার কারণ ছিল রাস্তা সংকুচিত হওয়া। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ পায়ের পাঞ্জার উপর ভর করে চলছিলেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জানাযা নিয়ে দ্রুত গতিতে চলবে তবে দৌড়ে নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন জানাযার সাথে চলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি مَا دُوْنَ الْخَبَبِ বলেছিলেন। خَبَب অর্থাৎ হলো– দৌড়ানো অর্থাৎ তিনি চলার মধ্যে দ্রুতভাবে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে দৌড়াতে নিষেধ করেছেন। দ্রুততার নির্দেশ এ জন্য দিয়েছিলেন যে, জানাযা যদি নেককার হয় তবে তাকে আল্লাহর দরবারে দ্রুত পৌছিয়ে দাও। আর যদি বদকার হয় তবে এই বালাকে দ্রুত নিজের কাঁধ থেকে দূরে সরিয়ে দাও। আর দৌড়াতে এ জন্য নিষেধ করা হয়েছে যে, এর দ্বারা মাইয়েতের অবমাননা হয়। আমাদের মতে জানাযার পিছনে পিছনে চলা মুস্তাহাব। ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর মতে জানাযার আগে আগে চলা উত্তম। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, হযরত আবূ বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) জানাযার আগে আগে চলতেন। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সা'আদ ইবনে মু'আয (রা.)-এর জানাযার পিছনে পিছনে চলতেছিলেন। হযরত আলী (রা.)ও জানাযার পিছনে পিছনে চলতেন। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, فَضْلُ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ عَلَى الْمَشْيِ اَمَامَهَا كَفَضْلِ الْمَكْتُوْبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ জানাযার আগে আগে চলার তুলনায় জানাযার পিছনে চলার ফজিলত এমন যেমন ফরজের ফজিলত নফলের উপর। শায়খাইন (র.)-এর আমলের জওয়াব হলো, হযরত আলী (রা.) জানাযার পিছনে পিছনে চলতেন। হযরত আলীকে কেউ জিজ্ঞাসা করল যে, আবূ বকর ও ওমর (রা.) তো সামনে সামনে চলেন, তখন হযরত আলী বলেন, নিঃসন্দেহে তাঁরা জানাযার আগে আগে চলতেন। আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন তাঁদের জানা ছিল যে, জানাযার পিছনে চলা উত্তম। কিন্তু মানুষের আসানির জন্য তারা সামনে থাকতেন।

وَاِذَا بَلَغُوْا اِلَى قَبْرِهِ الخ যখন লোকেরা মাইয়েতকে নিয়ে তার কবর পর্যন্ত পৌছে যাবে তখন জানাযা জমিনের উপর রাখার পূর্বে অন্যান্য লোকদের বসে যাওয়া মাকরূহ। কেননা কখনো কখনো জানাযার লোকদের সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর সময় মতো লোকদের সাহায্যে তখনই অধিক হারে নেওয়া সম্ভব যখন সে দাঁড়িয়ে থাকবে। এজন্য বলা হয়েছে যে, জানাযা জমিনে অবতরণ করার পূর্বে লোকদের বসা মাকরূহ। আর যখন জানাযা জমিনের উপর রাখা হয় তখন লোকদের দাঁড়িয়ে থাকা মাকরূহ। দ্বিতীয় দলিল হলো, জানাযা থাকাকালে মাইয়েতের সম্মান প্রদর্শন করা মুস্তাহাব। আর জানাযা অবতরণের পূর্বে লোকদের বসে যাওয়ার দ্বারা মাইয়েতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হয়। তাই জানাযা অবতরণের পূর্বে বসা মাকরূহ।

হিদায়া গ্রন্থকার জানাযা বহনের নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, প্রথম মাইয়েতের সামনের ডান পার্শ্বকে নিজের ডান কাঁধের উপর রাখবে, তারপর পিছনের ডান অংশকে ডান কাঁধের উপর রাখবে, অতঃপর মাইয়েতের সামনের বাম অংশকে নিজের বাম কাঁধের উপর রাখবে, তারপর পিছনের বাম অংশকে নিজের বাম কাঁধের উপর রাখবে। দলিল হলো, এই সুরতে ডান দিক অগ্রাধিকার পাবে। কেননা খাটিয়ার সামনের বাম অংশ মাইয়েতের ডান অংশ। কারণ মাইয়েতকে খাটিয়ার উপর চিত করে শুইয়ে রাখা হয়। সুতরাং যখন খাটিয়ার সামনের বাম অংশকে জানাযা বহনকারী তার ডান কাঁধের উপর রাখবে তখন এটা মাইয়েতেরও ডান অংশ হবে, জানাযা বহনকারীরও ডান অংশ হবে। গ্রন্থকার বলেন, এ সুরত তখনই সম্ভব হবে যখন বহনকারীগণ পালাক্রমে বহন করবে। আর যদি বহনকারী শুধু চার ব্যক্তি হয় তবে একই অবস্থায় কবর পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

فَصْلٌ فِى الدَّفْنِ

وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ وَيُلْحَدُ لِقَوْلِهِ ﷺ اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةَ خِلَافًا لِلشَّافِعِى فَإِنَّ عِنْدَهُ يُسَلُّ سَلًّا لِمَا رُوِىَ أَنَّهُ ﷺ سُلَّ سَلًّا وَلَنَا أَنَّ جَانِبَ الْقِبْلَةِ مُعَظَّمٌ فَيُسْتَحَبُّ الْإِدْخَالُ مِنْهُ وَاضْطَرَبَتِ الرِّوَايَاتُ فِى إِدْخَالِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

অনুচ্ছেদ : দাফন

অনুবাদ : কবরকে লাহাদ রূপে খনন করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লাহাদ হলো আমাদের জন্য। আর খাড়া কবর হলো অন্য জাতির জন্য। মাইয়েতকে কিবলার দিক থেকে (গ্রহণ করে) দাখিল করা হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে মাইয়েতকে পায়ের দিক থেকে নিয়ে দাখিল করা হবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ-কে পায়ের দিক থেকে নিয়ে দাখিল করা হয়েছিল। আমাদের দলিল হলো, কিবলার দিক হলো সম্মানিত। সুতরাং সে দিক থেকে প্রবেশ করানোই মোস্তাহাব হবে। আর নবী করীম ﷺ-কে কবরে প্রবেশ করানো সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো পরস্পর বিরোধী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

লাহাদ কবর হলো কবরের ভিতর কিবলার দিকে কিছুটা গভীর করে দেওয়া। অর্থাৎ বগলী বানিয়ে দেওয়া এটাকেই বগলী কবর বলা হয়। খাড়া কবর হলো হলো, চওড়া কবর খনন করে তার ভিতর সরু নালীর অনুরূপ বানিয়ে তার মধ্যে মাইয়েতকে দাফন করা। (ইনায়া) মোটকথা আমাদের মতে কবর খনন করে লাহাদ বানানো সুন্নত। তবে শর্ত হলো জমিন নরম না হওয়া। আর যদি জমিন এত নরম হয় যে, লাহাদ বানানো অসম্ভব তবে খাড়া কবর বানানো জায়েজ। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে লাহাদ কবর সুন্নত নয় খাড়া কবর সুন্নত। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, খাড়া কবরের উপর মদীনাবাসীদের উত্তরাধিকারিত্ব রয়েছে অর্থাৎ মদীনাবাসী লোকদের থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে এটাই চলে এসেছে যে, তারা মুসলমান মাইয়েতের জন্য লাহাদ কবর খনন করে না বরং খাড়া কবর খনন করে। আমাদের দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا ইমাম শাফি'ঈ (রা.)-এর দলিলের জবাব হলো, জান্নাতুল বাকীর (মদীনা শরীফের কবরস্থান) জমি নরম এবং পাতলা ঐ জমিনে লাহাদ বানানো অসম্ভব তাই মদীনাবাসীগণ খাড়া কবর বানান। দ্বিতীয় ইখতিলাফ হলো, আমাদের মতে মাইয়েতকে কবরে দাখিল করানোর সুন্নত তরীকা হলো, মাইয়েতকে ঐ দিক থেকে কবরে দাখিল করানো হবে যা কিবলার সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ জানাযা কবরের কিবলার দিকে রাখা হবে সেখান থেকে মাইয়েতকে উঠিয়ে লাহাদ কবরে রাখা হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, সুন্নত হলো মাইয়েতকে তার কবর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া। তার পদ্ধতি হলো, জানাযা কবরের পায়ের দিকে এমনভাবে রাখা হবে যে, মাইয়েতের মাথা কবরের মধ্যে তার পায়ের স্থানের বরাবর হবে। অতঃপর কবরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করতে সে মাইয়েতের মাথা ধরে কবরে প্রবেশ করাবে এবং তাকে টানতে থাকবে। কেউ কেউ বলেন তার পদ্ধতি হলো, জানাযা কবরের থেকে পার্শ্বে এমনভাবে রাখা হবে যে, মাইয়েতের উভয় পা তার মাথার বরাবর হবে। অতঃপর মাইয়েতের উভয় পা ধরে প্রথমে তাকে কবরে প্রবেশ করানো হবে; অতঃপর টেনে পুরো মাইয়েতকে কবরে অবতরণ করাবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঐভাবেই টেনে কবরে অবতরণ করানো হয়েছিল। আমাদের দলিল হলো, কিবলার দিক হলো সম্মানিত, এ জন্য সেদিক থেকে প্রবেশ করানোই মোস্তাহাব হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কবরে প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে বর্ণনাগুলো পরস্পর বিরোধী রয়েছে। কোনো বর্ণনায় কিছু আর অপর বর্ণনায় অন্য কিছু রয়েছে। এ জন্য এই বর্ণনাগুলো দলিলযোগ্য নয়।

فَإِذَا وُضِعَ فِيْ لَحْدِهٖ يَقُوْلُ وَاضِعُهٗ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ كَذَا قَالَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ حِيْنَ وَضَعَ اَبَا دُجَانَةَ فِيْ [illegible] يُوَجَّهُ اِلَى الْقِبْلَةِ بِذٰلِكَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيُحَلُّ الْعُقْدَةُ لِوُقُوْعِ الْاَمْنِ مِنَ الْاِنْتِشَارِ وَيُسَوَّى اللَّبِنُ عَلَى اللَّحْدِ لِاَنَّهٗ ﷺ جُعِلَ عَلٰى قَبْرِهِ اللَّبِنَ وَيُسَجّٰى قَبْرُ الْمَرْاَةِ بِثَوْبٍ حَتّٰى يُجْعَلَ اللَّبِنُ عَلَى اللَّحْدِ وَلَا يُسَجّٰى قَبْرُ الرَّجُلِ لِاَنَّ مَبْنٰى حَالِهِنَّ عَلَى السَّتْرِ وَمَبْنٰى حَالِ الرِّجَالِ عَلَى الْاِنْكِشَافِ وَيُكْرَهُ الْاٰجُرُّ وَالْخَشَبُ لِاَنَّهُمَا لِاِحْكَامِ الْبِنَاءِ وَالْقَبْرُ مَوْضِعُ الْبِلٰى ثُمَّ بِالْاٰجُرِّ اَثَرُ النَّارِ فَيُكْرَهُ تَفَاؤُلًا وَلَا بَاْسَ بِالْقَصَبِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَيُسْتَحَبُّ اللَّبِنُ وَالْقَصَبُ لِاَنَّهٗ ﷺ جُعِلَ عَلٰى قَبْرِهٖ طِنٌّ مِنْ قَصَبٍ ثُمَّ يُهَالُ التُّرَابُ وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ وَلَا يُسَطَّحُ اَيْ لَا يُرَبَّعُ لِاَنَّهٗ ﷺ نَهٰى عَنْ تَرْبِيْعِ الْقُبُوْرِ وَمَنْ شَاهَدَ قَبْرَهٗ اَخْبَرَ اَنَّهٗ مُسَنَّمٌ ـ

অনুবাদ : মাইয়েতকে যখন কবরে রাখা হবে তখন অবতরণকারী আল্লাহর নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিল্লাতের উপর রাখছি বলবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ দুজানাকে কবরে নামানোর সময় এ দোয়া বলেছিলেন। আর তাকে কিবলামুখী করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই আদেশ করেছেন। আর কাফনের গিরা খুলে দিবে। কেননা এখন আর সরে যাওয়ার ভয় নেই। আর "লাহাদ" -এর মুখে কাঁচা ইট সমান করে বসিয়ে দিবে। কেননা নবী করীম ﷺ -এর কবর শরীফে কাঁচা ইট বসানো হয়েছিল। লাহাদের মুখে ইট বসানো পর্যন্ত স্ত্রীলোকের কবর কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখবে। আর পুরুষের কবর কাপড় দ্বারা ঢাকতে হবে না। কেননা স্ত্রীলোকের অবস্থার ভিত্তি হলো পর্দার উপর আর পুরুষের অবস্থার ভিত্তি হলো উন্মুক্ত থাকার উপর। পাকা ইট এবং কাঠ দেওয়া মাকরূহ, কেননা উভয়টি দ্বারা বিল্ডিং সুদৃঢ় করা হয়। কবর হল গলিত হওয়ার স্থান। তাছাড়া এই পাকা ইটের মধ্যে আগুনের প্রভাব রয়েছে। তাই বদনামী হিসাবেও মাকরূহ হবে। বাঁশ ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই। জামে সগীরে বর্ণিত হয়েছে যে, কাঁচা ইট আর বাঁশ ব্যবহার করা মোস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কবরের উপর একটি বাঁশের গিটু ব্যবহার করা হয়েছিল। তারপর মাটি দেওয়া হবে এবং কবরকে কুহান তথা উটের পিটের উঁচু হাড়ের অনুরূপ বানানো হবে। একেবারে সমতল বানাবে না। অর্থাৎ চতুর্কোণ বানাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরকে চতুর্কোণ বানাতে নিষেধ করেছেন। আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কবরকে দেখেছে সে বলেছে ঐ কবরটি কোহনে ছিল। (ঝাড় বা উটের উঁচু হাড়ের অনুরূপ ছিল)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার বলেন, মাইয়েতকে কবরে রাখার সময় এই দোয়া পড়বে بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ। অন্য বর্ণনায় بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ -এর শব্দ রয়েছে। দলিল হলো, হযরত আবূ দুজানা (রা.)-কে কবরে রাখার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ বলেছিলেন। মাবসূত ও বাদায়ে নামক গ্রন্থদ্বয়ে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থকারও তাদের অনুসরণ করেছেন, অথচ এটা ভুল। কেননা আবূ দুজানা আনসারী (রা.)-এর ওফাত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর সিদ্দীকে আকবর (রা.) -এর খিলাফতকালে জঙ্গে ইয়ামামার সময় হয়েছিল। সহীহ হলো হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুন্নাজাদাইনকে (আব্দুল্লাহ) কবরে রাখার সময় উক্ত দোয়া পড়েছিলেন। তা ছাড়া উক্ত দোয়ার প্রমাণ হযরত ইবনে ওমর

عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ (রা.)-এর হাদীস দ্বারাও পাওয়া যায়। হাদীসটি হলো, وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাইয়েতকে কবরে রাখতেন তখন بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ বলতেন। আর حاكم-এর বর্ণনায় হাদীসটি এভাবে রয়েছে যে, إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِيْ قُبُوْرِهِمْ فَقُوْلُوْا بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ যখন তোমরা মুর্দাকে কবরে রাখবে তখন بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ পড়বে।- (ফাতহুল কাদীর) লাহাদে মাইয়েতকে রেখে কিবলামুখী করে দিবে। অর্থাৎ ডান পার্শ্বের উপর শুইয়ে কিবলার দিকে করে দিবে। শুধু মাত্র মুখ কিবলার দিকে করা যথেষ্ট নয়। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইনায়া নামক গ্রন্থে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে- عَنْ عَلِيٍّ (رض) أَنَّهُ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ ﷺ يَا عَلِيُّ اسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ اسْتِقْبَالًا হযরত আলী (রা.) বলেন, বনূ আব্দুল মুত্তালিবের এক লোক ইনতিকাল করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আলী তাকে কিবলামুখী করে দাও। গ্রন্থকার বলেন, মাইয়েতকে কবরে রাখার পর তার কাফনের গিরা খুলে দিবে। কেননা এখন আর কাফন সরে যাওয়ার ভয় নেই। তারপর লাহাদ-এর মুখে কাঁচা ইট সমান করে বসিয়ে দিবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রওজা শরীফে কাঁচা ইট বসানো হয়েছিল। হযরত জাবির (রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে। كَانَ قَبْرُ النَّبِيِّ ﷺ اللَّحْدُ وَنَصَبْنَا عَلَيْهِ اللَّبِنَ نَصْبًا وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লাহাদে রাখা হয়েছে। আমরা লাহাদের উপর ইট বাসিয়েছি। তাঁর রওজা শরীফ এক বিঘত পরিমাণ জমিন থেকে উঁচু রাখা হয়েছিল।

স্ত্রীলোকদেরকে লাহাদে রাখার সময় তার কবরের উপর কাপড় দ্বারা পর্দা করবে যতক্ষণ না কবরকে কাঁচা ইট দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুরুষের কবরের উপর পর্দা করার কোনো প্রয়োজন নেই। দলিল হলো, স্ত্রীলোকদের অবস্থার ভিত্তি হলো পর্দার উপর আর পুরুষের অবস্থার ভিত্তি হলো উন্মুক্ত থাকার উপর। তা ছাড়া হযরত ফাতিমা (রা.)-কে কবরে রাখার সময় তাঁর কবরের উপর পর্দা করা হয়েছিল। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, পুরুষের কবরের উপরও পর্দা করা হবে। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'আদ ইবনে মু'আয (রা.)-কে কবরে রাখার সময় তার কবরের উপর পর্দা রেখেছিলেন। আমাদের দলিল হলো, একবার হযরত আলী (রা.) এক মাইয়েতের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখলেন তার কবরের উপর পর্দা করা হয়েছে হযরত আলী (রা.) তা সরিয়ে দিলেন। আর বললেন, এ হলো পুরুষ অর্থাৎ পুরুষের অবস্থার ভিত্তি হলো উন্মুক্ত থাকার উপর, পর্দার উপর নয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পেশ করা দলিলের (হাদীসের) জবাব হলো, সা'আদ ইবনে মুআয (রা.)-এর কাফন এত ছোট ছিল যে, তার পুরো শরীরে আবৃত হচ্ছিল না। বরং শরীরের কিছু অংশ খোলা ছিল। এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কবরের উপর পর্দা করেছিলেন।

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ الْأَجُرُّ وَالْخَشَبُ لِأَنَّهُمَا الخ : কবরের মধ্যে পাকা ইট এবং কাঠ লাগানো মাকরূহ। দলিল হলো, এগুলো দ্বারা নির্মাণ কাজের মজবুতী করা হয়। আর কবর হল গলিত হওয়ার জায়গা, তাই এই স্থানে এগুলো ব্যবহার করা অতিরিক্ত এবং অহেতুক কাজ বৈ-কি? তাই মাকরূহ। পাকা ইট লাগানোর মধ্যে মাকরূহ হওয়ার এ-ও কারণ যে, পাকা ইটের মধ্যে আগুনের প্রভাব রয়েছে। তাই বদনামী হিসাবেও মাকরূহ। যেন তার আখরাতের ঘর আগুনের সাহায্যে তৈরি হয়েছে। (তাই মাকরূহ) বাঁশের বাশি বা বাশ ব্যবহারের কোনো অসুবিধা নেই। জামে সগীরে বর্ণিত হয়েছে যে, কাঁচা ইট ও বাঁশ ব্যবহার করা মোস্তাহাব। কুদূরীর ইবারত দ্বারা মোস্তাহাব বুঝা যায় না। জামে সগীরের ইবারত দ্বারা মোস্তাহাব বুঝা যায়। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরের উপর একটি বাঁশের বাশির গিট লাগানো হয়েছিল। তারপর কবরের উপর মাটি ঢেলে দিবে। কবরকে কোহান সদৃশ্য বানানো হবে। অর্থাৎ জমিন থেকে এক বিঘত কিংবা এর চেয়ে কিছু উচু করে বানানো হবে। কবরকে চতুর্কোণ বানাবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর মতে কবরকে চতুর্কোণ বানানো সুন্নত। কোহান বানানো সুন্নত নয়। তার দলিল হলো, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহেবজাদা ইব্রাহীমের ওফাত হল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কবরকে চতুর্কোণ বানিয়ে ছিলেন, কোহান বানাননি। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরগুলোকে চতুর্কোণ বানাতে বারণ করে গেছেন। ইব্রাহীমে নাখয়ী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরকে দেখেছে এবং শায়খাইন তথা হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর কবরকে দেখেছেন, সে আমাকে বলেছে যে, তাদের কবরগুলো কোহন সদৃশ্য ছিল। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পেশকৃত দলিলের জওয়াব হলো, ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ ﷺ-এর কবর প্রথমঃ চর্তুকোণ ছিল, পরে কোহন সদৃশ করে দেওয়া হয়েছিল। মাবসূত এবং মুহীত নামক গ্রন্থদ্বয়ে এভাবেই বর্ণিত আছে। আল্লাহই সম্যক অবহিত।

بَابُ الشَّهِيْدِ

اَلشَّهِيْدُ مَنْ قَتَلَهُ الْمُشْرِكُوْنَ اَوْ وُجِدَ فِى الْمَعْرَكَةِ وَبِهِ اَثَرٌ اَوْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُوْنَ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهِ دِيَةٌ فَيُكَفَّنُ وَيُصَلّٰى عَلَيْهِ وَلَا يُغْسَلُ لِاَنَّهُ فِىْ مَعْنٰى شُهَدَاءِ اُحُدٍ وَقَالَ ﷺ فِيْهِمْ زَمِّلُوْهُمْ بِكُلُوْمِهِمْ وَ دِمَائِهِمْ وَلَاتُغَسِّلُوْهُمْ فَكُلُّ مَنْ قُتِلَ بِالْحَدِيْدِ ظُلْمًا وَهُوَ طَاهِرٌ بَالِغٌ وَلَمْ يَجِبْ بِهِ عِوَضٌ مَالِيٌّ فَهُوَ فِىْ مَعْنَاهُمْ فَيُلْحَقُ بِهِمْ وَالْمُرَادُ بِالْاَثَرِ الْجِرَاحَةُ لِاَنَّهَا دَلَالَةُ الْقَتْلِ وَكَذَا خُرُوْجُ الدَّمِ مِنْ مَوْضِعٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ كَالْعَيْنِ وَنَحْوِهٖ وَالشَّافِعِىْ يُخَالِفُنَا فِى الصَّلٰوةِ وَيَقُوْلُ السَّيْفُ مَحَّاءٌ لِلذُّنُوْبِ فَاَغْنٰى عَنِ الشَّفَاعَةِ وَنَحْنُ نَقُوْلُ الصَّلٰوةُ عَلَى الْمَيِّتِ لِاِظْهَارِ كَرَامَتِهٖ وَالشَّهِيْدُ اَوْلٰى بِهَا وَالطَّاهِرُ عَنِ الذُّنُوْبِ لَايَسْتَغْنِىْ عَنِ الدُّعَاءِ كَالنَّبِىِّ وَالصَّبِىِّ -

পরিচ্ছেদ : শহীদের বিবরণ

অনুবাদ : শহীদ ঐ ব্যক্তি যাকে মুশরিকরা হত্যা করেছে কিংবা যুদ্ধের মাঠে (মৃত) পাওয়া গেছে আর তার দেহে চিহ্নও রয়েছে। কিংবা মুসলমানরা তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং তাকে হত্যা করার কারণে দিয়ত ওয়াজিব হয়নি। এমন ব্যক্তিকে কাফন দেওয়া হবে এবং তার জানাযা পড়া হবে কিন্তু গোসল দেওয়া হবে না। কেননা সে উহুদের শহীদের শ্রেণীভুক্ত। আর তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তাদেরকে তাদের জখম ও রক্তসহ আবৃত করো, গোসল দিওনা। সুতরাং যে কেউ লৌহাস্ত্র দ্বারা অন্যায়ভাবে নিহত হয় আর সে পবিত্র ও প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং তার হত্যার বিনিময়ে কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না, সে উহুদের শহীদগণের শ্রেণীভুক্ত হবে। সুতরাং তাকে তাদের সাথে যুক্ত করা হবে। চিহ্ন দ্বারা জখম উদ্দেশ্য। কেননা জখম নিহত হওয়ার আলামত। তেমনি অস্বাভাবিক স্থান থেকে রক্ত বের হওয়াও। যেমন, চোখ বা এরূপ কোনো স্থান থেকে রক্ত রেব হওয়া। শাফি'ঈ (র.) জানাযার নামাজের ক্ষেত্রে আমাদের সাথে মতভেদ করেছেন। তিনি বলেন, তরবারির আঘাত গুনাহ মুছে ফেলে। সুতরাং (জানাযার নামাজের মাধ্যমে) দোয়া ইস্‌তিগ্‌ফারের প্রয়োজন নেই। আমরা এর জওয়াবে বলি, মাইয়েতের জানাযা পড়া হয় তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য। আর শহীদ তো অবশ্যই সম্মানের যোগ্য। তা ছাড়া পাপ থেকে পবিত্র ব্যক্তিও দোয়ার প্রয়োজন থেকে মুক্ত নয়। যেমন নবী ও শিশু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব কথা : নিহত ব্যক্তি (مقتول) -এর ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো যে, সে সময় মতো মৃত্যু বরণ করেছে। সময়ের আগে মরেনি। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, যদি সে সময় মতোই মৃতবরণ করে থাকে তাহলে হত্যাকারীর উপর কিসাস বা দিয়ত কেন ওয়াজিব হয়? এর জবাব হলো, হত্যাকারী যেহেতু হত্যা করার কারণে পৃথিবীর আইন শৃঙ্খলাকে লঙ্ঘন করেছে তাই পৃথিবীর আইন-শৃঙ্খলা ঠিক রাখার জন্য হত্যাকারীর উপর উক্ত আইন আরোপ করা হয়েছে।

শহীদের আহকাম ভিন্ন পরিচ্ছেদে এ কারণে আনা হয়েছে যে, শহীদের মওত অন্যান্য মওতের তুলনায় অনেক দিক থেকে উত্তম। এমনকি আল্লাহর রাস্তার শহীদকে মৃত বলতেও নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّاتَشْعُرُوْنَ যারা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে মৃত বলো না বরং তারা জীবিত তবে তা তোমরা জান না। জানাযার পর শহীদের আলোচনা ذِكْرُ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ (তথা আম বিষয়ের

আলোচনার পর খাসের আলোচনা)-এর পর্যায় ভুক্ত। যেমন কুরআনের মধ্যে মালায়িকা (ملائكة)-এর পর জিব্‌রাঈল আর মিকাঈল (আ.)-এর বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ যে ব্যক্তি আল্লাহ, ফেরেশ্‌তা, জিব্‌রাঈল ও মীকাঈল-এর শত্রু সে জেনে রাখুক আল্লাহ তা'আলা, কাফিরদের শত্রু। শহীদকে এজন্য শহীদ বলা হয় যে, ফেরেশ্‌তাগণ তার সম্মানার্থে মওতের সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং شهيد - مشهود -এর অর্থে হবে যেমন فعيل - مفعول এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় কারণ হলো, আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি যেহেতু مَشْهُودٌ لَهُ بِالْجَنَّةِ তথা জান্নাতী হওয়ার ওয়াদা আছে তাই তাকে শহীদ বলা হয়। তৃতীয় কারণ হলো, আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি যেহেতু জীবিত এবং আল্লাহর নিকট উপস্থিত তাই তাকে শহীদ বলা হয়। কেননা শহীদের অর্থও হাজির তথা বিদ্যমান থাকা। ফকীহগণের পরিভাষায় শহীদ বলা হয় যাকে মুশরিকরা হত্যা করেছে কিংবা যুদ্ধের মাঠে পাওয়া গেছে এবং তার শরীরে হত্যার নমুনাও রয়েছে কিংবা তাকে মুসলমানরা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং তার হত্যার কারণে দিয়ত ওয়াজিব হয়নি।

শহীদ দুই প্রকার। **এক.** আখিরাতের আহকামের দিক থেকে শহীদ, যদিও দুনিয়াবী আহকামের দিক থেকে তাকে গোসল ইত্যাদি দেওয়া হয়। **দুই.** দুনিয়া ও আখিরাত উভয় দিক থেকে শহীদ এমনকি তাকে গোসলও দেওয়া হবে না।

قَوْلُهُ اَلشَّهِيْدُ مَنْ قَتَلَهُ الخ : কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, শহীদের অনেকগুলো সুরত রয়েছে। **এক.** কোনো মুসলমানকে মুশরিক লোকেরা হত্যা করেছে। আর তা কোনো অস্ত্র দ্বারা হোক কিংবা লাঠি দ্বারা হোক। **দুই.** কোনো মুসলমানকে যুদ্ধের মাঠে এমনভাবে মৃত পাওয়া গেছে যে, তার দেহে হত্যার চিহ্ন রয়েছে। **তিন.** কোনো মুসলমানকে মুসলমানরা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং এই হত্যার কারণে দিয়াত ওয়াজিব হয়নি। উপরোক্ত তিন সুরতের হুকুম হলো, সর্বসম্মতিক্রমে তাকে কাফন দেওয়া হবে আর যেহেতু সে উহুদের শহীদগণের শ্রেণীভুক্ত তাই তাকে সর্বসম্মতিক্রমে গোসল দেওয়া হবে না। তবে জানাযার নামাজের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আমাদের মতে শহীদগণের জানাযার নামাজ পড়া হবে। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে পড়া হবে না।

শহীদকে তো কাফন এ জন্য দেওয়া হবে যে, কাফন দেওয়া আদম সন্তানদের পুরুষদের জন্য সুন্নত। সুতরাং যদি শহীদগণের শরীরে কাপড় থাকে তবে তা খোলা হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, زَمِّلُوْهُمْ بِكُلُوْمِهِمْ وَ دِمَائِهِمْ অন্য বর্ণনায় রয়েছে بِثِيَابِهِمْ অর্থাৎ তাদেরকে তাদের জখম, রক্ত এবং কাপড়সহ আবৃত কর। শহীদের শরীরে যদি টুপি, মোজা এবং অস্ত্র ইত্যাদি থাকে, তবে সেগুলো খুলে ফেলবে। কেননা এগুলো কাফনের প্রকৃতির নয়। তবে যদি কাফনের কাপড়ে কম থাকে তবে তা বৃদ্ধি করা হবে। শহীদদেরকে গোসল দেওয়া হয় না এ কারণে যে, শহীদগণ উহুদের শহীদগণের শ্রেণীভুক্ত আর উহুদের শহীদগণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন وَلَا تُغَسِّلُوْهُمْ তাদেরকে গোসল দিওনা। অন্য হাদীসে রয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় যদি কেউ জখম হয় তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে এ অবস্থায় সে উপস্থিত হবে যে, তার রং তো রক্তের অনুরূপ হবে তবে ঘ্রাণ হবে মিশ্‌ক আম্বরের অনুরূপ। হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, যে ব্যক্তিকে ধারাল অস্ত্র দ্বারা অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, এবং সে পাক পবিত্র হয় এবং বালিগও বটে আর তার হত্যার কারণে আর্থিক (مالی) কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়নি, তবে সে উহুদের শহীদগণের শ্রেণীভুক্ত হবে। তাই তাকেও তাদের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে।

শহীদের জানাযার নামাজের ব্যাপারে আমাদের আর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। আমাদের মতে শহীদের জানাজার নামাজও ফরজে কিফায়া। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে শহীদের জানাযার নামাজ নেই। তাঁর মতে জানাযার নামাজ হল মূলত মাইয়েতের জন্য সুপারিশ ও দোয়া। আর তরবারির আঘাত শহীদদের তামাম অপরাধকে মুছে ফেলে। সুতরাং যেহেতু তরবারি শহীদের অপরাধকে মুছে দিয়েছে, তাই তার জন্য আর সুপারিশ এবং দোয়ার প্রয়োজন নেই। এ জন্য বলা হয়েছে যে, শহীদের উপর জানাযার নামাজ পড়া হবে না। আমাদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব হলো, মাইয়েতের উপর জানাযার নামাজ নিরেট দোয়ার জন্য পড়া হয় না বরং দোয়া ছাড়া মাইয়েতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর শহীদ তো সম্মান পাওয়ার অধিক যোগ্য। তাই অন্যান্য মাইয়েতের ন্যায় শহীদেরও জানাযার নামাজ পড়া হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর এই কথা বলা– "যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে পাক হয়ে গেছে তার দোয়ার প্রয়োজন নেই, সে দোয়ার অ-মুখাপেক্ষী" এ কথাটি ভুল। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অধিক পবিত্র আর কে আছে? অ-প্রাপ্ত বয়স্ক শিশুও গুনাহ থেকে পাক। এতদ্‌সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানাযা পড়া হয়েছে এবং শিশুদের জানাযার নামাজ পড়াও ফরজ। সুতরাং যেহেতু নবী ও শিশুর উপর নামাজ পড়া ফরজ সেহেতু শহীদের উপরও ফরজ হবে।

وَمَنْ قَتَلَهُ اَهْلُ الْحَرْبِ اَوْ اَهْلُ الْبَغْيِ اَوْ قُطَّاعُ الطَّرِيْقِ فَبِاَيِّ شَيْءٍ قَتَلُوْهُ لَمْ يُغْسَلْ لِاَنَّ شُهَدَاءَ اُحُدٍ مَا كَانَ كُلُّهُمْ قَتِيْلَ السَّيْفِ وَالسِّلَاحِ وَاِذَا اُسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ غُسِلَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَقَالَا لَايُغْسَلُ لِاَنَّ مَا وَجَبَ بِالْجَنَابَةِ سَقَطَ بِالْمَوْتِ وَالثَّانِىْ لَمْ يَجِبْ لِلشَّهَادَةِ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ اَنَّ الشَّهَادَةَ عُرِفَتْ مَانِعَةً غَيْرَ رَافِعَةٍ فَلَا تَرْفَعُ الْجَنَابَةَ وَقَدْ صَحَّ اَنَّ حَنْظَلَةَ لَمَّا اُسْتُشْهِدَ جُنُبًا غَسَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ اِذَا طَهُرَتَا وَكَذَا قَبْلَ الْاِنْقِطَاعِ فِى الصَّحِيْحِ مِنَ الرِّوَايَةِ وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ الصَّبِىُّ لَهُمَا اَنَّ الصَّبِىَّ اَحَقُّ بِهٰذِهِ الْكَرَامَةِ وَلَهُ اَنَّ السَّيْفَ كَفٰى عَنِ الْغُسْلِ فِىْ حَقِّ شُهَدَاءِ اُحُدٍ بِوَصْفِ كَوْنِهِ طَهْرَةً وَلَا ذَنْبَ عَلَى الصَّبِيِّ فَلَمْ يَكُنْ فِىْ مَعْنَاهُمْ ـ

অনুবাদ : যাকে হারবী লোক হত্যা করে কিংবা বিদ্রোহী কিংবা ডাকাতরা হত্যা করে, তাকে যে জিনিস দ্বারাই হত্যা করুক গোসল দেওয়া হবে না। কেননা উহুদের শহীদানদের সকলেই তরবারি বা লৌহাস্ত্র দ্বারা নিহত হননি। জানাবাত অবস্থায় কেউ যদি শহীদ হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তাঁকে গোসল দেওয়া হবে। সাহেবাইন বলেন যে, তাকে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা জানাবাত দ্বারা যে গোসল ওয়াজিব হয়েছিল, তা মৃত্যুর কারণে রহিত হয়ে গিয়েছে। আর মৃত্যুর দরুন দ্বিতীয় গোসলটি অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী গোসলটি শাহাদাতের কারণে ওয়াজিব হয়নি। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, শাহাদাত গোসল রোধকারী হিসাবে স্বীকৃত, লোপকারী নয়। সুতরাং তা জানাবাতকে লোপ করবে না। আর বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত আছে যে, হযরত হানাযালা (রা.) যখন জানাবাতগ্রস্ত অবস্থায় শহীদ হলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাঁকে গোসল দান করেছিলেন। হায়িয ও নিফাসগ্রস্ত স্ত্রীলোক যখন পবিত্র হয়ে (শাহাদাত বরণ করে) তখন তার সম্পর্কে একই মতভিন্নতা রয়েছে। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে হায়িয বা নিফাস শেষ হওয়ার আগে শাহাদাত বরণ করলেও তার সম্পর্কেও একই মতবিরোধ রয়েছে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু সম্পর্কেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। সাহেবাইনের দলিল হলো, শিশু তো এই মর্যাদা লাভের অধিকতর উপযুক্ত। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, পবিত্র অবস্থায় থাকা হিসাবে উহুদের শহীদানের ক্ষেত্রে তরবারির আঘাত গোসলের ব্যাপারে যথেষ্ট হয়েছে। পক্ষান্তরে শিশুর তো গুনাহ নেই। সুতরাং সে উহুদের শ্রেণীভুক্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো মুসলমানকে বিধর্মী রাষ্ট্রের কাফিররা হত্যা করে কিংবা মুসলমান রাষ্ট্রের বিদ্রোহীরা হত্যা করে কিংবা ডাকাতরা হত্যা করে এবং তা যে কোনো জিনিস দ্বারাই হত্যা করুক–না কেন নিহত ব্যক্তিকে শহীদ বলা হবে। তাকে গোসল দেওয়া হবে না। দলিল হলো, উহুদের শহীদগণ সকলে তরবারি ও অস্ত্র দ্বারা নিহত হননি বরং কাউকে তাদের মাথায় পাথর মেরে শহীদ করা হয়েছে, কাউকে লাঠির আঘাতে দ্বারা শহীদ করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল শহীদ হওয়ার জন্য লোহার অস্ত্র দ্বারা নিহত হওয়া শর্ত নয়। এখানে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মুসলিম রাষ্ট্রের ডাকাত কিংবা বিদ্রোহী ব্যক্তির হাতে নিহত ব্যক্তি শহীদের শ্রেণীভুক্ত হয় না এজন্য তাদের হাতে নিহত ব্যক্তিকে শহীদ না বলা উচিত। এর উত্তর হলো, আমাদেরকে যেমনিভাবে কাফিরদের সাথে লড়াই করতে বলা হয়েছে এমনিভাবে বিদ্রোহীদের সাথেও লড়াই করতে বলা হয়েছে। তাইতো ইরশাদ হয়েছে فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ যারা বিদ্রোহ করে তাদের সাথে লড়াই করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং যে ব্যক্তি বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলো সে-ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছে। তাই কাফিরদের সাথে লড়াই করে মারা যাওয়া আর বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হওয়া একই

পর্যায়ের। এমনিভাবে ডাকাতদের হাতে নিহত হওয়াও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রাণ দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। কেননা ডাকাতদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ডাকাতদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধকারী হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। এখন যে ডাকাতদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তাদের হাতে নিহত হবে যেন সে আল্লাহ এবং রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ করেছে বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূলের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য যুদ্ধ করবে এবং নিহত হয়ে যাবে সে-ও কাফিরদের সাথে যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির বলে গণ্য হবে। আর যে মুসলমান কাফিরদের সাথে যুদ্ধে নিহত হয়ে যায় সে নিঃসন্দেহে শহীদ। তাই বিদ্রোহী এবং ডাকাতদের হাতে নিহত ব্যক্তিও তার মতো শহীদ হবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا اسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ الخ মাসআলা ঃ জুনূবী মুসলমান যদি শহীদ হয় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তাকে গোসল দেওয়া হবে। এটা ইমাম আহমদ (র.)-এরও অভিমত। সাহেবাইন (র.)-এর মতে গোসল দেওয়া হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) ও একই কথা বলেন। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, যে গোসল জানাবাতের কারণে ওয়াজিব হয়েছিল তা মৃত্যু দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কেননা মৃত্যুর কারণে সে জানাবাতের গোসলের হুকুম থেকে বেরিয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় গোসল অর্থাৎ মাইয়েতের গোসল শাহাদাতের কারণে ওয়াজিব হয়নি। কেননা শাহাদাত গোসল ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। কারণ শহীদগণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন زَمِّلُوْهُمْ بِكُلُوْمِهِمْ وَلَا تُغَسِّلُوْهُمْ উক্ত হাদীসের মধ্যে এই ব্যাখ্যা নেই যে, শহীদ জুনূবী হবে-না গায়রে জুনূবী হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, শাহাদাত মাইয়েতের গোসল ওয়াজিব হওয়ার প্রতিবন্ধক তো বটে কিন্তু যদি প্রথম থেকে গোসল ওয়াজিব হয় তবে তা লোপকারী বলে গণ্য হবে না। তাইতো শহীদের কাপড়ে যদি নাপাক লাগে তবে তা ধোয়া জরুরি; কিন্তু তার শরীরের রক্ত ধোয়া জরুরি নয়। সুতরাং শাহাদাত যেহেতু লোপকারী নয় এ জন্য শাহাদাত জানাবাতকেও দূর করবে না। আর যেহেতু জানাবাতকে দূর করবে না, তাই জুনূবী শহীদকে জানাবাতের গোসল দেওয়া ওয়াজিব হবে।

এর সমর্থন নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারাও হয়। হযরত হানযালা (রা.) যখন শহীদ হলেন তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাঁকে গোসল দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ঘরের লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হানযালা কোন অবস্থায় ছিল? তাঁর বিবি বললেন, তিনি রাতে আমার সাথে সহবাস করেছিলেন। যখন যুদ্ধের ঘোষণা কানে ভেসে আসল তখন গোসল ছাড়াই যুদ্ধে শরিক হয়ে গেছেন এবং শহীদ হয়ে গেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন এটাই কারণ। এখানে যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, গোসল দেওয়া মানুষের উপর ওয়াজিব, ফেরেশ্‌তাদের উপর নয়। সুতরাং জুনূবী শহীদকে যদি গোসল দেওয়া ওয়াজিব হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হানযালাকে দ্বিতীয়বার গোসল দেওয়ার নির্দেশ দিতেন? জওয়াব হলো, ওয়াজিব তো হলো শুধু গোসল দেওয়া। গোসলদাতা যেমনই হোক। লক্ষণীয় যে, যখন ফেরেশ্‌তাগণ আদম (আ.)-কে গোসল দিলেন তখন ওয়াজিব আদায় হয়ে গেছে। আদম সন্তান আদম (আ.)-এর গোসলের পুনরাবৃত্তি করেননি। ফেরেশতাগণের দেওয়া গোসল যদি অসম্পূর্ণ হতো তবে আদম সন্তানগণ আদম (আ.)-এর গোসলের পুনরাবৃত্তি করতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হানযালার গোসলের পুনরাবৃত্তি করতেন। একই মতবিরোধ হায়িয ও নিফাসগ্রস্ত স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে রয়েছে। অর্থাৎ যদি হায়িয ও নিফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে তারা পাক হয়ে যায় কিন্তু এখনো গোসল করেনি, এ অবস্থায় শহীদ হয়ে যায় তবে ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর মতে তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা ইমাম সাহেবের মতে শাহাদাত গোসলরোধকারী কিন্তু বিলোপকারী নয়। সাহেবাইন (র.)-এর মতে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা গোসল প্রথমত মওতের কারণে লোপ পেয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত শাহাদাতের কারণে ওয়াজিব হয়নি। অন্য বর্ণনা মতে যদি রক্ত বন্ধ হওয়ার পূর্বে শহীদ হয়ে যায়, তবে ইমাম সাহেবের মতে তাকে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা রক্ত বন্ধ হওয়ার পূর্বে তার উপর গোসল-ই ওয়াজিব হয়নি। আর দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী গোসল দেওয়া হবে। এটিই সহীহ বর্ণনা। কারণ মৃত্যুর কারণে রক্ত বন্ধ হয়ে গছে। আর প্রবাহিত রক্ত বন্ধ হওয়ার সময় গোসলকে ওয়াজিব করে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুকে যদি হত্যা করা হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তাকে গোসল দেওয়া হবে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে গোসল দেওয়া হবে না। সাহেবাইন (র.) এর দলিল হলো, শহীদকে গোসল না দেওয়ার দর্শন হলো যাতে তার অত্যাচারিত হওয়ার আছর বাকি থাকে। সুতরাং শহীদকে গোসল দেওয়া হয় না তার সম্মানার্থে। আর শিশুর মযলূমিয়াত তার থেকেও অধিক তাই সে মর্যাদা লাভের অধিক উপযুক্ত। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, শহীদানে উহুদের ক্ষেত্রে তরবারির আঘাত গোসলের ব্যাপারে যথেষ্ট ছিল। কেননা তরবারির আঘাত গুনাহ'থেকে পাক পবিত্র করে দেয়। অর্থাৎ উহুদের শহীদগণকে এ কারণে গোসল দেওয়া হয়নি যে, তরবারির আঘাত তাদেরকে গুনাহ থেকে পাকসাফ ও স্বচ্ছ করে দিয়েছে। আর যেহেতু শিশুর কোনো গুনাহই নেই, তাই শিশু উহুদের শহীদগণের শ্রেণীভুক্ত হবে না। আর যেহেতু তাদের মতো হবে না, তাই তাদের ন্যায় গোসলও বাদ যাবে না। তাই শিশুকে গোসল দেওয়া হবে।

وَلَا يُغْسَلُ عَنِ الشَّهِيْدِ دَمُهُ وَلَا يُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ لِمَا رَوَيْنَا وَيُنْزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ وَالْحَشْوُ وَالسِّلَاحُ وَالْخُفُّ [illegible]هَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْكَفَنِ وَيَزِيْدُوْنَ وَيَنْقُصُوْنَ مَاشَاءُوْا اِتْمَامًا لِلْكَفَنِ وَمَنِ ارْتُثَّ غُسِلَ وَهُوَ مَنْ صَارَ خَلِقًا فِيْ حُكْمِ الشَّهَادَةِ لِنَيْلِ مَرَافِقِ الْحَيٰوةِ لِاَنَّ بِذٰلِكَ يُخَفُّ اَثَرُ الظُّلْمِ فَلَمْ يَكُنْ فِيْ مَعْنٰى شُهَدَاءِ اُحُدٍ وَالْاِرْتِثَاثُ اَنْ يَاْكُلَ اَوْ يَشْرَبَ اَوْ يَنَامَ اَوْيُدَاوٰى اَوْ يُنْقَلَ مِنَ الْمَعْرَكَةِ لِاَنَّهُ نَالَ بَعْضَ مَرَافِقِ الْحَيٰوةِ وَشُهَدَاءُ اُحُدٍ مَاتُوْا عِطَاشًا وَالْكَاْسُ تُدَارُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَقْبَلُوْا خَوْفًا مِنْ نُقْصَانِ الشَّهَادَةِ اِلَّا اِذَا حُمِلَ مِنْ مَصْرَعِهِ كَيْلَا تَطَاَهُ الْخُيُوْلُ لِاَنَّهُ مَانَالَ شَيْئًا مِنَ الرَّاحَةِ وَلَوْ اٰوَاهُ فُسْطَاطٌ اَوْخَيْمَةٌ كَانَ مُرْتَثًّا لِمَا بَيَّنَّا وَلَوْ بَقِيَ حَيًّا حَتّٰى مَضٰى وَقْتُ صَلٰوةٍ وَهُوَ يَعْقِلُ فَهُوَ مُرْتَثٌّ لِاَنَّ تِلْكَ الصَّلٰوةَ صَارَتْ دَيْنًا فِيْ ذِمَّتِهِ وَهُوَ مِنْ اَحْكَامِ الْاَحْيَاءِ قَالَ وَهٰذَا مَرْوِيٌّ عَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) وَلَوْ اَوْصٰى بِشَيْءٍ مِنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ كَانَ اِرْتِثَاثًا عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ لِاَنَّهُ اِرْتِفَاقٌ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَايَكُوْنُ لِاَنَّهُ مِنْ اَحْكَامِ الْاَمْوَاتِ ـ

অনুবাদ : শহীদের রক্ত ধোয়া হবে না এবং তার কাপড় চোপড়ও খোলা হবে না। এর দলিল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীস। তবে চর্মের বা তুলা ভর্তি পরিধেয় অস্ত্রসস্ত্র ও মোজা খুলে নেওয়া হবে। কেননা এগুলো কাফন জাতীয় নয়। আর কাফনের কাপড় পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে (প্রয়োজন অনুযায়ী) ইচ্ছামত বাড়াবে কিংবা কমাবে। যে আহত ব্যক্তি জীবনের কিছু সুযোগ সুবিধা লাভের পর মারা যায়, তাকে গোসল দেওয়া হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীবনের আরাম ও সুবিধা গ্রহণের কারণে শাহাদাতের হুকুম লাভের ক্ষেত্রে (কিছুটা সময় ক্ষেপণ করে) পুরনো হয়ে গেছে। কেননা এ কারণে জুলুমের চিহ্ন কিছুটা লঘু হয়ে গেছে। ফলে সে উহুদের শহীদের শ্রেণীভুক্ত হবে না। "সুযোগ সুবিধা" গ্রহণের অর্থ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা, নিদ্রা যাওয়া, ঔষধ (ও চিকিৎসা) গ্রহণ করা কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে (নিরাপদ স্থানে) স্থানান্তরিত হওয়া। কেননা এভাবে সে জীবনের কিছু সুবিধা ভোগ করল। আর উহুদের শহীদগণ পানির পেয়ালা তাদের সামনে তুলে ধরা সত্ত্বেও পিপাসার্ত অবস্থায় মারা গেছেন। কিন্তু শাহাদাতের মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকায় তারা (পানিটুকু) ও গ্রহণ করেননি। কিন্তু যদি কোনো আহত ব্যক্তিকে এ কারণে আহত হওয়ার স্থান থেকে তুলে আনা হয়, যাতে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট না হয় (তবে তা সুযোগ গ্রহণ বলে গণ্য হবে না)। কেননা সে কোনো প্রকার আরাম লাভ করেনি। আর যদি কোনো শিবিরে বা তাঁবুতে এনে রাখা হয় তবে পূর্ব বর্ণিত কারণে সে সুবিধা গ্রহণকারী বলে গণ্য হবে। আর যদি এক ওয়াক্ত নামাজের সময় অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত সে সজ্ঞানে বেঁচে থাকে তবে সে সুবিধা গ্রহণকারী হলো। কেননা উক্ত নামাজ তার জিম্মায় ঋণ হয়ে গেল। আর তা জীবিতদের সাথে সম্পর্কিত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত। যদি আখিরাত সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে অসিয়ত করে তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সেও সুবিধা গ্রহণকারী বলে গণ্য হবে। কেননা এটাও সুবিধা গ্রহণ। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে সুবিধা গ্রহণকারী হবে না। কেননা অসিয়ত করা তো মাইয়েতের আহকামভুক্ত বিষয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শহীদের শরীরে যদি চমড়ার কোনো পোষাক থাকে কিংবা তুলা ভর্তি কোনো পোশাক থাকে কিংবা অস্ত্রসস্ত্র বা মোজা থাকে, তবে এগুলো খুলে নেওয়া হবে। এটা হানাফী আলিমগণের মাযহাব। ইমাম শাফি'ই (র.) বলেন, শহীদের শরীর থেকে কোনো জিনিস সরানো যাবে না। তাঁর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– زَمِّلُوْهُمْ الخ অর্থাৎ শহীদগণকে তাদের কাপড়ে দাফন করো। এর মধ্যে কোনো ব্যাখ্যা নেই, কোন ধরনের কাপড়ে দাফন করা হবে বা কোন ধরনের কাপড়ে করা হবে না এবং কোন ধরনের কাপড় খুলে নেওয়া হবে। উক্ত হাদীসের ব্যাপকতা দ্বারা বুঝা যায় যে, শহীদের শরীর থেকে কোনো জিনিস খুলে নেওয়া হবে না। আমাদের দলিল হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস–

قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلٰى اُحُدٍ اَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيْدُ وَالْجُلُوْدُ وَاَنْ يُدْفَنُوْا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের শহীদানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন, তাদের শরীর থেকে লৌহা ও চর্মের পোশাক খুলে ফেলা হয় এবং যেন রক্ত ও পোষাক সহ তাদেরকে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য যে, উপরে বর্ণিত হাদীসদ্বয় একটি অপরটির বিপরীত। এজন্য উভয়টি রেখে কিয়াসের শরণাপন্ন হলাম। কিয়াস বলে চর্মের পোশাক ইত্যাদি খুলে ফেলা হবে। কেননা এগুলো কাফন জাতীয় নয়। শহীদের শরীরে যদি সুন্নত সংখ্যার চেয়ে কম কাপড় হয়, তবে সংখ্যা বৃদ্ধি করবে যাতে করে সুন্নত পরিমাণ সংখ্যা পূরা হয়ে যায়। আর যদি সুন্নত সংখ্যার অতিরিক্ত কাপড় থাকে তবে কম করবে যাতে করে সুন্নত পরিমাণ সংখ্যা অবশিষ্ট থেকে যায়।

اِرْتِثَاثٌ-এর অর্থ কোনো কিছু পুরানো হয়ে যাওয়া। ثوب رث পুরনো কাপড়কে বলা হয়। সুরতে মাসআলা হলো, আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি যদি আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনের কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করে তবে বলা হবে যে, এই শহীদ ব্যক্তি পুরানা হয়ে গেছে। আর যেহেতু জীবনের কিছু সুযোগ সুবিধা লাভের কারণে আঘাতের চিহ্নও লঘু হয়ে গেছে তাই সে উহুদের শহীদানের শ্রেণীভুক্ত হবে না। আর যেহেতু সে উহুদের শহীদানের শ্রেণীভুক্ত থাকল না তাই তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা গোসল ঐ সকল শহীদকে দেওয়া হয় না যারা উহুদের শহীদানের শ্রেণীভুক্ত। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ارتثاث হলো, আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বের কিছু খাদ্য গ্রহণ করা কিংবা নিদ্রা যাওয়া কিংবা চিকিৎসা গ্রহণ করা কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা। কেননা এর দ্বারা সে জীবনের কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করল। অথচ উহুদের শহীদানদের অবস্থা তো এই ছিল যে, পানি তাদের সামনে পেশ করা হয়েছিল কিন্তু তারা শাহাদাতের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকায় তা গ্রহণ করেননি এবং এমনি-ভাবে ধুকতে ধুকতে তার জান দিয়ে দিয়েছেন। তবে যদি কোনো শহীদকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে এ জন্য তুলে আনা হয়, যাতে সে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট না হয়ে যায় তবে এটা সুযোগ গ্রহণ বলে গণ্য হবে না। কেননা সে কোনো ধরনের আরাম লাভ করেনি। আর যদি তাকে ছোট বা বড় তাঁবুতে এনে রাখা হয় তবে সে সুযোগ গ্রহণকারী বলে গণ্য হবে। আর যদি শহীদ ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামাজের সময় অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকে এবং এই অবস্থায় সে জীবিত ছিল যে তার জ্ঞান বাকি ছিল তবে সে-ও সুবিধা গ্রহণকারী হবে। কেননা এই নামাজ তার জিম্মায় ঋণ হিসাবে বাকি থাকবে। আর নামাজ কারো জিম্মায় ঋণ হয়ে যাওয়া দুনিয়ার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত। আর আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি যদি আখিরাত সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে অসিয়ত করে তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সে-ও সুবিধা গ্রহণকারী হবে। কেননা এটাও ছওয়াব অর্জনের সুযোগ। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে সুবিধা গ্রহণকারী হবে না। কেননা এটা মাইয়েতের আহকামভুক্ত বিষয়।

وَمَنْ وُجِدَ قَتِيْلًا فِى الْمِصْرِ غُسِّلَ لِاَنَّ الْوَاجِبَ فِيْهِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ فَخَفَّ اَثَرُ الظُّلْمِ اِلَّا اِذَا عُلِمَ اَنَّهُ قُتِلَ بِحَدِيْدَةٍ ظُلْمًا لِاَنَّ الْوَاجِبَ فِيْهِ الْقِصَاصُ وَهُوَ عُقُوْبَةٌ وَالْقَاتِلُ لَا يَتَخَلَّصُ عَنْهَا ظَاهِرًا اِمَّا فِى الدُّنْيَا وَاِمَّا فِى الْعُقْبٰى وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ (رح) مَا لَا يَلْبَثُ كَالسَّيْفِ وَيُعْرَفُ فِى الْجِنَايَاتِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

অনুবাদ : যাকে নগরে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা তার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো কাসামাহ ও দিয়াত। সুতরাং এতে করে তার জুলুমের প্রতিক্রিয়া হালকা হয়ে যায়। তবে যদি জানা যায় যে, তাকে লৌহাস্ত্র দ্বারা অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। (এমতাবস্থায় গোসল দেওয়া হবে না) কেননা তার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো কিসাস যা একটি শাস্তি। আর হত্যাকারী বাহ্যত কোনোক্রমেই শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে না, দুনিয়াতে কিংবা আখিরাতে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যে অস্ত্রে প্রাণ সংহার বিলম্বিত হয় না, তা তলোয়ারের হুকুমভুক্ত। ইনশাআল্লাহ جنايات (অপরাধসমূহ) অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো নিহত ব্যক্তিকে শহরে পাওয়া যায় এবং তার হত্যাকারী জানা নেই, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা এই সুরতে মহল্লাবাসীর উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে এবং এই দিয়াতের ফায়দা মাইয়েত পাবে। তাই নিহত ব্যক্তি যদি ধনী হয় তবে এর দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। সুতরাং দিয়াতের ফায়দা যেহেতু মাইয়েতের হাসিল হলো তাই তার উপর থেকে জুলুমের প্রতিক্রিয়া হালকা হয়ে গেল, আর যেহেতু এই নিহত ব্যক্তি পরিপূর্ণ মজলুম থাকল না সেহেতু সে উহুদের শহীদানের শ্রেণীভুক্তও হবে না। এবং শহীদানের উহুদের ন্যায় তার থেকে গোসল বাদ যাবে না। তবে যদি জানা যায় যে, সে ধারাল কোনো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়েছে এবং হত্যাকারীও জানা আছে, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা এ সুরতে কিসাস ওয়াজিব। আর কিসাস হলো শাস্তি, বিনিময় নয়। আর যেহেতু কিসাস হলো শাস্তি বিনিময় নয় সেহেতু জুলুমের প্রতিক্রিয়াও হালকা হবে না; বরং নিহত ব্যক্তি পূর্ণরূপে মজলুম বলে গণ্য হবে। আর যেহেতু সে পূর্ণরূপে মজলুম তাই উহুদের শহীদানের শ্রেণীভুক্ত হওয়ার কারণে তাকেও গোসল দেওয়া হবে না। তবে হত্যাকারীও বাঁচতে পারবে না। কারণ হত্যাকারী যদি ধরা পড়ে তবে দুনিয়াতেই সাজা পাবে। আর যদি ধরা না পড়ে তবে আখিরাতে সাজা পাবে। মোটকথা, যদি হত্যার কারণে হত্যাকারী কিংবা হত্যাকারীর অভিভাবক কিংবা তার আকিলার উপর দিয়াত ওয়াজিব হয় তবে হত্যাকারী ব্যক্তি দুনিয়াতে শহীদ হবে না। সাধারণ মানুষের ন্যায় তাকেও গোসল দেওয়া হবে। আর যদি হত্যার কারণে কিসাস ওয়াজিব হয় তবে নিহত ব্যক্তি শহীদ হবে এবং তাকে গোসল দেওয়া হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন হয়। প্রশ্নটি হলো, যার হত্যার কারণে কিসাস ওয়াজিব হলো সে ব্যক্তি উহুদের শহীদানের শ্রেণীভুক্ত নয়। কেননা উহুদের শহীদানের হত্যার কারণে কোনো জিনিস ওয়াজিব হয়নি। আর যে ব্যক্তি উহুদের শহীদানের শ্রেণীভুক্ত নয় তাকে গোসল দেওয়া হবে। সুতরাং তাকেও গোসল দেয়া উচিত যার হত্যার কারণে কিসাস ওয়াজিব হয়? এর জওয়াব হলো, কিসাসের ফায়দা নিহত ব্যক্তির অভিভাবক আর সমস্ত মানুষ পায়, নিহত ব্যক্তি পায় না। সুতরাং যেমনিভাবে উহুদের শহীদানদের কোনো ফায়দা হাসিল হয়নি এমনিভাবে তাদেরও কোনো লাভ হয়নি। এর বিপরীত হলো দিয়াত। কেননা দিয়াতের লাভ নিহত ব্যক্তি পায়। এমনকি দিয়াতের মাল দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করা হয়। আর যদি অসিয়ত থাকে তা-ও পূরণ করা হয়। সাহেবাইন বলেন, যে সকল অস্ত্র প্রাণ সংহারে বিলম্ব করে না সেগুলোও তরবারির হুকুমভুক্ত। অর্থাৎ শহরে যদি কোনো নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া যায় এবং তার হত্যাকারীও জানা থাকে এবং আরো জানা আছে যে, ধারালো অস্ত্র ব্যতীত অন্য কোনো ভারী পাথর কিংবা লাঠি দ্বারা মারা হয়েছে, তবে সাহেবাইনের মতে হত্যাকারীর উপর কিসাসও ওয়াজিব হবে। আর যেহেতু অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে তাই সে শহীদ হওয়ার কারণে তাকে গোসলও দেওয়া হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ধারালো অস্ত্র ব্যতীত অন্য কোনো ভারী অস্ত্র দ্বারা হত্যা করলে হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না। মোটকথা, কিসাস ওয়াজিব হওয়ার জন্য ইমাম সাহেবের মতে ধারালো অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা শর্ত। আর সাহেবাইনের মতে শর্ত নয়। বিস্তারিত আলোচনা জিনায়াত অধ্যায়ে করা হবে।

وَمَنْ قُتِلَ فِىْ حَدٍّ اَوْ قِصَاصٍ غُسِلَ وَصُلِّىَ عَلَيْهِ لِاَنَّهٗ بَاذِلٌ نَفْسَهٗ لِاِيْفَاءِ حَقٍّ مُسْتَحَقٍّ عَلَيْهِ وَشُهَدَاءُ اُحُدٍ بَذَلُوْا اَنْفُسَهُمْ لِاِبْتِغَاءِ مَرْضَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَلَا يَلْحَقُ بِهِمْ وَمَنْ قُتِلَ مِنَ الْبُغَاةِ اَوْقُطَّاعِ الطَّرِيْقِ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ لِاَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْبُغَاةِ ـ

অনুবাদ : যাকে হদ বা কিসাস হিসাবে হত্যা করা হয়েছে তাকে গোসল দেওয়া হবে এবং তার উপর জানাযা পড়া হবে। কেননা সে তার উপর সাব্যস্ত হক আদায় করার জন্য স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করেছে। অথচ উহুদের শহীদগণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের জান উৎসর্গ করেছেন। সুতরাং তাকে তাদের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না। যে সকল বিদ্রোহী কিংবা ডাকাত নিহত হয় তাদের উপর জানাযা পড়া হবে না। কেননা আলী (রা.) বিদ্রোহীদের উপর জানাযা পড়েননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো ব্যক্তি হদ কিংবা কিসাস হিসাবে কতল হয় তবে তাকে গোসলও দেওয়া হবে এবং তার জানাযাও পড়া হবে। কেননা সে তার উপর ওয়াজিব হককে আদায় করার জন্য আপন জান দিয়ে দিয়েছে। আর উহুদের শহীদগণ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জান উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এ জন্য হদ কিংবা কিসাস হিসাবে নিহত ব্যক্তিকে উহুদের শহীদানদের সাথে যুক্ত করা যাবে না। তা ছাড়া বর্ণিত আছে যে, হযরত মায়িযে আসলামী (রা.)-কে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়েছিল। তখন তাঁর চাচা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন قُتِلَ مَاعِزٌ كَمَا يُقْتَلُ الْكِلَابُ فَمَاذَا تَأْمُرُنِىْ اَنْ اَصْنَعَ আল্লাহর রাসূল! মায়িযকে কুকুরের ন্যায় হত্যা করা হয়েছে। বলুন এখন আমি কি করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন لَاتَقُلْ هٰذَا فَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ تَوْبَتُهٗ عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ لَوَسِعَتْهُمْ اِذْهَبْ وَغَسِّلْهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ এমনটি বল না, সে তওবা করেছে। এমন তওবা করেছে যে, তার তওবা যদি সমগ্র জমিনবাসীকে ভাগ করে দেওয়া হয় তবে সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। যাও, তাকে গোসল দাও এবং তার জানাজা পড়।

আর যদি কোনো বিদ্রোহী বা ডাকাত নিহত হয়, আমাদের মতে তার জানাযার নামাজ পড়া হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, পড়া হবে। তাঁর দলিল হলো, বিদ্রোহী আর ডাকাত মু'মিন। ওয়াজিব হকের জন্য হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির মতো হয়ে গেল যাকে প্রস্তারাঘাত কিংবা কিসাস হিসাবে হত্যা করা হয়েছে। উপরোক্ত পৃষ্ঠা গুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে, হদ কিংবা কিসাস হিসাবে নিহত ব্যক্তির উপর জানাযা পড়া হবে। সুতরাং বিদ্রোহী ও ডাকাতও নিহত হলে তার জানাযার নামাজ পড়া হবে। আমাদের দলিল হলো, হযরত আলী (রা.) খারেজীদেরকে গোসল দেননি এবং তাদের জানাযাও পড়েননি। অথচ খারেজীরা বিদ্রোহী ছিল। হযরত আলী (রা.)-কে বলা হয়েছিল اَهُمْ كُفَّارٌ তারা কি কাফির? হযরত আলী (রা.) বলেন, لَا وَلٰكِنَّهُمْ اِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا না, তবে তারা আমাদের ভাই। আমাদের সাথে বিদ্রোহ করেছে। এর দ্বারা বুঝা গেল, বিদ্রোহী ও ডাকাতদেরকে গোসল না দেওয়া এবং তাদের জানাযা না পড়া। তাদেরকে শাস্তি দেওয়া এবং অন্যদেরকে সজাগ করার জন্য করা হয়। যেমন ডাকাতদেরকে তিনদিন পর্যন্ত শূলীতে রাখা হয়। উল্লেখ্য যে, শূলীতে এ কারণে চড়ানো হয়, যাতে তার শাস্তি হয় এবং অন্যরা সতর্ক হয়। আল্লাহই সম্যক অবহিত।

بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الْكَعْبَةِ

اَلصَّلٰوةُ فِى الْكَعْبَةِ جَائِزَةٌ فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِىْ فِيْهِمَا وَلِمَالِكٍ فِى الْفَرْضِ لِاَنَّهُ ﷺ صَلّٰى فِىْ جَوْفِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَلِاَنَّهَا صَلٰوةٌ اِسْتَجْمَعَتْ شَرَائِطَهَا لِوُجُوْدِ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِاَنَّ اِسْتِيْعَابَهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ فَاِنْ صَلَّى الْاِمَامُ بِجَمَاعَةٍ فِيْهَا فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ ظَهْرَهُ اِلٰى ظَهْرِ الْاِمَامِ جَازَ لِاَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ اِلَى الْقِبْلَةِ وَلَا يَعْتَقِدُ اِمَامَهُ عَلَى الْخَطَاِ بِخِلَافِ مَسْاَلَةِ التَّحَرِّىْ وَمَنْ جَعَلَ مِنْهُمْ ظَهْرَهُ اِلٰى وَجْهِ الْاِمَامِ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ لِتَقَدُّمِهِ عَلٰى اِمَامِهِ وَاِذَا صَلَّى الْاِمَامُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَتَحَلَّقَ النَّاسُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَصَلُّوْا بِصَلٰوةِ الْاِمَامِ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ اَقْرَبَ اِلَى الْكَعْبَةِ مِنَ الْاِمَامِ جَازَتْ صَلَاتُهُ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِىْ جَانِبِ الْاِمَامِ لِاَنَّ التَّقَدُّمَ وَالتَّاَخُّرَ اِنَّمَا يَظْهَرُ عِنْدَ اِتِّحَادِ الْجَانِبِ ـ

পরিচ্ছেদ : কাবার অভ্যান্তরে নামাজ আদায় করা

অনুবাদ : কাবার অভ্যন্তরে ফরজ ও নফল নামাজ আদায় করা জায়েজ। উভয় বিষয়ে ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর ভিন্ন মত রয়েছে। আর শুধু ফরজের ব্যাপারে ইমাম মালিক (র.)-এর ভিন্ন মত রয়েছে। আমাদের দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে নামাজ আদায় করেছেন। আর এ কারণে যে, অভ্যন্তরীন নামাজের যাবতীয় শর্ত সম্পন্ন হয়েছে। এতে কিবলামুখী হওয়াও পালিত হয়েছে। কেননা, সমগ্র কা'বা সম্মুখে রাখা শর্ত নয়। ইমাম যদি কা'বার ভিতের জামাআতের ইমামতি করেন, আর তখন মুক্তাদীদের কেউ ইমামের পিঠের দিকে নিজের পিঠ দিয়ে দাঁড়ায় তবুও নামাজ জায়েজ হবে। কেননা সে কিবলামুখী রয়েছে এবং আপন ইমামকে ভুলের উপর রয়েছে বলেও মনে করে না। চিন্তা করে কিবলা নির্ধারণের বিষয়টি এর বিপরীত। আর তাদের মাঝে যে ইমামের চেহারার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াবে, তার নামাজ জায়েজ হবে না। কেননা সে ইমামের অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। ইমাম যদি মাসজিদুল হারামে নামাজ পড়ান আর লোকেরা কা'বার চারপাশে হালকা করে বৃত্তাকারে করে দাঁড়ায় এবং ইমামের নামাজে ইকতিদা করে তাহলে তাদের মধ্যে যে কা'বার দিকে ইমামের চেয়ে অধিক নিকটবর্তী হবে, তার নামাজও জায়েজ হবে, যদি সেই পাশে দাঁড়িয়ে না থাকে, যে পাশে ইমাম আছেন। কেননা একই পার্শ্বে হওয়ার বেলায়ই অগ্রবর্তিতা ও পশ্চাদবর্তিতা প্রকাশ পাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব কথা : صَلٰوةٌ فِى الْكَعْبَةِ -কে- كِتَابُ الصَّلٰوةِ-এর শেষ পর্যায়ে এ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে সালাত অধ্যায়ের সমাপ্তি একটি বরকতপূর্ণ জিনিস দ্বারা হয়। বায়তুল্লাহর নাম কা'বা এ কারণে রাখা হয়েছে যে, কা'বা শরীফ চৌকোণ বিশিষ্ট। তাই কা'বা বলে নামকরণ করা হয়েছে।

اَلصَّلٰوةُ فِى الْكَعْبَةِ الخ : আমাদের মতে কা'বার অভ্যন্তরে ফরজ ও নফল উভয় নামাজ জায়েজ। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে উভয়টি নাজায়েজ। ইমাম মালিক (র.) -এর মতে নফল জায়েজ, ফরজ জায়েজ নয়। হিদায়া গ্রন্থকার লিখেছেন কা'বার অভ্যন্তরে ফরজ ও নফল জায়েজ না হওয়ার নিসবত ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দিকে করা লেখকের (كاتب) ভুল। কেননা আসহাবে শাফি'ঈ তাদের কিতাবগুলোর মধ্যে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মাযহাব জায়েজ হওয়া লিখেছেন, নাজায়েজ হওয়া নয়। এর জওয়াব হলো, কা'বার দরজা যদি খোলা থাকে আর সামনে সুতরাহ না থাকে তবে কা'বার অভ্যন্তরে ফরজ নফল পড়া ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে জায়েজ নেই। আর যদি কা'বার দরজা বন্ধ থাকে কিংবা সামনে সুতরাহ থাকে তবে জায়েজ। ইমাম মালিক (র.) দলিল দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কা'বার অভ্যন্তরে নামাজ পড়ে সে কা'বার এক অংশের ইস্‌তিকবাল করে আর অপর অংশের ইস্‌তিদবার করে। সুতরাং নামাজের অবস্থায় ইস্‌তিকবালে কিবলার তাকাযা হলো, নামাজ সহীহ হয়ে যাওয়া। আর ইস্‌তিদ্‌বার-এর তাকাযা হলো নামাজ ফাসিদ হয়ে যাওয়া। তাই সতর্কতামূলক আমাদের দিকটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কিয়াসের চাহিদা নফলের ক্ষেত্রে এটাই ছিল যে, নফলও কা'বার অভ্যন্তরে জায়েজ না হওয়া। তবে যেহেতু নফলের ব্যাপারে হাদীস রয়েছে, এ জন্য নফলের ক্ষেত্রে কিয়াসকে বর্জন করা হয়েছে। তা ছাড়া নফলের ভিত্তিও কিছুটা সহজ ও আসানীর উপর করা হয়েছে তাইতো দাঁড়ানোর শক্তি থাকা সত্ত্বেও বসে নফল পড়া জায়েজ। আর ফরজ যেহেতু নফলের শ্রেণীভুক্ত নয় এ জন্য ফরজকে নফলের সাথে যুক্ত করে কা'বার অভ্যন্তরে ফরজ পড়ার ইজাযত দেওয়া হয়নি। আমাদের দলিলে হলো, মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার ভিতর দুই রাকআত নফল আদায় করেছেন। হাদীসটি হলো –

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَاُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَاَغْلَقَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ مَكَثَ فِيْهَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِيْنَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَعَلَ عُمُوْدَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمُوْدًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَثَلَاثَةَ اَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ثُمَّ صَلّٰى وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ وَكَانَ هٰذَا يَوْمَ الْفَتْحِ ـ

ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা, বিলাল এবং ওসমান ইবনে তালহা কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর তাঁরা কা'বার দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর তাতে তাঁরা অবস্থান করলেন। ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি বিলালকে জিজ্ঞাসা করলাম যখন বিলাল বাইরে বের হয়ে আসলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কি আমল করেছেন? বিলাল বললেন, দু'টি খুঁটি তিনি বাম দিকে রাখলেন, একটি ডান দিকে আর তিনটি পিছনের দিকে রাখলেন। তারপর তিনি নামাজ আদায় করলেন। তখন বায়তুল্লাহর ছয়টি খুঁটি ছিল। আর ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের দিন ছিল। যদি কা'বার অভ্যন্তরে নামাজ পড়া নাজায়েজ হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কা'বার ভিতর নামাজ পড়তেন না। এখন আপনারা যদি বলেন যে, তা নফল ছিল তবে এর জওয়াবে আমরা বলব জায়েজ হওয়ার যে সকল শর্ত নফলের রয়েছে সেগুলো ফরজেরও বটে। এ জন্য ফরজও নফলের শ্রেণীভুক্ত হবে। সুতরাং নফলের ন্যায় ফরজও কা'বার অভ্যন্তরে জায়েজ হবে। দ্বিতীয় দলিল হলো, যে নামাজ কা'বার অভ্যন্তরে পড়া হয়েছে তার মধ্যে নামাজের সমগ্র শর্ত ছিল, এমনকি ইস্‌তিক্‌বালে কিবলাও পাওয়া গিয়েছে। কেননা সমস্ত কা'বা সামনে রাখা শর্ত নয়, আর এটা সম্ভবপরও নয়।

فَاِنْ صَلّٰى الْاِمَامُ بِجَمَاعَةٍ الخ : কা'বার ভিতরে জামাআতের সাথে নামাজ পড়ার চারটি সুরত রয়েছে। (১) মুক্তাদীর চেহারা ইমামের পিঠের দিকে হবে। (২) মুক্তাদীর চেহারা ইমামের চেহারার দিকে হবে। (৩) মুক্তাদীর পিঠ ইমামের পিঠের

দিকে হবে। (৪) মুক্তাদীর পিঠ ইমামের মুখের দিকে হবে। প্রথম ও তৃতীয় সুরত মাকরূহ ছাড়াই জায়েজ। দ্বিতীয় সুরত কারাহাত সহ জায়েজ। আর চতুর্থ সুরত একেবারেই জায়েজ নেই। প্রথম সুরত জায়েজ হওয়া তো যাহির। দ্বিতীয় সুরত এ জন্য জায়েজ যে, ইমামের অনুসরণ পাওয়া গেছে। আর প্রতিবন্ধক তথা ইমামের অগ্রে যাওয়া পাওয়া যায়নি। এ সুরতে কারাহাত এ জন্য যে, যখন মুক্তাদীর চেহারা ইমামের চেহারার দিকে হবে তাহলে সুরত তথা ছবি সামনে রেখে ইবাদতকারীদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যাবে। তাই উক্ত সুরতে ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে সুতরাহ রাখা সমীচীন হবে। তবেই ঐ সাদৃশ্য থেকে বাঁচা যাবে। তৃতীয় সুরত জায়েজ হওয়ার কারণ হিদায়া গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন যে, মুক্তাদী কিবলামুখীও এবং সে নিজের ইমাম ভুলের উপর রয়েছে বলেও মনে করে না এবং নিজের ইমামের অগ্রেও না। এর বিপরীত হলো তাহাররীর মাসআলাটি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্ধকার রাতে জামাআতের সাথে নামাজ পড়ে এই ইমামের পিঠের দিকে নিজের পিঠ করেছে আর সে ইমামের হালাতও জানে, তবে এই মুক্তাদীর নামাজ জায়েজ হবে না। কেননা তার আকীদা হলো ইমাম ভুলের উপর রয়েছেন। চতুর্থ সুরত জায়েজ না হওয়ার কারণটি যাহির। কেননা এ সুরতে মুক্তাদী তার ইমামের আগে হয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, এটাতো একেবারেই জায়েজ নেই।

ফায়দা : যে মুক্তাদী ইমামের ডানে কিংবা বামে থাকবে তার নামাজও জায়েজ হবে।

وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الخ : মাসআলা, ইমাম মসজিদে হারামে ইমামত করে নামাজ পড়াল, লোকেরা কা'বার চারপার্শ্বে হালকা করে দাঁড়াল এবং ইমামের ইক্‌তিদায় নামাজ পড়ল, তবে যে দিকে ইমাম নেই সে দিকে যদি মুক্তাদী ইমামের তুলনায় কা'বার অধিক নিকটবর্তী হয় তবে তার নামাজ জায়েজ হয়ে যাবে। কিন্তু যে দিকে ইমাম আছে সেদিকে যদি ইমামের তুলনায় কা'বার অধিক নিকটবর্তীও হয় তবে উক্ত মুক্তাদীর নামাজ জায়েজ হবে না। কেননা একই পার্শ্বে হওয়ার বেলায় অগ্রবর্তিতা ও পশ্চাদবর্তিতা প্রকাশ পায়। সুতরাং ইমামের দিকে যে মুক্তাদী ইমামের তুলনায় কা'বার নিকটবর্তী হবে এতে সে ইমামের আগে হয়ে যাবে। আর যে মুক্তাদী তার ইমামের আগে হবে তার নামাজ জায়েজ হবে না। আর যে দিকে ইমাম নেই সে দিকে অগ্রবর্তিতা প্রকাশ পায় না। এ জন্য এদিকের লোকদের নামাজ জায়েজ হয়ে যাবে।

وَمَنْ صَلّٰى عَلٰى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ جَازَتْ صَلَاتُهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِاَنَّ الْكَعْبَةَ هِيَ الْعَرْصَةُ وَالْهَوَاءُ اِلَى عِنَانِ السَّمَاءِ عِنْدَنَا دُوْنَ الْبِنَاءِ لِاَنَّهُ يُنْقَلُ اَلَا تَرٰى اَنَّهُ لَوْ صَلّٰى عَلٰى جَبَلِ اَبِىْ قُبَيْسٍ جَازَ وَلَا بِنَاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ اِلَّا اَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَرْكِ التَّعْظِيْمِ وَقَدْ وَرَدَ النَّهْىُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি কা'বার ছাদে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে তার নামাজ জায়েজ। এ সম্পর্কে ইমাম শাফি'ঈ (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। কারণ, আমাদের মতে কা'বা হলো আসমান পর্যন্ত খোলা স্থল ও শূন্য স্থান, ভবন নয়। আর ভবন তো স্থানান্তরিতও হতে পারে। এ জন্যই তো কেউ জাবালে আবূ কুবায়স-এর চূড়ায় উঠে নামাজ আদায় করলে তার নামাজ জায়েজ হবে। অথচ ভবন তো তার সম্মুখে বিদ্যমান নেই। তবে মাকরূহ হবে। কেননা এতে কা'বার প্রতি অসম্মান করা হয় এবং এ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ থেকে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের মতে কা'বার ছাদের উপর নামাজ পড়া জায়েজ আছে, যদিও তার সামনে সুতরাহ না থাকে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, কা'বার ছাদের উপর নামাজ পড়া জাজেয় নেই, তবে যদি সামনে সুতরাহ থাকে তাহলে জায়েজ হবে। উক্ত ইখতিলাফের ভিত্তি হলো, ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে নামাজের মধ্যে কা'বার ভবনের দিকে ফিরে দাঁড়ানো জরুরি। আমাদের মতে কিবলা নাম হলো কা'বা, কা'বা ভবনের নাম নয়; বরং ঐ স্থান যেখানে কা'বার ভবন আছে সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত পুরো খোলা ও শূন্যের নাম হলো কা'বা। ভবনের নাম কা'বা এ কারণে নয় যে, ভবন স্থানান্তরিত হয়। এ কারণেই কেউ যদি জাবালে আবূ কুবায়সের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে তবে জায়েজ হবে। অথচ তার সামনে ভবন ইত্যাদি কিছুই নেই। এমনিভাবে যদি কা'বা থেকে অনেক উঁচু স্থানে দাঁড়িয়েও নামাজ আদায় করে তবে তাও জায়েজ হবে। তবে এতটুকু তো অবশ্যই ধর্তব্য যে, কা'বার ছাদের উপর নামাজ পড়া মাকরূহ। কারণ হলো, কাবার ছাদের উপর উঠার দ্বারা কা'বার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। এ জন্য মাকরূহ বলা হয়েছে। তা ছাড়া কাবার ছাদের উপর নামাজ পড়া থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও নিষেধ করেছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ سَبْعِ مَوَاطِنَ اَلْمَجْزَرَةِ وَالْمَزْبَلَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ وَقَوَارِعِ الطَّرِيْقِ وَمَعَاطِنِ الْاِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাত জায়গায় নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন– (১) মাযবাহ তথা জবাইয়েরর স্থান (২) ডাস্টবিন (৩) কবরস্থান (৪) গোসলখানা (৫) রাস্তার মাঝখান (৬) উট বাঁধার স্থান (৭) বায়তুল্লাহর ছাদ। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, কা'বার ছাদের উপর নামাজ পড়া নিষেধ। আল্লাহই সম্যক অবহিত।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .